মাসিক বসুমতী

দ্বিতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

(১৩৩০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা)

সম্পাদক ঃ—

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-প্রেসে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়ানুক্রমিক সূচী।

[কার্ত্তিক হইতে চৈত্র, ১৩৩০]

চিত্র-সূচি—কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

রাস

২য় বর্ষ } ২য় * কার্ত্তিক, ১৩৩০ * খণ্ড { ১ম সংখ্যা

বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থ্যের অপব্যবহার

আমি ইতঃপূর্ব্বে নানাক্ষেত্রে বাঙ্গালীর পরাজয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং বাঙ্গালাদেশের অন্ন-সমস্যা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ের কারণ নির্ণয়ের প্রয়াসও করিয়াছি। আমাদের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন জাতি প্রতিযোগিতায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর নিকট কেন পরাভূত হইতেছে, অনুসন্ধান করিয়া তাহার কারণ-নির্ণয়ই আমার উদ্দেশ্য। আমার মনে হয়, আমাদের বুদ্ধির অতি-প্রাখর্য্য সুপ্রযুক্ত না হওয়ায় "উপরচালাকী"তে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ফাঁকি দিয়া অনায়াসে বা অল্পায়াসে ঈপ্সিত লাভ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা আমাদের এই দুর্ভাগ্যের কারণ। প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, কোনও জাতিকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ক্রমাগত সমসাময়িক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয় এবং যখন দুইটি সভ্যতায় সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন দুর্ব্বল ধারা প্রবল স্রোতে বিলীন হইয়া যায়। টিকিয়া থাকিতে হইলে, জাতির অন্তরে শক্তি ও বাহিরে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনে সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হয়। জগতের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে স্থানেই দ্বিবিধ সভ্যতায় সংঘর্ষ হইয়াছে, সেই স্থানেই দুর্ব্বল জাতিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান ও নিউজিলাণ্ডের মাওরী প্রভৃতি জাতি এইরূপে অনিবার্য্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে।

আমাদের সভ্যতা প্রাচীনতম কালের। জগতের চিন্তারাজ্যে আমাদের দান করিবার এখনও অনেক সম্পদ আছে এবং মানবের সভ্যতার পরিপূর্ণ পরিণতিতে আমাদের এখনও অনেক কায রহিয়াছে, তাই আমরা আজও বাঁচিয়া আছি; কিন্তু আমরা যদি পরিবর্ত্তনশীল কালের গতি উপেক্ষা করিয়া পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইবে।

ইংরাজ যখন প্রথম এ দেশে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করেন, তখন এই সুজলা সুফলা বঙ্গদেশে গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু ও পুকুরভরা মাছ লইয়া আমরা নিরুদ্বেগে ভালই ছিলাম। তখন এ দেশ হইতে বিদেশে বহু পণ্য রপ্তানী হইত না, কাযেই দেশে এখনকার মত টাকা ছিল না; কিন্তু দেশের লোক পেট ভরিয়া খাইতে পাইত। সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে বাঙ্গালায় টাকায় ৮ মণ ধান মিলিত। পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক একখানি পুরাতন রামায়ণ পুঁথির পশ্চাদ্ভাগে লিখিত হিসাবে দেখা গিয়াছে, তখন ২৫ টাকায় দুর্গোৎসব সমাধা হইয়াছে। দধির মণ

৮৹ আনা ও চাউলের মণ ॥৹ আনা মাত্র ছিল। ইহাতে প্রমাণ হয়, তখন দেশে বিত্ত অধিক ছিল না। তাহার পর ৫০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বাল্যকালেও দেখিয়াছি, কড়ির চলন ছিল; কড়ি দিয়া মুড়ি কেনা চলিত। আর এখন হিন্দুর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে কড়ির প্রয়োজন হইলে তাহা কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। "ভাল খেতে সাধ যায় তেলে বড় কড়ি"—ইত্যাদি প্রবাদে সে কালের চলিত মুদ্রার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বলিয়াছি, তখন দেশে অর্থের স্বল্পতা থাকিলেও আহার্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল। এখন কালের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে আমাদিগকে নূতন নূতন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। আর আমরা একান্ত আগ্রহভরে বহু শতাব্দীর প্রাচীন পথ আগলাইয়া বসিয়া আছি। ইহারই ফলে শক্তিশালী জাতিরা আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে; তাই বাঙ্গালী আজ বুভুক্ষিত।

গত ১ বৎসর আমি বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রায় ১৫ হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করিয়াছি। পল্লীগ্রামে ও সহরে বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমাগত ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়াছি, কয়জনের ভাগ্যে প্রতিদিন অন্ততঃ ২ পোয়া দুধ মিলে। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের কথা বাদ দিলেও বলা যায়, বাঙ্গালার পল্লীগ্রামেও আজকাল লোকের পক্ষে দুধ জোটান কষ্টসাধ্য। এই যে আজ আমরা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, যক্ষ্মা প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া জীবন্মৃত হইয়া পড়িতেছি, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব ইহার অন্যতম কারণ; পর্য্যাপ্ত খাদ্যের অভাব আজ দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতেছে। খুলনায় এবং উত্তরবঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে সাধারণ লোক যে দুই বেলা উদরপূর্ত্তি করিয়া আহার করিতে পায় না, তাহা আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। যিনি উত্তরকালে বাঙ্গালার ছোট লাট হইয়াছিলেন, সেই সার চার্লস ইলিয়ট এ দেশের লোকের এইরূপ দুর্দ্দশার কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মাছ ও দুধ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। কলিকাতার মত সহরবাসীরা দুধ চোখে দেখিতেই পায়েন না; আর মাছ—কেবল প্রথা রক্ষা করিবার জন্য হোমিওপ্যাথিক ডোজে আহার করা হয়; এইরূপে সমগ্র জাতিতে এখন নাইট্রোজেন অনাহার ঘটিতেছে। ডাক্তার বেণ্টলি প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই ম্যালেরিয়া প্রভৃতির পরোক্ষ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জীবনীশক্তিহীন, রোগজীর্ণ, দুর্ব্বল দেহে সতেজ মন আশা করিতে পারা যায় না; তাই আজ দেশের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, আশাহীন, ভগ্নোৎসাহ, উদ্যমহীন বাঙ্গালী দেখিতে পাই, জীর্ণ-শীর্ণ দেহ ও উৎসাহহীন হৃদয় লইয়া আমরা অদৃষ্টকে ধিক্কার দেই আর মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি আমাদেরই অর্থে পুষ্ট হয়।

পূর্ব্বে কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে কালা-ধলার চলাফেরার স্থানও স্বতন্ত্র ও নির্দ্দিষ্ট ছিল, এখন সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন দেখি, হৃষ্টপুষ্ট মাড়োয়ারীরা সে বাগানে অবাধে যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে, আর শ্বেতাঙ্গরা হয় ত বা স্থানাভাবে, হয় ত বা কালা আদমীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে গাড়ীতে বসিয়া আছে। কিন্তু বাঙ্গালী কোথায়? সমস্ত দিন প্রাণপাত পরিশ্রমে কেরাণীগিরি করিয়া আমরা কোনরূপে দেহে প্রাণরক্ষা করি।

আমরা কবিতা আবৃত্তি করিবার সময় বলিয়া থাকি, আমরা সাত কোটি বাঙ্গালী, কিন্তু এই সংখ্যাধিক্যে ফল কি? সংখ্যাধিক্যেই যদি জয়লাভ হইত, তবে মশা, মাছি, পিপীলিকা মুল্লুক জয় করিত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপানে যুদ্ধের সময় জাপানের লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে ৪ কোটি; আর তখন চীনসাম্রাজ্যের লোকসংখ্যা ৪৫ কোটি। চীনসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, উপকরণ প্রভৃতি জাপানের বিস্তৃতি ও উপকরণ অপেক্ষা শতগুণ অধিক। কিন্তু চীনের উপকরণাদি অপরিণত। চীন তখনও পুরাতনের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ও তজ্জনিত মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই। আর জাপান তখন নব-জাগরণে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। প্রতীচীর সংস্পর্শে আসিয়া জাপান বুঝিয়াছিল, তাহাকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে প্রতীচীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জ্জন না করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। এই বোধের ফলে জাপান আপনার প্রাচীন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া এমন ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, যুদ্ধঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাপানী রণতরী যখন চীন-বন্দরে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল, তখন নিরুপায় চীন তাহার বিরাট বিস্তৃতিভার লইয়া জাপানের নিকট জানু পাতিয়া পরাভব স্বীকার

করিতে বাধ্য হইল। সেই সময় জাপানের কোনও পত্রিকায় এই অবস্থার এক বিদ্রূপাত্মক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল—বন্দরের বাহিরের জাপানী জাহাজের গোলা বেণীধারী পলায়মান চীনা সৈনিকদের মধ্যে পতিত হইতেছে আর তাহারা বেণী উড়াইয়া উর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে পথ পাইতেছে না। কেবল সংখ্যাধিক্যে কি লাভ হইতে পারে? আমরা ৭ কোটি বাঙ্গালী বলিয়া আস্ফালন করিলেও কি ফল লাভ করিব?

মধ্যযুগে বলদৃপ্ত স্পেন যখন গৌরবের সমুচ্চ শিখরে সমাসীন, হল্যাণ্ড তখন য়ুরোপের প্রচলিত ক্যাথলিক ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মত গ্রহণ করিয়াছে। স্পেনের রাজা পোপের অন্যতম প্রধান ভক্ত এবং স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি মণিরত্ন-পরিপূর্ণ দেশের অধিকারী। খৃষ্টান জগতে স্পেনের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপ; আর ওলন্দাজগণ ক্ষুদ্র দেশবাসী—সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। কিন্তু নব-ধর্ম্মের অগ্নিশিখা তাহাদের অন্তরে উৎসাহদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছে। তাই মদগর্ব্বিত স্পেনের অধিপতি ফিলিপের ভ্রূকুটী অন্তরের বলে বলীয়ান্ ওলন্দাজদিগকে ভীত করিতে পারিল না। তাহাদের দেশের অর্দ্ধাংশ সাগর-সলিল-প্লাবিত, বাঁধ দিয়া বিরুদ্ধ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে সে দেশে বাস করিতে হয়। এই সংগ্রামই তাহাদের সামর্থ্যের হেতু। ধর্ম্মান্ধ ক্যাথলিকরা ধর্ম্মান্তর গ্রহণের "অপরাধের" জন্য ২০।২৫ হাজার লোককে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করিল; কিন্তু প্রিন্স অফ অরেঞ্জের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা স্পেনের বিরাট বাহিনী তুচ্ছ জ্ঞান করিল। এই স্বাধীনতার সংগ্রামে মট্‌লীকৃত Rise of the Dutch Republic গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতেও দেখিতে পাই, সংখ্যাধিক্য কোনও জাতির উন্নতির সহায় হিসাবে অতি অল্প প্রয়োজনই সাধন করিয়া থাকে। স্পেনের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য স্বদেশ-প্রেমে উদ্‌বুদ্ধ ওলন্দাজ কৃষকগণ সানন্দে ক্ষেত্রপূর্ণ ফসলের মায়া ত্যাগ করিয়া বাঁধ কাটিয়া দিয়া স্পানিস সৈন্যের গতিরোধ করিয়াছিল। বিরাট বাহিনীর অধিপতি সেনানায়ক ডিউক অফ আলফা ওলন্দাজদিগের কাছে পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই ওলন্দাজরাই ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে বাণিজ্যার্থ এ দেশে আসিয়াছিল। তাহাদের অনুকরণে ইংলণ্ডে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয় এবং তাহাতেই এ দেশে "কোম্পানীর মুলুক" প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্র হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা আজ কিরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে, তাহা তাহাদের আমদানী-রপ্তানীর খতিয়ান দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিগত যুদ্ধের শোচনীয় ফলে মধ্যয়ুরোপ এখন বিপন্ন। সেই জন্য বর্ত্তমান সময়ের হিসাব না দেখিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বের হিসাব ধরিয়া আমরা দেখাইতেছি, হল্যাণ্ডের তুলনায় ৩৩ কোটি অধিবাসীর বাসভূমি ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ—

	লোকসংখ্যা (১৯১১)	বিস্তৃতি (বর্গমাইল)	আমদানী রপ্তানী (১৯১৪)
বেলজিয়ম	৭,৫১৬,৭৩০	১১৩৯২	৮৩০,৯৭৯,০০০ পাঃ
হল্যাণ্ড	৬,১০২,৩৯৯	১২৭৬১	৫০২,৪৪৯,০০০ "
ভারতবর্ষ	৩১৫,০০০,০০০	১,৮০৩০০০	৬২০,৭৬৮,০০০ "

ক্ষুদ্র দেশ স্বল্প লোকসংখ্যা লইয়া সমৃদ্ধির হিসাবে পৃথিবীতে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও শ্রদ্ধায় অবনত হইতে হয়; আর মনে হয়, আমরা আমাদের বিরাট দেহভার লইয়া যেন কেবল মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছি। হল্যাণ্ড যে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যে এইরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু স্পেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই সেই বিজয় স্মরণীয় করিবার জন্য হল্যাণ্ডবাসীরা লিডনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনার জন্য বিশ্ববিস্তৃতকীর্ত্তি হইয়া পড়িয়াছে। এই নগরের লিডনজার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই জাতির ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করে। ইরাসমাস প্রভৃতি জগদ্বরেণ্য মনীষীরা মানবকে নূতন ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন। গ্রোটিয়াসকে আন্তর্জ্জাতিক বিধানের আদি গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারাই য়ুরোপকে মধ্যযুগের অবসাদ হইতে উদ্ধার করেন। এখনও ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি-সাধন করিতেছেন। ইঁহাদিগেরই এক জন হিলিয়মকে দ্রব করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছেন।

শক্তির ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার জাতিকে বড় করে। ৩৩ কোটি বলিয়া আমাদের আস্ফালন করিবার কোন

কারণ নাই। জাতির অন্তরে যদি শক্তির উৎস না থাকে, তাহা হইলে তাহার বাহিরের বিরাট আকার দুর্ব্বহ ভার মাত্র বলিয়া মনে হয়। জগতের বহু ক্ষুদ্র দেশের অপরিমিত সাফল্যের বিষয় চিন্তা করিলে কেবলই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়—আমরা কোথায়? অবসাদ আজ আমাদের নিত্য-সহচর; যুবকদিগের মধ্যে উৎসাহ লক্ষিত হয় না, সকলেই ভবিষ্যতের দারুণ দুশ্চিন্তায় অকালবৃদ্ধ।

"পাশ ক'রে হবে কি"—ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা ছাত্রদিগের মুখে প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। আমাদের জীবনে যেন কোন লক্ষ্য নাই। উকীলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে; কিন্তু ওকালতীর দুর্ভোগ ও বিড়ম্বনা জানিয়াও ছেলেরা আইন পড়িতেছে। উদ্দেশ্য—অভিভাবকের অর্থে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের আরও ৩ বৎসর কোনরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া কাটাইয়া দেওয়া। ইহাতে বিবাহের বাজারে হয় ত কিছু সুবিধা হয়; আর কোন লাভ হয় কি না সন্দেহ। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলিপুরে ওকালতী করে। তাহার কাছে শুনিয়াছি, আলিপুরে উকীলের সংখ্যা ৭ শত ৫০। জুনিয়র বেচারাদের বটতলায় কর্ম্মভোগই সার। ইঁহাদের সংখ্যা এত অধিক যে, আইন করিয়া ১০ বৎসর উকীল হওয়া বন্ধ করিলেও ইঁহাদের বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। হোমিপ্যাথিক মতে বিষে বিষক্ষয় হয়। এই জন্যই আরও উকীলের সৃষ্ট হইতেছে কি না বলিতে পারি না। নূতন নূতন কর্ম্মক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া নূতন নূতন সংগ্রামে জয়ী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে হইলে সামর্থ্যের প্রয়োজন। অবসাদগ্রস্ত চিত্তে সে সামর্থ্য কোথা হইতে আসিবে?

বাঙ্গালা দেশে ভারতবর্ষের আর সকল প্রদেশের লোক অন্নসংস্থান করিতেছে, আর বাঙ্গালীরাই অনশনক্লিষ্ট। বাঙ্গালায় বেহারা, চাকর, পাচক, মুচী, মিস্ত্রী পাটনী প্রভৃতি সবই ভিন্ন দেশের লোক। বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যাহারা এই সকল কার্য্য করিত, তাহারা কোথায়? তাহাদের গৃহ কি ধনধান্যে এতই পূর্ণ, তাহাদের সিন্দুকে কি এতই স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চিত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে আর উপার্জ্জন করিতে হয় না? তাহাদের অন্নই ত অন্য প্রদেশের লোকরা খাইতেছে, তাহারা করে কি? পৈতৃক ভিটা আগলাইয়া তাহারা সাপ বাঘের আবাস বন-জঙ্গলে পূর্ণ বাপ পিতামহের মাটী আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে; অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে এবং ম্যালেরিয়া ও অনাহারের সহিত অসমসংগ্রামে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে।

উদ্যমের অভাবই ইহার কারণ। সত্য বটে, এককালে পল্লীগ্রামের চতুঃসীমাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। এখন আর আমাদিগের পক্ষে বহির্জগত হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে; এখন আমাদিগকে আপনাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া সকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আপনাদের সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে; নহিলে প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে আমাদের বিলয়প্রাপ্তি অনিবার্য্য। বিস্ময়ের বিষয়, সামর্থ্যের হিসাবে ভারতবর্ষে বাঙ্গালী সকল জাতির পশ্চাতে রহিয়াছে। আজ দেখিতে পাই, কচ্ছপ্রদেশ হইতে করাতীরা বাঙ্গালায় কাঠ কাটিতে আসিতেছে। বাঙ্গালার করাতীরা কোথায় গেল? চীনা ছুতার সুদূর চীন হইতে অন্ন-সংস্থান করিতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সে এ দেশের ভাষা, আচার, ব্যবহার কিছুই জানে না; তবুও অদৃষ্ট ভরসা করিয়া স্বদেশে তিলে তিলে অনশনে মৃত্যুভোগ না করিয়া অকুতোভয়ে অজানাদেশে আসিয়াছে। সে যদি এ দেশে আপনার শক্তিতে ও উদ্যমে অন্ন সংস্থান করে, তবে তাহাকে দোষ দিবার কি আছে? বাঙ্গালী যদি তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তবে দোষ বাঙ্গালীর।

জার্ম্মাণ-যুদ্ধের পূর্ব্বে কলিকাতার টেঙ্গরা অঞ্চলে চীনা মিস্ত্রীর একখানি ছোট কাঠের দোকান দেখিয়াছিলাম। যুদ্ধের সময় সুবিধা মত ঠিকা কায লইয়া সে তাহার ছোট দোকানখানিকে খুব বড় কারখানায় পরিণত করিয়াছে। এখন তাহার একটা বড় কাঠের গোলাও হইয়াছে। কয় বৎসর পূর্ব্বেও কলিকাতার চাঁপাতলা অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী কাঠের আড়ৎদার দেখিয়াছি। তাহারা এখন কোথায় গেল? অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে, তাহারা অনেকেই বিদেশীদের কাছে আড়ৎ বিক্রয় করিয়া এখন তাহাদের খাতা লিখিবার চাকুরী লইয়াছে। অদৃষ্টের কি বিড়ম্বনা! টাকা অবশ্য তোড়াবন্দী হইয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া এই সব বিদেশীর কোলে পড়ে না। তবে ইহারাই বা বড় হয় কেন, আর আমাদেরই এ দুরবস্থার কারণ কি?

পূর্ব্বে গঙ্গায় অনেক বাঙ্গালী জেলে মাঝি নৌকা চালাইয়া অন্ন সংস্থান করিত। কিন্তু এখন শ্যামনগর, টাকী হুগলী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মাল্লার কয়খানি নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়?

সমস্ত জীবন শিক্ষা-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি বলিয়া শিক্ষা বিষয়ক কথাই প্রথমে মনে পড়ে। তাই প্রসঙ্গতঃ আমাদের ছাত্রবৃন্দ কিরূপে শক্তির ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করে, তাহাই দেখাইব। এবার প্রায় ১৮ হাজার ৫ শত যুবক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল। ১৫ই মার্চ্চের মধ্যে পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল; আর কলেজ খুলিয়াছে প্রায় ১৫ই জুলাই। এই সুদীর্ঘ ৪ মাস কাল ইহারা কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছে? আমি কিছু কিছু খবর রাখি; এই দীর্ঘ কাল ইহারা দিবানিদ্রায় এবং আড্ডা তাসখেলা প্রভৃতি বৃথা আমোদে ব্যয় করে। ইহাদের কি জাতিকে দান করিবার কিছুই নাই? এই সময়ের মধ্যে আপনাদিগের উন্নতির জন্য ইহারা কি চেষ্টা করিয়াছে? আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, এইরূপ সময়ে আমি মানসিক উন্নতিসাধনে বন্ধনহীন সুযোগ পাইয়াছি। এইরূপ অবকাশের সময়েই পুরাতন পুস্তকালয় হইতে লাটিন ও ফরাসী পুস্তক কিনিয়া লাটিন ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখি। এইরূপ সুযোগেই ত মানসিক সম্পদ লাভ করা যায়।

এখন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী পাঠের কোন অন্তরায়ই দেখিতে পাই না। নানারূপ সংস্করণের পুস্তক-প্রকাশকেরা শত শত পুস্তক সুলভ করিয়া দিয়াছেন। এখন ভাল ভাল পুস্তকাগারেরও অভাব নাই; এবং ধনী গৃহস্থরাও অনেকে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে এখন আর পড়িবার কোন অসুবিধা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্য সত্যই কতটুকু বিদ্যা সঞ্চয় করা যায়। ভবানীপুর অঞ্চলের ছেলেদের কলিকাতার কলেজে গতায়াতে প্রতিদিন প্রায় দুই বা আড়াই ঘণ্টা সময় অকারণ নষ্ট হয়। তাহার পর কলেজে অধ্যাপক কতক্ষণ বক্তৃতা করেন? সর্ব্বোপরি বৎসরে ৬ মাস ছুটী। কাযেই শিক্ষাব্যাপারে কলেজের উপর নির্ভর করিয়া আমরা কূপমণ্ডুক হইতেছি এবং তাহারই ফলে আজ ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদিগের নিকট পরাভব স্বীকার করিতেছে।

সেদিন য়ুরোপের খ্যাতনামা লেখক এচ, জি, ওয়েলসের "The Salvaging of Civilisation" পাঠ করিলাম। আমি বরাবর বলিয়া থাকি যে, ১৮৯০ সালের 1st Class M.A. ১৯২০ সন্ পর্য্যন্ত তাহার প্রথম শ্রেণীর বড়াইতে কাটাইয়া দেন; কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির কোন বিশেষ খবরাখবর আর রাখেন না। ওয়েলসও তাহাই বলিয়াছেন। প্রতি শ্রেণীতে গড়ে ১৫০ জন করিয়া ছাত্র ধরিলে এক একটি কলেজে প্রতি ক্লাসে ৪ শত ৫০ জন ছাত্র হয়। ঠাসাঠাসি করিয়া বসিয়া মধ্যম রকম অধ্যাপকের মুখনিঃসৃত বাণী ৪৫ মিনিটকাল প্রতি দিবস শুনিয়া আমরা সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়াসী হই। তাই ওয়েলস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, এখনও কলেজে বক্তৃতার দ্বারা শিক্ষা দিবার বিধি আছে; এখনও আমরা এক জন অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট হইতে প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয়তঃ এইভাবে আলোচ্য বিষয় বুঝিতে চাহি এবং একজন দূরস্থিত বিজ্ঞ অধ্যাপকের পুস্তক অপেক্ষা সম্মুখস্থিত অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের বক্তৃতা অধিক পছন্দ করি! উচ্চাঙ্গের পাঠ্যপুস্তক থাকিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ নীরস বক্তৃতা শুনা যে কি কষ্টদায়ক, তাহা কলেজের ছাত্ররাই ভাল বুঝেন। (১)

কারলাইল যথার্থই বলিয়াছেন যে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের পর কলেজে পড়ার প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে। যখন পুস্তক প্রকাশের উপায় ছিল না, তখন না হয় নবদ্বীপ, কাশী, বিক্রমপুরের টোলে ও অধ্যাপক না হইলে বিদ্যাশিক্ষার পথ ছিল না। কিন্তু এখন কলেজে পড়িলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না—এবং কলেজে পড়িবার অক্ষমতা বা অভাবের উপর নিরক্ষর হইবার দোষারোপ করা চলে না। (২)

(১) We still use the lecture as the normal basis of instruction in our colleges. We still hear discourses in the firstly, secondly and thirdly form. And we still prefer even a second rate professor on the spot to the printed word of the ablest teacher at a distance. Most of us who have been through college courses can recall the distress of hearing a dull and inadequate view of a subject being laboriously unfolded in a long series of tedius lectures, in spite of the existence of full and competent textbooks. (P. 178)

(২) Attendance at College no longer justifies

তাই বলি, কলেজে এত দৌড়াদৌড়ি কেন? ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অবশ্য সকলেরই পড়া উচিত। তাহার পর শক্তি ও উদ্যমকে এইরূপে পঙ্গু না করিয়া প্রকৃতভাবে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। শিক্ষার প্রতি যদি প্রকৃত অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে বাড়ীতে বসিয়াও আত্মোন্নতি করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না হইলেও শিক্ষালাভের কোন অন্তরায় নাই। শতকরা ১০।১৫টি মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়া জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা দেশে প্রজ্জ্বালিত করিবে। সকলেরই এই কর্ম্মভোগ কেন? যাহারা কলেজে পড়িতে পায় না, তাহাদিগকে প্রায়ই আক্ষেপ করিতে শুনি, তাহাদের জীবন নিষ্ফল হইল। মুটে রাজমিস্ত্রী প্রভৃতিও দিন ১ টাকা ৮ আনা রোজগার করে অর্থাৎ মাসে ৪৫৲ টাকা আয় করে। ধর্ম্মঘট করিয়া তাহারা পারিশ্রমিকের হার আরও বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছে; কয়জন গ্রাজুয়েট মাসে ৪৫৲ টাকা রোজগার করেন? যদি ৪৫৲ টাকার একটি কর্ম্ম খালি হয়, তবে ৫ শত গ্রাজুয়েট আবেদনপত্র লইয়া উপস্থিত! শিক্ষালাভ ত উদ্যম থাকিলে ঘরে বসিয়াও হইতে পারে। জীবন বৃথা হইবে কেন? ওয়েলস বলেন, আজকাল ছাত্রদিগের, নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট শিক্ষকের অমৃতময়ী বাণী শুনিবার প্রয়োজন হয় না। কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটী কলেজের ছাত্রাবাসের বিলাসিতার মধ্যে পাঠাভ্যাস করিলেই গ্লাসগোর কুটীরবাসী অধ্যয়নরত যুবক অপেক্ষা কিছু বেশী শিক্ষা করা যায় না। (৩)

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

a claim to education; inability to enter a college is no longer on excuse for illiteracy. (P. 180)

(৩) It is no longer necessary for the student to go to a particular room at a particular hour, to hear the golden words drop from the lips of a particular teacher. The young man who reads at 11 O'clock, in the morning in luxurious rooms in Trinity College. Cambridge, will have no very marked advantage over another young man, employed during the day, who reads at 11 O'clock in the night in a bed-sitting-room in Glasgow.

প্রিয়-মিলিতা

স্বামি-গর্ব্ব কোথা তব হে প্রিয়-মিলিতা,
অকুণ্ঠিত আনন্দের শুভ শোভারাশি?
শেফালির মৃদু রূপ—কুমুদের হাসি
বাধা মানে, হেরি স্বর্ণ-সন্ধ্যা সমুদিতা?

ফণিনীর গ্রীবাভঙ্গি, কটাক্ষ কুটিল,
হাসি যেন হাসি নয় জয়দর্পজ্বালা!
কাহারে হারালে রণে বিজয়িনী বালা,
রূপের গৌরবে পূর্ণ দেখ কি অখিল?

সীমন্তে সিন্দূর ধরি' ফোটে যে নম্রতা,
কেন নাই তব মুখে, হে নবোঢ়া বধূ,
এক রাত্রে ফুরাইল কৈশোরের মধু,—
নবীনা নায়িকা কাম-দৃপ্তা রূপলতা!

মেঘ-তারকার স্বপ্ন তুমি বর্ণচ্ছায়া,
স্নেহহীনা মোহময়ী শুষ্করূপ মায়া।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

রাজাবাড়ীর মঠ
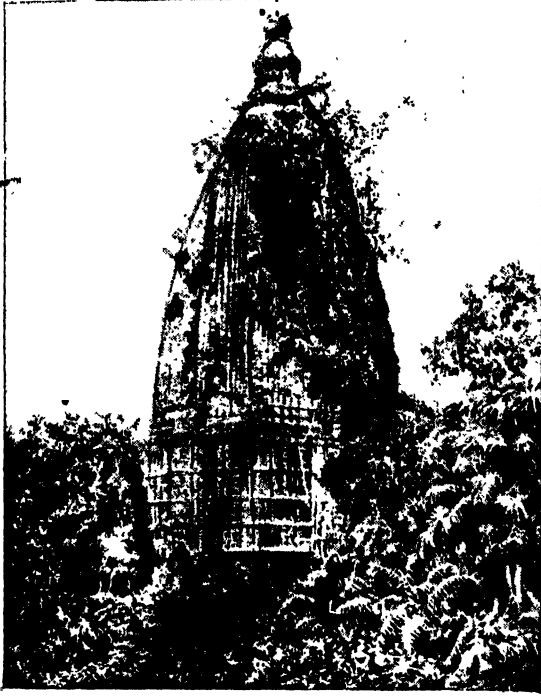
রাজাবাড়ীর মঠ—সংস্কারের পূর্ব্বে।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর (২২শে ভাদ্র) শনিবার প্রাতে ৮টা ২৩ মিনিটের সময় বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শন—পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র সুপরিচিত রাজাবাড়ীর মঠ পদ্মাগর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই সময় মঠের উপরিভাগ পড়িয়া যায় এবং পরদিন অবশিষ্ট অংশও জলতলগত হয়—আর তাহার চিহ্নমাত্র থাকে না।

পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই মঠ বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইত এবং গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারের যাত্রীরা ইহা দেখিয়া ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন। ইতঃপূর্ব্বে পদ্মা একাধিকবার এই পুরাতন শিল্প-নিদর্শনের সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া ইহাকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু, যেন কোন মন্ত্রবলে, পদ্মার প্রবাহ ইহার নিকটে আসিয়া আবার সরিয়া গিয়াছিল—মঠ জল-কল্লোল উপহাস করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিল। কিন্তু এবার পদ্মার প্রবাহ দিন দিন মঠের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; লোক বুঝিল, এবার পদ্মা এই পুরাতন কীর্ত্তি নষ্ট করিয়া আপনার কীর্ত্তিনাশা নামের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবে। অনেকে আসিয়া শেষবার মঠটি দেখিয়া গেল। তাহার পর কীর্ত্তিনাশারই জয় হইল—এই প্রাচীন কীর্ত্তি চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গেল—তাহাকে গ্রাস করিয়া পদ্মার জলধারা কলকল্লোলে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

ইতঃপূর্ব্বে সন ১২৭৬ সালে রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তি রাজনগর গ্রাস করিয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম লাভ করিয়াছিল। সেই কথা স্মরণ করিয়া কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—

"সকলি কি স্বপ্ন! বল ছিল কি এখানে,
অভ্রভেদী সেই একবিংশতি রতন?

নবীনচন্দ্র সেন।
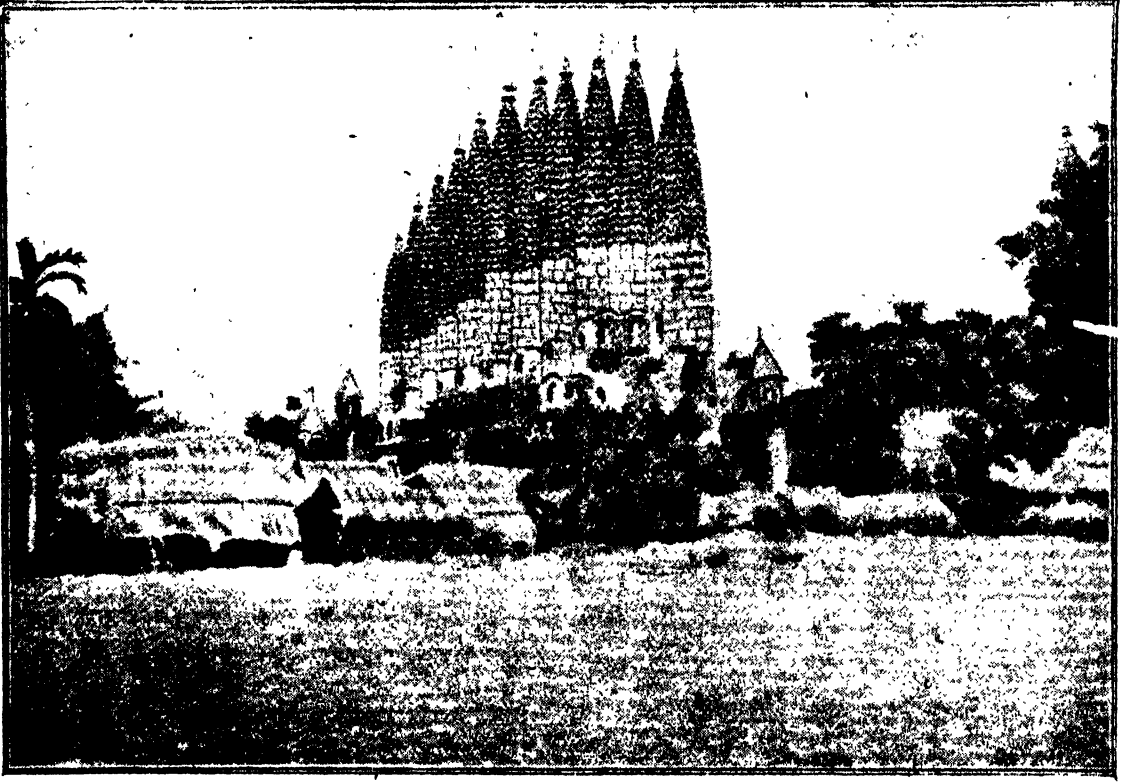
রাজনগরের একুশরত্ন।

"যেই সৌধ-চূড়া হ'তে বিশাল পদ্মায়
বোধ হ'ত ঠিক উপবীতের মতন ?
সে বিশাল রাজপুরী ছিল কি এখানে,
পড়িয়াছে ছায়া যা'র বঙ্গ-ইতিহাসে ;
যাহার বিশাল ছায়া লজ্জিয়া পদ্মায়
পড়েছিল বঙ্গেশের হৃদয়-আকাশে ?"

যে মূর্ত্তি—সে সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদ্মা রাজবল্লভের কীর্ত্তি গ্রাস করিয়াছিল, নবীনচন্দ্র তাহার কল্পনা করিয়াছিলেন :—

"ভীষণ ঘূর্ণিত স্রোতে ছাড়িয়া হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধূমিত—"

পদ্মা অগ্রসর হইল। তাহার পর—রাজবল্লভের কীর্ত্তি
"অতল সলিলগর্ভে পড়িল ভাঙ্গিয়া।"

রাজবল্লভ ঢাকার ডেপুটী নবাবী ও পাটনার সুবেদারী লাভ করিয়াছিলেন। সাহ আলমের সহিত মীরজাফরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বাঙ্গালী রাজবল্লভের বিক্রমে বাদসাহী সেনাদল অযোধ্যা পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইয়াছিল। ইংরাজ সেনাপতি কাপ্তেন ক্লডিয়াসকে তাঁহার অধীনে কায করিতে হইয়াছিল। মীরণের মৃত্যুর পর মীরকাসেম ও রাজবল্লভ কে ডেপুটী নবাব হইবেন, তাহা লইয়া ইংরাজদিগের মধ্যে মতভেদ হয় এবং মীরকাসেমের বিদ্বেষই শেষে রাজবল্লভের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। মীরজাফরের পর মীরকাসিম যখন বাঙ্গালার শাসনদণ্ড চালনা করিবার অধিকার লাভ করেন, তখনই রাজবল্লভের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হয়। তাঁহাকে একরূপ বন্দিভাবেই কালযাপন করিতে হয় এবং মীরকাসিম গিরিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া উদয়নালায় বা উধুয়ানালায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব্বেই রাজবল্লভের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। তাঁহার আদেশে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া রাজবল্লভকে মুঙ্গেরের নিকট গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

রাজবল্লভ বর্ত্তমান ঢাকা হইতে ২৭ মাইল দূরে বিলদাওনিয়ায় প্রাসাদাদি নির্ম্মিত করিয়া তাহা "রাজনগর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এই রাজনগরে স্থাপত্যের অপূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। রাজনগরের হর্ম্ম্যমালার মধ্যে "একুশরত্ন" বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এই "একুশরত্ন" রাজবল্লভের প্রাসাদের সিংহদ্বার ছিল।••ইহা একটি ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। সিংহদ্বারের ছাত অর্দ্ধ বৃত্তাকার এবং দ্বারপথ এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্য দিয়া এককালে তিনটি হস্তী হাওদাসহ পাশাপাশি যাইতে পারিত। দ্বারের দুইপার্শ্বে বেদীর উপর প্রহরীরা থাকিত; ইহার একবিংশ চূড়া বহুদূর হইতে পরিলক্ষিত হইত। পদ্মা তাহার জলবাহু প্রসারিত করিয়া রাজনগর নাশ করিয়াছে।

রাজবাড়ীর মঠ কেদার রায়ের কীর্ত্তি—তাঁহার জননীর শ্মশানে নির্ম্মিত বলিয়া কথিত আছে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদ রায় ও কেদার রায় দুই ভ্রাতা মোগলদিগের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন—ইঁহারা ভুঁইঞা নামে খ্যাত ছিলেন। ইঁহাদের রাজধানী সোণারগাঁ হইতে কিয়দ্দূরে পদ্মাতীরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে খিজিরপুরের ইশাখাঁও প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইশাখাঁ নিমন্ত্রিত হইয়া কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরে আসিয়া তাঁহার বিধবা ভগিনী সোণামণিকে (স্বর্ণময়ী) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং কৌশলে তাঁহাকে অপহরণ করেন। কিম্বদন্তী এই যে, এই ব্যাপারে ভগ্নহৃদয় হইয়া চাঁদ রায় দেহত্যাগ করেন। কেদার রায় বহুবার মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জলযুদ্ধে মোগলের পরাজয় ঘটে। ইহার পর মানসিংহ কেদার রায়কে পরাভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন এবং শ্রীপুরের সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কয়জন দূতসহ তরবারি, শৃঙ্খল ও নিম্নলিখিত লিপি কেদার রায়কে প্রেরণ করেন :—

"ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী।
হয় গজ নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি ॥"

কেদার রায় যুদ্ধ করিবেন এই উত্তর দিবার জন্য তরবারি গ্রহণ করিয়া শৃঙ্খলসহ নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করেন :—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তিবেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥"

বিশ্বাসঘাতকতায় কেদার নিহত হইয়াছিলেন।

রাজাবাড়ী মঠ কেদার রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। মঠের চূড়া ছিল না বলিয়া দ্বিবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল :—

(১) কেদার রায় মাতার দাহস্থানের উপর মঠ নির্ম্মাণের পর বলেন, "এতদিনে মাতৃদায় হইতে উদ্ধার পাইলাম।" যে জননী "স্বর্গাদপি গরিয়সী" তাঁহার ঋণ শোধ হইল—এই উদ্ধত বাক্য তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবার পর মন্দিরের চূড়া সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(২) মঠের চূড়া মঠের উপযোগী না হওয়ায় কেদার রায় স্থপতিকে তিরস্কার করিয়া প্রাণনাশের ভয় দেখান। স্থপতি ইহাতে দুঃখিত হইয়া পুনরায় চূড়া গঠনের ছলে মঠের উপর উঠিয়া চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়া চূড়াসহ পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের ব্যয়ে মঠের সংস্কার ও ইহার চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াইজ এসিয়াটিক সোসাইটীর 'জর্ণালে' পূর্ব্ববঙ্গের ভুঁইঞাদিগের বিবরণে এই মঠের বর্ণনা করিয়াছিলেন। মঠটি চতুষ্কোণ স্তম্ভাকার—পাদদেশ ২৯ বর্গ ফুট। ভূমি হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত প্রাচীর-গাত্র নানাবিধ ফুলের অনুকরণে গঠিত ইষ্টকে নির্ম্মিত। প্রাচীরের মধ্যভাগ উন্নত এবং খাঁজকাটা। প্রাচীরগুলি ১১ ফুট স্থূল। ইষ্টকগুলি ৮ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চ প্রস্থ এবং দেড় ইঞ্চ স্থূল। সে সময়ের মুসলমানদিগের গৃহে এরূপ বৃহদাকার ইষ্টক ব্যবহৃত হইত না।

ওয়াইজ যে সময় এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তখন মঠটি জঙ্গলে আকীর্ণ ছিল।

রাজাবাড়ীর মঠটি কেদার রায়ের জননীর শ্মশানে

নির্ম্মিত কি না, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব থাকিলেও উহা কেদার রায়ের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। কারণ সেই সময় আসামের অহম রাজারা বাঙ্গালা হইতে স্থপতি লইয়া যাইয়া শিবসাগরে যে সব মঠ নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, সে সকলের সহিত রাজাবাড়ীর মঠের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

রাজাবাড়ীর মঠের চূড়ায় যে সব বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; পরবর্ত্তী কালে বঙ্গদেশে যে সকল মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে,

রাজাবাড়ীর মঠ—সংস্কারান্তে।

সে সকলের চূড়া এরূপ বর্ত্তুলাকার নহে; এ বিষয়ে রাজাবাড়ীর মঠের সহিত উড়িষ্যার প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির সমূহের অসাধারণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের সহিত রাজাবাড়ীর মঠের তুলনা করিলে এ কথা বুঝা যাইবে। সেই জন্য মনে হয়, রাজাবাড়ীর মঠ কেদার রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হউক বা না হউক—যখন উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখনও এ দেশের শিল্পীরা হিন্দু স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয় নাই এবং মুসলমান স্থাপত্যের

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির।

ইছাই ঘোষের দেউল

প্রভাব হিন্দু স্থাপত্যের উপর পতিত হইলেও তাহার বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য যেমন রাজবল্লভের "একুশরত্ন" প্রভৃতির গঠনে সপ্রকাশ, রাজাবাড়ীর মঠে তেমনই বাঙ্গালার হিন্দু স্থাপত্য তাহার বৈশিষ্ট্যে বিরাজিত ছিল। পরবর্ত্তী কালে যেমন রাজনগরের গৃহাদির অনুকরণে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাসে হর্ম্ম্যমালা গঠিত হইয়াছিল, তেমনই সে কালে রাজাবাড়ীর মঠের অনুকরণে শিবসাগরে মঠগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজাবাড়ীর মঠের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার ঘণ্টাকৃতি চূড়া হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত কতকগুলি খাঁজকাটা কাষ যেন বেণীর মত নামিয়া আসিয়াছে। উড়িষ্যার মন্দির ও শিবসাগরের মঠগুলি বাদ দিলে বাঙ্গালায় কেবল আর একটি মন্দিরে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। সে বীরভূমে ইছাই ঘোষের দেউলে। অজয় নদের দক্ষিণ তটে এই দেউল বিদ্যমান—ইহার চারিদিকে একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ; এই স্থানেই শ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ইছাই ঘোষের রাজধানী ছিল। গৌড়েশ্বরের সেনাপতি লাউসেন ইছাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করেন। যে স্থানে উভয়ে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে স্থান এখন অজয়গর্ভগত। আর বাঙ্গালার অতীত যুগের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের উপকরণের প্রহরিরূপে এই দেউলটি ধ্বংসস্তূপ মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের প্রহারে বিলয় প্রতীক্ষা করিতেছে। জনরব, এই দেউল বাঙ্গালায় মুসলমান অধিকারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কালা-ধলায়
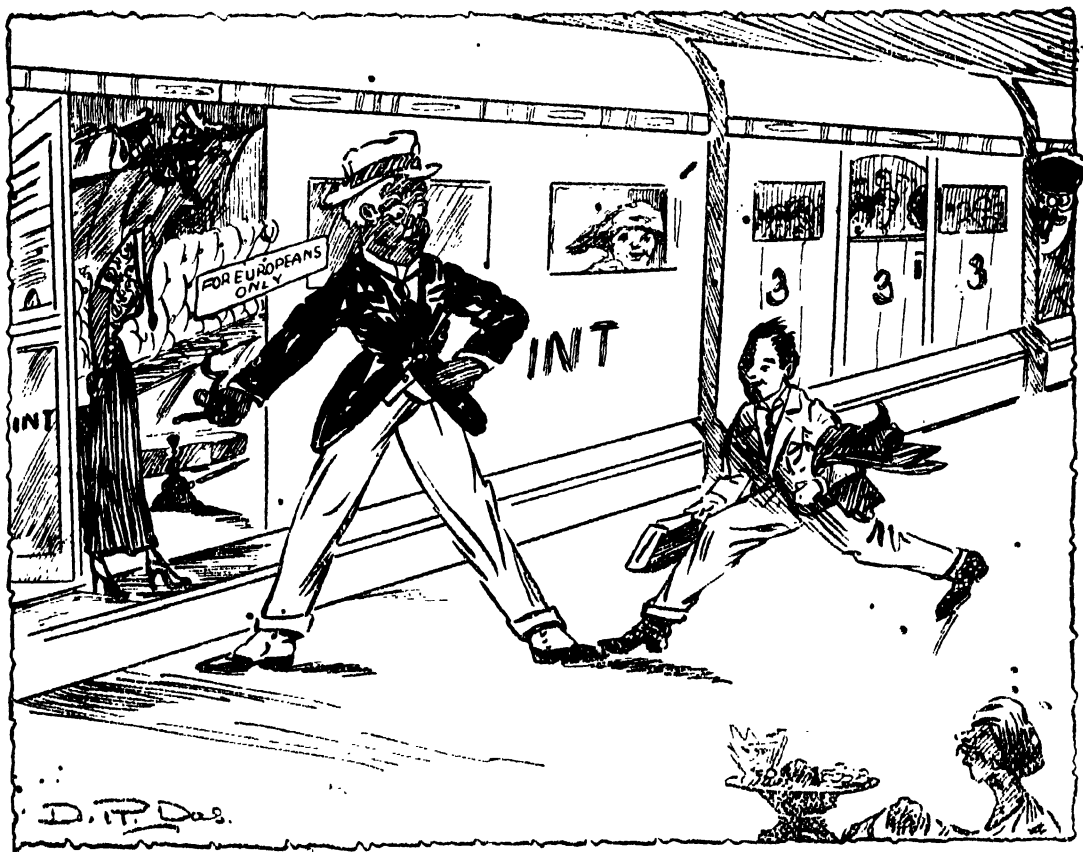
প্রেম

১

শ্রাবণের অপরাহ্ন—দিবসের প্রথম ভাগ ঘনবর্ষণেই কাটিয়া গিয়াছে—অপরাহ্নের দিকে সহসা আকাশ নির্ম্মল হইয়া সদ্যঃস্নাত। দিনদেবতা দীপ্ত প্রভায় চারি দিক ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন—তাহার পর বেলাশেষে অস্তপাটে বসিয়াছেন; বর্ষণক্লান্ত মেঘগুলি অলসভাবে পশ্চিম গগন-প্রান্তে লুটাইয়া রহিয়াছে—বিদায়মুহূর্ত্তে এই প্রতিদ্বন্দ্বী-দিগকেও সূর্য্যদেব স্নেহভরে চুম্বন করিয়া যাইতেছেন—লজ্জার অরুণিমা কালো মেঘের সারা অঙ্গে আলো-ঝলমল রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহারই দীপ্তি বাদশাহের নন্দনকানন তুল্য উদ্যানবাটিকাটিকে অপরূপ শোভায় মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। বাদশাহ বর্ষার দিনে দুর্ল্লভ এমন বর্ষণহীন গোধূলির আলোকোদ্ভাসিত অপরাহ্নটিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্যানে আসিয়া মর্ম্মর আসনে উপবিষ্ট। ফুলের নির্ম্মল স্নিগ্ধ গন্ধ ছাপাইয়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত নানারূপ উগ্র সৌরভ বাতাস যেন ভরিয়া দিয়াছে। বেগমমহলের তিনটি সুন্দরী, নৃত্যগীতনিপুণা দাসী সম্রাটের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া বাদশাহের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব। বেগম-মহলের দুই জন প্রহরী—খোজা মুক্ত কৃপাণহস্তে অদূরে দাঁড়াইয়া প্রভুর আদেশ যে কোন মুহূর্ত্তে শুনিবার জন্য উৎকর্ণ।

বাদশাহ গুরু রাজকার্য্যের অনুরোধে আজ এক সপ্তাহ অন্তঃপুরোদ্যানে আইসেন নাই, এমন কি গত চারি দিনের মধ্যে বেগমমহলেও পদার্পণ করিয়া বেগমদিগের বিরহ-বাসরকে মিলন-বাসরে পরিণত করেন নাই। অন্য বেগমদিগের ইহাতে বিশেষ কোনরূপ দুশ্চিন্তা না হইলেও বাদশাহের প্রিয়তমা বেগম মোতিয়া এ বিরহে বিশেষ উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বাদশাহের আগমন প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া দিন-রাত্রির প্রতি পল-বিপল যাপন করিতেছিলেন। আজ বাদশাহ অন্তঃপুরের উদ্যান-বাটিকায় আসিয়াছেন, অথচ মোতিয়াকে আহ্বান করেন নাই। মোতিয়া অত্যন্ত আকুলভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রিয়তমের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছেন; সাধ—ছুটিয়া যাইয়া স্বামীর সহিত মিলিতা হয়েন। কিন্তু তিনি বাদশাহের বেগম; বিনা আহ্বানে যাইতে অক্ষম, হৃদয়ের যে কোন বৃত্তি বাদশাহের অন্তঃপুরে বাদশাহেরই আইন-কানুনের শাসন মানিতে বাধ্য—চক্ষুর অন্তরালে যাহাই হউক না কেন, প্রত্যক্ষে তাহারা সম্রাটেরই কটাক্ষের দাস। সম্রাট কিছু-ক্ষণ নীরবে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, পশ্চিম গগনে তখন ঘন ঘন বর্ণবৈচিত্র্যের অপরূপ বিকাশ দৃষ্টিকে বিহ্বল করিয়া তুলিতেছিল। বাদশাহ দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করিলেন। এই সূর্য্যাস্তক্ষণ এই অপূর্ব্ব শোভায় মণ্ডিত হইয়া নিত্যই সকলের চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হয়, তিনি কিন্তু কয় দিন এ শোভার দিকে চাহিবার অবসর পায়েন? বিরাট রাজকার্য্যের গুরু দায়িত্ব তাঁহার স্কন্ধে সর্ব্বক্ষণই চাপিয়া বসিয়া আছে, রাত্রির অবসরক্ষণে তাহার নিকট হইতে তিনি মুক্তি পাইয়া থাকেন বটে—কিন্তু অপরাহ্নের এ অপূর্ব্ব লগ্ন সম্ভোগ কয় দিন তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে? বাদশাহের চিন্তাভার ক্রমেই লঘু হইয়া আসিল, তিনি দাসীদিগকে গান গাহিবার জন্য ইঙ্গিত করি-লেন। মধুর স্বরলহরী মুহূর্ত্তের মধ্যে উদ্যানটিকে ভরিয়া দিল, সেতারের মৃদু ঝঙ্কার নারী-কণ্ঠগীতির সহিত মিশিয়া অতি মধুর সুর রচনা করিল। মল্লার রাগিণীতে দুইটি ছত্রের একটি ক্ষুদ্র গীত—তাহার অর্থ—

"হে আমার মেঘ—হে আমার প্রিয়তম—হে আমার দয়িত—আমার চুম্বনের লালিমায় তোমার সারা অঙ্গ আবীর রাঙা করিয়া দিব, তুমি এস।"

বাদশাহ গান শুনিয়া প্রীত হইলেন—কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গান থামিল। সেই সময় বেগমমহলের প্রধান খোজা প্রহরী মশুর সম্মুখে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বলিবে?"

মশুর কহিল—"কাল কয়েক জন বিদ্রোহীর সহিত যে নারী বন্দিনী হইয়া আসিয়া আমার প্রহরায় রহিয়াছে, সেই নারী বিশেষভাবে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থিনী।"

কাল কয়েক জন বন্দীর সহিত একটি নারীও বন্দিনী

বসুমতী প্রেস — শিল্পী—শ্রীজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ।

আনমনে

হইয়াছিল, বাদশাহ তাহাকে অন্তঃপুর সংলগ্ন কারাগৃহে বন্দিনী রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক সময় এই সব বন্দিনীরা রূপ, গুণ ও বয়সের জন্য সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে,—বাদশাহের অনুগ্রহানুযায়ী এই সব হতভাগিনীর ভাগ্যনির্ণয় হয়। বাদশাহ নারীকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাহাকে তাঁহার সম্মুখে আনিবার জন্য মশুরকে আদেশ দিলেন।

২

অত্যন্ত অস্থির ও উন্মনাভাবে মোতিয়া বেগমের আজিকার বর্ষা-সন্ধ্যা কাটিতেছিল— ভ্রমরের মত আঁখিতারা দুইটি খঞ্জন পাখীর নৃত্যচটুলগতিকেও পরাস্ত করিয়া প্রিয়মুখ সন্দর্শনলালসায় চঞ্চল হইতেছিল। প্রধানা বাঁদী সিরাজী উতলা বেগমের মুহুর্মুহু নূতন নূতন আদেশ-পালনে বেগমের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল।

মোতিয়া ডাকিলেন,—"কে যায়, সিরাজী,কাহার পায়ের শব্দ ?"

সিরাজী ত্রস্তে দ্বারের কিংখাব পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে উঁকি দিয়া আসিয়া কহিল—"মশুর, বেগম সাহেবা।"

বেগম চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশুর কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

সিরাজী এই সুযোগই চাহিতেছিল—তখনই বাহিরে আসিয়া মধুরস্বরে খোজাকে সম্ভাষণ করিল—"মশুর—কোথায় যাও, একবার ফিরিয়া তাকাইলে বোধ হয় কিছু ক্ষতি হইবে না।"

সুন্দরী সিরাজীর সহিত হাস্যপরিহাসে কোন সময়েই মশুরের বিরক্তি ছিল না। সে হাসিমুখে সিরাজীর দিকে চাহিয়া কহিল—"বাদশাহের হুকুমে সেই বন্দিনীকে তাঁহার হাজিরে লইয়া যাইবার জন্য যাইতেছি, আমার দুর্ভাগ্য এখন তোমার সহিত কথা কহিবার অবসর নাই।"

সিরাজী কহিল—"হাঁ মশুর, মেয়েটি নাকি খুবই সুন্দরী ?"

মশুর কহিল—"হাঁ—তা—আমি আর কি বলি, হুজুর জহুরী—জহরের মূল্য তিনিই বুঝেন।"

মশুরের মুখের উপর লোল কটাক্ষ হানিয়া সিরাজী কহিল "জহুরীর সংসর্গে থাকায় তুমিও কিছু কম জহুরী নও নাই, মশুর। রূপ-গুণের সম্মান তুমিও বুঝ, আচ্ছা—আমার মুখের দিকে চাহিয়া সত্য বল দেখি, সে নারীর মুখ কি আমার মুখের অপেক্ষাও সুন্দর?"

মশুর ফাঁপরে পড়িল—সুন্দরীর এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে, কিন্তু সে অবিলম্বে চতুরতার সহিত জবাব দিল —"কার দৃষ্টিতে কাহাকে ভাল লাগে, সে বলা বড় কঠিন, সিরাজী বিবি!"

সিরাজী তাহার কোমল অঙ্গুলীদ্বারা মশুরের সুদৃঢ় পেশীবহুল হাতের উপর মৃদু আঘাত করিয়া কহিল—"মন রাখা কথা তোমার খুব অভ্যাস হইয়াছে, মশুর।"

মশুর এ আঘাতে সম্মানবোধ করিলেও আর তাহার দাঁড়াইবার সময় দিল না; সে ক্ষিপ্রচরণে বন্দিনীকে আনিতে গেল। এ দিকে সিরাজীর মুখে সংবাদ শুনিয়া বেগমের গোলাপের মত মুখের আভা কি এক আশঙ্কার ছায়ায় ম্লান হইয়া আসিল। সিরাজী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"আপনি বৃথা উতলা হইতেছেন—এ নারী আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারে না।"

মোতিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তুই কেমন করিয়া জানিলি সিরাজী, যে হইবে না? বেগমদের ভাগ্যই যে এই। আমার পূর্ব্বে ফাতিমা বিবি বাদশাহের অন্তঃপুরের প্রধানা অর্দ্ধীশ্বরী ছিলেন—তাঁহার পূর্ব্বে প্রধান বেগম ছিলেন মালেকা—সুতরাং আমারই কপাল যে না ভাঙ্গিবে, তাহাতে বিশ্বাস কি?"

সিরাজী বেগমের অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু আমার ত বিশ্বাস হয় না বেগম সাহেবা যে, পৃথিবীতে তোমার রূপকে হারাইয়া দিতে পারে, এমন রূপ কাহারও আছে—বেহেস্তের হুরী যদি নামিয়া আসে তবেই সম্ভব, তাহার উপর শুনিতেছি, এ নারী রাজপুত মহিলা।"

মোতিয়া ম্লানহাসি হাসিয়া কহিলেন—"সে ত আরও উত্তম—তুই কি শুনিস্ নাই, সিরাজী, যে, হিন্দুস্থানের রাজপুতের মেয়েরা এক একজন এমন সুন্দর হইয়া থাকে যে, তাহার তুলনা বুঝি জগতে মিলে না। তাহার উপর জানিস্ ত, সিরাজী, নূতনের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে।"

সিরাজী দুষ্টহাসি হাসিয়া কহিল—"বেগম সাহেবা,

আপনার এ হারাই হারাই ভয় অপেক্ষা হারানই যে ভাল।"

বেগম মুখ ম্লান করিয়া কহিলেন—"তুই পাগল, সিরাজী, তাই এমন কথা বলিতে পারিস্—সৌভাগ্যের চরম শিখর হইতে পতিত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয়—প্রিয়তমের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা নারী-জীবনে দুর্ভাগ্য আর কি আছে? তাহার উপর আজ যে সকল সপত্নী আমার সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যায় জ্বলিতেছে, আমার দুর্ভাগ্যের দিনে তাহাদের বিদ্রূপের হাসির তীব্র আঘাত—সে যে বড় ভীষণ!" বেগম অনাগত ভবিষ্যৎকে কল্পনায় দেখিয়া যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

সিরাজী ছিল বেগমের বিশ্বস্ত সহচরী, সুতরাং স্বচ্ছন্দে সে বেগমের সহিত সকল বিষয়ে আলাপ করিতে পারিত। সে কহিল—"আচ্ছা বেগম সাহেবা, সত্য করিয়া বলুন দেখি আজ যে আপনি প্রিয়তমের প্রণয় হারাইবার ভয়ে আকুল হইতেছেন, সেই প্রেম সত্যই কি আপনি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন? না যাহা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা রূপতৃষাতুর চিত্তের ক্ষণিকের মোহ?"

বেগম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"জানি না তাহার সত্যস্বরূপ কি—কিন্তু, সিরাজী, নারী-মাত্রেরই যাহা সাধনার ধন—তাহার সত্যরূপ যদি নাও মিলে, তাহা হইলেও যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই সত্যরূপে আঁকড়িয়া ধরিয়াও ত তৃপ্তি হয়!"

সিরাজী হাসির লহর তুলিয়া কহিল—"ভুল, বেগম সাহেবা,—মস্ত ভুল—আসলের নামে মেকীর আদর। আচ্ছা, সত্য বলুন দেখি—আপনার আজ পতিপ্রেম হারাইবার আশঙ্কা অপেক্ষা নিজের পদগৌরব হারাইবার ভয় কি প্রবল নয়?"

বেগম এতখানি স্পষ্ট কথা শুনিয়াও বিচলিত হইলেন না, পার্শ্বস্থ ফুলদানী হইতে একটি ছোট ফুলের তোড়া লইয়া সিরাজীর মুখ লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া মারিয়া কহিলেন—"তুই বড় দুর্ম্মুখ, সিরাজী।"

সিরাজী বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বেগম-সাহেবা, দুর্ম্মুখ হইতে পারি; কিন্তু বেগম-প্রধানা মোতিয়া বিবির দাসী মিথ্যা বলে না; আর সেই জন্য বেগম তাঁহার মুখে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছেন, এই তাহার পুরস্কার।"

বেগম দুঃখের সময়েও হাসিয়া ফেলিলেন—কহিলেন, "তুই ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবি না, সিরাজী, আমার ব্যথা তোর বোধগম্য নয়।"

সিরাজী গম্ভীর হইয়া কহিল,—"না, বেগমসাহেবা, অত বড় অপবাদ আমায় দিবেন না—আমিও এক জন প্রেমিকা।"

বেগম অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন—"তোর আবার প্রণয়ী কে? এই সাতমহল রাজপুরীর মধ্যে পুরুষের ত প্রবেশ নিষেধ—তবে তুইও যদি বাদশাহকেই ভালবাসিয়া থাকিস্।"

সিরাজী ভ্রূ বাঁকাইয়া কহিল—"যাঁর প্রণয় নদীর উর্ম্মিমালার ন্যায় সদাচঞ্চল—সিরাজী তাঁহার ভালবাসার কাঙ্গালিনী হইতে পারে না।"

বেগম হাসিয়া কহিলেন—"তবে তোর প্রণয়পাত্র কে, সিরাজী—মশুর?"

সিরাজীর চক্ষুর কাল তারা জ্বলিয়া উঠিল—সে বলিল, "যদি বলি 'সেই'?"

বেগম ঝরণার মত উচ্ছল হাসি হাসিয়া কহিলেন—"সে যে পশুরও অধম।"

সিরাজী দৃপ্তকণ্ঠে কহিল—"কিন্তু বেগমসাহেবা—তার চাইতে পশু যারা নিজেদের কতকগুলা সুবিধার জন্য শক্তির গর্ব্বে অন্ধ হইয়া তাহাদের এই অবস্থায় ফেলিয়াছে—"

বেগম উত্তর দিলেন না। সিরাজী কি বলিতে কি বলে—তাহার আচার-ব্যবহার অনেক সময় কতকটা পাগলের মত—সুতরাং তাহার সহিত আর পাগলামী না করিয়া তিনি নিজের সেতার তুলিয়া লইয়া সুর বাঁধিতে বসিলেন।

৩

মশুরের সমভিব্যাহারিণী বন্দিনী যখন উদ্যানে আসিয়া বাদশাহের সম্মুখে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল, তখন বাদশাহ তাহার উন্নত ঋজু দেহখানির দিকে চাহিয়া প্রীত মনে কহিলেন—"সুন্দরি, তোমার বোরখা খুলিয়া ফেল, রাহুগ্রস্ত চাঁদ দেখিতে আমি ভালবাসি না।"

বলা বাহুল্য—রেসমের অবগুণ্ঠনে বন্দিনীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা ছিল—বাদশাহের আদেশ শুনিয়া নারী ধীরে ধীরে আপনার অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিল—সূর্য্য তখন ডুবিয়া গিয়াছেন,

তাঁহার শেষ আলো তখন ধরণীর পৃষ্ঠ হইতে শেষ বিদায় লইতেছে; তাহারই কোমল করুণ রশ্মিটুকু তখন সেই তন্বী বন্দিনীর তরুণ মুখখানিতে যেন শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিল। বাদশাহের অন্তঃপুরে সুন্দরী যুবতীর অভাব নাই, রূপের পসরা লইয়া যৌবনের অর্ঘ্য সাজাইয়া আজ বিশ বৎসরের অনধিককাল কত নারী তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাঁহারই এককণা প্রেমের ভিখারিণী হইয়া কত নারী অকাতরে তাঁহার চরণে নারীর অমূল্যরত্ন উপঢৌকন দিয়া নারী-জন্ম সার্থক করিয়াছে, সুতরাং এই নবাগতার রূপ-মাধুরীতে মুগ্ধ হইবার মত বাদশাহ কিছুই দেখিলেন না। তবে তিনি যে তৃপ্ত হইলেন না, তাহা বলা যায় না, গোধূলী-রাগরঞ্জিত তরুণ মুখখানির যে মাধুর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিল, তাহা নারীর দুইটি উজ্জ্বল আঁখির নির্ভয় দৃষ্টি। সে আঁখি কবিবর্ণিত ইন্দীবরলোচন নহে, হরিণীনেত্র সদৃশ আয়ত চক্ষু নহে, কিন্তু সেই সুন্দর চক্ষু দুইটির দৃষ্টি সুন্দর—বাদশাহের মনে হইল, এমন দৃষ্টি তিনি ইন্দুনিভাননা, মদালসনয়না, কোন রূপসী নারীর চক্ষুতে দেখেন নাই। যাহা হউক, তিনি প্রীতি হইলেন।

বাদশাহের সহিত তখন বন্দিনীর আলাপ আরম্ভ হইল ঃ—

বাদশাহ। তোমার নাম কি, সুন্দরি?

বন্দিনী। সখিনা।

বাদশাহ। তুমি হিন্দু না মুসলমান?

সখিনা। জাঁহাপনা দেখিতেছেন, মুসলমানের পোষাকে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা—খোদাতালার বাঁদী আমি—যিনি এই দিনদুনিয়ার একমাত্র মালিক।

বাদশাহ। তুমি প্রগল্‌ভা, তাই বাদশাহেরও ভুল ধরিয়া দিতে চাও।

সখিনা যোড়হাতে কহিল—"গোস্তাকী মাপ করিতে হয়। মানুষ দেবতা নহে—তার ভুল প্রতি পদে।"

বাদশাহ। কথাবার্ত্তায় তুমি সচতুর। তোমায় হিন্দু বলিয়া এই জন্যই সন্দেহ করিয়াছি যে, যাহাদের সহিত তুমি ধৃত হইয়াছ, তাহারা সকলেই হিন্দু। তোমার ন্যায় সুন্দরী বিদুষী নারী কেমন করিয়া কাফেরের সঙ্গিনী হইল?

সখিনা। জাঁহাপনা দাসীর রূপের প্রশংসা অতিরিক্ত করিতেছেন। তাহার পর—আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন, আমি বর্ণাক্ষরজ্ঞানশূন্যা নই?"

বাদশাহ। তোমার দীপ্ত চক্ষু ও তৎপর রসনাই বলিয়া দিতেছে, তুমি বিদ্যার-অধিকারিণী- তোমার পরিচয় জানিতে পারি কি?

সখিনা। স্বচ্ছন্দে। তুর্কীস্থানের এক জন কৃষকের গৃহেই আমার জন্ম। পিতার ফুলের ও সব্জীর ফসল লইয়া খেলা করিতে করিতেই আমি বাড়িয়া উঠি। সহসা রাজার আহ্বানে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া পিতা প্রাণ দেন—সংসারে আর আমার কোন আশ্রয় ছিল না, আমি দেওয়ানা হইয়া এক দল গায়কের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরি।

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন—"কাহার প্রেমে দেওয়ানা হইয়াছিলে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

বন্দিনী ধূসরবসনা প্রকৃতির দিকে চাহিয়া, সম্মুখের স্তবকে স্তবকে পুষ্পিত লতাকুঞ্জের উপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া সেগুলির দিকে তাহার চম্পক তুল্য অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"এই প্রকৃতির প্রেমেই দেওয়ানা হইয়াছিলাম, জনাব!"

বাদশাহ কহিলেন—'তাহার পর?"

সখিনা। তার পর আর কি শুনিতে চাহেন বলুন!

বাদশাহ। রক্তমাংসের দেহ লইয়া মানুষের জন্ম; সুতরাং শুধু প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াই তাহার চিরদিনের তৃপ্তি সম্ভব নহে—সম্ভব হইলেও স্বাভাবিক নহে—তাই জীবনের এক দিন সে তাহার হৃদয়ের সেই ভালবাসা কোন মানুষকেই উপহার দিয়া তৃপ্তি পায়। তোমার জীবনে সে মুহূর্ত্ত বুঝি এখনও আইসে নাই?

বন্দিনী উত্তর দিল না, বাদশাহও উত্তর শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন না, পাছে কিছু অপ্রিয় কথা শুনিতে হয়। তাঁহার চির-বুভুক্ষু, চির-তৃষাতুর হৃদয় এই রমণীকে লাভ করিবার জন্য নিমেষমধ্যে অধীর হইয়া উঠিল। জগতে কোন্ পুরুষ নারীর প্রথম প্রণয়-পুষ্পের অর্ঘ্য লইতে না কামনা করে? সুতরাং বন্দিনী পাছে বলিয়া বসে যে, সে অন্যের প্রণয়ে আত্মহারা, তাই বাদশাহ আর কিছু শুনিতে চাহিলেন না, সখিনাকে বিদায়সম্ভাষণ জানাইয়া—মণ্ডরকে তাহাকে যোগ্য স্থানে সমাদরে রাখিতে বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

৪

সখিনা মশুরের সহিত নূতন কক্ষে আসিয়া সে গৃহের প্রাচীরের মসৃণ চিত্রিত টালি—হর্ম্মতলাস্তরণ, বহুমূল্য গালিচা ও মূল্যবান্ গৃহসজ্জা দেখিয়া কতকটা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"ঘর ভুল হয় নাই ত?"

বন্দিনীভাবে যাহারা বাদশাহের অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকে, সখিনা ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষেই স্থান পাইয়াছিল। এখন বাদশাহের আদেশে মশুর তাহাকে এই কক্ষে আনিয়াছে। বাদশাহের প্রিয়পাত্রীগণের জন্য এই কক্ষ নির্দ্দিষ্ট। তাঁহার মর্জ্জি হইলে শীঘ্রই এই কক্ষের অধিষ্ঠাত্রী নারী বেগমমহলের অধীশ্বরী হইয়া থাকে; সুতরাং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অভিজ্ঞ মশুর ভাবী বেগমকে সম্মান দেখাইয়া সবিনয়ে কহিল—"প্রভুর আদেশে আপনাকে এই গৃহে আনিয়াছি, আপনার যাহা প্রয়োজন, সবই দিয়া যাইব—"

সখিনা মনে মনে হাসিয়া কহিল—"বন্দিনীর সোনার পিঞ্জর—মন্দ নহে, লিখিবার সরঞ্জাম কিছু পাইতে পারি?"

মশুর, 'আনিতেছি' বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণপাত্রে নানারূপ মূল্যবান্ অলঙ্কার, প্রসাধন, অঙ্গরাগ পরিচ্ছদ প্রভৃতি লইয়া এক জন বাঁদী তাহার সম্মুখে দেখা দিল; পশ্চাতে আর এক জন বাঁদী, তাহার হাতে লিখনসামগ্রী—গজদন্তনির্ম্মিত লেখনী ও কালীর পাত্র এবং তাহারই কয়েকখানি ফলক—কিছু ফলমূল ও সরবৎ।

সখিনা সবিস্ময়ে এই সব সামগ্রীর দিকে চাহিয়া কহিল,—"আবশ্যকের অতিরিক্ত এত জিনিষ আমি কি করিব? প্রয়োজন নাই।"

এক জন বাঁদী আর এক জনের দিকে কটাক্ষ হানিয়া সরস-কণ্ঠে উত্তর দিল—"জাঁহাপনার মর্জ্জি হইলে ইহার অপেক্ষাও প্রচুর জিনিষ আপনার ভোগের জন্য আসিবে।"

সখিনা উহাদের ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিয়া লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—তাহার পর লিখিবার উপকরণ লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল।

মুক্ত বাতায়ন পথে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সখিনা দেখিতেছিল। তবে সম্মুখে অনেকদূর পর্য্যন্ত বাদশাহেরই জাঁকজমক—তাঁহারই আলোক, তাঁহারই উদ্যান প্রকৃতিকে দূরে সরাইয়া তাঁহার অধিকার ঘোষণা করিতেছিল। সখিনার দৃষ্টি সে দৃশ্যকে এড়াইয়া উদার আকাশে নিবদ্ধ হইল—বর্ষাস্নাত জ্যোৎস্না প্রেমিকের নীরব ভালবাসার মত কি শান্ত, কি উদার আলো বর্ষণ করিতেছে! আকাশের নীলিমা কি উজ্জ্বল—কি মধুর। মেঘকুল আজ সদলে তাহার উদার প্রাঙ্গণ হইতে নির্ব্বাসিত।

সখিনা দেখিয়া দেখিয়া নিজের বন্দিদশা ভুলিয়া গেল, লেখনী লইয়া গজদন্ত ফলকের উপর প্রণয়ীর উদ্দেশ্যে প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করিতে বসিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর বাদশাহ স্বয়ং সখিনার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি সখিনাকে কুশল প্রশ্ন করিলে সখিনা উত্তর দিল, "বন্দীদের কুশল প্রশ্ন করা মহত্বের পরিচায়ক। আপনার সব বন্দীরই কি কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন?"

বাদশাহ কহিলেন—"তাহা আমার ইচ্ছাধীন।"

হঠাৎ সখিনার হাতের লেখা গজদন্ত ফলকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই বাদশাহ তাহা উঠাইয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন—"হে আমার প্রিয়, একা এ বিরলে জাগিয়া এই শর্ব্বরীতে অশ্রু মুক্তা লইয়া আমি তোমার অর্ঘ্য রচনা করি—যেথা থাক—তোমার উদ্দেশে আমি ইহা নিবেদন করিতেছি, আমি জানি, নিষ্ফলতায় ইহার অবসান হইবে না।"

বাদশাহ ক্ষণেকের জন্য অধর দংশন করিলেন—তাহার পর নিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন—"সখিনা!"

সখিনা উত্তর দিল—"জাঁহাপনা,—হুকুম?"

বাদশাহ কহিলেন—"বন্দীদের মধ্যে একজন যুবক আছে, কঠিন হইলেও তাহার বীরোচিত অঙ্গ সৌষ্ঠবের আমি নিন্দা করি না, তাহার সহিত তোমার কিছু সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। সে সম্বন্ধ কি বিশেষ ঘনিষ্ঠ?"

বাদশাহের মুখের উপর উজ্জ্বল দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া সখিনা জিজ্ঞাসা করিল, "বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আপনি কাহাকে বলিতে চাহেন, জাঁহাপনা?"

বাদশাহ কহিলেন—"এই—এই—প্রেম ভালবাসা।"

মধুর হাসি হাসিয়া সখিনা কহিল—"যদি সেই ঘনিষ্ঠতাই থাকে? তাহা কি অসম্ভব, জাঁহাপনা?"

বাদশাহ গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—"কাফের—মোসলেম-নন্দিনী কাফেরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী—অসম্ভব—গর্হিত ব্যাপার।"

সখিনা। বাদশাহ জানেন—প্রণয় দেবতা অন্ধ। আর একটি কথা—কাফের হইলেই সে কি মানুষ বলিয়া গণ্য নহে? মহত্ত্বে, বীরত্বে, শৌর্য্যে, প্রতিভায় যে কোন উপযুক্ত পুরুষ মহত্ত্বের অনুরাগিণী নারীমাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না কি?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বাদশাহ কহিলেন—"কিন্তু সেই যুবা বিদ্রোহী; বিদ্রোহীর শাস্তি প্রাণদণ্ড।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নারী কহিল—"নারীর প্রেম শুধু দেহকেই অবলম্বন করে না, জাঁহাপনা। প্রণয় যখন দেহের অতীত বস্তুর সন্ধান পায়, তখন দেহীর জীবন-মরণকে ছাপাইয়া বিরাজ করে। আর বিদ্রোহী? আপনার কাছে সে বিদ্রোহী হইলেও স্বদেশের কাছে সে এক জন স্বদেশ-প্রেমিক—স্বার্থত্যাগী যুবা।"

বাদশাহ কহিলেন—"কিন্তু তাঁহার দিক দিয়া তোমায় ঘৃণা করাও অসম্ভব নহে। হিন্দুর নিকট বিজাতীয়া নারী ঘৃণার পাত্রী—সুতরাং অপাত্রে প্রণয়-স্থাপন গৌরবের কথা নয়, সুন্দরি!"

সখিনার রক্তকিশলয় তুল্য ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল—"যে বীর, যে মহত্ত্বের উপাসক—যে ভগবানে যথার্থ বিশ্বাস করে, ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ লইয়া যে নাড়া চাড়া করে না, সবল শুদ্ধ হৃদয়ের মধ্যেই সে খোদাতালার পাদপীঠ দেখিতে পায়; সুতরাং প্রেমকে সে কখনও ঘৃণা করে না।"

বাদশাহ নীরব হইলেন—এই বন্দিনীর ক্ষুরধার যুক্তির অস্ত্রে তাঁহার তর্কোদ্যম ছিন্ন হইয়া গেল—অন্য কেহ হইলে আজ তাহার নিস্তার ছিল না, তর্কযুক্তিতে তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার তরবারির আঘাত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার ক্ষমতা কাহারও নাই; কিন্তু বাদশাহ আজ আপনাকে যেন নিরুপায় মনে করিলেন। এই রমণীর প্রেম আজ তাঁহার আকাঙ্ক্ষার ধন। আজ তাঁহার মনে হইল, এ জীবনে তিনি শত শত সুন্দরীকে মুহূর্ত্তেকের ইচ্ছামাত্র অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু কই, এমন অমূল্য প্রণয়সম্পদ ত তাঁহার ভাগ্যে কোন দিন জুটে নাই! রূপসীর পর কত রূপসী তাঁহার জন্য নীত হইয়াছে—তাঁহার অতৃপ্ত প্রণয়লালসার আগুনে তাহারা ইন্ধনই যোগাইয়াছে—কেহ প্রণয়পিপাসাকে উদ্রিক্ত করিয়া চরিতার্থ করিতে পারে নাই। আজ প্রৌঢ় বয়সের সীমায় দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাদশাহ ভাবিতে লাগিলেন—"রূপ—কেবল রূপেরই সন্ধানে ফিরিয়াছি; সুতরাং তাহাই পাইয়াছি; অমূল্য প্রণয়সম্পদ্‌পরিপূর্ণ হৃদয়ের সন্ধান কোন দিন করি নাই, পাইও নাই—আজ যে নারী আমার সম্মুখে উপস্থিত, এই নারী সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া না হইলেও হৃদয়-সম্পদের অধিকারিণী। ইহাকে আমি লাভ করিবই।"

রাজ-বন্দিনী সখিনার বাদশাহের অন্তঃপুরে এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। বাদশাহ প্রতি রাত্রিতে আসিয়া সখিনার সংবাদ জানিবার ছলে দুই তিন ঘণ্টা সখিনার কাছে যাপন করেন, নানারূপ আলাপে সময় অতিবাহিত হয়। বাদশাহ উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়েন; মন কিন্তু মকরন্দপিয়াসী ভৃঙ্গের ন্যায় সখিনার হৃদয়-পুষ্পটির কাছে কাছে থাকিতে চাহে। কিন্তু উপায় নাই। সম্রাট দুই দিন সখিনার কাছে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন; সখিনা হাসিয়া সে প্রস্তাব এড়াইয়া অন্য প্রসঙ্গে সময় কাটাইয়াছে। বাদশাহ আর রূপোন্মাদ নহেন, তিনি আজ প্রেমের ভিখারী, সুতরাং অধীর না হইয়া সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। সারাদিনের অক্লান্ত বারিবর্ষণ শ্রাবণের রাত্রিকে গাম্ভীর্য্যে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে; তাহার উপর নিবিড় অন্ধকার সেই রাত্রিকে যেন এক নূতন ভাবে ওতঃপ্রোত করিয়া তুলিয়াছে। বাদশাহ সখিনার কক্ষে আসিতেছিলেন; সখিনার কক্ষ হইতে সঙ্গীতের মধুরগুঞ্জন কানে আসিতেই বাহিরে দাঁড়াইয়াই গান শুনিতে লাগিলেন। কোন পদ গীত হইতেছে না, শুধু সুরের অপরূপ লীলা—বাদল রাগিণীর সহিত একতানে সুর বাঁধা। আ—মরি মরি, কি সুর! কি মূর্চ্ছনা! বাদশাহ মুগ্ধচিত্তে শুনিতে লাগিলেন—বিরহ-বেদনা মূর্ত্ত হইয়া ঐ সুরে যেন ভাবুকের কাছে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। একটি পদ একবার শুনা গেল—

কাঁহা পিয়া—কাঁহা—হৃদয়কা সাথী—
কেইসে গোঙায়ব অকেলি বাদল রাতি।

আবার সুর—আবার বীণার অশ্রান্ত মধু-ঝঙ্কার। ভাষা মূর্ত্ত হইল—ভাব শুধু সুরের মধ্যে নৃত্য করিতে লাগিল।

বাদশাহ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন—সখিনা তাঁহাকে যোগ্য সমাদরে অভ্যর্থনা করিল।

আজ বাদশাহ সখিনার কাছে প্রণয় নিবেদন করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া আসিয়াছেন। কথাচ্ছলে তিনি বলিলেন—"বিশ্বাস কর, সখিনা,—সত্যই আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।"

সখিনা হাসিয়া কহিল—"সে আমার সৌভাগ্য, জাঁহাপনা; কিন্তু আপনি ত শুনিয়াছেন, আমি অন্যের অনুরাগিণী।"

বাদশাহ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিলেন—"সে তোমার অযোগ্যে অনুরাগ, সুন্দরি! তোমার ন্যায় নারী ভিখারীর প্রিয়া হইতে পারে না—রাজান্তঃপুরে তোমার স্থান।"

সখিনা বলিল,—"বাদশাহ, মনে রাখিবেন, আমার প্রণয়াস্পদ বাহিরের সম্পদে রিক্ত হইলেও হৃদয়ের সম্পদে অতুলনীয়।"

বাদশাহ বলিলেন,—"আমারও কি সম্পদের অভাব আছে, সখিনা?"

সখিনা বলিল,—"বাদশাহ, আপনার প্রেমকে ধন্যবাদ, শত নারীকে তাহা অর্পণ করিয়াছেন, তবু তাহা আজও অফুরন্ত। আমার প্রেমিকের কিন্তু আমিই একমাত্র প্রেমপাত্রী।"

সখিনার বিদ্রূপবাণী বাদশাহের চিত্ত স্পর্শ করিল। তিনি দীনভাবে সখিনার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"শুন, সখিনা, রাজসম্পদের অধীশ্বর বলিয়া তুমি আমায় বড় সুখী মনে করিতেছ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বড় দুঃখী। শত নারীর অধিপতি আমি, কিন্তু সত্য বলিতে কি, অন্তর আমার চিরতৃষিত; আমি কাহারও হৃদয় জয় করিতে পারি নাই, আমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শত্রুমিত্র সকলেই নতশির—আমার সম্মুখে সকলেই আমার জয়গান করে; কিন্তু আমি মূর্খ নহি, বেশ বুঝিতে পারি, অন্তরালে কেহই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নহে। আজ আমি সিংহাসনচ্যুত হইলে—কাল তাহারা ঠিক্ এমনই ভাবেই অন্যের স্তুতিগান করিবে। অনেক নারীর স্বামী আমি—কিন্তু তাহারাও আমার ঐশ্বর্য্যেরই মুখ চাহিয়া আমার প্রতি অনুরক্ত—সে অনুরাগে আর আমার আস্থা নাই, আজ আমি প্রকৃত প্রেমের সন্ধান পাইয়াছি, আজ আমি সেই প্রেমের কাঙ্গাল—যাহা সম্পদে সঙ্গী অথচ বিপদে দুর্দ্দিনেও সমভাবে অনুসরণকারী।"

বলিতে বলিতে লক্ষ লক্ষ প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা বাদশাহ এক জন সামান্য নারীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাহার পুষ্পপেলব হস্তখানি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"বল, নারী, বল তুমি আমায় এই প্রেমের অধিকারী করিতে পার কি, না? আমার যৌবন গতপ্রায়—কিন্তু যৌবনের তীব্র প্রণয়-তৃষ্ণা আজও আমার বক্ষে—অবহেলা করিও না, সুন্দরি; সত্যকথা বল, এই চিরতৃষাতুর হৃদয়কে তোমার অনাবিল প্রেমসুধা দানে সঞ্জীবিত করিতে পার কি না? আমি জানি—তুমি স্পষ্টভাষিণী, তোমার প্রকৃতির সেই সত্য পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই তোমার আকর্ষণে আমি আজ আত্মহারা—বল, এ হতভাগ্যকে কি তাহার প্রার্থনার ফল প্রদান করিবে না?"

বাদশাহের দীনতা সখিনার নারী-চিত্তে করুণাসঞ্চার করিল। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। ক্ষণেকের মধ্যেই আত্মসংবরণ করিয়া অতি মধুর অথচ সরলকণ্ঠে সে কহিল—"আপনি অকপট উত্তরই শুনিতে চাহেন, জাঁহাপনা?"

সখিনার কোমল হাতখানি দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অধীর কণ্ঠে বাদশাহ কহিলেন,—"জাঁহাপনা নহে; ও সম্ভাষণে কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। প্রিয় সম্ভাষণ না করিতে পার—অন্ততঃ বন্ধু—সুহৃদ সম্ভাষণেও আমায় ধন্য কর। সত্য উত্তর, নির্ভীক উত্তরই আমি আজ প্রার্থনা করি; ছলনা,—কপটতা,—এ সব অসহ্য, অসহ্য।"

সখিনা কোমলকণ্ঠে কহিল—"জাঁহাপনা, নারীর প্রেম খেলার সামগ্রী নহে। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহার গতি—তাহার প্রতিই ইহার বেগের বৃদ্ধি, গতি ফিরাইবার চেষ্টা নিতান্তই নিরর্থক। আপনাকে প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছা নাই; আমি আপনার যোগ্যা নই, আমায় চিরবন্দিনী করিয়া রাখুন,—ইচ্ছা হয়, আমার দেহকে নির্য্যাতন করুন; আমার মন কিন্তু উৎসৃষ্ট—দেবতার চরণে এ ফুল দিয়াছি, এ পূজার ফুলে আমার আর অধিকার নাই।"

হতাশভাবে সখিনার হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাদশাহ কহিলেন—"রমণীর প্রেম আকাঙ্ক্ষা করিয়া জীবনে আমি কোন দিন প্রত্যাখ্যান পাই নাই—জীবনে এই

আমার প্রথম প্রত্যাখ্যান। তবু আমি সুখী যে, তুমি আমায় ছলনা করিলে না, বঞ্চনা করিলে না। নারি, আজ আমার রাজ্য বিনিময়ে যদি সেই অমূল্য প্রেমের অধিকারী হইতাম—যে প্রেম রাজসম্পদকে ধূলিজ্ঞানে পরিহার করে, রাজ্যেশ্বরকে অবহেলা করিয়া নিগৃহীত, সামান্য রাজবন্দীর প্রতি আকৃষ্ট হয়! ধন্য সেই যুবা—যে তোমার এই পবিত্র হৃদয়পুষ্পের সমস্ত সৌরভ ও মকরন্দ লাভ করিতে পারিয়াছে, আজ সে আমার ঈর্ষ্যার পাত্র।"

সখিনা উত্তর দিল না, নীরবে বাদশাহের চরণপ্রান্তে চাহিয়া রহিল। বাদশাহ কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"নিজের হৃদয়কে বিশ্বাস নাই, সুতরাং বৃথা তোমায় আর আমি বন্দিনী করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি না, তুচ্ছ শরীরের প্রতি আর আমার লোভ নাই—তোমার হৃদয় যখন পাইলাম না, তখন তোমায় আমি মুক্তি দিতে চাই। এই লও আমার অঙ্গুরীয়—এ অঙ্গুরী যাহাকে যখন দেখাইবে, সে তখনই তোমার আদেশ মত কায করিবে। এ অঙ্গুরী আমি ফিরাইয়া চাহি না, আমার গভীর প্রণয়ের নিদর্শন এই অভিজ্ঞান তোমার কাছে রাখিয়া দিও। অন্যভাবে না হউক, বন্ধুভাবে এই দীন বাদশাহকে কখনও কখনও স্মরণ করিও—আর—আর যদি কোন দিন প্রয়োজন হয়, কোন অভাব হয়—আমার কাছে আসিও—ইহাই আমার একান্ত অনুরোধ।"

সখিনা বাদশাহের দান হাতে লইয়া মস্তকে রাখিয়া সম্মান জানাইল এবং সসম্মানে বাদশাহের হস্তখানি চুম্বন করিল। অতঃপর বাদশাহ বিদায় লইলেন।

* * * *

ভোর হয় হয়—ধারা-স্নাত পবন দ্বিগুণ শীতল হইয়া লেবু ফুলের সৌরভ লইয়া দাতার আসন গ্রহণ করিয়াছে। সম্রাটের অন্তঃপুরের নহবৎখানায় অতি মধুর স্বরে বাঁশীতে সুর বাজিতে সুরু হইয়াছে। অদূরে মসজিদে গম্ভীর আজান ধ্বনির পবিত্র রনন সবেমাত্র থামিয়া গিয়াছে। এই সময় কারাগারের প্রহরী আসিয়া মশুরকে চুপি চুপি সংবাদ দিল—রাজবন্দী হিন্দু যুবা এবং তিন জন সহচর পলাতক—বাদশাহের অঙ্গুরীয় নিদর্শন দেখাইয়া বোরখা ঢাকা এক স্ত্রী মূর্ত্তি তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে। মশুর আভাসে ইতঃপূর্ব্বেই কতক কতক অনুমান করিতে পারিয়াছিল। যাহা হউক, নিয়মানুযায়ী সেই সংবাদ তখনই সে বাদশাহকে জ্ঞাপন করিতে গেল। সম্রাট বিনিদ্র অবস্থাতেই শয্যায় শয়ান ছিলেন; সংবাদ শুনিয়া বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইলেন না—ধীরভাবে কহিলেন, "রাজধানীতে এ সংবাদ রটনা না হইলেই মঙ্গল।"

প্রহরী "যো-হুকুম" বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল। বাদশাহ শয্যাত্যাগ করিয়া একবার সখিনার পরিত্যক্ত কক্ষ দেখিতে গেলেন। বন্দিনী চলিয়া গিয়াছে; বাদশাহের উপহার একটি মাত্রও জিনিষ সে লইয়া যায় নাই, শুভ্রশয্যা সুন্দরীর আলিঙ্গন লাভ করিবার জন্য বক্ষ প্রসারিত করিয়া নীরব আহ্বান জানাইতেছে, তাহার উপর গজদন্ত ফলকখানি পড়িয়া আছে; বাদশাহ তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, তাহাতে মুক্তার ছাঁদে সখিনার হাতে লিখা—

গোলাপ হয়ে ফুটেছিল আমার প্রেমের ফুল;
বন্ধু ওগো বন্ধু আমার তোমার প্রাণের ব্যথা,
সেই গোলাপে কাঁটা হয়ে করত যে আকুল,
জীবন ভরা যা কিছু মোর সকল সুখের কথা॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়বে গো মোর মনে,
কাঁটার ব্যথা নিত্য সঙ্গোপনে॥

বাদশাহ জীবনে যাহাকে সত্যই ভালবাসিয়াছেন, তাহার শেষ দান বক্ষে চাপিয়া তাহার পরিত্যক্ত শয্যায় এলাইয়া পড়িলেন, নয়নে অশ্রু দেখা দিল। জীবনে তিনি কখনও কাঁদেন নাই, আজ কিন্তু পদগৌরব মান-সম্ভ্রম কিছুই তাঁহার রহিল না, বিন্দু বিন্দু অশ্রু কোন বাধা না মানিয়া কপোল বহিয়া ঝরিতে লাগিল; বাতায়ন-পথে উঁকি দিয়া রাজরাজেশ্বরের বিরহী বেশ দেখিয়া যেন লজ্জায় ঊষা গতি সংবরণ করিল—প্রকৃতির নয়নেও সমবেদনার অশ্রু বাদল-ধারা রূপে ঝরিতে আরম্ভ হইল।

বাদশাহের হৃদয়ে রূপজমোহ আজ মৃত—প্রেম আজ জাগিয়াছে। রাত্রিপ্রভাতে বন্দিনীর পলায়ন-সংবাদে বেগম-মহলে কিন্তু আনন্দোৎসব হইল। বেগমগণ সকলেই পীরের সিন্নি সাজাইলেন—এবং সে উৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা জাঁক-জমক করিলেন—বেগম-প্রধানা মোতিয়া বিবি।

শ্রীসরসীবালা বসু।

সাম্য-দর্শন।

সমভাবই সাম্য; সাম্য মহৎ, সাম্য উচ্চ, সাম্য পবিত্র। যিনি সাম্য-মন্ত্রের সাধক, তিনি ধন্য; যিনি সাম্য-মন্ত্রে সিদ্ধ, তিনি কৃতার্থ; কেবল কৃতার্থ তিনি একা নহেন, তাঁহার সঙ্গে বহু মানব কৃতার্থ, পৃথিবী পবিত্র। এই যে সাম্য ইহাই সত্য, ইহাই অপরিণামী অবিনশ্বর; ইহাই অব্যয়। সাম্যই এক, সাম্যই অদ্বিতীয়; সাম্য দর্শন, সাম্য দ্রষ্টা, সাম্য দৃশ্য; আরও পরিষ্কার—সাম্যই ব্রহ্ম—বা ব্রহ্মভাব 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম' ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত মহাবাক্য। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মভাবে কোন ভেদ নাই। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত। সনাতনধর্ম্মাশ্রিত সুজন কি এই সাম্যে অনাদর করিতে পারে, উপেক্ষা করিতে পারে, বিদ্বেষ করিতে পারে? যাহা হৃদয়ের হৃদয়, প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর, সেই সাম্যে সেই সার সত্য সাম্যে, কোন্ ধার্ম্মিক সাগ্রহে সবহুমানে ভক্তিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান না করিয়া থাকে?

তবে বৈষম্য কেন?—উচ্চ, নীচ, স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, জলাচরণীয়, অনাচরণীয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, দ্বিজ-শূদ্র—কত বলিব—জীবের এত বৈষম্য কেন? এ বৈষম্যের ফল—কলহ, বিবাদ, আত্মদ্রোহ, চরমফল প্রত্যক্ষ। এমন বিষময় বৈষম্য—স্বর্গাদপি গরীয়সী ভারতভূমিকে যে বৈষম্য-শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, সেই বৈষম্য—এখনও আধিপত্য করিতেছে। লোক দেখিয়াও দেখিতেছে না, ভাবিয়াও ভাবিতেছে না, জানিয়াও জানিতেছে না; ইহাই বুঝি দুর্ভাগ্যের ফল!

সত্যই দুর্ভাগ্যের ফল; কিন্তু কেবল এ দুর্ভাগ্য ভারতের নহে, এ দুর্ভাগ্য মানবমাত্রের; মানবমাত্রের কেন —জীবমাত্রের। দুর্ভাগ্যের—সেই দুর্ভাগ্যের পরিচয় দেওয়া উচিত;—তাই দিতেছি;—বিশ্বসংসারে দুইটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—একটি জ্ঞান, অপরটি জ্ঞেয়। জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞেয় কি না, সে বিচার তুলিব না;—জ্ঞাতা জ্ঞান এক কি না, সে বিচারও করিব না, কেবল বলিতেছি—জ্ঞেয় অর্থে যাহা জ্ঞান নহে—কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয়ে অবস্থিত। জ্ঞান আঁধার ঘরে প্রদীপ, জ্ঞেয় ঘরের দ্রব্যসামগ্রী; জ্ঞান রাজা, জ্ঞেয় প্রজা। জ্ঞান আত্মা, জ্ঞেয় অনাত্মা। নৈয়ায়িক জ্ঞান স্থলে 'জ্ঞাতা' শব্দ প্রয়োগ করেন। জ্ঞানই হউন আর জ্ঞাতাই হউন—তাঁহার দার্শনিক নাম 'চিৎ', জ্ঞেয়ের—'জড়'। পুরুষ 'চিৎ', প্রকৃতি 'জড়'—বা অচেতন স্যাংখ্যের—পরিভাষা এইরূপ। এই বিশ্বসংসার চিৎ জড়ের সমন্বয়ক্ষেত্র, প্রকৃতিপুরুষের লীলাভূমি। এ বিশ্বসংসারে যাহা দৃশ্য, তাহাই প্রকৃতি বা প্রাকৃত, আর যিনি দ্রষ্টা, তিনি অপ্রাকৃত—চিৎ। এই যে জ্ঞেয় জড় বা প্রকৃতি, বৈষম্য তাহার স্বভাব; বৈষম্য জড়ের স্বভাব বলিয়াই জগতে দুইটি দৃশ্যবস্তু সর্ব্বাংশে 'সমান' হয় না। এই বিশাল জগতে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে, কেবল বৈষম্য,—গ্রহ-নক্ষত্র দেখ, চন্দ্র-সূর্য্য দেখ, সরিৎ-সাগর দেখ, ভূমণ্ডল-দিঙ্‌মণ্ডল দেখ; দেখিবে, পরস্পরে বৈষম্য, জাতিগত বৈষম্য, স্থানগত বৈষম্য, অবস্থাগত বৈষম্য, ব্যক্তিগত বৈষম্য আবার স্বগত বৈষম্য। তেজঃ পদার্থে যে জাতি যে সাধারণ ধর্ম্ম আছে—তাহার স্থূল সংজ্ঞা—প্রকাশ; এই প্রকাশ-ধর্ম্ম গ্রহ-নক্ষত্র চন্দ্র-সূর্য্যে আছে, সরিৎ সাগরে নাই, ভূমণ্ডলে নাই, দিঙ্‌মণ্ডলে নাই। সরিৎ-সাগরের জলময়ভাব ভূমণ্ডল প্রভৃতিতে নাই, ভূমণ্ডলের পার্থিবভাব কাঠিন্য তেজ বা জলে নাই। এই যে বৈষম্য ইহা জাতিগত বৈষম্য, উর্দ্ধ অধঃ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ—ইহাই স্থানগত বৈষম্য,—উদয়-অস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি শীত-গ্রীষ্ম ইত্যাদি কারণে যে বৈষম্য, তাহাই অবস্থাগত বৈষম্য। চন্দ্র ও সূর্য্যে মঙ্গল ও বৃহস্পতিতে, গঙ্গা ও যমুনায় ইত্যাদি যে বৈষম্য, তাহা ব্যক্তিগত বৈষম্য—দুইটি আম্রবৃক্ষে দুইটি শুক পক্ষীতে যে পরস্পর ভেদ, তাহাও ব্যক্তিগত বৈষম্য; একই বৃক্ষের—শাখায় ও মূলে স্কন্ধে ও পত্রে পুষ্পে ও ফলে যে ভেদ, তাহা স্বগত বৈষম্য; এই বৈষম্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত। যে বৈষম্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত, মানবজাতি তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবে কিরূপে? দুইটি মানবের মুখ এক প্রকার হয় না—এই যে বৈষম্য—ইহা প্রাকৃতিক—ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিলে অন্ত

ভাষায় যে ভাবই পরিজ্ঞাত হউক, সংস্কৃত বা তাহার অনুগত বাঙ্গালা ভাষায় স্বাভাবিক শব্দের অর্থের সঙ্গে অদৃষ্টের—ভাগ্যের প্রগাঢ় সম্বন্ধ। জীবের যে 'অদৃষ্টবশে সুখ দুঃখ ভোগ হয়—ভোগ্য বস্তুর স্বরূপ সেই অদৃষ্টের ফলে ঘটিয়া থাকে। যাহারা মিষ্ট 'আম্র ফল সেবনে আনন্দ বোধ করে,—তাহাদের শুভাদৃষ্ট সেই মিষ্টতার মূলে বর্ত্তমান,—মিষ্ট আম্রের স্বাভাবিক মধুরতা সেই ভাগ্যের ফল. সুতরাং বস্তুস্বভাবও জীবের অদৃষ্টকে ত্যাগ করিয়া থাকে না, পক্ষান্তরে ঐ মিষ্টরস যাহাদের ভাল লাগে না,—সেবনে ক্লেশ হয়, তাহাদের দুরদৃষ্ট—ঐ স্বভাবের সঙ্গে জড়িত। এই অদৃষ্টবাদ নৈয়ায়িকের অবলম্বিত। আমি সেই মতেই বলিয়াছি—"বৈষম্য সত্যই দুর্ভাগ্যের ফল।" সাম্যের সঙ্গে তুলনায় ভাগ্যমাত্রই দুর্ভাগ্য,—সাধারণ বিচারে সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য পৃথক্ হইলেও সাম্যের তুলাদণ্ডে দেখিতে হইলেই ভাগ্য মাত্র 'দুর্' নিন্দিত, কেন না, ভাগ্যই বৈষম্যের স্রষ্টা, লোকচক্ষে তিনি 'সু'ই হউন, আর 'দুর্'ই হউন, তিনি না থাকিলে বিশ্বসংসারে বৈষম্য থাকিত না। যিনি চিৎ—যিনি পুরুষ, তিনিই আত্মা। তাঁহার সাম্যই সাধনীয়। কে সাধক আছ—সেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পার? কে সাধক আছ—অন্তরের সহিত কেবল কথায় নহে—কেবল বাহ্যিক আচারে নহে—অন্তরের সঙ্গে সেই সাম্যে আত্মসমর্পণ করিতে পার?

আমি জানি, বর্ত্তমান সময়ে লক্ষ লক্ষ যুবক বলিবেন, 'আমি আছি' 'আমি আছি',—কিন্তু তাহা কি প্রকৃত? যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে—সংসার অনেকাংশে স্বর্গতুল্য হইত, আত্মদ্রোহ থাকিত না, প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত।

অতএব প্রকৃত নহে। 'সাম্য' উত্তম; ধূর্ত্ততায়, ভণ্ডতায়, বাক্‌চাতুর্য্যে সে উত্তম বস্তু লাভ হয় না। যাহা উত্তম, তাহা পাইতে হইলে উত্তম ভাব, উত্তম সাধনা চাই। সকল জাতি মিলিয়া একত্র পানভোজন করা, আদান-প্রদান করা, মুখে 'ভাই ভাই' বলিয়া আলিঙ্গন করা, ইহা ত বাহ্য আচরণ, অন্তরের ভাবের বিপরীত বাহ্য আচরণই ভণ্ডতা। অন্তর সাম্যের প্রতি ধাবিত হইলে বৈষম্য স্বয়ংই হীনবল হয়—যেমন সাম্যের প্রতিষ্ঠা, তেমনই বৈষম্যের বিসর্জ্জন—যতটুকু সাম্যের বৃদ্ধি, ততটুকুই বৈষম্যের ক্ষয়—এই অনুপাতে যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা হইলে প্রথমে অন্তর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রাকৃত-বৈষম্যে যাহার মন পূর্ণ, সে ব্যক্তি বাহ্য আচরণে যতই সাম্য-দর্শনের পরিচয় প্রদান করুক, তাহার তাহা ভণ্ডতা মাত্র; তাহা সাম্য-সাধনা নহে।

সাম্য-দর্শন—বৈষম্যের ভিতর দিয়াই করিতে হয়, বৈষম্যসমূহকে একত্র করিয়া অন্তরে আবদ্ধ করিতে হয়, অন্তরেই তাহাকে বিলীন করিতে হয়। তাহাতে অন্তরেই সাম্যের নির্ম্মলজ্যোতিঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। যতদিন বৈষম্য অন্তরে বিলীন না হইতেছে, ততদিন সাম্যের ছায়াদর্শনও ঘটে না। সাম্যের একটা নকলমাত্র লোককে দেখান হয়; যেমন বাঙ্গালার বারবনিতা সীতা-সাবিত্রী সাজিয়া থাকে, সেইরূপ সাম্য-দর্শনের একটা সাজ পৃথিবীতে চলিয়াছে।

যে সাম্য মহৎ, উচ্চ, পবিত্র—সে সাম্য এই নকল সাম্য নহে,—এ সর্ব্বাচার পরিত্যাগ নহে।

আমাদের শাস্ত্র, সমাজ ও নীতি সমগ্রই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত। বৈষম্য যখন প্রাকৃত, তখন পরমার্থদর্শী ব্যতীত কাহারও দৃষ্টিতে বৈষম্য অসত্য নহে। বৈষম্যের ধ্বংস আছে, জড়-বস্তুর উৎপত্তি, ক্ষয় বা অবস্থা পরিবর্ত্তন অহরহঃ চলিতেছে, বৈষম্য সেই জড়বস্তুতেই আবদ্ধ—সুতরাং বৈষম্য অসত্য—নশ্বর বলিয়াই অসত্য, আত্মা বা চিৎ—অবিনশ্বর, তাই সত্য। নৈয়ায়িক জীবাত্মার অবস্থা-পরিবর্ত্তন মানেন বটে, কিন্তু এমন আত্মা আছেন, যাঁহার অবস্থা-পরিবর্ত্তন হয় না—তিনি পরমাত্মা—সুতরাং সদা সম—সুতরাং সার সত্য সমদর্শন—যতদিন না হইতেছে, ততদিন এই সংসারে থাকিয়া সংসারের সত্য মিথ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া—সত্যের আশ্রয় লইতে হয়—এই সত্য মিথ্যা নির্ণয় বৈষম্যের মধ্য হইতেই করিতে হয়।

সাম্যের তুলনায় বৈষম্য নিকৃষ্ট হইলেও—আপাততঃ অপরিহার্য্য; যখন শত্রুমিত্রে ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারি না, যখন আত্মপরে বৈষম্য দূর করিতে পারি না, যখন এক জন সুযোগ্য ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিয়া আত্মীয় অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করি—আমার নামটা ঢক্কানিনাদে কিরূপে ঘোষিত হইবে, তাহার জন্য

ব্যাকুল হইয়া থাকি, তখন সাম্যের নাম করিতে লজ্জা যে কেন হয় না, তাহাই বিস্ময়ের বিষয় !

যদি একত্র পানভোজনে বা আদান-প্রদানে সাম্য হইত, তবে বিখ্যাত জর্ম্মণ-যুদ্ধে পৃথিবী বিধ্বস্ত হইত না। সেখানে ত 'সাম্য'—কল্পিত সাম্য—সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। সেখানে দ্বন্দ্ব কেন, কেন বেকার-সমস্যা, কেন ধর্ম্মঘট—কেন প্রবলে দুর্ব্বলে বিরোধ? ইহার উত্তর নবীন সাম্যবাদী প্রদান করিতে অক্ষম।

আমরা বলি, সাম্য নাই, সংসারে সাম্য থাকিতে পারে না। বৈষম্যই সৃষ্টির মূলরহস্য, তাহা নিকৃষ্ট হইলেও সংসারের সহিত ওতপ্রোতঃভাবে বিজড়িত, সেই বৈষম্য দুর্ভাগ্য বা জীবের অদৃষ্টের আশ্রিত। যে সাধক এই অদৃষ্টবন্ধন হইতে মুক্ত, তিনিই "পরমং সাম্যমুপৈতি"। শ্রুতি বলিতেছেন, পরম সাম্য তাঁহারই ঘটিয়া থাকে।

শাস্ত্র দেখাইতেছেন—এই বৈষম্য—সর্ব্বজীবের অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত বৈষম্য—দূর করিতে হইলে সাধনা করিতে হয়, সাধনায় সংযম প্রয়োজন—এই সংযম আচারে ব্যবহারে ত আছেই ; মূল সংযম মনে। সংযম অভ্যাসে মন আয়ত্ত হয়, মন আয়ত্ত হইলে মনকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারা যায়। বিষয়নিবৃত চিত্ত ভগবদ্-ধ্যাননিষ্ঠ হইতে পারে। এই ধ্যানে অগ্রসর হইতে পারিলে রাগ-দ্বেষ ক্রমেই মন্দীভূত হয়। অন্তরে এই ভাবপ্রতিষ্ঠার সহিত বাহ্যাচারের যে সম্বন্ধ, তাহা সংযমমূলক, যথেচ্ছাচারমূলক নহে। যথেচ্ছাচারের সহিত রাগদ্বেষেরই প্রগাঢ় সম্বন্ধ, দম্ভ-অভিমানেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাগদ্বেষ, দম্ভ, অভিমান ছাড়িতে না পারিলে সাম্য অভিনয়ে কোন ফলই হয় না। অতএব 'সাম্যদর্শন' যদি যথার্থই মানবের প্রার্থিত হয়—তাঁহাকে সংযম অভ্যাস করিতে হয়, শাস্ত্র মানিতে হয়, যথেচ্ছাচার ত্যাগ করিতে হয়। ইহা কাহারও প্রতি বিদ্বেষ, কাহারও প্রতি ঘৃণা বা কাহারও প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের জন্য নহে, শাস্ত্রোপদেশকের নিকট নতমস্তক হইতে শিক্ষা করিবার জন্য, রাগদ্বেষ দম্ভ অভিমান বিসর্জ্জন করিবার জন্য। যে ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি বড়, আমার নিকট অপর জাতীয় মানবমাত্রেই নিকৃষ্ট, তিনি জাত্যা ব্রাহ্মণ হইলেও—প্রকৃতপক্ষে নিতান্ত অপকৃষ্ট। 'ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ' ব্রাহ্মণ যে কতদূর হেয়, তাহা অত্রিসংহিতায় আছে, পক্ষান্তরে যথেচ্ছাচারী ব্রাহ্মণও সেইরূপ হেয়।

"যথেষ্টাচরণাদাহুর্মরণান্তমশৌচকম্।"

আমাদের সমাজ ও ম্লেচ্ছসমাজে প্রকৃতই বিপরীত ভাব বর্ত্তমান, আমাদের শিক্ষায় যে বৈষম্য স্বাভাবিক, তাহা মুখে 'ন স্যাৎ' বলিয়া উড়াইলে চলিবে না, এই বৈষম্যকেই ধরিয়া সাম্যের পথে যাইতে হইবে ; ম্লেচ্ছ শিক্ষা এই যে, সাম্যকে অবলম্বন করিয়া বৈষম্যের দিকে ছুটিতে হইবে। ম্লেচ্ছগণের সাম্য আহার-বিহারে আদান-প্রদানে—কিন্তু অন্তরে বৈষম্য, কেবল স্বীয় বিষয়স্পৃহা, কেবল অপূরণীয় তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাই রাগদ্বেষ, দম্ভ, অভিমান—সর্ব্বত্রই বিরাজমান। তৃষ্ণা বৈষম্য বা বিষমদর্শন ব্যতীত হয় না। সর্ব্বত্র সমদর্শন যাহার আছে, তাহার ত কিছুই অপ্রাপ্ত নাই—কিসের জন্য তাহার তৃষ্ণা হইবে ? যে 'সাম্যবাদী' ম্লেচ্ছ, তাহার সর্ব্বত্রই বিষমদর্শন, উচ্চনীচভেদ, স্বজাতিবিজাতিভেদ, আত্মপরভেদ। তাহার ত তৃষ্ণা হইবেই, সেই তৃষ্ণা হইতেই সামাজিক অশান্তি।

আমাদের ব্যবহারশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের দণ্ডভেদ আছে। যাহারা কদাচ অপরাধ করে না, পাপভয়ে যাহারা স্বভাবতঃ ভীত, তাহাদিগকে অল্প দণ্ড প্রদানেও সামাজিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য সদ্‌ব্রাহ্মণের দণ্ড অল্প ছিল। যাহাদের মধ্যে অপরাধ অধিক, পাপভয় অল্প—তাহাদের পক্ষে দণ্ডভীতিরক্ষাই সমাজশৃঙ্খলাস্থাপনের হেতু। সত্যবাক্যে এই বৈষম্য-ব্যবহার শাস্ত্রঘোষিত। ম্লেচ্ছ ব্যবহারবিধান ঠিক ইহার বিপরীত, বিধি—সাম্যের জ্ঞাপক, তাহা ত বাক্যমাত্র মৌখিক বাক্যমাত্র, তদনুসারে কিন্তু বিধান হয় না—বিধানে দারুণ বৈষম্য। কৃষ্ণাঙ্গহত্যায় অনেক স্থলে যে শ্বেতাঙ্গ নির্দ্দোষ তাহাই নির্ণীত হয়, অনেক স্থলে নামমাত্রে দণ্ড। কৃষ্ণাঙ্গহত্যায় শ্বেতাঙ্গের প্রাণদণ্ড হয় কি ? কখন ত শুনি নাই। যদি বিধানে তাহা না হয়, তবে এ সাম্যের আবরণ কেন ? মিথ্যাকে সত্যের আবরণে প্রচ্ছাদিত করা কেন ?

'কেন'র উত্তর দিয়াছি। বৈষম্যই প্রাকৃত, প্রকৃতির বাহিরে যাইতে না পারিলে বৈষম্য থাকিবেই, মুখে যা-ই বল। সেই বৈষম্য বা প্রকৃতিলীলার বহির্ভাগে যাইতে হইলে জ্ঞান, চিৎ পুরুষ, আত্মা যে নামই করি না কেন, সেই 'নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'—সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—শাস্ত্রপ্রদর্শিত পথে বিষয়বিরস হইয়া অগ্রসর

হইতে হইবে, যথেচ্ছাচারের পথ নাই—সাম্য-অভিনয়ের পথ নাই—শাস্ত্রপ্রদর্শিত কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানপথে ধাবিত হইবে—তখন অন্ততঃ সাম্যদর্শন হইতে পারে। "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

সেই সাম্যদর্শনে পরমানন্দ, সে দর্শনে দুঃখের উত্তাপ যত তীব্রই হউক, স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। হায়, সেই সাম্যদর্শনের মূলীভূত শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া আমাদের সমাজ নকল সাম্যদর্শনের অনুবর্ত্তন করিতেছে! সম্মুখের সীতা-সাবিত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া রঙ্গালয়ের সীতা-সাবিত্রী-অভিনেত্রী বারবনিতার পূজা করিতেছে! হায়—হায়!

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

ভোট-ভিক্ষা

ভিক্ষা দাও গো, বঙ্গবাসী, ধড়ে রাখ প্রাণ—
চাপে চাপে প্রাণ যায় যে—কেমন বিধান!
যে যা'র ঢাকে দিচ্ছে কাটি
আকাশ যেন যাচ্ছে ফাটি—
নিজের ঢাকটি নিজেই বাজাই বধির করে কান।
ভিক্ষা দাও গো বঙ্গবাসী, ধড়ে রাখ প্রাণ।

স্নান

ইংরাজীতে একটা কথা আছে—পরিচ্ছন্নতার স্থান দেবত্বের পরেই। কিন্তু প্রতীচীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা বলিবেন, প্রতীচীতে পরিচ্ছন্নতা বাহিরে যত দেখা যায়, ব্যক্তিগত ভাবে তাহার তত অনুশীলন নাই। বিলাতে সাবানের বিজ্ঞাপন—মুখ ও

হাইরাই বালিকার তরঙ্গ-স্নান।

বর্ণের জন্য অতুলনীয় (Matchless for the hands and complexion) মুখ ও হাতই পুনঃ পুনঃ ধৌত করা হয়। স্নান হয় "কালে ভদ্রে।"

ইটালীতে বড় হোটেলে স্নান করিবার জন্য স্বতন্ত্র দর্শনী দিতে হয়। প্যারীতে স্নানের জন্য জল যদি বা পয়সা দিলে পাওয়া

সিংহলে স্নান।

ব্রহ্মে বালকের স্নান।

জাপানী শিশুদের স্নান।

জাপানে স্নান।

যায়—সাবান পাওয়া দায় ; হোটেলওয়ালা মনে করে, লোক যদি এত নির্ব্বোধ হয় যে, সে স্নান করিবে, তবে সে তাহার সাবানও সঙ্গে আনিবে।

প্রাচীতে স্নান নিত্যকর্ম্ম।

ভারতে স্নান না করিলে লোক আপনাকে অশুচি মনে করে। আবার সমগ্র ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশে স্নানের যত আদর, তত আর কুত্রাপি আছে বলিয়া মনে হয় না।

জাপানে স্নানের সুব্যবস্থা আছে। সংগৃহীত চিত্রে জাপানী অনাথাশ্রমে শিশুদিগের স্নানের ব্যবস্থা দেখা যাইবে। শিশুদিগকে কবোষ্ণ জলে স্নান করান হয় এবং তাহারা তাহাতে পরম আনন্দ অনুভব করে।

অনাথাশ্রমেও যেমন, পরিবারেও তেমনই জাপানীরা ছেলেমেয়েদের ভাল করিয়া স্নান করায়। ইহা যে জাপানী-দের পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক, তাহাতে অবশ্য সন্দেহের অব-কাশ নাই। সাধারণতঃ টবে জল লইয়া শিশুকে তাহার মধ্যে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া স্নান করান হয়।

হাইয়াইতে বালক-বালিকারা অতি অল্প বয়স হইতেই সৈকতে তরঙ্গলীলা সম্ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করে।

সিংহলে দিবসের উত্তাপের পর বালক-বালিকারা স্নান করিয়া তৃপ্ত হয়।

ব্রহ্মেও বালক-বালিকারা স্নান করিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে। চিত্রে দেখা যাইতেছে, একটি ব্রহ্মদেশীয় বালক জলের গামলার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

ডেরা ভাড়া

শ্রীনাথদ্বার যাত্রা

১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩২৯ সাল কাশীধাম হইতে শ্রীনাথদ্বার দর্শন অভিলাষে যাত্রা করিলাম, সঙ্গে ছাত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য ও ভৃত্য কেদার কাহার। শ্রীনাথদ্বার যাইবার অভিলাষ বহুকাল হইতেই মনে ছিল, কিন্তু শারীরিক অস্বাস্থ্য, সরকারী চাকরী ও মাদৃশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতোচিত উপযুক্ত অর্থাভাব, এই তিনটি কারণ মিলিত থাকিয়া এতকাল সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দেয় নাই, শ্রীনাথের কৃপায় হঠাৎ দেখিলাম যে, তিনটি প্রতিবন্ধকই অপসৃত হইয়াছে,। পূর্ব্বপুরুষগণের সুকৃতিবলে সংস্কৃত কলেজের চাকরী গত জানুয়ারী হইতেই খসিয়াছিল, শরীরও দেড় বৎসরব্যাপী পুণ্যতীর্থ কাশীবাসের প্রভাবে আবার কার্য্যক্ষম হইয়াছিল, ছিল কেবল উপযুক্ত অর্থাভাবরূপ বলবৎ প্রতিবন্ধক। শ্রীনাথজীর কৃপায় তাহাও অপসৃত হইল, কারণ রাজপুতানা সেখাবাটী প্রান্তস্থিত ফতেপুরের স্বনামধন্য কুবেরতুল্য ধনী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ শেঠজী মহোদয় সাবিত্রী যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া পূর্ণাহুতি মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, যাতায়াতের ব্যয়ভার তিনিই বহন করিবেন এবং তাহার সহিত মোটা বিদায় পাইবার সম্ভাবনাও খুব প্রবল। আর আমাকে পায় কে? মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, ফতেপুর হইতে ফিরিবার সময় মেবারে শ্রীনাথদ্বার দর্শন করিয়া আসিব, এমন সুযোগ এ জীবনে যে আর ঘটিবে, তাহার আর সম্ভাবনা কোথায়? ইহাই হইল আমার শ্রীনাথদ্বার যাত্রার মুখবন্ধ বা ভূমিকা। পাঠকবর্গকে একটু ধৈর্য্য ধরিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি; কারণ, শ্রীনাথদ্বার যাইবার পূর্ব্বে আমাকে মাড়োয়ারীর খাঁটী দেশ সেখাবাটী প্রান্ত ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে যাত্রা শ্রীনাথদ্বার যাত্রার সাক্ষাৎ অঙ্গ না হইলেও তাহাতে আমার বিবেচনায় মাড়োয়ারীর প্রতিবেশী বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে কিছু শিখিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে এবং তাহা একেবারেই যে নীরস হইবে, তাহাও বোধ করি না।

বেলা দশটার সময় দেরাদুন মেলে কাশী কাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে দিল্লীতে পৌছিলাম; সেখানে এক ধর্ম্মশালায় ১১টার মধ্যে স্নানাহার সারিয়া দিল্লী দেখিবার জন্য একখানি টাঙ্গাগাড়ী ভাড়া করিয়া সাত ঘণ্টার মধ্যে যতটা দেখা সম্ভব দিল্লীসহর দেখা গেল। দেখিলাম যে কি, তাহা নিজেই ভাল করিয়া বুঝিলাম না—পাঠককে কি বুঝাইব?

একি—স্বপ্ন, না মায়া অথবা মতিভ্রম?

অতীত ভুবনবিজয়ী ঐশ্বর্য্যের ধ্বংসময় স্তূপাবলীর মাঝখানে নূতন ঐশ্বর্য্যের যেন খলখল বিরাট হাস্যের বিকট কোলাহল! সহস্র বৎসরের অতীত ঘটনাবলীর স্মৃতির সহিত বিজড়িত ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাসের জলন্ত প্রতিকৃতি! মুসলমান বাদশাহগণের বিলাসময় সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ, সমাধিবক্ষে, বৃটনের তেজোবীর্য্য-সূচক উগ্র ও কঠোর প্রভাব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দিল্লীর দুর্গে, রাজপথে, কবর স্থানে ও কুতবমিনারের চারিদিকে ও অহমিকার বিশ্বজয়ী বিকট কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত করিতেছে।

দেখিলাম, নূতন দিল্লীর নূতন দুর্গের বিরাট সন্নিবেশ, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য—এই কেল্লা হইতে সোজাসুজি একটি বিরাট অতি প্রশস্ত রাজপথ নির্গত হইয়া সম্রাট সাহজিহানের নির্ম্মিত প্রাচীন কেল্লার তোরণে গিয়া সংলগ্ন হইয়াছে—রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া এই নব-নির্ম্মিত দুর্গ ও প্রাচীন দুর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মহাকবি কালিদাসের কবিতাটি মনে পড়িল।

> যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনা-
> মাবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
> তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
> লোকো নিয়ম্যত ইবৈষ দশান্তরেষু॥

এক দিকে মুসলমানের গৌরবমণ্ডিত কীর্ত্তি সুধাকরের অস্তগমন, অন্য দিকে জগদ্বিজয়ী ইংরাজের প্রভাবসূর্য্যের অভ্যুদয়, এই দুইএর মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভারত! তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে থাকিয়া সহস্রবর্ষ-ব্যাপী বিরাট

অবসাদভারে ক্রমশঃ ভগ্নপঞ্জর হইতেছে, পরিবর্ত্তনের ভীষণ আবর্ত্তে পড়িয়াও কুটস্থ পুরুষের ন্যায় কেবল দেখিতেছে মাত্র, ক্রিয়া নাই, বিক্ষেপের উত্তেজনা নাই, আছে কেবল আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস ও পৈতৃক, ব্যক্তিগত প্রাণটার প্রতি অত্যধিক প্রীতি! হা বিধাতঃ! এ বিড়ম্বনা কবে মিটিবে?

ইহাই হইল, আমার ৩৪ বৎসরের পর আবার দিল্লী-দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মুখে এ সব কথায় আলোচনা অনেকেরই ভাল না লাগিবার কথা, তাই এই পর্য্যন্তই এই কয়টি কথা বলিয়াই দিল্লী-দর্শনের বিবরণ শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

সন্ধ্যার সময় ধর্ম্মশালায় ফিরিলাম, তথা হইতে যথা কথঞ্চিৎ সান্ধ্য বৈধকৃত্য শেষ করিয়া ৭টা ৫ মিনিটের গাড়ীতে দিল্লী ষ্টেশন হইতে রাজপুতানার দিকে যাত্রা আরম্ভ হইল।

রাত্রি ৯টা ৫৫ মিনিটে, আমরা রেওয়ারী ষ্টেশনে পৌঁছিলাম; এ পর্য্যন্ত আমরা বি, বি, সি, আই রেলের, আমেদাবাদের মেল ট্রেণে আসিলাম, এখানে আমাদের গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইল; এখান হইতে আমাদিগকে হিসার ষ্টেশনে যাইয়া সেখান হইতে যোধপুর-বিকানীর রেল ধরিতে হইবে।

প্রাতঃকালে ৫টা ১২ মিনিটের সময় আমরা হিসারে পৌঁছিলাম। রাত্রিকালে বেশ শীত লাগিয়াছিল, শীতের জন্য যতদূর সম্ভব গাত্রবস্ত্র সঙ্গে থাকিলেও তাহার প্রভাব বেশ অনুভব করিতে হইয়াছিল। হিসারে যখন গাড়ী হইতে নামিলাম, তখনও খুব শীত বোধ হইতে লাগিল। বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝখানে ষ্টেশন; দূরে পশ্চিম ও দক্ষিণ কোণের ছোট ছোট বালুকাময় পাহাড়গুলি মাথা তুলিয়া যেন সম্মুখে নিপতিত বিশাল বালুকাময় সমতলক্ষেত্রের বিপুলতা ও নীরবতা বিস্ময়ভরে দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া পড়িয়াছে; তাহাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া, শিখরস্থিত ক্ষুদ্রকায় তরুরাজিকে কম্পিত করিয়া পশ্চিমমারুত সেই মরুস্থলীকে শীতল করিবার জন্য বেগে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইতেছে; সে বায়ুর শীতল স্পর্শে বুকের ভিতর যেন জমিয়া নিস্পন্দপ্রায় হইয়া আসিতেছে। রাজপুতানার শীতের কথা পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, এখন প্রত্যক্ষ করিলাম; মনে হইতে লাগিল, এত শীতে এ দিকে না আসিলেই ভাল হইত।

যাহা হউক, তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য যথাসম্ভব শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শেষ করিয়া আমরা ৬টার সময় গাড়ীতে উঠিলাম। আমাদিগকে এখান হইতে যোধপুর বিকানীর ষ্টেট রেলওয়ের গাড়ীতে দেপালসর ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। গাড়ীগুলি সবই জরা-জীর্ণ, অবয়বও ক্ষুদ্র, ভীড় বড় একটা নাই বলিলেও চলে। এত বে-মেরামত কদাকার ও বিবর্ণ গাড়ীগুলি দেখিয়া আমাদের দেশের হাওড়া-আমতা রেলওয়ে কোম্পানীকেও ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হইল। যাউক্, সে কথা বলিয়া কোন লাভ নাই।

হিসার ছাড়িয়া মাইল দুই যাইতে না যাইতেই গাড়ী আসিয়া একেবারে মাড়োয়ারের মরুভূমিতে পড়িল। বিশাল বালুকাময় প্রান্তরের মধ্য দিয়া গাড়ী দৌড়িতে লাগিল। পূর্ব্বে পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যে দিকে চাহিয়া দেখি, কেবল বালি! কেবল বালি! গ্রাম নাই, তৃণ-গুল্ম নাই, পশু-পক্ষী নাই; আছে কেবল ছোট ছোট কাঁটাগাছ, আর মাঝে মাঝে সবুজবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে রঞ্জিত বালুকা-ধূলি-ধূসরিত কণ্টকময় গুল্মরাজি। এখানকার বালি ঈষৎ পীতাভ, মধ্যে মধ্যে নাত্যুচ্চ বালিয়াড়ি, আর তাহার উপর ঐ সবুজবর্ণের কুসুমরাজিবিরাজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকগুল্মের শ্রেণী। ৮।১০ মাইল পরে এক একটি ষ্টেশন, ষ্টেশনের ধারে একটি কূপ, কূপের গভীরতা খুব বেশী—এক শত হস্তের দড়িতেও কুলায় না—কোন কোন স্থানে দুই শত হস্ত গভীরতার কথাও শুনিলাম। কূপের উপরিভাগে চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ চবুতারার মধ্যস্থলে দুইটি করিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত স্তম্ভের উপর একখানি কড়িকাঠ; তাহাতে দোদুল্যমান বৃহৎ কপিকলের স্থূল রজ্জুতে সংলগ্ন লৌহময় পাত্রের দ্বারা ঐ সকল কূপ হইতে জল উত্তোলিত হয়। বড় বড় বলীবর্দ্দ যুগানদ্ধভাবে ঐ দড়ি টানিয়া একবার নীচের দিকে যাইতেছে, জল উপরে তুলিয়া এক জন সেই জল কূপোপরিস্থিত বৃহৎ পয়ঃপ্রণালীর মুখে ঢালিয়া দিতেছে। প্রণালী দ্বারা সেই জল নিম্নে এক চতুষ্কোণ চৌবাচ্চায় জমা হইতেছে, চৌবাচ্চাসংলগ্ন পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে আবার ঐ জল আরও নিম্নে নির্ম্মিত চৌবাচ্চায় আসিয়া পড়িতেছে। নীচের চৌবাচ্চার জল তৃষার্ত্ত গো-মহিষ ও উষ্ট্রাদির পেয়রূপে সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে; উপরের চৌবাচ্চার জল মনুষ্যগণের পেয়। এক মাইল বা দুই মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া,

উষ্ট্রের পৃষ্ঠে কলস বোঝাই করিয়া ঐ প্রকার চৌবাচ্চা হইতে গ্রামবাসিগণ জল লইয়া যায়। বাসনমাজা কার্য্য প্রায়ই বালি দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

জল কিন্তু বড়ই সুস্বাদু এবং পাচক। পেট ভরিয়া গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করার পর এক গ্লাস জল খাইলে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে আবার ক্ষুধার উদয় প্রায়শঃই অনিবার্য্য বলিলে যে বড় একটা অত্যুক্তি হয়, তাহা নহে। কলিকাতার ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত বাবুদিগের পক্ষে মাড়ওয়ারে আসিয়া এই জল সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়, এ কথা ডাক্তার না হইয়াও মুক্তকণ্ঠে বলিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয় না। এই বিশাল মরুর মধ্যেও দুই তিন মাইল অন্তর এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল;—কাঁটার উচ্চ বেড়ার মধ্যে একখানি বা দুইখানি ঘর. সে ঘর দেখিতে ঠিক আমাদের দেশের ধানের গোলার ন্যায়। ঘরে প্রবেশের জন্য একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বা ছিদ্র, কোন দিকেই বায়ুপ্রবেশের জন্য কোন প্রকার গবাক্ষ বা ছিদ্র নাই। এইরূপ ৮।১০খানি গৃহ লইয়া এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে বৃক্ষের মধ্যে আছে কেবল বাবলাগাছ। বড় বড় গ্রামে দুই একখানি পাকা বাড়ীও যে নাই, তাহা নহে। কোন কোন গ্রামের মধ্যে বালুকাপ্রচুর মাটী থাকায় ফসলের কার্য্যও কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তরী-তরকারীর মধ্যে দেখিলাম, বিলাতী কুষ্মাণ্ড পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়, কোন কোন ক্ষেতে পটোলও হইয়া থাকে। আলুর কিন্তু ঐকান্তিক অভাব, কাঁচাকলা কচিৎ দেখিতে পাওয়া গেল; লাউ, পুদিনাশাকও মন্দ পাওয়া যায় না। ফলের মধ্যে বিশালাকৃতি মধুর তরমুজের একচ্ছত্র আধিপত্য, তাহাই এখানকার প্রধান খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশুর মধ্যে গো, মহিষ, ছাগল, কুক্কুর ও শৃগাল প্রচুর পরিমাণে দেখা গেল। এই শুষ্ক মরুভূমিতে ময়ূরের ও কাকের প্রাচুর্য্য খুব বেশী,উষ্ট্রের ত কথাই নাই। গৃহস্থালীর প্রধান উপকরণ হইল—ঐ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ বিচিত্রাকৃতি জানোয়ার; যেমন ভারবহনে পটু, তেমনই দ্রুতগতি; প্রচণ্ড রৌদ্রে প্রতপ্ত বালুকাপ্রান্তরের মধ্য দিয়া ২০।২২ মাইল পথ অক্লেশে অতিক্রম করিতেছে। বাণিজ্যের—গার্হস্থ্যের ইহাই প্রধান সম্বল; বাবলার কণ্টকময় পাতাই তাহার প্রধান খাদ্য; ১৪।১৫ মণ মাল পিঠে করিয়া এক দিনের মধ্যে ২৪ মাইল পথ হাঁটিতে সে চিরাভ্যস্ত। তাহার থাকিবার জন্য কোন ঘর বাঁধিবার প্রয়োজন নাই, উন্মুক্ত বালুকাময় প্রান্তরেই দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; গ্রীষ্মে, বর্ষায় ও শীতে সে কোন আবৃত স্থানের অপেক্ষাই রাখে না. এমন উপকারী পশু না থাকিলে এই শুষ্ক মরুদেশে মানুষ কখনও বাস করিতে পারিত কি না সন্দেহ। বিধাতৃপুরুষের এইরূপ যোগ্য সমাবেশকৌশল দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া কে থাকিতে পারে?

এই ভাবের মাড়োয়ার প্রদেশের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যসম্ভার দেখিতে দেখিতে বেলা দুইটার সময় প্রচণ্ড রৌদ্রে আমরা দেপালখর নামক ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনে নামিবামাত্র দেখিলাম, আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বহু মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে ষ্টেশনের অনতিদূরে একটি নাতিবৃহৎ ধর্ম্মশালায় যাইয়া সে দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, এবং রায় বাহাদুর শেঠজীর সুপর্য্যাপ্ত আতিথ্যের ও ব্যবস্থার প্রভাবে সকল ক্লেশ নিবারিত হইল।

প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ঘৃত, আটা, সূক্ষ্ম আতপ তণ্ডুল, নানাপ্রকার ফল, কিস্‌মিস, বাদাম, পেস্তা, চিনি ও উৎকৃষ্টতর ক্ষীরের বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণেই সংগৃহীত ছিল; সেবার জন্য বহু ভৃত্য, স্নানের জন্য উষ্ণোদক প্রভৃতি কিছু অভাব ছিল না; শুধু আমাদের জন্যই যে কেবল এই সকল উদ্যোগ, তাহা নহে। দেখিলাম, শেঠজীর সাবিত্রীযজ্ঞে নিমন্ত্রিত আরও ২০।২২ জন মাড়োয়ারী পণ্ডিত সেই গাড়ীতেই আমাদের সঙ্গে দেপালখরে নামিয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই জন্য সেবার পারিপাট্য বিশেষ প্রশংসনীয়। কর্ম্মচারিগণের বিনয়নম্র ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আমরা সকলেই পথের ক্লেশ ভুলিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম।

দেপালখর হইতে আমাদের গন্তব্য নগর ফতেপুর ১৭ মাইল দূরে। বয়েল গাড়ী বা উষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন বাহন পাওয়া যায় না—উষ্ট্রের উপর চড়িয়া যাইলে ৫ঘণ্টায় পৌঁছান যায়, গোযানে যাইলে ৭ ঘণ্টার কমে কিছুতেই সম্ভবপর নহে। রাত্রিকালে কোন যানই নিরাপদ নহে, এই কারণে দেপালখরের ধর্ম্মশালাতেই সে রাত্রি বাস করা স্থির হইল।

এইবার নিশিকান্ত বাবাজীর পালা অর্থাৎ রন্ধনের

ব্যাপার। বাবাজীর এ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা বা কুশলতা অনন্যসাধারণ। এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিশুদ্ধভাবে এমন ক্ষিপ্রতার সহিত বাবাজী সুপরিপক্ক ঘৃতপ্রচুর মুগের দাল, দুই তিন প্রকার ব্যঞ্জন এবং সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করিয়া তেমন শ্রদ্ধার সহিত নীরবে গুরু-সেবা করিয়া এত পরিতোষ লাভ করিতে পারেন দেখিয়া যে কি আনন্দলাভ করিলাম, তাহা লিখিয়া কি বুঝাইব? বেলা ৫টার পূর্ব্বেই আমাদের আহার-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, তাহার পর বেলা না থাকায় বাহিরে একটু বেড়াইয়া মরুভূমির সান্ধ্য-সৌন্দর্য্য-দর্শন-পিপাসা বিবেক সাহায্যে প্রশমিত করা গেল। ধর্ম্মশালায় সায়ং-কৃত্য সমাপন করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রায় মাড়োয়ারের অমৃতোপম শর্করামিশ্রিত গোদুগ্ধ পান করিয়া 'পদ্মনাভ' স্মরণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল; সমস্ত দিনের শ্রান্তিতে শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সদ্যঃ ফলদাতা পদ্মনাভের অপার অনুগ্রহে এক ঘুমেই যামিনী যাপিত হইল। "ভট্টাচার্য্যজী উঠিয়ে রথ তৈয়ার হায়" শেঠজী প্রেরিত কর্ম্মচারীর এই প্রাভাতিক মঙ্গলগীতিতে নিদ্রাদেবী পলায়নপরা হইলেন বটে, কিন্তু শীতের প্রকোপ এত বেশী বোধ হইতে লাগিল যে, খাটিয়া ছাড়িয়া উঠা এক প্রকার কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। কি দারুণ শীত!—সেই শীতে বাহিরে যাইয়া সেই শীতল জলে শৌচাদি করিতে অঙ্গযষ্টি সত্যই অসাড় যষ্টিতে পরিণতপ্রায় হইয়া উঠিল। যথাসম্ভব শৌচাদি কার্য্য সম্পাদনান্তে সুবোধ বালকের মত কাঁপিতে কাঁপিতে কর্ম্মচারী মহাশয়ের আদেশ পালনার্থ উদ্যত হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মশালার দ্বারে রথ হাজির, নিশিকান্তের একখানি "বয়েলিয়া" আর ভৃত্যপ্রবর কেদার কাহারের জন্য একটি বৃহদাকার উষ্ট্র। সে বেচারা ত উষ্ট্র দেখিয়া ভয়ে মলিনবদন হইয়া পড়িল, জীবনে সে কখনও উটে চড়ে নাই। পড়িয়া যাইবার ভয় এবং তাহার সঙ্গে উঠিবে কিরূপে এই ভয়ও তাহাকে একান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল দেখিয়া আমি শেঠজীর কর্ম্মচারীর মুখের উপর সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিলাম। সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, "পণ্ডিতজী, 'কোই ভয় নাহি, ই জানোয়ার বড়াহী ঠাণ্ডাহৈ" এই বলিয়া সে কেদারের পিঠ চাপড়াইয়া আবার বলিল, "ক্যা পাঠ্‌ঠে! তুম্ না কাশীজীকে কাহার হো?" এই কথা শুনিয়া অগত্যা কাহার বাহাদুর কষ্টেসৃষ্টে উষ্ট্রচালকের সাহায্যে উটের উপর উঠিয়া বসিল এবং একটু সাহসের হাসিও তাহার মুখে দেখা গেল। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া রথে উঠিলাম, নিশিকান্ত বাবাজীও হাসিতে হাসিতে ঠেলিয়া যানে উঠিয়া পড়িলেন. যাত্রা বর্ণনের পূর্ব্বে রথের বর্ণন একান্ত প্রয়োজন মনে করি।

মাড়োয়ারে গোশকট দুই প্রকার;—প্রথম রথ, দ্বিতীয় ঠেলিয়া। রথ ধনী বিলাসী মাড়োয়ারীগণের সুসজ্জিত সুখ-সেব্য যান, রথের আকার বৃহৎ, বলদ দুইটিও কিরাটাকৃতি। শুনিলাম আমার জন্য যে রথখানি আসিয়াছিল, তাহার দুইটি বলদেরই মূল্য ৬ শত রৌপ্যমুদ্রা। বাহিরে কিংখাপ-বস্ত্রে মণ্ডিত, তাহার পর সোনালী জরির বিচিত্র কারুকার্য্য, ভিতরে শুভ্র মলমলে আবৃত তুলার উৎকৃষ্ট গদির বিছানা। শুধু বসিবার উপযোগী নহে. তাহার উপর একজন লোক বেশ আরামে শুইয়াও যাইতে পারে; উপরে মন্দিরাকৃতি কারুকার্য্যসমন্বিত আবরণ. তাহার উপর পতাকা সম্বলিত রৌপ্যময় ধ্বজদণ্ড, সম্মুখে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্ত্রমণ্ডিত মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চালকের বসিবার স্থান। চারিদিকে ঘুঙ্গুর ও ছোট ছোট অনেকগুলি ঘণ্টা সংলগ্ন, বলদ দুইটির গলায়ও দুইটি ঘণ্টা বাঁধা, চলিবার সময় চক্রগতি অনুসারে শুষ্ক বালুকাবলীর উত্থান ও পতনজনিত নাতিস্পষ্ট শ্রুতি-সুখদ সূক্ষ্মধ্বনির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ঐ সকল ঘুঙ্গুর ও ঘণ্টার ধ্বনিনিচয় কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া থাকে। আমার এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য হয় ত, প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর সকলেরই নিকটে অরণ্যে রুদিতবৎ প্রতীত হইবে; কিন্তু সত্যের জয় অনিবার্য্য. এই আশায় বুক বাঁধিয়া মোটর ব্রুহাম বগীগাড়ীপ্লাবিত দেশের অধিবাসী পাঠকবৃন্দের সমক্ষে এই প্রকার উক্তি করিয়া বসিলাম, যদি বাড়াবাড়ি বোধ হয়, তাঁহারা তাড়াতাড়ি নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। দ্বিতীয় ঠেলিয়াগাড়ী, ইহাও মোটামুটি রথেরই আকার-সম্পন্ন, কিন্তু ছোট—ইহার বলদদ্বয়ও চলতি-ধরণের; ইহাতে চড়িলে শুইয়া আরামে যাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতেও কিন্তু মরুভূমি পরিক্রমণ ক্লেশকর নহে। অদ্য এই পর্য্যন্ত। আগামীবারে ফতেপুর-যাত্রার বিবরণ দিবার আশায় পাঠকগণের কাছে বিদায় লইলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

বিজয়ায়

রাজন, তোমার কল্যাণ যাচি—
প্রকৃতিপুঞ্জ থাকুক সুখে,
সচিব, তুমিও কল্যাণ লভ:
জনহিতেচ্ছা জাগুক বুকে।
ক্ষত্রিয় তুমি, সেবি পরার্থ
রাখ অভিজাতকুলপ্রথা,
কর আপন্ন আর্ত্তি হরিয়া
ক্ষত্র নামের সার্থকতা।
ব্রাহ্মণ তব দৈন্যের সাথে
লভ' শমদম নিষ্ঠাজ্ঞান,
হও সমাজের গুরু ও নায়ক
নিরাপদ হোক্ তোমার ধ্যান।
সার্থকনামী হও 'সাধু', হোক্
হলুদেরই গুঁড়া সোনার রেণু,
গোষ্ঠের গোপ, গোষ্ঠী বাড়ুক
হোক পীনোধ্নী তোমার ধেনু।
কৃষক তোমার শুষ্ক ক্ষেত্রে
পুষ্কর দেব ঢালুক বারি,
নাবিক তোমার ধীর নদীবুকে
সুবাতাসে দিক নৌকা পাড়ি।
লভ হে ছাত্র সুগুরুর কৃপা,
গুরু, লভ' ধীর শিষ্য সুধী,
জ্ঞানী তব জ্ঞান হোক্ দেশময়,
ধ্যানী লভ' ঋত নেত্র মুদি'!
জড় তুমি লভ' জীবন চেতনা
মূর্খরা লভ' বোধের চোখ.
যত অশক্ত লভুক শক্তি
যত আসক্ত বিরাগী হোক্।
ক্ষুধিত লভুক অমৃত অন্ন,
অনাময় হোক্ ব্যাধিত জরা,
শরশয্যায় যে জন শায়িত
লভুক সে জন মরণ ত্বরা।
শ্রমজীবী, লভ' নিজ অধিকার,
মসীজীবী, হও স্বাধীনচেতা,
শোষকেরা ছাড়' মশকবৃত্তি,
শাসকেরা হও পালকনেতা।
দস্যুরা ধর শিবাজী ধর্ম্ম,
দৈত্যেরা হও বলির মত;
পাপীজন লভ' অনুতাপ জ্বালা,
দম্ভীরা হও বিনয়নত।
যোগিজন হোক্ অনুপদ্রুত,
গৃহীরা হউক বিগতশোক,
ভোগিজন হোক ভোগে নিস্পৃহ,
ভিক্ষুক স্বাবলম্বী হোক্।
নিস্বরা পা'ক শ্রমের উপায়
ভূস্বামী হোক্ সুযশলোভী,
কৃপণের হোক্ কৃপার উদয়
গুণী জন রোক্ সমাজশোভি'।
জানপদগণ লভুক স্বাস্থ্য
পৌরেরা হোক্ পল্লীপ্রিয়,
শিশুরা লভুক ক্রীড়াকৌতুক
বৃদ্ধ হউক বন্দনীয়।
তরুণেরা হোক্ বাহুবলে বলী,
তরুণী লভুক যোগ্য পতি,
রমণী হউক সহধর্ম্মিণী
বৎসলা মাতা সাধ্বী সতী।
বুকের শোণিতে শিল্পীরা শুভ
রচে' যাক, ধ্রুবপ্রেরণা লভি,
গায়ককণ্ঠে দরদ জাগুক
কবিরা হউক দ্বিতীয় রবি।
দেবদেবীদের ভক্ত জুটুক
ভক্ত, লভুক দেবের দয়া,—
তীর্থ হউক পাপলেশহীন
স্বর্গ হউক প্রয়াগ গয়া।
তরু হোক্ ফলে পুষ্পে আঢ্য,
মরুভূমি হোক্ শস্পবতী,
মেরুর তুষার গলুক রৌদ্রে
নদীর বাড়ুক স্রোতের গতি।
সত্যের আমি সাধক যাচি হে
সেবক বাড়ুক সুন্দরেরো,
মঙ্গল সাথে দুয়ের মিলন
আত্মা আমার যেন গো হের'।
সত্য যা কিছু ধ্রুব কল্যাণ
মাগিয়া জানাই মনের সাধ,
আপনায়ো আজি—কল্যাণ মাগি,—
'তোমা সবাকার আশীর্ব্বাদ।'

শ্রীকালিদাস রায়।

দাড়ী-মাহাত্ম্য

'রোগ-শয্যার খেয়ালে' 'ক্ষৌরকর্ম্ম ও নির্ব্বেদ'-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, দাড়ী ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান-মুসলমানের চিহ্ন ('বসুমতী', আশ্বিন-সংখ্যা ৭৬৯ পৃঃ দেখুন)। বোধ হয়, জ্বরের ঘোরে বেশ একটু বেহুঁস অবস্থায় ফস্ করিয়া এই বেফাঁস কথাটা বলিয়া বসিয়াছি। পরে ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, কথাটা ধোপে টেঁকে না, অথবা পণ্ডিতী ভাষায় বিচারসহ নহে। কেন না, হিন্দুর পরমারাধ্য স্থষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং স্বয়ম্ভুরই অর্থাৎ খোদ বিধাতা পুরুষেরই চতুর্ম্মুখ শ্মশ্রু-সমাকুল। 'পিতামহে'র বদনমণ্ডল দাড়ী না থাকিলে মানায়ও না। এখনও সেই নজিরে ঠাকুরদাদারা দাড়ী রাখেন, নাতী-নাতনীরা লম্বা দাড়ী-গোঁফ দেখিয়া কখনও ভয়ে অভিভূত, কখনও ভক্তিতে পরিপ্লুত হয়, আবার কখনও ভালবাসার আতিশয্যে উহাতে টান দিয়া পুলকিত হয়—যদিও 'নীতিবোধে'র বেঙ্গের গল্পের মত, এক পক্ষের কৌতুক অপর পক্ষের সাঙ্ঘাতিক। কোনও কোনও ছবিতে রুদ্ররূপী মহাদেবের মুখমণ্ডলেও দাড়ী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়।* মহাযোগী মহাদেবের জটাকলাপের সহিত শ্মশ্রুরাজি বেশ মিশ খায়, সন্দেহ নাই। তাহার পর, সেকালে (সত্য-যুগে) মুনি-ঋষিদিগের অযত্নসংবর্দ্ধিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু থাকিত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যাঁহারা যোগনিরত, তাঁহারা ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর পাইবেন কখন্? সুতরাং তাঁহাদিগের জটাপাকান চুল ও 'জীর্ণকূর্চ্চ' অর্থাৎ পাকা দাড়ী। অবশ্য সত্যযুগের সঠিক সংবাদ আমরা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবগত নহি, কিন্তু এ কালের যাত্রার আসরে ইহার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়,—নারদ মুনির লম্বা পাকা দাড়ী সকলেরই সুপরিচিত। ভারতচন্দ্রের প্রসাদাৎ জানিতে পারি, ঋষি-দের ক্ষৌরকর্ম্মের অবসর-অভাবে দাড়ী গজাইত শুধু তাহা নহে, তাঁহাদের কাহারও কাহারও দাড়ীর সখও বিলক্ষণ ছিল। অত্র প্রমাণং যথা,—দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে শিবকিঙ্করগণ 'ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ী গোঁফ ছিণ্ডিল।' এখন কলির প্রকোপে মুনি-ঋষিরা লোপ পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বহু হিন্দুসন্তান রোগবালাই দূর করিবার উদ্দেশ্যে 'বাবার দাড়ী' অর্থাৎ তারকেশ্বরের মানত রাখেন। সুতরাং দাড়ী হিন্দুর নিতান্ত নিজস্ব সামগ্রী, ইহা ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান-মুসলমানের চিহ্ন বলিয়া তিন ফুঁয়ে উড়াইবার বস্তু নহে। (আজকাল এক শ্রেণীর না-গৃহী না সন্ন্যাসী—না-ঘরকা না-ঘাটকা—দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা ধোপার কড়ির শ্রাশ্রয় করিবার জন্য গেরুয়া পরেন আর নাপিতকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে দাড়ী রাখেন। তাঁহাদিগের কথা এ প্রসঙ্গে ধর্ত্তব্য নহে।) যাহা হউক, দাড়ীর নিন্দা করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছি। এক্ষণে অপরাধক্ষমাপণ-স্তোত্রপাঠ ভিন্ন উপায় নাই। যে মুখে একবার 'চ্যাংমুড়ী কাণী' বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছি, সেই মুখেই 'জয় ব্রহ্মাণী' বলিয়া স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছি। জয় শ্মশ্রু-বাবার জয়!

দাড়ী পুরুষত্বব্যঞ্জক, শৌর্য্যবীর্য্যের বাহ্য বিকাশ, সিংহের কেসরের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা শেক্সপীয়ারের ২।১ খানি নাটকে) যে নারীর দাড়ীর বার্ত্তা শুনা যায়, সে কলির ধর্ম্ম, ব্যভি-চারের উদাহরণ; ঐ সকল ক্ষেত্রে সে 'মেয়ে পুরুষের বাবা' আর এই উদ্ভট ঘটনা 'অবলা প্রবলা'র দেশের; আমাদের এই নিবীর্য্য পুরুষের দেশে নারীর বড় জোর গোঁফের কথা কচিৎ শ্রুতিগোচর (নয়ন-গোচর?) হয়। যাক্, আর এ সব কুৎসার কথায় কায নাই।

সত্য কথা সরাসরিভাবে স্বীকার করাই ভাল, 'প্রাগহং যৌবনদশায়াম্' বয়োধর্ম্মবশতঃ সযত্নে দাড়ীর চাষ করিয়া-ছিলাম, যদিও অধুনা লাঙ্গুলহীন শৃগালের দশায় উপনীত হইয়া দাড়ীর নিন্দা করিয়াছি। আমাদের বংশে ইহার বড় একটা রেওয়াজ নাই; কেবল এক জন পিতৃব্যের দেখি-য়াছি, তিনি পুলিসের লোক ছিলেন, তাই বোধ হয়, আমা-দের বংশগত শিষ্ট শান্ত আকৃতিকে পুলিসোচিত পরুষত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ

* 'অন্নদামঙ্গলে' গৌরীর 'পাকাদাড়ী বুড়া বর' ঘটাইব বলিয়া নারদ শাসাইতেছেন ও নারীদিগের শিবনিন্দায় 'বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া' বলিয়া আক্ষেপ আছে।

আমার যৌবনকালের দাড়ী 'নরাণাং মাতুলক্রমঃ' নিয়মের নিদর্শন। কেন না, পরম হিন্দু, পূজনীয় মাতুল মহাশয়ের (ভাগলপুর কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ৺হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের) এককালে দাড়ী ছিল। পরে মদ্বর্ণিত নির্ব্বেদের দশায় (বসুমতী, আশ্বিন-সংখ্যা, ৭৬৯ পৃঃ) দাড়ী-গোঁফ উভয়েরই উচ্ছেদ হয়। আমিও এত কালে মাতুল মহাশয়ের ধারা বজায় রাখিয়াছি। তবে আমার দাড়ী ঠিক নির্ব্বেদের প্রভাবে যায় নাই, গিয়াছিল গ্রীষ্মকালে মুখমণ্ডলে ফোড়ার জ্বালায়। অবশ্য শত্রুপক্ষ সে সময়ে টিটকারী দিতে ছাড়েন নাই যে, টালার হাঙ্গামার দরুণ আমি দাড়ী ফেলিয়া পরিত্রাণ পাই। দাড়ী ফেলা ঠিক উহার সমকালেই ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু উহা 'কাকতালীয়'-ন্যায়ের (post hoc, ergo propter hoc) উদাহরণ বই আর কিছুই নহে। এতৎপ্রসঙ্গে এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, চেহারার জন্য দাড়ী রাখার অবস্থায় এ পক্ষ কখনও কখনও মুসলমানের দ্বারা 'মিঞা সাহেব' বলিয়া অভ্যর্থিত হইয়াছেন এবং কাবুলী মেওয়াওয়ালার উচ্ছিষ্ট গড়গড়া টানিতে সাদরে আহূত হইয়াছেন। হয় তো দাড়ী ফেলার মূলে সে লাঞ্ছনার স্মৃতিও পরোক্ষভাবে ছিল। এ সব sub-conscious selfএর কথা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব, মদ্‌বিধ ক্ষুদ্র-প্রাণ 'কেবল'-সাহিত্যিকের বোধাতীত। যাহা হউক, যখন দাড়ীর নিন্দা করিয়াছিলাম, তখন নিজের পূর্ব্বকথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সংস্কৃতবাগীশ বলিবেন,'আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি'; আর মেয়েলি ভাষায় বলিবে, 'আপনার পানে চায় না' ইত্যাদি। যাক্, নিজের বকেয়া হালের পুরাতন কাসুন্দি না ঘাটিয়া অতঃপর শ্মশ্রুধারীদিগের নামগুণানুকীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাতিদীর্ঘ দাড়ী এবঞ্চ প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বা জটিয়া বাবার দীর্ঘ দাড়ী ও নিবিড় জটা অশেষ-বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির উদ্রেক করে। শুধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কেন, আদর্শ ব্রাহ্মণ শুদ্ধসত্ত্ব গৌরকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি উন্নতদেহ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু দেখিলে প্রাচীন ঋষিদিগের কথা মনে পড়িত। ঋষি রবীন্দ্রনাথ তথা তাঁহার অগ্রজগণ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, তথা ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় পিতৃধারা বজায় রাখিয়াছেন। আবার ৺বলেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ৺রাজনারায়ণ বসুর আকৃতি-গাম্ভীর্য্যে ও দাড়ীর নিবিড়তায় সিংহসম তেজস্বিতা প্রকাশিত হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র শ্বশুরের ধারা পাইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের নহে, থিয়সফিষ্ট-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, ত্রয়োদশ বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি, সম্প্রতি পরলোকগত ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের শ্বেতশ্মশ্রুও শোভায় অতুলনীয় ছিল। ক্যানিং লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ৺যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেদজ্ঞ ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত—এতদুভয়কে সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুর জন্য বেশ মুনিগোসাইএর মত মানাইত। বেদজ্ঞানের কথা যখন উঠিল, তখন সে কালের ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী ও এ কালের ৺বহুবল্লভ শাস্ত্রী এই দুই জন বেদবিদের দাড়ীও এ ক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই ৺প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ৺দুর্গামোহন দাস—ব্রাহ্মসমাজের এই ত্রিমূর্ত্তিও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালীর সেরা ব্যারিষ্টার মিষ্টার ডব্লিউ সি বোনার্জ্জির জমকালো দাড়ী তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সর্ব্বাংশে উপযোগীই ছিল। পদপসারে সমান সমান না গেলেও দাড়ীর বহরে ও বাহারে ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুও কম যাইতেন না। দানশৌণ্ড স্যার তারকনাথ পালিতের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম-বঙ্গের বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আমাদের যৌবনকালের হীরো ম্যাটসিনি বাঁড়ুয্যে, আজকালকার মিনিষ্টার স্যার সুরেন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি না) ও পূর্ব্ববঙ্গের বাগ্মিবর ৺অম্বিকাচরণ মজুমদার—বক্তৃতাবাজ এই যুড়ীর দাড়ীর জোরে বক্তৃতার তোড় আরও বাড়িয়া যাইত। দেশসেবক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী দাড়ীধারী বক্তৃতাকারীর শেষ-মেষ। কিন্তু এখন দেশের হাওয়া ফিরিয়াছে, দাড়ী নাড়িয়া বক্তৃতা দিয়া ভারত-উদ্ধার আর চলে না, আসর আর জমে না, তাই চিত্তরঞ্জন ও বিপিনচন্দ্র মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু।

সাহিত্যের আসরে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের নবযুগের প্রবর্ত্তয়িতা মহাকবি 'মেঘনাদ-বধ'-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের দিকে; 'হেলেনা'-কাব্যের রচয়িতা

৺আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রতিভায় না হইলেও দাড়ীর দৈর্ঘ্যে 'হেক্টরবধ-কাব্যের রচয়িতার পার্শ্বে স্থান পাইবার উপযুক্ত। 'ফুলজানি'র জনক ৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদার শেষটা শ্মশ্রুহীন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বান 'লয়ে দাড়ী, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি' শ্রীশচন্দ্রের দাড়ীকে অমরত্ব দিয়াছে। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সর্ব্বকনিষ্ঠ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত ৺শিবনাথ শাস্ত্রী, ৺রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি সাহিত্যিকের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই। সাময়িক সাহিত্যের ক্ষেত্রে নব্যভারতের লেখক ৺রসিকলাল রায় এবং 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র লেখক শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় দাড়ীর কদর রাখিয়াছেন।

সম্পাদক-মহলে দাড়ীর দণ্ডকারণ্য দাঁড়াইয়াছে। 'সাধারণী'-সম্পাদক ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিরাট বপুঃ দাড়ীর দৈর্ঘ্যের দরুণ বেশ জম-জমাট ছিল। 'বঙ্গবাসী'র ৺বিহারীলাল সরকার ওরূপ 'ব্যূঢোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' না হইলেও দাড়ীর ভারে কায হাঁসিল করিয়া গিয়াছেন। 'সঞ্জীবনী'র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম 'নরাণাং শ্বশুরক্রমঃ'-হিসাবে একবার গ্রহণ করিয়াছি। 'নব্যভারতের ৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর নাম এ ক্ষেত্রে স্মর্ত্তব্য। 'প্রবাসীর' শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লম্বমান দাড়ী 'প্রবাসী'র প্রচারের পরিমাণের পরিমাপক। চারুচন্দ্রও এককালে দাড়ীধারী ছিলেন। 'সন্দেশে'র সরবরাহকার ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর স্মৃতি এই প্রসঙ্গে উজ্জীবিত হয়। 'বসুমতী'র হেমেন্দ্রপ্রসাদ, তথা বর্ষীয়ান্ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাবুকে ভুলিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে।

নিজে শিক্ষাব্যবসায়ী হইয়া শিক্ষা-বিভাগের দিকে না চাহিলে ঠিকে-ভুল হইবে। সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—দেশমাতৃকার সুসন্তান সদা সমাজহিতরত চিরকুমারব্রত উৎসাহে চিরযৌবনধারী চিরকুগ্ণ কর্ম্মযোগী জ্ঞানযোগী স্যার-উপাধি-লাঞ্ছিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য—দীর্ঘ কর্ম্মকালের পর অবসরভোগী শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র রায় বাহাদুর। তিনি যখন ভক্তিপ্রেমায় গদ্গদ হইয়া দাড়ী নাড়িয়া কীর্ত্তন-অঙ্গ ধরেন, তখন বাস্তবিকই তাঁহাকে বাবাজী বাবাজী বলিয়া ভ্রম হয়। 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'-সংগ্রহকার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুদীর্ঘ শ্মশ্রু পরমহংসদেবের ভক্ত শিষ্যেরই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডক্টর হীরালাল হালদার, প্রিন্সিপ্যাল ক্ষুদিরাম বসু—এই দার্শনিক-ত্রয়ের আনাভিপ্রসারী দাড়ীর দৈর্ঘ্য তাঁহাদিগের দার্শনিকতায় গভীরতার সমান অনুপাতে। শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন চট্টোরাজ—এই ত্রিমূর্ত্তির লম্বা দাড়ী প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংলার (wrangler) ৺আনন্দমোহন বসুর ন্যায় প্রগাঢ় গণিতজ্ঞানের সাক্ষ্যদান করে। দাদার দেখাদেখি শ্রীমান্ মুক্তিদারঞ্জনও ঐ পথের পথিক। ফলতঃ খোদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে যদিও গোঁফদাড়ী মায় মাথার আধাআধি পর্য্যন্ত কামাইতেন, তথাপি তাঁহার কলেজের আবহাওয়া দাড়ী-গজানর পক্ষে খুবই অনুকূল বলিয়া ধারণা হয়। সাক্ষী—শুধু একালের কেন, সেকালের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী (বিদ্যাসাগর-জামাতা) ও ব্যারিষ্টার মিঃ এন্ এন্ ঘোষ, উক্ত কলেজের বহুবৎসরের সেবক, পরে সেন্ট্রাল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু; এমন কি, সংস্কৃতভাষার অধ্যাপক, আমাদের ছাত্রজীবনে ৺ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ীকে ও পরে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পর্য্যন্ত ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। পক্ষান্তরে, সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্রের শ্মশ্রুর অভাব ভাইস্-প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় মায় সুদ পূরণ করিয়াছেন।

রীপণ কলেজের খোদ মালিক (?) সুরেন্দ্রনাথের দাড়ীর কথা পূর্ব্বেই প্রসঙ্গান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অমৃত বাবুর অ-মৃত অবস্থায় মুখমণ্ডল শ্মশ্রুশোভিত ছিল—কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল-পরম্পরায় ও পাট নাই, মাতব্বর প্রোফেসার-মহলেও উহার রেওয়াজ নাই। সেকালের কৃষ্ণকমল বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, 'অন্তরের কথা'র প্রচারক ক্ষেত্রবাবু, সকলেই মুণ্ডিত-মুখমণ্ডল।

দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আমাদের কলেজে শ্রদ্ধাস্পদ প্রিন্সিপ্যাল মহাশয় যে example set করিয়াছেন, তাহা সাঙ্ঘাতিক।* ইদানীং কয়েক বৎসর হইতে তিনি গোঁফ

* এই প্রবন্ধ বঙ্গবাসী কলেজ ইউনিয়নের (৪ঠা অক্টোবরের) অধিবেশনে লেখক-কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। সাধারণের নিকট নীরস বিবেচিত হইবে বলিয়া কয়েকটি নাম মুদ্রণকালে পরিত্যক্ত হইল।

পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন। 'সাবধানের বিনাশ নাই'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান লেখক তাঁহার পদাঙ্ক (স্মুরাক্ষ বলিলে উৎকট শ্লেষের মত শুনায়) অনুসরণ করিয়াছেন,—পাছে শারীরিক অপটুতার অজুহতে চাকরী যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালী ভাইস্‌দিগের মধ্যে কেহ দাড়ীধারী ছিলেন না, ইহা অনেকের পক্ষে একটা আপশোষের বিষয় ছিল (অর্থাৎ দাড়ীধারী গ্র্যাজুয়েটগণের একটা grievance ছিল)। সদাশয় লর্ড লিটন সে আপশোষ দূর করিয়াছেন। তবে মাননীয় বসুজা মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়বাহুল্যের পরিবর্ত্তে ব্যয়-সঙ্কোচে অবহিত হইবেন,তাহারই অসন্দিগ্ধ প্রমাণ—নিজের দাড়ী পর্য্যন্ত কাঁচি চালাইয়া কাটাছাঁটা, কেয়ারি করা! (আচ্ছা, স্যার আশুতোষ সরস্বতীর দাড়ী থাকিলে কিরূপ মানাইত? ওঃ হরি, আমারই যে বিসমোল্লায় গলদ। সিংহের কেসর থাকে, 'বেঙ্গল টাইগারের' কেসর থাকে না, থাকে প্রখরনখর-দশন, তাহার আঘাতে ব্রিটিশ-সিংহ পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত!)

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোজাগরী-পূর্ণিমায়

শ্যামলা প্রকৃতি-সতী আমার কমলা রাণী,
কেমন সেজেছে মাতা পরি' জ্যোৎস্না-চেলিখানি।
আজি কোজাগরী নিশি—সারা রাত জাগি সুখে
পূজিব—পূজিব মা'য় ভক্তির প্রেরণা বুকে!
দেখ্ রে মায়ের মূর্ত্তি কি উদার—কি বিরাট,
অলিকুল কুঞ্জে কুঞ্জে করিতেছে মন্ত্রপাঠ!
বিহগ বাজায় শঙ্খ, কীচক দিতেছে তালি,
ফুলবালা গাঁথে মালা, বায়ু দেয় গন্ধ ঢালি।
চঞ্চলা—কমলা ওগো কে বলে, কে বলে হায়!
জানে না সে, বোঝে না সে—কেমনে বুঝাব তায়?
মা আমার বাঁধা আছে সকলের দ্বারে দ্বারে,
চাই জ্ঞান, চাই আঁখি প্রত্যক্ষ দেখিতে তাঁরে।
'বাণী-কমলায় দ্বন্দ্ব'—শুনে বড় হয় খেদ,
প্রকৃত কবির কাছে দুই এক—নাই ভেদ!
বুঝিতে সাধনা চাই!—বড় সূক্ষ্ম—নহে যা' তা',
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী উভে—ষড়ৈশ্বর্য্যদাত্রী মাতা।
কাঞ্চন চাহিলে পরে পাবি কি সাক্ষাৎ মা'র?
চা' দেখি আনন্দ শুধু—শুদ্ধ শান্ত নির্ব্বিকার।
কি দিব চরণে মা'র? সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি কালী,
অন্তরের ষড়রিপু হ'বে আজ অর্ঘ্য ডালি।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা
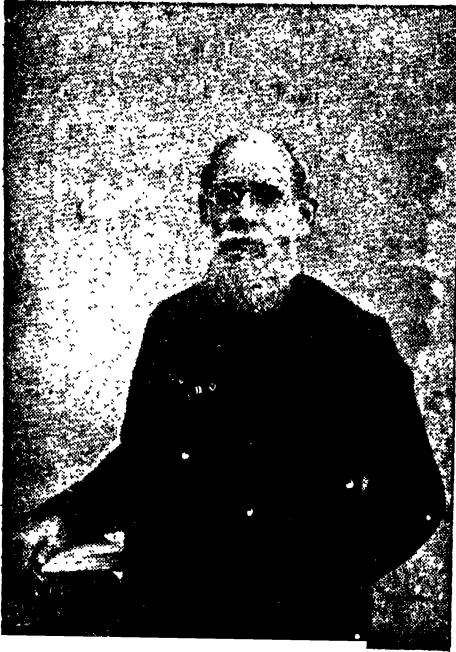
সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুকরণে এ দেশে যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহার আয়ু ৩ বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল। প্রথম ব্যবস্থাপক সভার আয়ুঃশেষ হইয়াছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে তাহার বিসর্জ্জনের বাজনা বাজাইয়া নূতন সভা গঠনের জন্য বোধনের আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যেই নূতন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইয়া যাইবে।

গতবারে নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতায় লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে মহাত্মা গন্ধীর উপদেশে স্থির হয়—ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগনীতির অন্যতম প্রধান উপকরণ বলিয়া গৃহীত হয়। তদনুসারে বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন এবং যাঁহারা শাসন-সংস্কারকে ক্রমশঃ-লভ্য স্বরাজের সোপান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি সহজে ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় এই নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্য হইতে ৩ জনকে গভর্ণর মন্ত্রী মনোনীত করেন। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র শিক্ষা বিভাগের ও নবাব নবাবআলী চৌধুরী কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মনোনীত হইয়াছিলেন।

নির্ব্বাচিত সদস্যরা সকলেই সহযোগী হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের বহু প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। সেই অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল গঠিত হয়। বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট জেনারল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশকে সে দলের নেতা বলা যাইতে পারে। এই দল আপনাদিগকে "লিবারল" আখ্যায় অভিহিত করেন এবং তাঁহাদের মিলনের ও আলোচনার ক্ষেত্ররূপে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই ক্লাব "কনষ্টিটিউশনাল" ক্লাব নামে পরিচিত।

শ্রীযুত প্রভাসচন্দ্র মিত্র।
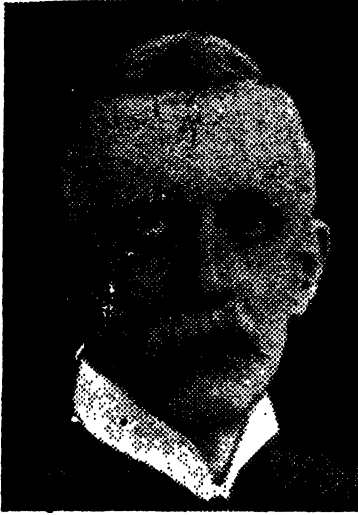
মিষ্টার কটন।

সার হেনরী হুইলার।

এই দলের সদস্যদিগের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ ইঁহারা সকল বিষয়ে না হইলেও বহু বিষয়ে সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন। সে বিষয়ে এই দলের কৈফিয়ৎ এই যে, তাঁহারা অসহযোগনীতি অবলম্বন করেন নাই; পরন্তু সহযোগী হইয়া শাসন-সংস্কারে প্রাপ্ত অধিকার—সামান্য হইলেও—ব্যবহার করিয়া ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যদ্বারা স্বরাজের পথ সুগম করিতে চাহেন। তাঁহারাও বুঝিয়াছেন, শাসন-সংস্কারে প্রবর্ত্তিত দ্বিধা-বিভক্ত শাসন-প্রণালীর দ্বারা ভাল কায হইতে পারে না; কিন্তু যখন আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ১০ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে বিলাতের পার্লামেণ্ট এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবেন না, তখন এই ১০ বৎসরকাল এই ব্যবস্থার দ্বারা জাতির যতটুকু স্বার্থসিদ্ধি করা যায়, তাহা করাই সঙ্গত; আর সঙ্গে সঙ্গে এই শাসন-প্রণালীর ত্রুটি প্রতিপন্ন করায় সুফল ফলিতে পারে।
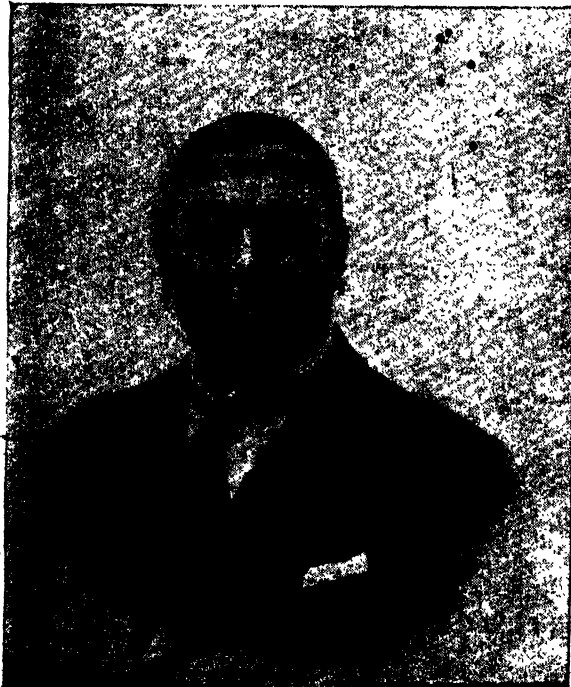
এই কনষ্টিটিউশনাল ক্লাবের দলের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রধান অভিযোগ তাঁহারা স্বীকার করেন না। পরন্তু তাঁহারা বলেন প্রতিবাদ করিয়া সংখ্যাধিক্য দ্বারা সরকারকে পরাস্ত করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহারা অন্য উপায় অবলম্বন করেন—পূর্ব্বাহ্নে সরকারের কর্ম্মচারীদিগের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনাদের মত গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহাদের দলে লোকসংখ্যা যত অধিক হইবে, এ বিষয়ে তাঁহারা তত অধিক সাফল্যলাভ করিতে পারিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা সরকারের অর্থাভাবনিবন্ধন যখন সরকার ৩খানি নূতন আইন দ্বারা নূতন কর আদায় করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহারা সে সব আইনের প্রতিবাদ করিবেন—এমন মত প্রকাশ করেন। ফলে সরকার তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং আলোচনাফলে সরকার যখন স্বীকার করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, এই সব উপায়ে সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ মন্ত্রীদিগের অধিকৃত হস্তান্তরিত বিভাগসমূহে প্রদত্ত হইবে, অর্থাৎ জাতির গঠনের কার্য্যে

শ্রীযুত সতীশরঞ্জন দাশ।

ব্যয়িত হইবে, তখন তাঁহারা সরকারের প্রস্তাবের সমর্থন করিতে সম্মত হয়েন। এইরূপে পুলিসের জন্য বরাদ্দ ব্যয় বিষয়েও তাঁহারা আপত্তি করিতে উদ্যত হইলে সরকারের পক্ষে সার হেনরী হুইলার আসিয়া তাঁহাদের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং ফলে সরকারই ব্যয় কমাইতে সম্মত হয়েন।

এই দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ—তাঁহারা মন্ত্রীদিগের সমর্থক। এ কথা তাঁহারা অস্বীকার করেন না। পরন্তু তাঁহারা বলেন, মন্ত্রীরা দেশের লোক এবং তাঁহাদেরই দলস্থ বলিয়া ব্যবস্থাপক সভার বহু মতানুসারে কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতে বাধ্য। এ অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা যদি মন্ত্রীদিগের কার্য্যের সমর্থন না করেন, তবে মন্ত্রীদিগের পক্ষে অর্থাভাবেই কায করা অসম্ভব হয়। একে ত বিচার, শাসন, পুলিস প্রভৃতি বাবদে সংরক্ষিত বিভাগের ব্যয় কুলাইয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য অধিক অর্থ পাওয়া দুষ্কর—তাহাতে আবার যদি শাসন-পরিষদের সদস্যরা বুঝেন, ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীরা সদস্যদিগের সমর্থনও পাইবেন না, তবে তাঁহারা হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য বর্ত্তমানে যে অর্থ দিতেছেন, তাহাও দিতে চাহিবেন না। এ অবস্থায় মন্ত্রীদিগের জন্য অর্থাৎ হস্তান্তরিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি আবশ্যক বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য অধিক অর্থ পাইতে হইলে মন্ত্রীদিগকে সমর্থন করা ব্যতীত উপায় নাই; মন্ত্রীরা সদস্যদিগের সমর্থন পাইবেন, জানিলে তবে ব্যুরোক্রেশী তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রার্থিত ও আবশ্যক অর্থ দিতে পারেন। যখন সংরক্ষিত বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত শাসন-পরিষদের সদস্যরা এবং হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া বাজেটের আলোচনা করিয়া রাজস্ব বাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ কাহার ভাগে কত পড়িবে, স্থির করেন, তখন মন্ত্রীদিগের ভাগের টাকা বাড়াইতে হইলে ব্যুরোক্রেশীকে বুঝাইতে হইবে, তাঁহারা আবশ্যক অর্থ না পাইলে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং বিদ্রোহী হইয়া নানারূপে সরকারের নানা প্রস্তাবের প্রতিবাদ দ্বারা অসুবিধা ঘটাইতে পারেন। এই কারণে তাঁহারা মন্ত্রীদিগের সমর্থন করেন। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মন্ত্রীরা তাঁহাদের মতানুসারেই আপনাদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন এবং তাহাতেই তাঁহাদের স্ব স্ব পদে অবস্থিতি সম্ভব।

সহযোগী লিবারল দল সহযোগের পক্ষ হইতে তাঁহাদের কার্য্যের ও কার্য্যপদ্ধতির এইরূপ সমর্থন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা সাফল্যলাভের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন।

মহাত্মা গন্ধী এই সহযোগের পথ বর্জ্জন করাই স্বরাজ লাভের উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলে ইচ্ছায় হউক্ আর অনিচ্ছায় হউক্ সহযোগ অবলম্বন করিতে হইবে—এই আশঙ্কায় ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন। যত দিন তিনি কারাবদ্ধ হয়েন নাই, তত দিন বাঙ্গালায় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, যুক্ত-প্রদেশে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, পঞ্জাবে লালা লজপত রায় প্রভৃতি তাঁহার মতই কংগ্রেসের বহুমত বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনের পর নাগপুরে শ্রীযুক্ত বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতেও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির হয়। তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশন আমেদাবাদে। সে অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতি হইবার কথা ছিল। কিন্তু অধিবেশনের অল্পকাল পূর্ব্বে তিনি কারাবদ্ধ হওয়ায় হাকিম আজমল খাঁ সভাপতি হয়েন। সে অধিবেশনেও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের প্রস্তাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

তাহার পর মহাত্মা গন্ধী কারাবদ্ধ হয়েন এবং কারামুক্ত হইয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও আর কয় জন কংগ্রেস-কর্ম্মী ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩টি অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তথায় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না এবং তাঁহারা কংগ্রেসের বহুমত অগ্রাহ্য করিয়া কংগ্রেসের নামে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য "স্বরাজ্যদল" নাম দিয়া এক দল গঠিত করেন। তাঁহাদের দলাদলিতে কংগ্রেসের গঠনকার্য্য দুর্ব্বল হয় এবং শেষে তাঁহাদেরই চেষ্টায় দিল্লীতে কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সে অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। সেই অধিবেশনে স্বরাজ্যদলের কৃত কার্য্য

সম্বন্ধে নানা কথা শুনা গিয়াছে। তাঁহারা বারাণসী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সম্মতিক্রমে বহু ছাত্রকে প্রতিনিধি করিয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের সংবাদদাতা বলিয়াছেন, তাহাদিগকে অন্য নামে চালাইবার চেষ্টাও হইয়াছিল। এই সব অনাচার যদি সত্যই হইয়া থাকে, তবে দলপতিরা সে সকল বিষয় অবগত ছিলেন কি না, বলা যায় না; কিন্তু বাঙ্গালায় স্বরাজ্য-দলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। সে যাহাই হউক, দিল্লীর অধিবেশনে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন সম্বন্ধে কংগ্রেসের পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হয় এবং সদ্য কারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলী সে পরিবর্ত্তনের সমর্থন করেন।

শ্রীযুত বিজয় রাঘবাচারিয়া।

স্বরাজ্যদল যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন; সে ব্যাপারে একটু বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য আছে। মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস-কর্ম্মীরা অনেকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, মন্ত্রী হইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। তাঁহারা লোকহিতকর প্রস্তাবে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবেন; কেবল যে সব প্রস্তাব লোকহিতকর নহে বলিয়া বিবেচনা করিবেন, সেই সব প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। স্বরাজ্যদল এক অদ্ভুত যুক্তি উপস্থাপিত করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে যেমন ভিতরেও তেমনই অসহযোগ করিবার জন্যই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবেন। তাঁহারা প্রথমে সম্পূর্ণ স্বরাজ চাহিবেন এবং সে প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হইলে ভালমন্দ বিচার না করিয়া সরকারের সব কার্যের প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু সেরূপ প্রতিবাদ করিলেও যে তাঁহারা কোনরূপ সাফল্যলাভ করিতে
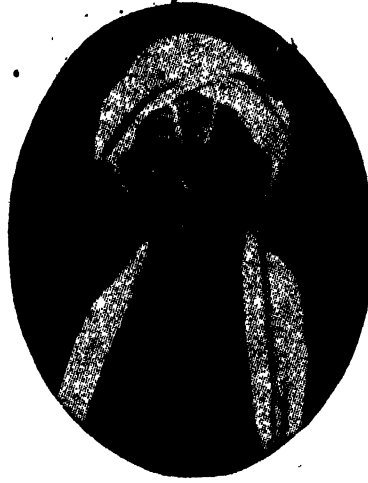
হাকিম আজমল খাঁ।

[illegible]
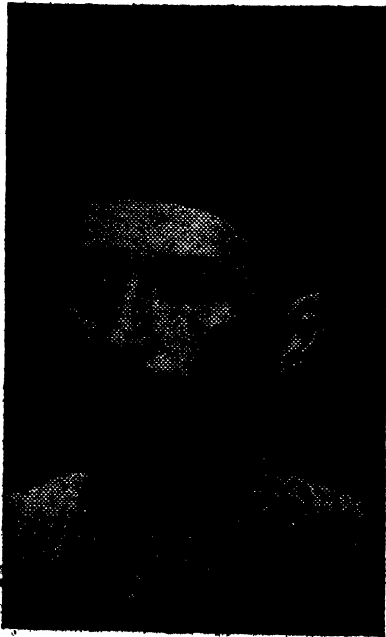
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

পারেন না—সে কথাটা তাঁহারা যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না বা বুঝিতে পারিয়াও কোন কারণে প্রকাশ করিতেছেন না।

বাস্তবিক শাসন-সংস্কার বিধিতে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক হইলেও নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে প্রতিনিধিদিগের পক্ষে একযোগে কায করা একরূপ অসম্ভব। সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাবিরোধ ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থের বিভাগ এরূপে রক্ষিত হইয়াছে যে, সকল সদস্য একযোগে কায করিতে পারিবেন না। সংস্কার আইনে স্থির করা হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৭০ পর্য্যন্ত হইতে পারিবে। কাযেই ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাধিক্য বা decided majority পাইতে হইলে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনকে একমত হইতে হইবে। ইহা কি সম্ভব? ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে যে সব নিয়ম করা হয়, তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়:—

প্রদেশ	সদস্যসংখ্যা	নির্ব্বাচিত	মনোনীত
বাঙ্গালা	১৩৯	১১৩	২৬
মাদ্রাজ	১২৭	৯৮	২৯
যুক্ত-প্রদেশ	১২৩	১০০	২৩
বোম্বাই	১১১	৮৬	২৫
বিহার ও উড়িষ্যা	১০৫	৭৮	২৭
পঞ্জাব	৯৩	৭১	২২
মধ্যপ্রদেশ	৬৮	৫৩	১৫
আসাম	৫৩	৩৯	১৪

এই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ মণ্ডলীর প্রতিনিধি থাকিবেন, অর্থাৎ য়ুরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, জমীদার, তালুকদার, সওদাগর, ভারতীয়, খৃষ্টান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হইবেন। ইঁহারা যে স্বরাজ্যদলের সহিত যোগ দিয়া সর্ব্ববিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, এমন আশা অবশ্যই করিতে পারা যায় না। আবার কোন কোন প্রদেশে এইরূপে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের সংখ্যাও প্রতিনিধিসংখ্যার অনুপাতে অল্প নহে। বাঙ্গালায় ১ শত ১৩ জন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে ২৮ জন এবং মাদ্রাজে ৯৮ জনের মধ্যে ১৯ জন এইরূপ "বিশেষ" নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত। কাযেই দেখা যায়, বাঙ্গালায় ১ শত ১৩ জনের মধ্যে ২৮ জন বাদ দিলে ৮৫ জন ও মাদ্রাজে ৯৮ জনের মধ্যে ১৯ জন বাদ দিলে ৭৯ জন প্রতিনিধি হয় ত একযোগে কায করিতে পারেন। তবেই দেখা যাইতেছে সামান্য সংখ্যাধিক্য পাইতে হইলেও বাঙ্গালায় ৭০ জনকে ও মাদ্রাজে ৬৪

মৌলানা মহম্মদ আলী।
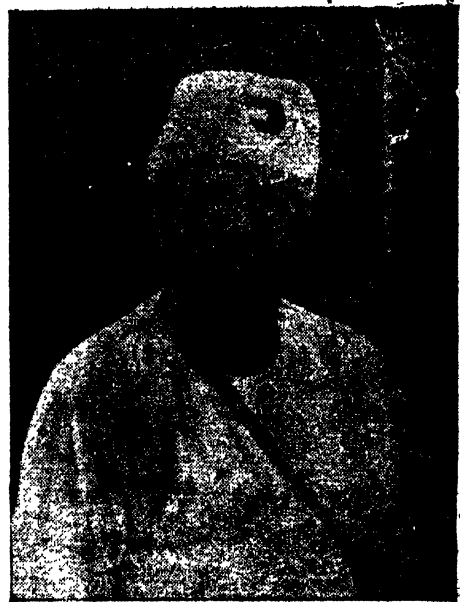
জনকে এক দলের হইয়া একযোগে কায করিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালায় ৮৫ জনের মধ্যে ৭০ জন ও মাদ্রাজে ৭৯ জনের মধ্যে ৬৪ জনকে—বা শতকরা ৮০ জনকে একযোগে কায করিতে হইবে। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে।

তাহার পর লেজিসলেটিভ এসেম্বলী তথায় মোট ১ শত ৪৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৪১ জন সরকারের মনোনীত,২০ জন বিশেষ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রতিনিধি; কাযেই ৮২ জন মাত্র সাধারণ ভাবে নির্ব্বাচিত। সংখ্যাধিক্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই ৮২ জনের মধ্যে ৭২ জনকে এক দলস্থ করিয়া একযোগে কায করাইতে হইবে। তাহা কিরূপে সম্ভব হয়?

সরকারের হাতে উপাধি হইতে চাকরী পর্য্যন্ত দিবার অনেক উপকরণই আছে; কোন নির্ব্বাচিত সদস্য যে সে সব প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইবেন না, এমন কথনই মনে করা যায় না—তদ্ভিন্ন নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত কার্য্যনিবন্ধন অনুপস্থিত থাকিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় একের পর এক প্রস্তাবে প্রতিবাদ দ্বারা ভোটের আধিক্যে সরকারের কায অচল করা বা প্রত্যেক কাযে লাটকে তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ নাকচ করিতে বাধ্য করা যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য।

লেজিসলেটিভ এসেম্বলীর উপর আছে—কাউন্সিল অব ষ্টেট। তাহাতে কোন দলের সংখ্যাধিক্য হইবে না হইবে; তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন। সওদাগর সভাগুলির প্রতিনিধিদিগকে বাদ দিলে তথায় মনোনীত সদস্যদিগের অপেক্ষা নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের সংখ্যা ৪ অধিক। গত ৩ বৎসরের কাযের আলোচনা করিলে মনে এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল হয় যে, কাউন্সিল অব ষ্টেট "শোভার্থমাত্র"—তাহার কোন প্রয়োজন গত ৩ বৎসরে প্রতিপন্ন হয় নাই।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ।

আমরা উপরে যে আলোচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যরা কখনই পদে পদে সরকারের প্রস্তাব ভোটের আধিক্যে প্রহত করিয়া সরকারকে বিব্রত করিতে পারেন না। প্রস্তর-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার আশা যেমন দুরাশা, ভোটের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভায় সরকারের কল অচল করিবার আশাও তেমনই দুরাশা।

অথচ বাঙ্গালায় স্বরাজ্য-দলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সেই অসম্ভবই সম্ভব বলিয়া ভোটারদিগকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন! সে চেষ্টা কি সফল হইবে?

দাশ মহাশয় প্রথমেই সদর্পে বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার সকল নির্ব্বাচনকেন্দ্রেই তিনি তাঁহার দলের প্রার্থী উপস্থিত করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার দলের ভোট অধিক হইবেই। কার্য্যকালে কিন্তু দেখা গিয়াছে, অনেক কেন্দ্রে তাঁহার দলের প্রার্থী উপস্থিত হয়েন নাই, কোথাও

সরিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলের প্রকৃত শক্তিপরিচয়—প্রকৃত প্রভাবের স্বরূপ পাওয়া যাইতেছে। কাযেই ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবার বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলের দলপতি সদস্য গঠন করিতেই মনোযোগী—তিনি King-maker হইবেন, কিন্তু স্বয়ং কোন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন নাই। তিনি স্বয়ং নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইয়া যদি দ্বন্দ্বে পরাভূত হইতেন, তবে সে দলের প্রভাব সহজেই বুঝা যাইত। তিনি নির্ব্বাচনপ্রার্থী না হওয়ায় প্রভাবের স্বরূপ প্রকাশে বিলম্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু সে দল যে সকল কেন্দ্রে প্রার্থীও পায়েন নাই, তাহাতেই লোক সে প্রভাব বুঝিতে পারিয়াছে।

সহযোগ ও অসহযোগ—উভয়ের মধ্যে একটা তৃতীয় পথ রচনার এই যে চেষ্টা ইহা ব্যর্থ হইবেই। মহাত্মা গন্ধী ব্যবস্থাপক সভার গঠন ও পদ্ধতি আলোচনা করিয়া দেশবাসীকে সে সভা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—অসহযোগের দ্বারা বিদেশী শাসকদিগের শাসনযন্ত্র স্তম্ভিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা অসহযোগের পথ। আর সহযোগীরা যাহা পাইয়াছেন, তাহারই ব্যবহার করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তাহা সহযোগের পথ। স্বরাজ্যদল এই উভয় পথই পরিত্যাগ করিয়া, তৃতীয় পথ রচনার ব্যর্থপ্রয়াসে অসহযোগের অঙ্গহানি করিয়াছেন, কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিয়াছেন, ব্যুরোক্রেশীকে স্বৈরাচারে নিঃশঙ্ক করিয়াছেন এবং দেশের উন্নতির গতি প্রহত করিয়াছেন। আগামী নির্ব্বাচনে দেশবাসী কি আর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে?

স্বরাজ-স্বপ্ন
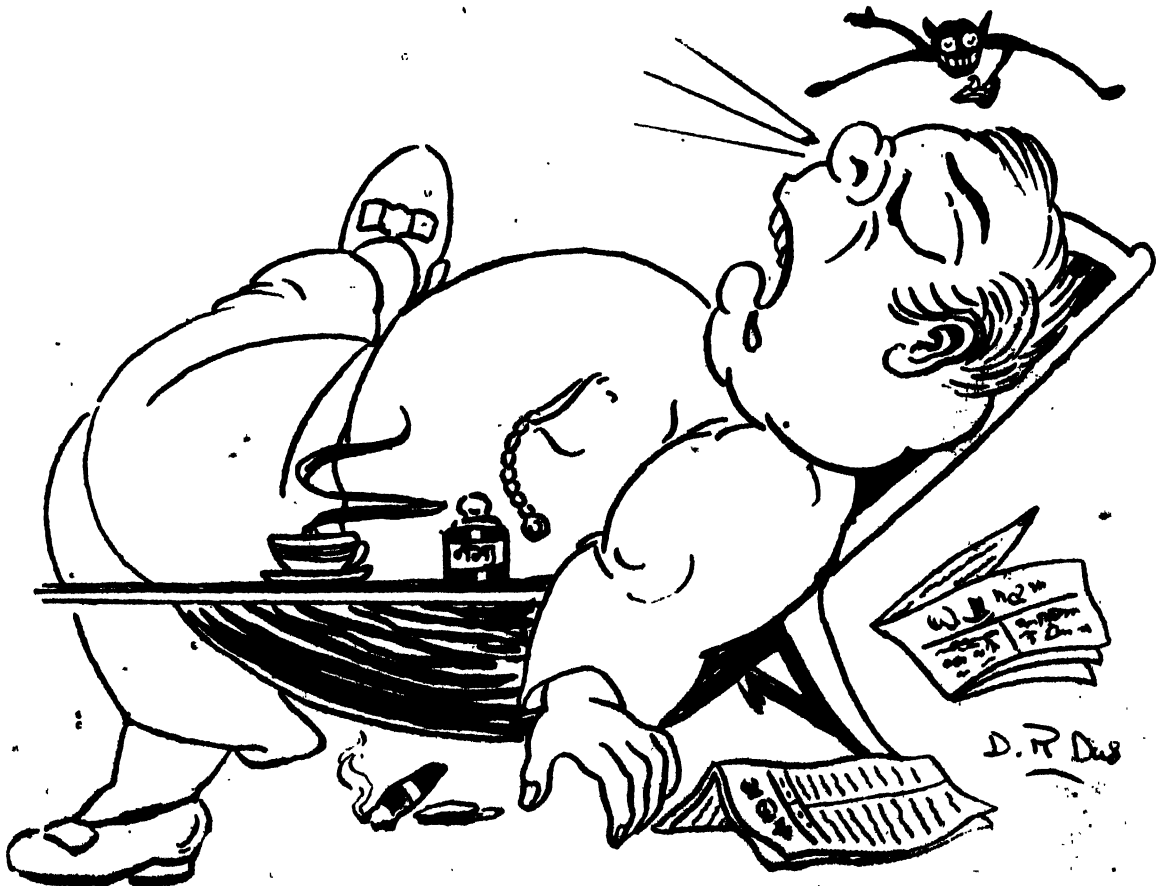
বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

চণ্ডীদাস

পরবর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন,—

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ,
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে,
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব।
রসিক মুকুট-মণি, প্রেম ধনেহি ধনী
কৃপা নিরখিল যব পাব॥
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব
যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত,
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব,
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দদাস॥

চণ্ডীদাস আমাদের ঘরের, আমাদের দেশের, আমাদের ভাষার কবি। এই কবির রচনা দেখিলে মনে কোনরূপ দ্বিধার স্থান থাকে না। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস প্রধান কবি, বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি আদি কবি। বাঙ্গালী সকল কবির তিনি গুরু, সকল সাহিত্যসেবকের তিনি বন্দনীয়। বাঙ্গালাভাষায় তাঁহাকে আদি কবি বলি, কেন না, তাঁহার পূর্ব্বের আর কোন কবির রচনা পাওয়া যায় না। জয়দেব তাঁহার পূর্ব্বের কবি, কিন্তু সংস্কৃতে ছাড়া তিনি বাঙ্গালাভাষায় কিছুই লিখিয়া যান নাই। চণ্ডীদাসের কাল পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, কিন্তু তাঁহার পদাবলীর ভাষা কিছুতেই প্রাচীন মনে হয় না। ভাবের কথা নয়; কেন না, ভাব ত নিত্য নব, কোন কালেই প্রাচীন হয় না। কিন্তু ভাষার এরূপ সম্পূর্ণ বিকাশ সহসা হওয়া অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। চণ্ডীদাসের ভাষা ও চণ্ডীদাসের পদাবলী সুরভিপূর্ণ পুষ্পিত বৃক্ষস্বরূপ, চিরশ্যাম কাণ্ড-পল্লব, চিরপ্রস্ফুটিত নিত্য পরিমলপূর্ণ কুসুমরাশি দেখিতে পাই, ভাষার মর্ম্মাভ্যন্তরনিহিত তরুর মূল দেখিতে পাই না। চন্দ্রকিরণধৌত সৌধচূড়া নয়নানন্দ উৎপাদন করে, প্রাসাদের ভিত্তি ধরণীর গর্ভে। উদ্বেলিতসলিলা তরঙ্গিণী সকলে দর্শন করে, তাহার কারণস্বরূপ শীর্ণসলিলা নির্ঝরিণীপুঞ্জ কেহ দেখিতে পায় না।

চণ্ডীদাসের ভাষা

কোন ভাষাতেই সর্ব্বপ্রথমে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হয় না। তাহার পূর্ব্বে কিছু হয়, কিছু যায়, যাহা অমর হইবার যোগ্য নয়, তাহা থাকে না। নিষাদের শরে ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয়ে করুণা ও কণ্ঠে ছন্দোময়ী বাণীর আবির্ভাব হইল, এই কল্পনা চিত্তহারিণী, কিন্তু সম্ভবপর কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। বাল্মীকির পূর্ব্বে কোন মহাকবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু কেহ যে সংস্কৃতভাষায় শ্লোক রচনা করেন নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। সেইরূপ চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে যে কেহ বাঙ্গালা গীত কিংবা কবিতা রচনা করেন নাই, এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। গানের ও কবিতার একটা পূর্ব্বচেষ্টা আছে, প্রথমে গানের সুর ধরিতে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই থামিয়া যায়, কবিতা রচনা করিতে গিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, অথবা সম্পূর্ণ হইলেও উত্তম হয় না। এই অবস্থাতে যে প্রতিভাশালী কবির অভ্যুদয় হয়, তিনি যে ভাষায় রচনা করেন, সেই ভাষার তিনি আদি কবি। কাব্যের ছন্দ, গানের সুর তাঁহার আগেও শোনা যাইত, কিন্তু তাঁহার মত গুণী কেহ হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বের সে ছন্দ, সে সুর বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে, প্রতিভার অমৃত-সিঞ্চনে চিরজীবী হইতে পারে নাই।

ভাষার সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম মত প্রকাশ করেন। অনেক রকম ভাষা আছে বলিয়াই অনেক রকম মত, কিন্তু ভাষা একটা আধার মাত্র, ভাষার সকল নিয়ম জানিয়া, অনেক গুরুদিগের উপদেশ পাইয়াও কেহ একটা

নূতন ধরণের সৃষ্টি করিতে পারে না, যেমন অলঙ্কার শাস্ত্র আগাগোড়া শিখিয়াও কেহ কবিতা কিংবা কাব্য লিখিতে পারে না। ভাষা ভাবের সহচরী অথবা কিঙ্করী। যে ভাবুক, তাহার ভাষার অভাব হয় না, ভাবের অভাবে ভাষার কিছুমাত্র বিকাশ হয় না। চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতে প্রথমেই বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এ ভাষা পাঁচশো বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা না এখনকার লেখা ? এ ভাষা যদি প্রাচীন হয়, তাহা হইলে ইহার অপেক্ষা নবীন ভাষা কোথায় ? রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ প্রসাদ গুণ, চণ্ডীদাসের রচনায় এই গুণ সর্ব্বত্র বিরাজমান। এমন সহজ সুন্দর সরল সরস ভাষা দেখিতে পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাসের কথা যেন প্রাণ হইতে নিঃসারিত হইয়া প্রাণ স্পর্শ করে। রচনার এমন কৌশল যে একেবারে কৌশলশূন্য মনে হয়।

চণ্ডীদাসের মৌলিকতা

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কল্পনায় ও ধারণায় অপর মধুর রসের কবিদিগের সঙ্গে চণ্ডীদাসের একটু স্বতন্ত্রতা আছে। রাধার হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষে তিনি প্রাচীন উপকথা ও কাব্যরচয়িতাদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। রূপকথার রাজ্যে রাজপুত্ররা লাল কুঁচ দেখিয়া কুঁচের মত কন্যা বিবাহ করিবার জন্য পাগল হন, চীনের কন্যা রাত্রিতে শয়ন করিয়া ইরাকের রাজপুত্রকে স্বপ্ন দেখেন, আবার হংসদূতের মুখে নলের কথা শুনিয়াই দময়ন্তী মুগ্ধ হইলেন, মহলে অবরুদ্ধ শাহজাদীরা কোন পুরুষের ছবি দেখিয়া তাঁহার প্রতি আশিক (১) হইতেন। চণ্ডীদাসের রাধারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। শ্যামকে দেখিবার পূর্ব্বে শ্যামের নাম শুনিয়াই তিনি আকুল হইলেন,

সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

হরিবংশে, প্রভাবতী প্রদ্যুম্নকে স্মরণ করিয়া হংসীকে বলিয়াছিলেন, আমি দেখি নাই, শ্রবণমাত্রেই কামনা করিতেছি, তথাপি আমার অঙ্গ সকল যেন দগ্ধ হইতেছে। নাম শুনিয়া সেই নাম জপিতে জপিতে রাধা অবশ হইলেন, সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমনে পাইব সই তারে। যাহার নাম শুনিয়া এমন হয়, তাহাকে স্পর্শ করিলে না জানি কি ঘটিবে !

নাম পরতাপে যার
ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় !

নামের পর আর এক শব্দ রাধার কানে প্রবেশ করিল,—

কদম্বের বন হৈতে
কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি
কি মাধুর্য্য পদাবলী,
কি জানি কেমন করে মন ॥

* * * *

শুনিয়া ললিতা কহে
অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন মুরলী ধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে
হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ ॥

তাহার পর প্রাচীন প্রথা অনুসারে চিত্র-দর্শন,—

হাম সে অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি ॥
হরি হরি ! এমন কেন বা হলো !
বিষম বড়বা অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল।
বয়সে কিশোর রূপ মনোহর
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ ॥

১। আশিক (পারসী), প্রেমে অনুরক্ত।

নিজ পরিজন সে নহে আপন
বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিতে তা পানে পশিল পরাণে
বুক বিদরিয়া মরি॥

ইহার পর অভিমান করিয়া এক দিন রাধা মাধবকে এ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন,—

যখন নাগর পিরীতি করিলা
সুখের না ছিল ওর।
সোতের সেঁওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুঞি ত অবলা অখলা হৃদয়
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া চিত্রেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখালে আনি॥

এই যে নির্ম্মল স্বচ্ছ ভাষা, তরল ছন্দ, ইহাই গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। সোতের সেঁওলা তবু অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে, কিন্তু অপর উপমা প্রায় নিতান্ত সোজাসুজি রকমের। উপমাই কম, ভাষারও বড় একটা চাকচিক্য নাই। যেখানে ভাষা একটু ঘোরালো, বর্ণনার একটু ছটা আছে, সেখানে অপর কবির প্রভাব লক্ষিত হয়। চণ্ডীদাসের মৌলিকতা অলঙ্কারশূন্যতায়। যেখানে অলঙ্কারের সমাগম, সেখানেই তাঁহার মৌলিকতার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীর আরম্ভেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মাধবের সহিত সাক্ষাৎ দর্শনের পর রাধা তাঁহার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥
সখী দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে।
ভালে সে নাগরী হয়েছে পাগলী
সকল লোকেতে বলে॥
কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনী
দোলনি গলে বনমাল।
মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তহি রসাল॥
দুইটি মোহন নয়নের বাণ
দেখিতে পরাণে হানে।
পশিয়া মরমে ঘুচায়া ধরমে
পরাণ সহিত টানে॥

এ বর্ণনা চণ্ডীদাসের উপযুক্ত, তাঁহার প্রতিভার মৌলিকতা প্রতি চরণে। "কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনী দোলনি গলে বনমাল", এই ছত্রের রেষ কানে ও স্মৃতিতে লাগিয়া থাকে। কিন্তু যখন কবি আর এক পদে শ্যামের রূপ বর্ণনা করিতে বলিতেছেন,—

বিম্ব ফল জিনি কেবা ওষ্ঠ গড়ল রে
ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড।
কম্বু জিনিয়া কেবা কণ্ঠ বনাইল রে
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।

তখন বিদ্যাপতির ছায়া সুস্পষ্টরূপে তাঁহার উপর পড়িয়াছে। বিদ্যাপতিতে আছে,—

কনক মুকুর শশি কমল জিনিয় মুখ
জিনি বিম্ব অধর পবারে।
দশন-মুকুতা পাঁতি কুন্দ করগবীজ
জিনি কম্বু কণ্ঠ অকারে॥
পিকু অমিয় জিনি বানি।

চণ্ডীদাসের বাণীতে যখন অপর কোন কবির ছায়া থাকে না, তখন তাঁহার প্রতিভা পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়—

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে।
ব্রজকুল নন্দন হরিল আমার মন
ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরুমূলে॥
গোকুল নগর মাঝে
আর কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুলখানি
যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা॥

রাধার অনুরাগ লক্ষণ দেখিয়া সখী অপর সখীকে বলিতেছে,—

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

পদাবলীর লিপিবিকৃতি

চণ্ডীদাসের ভাষা যেমন নবীন, লিপিকরের প্রসাদে শব্দের বানানও সেইরূপ নবীন হইয়া গিয়াছে। অজ্ঞাতে হউক, জ্ঞাতসারে হউক, বাঙ্গালা ভাষার এই আদি কবির প্রতি বিশেষ উপদ্রব হইয়াছে। বিদ্যাপতিও এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পান নাই। পাঠের বিকৃতি নানা কারণে ঘটিতে পারে—লিপিকরের প্রমাদ, কোন শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাহার স্থলে অন্য শব্দ প্রয়োগ, এক ভাষার শব্দের পরিবর্ত্তে অন্য ভাষার প্রতিশব্দ, এইরূপ অনেক কারণ পাওয়া যায়, কিন্তু বানান বদলান অতিবুদ্ধির পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। পুঁথি হইতে নকল করিবার সময়, মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইবার সময় পণ্ডিতপরম্পরা বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিতে থাকেন, তাহাতে প্রাচীন লিপিপ্রণালী একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, মূল গ্রন্থ অথবা মূল পদ কেমন করিয়া বানান করা হইয়াছিল, জানিবার কোন উপায় থাকে না। চণ্ডীদাসের রচনা লইয়া, তাঁহার কথা লইয়া আমরা গৌরব করি, গৌরব করা আমাদের কর্ত্তব্য, গৌরব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহার পদাবলীর অনেক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, কবির রচনার যতই প্রচার হয়, ততই আনন্দের কথা, কিন্তু এ কথা কি কেহ ভাবিয়া দেখে যে, চণ্ডীদাসের শব্দে বর্ণবিন্যাসের বিকৃতিতে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তিনি যেমন লিখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই আকারে একটিও পদ পাওয়া যায় না? যদি কথার বানান বদলাইতে পারা যায়, তাহা হইলে একটি শব্দের পরিবর্ত্তে আর একটি শব্দ বসাইয়া দিতে কতক্ষণ? এরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন হইলে কবির অবমাননা হয়, কাব্যেরও ক্ষতি হয়। চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। এখন তাঁহার পদাবলীর যেরূপ বানান দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কি সেইরূপ ছিল? বাঙ্গালা কথার বানান এখন সংস্কৃত ভাষার অনুযায়ী। এক শত বৎসর পূর্ব্বেও এরূপ বানানপদ্ধতি ছিল না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা বাঙ্গালা লিখিতে কেবল বানান ভুল করিতেন। আমরা বলি ভুল, কিন্তু যথার্থ ভুল নয়; কেন না, বাঙ্গালা কথার বানান সংস্কৃত শব্দের অনুযায়ী পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি হইয়াছে। বাঙ্গালা ও মিথিলা ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে নয়, প্রাকৃত হইতে এবং শব্দের বানানও প্রাকৃতের অনুযায়ী। এই কথা স্মরণ রাখিলে প্রাচীন বাঙ্গালা ও আধুনিক বাঙ্গালা লিপিপ্রণালীতে প্রভেদ রক্ষিত হইত ও লিপি পরিবর্ত্তনের পারম্পর্য্য সকলে জানিতে পারিত।

১৩০৫ সালের তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত হয়। পদগুলি যথার্থ চণ্ডীদাসের রচিত কি না, সে বিচার পরে হইবে, এখন শুধু লিপির উল্লেখ হইতেছে। যে পুঁথিতে এই পদগুলি পাওয়া যায়, তাহার তারিখ সন ১০০৯ সাল, অর্থাৎ ৩২০ বৎসর পূর্ব্বে লেখা। চণ্ডীদাসের মূল পদসমূহ আরও দুই শত বৎসর পূর্ব্বের লেখা। যে সকল পদ চণ্ডীদাসের বলিয়া প্রচলিত, তাহার বানান অন্যরূপ কেন? যেমন এই একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, সেই রকম মূল পদাবলীর একখানি আরও অথবা এইরূপ প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না কি? সন ১০০৯ সালের পুঁথিতে বানানের দৃষ্টান্ত এইরূপ,—

রসিকে জনম রসিকে পত্তন
রসিকে জনম হয়।
তবে সে জানিঅ সরূপের রতি
উদিঅ করন সঅ॥

এই লিপিপ্রণালীর সহিত মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর পুঁথির অনেক সাদৃশ্য আছে। থাকিবারই কথা। প্রথম, অক্ষরে। যাহাকে বঙ্গাক্ষর বলা যায়, সেই অক্ষর মিথিলায় ও বাঙ্গালাদেশে দুই স্থানেই প্রচলিত, আগে মিথিলায়, পরে বাঙ্গালায়। দ্বিতীয়তঃ, শব্দের বানান পদ্ধতিতে। সংস্কৃত হইতে মিথিলা ভাষার অথবা বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি নয়, প্রাকৃত হইতে। মাগধী প্রাকৃত হউক অথবা অপর প্রাকৃত হউক, প্রাকৃতে শব্দের বানান সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপের। মিথিলায় ও বাঙ্গালায় প্রথমে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল। সেইরূপ বানান চণ্ডীদাসের পদাবলীতে থাকা উচিত, আধুনিক বানান দিয়া পদাবলীর প্রাচীনত্ব বিনষ্ট হইয়াছে। শকুন্তলা অথবা উত্তররামচরিতের প্রাকৃত শব্দের বানান যদি কেহ বদলাইয়া সংস্কৃতের অনুযায়ী করে, তাহা হইলে কি রকম দেখায়? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর শব্দসমূহের বানান যাঁহারা বদলাইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গুরু ক্ষতি করিয়াছেন। কারণ, বানানের ক্রমবিকাশের অনুসন্ধানের পথ তাঁহারা বন্ধ করিয়াছেন। ইংরেজ কবি এডমণ্ড স্পেন্সর চণ্ডীদাসের এক শত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কাব্যে ইংরাজি শব্দের বানান এখনকার মত নয়, কিন্তু কেহ ত Faerie Qeene গ্রন্থের নামের অথবা গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাদির বানান বদলায় নাই। এই অনুযোগ অপ্রাসঙ্গিক অথবা অবান্তর কথা নয়, সাহিত্যের পরম্পরার মৌলিক কথা। যদি আমরা সাহিত্যের ও কাব্যের যথার্থ সম্মান জানিতাম, আদি কবিগুরুদিগের শ্রদ্ধাভক্তি করিতে জানিতাম, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কাব্যে ও সাহিত্যে এত বর্গীর দৌরাত্ম্য, এ রকম Vandalism হইত না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শান্তি-কণিকা

শান্ত শুভ্র জ্যোতিঃ চোখে, পরম সুন্দর,
অন্তরের হাসি,—পুণ্য,—চির বিমলতা,—
বিনয় মধুরমূর্ত্তি—আধলাজ-নতা—
অধরে আনন্দরেখা—চারুচন্দ্রকর!
প্রভাতপদ্মের প্রভা—অঙ্গে অঙ্গে খেলে,—
লতার ললিত-ভঙ্গী দেহের আন্দোলে,
সুপ্ত শুকতারা যেন হিরণ্য-হিন্দোলে!
কুমারীর মধুরিমা রাখিয়াছে জেলে
সোনার প্রদীপখানি স্মৃতির মন্দিরে,—
বিশ্বজননীর শুভ আরতির তরে!—
যত দেখ পুণ্যদীপ্তি—হাসে হৃদিপরে,
সিন্ধুবক্ষে চন্দ্রোদয় যেন ধীরে ধীরে।
শান্ত হয় জীবনের সর্ব্ব অভিযোগ।
কামমুক্ত স্নেহে এ কি অমৃতসম্ভোগ!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগতাম্বরা

চারি প্রকারের নগ্নতা দেখাশুনা গিয়াছে। শিশুতে, ষ্টেজে, কুম্ভমেলায় ও কালীমূর্ত্তিতে। এক বান্ধবী গল্প করিতেছিলেন, "জীবন্ত প্রস্তরমূর্ত্তি"র (Living statues) বিজ্ঞাপন পড়িয়া তাঁহারা লণ্ডনের এক থিয়েটরে গেলেন। ড্রপসীন উঠিলে দেখা গেল, প্রায় বিশ পঁচিশটি শ্বেতপাতরের বিবসনা মূর্ত্তি ব্যাকগ্রাউণ্ডে সাজান রহিয়াছে। তাহাদের প্রতি অঙ্গ লালিত্য ও সৌন্দর্য্য এবং পাষাণের স্থিরতা। কোন অপূর্ব্ব শিল্পীর গড়া এই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠার দিকে অবাধে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাদের নয়ন ফিরিতে চাহিল না। মিনিট কতক দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। মূর্ত্তিগুলি নড়িল। পলকের মধ্যে একটা ঘুরপাক খাইয়া ঠাম বদলাইয়া সেগুলি আবার যেমন তেমনই নিশ্চল হইয়া গেল। অতঃপর দুই এক মিনিট অন্তর এইরূপে ভঙ্গী বদলাইতে থাকিল। তখন বুঝা গেল, ইহারা প্রস্তরমূর্ত্তি নহে, কোন মানুষ-ভাস্করের কল্পনা ও নড়ুনে ক্ষোদিত ঘনীভূত সৌন্দর্য্য নহে, আদি কবি স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার হাতে গড়া রক্তমাংসের মানুষী মূর্ত্তি। তখন দ্রষ্টার মন সংস্কার ও লজ্জার আবরণে ভরিয়া গেল। আর চোখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করিল না। থিয়েটর ছাড়িয়া পলাইতে পথ পান না। বাড়ী আসিয়া—'হতচ্ছাড়ি বেহায়া, নির্লজ্জ ছুঁড়ীরা—আর মরবার পথ পেলিনে? একেবারে বিবস্ত্র উলঙ্গ হয়ে দশ হাজার লোকের সামনে ভঙ্গিমে ক'রে দাঁড়ালি? কি জাত গা! পুলিসেও বন্ধ করলে না?' এই বলিয়া তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। যে মেম তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তিনিও অপ্রস্তুতের একশেষ হইলেন। বোধ হয়, একটা কিছু জবাবদিহি করিবার ছিল, কিন্তু উত্তর যোগাইল না, মন গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিল না। এই উলঙ্গ নারীপ্রদর্শনী রাত্রির পর রাত্রি চলিতে লাগিল। পুলিস বা পার্লামেণ্ট আইনের জোরে ইহা বন্ধ করিল না। ইহাতে সমাজের নৈতিক স্বাস্থ্যের হানি হইবে, কেহ এরূপ আশঙ্কা করিল না।"

যতক্ষণ নিস্পন্দ প্রস্তরমূর্ত্তি ভাবিয়াছিলেন, ততক্ষণ দর্শনকারিণীও তাহাতে আপত্তিকর কিছু দেখেন নাই। বরঞ্চ সৌন্দর্য্যের শান্ত অনুধাবনে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন। জড়ত্বের আরোপে জড়ের অনুভূতি তাঁহার সজীব দেহে জড়তারই প্রতিঘাত (Re-action) আনিয়াছিল। কিন্তু যখনই অনুভূত হইল, তাহারাও সজীব, জড়প্রস্তর নহে, তাহারাও রক্তমাংসের ধর্ম্মযুত, তখনই তাঁহার রক্তমাংসের উপর তাহাদের ক্রিয়া (action) অনুরূপ হইল।

জড় শরীরের জড়ত্ব ভিন্ন আর ধর্ম্ম নাই; কিন্তু রক্তমাংসের শরীরের নানা ধর্ম্ম আছে,—ক্ষুৎ, পিপাসা, কাম প্রভৃতি। কোন শরীরে বা চিত্তে এই প্রকার শরীরধর্ম্ম যতক্ষণ প্রবল থাকিবে, ততক্ষণ তাহা অন্য শরীরস্থ সমান ধর্ম্মের দ্বারা ততই আহত হইবে বা আহত হওয়ার ভয় রাখিবে। জড় নগ্নমূর্ত্তির নিকট কোন ভয় নাই; তাই তাহাকে নিঃসঙ্কোচে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, নিজের চিত্তজাত প্রবাহের দ্বারা তাহাতে আঘাত করিলেও সে প্রতিঘাত করে না, তাই দুই একবার ভয়ে ও সঙ্কোচে দেখিতে দেখিতে ক্রমে নিঃসঙ্কোচ হওয়া যায়, এমন কি নিজের শরীরধর্ম্ম অতিক্রম করা যায়; নিজেও জড়বৎ হওয়া যায়। আমাদের দেশের মুক্তিপন্থীরা এই মার্গে সাধনার ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন-চরিত-লেখক আত্ম-জীবনের একটি ঘটনায় তাহা বর্ণিত করিয়াছেন।

য়ুরোপের আর্ট বা ললিতকলা অনেক স্থলে আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতিভূ। আর্টের নগ্নতা তাঁহাদের চোখে আপত্তিকর নয়, কেন না, তাহা অনুত্তেজক, শান্তভাবাত্মক। সে ভাব, যে দর্শক তাহা গ্রহণ করিতে না পারিবে, তাঁহাদের মতে সে অধিকারী নয়। চর্চ্চার ফলেই শুধু তাহাতে অধিকারিত্ব জন্মায়। ভারত-গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নর্ত্তকী-দেহভোগলোলুপ ভারতীয় দর্শকবৃন্দের জন্য মড অ্যালেনের বিবস্ত্র নর্ত্তন নিষিদ্ধ হইয়াছিল—তাঁহারা

অনধিকারী ধার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ ইংরাজ-দর্শক ও সাধারণ ভারতীয় দর্শকে, অধিকারভেদের কোন তারতম্য আছে বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। বরঞ্চ ভারতসমাজে রিপুদমনের সহিত বিবসনতার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ সচরাচর অনুভূতির বিষয়।

কুম্ভমেলায় নাগাসন্ন্যাসীর বিবস্ত্র যাত্রা ইহার এক পরিচয় ক্ষেত্র। সে বার হরিদ্বারে ভারতবর্ষের এই অদ্ভুত অধ্যাত্ম-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিলাম। এক জন দুই জনের পর, দুই জন চারজনে, তার পর, দশে বিশে নগ্ন মনুষ্য প্রবাহ বহিতে লাগিল। প্রথম দুই একটা ঝাপটায় চোখ বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, ক্রমে মন অভ্যস্ত হইয়া গেল। যেমন কুকুর, বিড়াল, বানর, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি জীবকে বস্ত্রাবৃত দেখিবার কথা নয়, না দেখার দরুণ চক্ষু লজ্জিত হয় না,—তেমনই মনুষ্যজীবকেও আজ বিবস্ত্র দেখা স্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল। ভাগবতের গল্প মনে পড়িল। অপ্সরারা শুকদেবের পিতা বৃদ্ধ ব্যাসের সম্মুখে বস্ত্র ছাড়িয়া গঙ্গাস্নান করিতে লজ্জাবোধ করিতেন, কিন্তু শুকদেবের সম্মুখে কোন সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না, কেন না, শুকদেব জীবন্মুক্ত; আর ব্যাস বহু শাস্ত্র-ধ্যায়ী হইলেও মুক্ত নহেন। তিনি শরীরধর্ম্মী; স্ত্রীপুরুষ-ভেদজ্ঞান তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। বিবস্ত্রতার ভিতর যে কামগন্ধহীন শিশুর সরলতা ও নির্ব্বিকারতা আছে, তাহা এই দশ সহস্র নগ্নসন্ন্যাসী দশ লক্ষ বস্ত্রাবৃত নর-নারীকে প্রত্যক্ষ করাইল।

তখন মনে উদয় হইল, দিগম্বরা কালীমূর্ত্তি ও তাঁহার ধ্যানের শ্লোক।

"মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং * * * বন্দে সদা কালিকাম্।"

বিগতাম্বরা কালিকামূর্ত্তি সাধকগণের ধ্যেয়া। পণ্ডিতরা "বিগতাম্বরা"র অধ্যাত্ম অর্থ করেন "মায়াতীতা।" মায়া অর্থাৎ মোহ, অর্থাৎ লজ্জা, ভয়, কাম। কামের সাধারণ অর্থ ইচ্ছা, কামনা; বিশেষার্থ বিশেষ-ইচ্ছা। কাম্যভোগের দ্বারা লব্ধ সুখমাত্রই, রসমাত্রই আনন্দশব্দ-বাচ্য। কিন্তু আনন্দের উচ্চ-নীচ স্তর আছে। শারীর আনন্দ নিম্নস্তরের আনন্দ। ঔদরিকের আনন্দ ও কামুকের আনন্দ নিকৃষ্টতম আনন্দ। যেখানে আনন্দ, সেখানেই ব্রহ্ম। বিষয়ে যে জীব আনন্দ পায়, ইন্দ্রিয়ভোগে যে জীব আনন্দ পায়, তাহার কারণ এই যে, বিষয়ে ও ইন্দ্রিয়ে আনন্দস্বরূপ আত্মা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। উপনিষদ বলিয়াছেন—কিছুরই কামনায় কিছু প্রিয় হয় না, শুধু আত্মারই কামনায় সব কিছু প্রিয় হয়, কেন না, সব কিছুর মধ্যে আত্মা প্রচ্ছন্ন আছেন। অতএব আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।

জীবের ভিতর সেই আত্মা বা ব্রহ্ম কত রকমে রহিয়াছেন? প্রথমতঃ সমস্ত স্থূলদেহে অধিদেহ হইয়া আছেন, দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্রিয়গণের শক্তির মধ্যে অধিদৈবত হইয়া রহিয়াছেন, তৃতীয়তঃ দেহের ও শক্তির সূক্ষ্মাংশে অধ্যাত্ম হইয়া আছেন। কিন্তু এই অধ্যাত্মপুরুষও ক্ষর, অনিত্য, বিনাশী, নাম ও রূপের উপাধিযুক্ত। ইহার অতিরিক্ত অক্ষর ব্রহ্ম যিনি, যাঁহার বিনাশ নাই—বিকার নাই, যিনি অজর অমর—তিনিও এই জীবদেহে আনন্দময় কোষে বিরাজিত আছেন। সুতরাং আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইলে, অন্নময় স্থূলদেহে তাঁহার অনুভব করিলে অতি সামান্যভাবে ও ক্ষণিকভাবে অনুভব করা হইবে। যে ভূমানন্দের পিপাসী হইবে, তাহাকে অধিদেহ ঈশ্বর, অধিদৈবত ঈশ্বর ও অধ্যাত্ম ঈশ্বরকেও ছাড়িতে হইবে। ইহার মধ্যে অধিদেহ যিনি, তিনি অল্পতম ও ক্ষণিকতম। মানুষ মানুষকে যখন চায়, তখন মানুষের ভিতর যে আত্মা, তাঁহাকেই চায়। তবে এই আত্মার নশ্বরতম ক্ষণিকতম আভাসে আপনাকে না বিকাইয়া তাঁহার অবিনশ্বর চিরন্তন বিকাশে কেন না লীন হইবে? ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ ব্রহ্মে বিচরণ। দেহরসেও তিনি আছেন সত্য—অধিদেহ হইয়া, কিন্তু তুচ্ছ, ক্ষণিক, বিকারিভাবে। যখন সেই দেহেরই ভিতর তিনি ব্রহ্মরসে, ভূমারসে, অধিকারিরসে বিরাজমান, তখন সেই রসেই তাঁহার ভোগ জীবের প্রকৃষ্টতম ভোগ। দেহরস-বিতৃষ্ণতা, অকামহততা ভক্তসাধকের প্রথম সাধ্য। উপনিষদে ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ বর্ণনাকালে বলা হইয়াছে :—

"বয়সে যুবা, শরীরে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, অন্তরে সাধু, অধ্যায়ক, আশিষ্ঠ, এবং এই সর্ব্ববিত্তপূর্ণা পৃথিবী তাঁহার আয়ত্ত, এমত অবস্থায় যে আনন্দ তাহা মনুষ্য-আনন্দের পরিমাণ। মনুষ্য-গন্ধর্ব্বের আনন্দ—মনুষ্য-আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। দেব-গন্ধর্ব্বের আনন্দ

মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব-আনন্দের শতগুণ, অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দ দেবগন্ধর্ব্ব-আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। আজান দেবগণের আনন্দ চিরলোকলোকী পিতৃগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। কর্ম্মদেবগণের আনন্দ এই আজান দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই! দেবগণের আনন্দ কর্ম্মদেবগণের আনন্দের শত গুণ, অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ইন্দ্রের আনন্দ এই দেবগণের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। প্রজাপতির আনন্দ বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ, অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই। ব্রহ্মের আনন্দ প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ। অকামহত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ এইরূপই।"

সুতরাং অকামহত যিনি, তাঁহার আনন্দের পরিমাণ সকলের আনন্দের সমান হইতে হইতে সকলকে ছাপাইয়া ব্রহ্মানন্দে পৌছায়। যিনি অকামহত, তিনিই মুক্ত, তিনিই প্রকৃত আনন্দময়।

যাহার শরীরে কাম নাই, তাহার শরীরে লজ্জাও নাই, যেমন শিশুর। তাই যে যত শিশু-প্রকৃতির, সে তত নগ্নতার অধিকারী। নগ্নমূর্ত্তি হয় কামনার উত্তেজক—নয় নিষেধক। যেখানে উত্তেজক, সেখানে তাহা পরিহার্য্য, যেখানে নিষেধক, সেখানে স্বীকার্য্য। নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর নগ্নতা বা কালীর নগ্নতা নিষেধাত্মক নগ্নতা। বিগতাম্বরা কালী বারংবার বলিতেছেন,—কামনাতীত হইয়া লজ্জাতীত ও দুঃখাতীত হও। কামনা-অম্বর ফেলিয়া দাও, লজ্জা পাইবে না, দুঃখ পাইবে না। কামনার অতৃপ্তিতেই যত কিছু দুঃখ, কাম্যের অপ্রাপ্তিভয়ে যত কিছু কষ্ট, কামনার নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও অশেষতা ধরা পড়ায় যত কিছু লজ্জা ও ভয়। যে নিষ্কাম, সে নির্ভয় ও বিগতলজ্জ। কেন না, লজ্জার কারণহীন। যেখানে লজ্জা নাই, সেখানে লজ্জা ঢাকিবার চাতুরী নাই, ছলনা নাই, কাপট্য নাই, কৌটিল্য নাই। তাই যে নিষ্কাম, যে নিরাশী, যে অপরিগ্রহ, সে নির্ভয়, অকুণ্ঠ, সত্য, সরল।

"এত আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুঃ, বিশোকো, অবিচিকিৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ।"

যে অপাপ, অশোক, অপিপাসী অর্থাৎ কামনাশূন্য, সেই সত্যকাম ও সত্যসংকল্প। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

এ মোহ আবরণ
খুলে দাও, দাও হে!
মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং
বন্দে সদা কালিকাম্।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

পল্লীর ললনা

কক্ষে অলিঞ্জর, পল্লীর ললনা,
কুঞ্জর-নিন্দিত মন্থর-গমনা,
মঞ্জীর শিঞ্জিনী সুন্দর চরণে,
মোর চিত-খর্পরে করে কত ছলনা।

চঞ্চল সমীরণ সঞ্চারি' বহে যায়,
অঙ্গের রঙ্গিল অঞ্চল উড়ে তায়;
মঞ্জুল ভঙ্গিতে কুলবালা চলে রে—
কর্ণের দুল-দুটি হিন্দোল দোল খায়।

ভ্রমর-বিনিন্দিত কৃষ্ণ সে অলকে
অস্থির সমীরণ কেলি করে পুলকে;
খঞ্জন-পারা আঁখি অঞ্জন-লিপ্ত,
মঞ্জু সে আঁখি-ঠার হরে প্রাণ পলকে।

ঝিল্লিকা-মুখরিত নির্জ্জন সরণী,
আনমনে ঘাটে চলে নির্ভীকা তরুণী;
অম্বরে নিঝ্ঝুম্ মন্থরে ডুবসী,
পশ্চিম দিগ্‌বধূ হিঙ্গুলবরণী।

ওগো ওগো সুন্দরী পল্লীর ললনা,
নির্জ্জন ঘাটে একা কেন যাও বল না?
চৌদিকে সন্ধ্যার অন্ধক নামে যে,—
শোনো বালা—এ সময় ঘাটে যাওয়া ভাল না।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু।

ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্য্যনারীর অবস্থা ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন :—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥

(মনু, ৫।১৫৫)

ইহার অর্থ এইরূপ :—"স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই; যিনি পতিশুশ্রূষা করেন, তিনিই স্বর্গে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েন।"

"স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ নাই," ঋগ্বেদে এরূপ কোনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং স্ত্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন, এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইরূপ বহু উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে কতিপয় মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল :—

"হে দেবগণ, যে দম্পতি একমনে অভিষব করে, সোম-শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম মিশ্রিত করে, তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়। তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না। তাহারা দেবগণকে দিব বলিয়া অপলাপ করে না; তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহৎ অন্ন দ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে। তাহারা পুত্র-বিশিষ্ট, কুমারবিশিষ্ট, স্বর্ণভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। প্রিয় যজ্ঞবিশিষ্ট এই দম্পতির স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইঁহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করেন। তাঁহারা সন্ততিলাভার্থ দেহসংযোগ করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।" (৮।৩১।৫-৯)

অপর একটি মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ :—

"হে অগ্নি, তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পতি ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা জীর্ণ হইয়া একত্র তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করি-তেছে।" (৫।৪৩।১৫)

অন্য একটি মন্ত্রেও বনিতাদিগের যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়। (১০।৪০।১০)

আর একটি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"স্তোত্রাভিলাষী দেবতাগণকে স্তব করতঃ স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে-ছেন।" (১।১৭৩।২)

ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বেদাধ্যয়নের পর সমাবর্ত্তন করিতেন। সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে বা পরে অগ্নিস্থাপন করিতে হইত। "এই অগ্নিতেই লাজহোমাদি সম্পন্ন করিতে হইত। এই অগ্নির নাম গৃহ্য অগ্নি, আবসথ্য অগ্নি বা স্মার্ত্ত অগ্নি। গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় স্মার্ত্তকর্ম্ম অর্থাৎ পাকযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এই গৃহ্য অগ্নিতেই সম্পাদিত হইত।" (১) উপনয়নে, বিবাহাদি সংস্কারে, বৃষোৎসর্গাদি ব্যাপারে, এবং বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূর্ত্তকর্ম্মে যে যজ্ঞ করিতে হয়, তাহার নাম গৃহ্যকর্ম্ম বা স্মার্ত্ত কর্ম্ম। গৃহ্যকর্ম্ম সম্পা-দনের যে সমস্ত উপদেশ আছে, সেগুলি গৃহ্যসূত্রে নিবদ্ধ। স্মার্ত্তকর্ম্ম ব্যতীত আর এক শ্রেণীর বৈদিককর্ম্ম ছিল, তাহাদের নাম শ্রৌতকর্ম্ম। অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্ব-মেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের নাম শ্রৌত যজ্ঞ। এই সমস্ত যজ্ঞসম্পাদনের উপদেশ শ্রৌতসূত্রে নিবদ্ধ আছে। যাবতীয় গৃহ্যসূত্রোক্ত কর্ম্ম গৃহ্য অগ্নিতেই নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু শ্রৌতকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতে হইত। "এই শ্রৌত অগ্নির ব্যাপার বেদপন্থীর গার্হস্থ্য জীবনে একটা বৃহৎ ব্যাপার। গার্হস্থ্যজীবনের সম্পূর্ণতা-লাভের জন্য এই শ্রৌত অগ্নির আবশ্যকতা। কিন্তু শ্রৌত অগ্নি বিবাহের পর স্থাপনীয়। যিনি অবিবাহিত, তাঁহার শ্রৌত অগ্নিস্থাপনের অধিকার নাই। বিবাহের পর গৃহস্থের নাম হইত গৃহপতি। বাড়ীর মধ্যে কোনও স্থানে অগ্নি-শালা বা অগ্ন্যাধার স্থায়িভাবে নির্ম্মিত হইত। সপত্নীক গৃহস্থ সেই অগ্ন্যাগারমধ্যে যথাবিধি শ্রৌত অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠা কর্ম্মের নাম অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয়।" (২)

---

(১) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত "যজ্ঞ-কথা" পাঠ করুন। ২০ পৃষ্ঠা।

(২) "যজ্ঞকথা" পৃঃ ২২।

গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই তিন অগ্নিই শ্রৌত অগ্নি। অগ্নিশালায় একটি চতুষ্কোণ বেদি নির্ম্মিত হইত। তাহার পশ্চিমে গার্হপত্য অগ্নি, পূর্ব্বদিকে আহবনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্নি স্থাপিত হইত। গার্হপত্যের স্থান চতুর্ভুজাকার, আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার এবং দক্ষিণাগ্নির স্থান অর্দ্ধবৃত্তাকার ছিল। গার্হপত্য অগ্নি গৃহপতির প্রতিনিধিস্বরূপ; আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দিষ্ট দ্রব্য দেওয়া হইত। অগ্ন্যাধানকর্ম্মে গৃহস্থ সপত্নীক অগ্নিশালায় উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

অগ্ন্যাধানের পর গৃহস্থকে আহিতাগ্নি বলা হইত, এবং তিনি যাবতীয় শ্রৌতকর্ম্মে, যাবতীয় দেবযজ্ঞে ও পিতৃযজ্ঞে অধিকার লাভ করিতেন। অগ্ন্যাধানের সময় গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি—এই তিন অগ্নিই প্রজ্বালিত হইত। কিন্তু গার্হপত্য অগ্নি কখনও নির্ব্বাপিত হইত না। তাহা দিবারাত্রিই প্রজ্বলিত হইতে থাকিত। গার্হপত্য অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে প্রত্যবায় ঘটিত। দেবতাগণের বা পিতৃগণের উদ্দেশে কোনও যাগ করিতে হইলে, গার্হপত্য হইতেই অগ্নি লইয়া আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি প্রজ্বালিত হইত।

আহবনীয় অগ্নিতে গৃহস্থকে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যাগ করিতে হইত। ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ইহাতে প্রভাতে একবার ও সন্ধ্যায় একবার আহুতি দিতে হইত। প্রভাতে আহুতি দিতে হইত সূর্য্যের উদ্দেশে এবং সন্ধ্যায় আহুতি দিতে হইত অগ্নির উদ্দেশে। আহবনীয়ে আহুতি দেওয়া হইলে, গার্হপত্যে এবং দক্ষিণাগ্নিতেও আহুতি দিতে হইত। গার্হপত্যে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি গৃহপতি, এবং দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। দক্ষিণাগ্নিতে প্রথম আহুতির দেবতা অগ্নি অন্নপতি, এবং দ্বিতীয় আহুতির দেবতা প্রজাপতি। পত্নীর মৃত্যুর পর অগ্নিহোত্র নষ্ট হইত। বিশ্বামিত্র ঋষি বলিয়াছেন, "জায়েদস্তম্" অর্থাৎ জায়াই গৃহ। যাঁহাকে লইয়া গৃহধর্ম্ম, তিনিই যখন গত হইলেন, তখন আর কাহার জন্য অগ্নিহোত্র? গৃহস্থ পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ না করিলে, তিনি পুত্র, পৌত্র বা দৌহিত্রকে অগ্নিহোত্র চালাইবার অনুমতি দিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে বিপত্নীকেরও অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষি-ঋণের এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণের পরিশোধ হইয়া থাকিলেও, দেবঋণ-পরিশোধের জন্য বিপত্নীকেরও পক্ষে অগ্নিহোত্র-যাগের অনুষ্ঠান আবশ্যক বিবেচিত হইত।

"আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটি ইষ্টিযাগ করিতে হইত। যাবজ্জীবন করাই বিধি, ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া করিতে হইত। অমাবস্যার ইষ্টিযাগের নাম দর্শযাগ, আর পূর্ণিমার ইষ্টিযাগের নাম পূর্ণমাস যাগ। উভয় যজ্ঞেরই বিধিবিধান প্রায় একরূপ।" (৩) এই যাগও গৃহস্থকে পত্নীর সহিত সম্পাদন করিতে হইত। গার্হপত্য অগ্নির দক্ষিণ দিকে যজমানপত্নী উপবেশন করিতেন। তিনিই গৃহের কর্ত্রী; সুতরাং গার্হপত্য অগ্নির সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে, ব্রহ্মা ছাড়া আর তিন জন ঋত্বিক্ যজমানের পত্নীর নিকট আসিয়া গার্হপত্য অগ্নিতে কয়েকটি আহুতি দিতেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর দম্পতি তাঁহাদের ভাগের হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতেন।

পত্নী যে স্বামীর সহিত একত্র যজ্ঞসম্পাদন করিতেন, তাহা দেখা গেল। অবশ্য পত্নী কোনও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না। তাহার কারণ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার যজ্ঞ-কথায়" এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"বেদমন্ত্র যথারীতি অভ্যাস করিতে হইলে আচার্য্যগৃহে গিয়া বহু বৎসর বাস করিতে হইত। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ আচার্য্য-গৃহবাসের সুবিধা বা সম্ভাবনা না থাকায় স্ত্রীজাতিকে ক্রমশঃ বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকারে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে দেখিতে পাই, নারীগণও বেদমন্ত্র প্রচার করিতেছেন, নারীগণের মধ্যেও ঋষি আছেন, ব্রহ্মবাদিনী আছেন। এমন কি, আচার্য্যগৃহে উপনীত হইয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ড আলোচনা করিতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। কিন্তু * * * বিনা উপনয়নে, অর্থাৎ বিনা আচার্য্যগৃহবাসে বেদবিদ্যালাভের সুযোগ না ঘটায় স্ত্রীলোকরা ক্রমশঃ বেদাভ্যাসে সুযোগ ও বেদের উচ্চারণে সুযোগ হারাইয়াছিলেন। বেদমন্ত্রের উচ্চারণ নিতান্ত সহজ কথা নহে। যথাযথ উচ্চারণ শিক্ষার জন্য শিক্ষা নামে একটা বেদাঙ্গ-বিদ্যারই উদ্ভব হইয়াছিল। বিশেষতঃ বেদের ভাষা

(৩) "যজ্ঞকথা" ৬৬ পৃঃ।

যখন অপ্রচলিত হইয়া পড়িল, তখন আচার্য্যের বিনা উপদেশে বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হইতে পারিত না। আবার যথোচিত উচ্চারিত না হইলে বেদমন্ত্রের ফল পাওয়া যায় না। এমন কি, উল্টা ফল হইবারও আশঙ্কা থাকে। * * * যজমানের পত্নী বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে না পারিলেও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাঁহার পূরা অধিকার ছিল। কেন না, পত্নী উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞই চলিত না; পত্নীকেও কয়েকটি অনুষ্ঠান করিতে হইত; এবং যজমান-পত্নীও যজ্ঞফলের সমান ভাগ পাইতেন।" (১৯ পৃঃ)

ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিতেন। যাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ গুরুগৃহে কিয়ৎকাল যাপনও করিতেন। এইরূপে সেই প্রাচীন কালে অনেক নারী-ঋষির আবির্ভাব হইয়াছিল। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত নারী-ঋষিগণের উল্লেখ দেখা যায়:—(১) ঘোষা, (২) সূর্য্যা, (৩) লোপামুদ্রা, (৪) বিশ্ববারা, (৫) অপালা, (৬) ইন্দ্রাণী বা শচী এবং (৭) সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিপদবাচ্যা হইয়াছিলেন। রাজকন্যা ঘোষা অশ্বিদ্বয় দেবতাদের স্তুতি করিয়া কুষ্ঠরোগমুক্তা হইয়াছিলেন। কুষ্ঠরোগে আক্রান্তা হইয়া ইনি পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় কালয়াপন করিতেছিলেন। পরে অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় রোগমুক্তা হইয়া অনেক বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে ইনি যে স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় চমৎকার। আমরা পাঠকবর্গকে ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অনেক বয়সে বিবাহ হওয়ার সময়ে ইনি সরলভাবে নারী-হৃদয়ের যে গভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও অতিশয় সুন্দর। নিম্নে কতিপয় মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"হে অশ্বিদ্বয়, হে উপদেশকারিদ্বয়, আমি রাজকন্যা ঘোষা; আমি চতুর্দ্দিকে গমন পূর্ব্বক তোমাদিগের কথাই কহি; তোমাদিগের বিষয়ই জিজ্ঞাসা করি। কি দিন, কি রাত্রি আমার নিকট তোমরা অবস্থিতি কর। * * *

"আমি ঘোষা, আমি নারী-লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্যবতী হইয়াছি। আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত বর আসিয়াছে। তোমরা বৃষ্টিবর্ষণ করাতে তাঁহার জন্য শস্যাদি উৎপন্ন হইয়াছে। নদীগণ নিম্নাভিমুখ হইয়া ইঁহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে। ইনি রোগশূন্য, ঐ সকল সুখভোগ করিবার সামর্থ্য ইঁহার জন্মিয়াছে।

"হে অশ্বিদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণরক্ষার জন্য রোদন করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিজ বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতা পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।

"হে অশ্বিদ্বয়, তাহাদের সেই সুখ আমি অবগত নহি। তোমরা সেই সুখের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণনা কর। * * হে অশ্বিদ্বয়, স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ স্বামীর গৃহে গমন করি, ইহাই আমার কামনা।

"হে অন্নসম্পন্ন, ধনসম্পন্ন অশ্বিদ্বয়, তোমরা উভয়ে আমার প্রতি সদয় হও; আমার মনের সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমরা উভয়ে কল্যাণ-বিধানকর্ত্তা, অতএব আমার রক্ষকস্বরূপ হও। আমরা যেন পতিগৃহে গমন পূর্ব্বক পতির প্রিয়পাত্র হই।

"আমি তোমাদিগকে স্তব করিয়া থাকি; অতএব তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর। হে কল্যাণকর বিধাতৃদ্বয়, আমি যে তীর্থে জলপান করি, তাহা সুবিধাযুক্ত করিয়া দাও। আমার পতিগৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় বিঘ্ন করে, তবে তাহাকে বিনাশ কর।" (১০।৪০।৫, ৯-১৩)

সূর্য্যতনয়া সূর্য্যা সোম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন:—"যখন উদ্ভিজ্জরূপী সোমকে নিষ্পীড়ন করে, তখন লোক ভাবে, তাহার সোমপান করা হইল। কিন্তু স্তোতাগণ যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহই পান করিতে পায়েন না।" (১০।৮৫।৩)

সোমরসপান যে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তাহা উদ্ধৃত মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। সূর্য্যা বিবাহমন্ত্রসমূহের প্রচার দ্বারাও জগতে যশস্বিনী হইয়াছেন। আজিও আর্য্য-সমাজে বিবাহের সময় সেই মন্ত্রসমূহ উচ্চারিত হইয়া থাকে।

অগস্ত্যপত্নী মহাভাগা লোপামুদ্রা বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত তপস্যা করিয়া এবং তাঁহার কোনও প্রকার তপোবিঘ্ন সমুৎপাদন না করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে বলিতেছেন:— "বহু সংবৎসর অবধি আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক

উষাতে তোমার সেবা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য্য নাশ করিতেছে। * * যে সকল পুরাতন সত্যপালক ঋষি দেবতাগণের সহিত সত্য কথা বলিতেন, তাঁহারাও প্রণয়সুখসম্ভোগ করিয়াছেন; অন্ত পান নাই।" (১।১৭৯।১৩২) তাৎপর্য্য এই যে, উগ্রতপা অগস্ত্য সংসারধর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। লোপামুদ্রাও তাঁহার সেবা করিতে করিতে বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। সেই কারণে সংসারধর্ম্মপালনাকাঙ্ক্ষিণী লোপামুদ্রা স্বামীকে সংসারধর্ম্মপালনের জন্য অনুরোধ করিলেন।

পত্নীর অনুরোধ বা অনুযোগের প্রত্যুত্তরে অগস্ত্য বলিলেন;—"আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু, দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারিব।

"যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এই কারণেই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, আমার প্রণয়ের উদ্রেক হইয়াছে। লোপামুদ্রা সমর্থ পতিতে সঙ্গত হউন, অধীরা যোষিৎ ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।" (১।১৭৯।৩৩৪)

মূলে আছে "ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্।" 'অধীরা' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা লোপমুদ্রার ধৈর্য্য সম্বন্ধে যেন কিছু কটাক্ষ করা হইয়াছে। কিন্তু যে মহিলা প্রৌঢ়বয়স পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তপস্যামগ্ন স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে পারেন, এবং মাতৃত্বলাভের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে বলিয়াই স্বামীকে "পুরাতন সত্যপালক ঋষিগণের" ন্যায় সংসারধর্ম্মপালনের জন্য অনুরোধ করেন, তাঁহার ধৈর্য্য, সেই প্রাচীন যুগেই হউক, আর বর্ত্তমান যুগেই হউক, জগতে অত্যদ্ভুত ও একান্ত বিস্ময়জনক। পুত্রোৎপাদন না করিলে পিতৃঋণের পরিশোধ হয় না, এই বিশ্বাস প্রাচীনকালের নরনারীর মনে সুদৃঢ় ছিল। সুতরাং লোপামুদ্রা আজীবন ব্রহ্মচর্য্যপালনের পর প্রৌঢ়বয়সে তাঁহার সাহচর্য্যে স্বামীকে এই ঋণপরিশোধের জন্য অনুরোধ করিয়া নিশ্চয় "অধীরা" নামের যোগ্যা হন নাই, অথবা অধৈর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন নাই। লোপামুদ্রার এই অদ্ভুত সংযম ও পাতিব্রত্য জগতে অতুলনীয়। ইনি আর্য্যমহিলাগণের শিরোমণি ও উচ্চ আদর্শস্থানীয়া।

অগস্ত্যের শিষ্য এই ঋষিদম্পতির আলাপ শ্রবণ করিয়া শেষে বলিয়া গিয়াছেন:—

"সেই উগ্র ঋষি অগস্ত্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া, বহু পুত্র ও বল কামনা করিয়া, প্রণয়সুখসম্ভোগ এবং জপতপঃসাধন, এই উভয়ধর্ম্মই পোষণ করিয়াছিলেন; এবং দেবগণের নিত্য আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।" (১।১৭৯।৬)

গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ না করিয়া জীবনে ব্রহ্মসাধন করাই প্রাচীনকালে আর্য্যগণের জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের বংশধরগণ সংসার ও ধর্ম্ম—এই দুইটির মধ্যে কি বিরোধই না ঘটাইয়াছেন!

অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা আর এক জন প্রসিদ্ধ নারী-ঋষি ছিলেন। ইনি যে কেবল মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অগ্নির স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকেরও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। একটি মন্ত্র এইরূপ:—

"অগ্নি প্রজ্বালিত হইয়া আকাশে দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন এবং উষার সম্মুখে বিস্তৃতভাবে প্রদীপ্ত হইতেছেন। বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছেন।" (৫।২৮।১)

সমাজে যাহাতে দাম্পত্য-সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়, তজ্জন্যও বিশ্ববারা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (৫।২৮।৩)

যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মে, সমাজসংগঠনে বা সমাজ-সংস্কারে প্রাচীনকালে আর্য্যরমণীর কোনও অধিকার ছিল না, তাঁহারা বিশ্ববারার এই বৃত্তান্ত পাঠ করুন। সূর্য্যা, লোপামুদ্রা ও বিশ্ববারার ন্যায় মহিলাগণই প্রাচীনকালে গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও গার্হস্থ্য জীবনকে পবিত্র করিয়া সমুন্নত করিয়াছিলেন। বিশ্ববারা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত তাঁহার "ঋগ্বেদ" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য:—

বিশ্ববারা বলিতেছেন:—"সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙ্ষসমুর্বিয়া বিভাতি। এতি প্রাচী বিশ্ববারা

নমোভির্দেবা ইলানা হবিষা ঘৃতাচী। (৫।২৮।১) 'অগ্নি সম্যক্‌রূপে প্রজ্বলিত; তাহার তেজ আকাশের দিকে বিস্তৃত হইতেছে; উষার অভিমুখে সেই তেজ বিশেষরূপে দীপ্তি পাইতেছে। বিশ্ববারাও স্তোত্র দ্বারা দেবগণের স্তব করিতে করিতে হবির্যুক্ত স্রুক্ (ঘৃতপ্রক্ষেপার্থ হাতা বা চামচ) লইয়া পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে।' অগ্নেশর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নানি উত্তমানি সন্তু। সংজ্যাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ। (৫।২৮।৩) 'হে অগ্নে, শত্রু দমন কর, যেন মহাসৌভাগ্য লাভ হয়, তোমার উৎকৃষ্টতম তেজ প্রকাশিত হউক। আর হে অগ্নে, দাম্পত্যসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।' এ স্থলে আমরা দেখিতেছি, বিশ্ববারা নারী, অথচ মন্ত্ররচয়িতা বা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তিনি স্বয়ং অগ্নিকে যজ্ঞে আহ্বান করিতেছেন, অতএব তিনি হোতা। তিনি স্বয়ং 'নমঃ' বা স্তব উচ্চারণ করিতেছেন, অতএব তিনি উদ্গাতা। 'হবিষা ঘৃতাচী'—তিনি ঘৃতপ্রক্ষেপক স্রুকে করিয়া হবিঃ বা হোমদ্রব্য লইয়া অগ্নিতে হোম করিতে যাইতেছেন, অতএব তিনি অধ্বর্য্য। আবার বিশ্ববারার উপরে যজ্ঞের তত্ত্বাবধায়করূপে এ স্থলে অন্য কেহ নাই, অতএব বিশ্ববারা স্বয়ংই তাঁহার কৃত এই যজ্ঞের ব্রহ্মা। পাঠক এ স্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান।"

("ঋগ্বেদ" ১৩ পৃঃ)

অত্রিকন্যা অপালাও ঋষি হইয়াছিলেন। অপালা ত্বক্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মস্তক কেশশূন্য ও ক্ষেত্র শস্যশূন্য হইয়াছিল। অপালা ইন্দ্রের স্তব করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রের কৃপায় তাঁহার পিতার মস্তকে কেশোদ্গম হইয়াছিল এবং তাঁহার ক্ষেত্রসমূহ শস্যশালীও হইয়াছিল। (৮।৯১সূক্ত)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সপত্নী-পীড়ন মন্ত্রের রচনা দ্বারা ইন্দ্রাণী বহুবিবাহপ্রথার বিষময় ফলসমূহ জগৎ-সমক্ষে প্রচারিত করিয়া নারীহৃদয়ের গভীর ব্যথা প্রকটিত করিয়াছিলেন। আবার শচী নাম্নীও এক নারী-ঋষির উল্লেখ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (১০।১৫৯ সূক্ত) ইনি ইন্দ্রের পত্নী শচী ছিলেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু ইনিও ইঁহার সপত্নীগণের উপর বিজয়-ঘোষণা করিয়াছেন।

সার্পরাজ্ঞী নাম্নী এক স্ত্রীঋষি সূর্য্যের স্তব করিয়া সূর্য্যাত্মার কথা প্রচারিত করিয়াছিলেন। সূর্য্যের দেহ-দীপ্তি তাঁহার প্রাণ হইতেই নির্গত হইতেছে, ইহাই তাঁহার প্রধান উক্তি। (১০।১৮৯ সূক্ত)

বৃহস্পতির পত্নী জুহু আর এক জন নারী-ঋষি ছিলেন। কি কারণে ঠিক বুঝা যায় না, বৃহস্পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিত্যক্ত অবস্থাতেও তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ও চরিত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। "যে সপ্তঋষি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এবং প্রাচীন দেবতারা এই পত্নীর বিষয়ে কহিয়াছেন,—ইনি অতি শুদ্ধচরিত্রা; স্তোতাকে বিবাহ করিয়াছেন। তপস্যা ও সচ্চরিত্রতাপ্রভাবে নিকৃষ্ট পদার্থও পরম ধামে স্থাপিত হইতে পারে।" (১০।১০৯।৪)

প্রাচীন আর্য্যভূমি সংযত স্বাধীনতার বিহার-স্থল না হইলে এবং আর্য্য-সমাজ উন্নত, উদার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপোষক না হইলে, সেই সুদূর অতীত যুগে (যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ তামিস্র অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল) কদাপি পূর্ব্বোক্ত মহাভাগা মহিলাগণের অভ্যুদয় হইত না। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে পুরুষের ন্যায় নারীরও যজ্ঞসম্পাদনে সমান অধিকার ছিল। পরবর্ত্তী যুগে, নানা কারণে সেই অধিকার সঙ্কুচিত হইলে, "নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞঃ" এই উক্তির অবসর হইয়াছিল।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ যে কেবল গৃহকর্ম্ম, ধর্ম্মচর্চ্চা ও যজ্ঞসাধনেই নিরত থাকিতেন, তাহা নহে। তাঁহারা অতীব সাহসিকাও ছিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে অস্ত্র গ্রহণ করিয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধও করিতেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তে মুদ্গলঋষির ইন্দ্রসেনা নাম্নী পত্নীর বীরত্বগাথা এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"মুদ্গলের পত্নী যখন রথারূঢ়া হইয়া সহস্রজয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গলপত্নী রথী হইলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সেই মুদ্গলানী যুদ্ধের সময় গাভীগণকে শত্রুসৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।"

"শত্রুহিংসার জন্য (রথে) বৃষ যোজিত হইল, ইহার কেশধারিণী সারথি অর্থাৎ মুদ্গলানী শব্দ করিতে লাগিলেন। রথে যোজিত সেই বৃষকে ধরিয়া রাখা গেল না, সে শকট লইয়া ধাবমান হইল, সৈন্যগণ নির্গত হইয়া মুদ্গলানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।"

"সেই বিদ্বান্ মুদ্গল রথের চক্রের পরিধি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কৌশল সহকারে রথে বৃষকে যোজনা করিলেন। সেই গাভীগণের পতি অর্থাৎ বৃষকে ইন্দ্র রক্ষা করিলেন। সেই বৃষ দ্রুতবেগে পথে চলিল।"

"প্রতোদধারী ও কপর্দ্দী (মুদ্গল) চর্ম্মরজ্জু দ্বারা কাষ্ঠ বাঁধিতে বাঁধিতে সুচারুরূপে বিচরণ করিলেন। বিস্তর লোকের ধন উদ্ধার করিলেন। বহুসংখ্যক গাভী স্পর্শ করিয়া ধরিয়া আনিলেন।"

"দেখ, যুদ্ধ-সীমার মধ্যে এই যে মুদ্গর পতিত আছে, ইহা সেই বৃষের সহকারিতা করিয়াছিল। ইহা দ্বারা মুদ্গল শত্রুসৈন্যমধ্যে শত সহস্র গাভী জয় করিয়াছিলেন।"

মুদ্গলানী বিধবার ন্যায় নিজে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পতির ধন গ্রহণ করিলেন, তিনি যেন মেঘের ন্যায় বাণবর্ষণ করিলেন। ঈদৃশ সারথি দ্বারা আমরা যেন জয়শ্রী লাভ করি। আমাদিগেরও যেন অন্ন প্রভৃতি লাভ হয়।"

(১০।১০২।২, ৬-৯, ১১)

রমণীগণ বাল্যকালে রথচালনা ও বাণবর্ষণ শিক্ষা না করিলে কদাপি যৌবনে বা প্রৌঢ় বয়সে সহসা এই কার্য্যসমূহে দক্ষতা দেখাইতে পারিতেন না। রমণীগণ যে যুদ্ধে গমন করিতেন, তাহারও প্রমাণ আছে। রাজা খেলের স্ত্রী বিস্পলা স্বামীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময়ে তাঁহার একটি পা ছিন্ন হইয়াছিল। কথিত আছে, অশ্বিদ্বয় রাত্রির মধ্যে তাঁহাকে একটি লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে চলনক্ষম করিয়াছিলেন। (১।১১৬।১৫)

কিন্তু স্ত্রীগণের সহিত যুদ্ধ করা পৌরুষের পরিচায়ক ছিল না। একটি মন্ত্রে ইন্দ্র বলিয়াছেন :—

"যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে পুরুষকে যুদ্ধ করিতে পাঠায়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার ধন অপহরণ করিয়া ভক্তদিগকে ভাগ করিয়া দিই।" (১০।২৭।১০)

সম্ভবতঃ সেই প্রাচীনকালে স্ত্রী-সৈন্য এবং স্ত্রীবাহিনীও ছিল।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

দুর্দ্দিনের বন্ধু

১

বন্দনা আজ করবো আমি
দুখের দিনের বন্ধুগণে,
কদর তাদের বুঝবে না কেউ
যাও সরে যাও অন্যজনে।
এ উৎসবে স্তিমিত বাতি
অন্ধকারে আশার ভাতি
বৃষ্টি শেষের জ্যোৎস্না ওই
উঠছে ফুটি সঙ্গোপনে।

২

নাই আয়োজন বাদ্য-গীতের
ভাবছ কিসের আনন্দ বা,
এ আমাদের বুকের মিলন
এ আমাদের মূকের সভা।
এ আমাদের হাঁটার কথা,
এ আমাদের কাঁটার ব্যথা,
সান্ত্বনা আর দয়ার মিলন
কৃতজ্ঞতার নিমন্ত্রণে।

৩

দুখের সাগর মন্থনে হায়
এ সব পীযূষ-বুদ্বুদেরা,
ঐরাবতের অধিক দামী
কৌস্তুভ এবং চাঁদের সেরা।
প্রাণের এ সব গুহক মিতা,
দেয় ভুলায়ে সোনার সীতা,
পঞ্চবটীর স্নিগ্ধ ছায়া
অযোধ্যার রাজসিংহাসনে।

৪

আজকে আমি পরবো ফিরে
সেই সে-দিনের বল্কল-সাজ,
বন্ধুগণের সান্ধ্য-মিলন
অশ্রু-সরের চাঁদনীতে আজ।
পিছল পথের সঙ্গী সবে
যোগ দিয়েছে এ উৎসবে,
হাসির গলা জড়িয়ে ধরে
কান্না ঘোরে চোখের কোণে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গরীবের মেয়ে
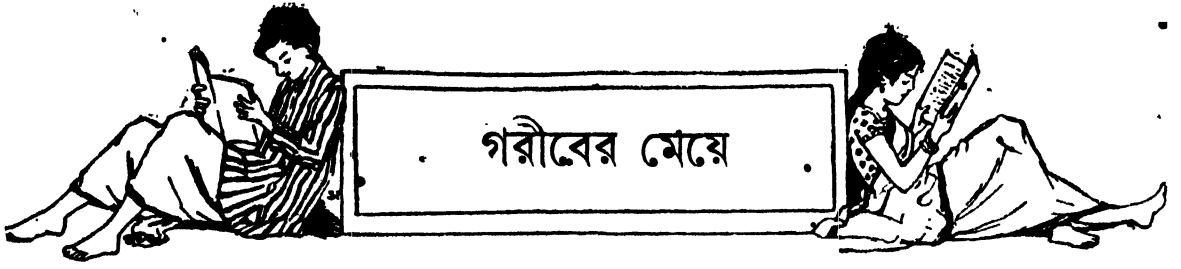
একাদশ পরিচ্ছেদ

তরুলতা শ্বশুরবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের কাছে আদরে আপ্যায়িত হইল; কিন্তু যে ভাইটিকে সে বোধ করি সকলের অপেক্ষা ভালবাসিয়াছিল, আজ শুধু তাহার নিকট হইতেই তাহার কোন স্বাগতসম্ভাষণ আসিল না। বিস্মিত হইয়া সুশীলের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বিনতা ঠোঁট ফুলাইয়া জবাব দিল, "তুমি চ'লে গিয়ে পর্য্যন্ত দাদা না কি কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে আসে! কারু সঙ্গে নাকি কথাই কয়! ছেলে ত দিন-রাত্তির অন্ধকার মুখ ক'রে বাইরের একটা ঘরে শুয়েই আছে। কেউ ডাকতে গেলে জবাবও দেয় না।"

তরু এই সংবাদে শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, "তার অসুখ করেনি ত? বাবা কি বলেন?"

বিনতা তাহার ফিতাবাঁধা বেণী দুলাইয়া জবাব দিল,—"বাবা কি বলবেন,—বাবা কি কাউকে কিছু কোন দিন বলেন? ঠাকুমা ব্যস্ত হচ্ছিলেন, তাই বল্লেন, 'ওর শরীরটা কিছু অসুস্থ আছে আর তার চেয়েও তরুর জন্য মনটাই বোধ করি বেশী খারাপ, থাক, একটু রেষ্ট নিক্।' তাই ছেলে শুয়ে শুয়ে 'রেষ্ট' নিচ্ছেন একেবারে, নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু।"

সে দিন যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া অকস্মাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, সুশীলের এত-দিনকার সংযত ও সুভদ্র জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত সেটার এতই অনৈক্য যে, সেই কাণ্ডটাতেই বোধ করি, তাহাকে একেবারে পাড়িয়া ফেলিত, যদি শুভেন্দু তাহার স্কন্ধে ভর করিয়া তখনও তাহাকে পরিচালিত না করিত। বিপ্রদাস বাবুর বাগানের বাহিরে আসিয়া শুভেন্দু বুঝিতে পারিল, সুশীল নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। শুভেন্দু তৎ-ক্ষণাৎ খুব কাছে আসিয়া সুশীলের যে হাতটা কাছে পাইল, জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে ডাকিল, "সুশীল!"

সুশীল কথায় ইহার জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের অপর হাতখানা দিয়া কোঁচার কাপড় তুলিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল. শুভেন্দু কণ্ঠস্বরে তিরস্কার ভরিয়া তাহা সুশীলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিয়া উঠিল, "তুমি কচি ছেলের মতন কাঁদছো, সুশীল? তোমার বয়স চারবছর না চৌদ্দ বছর?"

এ প্রশ্নেরও সুশীল কোন উত্তর করিল না বটে, কিন্তু এই অবমাননাজনক প্রশ্নে তাহার অবসাদগ্রস্ত শিথিল শরীরে যে একটা উত্তেজনার মাদকতা তাহার শরীরের রক্তকে উষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তাহার ধৃত হস্তের অকস্মাৎ কঠিন হইয়া যাওয়াতেই শুভেন্দু বুঝিতে পারিয়া-ছিল। তদ্ভিন্ন এই ছেলেটির চরিত্র-লিখা তাহার নিকট একান্তই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিছুদূর দুই জনেই নীরবে পাশাপাশি চলিয়া আসিবার পর শুভেন্দু পুনরপি আকস্মিক প্রশ্ন করিয়া বসিল, "এখন কি বাড়ী যাচ্ছো?"

সুশীল এই প্রশ্নে যেন একটুখানি হতবুদ্ধি হইয়া গেল, এই ভরাসন্ধ্যায় এবং এইমাত্র তাহাকে লইয়া যে ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, তাহারও পরে তাহার মত চৌদ্দ বছরের ছেলেতে বাড়ী না গিয়া যে আর কোথায় যাইতে পারে, তেমন কথা তাহার মনের কোণেও কখন উঁকি দিয়া যায় নাই, তাই সে বিস্মিত ও বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "না হ'লে আর কোথায় যাব?"

শুভেন্দু এই প্রতিপ্রশ্ন শুনিয়াই বাঘের মতন গর্জ্জিয়া উঠিল, "কোথায় যাবে? কুকুরের মতন চাবুক খেয়ে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়ে এখন বলছো, 'না হ'লে আর কোথায় যাব!' পিঠে ওই চাবুকের জ্বালা নিয়ে ভাত খেতে—ঘুমুতে পারবে? গলায় সে ভাত বাধবে না? চোখে ঘুম আসবে?"

সুশীল আবার নীরব রহিল, কিন্তু অক্ষমতার অসহায় কোপে তাহার সর্ব্বশরীরে যে টান ধরিয়াছে, তাহা পরিষ্কার বুঝা গেল। শুভেন্দু উহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া

দাঁড়াইল, "আমি তোমাদের মতন ভাল ছেলে নই, সুশীল! আমার ওই অবিচারের চাবুকের জ্বালা বড়লোকের বাড়ীর পিঠে পায়সে জুড়িয়ে যাবে না—আমি এর প্রতিশোধ নিতে চাই।"

শুভেন্দু চলিতে আরম্ভ করিয়াই বুঝিল, সুশীলও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরাইয়া কোমল-কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তুমিও এলে?"

"উঃ" বলিয়া সুশীল হন হন করিয়া আগবাড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মনে মনে হাসিয়া শুভেন্দু ডাকিল, "ওহে, শোন!"

"কি!" বলিয়া এবার সুশীলই ঘাড় ফিরাইল।

"রায়দীঘির পশ্চিম পাড়ে সেই সাদা বাড়ীখানা?"

"হুঁ"—

"বাড়ীর উত্তরধারের প্রকাণ্ড গোয়ালবাড়ীটা কখন লক্ষ্য ক'রে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"দিব্যি হবে।"

"কি?"

"তের বছরে এণ্ট্রান্স পাশ করলেই যে মানুষ বিদ্বান্ হয় না, তুমি তার একটি একের নম্বরের উদাহরণ, চাবুকের জ্বালার শোধ সেই প্রকাণ্ড চালাখানার জ্বালায় ভোলবার বেশ সুবিধা হবে, তাই বলছিলেম, তোমার কি এতটুকুও বোঝবার শক্তি নেই?"

সুশীলের মাথা হইতে পা অবধি সঘনে কাঁপিয়া উঠিল, "আগুন দেবে? সে যে মস্ত একটা অপরাধ!"

"আর দুটো পেয়ারা পাড়ার জন্য ভদ্রলোকের ছেলেকে চাকর দিয়ে চাবুক খাওয়ানটা বুঝি বিশেষরূপ পুণ্যকার্য্য?"

"কিন্তু আগুন দিলে—"

শুভেন্দু হাত দিয়া পিছনে দেখাইয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "তুমি বাড়ী যাও" বলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। লোহা যেমন করিয়া চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তেমন করিয়াই সুশীলও নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিল।

গভীর রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া ভুবনবাবু তাঁহার শয়নগৃহের মুক্ত বাতায়ন দিয়া, গ্রামের দক্ষিণভাগে একটা অগ্নি-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। মনটা তাঁহার বড়ই বিমর্ষ হইয়া গেল, না জানি কে বা কাহারা বিপন্ন হইল! বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দ্বার খুলিয়া বারান্দায় পা দিবামাত্র তাঁহার মনে হইল, কে যেন এক জন তৎক্ষণাৎ পাশের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। সে ঘরটা সুশীলের এবং উহার দ্বার যে ভিতর হইতে বন্ধ ও তাঁহার ঘরের দিকে মাত্র খোলা থাকে, সে কথা মুহূর্ত্তমধ্যে স্মরণ হইল না। মনে করিলেন, কোন পুরমহিলা আগুন দেখিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া গিয়াছেন। নীচে নামিয়া আর দুই তিন জন চাকর ও দ্বারবান্‌কে যদি সম্ভব হয় ত বিপন্নদের কথঞ্চিৎ সাহায্যার্থ প্রেরণ করিয়া অনেকক্ষণ এদিক সেদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেইখানে পা দিতেই আবার তেমনই করিয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি সরিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা মর্ম্মান্তিক বেদনার চিহ্ন—অস্ফুট কান্নার শব্দ তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। প্রথমে ইহাকেও লক্ষ্য না করিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কান্নার শব্দও যেন তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া আরও স্পষ্ট হইয়া কানের কাছে আসিল, তখন বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া ভুবন বাবু তাঁহার ও সুশীলের ঘরের মধ্যবর্ত্তী দ্বারের নিকট আসিলেন। ঘর অন্ধকার, কিন্তু এবার বেশ স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কান্নার শব্দ এই ঘরের মধ্য হইতেই সৃষ্ট হইতেছে বটে।

ভুবন বাবু ডাকিলেন, "সুশীল!"

উত্তর পাওয়া গেল না; কিন্তু কান্নার শব্দ বর্দ্ধিত হইল।

"সুশীল, আমার কাছে এস।"

ভুবন বাবু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেলেও কেহ দেখা দিল না, এরূপ প্রায় হয় না। অতিমাত্র বিস্ময়ের মধ্যেই তাঁহার সহসা মনে হইল, হয় ত যে ছায়ামূর্ত্তিকে দুইবার অপসৃত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা সুশীলেরই। ঐ অসহনীয় আগুন জ্বলার ভীষণ দৃশ্য চোখে দেখিয়া বালক ভয় পাইয়াছে, ব্যথিত হইয়াছে, আন্দাজে আন্দাজে কাছে আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া "সুশুর" বলিয়া ডাকিতেই ভয় পাওয়া শিশুর মত সুশীল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদের মত করিয়া উচ্চারণ করিল, "বাবা!"

"বাবা! ভয় কি? এস, আমার ঘরে এস;—আমি চাকরদের সব দেখতে পাঠিয়েছি—যদি কিছু করতে পারে, তার জন্যও তারা চেষ্টা করবে—"

"বাবুজি !"

"কে রে, রামপ্রসাদ ? কি খবর ?"

"আর খবর করতাবাবু ? রায় বাবুদের গোঁশালা একদম রাখসে রাক্স হোয়ে গেছে ; সে জস্তে একটুক্ দুক নেই—জামাই সাহেব বড় দুষমন আদ্মী আছে, লেকিন একঠো বাচ্ছী ইস্‌কে সাথ মর্ গিয়েছে, সেহি একঠো বড়ি আপশোষকা বাত হ্যায় !"

একটা সুকরুণ আর্ত্তধ্বনির সহিত সুশীল সংজ্ঞাহারা হইয়া তাহার পিতার বুকের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

সেই হইতে সুশীলের এই রোগের উৎপত্তি, বাড়ীর লোক বলিতে লাগিল, একে ত তরুর জন্যে ওর মনে মোটেই সুখ ছিল না, তাহার উপর আবার এই আগুন লাগা ও গোরু পুড়ে মরবার খবরটা আচমকা ঘুম ভেঙ্গেই দেখে শুনে তাহার দয়ার শরীর একেবারে গ'লে পড়েছে রে !

—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাপারটা নেহাৎ মন্দ গড়াইল না। সে দিনের সেই নিশীথ অগ্নিকাণ্ডের গুপ্ত নায়করূপে যাহাকে অভিযুক্ত ও পুলিস-সোপর্দ্দ করা হইল, সে বিপ্রদাস চৌধুরীরই এক জন পূর্ব্ব-ভৃত্য ; দিনচারেক পূর্ব্বে বাবুর একটা রূপাবাঁধান ছড়ি চুরি যাওয়ায় ইহার প্রতি সন্দেহে ইহাকে থামে বাঁধিয়া প্রহার করা হয় এবং ইহার পর সেই অপহৃত ছড়িটি আর এক জন ভৃত্যের নিকট হইতে পাওয়া যাওয়ায় তাহাকে পুলিসে চালান দেওয়া হয়। নিরপরাধে প্রহৃত ও অবমানিত গোপাল ছাড়া পাইবামাত্র তীরবেগে বাড়ীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল ও চীৎকার শব্দে দশেধর্ম্মে দোহাই পাড়িয়া দেবতা মানুষকে সাক্ষী রাখিয়া শীঘ্রই এই নৃশংস অবিচারের শোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিল। পরে দারবান্‌রা তাহাকে আর একবার অর্দ্ধচন্দ্র দিতে অনিচ্ছুক ছিল না ; কিন্তু ততক্ষণে সে পথে পড়িয়া দৌড় দিয়াছে। সাক্ষ্যের দ্বারা ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে, কয়দিন ধরিয়াই তাহাকে রায়গৃহের—এক্ষণে চৌধুরীবাড়ীর আশেপাশে সন্ধ্যার পর চুপি চুপি ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে। আগুন লাগাইবার সময়টায় সে অবশ্য সাক্ষী রাখিয়া লাগায় নাই, তবে সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী দোকানদার সাক্ষী দিল যে, এক ডিব্বা কেরোসিন তৈল ও একটা দিয়াশলাই এই উদ্দেশ্যেই সে তাহার দোকান হইতে রাত্রি নয়টার সময় কিনিয়া ওই দিকেই গিয়াছিল। গোপাল এ সব কথার কিছুই অস্বীকার করিল না, শুধু তাহার উপর প্রযুক্ত এই ভীষণ অপরাধটাকেই সে অস্বীকার করিল, অনেক পীড়াপীড়িতে সে আদালতে বলিল, "রাগের মাথায় শোধ লইবার কথা বলিয়া আসিলেও বাবুর উপর যে তার শোধ লইবার উপায় নাই, তাহা সে এক দিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিল। আর শুধু সেই জন্যই দেশে না গিয়া বাবুর বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া মরিতেছিল।" কারণ জিজ্ঞাসায় অবনতমুখে উত্তর দিল, "বাবুর শরীরে দয়া-ধর্ম্ম কখনই নেই ; চাকরদের তিনি কখনও মানুষ মনে করেন না। 'শালা' 'ব্যাটা' ভিন্ন কোন দিন নাম ধ'রেও কারুকে তিনি ডাকতে পারলেন না,—অথচ তাঁ'র পোষা কুকুরদের আদরের নাম 'টেবি' 'লুলু', কাশ্মীরি বেরালটাকে আদর ক'রে 'গারল্যাণ্ড' ব'লে ডাকা হয়। লালমাছ, নীলমাছ, পাখী, পায়রা, হরিণ, খরগোসের পিছনেই তিনটে চাকর। তাঁ'র বিলিতি কুকুরে রোজ তিন সের ক'রে মাংস খায়, কিন্তু চাকরদের বেলায় মোটা চালের ভাতের উপর সবদিন একটু শাকচচ্চড়ির অভাব ঘটিয়া যায়—অথচ সেই ভাতের গরাস কয়টা তুলিবার মধ্যেও ফাই-ফরমাসের জন্য ডাকপড়া বন্ধ হয় না। যাক্, তার জন্য আমি কিছু বলি না ; সে আমাদের বরাতের দোষ, আর জন্মে বাবুর কাছে ধার নিয়ে শোধ দিই নি, তারই জন্যে এবারে তার শোধ মিটিয়ে দিতে হচ্ছে ; আর জন্মে কি পুণ্যিকায ক'রে ফেলেছিলেন, তাই এ জন্মে উনি দশ জনের ওপোর এই হুকুমজারী ক'রে বেড়াচ্ছেন, এর জন্যে কাঁদাকাটি ক'রে আর হবে কি ? আমি শুধু একটিবার দিদিমণির মুখটি দেখে যাবার জন্যে ক'দিন ধ'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। অমন দানব বাপের যে তেমন দেবতার মতন মেয়ে কোথা হ'তে এলো, সে আমরা ভেবে কূল পাইনে।"

গোপালের এ সব ছেঁদো কথা আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে টিকিল না, যেহেতু, গরীবের মত ছোটলোক ত আর সংসারে দ্বিতীয় নাই—উহারা যখন বড়মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন নিশ্চিত জানা কথাই যে, তাহার ভিতর

পনের আনা সাড়ে-তিন পাই ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মিশ্রিত আছে। উহারা যদি মনিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কখন জয়লাভ করে, তবে সে দৃষ্টান্ত বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উহা ভৃত্য-জাতীয়ের শীতল শোণিতকে উষ্ণ করিয়া তুলে ও উহাদের স্পর্দ্ধা বাড়ায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সবারই ঘর সামলান দরকার বলিয়া নিতান্ত নিরপেক্ষ ন্যায়বান্ বিচারক ব্যতীত প্রায়ই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। তবে এমনটাও ঘটিয়া থাকে যে, যদি কালেক্টার "সাহেব" আবার কোন কারণে সেই মনিবটির উপর বিরূপ থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে ভৃত্যটি দোষী হইলেও জয়লাভ করে। এখানে তেমনধারাটা ঘটে নাই; এবং শিক্ষিত উকীলের বক্তৃতায় বেশ বাঁধুনীও ছিল; সাক্ষীরাও খুব পাকা এবং হয় ত বা হাকিমটিও একটু কাঁচা। গৃহদাহকারী গোপালের বিরুদ্ধে রায় বাহির হইল।

দণ্ডাদেশ শুনিয়া গোপাল সাশ্রুনেত্রে বারেক উর্দ্ধে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"হা ভগবান্!" তাহার পর নিজের উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে সজলগাঢ়স্বরে আত্মগতই কহিল, "দিদিমণি রে! আমার এই সাজার কথা শুনে তুই কত যে কাঁদবি,ভাই! তুই ছুটে এসে আমার উপর চেপে না পড়লে সে দিন বাবুর হুকুমে আমার তো [illegible] মেরেই ফেলেছিল! আহা, তোর কচি মুখটি আর একটিবার দেখা হলো না রে!" বলিতে বলিতে প্রৌঢ় হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! কাঁদিতে কাঁদিতে হাকিমের দিকে ফিরিয়া যোড়হাতে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমার বাবুর মস্ত লোকসান হয়েছে, শুনেছি, মা-ভগবতীর হত্যোকাণ্ডও হয়ে গেছে, তা'র জন্যে আমি না হয় শাস্তি পাচ্ছি, তা মিনি অপরাধে হ'লেও আমার তেমন দুঃক্ষু ছিল না, কিন্তু হুজুর! আমার দিদিমণি যদি সত্যি ক'রে মনে করে যে, তাঁ'র বাবার উপর শোধ তোলবার জন্যে—আমি তাঁদের ভাত খেয়ে মানুষ,—আমি এত বড় লোকসান ঘটালাম, অবোলা জীবের হত্যে করলুম। এ দুঃক্ষু যে আমার জেলখানায় মরণ ঘটলেও ঘুচবে না। এ দাগা আমার বুকে শেষ পর্য্যন্ত থেকে গেল।"

উকীলের দিকে চাহিয়া বলিল,-"বাবু! এখন ত আপনার কায শেষ হয়ে গেছে; এখন একবার কৃপা ক'রে আমার বাবুর বাড়ী যেয়ে আমার দিদিমণিকে ডেকে ব'লে যাবেন যে, তা'র গোপালদাদা, সত্যি ক'রে তাঁ'র গোয়াল পোড়ায়নি, তা'র লল্যুটের লেখনই এই কায করেছে, সে নয় বাবু! আমার বউ নেই,ছেলে নেই,মেয়ে নেই, কেউ নেই—আমার লেগে চোখের জল ফেলতে শুধু ওই একটি জনই আছে।—আহা রে! 'গোপালদাদা' বলতে বাছা যে আমার অজ্ঞান হয়ে যায়, রাগের মাথায় তিড়বিড়িয়ে বেরিয়ে এনু—বাছা আমার অশ্রু ঝরঝরে কেঁদে কি ভাসিয়ে দিলে! যেমন দেবতার চোখের জল ফেলান—ফল ফলবে না?—" বলিতে বলিতে এবার সে নিজেই কাঠগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আদালতের লোকদের মধ্যে কেহ কেহ রুমালে চোখ মুছিলেন, কেহ বা মৃদু হাসিয়া অপরকে বলিলেন, "একটিং জানে মন্দ না!" কেহ বলিলেন, "বেটা দাগী!"

ভুবন বাবুর বাড়ীতেও খবরটা প্রচার হইল। এখনকার দুর্ব্বিনীত ভৃত্যজাতীয় লোকদের উপর প্রায় কেহই সন্তুষ্ট নয়; তাহারা এখন কথায় কথায় মনিবের উপর চোখ রাঙ্গায়; মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে চাকরী ছাড়িয়া দেয়; ভাল খাওয়া-পরার দাবী তুলে; আবার অনেকেই গাঁজা, গুলী, সিগারেট, বিড়ি, পশ্চিমারা ইহার উপর তাড়ি ও সিদ্ধিতে চুর হইয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিতেই ভালবাসে। মেজাজেরও তাই ঠিক থাকে না। মনিব চাহেন শস্তায় সুচরিত্র ও বিনীত ভৃত্য। ভৃত্য—কালধর্ম্মে বিনীত ত নহেই—সচ্চরিত্রও নহে, অধিকন্তু মনিব-পুত্রের অনুকরণে নব্যয়ানায় চুলছাঁটা, সিগারেট টানা, পাতলা বিলাতি ফিতাপেড়ে সাড়ীটি পরা, লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী গায় দিবার সখটুকু পুরাদস্তরই তাহাদের শিক্ষা হইয়াছে। তা হইবেই বা না কেন? যখনকার বাবুরা খাটো ধুতী, হাতকাটা বেনিয়ান ও ঠনঠনের চটি পরিত; তখনকার ভৃত্যদেরও সেই খাটো ধুতী, ও বাহিরের জন্ম একটা মেরজাই-ই যথেষ্ট ছিল। তোমরা যদি 'ঘোড়ারোগে' শিক্ষিত হইয়াও মরিতে পার, উহারাই বা বাঁচিয়া থাকে কিসের জোরে? তোমাদের স্কুলের ছেলে "হাওয়াগাড়ী" পকেটে লইয়া বেড়ায়, ওদেরও সেই বয়সের ছেলেরা তোমাদের ঘরে চাকরী করিতে আসিয়া অমন সুদৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবে না?

কিন্তু মানুষ নিজেদের দোষ দেখে না। তাই মনিব

বসুমতী প্রেস]

[শিল্পী—শ্রীরামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
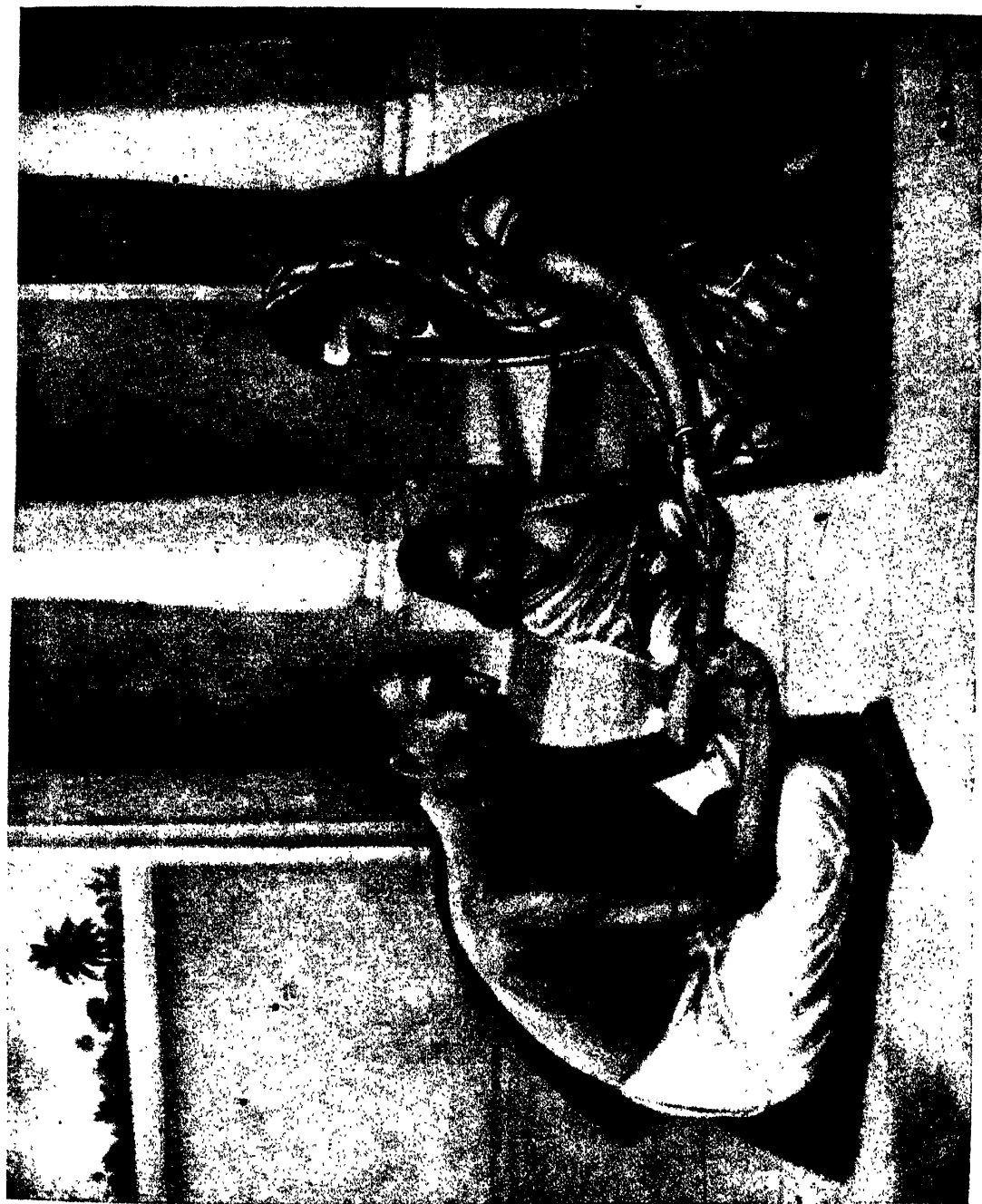
ভাগ্য-গণনা

যখন কোপ্তা কোর্ম্মা দিয়া লুচি খাইয়া যাওয়ার পর বামুন-ঠাকুরের কৃপায় মোটাচালের ধরাগন্ধ ভাতের সঙ্গে শাক-চচ্চড়ি ও ডালের ঝোলের অভাবে তোমার চাকর তোমার উপর চোখ রাঙ্গা করিয়া আসিল, তুমি অমনই তাহার সেই রাঙ্গা চোখের ছবিখানি দেখিয়াই তাহার স্পর্দ্ধার পরিমাপ করিতে বসিলে, নিজের পূর্ণ উদরের চাপে শরীর হাঁসফাঁস করিতেছে, কাযেই চোখ যে তাহার কেনই রাঙ্গা হইল, সে কথাটি ভাবিলে না, ধমক দিয়া বলিলে, "এমন এক আধ দিন হয়।" সে ইহার জবাব দিল, "এমন বাড়ী কায করিতে পারিব্ না, যেখানে খাওয়ার এমন দুর্দ্দশা।" সংসারের সমস্ত বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিয়া সে চলিয়া গেল! কাযেই কথা রটিল যে, ছোটলোকগুলার বড়ই স্পর্দ্ধা হইয়াছে! কিন্তু কেন যে হইল, কাহাদের সহানুভূতিহীনতায়, হীনতার দৃষ্টান্তে হইল—সেটুকু কেহ খুঁজিয়া দেখে না।

গোপালের মত ভয়ঙ্কর গেঁয়োরগোবিন্দ ছোটলোকটার এমন কঠিন দণ্ডাদেশে—তাই যাহাদের সর্ব্বদা চাকর রাখিয়া ঘর করিতে হয়, তাহারা অত্যন্তই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সাগ্রহে বড় বড় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল এবং বলিল, "এ না হইলে সংসারে টিঁকিয়া থাকাই ত মহা দায় হইয়াছিল! মনিবের জিনিষ খোয়া গেলে একটু কি করিয়াছে, না করিয়াছে—অমনই জ্বালাও তা'র ঘর, পোড়াও তা'র গোরু!—কি ভাগ্য যে তারই মুখে ধরাইয়া দেয় নাই!"

ইতঃপূর্ব্বে এই সকল লোকই অতঃপর আর চাকর রাখিয়া ঘর করা দায় হইবে বলিয়া নিতান্ত হতাশার সহিত আক্ষেপ করিতেছিলেন।

শুভেন্দু খবরটা লইয়া নিতান্ত নিরপেক্ষভাবেই সুশীলের ঘরে ঢুকিয়াছিল, সেখানে তরু ও বীণাকে উপস্থিত দেখিয়া সে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া বীণাই তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আসুন না শুভ'দা, চ'লে যাচ্ছেন কেন?"

শুভেন্দুর সুশ্রী চেহারা ও নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তি ও সাহস তাহাকে বাড়ীশুদ্ধ সমুদয় ছেলেমেয়ের কাছেই নিতান্ত ঘরের লোক করিয়া তুলিয়াছিল, বীণার আহ্বানে শুভেন্দু আসিয়া তাহাদের একপাশে বিছানা চাপিয়া বসিয়া পড়িল। সুশীল বলিল, "দিদি আমায় একটা গোলোকধাম খেলার ছক তৈরি ক'রে দিয়েছে; খেলবে, শুভেন্দু?"

শুভেন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিয়া কহিল, "এখনও তুমি গোলোকধাম খেল নাকি?"

শুভেন্দুর সেই হাসি ও কথার সুরে সুশীলের কানের গোড়া অবধি লাল হইয়া উঠিল। বিনতা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'ঠিক বলেছেন, শুভুদা!' দাদা এখনও এম্নি সব ছেলেমানুষী জিনিষ ভালবাসে যে, সে দেখলে আমার ভারী হাসি পায়; আমিও ওকে বলি যে, খেল্‌তে হয় ত তাস দিয়ে গ্রাব্ খেল, না হয় স্বিভার্সী খেল; না হয় ড্রাফ্‌ট খেল; তা নয়, ছেলে খেল্‌বেন ত গোলামচোর, নৈলে গোলোকধাম। আর দিদিরও ঠিক কি ওর মতন পছন্দ!"

সুশীল, তরু নিজেদের বিকৃত রুচির লজ্জায় বিব্রত হইয়া তৎক্ষণাৎ উহাদের সহিতই সায় দিয়া গিয়া বলিল, "আচ্ছা খেল, তোমাদের যে রকম ভাল লাগে, তাই খেল।"

খেলা আরম্ভ হইল। শুভেন্দুর কাছে এক পড়াশুনা ছাড়া কোন কার্য্যেই কাহারও জয়ের আশা নাই; একবার, দুইবার, তিনবার, বারবারই তাহার স্থান সর্ব্বপ্রথমে। কিন্তু এতবার জয়ী হইয়াও তাহার মন সেই জয়ের আনন্দের প্রতি নাই, সে বসিয়া পর্য্যন্তই সুশীলের নিরুদ্যম, রক্তহীন, ও ম্লান মুখের প্রতি তীক্ষ্ণচক্ষুতে চাহিতেছিল; তাস লইতে গিয়া কত সময় তাহার হাত কাঁপিয়া যাইতেছে, উহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। মনে মনে বিরক্ত হইয়া চোখ তাকাইয়া উহার উদ্দেশ্যে পাঁচশোবার "ভীরু" "অকর্ম্মণ্য" বলিয়া গালি পাড়িলেও কয় দিনের ভিতরে উহার শরীর-মনের অবস্থা দেখিয়া বোধ করি, তাহার মনে একটু অনুকম্পাও বোধ হইতেছিল। তাই তাহাকে মঙ্গল সংবাদে সুস্থ করিতে—নিশ্চিন্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কথায় কথায় বলিয়া ফেলিল, "গোপালের যে বিচার শেষ হয়ে গেল।—"

সে বার বিন্তির খেলা চলিতেছিল; কিন্তু আগ্রহাতিশয্যে তাহার সকল সাবধানতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিনতা টপ্ করিয়া ইস্কাবনের টেক্কাখানাকে 'পাশ' গুঁজিয়া দিয়া উগ্র-কৌতূহলে উচ্চ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হলো, শুভুদা! কি দণ্ড তার হলো?—উঃ, লোকটা কি ভয়ানক! তার ফাঁসি হ'লেও দোষ হয় না।"

সুশীলের হাতখানা কাঁপিয়া হাতের তাস ক'খানা ধপ্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার মুখখানা একবার ভয়ানক লাল হইয়া উঠিল, ঠিক যেন মনে হইল, তাহার সমস্ত শরীরের যেখানে যেখানে যতটা রক্ত জমা করা ছিল, সে সবই যেন একটানে বোঁ করিয়া মুখে ও মাথায় উঠিয়া আসিয়াছে। শুভেন্দুর মুখের দিকে সে যখন উদ্দাম ব্যাকুলতায় অধীর দৃষ্টিপাত করিল, সেই অস্বাভাবিক রাঙ্গামুখে, আশ্চর্য্য উজ্জ্বল চোখ দুইটা যেন দুইটা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্পের মত ভয়ানক রকম জ্বলিতেছিল। ঠোঁট তাহার নড়িতেছিল, কিন্তু তাহা শুধু উত্তেজনার জন্য কি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য কিছুই বুঝা গেল না। শুভেন্দু বারেকমাত্র তাহার মুখে তীব্রকটাক্ষ করিয়াই বিনতার প্রশ্নের উত্তরে শান্ত উদাস কণ্ঠে জবাব দিল—"বেশী কিছু হয়নি.........চার বৎসর সপরিশ্রম জেল খাটতে হবে মাত্র।"

আবার সেই রাত্রির মতই আর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা-ধ্বনি করিয়া সুশীল অচেতন হইয়া পড়িল।

গভীর রাত্রি। পল্লীগ্রামের সুপ্তিমগ্ন মধ্যরাত্রি। শুধু মানবই নহে, যেন তাহাদের সহিত সমস্ত বিশ্বচরাচর, দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই শান্তি-প্রদায়িনী নিদ্রাদেবীর সুশীতল অঙ্কাশ্রয়ে বিশ্রাম করিতেছে। একমাত্র ঝিল্লীরব ভিন্ন কোথাও কোন শব্দই নাই। যেন মহাসাধনাক্ষেত্রে কোন যোগমগ্ন মহাযোগী সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন; আর তাঁহার সর্ব্বসমাহিতচিত্তে কেবলমাত্র অনাদি প্রণবের একক ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং সেই ধ্বনি শুধু জানাইতে চাহিতেছে, সোঽহং—সোঽহং—সোঽহং! মানবের চিরশত্রু অহংকে সোঽহংএ মিলাইয়া দিবার সংযোজক কাল এমন আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু হায়, সুযোগ যে মানুষের সারাজীবন ব্যাপিয়া কত সহস্রবারই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার যে কোন লেখা-যোখাই করা যায় না! কি যে নিরেট পাষাণ দিয়াই বিধাতা মানুষকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছেন; এর কাছে যে সমস্ত মহা মহাযোগই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহার যে সমুদয়ই দুর্য্যোগ, সুযোগ সে লইবে কোথা হইতে? ভুবন বাবুর পত্নীবিয়োগের পর হইতেই রাত্রির নিদ্রাটা তেমন গাঢ় হইত না; ভোরের দিকে তিনি বরাবরই একটু পড়াশুনা করিতেন, চণ্ডী ও গীতাপাঠও হয় ত হইত, এ সময়ে কেহ তাঁহার কাছে থাকা তিনি পছন্দ করিতেন না বলিয়া ছেলেরা তাঁহার কাছে শয়ন করিত না। আজ হঠাৎ এই মধ্যরাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া তিনি আবার সে দিনের মত সেই চাপাকান্না শুনিতে পাইলেন। কান্নার শব্দ সুশীলের শয়নকক্ষ হইতেই আসিতেছে। উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুশীলের বিছানার কাছে আসিলেন। শুনিতে পাইলেন, সুশীল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "কি হবে! আমি কি কর্‌বো? গোপালকে যে জেলে যেতে হচ্ছে—এখন আমি কি করি! বাবাকে কি ক'রে সব বলি?"

ভুবন বাবুর মনে হইল,কে যেন একগাছা চাবুকের বাড়ি তাঁহার মুখের উপর সজোরে আঘাত করিয়াছে। তিনি যেন সহসা টলিয়া পড়িতে গেলেন। তাহার পরক্ষণে আপনার এই অতর্কিত ও অভাবনীয় গুরু আঘাতের যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ সহনীয় করিয়া লইয়া সুগভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কথা কহিলেন—"সুশীল! গোপাল কি তোমাদের সঙ্গেও ছিল না?"

সুশীল অকস্মাৎ এমনভাবে সম্বোধিত হওয়ায় ভয়ানক রকম চমকাইয়া উঠিয়াছিল; তাহার পর তাহার মনে সেই পরিমাণে বিস্ময়েরও সঞ্চার হইয়া গেল, বাবা কি তবে সবই জানেন? সে উঠিয়া বসিয়া অশ্রুভারাতুর ব্যাকুল উদ্‌ভ্রান্ত-স্বরে বলিল, "না, সে কিছু জানে না"—বলিয়াই আবার কাঁদিয়া অধীর হইয়া বিছানার মধ্যে লুটাইয়া পড়িল। এই ভয়ানক ব্যাপারটার জানাজানি ব্যাপারে তাহার জন্য যত বড় প্রচণ্ড লজ্জাই জমা করা থাক না কেন, তবু সে যে লুকাচুরির হস্ত হইতে বাঁচিয়া গিয়া তাহার বক্ষের মধ্যের অবরুদ্ধ তাপের প্রভাবে ফাটিয়া পড়া হইতে মুক্তিলাভ করিল, আপাততঃ সেই-ই তাহার পক্ষে যথেষ্ট!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রায়দীঘির তকতকে নীলজলে তখনও সূর্য্যকরের সোনার গুঁড়া ঝিলিক্ মারে নাই; তাহার অগ্নিকোণের কহ্লারবনে ঘোর রক্তবর্ণের কহ্লার ফুলগুলা সবেমাত্র পাপ্‌ড়ী খোলা সুরু করিয়াছে; তাহার নিশীথ-বিশ্রামের গায়ের চাদর কমলপত্রে বিস্তৃত রহিয়াছে, মানব-হস্তস্পর্শে তাহা এখনও

তীরদেশ হইতে অপসৃত হইয়া যায় নাই। তাহার মৎস্যকুল এখনও বকের দৌরাত্ম্যে তীরসংলগ্ন খাদ্যান্বেষণ ত্যাগ করিয়া গভীর জলে আত্মরক্ষার জন্য পলায়নপর নহে,—দীঘির কূলে দীর্ঘ সোপানশ্রেণী, উপরে প্রকাণ্ড চত্বর, পশ্চাতে পুরাতন ছাঁদের বৃহৎ অট্টালিকা—ইহাই উমাপতি রায়ের জামাতা বিপ্রদাস চৌধুরীর আবাসবাটী। বাটীর প্রবেশদ্বার এখনও খোলা হয় নাই; তবে ভিতরে দ্বারবান্‌জীর নাগরাজুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছে—খুব সম্ভব এইবার ফটক খোলা হইবে। বাড়ীর উত্তরে বিশাল একটা ভস্মস্তূপ, গত দুর্ঘটনার সাক্ষ্যস্বরূপে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই ভুবন রায়ের বুকের মধ্যে লজ্জার আঘাত অসহনীয় বেগে পড়িল।

ভুবন বাবু কিছুক্ষণ এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন, মন অস্থির, সময়ক্ষেপ সহ্য করা কঠিন বোধ হইল। কিছু পরে ফটক খোলার শব্দে সম্মুখে আসিয়া, দ্বারবান্ মাধো সিংএর হাতে একটা চিঠি দিয়া, বাবুর ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তাঁহাকে খবর দিতে বলিয়া, আবার সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। ইহাকে দেখিয়া নিরপরাধ গোপালের কথা আবার বেশী হইয়াই তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

বিপ্রদাস বাবু সচরাচর অধিকাংশ বাবুজাতীয় জীবের ন্যায় বেলায় শয্যাত্যাগ করেন এবং তাহার পর হাত-মুখ ধুইয়া, চা খাইয়া, কেশ-বেশ সারিয়া বৈঠকখানায় আসিতে তাঁহার ঐ শ্রেণীর লোকদেরই মত প্রায় সমান সময় লাগে। সেটা অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক বা তদুর্দ্ধ। আজ এমন নিতান্ত অসময়েও অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার পূর্ব্ব সম্বন্ধের জ্যেষ্ঠ শালকের আগমন-সংবাদে ও পত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনীয় ও গোপনীয় কার্য্যের উল্লেখ থাকায় তাঁহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে সকল কার্য্যই সমাধা করিয়া লইতে হইল। বিপ্রদাস বাবু জানিতেন, এই লোকটি বিলক্ষণ ধনী এবং সর্ব্বদা দেশে না-থাকা প্রযুক্ত ইঁহার সহিত তাঁহার বৈষয়িক বিবাদের যে কোন যোগাযোগ নাই, তাহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। আর তার উপর নিজে পয়সার লোক হইলে লোক একটু পয়সাওয়ালা লোকদেরই বেশী পছন্দ করিয়া থাকে; বিপ্রদাস বাবুই বা না করিবেন কেন?

সাক্ষাৎ যে এমনভাবে হইবে, তাঁহার তাহার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না, ভুবন বাবু আড়াই হাজার টাকার তিন কেতা নোট আগে খেসারত ধরিয়া দিয়া তাহার পর সমুদয় ইতিহাসটাই জানাইয়াছিলেন কি না; তাই তাহার মূর্ত্তি অনেকখানিই বদল করিয়া শ্রোতার কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিতে লাগিল এবং পাঁচশো টাকার বদলে দুই হাজার টাকা উপরি লাভ হওয়ায়, ক্ষতিটাকে তাঁহার এক্ষণে আর তেমন লোকসান বলিয়া মনে হইল না। বরং দুই পার্শ্বের বিরাট গুম্ফকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অর্দ্ধাবৃত সূক্ষ্ম ঠোঁটের আগার একটুখানি হাসি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিয়া তিনি নোট তিনখানি পাঞ্জাবী জামার পকেটে ফেলিতে ফেলিতে সংক্ষেপে কহিয়া উঠিলেন, "কি, ছেলেমানুষী!"

ভুবন বাবুর উচ্চ মস্তক আজ লুণ্ঠিত, তাঁহার বড় উন্নত আদর্শই চূর্ণ হইতে বসিয়াছে, কিন্তু পুত্রের আত্মাপরাধ স্বীকারোক্তিতে তাঁহার পিতৃ-হৃদয়ে দুঃখের মধ্যেও সুপ্রচুর সুখের অভাব ছিল না। শীঘ্রই তিনি বিদায় লইয়া উঠিলেন, এখনই তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জিলায় যাইতে হইবে। বিদায়কালে পুনশ্চ বিনীত মিষ্টবাক্যে কহিলেন, "বড় অন্যায় হয়ে গেছে; বেশী আর কি তোমায় বল্‌বো? মন থেকেই অপরাধীদের যতটুকু পার ক্ষমা করো, ভাই!"

বিপ্রদাস বাবু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন, "কিন্তু যারা প্রকৃত দোষী, তারা তো কই আমার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে গেল না!"

ভুবন বাবু নিরতিশয় লজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন, "হ্যাঁ, তারা ত আসবেই, নিশ্চয়ই আসবে। আসবে বই কি!" কিন্তু মনে মনে তিনি এই দুর্ভাষী ও অহঙ্কৃত পুরুষের নিকট শুভেন্দুকে পাঠাইতে একটু সংশয়ই বোধ করিতেছিলেন।

বৈঠকখানার বাহিরে আসিয়া বিপ্রদাস তাঁহাকে বিদায় দিয়াছিলেন, এর চেয়ে বেশী সৌজন্যের অপব্যয় তিনি দেশী লোকের জন্য কখন করিতে পারিতেন না। ভুবন বাবু বৈঠকখানার দালান পার হইয়া কয়েকটা পৈঠা নামিয়া উঠান দিয়া চলিতে চলিতে পিছন দিক হইতে একটা সসঙ্কোচ আহ্বান শুনিতে পাইলেন, "শুনুন!"

মুখ ফিরাইতেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়িল! একটি দশ বৎসরের বালিকা, কিন্তু স্নেই মেয়েটির গায়ের রঙের চম্পক গৌরাভা, উজ্জ্বল ও বিশাল দুইটি চোখের স্বচ্ছ

সরল ও সকরুণ কটাক্ষ, তাহার ঈষৎ স্ফুরিত আরক্ত অধর-পুটের মৃদুকম্পন, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার গোলাপী আভাযুক্ত গণ্ডের উপরকার গ্রন্থিছিন্ন মুক্তাহারের মতই নবীন রৌদ্র-করোজ্জ্বল অশ্রুমালার সমাবেশ তাঁহাকে মুগ্ধ করিল। ভুবন বাবু একান্ত বিস্ময়ের সহিত এই সহসা-উদ্ভূত করুণামূর্ত্তিটি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,এমন সময় সেই অপরিচিতা বালিকা তাঁহার অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী হইয়া নিজের কাপড়ের মধ্য হইতে বামহস্তখানি বাহির করিল, তাহার হাতে একটি রেশমের বোনা মণিব্যাগ। ভুবন বাবুর দিকে উহা প্রসারিত করিয়া দিয়া সে রুদ্ধপ্রায় গদ্‌গদস্বরে কহিয়া উঠিল, "এই নিন্, এই টাকা খরচ ক'রে আমার গোপালদা'কে ফিরিয়ে আনুন। আমি তিন সত্যি ক'রে বল্‌ছি, সে কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি, কক্ষণ আগুন দেয়নি।" বলিতে বলিতে সে দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল।

ভুবন বাবু টাকার থলিটি হাতে না লইয়াই মেয়েটির সেই অশ্রুপ্লাবিত চাঁদপানা মুখের দিকে চাহিয়া সস্নেহে কহিলেন, "মা, তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ, তোমার গোপালদা আগুন দেয়নি। দোষী দোষ স্বীকার করেছে, নির্দ্দোষ গোপাল মুক্তি পাবে। তোমার টাকা রেখে দাও।"

মেয়েটির সুন্দর মুখখানি বর্ষা-আকাশের চাঁদের মতই বারেক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আবার তখনই কিছু ম্লান হইয়া গিয়া সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে যে সবাই বল্‌ছে, তার পাঁচ বৎসরের জন্য জেল হয়েছে। জেলখানা আমি মামাবাড়ী থেকে দেখেছি, সেখানে পাতর ভাঙ্গতে দেয়, ঘানি ঘোরাতে দেয়, এমনি বিশ্রী খাবার তাদের—গোপালদা তা হ'লে মরেই যাবে।" এই বলিয়া মেয়েটি আঁচলে মুখ চাপিয়া পুনশ্চ কাঁদিয়া ফেলিল।

ভুবন বাবুর ইচ্ছা হইল, এই করুণাময়ী মেয়েটিকে বুকের কাছে টানিয়া লয়েন, মাথায় গায়ে হাত দিয়া একটু আদরের সহিত তাহাকে সান্ত্বনা করেন, কিন্তু সে যে কে, তাহাই তো জানা নাই, তাই সে ইচ্ছা দমন পূর্ব্বক গভীর স্নেহের সহিত কহিলেন, "হ্যাঁ, দণ্ড তা'র হয়েছিল বটে, কিন্তু তা'র দণ্ডের সংবাদ পেয়ে প্রকৃত দোষীর মনে অনুতাপের উদয় হয় এবং সে দোষ স্বীকার করে, গোপাল দু' এক দিনের মধ্যেই ছাড়ান পাবে, তুমি নিশ্চিত বিশ্বাস করো।"

"তা হ'লে তো যে প্রকৃত দোষী, সেও এই রকম সাজা পাবে? উঃ, পাঁচ বৎসর জেলখাটা কি সোজা কষ্ট! তাহার কি হবে?"

ভুবন বাবুর অন্তরের মধ্যে ব্যথাভরা আহত পিতৃত্ব যেন এই সহানুভূতিপূর্ণ করুণাধারায় টল্‌টল্ করিয়া উঠিল। তাঁহার পুরুষের চক্ষুতেও এই ক্ষুদ্র বালিকার ওই সভয় ইঙ্গিতটুকুতে অশ্রুর আভাস দেখা দেয়, এমন অবস্থা হইল। তিনি ইহা দমনচেষ্টা পর্য্যন্ত না করিয়াই সবাষ্পস্বরে উত্তর করিলেন, "মা! ঈশ্বর তোমায় চিরসুখী করুন, কত বড় মহৎপ্রাণ নিয়ে তুমি এই স্বার্থ-মলিন সংসারে নেমে এসেছ! আশীর্ব্বাদ করি, যেন এম্‌নি অম্লান থেকেই তাঁর পায়ে আবার ফিরে যেতে পার।"

দুইদিনের কুসঙ্গে পড়িয়া তাঁহার নিজ হাতে গড়িয়া তোলা সুশীল যে এত বড় একটা অন্যায়ের সহায়তা করিল, এ আঘাত তাঁহার বুকে যে বজ্রবলে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে!

মেয়েটি ঈষৎ লজ্জিতা ও নতমুখী হইয়াই পুনরপি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া বলিল, "তাকে কি ক'রে বাঁচাবেন? এই টাকা নিয়ে তা'র জন্যে কিছু করুন না। শুনেছি, মোকদ্দমায় অনেক টাকা লাগে। আমি অনেক টাকা কোথা থেকে পাব? বাবা আমায় খরচ করতে পাঁচ টাকা ক'রে দেন, তারই কিছু কিছু রেখে এই তের টাকা জমিয়েছিলুম। নিয়ে যান।" থলিটি সে ভুবন বাবুর হাতে দিতে গেল।

"মা! আমি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতেই যাচ্ছি, টা া আমার সঙ্গে আছে, ও টাকা তুমি রেখে দাও, আবার অন্য কাযে লাগবে।"

বালিকা আস্তে আস্তে থলিটি আঁচলে বাঁধিল, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন বোধ হইল না; বোধ করি, ইঁহার কথা তাহার যেন বিশ্বাস হয় নাই। ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ত উকীল? তা হ'লে টাকা না পেলে তা'র জন্য আপনি কেমন ক'রে চেষ্টা করবেন?"

অত্যন্ত বিষাদের একটুখানি ম্লানহাসি বর্ষাকাশের ভাঙ্গা মেঘপুঞ্জের মধ্যস্থ এক ঝলক সূর্য্যালোকের মতই ভুবন বাবুর বিমর্ষ মুখকে মুহূর্ত্তের জন্য প্লাবিত করিল, তিনি গভীরতর একটা নিশ্বাস মোচনপূর্ব্বক সখেদে উত্তর করিলেন, "না মা! আমি সেই অপরাধীর বাবা।—"

"সুলেখা!"—উপরের দালানের একটা ঝিলমিলি সরাইয়া নারীকণ্ঠে কেহ ঐ নামে আহ্বান করিল।

"যাই দিদিমা" বলিয়া উত্তর দিয়াই সেই বিদ্যুদ্বরণী মেয়েটি বিদ্যুতের মত মিলাইয়া গেল।

ভুবন বাবু একাল নির্নিমেষে সেই লুকাইয়াপড়া উজ্জ্বল মূর্ত্তিটির প্রতি চাহিয়া থাকিবার পর সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস টানিয়া লইলেন। গভীর ব্যথাবিজড়িত গ্লানির মধ্য হইতে মনে মনে কহিলেন, "এক দিন আগে হ'লে আমি মনে করতেম, আজ আমি আমার মানসী প্রতিমাকে খুঁজে পেয়েছি, আমার সুশীলের জোড়া মিলেছে—কিন্তু আজ আর সে কথা মনে করবার কোনই অধিকার বা স্পর্দ্ধা আমার মনের নাই।—"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

কনষ্টিটিউশন্যাল রাজনীতি

একাম্রকানন

১

পুরাণ-কীর্ত্তিত কথা, পুণ্যময়ী সে বারতা,
যুগান্তের ইতিহাস অতীব উজ্জ্বল।
সুরম্য কানন-শোভা, দেবতার মনোলোভা,
রসালের রস-গন্ধ বহে অবিরল!
সুবিস্তৃত চূত তরু অতি উচ্চ যেন মেরু,
প্রসারি' সহস্র শাখা ছিল বিরাজিত!
ছিল পাদমূলে তার, বিরাট বিগ্রহাকার,
স্থাণু, অচঞ্চল, শিব, বিশ্ব-বিমোহিত!

২

এ কি অপরূপ দৃশ্য, কে বুঝিবে এ রহস্য,
দশ শত পয়স্বিনী ঢালে ক্ষীরধারা!
প্রতি দিন মিলে তথা, ঈশ্বর অব্যক্ত যথা,
নিত্য অভিনব ভাবে প্রেম-মাতোয়ারা!
হেন কালে এলোকেশে, চারু গোপালিনী-বেশে,
দিক্-আলো-করা-রূপে মাতায়ে ভুবন,
অপূর্ব্ব এ লীলা হেরি, ফিরে ধেনু সঙ্গে করি,
বারাণসী ফিরে যেতে চলে না চরণ!

৩

বুঝিলেন শ্রীপার্ব্বতী, দক্ষকন্যা, সাধ্বী, সতী,
এই সেই শিব-উক্ত গুপ্ত বারাণসী!
ত্রিভুবন-মহেশ্বর, অপ্রকট লীলাধর,
গুপ্তভাবে গুপ্তলীলা করিছেন আসি'!
সুবেশা গোপের নারী, মহারাজ-রাজেশ্বরী,
গুপ্তভাবে হইলেন লীলার সহায়!
ত্রিলোকের অগোচর, দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নর
শিব-শক্তি প্রেম-লীলা সন্ধান না পায়!

৪

দৈত্য দুই 'কীর্ত্তি'-'বাস', নর-লোক-মহাত্রাস,
অকস্মাৎ আসি তথা আক্রমে দেবীরে!
অসুরে ছলিয়া মাতা, স্কন্ধোপরি অধিষ্ঠিতা,
পদে চাপি পাঠালেন যমের মন্দিরে!
ধীরে ধীরে ভক্ত-জন করি' লীলা দরশন,
প্রচারিল লীলা-কথা ললিত ভাষায়!
প্রান্তরে নগর উঠে, জয়-গীতি-রব ফুটে,
গুপ্ত-লীলা কিছু ব্যক্ত, ঈশ্বর-ইচ্ছায়!

৫

কেশরি-বংশের রাজা 'ললাটেন্দু' মহাতেজা
রচিল দেউল রম্য ভাস্কর্য্য-কলায় !
শত শত পরিপাটী, কঠিন প্রস্তর কাটি,
কাল-হৃত সে সৌন্দর্য্য আজো শোভা পায় !
ঘেরি ত্রিভুবনেশ্বরে, অপূর্ব্ব দেউল ধরে,
শত শত দেবদেবী স্থাপি সারি সারি !
প্রকটিল তীর্থস্থান, অলোক-সামান্য দান,
মন্দির হাজার সাতে দেশ গেল ভরি' !

৬

কোথা সেই শোভা আজ, এ যে বজ্রাহত সাজ,
গুপ্ত-কাশী লুপ্ত পুনঃ বিধির বিধানে !
স্তূপ-চিহ্ন অবশেষ, স্থিতমাত্র কীর্ত্তিলেশ,
আঁখি-জল ঝরে হেরি' দেব-প্রতিষ্ঠানে !
প্রাণ-চিত্ত-বিমোহন, কোথা কীর্ত্তি অগণন,
সুবর্ণাদ্রি আলো-করা সুচারু ভাস্কর্য্য !
একাম্র-কানন কোথা, কোটি লিঙ্গ ছিল যথা,
কোথা গেল মন্দিরের সে মহাসৌন্দর্য্য !

৭

শিব শবে পরিণত, নন্দন শ্মশানে নীত,
কত না করিল পাপ হতভাগ্য দেশ !
বিধর্ম্মীর অত্যাচারে, সেই পাপ ধ্বংস করে,
দেবতা-মন্দির শত স্তূপে অবশেষ !
পূর্ব্ব-স্মৃতি-চিহ্ন যত, বিচূর্ণিত আছে শত,
ভগ্ন-অঙ্গ, বিদলিত বিগ্রহ-অশেষ !
তাহারি দর্শন-আশে, কোটি ভক্ত আজো আসে,
আঁখি-জলে ঈশ্বরের পূজা করে শেষ !

৮

'রামেশ্বর', 'মেঘেশ্বর', 'ব্রহ্মেশ্বর', 'সূর্য্যেশ্বর',
'সিদ্ধেশ্বর', 'মুক্তেশ্বর' নানা দেবালয় !
পঞ্চ-কুণ্ড-প্রতিষ্ঠান, 'গৌরী-কেদারে'র স্থান,
আশেপাশে আরো কত আছে শিবালয় !
কোটি-তীর্থ-কুণ্ডতীরে, দেউল ভাঙ্গিয়া পড়ে,
কত না বিগ্রহ আজ যায় গড়াগড়ি !
মন্দির-অঙ্গন যত, শস্য-ক্ষেত্রে পরিণত,
ভগ্নদেউলের অংশ প'ড়ে ছড়াছড়ি !

৯

বিপুল বিশালকায় বিন্দু-সরঃ শোভা পায়,
গঙ্গা-আদি পুণ্যতোয় বিন্দু বিন্দু ধরি !
নষ্ট হ'ত পাপরাশি যে করিত স্নান আসি,
পবিত্র এ তীর্থোদকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি' !
আবর্জ্জনা-পূর্ণ বারি, ভগ্নসোপানের সারি,
পরিচ্ছন্ন নাহি করে, ঢালে মলারাশি !
ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণ আজো করে নিমজ্জন,
মহাতীর্থ গণি সরে দূর হ'তে আসি !

১০

বাঙ্গালীর কীর্ত্তি গায়, তীরে তার শোভা পায়—
বিরাট দেউল এক সুন্দর-দর্শন !
স্থাপিলা সে 'ভবদেব' এ 'অনন্ত-বাসুদেব',
'রাম-কৃষ্ণ' দুই ভাই নয়ন-শোভন !
যত যাও, দেখ তত, প'ড়ে আছে শিব শত,
নাম নাহি জানে তার অজ্ঞদেশবাসী !
দেব-দেবী-মূর্ত্তি-ভেদ নাহি জানে ভেদাভেদ,
শিব-শক্তি-বিষ্ণু-রবি এক হেথা আসি' !

১১

সম্মুখেতে উর্দ্ধ-চূড়া, অপূর্ব্ব দেউল-বেড়া,
ভুবন-ঈশ্বররাজে ত্রিভুবন-শোভা !
নয়নে চমক লাগে, পলক পড়ে না আগে,
বিরাট সৌন্দর্য্য-ভরা প্রাণ-মনোলোভা !
পঞ্চদশ-শত-বর্ষ, ব্যাপিয়া উথলে হর্ষ,
এ মহতী চারু-শোভা প্রস্তর-রচিত !
গম্ভীর বিরাটকায়, বর্ত্তমান লজ্জা পায়,
অতীতের স্মৃতি হেরি ভাস্কর্য্য-খচিত !

১২

দ্বারে শোভে 'প্রজাপতি', তার আগে 'গণপতি',
র'য়েছে 'বৃষভ-স্তম্ভ' নয়নের আগে !
পরে তার 'ভোগালয়', সঙ্গে গাথা 'নাট্যালয়',
অপূর্ব্ব 'জগ-মোহন' তা'র পুরোভাগে !
শেষ শোভে শ্রী-মন্দির, অপরূপ সে প্রাচীর,
স্থাপত্যের, ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব গঠন !
আজো শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ, হয়ে বিমোহিত-মন,
শতমুখে করে তার প্রশংসা কীর্ত্তন !

১৩

'কালাপাহাড়ে'র কীর্ত্তি, এখানে উজ্জ্বল অতি,
যবন কোথায় লাগে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট-পাশে !
ভগ্ন-হস্ত, ভগ্ন-পদ, চূর্ণিত শোভা-সম্পদ,
কর্ম্মনাশা, কীর্ত্তিনাশা কীর্ত্তি, দেব-বাসে !
হতশ্রী সুর-সুন্দরী, 'সাবিত্রী', 'ভুবনেশ্বরী',
'অন্নপূর্ণা', 'শ্রীপার্ব্বতী', চারুমনোহরা !
বিশাল মন্দির-কায়, 'গুহ' 'গণপতি' ভায়,
ভগ্ন-দেহা 'উমা'সতী পীন-পয়োধরা !

১৪

বিমর্দ্দিত আরো কত, দেবদেবী শত শত,
বিরাজিত চারিধারে 'নর-সিংহ' আদি !
'লক্ষ্মী-নারায়ণ' রাজে, বৃষরূপী 'নন্দী' সাজে,
'গঙ্গা' ও 'যমুনাকূপ' অমৃতের নদী !
সুবিশাল পাক-শালা, সু-উচ্চ প্রাচীর-মালা,
গম্ভীর তোরণ তিন, তিন দিকে তা'র !
পশ্চিমেতে কুণ্ডে ধৃত, শিবস্নান পঞ্চামৃত,
অমৃতের প্রস্রবণ ছিল গর্ভে যার !

১৫

দক্ষিণ-প্রান্তর-মাঝে, কাল-ভৈরবের সাজে,
'কপিলেশ্বর-কালিকা' বিরাজে শোভায় !
প্রাচীনকালের স্মৃতি, রয়েছে উজ্জ্বল অতি,
কুণ্ড-কূপ-সু-দেউল অপূর্ব্ব আভায় !
উত্তর-প্রান্তরে নব, অপরূপ সমুদ্ভব,
'ব্রহ্মানন্দ'-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ-ধাম' !
বিস্তৃত প্রাচীরে ঘেরা, মঠ-শোভা মনোহরা,
তপস্যা-সাধনালয় নয়নাভিরাম !

১৬

ধ্যান-যোগে জানি সত্য, গুপ্তকাশী মহাতত্ত্ব,
প্রচারিল যোগিরাজ ভক্তের সকাশে !
তাই আজ হেথা-সেথা, মঠাশ্রম হয় গাথা,
আসিতেছে বহু ভক্ত সাধনার আশে।
জ্ঞান হয় অল্পদিনে, পূর্ব্বকথা ল'য়ে জেনে,
হর-গৌরী-হরি-হর-মিলনের স্থানে !
সাধন-ভজন-আশে, পবিত্র এ শিববাসে,
আসিবে অযুত ভক্ত নামা প্রতিষ্ঠানে !

শ্রী[illegible]

আর্ট ও মোরালিটী *

শ্লিগেল বলেন, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যকে চক্ষুকর্ণের বিষয়ীভুত করাই কবির কার্য্য। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কিসের সৌন্দর্য্য? বহির্জ্জগতের এবং অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য। সুনীল আকাশ, পুর্ণিমার চাঁদ, বাগানের ফুল ইত্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থ সহজেই আমাদের মন মুগ্ধ করে, অর্থাৎ আমরা তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করি। আবার তাহাদের মধ্যে যে সকল বস্তু আমাদের মনে মনুষ্যজীবনের সুন্দর সুন্দর ভাব জাগাইয়া তুলে, সেগুলি আরও সুন্দর। কবি প্রাকৃতিক জগৎ হইতে সুন্দর সুন্দর বস্তু বাছিয়া লইয়া তাহাদের সাহায্যে মানবজীবনের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করেন। মহাকবি কালিদাস উমার মুখের সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন—উমার মুখ একাধারে পদ্ম ও চন্দ্রের শ্রী ধারণ করিত। ইহা হইল মুখের সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা। মানুষের মুখে তাহার মনের ভাব প্রতিফলিত হয়, সেই জন্য মুখের সৌন্দর্য্যবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মনের সৌন্দর্য্যের আভাসও পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া কবি প্রাকৃতিক বস্তুর সাহায্যে মানবমনের সৌন্দর্য্যও ব্যাখ্যা করেন। সীতাকে বনবাসে পাঠাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা কালিদাস একটি সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন—"তুষারবর্ষীব সহস্যচন্দ্রঃ"—বাষ্পাকুল-লোচন রাম তুষারবর্ষী পৌষমাসের চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এখানেও অবশ্য মনের ভাব মুখেই ব্যক্ত হইয়াছে, কারণ, মুখ মনের দর্পণস্বরূপ। ভবভূতি-কৃত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ আরও গভীর। তিনি রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থা আর একটি অতি সুন্দর উপমা দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন।—"অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ, পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ"—রামচন্দ্রের অন্তরের ব্যথার বাহিরে প্রকাশ নাই, অন্তরেই গূঢ়ভাবে থাকিয়া পুটপাকে প্রস্তুত ঔষধের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে।

কবি এইরূপে পর্য্যবেক্ষণশক্তি (Observation) দ্বারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিনাইয়া দেন এবং উদ্ভাবনী শক্তি (Constructive imagination) দ্বারা মানব-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া বাহিরের সুন্দর পদার্থের সাহায্যে তাহার ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু কবির কৃতিত্ব মানবজীবনের গভীর ভাব সকলের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার উপরই অধিক নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পর্য্যবেক্ষণও অবশ্য বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও উৎকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক। কিন্তু তাহা সব সময় আমাদের মনে গভীর ভাব (Deep emotions) সঞ্চার করিতে পারে না। একটি গোলাপফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড় কাহাকেও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখা যায় না। তবে এরূপ ঈশ্বর-ভক্ত লোকও থাকিতে পারেন, যাঁহার মনে সেই গোলাপফুলও ঈশ্বরের অপার করুণা ও সৃষ্টিকৌশলের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তিনি ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু এই প্রকার সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও ভক্তির উচ্ছ্বাস সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণতঃ মানুষের মনে হর্ষবিষাদের উদ্রেক হয়, মানবজীবনের হর্ষবিষাদের সম্পর্কে আসিয়া। সুতরাং মানবজীবনের অবলম্বনে সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই প্রধানতঃ কবির কার্য্য। তাই ম্যাথিউ আরনল্ড বলেন—

"* * * Poetry is at bottom a criticism of life; that the greatness of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life—to the question How to live." (Wordsworth) এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে—"life" অর্থে যে "moral life" বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে আছে কি? কবি তাঁহার আর্ট দ্বারা কেবল সুনীতি-সাধিত জীবনেরই ব্যাখ্যা করিবেন, না সুনীতি-দুর্নীতির মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ না করিয়া সমগ্র মনুষ্যজীবনের ব্যাখ্যা করিবেন?

* আর্ট কথাটি বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিয়াছে; মোরালিটী এখনও চলে নাই। তবে আর্টের সঙ্গে বলিলে দোষ কি? বিশেষতঃ উহার অনুবাদও তেমন সুবোধ্য হয় না। আমি উহার অনুবাদ "সুনীতি" করিয়াছি, শুধু নীতি বলিলে ঠিক হয় না।

ভল্‌টেয়ার ইংরাজ জাতির কাব্যসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"No nation has treated in poetry moral ideas with more energy and depth than the English Nation. * * * There it seems to me is the great merit of the English poets."—অর্থাৎ কাব্যে ইংরাজ জাতি সুনীতিকে অবলম্বন করিয়া যত অধিক উদ্যম ও ভাবের গভীরতা দেখাইয়াছে, অন্য কোন জাতি সেরূপ করে নাই। ম্যাথিউ আরনল্ড ভল্‌টেয়ারের এই উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন,—ভল্‌টেয়ারের উক্তির এরূপ অর্থ নহে যে, ইংরাজী কাব্যে কেবলই সুনীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে (didactic), এরূপ উপদেশপূর্ণ কবিতার দ্বারা কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না। তবে ভল্‌টেয়ারের উক্তির প্রকৃত অর্থ কি ? "He means just the same thing as was meant when I spoke above 'of the noble and profound application of these ideas to life' and he means the application of these ideas under the conditions fixed for us by the laws of poetic beauty and poetic truth." অর্থাৎ কবি তাঁহার উচ্চ ও গভীর ভাব সকল মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে এরূপভাবে প্রয়োগ করিবেন যে, তাহা যেন সত্য ও সৌন্দর্য্যের নিয়ম অতিক্রম না করে।

ভলটেয়ারের Moral ideasকে যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক না কেন, ইহাতে কাব্যকে একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইবে—এরূপ আপত্তি হইতে পারে। তাহার উত্তরে ম্যাথিউ আরনল্ড বলেন—Moral ideas মনুষ্যজীবনের এত অধিক যায়গা জুড়িয়া আছে যে, Moral ideasকে না মানিলে মনুষ্যজীবনকে যথাযথভাবে দেখান অসম্ভব। "A poetry of revolt against Moral ideas is a poetry of revolt against life ; a poetry of indifference towards moral ideas is a poetry of indifference towards life." অর্থাৎ যে কাব্য সুনীতির বিদ্রোহী, তাহা মনুষ্যজীবনেরও বিদ্রোহাচরণ করে ; যে কাব্য সুনীতিরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন, তাহা মনুষ্যজীবনের সম্বন্ধেও উদাসীন। সুতরাং যে কাব্য দ্বারা মনুষ্যজীবনের সার ভাগ ব্যাখ্যাত হয়, তাহা সুনীতির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। কবির আর্ট যদি প্রকৃত মনুষ্যজীবন অবলম্বনে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তবে তাহাতে অবশ্যই সুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

আর এক জন বিখ্যাত সাহিত্যসমালোচক এ বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়াছেন। সি, টি, উইনচেষ্টার তাঁহার "Some Principles of Criticism" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"We may lay it down as a general rule, then, that these emotions which are intimately related to the conduct of life are of higher rank than those which are not ; and that, consequently, the emotions highest of all are those related to the deciding forces of life, the affections and conscience. There is no surer test of the permanent worth of a book than this – Does it move our sympathy with the deepest things of human life ? If it does not, whatever other virtues it may have, it is not great literature. If this be true, the highest literature must always have a distinctly ethical character. And it has not a didactic, but an ethical character. Other things being equal, that literature must be the best, which exerts such emotions as tend to invigorate and enlarge our nature—in a word healthy emotions. We must dissent entirely from those critics who would measure literature as well as art, by its power to give an order of pleasures with which, as they claim morality has nothing to do. The maxim 'Art for art's sake' is meaningless, and is employed usually as an apology for a weak or licentious art. Art exists not for its own sake, but to

minister to the pleasures of man; and that art certainly is the highest which ministers to the highest pleasure.* *

অর্থাৎ একখানা গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে কি না, তাহার পরীক্ষা কি? না, তাহা মনুষ্য-জীবনের গভীরতম ভাবের সম্বন্ধে আমাদের সমবেদনার উদ্রেক করে কি-না। যে গ্রন্থ তাহা করে না, তাহা অন্য বিষয়ে ভাল হইলেও উচ্চতম সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ কথা সত্য হইলে উচ্চতম সাহিত্য-মাত্রেই সুনীতির পরিপোষক হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা স্কুলপাঠ্য নীতি-গ্রন্থ (Moral Text book) হইবে না। আর সব বিষয়ে সমান হইলে, সেই সাহিত্য-গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা আমাদের স্বভাবের স্বাস্থ্যকর ভাব সকলের পরিপুষ্টি দ্বারা মনুষ্যত্বের উৎকর্ষবিধান করে। যাঁহারা বলেন, আর্ট ও সাহিত্য যে পরিমাণে আমাদের মনে সুখ দেয়, সেই পরিমাণে তাহারা উৎকৃষ্ট, সুনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারি না। "আর্টের জন্যই আর্ট" —এই প্রবচনের কোন অর্থ নাই। দুর্ব্বল অথবা দুর্নীতি-পোষক আর্টের সমর্থন করিবার জন্যই ইহার দোহাই দেওয়া হয়। আর্টের জন্যই আর্ট নহে, মানুষের সুখ সম্পাদন করিবার জন্যই আর্টের প্রয়োজন। আবার সেই আর্টই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা মনুষ্যের উচ্চতম সুখবিধান করিতে পারে।

কিন্তু এ স্থলে যদি আপত্তি করা হয় যে, সাহিত্য মনুষ্য-জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইবে, ভাল হউক, মন্দ হউক, সমগ্র মনুষ্য-জীবনটাকেই যথাযথভাবে দেখাইবে, মানব-চরিত্রের সৎপ্রবৃত্তি, অসৎপ্রবৃত্তি সকলই কবির কাব্যের বিষয় হইবে, আর্ট মনুষ্য জীবনের সর্ব্বপ্রকার ভাব ও অবস্থার উপর পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপন করিতে চায়, নতুবা আর্টের সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে উইনচেষ্টার বলেন,—

"To all this we answer, first, and most obviously, that literature depicts human life and character with some end in view; not merely for the sake of depicting them. And the end, in the case of other forms of literature specailly concerned in this discussion —poetry and fiction—is to awaken emotion. But if the depiction of any phase of human life arouse only unpleasant repulsive or degrading emotions then such depiction is forbidden by the purpose of literature as well as the laws of morality."

অর্থাৎ প্রথমতঃ, সাহিত্য মনুষ্যজীবন ও মানবচরিত্র যথাযথভাবে অঙ্কিত করে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও শুধু চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্যে কেহ চিত্র অঙ্কন করে না, চিত্রাঙ্কনের একটা উদ্দেশ্য অবশ্য থাকে। পদ্য ও গদ্যকাব্য বা উপন্যাস রচনায় সে উদ্দেশ্য কি? না, পাঠকপাঠিকার মনে অনুভূতি বা রসের (emotions) উদ্রেক করা। কিন্তু মনুষ্যজীবনের কোন চিত্র যদি পাঠকের মনে ঘৃণা, কলুষতা বা বীভৎস ভাবের উদ্রেক করে,—যাহা দ্বারা আমাদের মন উচ্চভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়, তবে সেরূপ চরিত্র-চিত্রণদ্বারা সাহিত্যের উদ্দেশ্য বিফল হয়, এবং তাহা সুনীতির মস্তকে কুঠারাঘাত করে।

যদি বল, সাহিত্যকে সুনীতির শাসন যে মানিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। এরূপ অনেক গ্রন্থ আছে, যাহাতে কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও সত্য-দৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে সুনীতির মর্য্যাদা সর্ব্বথা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া, তাহা কি সৎসাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবে না?

ইহার উত্তরে আর একটা প্রশ্ন করা যায়—সৎ-সাহিত্যের পক্ষে সুনীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা একান্ত প্রয়োজন কি না? উক্ত সমালোচক বলেন,—"This question may be confidently answered in the negative. Such immoral influence is never really a part of literary value, nor the price of it. The books are great not because of

* "Some Principles of Criticism"—by C. T. Winchester, Professor of English Literature, Wesleyan University.

their moral deficiencies but in spite of them. In some of the works of Byron, the 'Don Juan' for instance, or in the poetry of Musset, there is great brilliancy of imagination etc. * * * but these excellences are not heightened by the license with which both poets are chargeable. There is no reason why our judgment upon such work should not be discriminating, recognising at once its poetic merit, and its moral defects; but we need not admit that the moral defects are essential to the poetic excellences or serve in any wise to heighten them."

অর্থাৎ—এ কথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, দুর্নীতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে এবং ইহা কোন গ্রন্থের সাহিত্যিক গুণ অথবা মূল্য বৃদ্ধি করে না। কোন দুর্নীতি-কলুষিত গ্রন্থ যদি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহা সেই দুর্নীতির জন্য নহে, দুর্নীতির দোষ অতিক্রম করিয়া। বায়রণ এবং মুসের কোন কোন গ্রন্থ তাঁহাদের প্রখরোজ্জ্বল কল্পনাশক্তিবলে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থে যে দুর্নীতির স্বেচ্ছাচারিতা দৃষ্ট হয়, তাহার দ্বারা সেই কল্পনাশক্তি প্রখরতা লাভ করে নাই। এই সকল গ্রন্থের বিচার করিতে বসিলে আমরা যেমন তাহাদের কবিত্বের প্রশংসা করিব, তেমনই তাহাদের দুর্নীতি-পরায়ণতার জন্য আবার নিন্দাও করিব। * তাহাদের দুর্নীতিপরায়ণতা কবিত্বশক্তির অত্যাবশ্যক অঙ্গ নহে, অথবা তাহাকে পরিপুষ্ট করে না।

আমার অনেক সিদ্ধান্তের সহিত উইনচেষ্টারের মতের আশ্চর্য্য রকম মিল দেখিতেছি। সেইজন্য তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক কথা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তিনি আরও বলেন,—

"For, notice, critics of every school insist (as we shall see in a following chapter) that one requsite of excellence in any depiction of human life is truth, fidelity to the laws of human nature. But the facts of man's moral nature are certainly as real and as important as any other facts.—Nay, in literature they are of supreme importance. At the very foundation of character lie the moral intuitions, at the foundation of any scheme of human actions, the moral laws. The sentiment of Duty is universal, absolute. Disobedience to it brings inevitably dulness of perception and weakness of purpose, and ends at last in ruin. These are facts; let the man of letters be true to them.—" [pp. 114—15].

অর্থাৎ—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, মনুষ্যজীবনের চিত্রাঙ্কন ততই উৎকৃষ্ট হইবে—যত তাহা সত্যের অনুসরণ করিবে ও মানব-চরিত্রের মূলসূত্র অবলম্বন করিবে। মানবজীবনের অন্যান্য সত্য ঘটনার মধ্যে মানবের Moral natureও (নীতি-চরিত্র) একটা অত্যন্ত সত্য ও প্রয়োজনীয় ঘটনা। কেবল তাহাই নহে, সাহিত্য বিষয়ে তাহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মানবজীবনের মূলভিত্তি হইতেছে সুনীতিসঙ্গত প্রবৃত্তি (Moral Intuition); মানবের প্রত্যেক কার্য্যের মূলে নৈতিক প্রভাব বিদ্যমান। মানবের কর্ত্তব্যস্পৃহা একটা সার্ব্বভৌম প্রবৃত্তি। সেই কর্ত্তব্য-স্পৃহাকে অবহেলা করিলে, মানবের অনুভবশক্তি ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কর্ম্মের প্রবৃত্তি দুর্ব্বল হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষা সকল হীনতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এগুলি মানবজীবনের সত্য ঘটনা। সাহিত্যিককে এই সত্য ঘটনা মানিয়া চলিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি চিরন্তন সত্য এই যে, বিশ্বব্যাপারের এক জন নিয়ন্তা আছেন,—তাঁহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য কিরণ বিতরণ করিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে, মৃত্যু সকলকে সংহার করিতেছে,—

* লেখক তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" পুস্তকে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সমালোচ্য পুস্তকের দোষ-গুণ বিচার করিয়াছেন।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

—কঠোপনিষৎ।

তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া চন্দ্রের ন্যায় তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।"

—গীতা।

যাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, এবং তজ্জন্য জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেনৈব কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥"

—গীতা।

যিনি সত্যের উপাসক, তত্ত্বদর্শী কবি হইবেন, তাঁহাকে জীবজগতের এই নৈতিক শৃঙ্খলা স্বীকার করিতেই হইবে। বিধাতার চিরন্তন নিয়মানুসারে জীবজগতে ও মনুষ্যচরিত্রে যে অহরহঃ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কবিকে তাহা অবশ্যই মানিয়া চলিতে হইবে। এই সকল সত্যকে তিনি যদি সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারেন, তবেই তিনি কবি। এই সকল জগদ্ব্যাপার কখনও শিববিহীন হইতে পারে না, কারণ, শিববিহীন যজ্ঞমাত্রই পণ্ড হয়। কি জগদ্ব্যাপার, কি মানবসমাজের ক্রমবিবর্ত্তন, কি মানবচরিত্রের ক্রমপরিবর্ত্তন,—ইহার প্রত্যেকের মূলে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব গূঢ়রূপে নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং কবি যেমন সত্য ও সুন্দরের উপাসক হইবেন, তেমনই তাঁহাকে শিবেরও উপাসনা করিতে হইবে। "সত্যং শিবং সুন্দরং" — আর্টের মূলমন্ত্র। বিশ্বনিয়ন্তা আদি, কবি স্বয়ং সত্য শিব সুন্দর। যিনি সেই আদি-কবির সৃষ্টিপ্রণালী অনুসরণ করিয়া, ঈশ্বরদত্ত আর্টের সাহায্যে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত কবি। তাঁহার আর্ট কখনও ধর্ম্মনীতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না, তাঁহার আর্টের সহিত মোরালিটীর নিত্যসম্বন্ধ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

তাপসী রাবেয়া

নগরের কোলাহল হ'তে,
বহু দূরে নিরালা নির্জনে,
ক্ষুদ্র এক গুহার ভিতরে ;
সর্ব্বত্যাগী তাপসী রাবেয়া,
ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নে রত—
কোলাহল পরিহরি দূরে।
সপ্ত দিন অন্তে একবার,
এক খণ্ড রুটী আর জল,
তুষ্টমনে করেন গ্রহণ।
মুখে সদা কোরাণের বাণী,
হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে,
প্রেমময় রূপ অনুক্ষণ।
কত বর্ষা কত গ্রীষ্ম গত,
ধান-রতা তাপসী রাবেয়া,
কিছু তার না পান জানিতে।

ধ্যানময়ী ধ্যানে নিমগনা,
এ বিশ্বের তুচ্ছ কোলাহল
নাহি পারে সে ধ্যান ভাঙ্গিতে।
এক জন অনুচর তাঁর,
এক দিন শরত-প্রদোষে,
সম্বোধিয়া কহিলা তাঁহারে ;—
"সাজিয়াছে প্রকৃতি কেমন—
কি মহান্ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির,
একবার দেখুন বাহিরে।"
মৃদু হাসি কহিলা রাবেয়া ;—
"দেখ আসি ভিতরে প্রবেশি,
স্রষ্টার কি মহিমা অপার!
বাহিরের সৌন্দর্য্যে কি ফল,
স্রষ্টার সৌন্দর্য্যে যদি নাহি
পূর্ণ হয় হৃদয়-ভাণ্ডার।"

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা পাল।

কৈলাস-যাত্রা

সপ্তদশ অধ্যায়

এ সময়ের একটা কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটা এই যে, মানস-সরোবর আমার চর্ম্মচক্ষুর নিকট হইতে দূর-তর হইলেও আমার কল্পনার নয়নে সর্ব্বদা প্রতিভাত হইয়াছিল। মানস ও রাবণহ্রদের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের (পাড়ের) উপর হইতে যখন প্রথম দর্শন করিয়াছিলাম—কৈলাস পরিক্রমার সময় যখন কৈলাস হইতে এ অঞ্চলের মানস-বিমোহন অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর হইয়াছিল—তাহার পর যু-গুম্ফার নিকট রজনীমুখে ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতার মধ্যে তারকাকরোজ্জ্বল, তরঙ্গমণ্ডিত, কনক-কমলশোভিত মৃদুমন্দ মধুর পবনবাহিত মানসমোহন মানস আমার মানস-নয়নে যখন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত নানা-জাতীয় জলচর পক্ষিপরিশোভিত মানসের তট দিয়া যখন দীর্ঘ পথ অতিক্রমণ করিয়াছিলাম, সেই সময়ের বিক-সিত সৌন্দর্য্য, এই সকল মিলিত অনুভব, যখন বৃষভারূঢ় হইয়া গমন করিতেছিলাম, তখন যুগপৎ আমার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইতেছিল।

আবার কখন অদ্ভুত-চরিত্র লামাদের কথা মনে হইতে লাগিল। এক জন মৌনী লামার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অনেকে এই অতিবৃদ্ধ লামাকে ভারতীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে আমার দেশের কল্যাণকথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইঙ্গিত করিয়া উত্তর প্রদান করেন। সে উত্তর আমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি হস্ত উত্তোলিত করিয়া অঙ্গুলিপঞ্চক বিস্তার করিলেন, অনন্তর পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ একত্র করিয়া পদ্মাকারে পরিণত করিলেন, তদনন্তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সঙ্গবিবর্জ্জিত সাধু মহাশয় আমাকে গমন করিতে ইঙ্গিত করেন। এই প্রহেলিকার অর্থ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে নানা প্রকার করিতে পারেন। কিন্তু সাধু মহোদয়ের ঈপ্সিত অর্থ কি, তাহা ঘোর অন্ধকারে আবৃত। সে সময় আমি যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহা বিবৃত করিলাম। তাহা গ্রহণ বা পরিত্যাগ পাঠক-পাঠিকাগণ ইচ্ছা অনুসারে করিতে পারেন। তিনি অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া যেন দেখাইলেন, আমরা বহুধা বিভক্ত ভারতবাসী একতাবিহীন—বা নায়ক-বিহীন, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া দুর্ব্বল। যখন এই জাতি এক নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, বা সাধারণ স্বার্থসাধন জন্য নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সময় চিরদিনের প্রবাদবাক্য যে "পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়" ইহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া অন্ন-গ্রহণাদি সময়ে একত্র হইয়া থাকে, একত্র হইলে—প্রণয়সূত্রে গ্রথিত হইলে—বৈষম্য বিদূরিত হইলে—অথবা বিপন্ন হইলে সেই পঞ্চধা বিভক্ত অঙ্গুলি একত্র হইয়া—মুষ্টিবদ্ধ হইয়া নিজেকে রক্ষা বা আক্রমণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া থাকে। নিজের কথা সকলের প্রিয় বোধ হইয়া থাকে। আমার এই কল্পিত অর্থ সে সময় আমার অপ্রিয় বোধ হয় নাই। এইরূপ নানা প্রকার ভাবনায় আমি ভাবিত হইয়া পরমানন্দে তাকলাকোট অভি-মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

তাকলাকোট অভিমুখে যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই প্রস্তরকঙ্করপরিপূর্ণ কান্তারের পরিবর্ত্তে সলিলসিক্ত সরস শস্যশ্যামল ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণকালে ভুটিয়াবাজারে উপস্থিত হইলাম। সকলে স্বীয় স্বীয় আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইল। যাত্রীরা যাত্রার কথা—সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়া ভারমুক্ত হইল। আমি আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীকে আমার কথা কহিতে না পারাতে কি যেন অসম্পূর্ণতা বোধ করিতে লাগিলাম।

প্রত্যাগমনকালে তাকলাকোটে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সময় আমার পুত্র শ্রীমান্ জগন্নাথের নিকট হইতে একখানি পত্র পাই। তাহাতে লিখিত ছিল, পত্র পাঠমাত্র যেন আমি বাড়ীতে আসি। বাড়ীর সকলেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী, আর আমার ছোট কন্যাটি মুমূর্ষু। পত্র পাঠ করিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম। যদি কোন স্থানে বিশ্রাম না করিয়া প্রতিদিন গমন করি, তাহা হইলেও ১৬.১৭ দিনের কমে বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিব না। এই সময়ের মধ্যে আরোগ্যলাভ বা প্রথগতি এই উভয় বিষয়ে

আমি কিছুই করিতে সমর্থ হইব না, সুতরাং বাড়ীর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের উপর সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এখানে ব[illegible]য়া রাখি, গৃহে যাইয়া সকলকেই স্বাস্থ্যসম্পন্ন, আর আমার মুমূর্ষু কন্যা, যাহাকে ডাক্তার দেখিয়া আসন্নকালের কথা কহিয়াছিলেন—আত্মীয়-স্বজনরা ক্রন্দনরোল শুনিয়া সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, সেই রাত্রি হইতে তাহার জননীর কাতর প্রার্থনায় আরোগ্যলাভ করিতে থাকে।

যে কয় দিন তাকলাকোটে ছিলাম, লামা সাধু সন্ন্যাসি-দর্শন ব্যতীত সে দেশের বাণিজ্যের বিষয়ও কিছু কিছু অনুসন্ধান করিতাম। সে দেশে ভেড়ার লোম প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কলের সাহায্যে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিলে প্রচুর লাভ হইতে পারে। জলের শক্তি বৃথা নষ্ট হইতেছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তিব্বতীদের আলস্য আর আমাদের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব বলিয়া এই দুর্দ্দশা।

এক দিন আমার এক বন্ধু ভুটিয়ার দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় এক জন তিব্বতী স্বর্ণরেণু বিক্রয় করিতে আগমন করে। দেখিয়া বোধ হইল, অতি উত্তম স্বর্ণ। তাহাদের মুখে শুনিলাম, কৈলাস অঞ্চলে সোনার খনি আছে। সেই স্থান হইতে ইহারা গুপ্তভাবে স্বর্ণ আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। একবার মনে হইয়াছিল, নমুনাস্বরূপ কিছু সোনা কিনি। কিন্তু নানারূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিলাম। তিব্বত নানা প্রকার খনিজ-পদার্থে পরিপূর্ণ। চেষ্টা করিলে খনিবিদ্যাবিৎ ভারতবাসী নানা প্রকার বহুমূল্য খনিজপদার্থের সন্ধান পাইতে পারেন। আমাদের জম্বুদ্বীপ (শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধরা আমাদের এ সকল দেশকে জম্বুদ্বীপ বলিয়া থাকেন। আমরাও সঙ্কল্পকালে জম্বুদ্বীপ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি।) সম্বন্ধে য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞান চিরকালই অগাধ। তাঁহাদের এক জন লিখিয়াছেন, (মারকোপোলি) এক রকম পিপীলিকা সুবর্ণ উত্তোলন করিয়া থাকে। যাউক্ সে সব কথা। এক দিন বাঙ্গালী তিব্বতকে ধর্ম্ম দিয়াছেন, বর্ত্তমানকালে আর্থিক উন্নতিকল্পে ইঁহারা সাহায্য করিলে উভয়েই লাভবান্ হইবেন।

ঝব্বু সংগ্রহে বিলম্ব হওয়াতে তাকলাকোট ছাড়িতে বিলম্ব হইয়াছিল। ৭ই আগষ্ট সকাল সকাল ভোজন করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করি। পদব্রজে কর্ণালী পার হইলাম। আমাদের গমনপথে স্থানে স্থানে পানচাক্কী দেখিতে পাওয়া গেল, গ্রামবাসীরা যবাদি চূর্ণ করাইতেছে। কোথাও বা তিব্বতী নারীরা বস্ত্র প্রক্ষালন করিতেছে; কোথাও বা ভারবাহী ঝব্বু ও মেষ সকল দলে দলে নদী পার হইতেছে; ইহা দেখিতে দেখিতে আমরা অপর পারে নদীর উচ্চতটের উপর আরোহণ করিলাম। লিপুলেখ পথ শীঘ্র শীঘ্র পার হইবার জন্য আমরা একটু ব্যস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু ঝব্বুওলা রাস্তার সমীপবর্ত্তী তাহাদের গৃহে গমন করিয়া বিলম্ব করিতে লাগিল। আমরা নিকটবর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্র আর তাহাতে আগাছার প্রস্ফুটিত নয়নরঞ্জন পুষ্প দেখিয়া, আর মটর-ক্ষেত হইতে কড়াইশুটি সংগ্রহ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিয়াছিলাম।

আসিবার সময় যে সকল জলপূর্ণ পার্ব্বত্য নদী দেখিয়াছিলাম, এ সময় সেগুলিতে অধিক জল ছিল না, ঝব্বু চড়িয়াই অনায়াসে পার হইয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পালার নিকটবর্ত্তী হওয়া গেল। এই স্থানে কাশ্মীরী সেনানী বস্তিরাম, তিব্বতী সেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পর্য্যুদস্ত হইয়াছিলেন—তিব্বতীরা তাঁহার যাহা না করিতে পারিয়াছিলেন, তুষারপাত তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিকতর বিপন্ন করিয়াছিল। ভারতীয় সৈন্যের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। সেই সকল হৃদয়বিদারককাহিনী স্মরণ করিয়া পালার প্রান্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম।

পালায় কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া আবার অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এক্ষণে ধীরে ধীরে লিপুলেখ পথের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম। রাস্তায় কতিপয় ভুটিয়া ব্যবসায়ী তাকলাকোটে গমন করিতেছে দেখিলাম। আর দেখিলাম, এক জন খঞ্জ কতকগুলি ভারবাহী মেষ লইয়া লিপুলেখ হইতে অবতরণ করিতেছে। ভগবানের কৃপা হইলে, আর উদ্যম থাকিলে পঙ্গুও হিমালয়ের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বত অবলীলাক্রমে অতিক্রমণ করিয়া থাকে।

চড়াইএর কঠিন স্থানে ঝব্বু পরিত্যাগ করিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে গমন করিয়া লিপুলেখ লা-তে (লা তিব্বতী শব্দ—অর্থ গিরিপথ) উপস্থিত

হইয়াছিলাম। মধ্যাহ্নকাল অতিক্রমণ করিয়া এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলাম। মনে মনে ভয় হইয়াছিল, পাছে তুষারপাতে বিপন্ন হই। সৌভাগ্যক্রমে হিমানীপাতের কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নাই। চতুর্দ্দিক নির্ম্মল ছিল, সূর্য্যদেব কুজ্ঝটিকাজাল দূর করিয়া দেওয়াতে অতিদূরের দৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সাধুমহাত্মার দেশ—লামার রাজ্য—গৌড়বাসীর ধর্ম্মপ্রচারক্ষেত্র–নগ্নপ্রকৃতির লীলানিকেতন তিব্বত একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। নয়ন যেন সে দিক হইতে ফিরিতে চাহে না—অস্থির মন যেন কৈলাস মানসের দেশে সুস্থির হইয়া অবস্থান করিতে চাহে। এরূপ অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ তথায় অতিবাহিত করিয়া অনিচ্ছায় ভারতের দিকে নামিতে লাগিলাম। বহু দূর বরফের উপর দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। দুই ধারে জীববাসের অযোগ্য—অনন্তকাল হইতে বজ্রাঘাতে বিশীর্ণ তুঙ্গ শৃঙ্গ সকল দেখিতে দেখিতে নামিতে লাগিলাম। আগমনকালে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প দেখিয়াছিলাম, এখন গমনপথের অধিকাংশ স্থল রক্ত-পীতাদি বর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হওয়ায় অত্যন্ত রমণীয় হইয়াছিল।

যাঁহারা পর্ব্বত দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে পর্ব্বত কিরূপ, তাহা বুঝান বড়ই কঠিন। কুম্ভীরের পৃষ্ঠের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। ইহার কাঁটা বা গাঁট যেমন পিঠের উপর ক্রমে ক্রমে উঁচু হইয়াছে, পর্ব্বতও সেইরূপ। পর্ব্বত সকল শ্রেণীবদ্ধ; ইহার মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। যাঁহারা এ বিষয় অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। উচ্চ শৃঙ্গ হইতে উঠিয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পর্ব্বতের বৃদ্ধি আছে। উচ্চ হিমালয়ের বৃদ্ধি হইতেছে কি না, তাহা প্রমাণিত হয় নাই, কিন্তু নিম্ন হিমালয়ে শৈবালিক পর্ব্বতশ্রেণী যে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ভারতের সমতল ভূমি হইতে ধূলি বায়ুযোগে নীত হইয়া হিমালয়ের বৃদ্ধিসাধন করিয়া থাকে। এরূপ ভাবে বৃদ্ধি অপেক্ষা হিমালয়ের ক্ষয় বড় কম হয় না। বর্ষাকালে হিমালয়ের অঙ্গ ধৌত করিয়া প্রচুর পরিমাণে মৃত্তিকা-মিশ্রিত আবিল জল সমতল ভূমিতে নীত হইয়া থাকে। তাহাও আমরা বর্ষাকালে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ভূকম্পে উন্নতি ও অবনতি সাধিত হয়। যাঁহারা এ সকল বিষয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিবেন, তাঁহারা ইহার অনুসন্ধান করিবেন। আমি তীর্থযাত্রী—অবৈজ্ঞানিক, ইহা আমার আলোচনার বিষয় নহে।

জীবজন্তুবনস্পতিবিহীন মৃতপ্রায় হিমালয় হইতে ধীরে ধীরে অবতরণ করিয়া সজীব হিমালয়ের প্রান্তভাগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপস্থিত হই। এ স্থানের নাম কালাপানি। আগমনকালে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাহা হইতে ইহা প্রায় এক মাইল উত্তরে। এ স্থানে রায় সাহেব গোবরিয়া পণ্ডিতের একখানি দ্বিতল বাংলা আছে। সেই বাংলায় আমরা রাত্রিযাপন করি। অনেক দিন এরূপ গৃহে অবস্থান করি নাই; মনে হইল, যেন দেশের নিকট-বর্ত্তী হইতেছি।

ভোজনবিপর্য্যয় ও পরিশ্রম জন্য আজ আমার পেটের পীড়া দেখা দিল। আম ও রক্তমিশ্রিত পেটের পীড়া হইয়াছিল। আমার যাত্রার সময় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন কবিরাজ মহাশয় কতকগুলি ঔষধ দিয়াছিলেন, সে ঔষধ অনেক রোগীকে বিতরণ করিয়াছিলাম। পেটের পীড়ার প্রথম অবস্থায় "সিদ্ধ প্রাণেশ্বর" বটিকা সেবন করিয়া আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়াছিলাম। পর্ব্বতযাত্রীর নিকট পেটের পীড়ার ঔষধ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। গত বৈশাখ মাসে প্রায় ৪ শত মাইল হিমালয়ে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এই ভ্রমণকালে আমি পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হই। আমার সহযাত্রীরা আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও আমার নিজের দোষের জন্য প্রায় ৪ মাস রোগভোগ করিয়াছিলাম। রোগের প্রথম অবস্থায় যদি রোগ দূর করিবার প্রতি-বিধান করিতাম, তাহা হইলে, বোধ হয়, দীর্ঘকাল কষ্ট পাইতে হইত না।

গোবরিয়া পণ্ডিতের বাসায় সুখে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে পুনরায় আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা কখন দেবদারু-বনের ভিতর দিয়া, কখন বা পীতপুষ্পশোভিত সর্ষপক্ষেত্রের শোভা দেখিতে দেখিতে, কখন বা প্রস্ফুটিত গোলাপ-বনের মধ্য দিয়া উচ্ছলিত কালীর কূলের উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলাম। আজ চড়াই উৎরাই খুব কমই ছিল, রাস্তা অনেকটা সমতল।

বসুমতী প্রেস] মানস-কৈলাস। [শিল্পী—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু

সমতল ভূমির উপর দিয়া যাওয়াতে আমাদের গমন-ক্লেশটা অনেকটা কম হইয়াছিল। বনভূমির প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে অপরাহ্নকালে সুপরিচিত গারবাংএ পুনরায় উপস্থিত হইলাম।

অষ্টাদশ অধ্যায়

গারবাংএর জনসাধারণ আমার যেন পরম আত্মীয়ে পরিণত হইয়াছিলেন। আমাকে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহারা যথেষ্ট প্রীতিপ্রকাশ করেন। আর প্রীতিপ্রকাশ করেন, পোষ্ট ও স্কুলমাষ্টার লক্ষ্মীধর পণ্ডিতজী ও স্কুলের ছাত্ররা। তাঁহাদের সৌজন্য আমার মানসপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে।—রুমাদেবীর আগ্রহে আর কুলী-সংগ্রহে বিলম্বের জন্য বাধ্য হইয়া এই স্থানে এক দিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই স্থানের ভারবাহীরা কোনরূপে সসা-চৌদাসের নীচে যাইতে রাজী হয় না। তাহাদের যুক্তি—নিম্নের দেশ বড় গরম; তথায় যাইলে অসুখে পড়িবে। অগত্যা তাহাদের কথায় আমাকে বাধ্য হইয়া সম্মত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, কুলী-সংগ্রহ রুমাদেবী করিয়াছিলেন বলিয়া এত শীঘ্র সংগ্রহ হইয়াছিল।

অবস্থানের, দিনের অনেক সময় স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ও ছাত্রদের মধ্যে কাটাইয়াছিলাম। পণ্ডিত মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, কালীর উপর ভুটিয়াদের প্রস্তুত পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমাকে নিরাপানির অত্যন্ত দুর্গম রাস্তা দিয়া গমন করিতে হইবে। কেমন করিয়া যে আমি তাহা অতিক্রমণ করিব, সে বিষয় তিনি একটু চিন্তিতও হইয়াছিলেন। তাঁহার চিন্তা দেখিয়া আমিও একটু অবসন্ন হইয়াছিলাম। কি করা যায়, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" আর রাস্তা নাই। ইহা যেন ক্ষুরধারা হইতেও ভীষণ।

প্রাতঃকাল হইল; কুলী আসিল; আমিও গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার সুখের ও দুঃখের সাক্ষী গারবাংকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। গমনের পূর্ব্বে একবার স্কুলে গেলাম; শিক্ষক ও ছাত্র সকলের নিকট বিদায় লইলাম। কৈলাসে গমন সময় পুনরায় দেখা হইবে, এই জন্য সে সময় তাঁহারা হাসিয়া বিদায় দিয়াছিলেন, এ সময় অনেকে ম্লানমুখে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। রুমাদেবী তাঁহার কতিপয় সঙ্গিনীসহ আমাদের অনুগমন করিলেন। তিনি গারবাংএর সীমা পরিত্যাগ করিয়া বুধির উপরিভাগ পর্ব্বতের মস্তক পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। গমনকালে নানাপ্রকার বন্য ফল তুলিয়া তাঁহারা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সে সময় তাহা অতীব সুমধুর বোধ হইয়াছিল। তাঁহাদের সহিত বিদায়কালের দৃশ্য আমার কাছে চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। অনেক সময় গৃহ হইতে অনেক দূর প্রদেশে গমন করিয়াছি; আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, সখাসখী কাতরভাবে বিদায় দিয়াছেন। এ বিদায় সে বিদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বিদায়কালে অশ্রুজলে দেবীর গণ্ডদেশ সিক্ত হইয়াছিল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়াছিল, আর তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত দৃষ্টি আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অতি কষ্টে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অবতরণ করিবার পূর্ব্বে একবার চারিদিক দেখিয়া লইলাম। নেপালের দিকে চিরতুষারাবৃত তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বত সকলও দেখিয়া লইলাম। আমাদের অবতরণের সহিত আমাদের কল্যাণকামনা করিয়া সঙ্গিগণ সহ দেবী মঙ্গলগীত গান করিয়াছিলেন। যখন ভুটিয়াদের আত্মীয়স্বজন দূরদেশে গমন করেন, সেই সময় ভুটিয়া রমণীরা এই স্থানে বিস্তৃত শিলার উপর উপবেশন করিয়া প্রিয়জনের কল্যাণকামনা করিয়া গান গাহিয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় এই দূর প্রদেশেও আমরা দেবীর আত্মীয়তালাভে বঞ্চিত হই নাই।

বুধি, আমাদের পদতলে অবস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন গ্রামের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। আগমনকালে যখন পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছিলাম, তখন অনেক ক্লেশে শরীর হইতে "কাল ঘাম" বাহির করিয়া উপরে উঠিয়াছিলাম। এখন অবলীলাক্রমে অল্প সময়ে নীচে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখনও রুমাদেবী পর্ব্বতমস্তকে ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। বুধি পরিত্যাগ করিয়া যখন পর্ব্বতের অপর দিকে গমন করিয়াছিলাম, যখন আমরা তাঁহাদের চক্ষুর অগোচর হইলাম, তখন তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন। এই মহীয়সী মহিলার মহিমান্বিত মধুর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

ভুটিয়ারা স্বাবলম্বী, ব্যবসায়ী ও উদ্যমশীল। ইঁহারা প্রাণের প্রতি মমতা না রাখিয়া অভীষ্টসাধনে তৎপর।

তিব্বতের ভৌগোলিক জ্ঞানবিস্তারপক্ষে ইঁহারা যেরূপ অধ্যবসায়, ক্লেশ ও সহিষ্ণুতা ও বিপদে ধীরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা তিব্বতের ভৌগোলিক ইতিহাসে বিস্ময়ের সহিত পঠিত হইবে। কিষণসিং, নেমসিং, রামসিং, লাল-সিং প্রভৃতির নাম চিরকাল ভক্তিসহকারে পূজিত হইবে। ইঁহারা সময় সময় দস্যুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে, তথাপিও কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। তাঁহারা লামা সাজিয়া ধর্ম্মচক্রের ভিতর গোপনে যন্ত্র রাখিয়া গমনকালে প্রত্যেক পদবিক্ষেপ হস্তস্থিত মালায় গণিয়া মাইলের হিসাব করিয়াছিলেন। অবকাশ পাইলে ভারতবাসী এরূপ কঠোর কার্য্য করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করিতে পারেন। ভুটিয়াদের এই সকল অবদানপরম্পরা আলোচনা করিয়া ও নানাপ্রকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণকালে মালপার ডাকহরকরাদের কুটীরে উপ-স্থিত হই।

গারবাংএ অবস্থানকালে ডাকহরকরাদের সহিত পরি-চিত হইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে এ স্থানে যে ব্যক্তি ছিল, সে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। গমনকালে যে গুহায় রাত্রিবাস করিয়াছিলাম, সেই গুহায় আর এক রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

রজনীপ্রভাতের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আজ নিরাপানির দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিতে হইবে। পাঠক! রাস্তার নামেই এ রাস্তায় জলের অভাব সূচিত হইয়া থাকে। মালপা পরিত্যাগের কিয়ৎ-ক্ষণ পরে আমি পথিভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। আসিবার সময় পথে জঙ্গল ছিল না; বর্ষার আগমনের সহিত ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম দীর্ঘাকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জঙ্গলের জন্য রাস্তা চিনিয়া গমন করা দুরূহ ব্যাপার। আমার কুলী একটু আগে চলিয়া গিয়াছে, রাস্তায় জনমানব নাই—সবই নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। আমি রাস্তা ছাড়িয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাস্তা হারাইয়া ফেলি। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক গমন করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। যদি হিংস্র জন্তুর সম্মুখে পড়িতাম, তাহা হইলে প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। এইরূপে বিপন্ন হইয়া কোন্ দিকে যাইব চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ আমার কর্ণগোচর হয়। অনেক চীৎকার করিয়া তাহাকে আমার অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া-ছিলাম। তাহার কৃপায় কুমার্গ পরিত্যাগ করিয়া সুমার্গে আগমন করিয়াছিলাম। তাহাকে কিছু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন দিয়া ত্বরিতগতিতে গমন করিয়া কুলীদের সহিত মিলিত হই। স্থানে স্থানে ভুটিয়ারা এই দুর্গম রাস্তার অত্যন্ত দুর্গম স্থান সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। এই সংস্কৃত রাস্তাতেও অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের গাত্রে হস্ত রাখিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। সময় সময় ঘাস ধরিয়া দীর্ঘ যষ্টির ও কুলীদের সাহায্যে নামিতে বা উঠিতে হইয়াছিল। পর্ব্বতের গাত্রে দেড় দুই হাত বিস্তৃত রাস্তা দিয়া গমন করিতে হইয়াছিল। এই সঙ্কীর্ণ রাস্তায় বর্ষায় বড় বড় তৃণ জন্মে; গমনপথে ইহাও বাধা প্রদান করিয়াছিল। এই স্থান হইতে পতন হইলে বহু সহস্র ফুট নিম্নে প্রবাহিতা প্রমত্তা কালীতে পড়িতে হইত। উপর হইতে যদি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পতিত হয়, তাহা হইলে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সুদীর্ঘ পথে কয়েক জন নেপালী কৈলাসযাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল মাত্র। অপেক্ষাকৃত একটু প্রশস্ত স্থানে দাঁড়াইয়া আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম। দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে কোনরূপে এই দুর্গম রাস্তা অতিক্রমণ করিয়া সায়ংকালের পূর্ব্বে সামখেলায় উপস্থিত হই।

গমনকালে এই স্থানে এক রাত্রি কাটাইয়াছিলাম। প্রধানের সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে দেখিয়া আনন্দের সহিত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। পর-দিবস চৌদাস-সসাতে উপস্থিত হওয়া গেল। গারবাংএর কুলী এই স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া চলিয়া গেল। এ স্থানে নূতন কুলী বন্দোবস্ত করা গেল। সে রাস্তার মধ্যে পদ্দু নামক গ্রামে গিয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে নাই। অগত্যা এই গ্রামে থাকিতে হইয়াছিল। এই দিনেই যাহাতে গমন করিতে পারা যায়, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করি-য়াছিলাম, কিন্তু কুলী পাওয়া যায় নাই। পরদিবস কোনরূপে কুলী সংগ্রহ করিয়া অগ্রসর হওয়া গেল। যখন ধবলীগঙ্গার পথে উপস্থিত হওয়া গেল, সে সময় এক জন কুলী কহিল, আমরা আর অগ্রসর হইব না। ইহাই খেলার সীমানা, মস্তকের উপর খেলা দেখিতে পাওয়া গেল। ইহা এক মাইলেরও বেশী দূর হইবে।

কুলীদের ইচ্ছা, এইরূপ চাপ দিয়া কিছু বেশী পয়সা আদায় করা। জবরদস্তী করিয়া আদায়ের আমি ঘোর বিরোধী; উহাদিগের মধ্যে এক জনকে কিছু মিশ্রী দিয়া সদয় ব্যবহারে বশীভূত করিয়া লইলাম। আমার বুকের পকেটে নোট গোল করিয়া রাখিয়াছিলাম। অপরকে কহিলাম, ইহা রিভলবার; যদি বেশী বদমাইসী কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলী করিয়া পদাঘাতে ধৌলীতে ফেলিয়া দিব। এই ধমকের ফল ফলিল। নিরীহ গো-বেচারীর মত সে মোট লইয়া উপরে পৌছাইয়া দিল।

খেলাতে আসকোটের এক জন ভদ্রলোকের বাস ছিল। তাঁহার বাসায় অবস্থান করিলাম। তিনি পরদিনের জন্য অন্য কুলী বন্দোবস্ত করিয়া রাখিলেন। তিনি এক দিন খেলাতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, তাঁহার অনুরোধ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলাম। খেলার ঘৃত এ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ; রাস্তার খরচের জন্য উহা কিছু সংগ্রহ করা গেল।

খেলা হইতে ধারচুলার রাস্তা নিতান্ত মন্দ নহে; কিন্তু দুই স্থানে পাগড় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রাস্তা অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল হইয়াছিল। প্রথম স্থানে গিয়া দেখি, রাস্তা ভাঙ্গিয়া গভীর গর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। কোন্ দিক্ দিয়া যে যাইব, যখন তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, সেই সময় এক জন ভুটিয়া আগমন করিয়া আমার পথিপ্রদর্শক হইয়াছিল। গাছের মূল ধরিয়া উপরে উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুরাতন রাস্তায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, আবার কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, অনেকটা ধস ভাঙ্গিয়া রাস্তা লোপ হইয়াছে, আর কাদা-পাতর সর্ব্বদাই উপর হইতে পড়িয়া রাস্তা ভীষণ করিয়া তুলিয়াছে।

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই ধারচুলায় পণ্ডিত লোকমণিজীর গৃহে উপস্থিত হই। পণ্ডিতজীর সাদর সম্ভাষণে ও আনন্দে আপ্যায়িত হইলাম। আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল ও নানা প্রকার ভোজ্যদ্রব্যে ভোজন সম্পন্ন করিলাম। পরদিবস প্রাতঃকালে আসিবার সময় উষ্ণ দুগ্ধে কদলী, চিনি ও ময়দা গুলিয়া প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করা হয়। বহু দিন এরূপ খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করি নাই, তাই বড়ই উপাদেয় বোধ হইয়াছিল। পণ্ডিতজী হিমালয়ের নানাপ্রকার ঔষধি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আমাকে তিনি কিয়ৎপরিমাণে বিশুদ্ধ শিলাজতু দিয়াছিলেন। আমার নিকট কতকটা পুরাতন তেঁতুল ছিল। এ প্রদেশে তেঁতুল দুষ্প্রাপ্য, তাহা তিনি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিয়া আমাকে আনন্দিত করিয়াছিলেন।

ধারচুলা হইতে বালবাকোটে গমন করি। তথাকার প্রধান মহাশয় যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে পরদিবস প্রাতঃকালে আসকোট অভিমুখে গমন করি। আবার গৌরী নদীর সুন্দর সেতু পার হইলাম। বর্ষার জন্য গৌরী প্রচুর পরিমাণে জল লইয়া কালীকে পরিপুষ্ট করিতেছে। গৃহের জলনির্গমনের জন্য পয়ঃপ্রণালী না থাকিলে জল বসিয়া যেমন বাড়ীর ক্ষতি হইয়া থাকে, পর্ব্বতের অবস্থাও সেইরূপ হইত; জল বসিয়া পর্ব্বতের মূল শিথিল হইত; তাহা হইতে ইহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রী প্রকৃতি দেবী জলনির্গমের জন্য এই সকল নদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। যেন এক বিন্দুও জল হিমালয়ে থাকিতে না পায়। যাহা হইতে নদীর উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকে সুরক্ষিত করিবার জন্য এই সকল নদীর সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরীর তট হইতে আসকোট প্রায় ২ মাইল চড়াই পার হইয়া যাইতে হয়। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া এই কড়া চড়া বড়ই ক্লেশপ্রদ হইয়াছিল। যতই উঠি—যতই পর্ব্বতের বাঁক ঘুরিয়া গমন করি, ততই যেন আসকোট দূরতর, বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে রাজওয়াড় সাহেবের প্রাসাদ নয়নগোচর হইল। রাস্তার অপর পারে একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মস্তকোপরি ইহা অবস্থিত। ইহা দেখিতে দেখিতে কিয়ৎক্ষণ অবতরণের পর আসকোটে উপস্থিত হইলাম। প্রথমবারে যখন আসকোটে প্রবেশ করি, তখন যেন এক প্রকার বিভীষিকা, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। আসকোট যেন আমাকে ইহা শীঘ্র পরিত্যাগ করিবার ইঙ্গিত করিতেছিল। এক্ষণে গ্রামে প্রবেশকালে বোধ হইল, ইহা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছে।

আসকোটে উপস্থিত হইয়া পোষ্ট আফিসে আশ্রয় লইলাম। ব্রাহ্মণ যুবক পোষ্টমাষ্টার আমাকে অকস্মাৎ দেখিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন; আর আমার আগমনবার্ত্তা কুমার নগেন্দ্রনাথ

করিলেন। মাষ্টার, আজ তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। ইত্যবসরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে এক জন থালায় করিয়া আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল লইয়া উপস্থিত হইল। আমি তাঁহার কাছারীর সুন্দর ঘরে থাকিবার জন্য আহূত হইলাম। উপস্থিত অন্ন পরিত্যাগ করা কোনরূপেই বিধেয় নহে; বিশেষতঃ আমার মত পথিকের পক্ষে কোনরূপেই নহে। কৈলাসদর্শনজন্য এ বৎসর যেরূপ আমার জীবনের স্মরণীয় বৎসর, সেইরূপ এই সুদীর্ঘ জীবনে কোন বৎসর আম্র-ভোগে বঞ্চিত হই নাই, এ জন্যও এ বৎসর আমার অনেক দিন মনে থাকিবে। যাঁহারা আমাকে প্রতিবৎসর আম পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করিতে করিতে আম্রের সার্থকতা সম্পাদন করা গেল। আজ আমার সঙ্গীর মহানুভাবুকতার ও বৈরাগ্যের যথার্থ পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাহা পাঠককে না জানাইলে আমি গুণগ্রহণ-শক্তিরহিত বলিয়া বিবেচিত হইব। তিনি বলিলেন, "আমি আম খাই না; আমাকে দিবেন না।" কথা কয়টি আমার কাছে বড়ই মধুর বোধ হইয়াছিল। কয়টি মাষ্টারকে দিয়া অবশিষ্ট আম আমারই ভোগে আসিয়াছিল। আমগুলি দেখিয়া বোধ হইল, অতি যত্নের সহিত সুরক্ষিত হইয়াছিল। আসকোটে আসিয়া বোধ হইল, যেন দেশেই আসিয়াছি।

ভোজনের পর কুমার সাহেবের লোক আমাকে তাঁহার কাছারী-ঘরে লইয়া গেল। আসন বিস্তার করিয়া সুখাসনে উপবিষ্ট হইলাম। আমার গমনের পর কলেরার প্রকোপ কিরূপ বাড়িয়াছিল, সেই সকল দুঃখপূর্ণ কাহিনী কুমার সাহেবের লোক বিবৃত করিতে লাগিল।

আমার বাসগৃহ হইতে এ স্থানের দৃশ্য চির-অভিনব। এই মধুর দৃশ্য যেন মানুষের শোক, তাপ, ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়, অন্ততঃ আমার পক্ষে তাহা হইয়াছিল। নিম্নে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র—নেপালের সুন্দর বন্য শোভা। কালীর গভীর গর্জ্জন ক্ষীণরবে পরিণত হইয়া সঙ্গীতের ন্যায় কর্ণগোচর হইতেছিল। কুমার নগেন্দ্রনাথ, কুমার খড়্গসিং (ইনি সরকারী কার্য্যে অনেকবার তিব্বতে গমন করিয়াছিলেন), অন্যান্য রাজকুমার সহ আমার কাছে আগমন করিয়া আমাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। আমি কৈলাস হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছি, হিন্দুর কাছে, বিশেষতঃ প্রাচীন প্রথানুযায়ী হিন্দুর কাছে আমি শ্রদ্ধার বস্তু হইয়াছিলাম। এই প্রথা প্রাচীন প্রথার ভগ্নাংশ কি না, তাহা জানি না। যাভাতে রেলে গমনকালে এক জন মক্কাপ্রত্যাগত যাত্রীর অভ্যর্থনা দেখিয়াছিলাম। তাঁহাকে আলিঙ্গন—তাঁহার শরীরস্পর্শ—এমন কি, তাঁহার বস্ত্র স্পর্শ করিবার জন্য জনগণের ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বালকরা ক্রীড়াকন্দুক গ্রহণ জন্য যেরূপ আগ্রহ দেখায়, সমবেত জনমণ্ডলীর আগ্রহ তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। এ স্থানে অবস্থানের প্রথম রাত্রিতে নর্ত্তকীর নৃত্য ও সঙ্গীত হইয়াছিল; পর-রাত্রিতে এ দেশবাসীর চক্রাকারে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্য ও গীত আমার বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। দিবাভাগে জঙ্গলের আদিম নিবাসী আনীত হইয়াছিল। ইহারা মনুষ্যসমাজে বড় বেশী আইসে না; নিভৃত বনে অবস্থান করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, তাহারা এক সময় এ প্রদেশের রাজা ছিল, এ জন্য তাহারা কাহারও কাছে মস্তক অবনত করে না। নিজেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বনমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। গত ভাদ্রের 'মাসিক বসুমতীতে' ইহাদের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি—নিষেধ সত্ত্বেও ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া এই ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়াছে, কৈ, তাহাতে ত এক মুহূর্ত্তের জন্য কোনরূপ চিত্তবিকার হয় নাই। আমার সংবর্দ্ধনার জন্য এই রাজসিক ব্যাপারে আমি মুগ্ধ হইলাম। অকস্মাৎ আমার কি মূল্য বৃদ্ধি পাইল, তাহা ভাবিয়াই আমি আকুল হইয়াছিলাম। এ সম্মান দরিদ্র ব্রাহ্মণের ধাতে সহে নাই। এই সম্মান হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আমি ব্যস্ত হইলাম; তাঁহারাও রাখিবার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। নিম্নগামী জলের গতি কেহ যেমন রোধ করিতে পারে না, আমারও অবতরণ সেইরূপ অবরুদ্ধ হয় নাই।

কথায় কথায় তাঁহাদের মুখে এক জন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এ স্থানে অনেক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন শুনিলাম। তিনি কোন কোন রাজকুমারকে ইংরাজী ও সঙ্গীতবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে হারমোনিয়ম আনাইয়া তাহাও বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন। সেই বাঙ্গালী সাধুর কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম।

আসকোট পরিত্যাগের পর বাড়ী আসিয়া মনে হইয়াছিল, আর ২।১ দিন তথায় থাকিলে মন্দ হইত না। এ জ্ঞানটা অনেক দেরীতে হইয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম।

আগমনকালে কুমার সাহেব আমাকে একখানি তিব্বতের সুন্দর আসন আর কিছু খাবার রাস্তায় খাইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এ স্থানে একটি মধুর কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কুমার সাহেবের একটি বালিকা কন্যা আমাকে এত ভালবাসিয়াছিল, আমার এত অনুগত হইয়াছিল যে, তাহারা "কলিকাতা যান্‌ছ?" অর্থাৎ কলিকাতায় যাইবে প্রশ্ন করিলে সে সহাস্যবদনে "যাইব" বলিয়া উত্তর দিত। এই সকল মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া আমি আসকোট পরিত্যাগ করিলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

শিশুর আবাহন

এস শিশু, এস দেবতা,
বহিয়া আনিলে এ মর মরতে
কোন্ অমরার বারতা!
নন্দন-বন গন্ধের মাঝে লুকায়ে ছিলে,
প্রেমের সরস পরশ বুঝি বা জাগায়ে দিলে,
মুকুতা ঝরিল অশ্রুতে তব
মাণিক ঝলিল হাসিতে,
ভালবাসা দিয়া গড়া তুমি তাই
আসিয়াছ ভালবাসিতে।
তোমার দেহের মাধুরী বাড়াক
শারদ জোছনারাশি গো,
মন্দাকিনীর অমিয়ার ধারা
অধরে ফুটাক হাসি গো;
মলয়ার শ্বাস মিশায়ে সুষমা ভরিয়ে দিক,
কণ্ঠেতে তব পঞ্চম স্বর ঢালুক পিক,
বিজলীর আলো চোখেতে জ্বলুক,
মেঘের কালিমা কেশেতে,
আর যাহা কিছু ভাল জগতের
সাজুক তোমার বেশেতে।
শুভাগত শিশু-দেবতা,
প্রণয়-কলহে মিলনের সেতু
ধরণীতে নব-আগতা!

শ্রীমতী প্রীতি দেবী

জাপানী নর্ত্তকী

জাপানের নর্ত্তকী-দিগকে 'গায়সা' বলে। বারবনিতাদিগের অপেক্ষা গায়সার প্রতিপত্তি ও সম্মান অধিক হইলেও, জাপানে সাধারণতঃ গায়সা নর্ত্তকীদিগকে লোক শ্রদ্ধা করে না। চায়ের দোকানে যখন কোনও গায়সা কর্ম্মগ্রহণ করে, তখন সে 'পঙ্কে পা ডুবাইয়া থাকে' (Sticks her foot in the mud), আবার যখন সে ঐ জীবনযাত্রা ত্যাগ করিয়া আইসে, তখন সে 'পঙ্ক হইতে পা তুলিয়া লয়'; গায়সা নর্ত্তকীদিগের সম্বন্ধে জাপানবাসীর এইরূপ ধারণা। বিবাহ করিলেই নর্ত্তকীর অতীত জীবনের সকল স্মৃতি লোক ভুলিয়া যায়, স্বামীর স্থায় সমাজে তাহার সমান আদর ও প্রতিপত্তিলাভ ঘটে। জাপানের বারবনিতা সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে। বিবাহ হইয়া গেলে, নারীর অতীত কলঙ্ক ধৌত হইয়া যায়।

নৃত্যনিপুণা গায়সা-যুগল। নৃত্যকলার সাহায্যে কিংবদন্তীকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে।

জাপানে কোনও পরিবারের কোনও কন্যা নর্ত্তকীর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা অবলম্বন করিলে, সে পরিবার সমাজে অতি হেয় হইয়া পড়ে—এত বড় লাঞ্ছনা কোনও গৃহস্থের স্পৃহণীয় নহে। এ জন্য সাধারণতঃ সম্ভ্রান্ত বা ভদ্রপরিবারের কোনও কন্যাই নর্ত্তকী হয় না। অতি নিম্ন-শ্রেণীর পরিবার হইতে গায়সার উদ্ভব। সমাজের নিম্নস্তরের গৃহস্থরা কন্যাদিগকে নর্ত্তকীর ব্যবসায় অবলম্বন করিবার অবকাশ দেয়। তাহাদের উপার্জ্জনলব্ধ অর্থ হইতে পিতামাতার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ ছয় বৎসর বয়সেই এই সকল বালিকা নর্ত্তকী-জীবনের শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সেই বয়স হইতেই আচার-ব্যবহার, চালচলন—সকল বিষয়েই ভব্য হইতে হইবে। এতটুকু বর্ব্বরতা তাহাদের ব্যবহারে থাকিবে না। পুষ্পবিন্যাস—অর্থাৎ কোন্ বর্ণের ফুলের পার্শ্বে কোন্ বর্ণের ফুল রাখিলে দেখিতে সুন্দর হইবে—শোভা বৃদ্ধি পাইবে, ইহাও গায়সা বালিকাকে শিখিতে হইবে। কিরূপে চা তৈয়ার করিতে হয়—লঘু, গাঢ় প্রভৃতি নানা প্রকার স্বাদবিশিষ্ট চা তৈয়ার করিবার প্রণালীতে তাহাকে সিদ্ধ হইতেই হইবে। 'টাইকো' বা ঢাক বাজাইবার কৌশলও তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়।

আট বৎসর বয়সে বীণাবাদন ও নৃত্যকলা শিক্ষার

ব্যবস্থা হয়। করপল্লব, বাহু, দেহ ও মস্তক শত শত ভঙ্গীতে দুলাইয়া, ঘুরাইয়া বালিকা নৃত্যকলার বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিতে থাকে। পাখা লইয়া নৃত্য করিবার শত প্রকার পদ্ধতি আছে। বালিকা তাহাও শিখিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গীতচর্চ্চা আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃ কুমারীর কণ্ঠস্বর অতি কোমল ও মধুর। কিন্তু জাপানী গায়িকার কোমল কণ্ঠ হইলে চলিবে না। তত্রত্য সঙ্গীতজ্ঞরা চাপা, ধাতব-পাত্রের ঠন্-ঠন্ ধ্বনির ন্যায় কণ্ঠস্বরের পক্ষপাতী। সুতরাং জাপানী গায়িকার কণ্ঠস্বরকে তদুপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, ধরা, ভরা স্বর ছাড়া আর কিছুই তখন থাকে না। ইহার পর সে কণ্ঠ হইতে আর মধুস্রাবী স্বর নির্গত হয় না—শুধু একটা কর্কশ, কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেমন ঠন্-ঠন্ শব্দ হয়, সেইরূপ একটা তীব্র শব্দ বাহির হইতে থাকে। তখন সে আর গান গায় না। কিন্তু বালিকা তখনই গায়িকা বলিয়া পরিগণিত হয়।

তাহার পর বালিকাকে 'টুজুমি' বাজাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহা শুষ্ক চর্ম্মাবৃত করতালজাতীয় ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ,

বালিকারা নৃত্য শিক্ষা করিতেছে। পরিণামে ইহারাই 'গায়সা' পর্য্যায়ে উন্নীত হয়।

উপায় অতি সহজ। শীতকালে—যখন খুব জোরে শীত পড়ে, সেই সময় আট বৎসরের ক্ষুদ্র গায়সা বালিকা খুব ভোরে উঠিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে থাকে। ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনও সম্বন্ধ নাই—তাহাকে গাহিতেই হইবে। দরজা, জানালা খোলা থাকিবে, শীতল বাতাস হু হু করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কুজ্ঝটিকা অথবা তুষারপাত যাহাই কেন হউক না, তখনও তাহাকে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে হইবে। যতক্ষণ সূর্য্যোদয় না হইবে, তারস্বরে তাহাকে চীৎকার করিতে হইবে, ইহার ফলে বালিকার অস্থিরা বাজাইতে হয়। একসঙ্গে তিনটি এইরূপ যন্ত্র হস্ত দ্বারা ধরিয়া বাজাইতে পারিলে বালিকার প্রশংসা হয়। গায়সা যদি অশেষ মেধাশালিনী হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'কোকিও' (এক প্রকার বেহালাজাতীয় তারের যন্ত্র) বাজাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। 'কোটো' যন্ত্র লইয়া সঙ্গীত করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। এই তারের যন্ত্র হইতে সুর বাহির করা সহজ নহে। যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা শবদেহাধারের (Coffin) মত। ইহাতে ১৩টি তার সন্নিবিষ্ট থাকে। সাধারণতঃ

সম্ভ্রান্তবংশীয়া যুবতীরা 'কোটো' যন্ত্রে সঙ্গীতালাপ করিয়া থাকেন।

যে বালিকা অল্পবুদ্ধি, চা-দোকানের অধ্যক্ষ তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু বালিকা বুদ্ধিমতী হইলে অধ্যক্ষ তাহার ভাবী শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকে। নবীনা গায়সা অধ্যক্ষের চায়ের দোকানে বিনা বেতনে কিছুকাল নৃত্য-গীত করে। তাহার পর তিন বৎসর অধ্যক্ষ গায়িকার পিতামাতাকে বৎসরে ১ শত ইয়েন্ (দেড় শত টাকা) করিয়া মোট ৩ শত ইয়েন প্রদান করে। যদি নর্ত্তকী সুন্দরী ও মনোহারিণী হয়, তবে আরও কিছু বেশী অর্থ দিয়া থাকে। কিন্তু গায়সা স্বয়ং এক কপর্দ্দকও পায় না। সে যেমন দরিদ্র তেমনই থাকে। তাহার জনক-জননী চা-পান করে, ধূমপানে আনন্দ উপভোগ করে এবং পাখার বাতাস খাইয়া চাঁদের সুধা পান করিতে থাকে! কন্যা চায়ের দোকানে নাচিয়া, গাহিয়া প্রত্যেক কপর্দ্দকটি পিতামাতাকে দান করে। ইহাই তাহার বিধিলিপি।

সুন্দরী গায়সা। বাহিরের সংস্পর্শে আসিয়া গায়সার মানসিক ক্রমোন্নতি কিরূপ দ্রুত বর্দ্ধিত হয়, ইহার আননে তাহা সুস্পষ্ট।

যুবতী গায়সার নানারূপ মিষ্ট নামকরণ হইয়া থাকে, যথা—"প্রথমা"; "ধনী"; "উমেকা" বা কুলগন্ধী; "হারুকা; বা বসন্তসৌরভ; "ওটাফুকু" বা অপ্রিয়দর্শনা; "সেন্‌মাৎসু" বা সহস্র-তরু-বীথি; "এমিকা" বা হাস্যময়ী শুভেচ্ছা প্রভৃতি। অধ্যক্ষ কাহারও কাহারও নাম রাখে, "শ্বেত তুহিন"; "ক্ষুদ্র প্রজাপতি" ইত্যাদি।

'শ্বেত তুহিন' বা 'ক্ষুদ্র প্রজাপতি' নামধারিণী গায়সা নগরের ধনী ও বড় বড় হোটেলওয়ালাদিগকে পত্র লিখিয়া জানায় যে, সে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছে। অবশ্য চা-দোকানের অধ্যক্ষের নির্দেশ অনুসারেই সে এইরূপ পত্র লিখিয়া থাকে কখনও কখনও চাউল অথবা

বেশভূষা ও কেশপ্রসাধনের বিশিষ্টতাবশতঃ ইহাদিগকে নর্ত্তকী বলিয়া চিনিতে পারা সহজ।

টোয়ালে উপঢৌকনস্বরূপ পত্রের সঙ্গে প্রেরণ করে। প্রেরিকার নামও সেই সঙ্গে থাকে। নগরের সম্ভ্রান্ত ধনীদিগের গৃহে সময়ে সময়ে সে অধ্যক্ষের সমভিব্যাহারেও গমন করে। সেই সময় জনৈক পরিচারক তাহার শিরোদেশে ছত্রধারণ করিয়া থাকে; এক জন পরিচারিকা তাহার ছাপান নাম-লিখা পরিচয়পত্রপূর্ণ ঝুড়িটি বহন করিয়া তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে ফিরিতে থাকে।

প্রথম শ্রেণীর গায়সা, যন্ত্রসংযোগে গান গাহিতেছে।

অপরিসর গলি বা রাজপথের উপর দিয়া সে যখন হাঁটিয়া যায়, পথের লোক সহাস্যে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে। গায়িকার বেশভূষা তখন খুবই আড়ম্বরপূর্ণ; পুষ্পনির্য্যাসের ঘন সুগন্ধ তাহার বস্ত্র হইতে নির্গত হইয়া চারিদিকের বাতাসকে প্রফুল্ল করিয়া তুলে। রাজ্ঞীর ন্যায় গম্ভীরভাবে সে পথ চলিতে থাকে।

কোনও হোটেল বা পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষ অভিবাদন করিয়া হোটেল স্বামীকে বলে, "মাননীয় মহোদয়, শ্বেত তুহিন সুদক্ষা নর্ত্তকী। আমি তাহাকে আপনার কাছে আনিয়াছি, ইহার প্রতি আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন।" স্বত্বাধিকারী তখন 'আম্‌তা আম্‌তা' করিতে করিতে সকলকে ভিতরে আসিতে অনুরোধ করেন। নর্ত্তকী তাহার 'গেটা' বা কাষ্ঠপাদুকা ত্যাগ করিয়া এমনভাবে নত হইয়া অভিবাদন করে যে, সকলেই তাহার চমৎকার শিরাভরণ ও মূল্যবান্ কোমরবন্ধ দেখিতে পায়। ইহার দুই এক দিন পরেই স্বত্বাধিকারী চারিদিকে নিমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন; তখন যুবতী নর্ত্তকী তাহার নৃত্যকলা প্রদর্শনের সুযোগ পায়। এইরূপ ব্যাপারে সে অত্যন্ত সাবধানে নৃত্য করিয়া থাকে।

জাপানী চা-এর দোকানে গায়সা গান গাহিতেছে।

এইরূপে একবার নাম রটিয়া গেলে, তখন নর্ত্তকী চায়ের দোকানে ফিরিয়া আইসে। সেই সময় হইতে তাহার নর্ত্তকীর জীবন বা

নবীনা নর্ত্তকীত্রয়।

গিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত অজস্র আছে। নর্ত্তকীরা অতিথি-দিগের আজ্ঞাকারিণী হইয়া থাকে; কিন্তু যখন কোনও অতিথি বলিয়া বসে 'যোরোসি'—"বহুৎ আচ্ছা, আর নয়", তখনই নর্ত্তকী তাহার কাছ হইতে চলিয়া যাইবে।

চিরদিন সকল গায়সাকে নর্ত্তকীজীবন যাপন করিতে হয় না। কোনও উপার্জ্জন-ক্ষম পুরুষ রূপমুগ্ধ হইয়া কোনও নর্ত্তকীকে বিবাহের প্রস্তাব করিলেই, সেই গায়সা অমনই পবিত্র দাম্পত্যজীবন বরণ করিয়া লয়। তখন তাহার অতীত জীবনসম্বন্ধে কেহ কোনও উচ্চবাচ্য করে না। পরিণীতা স্ত্রী হইয়া সে সুখে-স্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতে থাকে। কেহ কেহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া আমোদ-প্রমোদেই সারাজীবন কাটাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ প্রেমে পড়িয়াও বিবাহ করে না। একবার একটি সুন্দরী নর্ত্তকী কোনও রঙ্গালয়ের এক অভিনেতার

আরম্ভ। যখন দোকানে কোনও অতিথি না আইসে, সে সময় নর্ত্তকীরা কিরূপে রাত্রি অতিবাহিত করে, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ সে সময় তাহারা আপনা আপনি নৃত্য করে, গান গায় এবং ক্রীড়া করে। পুরুষ-শূন্য কক্ষে তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া অগ্নির উত্তাপ উপভোগ করে এবং সময়ে সময়ে নলসাহায্যে ধূম-পান করিয়া সময় অতিবাহিত করে।

এই নর্ত্তকীদিগের কেশপ্রসাধনে এক বেলা সময় লাগে। রাত্রিতে নিদ্রাকালে স্কন্ধের নিম্নে এক টুকরা কাঠ রাখিয়া দেয়। ইহাতে তাহাদের মস্তকের আভরণ বিশৃঙ্খল হইতে পায় না।

অনেক সময় উপার্জ্জিত অর্থ ইহারা অধ্যক্ষের অগোচরে লুকাইয়া রাখে এবং পিতামাতাকে পাঠাইয়া দেয়। ইহাদের কবলে একবার পড়িলে কাহা-রও নিস্তার নাই। কত রেশম-বণিকের পুত্র, স্নানাগারের অধ্যক্ষ ইহাদের কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। বেচারা নাবিক পর্য্যন্ত মায়াবিনীদের কুহকে পড়িয়া শেষ কপর্দ্দকটি তাহাদিগকে দিয়া

গায়েসা যুবতী প্রণয়লিপি লিখিতেছে।

প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিল। পরিণামে ২৩ বৎসর বয়সে তাহাকে মনের দুঃখে ইহলীলা শেষ করিতে হয়।

কোন কোন নর্ত্তকী একটু বয়স হইয়া গেলে, সে ব্যবসা ত্যাগ করিয়া নবীনা গায়সাকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়া থাকে। অধিকাংশেরই জীবন এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া থাকে। জাপানী নর্ত্তকীরা অতি চমৎকার নৃত্য করিয়া থাকে। মনে হইবে যেন পরীরা নন্দনবনে অতি লঘুগতিতে নৃত্য করিতেছে।

কিংবদন্তী আছে, একবার জাপান সম্রাট—মিকাডো টায়ু শিকার-ব্যপদেশে অরণ্যমধ্যে ঝটিকাগ্রস্ত হয়েন। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া একটি ক্ষুদ্র 'ফার' গাছের তলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃক্ষটি সম্রাটকে আশ্রয় দিবার জন্য অকস্মাৎ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। সম্রাট এই ঘটনাটিকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটি নৃত্যে উহাকে মূর্ত্তি দিবার আদেশ করেন। নর্ত্তকীরা প্রকৃতই নৃত্যকলার সাহায্যে এই ঘটনাটিকে দর্শকের সমক্ষে মূর্ত্ত করিয়া তুলে। জাপানের অধিকাংশ নৃত্যই কোন না কোন কিংবদন্তীকে অবলম্বন করিয়া প্রদর্শিত হয়।

যাহারা পূর্ব্বজীবনে গায়সা বা নর্ত্তকী ছিল, তাহারা পরিণতবয়সে শিক্ষয়িত্রীর কায অবলম্বন করে। কোনও বালিকা নর্ত্তকী হইবার বাসনায় কোনও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলে, সেই নৃত্যবিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীকে নবীনা নর্ত্তকীর উপার্জ্জনলব্ধ সমুদয় অর্থ তিন বৎসর ধরিয়া প্রদান করিতে হয়।

জাপানী নৃত্য যেমন চমৎকার, তেমনই মনোজ্ঞ। বার্ণার্ড ফেলারম্যান নামক কোনও লেখক জাপানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এমন কোমল মনোমুগ্ধকর ও মধুর নৃত্য তিনি আর কোনও দেশে কোথাও দেখেন নাই।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

নববলে বলীয়ান—য়ুরোপের রোগী তুর্কী

বাঙ্গালার জনতত্ত্ব

(বিগত সেন্সাস রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত)

বর্ত্তমান বাঙ্গালার মোট আয়তন ৮২ হাজার ২ শত ৭৭ বর্গমাইল এবং বিগত লোকগণনায় মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৪ শত ৬২ জন বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ইহা হইতে কোন্ বিভাগের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ এবং কোন্ বিভাগের জনসমাজের কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইতেছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

বিভাগ	বর্গমাইল	মোট লোক-সংখ্যা	প্রতি বর্গ-মাইলের জনসংখ্যা	গত দশবৎসরে শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধির হার
বর্দ্ধমান—	১৩৮৫৪	৮০৫০৬৪২	৫৮১	হ্রাস ৪.৯
প্রেসিডেন্সী—	১৭৪১০	৯৪৬১৩৯৫	৫৪৩	বৃদ্ধি ০.৪
রাজসাহী ও কুচবিহার—	২০৩৬৫	১০৯৩৮১৫৩	৫৩৮	„ ১.৯
ঢাকা—	১৪৮২২	১২৮৩৭৩১১	৮৬৬	„ ৭.১
চট্টগ্রাম—	১৫৮২৬	৬৩০৪৯৬১	৩৯৮	„ ১০.৭
সমগ্র বাঙ্গালা	৮২২৭৭	৪৭৫৯২৪৬২	৫৭৯	„ ২.৮

উপরের তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার দিক দিয়া বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। বর্দ্ধমান বিভাগের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ত দূরের কথা, বরং কমিয়া গিয়াছে; প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগের বৃদ্ধিও একপ্রকার নগণ্য, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই বাঙ্গালার মুখ রক্ষা করিয়াছে; এই দুই বিভাগের জনসংখ্যা-বৃদ্ধির দ্বারাই বাঙ্গালা ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক লোকবল-সম্পন্ন। এই দুই বিভাগই বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর স্থান এবং সরকারী রিপোর্টের মতে এই দুই বিভাগের জনসংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, বাঙ্গালাদেশের লোক কি অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।—

সময়		বৃদ্ধির অনুপাত (শতকরা)
১৮৭২—৮১	...	৬৭
১৮৮১—৯১	...	৭.৫
১৮৯১—১৯০১	...	৭.৭
১৯০১—১১	...	৮.০
১৯১১—২১	...	২.৮

জনসংখ্যা ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ৪০ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বাড়িতে থাকিয়া, গত ১০ বৎসরে হঠাৎ পূর্ব্বেকার সিকি অংশ হইয়া যাওয়া বড়ই আশঙ্কাজনক। বাঙ্গালীজাতির জীবনীশক্তিতে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, ইহাই তাহার প্রমাণ। দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতির প্রকোপ, দারিদ্র্যের পেষণ এবং অতিরিক্ত মাত্রায় শিশুমৃত্যুর বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণেই বাঙ্গালীজাতি ধ্বংসের মুখে যাইতে বসিয়াছে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব

বাঙ্গালাদেশের প্রতি বর্গমাইলের লোকসংখ্যার সহিত আরও কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনা করা যাইতেছে—

দেশের নাম	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা
১। বঙ্গদেশ	৫৭৯
২। ঐ (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, স্বাধীন-ত্রিপুরা ও দার্জ্জিলিং বাদে কেবল বাঙ্গালার সমভূমি	৬৪০
৩। ইংলণ্ড ও ওয়েলস্	৬৪৯
৪। বেলজিয়ম	৬৬২
৫। যুক্তপ্রদেশ	৪১৪
৬। বিহার ও উড়িষ্যা	৩৪০
৭। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী	২৭৯
৮। পঞ্জাব	১৮৪
৯। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী	১৪৩

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়া

দেখিলে বাঙ্গালা ভারতের সর্ব্বপ্রথম স্থান পাইতে পারে এবং এ বিষয়ে পৃথিবীর অত্যন্ত ঘনবসতিযুক্ত কয়েকটি দেশের প্রায় সমকক্ষ।

বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মালদহ, দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলায় নানা কারণে ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির হ্রাস ও স্বাভাবিক বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। এই কারণে এ কয় জিলায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে ৪ শতেরও কম! বাঙ্গালার ২টি স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত অধিক। একটি স্থান, কলিকাতার উপরে ও নীচে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থিত কলকারখানার অঞ্চলগুলি। এ স্থানগুলি স্বাস্থ্যকর না হইলেও কলকারখানা ও ব্যবসায়ের অনুরোধে বহু কুলী-মজুর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। আর একটি ঘনবসতিযুক্ত অঞ্চল, পূর্ব্ববাঙ্গালার পদ্মা ও মেঘনার উভয় পার্শ্বস্থিত স্বাস্থ্যকর ও উর্ব্বর স্থানগুলি। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের এক-পঞ্চম অংশ অপেক্ষাও কম স্থানে প্রতি বর্গমাইলে ৭ শত ৫০ জনের অধিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৪৪ ভাগ স্থানই এইরূপ ঘনবসতিযুক্ত এবং পূর্ব্ববঙ্গের এক-পঞ্চম অংশেরও অধিক স্থানে প্রতি বর্গমাইলে ১ হাজার ৫০ জনেরও অধিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি বর্গমাইলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের ঐ পরিমাণ স্থানের উৎপন্ন শস্যের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রতিপালনে সমর্থ।

সহর ও পল্লীগ্রাম

বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৩২ লক্ষ ১১ হাজার ৩ শত ৪ জন, অথবা হাজারকরা ৬৭ জন মাত্র সহরে বাস করে। কলিকাতা ও উহার উপকণ্ঠগুলি বাদ দিলে বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৪ জন মাত্র সহরবাসী দাঁড়ায়। গড়ে সমগ্র ভারতে শতকরা ১০ জন নগরে বাস করে। অপর পক্ষে ইংলণ্ড ও ওয়েলস্‌এর শতকরা ৭৯ জনই সহরে বাস করে। দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালীজাতি বিশেষভাবে পল্লীবাসী, পল্লীর আবেষ্টনই বঙ্গমাতার প্রকৃত বিহারস্থল।

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের যে সকল সহর ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র নহে, সে সকলের লোকসংখ্যা প্রায়ই ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। অপরপক্ষে যে সকল সহর কলকারখানা বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সে সকলের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যে ভদ্রেশ্বর, বৈদ্যবাটী, ভাটপাড়া, টিটাগড়, বজবজ, গাড়ুলিয়া, নৈহাটী, কামারহাটী প্রভৃতি স্থানের লোকসংখ্যা গত ১০ বৎসরে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কয়েকটি সহরের লোকসংখ্যা গত ১০ বৎসরে কি অনুপাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

১।	রংপুর	শতকরা	১৬ জন
২।	দিনাজপুর	"	১৩ "
৩।	জলপাইগুড়ী	"	২৭ "
৪।	বগুড়া	"	৩৫ "
৫।	সৈয়দপুর	"	৬৩ "
		(রেলওয়ে কেন্দ্র)	
৬।	ঢাকা	"	১০
৭।	নারায়ণগঞ্জ	"	১০
৮।	মাদারীপুর	"	৩৩
৯।	চাঁদপুর	"	১৯
১০।	মৈমনসিংহ	"	২৭
১১।	বরিশাল	"	১৯
১২।	চট্টগ্রাম	"	২৫
১৩।	কুমিল্লা	"	১৪

কলিকাতা এবং হাবড়া ও কলিকাতার সংলগ্ন ৫টি মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত স্থানের লোকসংখ্যা কি হারে বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

খৃষ্টাব্দ		মোট জনসংখ্যা
১৮৮১	...	৮২৯১৯৭
১৮৯১	...	৯৩২৪৪০
১৯০১	...	১১৪৫৯৩৮
১৯১১	...	১২৭২২৭৯
১৯২১	...	১৩২৭৫৪৭

প্রত্যহ আফিসের সময় মফঃস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় যে লোক আসিয়া থাকে, তাহাতে কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় জনসংখ্যা শতকরা ২০ জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা

বাঙ্গালায় অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বিষয়টি প্রত্যেক বাঙ্গালীরই বিশেষ চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শ্রমশিল্প, কুলীমজুরের কায প্রভৃতি নানাবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে বাঙ্গালী নিজের দেশে দিন দিন "কোণঠাসা" হইয়া পড়িতেছে। এ ভাবে আরও কিছুদিন চলিলে বাঙ্গালী সত্য সত্যই "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া পড়িবে। বাঙ্গালায় অ-বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সংখ্যার একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

কোন্ দেশ হইতে আগত			সংখ্যা
১।	বিহার ও উড়িষ্যা	...	১২২৭৫৭৯
২।	যুক্তপ্রদেশ	...	৩৪৩০৯৫
৩।	আসাম	...	৬৮৮০২
৪।	মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	...	৫৪৮১০
৫।	রাজপুতানা	...	৪৭৮৬৫
৬।	মাদ্রাজ	...	৩২০২৪
৭।	পঞ্জাব ও দিল্লী	...	১৭৭১৫
৮।	সিকিম	...	৪০৫৭
৯।	ব্রহ্মদেশ	...	২৩৬১
১০।	নেপাল	..	৮৭২৮৫
১১।	য়ুরোপ	...	১৩৩৫৬
১২।	চীনদেশ	...	৩৮৫৬

এ দিকে বাঙ্গালা দেশ হইতেও কয়েক লক্ষ লোক বাঙ্গালার বাহিরে অর্থোপার্জ্জনের জন্য গিয়াছে। কিন্তু বিদেশগামী বাঙ্গালীর সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে আগত অ-বাঙ্গালীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক কম। বাঙ্গালার বাহিরে কোথায় কত বাঙ্গালী আছে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া গেল—

১। আসাম ... ৩৭৫৫৭৮
(বেশীর ভাগ মৈমনসিংহ হইতে)

২। ব্রহ্মদেশ ... ১৪৬০৮৭
(বেশীর ভাগ চট্টগ্রাম হইতে)

৩। বিহার ও উড়িষ্যা ... ১১৬৯২২

যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে কত বাঙ্গালী আছে, তাহার বিবরণ রিপোর্টে নাই, তবে ইহা ঠিক যে, ঐ সমস্ত স্থানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি নগণ্য। বাঙ্গালী মাড়োয়ারী বা ভাটিয়াদের মত ব্যবসা করিতে বা বিহারী ও উড়িয়াদের মত কায়িক শ্রম করিবার জন্য বিদেশে খুব কমই গিয়া থাকে। বিদেশে যে সকল বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রধানতঃ কেরাণী, শিক্ষক, উকীল বা ডাক্তার। এ বিষয়ে বাঙ্গালীদের পঞ্জাবী ও ভাটিয়া প্রভৃতির নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করিবার আছে। বাঙ্গালা দেশের স্বভাবতঃ উর্ব্বর ভূমি এবং আর্দ্র আব-হাওয়া বাঙ্গালী চরিত্রের দৃঢ়তা, উদ্যম ও কার্য্যকুশলতা অনেক কমাইয়া দিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"সপ্ত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে মানুষ করনি।"

বিভিন্ন সম্প্রদায়গত সংখ্যা

বিগত ৪০ বৎসরের লোকগণনার বিবরণ পাঠ করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালার বিভিন্ন সম্প্রদায় সমানভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা খুব কাছাকাছি ছিল। সে সময়ে হিন্দু ছিল, শতকরা ৪৮·৮২ আর মুসলমান ছিল ৪৯·৬৯। কিন্তু গত ৪০ বৎসরের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের অপেক্ষা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু জাতির বৃদ্ধির হার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছিল এবং গত ১০ বৎসরের বিবরণে দেখা যায় যে, **বাঙ্গালী হিন্দু বৃদ্ধি না পাইয়া সত্য সত্যই কমিয়া গিয়াছে।** বাঙ্গালায় হিন্দু জাতির ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বোধ হয় ইহাই প্রথম। বাঙ্গালী হিন্দুর এই শোচনীয় ও আশঙ্কাজনক ক্ষয়সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। আশা করি, এই গুরু বিষয়টির প্রতি প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিম্নলিখিত-রূপ :—

সম্প্রদায়		সংখ্যা		শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি
		১৯২১	১৯১১	১৯১১—২১
১।	মুসলমান	২৫৪৮৬১২৪	২৪২৩৬৭৫৬	+৫.২
২।	হিন্দু	২০৮০৯১৪৮	২০৯৪৫৩৭৯	-০.৭

৩।	প্রেতোপাসক	৮৪৯০৪৫	৭৩০৭৮০	+১৬·২
৪।	বৌদ্ধ	২৭৫৭৫৯	২৪৬৮৬৬	+১১·৪
৫।	খৃষ্টান	১৪৯০৭৫	১২৯৭৪৬	+১৪·৯
৬।	জৈন	১৩৩৬৯	৬৭৮২	+৯৭·১
৭।	ব্রাহ্ম	৩২৮৪	২৯৫৮	+১১·০
৮।	শিখ	২৩৮০	২২২৪	+৭·১
৯।	ইহুদী	১৮৫১	১৯৯৩	—৭·৩
১০।	কংফুচীয়	১৪৪৩	১০৫৮	+৩৬·৪
১১।	জোয়ারেষ্ট্রীয়	৭৭০	৬১১	+২৬·০
১২।	আর্য্যসমাজী	২১৪	২০	....

বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন বিভাগের হিন্দুমুসলমান সংখ্যার অনুপাত যদি তুলনা করা যায়, তবে দেখা যায় যে, এক প্রেসিডেন্সী বিভাগ ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগেই হিন্দুর সংখ্যার অনুপাত গত দশ বৎসরের মধ্যে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান সংখ্যার অনুপাত প্রায় সকল বিভাগেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।—

সাম্প্রদায়িক অনুপাত, প্রতি দশ হাজারে

বিভাগ	মুসলমান		হিন্দু	
	১৯২১	১৯১১	১৯২১	১৯১১
বর্দ্ধমান	১৩৪৪	১৩৪৪	৮২০৭	৮৩১৯
প্রেসিডেন্সী	৪৭৩২	৪৮৩৪	৫০৪৭	৫০২৩
রাজসাহী ও কুচবিহার	৫৯৮২	৫৯২৭	৩৭৩৮	৩৯২১
ঢাকা	৬৯৬৯	৬৮৩৪	২৯৭০	৩১০২
চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা	৭০৪৬	৭০০০	২৬০১	২৬২০

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মাড়োয়ারীর সংখ্যা মাত্র ৯ হাজার ৭ শত ৯৭ ছিল, কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ৫ হাজার ৫ শত ২৪ হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে উত্তরবঙ্গে, বিশেষতঃ রংপুরেই মাড়োয়ারীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদেও তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। পূর্ব্ববঙ্গে এখন পর্য্যন্তও মাড়োয়ারীগণ আসর জমাইয়া উঠিতে পারে নাই, সে অঞ্চলের ব্যবসায় এখনও পর্য্যন্ত তিলি ও সাহাদের হাতে আছে।

শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা

বাঙ্গালায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা হাজারকরা মাত্র ১ শত ৪ জন। যাহারা অন্ততঃ একখানা পত্র লিখিতে বা পড়িতে পারে, এইরূপ লোককেই "শিক্ষিত" (literate) বলিয়া ধরা হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রী স্বতন্ত্র ভাবে ধরিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় হাজারকরা ১ শত ৮১ জন পুরুষ ও মাত্র ২১ জন স্ত্রীলোক লিখাপড়া জানে!! যাহা হউক, পাদপশূন্য দেশে এরণ্ড বৃক্ষের ন্যায় এই সামান্যসংখ্যা লইয়াই বাঙ্গালা দেশ ভারতে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম—ব্রহ্মদেশ (শিক্ষিত হাজারকরা ৩ শত ১৭)। অন্যান্য প্রদেশের অনুপাত—মাদ্রাজ ৯৮, বোম্বাই ৮৩, আসাম ৬৩, বিহার ও উড়িষ্যা ৫১, পঞ্জাব ৪৫। কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারকরা কত জন লিখাপড়া জানে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—

সম্প্রদায়	হাজার করা শিক্ষিতের হার	
	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	২৬৮	৩৬
মুসলমান	১০৯	৬
দেশীয় খৃষ্টান	৩১৭	১৬৪
বৌদ্ধ	১৬৯	১৯
প্রেতোপাসক	১৪	১

বিভাগ হিসাবে ধরিলে প্রেসিডেন্সী বিভাগে হাজারকরা শিক্ষিতের হার ১ শত ৪৩, বর্দ্ধমান ১ শত ২৭, চট্টগ্রাম ৯৩, ঢাকা ৯০, রাজসাহী ৭৫।

কোন্ ব্যবসায়ে কত জন লোক নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের দ্বারা মোট কত জন পোষ্য পরিজন প্রতিপালিত হইতেছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

ব্যবসায়	মোট সংখ্যা পোষ্য সহ	প্রকৃতকর্ম্মী	
		পুরুষ	স্ত্রী
১। কৃষি ও পশুপালন	৩৭৪২৯৮৫২	১০৮২৪৭০৬	১২৬৪৫১২
২। খনির মজুর	৯৭৪৭১	৩৮২৫৮	২৯০৭৩
৩। কলকারখানা ও গৃহশিল্প	৩৬২১৮৩১	১২৪৫৫৯৯	৪২৮৬৯১
৪। যানবাহন	৭৩১৪৯০	৩৫৪০০৪	১৭৭৯৯
৫। ব্যবসায়বাণিজ্য	২৪৩৯৮৫৯	৮০১৪৪৭	১৮২৫৫৮
৬। সৈন্য, পুলিস ইত্যাদি	১৭৭৬৫৭	৬৮৫৬৫	....
৭। সরকারী কর্ম্মচারী	১৪৪২৬৯	৪৭৮৯৩	৪০৪
৮। কেরাণী,ডাক্তার প্রভৃতি	৭৮৩২৮৮	২৩৬৬৫২	১৬৭৭০
৯। সম্পত্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল	৩৭৪৪২০	১০২০৬	৩৪৪০

১০। গৃহ-ভৃত্য	৬৮৮২৬৮	৩৩৮৮৮১	১১৬৩৬৫
১১। বিবিধ	৯৮০১৮৭	৪০৫৫৩০	৫৪৩৯৩
১২। ভিক্ষুক, বেশ্যা, নর্ত্তক, বাদক প্রভৃতি	৪৫২৮৭০	১৫৮২০২	১৫৭৮৮২

কৃষি ও পশুপালকের দ্বারা বাঙ্গালার চার পাঁচএর অংশ লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ইহাই বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের দ্বারা শতকরা মাত্র ৭৷৷০ প্রতিপালিত হইতেছে। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বড় বড় কলকারখানাগুলিতে বাঙ্গালী শ্রমিক অপেক্ষা অ-বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশী। যানবাহনে মাত্র শতকরা ১৷৷০ জন, পুলিস, চৌকীদার ও সৈনিক শতকরা ০'৪, অন্যান্য সরকারী চাকুরে ০'৩, উকীল, ডাক্তার, মাষ্টার ও কেরাণী প্রভৃতিতে সর্ব্বসাকুল্যে মাত্র শতকরা ১৷৷০, দাসদাসী প্রভৃতি শতকরা ১৷০। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরীতে (যাহার জন্য শিক্ষিত লোকগণ পাগল হইয়া ছুটাছুটি করে) অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রতিপালিত হইতেছে এবং হইতে পারিবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় চাকুরীর প্রত্যাশায় পুনঃ পুনঃ প্রতারিত না হইয়া কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের দ্বারা স্বাধীনভাবে রোজগারের পথ না দেখিলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অবস্থা ক্রমে আরও ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইবে। বাঙ্গালার ন্যায় দরিদ্র দেশে বেশ্যা, ভিক্ষাজীবী, নর্ত্তক, বাদক প্রভৃতির সংখ্যা (৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৮ শত ৭০) বিশেষ আপত্তিজনক। ইহারা একটি পয়সাও উৎপন্ন করিতেছে না অথচ দরিদ্র সমাজের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে ও তদ্‌বিনিময়ে সমাজকে ক্রমশঃ অধঃপাতের পথে লইয়া যাইতেছে। এ বিষয়টির প্রতি বাঙ্গালার নেতৃগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যাইতেছে।

বিভিন্ন জিলার জনসংখ্যা

বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলার জনসংখ্যা এবং গত ১০ বৎসরে তাহার কিরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

জিলা	মোট লোকসংখ্যা ১৯২১	১৯১১	দশ বৎসরের হ্রাস (—) বা বৃদ্ধি (+)
বর্দ্ধমান	১৪৩৮৯২৬	১৫৩৮৩৭১	—৯৯৪৪৫
বীরভূম	৮৪৭৫৭০	৯৩৫৬৬৫	—৮৮০৯৫
বাঁকুড়া	১০১৯৯৪১	১১৩৮৬৭০	—১১৮৭২৯
মেদিনীপুর	২৬৬৬৬৬০	২৮২১২০১	—১৫৪৫৪১
হুগলী	১০৮০১৪২	১০৯০০৯৭	—৯৯৫৫
হাবড়া	৯৯৭৪০৩	৯৪৩৫০২	+৫৩৯০১
২৪ পরগণা	২৬২৮২০৫	২৪৩৪১০৪	+১৯৪১০১
কলিকাতা	৯০৭৮৫১	৮৯৬০৬৭	+১১৭৮৪
নদীয়া	১৪৮৭৫৭২	১৬১৭৪৬২	—১২৯৮৯০
মুর্শিদাবাদ	১২৬২৫১৪	১৩৭২২৭৪	—১০৯৭৬০
যশোহর	১৭২২২১৯	১৭৪৩৩৭১	—২১১৫২
খুলনা	১৪৫৩০৩৪	১৩৬২৪১৬	+৯০৬১৮
রাজসাহী	১৪৮৯৬৭৫	১৪৮০৫৮৭	+৯০৮৮
দিনাজপুর	১৭০৫৩৫৩	১৬৮৭৮৬৩	+ ১৭৪৯০
জলপাইগুড়ি	৯৩৬২৬৯	৯০২৬৬০	+৩৩৬০৯
দার্জ্জিলিং	২৮২৭৪৮	২৬৫৫৫০	+১৭১৯৮
রংপুর	২৫০৭৮৫৪	২৩৮৫৩৩০	+১২২৫২৪
বগুড়া	১০৪৮৬০৬	৯৮৩৫৬৭	+৬৫০৩৯
পাবনা	১৩৮৯৪৯৪	১৪২৮৫৮৬	—৩৯০৯২
মালদহ	৯৮৫৬৬৫	১০০৪১৫৯	—১৮৪৯৪
ঢাকা	৩১২৫৯৬৭	২৮৮৭৪৭২	+২৩৮৪৯৫
মৈমনসিংহ	৪৮৩৭৭৩০	৪৫২৬৪২২	+৩১১৩০৮
ফরিদপুর	২২৪৯৮৫৮	২১৪৫৮৫১	+১০৪০০৭
বাখরগঞ্জ	২৬২৩৭৫৬	২৫২৪৭৮২	+১৯৮৯৭৪
ত্রিপুরা	২৭৪৩০৭৩	২৫০০৮৭২	+২৪২২০১
নোয়াখালি	১৪৭২৭৮৬	১৩০৩৪৪১	+১৬৯৩৪৫
চট্টগ্রাম	১৬১১৪২২	১৫০৮৪৩৩	+১০২৯৮৯
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১৭৩২৪৩	১৫৩৮৩০	+১৯৪১৩
কুচবিহার	৫৯২৪৮৯	৫৯২৯৫২	—৪৬৩
স্বাধীন ত্রিপুরা	৩০৪৪৩৭	২২৯৬১৩	+৭৪৮২৪
সিকিম	৮১৭২১	৮৭৯২০	—৬১৯৯

এখন আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালার ১২টি জিলার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া বরং দ্রুত ক্ষয়ের মুখে চলিতেছে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, হিন্দু-প্রধান জিলাগুলিতেই জনসংখ্যা প্রধানতঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। অপরপক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান-প্রধান জিলাগুলির জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, বাঙ্গালার যে যে জিলায় জনসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেগুলিতে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য লোকক্ষয়কর পীড়ার প্রকোপ অধিক, জনসাধারণের দারিদ্র্য অধিক এবং

জলাভাব ও আরও নানা কারণ বশতঃ ভূমির উৎপাদিকা শক্তিও অত্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধ্বংসোন্মুখ জিলাগুলিতে মদ, গাঁজা, তাড়ি প্রভৃতির প্রচলন এবং জনসাধারণের নৈতিক দুর্গতি বাঙ্গালার অপরাপর বর্দ্ধিষ্ণু জিলাগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী অর্থাৎ ইহারা ধনে, প্রাণে, মনুষ্যত্বে, সর্ব্বপ্রকারেই অধঃপাতের পথে যাইতে বসিয়াছে। অথচ এই ধ্বংসোন্মুখ জিলাগুলিই এক সময়ে ধনে, ধান্যে, জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মের আদর্শে বাঙ্গালার মুকুটমণি ছিল! বাঙ্গালী কি ইহার মূল কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবে না? বাঙ্গালার দেশকর্ম্মীরা কি এই সর্ব্বনাশকর জাতীয় ক্ষয়-নিবারণকল্পে কৃতসঙ্কল্প হইবেন না? বাঙ্গালী হিন্দু জাতি কি তবে বাঙ্গালা দেশ হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে?

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত।

ভাগ্যহীন

১

ভাঙ্গা কপাল রাংঝালে আর
জুড়বি কত বোকা,
ফাটের উপর ফাট্ ধরেছে
নাই যে লেখা-যোখা,
হাত দিয়ে আর রুধবি কত
পড়ছে শ্রাবণ-ধারার মত,
পড়ছে বুকে পড়ছে রে তোর
শর যে চোখা চোখা।

২

বৃথা যতন টানা পড়েন
যাচ্ছে রে তোর ফেঁসে,
জোড়া-তাড়ায় কেমন ক'রে
বুন্‌বি রে তুই ঠেসে।
ভাঙ্গা তরী বেজায় ভারী,
কেমন ক'রে জমবে পাড়ি,
শেষকালে যে ডুবলি রে তুই
মাঝ দরিয়ায় এসে।

৩

বাঁধ দিয়ে আর রাখবি কত,
বান যে এলো দোরে,
বেড়া আগুন নিভবে কেন
কেবল ফুঁ'এর জোরে?
টুকরা ছেঁড়া বসনখানি,
কোথায় দিবি সেলাই তালি,
এমন ফাটাল চূণ-বালীতে
ঢাক্‌বে কেমন ক'রে?

৪

তোর হৃদয়ের শুষ্ক বিপট
মুঞ্জরিতে ভাই,
পাষাণকে যে মানুষ করে
এমন চরণ চাই।
ভাগ্যদেবের অঙ্গরাগে
কারিকর যে জবর লাগে,
রামধনুকে রঙায় যে জন
ছোট তাহার ঠাঁই।

৫

বৃষ্টিকে যে সৃষ্টি করে,
শীতল করে ধরা,
উচিত তোমার সবার আগে
খোঁজটি তাহার করা।
শত্রুকে যে শাসতে পারে,
অমঙ্গলে নাশতে পারে,
দীনকে ভালবাসতে পারে,
তার কাছে যাও ত্বরা।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বদেশ উদ্ধার

বাঙ্গালা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের চেষ্টা বিশেষ ক'রে আরব্ধ হয়েছিল, ১৯০২ খৃষ্টাব্দে। তা'র কিছু পূর্ব্বে থেকে মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়েছিল ব'লে শুনেছি। কিন্তু তা'র আদর্শ নাকি এমন উন্নত ছিল না। যাই হোক, মহারাষ্ট্র গুপ্ত সমিতি ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। বাঙ্গালা দেশে গুপ্ত সমিতি গঠন সুরু করবার আগে, শুনেছি, 'ক'বাবু নাকি মারাঠা গুপ্ত সমিতির সংস্পর্শে এসেছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে তিনি যে গুপ্ত সমিতি গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলেন, তা'র পত্তন থেকে দু'বৎসর যাবৎ তিনি নিজে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করতেন না, আর দীক্ষা-কালীন গীতা স্পর্শ করা ছাড়া সমিতির কাযে বা ভাবে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ ছিল না। যদি 'ক'বাবু নেহাৎ থিওরিটিক্যাল না হতেন, অথবা তাঁ'র থিওরি কাযে পরিণত করবার জন্য এক জন যোগ্য কর্ম্মী জুটত, তা' হ'লে এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধবিহীন গুপ্ত সমিতির কাযের প্রসার আরও হয় ত বাড়ত। কিন্তু তা' না হয়ে যখন বারীণের গ্রে ষ্ট্রীটের আড্ডা ভেঙ্গে গেল, তখন 'ক'বাবু হতাশ হয়ে পড়লেন।

অন্য নেতাদের মধ্যে দেবব্রত বাবু বিশেষ ক'রে আগে হ'তে ধর্ম্মচর্চ্চা করছিলেন। ভারত যে ধর্ম্মের দেশ, ধর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্যতীত কোন নতুন ভাব এ দেশ গ্রহণ করতে পারে না, এই ধারণা আমাদের দেশে খুব সাধারণ হ'লেও, 'ক'বাবুকে কিন্তু অনেক দিন থেকে তা ধরাতে চেষ্টা করেছিলেন দেবব্রত বাবু। সিদ্ধ যোগী, সাধু-সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে দেবব্রত বাবুর বিশ্বাস ছিল অগাধ। তা'র থেকেও বেশী ছিল তাঁ'র অন্যকে বিশ্বাস করাবার শক্তি।

'ক'বাবু স্বাধীনতার আদর্শপ্রচারের বিফলতাতে নিজের কিংবা সহনেতা বা সহকারী নেতাদের কোন ত্রুটী নিশ্চয় দেখতে পাননি। কাযেই তাঁ'র পক্ষে ধ'রে নেওয়া সহজ হয়েছিল যে, এ দেশবাসীকে স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত করা কোন প্রকার লৌকিক শক্তির কর্ম্ম নয়। অথচ এ দেশ থেকে ইংরাজকে তাড়াবার ইচ্ছাটা তাঁ'র পুরাপুরি ছিল। মনের যখন এই রকম অবস্থা (temperament), তখন দেবব্রত বাবুর তথাকথিত, সিদ্ধযোগীদের অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও নির্ভর করা ছাড়া 'ক'বাবুর গত্যন্তর ছিল না। এই অলৌকিক শক্তির দ্বারা এত বাড়াবাড়ি আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হ'লে নিজেকে ঐ রকম শক্তিশালী করতে অথবা ঐরূপ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি খুঁজে বার করতে হ'ত। প্রথমে তৈরী অর্থাৎ ready-made শক্তিধারী খুঁজে বার করবার জন্যই কিন্তু 'ক'বাবু বাঙ্গালা হ'তে স্থানান্তরে গেলেন। অন্য নেতারা তা'তে সম্ভবতঃ সায় দিয়েছিলেন বা অন্ততঃপক্ষে কোন প্রতিবাদ করেন নি। তখন কিন্তু তাঁ'রা বা খোদ 'ক'বাবু নিশ্চয় জানতেন না যে, উপায় কখন উদ্দেশ্যে পরিণত হ'তে পারে।

যাই হ'ক, এই অলৌকিক বা দৈবশক্তি অর্থাৎ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ভারতের সনাতন সভ্যতা ও ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য দেশ স্বাধীন করবার চেষ্টাকে, "ধর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বদেশ উদ্ধার" ব'লে অভিহিত করা হয়েছে।

এই রকম উদ্ধারের প্রণালীটা কিন্তু হুবহু 'আনন্দমঠ' থেকে নেওয়া হয়েছিল। আংশিকভাবে তা'র সামান্য একটুখানি নমুনা দিই। 'আনন্দমঠের' এক স্থানে বন্দী অবস্থায় সত্যানন্দ মুসলমান সরকারের জেলের মধ্যে মহেন্দ্রকে বলেছিলেন, সে দিন দুপুর রাত্তিরে তাঁ'রা জেল থেকে মুক্ত হবেন। নিজে পূর্ব্বে তা'র ব্যবস্থা ক'রেও খালি অলৌকিক শক্তি দেখাবার জন্যই যে ইচ্ছা ক'রে মহেন্দ্রকে তা জানান নি, এ কথা ধ'রে নিতে পারা যায়। পূর্ব্ব-বন্দোবস্তমত নির্দ্দিষ্ট সময় অবাধে যখন তাঁ'রা জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, তখন মহেন্দ্রের

বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। এহেন অকাট্য প্রমাণ হাতে হাতে পেয়ে, সত্যানন্দ যে এক জন দৈবশক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ, আর সেই শক্তি যে তিনি ধর্ম্ম-সাধন দ্বারাই পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে মহেন্দ্রের আর কোন সংশয় থাক্‌ল না।

'আনন্দমঠের' অনুকরণে এই রকম ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বিপ্লবকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্‌বার মত আর সকলই তখন বাঙ্গালা দেশে সহজলভ্য ছিল। কিন্তু ছিল না কেবল দুটি মানুষ; সত্যানন্দের মত এক জন ধর্ম্মের ব্যাখ্যাকারী, সন্ন্যাসী নেতা, আর তাঁ'র ত্রিকালজ্ঞ গুরুর মত এক জন, যিনি অসম্ভবকে সম্ভব কর্‌তে পারেন, অর্থাৎ, আমগাছে কুষ্মাণ্ড আর শালগাছে কদলী ফলাতে পারেন। এই কথাগুলি আমার মনগড়া রসিকতা নয়। সত্য সত্যই এই রকম গুরু খুঁজ্‌তে অনেকবার অনুসন্ধানকারী দল (Expeditionary party) বেরিয়েছিল।

খুঁজে নিতে পার্‌লে যে এমন অলৌকিককর্ম্মা সিদ্ধ-পুরুষ পাওয়া যায়, 'ক'বাবুকে এ ধারণাও সম্ভবতঃ দেবব্রত বাবুই করিয়ে দিয়েছিলেন। দেবব্রত বাবুর কাছে এমন সাধু-সন্ন্যাসীর কথা অনেকবার শুনেছি। এঁরা নাকি বাঙ্গালার বাহিরে নেপাল, বিন্ধ্যাচল, গুজরাট্ প্রভৃতি স্থানে থাকেন। এই রকম এক জন খুঁজে এনে তাঁ'র কাছে দীক্ষা নিয়ে, প্রথমে 'ক'বাবু বোধ হয় নিজে সত্যানন্দের পালা অভিনয় কর্‌বেন, মনস্থ করেছিলেন।

অসম্ভবকে কোনও অলৌকিক উপায়ে যে না সম্ভব কর্‌তে পারে, তা'র দ্বারা যে ভারত উদ্ধার হ'তে পারে না, এ কথা মেনে নেওয়া আমাদের মত সামান্য প্রাণীর পক্ষে নেহাৎ অন্যায় নাও হ'তে পার্‌ত। কিন্তু 'ক'বাবুর মত অত বড় অভিজ্ঞ নেতাদের পক্ষে এ কথা বলা আদৌ চলে না। কারণ, দেশের জনসাধারণ যে নিতান্ত অন্ধবিশ্বাস-পরায়ণ এবং অজ্ঞ, তা' এঁরা বিলক্ষণ জান্‌তেন। শুধু রাজনীতিক অধীনতা কেন, আমাদের সকল দুর্ভাগ্যের ও অধীনতার প্রধানতম কারণ যে অন্ধবিশ্বাস-পরায়ণতা ও অজ্ঞতা, এঁরা তাও জান্‌তেন। দেশের জনসাধারণকে এই দু'টা অভিসম্পাত থেকে যতটুকু উদ্ধার কর্‌লে অন্ততঃপক্ষে স্বাধীনতা শব্দের মানেও তারা বুঝতে পার্‌ত, ততটুকু উদ্ধার না ক'রে দেশটাকে স্বাধীন কর্‌বার মানে যে কি, তা' এঁরা বুঝতেন না বল্লে এঁদের নিতান্ত হীন ব'লে মনে করা হয়।

কিন্তু এত সব জানা সত্ত্বেও যে এঁরা অন্ধবিশ্বাস-পরায়ণতার পোষক, সেই অলৌকিক শক্তিরূপ মরীচিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেন, তা'র কারণ হচ্ছে, এঁরা বড় বেশী ক'রে জেনে ফেলেছিলেন যে, ভারতের মত দেশকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হ'লে, অতি বড় লৌকিক-শক্তিসম্পন্ন নেতার পক্ষেও এক জীবনে সাফল্য লাভ করা কত কঠিন ও কত সুদূরপরাহত। এঁরা চেয়েছিলেন সহজে কায সার্‌তে, দু'পাঁচ বছরে নিজ কর্ম্মের সুফল ভোগ কর্‌তে, অবতারের পূজা পেতে, দেশের কোটি কণ্ঠে নিজ নামের জয়ধ্বনি শুন্‌তে; আর চেয়েছিলেন, এঁদের অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে চোখ বুজে প্রাণ দেওয়াতে।

অনেকেই জানেন, অসভ্য আদিম-নিবাসীদের মধ্যে ধূর্ত্ত ওঝা বা গুণিন্‌রা (Medicine Men) নিজেদের ধূর্ত্তামি ঢাক্‌বার এবং অজ্ঞ লোকের মনে ভয়, ভক্তি, গুণমুগ্ধতা ইত্যাদি উদ্রেক কর্‌বার জন্য যেমন দেবদেবীর দোহাই দিয়ে, অবোধ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান এবং অর্থহীন মন্ত্রাদির উচ্চারণ ক'রে থাকে, আর তাতে ক'রে পূজা বা নির্যাতনপ্রিয় দেবদেবী এবং ভূত-প্রেতরা তাহাদের আজ্ঞাকারী মনে ক'রে, সাধারণ অজ্ঞ লোক যেমন সেই ভূতপ্রেতাদির নির্যাতন থেকে অব্যাহতি বা তাহাদের অনুকম্পালাভের জন্য গুণিন্‌দের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হয়ে তাহাদের সকল আবদার পূরণ করে, সেইরূপ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজে ধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, তাহার হরেক-রকম ব্যাখ্যা, আর দেবদেবী বা স্বয়ং ভগবানের নামে আদেশাদি প্রচার দ্বারা অজ্ঞ লোককে যে কোন দুরূহ বা অসঙ্গত কাযে নির্ব্বিচারে আজ্ঞানুবর্ত্তী করা খুব সহজসাধ্য ও অল্প সময়সাপেক্ষ ব'লে জগতে অনেকবার অনেক লীলাময় নেতা (demagogwes) নিজেদের অতিমানুষ ব'লে জাহির করেছেন, তদনুযায়ী লোকপূজা পেয়েছেন, আর অনেক রকম কীর্ত্তি রেখে গেছেন এবং এখনও যেখানে ধর্ম্মের গোঁড়ামী বর্ত্তমান, সেখানে লীলা প্রকট করছেন। আমাদের নেতাদের এই অলৌকিক শক্তিশালী গুরু খোঁজা বা ধর্ম্মের

মধ্য দিয়া স্বদেশ উদ্ধার, উল্লিখিত ব্যাপারের বিংশ শতাব্দীর উপযোগী উন্নততর সংস্করণ কি না, এ সন্দেহের ভাব এ দেশে আজকাল কদাচিৎ দেখা দিলেও আমাদের দেশবাসী চিরকাল এত অধিক পরিমাণে অন্ধবিশ্বাসপরায়ণ যে, সন্দেহবাদ (Scepticism) যতটুকু প্রবল হ'লে সত্য নির্দ্ধারণের জন্য একটুও অনুসন্ধিৎসা জাগতে পারত, কোনও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ ততটুকু প্রবল কখনও হ'তে পারে নি।' এখনও যে তেমন প্রবল আকার ধারণ করবে, তা'র কোন আশাও নাই। তা'র কারণ, অবিশ্বাস বা সন্দেহ করাটা যে সব চেয়ে ঘৃণিত পাপ, তা আমাদিগকে আবহমানকাল সব চেয়ে বেশী ক'রে শিখান হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আর সকল শিক্ষার ভিত্তি গাড়া হয়েছে ভক্তিবাদের উপর, তাই যুক্তিবাদ বা চিন্তার স্বাধীনতা ঘৃণ্য; তাই গতানুগতিকতা বা গড্ডালিকাপ্রবাহ আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে; তাই প্রকারান্তরে এই গড্ডালিকাপ্রবাহের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে, constractive method গঠননীতি আর ইহাতে উল্টা যা' কিছু, তাই নাকি destructive method ধ্বংসনীতি।

দেশের লোকমতের কোনও বিষয় নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য বা ত্যজ্য করাবার জন্য আমাদের মধ্যে কতকগুলি শব্দ অধুনা প্রচলিত করা হয়েছে, যা'র স্পর্শে লোকমত মন্ত্রমুগ্ধবৎ অন্ধভাবে চালিত হচ্ছে। সেই যাদুপ্রভাববিশিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে destructive শব্দটির প্রভাব অতীব সাংঘাতিক, এই শব্দটি শুধু সন্দেহবাদ নয়, যে কোন কথায় ঠেকিয়ে দিলেই, তা লোকমতে ভীষণ ঘৃণ্য, কাযেই বর্জ্জনীয় হয়ে থাকে।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কেবল একটা বিষয়ে ঠিকমত না হ'লেও, এই প্রবন্ধের গোড়াতে লিখিত কারণগুলির জন্য আমাদের মধ্যে কতকটা সন্দেহের ভাব বদ্ধমূল হয়েছে। সে সন্দেহটা এই যে, বৃটিশরাজ আমাদের হিত করবার জন্যই ভারত শাসন করছেন? না স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য?

যাই হ'ক্, এ দেশে অন্য সকল বিষয়ে সন্দেহবাদকে এইরূপে মেরে রাখা হয়েছে ব'লে নেতাদের দূরদর্শিতা অর্জ্জন বা পরিণামচিন্তা করবার প্রয়োজনই হয় না। অন্য দেশে নেতারা অনুগমনকারীদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাছে ভুলপথে নিয়ে যায়, এই সন্দেহ উত্তেজনা বা হুজুগের মধ্যেও ফুটে উঠে। তা'র পর সন্দেহের কারণ পেলে, তা'র পরিণাম যে কি রকম মারাত্মক হয়, যাঁ'রা অন্য দেশের সম্যক্ খবর রাখেন, তাঁ'রাই জানেন। কিন্তু আমাদের দেশে কোনও আদর্শের নেতারা যখনই কোন ভুল করেছেন বা তাঁ'দের নেতৃত্বের ফলে যখনই কোন অঘটন ঘটেছে, তখনই তাঁ'দের সেই ভুল বা অঘটন ব্যাপারটাকে পূর্ব্ববর্ণিত লীলা ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আর জনসাধারণও পরম ভক্তি ও সন্তোষসহকারে তা' মেনে নিয়েছে। তা'র পর লীলা না করলে যখন অবতার ব'লে গ্রাহ্য হওয়াই শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, তখন সেই অপরিণামদর্শী নেতা তাঁ'র লীলার মাত্রা অনুযায়ী, খণ্ড বা অখণ্ড অবতার ব'লে পুরাকালের কথা ছেড়ে দিলে, এ কালেও লোক-পূজা পাচ্ছেন, তাই অপরিণামদর্শিতাই যেন আমাদের নেতাদের সাধনার একটি বিশেষ অঙ্গ হয়েছে। আর ধর্ম্মের গোঁড়ামী দেখিয়ে বা যেমন ক'রে হ'ক, একবার কোন রকমে নেতা অথবা গুরু ব'লে জাহির হ'তে পারলেই, জনসাধারণের নিকট তিনি চিরকালের জন্য সর্ব্বপ্রকার সন্দেহের অতীত। দেশ উদ্ধারের কেন, যে কোনও আদর্শের চাইতে অবতারত্ব বা popularity লাভটাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য করা এ দেশে নেতৃত্বের নিত্যধর্ম্ম। তাই আমাদের 'ক'বাবু শুধু নয়, সকল ধর্ম্মপন্থী নেতারই ধর্ম্মের মধ্য দিয়া, স্বদেশ উদ্ধারের পরিণাম কি, তা' ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

ধর্ম্মকে স্বদেশ উদ্ধারের একমাত্র পন্থা ব'লে গ্রহণ করলে যে দুইটি ঘোর সমস্যা ইংরাজের কবল থেকে ভারত উদ্ধারের পথে হিমাচলসদৃশ অলঙ্ঘনীয় অন্তরায় না হয়ে যায় না, সে দু'টি 'ক' বাবু ও অন্য নেতাদের চিন্তার বিষয়ীভূত হয় নি, এ কথা জোর ক'রে ব'লতে না পারলেও, এর গুরুত্ব যে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন নি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

প্রথম, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা, দ্বিতীয়, অভিজাত-ইতর অর্থাৎ হিন্দুর উচ্চ নীচ জাতি (Caste) সমস্যা।

ধর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বদেশ উদ্ধার-চেষ্টা সুরু হবার পর এক দিন গুপ্ত সমিতির এক মজলিসে, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে, তিন চার জন বড় বড় নেতারা যে সকল মত প্রকাশ করেছিলেন, সে সব কথা এখানে

উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। তবে এ সমস্যাসমাধানের যত প্রকার মতলব খুঁজে বা'র করবার চেষ্টা হয়েছিল, তা'র মধ্যে যেটা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত ও সহজ ব'লে তখন গৃহীত হয়েছিল, সেটি হচ্ছে এই যে, "মুসলমানগণ যদি এ বিপ্লবে যোগ দেয়, তবে ভালই, দেশ স্বাধীন হ'লে তা'দের সাহায্যের পরিমাণ অনুযায়ী অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া যাবে; আর তা না করে, তাহাদিগকে শত্রু অর্থাৎ ইংরাজের সামিল ব'লে গণ্য করা হবে।" এই প্রকার সমাধানের কল্পনা যে নিতান্ত চিন্তাহীনতার পরিচায়ক, তা' বলা বাহুল্য। কারণ, এ রকম জাঁক বরং মুসলমানগণ করলে করতে পারত।

তা'র পরে একেই ত এই সমস্যার একটি অন্ততঃ সুশীল মনকে সুবোধ করবার মত সমাধানের সঙ্গত পথ খুঁজে বা'র করা চিন্তারও অতীত, তা'র উপর ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ভারত উদ্ধারের খেয়াল অবিকৃত মস্তিষ্কে কি ক'রে এসেছিল, তাই ভেবে এখন আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়া ভারত উদ্ধারের মানে যে হিন্দুধর্ম্মের তরফে ভারত উদ্ধার, এ সহজ কথা মুসলমান তায়াদের বুঝিয়ে দিতে হয় না; পরন্তু ইহা তাঁ'দের আঁতে যে কি রকম ঘা দেয়, তা বলা বাহুল্য মাত্র। এতে মুসলমানগণ এ আন্দোলনে যে কেবল যোগ দিতে বিরত থাকতে পারেন, তা' নয়, তাঁ'রা ইংরাজের অপেক্ষাও হিন্দুদের প্রবল শত্রু না হয়ে পারেন না। কারণ, হিন্দুদের অধীন হওয়ার ধারণা করাও তাঁদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ অবস্থায় যদি মুসলমান নেতারা সুলতান অথবা আমীরের উপর নির্ভরতাই ইংরাজের অধীনতা থেকে ভারত উদ্ধারের একমাত্র উপায় ব'লে মনে ক'রে থাকেন, অথবা প্যান-ইস্লামিক্ আন্দোলনে ঐরূপ কোন মতলবে যোগ দিয়ে থাকেন, তবে তা' নিশ্চয় বিশেষ কিছু অন্যায় বলা যায় না।

যদি তর্কের খাতিরে ধ'রেই নেওয়া যায় যে, ইংরাজের গ্রাস থেকে ভারত কেড়ে নেওয়াতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান স্বার্থ আছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থের মিলন হওয়া সঙ্গত। কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষ এত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান, সেখানে কোন প্রকার কায চালানগোছ মিলনও যে অসম্ভব, এ কথা অস্বীকার যা'রা করে, তা'রা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনাই ক'রে থাকে।

কোন ধর্ম্মের আত্মরক্ষার অব্যর্থ উপায় হচ্ছে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষপরায়ণতা। যে ধর্ম্ম তা'র ভাবসম্পদের আকর্ষণে অপরকে আকৃষ্ট করতে ও নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ধ'রে রাখ্তে যত অপারগ, সে ধর্ম্ম আত্মরক্ষার জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়াবার ও তা জাগিয়ে রাখবার তত অধিক হীন উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। আমাদের বর্ত্তমান 'সনাতন' হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে কম করে নি। কারণ, হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ নাই, বর্জ্জন আছে। কাযেই আত্মরক্ষার খাতিরে হিন্দু, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মানুষকে এতদূর ঘৃণা করতে বাধ্য হয়েছে যে, কোন জন্তু-জানোয়ারকেও তেমন ঘৃণা করতে পারে নি।

যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে, কোন গতিকে উক্ত দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ঘুচে গেল, তা' হ'লেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যক্তিগতভাবে কি সাম্প্রদায়িকভাবে গুণমুগ্ধতা উৎপন্ন হওয়া স্বভাবসিদ্ধ, তবে অকৃত্রিম গুণমুগ্ধতা হ'তেই বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি স্থায়ী মিলনের বীজ উপ্ত হবেই, তখনই শাস্ত্রের নিষেধ সত্ত্বেও যৌন আদান প্রদান ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণশীল নয় ব'লেই তাঁতে হিন্দুরই সংখ্যা হ্রাস ও সেই সঙ্গে নাশ অনিবার্য্য। অথচ হিন্দুধর্ম্মকে গ্রহণশীল করাও প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব, অথবা কোন প্রকারে সম্ভব হ'লেও হিন্দুর জাতি-(Caste) ভেদ প্রথার আবর্ত্তনে তাহা কেবল বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য, অর্থাৎ মুসলমানধর্ম্ম হ'তে যা'রা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হবে, তাদের স্থান কোথায়? এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সমস্যা এসে পড়ে। হিন্দু-সমাজের জাতি-(Caste) বিভাগ একেবারে লোপ ক'রে ব্রাহ্মণ হ'তে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল বর্ণকে এক করতে পার্‌লে তবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহিরের লোক আনা সম্ভব হ'তে পারে। তাতে কিন্তু হিন্দুর পুরাতন প্রথার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কাযেই সেরূপ আশা করা একেবারে বৃথা। জাতি-(Caste) প্রথা বর্ত্তমান থাকতে হিন্দুধর্ম্মকে গ্রহণশীল করলে নতুন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগকে একটি এমন জাতিতে (Caste) পরিণত হ'তে হয় যে, সে জাতি এক

দেশে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস ক'রে নিরন্তর *হিন্দুর দ্বারা, সব চেয়ে নিম্নস্তরের পতিত হিন্দু ব'লে, যেমন সকরুণভাবে ঘৃণিত হ'তে থাকবে,* মুসলমানদের দ্বারাও সেইরূপ নিদারুণভাবে নির্যাতিত ও ঘৃণিত হ'তে বাধ্য হবে। ঘৃণা-বিদ্বেষ পরিহার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব করতে হ'লে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদের উপর প্রাধান্য দিতে হয়, আর দেশাত্মবোধকে ধর্ম্মের স্থানে বসিয়ে, ধর্ম্মকে অন্দরমহলে পাঠাতে হয়। কারণ, যুক্তির তাপালোকে ধর্ম্মের কুজ্ঝাটিকা আপনা হ'তেই উধাও হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু তা' আমাদের নেতাদের প্রাণে ত সইবে না। কারণ, তাঁ'রা তথা-কথিত অভিজাত-সম্প্রদায়ভুক্ত ব'লে মনে করেন, আর আভিজাত্য ধর্ম্মের দ্বারা সংরক্ষিত। এই জন্য অভিজাত-সম্প্রদায় সুলভ মনোভাববিশিষ্ট নেতাদের দ্বারা দেশ উদ্ধার ব্যাপারটা, "বিড়াল মেকুর" প্রহসনের অভিনয় মাত্র।

পরন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য পূর্ব্বকালে ধর্ম্মই একমাত্র উপায় ব'লে গৃহীত হ'ত; অর্থাৎ ধর্ম্মকে লোক-শাসনের যন্ত্রস্বরূপ ক'রে একধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের (ইতর জনসাধারণের) মনুষ্যত্ব নাশের দ্বারা ক্ষুদ্রতর অভিজাতসম্প্রদায়ের এক প্রকার তথা-কথিত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ত বা হ'ত। শুধু ভারতের নয়, সকল দেশের তথা-কথিত প্রাচীন সভ্যতাবিকাশের মূল রহস্যই এই। কিন্তু আজকাল দুনিয়ায় অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, ধর্ম্ম ইতর জনসাধারণের মনুষ্যত্ব-বিকাশের অন্তরায় ব'লে বিবেচিত; আর nationality তা'র পরিপোষক ব'লে স্থিরীকৃত ও গ্রহণ করা হয়। এই দু'টি জিনিষের মধ্যে অন্য দেশে মধ্যযুগ থেকে বহুকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের ও মিলনের আন্তরিক চেষ্টার ফলে অবশেষে মিলন অসম্ভব জেনে সর্ব্বসাধারণের উন্নতির জন্য ধর্ম্মসম্পর্কবিহীন nationalityকেই সাধনীয় করা হয়েছে। যে জাতি (nation) বা যে দেশবাসী এই সত্য যতটুকু মেনে নিয়েছে, সে দেশবাসী ততটুকু জাতীয়তা লাভ ক'রে সকল রকম স্বাধীনতা তত অধিক ভোগ করছে।

তার উপর হিন্দু-মুসলমানের মত দুটি ধর্ম্মের যেখানে আদা-কাঁচকলার সম্বন্ধ, আর যেখানে *হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে* বংশানুক্রমে (গুণানুক্রমে নহে) নিতান্ত অল্প সংখ্যা অতি বৃহৎ সংখ্যাকে যে ধর্ম্মের সাহায্যে হীন ক'রে রাখবার অধিকার চিরস্থায়ী ক'রে নিয়েছে এবং ঐ বৃহত্তর সংখ্যা যেখানে ঐ ক্ষুদ্র সংখ্যার উল্লিখিত অধিকার স্বীকার ক'রে নিয়ে ধন্য হয়ে আছে, সেই ভারতে সেই হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক nationalityর সৃষ্টি এক অত্যদ্ভুত সমস্যা কি না, তা' আমাদের নেতারা তখন ভেবে নিশ্চয় দেখেন নি। বর্ত্তমান ভারতের কাম্য স্বাধীনতা বল্‌তে যা বুঝায়, তাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করলে এই দাঁড়ায় যে, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ক্রমোন্নতির অভাব বোধ করবার শক্তিনাশ দ্বারা, অভাবের জ্বালা হ'তে যে নিস্কৃতি, সে একপ্রকার স্বাধীনতা, যার মানে সত্যযুগে বা আদিম অসভ্য অবস্থায় ফিরে যাওয়া, আর উত্তরোত্তর অভাব বোধ করবার এবং সেই অভাব পূরণ জন্য শক্তিলাভ করবার পথে যে অন্তরায়, তা' থেকে উদ্ধারের ফলে যা দাঁড়ায়, তা' আর এক প্রকার স্বাধীনতা। প্রথম প্রকার স্বাধীনতাই আমাদের নেতাদের "ধর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বদেশ উদ্ধারের" লক্ষ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মকে শাসনযন্ত্ররূপে প্রয়োগ ক'রে যাঁরা জনসাধারণকে শাসন করতে বদ্ধপরিকর, তাঁ'রা দেশ থেকে ইংরাজ-প্রভুকে তাড়িয়ে নিজেরা সেই প্রভুত্বের একচ্ছত্র অধিকারী হ'তে চান। তা'র প্রমাণস্বরূপ এখন তাঁ'দের সে মৎলবের আভাষ আমরা পেয়েছি, জনসাধারণের অধিকারবৃদ্ধির জন্য Councilএ উপস্থাপিত কয়েকটি বিলের প্রত্যাহার থেকে, অস্পৃশ্য জাতির (caste) উন্নতিকল্পে কংগ্রেসের প্রস্তাব থেকে, আর পেয়েছি সেদিনকার হিন্দুসভা ও সনাতন ধর্ম্মসভার লীলা-প্রকট থেকে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

আমার ডায়েরী

১৪ই নভেম্বর।—এমন জড়ের মত প'ড়ে থাক্‌লে ত চলবে না! পালাতে হবে, এখান থেকে চ'লে যেতে হবে। নৈলে সগুণা ভাববেন, "নীচ স্বার্থপর" এখনও তাহার স্বার্থপরতার জাল বিস্তার ক'রে তাঁহার বাবার পাশে ব'সে তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে হরেন্দ্রের অনিষ্টের চেষ্টা করছে আর তাঁহাদের এমনই ক'রে পর ক'রে দিচ্ছে। হরেন্দ্রের উপর কাকার এই অসম্ভব রাগ এবং মেয়ের উপর এই অযথা উৎপীড়ন—এ সব আমার প্ররোচনাতেই যে হচ্ছে, এতে সগুণার নিশ্চয়ই সন্দেহমাত্র নেই।

"নীচ স্বার্থপর?" হাঁ, এইমাত্র সম্বল নিয়ে, এই উপহার নিয়ে যাত্রা করতে হবে চিরদিনের মতই এবার! জীবনের সমুদ্রমন্থনে উদ্ভূত এই আমার ধন্বন্তরি কলসের সার বস্তু! মোহিনী মায়ার পরিবেশিত ভোজ্য-পেয়! লক্ষ্মীর করের বরমাল্য, চন্দ্রের পূর্ণতম তিথি। এই-ই আমার এ যাত্রার শেষ ফল! 'নীচ স্বার্থপর!' বাসুকির নিশ্বাসে সে দিন যতটা জ্বালা—যতটা বিষ বেরিয়েছিল, তাহার সবটা নিয়েও কি এতখানি হয়েছিল? এতখানি?—উঃ!

উঠ্‌তে হবে—যাত্রার বন্দোবস্ত করতে হবে, দিদিকে বল্‌তে হবে। সেই পরশু কখন্ ঘরে ফিরেছি, রাত্রে কখন্ খাতায় সে দিনের এ কথাগুলি লিখেছি, কিছু মনে নেই। কা'ল সমস্ত দিনরাত্রি কই দিদির সঙ্গে তো কোন কথা হয় নি, চোখোচোখিও না। উঠি, বলি তাঁকে! এইটুকু লিখে রাখি আজও। উঠতে পারছি না যে!—কেমন যেন লাগছে।

ওঃ, বড় যন্ত্রণা মাথায়, কি জ্বালা সর্ব্বাঙ্গে! আর একটু লিখে রাখি—যতক্ষণ পারি। দিদি খানিক আগে এসে আমার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন! কপালে হাত দিয়ে বল্‌লেন, "এ যে ভয়ানক গরম!" তা'র পরে আমাকে বিছানায় শুইয়ে মাথায় জলপটী দিয়ে বাতাস দিতে লাগলেন। শোবার সময়ও খাতা আর কলমটা পাশে নিয়ে শুলাম দেখে বল্লেন, "যদি এখানা লিখবে, এর ওপরেও যদি আরও মাথা খাটাবে, তা হ'লে খাতা-কলম কেড়ে নেব কিন্তু।" 'নেব না' বলেও যে নিচ্ছি, বুঝতে পারছি, কি রকম যেন আসছে মনের ওপর কালো পর্দ্দার মত ছেয়ে। দিদি বল্লেন, 'খুব জ্বর, মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা।' বল্লাম তাঁকে, 'সব ঠিক ক'রে নাও দিদি, কা'ল আমরা বেরুবো এখান থেকে।' দিদি বল্লেন, 'সে হবে এখন', চুপ কর তো তুমি, মুখ বুজে শুয়ে থাক খানিক। পরশু থেকেই বুঝছি, তুমি একটা কাণ্ড করবে। কা'ল যাবে কি কত দিনে বিছানা থেকে উঠবে, তাই দেখ।' 'না—না, কালই—কালই যেতে হবে' ব'লে আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, এইমাত্র মনে আছে। তার পরে—চাকরাণীকে বাতাস করতে দিয়ে উঠে গেছেন কি তিনি? লিখে রাখছি একটু—যতক্ষণ পারি। না—এ কি? হচ্চে না, আর না। ওঃ—ওঃ—মাথায়—"নীচ—নীচ—নীচ! স্বার্থপর!"

১৫ই ডিসেম্বর।—কত দিন পরে? ওঃ, ঠিক এক মাস! ভাল হয়েছি, পথ্য করেছি ক'দিনই, তবু নিজেকে একটা পাখীর মতই মনে হচ্ছে। কত মিনতি ক'রে দিদির কাছ থেকে এখানা চেয়ে নিয়েছি, দশ পনেরো মিনিটের বেশী রাখতে পাব না। তিনি এখনই এখানা এসে কেড়ে নেবেন ব'লে গেছেন। অসুখের মধ্যেও নাকি আমি একে কাছ-ছাড়া করিনি, আঁকড়ে থেকেছি, আর আঙ্গুল দিয়ে লিখার মত করেছি এর গায়ে। তাই তিনি এটুকু অনুমতি দিয়েছেন।

কাকা আসেন দুবেলা, অসুখের সময় নাকি দিনরাতই প্রায় থাকতেন। দিদিই তাঁকে ডাকিয়ে আনান বোধ হয়। তাঁ'কে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছি, 'ব্রেণ ফিবার' হয়েছিল। ঘাড়ের একটা শিরা কেটে মাথার সে উর্দ্ধগ রক্ত বা'র ক'রে দিতে হয়েছে, তার পরে রীতিমত ব্যায়রামও গেছে খুব। এই ক'দিন মাত্র এ কথা তিনি বলেছেন। এখনই এসে কত কি ব'লে গেলেন। আমায় এ বাসা ছেড়ে তাঁ'র কাছে গিয়ে থাকতে হবে। দু'তিন মাস এখনও আমি কোথাও নড়তে পাব না। দিদিকেও আমার কাছে থাকতে হবে। [illegible]

এসেছিল, তাই আমার প্রাণটা পাওয়া গেছে। নিজের আত্মীয় ছাড়া পরকে যে এমন যত্ন কেউ করতে পারে, এ তাঁ'র ধারণাই ছিল না। তিনি এই রকম অনেকই বলেছেন। আমি বলেছিলাম, উনি যে আমার 'দিদি'।

১৭ই ডিসেম্বর।—এত দিনে আমার 'জীবন-খাতা' দিন-তারিখের হিসাবমত চলেছে। বেহিসাবীর দিন তা'র কেটে গেছে কি না! এখন সবই হিসাবমত! এ হিসাব আরম্ভও হয়েছে সেই হরেন্দ্র এবারে আসার দিন থেকে।—যাক্।

দিদি শুনেছেন কিছু, তবু সবটা জানেন নি বুঝলাম। আমায় প্রশ্ন করলেন, "নীরেন, দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করি যদি, উত্তর দিতে পারবে?" "কেন পারব না দিদি, এখন তো আর আমার কোন কষ্ট নেই।" বুঝলাম, আমার অজ্ঞানের মধ্যেও তিনি আমার খাতার একটা পাতাও খোলেন নি। তাঁ'র ওপর কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠলো।

দিদি চিন্তিত মুখে বল্লেন, "আরও দু' চার দিন পরে এ সব কথা কইলেই ঠিক্ হ'ত বোধ হয়, কিন্তু হয় ত যত দিন যাচ্ছে, ততই বেশী অন্যায় হচ্ছে।" তা'র পরে একটু থেমে বল্লেন, "কি হয়েছিল?" আমি খানিকক্ষণ চোখ বুজে সাম্‌লে নিয়ে উত্তর দিলাম, "আপনার এটুকু আন্দাজ করা উচিত ছিল দিদি।"

"না, এ যে বে-আন্দাজী ব্যাপার! এতটুকুও এর স্বরূপ আগে তো বোঝা যায় নি।"

"কিন্তু এই তো সম্ভব। আপনারা যা বলেছিলেন, তাই-ই অসঙ্গত অসম্ভব কথা। আপনি কি ক'রে জান্‌লেন দিদি? কাকা কি কিছু বলেছিলেন?"

"তোমার খুব বাড়াবাড়ি অসুখের সময় আমিই ব্যস্ত হয়ে আর একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাঁ'কে বলি, সগুণা এক দিনও নীরেনকে দেখতে আসছে না যে? তাতে তিনি বললেন, 'সে তার পিসীর কাছে বোর্ডিংয়ে গেছে।' এই মাত্র শুনেছি। তাঁ'র মুখ দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে এক দিনও সাহস হ'ল না। সে কি আবার পুনায় গেছে?"

"না—এইখানেরই মেয়ে স্কুলের বোর্ডিংয়ে।"

"এই এক মাসের ওপর সেইখানেই আছে?"

"সে কথা তো আমি বল্‌তে পারব না দিদি। আমি তো সেই দিনের কথা মাত্র জানি, তা'র পরের আর তো কিছু জানি না।"

"আঃ, মেয়েটার হরেন এত শত্রুও ছিল! তাকে ঘর-ছাড়া, বাপের কোলছাড়াও হ'তে হ'ল শেষে!"

"হরেন না দিদি, সে আমি। আমারই ভয়ে তিনি গৃহত্যাগী হয়েছেন, বাপের ত্যজ্যা হয়েছেন।"

"আমায় আর একটু স্পষ্ট ক'রে বল্‌তে পারবে কি সব কথা?"

"'এতে অস্পষ্টের কিছুই তো নেই দিদি। তাঁ'র বাপের চেষ্টা আর ইচ্ছার জোর তো দেখেছিলেন! ' তিনি এখনই অঘ্রাণের তারিখটাতেই——"

"বুঝেছি, এতটা তাড়াহুড়া করাতেই এ কাণ্ডটা ঘটলো। তিনি যদি একটু ধৈর্য্য ধরতেন।"

"তাতে অন্ততঃ তাঁকে ঘর-ছাড়া হ'তে হ'ত না, এই পর্য্যন্ত! কাকা তাঁকে যা বলেছেন, তাতে এ ভিন্ন গত্যন্তরই বা কি ছিল সগুণার?"

"এত দূর? আঃ—সে তা হ'লে এখনও ফেরেনি বলেই মনে হচ্ছে নীরেন। কাকার মুখ দেখেও এই-ই বোধ হয়।"

"আমি যত দিন এ দেশ না ছাড়ব, তত দিন হয় ত তিনি ঘরে ফিরবেন না দিদি।"

"পাগল আর কি! বাপের এত দিন আদর ক'রে ডেকে আনা উচিত ছিল। তুমি এ দেশ ছেড়ে গেলেও বাপ না ডাকলে সে কি ঘরে আসবে? তা'রা কৃতবিদ্য মেয়ে, নিজেদের জীবিকার সংস্থান স্বচ্ছন্দে করতে পার্‌বে যখন, তখন আমাদের মত অন্যায় নির্যাতন সইবেই বা কেন?"

"তবু আমায় যেতে হবে দিদি—শীগ্‌গিরই!"

"অন্ততঃ আরও দিন পনেরো না হ'লে তুমি এই দূর-পথের যাত্রায় বেরুতেও পারবে না, আর তা তোমায় দেওয়াও হবে না। আচ্ছা নীরেন, আর একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"অজ্ঞানের মধ্যে তুমি যত যা ব'লে চেঁচিয়ে উঠতে—তা'র মধ্যে 'নীচ' আর 'স্বার্থপর' এই দুটো শব্দ তুমি—ও কি, মুখ ঢাকছ কেন? থাক্ নীরেন, এ কথায় আর কায নেই, এস অন্য কথা কই!"

একটু পরে আমি বল্লাম, "বলুন।"

"তুমি আর একটু বল পেলে আমায় এক দিন সেই মেয়ে-বোর্ডিংয়ে নিয়ে যাবে ?"

আমি কেঁপে উঠলাম ! আমি যাব আমারই জন্ত সগুণা যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন, সেইখানে ! "না দিদি, এইটি বাদ আর যা বলেন।"

"কেন ? সগুণাকে যা উৎপীড়ন কর্‌বার,সে তা'র বাপই করেছেন, তুমি যে নির্দ্দোষ, তা কি সগুণা জানে না ?"

"আমি তো নির্দ্দোষ নই দিদি।"

"তবে কি দোষী ? আচ্ছা, সে তুমি যা খুসী হও—কিন্তু আমার একবার তা'র সঙ্গে দেখা কর্‌তেই হবে। বাপে মেয়েয় এত বড় কাণ্ড হ'ল—আর তা আমারই দুই ভাই নিয়ে, আমার কি এখানে উপস্থিত থেকেও এমন চুপ ক'রে থাকা উচিত ? তোমার অক্ষমতার জন্যে য'টা দিন আরও দেরী হবে, তা'র পরে আমায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে না কি ?"

"তা কি পার্‌বেন দিদি ? তাঁ'র বাপ না ডাক্‌লে তিনি যে আসবেন না, তা তো আপনিই এখনই বল্‌লেন।"

"পারি না পারি, চেষ্টা দেখতে হবে তো !"

"কিন্তু আমি যে তাঁ'র সুমুখে আর যেতে পারি না, এটুকুও বোঝা উচিত আপনার।"

"কেন পার্‌বে না—নিশ্চয় পার্‌বে। আমরা গিয়ে বল্‌ব—আমরা দেশে যাচ্ছি, তুমি তোমার ঘরে ফিরে এস ! আর তাও তুমি বল্‌বে না—আমি বল্‌ব। তুমি কেবল আমায় তা'র সঙ্গে যাতে দেখা হয়, তারই বন্দোবস্ত ক'রে দেবে। চাই কি তুমি দেখা না কর্‌তে চাও—তাই কর ! বাইরে স'রে থেকো।"

আমি ক্ষণিক ভাবিয়া বলিলাম, "সে অন্য কারও সঙ্গে আপনাকে পাঠালেও তো চল্‌তে পার্‌বে দিদি। আমি বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখে—না, তাও ভাল দেখাবে না ! তাঁ'র বাপ দেখা কর্‌তে যান না, হয় ত পত্রও লেখেন না, আর পর আমরা, আমাদের এ আত্মীয়তার চেষ্টা করা তাঁ'র পক্ষে হয় ত অসম্মানজনক হবে। আপনি এমনই গিয়ে সগুণাকে ডাকিয়ে দেখা করুন, —সে স্বচ্ছন্দেই হবে।"

"তা তো হবে, কিন্তু যাব কার সঙ্গে ? কার সঙ্গে আমি যেতে পারি তুমি ছাড়া ?"

আমি মাথা হেঁট কর্‌লাম। সত্যই এ কথা ? স্বার্থপরের মত নিজের কথাই ভাবছি কেবল। "আচ্ছা দিদি, তাই হবে। কবে যাচ্ছেন ?"

"আর একটু সুস্থ হয়ে নাও !"—দিদি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন।

সত্যই আর একটু সুস্থ হই। পার্‌ব না,এখনও পার্‌ব না।

১৮ই ডিসেম্বর।—কাকাকে আজ একটু জানালাম দিদির কথা। তিনি যে সগুণাকে বুঝিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে চান, এটুকু শুনে গোঁ গোঁ ক'রে দুচার বার "দরকার নেই, অমন মেয়ের আমার দরকার নেই আর" বল্‌তে বল্‌তেও আমার বক্তব্যটা শুন্‌ছিলেন, তা'র পরে যে-ই শুন্‌লেন, আমি দেশে চ'লে যাব শীগ্‌গিরই, তখন একেবারে অসংযত হয়ে চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন, "কিছু দরকার নেই—তোমাদের এই সব ব্যাপারের। আমার ঘরে সে মেয়ের আর যায়গা হবে না। তোমরা যদি ঐ রকম ক'রে তাকে ফিরিয়ে আনো, জেনো, তার আর আমার কপালে আরও দুঃখ—আরও কেলেঙ্কারী ঘটতে বাকী আছে।"

তাঁ'র ভাবে আর স্বরে এ কিছুমাত্র অসম্ভব বোধ হয় না। আমি স্তব্ধ হয়ে আছি। তখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত স্বরে পরিবর্ত্তিত ভাবে তিনি ব'ল্লেন, "তুমি তা' হ'লে সত্যই চ'লে-যাবে ?"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে তিনি আবার বল্লেন, "মেয়েটিকে তুমি যদি পাঠাবার জন্যই যেতে চাও, আমি সেজন্য বিশ্বাসী লোক দিতে পারি"—

"না, আমায় এইবার যেতেই হবে কাকা," বলায় তিনি খানিক চুপ্ ক'রে থেকে ব'লে উঠলেন, "তা হ'লে তুমিও আমায় ত্যাগ করবে নীরেন ?—তুমিও ?"

চোখ তাঁ'র অশ্রুপূর্ণ। এ কি বিষদৃশ স্বভাব তাঁ'র ! আপনার সন্তানের প্রতি এই ঘোর অবিচার, আর পরের ওপর এ কি অহেতুক স্নেহ ! কিন্তু এই অসুখ হয়ে মনটা এমন তরল হয়ে গেছে যে, চোখে জল দেখলেই নিজের চোখেও জল আসে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে জলটা মুছে ফেল্লেও তাঁ'র কাছে ধরা প'ড়ে গেলাম। তখন তিনি যেন জোরের সঙ্গেই ব'লে উঠলেন, "কক্‌খোনো যেতে পাবে না—এই বাছাকে এমনি ক'রে একা ছেড়ে যাও দেখি তুমি।

তোমার উপর সে অবিচার করলে ব'লে আমি তা'র মুখ দেখ্‌ছি না, আর সেই তুমিই আমায় ত্যাগ করবে? না না, তুমি যেতে পাবে না।"

২৫শে ডিসেম্বর।—দিদিকে বুঝিয়েও থামাতে পারছি না। তিনি সগুণার সঙ্গে দেখা করতে যাবেনই। তাঁ'র বিশ্বাস—সগুণা যদি রাজী হন, ঘরে ফিরে এলে বাপ কখনই মেয়েকে আর কিছু বলতে পারবেন না। আমাদের এই কর্ত্তব্যটা সারা হ'লেই আমরা চ'লে যেতে পারব। এমন ক'রে তাকে ঘরছাড়া অবস্থায় ফেলে রেখে তিনি কি ক'রে যাবেন?

কথাটা সত্য বটে। যাক্—যখন অন্য উপায়ই নেই, তখন যত দুরূহই হোক্, করতেই তো হবে। যাই কা'ল দিদিকে নিয়ে বালিকা বোর্ডিংয়ে! দূরে থাক্‌ব, তা হ'লেই দেখা হবে না! পাছে দেখা হয়ে যায়, এই ভয়টাই সব চেয়ে বেশী হচ্ছে। সে ধাক্কা কি সাম্‌লাতে পারব? নির্লজ্জের মত আবার আমি তাঁ'র কাছে যে গিয়েছি, সে তো বুঝতেই পারবেন! দিদিকে বারণ ক'রে দেব এ কথা বলতে? কিন্তু তাতে যদি কোন রকমে তাঁকে মিথ্যা বলতে হয়? এ অনুরোধ কি করা চলে? ছেলেমানুষী—অভিমানের মত যেন দেখায়! ছিঃ—হোক্—এও সইতে হবে।

২৬শে ডিসেম্বর।—গিয়েছিলাম দিদিকে সগুণার সঙ্গে দেখা করিয়ে আন্‌তে। সগুণা গার্লস্কুলের এক জন শিক্ষয়িত্রীর পদ নিয়েছেন, আর সম্মানের সঙ্গেই সেখানে আছেন বুঝলাম। 'দিদি' তাঁ'র নাম করতেই কটি মেয়ে বোর্ডিংয়ের হেড্‌ মিষ্ট্রেসের কাছে হুকুম নিতেও না গিয়ে একেবারে তাদের নতুন টিচারের কাছেই দৌড়ুলো, আর এক জন 'দিদি'কে সসম্মানে বসতে চৌকী দিলে! আমি আস্তে আস্তে বাইরে চ'লে এলাম।

হাতার একদিকে একটু একটু পায়চারী করতে করতে সময়টা কাটিয়ে নিলাম। তখন স্কুলের ফেরত মেয়েরা বোর্ডিংয়ে আসছে। এই দেশের এই সুন্দর আবহাওয়াটি সস্পৃহ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম। তাঁরা সব হিন্দুর ঘরেরই মেয়ে। রবি বর্ম্মার স্ত্রীছবির মত কারও কারও কপালের মাঝখানে সিঁদুরের মোটা টিপ্; সেগুলি নিশ্চয়ই বিবাহিতা। উচ্চ হ'তে উচ্চ বর্ণের মেয়েরাই এর মধ্যে বেশীর ভাগ আছে। তবে এখানে কলেজ নেই—প্রবেশিকা মাত্র পাশ দেওয়া চলে; তাই বেশী বয়সের মেয়ে তত বেশী নেই। এঁদের বিয়েও বয়স হয়েই হয়, তাই এর মধ্যে বিবাহিতা দুটি তিনটি মাত্র দেখলাম। যে তিন চার জনের বয়স একটু বেশী বোধ হ'ল, ভাবে বোধ হ'ল, তাঁরা টিচার। কি অসঙ্কোচ গতি আর ভাবভঙ্গী! আমাদের দেশের যাঁ'রা ধর্ম্মের পর্য্যন্ত একটু নামান্তর নিয়ে তবে এই রকম স্ত্রীস্বাধীনতার ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারেন, তাঁ'রাও এ দেশের মেয়েদের মত এ রকম শরীরের রক্ত অস্থি-মজ্জাকে পর্য্যন্ত স্বাধীন ক'রে তুলতে পারেন না। এমন একটু সঙ্কোচ তাঁ'দের মধ্যে থেকেই যায়—যাতে তাঁ'দের কাছে গেলেই তাঁরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে, তা বেশ ধরা পড়ে। এরা যেন পুরুষেরই মত একটা সঙ্কোচহীন—লজ্জার সংস্কারমাত্রহীন জাতি! হাত, পা, মাথা, মুখ খোলা, স্বাধীনতার নামান্তরে বস্ত্রের একটা বোঝা হওয়া নেই, দেশের দশের সঙ্গেই অবস্থা মিলানো একখানা শাড়ী আর এক এক হাতকাটা জামা (চোলি) গায়ে, চলন-ফেরন পর্য্যন্ত এমন নিঃসঙ্কোচ—যাতে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে একটু পীড়ার মতই লাগে যেন। পুরুষমানুষের মত কাছায় কোঁচায় এ যেন চিত্রাঙ্গদার দেশের বা দ্বিতীয় প্রমীলার পুরীর মেয়েরা! কারও দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে নগ্নপদে নগ্নমস্তকে বগলে এক এক গোছা বই নিয়ে ঠিক আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্রদের মত দীর্ঘ পদবিক্ষেপে সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করতে করতে চলেছে। আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের একটা দুর্ব্বলতা যা বেশীর ভাগ মেয়েদের মধ্যেই দেখা যায়—সেই সুন্দর দেখানোর চেষ্টা—কেমন দেখাবে, তা'র দিকে একটা উৎকণ্ঠ দৃষ্টি, সেটা বোধ হয়, এরা একেবারে জানেই না। মেয়েদের যে পুরুষদের কাছে এই একটা মুখপ্রেক্ষিতার বিষয় আছে, চালচলনে তা'দের মধ্যে এ যেন বোঝবারই পথ নেই। আমাদের জন্মগত সঙ্কোচে আমি তা'দের পাশ থেকে একটু দূরে দূরে রয়েছি, আত্মীয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেও অন্যত্রে স'রে গিয়েছি, এ দেখে তা'রা একটু বিস্মিতভাবেই যেন আমার দিকে চেয়েছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন টাঙ্গাওয়ালা আমার বিরক্তির চরমসীমায় তুলেছে, তখন দিদি বেরিয়ে আসছেন দেখলাম,

আর দেখলাম তাঁ'র সঙ্গে সগুণা। বোধ হয়, জেনেছিলেন কিংবা আন্দাজই করেছিলেন, তাই তাঁ'র সঙ্গে আমার চোখোচোখি হয়নি। ভাগ্যে আমি টাঙ্গাটার কাছেই তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিকটা এসে দিদি বল্লেন, শুন্‌তে পেলাম, "আর দরকার নেই, যাও, জল খাওয়ার সময় যাচ্ছে, ফিরে যাও এইবার! আচ্ছা, আস্‌তে আর এক দিন চেষ্টা করব,—যাও।" সগুণা বোধ হয়, ফিরে গেলেন; কেন না, টাঙ্গার সম্মুখের আসনে যখন দিদির আদেশে উঠে বসার পর টাঙ্গাটা চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো, তখন একবার সেই দিকে চেয়েছিলাম। খোলা বারান্দায় দু'এক জন মহিলা যাওয়া আসা কর্‌ছেন, এই মাত্র দেখ্‌তে পেলাম। আর কিছু না।

বাসায় পৌঁছে দিদির মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "চেষ্টাটা মিথ্যাই হবে ব'লে বুঝলে কি দিদি?" দিদি উত্তর দিলেন, "ঠিক্ বুঝতে পারলাম না। বাপ একটু নরম হলেই ভাল হ'ত। সগুণা সবই জিজ্ঞাসা করলে, 'বাবা কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তা যখন পাঠাননি, তখন কেন আর এ কথা! আমার দিকের বাধা তো কিছুই নেই, তিনি আমায় নির্যাতন না করলেই আমি আবার ফিরে যেতে পারি। তাঁর ওপোর আমার তো রাগ নেই'।"

এই নির্যাতনকারীই মাত্র তাঁ'র রাগের পাত্র। সে তো জানা কথাই! তবু কেন এটুকু শুন্‌তে এমন মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুতের বাড়ি পড়ে! দিদি বল্‌তে লাগলেন, 'এই ব্যাপারে তোমার মন যখন বাবা জেনেছেন, তখন আর নিশ্চয়ই নির্যাতন করবেন না, তুমি ফিরে চল।' আমি এই কথা বল্লাম যখন, তখন সে বল্লে, 'তিনি নিজে আমায় নিতে আস্‌তে না পারেন, একখানা পত্রও তো দিতে পারেন? তা না যত দিন দিচ্ছেন, তত দিন কি ক'রে ফিরে যাই দিদি? যদি আবারও এই অশান্তি বাধে?' আমি উত্তর দিলাম, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, আর বাধবে না, কেন না, যাকে নিয়ে বেধেছিল, তাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই আমি দেশে যাচ্ছি! তুমি তোমার বাপের কাছে গেলেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা চ'লে যেতে পারি।' তাতে সে বল্লে, 'আমার জন্যে আপনি কেন ভাবছেন? দেখছেন না, আমি ভালই আছি।' 'তুমি তো ভাল আছ, কিন্তু তোমার অভ সম্বন্ধহীন বন্দো বাপ... তাঁ'র কথা ভাব কি?' এই কথায় মুখ রাঙা ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, 'না, আমার তাঁ'র এখন না হ'লেও চল্‌বে।'

আমি নিঃশব্দে চোখ বুজে শুনে যাচ্ছিলাম। তিনি চুপ কর্‌লে বল্লাম, "এইবার তো আপনার ঝোঁক্ মিট্‌লো, চলুন এইবার আমরা যাই।"

"আমি যাওয়ায় খুব খুসী হয়েছে কিন্তু সগুণা। বল্‌লে, 'যদি আপনার থাকার উপায় থাকতো দিদি, আমি আপনাকে এই দেশে থাকতে বল্‌তাম। মাঝে মাঝে তবু আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত!' আমি বল্লাম, 'তুমি নিজের বাপের কাছে না গেলে আমি দেশে যেতেই পার্‌বো না। এ শুন্‌লে হরেন আমায় কি বলবে না যে, তুমি কেন তাকে তবে সঙ্গে ক'রে আমাদের বাড়ী নিয়ে গেলে না? এমন ভাবে রেখে কি ব'লে চ'লে গেলে? তাতে সে একটু চুপ ক'রে থেকে আমায় কি অনুরোধ করলে জান নীরেন? পারি যদি, এ সব কথা হরেনকে যেন না লিখি। আমি যে লিখে দিয়েছি হরেনকে, সে কথা বল্লাম তাকে। আমায় বলেছিল, আর একবার আসবেন! আমি তখন বলতে বাধ্য হলাম যে, আমি তো একা আস্‌তে পারব না, সঙ্গে যাকে এনেছি, তাকে এ কষ্ট আর আমি দিতে পার্‌বো না। সে আমার দায়েই এসেছে, নৈলে'—"

বাধা দিয়ে বল্লাম, "এ কথাটা না বল্লেও চল্‌ত দিদি।"

"চল্‌তো জানি, কিন্তু তার আগেই তোমার এই বিষম অসুখের জন্য এই দেড় মাস যে আমাদের দেশে যাওয়া হয়নি, সে কথাটা তার কথার উত্তরে ত ব'লে ফেল্‌তে হয়েছিল! তাই এটুকুও বল্‌তে হ'ল।"

"যাক্, এইবার আর দেরী ক'রে কায নেই, দেশে চলুন দিদি।"

"এবারের বিলাতের ডাকের দিনটা দেখে হরেনের চিঠিটা পেয়ে তবে গেলে ভাল হ'ত না?"

"সেও আর বেশী দেরী নেই। তাই না হয় যাওয়া যাবে।"

হরেন্দ্রর যথাসময়ে নিরাপদে ইংলণ্ড পৌঁছানো এবং একরকম স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে স্থান পাওয়ার সংবাদ এসেছিল। তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, দিদি তার উত্তরে কি কি লিখেছেন? তারই উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকলেম বল্লেম বটে,

তত ইচ্ছে নেই। এ অসম্ভবও নয়। কেন না, সগুণাকে ভাবী ভ্রাতুবধূ ব'লে এখন তাঁর ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক! তাকে এই রকম অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে তাঁ'র বাঙ্গালী হিন্দুর মেয়ের সংস্কারে বোধ হয় বাধছিল। সগুণা যে এই তিন চার বৎসর অন্যত্রে পরের অভিভাবকতায় বিদ্যাশিক্ষা ক'রে এসেছেন, এখনও তিনি যে স্বচ্ছন্দেই নিজের ভার নিজে নিয়ে থাকতে পারেন, সে উনি কিছুতেই মনে রাখতে পারছিলেন না। কোন উপায় পেলে উনি বোধ হয় এখনই এখান থেকে যেতেন, কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে।

৩০শে ডিসেম্বর।—হরেন্দ্রর চিঠি এলো। 'দিদি'কেই লিখেছে। তাঁ'র নানা কথার উত্তর দিয়ে—আমি কেমন আছি, সেজন্য বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে শেষে সগুণার বিষয়ে আলোচনা করেছে। লিখেছে—"সগুণা এখন অধীর না হ'লেই ভাল হ'ত! সে নীরেনকে চেনে না, তাই এই ভুলটা করতে পেরেছে। তা'র বাবা যা-ই বলুন, সগুণা চুপচাপ থাক্‌লেই হ'ত। যাক্, যা হবার, হয়েছে, এখনও সে যাতে বাপের কাছে ফিরে আসে, সেই চেষ্টা আপনিও করুন। এ বিষয়ে তাকে আমারও অনুরোধ জানাবেন। আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকলাম, তার বাড়ী ফেরার খবর পেলে সুস্থ হব।" সে যত দিন বাড়ী না ফেরে, নীরেন আমাদের ওপোর অনুগ্রহ ক'রে যত দিন ওখানে থাকবে, তত দিনই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আপনারা সর্ব্বদা তা'র তত্ত্ব নেবেন ও আমায়ও জানাবেন" ইত্যাদি।

'দিদি' পত্রখানা সগুণাকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; কিন্তু আমার যে একটু বাধা লাগছে দু'একটা কথার জন্য। কিন্তু বারণ করারও পথ তো নেই! নীরেনকে তুমিও চেনোনি হরেন,—মিথ্যে এ সব লিখেছ!

৩১শে ডিসেম্বর।—দিদিকে আজ স্পষ্টই বল্‌লাম, নিজের প্রশংসা-পত্র সঙ্গে নিয়ে তাঁ'র সঙ্গে আমি সগুণার কাছে যেতে পার্‌ব না। তিনি আমার চাকরকে নিয়ে টাঙ্গায় চ'ড়ে সেখানে যান। যে দেশে যেমন, সেখানে তেমন ভাবে স্বচ্ছন্দেই চলতে পারা উচিত। আমায় একেবারে অস্বীকার দেখে তিনি অগত্যা তাই-ই করলেন।

দু'দিন কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি, দিদিকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁ'র কাছে সময়টা কাটিয়ে এলাম। তাঁ'র আমাশার অসুখ আছে, মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এখনও দেখা দিয়েছে আর তাই নিয়ে কষ্টও পাচ্ছেন দেখ্‌লাম। আমার যাবার কথা উঠ্‌তেই তিনি ঠিক্ সেই দিনের মত এমন ক'রে উঠলেন যে, সে কথা আর তাঁ'র সাম্‌নে তুলবই না ভাবলাম। যে দিন যাব, নিঃশব্দেই পালাতে হবে। কিন্তু দু'মাস যে হ'তে চল্‌লো—আর কত দিন এমন ক'রে ব'সে থাক্‌ব এখানে?—এই ডায়েরীরই আরম্ভের দিকে—আর তার মাঝের দিকে চাইলেও একটা এমন হাসি ভেতরটাকে ভরিয়ে তোলে! কি ব্যথা নিয়ে তখন এত ক'রে ফেনিয়ে গেছি। আজকার কথা বল্‌তে যে একটা ভাষাও নেই!—সব যে একেবারে বোবা হয়ে গেছে আমার! চিন্তাহীন—বাক্যহীন—স্তব্ধ জড় আমি। ঘৃণা—ঘৃণা! এরই স্মৃতিমাত্র আমার সম্বল!

'দিদি' ফিরে এলেন। তাঁ'র অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে একটু অবাক্ হলাম। বুঝ্‌লাম, নিশ্চয় তিনি কোন আঘাত পেয়েছেন! আমায় প্রথমেই বল্‌লেন—

"কবে যাবার দিন ঠিক্ কর্‌ছ নীরেন?"

"পরশু।"

"বেশ, তাই চল!" তার পরে একটু থেমে যেন নিজ মনেই বল্‌লেন, "এই যে বিষম স্বাধীন মেয়েটি এই তোমাদের সগুণা, এর কপালে কষ্ট আছে শেষে—দেখে নিও! জগতের সকলেরই যেন স্বার্থ নিয়েই কারবার—এমনি যেন তার ধারণাটা!"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, "থাক্ না দিদি ওঁদের কথা—"

"না, থাকবে না, তোমায় তা'র কথা আজ একটু শুন্‌তে হবে। তোমায়ও চিনিয়ে দেব একটু মেয়েটিকে!"

কি যেন বল্‌তে গিয়ে সাম্‌লে নিলেন তিনি। তা'র পরে একটু শান্তভাবে বল্লেন—"জান নীরেন—হরেন যে তাকে উদ্দেশ ক'রে ঐ কথাগুলো লিখেছে, সেগুলো পড়েও সে বিষম চ'টে গেছে! বল্লে, 'আপনার ভাইকে নিশ্চিন্ত হ'তে বলবেন। আমার জন্য আপনাকে এখানে ব'সে থাক্‌তেও হবে না! আমার জন্য না ভেবে আপনার ভাই নিজের দিকেই যেন সে মনোযোগটি দেন।' আমি তোমায় এখনও বল্‌ছি নীরেন—এ মেয়েটিকে এখনও কেউ আমরা চিনিনি।"

আমি মিনতির সুরে বল্লাম, 'তা হ'তে পারে, দিদি, এই বেলা আমাদের—"

দিদি সে কথায় কর্ণপাতও না ক'রে নিজের মনের গুপ্ত ক্রোধে আবার নিজে যেন ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে গোঁ গোঁ ক'রে বল্‌লেন, "সব চেয়ে অসহ্য তা'র!— বল্‌লামও যে, নীরেন মাত্র আমাদের উপকারী, এইটিই মনে ভেবো না; সে আমার ভাই! নাঃ, আর না, চল, আমরা চ'লে যাই, নীরেন!"

চোখ বুজে বল্‌লাম, "তাই চল।" বুঝ্‌তে পারছিলাম, দিদি কি জন্য এত বেশী রেগেছেন। তাঁ'র এই ভাইটির ওপোরও বিরক্তি, ঘৃণা আর স্বার্থপরতার আরোপই তাঁ'কে এত বিচলিত করেছে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

ভারতের রাজস্ব-সচিব

হিন্দুর নব নামকরণ

ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো বর্গী এল দেশে, বুল-বুলীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে। ভোটের ছুটোছুটি হুটোপাটী চুকে গেল, ছেলেরা ঘুমিয়ে প'ড়লো, পাড়া জুড়ুলো;——পাড়া জুড়ুলো ব'লে জুড়ুলো! সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় কি মেড়ার লড়াই-ই চলছিল এই মাস দুই আড়াই! ছেলেদের কালেজ-স্কুল নেই, চাকুরের রবিবার নেই, বেকারের বিড়ি ধরাবার অবকাশ নেই, সকাল বিকাল সন্ধ্যা সব দলে দলে পালে পালে ভোট লুটতে ঘুরে বেড়িয়েছে। এবার পূজা কোথা দিয়ে চ'লে গেছে, তা 'কেণ্ডিডেট'ও টের পান্‌নি, 'ক্যানভ্যাসার'ও আভাসে বুঝতে পারেন নি।

পরোপকারের কি মহামন্ত্র নিয়েই ইংরাজরা ভারতবর্ষে শুভ-প্রবেশ করেছিলেন; সেই অবধি ক্রমান্বয়ে তাঁরাও গলদ্‌-ঘর্ম্ম হয়ে আমাদের উপর পরোপকার প্র্যাক্‌টিস কচ্ছেন, আর সংসর্গগুণে ও সদ্‌গুরুর উপদেশে আমরাও প্রতিবেশীদের উপর পরোপকার চালাবার জন্য প্রবলবেগে ধাবমান হয়েছি। আহা! কি ধম্বা, কি কান্না, কি আনাগোনা! পরোপ-কারীতে পরোপকারীতে কি লড়াই! রাম পরোপকারী বলে, শ্যাম পরোপকারীটা মূর্খ; শ্যাম পরোপকারী বলে, রাম পরোপকারীটা খোসামুদে; কালুর ছেলের সঙ্গে ভুলুর মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছিল, এমন সময় কৌন্সিলের ভোটোৎসবের বাজনা বেজে উঠ্‌লো, অমনি কালু-ও গেল পরোপকার করতে, ভুলু-ও গেল পরোপকার করতে। অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হ'ত, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল। নিমাই পরোপকারী রমাই পরোপকারীর নামে হাইকোর্টে মামলা জুড়ে দিলে। পরোপকার-শ্রাদ্ধের দক্ষিণাপ্রাপ্তিতে পরিতৃপ্ত হয়ে উকীল-কৌন্সিলিরা দেশহিতৈষিতা দেবীকে প্রদক্ষিণ ক'রে "জয় ভারতের জয়" বন্দনা গাইলেন।

সাধারণতঃ বিপদ্‌গ্রস্ত, দায়গ্রস্ত, আশ্রয়হীন দীন-দুর্ব্বলই উপকারের প্রত্যাশায় ধনী ধার্ম্মিক ক্ষমতাবান্‌ বিদ্বান্‌ বলীয়ানের দ্বারে উপকারপ্রত্যাশায় অবনতমস্তকে উপস্থিত হইয়া থাকে; কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা; অনাহারী অতন্দ্র উপকারী লোকের দ্বারে দ্বারে তাহাদের মঙ্গলের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃষ্টান্ত কেবল মহান্‌ নহে, দেবাদর্শে প্রণোদিত; মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব-ও যেমন বিষয়-বিষজর্জ্জরিত সংসারীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছিলেন, রাজ-নীতিক পরিত্রাতারাও তেমনই আত্মবিস্মৃত করদাতৃগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভোট-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন; কিন্তু বুদ্ধ, যিশু, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি অবতারগণ যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আসিয়াছিলেন, সেই জন্য ভক্তদের বড় বেশী বিড়ম্বনা হয় নাই, এ একেবারে একসঙ্গে অবতারের উপর অবতার কলসে কলসে করুণা কাঁধে করিয়া পরিত্রাণের জন্য সাধাসাধি, ভক্তরা কাহাকে রাখিয়া কাহাকে পূজা করেন ভাবিয়া অস্থির।

রূপক রাখিয়া সাদা কথায় একটা আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, সমস্ত দেশের কথা দূরে থাক, ভারতের সংক্ষিপ্তসার এই কলিকাতা নগরীতে কি এমন একটিও লোক নাই যে, কি মিউনিসিপ্যাল কি কাউন্সিল ইলেকসনে লোক নিজের ইচ্ছায় ছুটে তাঁর কাছে গিয়ে বলে যে, আপনি কমিশনার বা কাউন্সিলার হোন্‌, আমাদের বিশ্বাস আছে যে, আপনি আমাদের উপকারের চেষ্টা করবেন, আর অনুপকার কখনও করিবেন না।

যাক্‌, ভোটের লেঠা চুকে গেল, "ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো।" এখন যে "বর্গী এল দেশে," ভাবনা হচ্ছে যে, ধান ত বুলবুলীতে খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে? অন্য অন্য উপকারের সঙ্গে খাজনা যে বেশী ক'রে দিতে হবে, এ কথা নিশ্চয়। কথা উঠেছে, আমরা অধিকার চাচ্ছি—অধিকার পাচ্ছি, কিন্তু সদ্যঃফলপ্রদ অধিকার দেখছি নিজে-দের উপর ট্যাক্স বসাবার উদার অধিকার। প্রবন্ধান্তরে বলেছি, হিন্দুস্থানে এক্ষণে ইংরাজরাই ব্রাহ্মণ; সুতরাং পূজারি বামুনের অনেক কৌশলই ইংরাজরা শিক্ষা করেছেন। কালীপূজার সময় ভট্‌চায্যি মশায় পাঁঠাটিকে সংস্কৃত মন্ত্র প'ড়ে বলিদানের জন্য উৎসর্গ ক'রে কোপ

মারবার জন্য যখন কামারের কাছে জিম্মা ক'রে দেন, তখন ছাগশিশুর কানে কানে ব'লে দেন "বধ বধ বধ, যে তোমারে বধে, তারে তুমি বধ।"—যা, ছাগলের যত আক্রোশ ঐ কামারপোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ুক। ইংরাজও তেমনই এদেশীয়দের অধিকার দিয়ে কতকগুলি কামার তৈরী কচ্ছেন, প্রজার গলায় কোপ মারবার ভার তাদের উপর; প্রজাও "বধ বধ বধ, যে তোমারে বধে, তারে তুমি বধ" এই মন্ত্রের প্ররোচনায় নুণ বেশী মাশুল দেবার সময় এ কৌন্সিলারকে গাল দিচ্ছে; ষ্ট্যাম্পের দর বাড়লো, ও কাউন্সিলারকে মুখ খিঁচোচ্ছে; জরিমানার পয়সা জমা দিয়ে গান শুনে নাচ দেখে ছবি দেখে ফেরবার সময় মিনিষ্টারের মুণ্ডপাত কচ্ছে আর পুরুতঠাকুর চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে ঘণ্টা নাড়চেন, নস্ত নিচ্ছেন আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসচেন।

কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে যে, একটা

বড় অধিকার আমরা পেয়েছি!

পুরাতন নাম আর আমাদের বরদাস্ত হচ্ছে না; মিত্র মিটার হচ্ছেন, দত্ত হচ্ছেন ডাটা চট্টো হচ্ছেন চ্যাটো, বন্দ্যো হচ্চেন বানরজি, রক্ষিত হচ্চেন রোকেট। কায়স্থরা দাস লিখতে নারাজ, কিন্তু সিবিল সার্ভেণ্ট হ'তে পারলে বুক-খানা দশ হাত হয়; দাস উপাধিযুক্ত বৈষ্ণরা তালব্য শ দিয়ে দাশ লিখছেন, সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতরা মনে মনে করেন, এ কি, জেলে না কি? 'সাহেবরা' নেটিভ বল্‌লে চটে যাই, বাবু বল্‌লে রাগে গরম হয়ে উঠি; কিন্তু স্কোয়ার শিরোনামা-লিখা চিঠি পেলে আহ্লাদে গদগদ অথচ স্কোয়ার মানে নাই-টের নফর; ভারতবাসী হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী এ সব নাম আর পছন্দ হ'ল না—আমরা নাম নিলুম ইণ্ডিয়ান। কত যুগ-যুগান্তরের আর্য্যাবর্ত্ত—কত সহস্র সহস্র বৎসরের ভারতবর্ষ —প্রায় হাজার বছরের হিন্দুস্থান দিলুম সাগরের জলে ডুবিয়ে—বরণ ক'রে নিলুম ২ শত বছরের ইণ্ডিয়াকে; —বটেই ত! কালকের চক্‌চকে জার্ম্মাণ র‍্যাপারের কাছে কি বকেয়া কাশ্মীরী জামিয়ার লাগে!

কিন্তু গোল বাধলো রিফরমে স্বরাজের কিস্তিবন্দী হয়ে। সাদা 'সাহেবরা' বল্‌লেন, আমরা য়ুরোপীয়ান, ইণ্ডিয়ান নাম কেন নেব? কাল 'সাহেবেরা' বল্‌লেন, য়ুরোপীয়ান যখন বলবে না, তখন ইণ্ডিয়ান বটে; কিন্তু তাতে একটা বাঁট না দিলে আমরা মুটো ক'রে ধরবো না; সুতরাং তাদের বলতে হ'ল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান; মুসলমানরা বল্‌লেন যে, আমা-দের ধর্ম্ম আগে, তার পর ত ইণ্ডিয়া, মহাম্যাডিয়ান আছি এবং মহাম্যাডিয়ান থাকবই। এবার মুস্কিল হ'ল আমা-দের নিয়ে; পত্তনিদার, জোতদার, মৌরসীদার সবাই যে যার নাম খারিজ ক'রে নতুন দাখিলা লিখিয়ে নিলে, আসল সাবেক জমীদার আমরাই, আমাদেরই নিরুপায়; আমাদের আর্য্য দলিল হারিয়ে গেছে, হিন্দু দলিল পোকায় কেটেছে, ইণ্ডিয়ান ব'লেও নতুন দলিল হবার যো নেই, কেন না, য়ুরোপীয়ান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মহাম্যাডিয়ান, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, এমন কি, ব্রাহ্মদের পর্য্যন্ত reversionary right আছে;—তবে উপায়?

পাঁজি খুলে 'সাহেব' পুরোহিতরা আমাদের নতুন নাম করবার চেষ্টা করলেন; দেখলেন, আমরা মেষরাশি—আগুক্ষর অ; সুতরাং আমাদের নতুন নামকরণ হ'ল—

অ-মুসলমান!

অ ল দুই বর্ণই মেষরাশির আগুক্ষর, ইতরসাধারণে ন স্থানে ল, ল স্থানে ন বলেই থাকে; সুতরাং ইংরাজীতে নন্-মহাম্যাড্যান।

শুভ সৌরকার্ত্তিকস্য অষ্টাবিংশতিদিবসে তুলারাশিতে শুভ বুধবাসরে ভাগীরথীতীরস্থ কলিকাতা মহানগরীতে ভরদ্বাজ, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য, গৌতম, বিশ্বামিত্র, সৌকালীন, অঙ্গিরা প্রভৃতি গোত্রসম্ভূত হিন্দুসন্তানগণ পেট্রিয়টিক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া অ-মুসলমান পরিচয় দিয়া আর এক-জন অ-মুসলমানকে ভোট দিয়া আসিলেন।

জগতের রাজনীতিক ইতিহাসে কোন জাতি এমন নবীন নামধারণে অধিকার পাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ; আর জাতিকুল ভাঁড়াইয়া, কুলুজি ইতিহাস পায়ে মাড়াইয়া, বি-নামা নামে পরিচয় দিয়া এমন দেশ-উদ্ধার যে কেহ কখন করে নাই, তাহা নিশ্চয়।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

জাগরণ

১

ব্যারিষ্টার মিষ্টার আর, এম, রে ব্রাহ্ম ছিলেন না, গোঁড়া হিন্দু ত ছিলেনই না, হয় ত বা আঠারো-আনা 'বিলাত-ফেরতের-জাতি'ও নাও হইবেন, তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার পিতা মাতা যখন আরাধ্য দেব-দেবী স্মরণ করিয়া সপ্ত পুরুষের অক্ষয় স্বর্গকামনায় একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীরাধামাধব রায় রাখিয়াছিলেন, তখন অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাঁহারা কল্পনা করেন নাই যে, এই ছেলে এক দিন আর, এম, রে হইয়া উঠিবে, কিংবা তাহার খাদ্য অপেক্ষা অখাদ্যে এবং পরিধেয়র পরিবর্ত্তে অপরিধেয় বস্ত্রেই আসক্তি দুর্দ্দম হইয়া দাঁড়াইবে। যাই হোক, সেই পিতা-মাতারা আজ যখন জীবিত নাই, এবং পরলোকে বসিয়া পুত্রের জন্য তাঁহারা মাথা খুঁড়িতেছেন কিংবা চুল ছিঁড়িতেছেন অনুমান করা কঠিন, তখন এই দিকটা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার যে-দিকটায় মতদ্বৈধের আশঙ্কা নাই, সেই দিকটাই বলি।

ইঁহার রাধামাধব অবস্থাতেই বাপ-মায়ের মৃত্যু হয়। কলেরা রোগে সাত দিনের ব্যবধানে যখন তাঁহারা মারা যান, ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশটুকু পর্য্যন্ত করাইয়া যাইতে পারেন নাই। তবে, এই একটা বড় কায করিয়া গিয়াছিলেন যে, ছেলের জন্য জমীদারী এবং বহু প্রজার রক্ত-জমাট-করা অসংখ্য টাকা এবং ইহার চেয়েও বড়, এক অতিশয় বিশ্বাসপরায়ণ ও সুচতুর কর্ম্মচারীর প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করিয়া যাইবার অবকাশ এবং সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ সকল অনেক দিনের কথা। আজ 'সাহেবের' বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধে গিয়াছে, দেশের সে রাজশেখর দেওয়ানও আর নাই, সে সব দেব-সেবা, অতিথি-সৎকারের পালাও বহুকাল ঘুচিয়াছে। এখন ইংরাজী-নবিশ ম্যানেজার, এবং সেই সাবেক কালের বাড়ী-ঘরের স্থানে যে ফ্যাসানের বিল্‌ডিং উঠিয়াছে, মালিক মিষ্টার আর, এম, রে'র মত ইহাদেরও পৈতৃকের সহিত কোন জ্ঞাতিত্ব নাই। অথচ, এই সকল নব পর্য্যায়ের সহিতও যে যথেষ্ট সম্পর্ক রাখিয়াছেন তাহাও নয়। কেবল, দূর হইতে সমস্ত নিঙড়াইয়া যে রস বাহির হয়, তাহাই পান করিয়া এতকাল আত্ম এবং সাহেবত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। এইখানে তাঁহার কর্ম্মজীবনের আরও দুই একটা পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া আবশ্যক। ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া তাঁহারই মত আর এক 'সাহেবের' বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং যথাক্রমে অযোধ্যা, প্রয়াগ, বোম্বাই এবং পঞ্জাবে প্র্যাকটিস্ করেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা লইয়া বার তিনেক বিলাত যাতায়াত করেন এবং আর যাহা করেন, তাহা এই গল্পের সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন। ছেলেটি ত ডিফ্‌থিরিয়া রোগে শৈশবেই মারা যায়, এবং পত্নীও দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বছর তিনেক হইল নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। সেই হইতে রে সাহেবও প্র্যাক্‌টিস্ বন্ধ করিয়াছেন। ঐ ঐ স্থানগুলায় যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ না থাকার জন্যই হোক বা স্ত্রীর মৃত্যুতে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতেই হোক, এক সাহেবি-আনা ব্যতীত আর সমস্তই ত্যাগ করিয়া তিনি একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা বড় সহরে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন। এম্‌নি সময়ে এক দিন তাঁহার নিশ্চিন্ত শান্তি ও সুগভীর বৈরাগ্য দুই-ই যুগপৎ আলোড়িত করিয়া মহাত্মা গন্ধীর নন্-কো-অপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ এক মুহূর্ত্তে একেবারে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে 'অদ্রোহ-অসহযোগ' নিমিষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতি-বেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ-দৈন্য, যত উৎপাত-অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জ্জনা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গবেগে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।

কলিকাতার মেল ক্ষণকাল পূর্ব্বে আসিয়াছে, বাহিরের ঢাকা বারান্দায় আরাম-কেদারায় বসিয়া রে সাহেব জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বিবরণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময়ে নীচে গাড়ী-বারান্দায় মোটরের শব্দ শোনা গেল, এবং মিনিট দুই পরেই তাঁহার কন্যা আলেখ্য

রায় বাহিরে যাইবার পোষাকে সজ্জিত হইয়া দেখা দিলেন। মেয়েটির রঙ ফর্সা নয়; কারণ, বাঙালী 'সাহেবদের' মেয়েরা ফর্সা হয় না, কেবল সাবান ও পাউডারের জোরে চামড়াটা পাণ্ডটে দেখায়। তবে, দেখিতে ভাল। মুখে চোখে দিব্য একটি বুদ্ধির শ্রী আছে, স্বাস্থ্য ও যৌবনের লাবণ্য সর্ব্বদেহে টল্ টল্ করিতেছে, বয়স বাইশ-তেইশের বেশী নয়; কহিল, বাবা, ইন্দুর বাড়ীতে আজ আমাদের টেনিস্ টুর্ণামেণ্ট, আমি যাচ্ছি। ফিরতে যদি একটু দেরি হয় ত ভেবো না।

'সাহেব' কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় উজ্জ্বল, মুখে আবেগ ও আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে, মেয়ের কথা কানেও যায় নাই। বলিয়া উঠিলেন, আলো, এই দেখ মা কি সব কাণ্ড! বার বার বলেছি, এ সব হ'তে বাধ্য, হয়েছেও তাই।

মেয়ে বাবাকে চিনিত। তাঁহার কাছে সংসারে যাহা কিছু ঘটে, তাহাই ঘটিতে বাধ্য, এবং তিনি তাহা পূর্ব্বাহ্লেই জানিতেন। সুতরাং এটা যে ঠিক কোন্‌টা, তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া কহিল, কি হয়েছে বাবা?

বাবা তেম্‌নি উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে? দুজন নন্-কো-অপারেটার ছাত্রকে ম্যাজিষ্ট্রেট ধ'রে নিয়ে গিয়ে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির জেল দিয়েছে, আরও পাঁচ-সাত-দশ জনকে ধরবার হুকুম দিয়েছে,—কি জানি এদেরই বা কি সাজা হয়! এই বলিয়া এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিলেন, আর যা' হবে, তা'ও জানি। খাটুনির জেল ত বটেই, এবং এক বছরের নীচেও যে কেউ যাবে না, তা'ও বেশ বোঝা যায়। এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আলেখ্য এ সকল বিষয়ে মনও দিত না, এখন সময়ও ছিল না। আসন্ন টুর্ণামেণ্টের চিন্তাতেই সে ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গিহীন, শোকজীর্ণ, অকালবৃদ্ধ পিতার আগ্রহ ও আশঙ্কাকেও অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। পাশের চেয়ারটার হাতলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলে দু'টি কি করেছিল বাবা?

পিতা কহিলেন, তা' করেছেও কম নয়। চারিদিকে গান্ধীর নন্-কো-অপারেশন মত প্রচার ক'রে বেড়িয়েছে, দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা মারামারি কাটাকাটি কোরো না, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ কোরো না, কিন্তু এই অনাচারী, ধর্ম্মহীন, সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্ণমেণ্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো না। চাকরীর লোভে এর দ্বারে যেয়ো না, বিদ্যের জন্যে এর স্কুল-কলেজে ঢুকো না, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়িয়ো না।

আলেখ্য কহিল, তার মানে, সমস্ত দেশটাকে এরা আর একবার মগের মুল্লুক বানিয়ে তুল্‌তে চায়।

রে বলিলেন, তা' ছাড়া আর কি যে হ'তে পারে, আমি ত ভেবে পাইনে!

আলেখ্য কহিল, তা হ'লে এদের জেলে যাওয়াই উচিত। বাস্তবিক, মিছামিছি সমস্ত দেশটাকে যেন তোলপাড় ক'রে তুলেছে।

মেয়ের কথায় পিতা পূর্ণ সম্মতি দিতে পারিলেন না একটু দ্বিধা করিয়া বলিলেন, না, ঠিক যে মিছামিছিই করছে, তাও নয়, গভর্ণমেণ্টেরও অন্যায় আছে।

আলেখ্য গভর্ণমেণ্টের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রায় জানিত না। খবরের কাগজ পড়িতে তাহার একেবারে ভাল লাগিত না, দেশ বা বিদেশের কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, এ লইয়া নিজেকে নিরর্থক উদ্বিগ্ন করিয়া তোলার সে কোন প্রয়োজন অনুভব করিত না। সুমুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও তাহার মিনিট দশেক সময় আছে, বাবাকে একলা ফেলিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন-কিছু একটা অছিলায় এই স্বল্পকালটুকুও তাঁহাকে সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়া যাইবার লোভে কহিল, বাবা, মুখে তুমি যাই কেন না বল, ভেতরে ভেতরে কিন্তু তুমি এই সব লোকদেরই ভালবাসো। এই যে সে দিন হরতালের দিন ইন্দুদের মোটরের উইণ্ডস্ক্রীনটা ইঁট মেরে ভেঙে দিলে, তুমি শুনে বল্লে, এ রকম একটা বড় ব্যাপারে ও সব ছোটখাটো অত্যাচার ঘটেই থাকে। গাড়ীতে ইন্দুর বাবা ছিলেন, ধর, যদি ইঁটটা তাঁর গায়েই লাগতো?

কন্যার অভিযোগে পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না না, আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ আলো। এই সব দুরন্তপনা আমি মোটেই পছন্দ করিনে, এবং যারা করে, তাদের শাস্তি দিতেই বলি। কিন্তু তা'ও বলি, মিষ্টার ঘোষের সে দিন গান্ধীকে না [illegible]

এতগুলো লোকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করাই কি ভাল মা ?

আলেখ্য রাগ করিয়া কহিল, অনুরোধ করলেই হ'ল বাবা ? বরঞ্চ, আমি ত বলি, অন্যায় অনুরোধ যে দিক থেকেই আসুক, তাকে অগ্রাহ্য করাই যথার্থ সাহস। এ সাহস তাঁর ছিল ব'লে তাঁকে বরঞ্চ ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।

রে সাহেব সামান্য একটুখানি উত্তেজনার সহিত প্রশ্ন করিলেন, এ অনুরোধ অন্যায়, এ তুমি কি ক'রে বুঝলে আলো ?

আলেখ্য কহিল, তাঁর নিজের গাড়ীতে চড়বার তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নিষেধ করাই অন্যায়।

তাহার পিতা বলিলেন, এটা অত্যন্ত মোটা কথা মা।

কন্যা কহিল, মোটা কথাই বাবা, এবং এই মোটা কথা মেনে চল্‌বার বুদ্ধি এবং সাহসই যেন সংসারে বেশী লোকের থাকে ! সে দিন গাড়ীর এই কাঁচ ভাঙা লইয়া ইন্দুদের বাটীতে যে সকল তীক্ষ্ণ ও কঠিন আলোচনা হইয়াছিল, সে সকল আলেখ্যর মনে ছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি কিছুই অন্যায় করেননি, বরঞ্চ যে সব ভীতু লোক ভয়ে ভয়ে এই সব স্বদেশী গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারাই ঢের বেশী অন্যায় করেছিল বাবা, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বল্‌ছি।

সাহেবের মুখ মলিন হইল। কিন্তু আলেখ্যরও চক্ষের পলকে মনে পড়িল, তাহার পিতা অসুস্থ শরীরেও সে দিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া ডাক্তারখানায় গিয়াছিলেন, এবং ডাক্তারের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তেমনি হাঁটিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন। পাছে তাহার তীক্ষ্ণ মন্তব্য ঘুণাগ্রেও পিতার কার্য্যের সমালোচনার মত শুনাইয়া থাকে, এই লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য দুর্ব্বল-চিত্ত পিতাকে সে ভাল করিয়াই জানিত। দেহের ও মনের কোন দিন কোন তেজ ছিল না বলিয়া তিনি সংসারে সকল সুবিধা পাইয়াও কখনও উন্নতি করিতে পারেন নাই। শত্রু-মিত্র অনেকের কাছে, বিশেষ করিয়া নিজের স্ত্রীর কাছে অনেক দিন অনেক কথাই এই লইয়া তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে, ফলোদয় কিছুই হয় নাই। এমনিভাবেই সারাজীবন কাটিয়াছে,—কিন্তু সেই জীবনের আজ অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া মেয়ের মুখ হইতে সেই সকল পুরানো তিরস্কারের পুনরাবৃত্তি শুনিলে দুঃখের আর বাকি কিছু থাকে না। আলেখ্য তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কিন্তু তাই ব'লে তুমি যেন ভেবো না বাবা, তোমার কোন কাযকে আমি অন্যায় মনে করি।

পিতা একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কোন্ কায মা ? সে দিনকার নিজের কথা তাঁহার মনেও ছিল না।

মেয়ে বাপের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, কোন কাযই নয় বাবা, কোন কাযই নয়। অন্যায় তুমি যে কিছু করতেই পারো না। তবুও তোমাকে যারা সে দিন অসুখ শরীরে ডাক্তারখানায় হেঁটে যেতে আসতে বাধ্য করলে, বল ত বাবা, তারা কতখানি অন্যায় অত্যাচার করেছিল !

সাহেবের ঘটনাটা মনে পড়িল। তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলিলেন, ওঃ, তাই বুঝি তাদের ওপর তোর রাগ আলো ?

এই পিতাটিকে ভুলাইতে আলেখ্যর কষ্ট পাইতে হইত না। সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল, রাগ হয় না বাবা ?

বাবা হাসিয়া বলিলেন, না মা, রাগ হওয়া উচিত নয়। বরঞ্চ সে আমার বেশ ভালই লেগেছিল। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু নেই, সবাই পায়ে হেঁটে চলেছে, পা যে ভগবান্ দিয়েছেন, তার ব্যবহারে যে লজ্জা নেই, এ কথা সে দিন যেমন অনুভব করেছিলাম মা, এমন আর কোন দিন নয়। বহুকাল এ কথা আমার মনে থাক্‌বে আলো।

ইহা যে কোন যুক্তি নয়, আলেখ্য তাহা মনে মনে বুঝিল, তথাপি এই লইয়া আর নূতন তর্কের সৃষ্টি করিল না। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিতেই কহিল, চল না বাবা, আজ আমাদের টুর্ণামেণ্ট দেখ্‌তে যাবে ? ইন্দুর মা যে কত খুসী হবেন, তা' আর বল্‌তে পারি নে।

পিতাকে কোনকালেই সহজে বাটীর বাহির করা যাইত না, বিশেষ করিয়া তাহার মায়ের মৃত্যুর পর। ঘর এবং এই ঢাকা বারান্দাটি ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে সমস্ত পৃথিবীতে পরিণত হইতেছিল। [illegible]

আসিতেছিল, কিন্তু কোথাও বাহির হইবার প্রস্তাবেই তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত। মেয়ের কথায় ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, এখন? এই অসময়ে?

মেয়ে হাসিয়া বলিল, এই ত বেড়াতে যাবার সময় বাবা।

কিন্তু আমার যে বিস্তর চিঠি লেখবার রয়েছে আলো? তুমি বরঞ্চ একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরো, যেন অধিক রাত না হয়, আমি ততক্ষণ হাতের কাযগুলো সেরে ফেলি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন।

এই মেয়েটির ক্ষুদ্র জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানে দেওয়া প্রয়োজন। আলেখ্য নামটি মা রাখিয়াছিলেন বোধ করি নূতনত্বের প্রলোভনে। হয় ত, এমন অভিসন্ধিও তাঁহার মনে গোপনে ছিল, হিন্দুদের কোন দেব-দেবীর সহিতই না ইহার লেশমাত্র সাদৃশ্য কেহ খুঁজিয়া পায়; কিন্তু, পিতা প্রথম হইতেই নামটা পছন্দ করেন নাই, সহজে উচ্চারণ করিতেও একটু বাধিত, তাই মেয়েকে তিনি ছোট করিয়া আলো বলিয়াই ডাকিতেন। এই সোজা নামটাই তাহার ক্রমশঃ চারিদিকে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দুদের সহিত তাহার পরিচয় ছেলেবেলার। ইন্দুর মা ও তাহার মা স্কুলে একত্রে পড়িয়াছিলেন, কিছুকাল এক বোর্ডিঙে বাস করিয়াছিলেন, এবং আমরণ অতিশয় বন্ধু ছিলেন। ইন্দুর দাদা কমলকিরণ যখন বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যায়, তখন এই সর্ত্তই হইয়াছিল যে,সে পাশ করিয়া ফিরিলে তাহারই হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। বছর-খানেক হইল কমলকিরণ পাশ করিয়া কে, কে, ঘোষ হইয়া দেশে ফিরিয়াছে, তাহার পিতা-মাতা মৃত পত্নীর প্রতিশ্রুতিও বারকয়েক রে সাহেবের গোচর করিয়াছেন, কিন্তু এমনি দুর্ব্বল-চিত্ত তিনি যে, হাঁ কিংবা না কোনটাই অদ্যাবধি মনস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইন্দুদের বাটীতে টুর্ণামেণ্ট দেখিবার নিমন্ত্রণমাত্রই কেন যে তিনি অমন করিয়া আপনাকে খবরের কাগজের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া ফলিলেন, ইহার যথার্থ হেতু মেয়ে যাহাই বুঝুক, ইন্দুর মা শুনিলে তাহার অন্য প্রকার অর্থ করিতেন। তথাপি আলেখ্যকে বধূ করিবার চেষ্টা হইতে তিনি এখনও বিরত হন নাই। তাহার মত মেয়ে রূপে, গুণে দুর্লভ নয়, তিনি জানিতেন, কিন্তু, রোগগ্রস্ত পিতার মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তি তাহার হস্তগত হইবে, তাহা যে সত্যই দুর্লভ, ইহাও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অন্যপক্ষে পাত্র হিসাবে কমল-কিরণ অবহেলার সামগ্রী নহে। সে শিক্ষিত, রূপবান্, পিতার জুনিয়রি করিতেছে,—ভবিষ্যৎ তাহার উজ্জ্বল। মা কথা দিয়াছিলেন, আলেখ্য তাহা জানিত। ইন্দু ও তাহার জননী যখন-তখন তাহা শুনাইতেও ত্রুটি করিতেন না। সকলেই প্রায় এক প্রকার নিশ্চিত ছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি বৃদ্ধের মনস্থির করিতে বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু স্থির যখন এক দিন করিতেই হইবে, তখন এ দিকে আর নড়-চড় হইবে না। প্রমাণস্বরূপে তিনি আলেখ্যর সুমুখেই তাঁহার স্বামীকে বলিতেন, সন্দেহ করবার আমি ত কোন কারণ দেখি নে। অমত থাক্‌লে মিষ্টার রে কখনও আলোকে এমন একলা আমাদের বাড়ীতে পাঠাতেন না। মনে মনে তিনি খুব জানেন, তাঁর মেয়ে আপনার বাড়ীতে আপনার লোকজনের কাছেই যাচ্ছে। কি বল মা আলো? কমল উপস্থিত থাকিলে মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিত। পুরুষরা না থাকিলে সে সহজেই সায় দিয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিত, বাবা ত সত্যিই জানেন আপনি আমার মায়ের মত।

এই একটা বছর এম্‌নি ভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল।

টেনিস টুর্ণামেণ্টের অদ্যকার পালা সমাপ্ত হইলে ইন্দুদের বাটীতেই চা ও সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সে সকল শেষ হইতে সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু সে দিকে আলেখ্যর আজ খেয়ালই ছিল না। সে ভাল খেলিত, কানপুর হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হারিয়া গিয়াছিলেন, সেই জয়ের আনন্দে মন তাহার আজ অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তথাপি, ইন্দুর গান শেষ না হইতেই তাহাকে ঘড়ির দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে উঠিয়া পড়িতে হইল এবং সঙ্গিহীন পিতার কথা স্মরণ করিয়া বিদায় গ্রহণের প্রচলিত আচরণটুকু পরিহার করিয়াই তাহাকে দ্রুত-পদে নীচে নামিয়া আসিতে হইল। মোটর তাহার প্রস্তুত ছিল, শোফার দ্বার খুলিয়া দিতেই গাড়ীতে উঠিয়া পরিশ্রান্ত দেহলতা সে এলাইয়া দিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার নহে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, অদূরে একটা বিলাতি-লতার কুঞ্জ হইতে এক প্রকার উগ্র গন্ধে নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু যৌবনের উষ্ণ রক্ত তখনও খরবেগে শিরার মধ্যে বহিতেছে,—এমন না বলিয়া চুপি-চুপি আসাটা ভাল হইল কি না, সে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ঠিক কানের কাছে শুনিল, হঠাৎ পালিয়ে এলে যে আলো?

আলেখ্য চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, এঁরা কিছু বল্‌ছেন বুঝি?

কমল হাসিয়া কহিল, না। তার কারণ আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌তেই পারেননি। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। জ্যোৎস্নার আলোকে আলেখ্যর মুখের চেহারা দেখা গেল না। সে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, আপনি ত জানেন, বাবা একলা আছেন। একটু রাত হলেই তিনি বড় ব্যস্ত হ'ন।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানি, এবং সেই জন্যে রাত করা তোমার উচিতই নয়।

শোফার গাড়ীকে প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া বসিতেই কমল চুপি-চুপি বলিল, হুকুম দাও ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আলেখ্য মনে-মনে লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু না বলিতেও পারিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ফির্‌বেন কি ক'রে?

কমল কহিল, চমৎকার রাত, দিব্যি বেড়াতে বেড়াতে ফিরে আস্‌বো। তখন পর্য্যন্ত হয় ত এঁরা কেউ টেরও পাবেন না। এই বলিয়া সে নিজেই দরজা খুলিয়া আলেখ্যর পাশে আসিয়া উপবেশন করিল।

বেশী দূর নয়, মিনিট পাঁচ ছয় মাত্র। অতি প্রয়োজনীয় কথার জন্য ইহাই পর্য্যাপ্ত। কিন্তু কোন কথাই হইল না, পাশাপাশি উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া। গাড়ী রে সাহেবের ফটকে আসিয়া প্রবেশ করিল। আলেখ্যর অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল, মোটরের শব্দে বাবা নিশ্চয়ই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, কিন্তু উপরের বারান্দা শূন্য, কোথাও কেহ নাই। দু'জনে অবতরণ করিলে, শোফার গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল, কমল মৃদুকণ্ঠে বিদায় লইয়া ফিরিল, হলে ঢুকিয়া আলেখ্য বেহারাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল, সাহেব কোথায়?

সে সেলাম করিয়া জানাইল, তিনি উপরে ঘরেই আছেন।

আলেখ্য দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাহার পিতার ঘরে ঢুকিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আলমারি খোলা, ঘরময় জিনিষপত্র ছড়ানো, সাহেব নিজে আর একটা বেহারাকে দিয়া বড় বড় দুটা তোরঙ্গ ভর্ত্তি করিতেছেন।

এ কি বাবা, কোথাও যাবে না কি?

সাহেব চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, দেখ্ দিকি সব কাণ্ড! তখনি বলেছি, গান্ধী সর্ব্বনাশ করবে! এই সব স্বদেশী গুণ্ডারা দেশটাকে লণ্ডভণ্ড ক'রে তবে ছাড়্‌বে, এ যে আমি সুরুতেই দেখ্‌তে পেয়েছি! এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা চিঠি লইয়া মেয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, এদের সবাইকে ধ'রে জেলে না পাঠালে যে সমস্ত দেশ অরাজক হ'তে বাধ্য!

মাত্র ঘণ্টা তিন চার পূর্ব্বেই যে তিনি প্রায় উল্টা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া কোন লাভ নাই। আলেখ্য নিঃশব্দে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া আলোর সম্মুখে গিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। চিঠি তাঁহার ম্যানেজারের। তিনি দুঃখ করিয়া, বরঞ্চ কতকটা ক্রোধের সহিতই জানাইতেছেন যে, জমীদারীর অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকখানা পত্রে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিয়াও প্রতিবিধানের কোন আদেশ পান নাই। অপিচ, প্রকারান্তরে তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াই হইয়াছে। দুর্ব্বৃত্তরা ক্রমশঃ এরূপ স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে,তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে। এমন কি, তিনি লোকজন লইয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অমরপুরের হাটে বিলাতি বস্ত্র বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাতে জমীদারী আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় হইয়াই তিনি সকল ঘটনা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর করায় ইহাদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী প্রজারা ধর্ম্মঘট করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে। এমন কি, লুঠপাটের ভয়ও দেখাইতেছে। সরকারী খাজনা জমা দিবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু তহবিলে কিছুমাত্র টাকা মজুদ নাই। ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। জনরব এইরূপ যে, মালিক নিজে না আসিলে কোন উপায় হইবে না।

চিঠি পড়িয়া আলেখ্যর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বাবা, তুমি নিজে যাচ্ছো?

বাবা বলিলেন, নিজে না গেলে কি হয় মা? যাবো আর আসবো।—একটা দিনে সমস্ত শায়েস্তা হয়ে যাবে। ঘোষ সাহেবকে ব'লে যাবো, তিনি দুবেলা এসে দেখবেন, তোমার কোন কষ্ট হবে না।

মেয়ে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, ম্যানেজার বাবু তোমাকে বার বার সতর্ক করেছেন, তবু তুমি কিছুই করোনি বাবা?

সাহেব সতেজে বলিলেন, করেছি বই কি, নিশ্চয় করেছি। বোধ হয়, চিঠির জবাবও দিয়েছি।

মেয়ে ক্ষণকাল বাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ হয় দাওনি বাবা, তুমি ভুলে গেছ।

সাহেবের গলার সুর সহসা নীচের পর্দ্দায় নামিয়া আসিল, কহিলেন, ভুলে যাবো কেন? এই যে সে দিন নিজের হাতে লিখে দিলাম, লোকরা বিলিতি কাপড় যদি পরতে না চায় ত হাটে এনে কায নেই। তাতে লোকসান ছাড়া ত লাভ নেই কারও—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই আলেখ্য ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, এ চিঠি আবার তুমি কাকে লিখলে বাবা? কই, ম্যানেজার বাবুর পত্রে ত এর কোন কথা নেই?

সাহেব চিন্তিতমুখে বলিলেন, ঐ যে সব কারা কলকাতা থেকে এসে গ্রামে গ্রামে নাইট ইস্কুল খুলেছে। চাষা-ভূষোদের সব মত জেনে আমার হুকুম চেয়েছিল,—তা' বেশ ত, তারা যা ইচ্ছে পড়ুক না, আমার কি? আমার খাজনা পেলেই হ'ল।

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে আমাদের গ্রামেও নাইট ইস্কুল খোলা হয়েছে?

বাবা সগর্ব্বে বলিলেন, নিশ্চয় হয়েছে! নিশ্চয় হয়েছে! আমিই ত ব'লে দিলাম, মন্দিরের নাটবাঙলাটা প'ড়ে আছে, ইচ্ছে হয়, তাতেই করুক। সামান্য একটু তেলের খরচা বই ত না!

মেয়ে কহিল, তেলের খরচও বোধ হয় কাছারি থেকেই দেওয়া হচ্ছে?

বাবা বলিলেন, হুকুম ত দিয়েছি, এখন না যদি করে, দূর থেকে আর কত দেখি বল্?

মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বাবা, তুমি ও-ঘরে গিয়ে বসগে,আমি নিজে সব গুছিয়ে নিচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

পিতা সবিস্ময়ে কহিলেন, তুমি যাবে?

আলেখ্য বলিল, হাঁ বাবা, আমার বোধ হয়, আমি না গেলে চল্‌বে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লুকোচুরী

অন্তর বাহিরে
ব্যাপ্ত চরাচর
তোমারী মধুর ছবি।
তবু পাইনাক কাছে
হৃদয়ের মাঝে
মেঘে ঢাকা যেন রবি,
ধরি ধরি করি
যাও তুমি সরি
হাসিয়া মধুর হাসি।

চকিতে বিজলী
হৃদয় উজলি
আবার আঁধারে ভাসি।
অন্ধ বাসনায়
জড়াইতে চায়
জড়ের জড়ত্ব মাঝে।
কখন স্বরূপ
কখন অরূপ
কখন মধুর সাজে।

শ্রীস্নেহলীলা চৌধুরী।

সাম্রাজ্যবৈঠকে

মন্ত্রি-সম্মিলন

সংপ্রতি বিলাতে সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মন্ত্রিবর্গ সম্মিলিত হইয়া সাম্রাজ্যের সমস্যাসমূহ সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাউনিং ষ্ট্রীটের মন্ত্রণা-কক্ষে মন্ত্রিবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মিঃ এস্‌, এম্‌ ক্রস্‌, নিউজিলাণ্ড হইতে মিঃ ডব্‌লু-এফ্‌ ম্যাসে, অলষ্টার হইতে সার জেম্‌স্‌ ক্রেস্‌, কানাডা হইতে সার লোমার গুইন্‌ ও মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে জেনারল স্মাটস্‌, নিউফাউণ্ড-লাণ্ড হইতে মিঃ ডবলু আর ওয়ারেন্‌ এবং ভারতবর্ষ হইতে সার তেজবাহাদুর সপরু এই পরামর্শ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কানাডার সার লোমার গুইন্‌।

মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র য়ুরোপে যে অভাব, অশান্তি ও নানাবিধ বিপদের মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতে সমগ্র বৃটিশজাতিরও পরিত্রাণ নাই, তাই সমস্যা সমাধানের জন্য এই সাম্রাজ্যবৈঠকের ব্যবস্থা। সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্য হইতে মনীষী, চিন্তাশীল মন্ত্রিবর্গ সমবেত হওয়ায় তাঁহাদের সুখ, সুবিধার জন্য পর্য্যাপ্ত আয়োজনও করা হইয়াছিল। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য মন্ত্রিবর্গের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

ভারতবর্ষের সার তেজবাহাদুর সপরু।
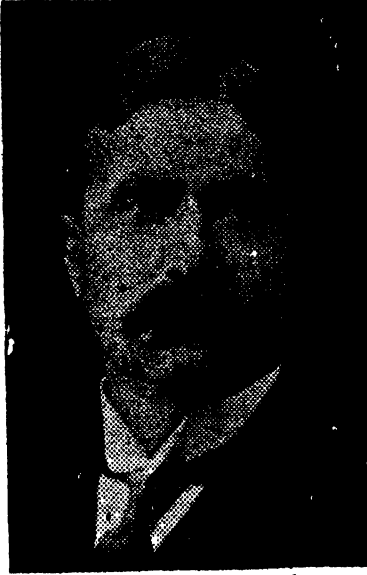
লর্ড উইলিয়ম পীল।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মিঃ ডবলু আর ওয়ারেন্‌।

এই বৈঠকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি সার তেজ বাহাদুর সপরু উপনিবেশে ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক সমিতি নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ২ বৎসর পূর্ব্বে এই বৈঠকেই এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে, ভারতবাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তুল্যাধিকার পাইতে পারে। সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এবারও দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারল স্মাটস সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে

নিউজিলাণ্ডের মিঃ ডবল্যু, এফ, ম্যাসে।

কানাডার মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিং।

অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, সাম্রাজ্যের একাংশের প্রজা হইলেই যে সর্ব্বত্র প্রজার সহিত তুল্যাধিকার লাভ করা যায়, ইহা সঙ্গত নহে। কেনিয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার যে ব্যবস্থা করিয়া শ্বেতাঙ্গদিগের আবদার রক্ষা করিয়াছেন,তাহাতে অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে। তাহারা তাহাতেই বুঝিতে পারিয়াছে, বৃটিশ সরকার শ্বেতাঙ্গের প্রাধান্যরক্ষার চেষ্টায় সম্মতি দিবেন। নহিলে ভারতবর্ষের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকা যেরূপ নগণ্য, তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কখনই ভারতবাসীকে সে দেশে অপমান করিতে সাহস করিতে পারিত না।

ভারত সরকার ভারতবাসীর পক্ষে অপমানজনক মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন এবং সেই সরকারেরই প্রতিনিধি হইয়া যাইয়া সার তেজ বাহাদুর বৈঠকে জেনারল স্মাটসের মুখে উদ্ধত কথা শুনিয়া আসিয়াছেন।

আরও বিস্ময়ের বিষয়, আলোয়ারের মহারাজা প্রথমে ভারতবাসীকে তুল্যাধিকার প্রদানের স্বপক্ষে বক্তৃতা করিয়াও শেষে বলিয়াছেন, জেনারল স্মাটস ভারতবর্ষের বন্ধু! বন্ধুই বটে! ইংরাজীতে একটা কথা আছে—আমার বন্ধুদের হাত হইতে আমাকে রক্ষা কর। ভারতবাসীও জেনারল স্মাটসের মত বন্ধুর সম্বন্ধে সেই কথাই বলিতেছে। আর আলোয়ারের মহারাজ?—বঙ্কিমচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন—রাজা হইলে তাহাকে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকাও অল্পদিন পূর্ব্বে ইংরাজের অধীন হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের শ্বেতাঙ্গরা স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিয়াছে এবং সেইজন্যই আজ তাহারা তাহাদের দেশে ভারতবাসীর প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিতেছে। আর বৃটিশ সরকার বলিতেছেন, তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ইহাতেও কি ভারতবাসী বুঝিতে পারিবেন না, স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না করিলে এ অবস্থার প্রতীকার হইতে পারে না? সে পক্ষে ভারতবাসীর চেষ্টার উপর তাহাদের জাতীয় সম্মান নির্ভর করিবে।
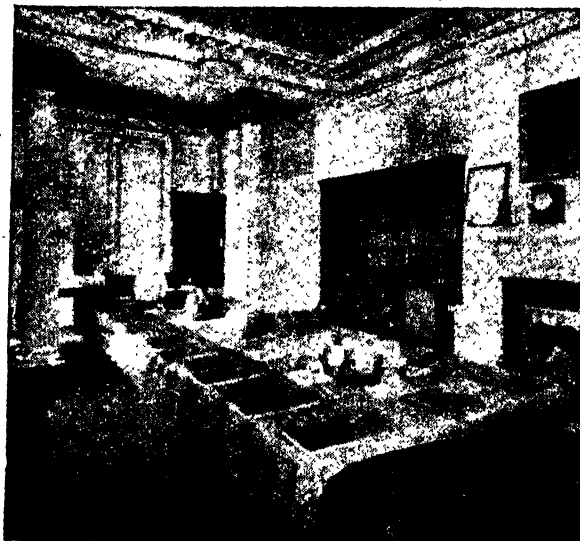
লঘুভার করাত

লঘুভার করাতের সাহায্যে কাঠুরিয়া মোটা গুঁড়ি চিরিতেছে।

সংপ্রতি এক প্রকার করাত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে এক ব্যক্তি যে কোন মোটা কাঠ সহজে চিরিয়া ফেলিতে পারে। করাতটির ওজন ৬ পাউণ্ড বা প্রায় ৩ সের মাত্র। শিল্পী এই করাত এমনভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, দাঁড়াইয়া যে কোনও অবস্থায় কার্য্য করিতে পারে। দাঁড়াইয়া কায করিলে শরীর বিশেষ ক্লান্ত হয় না। করাতটিকে সকল প্রকারে ঘুরাইয়া বসাইতে পারা যায়।

জুতাপায়ে শিশু ;—পাঁচপুরুষে জুতার বর্ত্তমান অবস্থা।

কায শেষ হইলে উহা মুড়িয়া অনায়াসে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া চলে। এই অভিনব করাত এ দেশে আমদানী করিলে কাঠের মিস্ত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে।

পাঁচপুরুষে জুতা

১৭৭০ খৃষ্টাব্দে স্কটলাণ্ড হইতে কোন শিশুর জন্য এক জোড়া জুতা ক্রীত হইয়াছিল। সেই জুতা এখনও বিদ্যমান। জুতার তলদেশের চামড়া অত্যন্ত পুরু। জুতা জোড়া আধুনিক যুগের হিসাবে দেখিতে সুদৃশ্য নহে; কিন্তু পাঁচপুরুষ ব্যবহারের পরও এখনও উহা বেশ মজবুত আছে। যে বংশের শিশুর জন্য প্রথম উহা কেনা হইয়াছিল, এইরূপে পাঁচপুরুষ কাটিয়াছে। এখনও দীর্ঘকাল উহা ব্যবহার করা চলিবে।

পিস্তলে শুক্তি

আমেরিকার কোনও যাদুঘরে সংপ্রতি শুক্তিযুক্ত একটি রিভলভার আসিয়াছে। সমুদ্রসৈকতে এক ব্যক্তি ঐ শুক্তিযুক্ত পিস্তলটি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সম্ভবতঃ বহুবৎসর পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি জাহাজ হইতে ঐ পিস্তলটি সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া শুক্তিটি পিস্তলে আপন দেহ আবদ্ধ করিয়া থাকিবে। পিস্তলের মধ্যে গুলী ছিল, কিন্তু দীর্ঘকালের অব্যবহারে নলের মধ্যে এমন মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল যে, গুলী বাহির করিতে পারা যায় নাই। এই শুক্তিযুক্ত পিস্তলটি দর্শকের কৌতুহলনিবৃত্তির জন্য যাদুঘরে প্রদর্শিত হইতেছে।

বিচিত্র তারহীন শব্দবহ যন্ত্র

তারহীন শব্দবহ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভে অথবা প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত স্থান হইতে কথা বলিবার উপায় সংপ্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খনির মধ্যে কায করিবার সময়, যদি খনি হইতে

তারহীন শব্দবহ যন্ত্র—বিনা বাতাসের সাহায্যে সমুদ্রগর্ভ হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী অথবা নির্দোষ, যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে।

নির্গমনের পথ অকস্মাৎ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং যদি এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র সঙ্গে থাকে, তাহা হইলে ইহার সাহায্যে অনায়াসে কথা বলিতে পারা যাইবে। সমুদ্রগর্ভ হইতেও এই শব্দবহ যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে কথা বলা সম্ভব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, বহু দুর্ঘটনা হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধার করিবার অনেক সুবিধা হইয়াছে। যন্ত্রটি লঘুভার এবং ইহার পরিচালনপ্রণালীও জটিল নহে। ক্ষুদ্র ব্যাটারী হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি নির্গত হইয়া উচ্চারিত শব্দকে ২ শত ফুট নিরস্থান হইতে প্রেরণ করিতে পারে। ইহার শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে।

অপরাধ-নির্ণায়ক যন্ত্র

কোনও বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সংপ্রতি এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তি প্রকৃতই দোষী, অথবা নিরপরাধ, ইহা সহজে নির্ণয় করা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা মানুষের শরীরের রক্তের চাপ (blood pressure) কখন্ কিরূপ থাকে, তাহা নির্ণীত হয়। কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথম প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে তাহার রক্তের গতিবেগ গৃহীত হয়। প্রশ্ন করা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথমেই যে কথা বলে, সে সময়ে তাহার রক্তের গতিবেগ কিরূপ, তাহা এই যন্ত্রে নির্ণীত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী হইলে রক্তের চাপ খুব বেশী হইয়া থাকে। আসামীর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এই যন্ত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

ঘাসের বৃষ্টিনিবারক অঙ্গাবরণ

মেক্সিকো অঞ্চলের দেশীয় কৃষকগণ দীর্ঘ তৃণনির্ম্মিত এক প্রকার অঙ্গাবরণ ব্যবহার

ধারণ করিলে বৃষ্টির জল ও সূর্য্যের উত্তাপে কোন কষ্ট হয় না। বৃষ্টির জল তৎক্ষণাৎ ঝরিয়া যায়, বাতাসও সহজে দেহে সঞ্চালিত হয়। মেক্সিকোর দেশীয়গণ এই অঙ্গাবরণের বিশেষ পক্ষপাতী। সে অঞ্চলে এক প্রকার মক্ষিকার উৎপাত আছে। এই অঙ্গাবরণের সাহায্যে কৃষকগণ তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে।

আল্‌পিন-নির্ম্মিত ক্রুশ

এক জন ৯২ বৎসরের বৃদ্ধ আল্‌পিনের সাহায্যে একটি রত্নখচিত প্রসিদ্ধ ক্রুশের অনুকরণে একটি ক্রুশ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আসল রত্নখচিত ক্রুশের যেস্থানে যে রত্ন আছে, নির্ম্মাতা সেই স্থানে চিত্রিত আল্‌পিনের শীর্ষগুলি স্থাপন করিয়াছেন। ১৫ হাজারের অধিক আল্‌পিন এই ক্রুশে ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েক সপ্তাহ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বর্ষীয়ান্ শিল্পী এই নকল ক্রুশটিকে আসলের মত করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হীরা, চুণি ও পান্না

প্রসিদ্ধ রত্নখচিত ক্রুশের অনুকরণে শিল্পের ক্রুশ।

প্রভৃতি মূল্যবান্ রত্নের পরিবর্ত্তে শিল্পী রঙীন কাচখণ্ডসমূহ উহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সহসা দেখিলে আসল ও নকলে পার্থক্য অনুভূত হয় না।

প্রাচীন যুগে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ

বর্ত্তমান সভ্যতালোকদীপ্ত যুগে, বিনা তারে সংবাদপ্রেরণ-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণ আমেরিকার অসভ্য

দক্ষিণ আমেরিকার বর্ব্বরদিগের বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ ব্যবস্থা।

অধিবাসীরা বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় আবিষ্কার করিয়াছিল। গভীর অরণ্যে, কান্তারে বাস করিলেও সেই অসভ্যদিগের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর ছিল না। ফাঁপা গাছের গুঁড়ির সাহায্যে তাহারা বহু দূরে সংবাদ পাঠাইতে পারিত। সাঙ্কেতিক শব্দও তাহারা ব্যবহার করিত। ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে তাহারা যখন যে প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিত, তাহা বহু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত। সেই শব্দানুসারে দলের বন্ধুগণ কায করিত। শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সাঙ্কেতিক শব্দ অমনই কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিল, তাহারাও অনুরূপ শব্দসাহায্যে উত্তর প্রদান করিয়া সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইল। কোন বিদেশী তাহাদের রাজ্যে উপস্থিত হইবামাত্র, দূরস্থ অধিবাসীদিগকে সে সংবাদ তাহারা অনায়াসে প্রদান করিতে পারিত। এই ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা বিনা

জানা গিয়াছে, এই যন্ত্র হইতে উত্থিত শব্দ কামানের ধ্বনির ন্যায় বহু মাইল দূরে শ্রুতিগোচর হয়।"

খাম জুড়িবার জলভরা নল

খাম জুড়িবার জন্য এক প্রকার নল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ফাঁপা নলের মধ্যে যে জল থাকে, তাহাতে ১ হাজার খাম জোড়া যায়। প্রতি মিনিটে ৬০ খানা খামের আঠা এই নলের জলে ভিজাইয়া জোড়া গিয়া থাকে। খামের পাতায় যে আঠা শুকাইয়া থাকে, তাহাকে সরস করিয়া তখনই খাম আঁটিয়া দিবার ব্যবস্থা এই নলে আছে। এই যন্ত্র পিত্তল-নির্ম্মিত এবং কোনও দিক দিয়া জল চুঁয়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনামাত্র নাই।
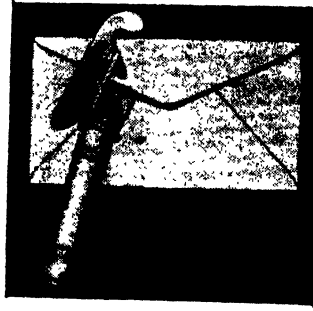
খাম জুড়িবার নল।

বিলাসে প্রাণিহত্যা

আমেরিকায় সংপ্রতি একটি নূতন হোটেল বা পান্থনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। এই হোটেলের ঘরগুলি কার্পেট মুড়িতে কত কার্পেট লাগিয়াছে, শুনিলে বিস্মিত হইতে হইবে। ৩৭ মাইলব্যাপী কার্পেট হোটেলঘরে লাগিয়াছে। শয়নগৃহে— খাটের গদিগুলি নির্ম্মাণ করিতে ২৫ হাজার পাউণ্ড বা প্রায় ৩ শত ৫ মণ ওজনের ঘোড়ার কেশর লাগিয়াছে। বালিসগুলি পাখীর পালকে পূর্ণ, এ জন্য ৯০ হাজার হংসীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। হোটেলটি কত বড়, তাহা ইহা হইতেই স্বল্পায়াসে অনুমান করা যাইতে পারে।

বৈদ্যুতিক কম্পনে হৃদ্‌যন্ত্র

চিকিৎসাসংক্রান্ত ব্যাপারে একটা চমৎকার আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। বৈদ্যুতিক কম্পনের প্রভাবে দুর্ব্বল হৃদ্‌যন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করা যায়। কাহারও কাহারও হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া অতিশিথিল, কাহারও বা দ্রুতগতিবিশিষ্ট। এই নূতন আবিষ্ক্রিয়ার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। রোগীকে একটি আসনে উপবিষ্ট করান হয়। এই আসনটি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, ভূমিতে তড়িতের প্রবাহ সংক্রমিত হইতে পারে না (insulated)। উল্লিখিত আসনের সহিত একটি যন্ত্র যুক্ত থাকে। ঐ যন্ত্র হইতে রোগীর দেহে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত করা হয়। যন্ত্রের সীমার বাহিরে একটি গোলক ঘুরিতে থাকে। সেই গোলকটি একটি ধাতব দণ্ডের প্রান্তে সন্নিবিষ্ট। এই গোলকটি আর একটি স্থিতিশীল গোলকের পার্শ্ব দিয়া আবর্ত্তিত হয়। আবর্ত্তিত গোলকটি স্থিতিশীল গোলকের কাছে আসিবামাত্র দেহ হইতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ফলে পেশীসমূহ শিথিল হইয়া পড়ে। কোনও রোগীর বক্ষের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ৭৪ হইলে (তাহার পক্ষে ৬৮ বার স্পন্দনই স্বাভাবিক; কিন্তু প্রতি মিনিটে ৬ বার অধিক স্পন্দন হয়) আবর্ত্তিত গোলকটি প্রতি মিনিটে ৭৪ বার ঘুরিবে। তাহার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন কমিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই উপায়ে স্পন্দনের মাত্রা বাড়ানও গিয়া থাকে। সংপ্রতি লণ্ডনের চিকিৎসাপ্রদর্শনী-ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত যন্ত্রটি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বধিরতায় তারহীন তাড়িত যন্ত্র

অধুনা তারহীন তাড়িত যন্ত্রের সাহায্যে বধিরতা রোগ দূরীভূত করা সম্ভবপর হইয়াছে। যাহারা কানে একটু কম শুনে, সাধারণতঃ তাহাদের একটা কান অপরটির অপেক্ষা দুর্ব্বল। কাযেই চেষ্টা করিয়া একই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাহাদিগকে শুনিতে হয়। ইহাতে স্নায়বিক স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া থাকে। কিছুকাল ধরিয়া বিশেষজ্ঞগণ দুর্ব্বল কর্ণের শক্তি বাড়াইয়া বধিরতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এজন্য তাঁহারা দুর্ব্বল কর্ণে একটা যন্ত্র সংশ্লিষ্ট করিয়া সাধারণভাবে শব্দ উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সেই শব্দ পুনঃ পুনঃ কর্ণপটহে আঘাত করিতে থাকিলে ক্রমে শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু সে প্রক্রিয়ার পরিবর্ত্তে ইদানীং তারহীন টেলিফোন যন্ত্রের সাহায্যে বধিরতা দূর করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নির্ব্বাসন

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দেশের তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া এ দেশে ইংরাজ যে বিধি বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাহার ব্যবহারে অনুমতি দিবার সময়ও ভারত-সচিব লর্ড মর্লি তাহাকে "মরিচাধরা তরবারি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, শত বৎসরেরও অধিককাল পরে—ভারতে দায়িত্বশালী স্বায়ত্ত-শাসনই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য এই ঘোষণার পর—বঙ্গদেশে আবার সেই আইনের বলে কয়জন যুবককে আদালতের বিচারে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে!

প্রকাশ্য বিচার ব্যতীত লোককে নির্ব্বাসিত করিবার সম্বন্ধে ৩টি বিধি আছে—বাঙ্গালার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন, মাদ্রাজের ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২নং রেগুলেশন ও বোম্বাইয়ের ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৫নং রেগুলেশন। এই কয়টি রেগুলেশনের বলে সরকার যে কোন লোককে নিম্নলিখিত অজুহতে আটক করিয়া রাখিতে পারেন—

(১) বিদেশী সরকারের সহিত বৃটিশ সরকারের সন্ধি-সর্ত্ত সংরক্ষণ;

(২) ইংরাজের সাহায্য পাইতে পারেন, এমন দেশীয় রাজাদের রাজ্যমধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষণ;

(৩) বিদেশীর আক্রমণ ও দেশমধ্যস্থ বিশৃঙ্খলা হইতে বৃটিশরাজ্য নিরাপদ করণ।

সার হেনরী কটন।

করিবার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব বা যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ আদালতে প্রকাশ করা সঙ্গত নহে, তাঁহাদিগকে এই ত্রিবিধ অজুহতে আটক রাখিবার অধিকার—এই সব রেগুলেশনে সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ওহাবী নেতাদিগের বিরুদ্ধে সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহাতে এই ৩নং রেগুলেশন ব্যবহৃত হইয়াছিল।

তাহার বহুদিন পরে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে সর্দ্দার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র প্রযুক্ত হওয়ায় দেশে আতঙ্ক-সঞ্চার হয় এবং কংগ্রেস তাহার প্রতিবাদে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু পরলোকগত সার হেনরী কটনের স্মৃতিকথা পাঠ করিলে জানা যায়, মধ্যে মধ্যে এই আইন ব্যবহৃত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্র-সচিবের পরওয়ানার বলে তিনি কলিকাতা হইতে এক জন শিখকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। শিখ ভদ্রলোকটি বহু দিন ইংলণ্ডে বাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এক জন ডিটেক্টিভ ইনস্পেক্টার তাঁহার সহিত কপট বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহাকে লালবাজার পুলিস আফিসে লইয়া যায় এবং তথা হইতে তাঁহাকে চুনার দুর্গে চালান করা হয়।

ইহার পর নাটু ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুটোৎসবের পর ৬০

উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়া মিষ্টার র‍্যাণ্ড ও লেফটেনাণ্ট আয়ার্ষ্ট যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন চাপেকাররা তাঁহাদিগকে হত্যা করে। সেই ব্যাপারের সম্পর্কে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে নির্ব্বাসিত করা হয়।

তাহার পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে পঞ্জাবে লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিৎসিংহকে ৩নং রেগুলেশনের বলে নির্ব্বাসিত করা হয়। তখন সার ডেনজিল ইবেটশন পঞ্জাবের ছোট লাট, লর্ড মিণ্টো ভারতের বড় লাট এবং লর্ড মর্লি ভারত-সচিব। এই পুরাতন বিধির ব্যবহার করা লর্ড মর্লির অনভিপ্রেত হইলেও তিনি শেষে ভারত সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিলেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মর্লির স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয়। নির্ব্বাসন সম্বন্ধে তিনি লর্ড মিণ্টোকে যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকল এই পুস্তকে প্রকাশিত হয়। আমরা তাহা হইতে কয়টি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

(১) উদারনীতিকদিগের কাছে নির্ব্বাসন বড়ই অপ্রীতিকর। কেবল আয়ার্লণ্ডে চণ্ডনীতির বিরোধী বলিয়া আমার খ্যাতি ছিল বলিয়াই আজ আমার এ কাযে আমার সহকর্ম্মীরা ততটা উগ্র হইয়া উঠেন নাই। (২য় খণ্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

(২) নির্ব্বাসনবিধি সেকালের মরিচাধরা তরবার (২য় খণ্ড, ২১৯ পৃষ্ঠা)

(৩) যাহাতে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটে কেহ ইচ্ছা করিয়া তেমন কায করিয়াছে, এমন বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে আমি কখনই তাহার নির্ব্বাসনে সম্মতি দিব না। (২য় খণ্ড, ২৩১ পৃষ্ঠা)

(৪) যদি কাহারও বক্তৃতার ফলে দাঙ্গা হয়, তাহাকে দাঙ্গার জন্য কারাবদ্ধ করা হয় না কেন? কেন, ভারতে কি যথেষ্ট পুলিস নাই? (২য় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা)

(৫) সমস্ত কারণ আমাকে জানাইয়া—আমার সম্মতি লইয়া তবে যেন নির্ব্বাসন করা হয়। (২য় খণ্ড, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

(৬) আমার বিশেষ অনুরোধ, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যেন তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা না হয়। (২য় খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা)

কিন্তু যখন ভারত সরকার এই অস্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য জিদ করিলেন, তখন অগত্যা লর্ড মর্লি তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং পার্লামেণ্টে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়া তাহার সমর্থন করিলেন :—

"অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, আদালতে প্রকাশ্য বিচারে আপত্তিজনক রচনা বা বক্তৃতা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়। যাহারা হয় ত তাহা শুনিতেও পাইত না, বিচারের ফলে তাহারাও তাহা জানিতে পারে এবং যে সব অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাদিগকে দেশের ও দেশবাসীর হিতার্থ আত্মোৎসর্গকারী বলিয়া প্রকাশ করে, লোকের দৃষ্টি তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হয়। (আসামীর পক্ষে) ব্যবহারাজীবদিগের বক্তৃতাও আপত্তিজনক রচনার মত অনিষ্টকর। তাহার পর যখন দণ্ডাদেশ প্রচারিত হয়, তখন আদালতে করুণ দুঃখের অভিনয় হয়—কারাগারের পথে লোক কিরূপে দণ্ডিত ব্যক্তির অনুগমন করিয়াছিল, সংবাদপত্রে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয়। কখন কখন নেতারা আসামীদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং কারামুক্ত হইলে তাহাদিগকে রাজপথে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।"

সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে লালা লজপত রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহ মুক্তিলাভ করেন।

তাহার পর আবার দীর্ঘকাল এই বিধি ব্যবহৃত হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে তুমুল আন্দোলন বঙ্গদেশে উৎপত্তি লাভ করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারই প্রবাহ যখন খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইবার ৬ দিন মাত্র পূর্ব্বে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর ও তাহার পরদিন নিম্নলিখিত ৯ জন বাঙ্গালীকে নির্ব্বাসিত করা হয়—

সুবোধচন্দ্র মল্লিক
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী
কৃষ্ণকুমার মিত্র
অশ্বিনীকুমার দত্ত
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পুলিনচন্দ্র দাস
ভূপেনচন্দ্র নাগ
শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

এই সময়েই নূতন আইন হয় যে, কতকগুলি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার জুরী বা এসেসারের সাহায্য ব্যতীত

সুবোধচন্দ্র মল্লিক।

হাইকোর্টের ৩ জন জজ করিতে পারিবেন এবং সরকার কতকগুলি সমিতি বে-আইনী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবেন।

তদবধি এ পর্য্যন্ত আর নির্ব্বাসন বিধির ব্যবহার হয় নাই। তবে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে—জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় ভারত-রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহাতে "বিপজ্জনক" ব্যক্তি-দিগকে বিনা বিচারে

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

আটক রাখিবার অধিকার সরকার লাভ করেন।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ফলে নূতন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী দমনমূলক আইনগুলি পরীক্ষা করিয়া সেগুলি প্রত্যাহার করা—সংস্কৃত করা সম্ভব কি না, তাহা জানাইবার জন্য একটি সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

সেই প্রস্তাবানুসারে যে সমিতি গঠিত হয়, ২রা সেপ্টেম্বর তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সমিতি নিম্নলিখিত কোন কারণে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন ও তদনুরূপ অন্য রেগুলেশন ২টির ব্যবহারের সমর্থন করেন :—

(১) বিদেশী সরকারের সহিত

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।

বৃটিশ সরকারের সন্ধি-সর্ত্ত-সংরক্ষণ;

(২) ইংরাজের সাহায্য পাইতে পারেন, এমন দেশীয় রাজাদের রাজ্যমধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষণ;

(৩) বিদেশীর আক্রমণ হইতে বৃটিশরাজ্য নিরাপদকরণ;

(৪) সীমান্তপ্রদেশ সম্পর্কে দেশ-মধ্যে বিশৃঙ্খলা নিবারণ।

এবার যে সকল বাঙ্গালী যুবককে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে সংগৃহীত প্রমাণ ২ জন জজের কাছে উপস্থাপিত করা হইবে; বোধ হয়, তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবেন, নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন কি না, অথবা তাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত ৪ দফায় অপরাধী কি না।

লর্ড লিটন।

উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছি—যেন অভিযুক্ত ব্যক্তির অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা না হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বাঙ্গালা সরকার সে উপদেশ পালন করিবেন কি?

কলিকাতা শাঁকারীটোলা ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার খুন হইবার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মিষ্টার ষ্টিফেনসন ও লর্ড লিটন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় আবার বিপ্লববাদীরা ষড়যন্ত্র করিতেছে। তৎকালে তাঁহারা সে উক্তির পোষক কোন প্রমাণ উপস্থাপিত না করায় সংবাদপত্রে সে কথা বলা হয় এবং ফলে মিষ্টার ষ্টিফেনসন কয় জন সংবাদপত্রসেবককে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের পক্ষের কথা প্রকাশ করেন। তৎকালে বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের পক্ষ হইতে বলা হয়, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে সরকার যেন প্রকাশ্য আদালতে তাহার বিচার-ব্যবস্থা করেন। তাহা হইলে পদ্ধতি সম্বন্ধে কাহারও বলিবার কিছু থাকিবে না। তাহা না করিয়া সরকার যদি চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন করেন এবং প্রকাশ্য বিচারে বঞ্চিত করিয়া লোককে নির্ব্বাসিত বা আটক করেন, তবে সংবাদপত্রগুলিকে তাহার প্রতিবাদ করিতেই হইবে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা হইতে সুবোধচন্দ্র মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতিকে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন কংগ্রেসে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমরা কি আমাদের ব্যবহারের কৈফিয়ৎ দিতে না পাইয়াই ধৃত, কারাবদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইব?"

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এতদিন পরে আবার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন ব্যবহার করিবার সময় বাঙ্গালার গভর্ণর মন্ত্রীদিগের মতও গ্রহণ করেন নাই। অথচ গত আগষ্ট মাসেও লর্ড লিটন বলিয়াছিলেন, কোন বিষয়ে কোন নীতি অবলম্বন করিবার সময় তিনি মন্ত্রীদিগের সহিতও পরামর্শ করিয়া থাকেন!—

"It has been my practice since I assumed office to treat my Government as a whole. All questions of policy, whichever department may be responcible for them, are discursed at joint meetings."

এই উক্তির সহিত লর্ড লিটনের বর্ত্তমান ব্যবহারের সামঞ্জস্য নাই এবং তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অযথার্থ উক্তি করিয়া থাকেন, তবে তিনি যে নিন্দনীয়, তাহাতেও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি যে এমন ব্যাপারেও মন্ত্রীদিগের মত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই, তাহাতেই
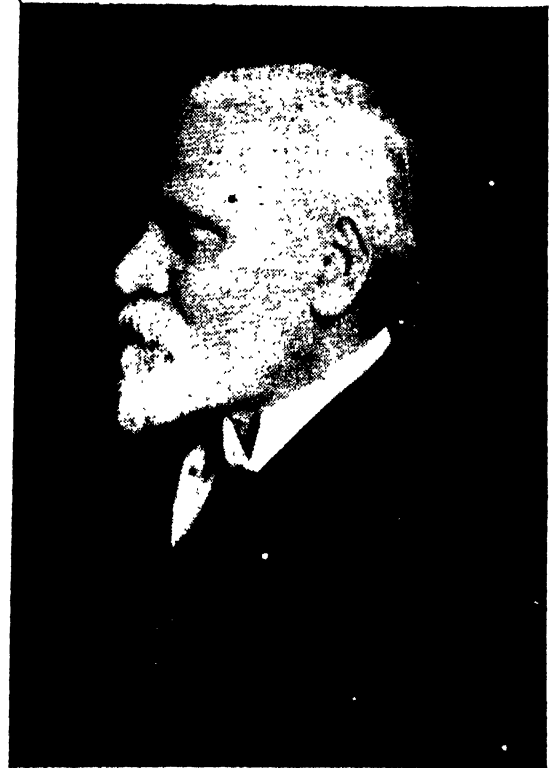
শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু।

প্রতিপন্ন হইতেছে, দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতিতে কোন-রূপেই দেশে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে না'। অবশ্য এরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিতে পারেন—কিন্তু আইনতঃ যে বিষয়ে তাঁহাদের মত গ্রহণ করিতে সপার্ষদ গভর্ণর বাধ্য নহেন, সে বিষয়ে যেমন তাঁহাদের দায়িত্ব নাই, তেমনই তাঁহাদের পক্ষে সরকারকে তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বলা—উপেক্ষিত হইতে পারে। তবে ইহাতে শাসন-সংস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা যে সপ্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যে কয়জন বাঙ্গালী যুবক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভাগ্যে যাহাই থাকুক, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে যে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য সরকারকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের "মরিচাগড়া তরবারি" বাহির করিতে হইয়াছে, ইহা সরকারের পক্ষে গর্ব্বের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

লর্ড মর্লি

পরিণত বয়সে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও রাজনীতিক লর্ড মর্লির মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ব্লাকবার্ণে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সাহিত্যিকরূপে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া সাহিত্যিকদিগের শ্রেষ্ঠ দলভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

লর্ড মর্লি।

তিনি কিছুকাল সংবাদপত্র-সেবাও করিয়াছিলেন এবং তিনি যখন 'পেলমেল্ গেজেটের' সম্পাদক, তখন 'রিভিউ অব রিভিউজ' পত্রের প্রবর্ত্তক মিষ্টার ষ্টেড তাঁহার সহকারী কর্ম্মী ছিলেন।

লর্ড সিংহ

রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তিনি যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ২ বার আয়র্লণ্ডের চীফ সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত-সচিব ছিলেন। আয়ার্লণ্ডে তিনি চণ্ডনীতির একান্ত বিরোধী ছিলেন বলিয়া তিনি যখন ভারত সরকারের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে প্রকাশ্য বিচার না করিয়াই লালা লজপত রায়কে ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহকে নির্ব্বাসিত করিতে সম্মতি দেন, তখন তাঁহাকে নিন্দা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড মিণ্টোর সরকারের প্রতি তাঁহার আস্থা থাকিলেও তিনি যে চণ্ডনীতির বিরোধী ছিলেন, তাহা লর্ড মিণ্টোকে লিখিত তাঁহার পত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেই হইবে, কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতা বর্জ্জনীয়—তাহাতে অনাচার উৎপন্ন হয়, "We must keep order, but excess of severity is not the path to order on the contrary, it is the path to the bomb."

ভারত-সচিবরূপে তিনি যে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাকে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। তবে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী শাসন-পদ্ধতির অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি যে ভারতে পার্লামেণ্টের অনুকরণে শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কল্পনাও করেন নাই, তাহা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থায়

গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাধিক্যহেতু জনগণ মতপ্রকাশের সুবিধা পাইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রবর্ত্তিত আইনের নিয়মে ব্যবস্থাপক সভাসমূহে নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছিল।—

ব্যবস্থাপকসভা	সরকারী সদস্য	বে-সরকারী সদস্য
সভা	৩৬	৩২
মাদ্রাজের সভা	২০	২৬
বোম্বাইয়ের সভা	১৮	২৮
বাঙ্গালার সভা	২০	৩১
যুক্তপ্রদেশের সভা	২০	২৬
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের সভা	১৭	২৩
পঞ্জাবের সভা	১০	১৪
ব্রহ্মের সভা	৬	৯

যখন এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ রাজনীতিকরাও ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত-সচিবের পরামর্শপরিষদে ২ জন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করিয়াছিলেন—সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহাদিগের অন্যতর। অন্য জন—সৈয়দ হুসেন বিলগ্রামী।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের আইন উপস্থাপিত করিবার সময় তাঁহাকে বিলাতে অনেকের প্রতিবাদ প্রহত করিতে হইয়াছিল। লর্ড কার্জ্জন তাঁহাদিগের অন্যতম।

কিন্তু লর্ড মর্লির বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনে য পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদনুসারে ভারত সরকারেও রিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। তবে তিনি মনে করিতেন, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের সময় এখনও হয় নাই।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কার আইনের আলোচনাকালেই প্রকাশ পায়, বড় লাটের শাসন-পরিষদে এক জন ভারতীয় সদস্য নিয়োগ করা লর্ড মর্লির অভিপ্রেত। ইহার প্রবল প্রতিবাদ হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। লর্ড রিপণকে ভারতবাসী শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে—তাঁহারই শাসনকালে ভারতে যে ভাবের আবির্ভাব হয়,তাহার ফলে জাতীয় মহাসমিতি গঠন। তাঁহার সময়ের ইলবার্ট বিল স্মরণীয়। লর্ড মর্লির স্মৃতিকথা পাঠ করিলে জানা যায়, যখন বড়লাটের শাসন-পরিষদে এক জন ভারতীয় সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব আলোচিত হয়, তখন লর্ড রিপণও সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সদস্য সামরিক ও পররাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সকল গুপ্তকথা জানিতে পারিবেন। সেই জন্য গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কায় (on the secrecy argument) তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন।

কেবল তাহাই নহে—সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডও বড় লাটের শাসন-পরিষদে এক জন ভারতীয় সদস্যনিয়োগের
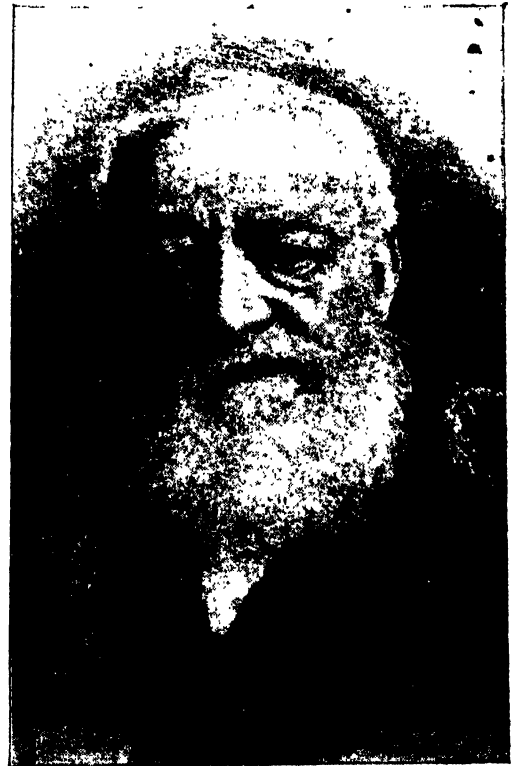
লর্ড রিপণ।

বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বড় লাট লর্ড মিণ্টো ও ভারত-সচিব লর্ড মর্লি সেই প্রস্তাবের পক্ষপাতী এবং সে নিয়োগ আবশ্যক বিবেচনা করায় মন্ত্রিসভা তাহার সমর্থন করেন। মন্ত্রিসভায় লর্ড মর্লি সেই প্রস্তাবের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "No more important topic has ever been brought before a Cabinet," ইংলণ্ডের রাজা জনমত অগ্রাহ্য করিতে পারেন না ; তথায় পার্লামেণ্ট জনগণের প্রতিনিধি সভা এবং মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। কাজেই অনিচ্ছাতেও সপ্তম এডওয়ার্ড এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, "Protesting against the whole proceeding, but admitting that there was no alternative against a unanimons Cabinet."

এই নির্দ্ধারণের ফলে লর্ড সিংহ বড় লাটের শাসন-পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জার্ম্মাণ যুদ্ধের বিরোধী হইয়া লর্ড মর্লি মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করেন।

তিনি মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের সমর্থক ছিলেন না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে আমাদিগের সহিত আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি সেই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ; বলিয়াছিলেন, ভারতের শাসন-পদ্ধতিতে উন্নতির প্রবর্ত্তন জন্য প্রতিবাদের দুর্গদ্বার ভাঙ্গিতে গুপ্ত মহাশয় তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

পরিণত বয়সে ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কন্যাকে পাশ্চাত্যপ্রথায় সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। স্বামী দ্বারকানাথ তাঁহার শিক্ষাদানে আরও উৎসাহী ছিলেন। দ্বারকানাথ বাঙ্গালায় রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুদিন ভারত সভার সহকারী-সম্পাদক থাকিয়া সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না।

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিয়া তথায় চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন।

তিনি রাজনীতিক কার্য্যেও যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা টিভলী গার্ডেনে মিষ্টার (পরে সার) ফিরোজসা মেটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে তাঁহার পরমাত্মীয় মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি দেশের শ্রমজীবীদিগের উন্নতি-সাধন অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়াছিলেন।

তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন এবং তাঁহাকে আদর্শ গৃহিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি শোকাতুর হইয়াছিলেন, তাহার পর দৌহিত্র শিল্পী সুকুমার রায়ের মৃত্যু তাঁহার পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হয়।

সকালে রোগী দেখিয়া আসিয়া তিনি অসুস্থ হয়েন এবং তাহার পর প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুকুমার রায়

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, শিল্পী সুকুমার রায় তরুণ বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। সুকুমারের পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় সাহিত্যে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টায় এ দেশে হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ

সুকুমার রায়।

করেন। সুকুমার পিতার সাহিত্যশিল্পানুরাগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিশু-সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ 'সন্দেশ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহার রচনা শিশুদিগের চিত্তবিনোদন করিত।

তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত।

নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব

ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন লইয়া ইতোমধ্যেই কয়টি মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে, প্রথম মামলা মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সহিত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্রের। মহারাজা কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম, কেহ এক সভার সদস্য থাকিতে অন্য সভার সদস্যপদপ্রার্থী হইতে পারেন না। মহারাজা কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্যপদ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার দরখাস্ত পেশ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাসচন্দ্র বলেন, মহারাজের দরখাস্ত বে-আইনী। আদালতের বিচারেও স্থির হইয়াছে, তাঁহার দরখাস্ত আইনানুসারে পেশ হয় নাই।

দ্বিতীয় মামলা কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত স্বরাজ্য দলের নেতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের। হালদার মহাশয় তাঁহার দরখাস্তে তারিখ দিতে ভুল করিয়াছিলেন। সেই ভুলের জন্য তাঁহার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হইলে তিনি হাইকোর্টে নালিশ করেন, তাঁহার দরখাস্ত মঞ্জুর বলিয়া গ্রহণ করা হউক এবং সঙ্গে সঙ্গে মল্লিক মহাশয়ের দরখাস্ত বাতিল করা হউক; কেন না, মল্লিক মহাশয় সরকারের চাকরীয়া এবং সরকারের চাকরীয়ারা ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন না। মামলায় হালদার মহাশয় পরাজিত হইয়াছেন।

তৃতীয় মামলা প্রসিদ্ধ কয়লা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঘোষ উপস্থাপিত করেন, শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ গোস্বামীর বিরুদ্ধে। যতীন্দ্র বাবুও দরখাস্তে তারিখ দিতে ভুলিয়াছিলেন, সেই অজুহতে তাঁহার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে।

[illegible]
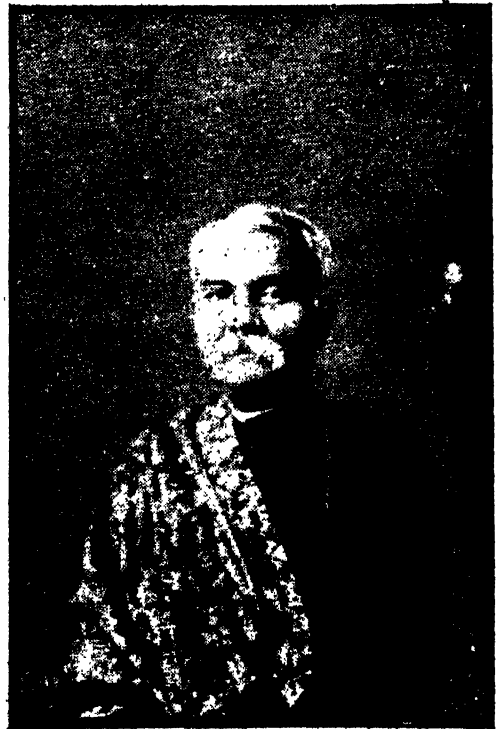
পরলোকে অশ্বিনীকুমার

বাঙ্গালার মুক্তি-সমরের প্রবীণ সেনাপতি, নীরব কর্ম্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া—তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বরিশালের মায়া কাটাইয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। আজ বাঙ্গালায় একটা ইন্দ্রপাত হইয়া গেল। স্নেহ-প্রীতির অপূর্ব্ব আধার, দয়ার উৎস, জ্ঞান-কর্ম্মের অনুপম সমন্বয়, লোকহিত-ব্রত, আদর্শ-চরিত্র অশ্বিনীকুমারের আবির্ভাব সকল দেশে সকল সময়ে হয় না। বাঙ্গালী বহু পুণ্যফলে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিল। আজ সমগ্র দেশ অন্ধকার করিয়া সে জ্যোতিষ্ক অস্তমিত হইল। যে কয় জন সাধক বাঙ্গালার শ্মশানে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া ভগীরথের মত দেশে পুণ্য মুক্তি-মন্ত্রের পীযুষ-ধারা প্রবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের এক জন। অগ্নিহোত্রীর মত তিনি সে সাধনা-যজ্ঞের অগ্নি তাঁহার সারাজীবনের কর্ম্মের ইন্ধনে প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন। সে সাধনা, সে প্রাণময় কর্ম্ম-যজ্ঞের আজ অবসান। যে সময় দেশে নেতার অভাব অনুভূত হইতেছে, প্রকৃত কর্ম্মীর অভাবে যখন এই বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন নীরব হইয়া পড়িতেছে, ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালী অশ্বিনীকুমারের মত কর্ম্মীকে হারাইল। গত ৭ই নবেম্বর বুধবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় কলিকাতা, ভবানীপুরে, চক্রবেড়ে রোডে অশ্বিনীকুমার লোকান্তরিত হইয়াছেন। চিকিৎসার জন্য তিনি কিছুকাল আত্মীয়-পরিবারবর্গের সহিত প্রবাস-জীবন যাপন করিতেছিলেন। অনেক দিন হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইয়াছিল, বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগ গত কয় বৎসর হইতে তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। শেষে মূত্রসংক্রান্ত ইউরেমিয়া রোগেই তাঁহার ইহলীলার অবসান হইল।
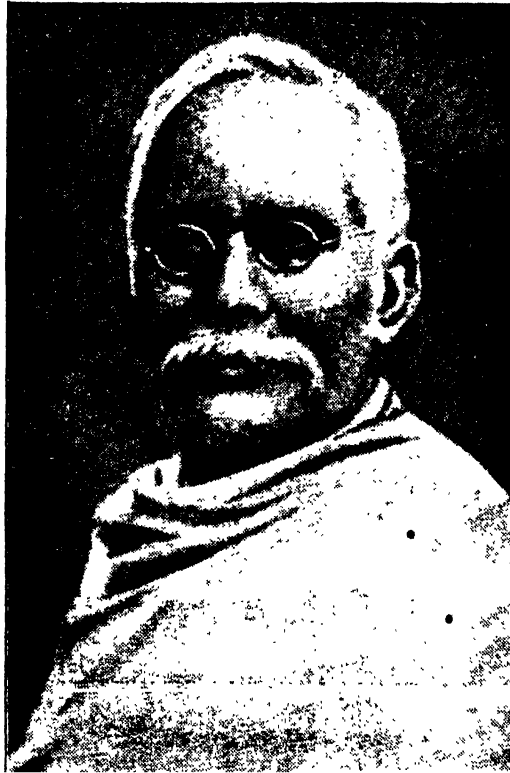
অশ্বিনীকুমার দত্ত।

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

অশ্বিনী বাবুর চরিত্রের যে সব বৈশিষ্ট্য উত্তরকালে তাঁহাকে জন-নায়কের আসন প্রদান করিয়াছিল, সেগুলি তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের শিক্ষানুরাগ পুত্র অশ্বিনীকুমারে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া বর্ত্তিয়াছিল। আদর্শরূপিণী জননীর নিকট হইতে তিনি সত্যনিষ্ঠা, উদারতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বরিশাল জিলার পটুয়াখালীতে অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা তখন সেখানকার মুন্সেফ। ব্রজমোহন বাবু পরে কলিকাতার ছোট আদালতের জজ পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন এবং সে পদে তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতিও হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার ১৩ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগর হইতে প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তাহার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন এফ এ পাশ করেন, তখন জানিতে পারেন যে, তিনি বেশী বয়স লিখাইয়া পরীক্ষা পাশ করিতেছেন, তাঁহার প্রকৃত বয়স প্রকাশ করিলে তাঁহাকে পরীক্ষা-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবে না। সত্য গোপন করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। এ বয়স-রহস্য অবগত হইবার পর তিনি কয় বৎসর আর পরীক্ষা-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়েন নাই; একেবারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বি, এ

পাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এম এ এবং পরবৎসর বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

অশ্বিনীকুমার যখন এফ, এ পাশ করেন, তখন তাঁহার পিতা যশোহরে। পরীক্ষার পর দীর্ঘ অবসরসময় তিনি পিতার নিকটই ছিলেন। এই সময় অশ্বিনীকুমার যশোহরে এক ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। তখন যশোহর অঞ্চলে খৃষ্টান পাদরীদের প্রভাব দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছিল। ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমার তাহারই প্রতীকার উদ্দেশ্যে সেই অল্পবয়সেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন।

বি এ পরীক্ষা দিবার পর অশ্বিনী বাবু শ্রীরামপুর চাতরার স্কুলে মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর বি এল পাশ করিয়া বরিশালে ওকালতী করিতে যায়েন। কিন্তু অল্পদিনেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, আইন-ব্যবসা তাঁহার জন্য নহে। তিনি তখন তাঁহার পুরাতন পেশাই আবার গ্রহণ করেন। অশ্বিনী বাবু ১৭ বৎসরকাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে জন্য কোনওরূপ পারিশ্রমিক লয়েন নাই।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় ব্রজমোহন বাবুই প্রথম ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউটকে হাই স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। অশ্বিনী বাবু ইহাকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলেজে পরিণত করেন। কলেজের গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য অন্যূন ৩৫ হাজার টাকা তাঁহাকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

সরকারের সুনজরে পড়ার জন্য ব্রজমোহন কলেজকে অনেক সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজারও (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন ও কলেজ অশ্বিনী বাবুর প্রভাবে এক অপূর্ব্ব অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বিদ্যালয়টি শুধু পরীক্ষা পাশ করাইবার যন্ত্রস্বরূপ না করিয়া তথায় ছাত্রদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হয়। বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট "লিটল্ ব্রাদার্স অব দি পুয়র" বা দরিদ্র-বান্ধব সমিতি ও ষ্টুডেণ্টস্ ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন নামক অনুষ্ঠান দুইটিই উহার প্রাণস্বরূপ ছিল। অনুষ্ঠান দুইটির সাহায্যে ছাত্রদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে লোকহিত ও দেশ-হিতকর কর্ত্তব্য বুদ্ধি জাগিয়া উঠিত। অশ্বিনী বাবু স্বয়ং তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। নিজে কর্ত্তব্যসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিনি অন্য সকলকে সেই দিকে আক[illegible]তেন। শুধু উপদেশ দিয়া দেশোদ্ধার কর্য্য[illegible] তাঁহার কোন দিন ছিল না। তিনি নিজে যেমন [illegible]বোধে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন, অপরকেও সেইরূপ করিতে বলিতেন। সত্যনিষ্ঠা, জীবে দয়া ও পবিত্রতাকে তিনি সকলের আদর্শ

শ্মশানঘাটে অশ্বিনীকুমার।

করিতে বলিতেন। দরিদ্র ও বিপন্নের সাহায্যে অশ্বিনী বাবুকে কেহ কখনও পরাঙ্মুখ দেখে নাই। কত বিনিদ্র-রজনী তিনি বিসূচিকা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বরিশালে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে সময় তিনি স্থানীয় পীপল্‌স্ এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে বিপন্নদের সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সেই প্রাণপাত পরিশ্রমের জন্য তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবু ১ শত ৫০টি কেন্দ্র খুলিয়া প্রতি সপ্তাহে ৬ হাজার টাকা বিতরণ করেন। এই ভাবে ক্রমাগত ৭ মাস কায করিতে হয়। অশ্বিনী বাবু বহু বৎসর যাবৎ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। জিলা ও লোকাল বোর্ডেও তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল।

অশ্বিনী বাবু মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গেই মিশিতেন, সকলেরই বন্ধু ছিলেন। নমঃশূদ্র বা মুসলমান বলিয়া কেহ তাঁহার স্নেহ-প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইত না। অথচ, তখন সমাজে এখনকার অপেক্ষা অধিক গোঁড়ামীই প্রশ্রয় পাইত।

সাধারণভাবে যাহাকে রাজনীতিক বলে, অশ্বিনী বাবু সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি রাজনীতির সহিত ধর্ম্মের সংযোগসাধন করিয়াছিলেন। ভারতীয় রাজনীতির এই বৈশিষ্ট্য মহাত্মার অসহযোগ মন্ত্র প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আর কাহারও নিকট ফুটিয়া উঠে নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বদেশী বয়কটের যুগেই প্রাধান্যলাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বরিশালে যে বিখ্যাত প্রাদেশিক কনফারেন্স বসে, তিনি তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। পুলিস নেতাদের যে শোভাযাত্রাটি জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, অশ্বিনী বাবু তাহার মধ্যেও ছিলেন।

অশ্বিনী বাবু জাতীয় দলের (চরমপন্থী বলিলেও চলে) হইলেও মডারেটদের সভাসমিতিতেও যোগদান করিতেন। তিনি উভয়দলের সম্মিলনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে, বোম্বায়ের স্পেশ্যাল কংগ্রেসে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে ও কলিকাতায় স্পেশ্যাল কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন।

সার বাম্‌ফাইল্ড ফুলার অশ্বিনী বাবুকে কোনরূপে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহাকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনী বাবু ঢাকায় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনী বাবু সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি সমান দক্ষতার সহিত লেখনী চালনা করিতে পারিতেন। তিনি বহু ধর্ম্মমূলক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ভক্তিযোগ' মারাঠী ও তামিল ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ভক্তিযোগের ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। প্রেম, দুর্গোৎসব তত্ত্ব, ভারত-গীতি প্রভৃতি তাঁহার আরও কয়েকখানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

অশ্বিনী বাবু বরিশালে মফঃস্বল অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একটি সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্য-তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারই সভার উদ্দেশ্য ছিল। এই সভার জন্য তিনি বাৎসরিক ৩ শত টাকা আদায়ের ভূ-সম্পত্তি আলাহিদা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রথম বয়সে অশ্বিনী বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাবাধীন ছিলেন। ধর্ম্মে উদারতার জন্য তিনি সকল ধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তকেরই পক্ষপাতী ছিলেন। স্নেহ-প্রীতি, দয়া ও ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার সত্যানুরাগ ও অকপটতা অনন্যসাধারণ। পরলোকগত মহেন্দ্র সরকার একবার বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় কেশব সেন যেমন, বরিশালে অশ্বিনী দত্তও তাহাই।

অশ্বিনী বাবু প্রথমে অসহযোগ মন্ত্রের পক্ষপাতী না থাকিলেও পরে তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। তিনি কাউন্সিল-গমনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ব্রজমোহন কলেজের

কালীঘাটে কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে দেশনায়কের অন্তিমকৃত্য সমাধা হইয়াছে। রাত্রি আটটার সময় শোভা-যাত্রা করিয়া জাতীয় সঙ্গীত সহকারে শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ ও শ্রীযুত ললিত-মোহন দাশ প্রমুখ নেতারা শ্মশানে যাইয়া শ্রদ্ধাস্পদ নেতার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করেন।

ভারতবন্ধু পিয়ার্সন

কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য ভারতবর্ষের চিরহিতৈষী মিঃ পিয়ার্সন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ পিয়ার্সন যত্ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে প্রথম যৌবনে ইনি ইংরাজীর অধ্যাপকরূপে এল, এম্, এস্ কলেজে যোগদান করেন। প্রথমাবধিই মিঃ পিয়ার্সন বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। অনেক ছাত্রের বাড়ীতে গিয়া পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি মিঃ পিয়ার্সনের বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ এত অধিক হইয়াছিল যে, গত বৎসর কাশ্মীরে অবস্থানকালে জনৈক বাঙ্গালী ছাত্রের সাহায্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের গোরা নামক উপন্যাসখানি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন।

সহোদরার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে মিঃ পিয়ার্সন কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে যাইবার পর অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। মিঃ পিয়ার্সন সাধারণ অধ্যাপকের কায পরিত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের বোলপুর শান্তি নিকেতনে যোগদান করেন। তিনি পরিচিত সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহারে এবং আন্তরিকতা-পূর্ণ আলাপে যে কোনও ব্যক্তি মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার শক্তিও তাঁহার ভালই ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীদিগের কলেজে অধ্যাপনার কায করিতে করিতে ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার মমতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেক সময় ভারত-বাসীর পক্ষ লইয়া তিনি ব্যুরোক্রেশীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় মিঃ পিয়ার্সনকে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইয়াছিল। অসহযোগ আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্যভাবে যোগ দিতে না পারিলেও তিনি এই আন্দোলনে সাফল্য কামনা করিতেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ভারতবাসী যে একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু হারাইল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

চরমানাইরের তদন্ত

গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে আমরা চর-মানাইরে পুলিসের বিরুদ্ধে গুরু অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। সরকার সে সম্বন্ধে যে কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও সেই সঙ্গে আমরা পাঠক-দিগের গোচর করিয়াছিলাম্। সেই সব অভিযোগের কথা প্রকাশিত হইলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী এক তদন্ত-সমিতি গঠিত করেন। এত দিনে তদন্ত-সমিতির রিপোর্টের একাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। সে রিপোর্টে গৈজুদ্দীনের মৃত্যুসম্বন্ধে পুলিসের অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার প্রস্তাব সংগৃহীত হইয়াছে এবং স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশের ও স্ত্রী-লোকের প্রতি অত্যাচারের অভিযোগও প্রকাশিত হই-য়াছে। তদ্ভিন্ন লুঠ-তরাজের অভিযোগ ত আছেই।

আমরা বারান্তরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সরকার প্রথম প্রকাশিত অনাচার-বিবরণ ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সে কথায় দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার পর কংগ্রেসের তদন্ত-সমিতির এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে সরকার কি বলিবেন? এই রিপোর্টে যে সব অভিযোগের উল্লেখ আছে, সে সকলের সহিত তুলনায় বুঝি জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারও লঘু হইয়া যাইতে পারে। তাহার তুলনা আছে কেবল, বেল-জিয়মে জার্ম্মাণদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ—ব্রাইস কমিটীর রিপোর্টে। আমরা বলিতে বাধ্য, সরকার যদি এ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করিয়া ফল প্রকাশ না করেন, তবে দেশের লোক কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।

১লা ভাদ্র—

নাগপুরে সত্যাগ্রহের জয়, নিষিদ্ধ অঞ্চল দিয়া শোভাযাত্রা যাইতে দেওয়া হইল। বহরমপুর জেলে শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের কঠিন পীড়ায় স্বাস্থ্যহানির সংবাদ। মাদ্রাজ জেলে ডাঃ বরদ'রাজালু নাইডুর প্রায়োপবেশন। ব্রহ্মে বেসিন অঞ্চলে বন্যার জলে প্রায় ৭ লক্ষ বিঘা জমীর ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বারাণসীতে সনাতন ধর্ম্ম মহাসভায় বালিকাদের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণে সংস্কারক ও গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে বিবাদ। হংকংয়ে ঘূর্ণিবায়ুতে অনেক সম্পত্তি নষ্ট ও লোকজন হতাহত। ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্যান পিড্রো সহরে পাঁচ লক্ষ পিপা পেট্রোলিয়াম অগ্নিকাণ্ডে নষ্ট।

২রা ভাদ্র—

কাশীতে হিন্দু মহাসভার সপ্তম অধিবেশন। হিন্দু মহাসভার সাফল্য কামনা করিয়া পণ্ডিত মালব্যের নিকট মহাত্মা-পত্নীর তার। ফ্রান্সে সমগ্র ডোভার উপকূলে দাবানলের আবির্ভাবে বহু কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট।

৩রা ভাদ্র—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ ষ্টিফেনসনের মুখে আবার বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানের কথা। নাগপুরে ধৃত স্বেচ্ছাসেবকদের মুক্তিপ্রদান আরম্ভ। ঢাকা কংগ্রেস কমিটীতে সদস্যদের মারামারি। কলিকাতার লাটপ্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয় কনফারেন্স। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক বন্দীদের নির্ব্বাচনাধিকার-প্রদানের প্রস্তাব ভোটে অগ্রাহ্য; রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাবেও সরকার পক্ষের আপত্তি, বেশ্যাবৃত্তিনিবারক আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় গৃহীত। কাশীতে নিখিল ভারত হিন্দু সনাতন ধর্ম্ম-সভায় অস্পৃশ্যতা পরিহারের প্রস্তাবে আপত্তি। বিহারে ভীষণ বন্যার সংবাদ। দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক প্লেগ দমনের জন্য ইঁদুর মারিতে প্রায় লাক টাকা বরাদ্দ। আজমীর হাঙ্গামা উপলক্ষে টঙ্কের নবাব-পুত্র আদালতে অভিযুক্ত। পারস্যে খোরাসান অঞ্চলে বিষম বন্যা।

৪ঠা ভাদ্র—

বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণর কর্ত্তৃকও বিপ্লববাদ-অভ্যুত্থানের সরকারী সংবাদের সমর্থন। রসুলাবাদ ট্রেণ দুর্ঘটনায় অল্প আঘাতপ্রাপ্ত ইংরেজ মহিলাটির জন্য লাক টাকা ক্ষতিপূরণ।

৫ই ভাদ্র—

কেনায়ার অপমানে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীর হরতালের সঙ্কল্প। তমোলুক অঞ্চলে ৪০ বর্গমাইল স্থানে বন্যার সংবাদ। ভূতপূর্ব্ব তুর্ক সুলতান এঙ্গোরা কর্ত্তৃক এখনও ক্ষমার অযোগ্য সাব্যস্ত। আবার এক ভারতবাসীর ভাগ্যে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি-সম্ভাবনার সংবাদ।

৬ই ভাদ্র—

হুগলী জেলে দল বাহাদুর গিরির প্রায়োপবেশনের সংবাদ। ঢাকায় ডাকাতির অভিযোগে প্রায় ৫০ জন যুবকের গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ। ইয়াং ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত সোয়েব কোরেসীর মুক্তিলাভ। সেওড়াফুলীর জাল সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারী সুকুমার সেনের ২ বৎসর কারাদণ্ড। বন্যায় শোণতীর ধ্বংসের সংবাদ। জাল নোট তৈয়ারীর অভিযোগে কলিকাতার বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুত কে বি সেন গ্রেপ্তার; বেণেটোলা লেনে আরও ৭ জন ধৃত। কেনিয়া রহস্য সম্পর্কে যুক্তপ্রদেশের মডারেট সভায় মিঃ এণ্ডরুজের অভিযোগ—বর্ত্তমান ভারত-সচিব লর্ড পীল ঔপনিবেশিক অফিসের এক গোপনীয় সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আঙ্গোরার জাতীয় সংঘ লসেন সন্ধি অনুমোদন করিলেন।

৭ই ভাদ্র—

কেনায়ার অপমানে সালেম মিউনিসিপ্যালিটীতে হরতাল, এম্পায়ার ডে'র ছুটী বন্ধ ও সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বয়কটের সঙ্কল্প; মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সম্পর্ক বর্জ্জনের ব্যবস্থা। জলন্ধর জেলে এক জন কয়েদীর সন্দেহজনক মৃত্যুতে অন্যান্য কয়েদীদের প্রায়োপবেশন। কেনায়া প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতা, শিয়ালদহের ফৌজদারী আদালতে কতিপয় ভদ্রসন্তান ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। মহরম উপলক্ষে পঞ্জাব, সাহারাণপুরে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ, পুলিসের গুলীতে ৬ জন নিহত, ১৬৫ জন আহত, হিন্দুদের দোকান লুঠ; লক্ষ্ণৌ গর্দ্দাতেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও পুলিসের গুলী; আমেদাবাদ, আগ্রা ও অমৃতসরেও হাঙ্গামা; নেলোর, লাহেরিয়া-সরাই ও কলিকাতাতেও সামান্য গোলমাল।

৮ই ভাদ্র—

বর্দ্ধমান জেলে শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাতে আপত্তি। বাঙ্গালার কাউন্সিলের কয় জন সদস্যের অযথা রাহাখরচ ইত্যাদি আদায় করিবার হিসাব প্রকাশ। তিন্নিভেলিতে বৃটিশ-বিরোধী মিছিল ও বক্তৃতা।

৯ই ভাদ্র—

বিজাপুর জেল হইতে মৌলানা মহম্মদ আলি স্থানান্তরিত। প্রতাপ সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ। কলিকাতায় বড়বাজার কংগ্রেসে দুই দলে সংঘর্ষ। বিলাতে ঋণগ্রহণের জন্য কাসিমবাজার ষ্টেটে শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। গ্রীস কর্ত্তৃক লসেন সন্ধির সমর্থন।

১০ই ভাদ্র—

কেনায়ার অপমানে নিখিল ভারত হরতাল। ডাঃ বরদারাজলু নাইডু ট্রিচি জেলে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। গিরিডীতে আবার ২ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারী। কেনায়া অপমানের প্রতিবাদে বোম্বায়ে শ্রীযুত যমুনাদাস দ্বারকাদাস কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর নিখিল ভারত ও বোম্বাই কমিটীর সংস্রব ত্যাগ। দক্ষিণ কানারার প্লাবনের বিবরণ, ৪৫ মাইল গ্রাম ভাসিয়াছে। আসানসোলের নিকট কোন গ্রামের এক বিবাহ-বাড়ীতে ডাকাতি, মহিলার বর্শায় এক জন ডাকাত জখম। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বিলাতে রাজস্ব-সচিব হইলেন। তুরস্ক হইতে বৃটিশ-সেনার সদলবলে প্রস্থানের আয়োজন।

১১ই ভাদ্র—

ঢাকায় শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সশস্ত্র ৩ জন যুবক কর্ত্তৃক স্বগৃহে আক্রান্ত; যুবকরা ধৃত। মেদিনীপুর, গিধনা অঞ্চলে অনাচারের সংবাদ, কমিশনারের নিকট তার। বোম্বায়ে রোভার্স কাপ-খেলায় মোহনবাগান ফাইন্যালে উঠিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য আগ্রায় গোরা সৈন্যের পাহারা, সন্ধ্যার পর বাহির হওয়া নিষিদ্ধ। সাহারাণপুরের হাঙ্গামায় ক্ষতির হিসাব—দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মামলায় হাইকোর্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্ব রায়ই (য়ুরোপীয়দের রিজার্ভ কামরা হইতে না নামায় হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৫ টাকা জরিমানা) বাহাল। কলিকাতায় যুবকদলের ডাকাতি ও বিপ্লববাদ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগকে সরকারী প্রচার বিভাগের নিমন্ত্রণ। জজলুল পাশার মিশর প্রত্যাগমন সম্ভাবনা।

১২ই ভাদ্র—

বান্দী জেল হইতে মৌলানা মহম্মদ আলির মুক্তি। ধারোয়ার জেলার শ্রীযুত মঙ্গলজীর প্রতি ১৪৪ ধারা জারী। খালসা কলেজের অধ্যাপক সর্দার ভকতরাম নাভা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত। হিন্দু দরিদ্র-নারায়ণগণের পোষণকল্পে শ্রীযুত প্রিয়নাথ মল্লিক কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর হস্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিলেন। কলিকাতার হাবড়ার পুলের উত্তরে গঙ্গার ধারে প্রমোদ-বীথিনির্ম্মাণের প্রস্তাব মিউনিসিপ্যালিটীতে গৃহীত। আগ্রার হাঙ্গামায় ২৬ জন গ্রেপ্তার। কাবুল জেল হইতে মেজর অর ও এণ্ডারসনের হত্যাকারী দুই জনের পলায়ন সংবাদ। ইটালীয় মিশনের সদস্যগণের হত্যা সম্পর্কে গ্রীসের প্রতি ইটালীর চরম-পত্র। বাণিজ্য-সামগ্রী লইয়া পারস্যের এঞ্জেলী বন্দরে জার্ম্মাণ-জাহাজের উপস্থিতি।

১৩ই ভাদ্র—

দিল্লীতে তেজ-সম্পাদক জাতি-বিদ্বেষের অভিযোগে ধৃত। বিহারে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাবে সরকারের অসম্মতি। বোম্বায়ে নূতন গবর্ণরের অভিনন্দনে মিউনিসিপ্যালিটীতে আপত্তি। নাভার আকালী জাঠের সম্পাদক গ্রেপ্তার, জৈঠোর দেওয়ানে যোগদানে বাধা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর বারলিন-যাত্রা। বন্যাসাহায্যে সাহাবাদ জেলায় সরকারের এক লক্ষ টাকা প্রদান। মেদিনীপুর জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক তমোলুকের বন্যায় ৫ হাজার টাকা দান। বেঙ্গল টেরিটোরিয়াল সৈন্যদলের জন্য ডাঃ মল্লিকের আবেদন। রঙ্গপুরে আর এক বৈষ্ণবীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারের মামলা। খলিলপুর গুলীর মামলায় পুলিসের অব্যাহতি। আয়ার্ল্যাণ্ডে ফ্রি ষ্টেটের নির্ব্বাচনে ডিঃ ভালেরার তিন গুণ ভোট। গ্রীস অভিমুখে ইটালীয় রণপোত। ইংলণ্ডে বিষম ঝড়-বৃষ্টি।

১৪ই ভাদ্র—

বোম্বায়ে রোভার্স কাপের ফাইনালে মোহনবাগানের পরাজয়। পালামকোটায় শ্রীমতী পঙ্কজমের মামলায় মিশনারীদের ক্রোধ হ্রাসে আপোষ হইল। সিংহল ও বৃটিশ মালয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভারত সরকারের ব্যবস্থা। বিহার জেলে বেত্রদণ্ড উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় ভোটের জোরে গৃহীত। খেলামের দুই জন দরজীর নিকট ৬০ হাজার টাকার জাল নোট প্রাপ্তি। ময়মনসিংহে বিন্দু বৈষ্ণবীর প্রতি পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে কয় জন মুসলমান অভিযুক্ত। রায়বেদা জেলে জেলারের উপর আক্রমণ, হাঙ্গামায় এক শিখ কয়েদীর মৃত্যু। ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীক দ্বীপ কর্ফিউ অধিকৃত।

১৫ই ভাদ্র—

নিজামরাজ্যে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে সেচের ব্যবস্থা। জাপানে ভীষণ ভূমিকম্প, ভূমিকম্পের জন্য অগ্নিকাণ্ড এবং সেই সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টি; বহু লোকক্ষয় ও সম্পত্তি-নাশ।

১৬ই ভাদ্র—

জাপানের খণ্ড-প্রলয়ে একটি অস্ত্রাগার ও রেলওয়ের সর্ব্ববৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ ধ্বংস, টোকিয়ো ওইয়ে কোহামায় দুই লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু এবং রাজপ্রাসাদে অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ; রাজসভাসদদিগের অনেকের মৃত্যু। ইটালী কর্ত্তৃক গ্রীসের আরও দ্বীপ অধিকার এবং জাতি-সংঘের আদেশপালনে অসম্মতি।

১৭ই ভাদ্র—

রাজদ্রোহের অপরাধে লাহোরে জমীদার পত্রের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের দুই বৎসর কারাদণ্ড। নাগপুরের সত্যাগ্রহীদের মধ্যে যাঁহারা জেল-নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলের মুক্তির আদেশ; শেঠ যমুনালাল বাজাজ, ডাঃ হার্দ্দিকর প্রভৃতি নেতাদেরও এই সঙ্গে মুক্তি; মোট ৭০৭টি সত্যাগ্রহীর অব্যাহতি। হরতাল ঘোষণায় লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেস সম্পাদকের দণ্ড। হুগলী মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশকে অভিনন্দন প্রদান। নাভা, জৈঠোর গুরুদ্বারে প্রায় ৬০ জন আকালী ধৃত। মেদিনীপুরের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদের আক্রমণের অভিযোগ হইতে ১৮ জন সাঁওতালের অব্যাহতি, বাকী ৪৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা। কেনায়ার অপমানে শ্রীমতী এনী বেসাণ্ট কর্ত্তৃক সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বয়কট। সাহারাণপুর হাঙ্গামায় এ পর্য্যন্ত মোট ২৪৫ জন গ্রেপ্তার। জলন্ধর অঞ্চলে বাবর আকালীদের সহিত অশ্বারোহী পুলিসের সংঘর্ষ, প্রথম দলের ৪ জনের মৃত্যু। পারস্যেও স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে।

১৮ই ভাদ্র—

বোম্বায়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসে কেনায়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের সঙ্কল্প। শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্তের স্বরাজ্য দলে যোগদান। দিল্লীতে কোন মসজিদের সম্মুখস্থ পানীয় জলের পুষ্করিণী হিন্দুদের ব্যবহারে মুসলমানগণের আপত্তি। জাপানে প্রায় তিন লক্ষ লোকের প্রাণনাশ ও কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নাশের সংবাদ; মৃতদের মধ্যে চারিটি রাজকন্যার নাম শুনা যাইতেছে।

১৯শে ভাদ্র—

লাহোরে খবরদার প্রেসের মালিক রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার, ডাঃ কিচলুর অভিনন্দনে শোভাযাত্রার ব্যবস্থায় তাঁহার আপত্তি। বিহার বন্যা সাহায্যে গুজরাট কংগ্রেসের ৫ হাজার টাকা সাহায্য। [illegible]

প্রচার। নৈহাটী ষ্টেশনে কুমারী এইচ ডি মিত্রের টাকা চুরীর চেষ্টায় দুইটি গোরা সৈনিকের কারাদণ্ড। বিহারে সাহাবাদ ও শারণ জিলার ৩০০ ও ১৫০ বর্গ মাইল স্থান বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অ্যালবিনিয়ার হত্যাকাণ্ডে গ্রীসই দূত-সভা কর্ত্তৃক দায়ী সাব্যস্ত। টোকিয়ো ওইয়োকোহামায় কতিপয় বৈদেশিক দূতের মৃত্যু-সংবাদ।

২০শে ভাদ্র—

করাচীর জন-নায়ক, ফতোয়া মামলার অন্যতম আসামী পীর গোলাম মুজাদিদের কারামুক্তি। মন্ত্রী নবাব নবাব আলির পুনঃপুনঃ পীড়ায় তাঁহার কার্য্যভার অন্য দুই মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। সাহারাণপুরের কাণ্ডে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের অভিযোগ—হিন্দু স্ত্রীলোকদের উপরও অত্যাচার হইয়াছে। যুক্তপ্রদেশে, শাজাহানপুরে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে ৫০ জন আহত, হিন্দুদের দোকান বন্ধ। ফিলিপাইনের মার্কিণ গবর্ণর-জেনারেলের ব্যবহারে দেশবাসীর অসহযোগ, মন্ত্রি-সভার পদত্যাগের সংবাদ।

২১শে ভাদ্র—

সালেম মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক এম্পায়ার ডে বর্জনের ইস্তাহার। দেশনায়ক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তি। দিল্লী মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক কংগ্রেস নেতাদের অভিনন্দন প্রস্তাবের আলোচনায় মতভেদে স্বরাজ্য বাধা। মুজাফ্‌ফর্‌ লবণ প্রস্তুতের মামলায় ৩ জনের অব্যাহতি, বাকী ১৭ জনের কারাদণ্ড। বোম্বায়ে প্রাথমিক শিক্ষার ভার নূতন শিক্ষা আইনে লোক্যাল বোর্ডের হস্তে অর্পিত। শাজাহানপুর হাঙ্গামায় শতাধিক লোক গ্রেপ্তার, হাঙ্গামায় আহতের মোট সংখ্যা প্রায় দুই শত। অ্যালবিনিয়ার হত্যাকাণ্ডে দূত সমিতি গ্রীসের বিরুদ্ধে কতকগুলি দাবী স্থির করিলেন।

২২শে ভাদ্র—

কারামুক্ত নাগপুর-সত্যাগ্রহী নেতা পণ্ডিত সত্যদেও বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত আবেদ আলির জেলে ওজন-হ্রাসের সংবাদ। লাহোরের কেশরী সম্পাদকের প্রতি জামীন মুচলেকার আদেশ। বালিয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে দরবার দিন প্রভৃতির ছুটী বন্ধ করিয়া গান্ধী সাংবৎসরিক প্রভৃতিতে ছুটীর ব্যবস্থা। লালা লাজপৎ সাহারাণপুর হাঙ্গামায় বিপন্নদের জন্য দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কালকাতায় গোলদীঘিতে বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় একটি ৫ বৎসরের শিশুর ১১০ গজ সাঁতার। শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দত্তের স্বরাজ্য দলে যোগদানের সংবাদ। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যয়-হ্রাসে মুডিম্যান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ। ঐতিহাসিক রাজবাড়ীর মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইল। জার্ম্মাণী নূতন এক বৈজ্ঞানিক উপায়ে আকাশচারী বিদেশী বিমানমণ্ডলিকে তাহাদের দেশে নামাইতেছে। আয়ার্লণ্ডকে জাতিসংঘর্ষে প্রবেশ করিতে দিবার প্রস্তাব।

২৩শে ভাদ্র—

বাঙ্গালা কংগ্রেসের বিবাদে পণ্ডিত মালব্যের মতে স্বরাজ্যদলই ঠিক। পাঞ্জাবের নানা স্থানে "নাভা-দিবস" পালন; এই-উপলক্ষে পাতিয়ালায় ১০০, সিরহিন্দে ২০০, ভবানীগড়ে ৬০, বরনালায় প্রায় ২৫০ এবং রাজপুরা ও ঝিন্দে কিছু কিছু গ্রেপ্তার। আসাম ও বাঙ্গালার নানা স্থানে ভূমিকম্প, ময়মনসিংহে প্রাণহানি। ডাঃ কিচলুর মুক্তিতে জাফ্রিয়ারের অভিনন্দন।

২৪শে ভাদ্র—

ঝালোয়ারের মহারাণার লণ্ডনবাসে শিখ সমাজে নানা আশঙ্কা। জৈঠোর সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের গমনে বাধা। কেনায়ার অপরাধে বোম্বায়ে শ্রীযুত নটরাজন "জাষ্টিস্ অব পীসের" পদ ত্যাগ করিলেন। অভাবের তাড়নায় ঢাকার ধামরাই থানায় এক সূত্রধর কর্ত্তৃক ২টি শিশুপুত্র ও ১টি কন্যা হত্যা। সাণ্টা বার্ব্বারার নিকট মার্কিণের ৭ খানি ডেষ্ট্রয়ার পাহাড়ে লাগিয়া চুরমার। যুগোস্লাভিয়া ও ইটালী রণমুখী।

২৫শে ভাদ্র—

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে দিল্লীতে কংগ্রেসের ও অন্যান্য সভাসমিতির নেতৃবৃন্দের পরামর্শ সভা। অমৃতসরে লালা গিরিধারীলাল ও সালেমে ডাঃ নাইডুর জরিমানার জন্য জিনিস ক্রোক। রায় রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের লোকান্তর। পাঞ্জাবের কৃষিমন্ত্রী লালা হরকিষেণ লালের পদত্যাগ-সম্ভাবনা। কালা ধলা সমস্যায় প্যারিসের কোন নৃত্যালয় হইতে দুই আফ্রিকান রাজপুত্রের বহিষ্কারে সরকারের ভর্ৎসনা। আমেরিকায় সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ। জাপানী বীমা কোম্পানীগুলি তাহাদের বীমাকারকদিগকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ সমস্যা সম্পর্কে জার্ম্মাণ প্রধান মন্ত্রীর সহিত ফরাসী দূতের সাক্ষাৎ।

২৬শে ভাদ্র—

নাগপুর সত্যাগ্রহের সাফল্যে সরকার পক্ষের দুই ইঙ্গিতে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিবাদ। বাঙ্গালোরে দুই জন কর্ম্মীর প্রতি বক্তৃতা-বন্ধের আদেশ। কাউন্সিল গমন সমস্যায় দিল্লীতে নেতৃবৃন্দের পরামর্শ। রোটক জেল হইতে লালা গিরিধারীলালের মুক্তি। হাবড়ার বর্ত্তমান পুলের স্থানে ব্যয় বহুল ক্যান্টিলিভার পুল নির্ম্মাণে কর্পোরেশনের আপত্তি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত নাভা রাজ্যের দুই ব্যক্তি নূতন তদন্তে অব্যাহতি পাইল। জাপানের প্রলয়কাণ্ডের সরকারী হিসাব ১০০ মাইল লম্বা ও ৯০ মাইল প্রস্থ পরিমাণ টোকিয়োর উপকণ্ঠস্থিত জায়গা বিপন্ন; হতাহতের সংখ্যা পূর্ব্ব হিসাব অপেক্ষা কম।

২৭শে ভাদ্র—

দিল্লীতে মার্টার হলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন, মহাত্মা কারারুদ্ধ থাকায় শোভাযাত্রায় নেতাদের আপত্তি, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে বাঙ্গালার কংগ্রেসের সমস্যা। দিল্লীতে প্রবন্ধক কমিটীরও কার্য্যকরী সভার অধিবেশন। জঙ্গীপুরে জলপ্রবাহ প্রবাহিত করার ব্যবস্থায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস। জাপানের বিপদে সাহায্যের জন্য বোম্বায়ে দুই লাক টাকা সংগৃহীত। প্রিটোরিয়ার ইসলামিক সোসাইটী কারামুক্ত নেতাদের অভিনন্দন জানাইয়াছেন। স্পেনে বিদ্রোহ; গবর্মেণ্টকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা, সামরিক বিভাগেরও বিদ্রোহে সাহায্য।

২৮শে ভাদ্র—

দিল্লীতে ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে বাঙ্গালায় কংগ্রেসের সমস্যা-চেষ্টা; হিন্দু-মুসলমান সমস্যায় সাব-কমিটীর আপোষ প্রস্তাব, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার স্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য একটি ছোট কমিটীর প্রস্তাব। জৈঠোর আকালী সত্যাগ্রহীদিগকে দূরে লইয়া যাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালা সরকার বেথুন কলেজের নূতন ছাত্রী-বাসের জন্য ২২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। হাবড়ায় গুণ্ডাদল কর্ত্তৃক গরুর গাড়ীর মাল লুঠ। ই আই আর জামালপুরে রেলসংঘর্ষে অনেকে আহত। স্পেনে বিদ্রোহী নেতাকে মন্ত্রি-সভা গঠনের আদেশ। বুলগেরিয়ায় কমিউনিষ্ট হাঙ্গামায় পুলিস কোতোয়াল নিহত, আরও কয় জন পুলিস আহত।

২৯শে ভাদ্র—

বাঙ্গালার সমস্যায় স্বরাজ্যদলের জয়লাভ, দিল্লীর সাব-কমিটী মালব্যজীর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলেন। বিশেষ কংগ্রেসের প্রথম দিনের অধিবেশন; অভ্যর্থনা সভাপতি ডাঃ আন্সারী ও মূল সভাপতি মৌলানা আজাদের অভিভাষণ। এ দিন গভীর রাত্রিতে কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে কাউন্সিল সমস্যার আপোষ প্রস্তাব গৃহীত; মৌলানা মহম্মদ আলি প্রস্তাবক, কংগ্রেস আর কাউন্সিল-গমনে বাধা দিবেন না, তবে কংগ্রেস কমিটিগুলি সে বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বা অর্থসাহায্য করিবেন না। কৃষ্ণনগরে গবর্ণর-বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত। জৈঠোয় সৈন্যদের প্রতি আকালীদের আক্রমণের কথা। বেলিয়াঘাটায় মোটর-ডাকাতির চেষ্টা।

৩০শে ভাদ্র—

কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে আইন অমান্যের জন্য কমিটী-গঠনের প্রস্তাব। বিশেষ কংগ্রেসেও কাউন্সিল-গমন ব্যাপারে আপোষ প্রস্তাব গৃহীত। দিল্লীতে নিখিল ভারত সামন্তরাজ্য সভার অধিবেশন, সভাপতি পুণার কেশরী-সম্পাদক শ্রীযুত কেলকার। কিউমের শাসন-পরিষদের পদত্যাগ।

৩১শে ভাদ্র—

বিশেষ কংগ্রেসে আইন অমান্যের জন্য কমিটী নিয়োগ; বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে কেনায়া সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনের ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্কশূন্য স্বরাজ-স্থাপনে কমিটী-গঠনের প্রস্তাব; হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সাব-কমিটীর শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় সংঘ ও হাঙ্গামাস্থল পরিদর্শনের কমিটী গঠন প্রস্তাব। উদয়পুরে রাজস্থান সেবাসংঘের সভাপতি শ্রীযুত পাঠিকের গ্রেপ্তারের সংবাদ। ফ্রান্স হইতে জগলুল পাশার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন।

পরলোকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালার সংবাদপত্রজগতে একটি ইন্দ্রপাত হইল। মনীষী, চিন্তাশীল ভাবুক, রসরসিক, শক্তিশালী, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্রসেবক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২৯শে কার্ত্তিক রাত্রি ৭।৷০ ঘটিকার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সংবাদপত্রজগতে যাঁহারা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম অগ্রণী। প্রাচীনযুগে যাঁহারা বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া পাঁচকড়ি বাবু তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অতীতের সহিত বর্ত্তমানের শুভযোগ সংঘটন করাইয়াছিলেন। আজ অতীত ও বর্ত্তমানের যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান সংবাদপত্র-সেবকের পক্ষ হইতে তাঁহার সাহিত্যসেবা ও সংবাদপত্রসেবার ইতিকথা আলোচনা করিবার ইহা উপযুক্ত সময় নহে, তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্রের তীব্র শ্লেষ ব্যঙ্গোক্তির তীক্ষ্ণ কশাঘাতের অনুকরণে তিনি বর্ত্তমান সংবাদপত্রজগতে ভাঙ্গনের দিক্ যেমন ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনই ভাবে গড়নের দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়া বর্ত্তমানের তীব্র আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রচনার মধ্য দিয়া মূর্ত্ত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহার সরস রচনামাধুর্য্যে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নব জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল—বাঙ্গালা সংবাদপত্র শক্তির অন্যতম আধার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যে শক্তির উৎস হইতে তাঁহার রচনা উদ্গত হইত, সে শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল, এ কথা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ক্ষণিকের মোহে ক্ষেত্রবিশেষে সে শক্তির যে অপব্যবহার হয় নাই, এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ভাবে, ভাষায়, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, অনুপ্রাসে, বর্ণনে তাঁহার লেখনী স্বচ্ছন্দগতি ছিল। কিন্তু বর্ষার বারিস্ফীত স্রোতস্বিনীর মত তাহা আবিলতাবর্জ্জিত ছিল না। মতস্থৈর্য্যের অভাবে তাহা কখনও যে ভাবের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হয় নাই, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। ব্যক্তিগত মতভেদের তীব্র তাড়নায় তাঁহার লেখনী কখনও কখনও অসংযত হইত বটে, কিন্তু তাঁহার রচনার পারিপাট্য দোষকে গুণে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার অভাব বাঙ্গালা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে বহুদিন পূর্ণ হইবার নহে।

আজীবন দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি সাহিত্য-সেবা করিয়া আসিয়াছেন। জীবনের সায়াহ্নে রোগে শোকে জীর্ণ হইয়া তিনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি বাঙ্গালা ভাবাভাবী কখনও ভুলিতে পারিবে না। আজ তাঁহার বর্ষীয়ান্ জনক ও বর্ষীয়সী জননীর এবং স্নেহাশ্রিত সন্তান-সন্ততির বুকে দারুণ ব্যথা দিয়া তিনি চিররোগমুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের এই শোকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাই না। তবে এ শোকে এইটুকু সান্ত্বনা যে, তাঁহাদের আপনার জন দেশের ও দশের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মন্তী প্রেস] প্রতিবিম্ব। [চিত্রকর—জে, এন, মণ্ডল
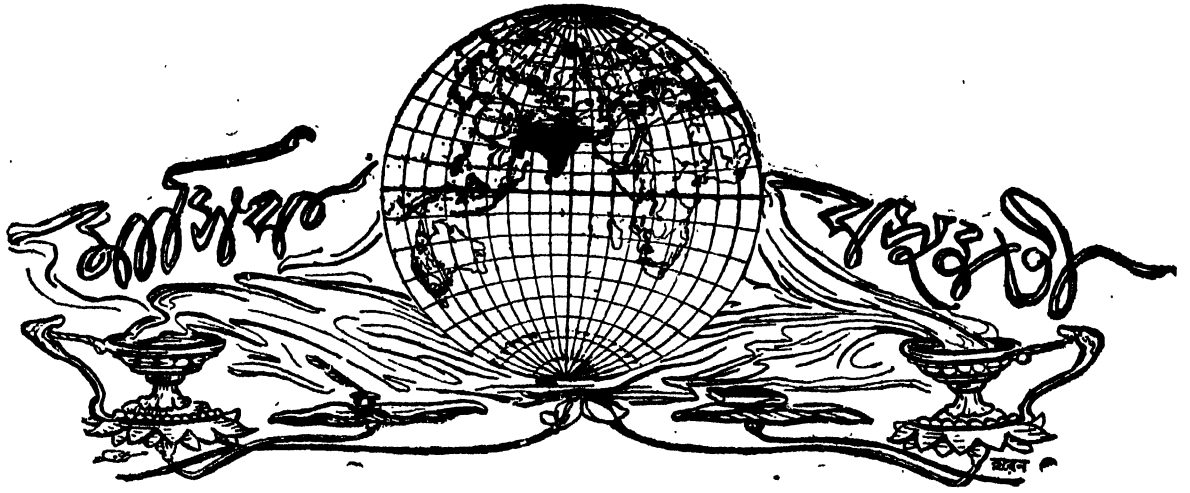
২য় বর্ষ } ২য় * অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ * খণ্ড { ২য় সংখ্যা

খাদির সার্থকতা

খদ্দর সম্বন্ধে গত ২ বৎসরে বহু বক্তৃতা করিয়াছি, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত খদ্দরপ্রচারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। বোধ হয়, বর্ত্তমান বৎসরেই রেলে ও ষ্টীমারে ১৫।২০ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি—খদ্দরের কথা বলিয়াছি, নূতন কিছুই বলিবার নাই। আমরা আজ মৃতের জাতি, যেমন অহিফেন-সেবীকে জাগাইবার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর প্রয়োজন, তেমনই এই মৃতকল্প জড়প্রায় জাতির জন্য প্রতিদিনই উত্তেজনাদায়ী আঘাত প্রয়োজন হইয়াছে। গত এক বৎসরে আমরা অনেকটা পিছাইয়া গিয়াছি। কলিকাতায় বৌবাজার অঞ্চলের দোকানগুলি দেখিয়া পূর্ব্বে সুখ হইত। এগুলি বাঙ্গালীরা নিজের হাতে রাখিয়াছে।

গত বৎসর এই সময়ে প্রায় সকল দোকানেই খদ্দর ছিল। আজকাল একবার দেখুন, দোকানগুলি নানারকম পাতলা, চকচকে, ফিনফিনে বিলাতী পরিচ্ছদে সাজান; দোকানের ভিতর বিলাতী কাপড় চোপড়। কতক কতক দেশী মিলের কাপড়ও আছে। কিন্তু খদ্দর নাই—একেবারেই নাই বলিলেই হয়। দোকানদারদের তত দোষ দেওয়া যায় না। ঘরভাড়া, লাইসেন্স, টেক্স এ সকলের বিপুল ব্যয় আছে। তাঁহাদের ত টিঁকিয়া থাকিতে হইবে? খরিদ্দার যে মাল চায়, তাহাই না রাখিলে তাঁহাদের কারবার তুলিয়া দিতে হয়। খদ্দর এখন ইঁহাদের দোকানে নাই; কেন না, খদ্দর অল্প লোকেই চাহে। দুই একটা কেবল মাত্র খদ্দরেরই দোকান বিক্রয়াভাবে মৃতবৎ আছে। সস্তা বিলাতী মালে জাপানী মালে আজ বাজার ভরা। এ দেশে খদ্দর প্রচলনকালে বিলাতী কাপড়ের চাহিদা কমিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য বিলাতের কাপড়ের কতকগুলি কল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাই বিলাতী কলওয়ালারা লাভ-লোকসানের দিকে না চাহিয়া ভারতবর্ষের বাজারে কাপড় যে কোন দরে বেচিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এখন যে দরে বিলাতী কাপড় পাওয়া যায়, তাহা অস্বাভাবিক দর—এ দর থাকিতে পারে না। তবে ইহাতে একটা কায হইতে পারে—খদ্দর সংহার হইতে পারে—যে খদ্দর বিলাতওয়ালার বস্ত্রব্যবসা নষ্ট করিতে বসিয়াছিল, তাহার প্রচলন রুদ্ধ হইতে পারে। বাঙ্গালী বড় চতুর জাতি, সস্তায় যে মাল পায় তাহাই কিনিবে। বেশী চালাক বলিয়াই আজ বাঙ্গালী "হা অন্ন! হা অন্ন!" করিয়া মরিতেছে। একটি দেশী ষ্টীমার কোম্পানীর কথা বলি। ঐ কোম্পানীটির সহিত আমি বিশেষভাবে সম্পর্কিত। বিদেশী কোম্পানীর সারঙ্গ খালাসীরা যাত্রীর উপর অন্যায় ব্যবহার করিত। কতকটা এই জন্যও বটে, আর কতকটা ব্যবসায়ের জন্যও বটে দেশী ষ্টীমার কোম্পানী খুলা হইল।

তাহার পরেই বিদেশী কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। দেশীয় ষ্টীমার একখানা চলে ত তাহাদের চলে দুইখানা। ভাড়া কমিতে সুরু করিল। এক টাকার জায়গায় এক আনা হইল। লোকসান দিতে লাগিলাম। আমাদের দেশের ভাইরা এটা বুঝিলেন না যে, সস্তায় এক আনা ভাড়ায় বিদেশী ষ্টীমারে যাইয়া দেশী কোম্পানীকে বধ করিতেছি। এটা বুঝিলেন না যে, এই স্বদেশী হত্যার পরদিনই বিদেশী ষ্টীমার এক টাকার জায়গায় দেড়-টাকা ভাড়া করিবে। খদ্দরের বেলা ত ঠিক এই রকম হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ৫।৭ টাকা জোড়ায় বিলাতী মিলের কাপড় কিনিয়াছি। তাহার পর তুলাও সস্তা হয় নাই, শ্রমের হার বরং বাড়িয়াছে। কিন্তু কাপড়ের দর কমিয়া আড়াই টাকা তিন টাকা জোড়া হইয়াছে। একবার খদ্দর বধ হইলে পুনরায় বিলাতী বস্ত্র ৪।৫ টাকাতেই উঠিবে। আমরা চতুর, আমরা চালাক! আজ বিলাতী ও মিলের কাপড়ের জোড়া তিন টাকা, আর খাদি পাঁচ টাকা, কাযেই খাদি পরিত্যাগ করিব, তুচ্ছ করিব। ইহা ভাবিব না যে, অতঃপর খাদির অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিলাতী কাপড় ও দেশী মিলের কাপড় কিনিতে হইবে। ইহা সুনিশ্চিত যে, খাদির মূল্য কমিবে। আমাদের স্ত্রী-কন্যারা যতই সূতাকাটায় দক্ষ হইবেন, ততই সূতার মূল্য কমিবে, সূতা শক্ত হইবে, মিহি হইবে, আবার সেই জন্য তাঁতির মজুরীও কমিবে। আজ যে শুদ্ধ খদ্দর কাপড়ের জোড়া ৫।৬ টাকা, অচিরেই উহার মূল্য ৪ সওয়া ৪ টাকা হইবে। কিন্তু সে কেবল যদি টিঁকিয়া থাকা যায়, যদি খদ্দরের বহুল প্রচার হয়, চাহিদা বাড়ে। বেশী কাটিতে কাটিতে কাটুনির ও বেশী বুনিতে বুনিতে তাঁতির হাত দুরস্ত হইবে, সহজে অল্প পরিশ্রমে অনেক সূতা অনেক কাপড় হইবে, খাদির মূল্য কমিবে। এক বৎসরকাল সকলে অন্য সকল প্রকার বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র খাদি ব্যবহার করিয়া দেখুন, কি অবস্থান্তর হয়। ধিকি ধিকি করিয়া কোন রকমে খদ্দর চলিলে সস্তার দিক দিয়া সাফল্যলাভ করিবার আশা কম।

কেহ কেহ বলেন, খদ্দর মিহি হউক তবে পরিব। আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্ণপরিচয় না শিখিয়াই কি বিদ্যা-বাগীশ হয়? যে শিল্প অবহেলার, অজ্ঞতায় এবং অনেকাংশে বিদেশী বণিকসঙ্ঘের অত্যাচারে নষ্ট হইয়াছে, তাহা কি এক দিনেই পূর্ব্বের গৌরবান্বিত অবস্থায় উপনীত হইবে? তাহাও আবার মায়ামন্ত্র বলে হওয়া চাহি, কেন না, যতক্ষণ মিহি না হয়, ততক্ষণ ব্যবহার করিব না! যদি মোটা ব্যবহার না করি, তবে মিহি কেমন করিয়া পাইব? আমাদের মত নির্লজ্জ জাতি আর নাই। আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই। আর কোথায়ও এ দুর্দ্দশা দেখি নাই।

আত্রাইতে উত্তরবঙ্গ বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সবে মাত্র ২ মাস হইল খদ্দর-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। তথায় কর্ম্মীরা ঘাড়ে করিয়া চরকা লইয়া গ্রামবাসীদের বাড়ী বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেছে, আবার তুলা দিয়া সূতা লইয়া আসিতেছে। অধিকাংশ কাটুনীই আমাদের কর্ম্মীদের নিকট সূতা কাটা শিখিয়া তবে তুলা লইয়াছে। এই ২ মাসের চেষ্টায় কাঁচা হাতের সূতায়, কাঁচা তাঁতির বুননে কি রকম কাপড় হইয়াছে, একবার দেখিবেন। ঢাকাই মসলিন, যাহা দেখিয়া রোম সম্রাটরা বিস্মিত হইতেন, যাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষে রত্নবর্ষণ হইত, সেই মসলিন লুপ্ত হইয়াছে। সে তুলার গাছ শুদ্ধ লুপ্ত। কেহ বলেন, অমুক কার্পাস হইতে সেই মসলিনের সূতা হইত; আবার কেহ বলেন, তাহা ঠিক নহে। কি দুরদৃষ্ট—কয়েক বৎসরের মধ্যে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্প এমন নির্ম্মূল হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে যে, তাহার চিহ্নমাত্র নাই—এখন তাহা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বিষয় হইয়াছে! আমা-দিগকে বিদেশীরা যাহা শিখাইয়াছে, তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া আমরা কুরুচিগ্রস্ত হইয়াছি। বিলাতী কল-ওয়ালা কেবল মাত্র সূক্ষ্ম সূতার কাপড়েই প্রতিযোগিতা করিয়া তিষ্ঠিতে পারে—মোটা সূতার পারে না—আর তাহা-দেরই শিক্ষা আমাদের শিক্ষিত লোকের রুচি এমন বিকৃত করিয়াছে যে, ঢাকা ও টাঙ্গাইলের তাঁতিরা অহঙ্কারের সহিত বলে যে, তাহারা ৯০ নম্বরের চাইতে মোটা সূতায় হাত দেয় না!

সে দিন কলিকাতার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্বৎসমাজের অগ্রগণ্য ভদ্রলোকের সহিত কার্য্য উপলক্ষে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স ৭০ পার হইয়াছে। তিনি একখানা ফিনফিনে কাপড় আর ততোঽধিক হাল্কা

চাদর পরিয়া বাহির হইলেন। শ্রেষ্ঠ ও গণ্য ব্যক্তির যদি এই রুচি হয়, তবে ইতরসাধারণের নিকট কি আশা করা যায়! আরামপ্রিয় বিলাসে নিমজ্জিত আমাদের দেশের বুদ্ধিমানরা জিজ্ঞাসা করেন, "দেশের জন্য আর কি করিব?" আমি বলি, "কি করিয়াছ? খদ্দর পর, পরাও! গ্রামে যাও, চাষবাস করিয়া খাও।" তাহা নহে; কেবল শুনি, সহরে থাকিয়া আমি এম্ এ পাশ করিয়াছি, আমি বি এ পাশ করিয়াছি, চাকুরী চাই। আবার অভাবের তাড়নায় চাকুরী না পাইয়া আত্মহত্যা করার সংবাদও শুনা যায়। যাহাদের এত অভাব এত দুঃখ তাহারা অভাবমোচনের জন্য আরও অভাব বাড়াইবার চেষ্টায় রত! কেবল চাকুরী-লিপ্সায় মরিতে বসিয়াও হুঁস নাই! তবু কাহারও কাহারও রুচি-পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রদর্শনীতে দেখা যায়, সুন্দর ছাপ করা কাপড় আমাদের যুবকরা নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছেন। খাদি ব্যবহার করিয়া ইহাদিগকে একটু উৎসাহ দিলে আবার বাঙ্গালা ধনে ধান্যে পূর্ণ হইবে।

রাজসাহীর বন্যাপীড়িত অঞ্চলের নসরৎপুর, তালোড়া প্রভৃতি স্থানে এবারও অজন্মা হইয়াছে। আমি অল্পদিন পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি, বৃষ্টির অভাবে ধান নষ্ট হইতেছে। ঐ সকল স্থানে অভাবগ্রস্ত লোকরা চরকা লইতেছে। আমার সহিত ৭০।৭২ বৎসর বয়স্কা দুই বৃদ্ধার সাক্ষাৎ হইল, তাহারা ৫০ বৎসর পরে আবার চরকা হাতে লইয়াছে।

এক জন ১৩।১৪ নম্বরের সূতা এক সপ্তাহে ৬০ তোলা কাটিয়া ১৫ আনা উপার্জ্জন করিয়াছে এবং বলিল, পরের সপ্তাহে ১ সের সূতা কাটিয়া ১ টাকা ৪ আনা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। উহাদের সঙ্গে উহাদের নাত্নীরাও সূতা কাটিতেছিল। তাহারা সপ্তাহে ৮ আনা রোজগার করে। আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয় কত সামান্য! রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, বৎসরে ২৪৲ টাকা, আর লর্ড কার্জ্জন অনেক হিসাবাদি করিয়া দেখাইয়াছেন, অত কম নহে, তবে বার্ষিক আয় ৩০৲ টাকা বটে। অর্থাৎ মাসিক আয় আড়াই টাকা। দিন প্রতি ৫ পয়সা। যদি দিন প্রতি সওয়া তোলা করিয়া সূতা কাটা যায়, আর সওয়া পয়সা মজুরী পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আয় শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে বাড়ে। আর এক দিক্ দিয়া দেখুন, ৫ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে ১ কোটি বাঙ্গালী যদি সূতা কাটিতে মনস্থ করে, আর প্রতিদিন ২ পয়সার সূতা কাটে, তবে মাসে ১৲ টাকা উপার্জ্জন লোকপ্রতি হয়। আর বাঙ্গালা দেশে ইহা হইতে মাসে ১ কোটি ও বৎসরে ১২ কোটি টাকার কাপড় হয়। যদি দৈনিক এক আনার সূতা কাটা হয়, তবে বৎসরে ২৪ কোটি টাকা উপার্জ্জন হয়। এ কি বড় সাধারণ কথা? ইহাতে ন্যায়ের মারপেঁচ নাই, ফাঁকির হিসাব নাই। বাঙ্গালার এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শতকরা ৯৫ জন চাষী। এই চাষীদের মেয়েদের মধ্যে অর্দ্ধেক মেয়েও যদি দৈনিক ২ তোলা সূতা কাটে, তবে বৎসরে ৫০ কোটি টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে; অর্থাৎ ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ও মিলের বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিজেরা ত বস্ত্রপ্রয়োজন মিটাইতে পারেই, উপরন্তু রপ্তানীও করিতে পারে। বিলাতী কাপড় ও মিলের কাপড় ব্যবহার করিয়া কেবল মুখে চালাকী করিয়া হিসাব চাওয়া হয়, সমালোচনা করা হয়, খাদি চলা অর্থনীতিক হিসাবে (economically) সম্ভব নহে! আমি বলি, আগে খাদি পর, বুঝিতে চেষ্টা কর, পরে তর্ক করিও। কেনা-বেচায় খাদির হিসাব ছাড়া বাড়ীর সূতার কাপড় পরিবার কথাই আসল। তাহা অবশ্য সহরবাসী লোকদের পক্ষে খাটে না। কিন্তু সহরবাসী সকলকেই বাদ দিলেও ১ শত লোকের মধ্যে গ্রামে ৯৫ জন থাকিয়া যায়। এই ৯৫ জনের ত প্রত্যেকের একটু ভিটা আছে। নিজের আবশ্যক তুলা জন্মাইয়া সূতা কাটিয়া লইলে অঙ্কের হিসাবের ধার দিয়াও যাইতে হয় না; কেন না, মাত্র তাঁতির মজুরীতে কাপড় পাওয়া যায়। অবশ্য আজকার অবস্থা ইহার বিপরীত। সহর হইতেই ফ্যাসান যাইয়া এই ৯৫ জন চাষীকেই বিলাতী পরাইয়াছে। আজ খাদি প্রচলনের চেষ্টায় এই সহরের ৫ জনকেই অগ্রণী হইবার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। তাঁহারা চেষ্টা করিয়া ও পথিপ্রদর্শক হইয়া তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে সাহায্য দিয়া দুধের শিশু খাদিটিকে পুষ্ট করিয়া তুলুন; তাহার পর সে অবাধে ৯৫ জন গ্রামবাসীর কুটীরে কুটীরে সবল সন্তানের দুর্জ্জয় শক্তিতে বিচরণ করিবে; ৯৫ জন তাহাকে বুকে তুলিয়া লইবে—

তাহার ভীম ও রিপুদমন রূপে ভারতবাসী ধন্য হইবে—জগতে নূতন আদর্শ স্থাপিত হইবে।

বাঙ্গালাদেশের অনেক স্থানেই একটা মাত্র ফসল হয়। চাষীরা যদি ৪ মাস কায করে, তবে বাকী ৮ মাস এক রকম হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে। ফসল যদি ভাল হইল, তবে তাহাদের খাওয়া চলে। তাহারা মহাজনের কাছে, জমীদারের কাছে ঋণে বাঁধা। ইহার উপর যদি অজন্মা হইল, তবে একেবারে মৃত্যু। চাষবাসে সুজন্মা-অজন্মা আছেই ; তাহার পর ইদানীং আবার তূলায় ও পাটে বড়-লোকদের খেলার উপর দর উঠে নামে বলিয়া প্রকৃতির খেয়াল ছাড়াও একটা অনিশ্চয়তা প্রবেশ করিয়াছে। পাট ভাল হউক, মন্দ হউক, বেশী-কম হউক, তাহার সহিত পাটের এবং তূলার দরের কোনও সম্পর্ক নাই। যখন অজন্মা বা ফাটকাখেলার (speculationএর) ফলে চাষী প্রত্যাশিত অর্থ পায় না, তখন সে একেবারে মরে। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি, তখন তাহারা ঘাসপাতা, ঘাসের বীজ এই সব অখাদ্য-কুখাদ্য খাইতে বাধ্য হয়। ইহাদের ঘরে ঘরে যদি চরকার অনুষ্ঠান থাকিত, তবে ইহারা প্রত্যেকে প্রতি-দিন ২।১ আনা রোজগার করিতে পারিত, অথবা নিজের শ্রমেই নিজের অন্নবস্ত্রাভাবটা মিটাইতে পারিত। এখন শস্য না জন্মিলে যেমন অন্নহীন হয়, তেমনই বস্ত্রহীনও সঙ্গে সঙ্গে হয়। লজ্জানিবারণে অক্ষম নারীর উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ এই হতভাগ্য দেশেই সম্ভব। কিন্তু হাতে চরকা থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি দুঃখ ঘটিবার কারণ থাকে না। প্রত্যেকে ২।১ আনা রোজগার করিলে তাহাতেই খাইয়া বাঁচিতে পারে। এক জিলায় অজন্মা হইলে অপর জিলা হইতে ধান আসিয়া পড়ে, ধানের দর তত বাড়ে না, কেবল পয়সার অভাব হয়। আর চরকায় ২।৪ পয়সা রোজগার করিলেই বাঁচিয়া যাইতে পারে, ইহা ত আমার নিকট বড়ই সোজা বলিয়া ঠেকে। এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া চরকার সঙ্গে কলের তুলনা করা হয়। মিল ত গ্রামে গ্রামে অর্থ পৌছাইয়া দিতে পারে না। এই কলি-কাতায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী মিলের কথা ধরুন। বজবজ হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত যত চট্‌কল, সেই ৭০।৭২টি কলই বিদেশীর হাতে। ধরুন, নিজেরাই না হয় মিল বসাইলাম, কিন্তু মিলের সম্পর্কে প্রচুর সামাজিক অনিষ্ট ঘটিবে—মদের দোকান, কাবুলিওয়ালা, নষ্ট নারী, কুৎসিত ব্যাধি এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন মিলের উপকণ্ঠে গড়িয়া উঠিবে, মানুষ একেবারে অমানুষ হইবে। ভাড়া গাড়ীর ঘোড়া যেমন অতি-রিক্ত পরিশ্রমের পর ছাড়া পাইলে একবার ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া উঠে, মিলের শ্রমিকরাও তেমনই ছুটীর পর পাপের পঙ্ক গায় মাখে। হিসাব করিলে দেখা যায়, যদি বাঙ্গালার সমস্ত কাপড় মিলেই হইত, তাহা হইলে ২।৩ লক্ষ কুলী-মজুর কর্ম্ম পাইত। তাহাদের শতকরা একটি দুইটি মাত্র বাঙ্গালী, আর বাকী সবই অবাঙ্গালী। আর আমাদের মিল গড়িবার সাধ্যই কি আছে? এক বঙ্গলক্ষ্মী সবে ধন নীলমণি! কই, আর ত হইল না! আর যদি মিলই হয়, তাহা ম্যাঞ্চেষ্টারওয়ালারা আসিয়াই করিবে। কিন্তু এ সমস্ত আলোচনা নিরর্থক। চরকা যে নিরন্নের অন্ন দিবে—বস্ত্রহীনের বস্ত্র দিবে, মিল সেখানে পৌছিতেই পারিবে না। চরকার সূতার প্রস্তুত কাপড় যেখানে প্রস্তুত হইবে—সেইখানেই ব্যবহৃত হইবে। ব্যবসায়ীর হাতে হাতে ঘুরিয়া মিলের কাপড়ের দর যেমন বাড়িতে বাড়িতে চলে ; খাদিপ্রতিষ্ঠান পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহার আদৌ সম্ভা-বনা থাকিবে না।

কোন স্বাধীন জাতি যখন আত্মস্থ হয়, তখন তাহাদের বাধা-বিঘ্ন উৎরাইবার পথ আপনিই সম্মুখে উপস্থিত হয়। ফরাসী-বিপ্লবের দিনে ফ্রান্স ইংরাজ নৌবাহিনীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সেই সময়, ফরাসীদের যে চিনি জামেকা হইতে আসিত, উহার আমদানী বন্ধ হইয়া যায়। ফরাসী সাধারণ তন্ত্র হইতে ঘোষণা করা হয় যে, দেশপ্রীতির বশবর্ত্তী হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ যেন দেশে উৎপন্ন উদ্ভিদের মধ্য হইতে চিনি প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবন করে। ফলে বিট হইতে চিনি প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তাহার পর দেশের এই শিল্পটির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য সরকার হইতে এবম্প্রকার ব্যবস্থা হয় যে, যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিট চিনি বিদেশে রপ্তানী করে এবং তথাকার চিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতার ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম দামে বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহার যাহা লোকসান হইবে, তাহা 'ষ্টেট' পূরণ করিবে। ইক্ষুরসের চিনির সহিত বিট চিনির প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই এই নূতন শিল্পটি রক্ষার জন্য ফরাসী ও অপরাপর দেশে এই ব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট

বিদেশীর হাতে বলিয়া আমাদের দেশীয় শিল্প উন্নতির চেষ্টা রাজশক্তি হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই। বরং বাধা প্রাপ্তিরই সম্ভাবনা। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলপ্রস্থত বস্ত্রাদি বিক্রীত হইয়া যাহাতে ম্যাঞ্চেষ্টারে শ্রমিকরা বেকার না বসিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই সজাগ। বিদেশী বস্ত্র যাহাতে এ দেশে না আইসে, সে চেষ্টা করা দূরের কথা, যাহাতে এ দেশের প্রস্তুত বস্ত্রাদি বিলাতীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারে, তজ্জন্য শুল্ক বসান আছে। বৃটিশ শাসনের প্রথম সময়ে ঘরে ঘরে যে তাঁত চলিত, কর্ণাট অঞ্চলে তাহার উপরেও টেক্স বসিয়াছিল। এমনই করিয়া তাঁত, চরকা ধ্বংস করা হইয়াছে। তাঁত-চরকার পুনঃপ্রচলনে যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় এ দেশে আসা বন্ধ হয়, তবে ভারতের শাসনকর্ত্তারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে যখন কোন সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন এই জীবন-সমস্যার অন্যতম প্রধান সমস্যা খাদি বস্ত্রসমস্যার পূরণ নিজেদেরই করিতে হইবে। দেশবাসীকে দৃঢ়সংকল্প হইয়া বলিতে হইবে যে, আমরা বস্ত্রশিল্পের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিব। এই সঙ্কল্প করিলে আজ যে খাদির দাম ৫৲ টাকা—অল্পদিনেই তাহা ৪৲ টাকা হইয়া যাইবে। কিছুদিন অপেক্ষা করুন, এক বৎসর সকলেই খাদি ব্যবহার করুন, তাহা হইলেই দেখিবেন যে, খাদি সহজলভ্য এবং উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

খদ্দরের অনেক অসুবিধার কথা শুনিয়া থাকি। বর্ষা-কালে খদ্দর শুকায় না। আমি বলি, বর্ষাকাল ত বৎসরে দুই তিন মাস। সে দুই তিন মাস না হয় কিঞ্চিৎ অসুবিধাই ভোগ করিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ভারী; কেহ বলেন, মোটা। ভারী হাল্কা অভ্যাসের কথা। এই আমি ত দুর্ব্বল। আমি যে মোটা খদ্দর ব্যবহার করি, তাহাতে ত কিছুই অসুবিধা বোধ করি না। শীতাতপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্যই ত বস্ত্রের ব্যবহার। শীতে গ্রীষ্মে মোটা কাপড়ই ত ভাল; যেমন টেঁকে, তেমনই আবরণ করে। আর একটা দিক দিয়া দেখিবেন, যে পরিবারে সদর দরজা দিয়া খদ্দর প্রবেশ করিয়াছে, সেই পরিবারের বহু প্রকারের বিলাতী বিলাসিতা খিড়কীদ্বারপথে প্রস্থান করিয়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতে আমাকে তথাকার প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। তথায় কোন বিখ্যাত ধনী ভাটিয়া বণিকের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহাদের চালচলন সাদা-সিধা। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে তাঁহারা বোম্বাইয়ের পার্শী বণিকদের অনুকরণে বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন ও সাজসজ্জায় বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। কিন্তু মহাত্মাজী যখন খদ্দর প্রচার করিলেন, তখন হইতে তাঁহারা বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছেন—আর এখন দেখিতেছেন, বিদেশী বস্ত্রের সহিত অনেক বিদেশী বিলাসের উপকরণ বিনা চেষ্টায় অজ্ঞাতসারে বর্জ্জন করিয়াছেন। চিন্তা করুন, এই জন্য ভারতবর্ষের কত যুবক গৃহত্যাগী হইয়া মহাত্মার আদর্শ গ্রহণ করিয়া এই শিল্প পুনরুদ্ধার করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে অনশনক্লেশ পর্য্যন্ত সহ্য করিয়া নীরবে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন।

কেহ বলেন, খদ্দর ভারী—অথচ অলষ্টার ও ধড়া-চুড়া হ্যাট্ কোট ব্যবহারে আপত্তি হয় না! এ সব কথা কেবল বাঙ্গালীর মত চতুর জাতির মুখেই শোভা পায়। যতক্ষণ না দেশের ধনদৌলত বিদেশীর হাতে সমর্পণ করিয়া একেবারে অনাবৃত শরীরে ভূমিশয্যা লইব, ততক্ষণ আমাদের সোয়াস্তি নাই—আমাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যের আস্ফালন শেষ হইবে না। এই পাণ্ডিত্য আমাদিগকে ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভ করিয়া ইংরাজের বাহ্যাচরণ নকল করিতে এবং তাঁহাদের বাঁধা বুলি কপচাইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। মহাত্মাজী গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কত লিখায় কত বক্তৃতায় খদ্দর প্রসঙ্গ বিচার করিয়া দেখাইয়া-ছেন যে, খদ্দর আমাদের বাঁচন-কাঠি—খদ্দর আমাদের দেশাত্মবোধের প্রতীক। খদ্দর ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই। কুতর্কের দ্বারা খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা মীমাংসা হইবে না। আমার এখনও আশা হয় যে, বাঙ্গালী এবং ভারতবাসী আজ হউক, কাল হউক, খদ্দর গ্রহণ করিবেই —তবে যত শীঘ্র হয় তত শুভ। খদ্দর যে বাঙ্গালার যুবক-দের অঙ্গের ভূষণ এখনও হয় নাই, তাহার অন্যতম কারণ —আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বাসপ্রবণ। খদ্দরের জন্য প্রথম প্রথম যে দৈনন্দিন দুঃখ এবং ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে, উহাতে আমরা পরাঙ্মুখ। অথচ নিমিষের উত্তেজনায় গভীরতর দুঃখ বরণ করিয়া লইতে অনেক সময় আমরা পশ্চাৎপদ

নহি! আজ যদি গোলদিঘীর মঞ্চ হইতে বাছা বাছা কথায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া যায়, তাহা হইলে হয় ত হাজার যুবক পাওয়া যাইবে, যাহারা খুব একটা দুঃসাহসিক কাযের জন্য তন্মুহূর্ত্তেই আগুয়ান হইবে—সে জেলে যাওয়াই হউক আর নদীতে ঝাঁপ দেওয়াই হউক। কিন্তু দিনের পর দিন অল্প পরিমাণ ত্যাগ করিতে আমরা অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের এই জাতিগত দৌর্ব্বল্য দূর হইবে। এককালে বাঙ্গালীকে ভীরু বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইত, আমাদের যুবকরা সে অপবাদের কলঙ্ক মুছিয়া দিয়াছে। আমি সেই যুবকদলের দিকেই ফিরিয়া বলি—তোমরা নিত্যই কিঞ্চিন্মাত্র ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিয়া লও। শিশু খাদিটির প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া ইহাকে লালনপালন করিবার ভার গ্রহণ কর। প্রহ্লাদের মত অমিতবিক্রম এই শিশু—ইহাকে বধের চেষ্টায় স্বদেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিও না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

রেডিং-নেহেরু সংবাদ

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

চণ্ডীদাসের রাধা

চণ্ডীদাসের রাধা সংস্কৃত মহাকবিদিগের নায়িকার মত নহেন, তাঁহার কথা পড়িলে তাঁহাকে নিতান্ত চেনা চেনা মনে হয়, পূর্ব্বে এ দেশে যেমন কিশোরী দেখিতে পাওয়া যাইত, অনেকটা সেই রকম, সেই ভূতে পাওয়ার কথা, নাতনী সম্বন্ধে ডাকিবার কোন বৃদ্ধা, সঙ্গোপনে সাক্ষাৎ সম্ভাষণের জন্য মাধবের নানা বেশ ধারণ, সবই আছে। সেই সঙ্গে রাধার প্রকৃত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত আছে। রাধাকে আকুল ও মাঝে মঝে মূৰ্চ্ছিত দেখিয়া—

কেঁহ কহে মাই ওঝা দে ঝাড়াই
রাইয়েরে পেয়েছে ভুতা।
কাঁপি কাঁপি উঠে কহিলে না টুটে
সে যে বৃষভানুসুতা॥
রক্ষা মন্ত্র পড়ে নিজ চুলে ঝাড়ে
কেহ বা কহয়ে ছলে।
নিশ্চয় কহি যে আনি দেও এবে
কালার গলার ফুলে॥
পাইলে সে ফুল চেতন পাইয়া
তবে উঠিবেক বালা।
ভূত প্রেত আদি ঘুচিয়া যাইবে
যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥

যিনি রাধাকে নাতনী বলিয়া সম্বোধন করেন, তিনি বলিতেছেন,—

সোণার নাতিনি কেন
আইস যাও পুনঃ পুন
না বুঝি তোমার অভিপ্রায়।
সদাই কাঁদনা দেখি
অঝরু ঝরয়ে আঁখি
জাতি কুল সকল পাছে যায়॥
যমুনার জলে যাও
কদমতলার পানে চাও
না জানি দেখিলা কোন জনে।
শ্যামল বরণ হিরণ পিঁধন
বসি থাকে যথন তথন
সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥
ঘরে আসি নাহি থাও
সদাই তাহারে চাও
বুঝিলাঙ তোমার মনের কথা।
এখনি শুনিলে ঘরে
কি বোল বলিবে তোরে
বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অথবা বিদ্যাপতিতে রাধার যে চিত্র আছে, সে একেবারে অন্যরূপ। প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিলে চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সমসাময়িক অথবা অপর কবির তুলনা করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। চণ্ডীদাসের আদর্শ তাঁহার নিজের, রাধার কল্পনা তাঁহার নিজের, আর কোন কবির কাছে তিনি কিছু গ্রহণ করেন নাই। তবে ভাষা ও ভাবের কথা স্বতন্ত্র। চণ্ডীদাসের ভাষায় ও উপমায় অনেক স্থানে বিদ্যাপতির আভাস আছে। রাধার রূপবর্ণনা করিতে মাধব বলিতেছেন,—

হিয়ার মালা যৌবনের ডালা
পসারী পসারল যেন।
চাকুতে কাটিয়া চাক যে করিয়া
তাহাতে বসাইল হেন॥

এ উপমা চণ্ডীদাসের নিজের, সহজ চক্ষুতে যাহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেক স্থলে হয় বিদ্যাপতির ভাষা, না হয় বিদ্যাপতির অনুকরণ—

অঙ্গের বসন ঘুচায় কখন
কখন ঝাঁপয়ে তাই।

বিদ্যাপতির পদে আছে,—

কবহু ঝাপয় অঙ্গ কবহু উঘারি।

কুচের বর্ণনায় চণ্ডীদাস কয়েক স্থানে 'কনক কটোরি' লিখিয়াছেন,—

কুচ যে মণ্ডলি কনক কটোরি
বনালে কেমন ধাতা।

* * * *

কুচ যুগ গিরি কনক কটোরি
শোভিত হিয়ার মাঝে।

বিদ্যাপতির অনেক পদে কনক কটোরি পাওয়া যায়—

একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।

এক এক স্থানে চণ্ডীদাসের রচনা অবিকল বিদ্যাপতির রকম,—

গলার উপর মণিময় হার
গগন মণ্ডল হেরু।
কুচ যুগ গিরি কনক গাগরী
উলটি পড়ল মেরু॥

চণ্ডীদাসের প্রতিভা অথবা মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সংশয় হইতেই পারে না বলিয়া এ কথা পূর্ব্বে হইতে জানিয়া রাখা ভাল যে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির প্রভাব একেবারে ছাড়াইতে পারেন নাই ও তাঁহার রচনায় তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের নিজের আঁকা ছবির তুলনা নাই।—

পথে জড়াজড়ি দেখিনু নাগরী
সখীর সহিত যায়।
সকল অঙ্গ মদন তরঙ্গ
হসি বদনে চায়॥

* * * *

শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কে ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপরে পা॥

* * * *

সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥

* * * *

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

চণ্ডীদাস তাঁহার রাধাকে শাড়ী পরাইয়াছেন, বেশের এই স্বাতন্ত্র্যই চণ্ডীদাসের রাধার স্বাতন্ত্র্য। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কবি রাধার অঙ্গে শাড়ী দেন নাই। জয়দেব বাঙ্গালী, চণ্ডীদাসের অনেক পূর্ব্বের কবি, কিন্তু তিনি শাড়ীর উল্লেখ করেন নাই, 'চল সখি কুঞ্জং সতিমির-পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং'। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি, চৈতন্যদেবের ভক্ত। তিনিও শাড়ীর উল্লেখ করেন নাই; 'মাথ আধ পর রহল নিচোল'। নিচোল চুনরী, ঘাঘরা। বেশের প্রভেদ বড় সামান্য মনে হয়, কিন্তু এই কথা মনে রাখিলে চণ্ডীদাসের আদর্শে ও অপর কবিদের আদর্শে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ রমণী বেশের বা জাতির গণ্ডির ভিতর রাখা যায় না, কিন্তু শাড়ীপরা ও ঘাঘরাপরা স্ত্রীলোকের আচারে ব্যবহারে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্য চণ্ডীদাসের রাধায় দেখিতে পাওয়া যায়। জটিলা কুটিলা পূর্ব্বপরিচিতা, কিন্তু রাধিকাকে নাতিনী বলিয়া ডাকেন, এমন ঠান্‌দিদির অবতারণা অপর কোন কবি করেন নাই। সেই রকম কোন বর্ষীয়সী মাধবের গুণের পরিচয় পাইয়া ভৎর্সনা করিয়া কহিতেছেন,—

নিতি নিতি এসে যায় রাধা সনে কথা কয়
শুনিয়েছিলাম পরের মুখে।
মনে করি কোন দিনে দেখা হবে তার সনে
ভাল হইল দেখিলাঙ তোকে॥
চেট্রে নেট্রে যায় জলে তারে তুমি ধর চুলে
এমত তোমার কোন রীত।
যার তুমি ধর চুলে সেই এসে মোরে বলে
নহিলে নহিতাম পরতীত॥

বুড়ীর মিথ্যা কথা, কেন না, রাধা কিংবা কোন সখী তাহার কাছে কোন নালিশ করে নাই, কিন্তু এ রকম বুড়ী

চণ্ডীদাসের কালেও দেখা যাইত, এখনও দুর্লভদর্শন নয়। এইরূপ একটি চরিত্র-কল্পনা আর কোন কবি করেন নাই। রাধার আদর্শের জন্ত চণ্ডীদাসকে নিজের দেশের বাহিরে যাইতে হয় নাই।

পাপ ননদিনী আর এক পর্দ্দা গলা চড়াইয়া নিজের সতীত্বের স্পর্দ্ধা করিয়া রাধাকে গঞ্জনা করিতেছে,—

আইসহ শ্যামসোহাগিনি।
রাধা বিনোদিনি তোমারে বলিতে কি
চাই দুই তিন কথা যে কথা তোমার
বড়ই শুনিয়াছি॥
তুমি কোন দিনে যমুনা সিনানে
গিয়াছিলা না কি একা।
শ্যামের সহিতে কদম্বতলাতে
হৈয়াছিল না কি দেখা॥
সেই দিন হৈতে সেই ত পথেতে
করে না কি আনাগোনা।
রাধা রাধা বলি বাজায় মুরলী
তাহে হৈল জানা শুনা॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
তা সঞে কহিতে কথা।
বেঁশ ছিঁড়ি বেশ দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥
* * * *
গোকুল নগরে গোপের মাঝারে
এত দিন বসি মোরা।
কভু না জানিনু কভু না শুনিনু
শ্যাম কাল কি গোরা॥

রাধার সঙ্গে বিরলে সম্ভাষণের আশায় অথবা তাঁহার মানভঞ্জনের নিমিত্ত বহুরূপীর ন্যায় মাধবের বিবিধ বেশ ধারণ করা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি দুই কবির পদাবলীতেই পাওয়া যায়। মাধব নাপিতানী সাজিয়া রাধাকে কামাইয়া দিতেছেন,—

করে নখরঞ্জনী চাঁকয়ে নখের কণি
শোভিত করিল যেন চাঁদে।
আলসে অবশ প্রায় ঘুম লাগে আধ গায়
হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥

শারদ পূর্ণিমায় নিকুঞ্জের শোভা,—

শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকশিত তথি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরু কুল ডাল ফুল ভরি ভাল
সৌরভে পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগ মনোলোভা
ভুলিল নাগর রায়॥

যে বংশীধ্বনি আচম্বিতে রাধার শ্রবণে প্রবেশ করিয়াছিল, অপর ব্রজাঙ্গনাদেরও কর্ণকুহর দিয়া সে আহ্বান তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল,—

মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
* * * *
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
যেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥
* * * *
রাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করিছে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥

ব্রজতরুণীগণ উন্মত্ত হইয়া, কুললজ্জা ত্যাগ করিয়া যেখানে বাঁশী ডাকিতেছে, সেইখানে ছুটিল। কেহ বিভ্রম

সুপ্ত পতির পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া, কেহ সখীর সহিত গূঢ় রহস্য আলাপ বন্ধ করিয়া, কেহ দুধের কড়ায় জ্বাল দিতে দিতে, কেহ কোলের শিশু মাটিতে ফেলিয়া ছুটিল, মুরলী শুনিয়া কৃষ্ণমুখী হইয়া সকলে সব ভুলিয়া গেল ;—

সকল রমণী ধাইল অমনি
কেহ কাহা নাহি মানে।
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥

মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্ব ছাড়া আর কোথাও কৃষ্ণের বাল্যকালের কোন উল্লেখ নাই, হরিবংশে তাঁহার জন্ম ও বাল্যলীলার বিবরণ প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে লিখিত আছে, গোপিকাগণ পিতা-মাতা, ভ্রাতৃগণের নিবারণ না মানিয়া যামিনীসমাগমে কৃষ্ণানুসরণ করিত, কিন্তু বাঁশীর কোন উল্লেখ নাই। অসমাপিত কর্ম্ম ছাড়িয়া অসংবৃত অবস্থায় উপবনে গোপীগণের প্রবেশ ও তৎপরে রাসমণ্ডলে লাস্যগীত শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে এবং চণ্ডীদাস তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে,—

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥

প্রেমের আকুলতা, চঞ্চলতা, তন্ময়তা রাধাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল—

নৌকাতে চড়াঞা দরিয়াতে লৈঞা
ছাড়য়ে অগাধ জলে।
ডুবু ডুবু করি ডুবিয়া না মরি
উঠিতে নারি যে বুলে॥

* * * *

বল না কি বুদ্ধি করিব এখন
ভাবনা বিষম হৈল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল॥

* * * *

সখি রে মনের বেদনা কাহারে কহিব
কেবা যাবে পরতীত।
কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে
সদাই চমকে চীত॥

যখন তখন, যাহাতে তাহাতে সেই কালো রূপ মনে পড়ে ;—

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে॥
কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥

* * * *

কাল কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড় মনের মনোব্যথা।
যেখানে সেখানে যাই সকল লোকের ঠাই
কাণাকাণি শুনি এই কথা॥
সই লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদে না হেরি গো
ত্যজিয়াছি কাজরের সাধ॥

রাধার কলঙ্ক-রটনা হইলে তিনি বলিতেছেন, এমন অখ্যাতি কি আর কাহারও হয় না ?—

ধরম করম গেল গুরু গরবিত।
অবশ করিল কালা কানুর পিরীত॥
ঘরে পরে কি না বলে করিব হাম কি।
কেবা না করয়ে প্রেম আমি সে কলঙ্কী ?

* * * *

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না
প্রাণ আনচান বাসি।
কেবা নাহি করে প্রেম
আমি হৈলাম দাসী॥
গোকুল নগরে কেবা কি না করে
তাহে কি নিষেধ বাধা।
সতী কুলবতী সে সব যুবতী
কানু কলঙ্কিনী রাধা॥

কিন্তু এ ভাবকে রাধা মনে স্থান দিলেন না,—

বলে বলুক মোরে মন্দ আছে যত জন।
ছাড়িতে নারিব মুই শ্যাম চিকন ধন॥
সে রূপ লাবণ্য মোর হৃদয়ে লাগি আছে।
হিয়া হইতে পাজর কাটা লইয়া যায় পাছে॥

* * *

জাতি জীবন ধন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা॥
সই ছাড়িতে যদি বল তারে।
অন্তর সহিত সে প্রেম জড়িত
কে তারে ছাড়িতে পারে॥

* * * *

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে॥
কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতি কুল প্রাণ নিল বাঁশী॥

লোককলঙ্ক অসহ্য হইলেও রাধা কলঙ্ক ছাড়িতে চাহে না,—

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা।
শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥
এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি।
ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥
তেমতি নহিলে যার এমতি ব্যভার।
কলঙ্ক কলসী লইয়া ভাসিব পাথার॥

অনেক সময় রাধা স্বাভাবিক নায়িকার মত। শাশুড়ী, ননদ, পাড়াপড়সী সকলে তাঁহার পিছনে লাগিয়াছে, তিনি বা কত সহ্য করিবেন? একটি পদে প্রতিহিংসার মাত্রার কিছু বাড়াবাড়ি;—

বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥
গুরু পুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কালসাপিনী যেন তার বুকে খায়॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥

পরের কথা মনে না করিয়া চণ্ডীদাসের রাধা যখন নিজের প্রেম স্মরণ করেন, তখন তিনি নায়িকাশ্রেষ্ঠ;—

যদি হাম শ্যাম বঁধু লাগি পাউ
তবে সে এ দুখ টুটে।
আন মত গুণি মনের আগুনি
ঝলকে ঝলকে উঠে॥
পরাণ রতন পিরীতি পরশ
জুকিনু হৃদয় তুলে।
পিরীতি রতন অধিক হইল
পরাণ উঠিল চুলে॥

এই প্রীতি এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে, মিলনেও বিচ্ছেদ অনুভূত হয়—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

চণ্ডীদাসের ভাবের প্রসার অধিক নয়, কিন্তু প্রবাহ অত্যন্ত তীব্র। প্রেমে রাধাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে. তিনি নিখিল বিশ্বে প্রীতি ছাড়া আর কিছু চাহেন না—

পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব
তা বিনু সকলি পর॥

* * * *

পিরীতি সরসে সিনান করিব
পিরীতি অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
পিরীতে পরাণ দিব॥

অভিসারের অথবা বিরহের অধিকসংখ্যক পদ নাই। বর্ষা অভিসারের একটি পদ,—

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিয়ার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

মাথুরের পদে,—

কালি বলি কালা গেল মধুপুরে
সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা
তাহারে কেমনে রাখি॥

জোয়ারের পানী নারীর যৌবন
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব
যৌবন মিলন ভার॥

চণ্ডীদাসের প্রসাদে তাঁহার পর অনেক কবি এই উপমা এই ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। উপমা চণ্ডীদাসের অপেক্ষা অনেক পুরাতন, কিন্তু এমন ধারালো টিকলো বাঙ্গালায় এ উপমা প্রথমে এই দেখা যায়।

আর একটি পদ,—

সখি রে মথুরা মণ্ডলে পিয়া।
আসি আসি বলি পুন না আসিল
কুলিশ পাষাণ হিয়া॥
আসিবার আসে লিখিনু দিবসে
খোয়াইনু নখের ছন্দ।
উঠিতে বসিতে পথ নিরখিতে
দু আঁখি হইল অন্ধ॥

এ ভাব সম্পূর্ণ বিদ্যাপতির। তাঁহার পদে আছে,—

সখি মোর পিয়া।
অবহুঁ ন আওল কুলিশ হিয়া॥
নখর খোয়ায়লুঁ দিবস লিখি লিখি।
নয়ন অন্ধায়লুঁ পিয়া পথ পেখি॥

জ্ঞানদাস আরও পরের কবি। তিনিও এই ভাব গ্রহণ করিয়াছেন,—

পন্থ নিহারিতে নয়ন অন্ধাওল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখে কত ভেল॥

পরিশেষে আত্ম-অবদান। রাধা মাধবকে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন,—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

বিদ্যাপতির রাধাও শেষে বলিয়াছেন,—

বার বার চরণারবিন্দ গহি
সদা রহব বনি দসিয়া।

মাধবকে সব শেষে রাধা প্রকাশ করিতেছেন,—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন আন নাহি ভায়॥

* * * * *

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ব্যায়াম, ক্রীড়া ও সন্তরণ

মোহনবাগান ফুটবল খেলোয়াড় দল।

বাঙ্গালী-জীবনে এমন একটা যুগ আসিয়াছিল, যখন বাঙ্গালী বালক ও যুবক শারীরিক ব্যায়ামে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। ভাল ছেলের দল বলিতে শুধু অধ্যয়নশীল বালক ও যুবকদিগকেই বুঝাইত। যাহারা ব্যায়ামচর্চ্চার দ্বারা শরীরের শক্তিবৃদ্ধি করিত, অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন অথবা প্রতিবেশীর দল তাহাদিগকে 'সুনজরে' দেখিতেন না। আবহাওয়ার দোষেই এমন অবস্থা যে দেশে আসিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু বাঙ্গালী এখন বুঝিতে শিখিয়াছে যে, শুধু বিদ্যার্জ্জন করিয়া ভাল ছেলে হইলেই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করা চলে না। শরীরকে বলিষ্ঠ, ব্যায়ামপুষ্ট করিতেই হইবে। তাই আবার বাঙ্গালী বালক ও যুবকের দল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়ায় অবহিত হইয়াছে। অবশ্য, বাঙ্গালা দেশের 'কপাটি' প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া এখন দেশ হইতে প্রায় নির্ব্বাসিতই হইয়াছে। তৎপরিবর্ত্তে য়ুরোপীয় প্রণালীর ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ প্রভৃতি প্রচুর ব্যয়বহুল ক্রীড়ার আমদানী হইয়াছে; কিন্তু যুগের আবহাওয়াকে সকল সময় অতিক্রম করিয়া চলা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালী বালক ও যুবকের দল এরূপ ক্রীড়ায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া শরীরকে নানাভাবে পুষ্ট ও শ্রমসহিষ্ণু করিয়া তুলিতেছে, তাহা জাতির পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। শুধু উল্লিখিত ক্রীড়া নহে, সন্তরণ ও অপর নানাপ্রকার ব্যায়ামের প্রতিও বাঙ্গালী দিন দিন অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হইতেছে।

ফুটবল—বাঙ্গালী বালক ও যুবকের দল ফুটবল ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছে। বাঙ্গালার

প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড়ের দল—মোহনবাগান সে দিন বোম্বাই সহরে 'রেভার্স কাপের' খেলায় গোরাদলের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। 'ফাইনাল' পর্য্যন্ত তাহারা ক্রমান্বয়ে কয়েকটি শক্তিশালী ক্রীড়ানিপুণ গোরাদলকে ক্রীড়া-কৌশলে পরাজিত করিয়া অশেষ যশঃ অর্জ্জন করিয়াছিল। অবশ্য 'ফাইনালে' তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু নগ্নপদ যুবকের দল বোম্বাই-বাসীকে ফুটবল খেলার যে কৌশল দেখাইয়া আসিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইংরাজী সংবাদ-পত্রসমূহে মোহন-বাগানের খেলা সম্বন্ধে যে সকল নিরপেক্ষ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, খেলায় চরম সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও মোহনবাগানের উচ্চাঙ্গ ক্রীড়াকৌশলে বোম্বাইবাসী দর্শকের দল চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ফুটবলে শেষ জয়-লাভ করিতে না পারিলেও মোহনবাগান দলের কয়েক জন খেলোয়াড় দৌড়ের বাজিতে "লেস্লী-কাপ্" জিতিয়া আনিয়াছে। ইহা শুধু মোহনবাগান নহে—সমগ্র বাঙ্গালী-জাতির গৌরবের বিষয়। ফুটবল ক্রীড়াতে বাঙ্গালী যুবকদিগের কৃতিত্ব যেমন দিন দিন ফুটিয়া উঠিতেছে, তেমনই ব্যায়ামের অন্যান্য বিভাগের প্রতিও সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইতেছে।

লেসলী কাপ।

সন্তরণ—সন্তরণচর্চ্চা ভারতবর্ষে নূতন নহে। নদনদীবহুল ভারতবর্ষে সন্তরণবিদ্যা সকলেরই পক্ষে সে যুগে অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ভারতবর্ষে ইতিহাসচর্চ্চা ছিল না, সুতরাং প্রাচীন যুগের কোনও বিষয়ের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে পুরাণাদি পাঠ করিলে সন্তরণ সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, সে সময় নৌবিহার ও জলবিহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যে সন্তরণবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা যমুনাগর্ভ হইতে নন্দের জীবনরক্ষা ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যাবলীতেই প্রকাশ। সে ত বাল্যকালের কথা। তাহার পর যৌবনে দ্বারাবতীতে তিনি অনেক সময় সমুদ্রে জলবিহার করিতেন, তাহারও উল্লেখ পুরাণে আছে।

প্রাচীন যুগের কথা ছাড়িয়া ঐতিহাসিক যুগে আসিলেও দেখা যায় যে, মোগল সম্রাট বাবর অত্যন্ত সন্তরণপ্রিয় ছিলেন। তিনি প্রত্যহই সন্তরণের পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ নদনদীই তিনি সন্তরণ

আশুতোষ দত্ত।

যায়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তবে সে সময়ে ভারতবর্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সন্তরণ প্রতিযোগিতার কোন ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। য়ুরোপ ও আমেরিকায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকল প্রকার ব্যায়াম ক্রীড়া হইয়া থাকে। ক্লব বা গোষ্ঠী অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে ইদানীং বাঙ্গালী বালক ও যুবকগণ নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন কার্য্য না করিলে সে কার্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভবপর নহে। পাশ্চাত্য দেশের দেখাদেখি এখন সঙ্ঘবদ্ধতার উপকারিতা দেশবাসী অনুভব করিতেছেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে শিবপুরের নিকট গঙ্গায় নৌকাডুবি দুর্ঘটনার পর হইতেই বাঙ্গালা দেশে সন্তরণ-প্রতিযোগিতার বিশেষ চেষ্টা হয়। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে সন্তরণসমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়া পরবর্ত্তী কালে Calcutta Swiming and Sports Associationএর উদ্ভব হয়। এই সমিতির সভ্যগণের চেষ্টায় কলিকাতা সহরের বালক ও যুবকগণের মধ্যে সন্তরণপ্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতে থাকে। সহরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ক্রমে ক্রমে আরও কতিপয় সন্তরণগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়।

সুরেন সাধুখাঁ নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দে ৪ শত ৪০ গজ সন্তরণপ্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য সন্তরণকারীদিগকে পরাজিত করিয়া প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মুরারিলাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ষোড়শবর্ষীয় বালক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সন্তরণকারী সাধুখাঁকে ৮ শত ৮০ গজ সন্তরণে পরাভূত করে। বালকের এই সন্তরণনৈপুণ্য দর্শনে কলিকাতার বালক ও যুবকদলে একটা প্রচণ্ড উৎসাহের সঞ্চার হয়। অনেকেই তখন হইতে সন্তরণপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া উক্ত বিদ্যা অর্জ্জনে অবহিত হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে 'আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লব' দশহরার দিন গঙ্গায় সন্তরণ দিবার জন্ম সালখিয়া বাঁধাঘাট হইতে কলিকাতা বেণেটোলাঘাট পর্য্যন্ত আধমাইলব্যাপী সন্তরণ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে তেমন ভাবে যোগদান করে নাই। যাহা হউক, এই সময় হইতে দূর-সন্তরণের স্পৃহা অনেকের হৃদয়ে জাগ্রত হয় এবং গঙ্গায় সন্তরণ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ের জন্ম অনেকগুলি বালক ও যুবকের বিশেষ আগ্রহ জন্মে। কয়েক জন যুবক মাঝে মাঝে সাঁতার দিয়া গঙ্গা পার হইত

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।
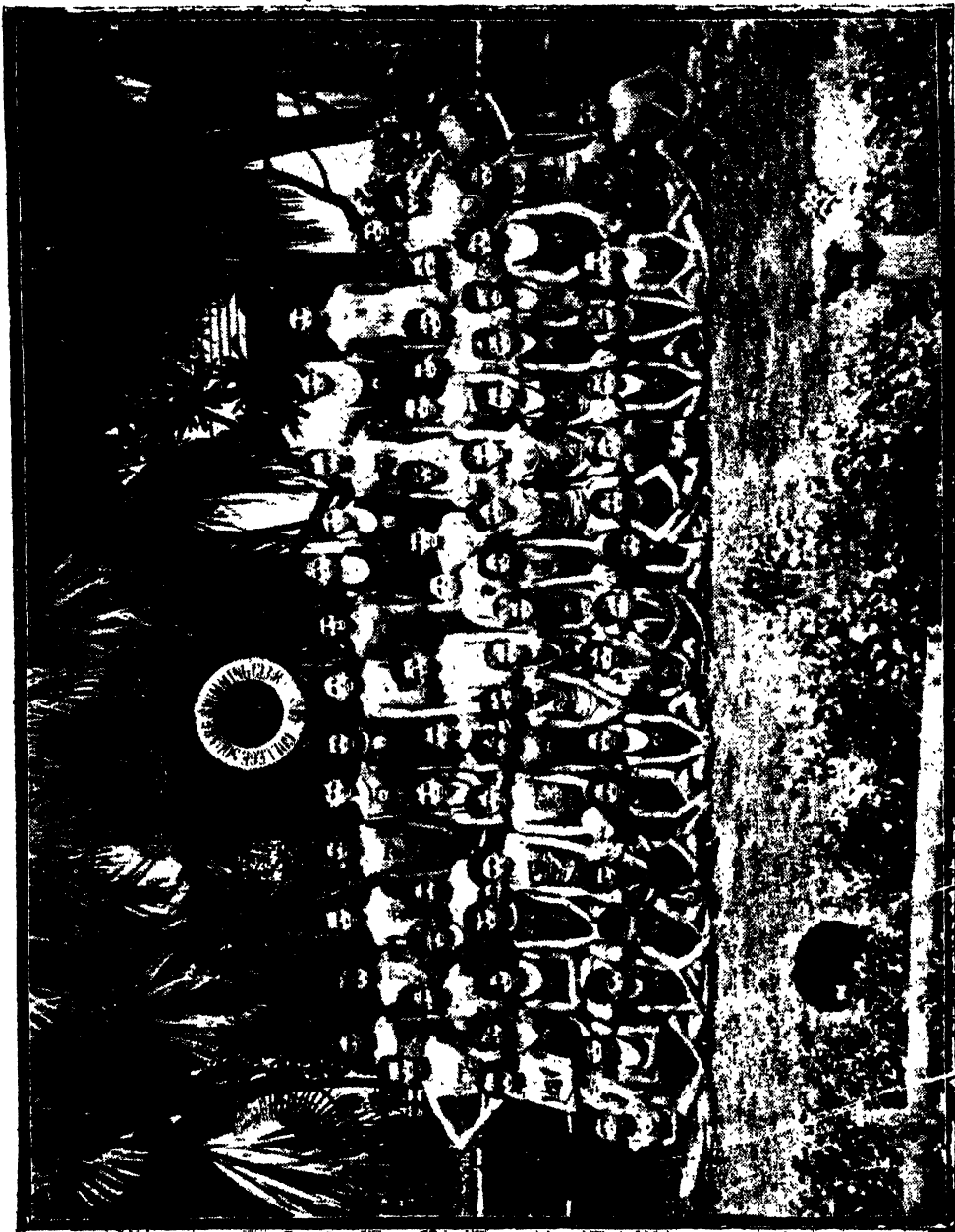
কলেজস্কোয়ারে সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় বালকবৃন্দ।

ঘটে, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সন্তরণের ব্যবস্থা তখনও উত্তমরূপে হয় নাই।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গায় দীর্ঘ সন্তরণপ্রতিযোগিতা করিবার জন্য কয়েক জন যুবক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েন। উত্তরপাড়া হইতে আহিরীটোলা, মাণিকবসুর ঘাট—৭ মাইল সন্তরণ করিয়া জয়লাভের জন্য যুবকদিগের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে ষোড়শবর্ষীয় বালক শ্রীমান্ আশুতোষ দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করে। এই দীর্ঘপথ. সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিতে ১ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় লাগিয়াছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে খড়দহ শ্যামসুন্দরের ঘাট হইতে আহিরীটোলা ঘাট পর্য্যন্ত ১৩ মাইল সন্তরণে শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। এই বালক সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লবের সভ্য। ইতঃপূর্ব্বে গোলদীঘিতে যে বাৎসরিক প্রতিযোগিতা হইয়াছিল, তাহাতে এই বালক এক মাইল, আধ মাইল, সিকি মাইল ও ২ শত ২০ গজ সন্তরণেও প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিগত ১২ বৎসরের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সন্তরণ-কৌশলের যে সকল দৃষ্টান্ত আছে, এই বালক অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইয়া অশেষ গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে।

বাঙ্গালী ইদানীং বৈজ্ঞানিক ভাবে সন্তরণবিদ্যার কৌশলগুলি আয়ত্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সন্তরণ-শিক্ষার বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়। নদনদীবহুল বঙ্গদেশে সর্ব্বক্ষণই মানব-জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। সন্তরণবিদ্যা জানা থাকিলে অনেক সময়ই উপকারে লাগে। শুধু ক্রীড়া হিসাবে নহে—দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার পথে সন্তরণ বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিহার্য্য। শুধু পুরুষ নহে, নারীর পক্ষেও এ বিদ্যা আলোচনার লাভ যথেষ্ট। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পল্লী-জীবনের কথা মনে পড়িলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। তখন দেখা গিয়াছে, বাঙ্গালী পল্লীনারীরা সকলেই অল্লাধিক সন্তরণে অভ্যস্তা ছিলেন। পল্লীর অন্দরস্থ পুষ্করিণীতে তাঁহারা সাঁতার দিতেন, তাঁহাতে অঙ্গচালনাও হইত, জলে জীবনরক্ষার একটা কৌশলও জানা থাকিত। এখন সহরবাসিনীদিগের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে, সহরে তাঁহাদের সাঁতার দিবার সুবিধা নাই—

পল্লীর পুষ্করিণীও ম্যালেরিয়া-বাষ্পদূষিত। তবে পূর্ব্ব-বঙ্গের রমণীরা এখনও সন্তরণবিদ্যা কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়া থাকেন। সে সুবিধা তাঁহাদের আছে।

ব্যায়াম—ব্যায়ামে বাঙ্গালীর অনেক কীর্ত্তি আছে। অবশ্য, লিখাপড়ায় ভাল ছেলের দল এখনও আশানুরূপ সংখ্যায় বলচর্চ্চায় অবহিত নহে সত্য, তথাপি শরীরপুষ্টির এ বিভাগেও বাঙ্গালীর দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইতেছে। য়ুরোপীয় প্রণালীতে বারের খেলা, তারের খেলা, নানাবিধ ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধে বাঙ্গালী শক্তিধর পুরুষের এইটুকু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সন্তানের দেহ বলিষ্ঠ না হইলে চলিবে না। ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়ামচর্চ্চার দিকে অনেকেই অবহিত হইতেছেন। জীবনসংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে গেলে বাঙ্গালীকে শক্তিধর হইতে হইবে। নবনীতকোমল দেহ লইয়া সভা প্রভৃতিতে শোভাবৃদ্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা চলে না।

বাল্যকাল হইতে দেহকে ব্যায়ামপুষ্ট করিয়া তুলিতে পারিলে উত্তরকালে সুদৃঢ় ও সুগঠিত দেহ লইয়া জীবন-

"বালক শিক্ষা সমিতি"র লাঠিখেলা শিক্ষা।

নাম করা যাইতে পারিলেও সাধারণ ভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচলন এখনও হয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যায়ামের প্রতি বালক ও যুবকগণের যেরূপ গভীর আগ্রহের কথা শুনা যায়, বাঙ্গালী ছাত্রগণের মধ্যে সেরূপ স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে ধীরে ধীরে অবস্থাপরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইতে দেখা যাইতেছে। বাঙ্গালী ছাত্রবর্গের অভিভাবকগণের অনেকেই এখন সংগ্রামে অনায়াসে জয়মুকুট লাভ করিতে পারা যায়। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া সংপ্রতি কলিকাতার "বালক-শিক্ষা সমিতির" পরিচালকবর্গ বালকদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বালকশিক্ষা সমিতি"র বালকগণ নিয়মিতরূপে 'ফ্রি হ্যাণ্ড-ড্রিল', 'গ্রাউণ্ড-ফিগার' প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ সুকুমারদেহ বালকগণকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা

দিয়া বলিষ্ঠ ও কৌশলী করিয়া তুলিতেছেন। বাল্যকাল হইতে নিয়মিত ভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে এবং সংযত জীবনযাপন করিতে পারিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারা যায়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা সহজ হইয়া উঠে, এ তত্বটি বাঙ্গালার নর-নারীকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

বাঙ্গালী দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন। "বালক শিক্ষা-সমিতি"র উদ্যোগীরা এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত হইয়া বালক শিক্ষার্থিদিগকে স্বাস্থ্যতত্বের এই মূল সত্যটি শিক্ষা দিলে উত্তর-কালে ঘরে ঘরে বলিষ্ঠ যুবার অভ্যুদয় ঘটিবে। প্রথম যৌবনে অনেকে ব্যায়াম করিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী যুবকগণ আর দেহের প্রতি ততটা মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। আলস্য ও অর্থনীতিসমস্যার চাপে অনেকের ব্যায়াম চর্চ্চার অবসর থাকে না, ইহা সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু বাল্যকাল হইতে নিয়ম শৃঙ্খলার অধীন হইতে পারিলে এই দৌর্ব্বল্যকে অনেকাংশে পরিহার করা অসম্ভব হয় না।

গুরুভার উত্তোলন।

পল্লীগ্রামে 'জিমনাষ্টিকের' আখড়া প্রভৃতি আছে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যদি পল্লীর বালকগণকে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তাহারা সুগঠিতদেহ ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। পল্লীবালকগণকে দেহ স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে অনুরূপ প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দেশমধ্যে নূতন হাওয়া বহিতেছে। এই সময় পল্লীসংস্কারকগণ যদি শক্তি-চর্চ্চা সম্বন্ধে সুকুমারমতি বালকগণকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাস্থ্যরক্ষায় অবহিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে প্রকৃতই দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন।

শক্তিমান্ পুরুষকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। সংযত শক্তি পুরুষ দেশের অনেক ভাল কায করিতে পারেন।

বাঙ্গালা দেশে এক কালে লাঠিখেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ ছিল। অভিজাত বংশীয় যুবকগণও এই ক্রীড়ায় যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেন। লাঠিখেলার ব্যায়ামে সর্ব্বাঙ্গ পরিচালিত হয়, দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। বাঙ্গালা দেশে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে লাঠিখেলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা সুব্যবস্থা সন্দেহ নাই। তবে সকল প্রকার ব্যায়ামের মূলে সংযমের প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থিগণকে সংযম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অগ্রণী ও পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এ আশা আমরা অনায়াসে করিতে পারি। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে প্রত্যেক বাঙ্গালীকে মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এখন বলিষ্ঠ নরনারীর প্রয়োজন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ
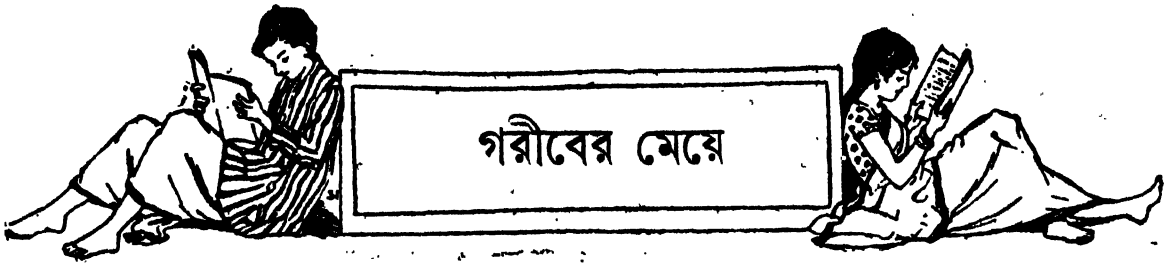
অতি কষ্টে গোপালের মুক্তিলাভ ঘটিল। প্রথমে এ সংবাদ সে ত বিশ্বাসই করিতে পারে নাই; পরে আনন্দে প্রায় মূর্চ্ছা যাইবার মত তাহার উপবাসক্লিষ্ট শরীর টলিয়া পড়িতেছিল। বাঁধনখোলা হাত দুইটা ঊর্দ্ধে তুলিয়া দরবিগলিত অশ্রুজলের মধ্য হইতে সে অস্ফুট ধ্বনিতে উচ্চারণ করিল—"তুমিই সত্যের!"

বাহিরে আসিয়া সে একটা জনরব শুনিতে পাইল যে, রায়বাড়ীর ভুবন রায় নাকি তাহার দিদিমণির কান্নায় গলিয়া বিস্তর পয়সা খরচ করিয়া তাহার উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন। আরও শুনিল, সেই ভুবন রায়ের,এক জন রাজার মত আয়, তেমনি ধারা টাকার আমদানী আসে এবং সেই ধনাঢ্য ব্যক্তিটি না কি ভবিষ্যতে চৌধুরী-কন্যার শ্বশুর হইবেন। কথাটা গোপালের বিশ্বাসও হইল এবং ভালও লাগিল। সম্প্রতি রায়বাড়ীর বিবাহে আইবুড়ভাত লইয়া গিয়া সে রায়েদের ঐশ্বর্য্য, বদান্যতা প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছিল, আহার্য্য এবং বিদায় ভাল রকমই পাইয়াছিল। ও-বাড়ীর বড়বাবুর মেজাজও হয় ত যে অসাধারণ ভাল, তাহাও লোকমুখে তাহার জানা আছে। তাহার দিদিমণি যদি সে বাড়ীর বউ হয়, অন্যায় হইবে না। কিন্তু এখন দিদিমণিকে একবার দেখা যায় কেমন করিয়া? আর কি বাবু তাহাকে তাঁধার বাড়ী ঢুকিতে অনুমতি দান করিবেন!

বাড়ীখানার আশেপাশে চোরের মত লুকাইয়া ফেরাই যে তাহার পক্ষে প্রধানতম প্রমাণ দাঁড়াইয়াছিল, সে কথাটা প্রায় বিস্মৃত হইয়া গিয়া সে আবার সেই দুষ্কার্য্য করিতে লাগিল, ও শেষে এক দিন পুরাতন মনিব-বাড়ী মরিয়া হইয়া ঢুকিয়া পড়িতেও ছাড়িল না। দ্বারবান্ মাধোসিং তখন ফটকের পাশের কুঠরীতে আটা মাখিয়া মোটা মোটা লেচী পাকাইতে পাকাইতে অনতি-উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া তুলসীদাস আবৃত্তি করিতেছিল;—

"তুলসীদাস হরি-চন্দন রগড়ে, পূজা করত রঘুবীর।"

গোপাল এই চৌগোঁপ্পা সরযূ-পারীর কঠিন দৃষ্টি হইতে নিজের শীর্ণ ও খর্ব্ব আকৃতিটা গোপন করিয়া ফেলিবার কোন উপায়ই না দেখিয়া অবশেষে কাঁচুমাচু মুখে দুই হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে তাহারই শরণাপন্ন হইল।

"ভাল আছ ত বাবা, দরোয়ানজি! মেজাজ খুস হায়?"

"হাঁ জী, কাহে না? কিসিকে নেহি চোরী কিয়া; কিসিকে নেহি অপচয় কিয়া; কোই হামারে তক্‌লিব দে' শক্তে হেঁ?"

গোপাল চোরের অধম হইয়া গেল। কি বলিবে, কি করিয়া নিজের বক্তব্যটাকে প্রকাশ করিবে, তাহার খেই হারাইয়া ফেলিয়া সে বিমূঢ় হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আবার ধসিয়া পড়া শরীর-মনকে কোনমতে একটুখানি গুছাইয়া লইয়া সে আবার ক্রন্দনের সুরে আরম্ভ করিল, "দরোয়ানজী বাবা! হামার খোঁকি দিদিমণিকে একবারটি বুলিয়ে দেবে, বাবা! বাবা, তোমার কাছে হামি জন্মের মতন কেনা হয়ে থাক্‌বো, বাবা! একবারটি তেনাকে বুলিয়ে দাও।—"

মাধোসিং তাহার গঞ্জিকাপ্রসাদাৎ রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু অগ্নিতপ্ত লোহার ভাঁটার মত গোল করিয়া পাকাইয়া গোপালের দিকে তাহা যেন ছুড়িয়া মারিয়া তেম্নি বজ্র-নির্ঘোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিল, "কেঁও! ম্যয় চোট্টাকো সাথ ম্যয়কো থাখিন্‌কা লেড়্‌কীকো মিলনে দেঙ্গে?—"

আরও কোন কোন কথা সে বলিত, কিন্তু ক্রোধাতিশয্যে তাহার কথা বাহির না হইয়া তাহাকে অকস্মাৎ স্প্রিংয়ের মতন ছিটকাইয়া তুলিয়া বাহিরে ঠেলিয়া দিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রচণ্ড বিক্রমে আসিয়া গোপালের পাকাটির মতন সরু গলা চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ধাক্কা দিয়া গর্জ্জনস্বরে কহিল; "নিকালো শালে! হারামজাদ! ফিন্ তয়াসে আগ্ মুকুনে আয়া! বেহায়া বদমাস্! নিকালো।—"

"দিদিমণি রে! আর তোকে দেখতে পেলাম না—" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কারাবাসক্লেশে অর্দ্ধমৃত ও অনাহারী গোপাল সবেগে ফটকের বাহিরে পড়িতে পড়িতেও, না পড়িয়া হঠাৎ কেমন করিয়া যে আট্‌কাইয়া গেল, সে প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে নাই। পরক্ষণে দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই একটি সুরূপ কিশোরের সহিত এক জন মাধোসিংহেরই সমপদস্থ অপরিচিত ব্যক্তি ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল; গোপাল তাহারই গায়ের উপর পড়িয়া যাওয়াতে মাটীতে পড়া হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সে ব্যক্তি উহাকে ধরিয়া ফেলিয়া দাঁড় করাইল, গোপাল তখন চিনিল, সে ভুবন বাবুর দ্বারবান্।

এ দিকে ইতোমধ্যে আর একটা কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। গোপালের সেই উচ্চকণ্ঠের আর্ত্তনাদ বাহিরের অঙ্গন পার হইয়া ভিতর-মহলের সন্নিহিত একতলার ঘরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রবেশিকা-সোপান ও উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাঠে নিযুক্তা সুলেখার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। ধাতু রূপ করা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া সে কশাহত জানোয়ারের মত তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অধীরস্বরে কহিয়া উঠিল, "এ নিশ্চয়ই আমার গোপালদা' না হয়ে যায় না! কি হলো? গোপালদা' অমন করে চেঁচালো কেন? আবার কি মাধোসিং তাকে মারছে!"—

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্যা বালিকা তীরবেগে ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল,—"মাধোসিং! মাধোসিং! তোম্ উসকো একদম জান লেনে চাহতা হায় কেয়া! কাহে ফিন্ মারতা হায় জী?"

"ম্যয়কো কুছ্ কশোর নেহি হায় দিদিসাহাব! হুজুরকা হুকুম হায় যে ফিন্ কোভি উ দাগাবাজ আদমীঠো হুন্‌কা কোঠীকো মাইল ভরমে আনে নেই শকে। ম্যয় তো তাঁবেদার হায়।"

"কক্ষণ না. বাবা সে' কথা নিশ্চয়ই বলেন নি! গোপালদা'! গোপালদা'! তুমি আমার কাছে এস! আহা, তুমি কি হয়ে গেছ, ভাই!"

বিগলিত করুণায় যেন শীতল জাহ্নবী-ধারা ঢালিয়া দিয়া সুলেখা এই বলিয়া গোপালের দিকে চোখ ফিরাইতেই তাহার সেই সুকরুণ দৃষ্টিটি এক মুহূর্ত্তেই বিস্ময়-রেখায় ভরিয়া উঠিল। শুধু তো তাহার গোপাল দাদাই নয়; তাহার সঙ্গে আরও যে কে দুই জন দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই এক জনের দেহে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া গোপাল কেমন যেন অবসন্নবৎ ঝিমুম মারিয়া গিয়াছে। সুলেখা সহসা একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত গোপালকে জড়াইয়া ধরিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়া উঠিল—"গোপালদা! গোপালদা! আমি এসেছি।"

সেই স্বভাব-মধুর স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ ও সস্তরস্বর যেন মন্ত্রোষধির মতই মূর্চ্ছাতুর গোপালের ঘোর ক্লান্তিতে হতচেতনবৎ দেহে শক্তি-সঞ্চার করিল। সে সবেগে দৃষ্টি মেলিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল, "দি,—দিদি, দিদিমণি আমার!"—তাহার চোখ দিয়া অবিরল জলের ধারা বহিতে লাগিল।

সুলেখার চোখ দুইটিও শুষ্ক ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য; সে আরও অনেক বেশী কান্নাই বোধ করি কাঁদিত; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহার সম্মুখবর্ত্তী কিশোরের দুইটি বিস্ফারিত ডাগর চোখের উপরে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গেল, অমনই একটা গাঢ় লজ্জার লালিমায় তাহার সরস দাড়িম্ববীজতুল্য গণ্ড দুইটি আরক্ত করিয়া, তাহার কান্নাকেও যেন বাঁধ দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। সে চিনিল, এ সেই ছেলেদেরই এক জন—যাহারা সে দিন তাহার বাবার হুকুমে বাজপেয়ীর হাতের বেত খাইয়া গিয়াছে! মনে মনে বিস্মিত হইল, তাহারা এখানে কি জন্য আসিল? গোপালদার সঙ্গে আসিয়াছে কি? কিছু বুঝিতে পারিল না; কিন্তু তাহার ইহাদের কাছে ভারী লজ্জা বোধ হইল। পাছে সে দিনের কোন কথা আবার উঠিয়া পড়ে, সে ভয়ও হইল।

"গোপালদা, এস, কিছু খেতে দিই গে"—বলিয়া সে ততক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ গোপালের হাতে ধরিয়া তাহাকে লইয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

সুশীলের অত্যন্ত লোভ হইতে থাকিলেও সে তাহার সম্মানরক্ষাকর্ত্রীকে একটি কৃতজ্ঞতার কথাও মুখ ফুটিয়া বলিতে সমর্থ হইল না। বলিতে তাহারও অতিশয় লজ্জা বোধ হইতেছিল।

বিপ্রদাস বাবু দ্বৈপ্রহরিক বিশ্রামশয্যায় শয়ন করিয়া

আলবোলার নল টানিতেছিলেন, তাঁহার মাংসবহুল পদযুগল এক জন দাসীতে টিপিয়া দিতেছিল, তিনি তাহাকে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া দিতে আদেশ করিলেন। গৃহিণী সত্যবতীর বয়স বিপ্রদাস বাবুর অর্দ্ধেকের অনধিক। আকৃতি অনেকটা সুলেখারই মত; প্রকৃতিতেও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তবে সে শিশু, ইনি পরিণতবয়স্কা জমিদারগৃহিণী এবং দুর্দ্দান্ত স্বামীর স্ত্রী। দ্বিতীয়পক্ষীয়া হইলেও চরিত্রের কোমলতা বশতঃ "প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী" হইতে পারেন নাই—বিশেষতঃ বিপ্রদাসও বৃদ্ধ নহেন; তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চাশোর্দ্ধ এবং পত্নী পঞ্চবিংশতিবর্ষীয়া।

প্রভুর ইঙ্গিতে দাসী বিদায় লইলে বিপ্রদাস বলিলেন—"তোমায় বাড়ী পোড়ানর ব্যাপারটা সে দিন সব বলেছিলেম না? আজ ভুবন বাবু যে তাঁ'র ছেলেকে আমার কাছে ক্ষমা চাইতে পাঠিয়েছিলেন।"

সত্যবতী একটুখানি চঞ্চলভাবে স্বামীর দিকে বারেক চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "ওঃ!"

বিপ্রদাস কহিলেন, "খাসা ছেলে।"

সত্যবতী মনে মনে ঈষৎ বিস্মিতা হইলেও মুখে মৌনী হইয়াই রহিলেন, ইতঃপূর্ব্বে এ শব্দ তিনি স্বামীর মুখ হইতে আর কখন বাহির হইতে শুনিয়াছেন কি না, বোধ করি, সেই কথাটাই ভাবিতে লাগিলেন।

বিপ্রদাসের আজ বোধ করি মনোবীণা খুব উচ্চ সুরগ্রামে বাঁধা ছিল, কোন দিকে লক্ষ্য পড়িল না; আপনার চিন্তাধারারই অনুসরণ করিতে করিতে সত্যবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভুবন বাবুর এখন ঢের টাকা রোজগার হচ্ছে; শুনেছি, কলকাতায় না কি বড় বড় আট দশখানা ভাড়াটে বাড়ী—একখানা তার বিলিতি হোটেল ভাড়া দিয়ে রেখেছে; কারবারও খুব ফালাও, আবার এ দিকের জমীদারীরও অংশ আছে। তাঁ'র ঐ ছেলে তো মোটে একটি। ছেলেটিও দেখ্‌তে ভাল, লেখাপড়াও মন্দ কর্‌ছে না, কেমন? কি বল? মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না কি?"

সত্যবতী চকিত হইয়া উঠিলেন, "এখনই?"

বিপ্রদাস কহিলেন, "আজই নয়, যখন হয় তখন, পছন্দ কি না?"

"কিন্তু ওদের লেখাকে যদি পছন্দ হয়, তবে ত?"

বিপ্রদাস বিজয়গর্ব্বে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "পছন্দ হয় কি? হয়েছে। ভুবন বাবু সে দিন সুলি'কে দেখে খুব পছন্দ ক'রে গেছেন। বিয়ের কথা স্পষ্ট না লিখলেও ওর রূপের কথা, গুণের কথা আজকের চিঠিতে না হোক তবু পাঁচ যায়গায় লিখেছেন। শেষে লিখেছেন, 'আমার ছেলে যদি আজ এত বড় অপরাধে অপরাধী না হতো তা হ'লে মনে কত সাধ যায়; সব সাধ কি আমরা মিটাইবার সৌভাগ্য লইয়া আসিয়াছি!' —আর কি স্পষ্ট বল্‌বেন?"

সত্যবতীর সুন্দর মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া আসিল, তিনি ক্ষণকাল নতমুখে নীরব থাকিয়া সহসা মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে কথাও তো সত্যি, সুশীল যা অন্যায় কাযটা করেছিল, তাতে বড় হয়ে—"

"সে ডাকাতের সর্দ্দার হবে? না, মোটেই না,—

বিপ্রদাস এবার হাহাশব্দে হাসিয়া উঠিলেন—"ছেলেটির অতি নধরকান্তি, মাধুর্য্যপূর্ণ নম্রমূর্ত্তি, সে এ সব কাযের যোগ্যই নয়। আমি বোকা নই; ভুবন বাবু কোন ইঙ্গিত না দিলেও আমি বুঝেছি ও জেরা ক'রে বা'র করেছি যে, আগুন দেবার পরামর্শ এবং দেওয়া সুশীলের নয়, শুভেন্দুর—ওর এক বন্ধুর ছেলের। সুশীল শুধু তার সঙ্গে ছিল। আর দেখ, যদিই দিয়ে থাকে, ছোট বেলায় অমন কত করে। সবাই তো আর তোমার এবং ভুবন বাবুর মতন ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মধ্বজী নয়; ও সব কি ধর্ত্তব্য?" একটু থামিয়া মৃদুহাস্যের সহিত পুনশ্চ কহিলেম, "ধর, এই আমিই ওর বয়েসে কারু ঘরে আগুন না দিয়ে থাকি, একবার সংস্কৃত পণ্ডিতের টিকিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম, আর একটু হলেই গো-হত্যা নয়, তবে ব্রহ্মহত্যাটা হয়ে যেতে পারতো। একবার না, যাক্ গে, তা তোমার কি মত বলো? আমি তো মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। আমি যখন ডাকাত হই নি, ও-ও হবে না।"

সত্যবতী মনে মনে বলিলেন, "তুমি ডাকাতের চাইতে খুব বেশী তফাৎও নও?" প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, যা ভাল হয়। তা ওরা এখন ত আর বিয়ে দেবে না? সুলেখা এখন ছোট আছে।"

"এখন দেবার কথা তো আর হচ্ছে না"—বলিয়া

বিপ্রদাস বাবু গম্ভীর মুখে ধূমপান করিতে লাগিলেন, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা তাঁহার পক্ষে এই যথেষ্টই হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইল। এর চেয়ে বেশী কথা কহিতে গেলে নিজেকে খেলো করিয়া ফেলা হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যেই স্ত্রীর সহিত মনের কথা কহিয়া ফেলিয়া নিজেকে তিনি হয় ত বা একটু-খানি খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াই থাকিবেন—কারণ, তাঁহার এই সকল কথাবার্ত্তার পরে তাঁহাকে একটুখানি প্রসন্ন বোধ করিয়া সত্যবতী ভয়ে ভয়ে এই সঙ্গে একটি আরজী পেস করিয়া বসিলেন, হাতের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন—"লেখা তো গোপালের জন্যে বড্ডই কান্নাকাটি করছে, সে যখন দোষী নয়, তখন তাকে বাড়ীতে রাখায় কি কোন দোষ আছে? যদি—"

বিপ্রদাসের মুখপ্রবিষ্ট আলবোলার নল বিবরপ্রবিষ্ট সর্পমুখের ন্যায় সবেগে বাহির হইয়া আসিল, ধূমধারা বর্ষাজলপ্রাপ্ত নল খাগড়ার বনের মত ঘন গুম্ফরাজীর মধ্য দিয়া ছড়াইয়া পড়িল, মনে হইল যেন, গভীর বনে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। গম্ভীর ও অবিচলিত কণ্ঠে তিনি কহিয়া উঠিলেন, "সে হারামজাদাটা কি আমার বাড়ীতে ঢুকতে পেয়েছে না কি? মাঃ, সুলুটা বড় জ্বালালে দেখছি! এসেছে না কি?"

সত্যবতী ভয় পাইয়া গিয়া নিজ নামের যথার্থ মর্য্যাদা-রক্ষায় সমর্থ হইলেন না। 'ইতি গজ' করিয়া বলিলেন, "আমার কথা নয়, যদি আসতে মত দাও, তাই বল্‌-ছিলাম, সে ত দোষী নয়।"

"দোষী নয়! বল কি তুমি? সে আমায় জব্দ করবে ব'লে মুখের উপর শাসিয়ে যায় নি? তার পর এই যে দণ্ড না পেয়ে ফিরে এলো, এতে কি ওর কম আস্কারা বাড়লো ব'লে মনে কর? ব্যাটার ধরাকে যে এখন সরা জ্ঞান হবে, আর ওর দেখাদেখি সব লোকজন বিগ্‌ড়ে যাবে। ওকে আমার বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যেন খবরদার আসতে দেওয়া না হয়, আমি যে মাধোসিংকে বলে-দিয়েছিলাম,—এই কে আছিস্?"

সত্যবতী তাড়াতাড়ি অন্তপথে সরিয়া পড়িলেন ও রান্নামহলে যেখানে সুলেখা আপনি বসিয়া বহুদিনের অভুক্ত গোপালকে যত্নপূর্ব্বক আহার করাইতেছিল, সেইখানে গিয়া অগত্যাই তাঁহাকে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। সুলেখার চোখ দিয়া অমনই জলের ফোঁটা টপ টপ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; কিন্তু গোপাল এ সংবাদ পাইয়া খুব বেশী বিচলিত হইল না; সে তৎক্ষণাৎ সুলেখাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিয়া উঠিল—

"কাঁদিস্ নে দিদিমণি! আমার জন্যে তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর শ্বশুর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে আমায় তাঁর বাড়ীতে থাক্‌বার কথা ব'লে পাঠিয়েছেন, বলেছেন, কল্‌কেতায় আমায় নিয়ে যাবেন। দুদিন দেখা হবে না বটে, আবার তুই ভাই, সেই ঘরই তো চিরদিন ধ'রে কর্ব্বি।" মুখ তুলিয়া সত্যবতীর সহসা কৌতুক-স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ কহিল, "খাসা মানুষ মা, আমার দিদিমণির শ্বশুর! দেবতুল্যি লোক! জেল-খানায় গিয়ে আমার মতন ছোট লোকের গায়ে হাত দিয়ে কি আদরটাই করা। যেমন আমার সীতে দেবী দিদিমণি, তেমনি রাজা দশরথের মতন শ্বশুর হবে বাবু।"

সত্যবতী প্রীতি আনন্দে সস্নেহ-নেত্রে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; মন্দ নয়! ইহারই মধ্যে সংবাদটা ছুটিয়াছে ত অনেক দূর? অথবা এটা উহাদের মিছক কল্পনা মাত্র! তা কথাটা নেহাৎ মন্দ নয়, সুলেখার পিতা যদি ভূষন বাবুকে বৈবাহিক করেন, তবে তাঁহার জীবনে অন্ততঃ একটাও ভাল কায করা হইবে।

সুলেখা অশ্রুভরা দুই চোখে রোষের বাণ ভরিয়া গোপালের দিকে তাহার সন্ধানপূর্ব্বক উল্টান ঠোঁটে বলিয়া উঠিল, "ধ্যেৎ!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি এই মিশন স্কুলে আসিবার পর হইতে যত না হউক, বাইবেল পড়া ও যিশুর গান তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণেই শিখিতে হইতে লাগিল; এবং যতই তাহা শিখিল, মিসেস্ গুঁই বা মিস্ হর্ণের কিছুতেই তাহার সে শিক্ষা আর মনঃপূত হইতেছিল না। মিসেস্ গুঁইএর ক্লাশে প্রথমেই প্রার্থনা গান, তার পর প্রার্থনা, তার পর বাইবেলের বুক অফ্ দানিয়েল "জেনি-সিস্ সামুয়েল"—কোন না কোন একটা যায়গা পাঠ্য। তা'র

পর হাতের লেখায়ও সেই বাইবেল, কোন দিন ডিক্টেসন দিলে সেও বাইবেল, ইংরেজী হপ্তায় দুই দিন মাত্র, তাহাও সেই ওল্ড টেষ্টমেণ্ট হইতে ছত্র কতক করিয়া পড়ান হইত। বাকী রহিল অঙ্ক ও সেলাই ও দুইটার মধ্যে নাকি বাইবেল গুঁজিয়া দেওয়া চলে না, কাযেই ও দুটাকে এই বাইবেলময় স্কুল-নিয়মের মধ্যে একান্ত ভাবেই সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। তবে সুপারিটেণ্ডেণ্ট মিস্ রীড্ নীলিমার সৌভাগ্যবশতঃ তাহাকে একটুখানি কেমন সুনজরে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাই হপ্তায় এক দিন করিয়া তিনি তাহাকে একটু উচ্চাঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিতে চাহেন, ঘর হইতে ইহার জন্ম উপকরণ যখন সে আনিয়া উঠিতে পারিল না, তখন আর কি হইবে? অগত্যাই ইহার বদলে অল্প-স্বল্প ইংরাজী ও অঙ্ক সে তাঁহার নিকট হইতে শিখিতে পাইল। তবে সে ইংরাজীও বাইবেল-সম্বন্ধীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। ছাত্রদিগের অণুতে পরমাণুতে এইরূপে বাইবেলের শিক্ষা ও যিশুপ্রেম ইহাঁরা ইন্জেক্ট করিয়া দিয়া নিজেদের কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছিলেন, এবং তপ্তলোহের তরলসারে পরিপূর্ণ বীভৎস কুম্ভীরময় কুম্ভীপাকের হস্ত হইতে অনন্তমুক্তি প্রদানে উহাদিগকেও ধন্ত করিতেছিলেন।

নীলিমা ক্লাশের কাহারও চেয়ে এই আত্ম-রক্ষা কার্য্যে অমনোযোগী না হইয়াও ইহার জন্ম উঠিতে বসিতে কিন্তু শিক্ষয়িত্রীদের নিকট ভৎর্সনা লাভ করিতেছিল। মিস হর্ণ এক দিন প্রশ্ন করিলেন, "আই হোপ, ইউ লাইক দি সাম্স্? (আমি আশা করি, Psalms তোমার ভাল লাগে)?

নীলিমা মিথ্যা বলিতে জানিত না, সে ভয়ে ভয়ে জানাইল যে, না। নো? ওহ্ হাউ শক!" (না,? উঃ কি ভয়ানক!) মিস হর্ণ চোখ কপালে তুলিয়া বক্ষে ক্রশ চিহ্ন ধরিয়া দেহশুদ্ধি করিয়া লইলেন।

মিসেস্ শুঁই এক দিন সব মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওই! তোরা সব পুতুলদের ভক্তি করিস? দেবতা মনে করিস?"

সব মেয়েই প্রায় ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়া থাকিল। তাহাদের মিথ্যা বলা অভ্যাস আছে, তাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়া বলিল, "নেহি, নেহি মানৃতে হৈ, পহিলে মানৃতে হি, লেকিন্ আব্ হিত্তে কেবল যেশুকো প্রেম করতে হৈ।"

মিসেস্ শুঁই উঁহাদের দিকে প্রীতিকটাক্ষ করিয়া সন্তুষ্টভাবে কহিলেন, "উহ্ ঠিক কাম করতে হেঁ, তোম লোগ্ কা আত্মা নরক সে বাঁচ গিয়া!" শুনিয়া ঐ মেয়েরা হাঁপ লাগিয়া বাঁচিল, যেন স্বয়ং যিশুখৃষ্টই পুর্ণজীবিত হইয়া আসিয়া তাহাদের অনন্ত পাপমুক্তির আদেশ দান করিতেছেন। মিসেস্ শুঁই তখন তাঁহার কোটরনিবাসী চোখ দুইটাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া কটমট করিয়া নীলিমার দিকে চাহিলেন, "তোমার বুঝি ও কথা বলবার সাধ্যি হলো না? তুমি বুঝি এখনও ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুতুলের পুজো করছো?"

এতক্ষণ এই সময়েরই জন্ম নীলিমা খাসরোধপূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সম্বোধিত হইয়া তাহার বুক টিপ টিপ করিতে লাগিল। তাহার রক্তাল্পতায় পাণ্ডুমুখ অধিকতর বিবর্ণ হইয়া গেল। হ্যাঁ না কোন কথাই সে কহিতে পারিল না।

মিসেস শুঁইএর হয় ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁর অপর সকল হিন্দুস্থানী ও দুই তিনটি নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর ছাত্রীদের আত্মার অপেক্ষা একটু উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্তা নীলিমার আত্মার বাজারদর কিছু অধিক হওয়াই সঙ্গত এবং সেই জন্মই বোধ করি, উহাকেই সুরক্ষিত করিবার জন্ম তাঁহার আগ্রহও কিছু অধিকতরই দেখা যাইত। নীলিমাকে যে উঠিতে বসিতে যিশু-প্রেম শিক্ষা দিয়াও তাহার ফল এত বড় অফলা হইয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার মন খারাপ হইয়া মূর্ত্তিও ভীষণতর হইয়া উঠিল।

"ফর্সেম্! সেলি! ফর্সেম্!—ঈশ্বর তোমার আমাদেরই সঙ্গে এক রকমেরই মানুষের চেহারা দিয়েছেন, দেননি? বয়সও তোমার এখন এই নেহাৎ কাঁচা, ইচ্ছা করিলে এখনও তুমি তাঁর নিজের ভেড়ার ছেনা হ'তে পারতে। কিন্তু তা না করে কি লজ্জার বিষয় যে তুমি সয়তানকে আত্ম-বিক্রয় করে রেখে দিলে! ঈশ্বরের পুত্রকে শরণ না নিয়ে পুতুলের কাছে নিলে? বাড়ী গিয়ে এক বার বাপারের লাথি দিয়ে দেখ দেখি, তোমার পুজো করা পুতুলগুলো জ্যান্ত হয়ে উঠে, তোমায় উল্টে গালে চড়

মারতে পারে কি না! * তা যদি না পারে, সে তোমায় অনন্ত নরক থেকে মুক্তি দিতে পারবে?"

নীলিমার চোখে সহজে জল আসে না, আসিলেও তাহা পড়ে না, কিন্তু আজ আর তাহার চোখের জল চোখের মধ্যে ধরা রহিল না, গাছের পাতার শিশির বিন্দুর মতই তাহা এক মুহূর্তে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু ইহার ফল যে ভাল নয়, তাহা বুঝিয়াই সে পরক্ষণে অশ্রু সংযত করিয়া লইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া পাশের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু চোখের জল তাহার গোপন ছিল না এবং দ্রষ্টার মনের অঙ্গে তাহা বোধ করি বিছার মত হুল ফুটাইয়া দিয়াছিল। মিসেস গুঁই একেবারে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ নেলি! এত দিন এত শিক্ষা পেয়ে তুমি পুতুলের শোকে কেঁদে ফেল্লে! কি ভয়ানক! কি লজ্জা! কি ঘেন্না! কোথায় আজ প্রভু যিশুর প্রেমে তোমার চোখ দিয়ে প্রেমের ধারা বইবে, তোমার স্বর্গের আলোক হাস্‌তে থাক্‌বে, তোমার আত্মা না অনন্তকালের জন্য ত্রাণকর্ত্তা যিশুর আশ্রয়ে পরিত্রাণ লাভ করবে, তা না হয়ে হুলো জগন্নাথ, জিব বারকরা কালামুখী, হাতীমুখো গণেশ, ন্যাংটা মূর্ত্তি কালী মনে করতেও গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে—সেই-গুলোর শোকে তুমি চোখে সরষেফুল দেখছো! এই মেয়েরা! তোরা আর এর সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বস্‌বিনে; ওর সঙ্গে কথা কবিনে; ওর দিকে কেউ চেয়ে পর্য্যন্ত দেখবিনে। ওর আত্মা একেবারে নরকের দোর গোড়াতে গিয়ে পৌঁছে গেছে। সেখানে ওর আত্মা হাঙ্গর-কুমীরের আহার হয়েছে। সেখানে ওর আত্মা কীট-পতঙ্গের আহার হয়েছে। সেখানে ওর আত্মা সংসারের যাবতীয় পাপের ভারে ভারী হয়ে সংসারের যত কিছু ময়লা জিনিসের মধ্যে ডুবে গেছে; সেখানে ওর আত্মা আগুনের হাপরে যেমন গলান লোহা ঢেউ খেলতে থাকে, তেমন ধারা গরম লোহার চৌবাচ্চার প'ড়ে জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে, জ্ব'লে যাচ্ছে।"

নীলিমার ঠোঁট ফুলিতে লাগিল, বুক ঠেলিতে লাগিল, চোখ ফাটিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই যেন এই মুহূর্ত্ত হইতেই তাহার উক্তবিধ দুর্দ্দশা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহার আত্মাটাকে (সেটা যে কোথায় আছে, তাহা না জানিলেও) যেন হাঙ্গরে চিবাইয়া, কুমীরে গিলিয়া, জোঁকরা কাটিয়া, পতঙ্গে কুরিয়া খাইতেছে। গরম লোহা তরল অগ্নির মতই যেন তাহার সমস্ত শরীরকে পোড়াইয়া দিতেছে অথচ তাহাকে ছাই করিতেও পারিতেছে না। নীলিমা হাঁপাইতে লাগিল, তাহার হাত ও পায়ের তলা ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া আসিল; তাহার পর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া একটা প্রবল কম্পন দেখা দিল, সে পতনোন্মুখ হইয়া দেওয়াল ধরিল।

মিসেস্ গুঁই একবারমাত্র তীব্রদৃষ্টিতে বোধ করি সেই তরল অগ্নিরই কতকটা ঝাপ্‌টা মারিতে চাহিয়া তেমনই সতেজে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "সেই গলা আগুনে প'ড়ে প'ড়ে দুষ্টাত্মা কর্ণে শুন্‌বে, কিন্তু কোনমতে বুঝিবে না; চক্ষুতে দেখিবে, কিন্তু কোনমতেই প্রত্যক্ষ করিবে না। চীৎকার করিয়া ডাকিলেও কেহ আসিবে না। আবার এর চেয়েও ভীষণ দণ্ড পাবে—যখন ঐ আগুনের কুণ্ড হ'তে তুলে নিয়ে ময়লার পচা গন্ধময় পুকুরে ঠেলে ফেলা হবে। তখন চীৎকার ক'রে উঠলে সেই পচা ময়লা থেকে সহস্রটা ভীষণাকার কৃমিকীট কিল্‌কিল্ ক'রে মুখের মধ্যে—"

নীলিমার কানে শুনিবার, চোখে দেখিবার শক্তি সত্যই লোপ পাইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পরে সে কতকটা আত্মস্থ হইয়া মুখ তুলিয়া, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল,—তাহার ক্লাসের মেয়েরা বটেই, অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরাও ক্লাস ছাড়িয়া তাহার বিচার দেখিতে আসিয়া জমা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মিস্ হর্ণও আসিয়া নিতান্ত সকরুণভাবে দাঁড়াইয়া মধ্যে মধ্যে "হাই সকিং!" "হোয়াট এ পীটি!" ইত্যাদি রূপ আপশোষ জানাইতেছিলেন। নীলিমার চক্ষু-কর্ণের এ সকল দৃশ্য ও মন্তব্যের জন্য বিশেষ অবসর ছিল না। মিসেস্ গুঁইএর প্রকাণ্ড ভাঁটার মত মুখখানা ও কণ্ঠের কাংস্যরব দর্শন-শ্রবণের জন্যই তাহার অপমানাহত ভীত চিত্ত উগ্র আগ্রহে চকিত হইয়া উঠিল। মিসেস্ গুঁই সমধিক শীতল হইয়াছিলেন।

তরল তপ্ত লৌহ বুঝি একটুখানি জুড়াইয়া আসিয়াছিল

* এই ঘটনাটি কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত নহে, পরন্তু বাস্তব।

না কি, বলাও যায় না। কতকটা সংযতভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। তিনি পাঠ করিলেন —"*এবং সেই পরাজিত সকলেও করে, যাহাদের উপরে আমার নাম ডাকা হইয়াছে।* অতএব আমার বিচার এই, পরজাতীয়দিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের প্রতি ফিরে, আমরা যেন তাহাদিগকে কষ্ট না দিই, কিন্তু তাহাদিগকে লিখিয়া পাঠাই, যেন তাহারা প্রতিমা ঘটিত অশুচিতা হইতে, ব্যভিচার হইতে গলা টিপিয়া মারা প্রাণী হইতে এবং রক্ত হইতে স্বতন্ত্র থাকে।"

"নেলি! এখন বেশ ভাল ক'রে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ ত? আচ্ছা, আজ সারা রাত্রি ধ'রে অনুতাপ ক'রে নিজের পাপ ক্ষালন কর গে যাও। পবিত্রতার কাছে ঐ পশুর হৃদয়ের বদলে একটি মানুষের হৃদয় প্রার্থনা ক'রে খুব চোখের জল ফেল গে দেখি। কি বল্‌বো, তুমি আমাদের বোর্ডিংএর মেয়ে নও, তা হ'লে এক দিনেই তোমায় আমি ঠিক ক'রে নিতুম। না খেতে দিয়ে ঘর বন্ধ থাকলে আর শাস্তির কথা শুন্‌লে পুতুলপুজো বের হয়ে যাবে।"

সকলের তীব্র ও অনেকেরই ঘৃণাপূর্ণ পর্য্যবেক্ষণদৃষ্টির মধ্য দিয়া ভীত, কম্পিত, লজ্জাবিবর্ণ, সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ নীলিমা ক্লাসের বাহিরে আসিয়া একটা আর্ত্তশ্বাস গ্রহণ করিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার তখন যেন টলমল করিতেছিল, একটা প্রচণ্ড অনিবৃত্ত ভয়ে যেন তাহার সমস্ত মনটাকে আর্ত্ততায় অস্থির করিয়া তুলিতেছিল; সে ভয়টা অবশ্য শুঁই, মিস্ হর্ণের উদ্দেশ্যে, অথবা তাঁহাদের বর্ণিত সেই ভীষণ নরকযন্ত্রণার ভবিষ্য আতঙ্কজনিত, তাহা নিশ্চিত করিয়া না বুঝিলেও তাহার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, সে গিয়াছে যেন জন্মের মত, ইহপরকালের মত, অনন্তকালেরই মত একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহার ক্লাসের মেয়েরা তখন ছুটীর পুর্ব্বেকার প্রার্থনা-গান গাহিতেছিল।

"ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও"

তাহাদিগের সেই প্রার্থনার সঙ্গে প্রাণের তান মিশাইয়া তাহার ভয়ার্ত্তচিত্তও যেন অকস্মাৎ আজ প্রাণের প্রাণেরও মধ্য দিয়া ঐ গান সপ্তস্বরে গাহিয়া উঠিল। মর্ম্মের ভিতর হইতে ভীত ত্রস্ত ব্যাকুলচিত্ত কাতর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিতে লাগিল—

"ইশ মশি মেরা প্রাণ বাঁচাইও, মেরা প্রাণ বাঁচাইও, মেরা প্রাণ বাঁচাইও।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

উদ্ভট-সাগর

কোনও কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে নিন্দাচ্ছলে রামচন্দ্রের স্তুতিবাদ করিয়া কহিতেছেন :—

সাধু সাধু রঘুনাথ বৎ ত্বয়া
পর্য্যণায়ি জনকস্য কন্যকা।
কার্য্যমেতদপরেণ দুষ্করং
যুক্তমেতদজবংশজন্মনঃ ॥

ধন্য ধন্য রামচন্দ্র! ওহে গুণধাম,
সংসারে রাখিয়া দিলে পরম সুনাম!
জনকের কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া
লইয়া আসিলে ঘরে আহ্লাদে মাতিয়া।
যে কার্য্য করিলে তুমি আসিয়া সংসারে,
সে কার্য্য কেহই কভু করিতে না পারে।
অজ-বংশে জন্মলাভ হইয়াছে যার,
অজের মতন কার্য্য উচিত তাহার।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।

‘তেরোস্পর্শ’

(বড়দিনের সওগাত)

[কাশীতে এবার যেমন প্রচণ্ড গরম, তেমনই (reaction) প্রতিক্রিয়া-হিসাবে পচা বর্ষা, তেমনই প্রবল বন্যা ; গঙ্গার জলবৃদ্ধির জন্য ‘ইন্দ্রদমন’, ‘পুষ্কর’ ও ‘কুরুক্ষেত্র’ কাণ্ড ; বর্ষা, বন্যা ও পূর্ব্বগামী গ্রীষ্মের প্রকোপে ডেঙ্গু, উদরাময় ও ফোড়া (‘গরমি-গোটা’ heat-boils or mango-boils) ; লেখক নিজে এ তিনে তো ভুগিয়াছেন, আবার গ্রীষ্ম, কুইনিন্ ও পশ্চিম-মুখো ঘরে বাস, এই ত্রিতাপও সহিয়াছেন ; সর্ব্বত্র এই তিনের প্রভাব অনুভব করিয়া প্রবল রোগযন্ত্রণার মধ্যে ‘তেরোস্পর্শে’র খেয়াল মাথায় চাপিয়াছে। পূজার বাজারে পাঠকদিগকে নবরত্ন উপহার দিয়াছি ; এটি দশম রত্ন, বড়দিনের সওগাতের জন্য রাখিয়াছি—কেন না, এটি দমে ভারী, নয়টির বোঝার উপর শাক-আঁটিটা হিসাবে চড়ান চলিত না। তা, নবরত্নের উপর দশমে দোষ কি ? ‘অধিকন্তু ন দোষায়’—বিশেষতঃ রত্নের বেলায় ! দশমরত্ন দরে চড়া। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কালিদাসের কালে জন্ম হইলে ‘দশমরত্ন’ হইতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।]

তিন তিথি একদিনে পড়িলে পঞ্জিকাকার তাহাকে বলেন ‘ত্র্যহস্পর্শ।’ সে দিনে যাত্রা নাস্তি, শুভকর্ম্মও নিষিদ্ধ। ‘বিবাহ-যাত্রা-শুভ-পুষ্টিকর্ম্ম সর্ব্বং ন কার্য্যং ত্রিদিনস্পৃশে তু।’ * (অবশ্য, নিত্যকর্ম্ম, সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা-জপ, যাগ-হোম, আহার-নির্হার, নিষিদ্ধ নহে। সে দিনে মা-বাপের শ্রাদ্ধ পড়িলে তাহাও স্থগিত থাকিবে না ; আর সে দিনে মড়া মরিলেও তাহাকে ‘বাসিমড়া’ করিয়া রাখা চলিবে না।) ইহা শনির শেষ ও বৃহস্পতির শেষ অপেক্ষাও সাংঘাতিক, কেন না, শুধু একবেলা আধবেলার ওয়াস্তা নহে, সমস্ত দিনটা ধরিয়াই দোষাশ্রিত। অশ্লেষা-মঘা দুই ভগিনীই কেবল ইহার সমান খুঁটের। ডি, এল্ রায় “বিষ্যুৎবারের বারবেলা”র গান বাঁধিলেন. ত্র্যহস্পর্শের বেলায় বাঁধিলেন না কেন ? বোধ হয়, ‘দুর্জ্জনকে দূর হ’তে করি পরিহার’ এই নীতি অবলম্বন করিয়া ‘ত্র্যহস্পর্শ’কে ঘাঁটাইতে সাহস করেন নাই। বেপরোয়া বিলাত-ফেরতাও যাহাকে ডরান, সে বড় সহজ পাত্র নহে। (শনির শেষও ভয়াবহ ; গজানন, নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণ পর্য্যন্ত রবি-নন্দনের হাতে নাকাল হইয়াছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত কবি ‘বিষ্যুৎবারের বারবেলা’র মত শনিবারের বারবেলা লইয়া ‘উচ্চবাচ্য’ করেন নাই।)

কিন্তু আবার বাঙ্গালা ‘তেরোস্পর্শ’ দেবভাষার ‘ত্র্যহস্পর্শ’ অপেক্ষাও ব্যাপক ব্যাপার। ইহা শুধু কালবাচক নহে। পল্লীসমাজে দলাদলির ঘোঁটে, বা হালচাল, মামলার সলা-পরামর্শে, তিনমাথা একত্র হইলে, আর দশজনে গা-টেপাটিপি করে, ‘এই রে তেরোস্পর্শ যুটেছে।’ বস্তুতঃ ‘তিন’ সংখ্যাই যেন আতঙ্কের বস্তু। [মানুষ দুইএর সঙ্গে আজন্ম নিবিড়ভাবে পরিচিত, যেহেতু, তাহার দুই কাণ, দুই চোখ, দুই নাসারন্ধ্র, দুই হাত, দুই পা (দুই নৌকায় নহে)। দুই উতরিয়া অজানা তিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তাই কি আতঙ্ক ?]

এইবার তিনের ভয়ঙ্করত্বের প্রমাণ দিই।

নারায়ণ বামন অবতারে বলি-রাজার নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়াই বিভ্রাট্ ঘটাইয়াছিলেন। আবার কৃষ্ণ-অবতারে ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি ধরিয়াই গোপীর কুল মজাইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পরশুরাম-অবতারে তিনবার নহে, ৩ × ৭ = ২১ বার (‘ত্রিসপ্তকৃত্বঃ’), পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। ত্রিলোচনের ত্রিশূলাস্ফালন সংহারের সূচনা করে। ত্রিপুরাসুর, ত্রিজটা রাক্ষসী, ত্রিশিখ-ত্রিশিরাঃ ইত্যাদি রাক্ষসের নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গা-রোহণ সঙ্কট-সঙ্কুল। মেনকার মাতৃ-হৃদয়ে তিন দিনের আনন্দ সুখের বটে, কিন্তু তাহার পরেই যে ‘সুখস্যানন্তরং দুঃখম্’, ‘হরিষে বিষাদ’, ‘যত হাসি তত কান্না’, ইহা

* পঞ্জিকায় আর একটি সদৃশ শব্দ আছে—‘ত্রিস্পৃশা’—একাদশী-বিশেষ। তিন তিথি একাদশীর দিনে পড়িলে ‘হরিভক্তিবিলাস’-মতে তাহাকে বলে ‘ত্রিস্পৃশা।’

প্রণিধান করিবেন। পুত্র অবর্ত্তমানে তেরাত্তিরের শ্রাদ্ধ—সুতরাং ইহাও সুখের বিষয় নহে। ত্রিপক্ষ শ্রাদ্ধও নিতান্ত অপার্য্যমাণে। ত্রিতাপজ্বালায় জনন-মরণ-শীল জীব জরজর। 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে,' 'তিন বিধাতা নিয়ে',—মানুষের হাত নহে। 'তিন সত্য', মা-কালীর দিব্য, গুরুর দিব্য প্রভৃতি কঠিন কঠিন শপথ অপেক্ষা বেশী (binding) জোরালো।

সংস্কৃত-ভাষায় ব্যাকরণে তিন লিঙ্গ প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা ঘটায়। পাটীগণিতের ত্রৈরাশিক ও জ্যামিতির ত্রিভুজও এ পক্ষে বড় কম যায় না। ত্রিকোণমিতির ত্রিভুজের ব্যাপার (solution of triangles) আরও জটিল। তিন নয় তিন ছয় তিন আঠারো কত হয়? * গণিত শাস্ত্রের এই বরযাত্রী-ঠকান প্রশ্নও স্মরণীয়। জ্বর ত্রিদোষজ হইলে বাঁকিয়া বসে। তেকাঁটা বা তেশিরা মনসা-সিজুর কাঁটার বড় জ্বালা। তেপান্তর (ত্রিপ্রান্তর ?) মাঠে পড়িলে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটে। তেতালার সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ঢিমে-তেতালা গায়িতে ও বাজাইতেও নাকি বেশ একটু বেগ পাইতে হয়। তিন মেয়ের পর ছেলে, বা তিন ছেলের পর মেয়ে হওয়া অলক্ষণ, মেয়ে-মহলে এইরূপ সংস্কার। তাই 'শৈল' সৈল (সহিল) নাম রাখিয়া দোষ কাটানর প্রথা আছে। তিন কুলে কেহ না থাকা, তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকা, ত্রিভুবন শূন্য দেখা, ত্রিশূন্যে অবস্থান, কোনটাই ভাল নহে। 'তেমাথা' পথে 'ঠ্যাকনা' করে, তেকাঠায় ঠেকা বড় দায়, 'তেএঁটে' মাথা সকলের চক্ষুঃশূল, 'তেথাকি' ভুঁড়ি বিদ্রূপের বস্তু। (ঈর্ষ্যারও নহে কি ?) তিন চড়, বা তিন থাপ্পড়, বা তিন তাড়ায় বাঁকা লোক সিধা হয়, আর তিন ফুঁয়ে সোজা লোককে উড়াইয়া দেয়; 'তিন নয় তিন ছয়' করিয়া ফেলা লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ, 'তিন টপকায়' কায সারা ব্যস্তবাগীশের ধরণ, আর 'পুরাতন ভৃত্য'—

"একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে বাকী কোথা নাহি জানে।"

'তিন তাস' খেলা জুয়াখেলারই প্রকারভেদ। বার বার তিনবার নিষেধ (warning) রূপেই বেশী প্রচলিত। তিন তিন বার ফেল হইলে লজ্জায় মুখ দেখান যায় না। পক্ষান্তরে, তিন তিনটা পাশ (অর্থাৎ বিএ পাশ) বেটার বিয়ে দিয়ে বরের মায়ের দেমাক দেখে কে?

এই 'ত্রির' সঙ্গে শব্দ-সাদৃশ্য থাকাতেই বোধ হয় 'স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী', 'স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ,' আর এই সবের জন্যই শাস্ত্রে বলে, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' 'স্ত্রীভাগ্যে পুরুষের ধন,' 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,' 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু,' 'স্ত্রিয়োদেবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রাণাঃ স্ত্রিয় এব বিভূষণম্,' এগুলি বোধ হয় 'উপচার পদ' স্ত্রীজাতির মন ভুলানর জন্য সৃষ্ট।)

আরও দেখুন, 'তিন শত্তুর' কাহাকেও দিতে নাই। (আমার মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর মুখ-শুদ্ধির জন্য তিনটি পাণ বরাদ্দ দেখিয়া আমার একটি নবাগতা ছোট্ট ভাগী বলিয়াছিল, "মামীমা, মামাবাবু কি তবে শত্তুর? তাঁকে তিনটি পাণ দেন যে!") 'এই তিন শত্তুর' ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই কি দেশীয় কলেজের কর্ত্তারা, অল্প বেতনে দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার প্রবর্ত্তয়িতা উদারচেতাঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দ্দিষ্ট ছাত্রবেতন, তিন টাকার জায়গায় ৪৲ টাকা করিয়াছিলেন, এবং বৎসর বৎসর ব্রহ্মোত্তরের বেড়া বদলাইয়া জমী-বৃদ্ধির ন্যায়, প্রতি বৎসরই এক টাকা এক টাকা করিয়া বাড়াইতেছেন? ক্রমে টিকিট-পোষ্টকার্ডের মূল্যের ন্যায় ডবল করিয়া তুলিয়াছেন, তবুও নিবৃত্তি নাই। সরকারের উপরও এক কাটি! জানি না, ইহার শেষ কোথায়? আশ্চর্য্যের বিষয়, বেতনের হার যত উচ্চ হইতেছে, গজকচ্ছপের শরীরবৃদ্ধির ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে।

আবার দেখুন, গোলদীঘি, লালদীঘি হেদুয়ার মত 'তিনকোণা তলাও' (Wellesley Square) এই তিনের ফেরে পড়িয়া (অনুপ্রাস-সত্ত্বেও) লোকপ্রিয় (popular) হইতে পারিল না। ঐ একই কারণে দুই জনে বিন্তী-খেলায় ও চারি জনে গ্রাবু প্রভৃতি খেলায় যেমন রেওয়াজ, তিন জনে ডাক-বুরুজ খেলার তেমন রেওয়াজ নাই। ধনে মানে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইলে 'ত্রিবেদী' ঠাকুর সকলের শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যখন বুদ্ধিবিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের বদলে কেবল লাঠিলোটা-কম্বল সম্বল করিয়া দরওয়ানী করিতে আসেন, তখন তিনি দ্বিবেদী চতুর্ব্বেদীর মত সোজাসুজি দোবে চোবে হন না, বাঁকিয়া বসিয়া 'তেওয়ারি' হইয়া 'তেরিমেরি' করেন।

* উত্তর—এক কম এক শ অর্থাৎ ৯৯।

আবার পুরাণেও 'তিন' কম সাত্ত্বিক নহেন। বিরূপাক্ষের তৃতীয় চক্ষুই মদনভস্ম করিয়াছিল, বামনের তৃতীয় চরণই বলির বিপত্তি বাধাইয়াছিল; 'মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ'ও এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। গুণের মধ্যে তমোগুণ তৃতীয়, সুতরাং 'বিদ্যার বিদ্যা'র স্থায় 'গুণ হয়ে দোষ হ'ল'। ৩নং রেগুলেশন যে কি সাংঘাতিক ব্যাপার, তাহা আবার নূতন করিয়া সন ১৩৩০ সালে মালুম হইতেছে। তৃতীয় পক্ষে বিবাহ অলক্ষণ বলিয়া আগে ফুলগাছের সঙ্গে সাতপাক ঘুরাইয়া লইয়া পরে তৃতীয় পক্ষকে চতুর্থ পক্ষ বলিয়া চালান হয়। তৃতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর আরোহীর দুর্গতির সীমা নাই, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রকে ভর্ত্তি করিতে বহু কলেজ নারাজ, এমন কি, তৃতীয় শ্রেণীতে এম, এ পাশ হইলে কলেজে চাকরী পাওয়া দুর্ঘট; third-rate intellect বলিয়াই যেন ইঁহাদিগকে ধরিয়া লওয়া হয়। (ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই জাত-ব্যবসার কথায় আসিয়া পড়িলাম—talking shop!)

তিনের অন্ত নাই। ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিগণ বা ত্রিবর্গ, সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক ত্রিতাপ, 'মনোবুদ্ধিরহঙ্কারঃ' ত্রিতত্ত্ব, ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী, বায়ু পিত্ত কফ দেহস্থ তিন ধাতু, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত-ভেদে বৈদিক উচ্চারণ, হ্রস্বদীর্ঘপ্লুত স্বরবর্ণের তিন প্রকার উচ্চারণ, উদারা মুদারা তারা গানের তিন গ্রাম, স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিলোক, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল—সর্ব্বত্রই তিন বর্ত্তমান। এত তিনের মধ্যে কোন কোন স্থলে গোলেমালে তিন ভালও হইয়া গিয়াছে। যথা, পতিতপাবনী সুরধুনী, ত্রিমার্গগা, ত্রিস্রোতা; বা ত্রিধারা হইয়া, ত্রিলোক পবিত্র করিতেছেন। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, 'ত্রিবেণী,' যুক্ত বা মুক্ত, উভয় অবস্থায়ই মহামুক্তিদা, পরন্তু স্নানে পর্ব্ববিশেষে ত্রিকুল কেন, ত্রিকোটিকুল উদ্ধার করেন। স্বর্গবর্গে, ত্রিদিবস্ত্রিদশালয়ঃ, ত্রিবিষ্টপ বা ত্রিপিষ্টপ, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিবিক্রম, ত্র্যম্বক, ত্রিপুরারি, ত্রিলোচন, ত্রিনয়না, ত্রিনাথ, ত্রিবিদ্যা বা ত্রয়ী, শৈবের ত্রিপত্র ও ত্রিপুণ্ড্র, বৈষ্ণবের ত্রিকণ্ঠী ও ত্রিভঙ্গমুরারি, ত্রিসন্ধ্যা, ত্র্যক্ষর প্রণব, গায়ত্রীদেবীর তিন মূর্ত্তি ধ্যান, তিন বার শ্রীবিষ্ণু উচ্চারণ-পূর্ব্বক আচমন, তিন গণ্ডূষ গঙ্গাজলপান, তিন ফেরতায় এক দণ্ডী ও এইরূপ তিন দণ্ডী পৈতা, ৩৩ বা ৩৩ কোটি দেবতা, ত্রৈলিঙ্গস্বামী,—এমন কি, বৌদ্ধের ত্রিরত্ন, ত্রিপিটক, খৃষ্টানের Trinity,—পরম পবিত্র। ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের 'নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে'। 'সর্ব্বসিদ্ধেস্ত্রয়োদশী' যাত্রিক দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বেজায় মিষ্ট হইলেও ত্রিমধু ব্রাহ্মণের পাতে বেশ সাজে, তেহাই দিলে গীত-বাদ্য খুব মজে, আর বাঁয়াতবলা ডুগডুগী ঢোলকের চাঁটার কর্ণবধিরকারী শব্দের তুলনায় ত্রিতন্ত্রীর (সেতারের) ঝঙ্কার বড় মধুর বাজে। নারীদেহে ত্রিবলি-রেখায় চক্ষুঃ জুড়ায়, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে একঘেয়ে পয়ারের পর ত্রিপদীচ্ছন্দে কর্ণ জুড়ায়, 'তেমাথার' পরামর্শে হৃদয় জুড়ায়। বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের (৩×৩=৯) আদর, বাঙ্গালা স্কুলে ত্রৈবার্ষিক পাশের কদর, গ্রহদোষখণ্ডনে ত্রিলৌহের ও ত্রিরত্নের তথা নবরত্নের * এবং রোগপ্রশমনে ত্রিকটু ও ত্রিফলার অসামান্য গুণ। দুঃখের বিষয়, ত্রিফলার জলেও রোগশয্যাশায়ী লেখকের উপকার হইতেছে না। অতএব এইখানেই 'তেরোস্পর্শ'কে পরিহার; পাঠক তো পরিত্রাণ পাইলেন, লেখকের ললাটলিপিতে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন!

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* লেখক এই জন্য অঙ্গুরীয়ে ত্রিরত্ন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন ও নবরত্ন-ধারণেরও পরামর্শ পাইয়াছেন।

বৌদ্ধদিগের প্রেততত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

পালিবৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব

মৃত্যুর পর মানুষের পরলোকগত আত্মা ভাল এবং মন্দ কায অনুসারে ফলভোগের নিমিত্ত পৃথিবীর আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—এ ধারণা বৌদ্ধধর্ম্মের একটি গোড়ার ধারণা। বৌদ্ধসাহিত্যে প্রেত শব্দটি আত্মা শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র। প্রেত শব্দের মূল অর্থ লোকান্তরিত প্রাণী। সুতরাং প্রেত বলিতে পরলোকগত আত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে। চাইল্ডার্স ও প্রেত শব্দকে মৃত ব্যক্তির আত্মা—এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। (১) পেতবথু নামক পালিগ্রন্থখানিতে প্রেত এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। পেতবথু কে এই জন্য সূত্রপিটকের ক্ষুদ্দক নিকায় গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পালি ধর্ম্মসংহিতা প্রভৃতির পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বেও পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষদের অস্তিত্বে হিন্দুরা বিশ্বাস করিতেন (২) এবং তাঁহাদের নামে তর্পণ করার পদ্ধতি হিন্দুদের ধর্ম্মেরও একটা অঙ্গ ছিল। হিন্দুদের এই চিরন্তন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই বৌদ্ধগণ প্রেতলোক—প্রেত বা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে পিতৃপুরুষ নামে এক শ্রেণীর অশরীরী আত্মার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা মাসের কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের অমৃত পান করে।(৩) এই সব পিতৃপুরুষ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। পরিবারবিশেষের পিতা—সম্প্রদায়বিশেষের পিতা—জাতিবিশেষের পিতা—ইহাদের এইরূপ নানাপ্রকারের শ্রেণীবিভাগ আছে। এই সব আত্মার কায ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে নানা রূপকের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত।

(1) R. C. Childers, Pali Dictionary, p. 378

(2) Sir Charles Eliot, Hinduism and Buddhism, Vol. 1. p. 338

(3) Ragozin, Vedic India, p. 177

ইঁহারা রাত্রির কালো ঘোড়াটার গায়ে মণিমুক্তার সাঁজোয়া অর্থাৎ তারাহারের সন্নিবেশ করেন; রাত্রির বুকে অন্ধকার লেপিয়া দেওয়া, দিনের বুকে আলোকের রেখাপাত করা, স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যকে একসঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া—এ সমস্তই এই সব পিতৃপুরুষের কায। তাঁহাদিগকে 'সূর্য্যপ্রহরী' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পিতৃপুরুষরা সোমরস ভালবাসেন এবং সোমরস পান করেন। দেবতাদিগের সঙ্গে প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবার এবং অর্ঘ্য প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শ্রাদ্ধ প্রভৃতি স্মারক ব্যাপারেই তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য গোধূমের পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া পিণ্ডদানেরও ব্যবস্থা আছে। (১)

পিতৃপুরুষকেও যে মানুষের অর্ঘ্যের উপরে নির্ভর করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হয়, এ বিশ্বাসের নিদর্শন কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রেই নহে, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও প্রচুর পাওয়া যায়। অমৃতায়ুর্ধ্যানসূত্র উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদিগের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থে জম্বুদ্বীপের প্রেতলোকের বহু ক্ষুধার্ত্ত প্রেতের কথার উল্লেখ আছে। (২) অঙ্গুত্তরনিকায় আর একখানি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থের মতে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বলেই প্রেতলোকে প্রেতাত্মারা আনন্দের অধিকারী হয়েন। (৩) যাঁহারা ধার্ম্মিক এবং দানশীল,তাঁহারা যে কেবল তাঁহাদিগের জীবিত আত্মীয়স্বজনেরই উপকার করেন, তাহা নহে, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রেতাত্মাদেরও প্রভূত উপকার সাধিত হয়। (৪) প্রেতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মচারী বা বংশধররা যে সমস্ত খাদ্য প্রেতদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন, তাহার উপরেই তাহাদিগের জীবনধারণ নির্ভর করে। (৫) অঙ্গুত্তর নিকায়ে পাঁচ রকমের

(1) Ibid., p. 336.

(2) Buddhist Mahayana Sutras, S. B. E., Vol, XLIX, p. 165.

(3) Vol. I. pp. 155-156

(4) Vol. III, p. 78, Vol. IV, p. 244

(5) Vol. V. p. 269 fol.

বলির নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। (১) যে প্রেতের উদ্দেশে বলি দেওয়া হয়, সে বলির অর্ঘ্য গ্রহণ না করিলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। অন্য যে কোনও প্রেত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে পিণ্ডের প্রত্যাশা করিতেছে, সে-ই আসিয়া সে অর্ঘ্য গ্রহণ করে। কেহ গ্রহণ না করিলেও পিণ্ডদান পণ্ড হয় না। কারণ পিণ্ডদাতার নিজেরও ইহার ফল উপভোগ করিবার অধিকার আছে। (২) পিতা মাতা প্রেত-লোকে পুত্রের নিকট হইতে পিণ্ডের প্রত্যাশা করেন। (৩) প্রেতলোকে আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে প্রেতাত্মারা যে সমস্ত বলির প্রত্যাশা করেন, তাহার একটির নাম পূর্ব্ব-প্রেতবলি। (৪) নিমিজাতকে সাগর, মুসলিন্দ, ভগীরস প্রভৃতি নৃপতির নাম পাওয়া যায়—যাঁহারা দানের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিলেও পাপের জন্য প্রেতলোকে গমন করিয়াছিলেন। (ফৌজবোল, জাতক, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৯৯-১০১) বেস্‌সন্তর জাতকের মতে প্রেতাত্মারা তাহাদিগের পাপের জন্য প্রেত-লোকে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে। (৫) পক্ষান্তরে জাতকে যামহনু, সোমযাগ, মনোজব, সমুদ্দ, ভরত প্রভৃতি এমন অনেক মুনি-ঋষিরও নামের উল্লেখ আছে—যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সাধনার বলে প্রেতভবনে গমন না করিয়াই উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৬)

মিসেস এস ষ্টিভেনসেন দেখাইয়াছেন—হিন্দুদের ধারণা অনুসারে প্রেতের কণ্ঠনালী সূচের ছিদ্রের মত সরু। সুতরাং তাহারা জলও পান করিতে পারে না, নিশ্বাসও ফেলিতে পারে না। তাহাদের আকৃতি এরূপ যে, দাঁড়াইয়া থাকাও তাহাদিগের পক্ষে কঠিন, বসিয়া থাকাও তাহাদিগের পক্ষে সহজ নহে। সুতরাং তাহাদিগকে সর্ব্বদা বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে হয়। (৭) যে মানুষ আত্মহত্যা করে, সে প্রেত অথবা ভূতযোনি লাভ করে। প্রেতের জীবন অবিচ্ছিন্ন দুঃখের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হয়। (১) প্রেতের মুক্তির জন্য নানা রূপ প্রায়শ্চিত্ত-বিধি আছে। মৃত্যুর সময় হঠাৎ অপবিত্র জিনিষ স্পর্শ করা, অমুণ্ডিত অবস্থায় বিছানায় মৃত্যু, মৃত্যুর পূর্ব্বে অস্নাত অবস্থায় থাকা ইত্যাদি ৩২ রকমের আনুষ্ঠানিক অপরাধ আছে। (২) প্রায়শ্চিত্ত-হোমের দ্বারা এই সব অপরাধ খণ্ডন করা যায়। মানুষের প্রেতাত্মা অশরীরী অবস্থা হইতে যাহাতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, সে জন্য পুরোহিতের দুইটি বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ব্যবস্থা আছে। (৩)

স্পেন্স হার্ডিও দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা হইতে প্রেতসম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব রূপকথায় লোকান্তরিক নরকের অধিবাসীরাই প্রেত নামে অভিহিত। তাহাদিগের দেহের দৈর্ঘ্য ১২ মাইল, হাতে তাহাদিগের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নখ আছে। তাহাদিগের মাথার উপরে মুখ এবং মুখের হাঁ সূচের ছিদ্রের মত ক্ষুদ্র। মানুষের এই পৃথিবীতেও একটি প্রেতলোক আছে—তাহার নাম নিঝামাতন্হা। এই প্রেতলোকের প্রেতের দেহগুলি সব সময় জ্বলিতে থাকে। তাহারা স্থির হইয়া এক দণ্ডও কোথাও নিশ্চল থাকিতে পারে না, সর্ব্বদা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এইরূপ অব্যবস্থিতভাবে একটি সম্পূর্ণ কল্পকাল ধরিয়া তাহারা অবস্থান করে। তাহারা কোন খাদ্য, এমন কি, জলবিন্দুও স্পর্শ করিতে পারে না। রোদন তাহাদিগের চিরন্তনের সঙ্গী। (৪) ইহারা ছাড়া আরও অনেক রকমের প্রেত আছে। ক্ষুপ্পিপাসা প্রেতের মস্তকে পরিধি ১ শত ৪৪ মাইল, জিহ্বার দৈর্ঘ্য ৮০ মাইল। তাহাদিগের দেহ প্রকাণ্ড লম্বা এবং অত্যন্ত সরু। কালকঞ্জক প্রেত ভয়ানক স্বজাতিদ্বেষী। তাহারা অনবরত আগুন এবং অস্ত্রের যন্ত্র লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ এবং আহত করে। (৫) স্মৃতি বলেন, উপজীবী নামেও এক প্রকারের প্রেত

(1) Vol. II. p. 68
(2) Anguttara Nikaya, Vol. V. p. 269
(3) Ibid Vol. III. p. 43
(4) Ibid Vol II. p. 68 Vol. III. p. 45
(5) Fausböll, Jataka, Vol. VI. p. 595
(6) Ibid Vol. VI. p. 99
(7) Mrs. S. Stevenson, The Rites of the Twice-born, p. 191

(1) Ibid, p. 199
(2) Ibid, p. 168
(3) Ibid, p. 174
(4) Spence Hardy, Manual of Buddhism, pp. 59—60
(5) Ibid p. 60

আছে। (১) প্রেতবত্থু কথাতে পাওয়া যায়, থের লক্ষণের সঙ্গে মহামোগ্‌গল্লান যখন গিজ্ঝকুট হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা দিব্য চক্ষুর দ্বারা অজগর নামে এক প্রকারের প্রেতকে দেখিতে পায়েন। প্রেতটির মাথা হইতে পা এবং পা হইতে মাথা সমস্ত শরীর আগুনের শিখায় ঘেরা। দেখিয়া মোগ্‌গল্লান হাসিয়া উঠায় লক্ষণ এই হাস্তের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তখন প্রশ্নটি বুদ্ধের সম্মুখে উত্থাপন করিতে বলেন। প্রশ্নটি বুদ্ধের সম্মুখে উত্থাপন করা হইলে তিনি বলেন—বোধিক্রমের পাদদেশ হইতে তিনি প্রেতটিকে দেখিয়াছেন। কস্‌সপ বুদ্ধের সময় সুমঙ্গল নামে এক জন মহাজন বুদ্ধের জন্ত একটি স্বর্ণবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক দিন অতি প্রত্যূষে বুদ্ধের উপাসনার জন্ত তিনি বিহারে যাইবার সময় বিশ্রামভবনের একটি গোপন স্থানে এক জন লোককে শায়িত অবস্থায় দেখিতে পায়েন। তাহার পদে তখনও কর্দম লাগিয়া ছিল। মহাজন মনে করিলেন, লোকটা হয় ত বা তস্কর—সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াইয়া অবশেষে ভোরের দিকে এখানে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তস্করকে ডাকিয়া সেই কথা বলায় সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহাজনের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্ত মরিয়া হইয়া উঠে। সাতবার মহাজনের গৃহ এবং ধানের ক্ষেত পোড়াইয়া দিয়া এবং সাতবার তাঁহার গাভীসমূহের পা কাটিয়া দিয়াও তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ না হওয়ায় মহাজনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুটি কি, তাহারই সন্ধানলাভের জন্ত সে অবশেষে মহাজনের চাকরদের সঙ্গে মিতালী পাতাইয়া লয় এবং বিহারটিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু জানিতে পারিয়া এবার সে বিহারটিতেই অগ্নি সংযোগ করে। এই সব দুষ্ক্রিয়ার জন্ত সে এই জ্বালাময় প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) ধম্মপদ-ভাষ্যে আরও একটি প্রেতের উল্লেখ আছে—তাহার মাথা শূকরের মত হইলেও দেহ ঠিক মানুষের মতই। গণ্ডদেশ তাহার স্ফোটকে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত স্ফোটক হইতে কৃমি-কীট অনবরত বাহির হইয়া আসিতেছে। কস্‌সপ বুদ্ধের সময় একটি বিহারে দুই জন ভিক্ষু বাস করিতেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা অত্যন্ত নিবিড় ছিল। এক দিন বুদ্ধের বাণীর প্রচারক আর এক জন ভিক্ষু অতিথি-ভাবে তাঁহাদিগের সেই বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভিক্ষার সুবিধা এবং স্থানটির সৌন্দর্য্য এই অতিথি ভিক্ষুকে মুগ্ধ করায় সে মনে ভাবিল, অন্ত দুই জন ভিক্ষুকে সে যদি এই স্থানটি হইতে বিতাড়িত করিতে পারে, তবে সেই বিহারের সমস্ত সুখ-সুবিধা একা উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে। অতঃপর সে দুই বন্ধুর ভিতর বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্ত চেষ্টা আরম্ভ করিল। এক দিন গোপনে বড় ভিক্ষুকে ডাকিয়া সে বলিল, "ছোট ভিক্ষু আমাকে বলিয়াছে—তুমি ভাল লোক নও এবং তুমি বুদ্ধের উপদেশও পালন কর না। সুতরাং খুব সাবধানে তোমার সহিত মিলামিশা করা উচিত।" তাহার পর সে ছোট ভিক্ষুর নিকট গিয়াও সেই একই অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহাকেও ডাকিয়া সে বলিল, "বড় ভিক্ষু আমাকে বলিয়াছে—তুমি ভাল লোক নও এবং তুমি বুদ্ধের উপদেশও পালন কর না। সুতরাং তোমার সহিত খুব সাবধানে মিলামিশা করা উচিত।" এইরূপে দুই বন্ধুর ভিতর সে এরূপ একটা বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বসিল যে, দুই বন্ধু বিহারের ভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং সে একা বিহারের সমস্ত সুখ-সুবিধা উপভোগ করিতে লাগিল। পরে দুই ভিক্ষু আবার পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ছোট ভিক্ষু তখন তাঁহার ব্যবহারের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বড় ভিক্ষুও সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ছোট ভিক্ষুকে বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত অনুরোধ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। মনোমালিন্সের কারণটাও তখন আর তাঁহাদিগের কাছে অবিদিত ছিল না এবং নবাগত অতিথিকেই তাঁহারা এ জন্ত দায়ী করিয়াছিলেন। এই সব দুষ্ক্রিয়ার জন্ত নবাগত ভিক্ষুটি পূর্ব্বোক্ত ধরণের প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। দীঘ-নিকায়ের (১) আটানাটিয় সুত্তন্তে কুম্ভণ্ড নামক প্রেতের উল্লেখ আছে। কুম্ভণ্ডের এক জন প্রভু ছিল, তাহার নাম বিরূঢ়ক।

(1) Childers, Pali Dictionary, p. 379

(2) Dhammapada Commentary, Vol. III. pp. 60—64.

(1) Digha-Nikaya (P. T. S.) Vol. III, pp. 197—198.

বিরূঢ়ের অনেকগুলি পুত্র ছিল। সুত্তন্তে প্রেতদিগকে নিন্দুক, খুনী, দস্যু, ক্রূরচিত্ত, বদমাইস, চোর, প্রতারকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

পেতবত্থুতে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেতরা তাহাদিগের সাবেক বাড়ীতে আসিয়া হয় দেওয়ালের বাহিরে, না হয় বাড়ীর এক কোণে, হয় রাস্তার এক ধারে, না হয় বাড়ীর সীমানার প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকে। (পৃঃ ৪)

প্রেতলোকে জীবনধারণের জন্য কোনরূপ চাষবাস, গোপালন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা নাই। (১) সুতরাং যাহারা মৃত আত্মীয়স্বজনের পরলোকগত আত্মার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা কল্যাণ কামনা করে, তাহারা ভাল খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য সঙ্ঘে দান করে, এবং দানের পুণ্য প্রেতের উদ্দেশে অর্পণ করে। কারণ, এই সব সৎকার্য্য অনুমোদন করার দ্বারাও প্রেতরা উপকৃত হয়।

মহানিদ্দেশে আছে "পেতম্ কালকতম্ ন পস্সতি।" যখন প্রিয়জন পরলোক গমন করে এবং প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে আর দেখা যায় না। (১) মৃত্যুর পর প্রেতযোনিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পৃথিবীতে কেবলমাত্র নামটিই অবশিষ্ট থাকে। (২) এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে প্রেতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে তাহাদের চেহারা ও তাহাদের কার্য্যকলাপের বর্ণনার কিছুমাত্র অভাব নাই।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

(1) Petavatthu (P. T. S.) p. 5.

(1) Niddesa (P. T. S.) Vol. I. p. 126
(2) Ibid, p. 127

নির্ব্বাচন-রঙ্গ

বানরাকার নরবংশের ইতিহাস

ভূতত্ত্ববিদ্গণ মৃত্তিকাস্তর হইতে জীবকঙ্কাল আবিষ্কার করিয়া, কোন্ শ্রেণীর জীব কোন্ যুগে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহার ইতিহাস রচনা করিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবসমূহের কঙ্কালবিশেষ আবিষ্কার করিয়া পণ্ডিতগণ তাহা হইতে সেই জীবের প্রকৃত আকৃতি নিরূপণ করিতেছেন। মার্কিণ মুলুকের যাদুঘরে এইরূপ বহু জীবের রচিত দেহ রক্ষিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নরকঙ্কাল সংক্রান্ত আবিষ্ক্রিয়ায় ভূতত্ত্ববিদ্গণ অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। মৃত্তিকাস্তর হইতে বিভিন্ন জীবদেহের কঙ্কালসমূহ যে পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে, মনুষ্যকঙ্কাল তেমন ভাবে হয় নাই। তথাপি আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণ যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব—বিস্ময়কর।

প্রগৈতিহাসিক যুগের মানবগণ, অথবা মনুষ্যের সন্নিহিত স্তরের জীবগণ সাধারণতঃ অরণ্যপ্রিয় ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। যদি অরণ্যবাসী না হইয়া তাহারা সমতলক্ষেত্রে অথবা নদনদীর উপর বসবাস করিত, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ বহু পরিমাণে নরকঙ্কালসমূহ আবিষ্কার করিতে পারিতেন। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদগণ আলোচনাফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাচীনতর যুগে মানবগণ সর্ব্বদা জল হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসিত। জলের উপর সাধারণতঃ বসবাস করা তাহাদের প্রিয় ছিল না। সন্তরণবিদ্যায় মানবের জন্মগত অধিকার ছিল না। অন্যান্য পশু যেমন জন্মাবধি সন্তরণে পারদর্শী হয়, মানব তাহা হইতে পারে না। তাহাকে চেষ্টা করিয়া সন্তরণকৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। এই কারণেই মানব জল হইতে দূরে থাকিত।

যে জীব জলাশয়ের সন্নিহিত স্থানে বাস করে, অথবা মৎস্যাদি শিকারের জন্য জলমধ্যে মাঝে মাঝেও প্রবেশ করে, তাহার কোন না কোন বংশধরকে জলের মধ্যে সমাহিত হইতেই হইবে। তাহার পর সেই মৃত দেহের উপর 'পলি' পড়িয়া ক্রমে উহা মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইতে পারে। যাহারা সমতলক্ষেত্রে দেহ ত্যাগ করে, মাঝে মাঝে তাহাদের কাহারও কাহারও দেহ হয় ত সম্পূর্ণ উপেক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারে। কালে বায়ুতাড়িত বালুকণা সকল মৃতদেহের অস্থির উপর সঞ্চিত হইতে পারে। কিন্তু যাহারা অরণ্যে প্রাণত্যাগ করে, অন্য জীব সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, অথবা গলিতপত্র, শিশির ও জলের প্রভাবে শীঘ্র দেহাস্থি চূর্ণ হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাযেই অরণ্যবাসী জীবের কঙ্কাল পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। এই কারণেই মানবের পূর্ব্বপুরুষদিগের কঙ্কালাবশেষ অতি সামান্য পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ৫০ হাজার বৎসরের পূর্ব্বে পৃথিবীতে যে সকল মানবজাতীয় লোক বিচরণ করিত, তাহাদের কঙ্কাল দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী যুগের সম্বন্ধে বিশেষ হতাশ হইবার প্রয়োজন হয় না। এই সময়ে 'নিয়ান্ডারথাল' (Neanderthal) ও ক্রো-ম্যাগ্নন্ (Cro-Magnon) জাতীয় মানব শীতপীড়িত হইয়া বর্ত্তমান যুগের ফ্রান্স, স্পেন ও জার্ম্মাণীর গুহানিচয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুগের মানবকঙ্কালাবশেষ, বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানফলে উল্লিখিত গুহাসমূহ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গুহামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শীতের প্রবল আক্রমণ এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্বাপদ সমূহের গ্রাস হইতে মানবগণ আত্মরক্ষা করিতে পারিত। গুহার মুখে তাহারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিত, সেই অগ্নিতে মাংস সিদ্ধ করিয়া তাহারা ভক্ষণ করিত, শীতের কবল হইতে আত্মরক্ষার কার্য্যও ইহাতে সম্পন্ন হইত। গুহাবাসী হইবার পর হইতে সে যুগের মানবগণ, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বহু নিদর্শন, সে যুগের অস্ত্রাদি, নিহত পশুর অস্থি এবং তাহাদের দেহের কঙ্কালাবশেষও রাখিয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন হইতে নৃতত্ত্ববিদ্গণ অতি প্রাচীন যুগের মানবগণের কার্য্যকলাপ—তাহাদের খাদ্য, শিকার, অবসরযাপনের প্রণালী, তাহাদের গৃহস্থালীর বিবিধ উপচারসংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যবদ্বীপের 'টিনিল' মনুষ্য—৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানুষ।

মানব কোন্ জীব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তবে প্রাচীনতম যুগের কঙ্কালসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ায়, বৈজ্ঞানিকগণ একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছেন। তাহার বেশী কিছু নহে।

বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নর ও বানর একই শাখা হইতে উদ্ভূত ও আবর্ত্তিত হইয়াছে। যে জীববংশ হইতে উদ্বর্ত্তনের প্রভাবে ক্রমে বানর ও পরে বর্ত্তমান মানবের আবির্ভাব, তাহার প্রথম অবির্ভাবের কাল নিরূপণ করা কঠিন। তবে বৈজ্ঞানিকগণ এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেড় কোটি বৎসর হইতে জীবদেহে পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। আরও পূর্ব্ব হইতে আবর্ত্তনের আরম্ভ হওয়া বিচিত্র নহে; তবে উহার পরে নহে, ইহা সুনিশ্চিত।

গুহাবাসী মানব—৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের নিয়ানডাথালার মানব।

পৃথিবীতে এক সময়ে শুধু সরীসৃপ বিচরণ করিত। বৈজ্ঞানিকগণ এই যুগকে "Cretaceous Period" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সে যুগে চতুষ্পদ জীবের প্রাদুর্ভাব ছিল না বলিলেই হয়। ৫০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা পৃথিবীতে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভূতত্ত্ববিদ্গণ যে সকল অতিকায়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপের কঙ্কাল আবিষ্কার করিয়া যাদুঘরে রাখিয়াছেন, তাহা হইতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

Eocene অর্থাৎ জগতের উষাযুগে স্তন্যপায়ী জীবসমূহের সংখ্যাধিক্য ঘটে এবং তাহারা নানা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইতে থাকে। সমগ্র পৃথিবী তখন স্তন্যপায়ী জীবে ভরিয়া গিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এইরূপ অনুমান। সে যুগে যে সকল জীব বিচরণ করিত, এখন তাহাদের অনেকগুলি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এই সকল স্তন্যপায়ী জীবের মধ্যে বানরজাতীয় জীবই শ্রেষ্ঠ ছিল। বানর, মনুষ্যাকৃতি বানর অথবা বানরাকৃতি মানব সে যুগে বিদ্যমান ছিল।

পিল্টডাউন্ মনুষ্য—১ লক্ষ ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ।

ক্রোম্যাগনন্ মানব—২০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মানুষ।

ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী, গরিলা প্রভৃতি বানরজাতীয় জীব। বানর হইতে নরের উৎপত্তি কথাটা ঠিক নহে বলিয়া আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, বানর ও মানব একই জাতীয় জীব হইতে বিবর্ত্তন বা উদ্বর্ত্তনের প্রভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। বানরকে নরের Cousin বা ভ্রাতা বলাই ঠিক। কুকুর, ঘোড়া, সিল মৎস্য দূর-সম্পর্কের ভ্রাতা। অর্থাৎ জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণায় এই দাঁড়ায় যে, একই স্তন্যপায়ী জীব বিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে অশ্ব, কুকুর প্রভৃতি চতুষ্পদজীবে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং সেই একই বিবর্ত্তনবাদের সাহায্যে এক শাখা বানরে এবং অপর শাখা উদ্বর্ত্তিত হইয়া নরে পরিণত হইয়াছে। জীবকঙ্কাল ও ভূস্তর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

Miccene যুগের (মধ্য বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগ) আরম্ভকাল প্রায় ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে। স্তন্যপায়ী জীবসমূহ এই যুগেই চরম পরিণত অবস্থা লাভ করিয়াছিল। Eocene বা উষাযুগের অধিকাংশ স্তন্যপায়ী জীব এই যুগে আবর্ত্তিত হইয়া অনেকটা স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুগে Sivapithecus নামক প্রাচীনতম যুগের বানরাকৃতি জীবের অস্থি ভারতবর্ষের মৃত্তিকান্তর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার কঙ্কালাবশেষ পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ জীবের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নরদেহের অনেক লক্ষণ তাহাতে বিকসিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহাকে বানর ব্যতীত নর বলা চলে না।

পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায়, ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে নর ও বানরের পূর্ব্বপুরুষ এক। তবে বানরের সহিত নরের সম্বন্ধ ১০ লক্ষ অথবা ততোঽধিক বৎসর পূর্ব্বে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত কোনও কথা বলিতে চাহেন না। কারণ, সময় নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য; বিশেষতঃ সকল প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইতে পারে নাই। অনুসন্ধানফলে কালে হয় ত আরও প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানফলে প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্লিওসিনি যুগ হইতেই মানুষের প্রথম আবির্ভাব। যবদ্বীপে ভূস্তর হইতে যে নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে Pithecanthropus বা বানরাকৃতি নর এই আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, বানরাকৃতি হইলেও ইহাকে অবশ্যই নর বলা যাইতে পারে। মস্তকের খুলির গঠন দেখিলেই প্রমাণিত হয় যে, মানবের উপযোগী মস্তিষ্ক ইহাতে বিদ্যমান ছিল। কঙ্কালটিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নরমুণ্ডে পরিণত করা হইয়াছে। যথাসম্ভব—সে যুগে যেরূপ ছিল—তেমনই ভাবে পুনর্গঠিত করা হইলেও ঠিক তেমনটি হয় ত হয় নাই। হয় ত আধুনিক যুগের মানবের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকিতে পারিত, অথবা পশুত্বের দিকে মুখাবয়বের অধিকতর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতে পারিত। যে যুগে এইরূপ বানরাকার নরের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহার জীবনযাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস নাই। ৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিত। এই সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বের মানবগণ কি কি বস্তু ব্যবহার করিত, তাহারও নিদর্শন দুর্লভ। যে ভূস্তরের মধ্যে এই মানবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই স্তরেই পাষাণ-টুকরাসমূহ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিকে ঠিক পাষাণনির্ম্মিত যন্ত্র না বলিয়া পাতরের টুকরা বলিলেই ঠিক হয়। সম্ভবতঃ বানরাকার নর এই সকল পাষাণ সাহায্যে সে যুগে বাদাম প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া লইত, অথবা আহারের উপযোগী পশুকে হত্যা করিবার জন্য পাষাণখণ্ড নিক্ষেপ করিত।

যবদ্বীপে প্রাপ্ত এক নরকপালের অস্থিসংস্থান বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, তখনকার মানব অপেক্ষাকৃত সোজা হইয়া চলিত। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সম্মুখের মাংসপেশীসমূহও বেশী ব্যবহৃত হইত। চতুষ্পদের মধ্যে সম্মুখের পদযুগল যদি সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে কালক্রমে ‑বিবর্ত্তনের ফলে উহা হস্তে পরিণত হইয়া থাকে, ইহাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। প্রয়োজনকালে সম্মুখের পদযুগল আপনা হইতে কিছু ধারণ করিতে অভ্যস্ত হয়। ইহার ফলে পর্য্যবেক্ষণশক্তি স্ফূর্ত্ত হয়। ক্রমে মস্তিষ্ক কার্য্য করিতে থাকে। হস্তসাহায্যে কোনও পদার্থ গ্রহণ করিয়া চক্ষুর দ্বারা পরীক্ষা করিতে করিতে মস্তিষ্কের অনুভূতি বাড়িতে থাকে। হস্ত, নয়ন এবং মস্তিষ্কের পৌনঃপুনিক ক্রিয়ার ফলে বিচারশক্তি বর্দ্ধিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, এইরূপেই সাধারণ পশু হইতে
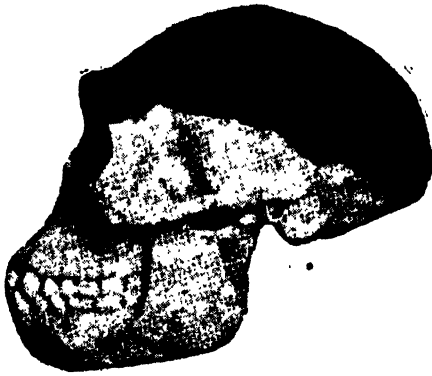
১নং নরকপাল।

মানবের উৎপত্তি। ইহারই নাম বিবর্ত্তনবাদ।

ক্রমে সেই জীব অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখে। সম্ভবতঃ প্রথমে আকস্মিক কারণে মানব যন্ত্রের ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলিগুলির সাহায্যে কোনও বস্তু ধারণ করিতে করিতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলিগুলির বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩নং নরকপাল।

অনুসন্ধানফলে বৈজ্ঞানিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রথম মানব তুষারযুগ বা Pleistocene যুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই যুগের স্থিতিকাল সম্ভবতঃ ৪ লক্ষ বৎসর। ইহার পর বর্ত্তমান যুগের আরম্ভকাল সম্ভবতঃ ৩০ হাজার বৎসর। তুষার যুগেই বিবর্ত্তনের ফলে জীব হইতে মানবের প্রকৃত পরিণতি ঘটে। তুষার যুগ ৭টি স্তরে বিভক্ত। ৪ বার পৃথিবী তুষারপ্লাবনে ডুবিয়াছিল, আবার উষ্ণতার প্রভাবে প্লাবন সরিয়া গিয়াছিল। বাকী ৩টি স্তরকে প্রত্যেক তুষারপ্লাবনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কাল বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ তুষার যুগ ; এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উষ্ণ (তুষার যুগের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল) যুগ। তুষার যুগের স্থিতিকাল, প্রত্যেকবার, ২৫ হাজার বৎসর করিয়া। প্রত্যেক তুষার যুগের পরবর্ত্তী কালের স্থিতি যথাক্রমে,৭৫ হাজার, ২ লক্ষ এবং ১ লক্ষ বৎসর। অর্থাৎ—

১ম—তুষার যুগ ২৫ হাজার বৎসর
১ম—পরবর্ত্তী যুগ ৭৫ হাজার বৎসর (উষ্ণ)
২য়—তুষার যুগ ২৫ হাজার বৎসর
২য়—পরবর্ত্তী যুগ ২ লক্ষ বৎসর (উষ্ণ)
৩য়—তুষার যুগ ২৫ হাজার বৎসর
৩য়—পরবর্ত্তী যুগ ১ লক্ষ বৎসর (উষ্ণ)
৪র্থ—তুষার যুগ ২৫ হাজার বৎসর
তুষার যুগের পরবর্ত্তী কাল ৩০ হাজার বৎসর (উষ্ণ)

২নং নরকপাল।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই ৮টি যুগের উপর নির্ভর করিয়া মানব-জাতির ইতিবৃত্ত রচনা করিতেছেন। কারণ, তুষার যুগ ও তাহার পরবর্ত্তী কালের ভূস্তর হইতে যে সকল কঙ্কাল পাওয়া
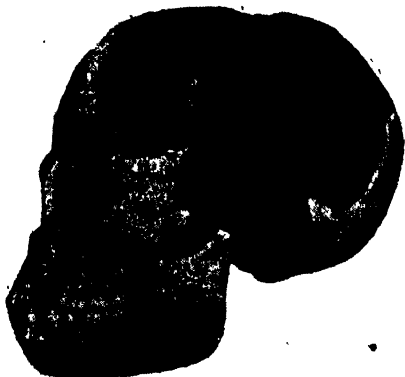
৪নং নরকপাল।

যাইতেছে, তাহাদের অস্থিসংস্থান প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়াই ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে। সুতরাং এই কাল-বিভাগ তাঁহাদের অনুসন্ধানের পক্ষে অপরিহার্য্য।

তুষার যুগের পরবর্ত্তী যুগ সুদীর্ঘকালব্যাপী; এবং মধ্য য়ুরোপের সীমা ছাড়াইয়া তুষারপ্লাবনও ব্যাপ্ত হয় নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য স্থানে মানব ক্রমবিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত অবস্থায় উন্নীত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল।

অনুসন্ধানফলে জানা গিয়াছে যে, ২ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে মানবজাতীয় জীব পৃথিবীতে বিচরণ করিত, তাহাদের শব্দ উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা ছিল, তবে তাহা স্পষ্ট নহে। এই জাতীয় মানবের যে চোয়াল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত দীর্ঘ। যে স্থানে কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল, তথায় উহার মজ্জা বাহির করিয়া উদরপূর্ত্তি করিত। এই সকল জীবকে মানব আখ্যা দিলেও তাহাদিগকে ঠিক আমাদের মত মানুষ বলা চলে না। পৃথিবীর যেখানে যে প্রকার নর বর্ত্তমান যুগে দেখিতে পাওয়া যায়, এই জাতীয় মানব তাহাদের সকলের অপেক্ষা অবনতদেহ ছিল। তবে ইহাদের মস্তকের খুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মস্তিষ্ক আধুনিক নিম্নস্তরের কোনও মানবের অপেক্ষা কম ছিল না। বর্ত্তমান যুগের কোনও শক্তিশালী মল্লের দেহ যেরূপ—তখনকার মানবগুলি সেইরূপ বৃষস্কন্ধ, কপাটবক্ষ, মহাবলশালী ছিল। এই জাতীয় মানবের যে সকল কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, তখনকার মানব মাথা সোজা করিয়া রাখিত না, সম্মুখভাগে নত হইয়া থাকিত, দৃষ্টি—ভূমিসংলগ্ন
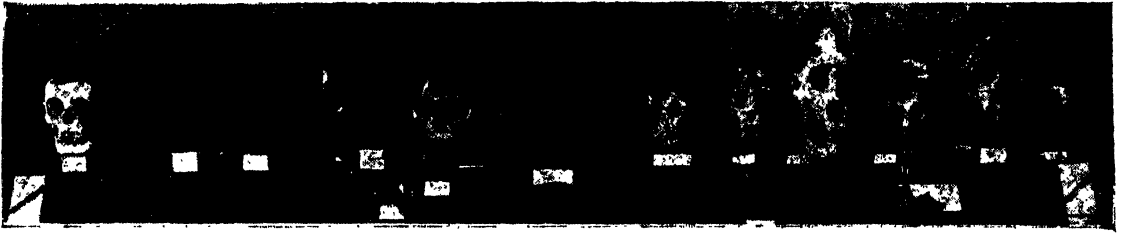
(১) আধুনিক নরকপাল, (২) ক্রোম্যাগনন নরকপাল, (৩) অষ্ট্রেলিয়ায় প্রাপ্ত নরকপাল, (৪) নিয়ানডারথালার নরকপাল, (৫) হেডেলবার্গ মানবের চোয়াল, (৬) পিল্‌টডাউন নরকপাল, (৭) যব দ্বীপে প্রাপ্ত নরকপাল নরমুণ্ডে পরিবর্ত্তিত হওয়ার অবস্থা; (৮) শিশু গরিলার মুণ্ড, (৯) বুড়া গরিলার মুণ্ড, (১০) শিম্পাঞ্জী, (১১) ওরাংওটার (১২) গীবন।

ছিল। ললাটদেশ চেপ্টা—পশ্চাদ্দেশে হেলিয়া থাকিত, ভ্রূযুগল উচ্চ এবং চিবুক অত্যন্ত হ্রস্ব ছিল। তবে সে যুগের ন্যায় দীর্ঘ নাসিকা এ যুগের কোনও মানবে দেখা যায় না। ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় গুহাবাসী মানব পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভগবান্ এই জাতীয় মানব সৃষ্টি করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, তাই বর্ত্তমান বুদ্ধিজীবী স্বতন্ত্র মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রস্তরনির্ম্মিত যন্ত্রাদিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জিনিষগুলি এমনই ভারী যে, বর্ত্তমান যুগের মানবের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে যুগের মানব অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিল। তাহাদের বাহুযুগলও সুদৃঢ়পেশীবহুল।

২ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যে জাতীয় মানব—Heidelberg মানব—পৃথিবীতে বিচরণ করিত, Neanderthaler জাতীয় মানব তাহাদের বংশধর নহে। ইহারা গুহাবাসী মানব। বৈজ্ঞানিকগণ এই নাম তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন। তুষারবন্যা বা হিমানীর প্রভাবে বাধ্য হইয়া এই মানবগণ য়ুরোপের পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শেষ তুষারবন্যার যুগে ইহারা পর্ব্বতগুহাতেই বসবাস করিত। সম্ভবতঃ সেই সময় মৃগ ও ক্ষুদ্র বন্য অশ্ব প্রভৃতি শিকার করিয়া, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। নিহত পশুর অস্থিগুলিও তাহারা গুহায় আনিয়া রাখিত।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এক জাতীয় নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে Piltdown বা উষাযুগের মানব আখ্যা দান করিয়াছেন। ১ লক্ষ ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই জাতীয় মানব পৃথিবীতে বিচরণ করিত। এই বানরাকৃতি নরের একাধিক কঙ্কাল সংগৃহীত হয় নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, এই সময়ের অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণ ও পীত বর্ণের মানব বিভিন্ন শাখায় পরিণত

হইয়াছিল। অবশ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে এই বিষয় লইয়া এরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া কোনও মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না। তবে শ্বেত-জাতি যেমন বিবর্ত্তিত হইতেছিল, উহারাও যে তেমনই বিবর্ত্তনের পাকে পড়িয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিতেছিল, সে বিষয়ে কাহারও মতানৈক্য নাই।

অবশেষে পৃথিবীতে Cro-Magnon জাতীয় মানবের আবির্ভাব হয়। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের মানবের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটায় এই জাতীয় মানব Neanderthal জাতীয় মানবগণের স্থান অধিকার করিতে থাকে। সম্ভবতঃ ক্রোম্যাগনন্ জাতীয় মানবগণ অন্যত্র বিবর্ত্তিত হইয়া নানা বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহারা কোথা হইতে কি ভাবে বর্দ্ধিত ও উন্নত হইয়াছিল, তাহার কোনও ইতিহাস বৈজ্ঞানিকগণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইহাদের দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিল; কঙ্কাল পরিমাপ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই জাতীয় মানবগণ প্রায় ৬ ফুট ৪ ইঞ্চ দীর্ঘ ছিল। পশুত্বের কোনও নিদর্শন তাহাদের দেহে ছিল না।

'নিয়ান্ডারথালার' মানবগণকে গুহা হইতে বিতাড়িত করিয়া ক্রোম্যাগনন্ মানব তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ফ্রান্স, স্পেন্ এবং জার্ম্মাণীর বহু গুহায় এই জাতীয় মানবকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অস্থি ও প্রস্তর-নির্ম্মিত ব্যবহার্য্য জিনিষ গুহামধ্যস্থ আবর্জ্জনারাশির মধ্যে সঞ্চিত ছিল। ইহা হইতে সে যুগের মানবের জীবনযাত্রা-প্রণালীর অনেক বিবরণ আবিষ্কার করা যায়। তাহারা তখন উপত্যকাভূমিতে হরিণ ও ক্ষুদ্রজাতীয় অশ্বাদি শিকার করিত। তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মানবগণের ন্যায় মৃগয়ালব্ধ মাংসে উদরপূর্ত্তি করিত বটে, তবে ইহারা শিল্পীও ছিল। অস্থির অপর নানাবিধ পশুর আকৃতি ক্ষোদিত দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে গুহাগাত্রে সুন্দর বর্ণচিত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সবই পশুর চিত্র। সে সকল চিত্রে নৈপুণ্য না থাকিলেও চেষ্টা যে ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয়জাতীয় পূর্ব্বপুরুষ কাহারা, বৈজ্ঞানিকগণ এখনও তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের ধারণা, দক্ষিণ এসিয়া হইতেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয়গণের পূর্ব্বপুরুষ য়ুরোপে গমন করিয়াছিল। এসিয়ায় ভূস্তর খনন করিলে সম্ভবতঃ সত্যের সন্ধান মিলিতে পারে, ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে চেষ্টা চলিতেছে, তবে সুবিশাল এসিয়ার কোন্ অংশের মৃত্তিকা-স্তূপের কোন্ স্তরে সে কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

ইব্রাহিম ও কাফের

সূর্য্য ডুবেছে অস্তসাগরে—আরক্ত পশ্চিম,
জলস্পর্শ করেনি এখনো সাধক ইব্রাহিম।
এক জনো আজ অতিথি-ভিখারী আসেনিক গৃহদ্বারে,
অনাথ ফকিরে না তুষি তাপস খায় না যে একেবারে।
ভৃত্যেরা সব অতিথির খোঁজে ঘুরে ঘুরে অবশেষে,
একটি জনের সাক্ষাৎ পেল মরু-প্রান্তরে এসে।
অশীতিবর্ষ বয়স তাহার—দুর্ব্বল অতি দীন,
কুব্জ পঙ্গু গলিতদন্ত বধির দৃষ্টিহীন।
তিন দিন হ'তে জুটেনি অন্ন, বেঁচে আছে জল পিয়ে,
মহাসমাদরে ভৃত্য আনিল প্রভুর গৃহে।
সাধক তাহারে তুষিল হর্ষে দিয়া নানা উপচার,
বহু ব্যঞ্জনে শোভিত অন্ন ধরিল সমুখে তার।
মুখে গ্রাস তুলি করিল বৃদ্ধ ভোজনের উদ্যোগ,
ঘটিল সহসা এ হেন সময়ে অপূর্ব্ব দুর্য্যোগ।
'হা-হা' ক'রে উঠে কহিল তখন তাপস ইব্রাহিম,
"কি কর কি কর কর না ভোজন রাখ গ্রাস মুসলীম।
কোরাণ মান না ? এক পা কবরে, হইয়াছ এত বুড়ো,
খোদাতালায় না স্মরি পিণ্ড গিলিতে যাচ্ছ মূঢ়।"
কহিল অতিথি "মানি না কোরাণ, নহিক মুসলমান,
অগ্নিরে পুজি— মানি নাক মোরা আর কোন ভগবান্।"
শুনিয়া তাপস কহিল, "কাফের, এক্ষনি দূর হও,
আমার এ গৃহে অন্নজলের তুমি অধিকারী নও।"
দৈববাণীতে ধ্বনিত হইল হেনকালে "আরে মূঢ়,
আমি যারে নিজে সহিয়া গিয়াছি আশীটি বছর পূরো,
খাইতে দিয়াছি, মোর দুনিয়ায় করিতে দিয়েছি বাস,
এক বেলা তারে সহিতে নারিলি, দিলি না মুখের গ্রাস।
কাফের সেও ত মোরি সন্তান, দেখিলি না হায় বুঝে,
অগ্নিরে যেবা উপাসনা করে, সে-ও আমারেই পুজে।"

কাল-বৈশাখী

১

কলিকাতা সহরে নহে, কিন্তু তাহা হইতে খুব বেশী দূরেও নহে, ভাগীরথীর তটপ্রান্তে একখানি সুন্দর বাগান-বাড়ীর সদর ফটক পার হইয়া এক দিন অপরাহ্লকালে একখানি গাড়ী আসিয়া ভিতরের অট্টালিকার দ্বারে পৌছিল। গাড়ীর শব্দে এক জন বর্ষীয়সী বিধবা রমণী ভিতর হইতে বাহির হইয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়ীর মধ্য হইতে একটি মধ্যবয়স্কা বিধবা মহিলা নামিয়া আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেই তিনি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "একলা যে? সুরেনকে সঙ্গে আন নি?"

এইরূপ একাকী আসা যে গৃহস্বামিনী পছন্দ করিবেন না, আগন্তুক তাহা জানিতেন। তিনি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "তার স্কুল কামাই হবে বলেই তাকে আনতে পারি নি। কিন্তু এমন হঠাৎ ডেকে পাঠায়েছ যে? খবর সব ভাল ত?"

"হাঁ, খবর ভাল। হঠাৎ নয়, অনেকদিন তোমাকে দেখি নি—চল ভিতরে এস।" এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া ভিতরে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাড়ী ঠিক সময়ে গিয়েছিল ত? নেমে ষ্টেশনে ব'সে থাকতে হয় নি? তোমাকে একলা আসতে হবে জানলে আমি বিন্দুকে পাঠিয়ে দিতুম।"

আগন্তুক চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপ একাকী আসা যাওয়া যে তাঁহাদের অভ্যাস আছে, অপ্রীতিকর হইবে মনে করিয়া এ কথা আর তিনি মুখ ফুটিয়া বলিলেন না।

উপরে একটা ঘরে বসিয়া দুই একটা সাধারণ কথা-বার্ত্তার পরে বাটীর গৃহিণী এই ডাকিয়া পাঠাইবার কারণ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "ভাগলপুর থেকে মানসীর বিয়ের একটা ভাল সম্বন্ধ এসেছে।"

যিনি আসিয়াছিলেন, তিনিই মানসীর মাতা। কন্যার আকস্মিক বিবাহের সম্বন্ধে তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এতে তোমার দুঃখের কোন কারণ নেই, বোন। পাত্র খুবই ভাল, তা না হ'লে আমি কথাই পাড়তুম না।"

মানসীর মাতা নির্ব্বাক্, স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তর যে কথাটা বলিতে চাহিলেও কোনমতে প্রকাশ করিতে পারিল না, গৃহিণী তাহা বুঝিলেন। তাঁহার শান্ত কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর হইল। তিনি কহিলেন, "কর্ত্তা বেঁচে থাকলে হয় ত তুমি যা চাও তাই হ'তো। কিন্তু এও ত তুমি জান, আমি তাতে অসুখী বই সুখী হ'তে পারতুম না। এখন তুমি যদি কিছু মনে না কর।"

"কি মনে করবো দিদি? তোমাদের ঋণ আমি জন্মে শোধ দিতে পারব না।" কথা কয়টি শেষ দিকে অশ্রুভারে যেন ভারী হইয়া আসিল। কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া গৃহিণী বলিতে লাগিলেন, "তুমি, মানসীর বাবা এবং কর্ত্তা ছিলেন এক দলের লোক, আর আমি ছিলুম চিরকালই অন্য দলের। তবে তখন তাঁর অধীন, যা বলতেন তাই হ'ত। এখন কিন্তু শ্বশুরের ধর্ম্মটা—আচার নিষ্ঠা—যাতে বজায় থাকে, তার জন্যে তোমার হাত ধ'রে বলছি।" এই কথা বলিয়া তিনি মানসীর মাতার হাতটা সহসা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিতেই, তিনি শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "অপরাধী করো না দিদি, তুমি যা বলবে তাই হবে। তোমার মতে অমত করলে এ অকৃতজ্ঞার নরকেও স্থান—"

দরজার বাহিরে জুতার শব্দ হইল। পরক্ষণেই একটি কুড়ি একুশ বছরের ছেলেকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ হইল।

"মাসীমা যে? কবে এসেছেন?" বলিয়া ছেলেটি প্রণাম করিয়া তাহার মাতার ও পরে মানসীর জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

২

"মা, ওমা ঘুমুচ্ছ? একবার উঠ ত।"

বসন্তের মা মধ্যাহ্নের নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়া ছেলের দিকে চাহিতেই সে বলিল, "তোমাকে উঠাতে হ'ল, মা। এখনই না বেরুলে কলকাতার গাড়ী পাব না।"

"হঠাৎ কল্‌কাতা কেন? আগে ত কিছু বলিস্ নি।"

"আগে কি জানতুম! এইমাত্র চিঠি পেলুম, মাসীমা লিখেছেন, মানসীকে আজই কোন্নগরে পৌঁছে দেওয়া চাই।"

মা যেন একটু কি ভাবিয়া আগ্রহের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, "তবে শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়, বাবা! যেন ট্রেণ ফেল্ হ'স্ নি, গাড়ী যুততে বলেছিস্?"

"না। দেরি হয়ে যাবে যে, মোটর সাইকেলেই যাই।"

কথাটা, বোধ হয়, জননীর তত মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন, "দেখ, সাবধানে যেও।"

বসন্ত চলিয়া গেল। তাহার মা কি একটু ভাবিয়া ডাকিলেন, "বিন্দু।" বিন্দু ঝি আসিয়া দাঁড়াইলে তাহাকে বলিলেন, "তোকে যে এখনই একবার বিরাজ ঘটকীর কাছে যেতে হবে, বাছা।"

"এখনই? কেন মা?"

"হাঁ। এখনই যা; পরে শুন্‌বি," তাহার পর স্বগতভাবে "ঘটকী মাগীর আবার দেখা পেলে হয়" বলিয়া, মনে মনে কি বিড়বিড় করিয়া বকিয়া, কপালে হাতটি ঠেকাইয়া, বসন্তের মা বলিলেন, "মা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা মানত কর্‌ছি, আমার মনস্কামনা যেন এবার পূর্ণ হয়!"

৩

কলেজের ছাত্রীগণের বসিবার ঘরে তখন দুই জন মাত্র কিশোরী গা ঘেঁসিয়া বসিয়া খুব মনোযোগের সঙ্গে একখানা পোষ্টকার্ড পড়িতেছিল। তাহাদের নবীন মন দুইটি যে সেই স্বল্পবার্ত্তাবহ চিঠিখানির ভিতর হইতে অন্যের অগোচরে একটা মধুর রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহা পান করিয়া মাতিয়া উঠিতেছিল, সে বার্ত্তা তাহাদের মুখ চোখ দিয়া বেশ স্পষ্ট ভাবেই ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। কার্ডখানি, সে বিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে প্রথম অধ্যক্ষ পড়িয়া তবে তাহার মালিকের হাতে দিয়াছিলেন; এবং তাহাতে এই মাত্র লিখা ছিল:—

"মানসি,

পরীক্ষার তাগাদে অনেক দিন তোমাকে দেখিতে যাইতে পারি নাই। আগামী শনিবার একবার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে, মাসীমাকেও দেখিয়া আসিব। তোমার খবর লইয়া না গেলে, মাসীমা রাগ করিবেন। সুতরাং কোন্ দিন তোমার ২টা হইতে ৩টার ভিতর ক্লাস নাই, শীঘ্র জানাইবে। ইতি—

বসন্ত।"

শেষের ছত্রটি পড়িয়া মানসীর সহাধ্যায়ী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিছু জানেন না, কবে ক্লাস নাই!" অধ্যক্ষা মহোদয়াও হাসিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রীর, এই ছাত্র অভিভাবকটির চিঠিগুলির, কারণে অকারণে এই পৌনঃপৌনিক আগমন, তাঁহার লক্ষ্যের বিষয় না হইয়া থাকিতে পারে নাই; এবং তাহাদের প্রত্যেক খানিরই মধ্যে এমন কোন না কোন একটা অজুহাত বা অনর্থক উক্তি থাকিত, যাহা তাঁহার মনের কোণে একটু মধুর কৌতুকের উন্মেষ না করিয়া দিয়া ছাড়িত না।

মানসী তখনই চিঠিখানির জবাব লিখিতে আরম্ভ করিল। সে জবাব দুই তিন ছত্রের ভিতরেই শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহাতে যে সময় লাগিল তাহাতে হয়ত, সে কলেজের প্রশ্নপত্রের এক বড় উত্তর শেষ করিয়া ফেলিতে পারিত। এই সকল চিঠির জবাবে যে অসমানুপাতিক সময় ব্যয় হয়, তাহাতে মানসীর সখীর বহুদর্শনের অভাব ছিল না। সুতরাং যখন তিন ছত্রের চিঠিখানি বহুক্ষণ ধরিয়া লিখিয়া, মানসী তাহা কলেজের কর্ত্রীর নিকট পাঠাইবার জন্য বেহারাকে খুঁজিতে যাইতেছিল, তখন তাহার সঙ্গিনী ঘড়ীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া তাহাকে বলিল, "তোমার এ চিঠিখানা ফেলে যাচ্ছ যে!" মানসী ফিরিয়া পোষ্টকার্ডখানি হাতে লইয়া দেখিল যে, তাহার বন্ধু ইতোমধ্যে "মাসীমার" "মাসী" কথাটি লাল কালিতে কাটিয়া দিয়া এবং "বসন্ত" কথাটির আগে "প্রাণের" কথাটি পুরিয়া দিয়া, চিঠিখানির যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার আর কোথাও যে লাল কালিতে কোন কারিকুরি হয় নাই তাহা দেখিতে বেশী সময় লাগিবার কথা না হইলেও মানসী সেখানি হাতে লইয়া, যেন খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করিবার জন্যই বহুক্ষণ ধরিয়া তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কলেজের বেয়ারা আসিয়া বলিল, "তার। মানসী—বাবার।"

খোলা তারের কাগজখানি লইয়া পড়িয়া বলিল "খবর ভাল। বসন্তের বাতাস, এসে—"

মানসী, ছোঁ মারিয়া, কাগজখানি কাড়িয়া লইয়া দেখিল, বসন্ত জানাইতেছে "আজই তোমাকে আনিতে যাইতেছি। চিন্তিত হইও না। সকলে ভাল আছে। আসিবার অনুমতি লইয়া রাখিও।" চিঠির কোণে অধ্যক্ষের হস্তলিখিত 'অনুমতি দেওয়া হইল' পড়িয়া সে তাহার মনের স্ফূর্ত্তি আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, মুখের হাসি এবং অন্তরের শিহরণের মধ্যে তাহার পার্শ্বস্থা সখীকে সজোরে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বাহ্যাবয়বের অদম্য জৈবিক চাঞ্চল্যকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

৪

যখন বসন্ত ও মানসীকে বুকে লইয়া বসন্তর গাড়ীখানি হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল, তাহার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে শনিবারের অপরাহ্নের লোকাল ট্রেণখানি ছাড়িয়া দিয়াছিল। মানসী বলিল, "কি হবে?"

"তাই ত ভাবছি। এ'র পরের গাড়ীখানা কোন্নগরে ধরে না। তা'র পরের গাড়ী অনেক রাত্তিরে—"

"আচ্ছা, বরাবর মোটরে গেলে কতক্ষণ লাগে?"

"বেশীক্ষণ নয়। কিন্তু মাসীমা যদি কিছু মনে করেন?"

"কি আবার? তাই চল না। বেশ, সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া হবে!"

বসন্ত একটু কি ভাবিয়া সফারকে "পেট্রল আছে কি?" জিজ্ঞাসা করিয়া মানসীকে বলিল, "তাই বেশ। সন্ধ্যের আগেই পৌছুন যাবে।" মানসী মৃদু হাসিয়া, ঘাড়টি ঈষৎমাত্র নাড়িয়া, তাহার সম্মতি ও সন্তোষ দুই-ই একসঙ্গে জানাইয়া দিল।

মুরাদপুরের রামশরণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর পাশে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেটে রাস্তাটা গিয়াছে, তাহারই উপর দিয়া মোটরখানি মন্দগতিতে, অতি সাবধানে অজানা পথের খানা-ডোবা হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল, হঠাৎ কি একটা ধাক্কাতে চক্রবর্ত্তীবাড়ীর নিকট থামিয়া গেল। চালক নামিয়া পড়িল এবং গাড়ীর আরোহী দুই জন পরস্পরের মুখের উপর একবার চাহিয়া লইয়া নির্ব্বাক্ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলটার সঙ্গে কয়েক মিনিট ধস্তাধস্তির পর সফার ফিরিয়া আসিয়া যে কথা জানাইল, তাহাতে গাড়ীর আরোহীদিগের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিল, "কি হবে?" আর এক জন উত্তর দিল, "তাই ত!"

বসন্ত নামিয়া নিজে একবার কলটি দেখিল, সফার তাহাকে কি বুঝাইয়া বলিল। তাহার পর সে ফিরিয়া আসিয়া মানসীকে জানাইল, "গাড়ী আর চল্‌বে না।"

"তবে কি ক'রে যাব?"

"বোধ হয়, যাবার কোন উপায়ই হয়ে উঠবে না। এইখানেই ঘরবাড়ী পাততে হবে। অন্ততঃ আজকের মত।"

মানসী আপনার মনে কি যেন একটু ভাবিয়া সলজ্জ মৃদু হাসি হাসিয়া চক্ষু দুইটি নত করিল। বসন্ত গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে সে বলিল, "মা কিন্তু বড় ভাববেন।"

"তা জানি। সফারকে তোমার জন্য একখানা পাল্কীর সন্ধানে পাঠায়েছি। সত্যিই ত আমি জোর করে,—আজ থেকেই তোমাকে দিয়ে, এই অজানা যায়গায়, ঘরকন্না পাতাতে পারি না!"

মানসী বসন্তর চক্ষুর দিকে চাহিতে গিয়া বোধ হয় লজ্জায় চক্ষু নত করিয়া—চুপ করিয়া রহিল। এই সময়ে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া যাইবার জন্য সফার ফিরিয়া আসাতে বসন্তের কথাও বন্ধ হইয়া গেল।

দুর্দ্দৈব একা আইসে না। হঠাৎ কালবৈশাখীর ঝড় আরম্ভ হইল, এবং ধূলা-বালিতে তাহাদের গা, মাথা, চুল ভরিয়া উঠিতে লাগিল। পবনের বিক্রমে নিকটের বড় একটা অশ্বত্থ গাছের উপর দিকের দুই একটা কোঁকড়ি ভাঙ্গিয়া ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। মানসী অতি আয়াসে তাহার গাত্রবস্ত্র সাম্‌লাইতেছিল। বসন্ত বলিল, "ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। এইবার বৃষ্টি, আর তা'র পর ছাট।" মানসী রামশরণ চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ ঘরটায় গিয়ে দাঁড়ালে হয় না?"

"তাই চল" বলিয়া, বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া নামাইয়া লইয়া আশ্রয়স্থানের উদ্দেশে চলিল। তাহার পর বেশ ঘটা করিয়া বৃষ্টি আসিল। [illegible] চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর [illegible] [illegible] ফিরিয়া [illegible]

লাগিল। ভিজে মাটির উপর বসিয়া অর্দ্ধসিক্তবস্ত্রে তাহারা দুইটিতে কাঁপিতে কাঁপিতে দেখিল, দিবা অতীত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। সেই নির্জ্জন বর্ষণস্তব্ধ সন্ধ্যার অন্ধকারের নিশ্চিন্ত আবরণের মধ্যে বসিয়া সেই আবাল্যপরিচিত তরুণ তরুণী দুই জন তাহাদের অতীত জীবনের কত পুরাতন কাহিনী আবার নূতন করিয়া কীর্ত্তন করিল; বর্ত্তমান কালের কত কৌতুক-রহস্য তাহাদের মনের উপর মোহময় ছাপ রাখিয়া চলিয়া গেল; সেখানকার গোপন অন্তঃপুরে ভবিষ্যতের কত মধুর আকাঙ্ক্ষা, কত অপূর্ব্ব কামনা উদিত হইতে লাগিল!

ইতোমধ্যে বৃষ্টির বেগ যে কমিয়া আসিয়াছে এবং রাত্রিও যে খানিকটা হইয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহই লক্ষ্য করিতে পারে নাই। হঠাৎ চণ্ডীমণ্ডপের, বাড়ীর ভিতরদিকের দরজাটি খুলিয়া যাইতে এবং ধুচুনির ভিতর প্রদীপ হাতে এক জন স্ত্রীলোককে সেখানে আসিতে দেখিয়া তাহারা চমকিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই মহিলাটি মাথায় শশব্যস্তে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গলার কান্নার স্বর তাহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল।

বসন্ত বলিল, "বাড়ীর গিন্নী বোধ হয়। চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধ্যা দেখাতে এসেছিলেন।"

মানসী বলিল, "কিন্তু কাঁদে কে?"

হরিকেন লণ্ঠনের আলো হাতে করিয়া একটি ১০।১১ বছরের মেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিল, "জ্যাঠাইমা বলছেন, আপনারা বাহিরে কেন? ভেতরে চলুন।" তাহার পর সে মানসীর পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল, যেন জন্মে সে সব কখনও দেখে নাই। ভিতরে শিকলটা নড়িয়া উঠাতে মেয়েটি এক বার সে দিকে চাহিয়া আবার মানসীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চল না, জ্যাঠাইমা ডাকছে যে।"

বসন্ত বলিল, "এক বার না হয় দেখা ক'রে এস। এঁরা কি মনে করবেন!" পরে সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুকি, তোমার নামটি কি?"

সুশীলা মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর না দিয়া, মানসীকে পথ দেখাইবার জন্য হাতের আলোটা একটু উঁচু করিয়া ধরিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টিটা মানসীর পায়ের উপর পড়িবামাত্র হাসি থামাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় পরাভূত হইয়া হাসির উচ্ছ্বাসে তাহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "এক উঠান জল যে!" মানসীও একটু হাসিয়া জুতা জোড়াটা খুলিয়া রাখিয়া বলিল, "এইবার চল। আলোটা ঐ চৌকাঠের উপর রেখে দাও। আমাদেরও পথ দেখা হবে, আর—"

সুশীলা চৌকাঠের উপর আলো হাতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "জ্যাঠাইমা, কিন্তু তোমার বরকেও—"

মানসীর মুখটা হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল। সে ত্রস্তে চৌকাঠ পার হইয়া গিয়া কর্দ্দমাক্ত উঠানে পা দিয়া বলিল, "তুমি এস, খুকি!"

পিচ্ছিল অল্পালোকিত পথে মানসীর অনভ্যস্ত পদ অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল। সুশীলার অভ্যস্ত গতি তাহাকে ছাড়াইয়া আগাইয়া যায় দেখিয়া, তাহার সঙ্গিনীকেও অগত্যা দ্রুতগামিনী হইবার চেষ্টা করিতে হইল। কিন্তু বিধাতাপুরুষ বোধ হয়, এইরূপ দুশ্চেষ্টার কর্দ্দমাক্ত পরিণাম হইতে, সহরের মেয়েটির বেশ-ভূষাকে বাঁচাইবার জন্যই অকস্মাৎ একটা অস্বাভাবিক উপায়ে তাহার গতিরোধ করিয়া দিলেন। পাশের একটা ধানের মরাইয়ের আড়াল হইতে এক জন স্ত্রীলোক বন্যার গতিতে ছুটিয়া আসিয়া মানসীর সর্ব্বাঙ্গ স্নেহের প্লাবনে ভাসাইয়া দিয়া, হতভম্ব মানসী কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবার আগেই তাহাকে সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া, তাহার মুখে চুমা খাইয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া, হাসিয়া, কাঁদিয়া, অব্যক্ত আদরে, স্নেহের তিরস্কারে, তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সে একটু সামলাইয়া এই বিষম ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর হইতে কেবলমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিল, "মা আমার! হারানিধি আমার! কত দিন পরে এলি, মা—"

৫

বসন্ত বহুকাল পূর্ব্বে আরব্য-উপন্যাস পড়িয়াছিল। এখন তাহার সে সব কাহিনী তেমন মনেও ছিল না। কিন্তু আজ তাহার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা সেই গল্পের পুস্তকের আজগুবি কল্পনাগুলি অপেক্ষা কোন অংশে কম আশ্চর্য্যের নহে। আজন্ম অপরিচিত এই গ্রামে দৈব-দুর্ঘটনায়

আবদ্ধ হইয়া, অতি নিকট-আত্মীয়েরও অধিক আদর-যত্নে কিরূপে যে সে এই গৃহে রাত্রিযাপনের জন্য স্থান পাইয়াছে, তাহা কিছুতেই তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। ইতোমধ্যে বাহিরে বৃষ্টির এবং বায়ুর আবার একটা নূতন পালা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুপরিচ্ছন্ন গৃহে, শুভ্র শয্যায় শুইয়া থাকিয়া, প্রদীপের মিটিমিটি আলোকে দেয়ালের আলেপন, কড়ির আলনা, সিন্দুরের ঝাঁপি প্রভৃতি অদৃষ্টপূর্ব্ব গৃহসজ্জার শিল্পচাতুর্য্য দেখিতে দেখিতে তাহার মনটা যেন এক কল্পনার দেশে ভাসিয়া গেল। সেখানে যেন সে পাতালের সজ্জিত দৈত্যপুরীতে মগ্ন তরীর অধিস্বামী দুঃস্থ রাজকুমারের আশ্রয়প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ করিতেছিল। বোধ হয়, তন্দ্রার আবেশে এবং কল্পনার বিভোরতায়, সংসার এবং সমাজের সহস্র খুঁটি-নাটি হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত, তাহার মনের গোপন কোণ হইতে একটা চির-সঞ্চিত অব্যক্ত বাসনা বাহিরে আসিয়া, সেই কল্পনার দৈত্যপুরীর চিত্রের রাজকুমারীর অঙ্গে তাহার মানসী মূর্ত্তিকে ফুটাইয়া তুলিতেছিল ও তাহাকে মধুর মোহে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। এই সময়ে হঠাৎ একটা শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সে চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহা যে স্বপ্ন-বিভ্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়, এরূপ মনে করা তাহার পক্ষে সে মুহূর্ত্তে যে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ জাগ্রত জীবনকালের মধ্যেও সে কখনও সন্দেহ করিতে পারে নাই। অনর্গল ক্ষুদ্র দ্বারটি নিঃশব্দে খুলিয়া মন্থর-পদ-বিক্ষেপে সেই অনুজ্জ্বল ক্ষুদ্র কক্ষটি রূপের আলোকে উদ্ভাসিত করিতে করিতে যে তরুণী সেখানে প্রবেশ করিল, সে যে বসন্তের চিরজীবনের মানসী মূর্ত্তি, তাহা যেন বিধাতা-পুরুষ আজ তাহাকে বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, আজ সমস্ত বৈকালটা ধরিয়া প্রকৃতি-দেবীর এত যে আয়োজন, তাহা যেন বসন্তকে মানসীর উপর তাহার চির-জীবনের দাবী জ্ঞাপন এবং বাহাল করিবার জন্যই হইয়াছিল। সূচিভেদ্য অন্ধকার সেই ক্ষুদ্র কক্ষটিকে জগতের দৃষ্টি হইতে একবারে অন্তরাল করিয়া দিয়াছিল; মুষলধার বর্ষণের শব্দ তাহাদের নির্জ্জন আলাপের, অন্যের শ্রুতিগোচর হইবার সম্ভাবনামাত্রের লোপ করিয়া দিয়া, সে সম্ভাষণকে অধিকতর লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল; পরিচয়হীন, পরিজনহীন গ্রামে, স্তব্ধ নিঃশব্দ নিশীথে, কল্পনারও অসম্ভব তাহাদের এই সান্নিধ্য, তাহাদের মধ্যের সমাজগত এবং শীলতাসম্মত সমস্ত ব্যবধানকে দূর করিয়া দিয়া তাহাদের নবীন অন্তর দুইটিকে সনাতন, অপরিহার্য্য, মধুরতম মানবিক বৃত্তির স্ফুরণের অবকাশ করিয়া দিতেছিল; এবং স্থান, কাল ও ঘটনামাহাত্ম্যে জগৎসৃষ্টির প্রাক্কালে তাহাতে যে আদিম নরনারী দুই জন লোকলজ্জার জ্ঞানমাত্র তিরোহিত হইয়া বাস করিত, তাহাদেরই সম্পর্ক এই তরুণ-তরুণীর মনের চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতেছিল।

কয় মুহূর্ত্ত যে তাহারা নির্ব্বাক হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিয়াছিল, তাহার মধ্যে কখনই বা যে বসন্ত শয্যায় উঠিয়া বসিয়াছিল, এবং মানসী গৃহদ্বারটি অর্গল-বদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, সে সকলের ধারণা তাহাদের দুই জনের এক জনও পরবর্ত্তী জীবনে ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইতোমধ্যে মানসী তাহার হাতের জলের পাত্রটি নিকটে একখানি ছোট চৌকির উপর রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার পর অত্যুজ্জ্বল দীপশিখাটি উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, বাম হাতের পানের ডিবাটি খুলিতে খুলিতে তাহার বিব্রত কণ্ঠস্বর ও ব্রীড়াবাধাগ্রস্ত চরণগতিকে মনের জোরে সহজ দেখাইবার চেষ্টা করিতে করিতে আসিয়া বসন্তর কাছে দাঁড়াইয়া সে বলিল,"পান খাও।" তাহার মুখের স্নিগ্ধ-ভাব, তাহার কণ্ঠের মধুর আত্মীয়তার আহ্বান স্বপ্নদশাগ্রস্ত বসন্তকে অবশ্য নিরতিশয় বিস্মিত করিয়া দিল; কিন্তু মানসীর ললাটের নবাঙ্কিত সিন্দুরবিন্দু তাহার বুদ্ধিকে একবারে লোপ করিয়া দিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার একান্ত অনুকূল এই যে রহস্যময়ীর আবির্ভাব, ইহার কারণানুসন্ধানের স্বাভাবিক কৌতূহল, সমস্ত অবয়বের শিরা উপশিরায় শিহরণে এবং মত্ত মুগ্ধ হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনে কতক্ষণ যে নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু পুরুষের চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি, হয় ত বা বসন্তর অজ্ঞাতসারেই, তাহার মনের কথাকে তাহার সঙ্গিনীর সমক্ষে এমন স্পষ্টভাবে ধরিল যে, মানসীর সহজভাব দেখাইবার শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া তাহার দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন না হইয়া রহিতে পারিল না; কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্যই; তখনই আবার সে দৃষ্টি সহজের মত হইয়া আসিয়া এই রহস্যের উদ্ঘাটনে তাহার লজ্জা-মৃদু-ভাবকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল। এই সময়ে বৃষ্টি থামিয়া

জে, এন, মণ্ডলের চিত্রশালা | | শিল্পী—শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল

উপবনে

গিয়াছিল। বাহিরের শিকল নাড়ার শব্দের উত্তরে বাটীর ভিতর হইতে যে পদশব্দ সদরের দিকে অগ্রসর হইল, তাহা যে সেই বাড়ীর গৃহিণীর, তাহা সেই বিনিদ্র তরুণ-তরুণী সহজেই বুঝিতে পারিল। তাহার পর তাহারা যখন শুনিল, আগন্তুক আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, "মেয়ে জামাই!" এবং তদুত্তরে চাপাগলার উত্তর হইল, "হাঁ, সন্ধ্যার পর এসেছে," তখন মানসী যেন কথাটা বুঝাইবার একটা সূত্র পাইয়া তাহার দায়িত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।

৬

বিরাজ ঘটকী যথাসময়ে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার আগেই বসন্তর দিদি সেই বাগানবাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। অনেক দিন পরে না হইলেও শ্বশুরালয় হইতে আগত তনয়ার মিলনানন্দে বসন্তর জননী সাংসারিক কর্ত্তব্যের অনেক কথা এবং সেই সঙ্গে বিরাজ ঘটকীকে যে তলব দিয়াছিলেন, সে কথাও তখনকার মত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাই যখন বিরাজ ঘটকী আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা, মা ঠাকরুণ? স্মরণ করেছেন কেন?" তিনি যেন একটু চকিত—একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্ম মাত্র। পরে তিনি বলিলেন, "তুই সে দিন রাজাদের যে মেয়েটির কথা বল্‌ছিলি—" বসন্তর দিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র জন্যে মা?" তাহার মা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তাঁরা বসন্তর জন্যে ব'লে পাঠিয়েছিলেন—"

"তা' ত হবার নয় জানি। কিন্তু তুমি কার জন্যে খবর নিচ্ছ?"

মাতা একটা সঙ্কোচকে দমন করিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "বসন্তর জন্যই—হবে না কেন শুনি?"

"মানসী—"

"তা'র মাকে বলেছি। রাজি হয়েছে—"

"কি? রাজি হয়েছেন! কি বলছ তুমি?"

"মানসীর জন্যে ভাল পাত্র দেখেছি। বসন্তর সঙ্গে তার বিয়ে হ'তে পারে না। তাতে ধর্ম্ম—"

"তিনি কি বল্লেন?"

মাতা ঘটকীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বিরাজ, তুই বাছা, একটু বিন্দুর কাছে গিয়ে বস্ গে ত।" পরে কন্যার উদ্দেশে বলিলেন, "বল্লে, আমি এত অকৃতজ্ঞ নই যে, তোমার কথা ঠেল্‌তে পারি। তুমি যা করবে—"

"একে কি রাজি হওয়া বলে, মা? তোমার পায়ে পড়ি, এ কায তুমি করতে পাবে না। এতে তোমার ছেলেও সুখী হবে না। আর বাবা সকলকে ব'লে গেছেন, সকলেই এ পর্য্যন্ত জানে—"

"কিন্তু গুরুদেব যে বলেছেন, এ বিয়ে হ'লে এ বাড়ীতে আর তিনি কখন জল গ্রহণ করতে পারবেন না—"

"কেন? বাবা থাক্‌তে ত বেশ জল গ্রহণ করতে পারতেন!"

"যাই হোক্। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করি কেমন ক'রে?"

কন্যা সম্মুখস্থ পিতৃচিত্রের দিকে চাহিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর বাবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করবে তাঁরই বাড়ীতে ব'সে? তিনি বেঁচে থাক্‌লে আজ তোমার গুরুর মুখে—"

কন্যার উগ্রতা বোধ হয় মাতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। তিনি কণ্ঠের তীব্রতায় কন্যাকেও ছাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "বারণ কচ্ছি, মিনি! আমার সাম্‌নে গুরুনিন্দা করতে পাবি নে।" শিক্ষিতা, নব্যসমাজ-সংশ্লিষ্টা কন্যা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, "মাপ কর, মা, অন্যায় করেছি" বলিয়া, বোধ হয়, রাগের মাথায় বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে 'কড়কড়' শব্দে একখানা কাল মেঘ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাল-বৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাপাত আরম্ভ হইল।

সেই ঝড়-জলের মধ্যে ক্রুদ্ধা মাতা ও অভিমানিনী কন্যার নির্ব্বাক চিন্তার সুযোগ লইয়া, তাহাদের মনে কোন সাড়া না দিয়া, মেঘান্ধকার নক্ষত্রবিহীন গগন হইতে সিক্ত সন্ধ্যা তাহার গাঢ় অন্ধকাররাশি লইয়া আসিয়া সেই উদ্যানবাটী এবং তাহাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া দিল। তখন সন্ধ্যার দীপ হস্তে বিন্দু পরিচারিকা সে গৃহে আসিয়া আলোক জ্বালিতেছিল; হঠাৎ একটা বিপদার্ত্তা রমণীর স্বর মাতা দুহিতার ক্ষুব্ধ মনের জড়তা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের উৎসুক নয়নকে দ্বারের দিকে আকৃষ্ট করিয়া দিতেই তাহারা দেখিতে পাইল, প্রতিবেশিনী কেশবের মা'র উদ্বেগকাতর উদ্ভ্রান্ত, চঞ্চল মূর্ত্তি। তিনি বলিতেছিলেন, "কি হবে, দিদি! রেলে যে ঠোকাঠুকি হয়ে

গেছে! আমার কেশব যে রোজ এই গাড়িতে আসে!" তিনি আরও বলিতে যাইতেছিলেন, "বসন্তকে একবার খোঁজ করতে বল।" কিন্তু তাঁহার কাতর প্রার্থনা ছাপাইয়া বৎসহারা বাঘিনীর দীর্ঘশ্বাসের মত একটা নিশ্বাসের সঙ্গে বসন্তর জননীরও মুখ হইতে বাহির হইল, "কি হ'লো গো! আমার বসন্তও যে এই গাড়ীতে—"

* * * *

কত রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বসন্তর দিদি মৃন্ময়ী বালিগঞ্জে তাহার স্বামীকে তার করিয়া সংবাদ লইতে বলিয়াছিল। তিনি সংঘর্ষণের স্থানে উপস্থিত হইয়া তদন্ত করিতেছেন, জানাইয়াছেন। অনুগত, আত্মীয়, কর্ম্মচারী, প্রতিবেশিগণ ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু এখনও কেহই কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারে নাই। যে একটু আধটু গুজব সেই রাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, তাহা সেই স্নেহময়ী মাতার ও ভগিনীর অন্তরের নিরাশার আকুল অন্ধকারকে বাড়াইয়া তুলিতেছে বই কমাইতে পারিতেছে না। তাঁহারা শুনিয়াছেন, সে স্থানটা রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে, সহস্র মরণাহতের আর্ত্তস্বরে তাহাকে হৃদয়বিদারক করিয়া তুলিয়াছে, আত্মীয়বান্ধবের করুণ, নৈরাশ্যব্যঞ্জক আহ্বানে সেখানে লোকের স্রোত বহিতেছে, রেলপথের কর্ম্মচারীরা কোন গোপন অভিপ্রায়ে সেখানকার আলোকাদি নির্ব্বাণ করিয়া দিয়াছে, ইত্যাদি। এই সকল সংবাদ যে সে রাত্রিতে সেই তীব্র অমঙ্গল-শঙ্কিতা মহিলা দুই জনকে না শুনাইলেও চলিতে পারিত, তাহা কেহ হয় ত বুদ্ধির ভ্রমে ভুলিয়া গিয়াছিল, কেহ হয় ত বা স্বভাবের ক্রূরতায় না বলিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার ফলে সন্ত-অমঙ্গল-আশঙ্কাকাতর সেই দুই জন রমণী মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র ছিল। তাহার পর তন্দ্রা যে কখন্ আসিয়া তাহার অপরিহার্য্য অধিকার তাহাদের চক্ষুর উপর স্থাপন করিয়াছিল, তাহার ঠিক জ্ঞান তাহাদের না থাকাই স্বাভাবিক। মনের অবস্থা কিন্তু এরূপ ছিল যে, তন্দ্রার অধিকারের মধ্যেও স্বপ্ন সেখানে ঢুকিয়া বসন্তর জননীকে কত কি সম্ভব অসম্ভব চিত্র দেখাইতেছিল। সেই সকল অর্থহীন অসংলগ্ন দৃশ্যের মধ্যে তাঁহার স্বামীর চিত্রমূর্ত্তি অস্থিমাংসের আকার গ্রহণ করিয়া, সার্থকতার গর্ব্বে হাসিতে হাসিতে, তাঁহাকে নব-পরিণীত বসন্ত-মানসীকে দেখাইয়া বলিতেছিল "ঐ দেখ, আমার কথাই রহিল। তোমার গুরুর কথা ব্যর্থ হ'ল।" বসন্তর মা ঘুমের ভিতর থাকিয়াই স্বামীকে জানাইলেন, "আমাকে মাপ কর।" তাহার পর তাঁহার ঘুমন্ত মুখ হইতে বাহির হইল, "এস বাবা বসন্ত, এস মা মানসী।" সেই শব্দে পার্শ্বস্থা কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যাওয়াতে সে মাতাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বলছ মা—"

৭

সে রাত্রিতে বসন্ত বা মানসীর যে সুনিদ্রা অসম্ভব, তাহা সহজেই মনে করিয়া লওয়া যাইতে পারে। সামাজিক পবিত্রতাসম্বন্ধীয় আজন্ম-অভ্যস্ত সংস্কার এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অবস্থায় পড়ার ফলে তাহাদের মনে একটা লোকলজ্জার উদ্রেক করিয়া দিয়াছিল। প্রথম নির্জ্জনে প্রিয়জন-সান্নিধ্যের প্রাকৃতিক উন্মাদনা সেই কুণ্ঠার সহিত মিশিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহাদের তরুণ মন দুইটিকে দুশ্চিন্তার ব্যথায় ও নবীন প্রণয়ের মধুরতায় একসঙ্গে ডুবাইয়া এক অপূর্ব্ব অবস্থায় ফেলিয়া জাগ্রত রাখিয়াছিল। কিন্তু ভোরের দিকে প্রাকৃতিক অবস্থাই তাহাদের মানসিক উত্তেজনাকে পরাস্ত করিয়া তাহাদিগকে তন্দ্রান্বিত করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রাতঃকালে যখন কাক-কোকিলের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া মানসী তাহার তক্তপোষের শয্যার উপর বসিল, তখন প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঘরের মেঝের একখানা মাদুরের উপর শায়িত বসন্তর নিদ্রাচ্ছন্ন মূর্ত্তির উপর। সে দেখিল, জানালার ভিতর দিয়া এক ঝলক উষালোক আসিয়া সেই প্রিয়তম মূর্ত্তিটিকে স্নিগ্ধ-লাবণ্যে উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়াছে। কি ভাবিয়া তাহার ওষ্ঠাধরের মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য যে অস্ফুট হাস্যরেখার আবির্ভাব হইল, তাহা নবোঢ়ার মত সঙ্কোচে মিলাইয়া গেল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি ধরিয়া যে সমস্ত মধুর গোপন কথা সে বার বার ভাবিয়াও শেষ করিতে পারে নাই, এখন আবার নূতন করিয়া তাহাদের মোহময় কল্পনায় বিভোর হইতে বসিবার সময় তাহার মোটেই ছিল না। সে জানিত যে, এখনই এই অভিনয় ভঙ্গ করিয়া যে বাস্তব সামাজিক-জীবনে তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে—তাহার সর্ব্বপ্রথম সমস্যা সেই বাহুগৃহ হইতে বাহির হইবার সময়ের সঙ্কোচকে অবজ্ঞা করিয়া সহজভাব দেখান। চৌকী

হইতে নামিয়া মানসী দরজার নিকট গেল, কিন্তু দরজা না খুলিয়া সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি একটু ভাবিয়া লইয়া, ফিরিয়া আসিয়া নিদ্রিত বসন্তর নিকট নীচু হইয়া বসিয়া ডান হাতের দুইটি অঙ্গুলি দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিল। জাগ্রত বসন্তর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র তাহার চোখের পাতা নত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বেন বিশেষ মনের বলে তাহাদের সঙ্কোচ নিবারণ করিয়া মানসী বলিল, "তুমি উঠে বিছানার উপর শোও। আমি মাদুরটা তুলে রেখে বাহিরে যাই।" কথাটি মাত্র না বলিয়া বসন্ত শয্যায় উঠিয়া শুইয়া পড়িল এবং সঙ্কোচের ভারে বিব্রতা মানসী কোনরূপে মেঝের মাদুরটা গুড়াইয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। সেই সময় বসন্ত তাহাকে ডাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "সীঁথের সিন্দুরটা?" মানসী মুখ ফিরাইল না। কিন্তু বেশ স্পষ্টভাবেই উত্তর দিয়া গেল, "ওটি রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নাই; আর তার জন্যে যা কিছু করতে হবে, বলতে হবে, তার ভার তোমারই নেওয়া উচিত।"

বসন্ত বাল্যকাল হইতেই এই মেয়েটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কথা যেমন জানিত, তেমনই তাহার অনড় গোঁয়ের কথাও তাহার অবিদিত ছিল না। মানসী যে তাহার বাগদত্তা বধূ, তাহা সে-ও জানে, সকলেই জানে; কিন্তু তাহার মা সেকালের ধরণের লোক, এবং মানসীর মাতা সম্পূর্ণ এ কালের ধরণের হইলেও, একরাত্রি অজ্ঞাতবাসের পর সীঁথায় সিন্দুর লইয়া কন্যার অকস্মাৎ আবির্ভাব যে তাঁহার চক্ষুর পক্ষেও সুখকর হইবে না, তাহা বসন্ত বেশ বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু উপায় কি? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ বসন্তর মনে হইল যে, 'সকার' চণ্ডীমণ্ডপে শুইয়া আছে। সে যদি এই বাড়ীর কর্ত্তাটির কাছে তাহাদের প্রকৃত পরিচয় দেয়! কি লজ্জার কথা। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল, 'সকার' তখনও ঘুমাইতেছে, এবং রামশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দাঁতন করিতেছেন। পরস্পরের সম্ভাষণ-পরিচয়ের পর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছিলেন, "আমার গৃহিণীর অদ্ভুত আচরণ হয় ত কা'ল রাত্রিতে—" [illegible] বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা আর উত্থাপন করবেন না। উনি আমাদের যথেষ্ট যত্ন করেছেন।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে এক করুণ কাহিনী! কয় বৎসর আগে আমার একমাত্র কন্যা শ্বশুরালয়ে বাক্যযন্ত্রণায় আত্মহত্যা করে। সে সংবাদে ব্রাহ্মণী এক বারে পাগল হইয়া যান, পরে অন্য সব বিষয়ে প্রকৃতিস্থার মত হইলেও ঐ প্রসঙ্গে ওঁর মানসিক বিকার রহিয়া গিয়াছে। উনি মনে করেন যে, কন্যা এখনও জীবিতা থাকিয়া শ্বশুরঘর করিতেছে, এবং তাহার সমবয়স্কা অপরিচিতা বালিকামাত্রকেই নিজের কন্যা বলিয়া—" কথাগুলি বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। বসন্ত তাঁহাকে থামাইয়া বলিল, "আমি সব শুনেছি।"

৮

সেই দিন বেলা ১০টার সময় যখন মানসী ও বসন্ত তাহাদের উদ্যানবাটিকায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন আনন্দের আতিশয্যেই হউক বা প্রাচীন দৃষ্টির ক্ষীণতার জন্যই হউক, বসন্তর জননী মানসীর সীমন্তে সিন্দুররেখাটি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। হয় ত বা মানসী সেটির অস্তিত্ব গোপন করিবার কোনরূপ সাময়িক ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছিল। পরে যখন নির্জ্জন গৃহে সখী মৃন্ময়ীকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া মানসী তাহার লজ্জারক্ষার ভার তাহারই উপর ফেলিয়া দিল, তখন মৃন্ময়ী মাতার বিরুদ্ধ মনোভাব সেই দুর্দ্দিনের রাত্রির অন্য ঘটনাগুলির মত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে জানিত বলিয়াই তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল, "সীঁথেটা একটু সরু ক'রে দুটা দিনের জন্য চুলটুল দিয়ে কোন রকমে চেপে রাখবার উপায় ক'রে আয়। আর তিন দিনের দিন গোধূলিলগ্নে সেটার উজ্জ্বল প্রকাশের ভার আমার উপর।"

বসন্তর পরলোকগত পিতৃদত্ত স্বপ্নের বলে এবং মৃন্ময়ীর তীক্ষ্ণবুদ্ধিকৌশলে বসন্তর মাতার গুরু-আজ্ঞার শক্তি এত শীঘ্র লোপ পাইল যে, সত্য সত্যই তৃতীয় দিবসে গোধূলিলগ্নে মানসীর ললাটের গুপ্ত সূক্ষ্ম সিন্দুররেখা স্থূল ও উজ্জ্বল হইয়া সপ্রকাশ করিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার।

পুরাতন প্রসঙ্গ

(১) হুগলীর বরফ

অনেকেই শুনিয়াছেন, হুগলীতে বরফ পড়ে। কিন্তু এ বরফ পড়া ব্যাপারটা কি, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হুগলীতে বহুপূর্ব্বে এত শীত পড়িত যে, জল জমিয়া বরফ হইত। কেহ বলেন, হুগলীর একটা মাঠ আছে, সে মাঠে তুষারপাত হইত। আবার কাহারও মুখে শুনিয়াছি, হুগলীতে প্রথম বরফগুদামের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাই এই প্রবাদ।

কিন্তু "কোম্পানীর" আমলের ইতিহাস পাঠ করিয়া সংশয় দূর হইয়াছে ; বুঝিয়াছি, এ সব প্রবাদের একটিও সত্য নহে। কলিকাতাতেই প্রথম বরফঘর (Ice-house) প্রতিষ্ঠিত হয়। এক মার্কিণ কোম্পানীই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা আমেরিকা হইতে জাহাজে এদেশে বরফ আনিতেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বরফের জাহাজ আইসে। এই জাহাজের বরফ কলিকাতার বরফ-ঘরে জমা করা হইত এবং হুগলী প্রভৃতি সহরে চালান হইত। হুগলীতে বরফ-ঘর ছিল না।

তবে মার্কিণ বরফ এ দেশে আমদানী হইবার পূর্ব্বে হুগলীতে কতকগুলি দেশীয় লোক এক অভিনব উপায়ে বরফ প্রস্তুত করিত বটে। হুগলীর দেখাদেখি পরে কোনও কোনও স্থানে ঐ প্রথায় বরফ প্রস্তুত করা হইত।

প্রথাটি এই :—একটা খোলা মাঠ অথবা কেবল পশ্চিম সীমানায় ঘেরা এক মাঠ নির্দ্দিষ্ট করা হইত। ঐ মাঠটি বেশ ভাল করিয়া সমতল করিয়া ফেলা হইত। কখনও কখনও ২ ফুট পরিমিত মাটী উঠাইয়া ফেলা হইত। বরফের মরশুমের পূর্ব্বে এই কার্য্য সম্পন্ন করা হইত; কেন না, পূর্ব্বেই জমী শুকাইয়া রাখা প্রয়োজন হইত। আকাশের অবস্থা দেখিয়া যখন মনে হইত, এইবার কুজ্ঝটিকা হইবে, তখন ঐ জমীটার উপর খড় বিছাইয়া দেওয়া হইত। স্তরের উপর স্তর খড় সাজাইয়া খুব পুরু করিয়া আস্তরণ পাতা হইত, মাঝে মাঝে কেবল লোকচলাচলের জন্ম সঙ্কীর্ণ পথ রাখা হইত। মজুররা ঐ পথ দিয়া গিয়া ঐ আস্তরণের উপর অনেকগুলি মাটীর সরা সাজাইয়া রাখিত, সরাগুলি সওয়া ইঞ্চ গভীর। এ দিকে ভূগর্ভে প্রোথিত কাল জালায় জল ধরিয়া রাখা হইত। মজুররা ঐ জালা হইতে জল তুলিয়া সরায় ভর্ত্তি করিত।

দিনের বেলা খড়গুলি শুকাইয়া লওয়া হইত, সন্ধ্যায় সময়ে ঐ খড়ের উপর সারি দিয়া সরা সাজান হইত। ছোট ছোট মাটীর ভাঁড় বাঁশের চোঙ্গের ডগায় বাঁধিয়া (হাতার আকারে পরিণত করিয়া) উহাতে জল ভরিয়া সরায় সেই জল ঢালা হইত। সরার এক-তৃতীয়াংশ জলে ভরা হইত।

যখন এই বরফ-মাঠের বাতাস ৫০ ডিগ্রী ফারেণহীটের নীচে নামিত এবং যখন উত্তর-পশ্চিমা হাওয়া বহিত, তখন তাহার সংস্পর্শে সরার জলের উপর বরফের সর পড়িত। কয়েকখানা সরার বরফের সর লইয়া এক এক খানা সরার জলে ফেলা হইত এবং উহার সংস্পর্শে সেই সরার জল জমাট বাঁধিয়া বরফে পরিণত হইত। রাত্রি ২টা ৩টা হইতেই জমাট বাঁধা প্রায় আরম্ভ হইত। বেশী হাওয়া চলিলে অথবা মেঘের সঞ্চার হইলে জল জমাট বাঁধায় বাধা পড়িত। এ সব বাধাবিঘ্ন না থাকিলে সরার সমস্ত জলটাই জমিয়া বরফ হইয়া যাইত, পরন্তু সরার ভিতরে ও বাহিরে দুই দিকেই বরফের সর পড়িয়া যাইত।

মজুররা সেই সব সরা (কোন সরায় সব জলটাই বরফ হইত, কোনও সরায় খানিকটা জলও থাকিত) হইতে জলসমেত বরফ পার্শ্বে রক্ষিত জালার মুখের ছাঁকনির মধ্যে ঢালিয়া দিত, জলটা জালায় পড়িয়া যাইত, বরফটা ছাঁকনির মধ্যে থাকিয়া যাইত।

এ দিকে ৬ ফুট গভীর ও ৪ ফুট ব্যাসের গর্ত্ত করা হইত, সেই গর্ত্তের দেওয়ালগুলি মাদুর দিয়া মোড়া হইত। ছাঁকনিতে সঞ্চিত বরফ—সেই সকল গর্ত্তের মধ্যে রক্ষিত হইত। আবার সেখান হইতে একেবারে বরফ-ঘরের বড়

গর্ত্তে বরফ জমা করা হইত,—সে গর্ত্ত ১০।১২ ফিট গভীর এবং ৮।১০ ফিট ব্যাসের।

মার্কিণের 'জাহাজী' বরফ আমদানী হইবার পর হইতে হুগলীর দেশী বরফব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে। বহুপূর্ব্বে মোগল বাদশাহরা গ্রীষ্মকালে কাশ্মীরে শৈলাবাস করিতেন এবং হিমালয় হইতে বরফ আনাইতেন।

---

(২) ঢাকার মসলিন

ঢাকার মসলিনের স্তায় সূক্ষ্ম বস্ত্র জগতে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। 'গজ' বা 'গসামার' নামধেয় য়ুরোপীয় চিকণ কাযও অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু উহা লেশ বা ফিতা অথবা ওড়নার জন্ত ব্যবহৃত হয়, পরিধেয় বস্ত্ররূপে হয় বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ঢাকাই মসলিন বাদশাহ-নবাবদের আমলে পরিধেয় বস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত, এ কথা ইতিহাসেই আছে। সেয়ার মুতাক্ষরিণে আছে, ঢাকা হইতে দিল্লীর রঙ্গমহালের জন্ত খাজনার সঙ্গে মসলিন পাঠাইতে হইত।

এ হেন ঢাকাই মসলিন কিরূপে প্রস্তুত হইত, তাহা এই বাঙ্গালারই অনেকে জানেন না। 'কোম্পানীর' আমলেও ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। 'কোম্পানীর' ইতিহাসে ঢাকাই মসলিন তৈয়ার করিবার যে বিবরণ আছে, তাহা অতীব কৌতূহলপ্রদ। আমরা তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

অতি প্রত্যূষে—যখন গাছের পাতায় আর মাঠের তৃণের উপর নিশার শিশির ঝলমল করে, সেই সময়ে অল্পবয়স্কা কিশোরী ও যুবতীরা তাঁহাদের চম্পকাঙ্গুলী ও টেকোর সাহায্যে এই মসলিনের জন্ত সূতা পাকাইতেন। বুঝিয়া দেখুন ব্যাপার! এত সূক্ষ্ম এই তুলার আঁশ যে, সূর্য্যোদয়ে উহার সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়, কঠিন অঙ্গুলীর তাড়নায় উহার কোমলতা থাকে না।

এক রতি তুলায় ৮০ হাত সূতা হইতে পারিত। ঐ সূতা ১ টাকা ৷৷০ আনায় বিক্রয় হইত। ঢাকার আশে-পাশে এই তুলার চাষ হইত। ইহার আঁশ খুব খাটো, কাযেই মানুষের আঙ্গুল ব্যতীত অন্ত যন্ত্রে উহা হইতে সূতা প্রস্তুত করা অসম্ভব ছিল। আবার রিপুকর্ম-ওয়ালারা এত সূক্ষ্ম কায করিতে পারিত যে, মসলিন হইতে এক একটি করিয়া আস্ত সূতা খুলিয়া তাহার স্থানে সূক্ষ্মতর সূতা পরাইয়া দিতে পারিত। আঙ্গুলের কাযের এমনই কেরামতি ছিল!

কোম্পানীর আমলেই এই ব্যবসায় উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার কোন বস্ত্র-ব্যবসায়ী চীনদেশ হইতে ২ খানি মসলিনের অর্ডার পায়েন। মসলিন ২ খানি ১০ গজ লম্বা ও ১ গজ চওড়া হইবে, এইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। যখন ঐ ২ খানি মসলিন প্রস্তুত হইল, তখন ওজন করিয়া দেখা গিয়াছিল, ২ খানির ওজন মাত্র ১০৷৷০ ভরি!, প্রত্যেকখানির মূল্য ১ শত টাকা।

ঢাকাই মসলিম এত সূক্ষ্ম হইত যে, সরু বাঁশের চোঙ্গের মধ্যে একখানা কাপড় পুরিয়া বিদেশে পাঠান হইত। মসলিন হাতের মুঠার মধ্যেও লুকাইয়া রাখা যাইত। সূক্ষ্মতার জন্ত ইহাদের নামও হইত বেশ, যথা:—অপ-রোয়া (জলপ্রবাহ, জলধারা), সবনম (সন্ধ্যার শিশির), ইত্যাদি।

১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতেই প্রথমে ঢাকাই মসলিনের ব্যবসায় পড়িতে আরম্ভ করে। অথচ উহার পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ঐ ব্যবসায়ে ২৫।৩০ লক্ষ টাকার কারকারবার হইত। এ টাকার কতকটা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অবশিষ্ট অন্তান্ত লোক নিয়োগ করিতেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর নিয়োগের টাকা কমিয়া প্রায় ৬ লক্ষে দাঁড়ায় এবং অন্তান্ত খরিদদারের নিয়োগের টাকা কমিয়া প্রায় ৫৷৷০ লক্ষে দাঁড়ায়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ইহা আরও কমিয়া যায়, এবং মোট ব্যবসায় ৫ লক্ষ টাকার উপরে উঠে নাই।

কেবল যে ঢাকার মসলিনের ব্যবসায় এই ভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে, এ দেশের অন্তান্ত বস্ত্রব্যবসায়ও প্রতীচ্যের কলজাত পণ্যের প্রবল প্রতিযোগিতায় কি ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। দেশের সংখ্যাতীত তাঁতী পৈতৃক পেশা ছাড়িয়া দিয়া অন্ত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে, কত শত কুলবতী কুলত্যাগ করিয়া পেটের অন্ন সংস্থান করিতেছে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এ দেশ হইতে বিদেশে ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ১ শত ১ টাকার মোটা কাপড় রপ্তানী হইয়াছিল; আর ১৮২৯-৩০

খৃষ্টাব্দে—মাত্র ৫ বৎসর পরে, ঐ ১৪ লক্ষ মাত্র সাড়ে ৯ লক্ষের কিছু উপরে দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাবে রেশমী এবং চিক্কণ কাপড়ের ব্যবসায়ও নষ্ট হইয়াছিল। ইংরাজ [illegible]কই [illegible]খিয়াছেন,—"The cheapness of [illegible] cloth has driven the products of [illegible]ms, as well as all other Indian looms, almost entirely out of market."

---

(৩) দেশীয় কাগজ

একবার আমরা আমতা লাইনে বেড়াইতে গিয়া খোড়প গ্রামের সান্নিধ্যে দেশীয় প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত করা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। প্রণালী অতি সাদাসিধা, নেহাইৎ সেকেলে—তবুও দেশের কারিকর দেশের জিনিষে দেশের মালমশালা ও দেশের যন্ত্রপাতি সাহায্যে দেশীয় কাগজ প্রস্তুত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। কাগজ পাটকিলে বা হরিদ্রাবর্ণের ও মোটা, পরন্তু অধিক পরিমাণে commercial purposeএ প্রস্তুত হয় না বটে, তথাপি চলনসই স্থানীয় চাহিদা সরবরাহ করে, এইটুকুই লাভ। কিন্তু ক্রমে এই সামান্ত ব্যবসায়টুকুও লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছে। যেমন একে একে এ দেশের হাতে গড়া নানা পণ্য বিদেশী কলের প্রস্তুত পণ্যের প্রসারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তেমনই এই ব্যবসায়ও সেই দশা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার মূলে সাহায্যের ও সহানুভূতির অভাব যথেষ্ট আছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এ দেশের বস্ত্রের ব্যবসায় যেমন ম্যাঞ্চেষ্টারের কল্যাণে সরকারী বাধা পাইয়া লোপ পাইয়াছে, অবশ্য খোড়পের কাগজের ব্যবসায়ে তেমন হয় নাই; তবে দেশের লোকই খসখসে মোটা ও হলুদে কাগজে তৃপ্ত নহে বলিয়া ঐ ব্যবসায়ে দেশীয় কারিকরের আর তেমন আগ্রহ নাই।

এখন এ দেশে কাগজের কল হইয়াছে। পাদরী কেরির সময়েও এ দেশে কল হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। কেরি তখনকার কালের কাগজ প্রস্তুত করিবার ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে নানা প্রকারের তরুগুল্মলতা আছে। তাহাদের আঁইশে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। গৃহস্থের অঙ্গনে, বাগানে, জঙ্গলে, অনুর্ব্বর মরুভূমিতে, মাঠে ঘাটে, সমুদ্রতটে,—ভারতবর্ষে এত রকম আঁইশওয়ালা গাছ আছে যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই সকল আঁইশ হইতে কত রকমের ব্যবসায় করা যায়, তাহারও ধারণা করা যায় না। অথচ পাদরী কেরি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ভারতের এত অধিক বনসম্পদ থাকিতেও এবং প্রতীচ্যের বিজ্ঞানালোক এ দেশে বিস্তার লাভ করিলেও এ দেশের লোক এ দিকে ব্যবসায়ে কোনও উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কেন করে নাই, তাহার কারণ পাদরী কেরি উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, দেশের সরকার যদি দেশের লোকের আয়ত্তাধীন থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিতই এই উন্নতির অভাব পরিলক্ষিত হইত না।

কেরির সময়েও এই খোড়পের কাগজের মত খসখসে চাকচিক্যহীন মোটা দেশীয় কাগজ এ দেশে প্রস্তুত হইত। সেগুলি মোটা হইলেও খুব শক্ত ও মজবুত হইত। বিশেষতঃ কুমাউনের বাঁশের মণ্ডে প্রস্তুত কাগজও খুবই মজবুত হইত। তবে তুলনায় প্রতীচ্যের কলে প্রস্তুত কাগজ অপেক্ষা উহা নিকৃষ্ট ছিল; পরন্তু ব্যবসায়ের পক্ষেও সুবিধাজনক ছিল না।

নেপালে এক প্রকার গাছ হয়, স্থানীয় লোক তাহাকে কাগজের গাছ বলে। উহার চারাগুলি অন্য এক প্রকার গাছের ছালের রসের সহিত জলে ফুটাইয়া নরম করিয়া কুটিয়া লওয়া হইত। পরে মণ্ড প্রস্তুত হইলে উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত। ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রধানতঃ শণগাছ হইতে মণ্ড করিয়া লওয়া হইত। তাহার পর নির্ম্মল জলপূর্ণ গামলা বা চৌবাচ্ছায় মণ্ড ভাসাইয়া দেওয়া হইত। পরে সাইজ করা ফ্রেম বা ছাঁচ জলে ভাসাইয়া রাখিলে তন্মধ্যে মণ্ড পূর্ণ হইত। ছাঁচগুলির বাঁখারির তলা ও তাহাদের ধারগুলা কাঠের। উহা এমন মজবুত করিয়া তৈয়ার হইত যে, উহার মধ্য দিয়া মণ্ড গলিয়া পড়িত না। যখন মণ্ড ঠিক ছাঁচের আকারে ঢালা হইত, তখন ছাঁচ জল হইতে তুলিয়া ধরা হইত, সঙ্গে সঙ্গে জল ঝরিয়া পড়িত। সমস্ত জল ঝরিয়া গেলে ছাঁচখানা উপুড় করিয়া তক্তার উপর রাখা হইত; সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচের ভিজা কাগজখানা তক্তার উপর বসিয়া যাইত। পরে উহাকে আগুনে বা সূর্য্যের তাপে শুকাইয়া লইলেই কাগজ প্রস্তুত হইত।

কাগজ মসৃণ করিবার নিমিত্ত ছোট একখানা মাজাঘষা কাঠ উহার উপর দ্রুত ঘর্ষণ করা হইত।

এই ব্যবসায়ে কত লোক প্রতিপালিত হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু প্রতীচ্যের কলের প্রতাপে তাহাদের বংশধরেরা অন্নহীন। এমন একটি ব্যবসায় নহে, কলে কত ভারতীয় ব্যবসায়েরই না সর্ব্বনাশ হইয়াছে! এককালে ইংলণ্ডেও প্রথম যখন কলের আদানী হয়, তখন তথায় এমনই হাহাকার উঠিয়াছিল। বিখ্যাত কবি গোল্ডস্মিথের Deserted Village কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি এ কথার মর্ম্ম অনুধাবন করিতে পারিবেন। তাঁহার সেই Trade's unfeeling train কথাটি এ দেশের পক্ষেও বিশেষ প্রযুজ্য। কিন্তু উপায় কি? বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ও কলকারখানার যুগে জগতের সর্ব্বত্র এমনই হইতেছে—দুই চারি জন ধনী মহাজন অর্থ ও প্রতিভা নিয়োজিত করিয়া পণ্য উৎপাদন করিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক শ্রমিক বা লেখকরূপে সেই পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করিয়া উদরান্ন সংস্থান করিতেছে। এক দিকে যেমন মূলধন ও প্রতিভা (Capital and brain) না হইলে চলে না, অপর দিকে তেমনই শ্রম (Labour) না হইলেও চলে না; তাই এতদুভয়ের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া কোন মতে কায চলিতেছে। কিন্তু অল্পের সম্পদে এবং বহুর কষ্টে অসন্তোষের উদ্ভব হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাই জগতে আজ Socialism, Communism, Bolshevism প্রভৃতি 'ইজমের' ছড়াছড়ি।

ইহার একমাত্র প্রতীকারোপায় —Plain living, ঘরে ফিরিয়া যাওয়া, Back to nature,—যাহা যুগপ্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী কথায় ও কাযে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা ঘরে ঘরে যেমন তুলার চাষ করিতে, সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে আদিষ্ট হইয়াছি, তেমনই সকল বিষয়েই যতদূর সম্ভব আত্মনির্ভরশীল হইতে উপদিষ্ট হইয়াছি। আমরা সম্ভবমত যদি দেশের মোটা কাপড়ের মত মোটা কাগজ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করি, তাহা হইলে আবার এই লুপ্ত ব্যবসায় পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে এবং হইলে পরে আবার বহু দেশবাসী ভ্রাতার অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে।

—

(৪) বেনিয়ান—মুৎসুদ্দী

কোম্পানীর আমলে এবং পরে বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী এই কলিকাতা সহরের বড় বড় য়ুরোপীয় সদাগরী আফিসে মুৎসুদ্দীগিরি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। এই কাযটা যে প্রশংসার কায ছিল, তাহা বলিতেছি না। কেন না, এই বাঙ্গালী বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দীরাই এ দেশে বিদেশী মাল কাটাইবার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, এবং ঐ সঙ্গে এ দেশের বহু ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। এইখানেই যে তাহাদের পাপ শেষ হইয়াছিল, তাহা নহে; তাহাদেরই মধ্যস্থতায় এ দেশে বিলাতী পণ্য ও সুরার স্রোত যেমন বহিয়াছিল, তেমনই বিলাসবাবুয়ানার ও সৌখিন চিজের আমদানী দেশ ভাসাইয়া দিয়াছিল! তাহাদেরই পাপ কাযের ফলে এ দেশে দরিদ্র সংযমী গৃহস্থ ও কৃষকের ঘরে মাটীর হাঁড়ীর ক্যাসবাক্সের স্থলে ট্রাঙ্ক,তোরঙ্গ; বেতের বা বাঁখারির চুবড়ীর স্থলে পোর্টমেণ্ট, সুটকেস, ড্রেসিংকেস; গামছার স্থলে কম্ফর্টার, তোয়ালে; খইল ও তেল হলুদের স্থলে সাবান, পোমেড; টোকার স্থলে ছাতি; খরসানের স্থলে সিগারেট; টাটকা ফুল ও গোলাবজলের স্থলে এসেন্স আমদানী হইয়াছিল। তাহারা মাঝে দোভাষী হইয়া না দাঁড়াইলে কোম্পানীর আমলে Ship captainরা অথবা হাউসের ধলা এজেণ্টরা এ দেশে মাল কাটাইতে পারিতেন কি? কিন্তু পাপ তাহাতে যতই হউক, পয়সা খুবই ছিল। এখন সেই পয়সা-লুঠা বিদ্যাটাও মাড়োয়ারী ভাটিয়ারা অন্যান্য অনেক জিনিষের সঙ্গে বাঙ্গালীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।

এই মুৎসুদ্দী বা বেনিয়ানের উদ্ভবের ই[illegible] জমাট। বোধ হয়,এখনকার দিনের বাঙ্গালীর সেটা [illegible] রাখা নিতান্ত ক্ষতিকর হইবে না। 'কোম্পানীর' আমলের ইতিহাসেই আছে, বেনিয়ান কথাটা বেনিয়া বা বণিক হইতে উদ্ভূত। বণিক অর্থে ব্যবসায়ী বা সওদাগর। তখনকার দিনে জজ বা কালেক্টারের কাছারীর সেরেস্তাদার অথবা নুণ-গোলার দেওয়ান যে কায করিত, জাহাজের কাপ্তেনের অথবা ইংরাজ হাউসের মুৎসুদ্দী বা বেনিয়ান সেই কায করিত—অর্থাৎ দোভাষীরূপে দেশীয়রা ব্যবসাদারদের নিকট ধনী মনিবের কথা বুঝাইয়া দিত এবং কথাবার্ত্তার

কলে মাল কাটাইয়া দিত। অতএব তাহারা ঠিক বণিক ছিল না—মাঝের লোক (Middleman) ছিল। তবে ইহার উপরেও তাহাদের আর একটা গুরু কায ছিল—প্রকৃতপক্ষে তাহারাই ধলা মনিবের ব্যাঙ্কার ছিল; কারণ, তখন এ দেশে কোনও য়ুরোপীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বেনিয়ানের উপর বিশ্বাস করিয়া ধলা মহাজনরা দেশীয় ব্যবসাদারকে মাল ছাড়িয়া দিত, বেনিয়ান মালের দাম আদায় করিয়া দিত। সুতরাং বলা বাহুল্য, বেনিয়ানদের এ জন্য ধলা মনিবের কাছে জামিন রাখিতে হইত। এই লেনদেন কারবারে রাশি রাশি কমিশন মারিয়া বেনিয়ানরা অল্পদিনের মধ্যেই পেট মোটা করিয়া ফেলিত।

এইবার একটুকু মজার ইতিহাস আছে। প্রথমে হিন্দু বেনিয়ান, ধলা ব্যবসাদার ও জাহাজী কাপ্তেনের বেনিয়ানি করিত। তাহারাই তখনকার কালে ইংরাজীতে একবারে লালমোহন ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন ছিল। ইংরাজী চমৎকার—ভাঙ্গা ভাঙ্গা আধা বাঙ্গালা আধা ইংরাজী জগাখিচুড়ী। ইংরাজরা তাহাকে Pigeon English (চীনদেশের চীনা ইংরাজী) এবং দেশীয়রা তাহাকে 'চীনাবাজারী' ইংরাজী বলিত। রসরসিক অমৃতলাল বসু তাঁহার চন্দ্রশেখরে 'বিশোয়াসের' মুখে কতকটা সেই ধরণের ইংরাজী চাপাইয়াছেন। কিন্তু তাহারই কদর কত! উহার দ্বারা বাঙ্গালী বেনিয়ানরা যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, এখন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তিধারীর হাড়ে তাহার সিকিও হয় না। গল্প আছে, সেকালের কেরাণী, এম, এ, পাশ করা ছেলেকে বলিতেছেন,—"নে তোর ইংরিজি থো কর! আমি I father ব'লে যা রোজগার করেছি, তুই My father ব'লে তার সিকি রোজগার করে আন্ দেখি!"

যাহা হউক, এই ভাবের ইংরাজী বিদ্যার জোরে হিন্দু বেনিয়ানরা বহুদিন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের বাড়া ভাতে ছাই পড়িল। ধলা মনিবরা ক্রমে ব্যবসায়ের সুবিধা দেখিয়া এ দেশে অমেধ্য দ্রব্যাদি আমদানী করিতে লাগিলেন। হিন্দু বেনিয়ানরা ব্রাণ্ডি, স্যাম্পেন, (টিনের) গোমাংস, ইত্যাদি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, ক্রমে একে একে তাহারা কায ছাড়িয়া দিতে লাগিল।

এ দিকে ধলা মহাজন ও মহাজনী কাপ্তেনদের কায চলে না। সুতরাং তাহারাও খুঁজিয়া খুঁজিয়া কলুটোলার এক ধোপাকে বেনিয়ান ঠিক করিল। ধোপা এক হাতে কাচা ধবধবে কাপড় লইয়া অপর হাতে ধলা মহাজনের মাল লইয়া বাজারে বাজারে ঘুরিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে ধোপা বেনিয়ানের কল্যাণে ব্রাণ্ডি, বিয়ার, গোমাংস, শূকরমাংস, পনীর প্রভৃতি এ দেশে অবাধে বিক্রীত হইতে লাগিল। ব্যবসায় চলিল, কিন্তু ধোপার ইংরাজী ভাষা জানা ছিল না বলিয়া অসুবিধা হইল; অথচ পেশা খুবই অর্থকরী। কাযেই ধোপা অংশীদার খুঁজিতে লাগিল। ধোপার তিন জন কারিকর বন্ধু মিলিল; তাহারা অল্পস্বল্প চীনাবাজারী ইংরাজী জানিত। তখন চারি বন্ধুতে মিলিয়া এক বেনিয়ানের ফারম খুলিল, তাহার নাম হইল "চার ইয়ার!"

'চার ইয়ারের' অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা লক্ষপতি হইতে কোটিপতি হইল। তখন তাহাদের সুখসৌভাগ্য দেখিয়া উচ্চজাতি ও ভিন্নদেশীয়দের হিংসা ও লোভ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লোভ তখন "জাতধর্ম্মকে" ছাপাইয়া গেল। অনেকে বেনিয়ানের কাযে প্রবেশ করিতে লাগিল।

যখন ধোপা বেনিয়ান বেনিয়ানি একচেটিয়া করিয়াছিল, তখন ধলা মহাজনরা বেনিয়ানকে 'ধোবু' (Dobu) বলিয়া সম্বোধন করিতেন, সুতরাং বেনিয়ানির নাম ধোবু হইয়া গেল। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই অঞ্চলে বহুকাল যাবৎ বেনিয়ানের নাম ধোবু ছিল। বাঙ্গালার উচ্চ জাতির লোক যখন আবার 'ধোবুর' কায গ্রহণ করিতে লাগিল, তখনও 'ধোবু' আবার 'বেনিয়ান' হইল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।
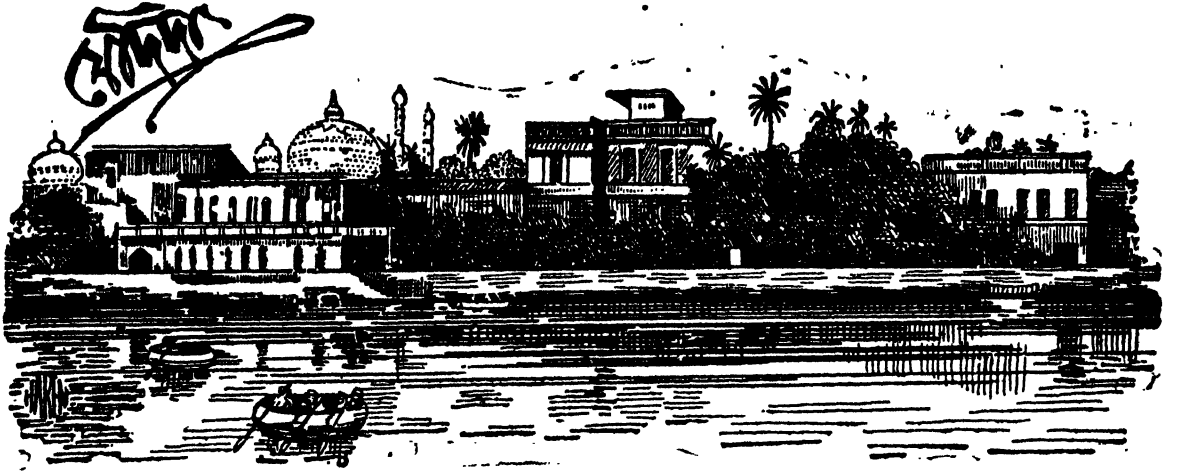
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

দায়ুদের সহায়তায় জেনারল টাউনসেণ্ড শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া বাগদাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। কয় দিন পূর্ব্বে একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে যুদ্ধে তুর্কদিগকে পরাভূত করিয়া জেনারল টেসিফনে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছেন। শিবিরের অনতিদূরে পারস্যের শাসানীয় নৃপতিদিগের অন্যতম চসরসের প্রাসাদের ভগ্নাংশ আজও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এখন প্রাসাদের প্রধান কক্ষের প্রাচীর ও খিলান করা ছাত মাত্র বর্ত্তমান। আর আছে দক্ষিণাংশের একটা প্রাচীর। খিলান করা ছাত ৮৬ ফিট বিস্তৃত কক্ষ আবৃত করিয়া আছে। সেনাদল সেই প্রাসাদাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছে—কেহ কেহ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষপ্রাচীরে আপনাদের নাম লিখিয়া আসিয়াছে। কেহ বা লিখিয়াছে—"বাগদাদের পথে।" পুনঃ পুনঃ জয়ে কাহারও মনে আর পরাভবের কল্পনাও উদিত হয় নাই।

যে খণ্ডযুদ্ধে জেনারল জয়ী হইয়াছেন, তাহাতে শত্রুপক্ষের সৈনিকসংখ্যা অধিক ছিল। স্বয়ং খলিল পাশা তাহাদের নায়ককে উপদেশ দিয়াছিলেন। তবুও যে তাহারা পরাভূত হইয়াছিল, তাহাতে তুর্ক সেনাপতিরা চিন্তিত ও ভীত হইয়াছিলেন। কোন্ দিকে তাহাদের দৌর্ব্বল্য, তাহা যেন ইংরাজরা নখদর্পণে দেখিতেছিল। তাহারা কি কোনরূপে সব সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে? কিন্তু তাহাদের পক্ষে সংবাদ সংগ্রহ করিবার কোন উপায়ই ত তুর্ক-শিবিরে কেহ খুঁজিয়া পাইল না! তখন পরাভবের পর পরাভবে তুর্কসেনা যেন নিরাশ হইতে লাগিল।

দায়ুদ সংবাদ সংগ্রহ করিবার যে কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা তুর্করা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তুর্কীর সর্ব্বনাশসাধনে—বিশেষ আমীরকে ধ্বংস করিতে দায়ুদ জীবনপণ করিয়াছিল। সেই জন্য শেষে ফরিদা যখন দায়ুদের কাছে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল, তখন সে সে প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে নাই। এই কার্য্যে ফরিদাই তাহার অস্ত্র—সে অস্ত্র যে উপায়েই হউক হস্তগত রাখিতে হইবে।

দায়ুদ প্রথমে ফরিদার প্রস্তাবে বিচলিত হইয়াছিল—ভালবাসা! কেহ কি জীবনে একবার ভিন্ন ভালবাসিতে পারে? ভালবাসা কি এক জনের পর আর কাহাকেও অবলম্বন করিতে পারে? সে ধারণাই দায়ুদের ছিল না। বিশেষ রুথ! যে রুথের মত পত্নীকে ভালবাসিয়াছে, সে কি আর কাহাকেও ভালবাসিবার কল্পনা করিতে পারে? না—না—না! দায়ুদের সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেন সে চারিদিকে সেই শব্দ শুনিতে পাইল—না—না—না।

দায়ুদ উঠিয়া নদীর কূলে গেল। নদী খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। পরপারে খর্জ্জুরবৃক্ষের পশ্চাতে—মরুভূমির চক্রবালের কাছে দিনান্ততপনের দীপ্তি যেন গলিত সুবর্ণের মত বোধ হইতেছে। তাহার পর আকাশ রক্তিমবর্ণে রঞ্জিত হইল। তাহার পর? তাহার পর মরুভূমি যেন সূর্য্যের আলোক শোষণ করিয়া লইল। অন্ধকার চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

দায়ুদের মনে হইল—তাহারও এমনই হইয়াছিল। রুথের ভালবাসা তাহার হৃদয়ে এমনই মাধুরী-সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার পর সব অন্ধকার হইয়াছে। এই নদীর জলে রুথ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। রুথ—তাহার রুথ!—কিন্তু সে বাঁচিয়া আছে। কেন বাঁচিয়া আছে? প্রতিহিংসা লইতে। তাহাকে প্রতিহিংসা লইতে হইবে। যেমন করিয়াই হউক, সে প্রতিহিংসা লইবে। প্রতিহিংসার সুযোগ সন্ধান করিয়া সে অর্দ্ধপৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছে। বুকে নরকাগ্নি প্রচ্ছন্ন করিয়া লইয়া ফিরিয়াছে—তাহাতে আমীরকে দগ্ধ করিবে। আজ তাহার সুযোগ সমুপস্থিত। সে সে সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিবে না—না—না। সে জন্য তাহাকে যদি প্রবঞ্চনা করিতে হয়, সে তাহাও করিবে—কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিতে হয়।

নদীকূলে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া দায়ুদ ভাবিতেছিল। সে আপনার মনকে বুঝাইতেছিল, মন, কঠিন হও; যে আমাকে রুথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যে পশু রুথকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। "হত্যা করিব—হত্যা করিব"—মনের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল। সেই সময় পশ্চাৎ হইতে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

অন্যমনস্কতা হেতু দায়ুদ সে দিনের সঙ্কেতবাক্য জিজ্ঞাসা করিয়া আইসে নাই। সে কেবল বলিল, "বন্ধু!"

এই শত্রুপরিবেষ্টিত স্থানে কেবল ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রহরী সেনাবাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না। সে গুলী করিবার জন্য বন্দুক তুলিল।

প্রত্যুৎপন্নমতি দায়ুদ তন্মুহূর্ত্তে মাটীর উপর শুইয়া পড়িল। গুলী উপর দিয়া চলিয়া গেল।

প্রহরী পুনরায় গুলী চালাইবার পূর্ব্বেই দায়ুদ ইংরাজীতে বলিল, "আমি ইহুদী দায়ুদ—ইরাকে ইংরাজের বন্ধু।" এ দিকে বন্দুকের আওয়াজে আরও কয় জন প্রহরী সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল।

দায়ুদ উঠিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল। চন্দ্রালোকে তাহারা দায়ুদকে চিনিতে পারিল। যে প্রহরী গুলী চালাইয়াছিল, সে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি কেবল আদেশ পালন করিয়াছি।"

দায়ুদ বলিল, "তোমার কোন অপরাধ নাই।"

তাহার নিকট হইতে সে দিনের সঙ্কেতবাক্য জানিয়া লইয়া দায়ুদ শিবিরে ফিরিয়া গেল

সে রাত্রিতে দায়ুদ ঘুমাইতে পারিল না। পরদিন প্রাতে ফরিদার প্রস্তাবের উত্তর দিতে হইবে। ফরিদা তাহাকে চাহিয়াছে। সেই প্রস্তাবে তাহার সম্মতি পাইবে বলিয়া ফরিদা তাহাকে আমীরের শিবিরের নক্সা পাঠাইয়া দিয়াছে—অস্ত্র ও উপকরণ, বারুদ প্রভৃতি কোথায় সঞ্চিত আছে, দেখাইয়া দিয়াছে।

ফরিদা আমীরকে জালে ফেলিয়াছে।

সে সাহিদের দৌর্ব্বল্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ছলনায় ভুলাইয়াছে। রূপজমোহে সাহিদ এমনই মোহাবিষ্ট যে, ফরিদার জন্য তিনি এখন সবই করিতে প্রস্তুত। সাহিদের—পশুপ্রকৃতি সাহিদের হৃদয়ে একটিমাত্র উচ্চ ভাব ছিল—প্রভুপরায়ণতা। ফরিদা দিনে দিনে দুরাশার বিষপ্রয়োগে তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সে সাহিদকে বুঝাইয়াছিল, আমীর তাহার হস্তে খেলিবার পুতুল—এখন আর পুতুলকে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিয়া আপনি তাহার চরণতলে দাঁড়াইয়া থাকিবার প্রয়োজন কি? সাহিদ ত আপনি সেই সিংহাসনে বসিতে পারে—ফরিদাকে তাহার পাশে বসাইতে পারে। রমণীসঙ্গলাভপিপাসী সাহিদ ধীরে ধীরে এই চিন্তার বিষক্রিয়ায় মনে করিতেছিলেন, তাই ত! দীর্ঘ জীবন তিনি আপনার কোনরূপ স্বার্থলাভের আশা না করিয়া আমীরের সেবা করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার কি লাভ হইয়াছে? আজ আমীর যদি ইচ্ছা করেন—তাঁহার মস্তক ঘাতুকের অস্ত্রে স্কন্ধচ্যুত হইবে। রাজসেবার এই পুরস্কার! দীর্ঘ জীবন তিনি রিপুতাড়নে চালিত হইয়াছেন—কোন নারী তাঁহাকে ঘৃণা ব্যতীত ভালবাসা দেয় নাই। তাহার পর জীবনের সায়াহ্নে আজ তিনি ফরিদার ভালবাসা পাইয়াছেন। যেন সহসা মরুভূমির উপর দিয়া নদীর জলধারা প্রবাহিত হইয়াছে! এ যে অদৃষ্টের অপ্রত্যাশিত দান! তিনি কি ইহা উপেক্ষা করিতে পারেন? ফরিদা তাঁহাকে বুঝাইয়াছে, তিনি আমীরের জন্য যে সব ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, সে সকল আপনার জন্য করিলে ইরাকে আজ তাঁহার মত প্রভাব কাহারও থাকিত না। ফরিদা জানিয়াছে—সে তাঁহার হইবে। ফরিদার একটি পানের এক

চরণ তিনি কিছুতেই স্মৃতি হইতে দূর করিতে পারিতে-ছিলেন না—

"আসছে আমার আশার পরী
হাওয়ার উপর ভেসে।"

অদৃষ্ট সৌভাগ্যের বাতাসের উপরই তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া আসিয়াছে।

সাহিদের পরামর্শেই তুর্কী টেসিফন রক্ষার ভার আমীরের উপর দিয়াছে; আর সাহিদই আমীরকে বলিয়াছেন, তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে না যাইলে সৈনিকরা সাহস পাইবে না। আমীর সাহিদের কাছে আপনাকে কাপুরুষ প্রতি-পন্ন করিতে পারেন না—তাই তিনি আসিয়া টেসিফনের নিকটেই শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছেন। সাহিদ রাজ-ধানীর ভার লইয়া তথায় অবস্থিত। আমীরের সঙ্গে কয় জন মাত্র বেগম আসিয়াছেন। সাহিদের ইচ্ছা ছিল না—ফরিদা সঙ্গে যায়। কিন্তু ফরিদা বলিয়াছিল, "আমীর কি মনে করিবেন? কয় দিন মাত্র—তাহার পর আমি অসুস্থতার ভাণ করিয়া ফিরিয়া আসিব।"

আমীর যাইবার পূর্ব্বে সাহিদ শিবিরের নক্সা আঁকিয়া দিয়াছিলেন। সে নক্সার নকল ফরিদার কাছে ছিল। ফরিদা দূতীর কাছে তাহার নকল দিয়াছিল। দায়ুদ যে উপায়ে আমীরের রাজধানী হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিত, শিবির হইতেও সেই উপায়ে সংবাদ পাইত। কেন না,আমীর রণক্ষেত্রেও কয় জন বেগম লইয়া আসিয়াছিলেন। এই বেগমরা হারেমের মধ্যে যে ভাবে থাকিতেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বাভাবিক কৌতূহলবৃত্তি তৃপ্ত হইবার কোন উপায় না পাইয়া মনেই প্রবল হইত। বাহিরের লোক পাইলে তাঁহারা বাহিরের সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। তাই ইহুদারা যখন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ছলে হারেমে যাইত, তখন কেহ তাহাদের গতিরোধ করিত না। সে দিক হইতে আমীর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করেন নাই।

নক্সাখানি জেমারল নিজে কেবল দায়ুদকে ও এক জন এঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, সুরক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে আমীর অস্ত্রাগার শিবিরের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়াছিলেন যে, সহসা কোন দিক হইতে কেহ তাহা আক্রমণ করিতে না পারে। সেই অস্ত্রাগারে বারুদে যদি কোনরূপে অগ্নিযোগ করা সম্ভব হয়, তবে সমগ্র স্কন্ধাবারটি উড়িয়া যাইবে; কিন্তু ইংরাজ শিবির এত দূরে যে, তাহার কোন অনিষ্ট হইবে না। ফরিদা প্রশ্নের উত্তরে জানাইয়াছিল, অস্ত্রাগারেও তাহার প্রবেশাধিকার আছে; কেন না, তাহারই এক পার্শ্বে বেগমদিগের মূল্যবান অলঙ্কার রক্ষিত হয় এবং সে সব রাখিয়া আসিবার ও লইয়া আসিবার ভার তাহার উপর।

সেই অস্ত্রাগারে যদি কোনরূপে একটি বোমা রাখিয়া তাহার পলিতায় অগ্নিযোগের এমন ব্যবস্থা করা যায় যে দুই, তিন, বা চারি ঘণ্টা পরে বোমা ফাটিয়া যাইবে—তাহা হইলে সেই উপায়ে অনায়াসে বারুদের স্তূপ প্রজ্বলিত হইতে পারে; আর তাহা হইলেই আমীরের শিবির উড়িয়া যাইবে। তাহাতে জেমারলের কার্য্য সিদ্ধ হইবে—তুর্কীর সেনাদল ছিন্নভিন্ন ও ভয়বিহ্বল হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দায়ুদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে,—যে পিশাচ তাহার জীবন মরুময় করি-য়াছে, তাহার পাপ-দেহ কণা কণা হইয়া মরুবালুকার মিশাইবে।

এ সুযোগ উভয়েই সন্ধান করিয়াছেন। এ সুযোগ কেহই ত্যাগ করিতে পারেন না।

ফরিদা দায়ুদের নির্দ্দেশানুসারে কায করিতে স্বীকারও করিয়াছে। কিন্তু তাহার যে মূল্য চাহিয়াছে, তাহা?—সে চাহিয়াছে—দায়ুদকে।

দায়ুদ উত্তরে বলিয়া দিয়াছিল, ফরিদা মুক্তি পাইবে, ধনরত্ন যাহা চাহে পাইবে; কেবল তাহাকে পাইবার জন্য যেন জিদ না করে—কারণ, যে ফুলের সৌরভ ও মধু সবই গিয়াছে, যে ফুল কেবল ঝরিয়া পড়িবার অপেক্ষা করিতেছে, পাগল ব্যতীত আর কেহ তাহাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র হয় না।

ফরিদা উত্তর দিয়াছিল, "আমি এক বই দ্বিতীয় মূল্য জানি না—চাহি না। আমি পাগলই হইয়াছি। নহিলে, এই আশায় সব বিপদ সাগ্রহে বরণ করিয়া লইব কেন? নহিলে, আশ্রয়দাতা পিতার নিধনসাধনে সম্মত হইব কেন? নহিলে, এত ষড়যন্ত্র করিব কেন? নহিলে, এই আশা বুকে লইয়া প্রতীক্ষায় থাকিব কেন? টাইগ্রীসের জল যেমন কেবল সাগরের দিকেই প্রবাহিত হয়, ফরিদার ভালবাসাও তেমনই কেবল দায়ুদের দিকেই যাইতেছে। কে

তাহাকে ফিরাইতে পারে? মরুভূমির বালুবাত্যা আর ইরাকে টাইগ্রীসের প্রবাহ—কেহ কি তাহাদিগের গতি-পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে পারে?"

আর ফরিদা বলিয়া দিয়াছিল, দায়ুদ যদি তাহাকে এই মূল্য দিতে স্বীকৃত হয়, তবে সেই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে যাহা করিতে হয় বলিয়া পাঠাইলে সে অবিচারিতচিত্তে তাহা করিবে—নহিলে নহে।

আর বিলম্ব করা চলে না। আজই উত্তর স্থির করিতে হইবে। তাই দায়ুদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। জেনারল তাহাকে কেবলই বলিতেছিলেন—"প্রতিশ্রুতি সহ বোমা পাঠাইয়া দিতে আর বিলম্ব করিয়া কায নাই।" তিনি এমনও বলিয়াছিলেন, যুদ্ধে আর ভালবাসায় সবই করা যায়—যদি প্রতিশ্রুতি পালন করা দায়ুদের অনভিপ্রেত হয়, সে পরে—কার্য্যোদ্ধারের পর, সে প্রতিশ্রুতি পালন না করিলেও পারিবে। দায়ুদও বুঝিয়াছিল, সে যদি এখন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করে, তবে হয় ত তাহার জীবনান্ত হইবে—শত্রু বলিয়া সামরিক আইনে তাহাকে হত্যা করা হইবে এবং তাহার পর জেনারল হয় ত দায়ুদ সাজিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিবেন। ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারের প্রতিষ্ঠাতা ক্লাইব ধূর্ত্ত উমীচাঁদের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা সে ইতিহাসপাঠে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুভয়ে সে ভীত ছিল না; কারণ, জীবনে তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না। জীবন যাহাকে আকৃষ্ট করে না—মৃত্যুতে তাহার ভয় কি? দায়ুদ কেবলই ভাবিতেছিল, সে কেমন করিয়া এ প্রতিশ্রুতি দিবে? রুথ—তাহার রুথ আজ লোকান্তরে; কিন্তু প্রেম যে অন্তর্যামী! রুথের ভালবাসা যে তাহার এই ব্যবহার জানিতে পারিবে—জানিবে, সে ফরিদার হইতে স্বীকার করিয়াছে! আর তাহার আপনার ভালবাসা যে তাহাকে দস্যুতস্করের অধম—বিশ্বাসহন্তা মনে করিবে! সে কেমন করিয়া সে কায করিবে?

সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দায়ুদ অপরাহ্নে নদীকূলে গিয়াছিল—বহুক্ষণ ভাবিয়াছিল—কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

জীবনে তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তবুও কি জন্ত সে জীবনভার বহন করিয়াছে? কিসের উত্তেজনায় সে অর্দ্ধপৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া শেষে জেনারল টাউনসেণ্ডের সাহায্য করিতে আবার ইরাকে আসিয়াছে? কি জন্ত সে জেনারলকে সাহায্য করিতেছে? আমীরের নিধনের জন্ত—রুথের হত্যার প্রতিশোধ লইতে। সেই কথা মনে পড়িতেই সে নদীকূলে দাঁড়াইয়া আপনার মনকে বুঝাইতেছিল—মন, কঠিন হও; যে আমাকে রুথ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, যে পশু রুথকে হত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে হত্যা করিব। তাই তাহার মনের কথা মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল—"হত্যা করিব—হত্যা করিব।" ঠিক সেই সময় প্রহরীর প্রশ্নে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল।

শিবিরে ফিরিয়া অবসন্নভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া দায়ুদ সেই ছিন্ন সূত্র বন্ধন করিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, এ সুযোগ ত আর আসিবে না! তাহার এত দিনের করুণ প্রার্থনা ভগবান্ শুনিয়াছেন; তাই সে আজ এই সুযোগ পাইয়াছে। সে কি ইহা ত্যাগ করিবে? রুথ আজ পরলোকে—পিশাচ আমীর তাহাকে কি যন্ত্রণা দিয়াই হত্যা করিয়াছে! সে তাহার প্রতিশোধ লইবে। প্রেম যদি অন্তর্যামী হয়, তবে রুথ তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে ভুল করিবে না।

দায়ুদ উঠিয়া টেবলের কাছে গেল; ঘড়ী দেখিল, মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে। সে বাহির হইয়া গেল—জেনারলের তাম্বুতে প্রবেশ করিল। জেনারল তখনও হেড-কোয়ার্টারসের জন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন।

দায়ুদ বলিল, "প্রতিশ্রুতি পাঠাইব—বোমা প্রস্তুত করিতে বলুন।"

জেনারল উঠিয়া সাগ্রহে দায়ুদের করমর্দ্দন করিলেন; এবং প্রহরীকে ডাকিয়া অস্ত্রাগারের অধ্যক্ষকে আনিতে বলিলেন। তিনি আসিলে তিন জনে পরামর্শ হইল—কিরূপ বোমা পাঠান হইবে এবং তাহার ব্যবহার জন্ত বোমার বাহককে কিরূপ উপদেশ দিতে শিখাইয়া দেওয়া হইবে, সে সব স্থির হইল। দায়ুদ সমস্ত উপদেশ লিখিয়া লইল এবং তাহার পর আপনার তাম্বুতে ফিরিয়া গেল।

কিন্তু সে ঘুমাইতে পারিল না—ভাবিতে লাগিল। কখন্ যে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পূর্ব্বব্যবস্থামত প্রভাতেই দুই জন ইহুদী কতকগুলি পণ্য লইয়া উপস্থিত হইল।

দায়ুদ তাহাদের পণ্যের মধ্যে বোমাটি রাখিয়া তাহাদিগকে উপদেশের কথা বুঝাইয়া দিল। তাহার পর সে ফরিদাকে তাহার উপদেশ পাঠাইল—

"ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমারই জয় হউক। পলিতায় আগুন দিবার দুই ঘণ্টা পরে সব উড়িয়া যাইবে। যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাহ, তাহাদিগকে তাহা বুঝিয়া সরিয়া যাইতে বলিও। অভিজ্ঞান দেখাইলে প্রহরীরা তোমায় আসিতে দিবে।"

পসারিণী চলিয়া গেল।

দায়ুদের মনে হইল, তাহার কায শেষ হইল—আর তাহার কোন কায নাই। সে আসিয়া অবসন্নভাবে শয্যায় শয়ন করিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ইংরাজের শিবিরে আজ যেন কেমন একটা স্তব্ধভাব, আর তাহারই মধ্য হইতে জেনারলের ব্যবহারে উৎকণ্ঠা যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। মরুভূমিতে বালুবাত্যা উঠিবার পূর্ব্বে যেমন গুমট হয়, এ যেন তেমনই। আজ কুচকাওয়াজের কোন উপদেশ নাই; জেনারল অন্যমনস্ক। সৈনিকরা ভাবিতেছে—এ কি? তবে কি কোন আসন্ন দুর্ঘটনার সংবাদ জেনারল পাইয়াছেন? সহসা এ কি হইল?

মধ্যাহ্নের পর বসোরা হইতে একখানি জাহাজ রসদ ও সমর-সরঞ্জাম লইয়া শিবিরের ঘাটে পৌছিল। সংবাদ পাইয়া জেনারল বলিলেন, "আজ মাল খালাস হইবে না।"

যে সংবাদ আনিয়াছিল, সে বলিল, "কিন্তু—"

জেনারল অধীরভাবে বলিলেন, "যাও। কেবল দেখিবে, আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেহ জাহাজে না যায়—জাহাজ হইতে কেহ না নামে। জাহাজে কে আছে, কি আছে, সে সংবাদ যেন কোনরূপে প্রকাশ না পায়। কিন্তু এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবে যে, আদেশপ্রাপ্তির পর পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাত্রীরা নামিয়া আসিতে পারে।"

সংবাদবাহী কর্ম্মচারী সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

জেনারলের এই আদেশে শিবিরে শঙ্কার ভাব গাঢ়তর হইল।

জেনারলের মনে হইতে লাগিল—দিন কি এত দীর্ঘ! সমস্ত দিন তিনি দশ পনের মিনিট অন্তর ঘড়ী দেখিতে লাগিলেন।

দায়ুদ সে দিন আর শয্যা ত্যাগ করিল না—আহারের কথা তাহার মনেই ছিল না। সে ভাবিতেছিল, পাশা হস্তচ্যুত হইয়াছে—জীবনের কায শেষ হইয়াছে। আজ যদি তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়, তবে তাহার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে; রুথের মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া হইবে। কিন্তু তাহার পর?—তাহার পর আর কিছুই নাই; ঐ মরুভূমির ঊষর বালুবিস্তারের মত শূন্য—দগ্ধ জীবন। কোথায় তাহার শেষ? কে যেন মনের মধ্যে বলিয়া উঠিল—"শেষ নাই! শেষ নাই! সীমাহীন—মরুভূমি।"

মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল—ক্রমে তাহার উজ্জ্বল কিরণ কোমল হইয়া আসিল। জেনারল একবার দায়ুদের তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। দায়ুদ তখনও শুইয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বন্ধু, অবসন্ন হইও না—আমি দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলাম, ইহুদারা ফিরিয়া আসিতেছে। আশা কর, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

দায়ুদ কোন কথাই বলিল না; তাম্বুর ছাতের দিকে চাহিয়া রহিল।

জেনারল বসিয়া ঘন ঘন ঘড়ী দেখিতে লাগিলেন, আর মুক্ত দ্বারপথে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে পসারিণীরা ফিরিয়া আসিল—দায়ুদের তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া জেনারলকে ও দায়ুদকে অভিবাদন করিল।

যেন বিদ্যুতের স্পর্শে চমকিয়া দায়ুদ উঠিয়া বসিল; জিজ্ঞাসা করিল, "খবর?"

পসারিণীরা উভয়ে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "শুভ।"

জেনারল পকেটে হাত দিলেন—হাতে যতগুলা গিনি উঠিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দিলেন।

দায়ুদ জিজ্ঞাসা করিল, "ফরিদা কি বলিল?"

এক জন পসারিণী বলিল, "সে জিনিষটি লইয়া বলিল—ইহাই আমার মুক্তির নিদর্শন।"

"সে কি বলিল—আজই সে কায করিবে?"

"হাঁ। আমরা তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।"

"সে কি উত্তর দিল?"

"ইন্‌শা আল্লা" (ভগবানের যদি তাহাই অভিপ্রেত হয়)—তাহার পর সে বলিল, "বন্দী যদি কারাগারদ্বার মুক্ত দেখে, তবে সে কি পলাইতে বিলম্ব করে ?"

তখন দায়ুদ আরও সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

যাইবার সময় এক জন পসারিণী বলিয়া গেল—"ফরিদা বলিয়াছে, সে আজই শিবিরে আসিবে—প্রহরীদিগকে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া রাখিবেন।"

পসারিণীরা চলিয়া গেলে জেনারল দায়ুদকে বলিলেন, "বন্ধু, আজ যদি সফল হই, তবে আমার নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। আর—ইংরাজ কখন ইরাকে তাহার বন্ধুকে ভুলিবে না। ইরাক তোমার দেশ—এ দেশে কোন পদ তোমার আকাঙ্ক্ষার বাহিরে থাকিতে পারিবে না।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দায়ুদ বলিল, "আমি অর্থ-লোভে এ কায করি নাই।"

জেনারলের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি যাহা দিব, তাহা তুমি সাদরে গ্রহণ করিবে—গ্রহণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"

ম্লান হাসি হাসিয়া দায়ুদ বলিল, "তেমন কোন জিনিষ এই বিশাল বিশ্বে আর নাই। যে ছিল, আমীর তাহাকে হত্যা করিয়াছে। আজ তাহার হিসাবনিকাশ হইবে।"

জেনারল একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

দায়ুদ আবার শুইয়া পড়িতেছিল, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "খাবার কি তাম্বুতে আনিব ?"

"আন"—বলিয়া দায়ুদ হাত-মুখ ধুইতে গেল।

মরুপ্রদেশে সূর্য্যের কিরণ একবার কোমল হইতে আরম্ভ হইলে দ্রুত কোমল হইয়া যায়—সূর্য্যাস্তের পরও বহুক্ষণ আলো থাকে আর সেই সময় পশ্চিমগগনে মেঘে বর্ণের পর বর্ণ ফুটিয়া দিনান্তশোভা প্রকটিত হয়। সূর্য্য দ্রুত পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে নামিয়া যাইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে জেনারলের ও দায়ুদের উৎকণ্ঠা ও অধীরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।—কি হয় !—কি হয় ! এ যেন জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া উভয়ে অদৃষ্টের নির্দ্দেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সন্ধ্যার পর—অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেই জেনারল একবার শিবিরের বাহিরে গেলেন এবং নদীকূলে যাইয়া মোটর-বোট লইয়া ষ্টীমারে উঠিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি আর একা নহেন—সঙ্গে এক জন রমণী! সৈনিকরা পরস্পরের দিকে চাহিল—এ কি ? রণক্ষেত্রে—শিবিরে—স্ত্রীলোকের আগমন নিষিদ্ধ। তবে এ কে ? এ কি তবে কোন ছদ্মবেশী ? কেহ কিছু বুঝিতে পারিল না। সমস্ত দিনের থম-থম ভাবের পর এই ব্যাপারে রহস্য যেন গাঢ়তর হইয়া উঠিল।

মহিলাটিকে সঙ্গে লইয়া জেনারল আপনার তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে তথায় রাখিয়া আপনি দায়ুদের তাম্বুতে আসিয়া দায়ুদকে বলিলেন, "খাবারের সময় হইয়াছে।"

দায়ুদকে সঙ্গে লইয়া তিনি আহারের তাম্বুতে গেলেন এবং আহারের পর আপনার তাম্বুতে না যাইয়া দায়ুদের সঙ্গে তাহার তাম্বুতে আসিয়া বসিলেন।

জেনারল চুরুটের পর চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ইহাই তাঁহার "মুদ্রাদোষ"—চিন্তার সময় তিনি ক্রমাগত চুরুট টানিতেন।

দায়ুদ আর একখানা চেয়ারে বসিয়া রহিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। উভয়েই তাম্বুর দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। উভয়েই উৎকর্ণ।

এক এক মিনিট যেন এক এক ঘণ্টা! ঘড়ীর কাঁটা যেন অচল হইয়াছে!

ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। জেনারল একবার দায়ুদকে বলিলেন, "দশটা বাজিয়া গেল।"

দায়ুদ কোন কথা বলিল না।

আরও অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়া গেল—তাহার পর আরও অর্দ্ধঘণ্টা।

জেনারল অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় সহসা দূরে অতি উজ্জ্বল আলো—রজনীর অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া—জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে অতি ভীষণ শব্দ শ্রুত হইল। সে শব্দে ইংরাজের শিবিরও কাঁপিয়া উঠিল। দায়ুদ উঠিয়া দাঁড়াইল।

জেনারল ও দায়ুদ তাম্বুর বাহিরে আসিলেন—দেখিলেন, দূরে আলোক নির্ব্বাপিত হইল না—জ্বলিতে লাগিল। এক একবার অগ্নিশিখা উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল—এক

একবার নামিতে লাগিল; যেন নাগিনী ফণা তুলিয়া ছুলিতে লাগিল।

দায়ুদ ও জেনারল উভয়েই বুঝিলেন, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে; তুর্কীর সহায় আমীরের শিবির ভস্মীভূত হই-তেছে—তুর্কীর আশা-বিহগের পক্ষ ভঙ্গ হইতেছে। জেনারলের মুখে হাসি ও মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। কিন্তু দায়ুদের মুখ অন্ধকার। তাহার কায শেষ হইয়াছে—যে উত্তেজনায় সে এত দিন জীবন ধারণ করিয়া ছিল—কায করিতেছিল, তাহা শেষ হইয়াছে। অথচ আজ সে ফরিদার কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ—সে প্রতিশ্রুতি পালন করিলে তাহাকে কেবল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাই দায়ুদ বিষন্ন ও অবসন্নভাবে চিন্তা করিতেছিল।

সহসা দায়ুদের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া জেনারল বিস্মিত হইলেন—দূরাগত বহ্নির আলোকে তিনি দেখিলেন, সে মুখ বিবর্ণ। তিনি বলিলেন, "বন্ধু, আমি তোমার জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার আনিতে চলিলাম।"

দায়ুদ কাতরভাবে বলিল, "ক্ষমা করুন। আমার কাযের সাফল্যই আমার পুরস্কার। আমি পুরস্কারের আশায় ইংরাজের বন্ধু হই নাই।"

"তাহা আমি জানি। কিন্তু অদৃষ্ট যদি তোমাকে তোমার ঈপ্সিত পুরস্কার দেয়, তুমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।"

জেনারল চলিয়া গেলেন।

দায়ুদ তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিল এবং টেবলের উপর যুক্ত বাহু রাখিয়া তাহাতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সহসা—এ কি স্বপ্ন! সেই পরিচিত কণ্ঠের আকুল আহ্বান—"দায়ুদ!" পিশাচ আমীরের সারদাবে সে সেই আহ্বান শেষবার—শেষ শুনিয়াছে। সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে? না—পরলোক হইতে আজ প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইল দেখিয়া রুথ—তাহার রুথ তাহাকে আহ্বান করিতেছে? তাহাই হউক। রুথ তাহাকে ডাকিয়া লউক। তাহার কায শেষ হইয়াছে। রুথ তাহাকে তাহার প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি প্রদান করুক।

আবার সেই আহ্বান!

দায়ুদ মুখ তুলিয়া চাহিল—সম্মুখে দাঁড়াইয়া—! স্থান-কালের ব্যবধান মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দায়ুদ রুথকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

জেনারল তাম্বু হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বহুক্ষণ রুথ ও দায়ুদ কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না। দায়ুদ মনে করিয়াছিল—রুথ মরিয়াছে; ফরিদা তাহাকে তাহাই বলিয়াছিল—মিথ্যা কথা বলিয়াছিল। রুথ আশা ত্যাগ করে নাই বটে, কিন্তু মনে করিতে পারিতেছিল না—সে আবার তাহার দায়ুদকে পাইবে।

আজ উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

কথা যখন ফুরায় না, তখন কথায় কথায় সময় কখন্ কাটিয়া যায়, তাহার অনুভূতি হয় না। দায়ুদের ও রুথের তাহাই হইয়াছিল। এই কয় বৎসরের কথা—সে কি ফুরায়? আর কত কথা! দুই চারি ঘণ্টায় কেন, দুই চারি দিবসেও তাহা শেষ হয় না।

রুথ আশা ত্যাগ করে নাই; তাই তাহার পক্ষেও মিলন একেবারেই অপ্রত্যাশিত হয় নাই। বিশেষ নারীর প্রেম—ইহকালের পর পরকালেও প্রসারিত হয়। কিন্তু দায়ুদ মনে করিয়াছিল, রুথ মরিয়াছে। তাই তাহার পক্ষে এই মিলন যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। যেন এত দিনের এই সব ঘটনা—দুঃখ, কষ্ট, সব স্বপ্ন মাত্র। সারদাবে পরস্পরকে হারাইবার পর কে কি অবস্থায় পড়িয়াছিল, কিরূপে কোথায় গিয়াছিল, সেই সব কথা বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল।

সহসা দ্বার হইতে এক জন প্রহরী প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিল। সে একটি নিদর্শন লইয়া আসিয়াছিল। জেনারলের আদেশ ছিল, কেহ সেই নিদর্শন লইয়া আসিলে তাহাকে আসিতে দেওয়া হইবে—দায়ুদের তাম্বুতে লইয়া যাইতে হইবে। এক নারী সেই নিদর্শন লইয়া আসিয়াছে—সে বোধ হয় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়াছে, সে শ্রান্ত—তাহার চক্ষুতে উত্তেজনাদীপ্ত দৃষ্টি, তাহার মুখে অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব। প্রহরী তাহাকে লইয়া আদেশানুসারে দায়ুদের তাম্বুতে আসিয়াছিল।

দায়ুদ তাহাকে আসিতে অনুমতি দিল।

প্রহরী তাম্বুতে প্রবেশ করিল। প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল—ফরিদা!

ফরিদাকে দেখিয়া ঘৃণায় দায়ুদের চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল।

ফরিদা মনে করিয়াছিল, যে জন্য সে এত দিন ষড়যন্ত্র করিয়াছে—এত দিন প্রতীক্ষা করিয়াছিল—আজ সে তাহা পাইবে—দায়ুদ তাহার হইবে। দায়ুদকে পাইবার জন্য সে-ও অসাধ্যসাধন করিয়াছে। সে মনে করিয়াছিল, আজ সে কামনার কল্পনালোকে উপনীত হইবে।

তাম্বুতে প্রবেশ করিয়া ফরিদা দেখিল—সম্মুখে—রুথ।

সহসা ফরিদার মুখ মরুভূমির বালুবিস্তারের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ মরুবাত্যায় বসোরার আঙ্গুর-লতার মত কম্পিত হইতে লাগিল।

রুথের ভয় হইল, সে পড়িয়া যাইবে। "উহাকে ধর"—বলিয়া রুথ তাহাকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল।

ফরিদা চমকিয়া উঠিল। বুঝি প্রেতলোকের অধিবাসীকে দেখিলে—সে স্পর্শ করিতে আসিলেও মানুষ তত ভয় পায় না। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ছুটিয়া তাম্বু হইতে বাহির হইয়া গেল।

দায়ুদ উঠিল। তাহার ভয় হইল, ফরিদা পাগল হইয়া গিয়াছে—বাহিরে সাঙ্কেতিক বাক্য বলিতে না পারিলে প্রহরীরা তাহাকে গুলী করিবে।

দায়ুদের আদেশে প্রহরী সাঙ্কেতিক বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ফরিদা যে দিকে গিয়াছিল, সেই দিকে দৌড়াইয়া গেল; দেখিয়া আর কয় জন প্রহরীও সেই দিকে দৌড়িল।

দায়ুদও সেই দিকে গেল।

যে দিকে নদী, ফরিদা সেই দিকে দৌড়িয়া গিয়াছিল—যেন সে প্রেতলোকবাসী কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া দৌড়াইয়া যাইতেছিল।

প্রহরীরা ফরিদাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সে নদীর কূলে উপস্থিত হইল। জ্যোৎস্নালোকে প্রহরীরা দেখিল, কূল হইতে সেই নারীমূর্ত্তি জলের মধ্যে অন্তর্হিত হইল—কেবল জলে গুরুভার দ্রব্যপতনের শব্দ শ্রুত হইল।

দায়ুদ যখন নদীকূলে পৌঁছিল, তখন নদীর জলে আর আবর্ত্তচিহ্নও নাই—জ্যোৎস্নালোকে টাইগ্রীস তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

দায়ুদ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন ফরিদার পরিণাম অবগত হইয়া রুথ কাঁদিয়া ফেলিল। আজ সে সুখী—এ সুখের দিনে সে সকলকেই সুখী দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল। ফরিদার উপরও সে রাগ করিতে পারে নাই।

গোল শুনিয়া জেনারল দায়ুদের তাম্বুতে আসিলেন এবং সব শুনিয়া হাসিয়া দায়ুদকে বলিলেন, "তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেও হইল না।"

উপসংহার

পরদিন দায়ুদ জেনারলকে বলিল, "আমার কায আমি শেষ করিয়া দিয়াছি; আপনি আয়োজন করুন, তুর্ক সেনাপতি নুরুদ্দীনের সেনাবল আপনার কাছে বন্দী হইবে। এইবার আমাকে বিদায় দিন।"

জেনারল ইংরাজ—ইংরাজের প্রকৃতিগত আত্মম্ভরিতা ও আত্মশক্তিতে অতিপ্রত্যয় তাঁহার ছিল। তিনি মনে করিলেন, এবার তাঁহার পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে—তিনি অনায়াসে বিজয়বাহিনী লইয়া বাগদাদ জয় করিয়া অক্ষয় যশ অর্জ্জন করিতে পারিবেন। সে যশের অংশ তিনি ইহুদীকে দিবার কোন প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। তিনি দায়ুদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন।

তাহার পরদিন রসদাদি নামিলে যে জাহাজে রুথ বসোরা হইতে আসিয়াছিল, সেই জাহাজেই দায়ুদ ও রুথ বসোরার দিকে ফিরিয়া গেল। জেনারল স্বয়ং জাহাজে যাইয়া বিদায় লইলেন। সেনাদল সামরিক প্রথায় দায়ুদের প্রতি সম্মান দেখাইল।

তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের কথা। দায়ুদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর তুর্কসেনাদলের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়া টাউনসেণ্ড ফিরিয়া কুট-এল-আমারায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন।

বোম্বাইয়ে ফিরিয়া দায়ুদ প্রথম জেনারলের পরাজয়-সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

বোম্বাইয়ে ফিরিয়া দায়ুদ শ্বশুরের সম্পত্তি লাভ করে এবং যুদ্ধের মধ্যেই ইরাকে সরঞ্জাম সরবরাহে ইংরাজকে নানারূপে সাহায্য করিয়া বড় ব্যবসায় পত্তন করে। কিন্তু সে বা রুথ আর ইরাকে যায় নাই।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের একটা ছোট গ্রামের ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক এক দিন প্রশ্ন করিলেন—"Rich man মানে কি?" উত্তর হইল "বড়মানুষ।" "Great man মানে কি?" "বড় লোক।" "এক জন বড়লোকের নাম কর দেখি।" ক্ষুদ্র বালক চিন্তা করিবার অবসরমাত্র না লইয়া উত্তর করিল, "অশ্বিনীকুমার দত্ত।" শিক্ষকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বরিশালের লোক আর কোন বড়লোকের খবর রাখিত না। অশ্বিনীকুমার তাহাদের বড় আপনার জন ছিলেন, তাহারাও অশ্বিনীকুমারের অফুরন্ত স্নেহধারায় অহরহঃ অভিষিক্ত হইত।

যখনকার কথা, তখনও দেশে স্বদেশীর দুন্দুভি বাজিয়া উঠে নাই। ইহার বহুদিন পরে স্বদেশী যুগে এক দিন বরিশালের রাস্তায় এক জন মুচি ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা করিতেছিল, "রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে সভা হইবে, বক্তৃতা হইবে।" উৎসুক পথিকরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কে বক্তৃতা করিবে?" "বক্তৃতা? বাবু বক্তৃতা করিবেন, আবার কে বক্তৃতা করিবে?" সদ্য পল্লীগ্রাম হইতে আগত পথিকেরও অজানা ছিল না, বরিশালের একমাত্র বাবু (নেতা) কে হইতে পারে। তথাপি কেবল মাত্র রহস্যপরবশ হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ বাবু?" মুচি ঢোল বাজাইতে বাজাইতে পূর্ব্বের ভঙ্গিতেই জবাব দিল—"অশ্বিনী বাবু। আবার কে বাবু আছে?" বরিশালের ছোট বড়, ধনী নির্ধন, ঐ এক বাবুরই খবর রাখিত, ঐ এক নেতারই আদেশ মানিত, আপদে বিপদে, সুখে সম্পদে ঐ পরম সুহৃদের কাছেই ছুটিয়া যাইত। আজ তাহাদের মত নিরাশ্রয় পৃথিবীতে আর কেহ নাই।

অশ্বিনীকুমারের দেহাবশেষ এই রাজধানীর প্রান্তবাহিনী গঙ্গার তীরে রক্ষিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বরিশালের মাটীতে। ইহার বড় গৌরব বরিশালবাসীর জানা নাই। শুনিয়াছি, এক দিন নিদ্রিত বালকের শয্যায় সর্পের অবস্থিতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ তাহার রাজদণ্ডলাভের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। উত্তর কালে অশ্বিনীকুমার সত্য সত্যই বরিশালের রাজা হইয়াছিলেন। সোনার মুকুট বরিশালবাসী তাঁহাকে দিতে পারে নাই, কিন্তু হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশে যে সিংহাসনে এই রাজার অভিষেক হইয়াছিল, পার্থিব জগতের কোন্ রাজা সে সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন? অশ্বিনীকুমার মধ্যে মধ্যে পরিহাসচ্ছলে বলিতেন—"একবার ছোট লাট বেলি বৃষ্টির সময় মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন, নির্ব্বাসনের সময়ে চামরের হাওয়া খাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ জেলের কয়েদীরা মনে করিত, আমি কোন সামন্ত নরপতি, কেন না, স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে জবরদস্ত ছোট লাট হিউয়েট 'সাহেবের' ঐ জেলে শুভাগমন হইয়াছিল। ছত্র, চামর, উপাধি সকলই হইল, বাকী কেবল রাজদণ্ড। কেন, দীর্ঘ নির্ব্বাসনেই ত রাজদণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

অশ্বিনী বাবুর বাড়ী।

আমরা দেখিয়াছি প্রৌঢ় অশ্বিনীকুমারকে; তাঁহার বাল্যের খবর কেমন করিয়া বলিব? তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই তিনি খুব জেদী ছিলেন। অন্তের নিকট শুনিয়াছি, অতি শৈশবেই বালক অশ্বিনীকুমার কাগজের ঢোলক গলায় ঝুলাইয়া হরিনাম করিতে হরিতলায় গিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। নিতান্ত বালককাল হইতেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষ হইয়াছিল, তাঁহার ধর্ম্মসংগ্রামের আরম্ভও হয় অতি অল্প বয়সে। এই সময়-কার দুইটি ঘটনা তাঁহার 'ভক্তিযোগ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"একটি বালক চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন স্থলে বাস করিতেছিল। সে সেই স্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময়ে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহস্বামী বাড়ীতে বেশ্যা আনিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। এক দিবস কতকগুলি লোক সুরা-পান করিতেছে ও বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে বালকটির ইচ্ছা জন্মিল, ক্রমে সে সুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াই-বার উপক্রম করিল; যেমন হস্ত বাড়াইতে যাইতেছে, অমনি তাহার একটি বিদেশস্থ প্রাণের বন্ধুর ছবি তাহার মনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বন্ধুটির প্রতি ইহার গাঢ় অনুরাগ, দু'য়ে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছে। মনে হইল, 'আমি কি করিতে যাইতেছি! আমি আজ সুরাপান করিলে কি তাহার নিকট গোপন রাখিতে পারিব? যদি গোপন রাখি, তাহা হইলে ত আমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক আর কেহ হইতে পারে না। যাহাকে এত ভালবাসি, যাহার নিকট কিছুই গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে, তাহার নিকটে ইহা প্রকাশ না করিয়া কিরূপে থাকিব? প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাসিবে? তাহার সহিত কত দিন সুরাপানের বিরুদ্ধে কত আলোচনা করিয়াছি। সে আমাকে কখনও ভালবাসিবে না। তবে এখন সুরাই পান করি, কি তাহার ভালবাসার মর্য্যাদা রক্ষা করি?' এইরূপ চিন্তায় বালকটির হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক দিকে সুরার মোহময় প্রবল প্রলো-ভন, অপর দিকে প্রেমের পবিত্র গাঢ় আকর্ষণ। কিঞ্চিৎ-কাল সংগ্রামের পর প্রেমেরই জয় হইল।"

বলা বাহুল্য, এই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালকই অশ্বিনীকুমার। আর যাঁহার পবিত্র প্রেম অশ্বিনীকুমারকে সুরাপান হইতে বিরত করিয়াছিল, তাঁহার নাম অধ্যাপক ত্রিগুণাচরণ সেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। মহাপুরুষদিগের জীবনে পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্বের এই দিকটা গোপন করিয়া রাখা অশ্বিনী-কুমার সঙ্গত বোধ করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, এই সকল দ্বন্দ্বের কাহিনী শুনিয়া দুর্ব্বলচিত্ত সাধারণ লোক উৎসাহ পায় এবং ধর্ম্মজীবন গঠনে সমর্থ হয়।

কুসঙ্গে পড়িয়া অল্পবয়সে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রলোভনের সাময়িক প্রাধান্য হইলেও সেই সময়েই অশ্বিনীকুমার অক্রোধ দ্বারা ক্রোধ জয় করিতে, প্রেম দ্বারা হিংসাকে পরাভূত করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার একটি দৃষ্টান্তও তিনি নিজের নামটিমাত্র গোপন রাখিয়া 'ভক্তিযোগে' দিয়াছেন। তাঁহার নিজের ভাষায় সেই ঘটনা নিয়ে বিবৃত হইল—

"এক স্থানে দুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে পড়িত, অপরটি কোন কলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করিত। এক দিবস কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাদ হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কোনরূপে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। সে বলিল, 'আমি কোন অপরাধ করি নাই; যদি করিয়া থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি।' এই বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল। এই ছাত্রটি প্রায় প্রত্যেক দিন অপর যুবকটির বাড়ীতে আসিত। কিন্তু বিবাদ হওয়ার পর হইতে আর সে তাহার নিকট আসে না। ইহাতে অপরটির যার-পর-নাই কষ্ট হইতে লাগিল। সে যখনই উপাসনা করিতে বসিত, তখনই যীশুখ্রীষ্টের এই মহাবাক্যটি তাহার মনে হইত। সে ভাবিত, যতক্ষণ না সে অপর যুবকটির সহিত মিলন করিবে, ততক্ষণ ভগবান্ তাহার প্রার্থনা কি স্তবস্তুতি গ্রাহ্য করিবেন না; তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িল। এ দিকে

তার জর হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং সে অপর যুবকটির নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই জর আরোগ্য হইল, অমনি ছুটিয়া তাহার নিকট উপস্থিত—'ভাই, আমাদিগের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিব?' সে নিতান্ত বিরসমুখ হইয়া উত্তর করিল, 'তাহা হইবে না। কাচ ভাঙ্গিলে আর কি তাহা জোড়ান যায়?'

"এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া আসিতে হইল, বলিয়া আসিল 'আমি পুনরায় কা'ল উপস্থিত হইব; প্রত্যেক দিন আসিব, যে পর্য্যন্ত না পুনরায় মিলন হয়।' তাহার পরদিন পুনরায় তাহার বাড়ীতে উপস্থিত; কিন্তু এ দিবস আর তাহাকে বাড়ী পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই যুবকটি পড়িত, সেই স্কুলে এক সভা ছিল; ছাত্রদিগের অনুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র রচনা পাঠ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে, যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দাঁড়াইয়া বলিল, 'অদ্য আমরা এ স্থলে রচনা শুনিতে কি তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপস্থিত হই নাই; আমাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার না কি কি বক্তব্য আছে।' এই ছাত্রটির বাক্য শেষ হইবামাত্র অমনি সেই ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল, 'ইঁহারা সকলে আমার অনুরোধে এ স্থলে উপস্থিত। সে দিন হয় ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি—বন্ধুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি; তাহা চাহি নাই এবং চাহিবার কোন কারণও নাই।' এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটূক্তি করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন ভাবিলেন; কিন্তু সেই কলেজের ছাত্রটি তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করায় আর তাহা পারিলেন না। আজ সে দৃঢ় হইয়া আসিয়াছে—মিলন করিবেই করিবে। মিলন না হইলে ভগবান্ প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না, প্রেমের দেবতা অপ্রেম থাকিতে কোন কথা শুনিবেন না, এইরূপ প্রাণের মধ্যে ভাব হইলে সে কি আর মিলন না করিয়া থাকিতে পারে? কোন কটূক্তিতে আজ আর সে উত্তেজিত নহে, কিছুতে তাহার মন বিচলিত হইতেছে না। যাই স্কুলের ছাত্রটি বলিল, অমনি কলেজের ছাত্রটি উঠিয়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল 'মিলন! মিলন! হইতে পারে না।' 'Reconciliation! Reconciliation cannot take place.' এই কথায় বিন্দুমাত্র সংক্ষোভিত না হইয়া কলেজের ছাত্রটি প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল ও তাহার নিকট ক্ষমা চাহিতে লাগিল। তাহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি ক্রমে সকলকেই আকুল করিয়া তুলিল। বক্তা ও শ্রোতা প্রায় সকলেরই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ। স্কুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার পুস্তকগুলি টেবলের উপর হইতে তুলিয়া লইল। তখন কলেজের ছাত্রটি আরও মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বারংবার 'কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দ্দয় হইও না' এইরূপে করুণ স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, স্কুলের ছাত্রটি বুঝি আর তাহার কথা শুনিতে চাহে না বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সভা হইতে চলিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেম সর্ব্বজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্ট কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে, আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে গিয়া তাহার দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে 'আমায় ক্ষমা করুন' বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। এই মিলন আর কখনও বিরোধের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয় নাই।" বহুকাল পরে বার্দ্ধক্যের দ্বারে উপনীত অশ্বিনীকুমারের সহিত বাবু হরিচরণের পুণ্য বারাণসীধামে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে দিন এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া দুই বন্ধু বালকের ন্যায় গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার অনেক মহাপুরুষের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু ও পরমহংস রামকৃষ্ণের কথা তিনি 'ভক্তিযোগে' স্থানে স্থানে বলিয়াছেন। ইঁহাদের আদর্শে তাঁহার জীবন অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকুল হইয়া তিনি কলিকাতা হইতে বিনা সম্বলে একবস্ত্রে যশোহরে ছুটিয়া গিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য। অশ্বিনীকুমার ভক্তিভাবে বাইবেল পাঠ করিতেন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অশ্রু নির্গত হইত, হাফেজের কবিতা পড়িতে পড়িতে তিনি নৃত্য করিতেন, রুমির আধ্যাত্মিক কবিতায়

তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন, কেম্পিসের তিনি পরম ভক্ত ছিলেন, তাঁহার ধর্ম্ম-মতে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রও ছিল না। উত্তরকালে তিনি জটিয়া বাবা শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য গুরু ভাইদের মত তিনি মুখবিবরে তাম্বুল নিক্ষেপ করা, অথবা নারিকেলের মালায় চা-পান করা গুরুনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের আদব বলিয়া মানিতেন না। যশোহরে তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-সভায়ও কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মুসলমান মোলবী, খৃষ্টান পাদ্রী, বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ ও হিন্দু সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত এই সভায় সম্মিলিত হইতেন—সকল সম্প্রদায়ের অতীত ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করিতেন। আর এই সভার প্রাণ ছিলেন তরুণ অশ্বিনীকুমার। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে এ দেশের সনাতন রীতি অনুসারে তাঁহাতে অবতারত্ব আরোপের চেষ্টাও হইয়াছিল। কিন্তু তেজস্বী অশ্বিনীকুমার ইহার আভাসমাত্রকেও ক্ষমা করেন নাই।

অশ্বিনীকুমার যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র, তখন ইংরাজীতে সনেট লিখিয়া একবার ছোট লাটকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী যুবকের ইংরাজী কবিতা ইংরাজ লাটের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। অধ্যাপক রো লাটের নিকট কৃতী শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। বি, এ পাশ হইবার পর অশ্বিনীকুমার পিতার নিকট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ায় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় তখন কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজ। ইতঃপূর্ব্বে ছোটলাট স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাঁহার নিকট অশ্বিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী দিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তম দত্তের যোগ্য বংশধরের ইতোমধ্যেই গোলামী অসহ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি পুত্রকে বলিলেন—"উকীল হও, স্বাধীন ব্যবসা কর। আমি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী, হাজার টাকা বেতন পাই। অনেক কর্ম্মচারী আমার হুকুম পালন করে। সমাজেও প্রতিপত্তি আছে। তথাপি আমার বংশে আর কেহই গোলামী করে, ইহা ইচ্ছা করি না।" অশ্বিনীকুমার ডেপুটী হইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন। বোধ হয়, তাঁহার মত তেজস্বী ব্যক্তি দীর্ঘকাল ডেপুটীগিরির লাঞ্ছনা ভোগ করিতে পারিতেন না; লাভের মধ্যে জীবনের কয়েক বৎসর বৃথা অপব্যয়িত হইত।

উকীল—অশ্বিনী বাবু।

বি, এ পাশ করিবার পর অশ্বিনীকুমার কিছু দিন শ্রীরামপুরের নিকট একটা ছোট স্কুলে হেড মাষ্টারের কায করিয়াছিলেন। চাতরার ছেলেরা দেখিল, এ এক নূতন রকমের হেড মাষ্টার। বিনীত বদন, সৌম্য মূর্ত্তি, তাহাদেরই প্রায় সমবয়স্ক। হেড মাষ্টার হইবে গুরুগম্ভীর, বেত্রহস্ত, শৃঙ্গীনখী দন্তীর মত, তাহাকে ভীত সন্ত্রস্ত বালখিল্যরা শশব্যস্তে এড়াইয়া চলিবে। আর এ হেড মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গেও বেড়ায়, নৌকায় করিয়া সন্ধ্যাবেলা নদীতে বাচ খেলিতে যায়, ছেলেরা আবার তাহার কোলে মাথা রাখিয়া গান গায়! পুরাতনপন্থী অভিভাবকরা দেখিয়া শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন,—নূতন হাওয়া লাগিলে প্রাচীন বৃক্ষের শাখায় শাখায় জীর্ণ পীত পত্রগুলি যেমন ঝর ঝর করিয়া আপত্তি জানায়। এক জন আসিয়া এই ছোকরা হেড মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, এগুলা কি ভাল হইতেছে?" "কোন্ গুলা?" "এই যে ছেলেরা আপনার সামনে গান গায়, হাসি-তামসা করে?" যুবক হেড মাষ্টার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—তিনি বলিলেন, "কেন মহাশয়, গান গাওয়া ত মন্দ

কায নয়। স্বাভাবিক বিশুদ্ধ আনন্দের পথ বন্ধ করিয়া দিলে ইহারা টপ্পা গাইবে; আমার কাছে ভগবানের প্রার্থনা গান করে।" যিনি অভিযোগ করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীরভাবেই চলিয়া গেলেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সেখানকার সকলে বুঝিলেন, হেড মাষ্টারের আগমনে ছাত্রদিগের মধ্যে এক নূতন জীবনের স্পন্দন দেখা যাইতেছে। বোধ হয়, এম, এ, পাশ করার পরে, ঠিক কখন্ জানি না, অশ্বিনীকুমার কিছু দিন কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরাজী ও কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ইতিহাস অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সময়ে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে এক মিত্রজ মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। 'লীলাবতী'র নদেরচাঁদের বক্তৃতায় দীনবন্ধু এই মিত্রজ মহাশয়েরই একটি বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন।

ওকালতীতে পসার জমাইতে অশ্বিনীকুমারের বেশী দেরী লাগে নাই। কৃতী পিতার কৃতী পুত্র, সাধুতা ও অমায়িকতায় তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, ইংরাজী বক্তৃতার জন্য তিনি ইতোমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং অবিলম্বেই পসার জমিল। অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি কোন বৎসরই ৫ হাজার টাকার কম পায়েন নাই। কিন্তু পসার যখন ক্রমেই বাড়িতেছে, তখন হঠাৎ এক দিন অশ্বিনীকুমার ওকালতী ছাড়িয়া দিলেন। কোন একটি মামলায় মক্কেলের স্বার্থের অনুরোধে তিনি 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' রকমের একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। যে ব্যবসাতে সত্যের মাহাত্ম্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়, অশ্বিনীকুমার সে ব্যবসায়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর কায়স্থবংশোদ্ভব এই ব্রাহ্মণ চিরকাল ব্রাহ্মণের কার্য্য অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, জনসেবা ও ভগবদারাধনাতেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যে বরিশাল লাঠির ঘায়ে পুণ্যে বিশাল হইয়াছিল, যে বরিশালের "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে দিল্লীর বাদশাহের শ্বেতাঙ্গ উত্তরাধিকারীদিগের তন্দ্রা বার বার টুটিয়াছিল, যে বরিশাল ফুলারী জবরদস্তিতে টলে নাই, আধুনিক সায়েস্তা খাঁ গুর্খা লেলাইয়া যে বরিশালকে সায়েস্তা করিতে পারেন নাই, যে বরিশালের ভীতি মর্লির নিকট সীমান্তসমস্যার তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, সে বরিশাল অশ্বিনীকুমারের নিজের সৃষ্টি। তরুণ অশ্বিনীকুমার যে বরিশালে ওকালতী করিতে গিয়াছিলেন—সেখানে ধনের স্থান ছিল বিদ্যার উপরে, ধন ব্যয়িত হইত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, বিদ্বানরা মাথা বিকাইতেন বিদ্যাধরীদের চরণতলে। আর সেখানে ছিল, হাজার বছরের পরাধীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল—গোলামী। শ্বেতশ্মশ্রু উকীলরাও যুবক সিবিলিয়ানকে মিঃ অমুক বলিয়া ডাকিতে সাহস করিতেন না। অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে হার্কিউলিসের বল না থাকিলে তিনি এই অজিয়ান আস্তাবলের বিরাট আবর্জ্জনার স্তূপ ধুইয়া পরিষ্কার করিতে পারিতেন না। এই আস্তাবল ধুইতে যে নদী-স্রোতের প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহারই প্রবাহ বহিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খাতে। এখন অশ্বিনীকুমারও নাই, সে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ও নাই।
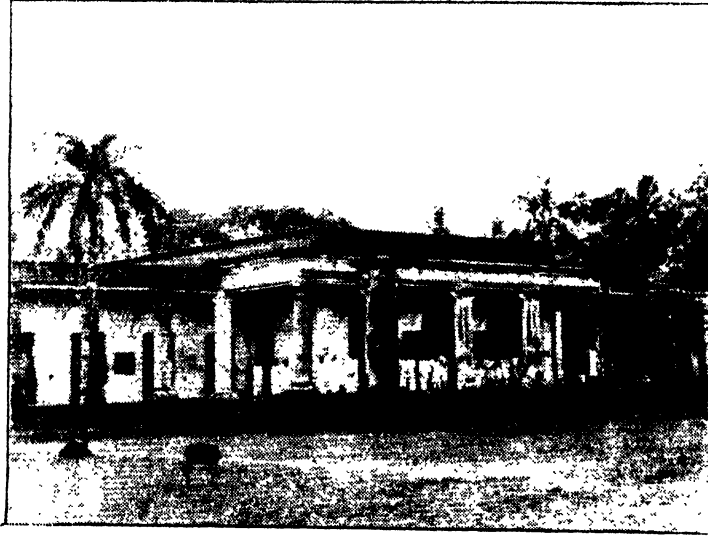
ব্রজমোহন স্কুল।

বরিশালে আসিয়া অশ্বিনীকুমার কেবল ওকালতীতেই

সময় কাটান নাই। উকীলসমাজেও দুর্নীতি দূর করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বরিশালের বারবনিতাদিগের সংখ্যা কমিয়া গেল এবং পানদোষের প্রাবল্যও প্রশমিত হইয়াছিল। এই সূত্রে ভারতহিতৈষী কেন্ ও মহামতি ষ্টেডের সহিত তাঁহার পত্রালাপ হয়।

ব্রজমোহন বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয়, তখন বরিশালে একটি সরকারী বিদ্যালয় ছিল। এখনও যেমন, তখনও তেমনই সেই স্কুলে গতানুগতিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে স্নেহভক্তির মধুর সম্পর্ক ছিল না, শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষা পাশ, ধর্ম্ম বা নীতি শিক্ষাটা বিদ্যালয়ের কার্য্যের একেবারেই বহির্ভূত ছিল। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার পিতা স্থির করিলেন যে, বরিশালে এমন একটি স্কুল স্থাপন করিবেন, যেখানকার ছাত্ররা বিদ্যানুশীলন অপেক্ষাও চরিত্রানুশীলন অধিক প্রয়োজন বোধ করিবে। সে বিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র হইবে, সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা। অশ্বিনীকুমার যখন আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা ব্রত আরম্ভ করিলেন, তখনই এই বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছিল।
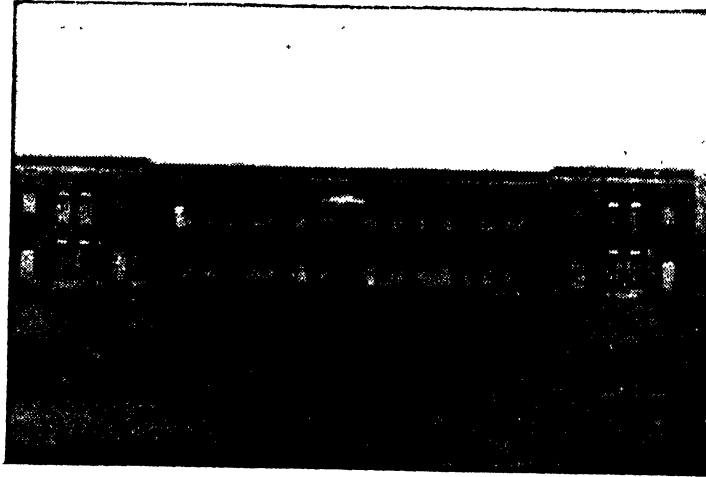
ব্রজমোহন কলেজ।

শিক্ষক হইবার জন্য যে সকল গুণ প্রয়োজন, তাহার সকলই তাঁহার ছিল। তিনি যে কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা বোধ হয় সকলের জানা নাই। প্রাচ্য ভাষার মধ্যে আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও পালি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। অবসরকালে তিনি হাফেজ ও জালালুদ্দীন রুমির কবিতার সরল গদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদগ্রন্থ অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই। পালি ভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘে গণতন্ত্রমতের প্রভাব লক্ষ্য করেন। পাটনার পণ্ডিত কাশীপ্রসাদ জয়গোপালের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার বহু পূর্ব্বে, বোধ হয় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার তাঁহার ছাত্রদিগের নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রচলিত শলাকা এবং বহু মতের প্রাধান্যর কথা বলেন। অন্যান্য স্নেহভাজন ছাত্রের মধ্যে এই অকিঞ্চিৎকর লেখককে এবং তাঁহার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক সুকুমার দত্ত মহাশয়কেও পালি গ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতে তিনি বলিয়াছিলেন। সুকুমার বাবু বৌদ্ধ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়া জ্যেষ্ঠতাতের অনুজ্ঞা পালন করিয়াছেন। ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে তিনি হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। এক জন মারাঠা সার্কাসওয়ালা বরিশালে আসিয়া তাঁহাকে রামদাসকৃত মারাঠী ভাষায় লিখিত দাসবোধ পাঠ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। গুরুমুখীতে লিখিত শিখদিগের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক 'গ্রন্থ সাহেব' তিনি নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন। আবার বহুমূত্র রোগে যখন তিনি নিতান্ত দুর্ব্বল, তখন তাঁহাকে উড়িয়া ভাষার ছোট ছোট বই পড়িতে দেখিয়াছি। তিনি বলিতেন যে, তিনি পারসী পড়িয়াছিলেন, হাফেজের রসাস্বাদ করিবার জন্য. হিন্দী ও মারাঠী শিখিয়াছিলেন,—তুলসীদাস, রামদাস ও তুকারামের ভক্তিপূর্ণ রচনা পাঠ করিবার নিমিত্ত। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য সর্ব্বজনবিদিত। বোধ হয়, তিনি ফরাসী ভাষাও জানিতেন। একবার তিনি আমাদিগকে একটি ফরাসী কোটেসন ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। সেলী ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার গভীর ভাবসমূহ তিনি ছাত্রগণের নিকট সরলভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহার বার্কের অধ্যাপনায় এক নূতন উন্মাদনার সৃষ্টি হইত।

কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্য থাকিলেই প্রকৃত শিক্ষক হওয়া

যায় না। প্রকৃত শিক্ষকের চাই চরিত্রবল; তিনি শিখাইবেন, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া। ফাঁকা বক্তৃতা রাজনীতিক্ষেত্রে চলে, তাহাতে তরুণ জীবনে অমলিন স্বুবর্ণরেখাপাত করা যায় না। অশ্বিনীকুমার যে উপদেশ দিতেন, তাহা তিনি নিজের জীবনে অহরহঃ প্রতিপালন করিতেন। তিনি যখন সত্যানুরাগের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, তখনই তাঁহার ছাত্রদের মনে পড়িত, এই সত্যভীরু শিক্ষকটি বয়স ভাঁড়াইয়া পরীক্ষা পাশ করিবার সুবিধাটুকু হেলায় বর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, সত্যভ্রষ্ট হইবার ভয়ে ওকালতীর মত সম্মানজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি যখন জনসেবার উপদেশ দিতেন, তখন তাঁহার ছাত্ররা দেখিত, আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত তরুণ কন্দর্পের মত এই নরদেবতা অবিকৃতচিত্তে স্বহস্তে কলেরারোগীর মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন। এক দিনের কথা বলি। তখন অশ্বিনীকুমার বার্দ্ধক্যগ্রস্ত, দুরন্ত বহুমূত্র রোগে তাঁহার দেহ দুর্ব্বল। প্রতিদিন বৈকালে তিনি ৪ মাইল বেড়াইতেন, সঙ্গে থাকিত স্নেহভাজন শিষ্যবৃন্দ। তিনি সহর হইতে কিয়ৎদূরে অবস্থিত কাশীপুরের রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন, অপরিচিত এক জন মসলমান রাস্তার নিকটে বসিয়া রুধির বমন করিতেছে। কয়েক জন সঙ্গীকে সহর হইতে ষ্ট্রেচার আনিতে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু পাছে বিলম্বে রোগীর ক্ষতি হয়, সেই জন্য এই অপরিচিত দরিদ্র মুসলমানকে নিজের পিঠে তুলিয়া লইয়া সহরের দিকে ফিরিলেন। কিছু দিন পরে কৃতজ্ঞ মুসলমান রোগমুক্ত হইয়া অশ্বিনীকুমারকে লিখিয়াছিল—"আমার পৃষ্ঠচর্ম্মে আপনার পায়ের পাদুকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেও এ ঋণের পরিশোধ হইবে না।"

ধ্যাপক অশ্বিনীকুমার।

অশ্বিনীকুমার সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন, কিন্তু বিলাসিতা সর্ব্বথা পরিহার করিয়া চলিতেন। কলেজের মালিক আসিতেন মোটা লংক্লথের জামা গায়ে, সাদা থান পরিয়া, সাধারণ রকমের জুতা পায়ে দিয়া; সুতরাং অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের মধ্যেও পরিচ্ছদের বাহুল্য বা আড়ম্বর ছিল না। ছাত্ররাও সাধারণতঃ এই দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিত। একবার একটি ছাত্র একটু অসম্ভব রকমের পরিচ্ছদের পারিপাট্য করিয়া কলেজে গিয়াছিল। বারান্দায় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে দেখা। তিনি তাহার পরিচ্ছদের মধ্যে কতকগুলি অনাবশ্যক বাহুল্য দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এগুলি পরিয়াছ কেন?" ছাত্রটি একটু উদ্ধতভাবে জবাব দিল—"আমার ইচ্ছা।" অশ্বিনীকুমার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তুমি এখনই আফিসে যাইয়া ট্রান্সফার লও।" ছাত্র—"কেন?" অশ্বিনীকুমার—"এ কলেজটা আমার। এখানে বিলাসী বাবুদের স্থান নাই।"

অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন, মান্দ্রাজ কংগ্রেস হইতে ফিরিবার সময়ে একটি অপরিচিত যুবক পুরীতে তাঁহাদিগকে পরম সমাদর করিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে তখন চিনিতে পারেন নাই। বরিশালে ফিরিবার পর তিনি তাঁহার নিকট হইতে চিঠি পান—"১৩ বৎসর পূর্ব্বে বিলাসিতার জন্য যাহাকে আপনি কলেজ হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই। আপনার ভৎ’সনায় আমার চৈতন্য হইয়াছিল। আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন, আমি এখন বিলাসিতা একেবারেই বর্জ্জন করিতে পারিয়াছি।" তিনি আগে সময়ে সময়ে চোগা-চাপকান পরিধান করিতেন। ধুতি

পরিহিত অশ্বিনীকুমার বরিশালের ১৯০৬ সালের বিখ্যাত কন্‌ফারেন্সের সময় ইমারসন্ কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আর কখনও চোগা-চাপকান পরিবেন না। ইহার পরে ছোট লাট বেলি ও তৎপরে লর্ড কার্ম্মাইকেল কর্তৃক দুইবার আহূত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে. তিনি ধুতি পরিয়া গেলে যদি তাঁহারা কিছু মনে না করেন তবেই তিনি তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে পারেন, নতুবা নহে। মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধুতি পরিয়া চটি পায়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের কার্য্য উপলক্ষে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া আসিলে অশ্বিনীকুমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি ধুতির মান রাখাতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে, আমি চোগা-চাপকান ছাড়াতে লোক বলে, পাগল—পাগলের খেয়াল। কিন্তু আপনি হাইকোর্টের জজ, আপনার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিবে না।"

অশ্বিনীকুমার তাঁহার ছাত্রদিগের সঙ্গে নিতান্ত সমবয়স্কের মতই মিশিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কাহারও কার্ড পাঠাইতে হইত না। তিনি তাঁহার বৈঠকখানাতেই সর্ব্বদা বসিয়া থাকিতেন। সে ঘরের সমস্ত দরজাগুলি খোলা থাকিত। ঐ স্থানে বসিয়াই তিনি পড়িতেন, ঐ স্থানে বসিয়াই তাঁহার রাজনীতিক পরামর্শ চলিত, ঐ ঘরেই তিনি মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার সহিত মেসমেরিজম করিতেন, আবার রাত্রি অধিক হইলে ঐ স্থানেই ভৃত্য তাঁহার জন্য সামান্য শয্যা রচনা করিয়া দিত। অন্তরঙ্গ ছাত্রগণ দিবারাত্রি ঐ স্থানে আড্ডা করিত। তিনি এক এক দল ছাত্র লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন; সমবয়স্কের মত তাহাদের সহিত তাহাদের ঘর-সংসারের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল সু ও কুঅভ্যাসের কথা আলোচনা করিতেন। ছাত্ররাও তাঁহার নিকট অন্তরের গোপনতম কথাটিও লুকাইয়া রাখিতে জানিত না। এমন বিষয় নাই, যাহা ছাত্রের কল্যাণের জন্য অশ্বিনীকুমার তাহার সহিত আলোচনা না করিতেন। একটি ঘটনার কথা বলি।

তখন স্বদেশী আন্দোলন প্রবল ভাবে চলিতেছে। ওদিকে আবার বরিশালে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। অশ্বিনীকুমারের সেই ঘরটিতে তখন সর্ব্বদাই ভিড় থাকে। রাত্রিতেও তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে ঘুমাইবার উপায় নাই। অনন্যোপায় হইয়া তিনি কলেজের অধ্যাপনা ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু ছাত্রদিগের সংস্রব ত্যাগ করেন নাই। একটি ছাত্র ১৬ বৎসর বয়সে পিতামাতার অনুজ্ঞায় একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কিশোরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। সে জানিত, অশ্বিনীকুমার বাল্য-বিবাহের বিরোধী। বাল্যকালে বিবাহে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন—"এ বিষয়ে জেদ করিলে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে সমর্থ হইব না।" তিনি বলিতেন, পুরুষের ২৫ বৎসর ও স্ত্রীলোকদিগের ২০ বৎসরের পূর্ব্বে সন্তান হওয়া উচিত নহে। অপরাধী ছাত্রটি বিবাহের পরে লজ্জায় প্রায় ৩ মাস কাল আর অশ্বিনীকুমারের আড্ডায় উপস্থিত হইল না। তাহার ভরসা ছিল, একে অশ্বিনীবাবু কাযে ব্যস্ত, তাহাতে সে দলের নিতান্ত জুনিয়র মেম্বর, কয় মাসই বা সেখানে যাতায়াত করিয়াছে, সুতরাং ধরা পড়িবার ভয় নাই। ৩ মাস পরে বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইতে হইল। সেখানে তখন অনেক লোকের ভীড়। অশ্বিনীকুমার তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,—"বিবাহ করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়িতেছি না।" তাহার পর তিনি হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আর কিছুকাল যাতায়াত করিলে অত তাড়াতাড়ি হাড়িকাঠে গলা দিতিস্ না, বাড়ী হইতে পলাইতিস্।" কিছুদিন পরে অশ্বিনীকুমার ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তোর ত পড়া শুনার বেশ ঝোঁক, তোর স্ত্রীর কেমন?" ছাত্র, "জানি না।" অশ্বিনীকুমার, "আচ্ছা, বুদ্ধিশুদ্ধি?" ছাত্র, "তাহাও পরীক্ষার সুযোগ পাই নাই।" অশ্বিনীকুমার, "এ কিন্তু ভাল নয়। তোর পড়াশুনার বিশেষ অসুবিধা হয়, না হয় রাত্রিটা তুই একলাই থাকলি। দিনের বেলায় কিন্তু কিছু সময় করিয়া তাকে তোর পড়াতে হবে। নইলে শেষকালে পস্তাবি, দুঃখ পাবি।" তিনি ছাত্রদের সুখদুঃখের কথা এতই ভাবিতেন। এই উপলক্ষে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তিনি স্ত্রীশিক্ষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনি তাঁহার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া লইয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার বাবুর পত্নীকেও তিনি বিবাহের পর অনেক বৎসর স্কুল কলেজে পড়িতে দিয়াছেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুশীলকুমারের পত্নী এখনও কলেজে পড়িতেছেন।

আমি যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি, তখন এক দিন বৈকালে অশ্বিনীকুমারের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিতে পাই, তিনি আমার একটি ছাত্রের বুকে ধীরে ধীরে টোকা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ফুরিয়েছে নাকি রে?" সে বলিল, "না।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন, "আছে? যখন ফুরিয়ে যাবে নিয়ে যাস।" পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, ছেলেটি বড়ই গরীব, দুই বেলা আহারের সংস্থান নাই। অশ্বিনীকুমার গোপনে তাহার প্রতিপালনের ভার লইয়াছিলেন। এমন কত দৃষ্টান্ত আছে।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীকুমার এক দল উপযুক্ত সহকর্ম্মী পাইয়াছিলেন। বিভিন্ন সময়ে চিরকুমার ভগবদ্‌ভক্ত জগদীশচন্দ্র, সেবাব্রত কালীশচন্দ্র, জ্ঞানযোগী রজনীকান্ত, কর্ম্মযোগী সতীশচন্দ্র ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করেন। ইঁহাদের সকলেরই বেতন অত্যন্ত অল্প ছিল। ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহের বেতন ছিল মাসিক ১ শত ৪০ টাকা; আর সকলের আরও কম। কিন্তু ইঁহারা কেহই ত অর্থের লোভে বরিশালে যায়েন নাই। ইঁহারা গিয়াছিলেন অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া। কলিকাতায় পেশাদারী কলেজ স্কুলের অভাব নাই। যে উদ্দেশ্যে দোকান খোলা হয় সেই উদ্দেশ্যেই এই সহরে স্কুল ও কলেজ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি খুলিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার কলেজ হইতে একটি কপর্দ্দকও কখনও গ্রহণ করেন নাই অথচ প্রায় ৩৫ হাজার টাকা কলেজের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি বরিশালের হিসাবে ধনী হইলেও কাঞ্চন-কৌলীন্যের পীঠস্থান কলিকাতার হিসাবে Upper middle classএও তাঁহার স্থান হইবে কি না সন্দেহ।

ধীরে ধীরে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আন্তরিক সেবাপরায়ণতা দেখিয়া এক জন বিখ্যাত বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন—"এই বরিশালেই যেন আমার মৃত্যু হয়।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময়ে ছাত্রদিগকে পাহারা দিতে হইত না। শিক্ষকরা তাহাদের সততার উপর নির্ভর করিতেন, ছাত্ররাও সে বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বিদ্যালয়ের প্রতিপত্তি দেখিয়া বাঙ্গালা সরকার উপযাচক হইয়া অর্থ-সাহায্য দিতে চাহিলেন; অশ্বিনীকুমার সরকারী সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তিনি জানিতেন, সরকারী সাহায্য গ্রহণের অর্থ কি। সার বীটসন বেল অশ্বিনীকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বরিশালে বেড়াইতে গেলেই ব্রজমোহন বিদ্যালয় দেখিতে যাইতেন। তিনি যখন সেটেলমেণ্ট বিভাগের বড় কর্ত্তা, তখন ঐ বিভাগের কার্য্যে বাছিয়া বাছিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেই নিযুক্ত করিতেন। তাহাদের কর্ত্তব্যপরায়ণতার, তাহাদের কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিয়া অশ্বিনীকুমারকে তিনি অসংখ্য পত্র লিখিয়াছিলেন। ব্রজমোহনের বহু ছাত্র আবার অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিল। বাঙ্গালায় যখন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন লাহোর হইতে গৌহাটী পর্য্যন্ত এমন কলেজ ছিল না যেখানকার অধ্যাপকদিগের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র একটিও নাই; সমগ্র বাঙ্গালাদেশে এমন একটি বিদ্যালয়ও ছিল না যেখানে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকতা করে নাই। ইহারই ফলে শিষ্যদিগের দ্বারা অশ্বিনীকুমারের প্রভাব, অশ্বিনীকুমারের আদর্শ সমগ্র বাঙ্গালাদেশে তথা সমগ্র উত্তরভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজনীতিক আন্দোলনে তিনি ইতঃপূর্ব্বেই যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশীর পূর্ব্বে সকলেই তাহাকে একজন ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্য-পরায়ণ আদর্শ শিক্ষক বলিয়াই জানিত। এই আদর্শ শিক্ষকটি যে বরিশালের নিরক্ষর নর নারীরও হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা, তাহা বরিশালের বাহিরের লোকরা তখনও ভাল করিয়া জানিতে পারে নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হঠাৎ এক দিন সরকারের চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন, বরিশালে এমন একটা লোক আছে, রাস্তার মজুর হইতে প্রাসাদবাসী লক্ষপতিও যাহার হুকুম তামিল করিতে ব্যগ্র, ঢাকার নবাব বাহাদুরের আদেশেও বরিশালের মুসলমান কৃষকেরা যাহার আদেশের অন্যথা করিতে নিতান্তই নারাজ।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

প্রাচীন গাথা

প্রবীন সাহিত্যিক রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট, মহাশয় অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জিলা হইতে সংপ্রতি কতকগুলি পল্লীগাথা সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সেইগুলি শীঘ্রই এক বিরাট পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলে এই গাথাগুলির গুরুত্ব নিতান্ত সামান্য নহে। ময়নামতীর গান, ডাকের বচন, গোরক্ষ-বিজয়, সূর্য্যপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন যুগের যে সকল সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির ভাষা গ্রাম্য, অমার্জ্জিত ও ছন্দোবন্ধে শ্রীহীন এবং তাহাদের মধ্যে যে কবিত্বরস আছে, তাহা খেজুররসের ন্যায় অনেকটা গবেষণার শাণিত অস্ত্রে কাটিয়া বাহির করিতে হয়।

ময়মনসিংহের এই গাথাগুলি তত প্রাচীন নহে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এইগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সময় বঙ্গ-সাহিত্যে সংস্কৃত প্রভাবের যুগ। কিন্তু এই সকল গাথায় সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ নাই। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ কোন সময়ই সেন রাজাদিগের আধিপত্য স্বীকার করে নাই। মুসলমানবিজয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ প্রথমতঃ কামরূপের রাজাদিগের অধীন ছিল; তাহার পর ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোচ, হাজাং, কিরাত প্রভৃতি বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। এই প্রদেশাংশে কোন কালেই ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিশেষভাবে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুতরাং এই গাথাগুলি যদিও ব্রাহ্মণ্য যুগের সময় লিখিত হইয়াছিল, তথাপি ইহাদের আদর্শ প্রাচীনতম হিন্দুসমাজের। সেই সমাজে গৌরীদান প্রথা ছিল না। স্ত্রীলোকরা যৌবনে পদার্পণ করিয়া স্বয়ং বর মনোনয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তখন অস্পৃশ্যতা প্রবল ছিল না। কবিকঙ্কণের গাথায় দেখা যায়, একটি ব্রাহ্মণ বালক এক বৎসর বয়স হইতে ৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত চাঁড়ালের গৃহে চাঁড়ালের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে। গর্গপ্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে জাতিতে তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের এই প্রকার আরও অনেক আখ্যায়িকা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এই সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পাড়াগাঁয়ের পথে, ঘাটে, মাঠে, অঙ্গনে, আঙ্গিনায় যে সকল ফুল লতাপাতা দেখা যায়, গ্রাম্য কবিরা তাহাই চয়ন করিয়া উপমা দিয়াছেন, "খগরাজ জিনি নাসা" "জিনি কুঞ্জরের গতি" প্রভৃতির পার্শ্বে সেই পাড়াগাঁয়ের প্রকৃতিসম্পদের উপমা কি সুন্দর! এক কবি লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাজকন্যার চোখ দুইটি দেখিয়াছেন, তিনি আর নদীর কাল জল ও আকাশের নীলাকার রং দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন না। আর এক জন কবি অপরাজিতাফুলের

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সহিত চোখের ও মহুয়াফুলের সহিত মুখের উপমা দিয়াছেন। কবি রঘুসুত লিখিয়াছেন, কোথাকার একটা পাখী মাথার উপর বজ্রকে ভয় না করিয়া শ্রাবণের বৃষ্টিতে ভিজিয়া পথে পথে তাহার প্রণয়িনীর মান ভাঙ্গিবার জন্য কান্দিয়া কান্দিয়া "বউ কথা কও" "বউ কথা কও" বলিয়া ফিরিতেছে। মোট কথা, এই সকল কবি প্রাণের কথায় এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন, পড়িতে পড়িতে শ্রাবণের মেঘের ন্যায় পাঠকের চক্ষু মুহুর্মুহু জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। লর্ড রোণাল্ডসে "মহুয়া" ছড়ার ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া ভূমিকায় তাহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। শিল্প সমালোচক ষ্টে ক্রামরকিস মহুয়া ছড়া পড়িয়া লিখিয়াছেন, সমস্ত ভারতীয় সাহিত্যে এমন একটি মনোজ্ঞ কবিতা আমি আর পড়ি নাই। "দাওয়ানা মদিরা" নামক পালাটি পড়িয়া শ্রীমতী আর কোয়াহট ইহাকে Shakespearian বা সেক্সপিয়ারের ভাবসম্পন্ন কবিতা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যে দুই একটি কবিতা দীনেশ বাবু বিলাতে পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া গ্রিয়ার্শন প্রমুখ বড় বড় মনীষীরা এই পালা সংগ্রহ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া পত্রাদি লিখিয়াছেন।

মোট কথা, এখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত প্রভাব আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা কথায় কথায় সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া থাকি, অবশ্য কেবল ১২।১৪ বৎসর হইতে বেহুলাকেও আমরা তদ্রূপ একটু স্থান ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এবার মহুয়া, কমলা, মদিনা, সখিনা প্রভৃতি রমণীচরিত্রগুলি বঙ্গীয় সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থানের দাবী করিবে। ইহারা আমাদের ঘরের লোক। এবার ঘাগরা-পরা জগদ্‌বরেণ্যা রমণীগণের পার্শ্বে সাড়ীপরা বাঙ্গালিনীরা আসিয়া দাঁড়াইবেন। আমাদের মনে হয়, আমাদের ঘরের অন্নপূর্ণারাই এখন হইতে আমাদিগের চক্ষুতে বেশী ভাল বোধ হইবেন।

এই গাথাগুলির সম্বন্ধে আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, ইহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর কবির রচনা। আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা অনেক সময় আমাদিগকে পল্লবগ্রাহী করিয়া তুলে। আমরা নিজেদের মর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়া কিছু লিখিবার সময় পুস্তকের গদ আওড়াইতে থাকি। প্রাচীন বঙ্গের উপাখ্যানগুলির অধিকাংশ এই দোষে দুষ্ট। বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী লিখিতে যাইয়া বিদ্যার রূপবর্ণনা করিতে করিতে আমরা গল্পের সূত্র ভুলিয়া যাই এবং গল্পগুলি দ্রৌপদীর সাড়ীর মত টানিতে টানিতে এত বাড়িয়া যায় যে, তাহাদের যে শেষ হইবে, এরূপ ভরসা হয় না। কিন্তু এই গাথাগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, নিরক্ষর কবিরা আদৌ বাজে কথা বলেন নাই। তাঁহাদিগের ভাষা ও ভাব কিছুমাত্র পল্লবিত হইয়া উঠে নাই। তাঁহারা যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা একেবারে অনাড়ম্বরে মর্ম্মে গিয়া হৃদয়ের সপ্ততন্ত্রীতে আঘাত করে। এই জন্যই কাব্যগুলির আগাগোড়া কৌতূহলের রস প্রবাহিত হইতে

গাথা চিত্র।

থাকে এবং একটা নির্ম্মল অনাবিল সরলতায় প্রাণ ভরিয়া উঠে।

ইংরাজী অনুবাদ এবং এক শত পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকাসহ এই পুস্তকের ইংরাজী ভাগ ৪ শত ৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে ১১ খানি ছবি ও পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের এক খানি মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই মানচিত্রে কাব্যগুলির বর্ণিত ঘটনাস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া যে সকল গায়ক এখনও এই গানগুলি গাহিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের নিবাসস্থান ও যে সকল স্থান হইতে এইগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাও এই মানচিত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দীনেশ বাবুকে এই মানচিত্র অঙ্কন করিতে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে; সার্ভে আফিসের ১৯।২০ খানা মানচিত্র দেখিয়া এবং পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে নানা প্রকার অনুসন্ধান করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। পুস্তকের আকার রয়াল ৮ পেজী ফরমা, বাঙ্গালা অংশের ছাপাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহাতে পালাগুলি, মূল, টীকা ও তৎসম্বন্ধে ভূমিকা, সূচী প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাও ৪ শত ৫০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। এই ৯ শত পৃষ্ঠাব্যাপী বৃহৎ পুস্তকে মোট নিম্নলিখিত ১০টি পালা দেওয়া হইয়াছে। (১) মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) চন্দ্রাবতী, (৪) কমলা, (৫) রূপবতী, (৬) কেনারাম (৭) দেওয়ান ভাবনা (৮) কাজল রেখা (৯) দেওনা মদিনা ও (১০) কঙ্ক ও লীলা।

আমরা আশা করি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পুস্তকখানির মূল্য এইরূপ করিবেন না—যাহাতে ইহা সাধারণ পাঠকের অনধিগম্য হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সার আশুতোষের বিশেষ উৎসাহ না পাইলে এই মহামূল্য গাথা সংগৃহীত হইত না। কেন্দুয়া পোষ্ট আফিসের অধীন আইচর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় দীনেশ বাবুর প্রেরণায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই গাথাগুলির উদ্ধার করিয়াছেন। দীনেশ বাবু রোগশয্যায় পড়িয়াও এই সংগ্রহের জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই গাথাগুলি ব্যতীত আরও প্রায় ১২।১৪টি পালা দীনেশ বাবুর নিকট প্রস্তুত আছে; কিন্তু ছাপাইবার টাকা কোথায়? বিলাত হইতে মিষ্টার গ্রিয়ার্শন দীনেশ বাবুকে লিখিয়াছেন, এই গাথাগুলি এত উৎকৃষ্ট যে, সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে এই প্রকার জিনিষ সংগ্রহের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। দীনেশ বাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, আরও অনেক স্থানে এইরূপ গাথা প্রচলিত আছে, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু সংগ্রহ ও মুদ্রণের টাকা পাইবেন কোথায়? এ জন্য কি বাঙ্গালীকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হইবে?

কার্ত্তিকেয়ের প্রতি

জননী তোমার সিংহবাহিনী,
জনক তোমার রুদ্র,
তুমি নিজে বীর দেব-সেনাপতি —
নহ সামান্য ক্ষুদ্র।

দুর্জ্জয়, বর-দৃপ্ত তারক-
অসুর-পীড়িত স্বর্গ
উদ্ধার হেতু উদ্ভব তব—
মথিতে অরাতিবর্গ।

তুমি তেজোময় অগ্নি-প্রতিম,
অগ্নিভূ তুমি, চণ্ড—
পার এ বিশ্ব করিতে ভস্ম
নিমিষে—লণ্ডভণ্ড।

আজি এ কি বেশ দানব-বিজয়ী?
ভুলেছ কি বীরধর্ম্ম?
কোথা আজি তব দিব্য আয়ুধ?
কোথা সে চর্ম্ম বর্ম্ম?

না, না, দেব, বুঝি কাল-মাহাত্ম্যে
কালী আজ কালা সেজেছে—
রিপু উচ্ছেদ ভুলে গেছে আজ—
বিচ্ছেদ-বাঁশী বেজেছে।

পার না কি দেব জাগিতে আবার?
জাগাতে এ সব বাঙ্গালী?
শিখাতে আবার,—তা'রা চিরদিন
ছিল নাক' ভীরু কাঙ্গালী?

তাদের হৃদয়ে আর্য্য-রুধির
বহিছে পরতে পরতে—
তা'রা এক দিন মাথা উঁচু করি
দাঁড়ায়েছিল এ মরতে।

তুমিও আবার—অসুর-দলন
নিশিত অস্ত্রে সাজিয়া
এস এস বীর—দিশি দিশি—শুভ-
শঙ্খ উঠুক্ বাজিয়া।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কৈলাস-যাত্রা

ঊনবিংশ অধ্যায়

আসকোটে দুই রাত্রি অবস্থান করাতে শারীরিক ক্লান্তিও অনেকটা দূর হইয়াছিল। কুমার সাহেবের যত্নে টনকপুর পর্য্যন্ত কুলী যাইবে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। রাস্তায় কুলী বদলান বড়ই বিরক্তিকর ব্যাপার; সুতরাং এখন নিরুদ্বেগে গমন করিব ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রাতঃকালে কুলী উপস্থিত হইল; কিন্তু বৃষ্টির জন্য গমনে একটু বিলম্ব হইল। যখন দেখিলাম, বৃষ্টির বিরামের কোন সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা আর বিলম্ব না করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করা গেল।

কিয়ৎক্ষণ গমনের পর মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তাহার সহিত বায়ুর বেগ থাকায় সোনায় সোহাগা সংযোগের ন্যায় হইয়াছিল। দীর্ঘ যষ্টির সহায়তায় পিচ্ছিল পন্থা হইতে দেহযষ্টির পতনভয় বিদূরিত হইয়াছিল। আলমোড়া হইতে যে রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম, সে রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পাহাড় ঘুরিয়া অপর দিকে গমন করিলাম। রাস্তার মোড় হইতে দূরে আসকোট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল—যে গৃহে আরামে অবস্থান করিয়াছিলাম, সেই বিন্দুসম গৃহকে সোৎসুক নয়নে শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। পর্ব্বতের অপর পারে উপস্থিত হইলাম। এ দিকে বৃষ্টির নামগন্ধও নাই, সুতরাং কুলীগণসহ নিরুদ্বেগে গমন করিতে লাগিলাম। ১২।১৩ মাইল পথ অতিক্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে কাঙ্গালীছিমা নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হওয়া গেল উচ্চ হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা নিম্ন হিমালয়ে আগমন করিয়াছি; রাস্তা অনেকটা সুগম আর পথিকও অবিরল নহে। কৃষিকার্য্যও বেশ হইতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে সিক্তবস্ত্রে একখানি দোকানঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। আসকোটে সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলাম, এ কথা দোকানী, কুলীর মুখে অবগত হইয়া যথেষ্ট যত্নের সহিত থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কিছু তরি তরকারীও সংগ্রহ করিয়া দিল।

এই ক্ষুদ্র শান্তিপ্রদ গ্রামে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যূষে পিথোরাগড় অভিমুখে গমন করা গেল।

গমনকালে ফলের বাগান, শস্যশ্যামল ক্ষেত্র, জনপূর্ণ গ্রাম সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল। এই উর্ব্বর প্রদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। উদ্বৃত্ত শস্য ভুটিয়ারা ক্রয় করিয়া নিজেদের দেশে লইয়া যায়। চড়াই উৎরাই বড় বেশী না থাকাতে ও এ অঞ্চলের দৃশ্য নয়নরঞ্জন হওয়াতে পথের ক্লেশ বেশী অনুভূত হয় নাই। মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই পিথোরাগড়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

পিথোরাগড়ে বেশ ভাল স্থানেই ছিলাম। কুলীরা এ বিষয়ে আসকোটে উপদিষ্ট হইয়াছিল। এ জন্য থাকিবার কথা আমাকে কিছুই ভাবিতে হয় নাই। এ স্থানে ডাক-টেলিগ্রাফ আফিস, হাঁসপাতাল, মিশনারীদের প্রচার-কেন্দ্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতার সকল অঙ্গই আছে। এক সময় এ স্থান ইংরাজ সরকারের সেনানিবাস ছিল; তাহাদের পরিত্যক্ত গৃহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আদালত ও স্কুল থাকায় স্থানের মহিমা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পিথোরাগড়ে আসিয়া বোধ হইল, যেন ইংরাজশাসিত ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছি। অনেক দিনের পরে রজককে বস্ত্র প্রক্ষালন করিতে দেখিলাম। বাজারে লোক সকল ক্রয়-বিক্রয়-নিরত, আর স্থানে স্থানে সংবাদ-পত্র পাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিলাম। অনেক দিন এ চিত্র না দেখিতে পাইয়া ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এ স্থানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে টেলিগ্রাফ আফিসে যাইয়া ঘড়ীটি মিলাইয়া লইলাম—ঘড়ী বিশ্বস্তভাবে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিল, বড় বেশী তফাৎ হয় নাই দেখিয়া প্রীত হইলাম।

বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্নানের জন্য একটু দূরে যাইতে হইয়াছিল—এ স্থানে জলের কষ্ট আছে বলিয়া বোধ হইল। মৃত্তিকা হইতে স্থানে স্থানে জল উদ্গত হইতেছে, তাহাকে চৌবাচ্চা করিয়া উপরে আচ্ছাদন ও চতুর্দ্দিক গাঁথিয়া বেশ সুরক্ষিত করা হইয়াছে। আমাদের অবগাহন করিয়া স্নান করা অভ্যাস; সুতরাং ঘটী করিয়া স্নানে তত সুবিধা হইল না।

ভোজনাদির পর পিথোরাগড় একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চ। এ স্থান কালীর ঝোলাঘাট হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত গুর্খা সৈন্য এ স্থানে বাস করিয়া থাকে। আজকাল এ স্থানের জলবায়ু মন্দ নহে, এ জন্য কয়জন পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত গোরা অবস্থান করিয়া থাকেন। অল্প আয়ে সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত থাকিবার অনুকূল যে কোন স্থান হউক না কেন, ইঁহারা তথায় থাকিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। রাস্তায় দুই এক জন গোরার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আলাপে ও মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহারা স্বাস্থ্য ও শান্তি উভয়ই ভোগ করিতেছেন।

এই স্থানে মিশনারী মহাশয়দের কর্ম্মকেন্দ্রকে জমকাল দেখিলাম। সুদূর আমেরিকা হইতে ইঁহারা এই স্থানে আসিয়া কার্য্যক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন। শিক্ষা প্রদান ও চিকিৎসাকার্য্য মনুষ্যহৃদয় জয় করিবার অমোঘ পন্থা— এই দুই পথ অবলম্বন করিয়া ইঁহারা আমাদের দেশবাসীর হৃদয় অধিকারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কুষ্ঠাশ্রম-চিকিৎসালয় আর বিদ্যালয় ইঁহাদের উদ্যমের ফল। এই তিন পবিত্র স্থানে আমাদের দেশবাসী যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক জন কর্ম্মী খৃষ্টপ্রচারক কহিয়াছিলেন, বালকের প্রথম কতিপয় বৎসর যদি আমার আয়ত্তের ভিতর হয়, তাহা হইলে তাহাকে চিরকালের জন্য আমার প্রভাব বহন করিতে হইবে। কথা খুব ঠিক। আমরা যখন আমাদের নিজের দিকে দেখি, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হই। অতি পুরাকালে আমাদের যাযাবর পূর্ব্বপুরুষরা দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়া আরোগ্যশালা আর শিক্ষা-মন্দির স্থাপন করিয়া আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার করিয়া-ছিলেন। কাম্বোজের শিলালেখ এখনও এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শত-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উদ্যমের অবতার আমাদের কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রের প্রবর পুরুষরা আমাদের ভারতীয় সভ্যতা প্রচার করিয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ করিলে হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকদের সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়াও অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। আমরা যদি আমাদের সম-ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতি মমতা অবলম্বন না করি, তাহা হইলে দলে দলে আমাদের অবনত শ্রেণীর হিন্দু অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের কাছে সম্মান আদায় করিবে, এখনও তাহারা তাহা করিতেছে।

আসকোটের কুমার সাহেব এ স্থানের স্কুলের এক জন শিক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কহিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় এ প্রদেশের ইতিহাসের উপাদান শিলালেখাদি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি উৎসুক হইয়াছিলাম—তিনি সে সময় পিথোরা-গড়ে না থাকায় তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হয় নাই।

পিথোরাগড় ভ্রমণকালে আমার সেই দেশের সঙ্গী বলিলেন, "শাস্ত্রী মহাশয়, ঐ যে পাহাড় দেখিতেছেন, এক জন ইংরাজ সেনানীর কার্য্যের সহিত ইহার একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস জড়িত আছে। ঐ পাহাড়ের নাম 'ড্রিল পাহাড়।' যে সময় এখানে কেণ্টনমেণ্ট ছিল, সেই সময় কোন সৈনিকপুরুষকে দণ্ড দিতে হইলে সেনানী মহাশয় তাহাকে দ্রুতবেগে ঐ পাহাড়ে উঠিবার আদেশ প্রদান করিতেন—সেনাপতি বাংলার বারান্দা হইতে দূর-বীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করি-তেন!" ইহার দেশী নাম কোলেশ্বর, শ্বেতাঙ্গমহলে ইহা ড্রিল পাহাড় নামে পরিচিত। আমার যুবক বন্ধু ইহা দেখা-ইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনাদের দেশে কি এরূপ কিছু আছে?" প্রশ্নে আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিয়াছিলাম, "এ ত সামান্য কথা, আমাদের কলিকাতার যিনি স্থাপয়িতা, তাঁ'র নাম ছিল যব চার্ণক, তিনি যখন খাইতে বসিতেন, তখন আমাদের দেশী লোককে প্রহার করা হইত, সেই প্রহৃত ব্যক্তির ক্রন্দনরোলের মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে তিনি ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন।" আমার নবীন যুবক বন্ধু মনে করিয়াছিলেন, আমি পরাজিত হইব; কিন্তু আমার উত্তর শুনিয়া তিনি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "এই জন্য বুঝি কলিকাতার ধনবানরা নির্ম্মম?" এইরূপ রহস্যা-লাপ করিয়া আমরা ডেরায় উপস্থিত হইলাম।

আবার অতি প্রত্যুষে চলিতে আরম্ভ করা গেল। আজ প্রায় ১৬।১৭ মাইল হাঁটিয়া গুরণা হইয়া টিরাজে রাত্রিবাস করা গিয়াছিল। আসিবার সময় এক স্থানের দৃশ্য একটু অদ্ভুত গোছের ছিল, পাহাড় যেন একটা অতি উচ্চ

প্রাচীরের মস্তক ; তাহার উপর দিয়া রাস্তা, নিম্নের সমতল ভূমি, বৃক্ষমণ্ডিত গ্রাম, আর শস্য-শ্যামল নয়ন-রঞ্জন ক্ষেত্র সকল অতি মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

চিরা হইতে লোহাঘাট ৯।১০ মাইল হইবে। মনে করিয়াছিলাম, লোহাঘাটে অবস্থান না করিয়া বরাবর মায়ফট্ বা মায়াবতীতে গমন করিব। দুই কারণে তাহা হয় নাই। বৃষ্টিতে সব ভিজিয়া যাওয়াতে আর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, এক জন বাঙ্গালী সাধু এ স্থানে অবস্থান করিয়া একটি পাঠশালা খুলিয়াছেন; কয়জন শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া তিনি অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।

এক সময় এ স্থান বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল, আসিবার সময় তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলাম। এ স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে একটু অদ্ভুত কথা মিশ্রিত আছে। চন্দ রাজাদের সময় কতকগুলি ব্রাহ্মণ কোন অপরাধে দণ্ডিত হইয়া এই স্থানে শৃঙ্খলিত হইয়া কারারুদ্ধ হয়েন। এক সময় নিকটবর্ত্তী নদীতে তাঁহারা স্নান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন। কোন অলৌকিক শক্তিতে তাঁহাদের সেই লৌহশৃঙ্খল গলিয়া যায় আর সেই সুযোগে ব্রাহ্মণরা পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। সেই সময় হইতে নদী লোহাবাতী আর গ্রাম লোহাঘাট নামে পরিচিত হইয়াছে।

আমাদের কুলী প্রথমে আমাকে স্কুলে লইয়া যায়। কিন্তু তথায় কেহ না থাকায় যে স্থানে বাঙ্গালী সাধু অবস্থান করেন, তথায় লইয়া গেল। সাধু মহাশয় কৈলাস-প্রত্যাগত শুনিয়া আর ভিজিয়া ভিজিয়া ক্লান্ত হইয়াছি দেখিয়া আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এরূপ স্থানে অকস্মাৎ স্বদেশীর সমাগমে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন আর আমরা যেন বহু শত বৎসর পর দেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গালা কথা শুনিয়া কৃতকৃতার্থ হই। সিক্তবস্ত্র শুষ্ক করিবার জন্য মেলাইয়া দিলাম, শয়নের জন্য স্থান অধিকার করিলাম; কিন্তু সন্ন্যাসীর অসংস্কৃত আশ্রমে, স্থানে স্থানে জল পড়াতে আমাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়াছিল। অনতিকালমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হওয়াতে আমরাও নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম।

সন্ন্যাসী মহাশয় রামকৃষ্ণ মিশনের এক জন কর্ম্মী পুরুষ; এই স্থানে বিদ্যালয় খুলিয়া জনগণমধ্যে বিদ্যাপ্রচার আর শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় লোকরা ইঁহাদের উপর বেশ ভক্তিসম্পন্ন দেখিলাম। আমাদের সায়ংগৃহের নিম্নে কয়টি মন্দির রহিয়াছে। দেখিলাম, সন্ধ্যাকালে স্থানীয় দর্শকরা আগমন করিয়া এ স্থানের জনতা বৃদ্ধি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে স্থানটি বেশ নির্জ্জন হইল। ভোজনান্তে সন্ন্যাসী মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া সুখশয্যায় শয়ন করিলাম।

মায়াবতী বাঙ্গালীর গৌরবের ক্ষেত্র; আর স্বামী বিবেকানন্দজীর কীর্ত্তি। ইহার এত নিকটে আসিয়া দেখিয়া না যাওয়া কোনরূপে উচিত নহে। ইহা দেখিতে গেলে কয় মাইল ঘুরিয়া যাইতে হইবে; আর এক দিন সময় বেশী যাইবে। বহু পথ, আর বহু দিন ত অতিক্রমণ করিয়াছি; এই অল্প পথ আর অল্প সময় কাটাইতে দ্বিধা বোধ করিলাম না।

প্রাতঃকালে সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদের কুলীকে মায়াবতীর রাস্তার বিষয় বলিয়া আর এক জন লোককে সেই রাস্তাটা দেখাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইয়া মায়াবতী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম—নিযুক্ত লোক নদী পার হইয়া রাস্তা দেখাইয়া বিদায় লইল। আমরা ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রায় ৯।১০টার সময় মায়াবতীতে উপস্থিত হইলাম। মায়ফট্ বা মায়পট্ এ স্থানের প্রাচীন নাম, মায়াবতী ইহার সুসংস্কৃত সংস্কৃত নাম। এই বহুবিস্তৃত সম্পত্তি পূর্ব্বে এক জন ইংরাজের ছিল—তিনি এই নির্জ্জন স্থানে আপেল প্রভৃতি ফলের বাগান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীদের হাতে আসিয়া ইহা তপোবনে পরিণত হইয়াছে। লোকালয় হইতে দূরে, আর বনের মধ্যে হওয়াতে কোলাহলক্লিষ্ট লোকের পক্ষে স্থানটি বেশ আরামপ্রদ, আর সাধনভজনের পক্ষেও অনুকূল হইয়াছে।

কুলীসহ আমি অসংস্কৃত-দেহ—দীর্ঘ যষ্টিধারী—আজানুলম্বিত আবরণে আচ্ছাদিত, বৃহৎ-উষ্ণীষধারী আমি কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। নামধাম, কোথা হইতে আগমন করিতেছি—কি উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি, সঙ্গে কাহারও অনুরোধপত্র আছে কি না, ইত্যাদি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এক জন তাপস আসিয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমার পরিচ্ছদে বা রূপে কোনরূপ বন্যীয় ভাব প্রকাশ পায় নাই, প্রান্তিকভাববহির্ভূত

সর্ব্বজনে সমদৃষ্টিসম্পন্ন তাপসদের কাছে সাদর সম্ভাষণ পাইব, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।

হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাব আনয়নের পক্ষে স্থানের প্রভাবও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আগে বঙ্গবাসীর পবিত্র গৃহ অতিথি-অভ্যাগতে আত্মীয় স্বজনের কলরবে মুখর হইত, এখন সে গৃহ শ্মশান-তুল্য হইয়াছে; না আছে দুগ্ধ-দধি, না আছে দধি-মন্থন শব্দ, না আছে গর্ভধারিণী জননীর পূজা। আছে অপরিষ্কার-অবিচ্ছন্নতা, কলহ-বিবাদ, অভাব-অভিযোগ, রোগ-শোক, আর হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা। এ অবস্থায় হৃদয় কিরূপে বিশালতাকে প্রাপ্ত হইবে? এক সাধুর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে। তিনি আমাদের বাড়ীতে ভোজন করিতেন আর গঙ্গাতীরে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। এইরূপে তাঁহার বহু মাস অতীত হয়। গমনকালে তিনি একটি পুঁটলী আনিয়া সাক্ষাৎদেবতা মাতৃদেবীর নিকট রাখিয়া দেন—প্রত্যাগমনকালে গ্রহণ করিবেন কহিয়া চলিয়া যায়েন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, সাধুর দেখা নাই। অনেকে মনে করিলেন, সাধু দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ৬ বৎসর পরে সাধু আগমন করিলেন, আমার মা তাঁহার পুঁটলী তাঁহাকে ফিরাইয়া দিলেন—যেরূপ ভাবে বাঁধা ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাবেই তাহা ছিল। তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় নাই। তাহার ভিতর সাধুর কতকগুলি মোহর ছিল; কোন ভক্ত খরচ করিবার জন্ম দিয়াছিলেন। সাধু আমার মাতৃদেবীর ব্যবহারে প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ কিছু দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। যাক সে সব কথা। এখন আমরা সামান্য বিষয়ের জন্ম কেন কুপথগামী হইতেছি? সে দৃঢ়তা নাই কেন? গৃহ পবিত্র হইলে পবিত্র ভাব আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমাদের এখন অশন, বসন প্রভৃতি সকল বিষয়েই অপবিত্রতা আসিয়াছে। তাহার ফলে আমরা অপবিত্র হইয়াছি, প্রপীড়িত হইতেছি, লাঞ্ছিত হইতেছি।

সন্ন্যাসী মহাশয়দের সহিত পরিচিত হইলাম, আমার 'শিবাজী' 'জালিয়াৎ ক্লাইব' প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত তাঁহাদের কেহ কেহ পরিচিত আছেন, অবগত হইলাম। আমার জন্মভূমি দক্ষিণেশ্বরে, আর আমি বাল্যকালে পরমহংসদেবের হস্ত হইতে মাখন মিশ্রী প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, শুনিয়া তাঁহারা আমাকে একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন।

আমার অবস্থান জন্ম তাঁহারা একটি দ্বিতল কক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কুলীরাও তাঁহাদের অতিথিসেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। একটু রাস্তা ঘুরিয়া আসায় তাহাদের মধ্যে যে অসন্তোষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। তাহারাও সানন্দে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিল। স্নানাদি নিত্যক্রিয়ার পর রসনাসুখকর নানাপ্রকার ব্যঞ্জনে তৃপ্তির সহিত ভোজন করা গিয়াছিল। সন্ন্যাসীর আশ্রমে—তপোবনে "নানা প্রকার ব্যঞ্জনের" নামে যেন কেহ শিহরিয়া না উঠেন, আমার কাছে সে সময় বেগুনভাজা আর পাঁপর বিলাসের সামগ্রী হইয়াছিল। গৃহপরিত্যাগের পর এরূপ ভোগের বিষয় এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সুস্বাদু বার্ত্তাকু ইঁহাদের তপোবনজাত। "পাপর কি এ স্থানের?" জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইয়াছিলাম, মহীশূর ব্যাঙ্গালোর হইতে কোন ভক্ত ইহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ কথা শুনিয়া তখন কহিয়াছিলাম, "আপনাদের ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে গমন করিয়া ইহা ভোজন করিব।" প্রভু আমার শুভাশুভ কোন কামনা অপূর্ণ রাখেন নাই; এ কামনাও পরে পূর্ণ করিয়াছিলেন। গত বৎসর মোপলা বিদ্রোহে হিন্দুরা কিরূপ ভাবে পীড়িত হইয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্ম মালাবার প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম। প্রত্যাগমনকালে কিছু সময়ের জন্ম ব্যাঙ্গালোরে অবস্থান করিয়াছিলাম। সে স্থানেও অকস্মাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের সুন্দর আশ্রমে গমন করিয়াছিলাম। মায়াবতীর পরিচিত এক সাধু সে সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন—তিনি আমাকে কৃপা করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন আর সাধু মহাশয়দের সাধু ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার পরিচিত সাধু মহাশয় বলেন, "আপনার বিষয় আমার আর কিছু মনে নাই; কিন্তু যখন জলবৃষ্টির বাধা না মানিয়া বেদান্তবাক্য পাঠ করিতে করিতে বীরদর্পে যাত্রা করেন, সে দৃশ্য আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে।" যাউক এ সকল অবান্তর কথা।

ভোজনের পর একটু বিশ্রাম করিয়া লইলাম। অনন্তর আশ্রমের পুস্তকালয়—কার্য্যালয় প্রভৃতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। সন্ন্যাসীরা এ প্রদেশের লোককে নানাপ্রকার

কার্য্য শিখাইয়া বেশ কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। অপরাহ্নকালে তপোবন পরিদর্শন করিলাম। যে গৃহে বিশিষ্ট অতিথি আসিয়া অবস্থান করেন, তাহাও দেখিলাম। এক সময় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই স্থানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যে রাস্তায় ভ্রমণ করিতেন, আশ্রমবাসীরা তাহার 'জগদীশমার্গ' নামকরণ করিয়াছেন।

আশ্রম, বনের মধ্যে অবস্থিত। এ স্থানে হিংস্র পশুর উৎপাত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু জোঁকের অত্যন্ত উপদ্রব—বৃষ্টির সহিত রক্তবীজের মত শত শত, সহস্র সহস্র জলৌকা গলিত পত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জোঁকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত সাধুরা পায়ে 'তেল-মুণ' মাখিতে উপদেশ দেন, আর খানিকটা মুণ সঙ্গে দেন। গমনকালে জোঁক বড় প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, ছুই চার পা গিয়া দেখি, ২।৪টা জোঁক আক্রমণ করিয়াছে, তাহাদের মুখে মুণ দিয়া ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল।

তাপসদিগের নিকট বিদায় লইয়া অনেক দূর গমন

চম্পাবত।

রাত্রিকালে হরিণের উৎপাত আছে, তাহা তাহাদের চীৎকারে অবগত হইয়াছিলাম। তাহাদের স্বরে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; আর তাহাদের স্বর শুনিতে শুনিতে নিদ্রিতও হইয়াছিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে যেন রজনীর অবসান হইল—আমার প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া গমনের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। আশ্রমবাসীরা ছুই এক দিন থাকিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের সাধু-সুলভ সুজনতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলাম, "ক্লান্তি মোটেই হয় নাই।" বলিয়া নম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

একটা কথা কহিতে ভুলিয়া গিয়াছি। এ রাস্তায় করিয়া তাঁহাদের তপোবনের সীমা অতিক্রম করিলাম। এখন আমরা অপেক্ষাকৃত জনপূর্ণ রাস্তায় উপস্থিত হইয়া চম্পাবত অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তায় স্থানে স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ প্রস্তর সকল দেখিতে পাইয়াছিলাম, এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রায় ১০।১১টার সময় চম্পাবত বাজারে উপস্থিত হইলাম।

চম্পাবত এক সময় সোমবংশীয় বঙ্গ-রাজাদের রাজধানী ছিল। কালীর তট হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ভূভাগ তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমানে কালী কামায়ুন পরগণা ইহার তসিল বা মহকুমা। কালী নদীর তটে

অবস্থিত বলিয়া ইহা কালী কামায়ুন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কামায়ুন শব্দ কূর্ম্মাচল শব্দের অপভ্রংশ। ভগবান্ বিষ্ণু এ স্থানে কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কোন অতীত যুগে যখন এ প্রদেশের অধিকাংশ স্থল সাগরগর্ভে নিমগ্ন ছিল, সেই সময় এই স্থানে কূর্ম্মাবতার হইয়াছিল। বাজারের নিকট কয়টি সুন্দর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি ইহার অতীত কালের সমৃদ্ধির কথা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সমুদ্র হইতে সাড়ে ৫ হাজার ফুট উচ্চ হইলেও স্থানটি স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। এই জন্য এ স্থান হইতে ক্যাণ্টনমেণ্ট বা গোরাবারিক লোহাঘাটে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। তখন নেপাল হইতে আক্রমণ-ভয় ছিল। অনেক দিন সে ভয় তিরোভূত হইয়াছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেনানিবাসও উঠিয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে লাল লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র টনকপুরে ঐ সকল দ্রব্যাদি নীত হইয়া থাকে। এক সময় এ প্রদেশে অনেকগুলি চায়া বাগান ছিল; সেগুলি লাভজনক না হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহার স্থলে আলু প্রভৃতির চাষ হয়। এ স্থানে কুলী-সংগ্রহের একটা আড্ডা আছে; আমার সহিত কুলী থাকায় তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় নাই।

পরদিবস অতি প্রত্যুষে কূর্ম্মরূপী ভগবান্কে স্মরণ ও প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ১৪।১৫ মাইল দূরে দেউড়িয়া গমন করিতে হইবে। বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীও পার হইতে হইয়াছিল। অপরাহ্নকালে গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া একটা বৃহৎ চালাঘরে কুলীরা আশ্রয় লইল। আমিও সেই গৃহের একপাশে স্থান নির্ব্বাচন করিলাম। রন্ধনের জন্য চাল, দাল, আলু প্রভৃতি সংগ্রহ করিলাম, সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এই আসে, এই আসে, করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, আমার সঙ্গী আসিল না দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। রাস্তায় গিয়া অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলাম; কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। কুলীদের এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রন্ধনকার্য্যে আমি নিযুক্ত হইলাম। মনে করিলাম, সঙ্গী আমার শ্রান্ত ও বুভুক্ষু হইয়া আসিবে, প্রস্তুত অন্ন পাইয়া পরিতৃপ্ত হইবে। খিচুড়ি রান্না হইয়া গেল; তথাপি তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। অগত্যা আমি ভোজনে বসিয়া গেলাম। আমার সান্ধ্যগৃহের কাছে কয়টা গোঁড়ালেবু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সে সময় ইহার অম্লরস ও গন্ধ বড় মধুর বোধ হইয়াছিল। সঙ্গীর জন্য তাহার কয় খণ্ড রাখিয়া দিলাম। আমার ভোজন হইয়া গেল, তবুও তাহার দেখা নাই। চিন্তিত হইলাম, একবার মনে করিলাম, আগে চলিয়া গিয়াছে, আবার মনে করিলাম, বনের মধ্যে পথ ভুলিয়া যদি বিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঘোর অন্ধকার, কোথায় বনের ভিতর লোক পাঠাই, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আলো লইয়া লোক ফিরিয়া আসিল, কোন সংবাদ পাইল না। রাস্তায় জনমানবের সাড়াশব্দ নাই; সুতরাং কাহারও মুখে কোন খবর পাইবারও সম্ভাবনা নাই। এ যাত্রায় হিমালয়ে আজ শেষ রাত্রিবাস। উদ্বিগ্ন হইয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। শ্রান্ত শরীর, সমস্ত ভুলিয়া গিয়া নিদ্রিত হইলাম।

আবার সকাল হইল, সঙ্গীর অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলাম এবং কোন সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত হইলাম। এক জন কহিল, এক জন লোক আগে চলিয়া গিয়াছে। এই সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমি টনকপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। খিচুড়ি, লেবু ভাল করিয়া রাখিয়া দিয়া আর দোকানীকে আমার সঙ্গী আসিলে তাহাকে টনকপুরে যাইবার জন্য কহিয়া দিলাম।

আমার সঙ্গীকে বার বার কহিয়াছিলাম, সঙ্গ ছাড়িও না, বিপন্ন হইবে। বনজঙ্গলের রাস্তা, কোনরূপ বিপদ ঘটিলে একত্র থাকিলে তাহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে। বহুবার কহিলেও এ কথায় কর্ণপাত না করার ফল, সে হিমালয় পরিত্যাগের শেষদিনে প্রাপ্ত হয়।

আজ হিমালয়ের প্রায় সমস্ত রাস্তা নামিতে হইয়াছিল। অতি দ্রুতবেগে নামিয়া নিম্নের বনভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এ জঙ্গল আসামে পরশুরাম কুণ্ডের পথে যে গভীর জঙ্গল দেখিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় কিছুই নহে। নামিবার পূর্ব্বে হিমালয় হইতে সমতলভূমির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদ-নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত হইতেছে, বর্ষার সময়ও সমতলভূমির স্রোতস্বতী ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে, পাহাড়ে যে নদী ভীষণ

তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া ভীমবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—সমতলভূমিতে বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় সে ভৈরবী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া যেন মাটীর সহিত মিলিত হইয়া গমন করিতেছে।

আমাদের ভারতের বৃক্ষসম্পদ নানাপ্রকার এবং অতুলনীয়। আমাদের শাল, সেগুণ, তুণ, খদির, চির, দেবদারু, হালদু (গৃহের অভ্যন্তরের কার্য্যে এই কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইলে বহুদিন স্থায়ী হয়), ধাউরী (সালের ন্যায়), শিশু প্রভৃতি নানাশ্রেণীর বৃক্ষ আমাদের দেশের জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিলাতে ওক বৃক্ষের বড় কদর, আমাদের সেগুণের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। ওকের সকল গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে। ওক-কাষ্ঠ লোহার পেরেক ব্যবহার করিলে তাহাতে কালক্রমে মরিচা পড়িয়া থাকে; আমাদের সেগুণে সেরূপ হয় না। নানাজাতীয় বৃক্ষের ছায়া সম্ভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃক্ষের উপরিভাগে সুবৃহৎ মধুচক্র স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

এক জন ভয় দেখাইয়াছিলেন, যদি পাহাড়ে বৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নদী পার হওয়া সময়-সাপেক্ষ আর বিপদ-সঙ্কুল। ভগবানের কৃপায় সেরূপ কোন বিপদে নিপতিত হই নাই।

একটি নদী পার হইবার সময় এক বিপুলবপু ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎলাভ হইয়াছিল; আমার যে কুলী অগ্রে ছিল, সে দেখিয়াছিল; ব্যাঘ্র দেখিয়া পশ্চাদাগমন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ব্যাঘ্র চলিয়া গেলে আমরা অগ্রসর হইলাম। তাহার বিরাট পদ-চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। ভুটিয়াদের মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি মানস-সরোবর দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ বা আক্রমণ করে না। মানসদর্শী ভুটিয়ারা কখন ব্যাঘ্রমুখে পতিত হয় নাই, এ কথা তাঁহারা সগর্ব্বে কহিয়া থাকেন। আমিও মানসের মহিমায় ব্যাঘ্র-কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলাম কি না, তাহা অবগত নহি। এইরূপে ১৫।১৬ মাইল রাস্তা অতিক্রমণ করিয়া প্রায় ১২টার সময় টনকপুরে উপস্থিত হই।

—·—

বিংশ অধ্যায়

টনকপুরে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে দূর হইতে এঞ্জিনের ধূম ও টেলিগ্রাফ তারের স্তম্ভ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, মনে হইল, পরিশ্রমের অবসান হইল—আত্মীয়বন্ধু-বান্ধব-স্বজন-সহ মিলিত হইবার সম্ভাবনা হইল। ষ্টেশনে না যাইয়া প্রথমে বাজারে গেলাম, বাজারের দোকান সকল বন্ধ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হইল, যেন কোন শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ষ্টেশন রাস্তার দোকান কতক কতক খোলা রহিয়াছে। একটা দোকানে কিছু ভোজন করিয়া লইলাম, আর কুলীদেরও ভোজন করাইলাম। তাহারা আমাকে খুব যত্নে আনিয়াছে—অবকাশ পাইলেই আমার শারীরিক সেবাও করিয়াছে। দোকানদারকে আমার সঙ্গীর জন্য লুচী ভাজিয়া রাখিতে কহিয়া আমি ষ্টেশনে গমন করিলাম।

শীতকালে টনকপুর জনপূর্ণ ও শোভাসম্পন্ন হয়। পাহাড় হইতে ভুটিয়া, নেপালী, পাহাড়ী প্রভৃতি তিব্বত হইতে ভেড়ার লোম, সোহাগা, ঘি, লঙ্কা, হলুদ, খদির, মধু প্রভৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। নিম্নভূমি পিলিভিত খানকা কানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ীরা বিলাতী ও দেশী বস্ত্র, গুড় প্রভৃতি আনয়ন করিয়া কেনাবেচা করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের ইহা খাসমহল, ইহার উন্নতিকল্পে সরকার দৃষ্টি দিয়া থাকেন। বর্ষাকাল এ অঞ্চলের পক্ষে বড় খারাপ কাল; ম্যালেরিয়া সে সময় অখণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া থাকে। শীঘ্র শীঘ্র টনকপুর পরিত্যাগের জন্য উদ্বিগ্ন হইলাম। আসিয়াই ষ্টেশনে কুলী পাঠাইয়া খোঁজ লইয়াছিলাম, আমার সঙ্গী আসিয়াছে কি না। যখন সে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, আইসে নাই, তখন উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইল, অগত্যা কিছু সময় এ স্থানে অবস্থান করিতে হইবে।

ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বেঞ্চে উপবেশন করিলাম। আমার মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, দীর্ঘ যষ্টি দেখিয়া এক জন উচ্চ রেলকর্ম্মচারী আমার প্রতি ঔৎসুক্য সহকারে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, আমিও তাঁহার হস্তস্থিত সংবাদপত্রের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। জল কাছে আইসে না, তৃষিত ব্যক্তিই জলের নিকটবর্ত্তী হয়, ইহাই

সনাতন নিয়ম। আমিই প্রথমে কথা তুলিলাম। তিনি তিব্বত হইতে আমার আগমনকথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া করমর্দ্দন করিলেন। আমার মলিন বেশ, তাঁহার সৌজন্যলাভে অন্তরায় হইল না। তিনি সংবাদপত্রখানি প্রদান করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিলেন। যখন সেই য়ুরোপীয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলাম, সে সময় ষ্টেশনের দূরপ্রান্তে আমার সঙ্গী আসিতেছে দেখিলাম। আমি অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার সঙ্গী কাদা মাখিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছে। এই অবস্থাবিপর্য্যয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম, আসিতে আসিতে গত রাত্রিতে রাস্তায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়, তাহার পর ঘোর অন্ধকারে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইলে চলিবার সময় পড়িয়া গিয়া এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। রাত্রিতে হরিণ প্রভৃতি আসিয়া দেখা দিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপ অনিষ্ট করে নাই। প্রাতঃকালে যে স্থানে আমি অবস্থান করিয়াছিলাম, তথায় আমার সঙ্গী আসিয়া আমার অনুসন্ধান করিয়া দোকানীর মুখে সমস্ত কথা অবগত হয়। যে খিচুড়ী ও লেবু রাখিয়া আসিয়াছিলাম, আমার সঙ্গী তাহা উপভোগ করিয়াছে শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

ট্রেণ ছাড়িবার আর বেশী বিলম্ব নাই; সঙ্গীকে দোকানে ভোজন করিতে পাঠাইয়া দিলাম। জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া হিমালয়ের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভগবান্‌কে অসংখ্য প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

সঙ্গীটি শেষ মুহূর্ত্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, ষ্টেশনমাষ্টার যদি ট্রেণ ছাড়িতে একটু বিলম্ব না করিতেন, তাহা হইলে, বোধ হয়, সঙ্গীটিকে ষ্টেশনে পড়িয়া থাকিতে হইত। এই তাড়াতাড়িতে সঙ্গীর গাত্রাবরণ ষ্টেশনের তারের বেড়ায় পড়িয়া রহিল। গাড়ী হইতে ষ্টেশন-মাষ্টারকে বহু ধন্যবাদ দিলাম, তিনি এ ভদ্রতা না দেখাইলে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আমার যাত্রা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। যখন ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন 'বসুমতীতে' এই কৈলাস-যাত্রা প্রকাশের জন্য আমাদের প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র; তাঁহার আগ্রহ উৎসাহ না হইলে ইহা আমার মনের ও নোটবুকের ভিতর বোধ হয় বন্ধ হইয়া থাকিত। আলমোড়ায় অম্বিরাম সা, ধারচুলায় পণ্ডিত লোকমনাজী লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের সদ্ব্যবহারে আমি মুগ্ধ আছি; শ্রীভগবানের অনুকম্পা তাঁহারা ভোগ করুন। ইহাতে যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেরিং ও স্বেনহিডেনের গ্রন্থ হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছি, এ জন্য তাঁহাদিগকেও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। হিমালয়-নিবাসী যে সকল বন্ধু আমাকে নানাপ্রকারে সহায়তা প্রদান করিয়াছেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাদের উপর করুণা বিতরণ করুন। শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু "মানস ও কৈলাসে"র সুন্দর চিত্র অঙ্কন করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

কৈলাস-যাত্রার সূচনা কলিকাতার হিন্দী দৈনিক কলিকাতা সমাচারে কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, এ জন্য ইহার কর্ত্তৃপক্ষ আমার ধন্যবাদভাজন। সর্ব্বশেষে এক বিরল পুরুষকে আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহার সহানুভূতি, তাঁহার উৎসাহ, তাঁহার পরামর্শ না পাইলে কৈলাস-যাত্রা কতদূর সম্ভবপর হইত, তাহা জানি না। কবি যথার্থ কহিয়াছেন :—

বিরলা জানন্তি গুণান্ বিরলাঃ কুর্ব্বন্তি নির্ধনে স্নেহম্।
বিরলাঃ পরকার্য্যরতাঃ পরদুঃখেনাপি দুঃখিতা বিরলাঃ॥

রেলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। টনকপুরে গাড়ী চড়িয়া শ্রীরামপুর আসিয়া নামিয়াছিলাম। অবশ্য গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে উঠিবার জন্য নামিতে হইয়াছিল। প্রতাপগড় হইতে আমার সঙ্গী প্রয়াগে যায়; যাইবার আগে খেলায় সুন্দর ঘৃত যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার কিছু আর যে কাঠের আধারে তাহা ছিল, তাহাও তাহাকে দিয়াছিলাম।

প্রায় সাড়ে তিন মাস সময়, আর পাঁচ শত টাকার ভিতরে আমার কৈলাস-যাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে নামিয়া যখন আমি আমার রিষিড়ার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হই, তখন শ্রীভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, আমাকে শক্তি দিবেন, যেন আমি অকাতরে প্রিয়জন-অভাবদুঃখ বহন করিতে সমর্থ হই। শ্রীভগবানের কৃপায় সেরূপ কোন দুঃখ ভোগ করিতে হয় নাই; সানন্দে সকলের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম।

আমার আগমনের সহিত আমার স্নেহভাজন শ্রীমান্

হরিপ্রসাদ রায় সর্ব্বপ্রথম আমার গৃহে আগমন করিয়া আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহা লিখিবার সহিত তাঁহার দুঃখপ্রদ মৃত্যুর কথাও মনে হয়। এক্ষণে তিনি পরলোকগত, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে চিরশান্তি প্রদান করুন।

অবশেষে যে সকল সাধু মহাত্মা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে এই কঠোর যাত্রা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া আর পাঠকপাঠিকা সকলের শুভ কামনা করিয়া ইহা সমাপ্ত করিলাম। শুভমস্তু।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

নির্ব্বাচন-ঘোড়দৌড়
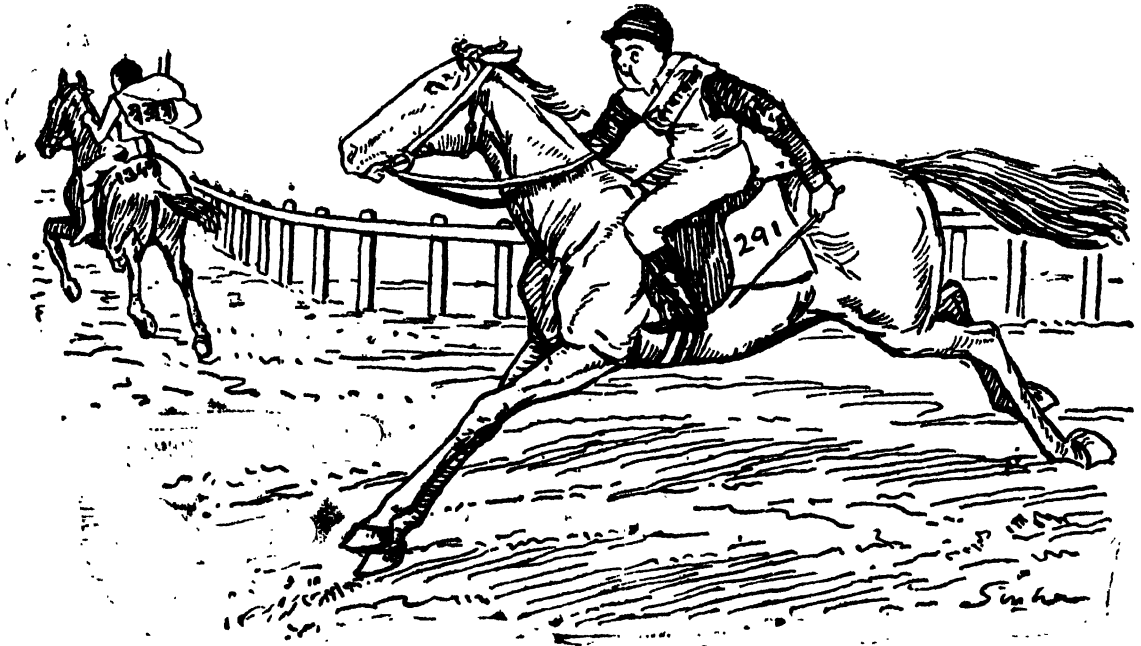
মস্ত বড় ঘোড়ায় চড়া—পায়া বড় ভারী ;
নির্ব্বাচনের বাজি মাতে—হায় হয়েছে তারই।
দেশের লোকের মতটি যারা দলতে যাবে পায় ;
এমনি দশা হবেই তাদের—এমনি পরাজয়।

নষ্টচন্দ্র

১

প্রভাতে উঠিয়া শিরোমণি মহাশয় বাগানে যাইবার জন্য দ্বার খুলিতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বিস্ময়ে ও ক্রোধে কিছুক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। একটু পরেই তাঁহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"ঈশ্‌নে! ও ঈশনে!"

ঈশানের সবেমাত্র একটু আগে ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। চক্ষু খুলিয়াই সে প্রভুকে পাশ দিয়া যাইতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। কারণ, সে জানিত, চক্ষু খোলা দেখিলেই প্রভু এখনই বলিয়া বসিবেন—"ঈশান, একটা কল্‌কে দে।"

চক্ষু মুদিয়া দুষ্ট হাসি হাসিতে হাসিতে ঈশান অনুমান করিতেছিল, প্রভুর এতক্ষণ তামাক সাজা হইয়া গেল, এইবার 'কলিকাপ্রসাদ' পাওয়া যাইবে। ঠিক সেই সময়ে তাহার কানে প্রভুর তীক্ষ্ণস্বর আসিয়া আঘাত করিল—"ঈশান" হইতে একেবারে "ঈশ্‌নে!"

ঈশান অগত্যা সুখশয্যা ও কপট নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিল এবং কি অঘটন ঘটিয়াছে জানিবার জন্য দ্রুতপদে প্রভুর সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিরোমণি মহাশয় সম্মুখের দিকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—"এ সব কি হয়েছে, ঈশেন?"

ঈশান চাহিয়া দেখিল, বাগানের দ্বারের সম্মুখেই ৫।৬ হাত জমীর উপর ঝিঙ্গা, শশা, কুমড়া ও লাউয়ের সুন্দর সুন্দর ডগাগুলি কে সযত্নে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া সাজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে!

ঈশানকে বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া শিরোমণি হুঙ্কার দিয়া পুনরায় কহিলেন—"এ সব কি, ঈশেন?"

ঈশান হাত দিয়া লাউ ও কুমড়ার কয়েকটি ডগা তুলিয়া বেশ করিয়া দেখিয়া সহজ স্বরে বলিল—"এ যে দেখ্‌ছি, লাউ আর কুমড়োর ডগা, কত্তা!"

শিরোমণি ক্রোধের সহিত দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ঈশানের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"লাউ আর কুমড়ার ডগা, কত্তা! ভারি কথাই বল্‌লেন! আমার যেন চোখ নেই, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে এগুলো কিসের ডগা!"

ঈশান একটু বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"আজ্ঞে, আপুনি জিগ্যেস্ কর্‌লেন, তা যা জানি, তাই তো বোল্‌বো; বেড়িয়ে তো আর বল্‌তে পারিনে!"

শিরোমণি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"কিসের ডগা তোকে জিগ্যেস্ করিনি; কে এ কায কর্‌লে বল্ দেখি?"

ঈশান বেশ বুদ্ধিমানের মত একটু ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বাগানের মধ্যে কা'ল রাতে কে এসেছিল বলুন ত! এ নিশ্চয় তারই কায।"

শিরোমণি এই অপরূপ উত্তর শুনিয়া খানিকটা অবাক্ হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তুই কি সকালে আমার সঙ্গে চালাকি কত্তে এলি, ঈশেন? এত স্পর্দ্ধা হয়েছে তোর?—পাজী, হতভাগা—"

ঈশান দাঁতে জিভ্ কাটিয়া সবিনয়ে বলিল—"আজ্ঞে, সে কি বলেন, কত্তা! আপনি হলেন মনিব, আপনার সঙ্গে চালাকি কত্তে পারি!"

"কর্‌তে পারিস্‌নে তো কর্‌লি কি ক'রে রে? চালাকি আর কারে বলে!"

অর্দ্ধেক রুষ্ট ও অর্দ্ধেক ক্ষুব্ধ হইয়া শিরোমণি এই কথা কহিলেন।

কোন্ কথায় প্রভু তুষ্ট হইবেন, কোন্ কথায় বা রুষ্ট হইবেন, তাহা না বুঝিয়া ঈশান আর কোন উত্তর না দিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

হঠাৎ শিরোমণির দৃষ্টি দক্ষিণ দিকের কলাগাছগুলির দিকে আকৃষ্ট হইল।

"অ্যাঁ, এ কি করেছে! ফলন্ত গাছটাকে এমন ক'রে কেটে রেখে গেছে! এক কাঁদি কলা কুচি কুচি ক'রে ফেলেছে!"

বলিতে বলিতে শিরোমণি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন।

সে দিকে ১০।১২ ঝাড় কলাগাছ ছিল। একটি গাছে কলা ফলিয়া বেশ পুরস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শিরোমণি ২।১ দিনের মধ্যে তাহা কাটিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠাইবেন, ভাবিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে এই দুর্ঘটনা। সেই এক কাঁদি কলা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া তলায় ফেলা হইয়াছে। কিন্তু এ কি! ছোট ছোট কলার টুক্‌রা দিয়া মাটীর উপর পাবগুরা যে কি লিখিয়া রাখিয়াছে! তিনি লক্ষ্য করিয়া পড়িলেন—"শিরোমণি কিপ্‌টে।"

ব্যর্থ রোষে শিরোমণি ফুলিতে লাগিলেন। "হ্যাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বাড়ী এসে আমার বাগানে ঢুকে আমার এত সাধের গাছপালা ফল সব কেটে আবার আমারই বদনাম! আমায় বলে কিপ্‌টে। আমার মত খরচে দেশের মধ্যে কটা লোক আছে বল্ তো, ঈশেন! কোন্ শালার কায এ! শালাকে খুঁজে বার কত্তেই হবে। শালা, পাজী, বদ্‌মাস কোথাকার—"

শিরোমণি আরও গোটা কয়েক উগ্র গালি দিয়া, এই কার্য্যগুলি যে করিয়াছিল, তাহার পিতাকেও ইহার মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহার মুখে একটা অত্যন্ত বদ জিনিষের ব্যবস্থা করিতে যাইবেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তাড়াতাড়ি কে বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাগা, ক্ষেপেছ! কি ব'লে গালগুলো সব দিচ্ছ? কা'ল যে নষ্টচন্দর গিয়েছে, মনে নেই? গাল দিলে তো তাদেরই ভাল।"

শিরোমণি পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, স্ত্রী পদ্মাবতী দাঁড়াইয়া। স্ত্রীর কথায় তিনি রহস্যের তবু একটা সূত্র পাইলেন।

২

হরকান্ত শিরোমণি কৃষ্ণনগরের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ। তাঁহার বিদ্যা যে পরিমাণে ছিল, অর্থের পরিমাণ তাহার চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু তাঁহার বিদ্যা ও অর্থ উভয়ই পরাজয় মানিত তাঁহার অর্থ উপার্জ্জনের ও সঞ্চয়ের আগ্রহের কাছে। সাধারণতঃ শিরোমণি বেশ মিষ্টভাষী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক। কিন্তু কোন জিনিষ কেহ ক্ষতি করিলে কিংবা কোন ব্যয়ের কারণ ঘটিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। সে ক্রোধ তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী ব্যতীত কেহ সাম্‌লাইতে পারিত না। সংসারের খরচপত্র নিয়মাতিরিক্ত হইলে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেন। কোন আত্মীয়বন্ধু আসিলে, আহার্য্যের কিছু পারিপাট্য হইলে, তাহা শিরোমণি মহাশয়কে লুকাইতে হইত অর্থাৎ তাহা হইতে শিরোমণিকে বঞ্চিত করিতে হইত।

পাছে বাজারখরচ লাগে, সেই জন্য শিরোমণি অতি যত্নে নানারকম তরকারির গাছ বাড়ীতে রোপণ করিয়াছিলেন। সে সব তরকারি বাড়ীর খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা ঈশানের মাথায় দিয়া বাজারে পাঠাইতেন ও তল্লব্ধ অর্থ সযত্নে সঞ্চয় করিতেন। নুণ, তেল ও কদাচিৎ মাছের জন্য প্রত্যহ আনা কয়েক পয়সা তিনি অতি কষ্টে বাহির করিয়া দিতেন। চা'ল-দাল কিনিতে হইত না। ভাগে তাঁহার যে জমী বিলি করা ছিল তাহা হইতেই বৎসরের খাদ্য উঠিয়া যাইত। তবে পদ্মাবতীকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; মাসে মাসে তিনি পদ্মাবতীর হাতে ২০৲।২৫৲ টাকা দিতেন। বলিয়া দিতেন, যেন একটি পয়সাও ইহা হইতে খরচ না হয়। স্ত্রীকে তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই বিশ্বাসও করিতেন। সেই জন্য তাঁহাকে যে টাকা দিতেন, তাহার কথা পদ্মাবতীকে কোন দিন জিজ্ঞাসাও করিতেন না। পদ্মাবতী অবশ্য স্বামীর এই বিশ্বাস ও অনুরোধ রাখিতে পারিতেন না; কারণ, স্বামীর সম্মানরক্ষার জন্যই তাঁহাকে স্বামীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে হইত।

শিরোমণি মহাশয়ের সংসারে লোক অতি অল্প; শিরোমণি স্বয়ং, স্ত্রী, কন্যা তারাসুন্দরী, আর ভৃত্য ঈশান। ঈশান তাঁহার স্বর্গীয় পিতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত ভৃত্য, তাই তাহাকে রাখিতে হইয়াছে। নহিলে স্বেচ্ছায় ভৃত্য রাখিবার মত লোক শিরোমণি নহেন।

এ হেন শিরোমণি মহাশয় যখন বাগানের দ্বার খুলিয়াই একসঙ্গে এতগুলি অপচয় দেখিলেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা যে কি করিয়া উঠিল, তাহা তিনিই বুঝিয়াছিলেন। আর কতকটা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী।

স্ত্রীকে দেখিয়াই শিরোমণি বলিলেন—"দেখেছ গা, লক্ষ্মীছাড়ারা কি করেছে!"

শিরোমণি সেখানে হেঁট হইয়া সেই কচি কচি ডগাগুলি একটি একটি করিয়া উঠাইতে লাগিলেন আর 'আহা' বলিতে লাগিলেন। এতক্ষণ তাঁহার মনে শুধু ক্রোধের

উদয় হইতেছিল ; স্ত্রীকে দেখিয়া দুঃখ ও শোকের অনুভূতি জাগিয়া উঠিল।

"আহা, দেখেছ এ দিকে" বলিয়া শিরোমণি পদ্মার হাত ধরিয়া ছিন্নভিন্ন গাছগুলির অবস্থা দেখাইলেন।

কোন গাছের গোড়াটা কাটিয়া দিয়াছে, কোনটির মাঝখানের অনেকখানি অংশ নাই। কোন গাছের খালি কচি কচি ডগাগুলি গিয়াছে। যেগুলির মাঝখানের অংশ বা গোড়া কাটিয়া গিয়াছে, তাহাদেরও ডগাগুলি এখনও মাচার কঞ্চি বেড়িয়া সতেজ রহিয়াছে। কিন্তু আর কতক্ষণ? মৃত্যু যে তাহাদিগকে অনেক আগেই গ্রাস করিয়াছে, এ কথাটি যেন এখনও তাহাদের কাছে পৌঁছায় নাই!

শিরোমণি সখেদে বলিলেন—"দেখেছ কি অবস্থা হয়েছে গাছগুলির? কা'ল সন্ধ্যাবেলাও দেখে গেছি, কি সুন্দর দেখাচ্ছিল গাছগুলি! শোভা যেন চারদিক দিয়ে ফুটে বের হচ্ছিল। আর দেখ দিকি আজ! ফলগুলো সব তলায় কেটে রেখে গিয়ে আশ মেটেনি, গাছের ডগাগুলির কি দুর্দ্দশা করেছে! আর তুমি বলছ, গাল দেব না শালাদের—"

গাছগুলির শ্রীহীন অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কথা বলিতে গিয়া শিরোমণির চক্ষুতে সত্য সত্যই জল আসিল।

পদ্মাবতী গাছগুলির অবস্থা দেখিয়া যত না হউক, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"দেখ, ওর জন্য আর আপ্‌শোষ ক'রে কি করবে? পৃথিবীতে কত লোকের কত ক্ষতি হচ্ছে। যার বাড়া নেই ছেলেমেয়ে, তাও মারা যাচ্ছে। লোক কি করছে বল। আর কা'ল নষ্টচন্দ্র গেছে, কা'ল তো লোক করবেই এ সব।"

বলিয়া পদ্মাবতী একপ্রকার জোর করিয়াই স্বামীকে বাগান হইতে বাহির করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া আসিলেন।

ঘরের রোয়াকে শিরোমণি অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—"কিন্তু আমি যে তাঁদের আসার সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি। এখন বাজারের কি করব আমি!"

পদ্মাবতী ঈষৎ আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাদের আস্‌বার কথা?"

শিরোমণি বলিলেন—"কুড়ুলগাছি থেকে কা'ল তারাকে দেখ্‌তে আস্‌বার কথা আছে।"

পদ্মাবতী একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তাদের আবার কেন আস্‌তে বলা? সেই ৪০ বছরের মিন্‌সের সঙ্গে আমি কিছুতে তারার বিয়ে দিতে দেব না—এ আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি।"

শিরোমণি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"আহা, তুমি আগেই যে অস্থির হয়ে পড়্‌লে! পাত্র স্বয়ং দেখ্‌তে আস্‌ছে। তুমি তাকে দেখ, সব শোন। তার পর পছন্দ না হয়, সে কথা আলাদা। কিছু দিতে হবে না, উপরন্তু মেয়েকে গহনা দিয়ে মুড়ে নিয়ে যাবে।"

"কিছু দিতে হবে না, এই তোমার পছন্দের কারণ, তা কি আমি বুঝিনি? মেয়েটার কি হবে, সে কত দুঃখ পাবে, এ সব ভাবনা তো তোমার নেই। মেয়েকে ভালবাস তবু এ কথাটা মনে হয় না, এতই পয়সার মায়া!"

ক্ষোভে পদ্মাবতীর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল।

শিরোমণি তৎক্ষণাৎ নরম হইয়া বলিলেন—"যখন তারা আসছে, তখন খাতির তো একটা করতে হবে। দেখ্‌তে এলেই তো বিয়ে হয়ে যাবে না। তুমি দেখ শোন, তার পর যা বিচার হয়, করা যাবে। কিন্তু বাজারখরচের কি হবে? আমার তো এই এমন ক্ষতি হ'ল, এর পর আবার খরচ কি ক'রে করি।"

পদ্মাবতী আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, সে ভাবনা তোমার কিছু করতে হবে না। তরীতরকারি সব আছে; তাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর ভার আমার। কিন্তু বিয়ে সেখানে দিতে দিচ্ছিনে, এ তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি।"

বর্ত্তমানে যে তাঁহাকে এখনই বাজারখরচ করিতে হইবে না, ইহাতেই শিরোমণি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইলেন। বিবাহ? —সে পরের কথা পরে হইবে।

৩

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

শিরোমণি এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্মুখের পাত্রস্থিত জল পবিত্র করিয়া দিলেন। সেই মন্ত্রপূত জল একে একে যখন তাহারা পান করিতে লাগিল, শিরোমণি তখন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, যদি রাত্রির
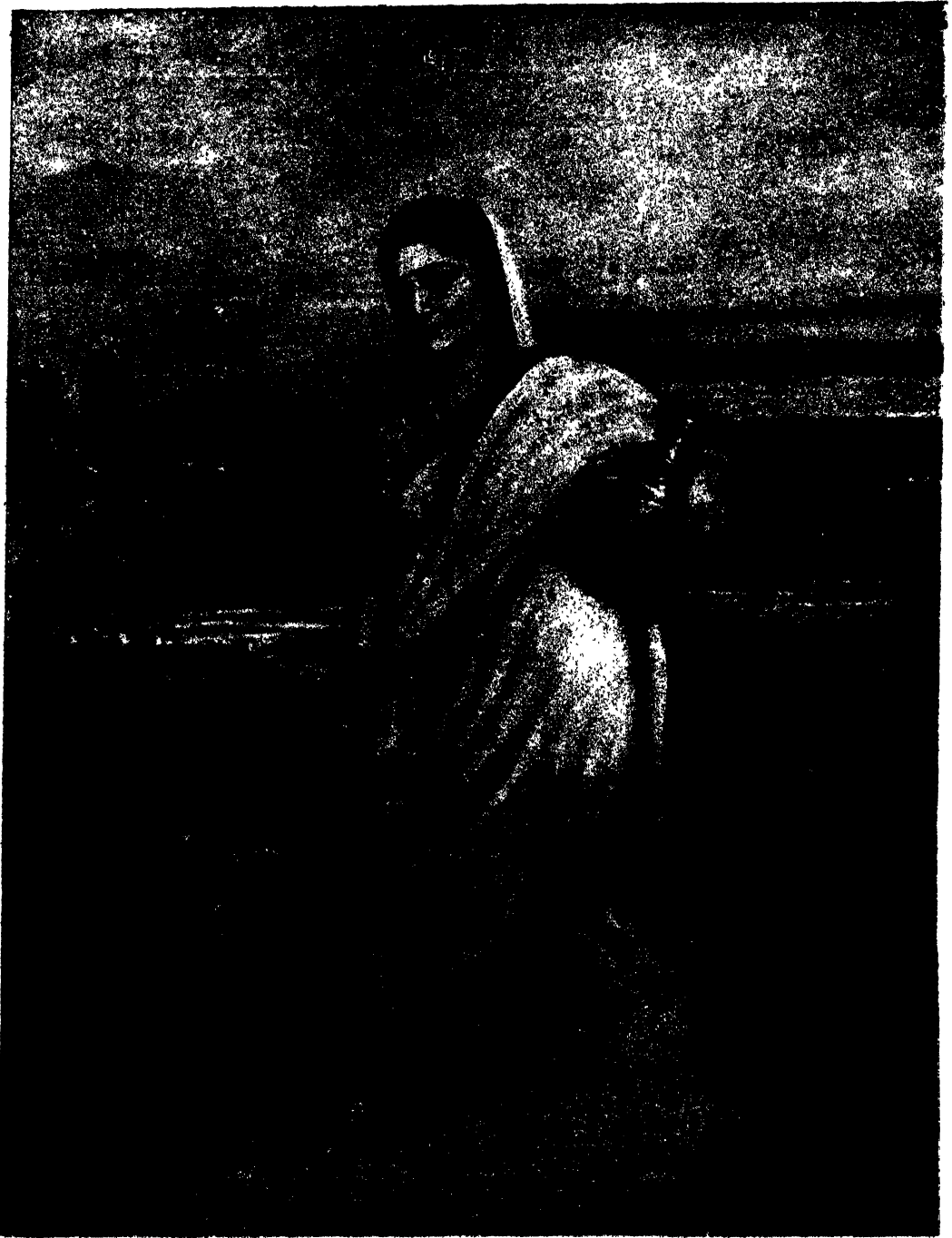
বসুমতী প্রেস]   [শিল্পী—শ্রীবামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রত্যাবর্ত্তন

সেই অপকার্য্যের চিহ্ন কাহারও মুখে দেখিতে পারেন। যাহারা মন্ত্রপূত জল পান করিতে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, দুই চারি জন যুবতী এবং কয়েকটি ছেলে। ছেলেগুলির বয়স ১০।১২ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত।

দুই চারি জনকে দেওয়া হইয়াছে,এখনও অনেক বাকী। শিরোমণির মনে হইল, একটি ছেলে যেন ঘন ঘন বাগানের দিকে তাকাইতেছিল। শিরোমণি তাহার দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"নেড়া, আমাদের বাগানে কি কি গাছ আছে জানিস্?"

নেড়া বলিয়া ছেলেটির বয়স বৎসর ১৪ হইবে। তাহার মাথার ঘনকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত কেশ দেখিলে কেহ তাহার"নেড়া" নাম চট্ করিয়া অনুমান করিতে পারিত না। সেই যে এক দিন কেশশূন্য ক্ষুদ্র মস্তক লইয়া সে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, সেই অপরাধে আজ এই কেশসম্পদের অধিকারী হইয়াও তাহাকে নেড়া অপবাদ সহিতে হইতেছে। এই ছেলেটিকে বাপ মা "নেড়া" বলিয়া ডাকিলেও স্কুলের রেজিষ্টারে তাহার নাম শ্রীমৃণালকান্তি রায় লিখা আছে এবং তাহার মনের ইচ্ছা, বাহিরের সকলেই তাহাকে মৃণাল বলিয়াই ডাকে। তাই শিরোমণি মহাশয়ের মুখে নেড়া নাম শুনিয়া সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। সেই জন্য সে তাঁহার বাগানের গাছ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানিলেও চট্ করিয়া তাঁহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিল না, তৎক্ষণাৎ বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, জানি বৈ কি।"

প্রায় সন্ধান পাইয়াছেন, ইহা অনুমান করিয়া শিরোমণি উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন—"তবু কি কি গাছ বল ত?"

নেড়া বা মৃণালের জানা ছিল যে, আম্রবাগে ঝিঙা, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি হইয়া থাকে। সে অমনই অম্লানবদনে ঐগুলারই নাম করিয়া দিল।

"তা হ'লে বল্, তোর সঙ্গে কে কে ছিল। চালাকী আমার কাছে? ধূর্ত্তকাক শিরোমণিকে ফাঁকি দিবি তোরা—হলিই বা আম্ভাজাদার ছেলে?"

শিরোমণি নেড়াকে একেবারে পাইয়া বসিলেন। নেড়া অনেকখানি বুদ্ধির বাহী করিয়া শেষে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কাহার সঙ্গে এবং কোথায় ছিল, এ সবের কিছুই বুঝিতে পারিল না।

নেড়াকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া শিরোমণি নেড়া অপরাধ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইলেন, বলিলেন—"ভেবেছিস্, তোরা আমার বাগানে গিয়ে গাছপালা কাট্লেই কলঙ্ক থেকে পরিত্রাণ পাবি! কথ্খনো না। শীগ্গির বল এখনও, কে কে তোর সঙ্গে ছিল?"

নেড়া তখনও চুপ। নেড়ার সঙ্গে তাহার অভিভাবিকা হইয়া আসিয়াছিলেন নেড়ার পিসীমা। তিনি এতক্ষণ চুপচাপ শুনিতেছিলেন। ব্যাপারটি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই, তাই কথা কহেন নাই। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র একটা বিপদের মধ্যে যাইতেছে, ইহা বুঝিয়া এইবার তিনি বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ গা ছিরোমণি ঠাকুর, এ আপনার কেমন বিবেচনা? ও ছেলেমানুষ, সাতচড়ে ওর মুখে কথা নেই (যদিও আজই সকালে বাড়ীতে তিনি নেড়াকে বলিয়াছিলেন—"ছেলের মুখে যেন খই ফুটছে") বাছাকে যেন উকীলের জেরায় ফেলে দেছেন। ও কি জানে, আপনার বাগানে কি গাছপালা আছে, কে কি কেটেছে। দেখ দিকি, বাপু!"

বলিয়া তিনি যেন আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য আর সকলের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তখনও সকলে মন্ত্রপূত জল হস্তগত করিতে পারে নাই; কাযেই কেহ নেড়ার পিসীকে সমর্থন করিতে সাহস করিল না।

সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া নেড়ার পিসী গলাটা আর একটু চড়াইয়া বলিলেন—"ও মা, দেখেছ একবার কলিকাল! ভাব্লাম, রাত্তিরে নষ্ট 'কন্দর' (নেড়ার স্বর্গগত পিসে মহাশয়ের নাম ছিল নিতাইচন্দ্র, সে জন্য তিনি চন্দ্র শব্দ পরিহার করিয়া চ স্থানে 'ক' ব্যবহার করিতেন) দেখে ফেল্লাম,তা যাই ছিরোমণি ঠাকুরের কাছ থেকে জলপড়া খেয়ে আসি, ছেলেটাকেও খাইয়ে আনি। আরও তো কত যায়গায় যেতে পারতাম, তা গেলাম না কেন? না, ছিরোমণি থাক্তে আর কার কাছে যাব? আর ওঁর মুখে কি না এই কথা! আর তো নেড়াধন, একেনে অপমান্তি হ'তে থাকা কেন? আর কি যায়গা নেই? চ, গিয়ে এখ্খুনি তোকে বেচাস্পতি ঠাকুরের কাছ থেকে জলপড়া খাইয়ে আন্ছি।"

বলিয়া নেড়ার পিসী সবেগে উঠিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের হাত ধরিয়া টানিলেন।

শিরোমণি অনেকটা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন; কারণ, আসলে তিনি লোক মন্দ ছিলেন না এবং কলঙ্কের জন্য

করিয়া চলিতেন। তাহা ছাড়া নেড়ার পিসীর ক্ষুরধার জিহ্বা গ্রামের মধ্যে সকলেরই ভয়ের কারণ ছিল।

শিরোমণি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া একটা শান্তিসূচক কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় ভিতরের দিক্ হইতে পদ্মাবতী আসিয়া পড়িলেন। তিনি নেড়ার পিসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"ঠাকুরঝি, চল্লে কেন ভাই, এসো। ওঁর তো কোন বিবেচনা নেই, কাকে কি বলেন, তার ঠিক নেই।"

বলিয়া পদ্মাবতী নেড়ার পিসীকে হাতে ধরিয়া বসাইলেন।

শিরোমণি তখন এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বলিলেন—"আমি তো ওকে কিছু বলিনি! ও মা, শুধু বলেছিলাম, কাদের এ কায, যদি জানে তো তাদের নাম বলুক্, গাছগুলোর নাম ঠিক ঠিক বল্লে কি না। না শুন্‌লে কি ক'রে জান্‌লে?"

নেড়ার পিসী পুনরায় কোমর বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; কিন্তু পদ্মাবতী তাঁহাকে সে অবসর না দিয়া কহিলেন,—"তা কেন বল্‌তে পার্‌বে না? ঝিঙে, লাউ, কুমড়া এখন লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে আছে। এ আর আন্দাজে কে না বল্‌তে পারে বল। তা ছাড়া নেড়া তো বুদ্ধিমান্ ছেলে!"

নেড়ার পিসী মহা খুসী হইয়া বলিলেন—"বল তো বৌ, বল তো! নেড়াধনের পেটে বিদ্যে আছে, ও কেন বলতে পারবে না? হেড্ মাষ্টার মুখপোড়া এক-চোখোমী ক'রে বাছাকে কেলাস দিলে না। তা নইলে এবারই তো বাছা সেকেন কেলাসে উঠ্‌ত; আস্‌ছে বার পাশ দিত। সে মিন্‌সেরই বা কি ভাল হ'ল এতে? দুমাসও যেতে হ'ল না, জলজ্যান্ত বৌটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল। আমার নেড়াধনের আর কি ক্ষেতি করলেন? আশু পণ্ডিত সেই আমার বাছাকে পড়াতো আগে—বল্লে, ছেলে তোমার পাকা হয়ে উঠ্‌বে। কেমন কি না, বৌ?"

পদ্মাবতী নেড়ার পিসীর অসাক্ষাতে অতি মৃদুহাসি ওষ্ঠাধরে গোপন করিয়া কহিলেন,—"তা বটেই তো।"

নেড়ার পিসীর তখন হৃদয় খুলিয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি আত্মীয়তা করিয়া বলিলেন,—"আর দেখ, বৌ, রাত্তিরে যখন চাঁদ দেখেছি, তখনি মনে পড়েছে—যা, মলাম, এই বুড়ো বয়সে অপকলঙ্ক বইতে হ'ল। কি করি? নেড়াকে বল্‌লাম, 'চ তো নেড়া আমার সঙ্গে—একটা উপায় তো করতে হবে।' কিন্তু কোথায় কার বাগানে তখন যাই? চৌধুরীদের নতুন ঘর হচ্ছিল না? তার পঁইটেটা সবে কা'ল শেষ করেছিল। দুই ভাইপো-পিসীতে গিয়ে ইটগুলো সব খসিয়ে দিয়ে এলাম। নেড়া আমার তার পর থেকে একটিবারও বাড়ী থেকে বেরোয়নি—ও কেন গাছ কাটতে যাবে?"

ছেলের ও ছেলের পিসীর সাধুতার এইরূপ নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়া শিরোমণি আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। পদ্মাবতী পাত্র হইতে মন্ত্রপূত জল দুই জনের হাতে ঢালিয়া দিলেন। নেড়ার পিসী নিজে তাহা পান করিয়া ও নেড়াকে পান করাইয়া কতকটা স্থির হইলেন। তাহার পর তিনি উঠিয়া বলিলেন,—"একটা বাটি-টাটি ক'রে আর দু' ফোঁটা দাও তো ভাই, বৌটাও আবার দেখে ব'সে আছে। একটা বিধান তো কর্‌তে হবে, যে কদিন আছি, সব দিক তো দেখতে হবে।"

পদ্মাবতী একটি ছোট পাতরের বাটিতে খানিকটা ঐ জল ঢালিয়া পিসীর হাতে দিলেন। পিসী-ভাইপো তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য সকলেও আপন আপন কার্য্য সারিয়া উঠিল।

পদ্মাবতী স্বামীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"ক্ষেমা ঠাকরুণকে চটিয়েছিলে! সর্ব্বনাশ আর কি?"

শিরোমণির মেয়ে তারাসুন্দরী বাপের জন্য পূজার যায়গা করিয়া রাখিয়া একখানি বই হাতে দুয়ারের আড়াল হইতে সব শুনিতেছিল। সকলে চলিয়া যাইবামাত্র তারা বাহিরে আসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল,—"হ্যাঁ মা, ক্ষেমঙ্করী ঠাকরুণের সঙ্গে কি ক'রে তুমি গম্ভীর হয়ে কথা কইছিলে? বুড়ো মাগী রাত্তিরে গিয়ে এক জনের পঁইটে ভেঙ্গে দিয়ে এসেছেন, তাই আবার বড় গলা ক'রে বলা হচ্ছিল। তুমি বারণ ক'রে এসেছিলে, তাই আমি আসিনি। নইলে এসে বল্‌তাম, যখন লোকের পঁইটে ভেঙ্গেছ, তখনই তো অপকলঙ্ক থেকে বেঁচে গিয়েছ, আবার কেন জলপড়া খেতে আসা?"

পদ্মাবতী হাসিয়া বলিলেন,—"তা হ'ক্ গে, মা! না

এসে ভালই করেছ। নিজে খাঁটি থাকলেই হ'ল। অপরে যা ইচ্ছে করুক গে না!"

তাহার পর একবার মায়ের দিকে, একবার বাপের দিকে চাহিয়া তারা বলিল,—"বাবা খালি বলেছেন, 'কে কে ছিলি বল্ তো?' ওরে বাপ্ রে, অমনই যেন একেবারে ধ'রে খেতে এল। আবার চন্দরকে বলে কন্দর!"

ক্ষেমঙ্করীর সেই অপরূপ ভঙ্গী ও উচ্চারণ স্মরণ করিয়া তারা খুব একচোট হাসিয়া লইল। শিরোমণি ও পদ্মাবতী দুই জনেই না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

তারা সুন্দরী, তাহার গাত্রের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। দেহ ঈষৎ দীর্ঘ। তাহার সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর দেখিলে মনে হয়, মেয়েটি বেশী কথা কহে না, কিন্তু যাহা কহে, তাহার দাম আছে। চক্ষু দুইটি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল; চোখের দিকে চাহিলেই মনে হয়, অন্যায় বা অবিচার সহিবার পাত্রী এ নহে। হাত দুই-খানির গড়ন এমন যে, দেখিলে মনে হয়, ঐ হাত দিয়া এই মেয়েটি যেমন প্রেমাস্পদকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে, তেমনই প্রয়োজন হইলে তাহাকে রক্ষা করাও উহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না।

তাহার বয়স বৎসর ষোল হইবে, যৌবন যেন পুষ্পের শোভার মত তাহার সর্ব্বদেহ বেষ্টন করিয়া আছে।

পদ্মাবতী তারার হাতের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বই পড়ছিলি মা?"

তারা বলিল,—"একখান কবিতার বই, 'চয়নিকা'।"

পদ্মাবতী বলিলেন—"নতুন বই! শরৎ বুঝি এনে দিয়েছে?"

পুষ্পের রঙ্গিন আভার মত লজ্জা তারার দুইটি গণ্ডে ফুটিয়া উঠিল। কোনমতে তারা "হাঁ" বলিয়া উত্তর দিল।

একটু পরেই তারা বলিল,—"মা, আমি এ বেলা রাঁধ্ব।"

"কেন?"—পদ্মাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন। তারা উত্তর করিল—"এম্নি, তুমি একটু জিরোও মা; আমি রাঁধি।"

"তুমি আর কদিন বা এখানে আছ, আর কদিনই বা জিরতে পাব?" বলিয়া পদ্মা মেয়ের বিবাহের কথা ভাবিয়া একটু বিমনা হইলেন।

তারা লজ্জা পাইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পদ্মাবতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আহা, শরতের সঙ্গে তারার বিয়েটি হ'লে কেমন মানায়!"

শিরোমণি যেন ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাপ্ রে, সে কি হয়! শরতের দাদার খাঁই কত, তার কি ঠিক আছে! আমার তো মনে হয়, পাঁচটি হাজারের কম হবে না।"

পদ্মাবতী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"না; অত হবে না। হাজার তিনেক টাকা খরচ করতে পারলেই হ'তে পারে। শরতের দাদা লোক খুব ভাল।"

"উঃ বাপ্ রে! তিন হাজার টাকা? তুমি বল কি? আমাকে খুন কল্লেও অত টাকা হবে না।" বলিয়া শিরোমণি একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন।

পদ্মাবতী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চিন্তান্বিত মুখে মেয়ের ভবিষ্যতের কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

৪

শরৎ শিরোমণিদের স্বঘর ও প্রতিবাসী। অল্পবয়সে শরতের পিতৃবিয়োগ হয়। বৎসর চারি হইল, শরতের মা-ও মারা গিয়াছেন। শরতের দাদা হেমন্ত ও বৌদিদি সুকুমারীর জন্য তাহাকে পিতৃ-মাতৃবিয়োগদুঃখ বেশী করিয়া অনুভব করিতে হয় নাই। হেমন্ত কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসর। শরৎ এবার এম্, এ, পরীক্ষা দিবে। হেমন্তের বয়স বৎসর পঁয়ত্রিশ, সুকুমারীর পঁচিশ। সন্তানাদি হয় নাই, হইবার আশাও না কি কম। কারণ, পাড়ার প্রবীণারা কেহ কেহ বলেন, সুকুমারীর শরীর মোটা হইয়া যাইতেছে; উহা সন্তানাদি না হইবারই না কি লক্ষণ।

হেমন্ত ও সুকুমারী কাহারও তাহাতে দুঃখ হয় নাই। স্বামী ও দেবর লইয়া সুকুমারীর দিন সুখেই কাটিয়া যাইতেছে। শরৎ তাহার কাছে একাধারে ভাই ও পুত্রের মত হইয়া পড়িয়াছিল, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে শরৎকে কে যে বেশী ভালবাসিত, তাহা স্থির করিয়া বলা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়িত।

শরতের বয়স ২২ বৎসর। হেমন্ত শরতের জন্য পাত্রী সন্ধান করিতেছিলেন; কিন্তু সুকুমারী স্বামীকে গোপনে কি একটা কথা বলায় তিনি সে চেষ্টা হইতে বিরত হইয়াছিলেন।

সংসারের সকল ব্যবস্থা সুকুমারী করিয়া থাকেন। হেমন্ত

তাঁহার ছাত্র ও গ্রন্থ লইয়া আছেন। শরৎ কলেজে পড়িয়া দাদার পড়িবার ঘরে, টেবলের উপরে বিছানার চারিধারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বইয়ের বোঝা ও কাগজের রাশি প্রত্যহ গুছাইয়া ও বৌদিদির জন্য ভাল ভাল বাঙ্গালা উপন্যাস ও গল্পের বহি আনাইয়া দিয়া ও অবসরক্রমে প্রতিবেশী শিরোমণি মহাশয়ের কন্যা তারাকে পড়াইয়া, তাহার সহিত গল্প করিয়া এবং অসাক্ষাতে তাহার কথা ভাবিয়া সময় কাটাইতেছে।

নষ্টচন্দ্রের পরের দিন শরৎ কলেজ হইতে আসিলে সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরপো, কা'ল তুমি চাঁদ দেখেছিলে ?"

বিস্মিত হইয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল,—"চাঁদ ? কেন বল দিকি ?"

"আগে বল তো দেখেছিলে কি না, তার পর বল্‌ছি।"

"হ্যাঁ, দেখেছিলাম বৈ কি ! আমি যে রাত্তিরে ছাতের উপর ব'সে পড়ছিলাম।"

"কা'ল নষ্টচন্দ্র গিয়েছে, যদি অপকলঙ্কের হাত থেকে বাঁচতে চাও তো শীগ্‌গির শিরোমণি মহাশয়ের কাছ থেকে জল পড়া খেয়ে এস।"

—"ও ! তাই ?"

"বটে ! কথাটা বুঝি তোমার গ্রাহ্য হ'লো না ? আচ্ছা, বল তো, ঠাকুরপো, চাঁদ দেখ্‌লে কলঙ্ক হবে আর পরের কোন অনিষ্ট কর্‌তে পারলেই তা কেটে যাবে, এ কথা হবার মানে কি ? এর কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ বল্‌তে পার ?"

"কলঙ্কের কারণটা ঠিক বল্‌তে পারিনে, তবে অনিষ্ট করলে কলঙ্ক থেকে পরিত্রাণ কেন পাওয়া যাবে, তার একটা কারণ টেনে টুনে আন্‌তে পারি।"

—"কি, বল।"

"প্রথম হচ্ছে, কলঙ্ক যদি অদৃষ্টে থাকে তো শশা, ঝিঙের উপর দিয়ে কেটে যায়, সেই ভাল। দ্বিতীয় হচ্ছে, পরের জিনিষ নেবার মানুষমাত্রেরই একটা স্বাভাবিক সদিচ্ছা আছে। ঐ রাত্তিরে সেই সদিচ্ছাটাকে শান্ত করবার একটা উপায় ক'রে দেওয়া হয়েছে।"

"তা মন্দ কারণ নয়। কাল রাত্তিরে কতকগুলি ছেলে শিরোমণিমশায়ের বাগানে গিয়ে ঐ সদিচ্ছাটিকে খুব শান্ত করেছে। শুন্‌লাম, তাঁর বাগানের তরীতরকারীর গাছ প্রায় সব কেটে ফেলেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ না কি আবার তাঁরই কাছে জলপড়া নিতে গিয়েছিল। তার পর কাকে শিরোমণি মশায় সন্দেহ করেছিলেন, তার মধ্যে না কি রক্ষেঠাকরুণের ভাই-পো নেড়া ছিল। রক্ষেঠাকরুণ জলপড়াটুকু আদায় ক'রে এনে গাঁ মাথায় ক'রে বেড়াচ্ছেন।"

"কিন্তু, বৌদিদি, ওঁকে রক্ষেঠাকরুণ না ব'লে রক্ষেঠাকুর বলাই ভাল। যে ওঁর মেজাজ।"

"তা বটে ! হ্যাঁ, ভাল কথা ভুলে গেছি, ঠাকুরপো ! শিরোমণি মশায়ের বাড়ী থেকে কি জন্যে তোমাকে একবার ডাক্‌তে এসেছিল। ব'লে গেছে কা'ল একবার যেতে।"

সুকুমারী কথাটা বলিয়া দেবরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখের ভাব কতখানি বদ্‌লাইল। পরে হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তারা তোমার কাছে আজকাল আর পড়ে না ?"

শরৎ অবনত মুখে থাকিলেও তাহার কান দুইটি যে ঈষৎ আরক্ত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইতেছিল। মুখ ভাল করিয়া না তুলিয়াই শরৎ বলিল—"মাঝে মাঝে কোন কোন বিষয় বুঝিয়ে দিই। তেমন নিয়ম ক'রে এখন পড়ে না।"

সুকুমারী আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না ; কিন্তু লক্ষ্য করিলেন যে, জলখাবারের অর্দ্ধেক অংশও শরৎ খাইতে পারিল না এবং জলযোগান্তে অত্যন্ত চিন্তান্বিত মুখে বেড়াইতে বাহির হইল।

শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী হইতে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া অবধি শরৎ বিমনা হইয়াছিল। কি দরকার হইতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ীর বাহির হইয়াছিল।

প্রত্যহ এই সময়ে শরৎ খেলিতে যাইত। আজ খেলিতে না যাইয়া দুই একটা রাস্তা ঘুরিয়া তাহাদের বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

তখন অপরাহ্ণ ৬টার বেশী হয় নাই, শিরোমণি ঈশানকে সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়াছিলেন। পদ্মাবতী পাড়ায় কাহাদের বাড়ী গিয়াছিলেন, তাহা তারা ঠিক বলিতে পারিল না।

হঠাৎ শরৎকে আসিতে দেখিয়া তারা বিস্মিত ও আনন্দিত হইল। তারা একটা কাগজে কি লিখিতেছিল, শরৎকে দেখিয়া তাহা মুড়িয়া রাখিল ও বসিবার জন্য একখানি কম্বল বিছাইয়া দিল।

শরৎ বলিল—"বৌদিদি বল্লেন, কি দরকারে আমাকে ডেকেছ? কি হয়েছে?"

তারা প্রথমটা কথা কহিল না; পরে বলিল, "ডাকতে পাঠানো হয় নি, কিন্তু ডাকবার দরকার ছিল।"

কি দরকার, সে কথা কিন্তু তারা বলিল না। শরৎ অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর বলিল—"তুমি যদি আজ এখন না আসতে, তোমাকে এই চিঠিখানা পাঠাতাম।"

"কি চিঠি দেখি" বলিয়া শরৎ চিঠির জন্য হাত বাড়াইল।

শরৎ আসিবার আগে তারা যে কাগজখানিতে লিখিতেছিল, সেই কাগজখানি শরতের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চিঠিতে তারা লিখিয়াছিল যে, কা'ল কোথা হইতে কে তাহাকে দেখিতে আসিবে। বার বার সে বাহিরের লোকের কাছে এমন করিয়া আর পরীক্ষা দিতে পারে না? যদি শরতের সব কথা মনে থাকে এবং তাহার প্রতি দয়া হয়, তাহা হইলে সে যেন শীঘ্র ইহার প্রতীকার করে। সব শেষে তারা অনুরোধ করিয়াছে যে, যে সময়ে তাহাকে দেখিতে আসিবে, শরৎ যেন দয়া করিয়া সে সময় উপস্থিত থাকে।

শরৎ যে তারাকে ভালবাসে ও বিবাহ করিতে চায়, তাহা তারা ও পদ্মাবতী দুই জনেই জানিতেন। কিন্তু শিরোমণি সে কথা কানে তুলিতেন না। তিনি হাসিতেন, শরতের অনেক বড়লোকের বাড়ী হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজী ছিল। কিন্তু শরতের পরীক্ষা সম্মুখে বলিয়া শরতের দাদা এ সম্বন্ধে কোন মনোযোগ দিতেন না। শরৎ তারার কাছে এই কথা বলিয়াছিল যে, দাদা ও বৌদিদিকে তাঁহার মনের কথা বলিলেই তাঁহারা রাজী হইবেন। কিন্তু মনের কথা এ পর্য্যন্ত সে দাদাকে তো বলেই নাই এমন কি, বৌদিদিকেও লজ্জায় বলিতে পারে নাই। পদ্মাবতী তখন নিজেই সুকুমারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। আজিও ঠিক এই সময়ে শরৎদের বাড়ী গিয়া সুকুমারীর সহিত এই সম্বন্ধে কথা কহিতেছিলেন। সুকুমারীকে তিনি আগেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, তাই সুকুমারী শরৎকে ইচ্ছা করিয়া তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছিল।

চিঠিখানি শেষ করিয়া শরৎ চাহিয়া দেখিল, তারা ঘরের মধ্যে নাই। পাশের ঘরে একবার উঁকি দিয়া শরৎ দেখিল, সে ঘরও শূন্য। সে ঘরটা পার হইয়া দরজার দিকের রোয়াকে আসিয়া দেখিল, তারা সেখানে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া।

শরৎ নিকটে আসিয়া বলিল—"আমার উপর রাগ করেছ?"

তারা কোন উত্তর করিল না। কিন্তু শরতের কথায় তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

তারার মনে সে সময়ে কি হইতেছিল, তাহা শরৎ সম্পূর্ণ না বুঝিলেও অন্য স্থান হইতে তারাকে দেখিতে আসিবে, ইহারই জন্য তাহার চোখে জল আসিয়াছে, ইহা অনুমান করিয়া শরৎ দুঃখিত হইয়াও একটু প্রীত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

শরৎ আর একটু নিকটে আসিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিল—"চুপ কর, তারা। কা'ল তাঁরা যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণ আমি থাকব। তোমাকে ঠিক বলছি, এর পর তোমাকে কেউ আর বিরক্ত করবে না।"

কথাগুলি বলিয়া শরৎ তারার একখানি হাত আপনার হাত দুইখানির মধ্যে তুলিয়া ধরিতে উদ্যত হইল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দরজার দুয়ার ঠেলিয়া দুইখানি লম্বা ও বলিষ্ঠ স্ত্রীহস্ত আবির্ভূত হইল ও একখানি অত্যন্ত কৌতূহলাবিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার মুখ উঁকি মারিল। মুখখানি নেড়ার পিসী ক্ষেমঙ্করীর।

ক্ষেমঙ্করী ঠিক কি ক্ষেম সাধন করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বুঝা না গেলেও কি ক্ষেম করিবেন, তাহা বুঝা কঠিন হয় নাই।

উভয়ে চকিতে সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র ক্ষেমঙ্করীর মুখ দ্বারপথ দিয়া অদৃশ্য হইল।

৫

পরদিন বেলা ১০টার সময় শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ী দুই জন আগন্তুকের আগমন হইয়াছিল। এক জনের বয়স ৪০ হইবে। অপরের বয়স ৫০-এর কিছু উপর। প্রথমোক্ত ব্যক্তির বেশের একটু পারিপাট্য ছিল। তাঁহার পরণে কালো ফিতাপাড় ফরাসডাঙ্গার ধুতি, শক্ত কফ্‌যুক্ত ছিটের কামিজের উপর কাল আলপাকার কোট, তাহার উপর জরীপাড় উড়ানি কোঁচাইয়া গলায় ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চক্‌চকে জুতা, ভদ্রলোকের বুকপকেটে ঘড়ী ও তৎসংলগ্ন তারাপ্যাটার্ণের চেন, এবং প্রত্যেক হাতে ২টি করিয়া উজ্জ্বল পালিশ করা স্বর্ণাঙ্গুরীয় শোভা পাইতেছিল। কারণে অকারণে তিনি ঘড়ী খুলিয়া দেখিতেছিলেন; তাহাতে সময় নির্দ্ধারণ করা যত না হউক, ঘড়ীটি যে সোনার, তাহা সকলকে দেখান হইতেছিল।

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের পায়ে চটিজুতা, পরণে থান, গায়ে সাদা উড়ানি, মাথায় শিখা ও শ্মশ্রুগুম্ফে ক্ষৌরকার্য্য। তাঁহার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ট্যাঁকে একটি ঢাকনিবিহীন ঘড়ী ও হাতে একটি সুদৃশ্য জারমানসিলভারের নস্যের ডিবা।

দেখিবামাত্র প্রথমটিকে পাত্র, দ্বিতীয়টিকে ঘটক বা পুরোহিত বলিয়াই মনে হয়।

শিরোমণি বেলা ৯টা হইতে ইঁহাদের আগমনের অপেক্ষায় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা আসিতেই তিনি অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানাঘরে বসাইলেন। ঈশান তামাক দিলে, তাঁহারা অস্ফুটস্বরে আপনাদের মধ্যে কি করিয়া পাত্রী দেখিতে হইবে, বোধ হয়, সেই সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময় শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিরোমণি শরৎকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু ঠিক এই সময়ে শরতের আবির্ভাব তিনি পছন্দ করিতে পারিলেন না। শরতের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হইলে বেশ হইত, এই ভাবের কথা তিনি অনেকবার শুনিয়াছেন। তাহার উপর দুইটি দুই ভাবের পাত্র একত্র হইলে, তুলনাটা সহজেই আসিয়া পড়ে। কিন্তু শরৎ আসিয়া ইঁহাদের কোথায় খাওয়ান হইবে, কি রান্না হইয়াছে, তামাক ঠিক সময়ে দেওয়া হইতেছে কি না, এই সমস্ত বিষয়ে এমন স্বাভাবিক-ভাবে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল যে, শিরোমণি অনেক-খানি তৃপ্তি ও ভরসা পাইলেন।

পাত্র ঘটকের কানে কানে একটা কি কথা বলিলে, ঘটক বলিলেন—"বাবাজীর ইচ্ছা, পাত্রীটিকে সর্ব্বাগ্রেই দেখেন। আপনি লক্ষ্মীকে নিয়ে আসুন।"

শিরোমণি কিছু উত্তর দিব'র আগেই শরৎ বলিল—"আপনারা কত কষ্ট ক'রে এসেছেন। স্নানাহার ক'রে একটু সুস্থ হোন, তার পর দেখলেই হবে।"

পাত্র তাড়াতাড়ি বলিল—"স্নান আমরা এ সব যায়গায় করছি না। আহারের জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। সে তো আছেই।"

শরৎ জিজ্ঞাসা করিল—"স্নান করবেন না কেন?"

পাত্র উত্তর করিল—"ভরসা হয় না। কলের জলে স্নান অভ্যাস। সে অভ্যাস বজায় রাখার তো উপায় নেই এখানে। শেষটা একটা দিন এসে ম্যালেরিয়া নিয়ে যাব? আমাদের কুড়ুলগাছি বাড়ী হলেও কল্‌কাতাতেই বেশীর ভাগ থাকা হয়।"

শরৎ বলিল—"তা বলেন তো জল গরম ক'রে দিই? তা হ'লে তো ম্যালেরিয়ার ভয় থাক্‌বে না?"

ঘটক বড়গোছের এক টিপ্ নস্য লইয়া তাঁহার নাসিকাগহ্বরে দিয়া বলিলেন—"উষ্ণজল শরীরের চর্ম্মের পক্ষে ক্ষতিকারক; সে জন্য তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।"

শিরোমণি আগেই তারাকে দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শরৎ তাঁহাকে বুঝাইল যে, কোন ভদ্রলোকই নিজের আহারের জন্য ব্যস্ততা দেখান না—তা সে যতই ক্ষুধা লাগুক্। কিন্তু তাহাদের ত কর্ত্তব্য আছে।

কাযেই ঘণ্টাখানেক পরে আহারের ব্যবস্থা করিয়া ভদ্রলোকদের আহ্বান করা হইল। পাত্র একটু অসন্তুষ্ট হইল। ঘটক তাঁহার উত্তরীয়ের প্রান্ত দিয়া রক্তের ধারার মত নস্যের চিহ্ন নাসারন্ধ্র হইতে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ইহাও মন্দ নহে। পূর্ণোদরে পাত্রী দেখা শুভ।"

আহারের আয়োজন পদ্মাবতীর চেষ্টায় ভালই হইয়া-ছিল। শরৎ পরিবেশন করিয়া উভয়কে খাওয়াইল। আহারান্তে উভয়ে বাহিরে আসিয়া বসিলে পাত্রীর ডাক পড়িল।

শিরোমণি শরতের সুব্যবস্থায় বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন; বলিলেন—"যাও তো বাবা, তারাকে নিয়ে এস।"

পাত্র একটু যেন অসন্তুষ্ট হইল। শরৎ তারাকে আনিতে গেল।

ক্ষণপরে শরতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নতদৃষ্টিতে তারা আসিয়া কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাঁহাদের প্রণাম করিয়া শরৎ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিল। তাহার পরণে একটি সাদাসিদা সেমিজের উপর একখানি শুভ্র মোটা কালো-পাড় সাড়ী। কোন প্রকার সাজসজ্জা ছিল না; এমন কি, চুল বাঁধা পর্য্যন্ত ছিল না।

পাত্র প্রথম ২।১ বার আড়চোখে তারার দিকে চাহিয়া তাহার পর প্রকাশ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া রহিল; সে চুপি চুপি ঘটককে কি বলায় ঘটক জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, কন্যার রংটি কি আসল! বড় উজ্জ্বল বোধ হচ্ছে যে!"

শিরোমণি বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ঘটক বলিলেন—"বাবাজী একবার গায়ের রংটি পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে চান। শাস্ত্রেই আছে, জানেন তো, নারীর দেহের কোমলত্ব, অঙ্গুলীর গঠন, গমনের ভঙ্গী সবই পরীক্ষার বিষয়।"

শিরোমণি কি বলিবেন, কিছু ঠিক করিতে পারিলেন না।

শরৎ বিরক্ত হইয়া বলিল—"সে কি কথা মশায়? দিনের বেলা চোখে দেখে বুঝ্‌তে পারলেন না? এ যেন আলু-পটল কিনতে আসার মত করছেন!"

ঘটক যেন একটু নাড়া পাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—"আলু-পটল হলেও বাজারে দেখে নিতে হয় বাপু। হাঁড়ি কিনতে গেলে, বাজিয়ে নিতে হয়। আর স্ত্রী কি তার চেয়ে কম জিনিষ হ'ল মনে কর তুমি?"

"কিন্তু এতে যে এঁদের অপমান করা হয়, তা বুঝ্‌ছেন না?"

"যদি রংটা আসল না হয়, তবেই না অপমান। নইলে আবার অপমান কিসের?"

শিরোমণি মীমাংসা করিয়া দিলেন—"না, মশায়, রং ঠিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই দেখুন।"

বলিয়া তারার দক্ষিণ হাতখানি আপনার বাম হাতের উপর লইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া তারার হাতের উপর ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া দেখাইলেন, রং হাতে উঠিয়া আসিল না।

আপনি পরীক্ষা করিতে না পারিয়া, পাত্র একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম কি?"

তারা ধীরে ধীরে বলিল—শ্রীতারা দেবী।

"শ্রী! আজকাল বুঝি শ্রীমতী উঠে গেল?"—ঘটক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শরৎ বলিল—"শ্রীর স্ত্রীলিঙ্গে তো আর শ্রীমতী হয় না যে, শ্রী মেয়েদের নাম বল্লে দোষ হবে? ও দুই-ই এক।"

ঘটক রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"তা হ'লে এত কাল পুরুষদের নামের আগে 'শ্রী' আর নারীদের নামের আগে 'শ্রীমতী' চ'লে এল কেন? তার চেয়ে সব তুলে দিয়ে ত, দ বল্লেই হয়। ত, দ অর্থাৎ তারা দেবী, কি বল?"

"তা মন্দ নয়" বলিয়া শরৎ হাসিয়া ফেলিল।

পাত্র এবার ঘটকের মারফৎ না বলিয়া স্বয়ং বলিল—"এইবার হেঁটে যাও তো দেখি।"

"তার মানে?"—শরৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"তোমার এতে কি হে, ছোক্‌রা যে, সবতাতে মানে খুঁজ্‌ছ?"—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাত্র জিজ্ঞাসা করিল।

শরৎ বলিল—"আজ্ঞে, এ কথা তো কখনও শুনিনি। আস্‌বার সময়ে তো হাঁটুনি দেখেছেন, আবার যাবার সময় দেখ্‌তে পাবেন। বলেন তো এঁকে আমি রেখে আসি, আপনারাও হাঁটুনি, দেখে নিন্‌।"

কথাগুলি বলিয়া শরৎ উঠিয়া ভিতরের দিকে পা বাড়াইতেই তারা উঠিয়া শরতের সঙ্গে ধীরপদক্ষেপে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

শরতের কথায় ও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও তারার সুন্দর মুখশ্রী, যৌবনশ্রীমণ্ডিত দেহ ও মনোহর গতি পাত্রের মনোহরণ করিয়াছিল। কিন্তু এই সুন্দরাকৃতি যুবকের সহিত শিরোমণি-পরিবারের এতখানি ঘনিষ্ঠতা তাঁহার কাছে অত্যন্ত খারাপ লাগিল।

শিরোমণিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ছোকরাটি কে মশায়—সবতাতে ওপরপড়া হয়ে কথা কয়?"

শিরোমণি বলিলেন,—"আমাদের প্রতিবেশী। ছেলেটি

বড় ভাল, এম্, এ, পড়ে। ওই তারাকে লিখাপড়া শিখিয়েছে।

"ভাল করেন নি।"—পাত্র গম্ভীর হইয়া বলিলেন। ঘটক উপদেশ দিলেন—"বিবাহের পর যেন এই রকম ঘনিষ্ঠতা করতে দেবেন না।"

পাত্রী দেখিয়া পছন্দ হইয়াছে কি না, শিরোমণি কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না দেখিয়া ঘটক নিজেই বলিলেন,—"পাত্রী আমাদের পছন্দ হয়েছে। কোন্ সময়ে আপনি বিবাহ দিতে পারেন, বলুন?"

শিরোমণি বলিলেন,—"আমার স্ত্রীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে পত্রে আপনাদের জানাব। তাঁকেও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার কি না।"

তাহার পর আর ২।১টি কথাবার্ত্তা কহিয়া ইঁহারা উঠিলেন। ঘটক বলিলেন,—"তা মেয়েটির বয়স কিছু হয়েছে, অরক্ষণীয়া বল্লেও হয়। আমাদের বাবাজী ঠিক পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হয়েছেন। বেশ মানাবে, টাকা কড়ির কথা তো আগেই বলা হয়েছে, কিছুই দরকার নেই। আমরাই মেয়েটিকে সাজিয়ে নিয়ে যাব। বাবাজীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী—"

কথাটা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পাত্রের একটা ভ্রূকুটি-পূর্ণ চাহনিতে ঘটক হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

পাত্র ও ঘটক উভয়েই উঠিয়া গেলেন।

পদ্মাবতী পাশের ঘর হইতে সব শুনিয়াছিলেন। এবার তিনি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন,—"এ পাত্রের সঙ্গে আমি মেয়ের বিয়ে দিতে দেব না।"

শিরোমণি হতাশভাবে পত্নীর পানে চাহিলেন।

৬

সেই দিন অপরাহ্ণেই হেমন্ত হঠাৎ শিরোমণির বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন; কিন্তু তাঁহার আগমনের কারণ ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

হেমন্ত কুশলপ্রশ্নের পর বলিলেন,—"শরতের বিয়ে দেবার চেষ্টায় আছি, তা আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তারাকে দয়া ক'রে শরতের হাতে দান করুন। বিয়েতে আপনার কিছু দিতে হবে না। আমার যা সঙ্গতি অবশ্যই বৌমাকে দেব।"

শিরোমণি একেবারে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! বিস্ময় একটু কমিলে তিনি দুই হাতে হেমন্তের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিলেন,—"এ তোমার অশেষ অনুগ্রহ, বাবা। শরতের মত ছেলে রাজারাজড়ারা পায় না। আমাকে তুমি কিনে রাখ্লে, বাবা!"

সে দিন সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে শরৎ অত্যন্ত প্রসন্নমুখে শিরোমণির-গৃহে আসিল। শিরোমণি ও পদ্মাবতী তখন তারার বিবাহে কি দেওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। শরৎ আজ আর লজ্জা না করিয়া বরাবর তারার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারা তখন একখানি পুস্তক হাতে করিয়া একটি ছত্রও মন দিয়া পড়িতে না পারিয়া সুধু শরতের কথাই ভাবিতেছিল; কারণ, হেমন্তের কথাবার্ত্তা সব সে শুনিয়াছিল।

তারার নিকটে বসিয়া শরৎ হাসিমুখে বলিল,—"ক্ষেমঙ্করী কিন্তু একটা ভাল কায ক'রে ফেলেছেন।"

তারার চোখে মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছিল। সে জিজ্ঞাসুভাবে শরতের দিকে চাহিল। শরৎ বলিল,—"এখান থেকে কা'ল তিনি দেখে গিয়েছিলেন, আমি তোমার হাত ধরতে গিয়েছিলাম। বৌদিদিকে গিয়ে বলেছেন, আমি তোমাকে চুমু খাচ্ছিলাম, তিনি নিজে দেখে গিয়েছেন। এর মধ্যে কিঞ্চিৎ যে সত্য ছিল, তা বৌদিদি জানতেন। তাই দাদাকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।"

হৃষ্ট কিন্তু লজ্জিত হইয়া তারা বলিল,—"দিদি তোমাকে কি বল্লেন? আমাকেই বা কি ভাবলেন?"

"আমাকে জেরা ক'রে সব কথা আদায় ক'রে নিলেন। তার পর বল্লেন,—নষ্টচন্দ্র দেখেছিলে কি না, তাই একটু অপকলঙ্ক হ'ল তোমার।"

তারা লজ্জারক্ত মুখখানি তুলিয়া একবার শরতের দিকে চাহিল।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।

ভারতে মুসলমানের স্বার্থ

কিছু দিন হইতে ভারতে একটা কু-বাতাস বহিতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে মুসলমানদের কোনরূপ স্বার্থ নাই বা থাকিতে পারে না। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভারতে মুসলমানেরা গঙ্গা ও সিন্ধুর উপত্যকাভূমির প্রতি কোন প্রকার দেশহিতৈষিতা-ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। এক কথায়, ভারতের প্রতি তাহাদের মমত্ববোধ নাই।

এক এক ব্যক্তির মত, এক একটি জাতিও সময়ে সময়ে মোহান্ধ হইয়া যায়, এবং মানসিক শক্তির বিকাশ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার অভাব নিবন্ধন ভ্রান্ত ধারণা প্রায়ই জাতিকে অন্ধকার ও ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। প্রত্যেক জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ বিধ্বস্ত জাতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মিলিবে। বর্ত্তমানে সমগ্র Indian Nation এই সংশয় ও সন্দেহে জড়িত হইয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছে। এই মোহান্ধের জন্য আমরা দুঃখিত; কারণ, ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে আমরা আরও দুঃখিত—যেহেতু, ইহা যাহাদের শক্তিতে আমাদের মাতৃভূমির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবস্থিত এবং যাহাদের উপর আমাদের গৃহের নিরাপদ নির্ভর করে, সেই জাতিদ্বয়কে পরস্পরের দৃঢ় প্রেমবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। অদ্য আমরা এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিতে প্রয়াস পাইব; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিব।

বলা বাহুল্য, ভারতের অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দু বংশধরের সন্তান হইতে উৎপন্ন *। তাই আমরা ভাবি, কেমন করিয়া ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনে তাহারা তাহাদের রক্ত ও বংশের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, এবং পিতৃমাতৃপিতামহের জন্মভূমি ও ক্রীড়াভূমির প্রতি মমতা ও ভক্তির ভাব পোষণ করে না। যদি বর্ত্তমান প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড প্রাচীন রোমান ক্যাথলিক ইংলণ্ড হইতে অল্প স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাহা হইলে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে এইরূপ করা সম্ভবপর হইত। অনেকের আবার ধারণা যে, ইসলাম ধর্ম্ম ইহার উপাসকগণকে তাহাদের জন্মস্থান—তাহাদের মাতৃভূমি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। এইরূপ ধারণা ইসলাম ধর্ম্মের পক্ষে ঘোর অপমানজনক। যে সকল সমাজ বা জাতি অসভ্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন, কেবল সেই সকল সমাজ বা জাতির মধ্যে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। আমাদের দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি আনয়নের পূর্ব্বে আমাদিগকে সম্মোহনের এই পর্দ্দা অপসারিত করিতে হইবে। বস্তুতঃ যাঁহারা ইসলামের স্বরূপ ও রস-মাধুরীর সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। পরন্তু ইসলাম-ধর্ম্ম-বিদ্বেষীরা সুমহান্ ইসলামের অঙ্গে কালিমা লেপন করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ দুর্নাম রটনা করিয়াছেন। নচেৎ ইসলাম ধর্ম্মের কুত্রাপি এইরূপ ভাব পরিলক্ষিত হইবে না। আর যাহাতে মুসলমান তাহার স্বদেশকে বিস্মৃত হইয়া বা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডকে ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে না করে, তাহার জন্য ইসলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহামানব হজরত মোহম্মদ তাঁহার অনুসরণকারীদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"হুব্বাল্ ওতন্ মানাল্ ঈমান্"—(ভাবার্থ) —"স্বদেশ-প্রেম ঈমানের (ধর্ম্মবিশ্বাস) অন্তর্গত" অর্থাৎ যে (মুসলমান) স্বদেশপ্রেমিক নহে, সে মুসলমান নহে। কাযে কাযেই এ দেশের যে সকল মুসলমান পয়গম্বর-শ্রেষ্ঠ হজরত মোহম্মদের "উম্মত" (শিষ্য) বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্বদেশ ভারতবর্ষকে কখনও ভুলিতে পারেন না; এবং ভুলিলে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন।

ভারতীয় মুসলমানগণের এক অংশ সুদূর আরব ও পারস্য হইতে এ দেশে আগমন করিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছে। ইহা কথিত হয় যে, এই মুসলমানগণ ভারতের প্রতি আকৃষ্ট নহে ও যখন ইচ্ছা এ দেশ পরিত্যাগ করিতে পারে। আমাদের জাতীয় ইতিবৃত্তে ইহা অপেক্ষা কিছু

* কোন কোন মুসলমান ইহাতে লজ্জা বোধ করেন। বস্তুতঃ ইহাতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ, ইসলাম প্রচারশীল ধর্ম্ম। —লেখক।

আশ্চর্য্য হইতে পারে না যে, সাত কোটির সমাজ তাহাদের বিষয়সম্পত্তি—জমীজমা পশ্চাতে ফেলিয়া মরসুমী পক্ষীর মত এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে। সামান্ত এক বর্গ স্থানের জন্য আমরা জাতিকে রক্তপাত করিতে দেখিয়াছি। স্বেচ্ছায় আমাদের ভারতীয় দাবী দাওয়া ত্যাগ ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে পরিণত হইবে। এই ভাব এক বিশেষ সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ ভূমণ্ডলে প্রত্যেক জাতিকে তাহার বসবাসের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং ঐ স্থানকে অন্য কোন জাতি নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে না। প্রত্যুত হিন্দুগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশতঃ আমাদের সকল যুক্তি হীন হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তাহারা যাহাকে নিজস্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাকে আমরা নিজস্বরূপে পাইতে ও বলিতে কুণ্ঠা বোধ করি।

হিন্দু যেমন ভারতকে ভালবাসে, মুসলমানেরও তেমনই ভারতকে ভালবাসিতে হইবে—ঘৃণা করিলে চলিবে না। ইহা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ভারতে হিন্দুর যে দাবী-দাওয়া আছে, মুসলমানেরও সেই দাবীদাওয়া আছে। আমাদের এই জন্ম ও পরিপুষ্টির স্থান ভারত আমাদের উভয়ের উপর সমান দাবী রাখে। আমরা উভয়েই বিজেতারূপে এ দেশে আগমন করিয়াছি; এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া এ দেশে বসবাস করিতেছি। আমরা এই-রূপ দৃষ্টান্ত মিশর ও পারস্যেও দেখিতে পাই। অগ্নি-উপাসক বা ফেরাউনের দেশে ইসলামের উদ্ভব হয় নাই। ইসলামের উৎপত্তিস্থান আরব দেশ দেশান্তরে তাহার শাখাপ্রশাখা প্রেরণ করিয়াছিল এবং তথায় তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছে। যদি মুসলমানগণ মরক্কো, গ্রীক, ত্রিপলি, মিশর ও তুরস্ক দেশকে আপনাদের জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে পারে,—যদি তথাকার মুসলমানগণ স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে—তবে আমরা—ভারতীয় মোস্‌লেম ভারত-বর্ষকে আপন জন্মভূমি বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না কেন? ভারতের মুক্তিসমরে আমরা যোগদান করিব না কেন? "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা"—ভারতবর্ষের প্রতি মুসলমানদের সে প্রেম ও অনুরাগ থাকা প্রয়োজন। তাহা যদি মুসলমানের হৃদয়ে লক্ষিত না হয়, তবে জগতের সম্মুখে ভারতীয় মুসলমানগণ নিতান্ত ঘৃণার পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন। এই স্থলে আর একটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতে মুসলমানের সংখ্যা অধিক। কি চীন, কি পারস্য, কি রুসিয়া, কি তুরস্ক, কি মিশর, এমন কি, ইসলামের জন্মস্থান আরব ভূমিতেও ভারতের ন্যায় অধিক মুসলমানের বসতি নাই। ভারতবর্ষ মুসলমানগণের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল—ভারত কিয়ৎপরিমাণে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ রাজনীতিক ও ক্ষমতাবান্ আদর্শ সম্রাটের জন্মদান করিয়াছে। ভারত মোস্‌লেম জগৎকে প্রজ্ঞানতম "মুজতাহিদ" প্রদান করি-য়াছে। এই মুজতাহিদগণের বিজ্ঞতা, পণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা পারস্য, তুরস্ক এবং আরবেও স্বীকৃত হয় এবং ইঁহাদের 'ফতোয়া' পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা, মদিনা প্রভৃতি নগরসমূহে মান্য করা হয়,—সর্ব্বত্র ইঁহাদিগকে অতিশয় ভক্তি করা হয়।

যদি ভারতে মুসলমানগণের কোন স্বার্থ না থাকে, যদি তাহারা মোস্‌লেম সাধু দরবেশ মহাত্মগণের পীঠস্থান আজ-মীর, সহরন্দ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানসমূহকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করে এবং যদি তাহারা তাহাদের পিতৃপিতামহগণের কবরগুলিকে স্নেহ ও মমত্বের দৃষ্টিতে না দেখে, তাহা হইলে এই বসুন্ধরার কোন স্থানের নিমিত্ত তাহাদের মমত্ব বোধ হইতে পারে না, তাহা হইলে স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ-হিতৈষিতার ভাব তাহা-দের হৃদয়ে বিকসিত হইতে পারে না। এরূপ হইলে পরি-শেষে তাহারা এই বিশাল পৃথিবীর সমক্ষে আসিয়া বলিতে বাধ্য হইবে যে, ইহুদীদের মত তাহারাও গৃহহীন জাতি। মোট কথা, তিনিই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন—যিনি মুসলমানের অন্তঃকরণে ভারত-বর্ষের প্রতি গভীর অনুরাগের ভাব উদ্রেক করাইয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন যে, ভারত তাহাদের জন্মভূমি—কর্ম্মভূমি—পুণ্যভূমি।

মইনউদ্দীন হোসায়েন।

বিসর্জ্জন

যেখানে আবাহন সেইখানেই বিসর্জ্জন। পূজার পরে বিসর্জ্জন রাজসিক বা তামসিক জগতের চিরপ্রথা। গৃহ-দেবতা বা তীর্থদেবতা প্রায়ই সাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত; সেবাইত নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাঁহার নিত্যপূজা সম্পাদন করিয়া থাকেন; সে শিলা বা বিগ্রহের বিসর্জ্জন নাই। কিন্তু রাজসিক বা তামসিক পূজার ধুমধামও যত বিসর্জ্জনের ধুমধাম তদপেক্ষা আরও অধিক। সাজগোজ পরাইয়া প্রতিমা পাতিয়া ধুমধামে পূজা করিলেই সে প্রতিমা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। দুর্গা-প্রতিমা তিন দিন পূজা করিয়া চতুর্থ দিনে বিসর্জ্জন দেয়। বীরাচারী শ্যামাপূজায় মধ্যরাত্রিতে প্রতিষ্ঠা, শেষ রাত্রিতে বিসর্জ্জন। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকের এক রাত্রিতেই চারি প্রহরে চারিবার পূজা ও পরদিন বিসর্জ্জন। জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণার বিসর্জ্জন এক দিন পূজার পরেই। কোথাও কোথাও বারোয়ারী প্রতিমা দশ বার দিন পর্য্যন্ত মণ্ডপে অধিষ্ঠিতা থাকেন, কিন্তু পরে সে প্রতিমাও বিসর্জ্জিতা হয়েন। সাঁতরাগাছির সেবকরা তাঁহাদের বড় জাঁকের শ্রীরামচন্দ্রের পূজা-সমারোহ তিন মাসের অধিক কাল পর্য্যন্ত বজায় রাখেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাদেরও বিসর্জ্জন আছে। বলিয়াছি যে, পূজার জাঁকের চেয়ে বিসর্জ্জনের জাঁক আরও বেশী; পূজার সময় যাঁহার অঙ্গনে দশটা ঢাক বারটা ঢোল বাজে বিসর্জ্জনের দিন তিনি রাস্তায় ঢোল ঢাক শানাইয়ের সঙ্গে এক দল মান্দ্রাজী ব্যাগপাইপ ও দুই দল্ গোরার বাজনা বাহির করেন।

দেবদেবীর প্রতিমা পূজায় বিসর্জ্জনের ন্যায় মানবপূজারও বিসর্জ্জন আছে। "মধুর মধুর ধ্বনি মুখ শতদল" ঘর আলো করার পরই মাতৃ-আরতির পঞ্চপ্রদীপ নিবিয়া যায়; পরমপূজনীয় পিতা বিসর্জ্জিত হয়েন পুত্রের অর্থোপার্জ্জনশক্তি জাগরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই; দায়োদ্ধারের পরই উপকারী স্মৃতি হইতে বিসর্জ্জিত হয়।

যে জুলিয়স্ সিজর্‌কে রোম এক দিন দেবতাজ্ঞানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পূজা করিয়াছিল, সেই রোমই আর এক দিন সেই সিজরের বক্ষে আততায়ীর ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল। নেপোলিয়ন্‌কে মণ্ডপে স্থাপনা করিয়া ফ্রান্স কি বারোয়ারী পূজার ঘটাই না করিল, আবার সেই নেপোলিয়ন্‌কেই জলে ভাসাইয়া দিল। সেদিনকার কথা – লয়েড জর্জ্জকে ঘেরিয়া ইংলণ্ডবাসী বৃটিশ এম্পায়ারের "পরিত্রাতা পরিত্রাতা" বলিয়া সোল্লাসে নৃত্য করিয়াছে, আবার দুই দিন না যাইতেই সেই ইংলণ্ড বলিল, "লয়েড জর্জ্জ জাতীয় দেবমন্দিরে ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী, গৃহের অলক্ষ্মী!"

বিগত নভেম্বর মাসের সংক্রান্তি দিবসে ১৩৩০ সাল ১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সপ্তমী তিথি অশ্লেষা নক্ষত্রে বঙ্গের রাজনীতিক বারোয়ারীর বিরাট প্রতিমা সুরেন্দ্র-নাথের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর পূজাগ্রহণান্তে বিজয়া হইয়া গিয়াছে।

আজ মনে পড়ে সেই প্রথম কল্পারম্ভ-বোধনের দিন! যে দিন তরুণ সুরেন্দ্রনাথ এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আসন হারাইয়া হ্যাটকোট পোড়াইয়া চাপকান পরিয়া অসুর-নাশন মূর্ত্তিতে "Awake! Awake!" "জাগৃহি! জাগৃহি!" বাণীর ঝঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বাঙ্গালার উঠানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; জাগ্রত-মন্ত্রের ন্যায় যে দিন সুরেন্দ্রনাথের জীমূতমন্দ্র-কণ্ঠধ্বনি যেন তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় অচেতন বঙ্গের অঙ্গে নবীন জীবনের উদ্দাম শক্তির সঞ্চার করিয়া দিল। যে সভায় সুরেন্দ্রনাথ দাঁড়াইতেন, মনে হইত, যেন সহস্র চক্ষু একটি বিস্ময়ের চিহ্নের প্রতি চাহিয়া আছে। সুরেন্দ্রনাথের যশের কিরণ দিনের পর দিন দীপ্ততর হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রথমেই বঙ্গদেশে শঙ্খঘণ্টারব হইল বটে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে বিহার, উড়িষ্যা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ, বোম্বাই, আকুমারিকা হিমালয় পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের পূজার বাজনা বাজিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে প্রবেশ করিলে প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান (W. C. Bonerjee) উমেশ বন্দ্যোপা-ও জ্যোতিঃ রবিতেজোদ্দীপ্ত নভঃস্থলস্থিত শশিকরের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল।

আজ মনে পড়ে আবার সুরেন্দ্রনাথের সেই কারাবাসের দিন। উঃ, বঙ্গদেশ যেন সে দিন ডুকুরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! গৃহস্থের অন্দরে বর্ণমালাজ্ঞানহীনা নারীরা পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল,—হাঁ, সত্য কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, আছাড়িয়া পড়িয়া কাঁদিয়াছিল যেন তাহাদের কত আপনার জনের এই অমঙ্গল ঘটনা ঘটিয়াছে; প্রাচীনারা জজ নরিস্‌কে কত অভিসম্পাতই না দিয়াছেন। মনে পড়ে, এই চক্ষুতে দেখিয়াছি, শত শত আদরে লালিত সুকুমার যুবক গ্রাজুয়েট, অণ্ডারগ্রাজুয়েট কামিজের উপর কালো ফিতা লাগাইয়া যেন শোকে মুহ্যমান হইয়া পথে পরিভ্রমণ করিয়াছে। ভক্তপ্রদত্ত ফলফুলের উপহারে সুরেন্দ্রনাথের কারাগৃহ নববিবাহিত বরবধূর ফুলশয্যার কক্ষে পরিণত হইয়াছে। আবার মনে পড়ে সেই বঙ্গভঙ্গের দিনও; সেদিন সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র বঙ্গদেশে মানসসিংহাসনে সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত। সমস্ত ভারতবর্ষ সে দিন সুরেন্দ্রের বাণী শুনিয়া বাঙ্গালী জাতিকে অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ছুরি ধরে নাই, বোমা গড়ে নাই, গুপ্ত আড্ডা সৃষ্টি করে নাই, কেবল বলিয়াছে ও লিখিয়াছে আর বজ্রগর্জ্জনে শঙ্কিত জনের ন্যায় দেশে বিদেশে ইংরাজ-হৃদয় সেই শব্দে কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মুখে যে যতই বড়াই করুক, "সুরেন্দ্রনাথটা আবার কি বলিয়া বসে, করিয়া বসে," এই ভাবনায় শঙ্কিত হয়েন নাই, সে সময়ে এমন ইংরাজ ছিলেন না; তা ক্যাবিনেটেই হউক, পার্লেমেণ্টেই হউক, ভাইসরয়ের ডায়াসে গবর্ণরের গদিতে জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সওদাগরের অফিসে চা-বাগানের বাংলায় চৌরঙ্গীর দোকানে, উদার সম্পাদকের বৈঠকে যেখানেই কেন থাকুন না।

কাল হইল নররক্তের আস্বাদ পাইয়া। প্রবাদ আছে, কোন লোক এক সময়ে একটি ব্যাঘ্রশাবককে পালন করিয়াছিল, সে ক্রমে বড় হইয়া বেশ পোষ মানিয়াছিল, ডাকিলে কাছে আসিত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত, বরাদ্দমত খাদ্য গ্রহণ করিত, হিংসাভাব তাহার মনে আদবেই ছিল না; দৈবক্রমে অপর এক জন লোক তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। তাহার পায়ে একথানি ক্ষত ছিল, ব্যাঘ্রটি সেই ক্ষত চাটিতে লাগিল, প্রভু ও আগন্তুক উভয়েই মনে করিলেন, কুকুর যেমন আদর করিয়া মানুষের গা চাটে এ-ও তাহাই করিতেছে। কিন্তু ব্যাঘ্র সেই দিন নররক্তের আস্বাদ প্রথমে গ্রহণ করিল; তখন শার্দ্দূলের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শোণিতপিপাসা জাগরিত হইয়া উঠিল, সে একলম্ফে তাহার পালনকর্ত্তাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; হুলস্থূল পড়িয়া গেল, শেষে এক জন প্রতিবেশী আসিয়া বন্দুকের গুলীতে ব্যাঘ্রটিকে বধ করায় গৃহস্থের গোল মিটিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ ছোট লাট বড় লাটের কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন জনপ্রতিনিধিরূপে; লোক বুক চাপড়াইয়া আস্ফালন করিয়া বলিয়া উঠিল, "এবার খোসামুদে রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর নয়, স্বার্থপর উকীল ব্যারিষ্টার নয়, আমাদের চ্যাম্পিয়ান আমাদের সুরেন বাঁড়ুয্যে এবার কৌন্সিলে বসিয়াছেন; গবর্ণমেণ্ট বিচঞ্চল, ধরা টলমল!" সুরেন্দ্রনাথ এমেণ্ডমেণ্টের পর এমেণ্ডমেণ্ট, অপোজিসনের পর অপোজিসন চালাইতে লাগিলেন, বাহবা, বাহবা, বাহবা! ইতোমধ্যে আবার সুরেন্দ্রনাথ সোঁদরবন বা বিলাত ঘুরিয়া আসিলেন, শুধু যে সে যা-চ্যাটা নয়, একেবারে দগ্‌দগে রাঙা টক্‌টকে বিলিতি খা; "সাহেবের" গায়ের গন্ধ, শ্বেত-করের সাদর কম্পন, আবার হ্যাটকোটের সঙ্গে জোটাজোট, পনীর পাঁউরুটি স্যাণ্ডউইচের উইচারী।

বুড়োর বোকামীই বলুন আর বাগবাজারের গাঁজাই বলুন, সঙ্গ-দোষ সঙ্গগুণ, অন্ন দোষ অন্নগুণ এ কথাগুলা ঠিক; যাহার সঙ্গে বাস করিবে, যাহার হাতের অন্ন খাইবে, তাহার প্রকৃতি দিনকতক বাদে নিজের ভিতর পাইতেই হইবে। আমরা যখন মায়ের রান্না, দিদির রান্না, পরিবারের রান্না, মেয়ের রান্না খাইয়াছি, তখন আমাদের মতিগতি কতটা পবিত্র, সৎ, সাধু ও উচ্চ ছিল, আর এখন ভ্রষ্টা পাচিকা ও নষ্টচরিত্র পৈতাগলায় বামুন-সাজা নিম্নশ্রেণীর উড়িয়ার হস্তপ্রস্তুত অন্ন উদরস্থ করিয়া আমাদের মন কত নীচু কত ছোট হইয়া যাইতেছে, তাহা একবার নির্জ্জনে মনে মনে ভাবিয়া দেখিবেন। বাপ্! ঐ শ্রেণীর উড়িয়াদিগের সঙ্গদোষে ও অন্নদোষে হাতটান হইবার ভয়েই স্বয়ং বিষ্ণু হাত দুইখানি বৈকুণ্ঠে রাখিয়া আসিয়া ঠুঁটো জগন্নাথরূপে পুরীতে বিরাজ করিতেছেন।

এ দেশের অনেক "সাহেবের" মেজাজ খারাপ হইয়া যায়, হাড়ি-কাওরার হাতের রান্না খাইয়া। কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া প্রথম যৌবনে অফিসিয়াল হইবার স্বপ্ন যে

আবার প্রৌঢ়বয়সে সুরেন্দ্রনাথের সুষুপ্তির ব্যাঘাত করে নাই, কে বলিবে? আবার সোনায় সোহাগা, সুরেন্দ্রনাথের অর্থসঞ্চয় হইতে লাগিল। কলেজ কাগজ, গঙ্গামণ্ডল বাহারবন্দ না হোক্, দুইটি মহল মন্দ নহে। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ যেন লোকের কাছ হইতে একটু তফাতে তফাতে যাইতে লাগিলেন। শ্মশানেশ্বর শিব ভাবিয়া লোক স্বহস্তে তাঁহার মাথায় বিল্বপত্র চাপাইত, অঙ্গ-স্পর্শ করিত,'বাবা' 'বাবা' বলিয়া ডাকিত; এখন যেন ময়ূরমুকুট-ধারী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া কৃতাঞ্জলি প্রণিপাত আরম্ভ করিল।

নায়কমাত্রেই তাঁহার হৃদয়ে রূপের পসরা সাজাইয়া, নানাগুণের অলঙ্কার পরাইয়া একখানি প্রিয়তমার প্রতিমা গড়িয়া রাখেন; প্রথমে যে নায়িকার 'মু'খানি' দেখিয়া তাঁহার প্রণয়কপাটের কড়ায় প্রথম 'সাড়া' পড়ে, তাহাকে তিনি কল্পনা-প্রতিমার সকল রূপ তুলিয়া মাখাইয়া মনের মত করিয়া লয়েন, কল্পনা-প্রতিমার অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া তাহার চারু অঙ্গ ভূষিত করেন, আরও কত 'অচিন দেশের' অজাপান প্রান্তরের অজানা শোভা আনিয়া 'মু'খানি' ধারিণীকে জগদ্বরেণ্যা করিবার চেষ্টা করেন।

বিবাহের পর নায়ক ভর্ত্তার পদবীতে আরোহণ করিয়া স্ত্রীরূপে নায়িকাকে গৃহে আনয়ন করেন; ক্রমে দেখেন যে, এ ত আর সে খালি 'এলোকেশ' নয়, শুধু সেই 'মধুর হাসি' নয়, এ ত আর সেই 'লজ্জায় লাল হইয়া উঠে না,' এ যে একেবারে চটে লাল! এখনও ঝড়ের মত গৃহে প্রবেশ করে বটে, কিন্তু 'থম্‌কাইয়া' ত দাঁড়াইয়া পড়ে না, স্বপ্নের প্রহেলিকার মত নহে, অথাত গন্তের গর্জ্জনে বলিয়া উঠে 'বলি তোমার মতলবটা কি বল্‌তে পার!' তখন কল্পনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, ক্রমে খুটোখুটি, খিচি-খিচি, কিচিমিচি, ঝগড়াঝাঁটি, উপোসত্রিরেশ, ঠোনাঠানা, ডিভোর্সকোর্ট।

সিবিলসার্ব্বিসচ্যুত সুরেনের কাঁচুমাচু মুখখানি দেখিয়া তাঁহাকে অন্যায় অত্যাচারের পাত্র ভাবিয়া, তাঁহার ময়ূরপুচ্ছ পরিত্যাগ দেখিয়া, তিনি সহায়হীন, ধনহীন, আশ্রয়হীন, আর তিনি রাজানুচর নহেন, আমাদেরই মত তিনি এক জন 'লোক', এই মনে করিয়া বঙ্গদেশ এক দিন প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। নায়ক যেমন নায়িকার রূপের নেশায় উন্মত্ত হয়, বঙ্গের প্রাণ এক দিন সেইরূপ সুরেন্দ্রের বক্তৃতার ভ্রান্তি পান করিয়া মাতাল হইয়া গিয়াছিল। নায়ক বঙ্গদেশ নায়িকা সুরেন্দ্রনাথকে কত কল্পিত গুণের আধার করিয়াই না তুলিয়াছিল!

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের সুরেন্দ্রে আর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সুরেন্দ্রে আমি ত বিশেষ কোন পার্থক্য দেখি না, তাই আমি যখন তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, তখন বিদ্রূপও করিয়াছি; তাঁহার বক্তৃতার উদ্দীপনাশক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছি এবং বাড়ী আসিয়া বাসি বক্তৃতা দগ্ধ করিয়া লিখিয়াছি, "দেলাও দে রাম বলে করিয়া চীৎকার, বীরত্ব বড়াই করি দুয়ারে দাতার।" সুরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান করিয়াছি বলিয়া বাহিরের লোকের কাছে বাহবা পাই নাই, কিন্তু যখনই বিদ্রূপ বা উপহাস করিয়াছি, তখন অনেকেই আমাকে ফাঁসি চড়াইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশে বিদেশে কংগ্রেসে অ-কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ যেখানে যত বক্তৃতা করিয়াছেন, সেখানেই বলিয়াছেন, সিবিল সার্ভিসে দেশীয়দের অধিক সংখ্যায় প্রবেশাধিকার দাও, বড় বড় চাকুরীতে দেশীয়দের স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, দেশীয়দের ভলাণ্টিয়ার কর, অস্ত্রশিক্ষা দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি দেলাও দে রাম বলিয়াছেন, দাতা তাঁহার আবেদনের গর্জ্জন শুনিয়া যাচকের সম্মান রাখিয়াছেন।

এমন দিন গিয়াছে যে, কলিকাতার থানায় এক জন বাঙ্গালী ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইলে আমরা যেন কি হইল মনে করিতাম, আর আজ সেই কলিকাতা পুলিসে বাঙ্গালী ডেপুটী কমিশনার এসিষ্টাণ্ট কমিশনারের ছড়াছড়ি। কলিকাতাবাসীকে মিউনিসিপ্যাল মন্দিরে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য অধিকার দিবার কথা লইয়া এক দিন শিশির ঘোষ, সুরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টকে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, আর আজ সেই কলিকাতা কর্পোরেশনে বাঙ্গালী চেয়ারম্যান, ডেপুটী চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী; ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে অতি উচ্চ আসন ছাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর সকল বিভাগেই এখন দেশীয়ের কর্তৃত্ব। শুধু কলিকাতা নহে, আজ বৃটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটীর এই অবস্থা। ডেপুটী মুন্সেফের মত বাঙ্গালী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টারের নাম আজ আর বাঙ্গালী মাত্রেরই

কর্তব্য নহে। বাঙ্গালী সৈনিক যুদ্ধ-অভিযান করিয়াছে, টেরিটোরিয়াল হইয়াছে, সৈনিক বিভাগে অফিসারির যে দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল,তাহার মাঝেও একটু ফাঁক দেখা দিয়াছে। সার্ভিস ইণ্ডিয়ানাইজ করিবার আশাতরুও ভারতের মৃত্তিকায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা-ব্রাণ্ডির মাদকতাশক্তি না থাকিলে, নেশার ঘোরে 'ডাচ্-কারেজে' বুক না বাঁধিলে কি যে বাঙ্গালী সাব-ডেপুটী হইলে পাড়ায় শাঁক বাজিয়া উঠিত, সেই বাঙ্গালী এক জন বাঙ্গালীকে লাট সাহেব হইতে দেখিয়া "ছি ছি চাকুরী নিলে, চাকুরী নিলে" বলিয়া ধিক্কার দিতে পারিত!

সুরেন্দ্রনাথ! তোমার অনেক গুণ, কিন্তু তুমি ভুলিয়া গিয়াছ যে, তোমার যৌবন চলিয়া গিয়াছে, সে ভাদ্রমাসের চলনামা ভরা গাঙে কানায় কানায় জল আর নাই, এখন বৈশাখের শেষ —চড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। তরুণীর অধরে যাহা আব্দার, বুড়ীর মুখে আবার সেই কথাই ঘ্যান-ঘ্যানানি। তাই যাহারা এক দিন কাঁধ পাতিয়া দিয়া তোমাকে বহন করিবার জন্ত ঠেলাঠেলি করিয়াছে,অশ্বত্বকে বীরত্ব জ্ঞানে তোমার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া চিঁহির পরিবর্ত্তে হুর্‌রে হুর্‌রে করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদেরই সন্তানেরা আজ তোমায় বাংলায় 'দুয়ে দুয়ো' দিল! যে বঙ্গের রমণীকুল এককালে যবনিকার অন্তরাল হইতে তোমার পূত মস্তকে শুভ্র শুভ লাজবৃষ্টি করিয়াছেন, সেই অঙ্গনারাও আজ তোমার উদ্দেশে অন্যরূপ লাজের তীব্রবৃষ্টি করিতেছেন। রাবণবিনাশের জন্ত শ্রীরামচন্দ্র নিজের নীল কমলনয়ন জগজ্জননীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর গত দুই মাসের মধ্যে তোমার কথা তুলিয়া সুরেন্দ্রনাথ, যে যুবকের মুখপানে চাহিয়াছি, মনে হইয়াছে, সে যেন তোমার বিনাশের জন্ত নিজের চক্ষু দুইটাও উপড়াইয়া ফেলিতে প্রস্তুত আছে।

এ রাগের জ্বালা, এ বিষের আগুন, এ বিদ্রোহ-বুদ্ধির তাড়না কেন? কল্পনার প্রতিমা ভাঙ্গিয়া গেলে, 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলে' কি হয় তা কি তুমি জান না, সুরেন বাবু! জন-মন আশালতা হইতে রাশি রাশি কচি কিশলয় কমনীয় কলিকা প্রস্ফুটিত কুসুম তুলিয়া তোমায় সাজাইয়াছিল, তোমার প্রবৃত্তির গতিকে নিজের মনে গঠিতপথে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, যে সকল গুণ তোমার আছে বলিয়া তুমি স্বপ্নেও অনুভব কর নাই, যে সকল গুণ সাধারণ বিষয়ী মানবের থাকা সম্ভব নয়, সেই সকল গুণ তোমাতে আরোপ করিয়া তোমায় তিলোত্তম করিয়া তুলিয়াছিল; হঠাৎ দেখিল, তুমি মানুষ বই আর কিছু নহ; তোমারও হাত পা আছে পেট আছে পিপাসা আছে, তোমারও কাম্য আছে বাসনা আছে লোভ আছে, তুমিও সাধারণ মানবের ন্যায় বংশধরের মুখপানে ব্যাকুলদৃষ্টিতে চাহিয়া থাক, তাহার জন্ত সঞ্চয়বৃদ্ধি কর; লোক-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও তুমি বৃটিশ রাজ্যের নাইটগিরিকে তৃণাদপি তুচ্ছজ্ঞান কর না। ক্যাসিয়স ব্রুটাসের চক্ষু খুলিয়া দেখাইয়াছিল যে, সিজার দেবতা নহে, মনুষ্য; টাইবারে সাঁতার দিতে দিতে সিজারেরও হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছিল, "রক্ষা কর,রক্ষা কর" বলিয়া তাঁহাকেও ডাক পাড়িতে হইয়াছিল; স্পেনে জ্বরের যাতনায় সিজারকে-ও "টিটিনিয়াস—জল জল" বলিয়া গোঁঙাইতে হইয়াছিল। আজ আবার ইংরাজ বাঙ্গালীর চক্ষু ফুটাইয়া দেখাইয়া দিল যে, তোমাদের সুরেন বাঁড়ুয্যে আমাদেরই হাতের তৈয়ারি C A T ক্যাট্ D O G ডগ্ পড়া "ব্বাবু।"

লোকের এত সাধের হন্তেলের রং রাংতার সাজ ধুইয়া খড়ছড়ি বাহির হইয়া পড়িল, তাই ত সবাই রাগিয়া উঠিল। আমরা অনেক সময়ই রাগ করি আপনার উপর আর তার ঝাল ঝাড়ি অপরের গায়। প্রত্যহ ঘরে ঝুল জমিতেছে কি না নজর করি না, তাহার পর একদিন হঠাৎ যখন দেখি, বড় বড় জটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিজের অনবধানতার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তেরেজা হইয়া দাঁড়াই চাকরের উপর;—'তোম্ কুচ্ দেখ্তা নেই, কুচ্ কর্‌তা নেই—ফাঁকি দেকে তলব লেতা, মাইনা কাটেঙ্গে' বলিয়া হিন্দি ঝাড়িতে থাকি। কেহ যখন দুই টাকার বাবু সজ্জার বিজ্ঞাপন পড়িয়া হাতী ঘোড়া আতর ল্যাবেণ্ডার শান্তিপুরে কাপড় ঢাকাই চাদর পম্প জুতার লোভে অর্ডার দিয়া ভ্যালুপেয়েবল আসিলে খুলিয়া দেখেন যে, দিব্য এক ছড়া 'অষ্টরম্ভা' আসিয়া পঁহুছিয়াছে, তখন নিজের ফাঁকি দিয়া দাঁও মারিবার লোভ ও বোকামীর জন্ত গ্লানি বোধ না করিয়া দোকানদারকেই চোর জুয়াচোর বলিয়া গালি পাড়ে। লোকও সেইরূপ নেশার ঝোঁকে সুরেন্দ্রনাথকে

দেবতা সাজাইয়া শাঁক বাজাইয়াছিল, আজ নেশা কাটিয়া গিয়াছে তাই একেবারে কুলা পিটিতেছে।

This is the penalty of greatness, সুরেন বাবু! যাকে শম্ভুবাবু এক দিন Surrender Not নাম দিয়েছিলেন, সে এক ইঞ্চি Surrender করে, এ-ও কি লোকে সহ্য করিতে পারে? এক দিন তোমার প্রাপ্য প্রাপ্ত হইয়া তুমি সাদরে সোল্লাসে গ্রহণ করিয়াছিলে; প্রাপ্যের শত শত সহস্র সহস্র গুণ লোক তোমাকে দিয়াছিল, তুমি একটি কথাও কহ নাই, একটি 'না' ও বল নাই, ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া সব আত্মসাৎ করিয়াছিলে, আর আজ লোক তোমার কত গুণ সব ভুলিয়া গিয়াছে, তুমি কত করিয়াছ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। বিষয়ী মানবের স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য তোমাতেও থাকিতে পারে তাহা মনে করিতেছে না, মনে আনিতেছে না সকলেরই আলাদা আলাদা কায আছে; তুমি গোলন্দাজ নহ অসিধারী যোদ্ধা নহ, বাহিনীর অগ্রগামী তুলনাহীন ভেরীবাদক যে তুমি তাহা মনে করিতেছে না.; সিরাজদ্দৌলার সময়ে যে মুসলমান রাজপুরুষ যেথানে যে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে, ইংরাজ ঐতিহাসিক সে সমস্তই যেমন ঐ অভাগা বালক নবাবের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, সেইরূপ এই 'রিফরম ত্রিবর্ষে' যেথানে যাহা কিছু হইয়াছে—ট্যাক্স জেল ধরপাকড় খানাতল্লাসী ব্যাধি বন্যা ঝড়—সে সব আজ তোমার পূর্ব্ব সেবাইতগণ তোমারই ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে। এ তোমায় ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতেই হইবে; এক দিন ফুলের মালার ভারে তোমার স্কন্ধ অবনত হইয়া পড়িয়া যাইত, আজ কাঁটার বোঝা মাথায় করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াও—লোক দেখুক তুমি মানুষ!

একবারও মনে করিও না, সুরেন্দ্রনাথ, তুমি একটি ছোকরা ডাক্তারের কাছে পরাস্ত হইয়াছ; বিধান রায়ও মনে মনে জানেন যে, কোথায় সুরেন বাঁড়ুয্যে আর কোথায় তিনি! তুমি পরাজিত হইয়াছ, বাঙ্গলার **ভাবের কাছে।** প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর লোক দালানটা ফাঁকা ফাঁকা দেথায় বলিয়া যেমন চৌকীর উপর একটা ঘট বসাইয়া একটা প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়, তোমার সিংহাসনের উপর বিধান রায় ডাক্তার তা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

হা রে, ভ্রষ্টবুদ্ধি আমরা! গুরুমারা বিদ্যা কত দিন চলে? ইংরাজের পলিটিক্স ইংরাজের কাছে শিখিয়া ইংরাজেরই উপর তাহার চাল চালিব এ হীন বুদ্ধি আমাদের যত দিন না যাইবে, তত দিন আমরা কখনই স্বাবলম্বনে সমর্থ হইব না। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ইংরাজ যখনই কোন নূতন দেশে প্রবেশ করে, সে একটি ষ্টেথসকোপ হাতে করিয়া আনে. রোগীর বুকের ভিতরের অবস্থা ডায়গনোস্ করিবার তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা।

প্রথমে ইংরাজ সুরেন্দ্র বাবুর পেট্রিয়টিজম্ পীড়ার ইটিওলজি অনুধাবন করিতে আরম্ভ করিল। বুঝিল যে, তাহারই নার্সিংএর দোষে পথ্যপ্রয়োগের বিশৃঙ্খলায় এ পীড়ার বৃদ্ধি হইয়াছে। আত্মম্ভরিতা অনেক সময়ে মানুষকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; তাই ইংরাজ মনে করিয়াছিল যে, সুরেন্দ্র একটা বাঙ্গালী ছোকরা, মুখস্থর জোরে নম্বর পাইয়া সিবিলসার্ব্বিসটা পাশ করিয়া আসিয়াছে, একটা খুটিনাটি ধরিয়া সরাইয়া দেওয়া যাউক তাহার পর মাষ্টারি ক্লার্কারি যাহা হউক করিয়া খাইবে এখন। ইংরাজ আপনাকে ষাঁড় বলিয়া গর্ব্ব করেন, কিন্তু সুরেন্দ্র যে মহিষাসুর তাহা ত টের পান নাই; তাহার পর সুরেন্দ্রবাবুর যখন বক্তৃতা চলিতে লাগিল, তখন ভাবিলেন, এ গ্যাসব্যাগ শীঘ্রই থালি হইয়া যাইবে, এ রকেট গোটা কত লাল নীল তারা কাটিয়াই নিবিয়া যাইবে; কিন্তু মহিষাসুরের নিধন যে সহস্র ভুজধারিণী শক্তির হস্তে তাহা হিন্দু বই ত অপরে বুঝিতে পারে না। ক্রমে ষ্টেথসকোপ বসাইয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ভিতর থেকে পদগর্ব্বের ক্রিপিটেসন একটু বেশ শুনা যাইতেছে, পারকাশান করিয়া দেখিলেন, কর্ত্তৃত্বের অভিমানে আদতে ডালসাউণ্ড নাই, আর জিব দেখিয়া বুঝিলেন যে, ধনের পিপাসা এখনও খুব তীব্র, তখন রোগ ধরা পড়িল, আর প্রেসক্রিপসন গেল মণ্টেগু-রোণাল্ডসের ডাক্তারখানায়; মিনিষ্টার বলিয়া একটা মিক্শ্চার এড্‌মিনিষ্টারড হইল, আর স্যার বলিয়া একখানা মাষ্টার্ড প্লাষ্টার বুকে বসাইয়া দিলে, পথ্যের ব্যবস্থা হইল ৬৪ হাজার বেদানার দানা। বল দেখি, ভাই ইংরাজী-পড়া বাবুরা, এ চিকিৎসার জোর এ পথ্যের প্রভাব কয় জন সামলাইতে পার? এ বেদানার দানা এলোচুলের ঢেউ চকিতচাহনির শিহরণও ভুলাইয়া দিতে পারে, তা 'জিওগ্রাফি গড' দেশ ত দেশ!

ডাকের হুড়াহুড়িতে রোগীর আকুল আহ্বানে যে দুর্গাচরণ ডাক্তারের প্রত্যহ অন্নগ্রহণেরও অবসর হইত না, বাল্যে সুরেন্দ্রনাথ সে পিতায় স্নেহসম্ভাষণ নিকটে বসিয়া কয় দিন পাইতে পারিয়াছেন? তাহার উপর পড়ার তাড়া; বড় হ'ব, বড় হ'তে হবে, ভিড়ের মাঝে আমার মাথা আধ হাত উঁচু হয়ে জেগে থাকবে, এ ভাব অতি শৈশবেই সুরেন্দ্রের প্রাণে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। যখন বাঙ্গালীর বিলাত যাওয়া একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আবার বাঙ্গালী বিলাতে গিয়া সিবিল সার্ব্বিস পাশ করিয়া আসিবে এও একটা আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার; সবেমাত্র এক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ডুমুরের ফুল একটি তুলিয়া আনিয়াছেন, তা তিনি ও বোম্বাইয়ে; তখন ব্রাহ্মণপুত্র, বৈদ্যপুত্র, কায়স্থপুত্র তিন বন্ধুতে বিলাতে সিবিল সার্ব্বিসে উত্তীর্ণ হইলেন। সুরেন্দ্রনাথের কিন্তু অদ্ভুত কোষ্ঠী, অনেক শুভগ্রহের সমাবেশ বটে, কিন্তু একটি বিঘ্নকারক শনি বরাবরই খাড়া আছেন, বেচারা যখনই মাথাটা উঁচু করিয়া তুলে তখনই কোথা হইতে একটা লোহার মুসল আসিয়া ঘাড়ে পড়ে। সিবিল সার্ব্বিস পাশ হইল ত এক বাঁশ বাহির হইল বয়স; বাঙ্গলায় মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, অনেক লেখাজোকা সই সাবুদ সাক্ষীর পর বয়সের গোল কাটিয়া গেল; দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দেখিলেন যে তিনি পিতৃহীন;—বাপেরও কত আশা, ছেলেরও কত আশা—সব ফুরাইয়া গেল! যা হউক, বড় চাকুরীর প্রথম পৈঠের সুরেন্দ্রনাথ পা দিলেন, সেখানে একখানা আমের খোসা পড়িয়াছিল দেখেন নাই, হঠাৎ পা পিছলাইয়া গেল, বাগ পেয়ে উপরের সিড়িতে যারা দাঁড়াইয়া ছিল তারা দিল একটা ঠেলা, অমনি কালা বাঙ্গালী সুরেন্দ্র আঁছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, বাঙ্গালা দেশের বুকে সেদিন বড় ব্যথাই বেজে ছিল। সেই দিন থেকে সুরেন্দ্রনাথ আর দুর্গাচরণ ডাক্তারের ছেলে রইল না—সমস্ত বাঙ্গালীকণ্ঠ স্নেহের কোমল রাগিণীতে গেয়ে উঠল, "এস আমাদের মায়ের ছেলে! এস আমাদের মায়ের ছেলে! এস আমাদের ভাই! এস আমরা তোমায় আদর করব, আমরা তোমায় ভালবাসব!" তাহার পর এই দীর্ঘ কত বৎসর বঙ্গদেশ ও সুরেন্দ্রনাথ এই দুই শব্দ যেন এক ধ্বনিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সে ধ্বনি গম্ভীরনাদে বিলাতের পার্লামেণ্টে ক্যাবিনেটে ক্লাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

বড় কষ্টেই সুরেন্দ্রনাথের এক সময় কাটিয়া গিয়াছে, পানীয়ের অভাবে ভোগের পিপাসা নিবৃত্ত না হইয়া বরং অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধিই পাইয়াছে। তাহার পর যখন কলের কাগজ করিয়া মুখে জল পড়িল, সে জল বরফ জল, তাহাতে পিপাসা আরও জাগাইয়াই তুলে। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে পিপাসিতের মুখে গরম জল দিতে বলে, তাতে তৃষ্ণা নিবারিত হয়; কিন্তু ইংরাজী চিকিৎসায় বরফ জল যে পিপাসা বৃদ্ধি করে তাহা ডাক্তাররাও জানেন। আবার যে ইংরাজ রাজ্যের উচ্চ কর্ম্মচারিরূপে কত কর্ত্তৃত্ব করিবেন কত কৃতিত্ব দেখাইবেন মনে করিয়াছিলেন, সে কামনাপ্রদীপ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, কোটি কণ্ঠের স্তুতিবাদ ও জয়ধ্বনিও প্রাণের ভিতরের সেই অস্ফুট রবকে ছাপাইয়া রাখিতে পারে নাই, তাই এই দীনহীন যেমন সখের থিয়েটার করিতে করিতে পেশাদার হইয়া পড়িয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথও তেমনই সখের মেম্বর হইতে হইতে মাহিনার মিনিষ্টার হইয়া পড়িলেন। ধীমান ইংরাজ ভাল করিয়া জানেন যে, সুরা যেমন মুখ খুলাইতে পটু, আহার্য্য তদ্রূপ মুখ বন্ধ করিবার পক্ষে ধন্বন্তরি; শ্মশানে যেমন রাজা প্রজা প্রহরী বন্দী ধনী নির্ধন বিদ্বান মূর্খ সবারই এক গতি, ক্ষুধার সময় আহার্য্য সম্মুখে পাইলে তেমনই সবাই এক। রুটি ঝোল ডিমস্থিনিস সিসিরোর-ও মুখ বন্ধ করে, নিউটন নিউম্যান, ফ্রাঙ্কলিন, ফ্যারাডে বর্ব্যাঙ্ক, এডিসন, যিনিই কেন হউন না ক্ষুধিত উদর লইয়া অন্নপাত্র কোলের সম্মুখে আসিলে অরব অনন্তচিন্ত্য তাঁহাকেও হইতে হইবে; নেশার ঝোঁকে সুরেন্দ্র বাবু বকিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ইংরাজ তাঁহার সম্মুখে মাখম মাখাইয়া এক টুকরা মফিন ফেলিয়া দিল, সেই জন্ম আজ তিন বৎসর বঙ্গদেশ সুরেন্দ্রনাথের শঙ্খ শব্দ শ্রবণ করে নাই, দুই একটা ফুৎকার যাহা মধ্যে মধ্যে কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সূর্য্যগ্রহণের সময়ের শঙ্খ রব, লোক তখন ভীত ত্রস্ত। সে রব শ্রবণে লোক হাঁড়ী ফেলিতে থাকে।

বাঙ্গালী যুবক, আজ সুরেন্দ্রনাথকে পরাস্ত করিয়াছ বলিয়া উল্লাস করিতেছ, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে, খেলোয়াড় ইংরাজ বড়ে টিপিয়া টিপিয়া তোমার দাবা

মারিয়া কিস্তি মাত করিয়াছে? বৃটিশ যুগে ব্যুরোক্রেশীর কাছে বাঙ্গালীর প্রথম পরাজয় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায়, আর দ্বিতীয় পরাজয় সুরেন্দ্রনাথের বিসর্জ্জনে!!

কেহ কেহ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কোটি কোটি লোক সুরেন্দ্রনাথের উপাসক পদে ব্রতী হইয়াছেন কিন্তু জীবনে সুরেন্দ্রনাথ এক জন ব্যতীত দ্বিতীয় বন্ধু পায়েন নাই; সে বন্ধুও নাই, এক্ষণে সুরেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বন্ধুহীন। সুরেন্দ্রনাথের সেই বন্ধু ছিলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী। সহধর্ম্মিণী বলিলে যাহা বুঝায়, সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রী ঠিক তাহাই ছিলেন, মুখটি বুজিয়া গতর ঢালিয়া দিয়া দুঃখের সময় তিনি তাঁহার সহকারিণী ছিলেন; আজীবন যেন তিনি সুরেন্দ্রনাথকে ডানায় ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি যখন সেই দেবীকে প্রথম দর্শন করি, তখন সুরেন্দ্রনাথের খুব ভাল সময়; কিন্তু তখনও তিনি রুক্ষবসনপরিধৃতা অশ্রান্তকার্য্যব্যাপৃতা। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী মেয়ের মধ্যে বাঙ্গালী মেয়ে। তিনি সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন, তাঁহার তিরোধানের পর হইতেই যেন সুরেন্দ্রনাথের যশোরবি অস্তাচলের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

হে বঙ্গের বহুদিনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথ! জনপ্রিয়তা কি জিনিষ তাহা আমিও একটু একটু জানি; খুব অভিনয় চলিতেছে, বাহবা বাহবা বাহবা! তালির উপর তালি! এমন সময় হঠাৎ একটা 'বিষম' লাগিল, আর অমনই 'হুয়ো হুয়ো' হাসির টিট্‌কারী। যখন ৭১ সালের আশ্বিনে ঝড় হয় তখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু ঝড়ের পর দিন পল্লীস্থ একটি অতি পুরাতন বট-বৃক্ষকে পথশায়ী দেখিয়া আমার বাল-চক্ষুতে জল আসিয়াছিল। মহতের পতনে আমার বুক ভাঙ্গিয়া যায়। বহুদিন পূর্ব্বে লোক তোমায় যখন জয় জয় করিয়াছে, আমি লীলাচ্ছলে তোমায় ব্যঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে দুই জনেই পরপারের নিকট-বর্ত্তী, কল্পনায় তোমায় উৎসাহপূর্ণ মুখে হতাশার ছায়া দেখিতেছি, আর চোখের পাতা জলে ভিজিয়া যাইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ! আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা হয় নাই, তাই এই দুর্দ্দশা! মিল মেকলে বার্ক খোলা আর ব্রাণ্ডী হুইস্কির কর্ক খোলা আমাদের পক্ষে দুই ই সমান। প্রবন্ধান্তরে বলিয়া গিয়াছি যে, পৃথিবীরূপ প্রাসাদের মধ্যে ভারতবর্ষটি দেবালয়; এখানে দেবতাকে ভোগ চড়াইতে হয় দরিদ্র নারায়ণের পরিতোষের জন্য, নিজের ভোগ-লালসায় আহুতি দিবার জন্য নহে। এ দেশে সিজার এলেকজেণ্ডার নেপোলিয়ন বীর নহে, এ দেশে বীর বিবেকানন্দ স্বামী, ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি। যে আপনাকে জয় না করিতে পারে, অহংকে যে না পরাস্ত করিতে পারে, সে ডজন দুই যুদ্ধজয়ের মেডেল গলায় ঝুলাইলেও এ দেশে ভোগপিপাসী লুণ্ঠনকারী বই আর কিছুই নয়। ত্যাগীই এ দেশে বিজয়ী। হিন্দু যখন কোন ত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীকে পথে দেখিবে, তখনই গাহিবে—See the conquering Hero comes! সুরেন্দ্রনাথ, যে দিন ভগবান তোমায় আহ্বান করিয়া লইবেন, সে দিন মহা প্রস্থানের পূর্ব্বে তুমি ভাবিয়া যাইতে পারিবে যে, বঙ্গদেশে আর একটা সুরেন্দ্রনাথ অনেকদিন জন্মিবে না। দোষে গুণে তুমি যাহাই হও We shall never find your like again। আর শেষে তুমি যে শিক্ষা দিয়া দিলে প্রায় ৫০ বৎসরেও সে শিক্ষা দিতে পার নাই; তোমার জীবন নাটকের শেষাঙ্ক দেখিয়া লোক শিক্ষা করিবে যে, ত্যাগমন্ত্রে সাধনা না করিলে এ পুণ্যভূমিতে কেহই নেতৃত্ব পদ গ্রহণ করিয়া স্থায়ী হইতে পারিবে না। ত্যাগ অর্থে শুধু সম্পত্তিত্যাগ নহে, আমাদের ইতিহাসে এ সচরাচর ঘটনা; ত্যাগ অর্থে কেবল পদত্যাগ উপাধিত্যাগ নহে, গীতা-গত ত্যাগশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে অহংএর ধ্বংস! কামত্যাগ ক্রোধত্যাগ লোভত্যাগ মোহত্যাগ মদত্যাগ মাৎসর্য্যত্যাগ। ভগবানের সেবা-জ্ঞানে মানবের সেবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

লক্ষ্মী *

মিষ্টার হ্যাভেল তাঁহার ভারতে আর্য্যশাসন সম্বন্ধীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বৈদিক উষাই পৌরাণিক লক্ষ্মী। বেদে অনেক স্থলে উষা সূর্য্যপ্রিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সুতরাং সূর্য্যপ্রিয়া বৈদিক উষা বিষ্ণুপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন, এ সিদ্ধান্তকে নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা বলা চলে না।

ইহা ব্যতীত আর একটি কারণ দেখান যাইতে পারে। গ্রীক-রোমীয় উষার ন্যায় বৈদিক উষারও রথ আছে। *শ্রীসূক্তে শ্রীকে 'অশ্বপূর্ব্বা' 'রথমধ্যা বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক শ্রী জলধিদুহিতা,* মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্না। গ্রীক্ উষা সমুদ্র হইতে অশ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাতগগন রঞ্জিত করিয়া আসিতেন। গ্রীক্‌দেশটি ক্ষুদ্র ও সাগরবেষ্টিত বলিয়া গ্রীক্‌গণ উষাকে এরূপভাবে কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষে ঠিক সেইরূপ সুযোগ না থাকায় উষা আকাশদুহিতা এইরূপ কল্পিত হইয়াছিলেন,—সমুদ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু একটু কষ্টকল্পনা করিলে এইরূপ একটি সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারা যায়। বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অন্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই হিসাবে উষাকেও সমুদ্রদুহিতা বলা যাইতে পারে।

আরও দুই একটি কারণে উষাকে লক্ষ্মীর আদিম রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদিক স্ত্রী-দেবতাগণের মধ্যে উষার আসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে, অথচ পৌরাণিক যুগে উষার উল্লেখ নাই, পুরাণে সে সুবর্ণকিরণ একেবারে নির্ব্বাপিত। বিষ্ণুপুরাণ-হরিবংশে অনিরুদ্ধ-উষা কাহিনীর সম্পর্কে একবার মাত্র উদয় হইয়া উষা নামটি পর্য্যন্ত পুরাণ হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছে। পুরাণে বৈদিক যুগের প্রধান প্রধান দেব-দেবীগণের অল্পাধিক পরিমাণে উল্লেখ বা প্রভাব আছে। উষা রুদ্রপত্নী রোদসীর ন্যায় নগণ্য দেবী নহেন। সেই উষা যে পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, তিনি যে লক্ষ্মীরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিলে মনে একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

অন্য কারণটি সামান্য। উষাকে বেদে বাজিনীবতী বা অন্নবতী বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীও অন্নদাত্রী; সুতরাং উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যটুকুও আছে।

তথাপি ইহা স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না যে, বৈদিক উষাই পৌরাণিক লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। ঋগ্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ ও ঐশ্বর্য্য-অর্থে 'শ্রী' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় শ্রী বলিয়া কোন দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর নিকট লোক প্রচুর শস্য অন্ন-বস্ত্র ধন-সম্পদের জন্য প্রার্থনা করে। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ প্রচুর শস্য ও পার্থিব সম্পদের জন্য পুরন্ধি ধিষণা প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। এখনকার আর্থিক অনাটনের দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা করিতে সাহস করে না। কিন্তু আর্য্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়। অনার্য্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কার্য্যে সহায়তার জন্য পুত্রের আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করিতেন এবং সেই জন্য তাঁহারা উপাস্য দেব-দেবীগণের নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থনা জানাইতেন। কুহূ ও সিনীবালীর নিকট তাঁহারা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। অথর্ব্ববেদে আছে, তাঁহারা সম্পদ ও বীরপুত্রের জন্য কুহূর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুপত্নী বলিয়া কাহারও উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদের শেষ অংশের একটি সূক্ত সুপ্রজননের জন্য বিষ্ণু ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা। বোধ হয় সেই জন্য অথর্ব্ববেদে সিনীবালীকে বিষ্ণুপত্নী বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুপত্নী শ্রী বা লক্ষ্মীর নিকট সন্তান সুপ্রসবের জন্য বা বহু সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা কেহ করে না। বৌদ্ধযুগে যক্ষিণী হারিতী সে ভার লইয়াছিলেন, আধুনিক যুগে জঙ্গলা রাক্ষসী, পাঁচু-ঠাকুর ও ষষ্ঠীদেবী তাহা লইয়াছেন। তথাপি লোক আশীর্ব্বাদ করিবার সময় 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভে'র কথা

* কোজাগর পূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত।

এখনও উল্লেখ করে। শ্রীসূক্তে দেখা যায়, প্রার্থনাকারী ধন-ধান্য গো-হস্তি-রথ-অশ্ব ও আয়ুঃ প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের জন্যও কামনা জানাইতেছেন, কারণ পুত্র-পৌত্রও ত' সম্পৎ-সৌভাগ্যের চিহ্ন।

শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে শ্রী দেবী হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বহুকেশবতী 'শ্রী'র উল্লেখ আছে। শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণু, অনুমতি, অদিতি প্রভৃতি দেব-দেবীগণের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণেও শ্রী দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন—তথায় তাঁহার ধন-সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য সবই আছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে শ্রী সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে—প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে শ্রী তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। (গ্রীক্-দেবেন্দ্র জিউসের মস্তক হইতে এথেনা দেবীর উদ্ভব ইহার সহিত তুলনীয়।) শ্রী দীপ্তিমান্ অবয়বে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিলেন। সেই শোভাময়ী আলোর প্রতিমা দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে নিধন করিয়া তাঁহার শোভা-সম্পদ্ কাড়িয়া লইবেন। প্রজাপতি দেবগণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "শ্রী স্ত্রীলোক, লোকে স্ত্রীহত্যা করে না।" প্রজাপতি শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। অগ্নি তাঁহার অন্ন লইলেন, সোম তাঁহার রাজ্য, বরুণ তাঁহার সাম্রাজ্য, মিত্র তাঁহার ক্ষত্র, ইন্দ্র তাঁহার বল, বৃহস্পতি তাঁহার ব্রহ্মতেজ, সবিতৃ তাঁহার রাষ্ট্র, পূষা তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সরস্বতী তাঁহার পুষ্টি এবং ত্বষ্টৃ তাঁহার রূপ সকল লইলেন। পরে শ্রী প্রজাপতির পরামর্শে যজ্ঞ করিয়া ঐ সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারা যাহা যাহা লইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া সব শ্রীকে একে একে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীসূক্ত শ্রী দেবীর উদ্দেশে রচিত। ঠিক বৈদিক যুগে ইহা রচিত না হইতে পারে, কিন্তু সেই জন্য ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে চলিবে না. কারণ বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বা সূক্ত-প্রণেত্রীগণের নামের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। পৌরাণিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে শ্রী প্রধান দেবীগণের মধ্যে পরিগণিতা। পৌরাণিক বৃত্তান্ত-অনুসারে সমুদ্রমন্থন হইতে শ্রীর উৎপত্তি। (গ্রীকদিগের প্রেমসৌন্দর্য্যের দেবী এফ্রোডাইটিও ('Aphrodite) সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্না।) মহাভারতে আছে, মন্থনকালে শ্বেতপদ্মাসীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে বারুণীর নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীর নাম নাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, শ্রী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা এবং ধর্ম্মের পত্নী। তাহার পর যখন রুষ্ট দুর্ব্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন. দেবগণ দানবহস্তে পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবগণ পুনরায় শ্রীকে পাইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা আছে, তাহা বাস্তবিকই কবিত্বময়। ব্রত-পাপ-প্রায়শ্চিত্ত-শাস্তি-বর্ণনা, মুনিঋষি দেবতা প্রজাপতি রাজা মহারাজের সন্তানসন্ততির নাম ও কার্য্যকলাপ বর্ণনা ও ভৌগোলিক গোলকধাঁধা-রচনার মধ্যে প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি-প্রকাশের সুযোগ অতি অল্পই থাকে। লক্ষ্মীর উৎপত্তি-বর্ণনায় পুরাণকার প্রকৃত কবিত্বশক্তি-প্রকাশের যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহার পুরামাত্রায় সদ্ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। 'তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত ফণা লক্ষ শত অবনত করিয়া' দেবীর পদতল চুম্বন করিতেছে, এরূপ বর্ণনা না থাকিলেও যাহা আছে, তাহা সুন্দর। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ধন্বন্তরির পর স্ফুরৎকান্তিমতী বিকসিত কমলে স্থিতা পঙ্কজহস্তা শ্রীদেবী সাগর হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা আদি নদী তাঁহার স্নানার্থ জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজ সকল হেমপাত্রস্থিত বিমল জল লইয়া সর্ব্বলোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ-সাগর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অম্লান-পঙ্কজমালা প্রদান করিল। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। দেবী স্নাতা, ভূষণভূষিতা ও দিব্য-মাল্যাম্বরধরা হইয়া সর্ব্বদেবসমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আরও কবিত্বময় এবং আরও বিস্তারিত। কান্তিপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া দেবী বিদ্যুন্মালার ন্যায় আবির্ভূতা হইলেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে

অদ্ভুত আসন আনিয়া দিলেন, শ্রেষ্ঠ নদীগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া হেমকুম্ভে পবিত্র জল দিল। ভূমিদেবী অভিষেচন-উপযোগী ওষধি সকল, গোগণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত মধুমাসের উৎপন্ন উপহাররাজি প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বকণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলপাঠ, নটীগণের নৃত্যগীত, মেঘের তুমুলনিস্বনে বাদ্যযন্ত্র বাদন, দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক পূর্ণকলস হইতে জলবর্ষণ ও দ্বিজগণ কর্ত্তৃক সূক্তবাক্য উচ্চারণ এই সকলের মধ্যে ঋষিগণ দেবীর অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর দেবীর সজ্জা। সমুদ্র পীত কৌশেয়বাস, বরুণ মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জরিত কুসুমদাম, বিশ্বকর্ম্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডল দিলেন। তাহার পর ভ্রমরগুঞ্জিত মালা লইয়া নূপুরশিঞ্জিত চরণে হেমলতার ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেবী নারায়ণের গলে সেই মাল্য প্রদান করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে লজ্জাবিভাসিত স্মিতবিস্ফারিত লোচনে তাঁহার বক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকে এইরূপ মানবী-সুলভ স্মিত সলজ্জ বধূভাব প্রদান করিয়া পুরাণকার দেবীচরিত্র সাধারণ মানব-মানবীর নিকট প্রীতিকর করিয়াছেন। দেবগণ ও অন্যান্য সকলে যে নানা দ্রব্য শ্রীকে উপহার দিলেন, এই বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণের বিবরণের শেষ অংশ অবলম্বনে রচিত হইতে যে না পারে, তাহা নহে, কিন্তু সম্ভবতঃ ইহা শুধু লক্ষ্মীর গৌরব ও মাহাত্ম্য-প্রকাশ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখা যায়, পূর্ব্বে দেবতারা চণ্ডীকে আপন আপন অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্র দিয়াছিলেন; এখানেও অনেকটা সেই প্রকার অনুষ্ঠান। স্বর্গের দেবতা 'নদীরূপমালাধৃত' ধরিত্রী, পৃথিবীর মুনিঋষি, প্রকৃতির অনুচর, পাতালের নাগগণ সকলেই লক্ষ্মীকে উপহার দিতেছেন—যেন মহাগরীয়সী মহারাণীর পদতলে দেশবিদেশের উপহার-সম্ভার আসিয়া একত্র হইতেছে!

তাহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লক্ষ্মীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, দেবী যেন কোন বঙ্গগৃহস্থের কুলবধূ। তিনি নারায়ণের পত্নী—গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার সপত্নী। পুরাণকার সপত্নীগণের কলহ ও তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর অবিচল শান্তভাব যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিলে মনে হয়, যেন কোন বাঙ্গালী লেখক বাঙ্গালারই একটি গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার গৃহলক্ষ্মীগণকে সপত্নীর জ্বালা এখন আর ততটা সহ্য করিতে হয় না বটে, কিন্তু গৃহে অন্য বধূ বা নারীর অভাব এবং কলহের অভাব এখনও ঘটে নাই। সেই হিসাবে লক্ষ্মীচরিত্র আদর্শ বধূচরিত্র। কলহ-রতা দুই সপত্নীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের কলহ শান্তি করিতে গিয়া লক্ষ্মী বিনাদোষে সরস্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মী কাহাকেও অভিশাপ দিলেন না, তাঁহার সপত্নীযুগল পরস্পরকে শাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপের কাণ্ড শেষ হইলে পর নারায়ণ লক্ষ্মীর উপর সুবিচার করিয়া গঙ্গাকে শিবের নিকট এবং সরস্বতীকে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লক্ষ্মী লক্ষ্মী, তিনি স্বামীকে সপত্নীদ্বয়ের উপর প্রসন্ন হইবার জন্য অনুনয় করিলেন। গুণমুগ্ধ স্বামী তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগের লক্ষ্মী-চরিত্রের তুলনা নাই। এক বালিকা উমা-চরিত্রের তুলনা ইহার সহিত দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু পার্ব্বতী যখন শিবানী হইলেন, দেবগণের উপকারের জন্য আপনার অসীম ঐশী শক্তি অসুরদলনে নিয়োজিত করিলেন, তখন তাঁহার চরিত্রের কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মী নামের সহিত এমনি শান্তমধুর ভাব জড়িত যে, স্থিরা ধীরা কন্যার সহিত (এমন কি, শান্ত শিষ্ট ছেলের সহিত!) লক্ষ্মীর তুলনা লোকে এখনও দিয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকের যতগুলি মধুর নাম আছে, লক্ষ্মী, কমলা ও ইন্দিরা তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য। এ নামত্রয় ব্যতীত লক্ষ্মীর অন্যান্য নামগুলিরও অল্পবিস্তর প্রচলন আছে—রমা, পদ্মা, বিষ্ণুপ্রিয়া ইত্যাদি। তবে লক্ষ্মীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাম শ্রীর প্রচার নাই। অনেক সময় কাব্য-উপন্যাস নামপ্রচারে সহায়তা করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'শ্রী' চরিত্রহিসাবে অতুলনীয় হইলেও আপনার নাম-প্রচারে এখনও উদাসীন রহিয়াছে।

পুরাণকারগণ দুঃসাহসী। কিন্তু তাঁহারা শিবানী-চরিত্রের উগ্রতা-দর্শনে সে চরিত্র কোথাও হীন প্রতিপন্ন করিতে সাহস করেন নাই। কিন্তু লক্ষ্মীর স্বাভাবিক নম্রতার জন্য তাঁহাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে দেবীভাগবতের গ্রাম্যিকর বৃত্তান্ত। লক্ষ্মীর ভ্রাতা উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ

করিয়া যখন সূর্য্যপুত্র রেবন্ত আসিতেছিলেন, তখন অশ্ব ও অশ্বারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিতে লক্ষ্মী নারায়ণ কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মীকে অশ্বীরূপ ধারণ করিতে হইল। তাহার পর অশ্বরূপী বিষ্ণুর ঔরসে তাঁহার পুত্র হয়। অশ্বরূপধারণের কাহিনীটি বৈদিক সূর্য্য-সরণ্যূ বা পৌরাণিক সূর্য্য-সংজ্ঞার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক সূর্য্য ও বৈদিক বিষ্ণু একই দেবতা,এ কথা প্রবন্ধের আরম্ভেই বলা হইয়াছে। পুরাণের যুগেও বিষ্ণু ও সূর্য্য উভয়েই আদিত্য। সুতরাং দেবী-ভাগবতের কাহিনীটি রচনা করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তাহার পর মহাদেব যে লক্ষ্মীর শাপমোচন করিলেন, তাহা দ্বারা শিবের ক্ষমতাপ্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। দেবীভাগবতকে একখানি শাক্ত ও সেই হিসাবে শৈব পুরাণ বলা যাইতে পারে। শৈব পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য দেখাইবার চেষ্টা যে সমগ্র কাহিনীটি রচনার কারণ, ইহাও বলা যাইতে পারে।

কোন্ কোন্ স্থলে মানব কি কি অনুষ্ঠান করিলে শ্রী তাহার গৃহে অধিষ্ঠান করেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লক্ষ্মীবাসব-সংবাদে আছে। সিরি-কালকন্নী জাতকে সিরি (শ্রী)ও প্রায় তাহাই বলিতেছেন। বৌদ্ধযুগে সিরি বা সিরিমা দেবতা একটি উপাস্য দেবী। সিরি-কালকন্নী জাতকে সিরি উত্তরদিক্‌পাল ধৃতরাষ্ট্রের দুহিতা; পশ্চিমদিক্‌পাল বিরূপাক্ষের দুহিতা কালকন্নী। কালকন্নীকে কথাবার্ত্তায় আমাদের অলক্ষ্মী বলিয়া মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, যেখানে পরনিন্দা, মূর্খতা, ঘৃণা সেইখানেই কালকন্নী বা অলক্ষ্মী। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের এক স্থলে কালকন্নী ও অলক্ষ্মীর একত্রে উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে আছে, সমুদ্রমন্থনকালে অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর লক্ষ্মীর উদ্ভব হব। অলক্ষ্মী বৈদিক নির্ঋতির পৌরাণিক রূপান্তর।

আমাদের দেশে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা হয়। এতদ্ব্যতীত আশ্বিন মাসে পূর্ণিমায় কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হয়। শ্যামাপূজার দিন অমাবস্যায় কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে এবং ঐ দিন কোন কোন গৃহস্থের বাড়ী প্রথমে অলক্ষ্মীর পূজা হইলে পরে অলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া লক্ষ্মীপূজা হয়।

শারদীয়া পূর্ণিমাতে যে লক্ষ্মীপূজা হয়—যাহার প্রচলিত নাম কোজাগর লক্ষ্মীপূজা—তাহা এখনও হিন্দুর নিকট একটি প্রধান পর্ব্ব। পূজনীয় স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এই তিথির করণীয় কার্য্যের বিধান দিয়া গিয়াছেন। কোজাগর পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতস্থিত ইন্দ্রের পূজা এবং সকলে সুগন্ধ ও সুবেশ ধারণ করিয়া অক্ষক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে; কারণ, নিশীথে বরদা লক্ষ্মী বলেন, "কে জাগরিত আছে? যে জাগরিত থাকিয়া অক্ষক্রীড়া করে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান করি। নারিকেল ও চিপিটকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিবে এবং বন্ধুগণের সহিত উহা ভোজন করিবে।" যে নারিকেলের জলপান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিশি অতিবাহিত করে, লক্ষ্মী তাহাকে ধন দান করিয়া থাকেন।

আশ্বিন-পূর্ণিমায় এই কোজাগর লক্ষ্মীপূজা একটি বহু প্রাচীন উৎসবের সহিত জড়িত। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শরৎকালে শস্য কর্ত্তন হইলে সীতা-যজ্ঞ হইত এবং তাহাতে সীতা এবং ইন্দ্র আহূত হইতেন। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে এই স্থানে সীতাকে ইন্দ্রপত্নী বলা হইয়াছে, কারণ, সীতা লাঙ্গলপদ্ধতি-রূপিণী শস্য-উৎপাদয়িত্রী ভূমিদেবী, ইন্দ্র বৃষ্টি-জল-প্রদানকারী কৃষিকার্য্যের সুবিধাদাতা দেব। পূর্ব্বে সীতা-যজ্ঞে ইন্দ্র আহূত হইতেন বলিয়া তিথিতত্ত্বে কোজাগর পূর্ণিমায় ইন্দ্রের পূজার বিধি আছে। লক্ষ্মী যে সীতার রূপান্তর, তাহা রামায়ণাদি গ্রন্থে বার বার বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও লক্ষ্মীর যে মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর হস্তে ধান্যমঞ্জরী। তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হস্তে শালিধান্যের মঞ্জরী। এখনও লক্ষ্মীপূজার সময় কাঠায় ভরিয়া নবীন ধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীসূক্তে লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণা, আবার পদ্মবর্ণা বলিয়া বর্ণিতা। তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর ধ্যানে দেবী বালার্কদ্যুতি, সিন্দূরারুণকান্তি, সৌদামিনীসন্নিভা। তিনি নানালঙ্কারভূষিতা। তিথিতত্ত্বে আদিত্যপুরাণ হইতে লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাঁহার হস্তসংখ্যা এবং হস্তে তিনি কি কি ধারণ করিয়া থাকিবেন, এই দুইটি বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও দ্বিহস্তা, কোথাও বা চতুর্হস্তা, কোথাও বা তিনি ষড়্‌ভুজা বা অষ্টভুজা। আবার

এক স্থানে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজারূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই মহালক্ষ্মী মহাকালীমূর্ত্তির অন্তরূপ বিকাশ। কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজায় যে বলিদানের বিধি আছে, তাহা বোধ হয় এই মহালক্ষ্মীর পূজা।

তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত আদিত্যপুরাণ অনুসারে লক্ষ্মীর হস্তে পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশ। লক্ষ্মীর প্রত্যেক মূর্ত্তিকল্পনাতেই হস্তে পদ্ম থাকে। কোন কোন মূর্ত্তিতে হস্তে বসুপাত্র (রত্নপূর্ণ পাত্র) স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ (লেবু) থাকে। কমলার হস্তধৃত লেবুই কমলালেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর হস্তে যথাক্রমে অক্ষ, স্রক্, পরশু, গদা, কুলিশ, পদ্ম, ধনুঃ, কুণ্ডিকা (কমণ্ডলু) দণ্ড, শক্তি, অসি, চর্ম্ম, জলজ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন (চক্র)। শুক্রনীতিসার অনুসারে লক্ষ্মীর এক হস্তে বীণা, দুইটি হস্তে বর এবং অভয়মুদ্রা থাকিবে। তথায় আর একটি হস্তে লুঙ্গ ফলেরও উল্লেখ আছে। লুঙ্গফল সম্ভবতঃ মাতুলুঙ্গ। মূর্ত্তিবিশেষে দেবীর এক হস্তে শ্রীফল থাকিবে, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীফল সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে যে, একদা শিবপূজাকালে একটি পদ্মের অভাব ঘটায় লক্ষ্মী মুকুলিত পদ্মসদৃশ আপনার একটি স্তন কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাদেবের বরে তাহাই বিল্ব বা শ্রীফল হয়। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মীমূর্ত্তির হস্তে পদ্ম ও শ্রীফল। এইটি গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, দুইটি হস্তী দেবীর উপর জলবর্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণুমূর্ত্তিসহ যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয়' নামক পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, বাসুদেব, ত্রৈলোক্যমোহন, নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে লক্ষ্মীমূর্ত্তিও আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণমূর্ত্তিতে দেবী নারায়ণের বাম অঙ্কের উপর উপবিষ্ট এবং কোন কোন স্থলে তাঁহারা হস্ত দ্বারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায়, লক্ষ্মী বরাহরূপধারী বিষ্ণুর পদতলে উপবিষ্টা থাকেন। অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্ত্তিতে বিষ্ণু নাগের উপর শয়ান এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। অগ্নিপুরাণের হরিশঙ্কর মূর্ত্তিতে নারায়ণ জলশায়ী অবস্থায় বামপার্শ্বে শয়ান। ইঁহার শরীরের এক অংশ রুদ্র (মহাদেব) মূর্ত্তি এবং অপর অংশ কেশব (বিষ্ণু) মূর্ত্তির লক্ষণযুক্ত এবং মূর্ত্তিটি গৌরী ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিসমন্বিত। ভারতবর্ষে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহাদিগের উপাস্য দেব-দেবীগণের মধ্যে ঐক্য-সম্পাদনের চেষ্টা ছিল। সেই চেষ্টার ফলে হরিশঙ্কর মূর্ত্তি ও মহালক্ষ্মী-মহাকালী-মহাসরস্বতীমূর্ত্তি।

চিত্রে লক্ষ্মীর বাহন পেচক দেখা যায়। ইহার কারণ ঠিক বলা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে দেবগণের যে বাহন, তাঁহাদের শক্তিরূপিণী দেবীগণেরও সেই বাহন, সুতরাং বৈষ্ণবীর বাহন গরুড়। সেই হিসাবে লক্ষ্মীর বাহন গরুড় হওয়া উচিত ছিল। পেচককে গরুড়ের স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই বোধ হয়। এথেন্সের পুরলক্ষ্মী বা রক্ষয়িত্রী এথেনা দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক।

দেবী-ভাগবতে আছে যে, লক্ষ্মী নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্বর্গধামে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী, এই লক্ষ্মীর অভাবে ইন্দ্র শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রাজভবনে তিনি রাজলক্ষ্মী – এই জন্যই পরমভাগবত গুপ্তরাজগণ মুদ্রায় লক্ষ্মী-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আর মর্ত্ত্যলোকে তিনি গৃহলক্ষ্মী—এই মূর্ত্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ করিতেছেন। স্বর্গের দেবীগণের মধ্যে লক্ষ্মীর তুলনা নাই। পৃথিবীর নারীগণের মধ্যে ভারতের গৃহলক্ষ্মীগণেরও তুলনা নাই।

শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণলালকে রাজা আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,"আপনি রাজি তা হ'লে।"

উত্তর হইল, "আপনি—আপনি—এই তুমি—বাবা যা বল্‌বে, তাতেই রাজি আমি।"

"না, তা নয়, আপনি নিজে বিবেচনা ক'রে বলুন;—আর সময় বেশী নেই।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজি বই কি?"

এই সময় শ্যামাচরণ আসিয়া বলিলেন,"সব প্রস্তুত, কিন্তু পুরোহিত এখনও এসে পৌঁছেন নি! ভটুপল্লী থেকে তাঁর আস্‌তে সম্ভবতঃ রাত হয়ে পড়বে; ১০টার আগে তিনি এখানে এসে পৌঁছতে পার্‌বেন ব'লে ত মনে হয় না।"

"কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করার সময় নেই ত আমার। সাড়ে আটটার সময় ট্রেণ ছাড়ে—না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখনি ত সাতটা বাজে। তা হ'লে আমিই পৌরোহিত্য করব। তুমি সকলকে সঙ্গে ক'রে দালানে নিয়ে এস—আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।"

বিচিত্র স্তম্ভাবলী-সুশোভিত মর্ম্মর প্রস্তরময় ঠাকুর-দালান বিদ্যুতালোকে সমুজ্জ্বল। সম্মুখে উচ্চ বেদীর ভিতরদিকে কারুকার্য্যক্ষোদিত অন্তঃপ্রবিষ্ট ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্রীসাদপুরের রাজবিগ্রহ শ্যামসুন্দর এবং রাধারাণী বিরাজিত। তন্নিম্নে গালিচার উপর সম্প্রদানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বর-কন্যার আসন, পিতা ও পুরোহিতের আসন,—ফুলমাল্যশোভিত সাক্ষিরূপ সাকার ভগবান্—শালগ্রাম-শিলা, এবং আশেপাশে মাল্যচন্দনের থালা—বসন-ভূষণের থালা প্রভৃতি সমস্তই যথানিয়মে রক্ষিত।

ঠাকুরদালানে যে সাজসজ্জার ধুম পড়িয়া গিয়াছে, তাহা অনাদি জানিত না। এখানে আসিয়া প্রথমে সে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিল—কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল, যাত্রার পূর্ব্বে দেব-বন্দনার জন্য বুঝি এ আয়োজন। হাসিও মনে মনে তাহাই ভাবিয়া লইল। কিন্তু তাহারা বেশীক্ষণ ভাবিবার অবসরও পাইল না। রাজার ইঙ্গিতে শ্যামাচরণ অনাদির হাত ধরিয়া বরের আসনে বসাইয়া দিলেন—রাজকন্যার হস্তে চালিত হইয়া হাসিও যন্ত্রবৎ কন্যার আসনে বসিল। জ্যোতির্ম্ময়ীকে রাজা ইতঃপূর্ব্বেই তাঁহার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। রাজার সহিত যে হাসির আর বিবাহ হইতে পারে না—ইহা তিনি এখন মনে মনে বুঝিয়া এ সম্বন্ধে পিতার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্বপ্নের মতন বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণলাল সংক্ষেপে জামাতৃবরণ করিয়া সম্প্রদান আরম্ভ করিলেন, অতুলেশ্বর সংক্ষেপে মন্ত্রপাঠ করাইয়া পৌরোহিত্য কার্য্য শেষ করিলেন। মন্ত্রপাঠ হইয়া গেলে—শ্যামাচরণ তাহাদের উভয়ের মাথার উপর বস্ত্র ফেলিয়া শুভদৃষ্টি করিতে বলিলেন; এই অসম্ভাবিত কাণ্ডে এমন অসময়েও শুভদৃষ্টির সময় হাসির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; অনাদি বিস্মিত বালকের ন্যায় মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল। উভয়ে নয়নে নয়ন সম্মিলিত করিয়া ভাবিল—মনের অগোচরে এই মিলনের জন্যই তাহারা বুঝি এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল।

শুভদৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে রাজা এক বাক্স বহুমূল্য রত্নালঙ্কার কন্যাকে উপহার প্রদান করিলেন। তন্মধ্য হইতে হীরকের সপ্তলহর বাহির করিয়া অনাদির হাতে দিয়া রাজা বলিলেন, "কন্যাকে পরাইয়া দাও।"

কণ্ঠহার পরিয়া হাসি প্রথমে পতিকে প্রণাম করিল। পরে রাজাকে প্রণাম করিল। রাজা মস্তকে হস্তদান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"স্বামি-কুলে ধ্রুব রহিয়া সুখী হও বৎসে।"

রাজার হৃদয়-মহত্ত্ব তখন হাসির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল কি ?

এইরূপে শুভ বিবাহপর্ব্ব সমাধা করিয়া কৃষ্ণলালকে রাজা কহিলেন—"এখন ইহাদের লইয়া আপনি বাড়ী যান মুখুয্যে মশায়। আপনার বাড়ীতেই কা'ল যথারীতি কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান করবেন।" অনাদি ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—"না—আমি আজ আপনার সঙ্গে যাব, রাজাবাহাদুর। সেখান থেকে ফিরে এসে যা হবার হবে।"

রাজা গম্ভীর আদেশে বলিলেন—"না অনাদি—আমার সঙ্গে আজ তোমার যাওয়া হইতে পারে না। কুশণ্ডিকা না হ'লে ব্রাহ্মণের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। আজ যাও তোমরা। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে তখন বরকন্যা উভয়ে মিলেই প্রসাদপুরে যেতে পারবে। রাণী তোমাদের সঙ্গী পেলে খুসীই হবেন।"

এই কথায় সকলের আসন্ন বিপদের কথা মনে জাগিয়া উঠিল—অনাদি আর কোন কথা কহিতে সাহস না করিয়া রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক রাজকন্যার দিকে একবার সজল বিষণ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া গ্রন্থিবন্ধনযুক্ত কন্যার সহিত চলিয়া গেল। বর-কন্যাকে বিদায় করিয়া রাজা লঘুচিত্তে তখন পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

শ্যামাচরণ রাজকন্যাকে লইয়া সেই রাত্রিতেই ট্রেণের অন্য কমপার্টমেণ্টে উঠিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

* * * * * *

* * * * * * * * * * *

বর-কন্যার মোটরে আর কেহ ছিল না। কৃষ্ণলাল অন্য মোটরে তাহাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন।

মোটরে উঠিবার সময় অনাদি গায়ের গ্রন্থিবাঁধা চাদরখানা পদতলে লুটাইয়া দিয়া অভ্যাস বশতঃ গাড়ীর সম্মুখের সিটেই বসিয়া পড়িল। বিবাহ ব্যাপারটা ঠিক সত্য বলিয়া এখনও তাহার মনে বেশ আঁটিয়া বসিতেছিল না। মোটরের গতির সঙ্গে সঙ্গে অনাদির চিত্তও যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল। গাড়ী ময়দানের পাশ দিয়া চলিতেছিল—হাসি বাতায়নপথে বহির্দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সহসা ডাকিল—"অনাদিদা," অনাদির ঘুমঘোর হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল; উৎসুক দৃষ্টিতে সে হাসির দিকে চাহিল। হাসি আবার বলিল,—অনাদি-দা—মোটরের ঢাকাটা খুলে দিতে বল না,—এখন আর মেঘ নেই, বেশ তারা ফুটেছে।" অনাদি বলিল,—কিন্তু শীত আছে ত!" বলিয়া সে এতক্ষণে হাসির পার্শ্বদেশ অধিকার করিয়া বসিল। হাসি একটু সরিয়া যাইতেই সেও ঘেঁসিয়া বসিয়া কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল—"আমি বুঝি এখনো তোমার অনাদি-দা ?"

হাসি বলিল,—"নয় ত কি ?"

"তোমার স্বামী মহাশয় গো—পতি মহাশয়। এই সংজ্ঞার্থে যত কিছু শিষ্ট বা অশিষ্ট প্রয়োগ আছে যথা—'উনি'—'তিনি' 'ও' 'সে' ইত্যাদি সব সম্বোধনেই আজ থেকে তুমি অধিকার পেলে, কিন্তু ভুলেও আর অনাদি-দা বল্‌তে পার্‌বে না।"

হাসি হাসিয়া বলিল, —"না, কক্ষণো না, আমি তোমাকে ওসব কিছু বলতে পারব না—।"

"পারবে না বই কি—?" বলিয়া সে হাসির মুখ ধরিয়া স্বামীর অধিকারটুকু তাহার অধরে মুদ্রিত করিয়া দিল,—হাসি সবলে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—"এমন দুষ্টু !"

সংসারে হাসি-কান্না এমনই পাশাপাশিই চলে !

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ওষ্ঠাধর আকর্ণ বিস্তার পূর্ব্বক সুজন রায় খন্‌খনে হাসি হাসিলেন। হিংসা-পরিতৃপ্তির কি মহানন্দ! যে ভাগ্যবান্, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এই সুখ লাভ করে! অতুলেশ্বরকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে পুলিস কলিকাতায় গিয়াছে; হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি লাগাইয়া খুনী নারকীর মত তাঁহাকে যখন আদালতের কাঠগড়ায় আনিয়া দাঁড় করাইবে, তখন? সেই অপরিমিত সুখ—ওরে মন, সইতে পারবি ত তুই? বাছার আমার সেই গর্ব্বদীপ্ত চাঁদপানা মুখখানায় রাহুগ্রাসে অমাবস্যার আঁধি লাগিয়ে দিয়েছে! পূর্ণ গ্রহণ রে পূর্ণ গ্রহণ! দেখবামাত্র মন রে, তোর জীবনের সমস্ত পাপ, তাপ, জ্বালা মুহূর্ত্তে খণ্ডিত হয়ে যাবে! ওঃ, সে কি পরমানন্দ! বল রে মন, জয় জয় সুজন রায়ের জয়!

শয়ন-গৃহের পার্শ্বের যে কুঠুরীতে গাদি গাদি রসীদপত্র চারি দেয়াল আচ্ছন্ন করিয়া কড়িকাঠ স্পর্শ করিয়াছে, রাত্রিকালে সেই ঘরে একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া সুজন রায় উক্তরূপে তাঁহার নব-সৌভাগ্যের কথা ভাবিতে-ছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে হাসিটা যখন একটু কমিয়া আসিল, শয়নগৃহে আসিয়া তখন খাটের মশারিটা তুলিয়া ধরিয়া গৃহিণীকে একটা ঠেলা দিয়া বলিলেন—"ওগো, শুনছ ?" গৃহিণী ঘুমের ঘোরেই রাগ করিয়া বলিলেন—"জ্বালাতন করো না বলছি,—ঘুমোতে হয় ঘুমোও—নইলে উঠে যাও।"

গৃহিণীর মনের ধারণা, প্রভুটি তাঁর শয্যাপার্শ্বেই আছেন। সুজন রায় বুঝিলেন—এ আনন্দের ভাগীদার—তাঁহার মনটিকে ছাড়া দ্বিতীয় কাহাকেও আর পাইবেন না তিনি,—একাকীই তাঁহাকে ইহার সমস্ত ভার বহন করিতে হইবে।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল,—তিনি মশারিটা ফেলিয়া দিয়া ভৃত্য ভোঁদার তল্লাসে দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভোঁদা তখন ভূমিতলে মশারিশূন্য মাদুরে শুইয়া প্রভুর ডাক-হাঁক এবং মশার দংশন ভুলিয়া দিব্য আয়েসে নাক ডাকাইতেছিল। পায়ের ঠেলায় তাহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া সুজন রায় কহিলেন, "অনেক ঘুমিয়েছিস্—ওঠ বেটা এখন, এক ছিলিম তামাক দে।" ভোঁদার এখানে শুইবার উদ্দেশ্যই ছিল তাহাই। সে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দালানের এক কোণে রক্ষিত সরঞ্জামাদি হইতে অবিলম্বে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকাটি বাবুজীর হস্তে দিয়াই এইবার অন্য রাত্রিকার মত এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হুঁকার ঘড়ঘড়ানি এবং কাসির খক্‌খকানিতে অতঃপর রাত্রির নিস্তব্ধতা বিচলিত করিয়া তুলিয়া রায় মহাশয় কতকটা সংযতচিত্ত হইয়া ভাবিলেন—"না, আদালতে ওাকে দেখতে যাওয়া হবে না; লোকে নিন্দা করবে। আমলাবাবুদের মুখের কথাতেই তার অন্ধকার চেহারাখানা আমার চোখে চাঁদের মতই ফুটে উঠবে। দরকার কি সেখানে যাবায়, ভাল দেখাবে না—সেটা ভাল দেখাবে না—বুঝলি ত ও মন, সেটা ভাল দেখাবে না।"

তিনটা বাজিল, কলিকার আগুনটুকুও প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল—তিনি এইবার পদ্মনাথকে স্মরণ করিয়া খাটে উঠিলেন। বিছানায় বসিয়া ভাবিলেন—"এখন থেকে রায়-বংশের প্রধান হলেম ত আমরাই, অখণ্ড রাজ্যের বিরাট অধিনায়ক ত আমরাই।" অপর্য্যাপ্ত আনন্দে তাঁহার হৃদয়-খানা ফাটিয়া উঠিতে চাহিল—তিনি আবার গৃহিণীকে ডাকিলেন—"শোন না গো,—ম্যাজিষ্ট্রেট স্পষ্ট ক'রে ব'লে গেছেন,—বিজনকেই তিনি গদিতে বসাবেন—তোমার ছেলে রাজা হবে—ওগো রাজা হবে—শুনছ ত ?" গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না; তাঁহাকে ঠেলিয়া উঠাইতে আর সাহস হইল না। রায় মহাশয় তখন পাশ ফিরিয়া চোখ বুজিলেন—নয়ন মুদ্রিত রহিল—কিন্তু অধরোষ্ঠ আবার হাস্যরেখায় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—"হায় রে অতুল, বাছা আমার! এত দিন যে অহঙ্কারে মাটীতে তোর পা পড়ত না। আমার ছেলেকেও তাই কন্যাদানে অস্বীকৃত হয়েছিলি তখন। এইবার পথে এস বাবা! তোমার মেয়ে যতই সুন্দরী হোক না কেন—আমার পুত্রবধূ হবার যোগ্য নয়—নয়—নয়। কে চায় মেয়েকে তোর—কে পোঁছে!"

এইরূপ সুখকল্পনায় সুজন রায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু সয়তানের এত আনন্দ দর্পহারীর প্রাণে বাজিল, তাঁহার মহাসুপ্তি ভঙ্গ হইল।

পরদিন সুজন রায় সংবাদ পাইলেন, অতুলেশ্বর জেল-বন্দী হয়েন নাই, জামিনমুক্ত হইয়া বিচারশেষ পর্য্যন্ত আপাততঃ প্রসাদপুর প্রাসাদেই রহিলেন। আরও শুনি-লেন যে, বিলাতেও তাঁহার পক্ষ হইতে আবেদনপত্র গিয়াছে। সুজনের আশানন্দ বজ্রদণ্ডে যেন চূরমার হইয়া গেল। ক্লাউডন সাহেব পার্লামেণ্টের এক জন মেম্বর—হয়কে নয় করিতে তাঁহার কতক্ষণ। তাঁহার চেষ্টায় রাজ-বিরুদ্ধের সমস্ত প্রমাণ নিশ্চয় অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে—ফলে রাজা যিনি তিনি রাজা আর ভিখারী যে সে ভিখারীই থাকিয়া যাইবে। বিপদের সময় আবার তাঁহার মনে পড়িল রাজকন্যাকে। এই অকূল পাথারে তিনিই একমাত্র তাঁহাদের আশা-তরণী। তাহার সহিত যদি পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন, তবেই সব দিক রক্ষা পায়; কিন্তু অতুলেশ্বর যেরূপ একগুঁয়ে লোক—প্রেমারার আড়ায়—যদি তাহাকে বশে আনিতে পারেন ত পারিলেন—নহিলে এ আশাও

এই উদ্দেশ্য মনে ধরিয়া সুজন রায় প্রথমে রাজমাতার সহিত দেখা করিতে গেলেন।

দ্বিপ্রহরে পুত্রপৌত্রীকে খাওয়াইয়া স্নানাহ্নিক শেষে রাজমাতা যখন উপরে উঠিলেন, তখন বেলা প্রায় আড়াইটা। ঠাকুর-ঘরের পাচক অল্প আগে প্রসাদান্ন আনিয়া তাঁহার গৃহে রাখিয়া গিয়াছে;—জ্যোতির্ম্ময়ী ঠাকুরমার আগমন প্রতীক্ষায় ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। রাজকুমারীর জোর-জবরদস্তী অনুরোধে ঠাকুরমার দিনান্তে একবার করিয়া অন্ন গ্রহণ করিতেই হয়। মহারাণী গৃহ-দালানে আসিয়া প্রথমেই রেলিংয়ের নিকট ঊর্দ্ধমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া, জপমাল্য মাথায় ঠেকাইয়া উদ্দেশে সূর্য্য প্রণাম করিলেন। তাহার পর মালাগাছি দেওয়ালের যথাস্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া, আহারস্থানে যাইবার মানসে সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছেন—এখন সময়—নন্দী দাসী খবর দিল—"রায় মশয় দেখা করতে আইছেন—গো মহরাণি মা।"

ঠাকুরমা দালানে আসিতেই জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহের বাহিরে আসিয়াছিল। এই খবর শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল—"বাইরেই তাঁকে কিছুক্ষণ বসতে ব'লে দাও—নন্দী, ঠাকুরমা, লক্ষীমা, তুমি শিগ্‌গীর খেয়ে নেও, বেলা প'ড়ে গেছে, খেয়ে তাঁকে খবর পাঠালেই হবে।"

ঠাকুরমা বলিলেন—"সেটা ভাল হবে না রাজা—" (মহারাণী নাতনীকে আদর করিয়া যখন তখন রাজা বলিয়া ডাকেন) "সুজন এসেছেন,—দেখা করেই খাব এখন, এতই কি খাবার তাড়া?"

কিন্তু উভয়ের বিবাদ নিষ্পত্তি হইতে না হইতে সুজন রায় স্বয়ং দালানে আসিয়া দেখা দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বিরক্তভাবে গৃহমধ্যে লুকাইয়া পড়িল—তাঁহাকে সমাদৃত করিবার অভিপ্রায়ে রাজমাতা অগ্রসর হইয়া নিকটে দাঁড়াইলেন।

অভিজাতমহত্ত্বে মহারাণীর হৃদয় পূর্ণ। তিনি ধর্ম্মশীলা, উদার এবং সরলপ্রকৃতি। সুজন রায় মিত্র নহেন, জানিয়াও তিনি তৎপ্রতি মন্দভাব পোষণ করিতেন না। সুজনের মনে যাহাই থাকুক—বাহ্যিক আত্মীয়তার অভাব তিনি কোন দিন দেখান নাই—সুখে দুঃখে সময়ে অসময়ে খোঁজখবর লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং এই বিপদের দিনে তাঁহার আগমন মহারাণী সহজ ভাবেই গ্রহণ করিলেন; এবং মনে মনে ইহাতে সন্তুষ্টও হইলেন। সুজন রায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সেই দেবীতুল্য ম্লানমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া—কি বলিবেন, ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। মহারাণী হস্তোত্তোলনে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন—"ভাল আছ ত ঠাকুরপো?"

মনে সয়তানের ভাব, মুখে সুজন রায় উত্তর করিলেন—"আর ভাল বৌঠান—বেঁচে আছি, এই মাত্র। মনে কি আর সুখ আছে, মহারাণি!"

এই সহানুভূতিবাক্যে মহারাণীর রুদ্ধ অশ্রু উথলিয়া উঠিতে চাহিল; অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া যথাসাধ্য সংযতভাবে তিনি কহিলেন—"এস ভাই, ঘরে গিয়ে বসবে এস।" অন্তঃপুরের অভ্যার্থনাগৃহে তিনি তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য, এই গৃহ বহুমূল্য আসবাবদ্রব্যাদিতে রাজোচিত সজ্জায় সজ্জিত। স্বদেশী বিদেশী ভদ্রমহিলাগণ অন্তঃপুরে আসিয়া এই ঘরেই বসেন। কিন্তু এই আড়ম্বর-পূর্ণ কোমল আস্তরণমণ্ডিত কোচচৌকির এক প্রান্তে গরুড়বাহন একখানি যে ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসন—তাহাই মহারাণীর উপবেশনস্থল।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে মহারাণী কোমল শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন।

উভয়ে এই কক্ষে প্রবেশ করিবার পর সুজন রায় অশ্রু-আনতমুখী রাজমাতার হাত ধরিয়া উক্ত আসনে বসাইয়া নিজে নিকটের মখমলচৌকী একখানায় বসিয়া বলিলেন—"কেঁদো না বৌঠান, কেঁদো না; তোমার এ ভাইটি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কোন ভয়ভাবনা নেই, ধনপ্রাণ দিয়ে আমি অতুলকে উদ্ধারের চেষ্টা করছি; ভেবো না।"

এই আশ্বাসবাণীতে রাজমাতার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল কি না কে জানে, তবে অকূলপাথারে ভাসিলে মজ্জমান ব্যক্তি কুটাখণ্ডকেও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে চায়।

তিনি সুজনের প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"মঙ্গল হোক দাদা তোমার, মঙ্গল হোক।"

সুজন বলিলেন—"তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরি মহারাণি—তবে কি জান; এ সময় আমার নিজের মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। আমি কেবল ভাবছি এ বিপদ্ থেকে তোমাদের উদ্ধার করব কি ক'রে? আচ্ছা বৌঠাকরুণ, একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি—মেয়েটার কি করছ তোমরা ? এ সময় তা'র একটা বিয়ে করলে ভাল হ'ত না ?"

মহারাণী বলিলেন—"তা হ'ত বই কি ?"

"তবে হচ্ছে না কেন ? তোমরা আমাকে পর, শত্রু যাই ভাব—আমি ত তোমাদের ভাবনা মন থেকে তাড়াতে পারিনে। আমি ত ছেলে দিতে রাজি আছি তোমাদের; বিয়েটা দিলেই ত হয়।"

"আমার আর তাতে অনিচ্ছা কি ভাই! কিন্তু এ সময় ত অতুলকে ও কথা বলা যায় না।"

"কেন যায় না, তা ত আমি বুঝতে পারিনে। মেয়ে বড় হ'লে তাকে সৎপাত্রস্থ করা ত পিতার কর্ত্তব্য ? আসল কথা—অতুল ভাবছে—শত্রুর ছেলেকে মেয়ে দেবো কি ক'রে ? স্পষ্ট কথা দিদি—সুজন রায় স্পষ্টবাদী লোক। আরে! শত্রুই যদি হব—তবে তোর বিপদে তোর অপমানে আমার প্রাণ জ্বলে কেন ? বিষয়ের অংশীদার হ'লে বিষয়-আশয় নিয়ে অমন ঝগড়াঝাঁটি হয়েই থাকে; কিন্তু তাতে কি মনের আত্মীয়তা নষ্ট হয় ? আমি বৌঠান,সরলপ্রকৃতির লোক, ও রকম শত্রুভাব আমার মনে ঠাঁই পায় না।"

বলিয়া সুজন রায় থামিলেন; রাজমাতাও ভাবিয়া পাইলেন না, এ কথার কি উত্তর দিবেন। গৃহ নীরবতামগ্ন হইল। কিছু পরে তাঁহার বিষভরা খন্‌খনে হাসি একটু হাসিয়া সুজন আবার কহিলেন—"আমি যদি সত্যই অতুলের শত্রু হতুম—তা হ'লে কি আজ সে রক্ষা পেতো ?" বলিয়া পকেট হইতে সেই জাল চেকখানা বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই যে কাগজখানা দেখছ; এ হচ্ছে—দশটি হাজার টাকার একখানি চেক; অতুল বিদ্রোহী ছেলেদের এখানি দিয়েছিলেন, কোন গতিকে এখানা আমার হাতে এসে পড়েছে। কি ক'রে যে আমি পেলাম, সে কথা তোমাকে ব'লে কোন লাভ নেই, অতুলকেই পরে বলব—এখন এখানা আমি যদি কোর্টে দাখিল করি, তা হ'লে কি হয় ভাব ত! বাবাজি যে বিদ্রোহীদের পিঠ থাবড়াচ্ছিলেন, এ থেকে সেটা স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায়।"

মহারাণী সভয়আগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—"ছিঁড়ে ফেল ঠাকুরপো—এখনই ছেঁড়ো ওখানা।"

"ফেলবই ত! আমি শুধু এখানা দেখাতে এনেছি তোমাকে। অতুলকেও একবার দেখাব, না দেখলে ত সে বিশ্বাস করবে না, বুঝবে না ত আমি তার শত্রু কি মিত্র!"

মহারাণী আবার আকুল স্বরে অনুরোধ করিয়া বলিলেন —"বুঝবে অতুল বুঝবে, ছেঁড় তুমি ভাই কাগজখানা—"

সুজন মহারাণীর অনুরোধে বিচলিত না হইয়া কাগজ-খানা বেশ বাগাইয়া ধরিয়া বলিলেন—"একবার কাণ্ডটা দেখ অতুলের, দশটি হাজারের চেক দিয়েছে কি না বিদ্রোহী ছেলেদের! একেবারে সর্ব্বনেশে প্রমাণ।"

মহারাণীর মাথা দেয়ালে ঝুঁকিয়া ঠক্ করিয়া উঠিল। তিনি মুদ্রিত-নয়নে অর্দ্ধ-অচেতনভাবে বলিয়া উঠিলেন—"শ্যামসুন্দর, হরি হে, এ কি কাণ্ড তোমার! কি খেলা এ খেলছ তুমি আবার আমাদের নিয়ে!"

সুজন রায় উঠিয়া তাঁহার মাথা তুলিয়া ধরিবামাত্র তিনি নিজেই পুনরায় ঠিক হইয়া বসিলেন। সুজনের নিষ্ঠুর কটাক্ষে তাঁহার অশ্রু স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। সুজন কোমল বাক্যে নয়নব্যক্ত সেই কঠোরতা চাপিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ভয় নেই মহারাণি, আমি তোমাদের শত্রু নই। তবে এটা ত বোঝ, বেশী রগড়ালে ভাল জিনিষও মন্দ হয়ে ওঠে। বিশ্বাসেই বিশ্বাস আনে, আমি যে তোমাদের জন্য এত করছি, সেটা তোমাদেরও ত বোঝা চাই।"

"বুঝছি ঠাকুরপো বুঝছি—রক্ষা কর ভাই তুমি।"

"বুঝছ কোথা ? মেয়ে দেবার বেলা বলছ—'তা হবে না'। এতে কি মন বেগড়ায় না ? স্পষ্ট কথা আমার মহারাণি, সুজন রায় স্পষ্টবাদী লোক। আমাকে মিত্র ভাব, তোমাদের কোন বিপদ নেই—নইলে মানুষ ত আমি—রাগের মাথায় যদি কিছু ক'রে ফেলি, তখন কিন্তু দুষো না আমাকে। চল্লুম এখন—একবার ভেবে চিন্তে দেখো। অতুলকেও একবার সব ব'লে যাই।"

রায় বাহাদুর চলিয়া গেলেন, মহারাণী অকূলচিন্তায় মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাজকন্যা আসিয়া ডাকিলেন—"ঠাকুরমা।"

রাজমাতা চমকিয়া উঠিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—"চল ঠাকুরমা—খেতে চল,বেলা প'ড়ে গেছে একেবারে—আর দেরী করলে চলবে না।"

রাজমাতা উঠিয়া রাজকন্যার কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"খাব না, রাজা খাব না এখন, নিয়ে চল আমাকে শ্যামসুন্দরের কাছে, তাঁর পদতলে হত্যা দেব, তিনি আমাকে নিন—নয় অতুলকে বাঁচান।" বলিতে বলিতে মহারাণী ভূমিতলে কার্পেটের উপরই শুইয়া পড়িলেন। রাজকন্যা কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুরমা—নতুন কিছু কি রায়-খুড়ো ব'লে গেলেন ?"

অতুলেশ্বর সুজনকে রায়-খুড়ো বলেন, তাই জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহাকে সেই নামে ডাকেন।

"বলবে আর কি ? অতুল যে চেক বিদ্রোহী ছেলেদের দিয়েছিলেন, সেই চেক তার হাতে এসেছে, সেটা দেখালেন। এ চেক আদালতে যদি দাখিল করেন তিনি, তবে আর কোন কথাই মানবে না সরকার।"

এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না; রাজকন্যার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। একটুখানি দম লইয়া তিনি বলিলেন, "রায়-খুড়ো কি সত্যিসত্যি সে চেক কোর্টে দাখিল করবেন ? এতদূর সর্ব্বনাশ কি তিনি আমাদের করতে পারেন ?"

যাহার অন্তঃকরণ মহৎ—সে এইরূপ করিয়াই ভাবে ?

মহারাণী বলিলেন, "বলেছে ত সুজন—তা করবে না—তবে—"

"তবে কি ?"

"বন্ধুতার বদলে তিনি বন্ধুতা চান।"

"সে কথা ত বলাই বাহুল্য, এ উপকার কি আমরা কখনো ভুলতে পারব ?"

"আরে পাগলি, তিনি চান তোকে তাঁর পুত্রবধূ করতে; তা নইলে—"

রাজমাতার আর কথা ফুটিল না; রাজকন্যাও নিস্পন্দ নির্ব্বাক্ হইয়া গেলেন, সুজনের সর্ত্ত বুঝিতে পারিলেন।

কিছু পরে উঠিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মনে মনে কহিলেন—হে, নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধাতা, ঐটুকু পারিনি শুধু; নিজের কণ্ঠ তোমার খাঁড়ার তলে বাড়িয়ে ধরেছি, তবু ঐটুকু পারিনি প্রভু, ঐটুকু পারিনি। আমার ভালবাসার দেবতাকে মন থেকে ছিন্ন ক'রে তোমার চরণে বলি দিতে পারিনি। তুমি কিন্তু নিষ্ঠুর হরি—তাই চাও, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; পরীক্ষা শেষ কর, যাহা অসম্ভব, তাহাই সম্ভব হোক, আমার হৃদয়-প্রাণের পরিপূর্ণ সম্পদ অখণ্ড-প্রেম খণ্ড খণ্ড ক'রে তোমার চরণে সমর্পণ করি—এ বলি তোমার গ্রহণীয় হোক্।"

ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুরমাকে বলিল—"ঠাকুরমা, ভেবো না তুমি, ওঠো, কিছু খেয়ে নেবে চল, যা বলছ তুমি, তাই হবে।"

ঠাকুরমা বিস্ময়ে উঠিয়া বসিলেন। রাজকন্যা বলিলেন, "এখনও সম্ভবতঃ রায় বাহাদুর বাবার ঘরেই আছেন—আমি যাই—আর দেরী করব না। আমার যা বলবার, তাঁকেই বলব। তুমি চল, প্রসাদ মুখে দাও একটু।"

রাজমাতার বুক ফাটিয়া উঠিল, রাজকুমারীর মনের বেদনা তিনি নিজের মনে অনুভব করিলেন, কাতর দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"উঠছি, রাজা উঠছি, তুই যা, আমি উঠছি ?"

রাজকন্যা চলিয়া গেলেন, রাজমাতা মন্দিরে গিয়া শ্যামসুন্দরের পদতলে ধন্না দিয়া পড়িলেন।

—

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

"নানি গো, নানি, শোন্ গো নানি; নানারে আনতে যাচ্ছি মোরা তোর তরে।"

বয়সভারে অবনতপৃষ্ঠ হইয়াও এক জন বৃদ্ধা লাঠি হাতে বেশ জোরে জোরেই পথ চলিতেছিল। রাস্তার দুষ্ট ছোকরা দুই জন বুড়ীর এই হাস্যকর সামর্থ্যে কৌতুকপীড়িত হইয়া উক্তরূপ সম্ভাষণবাক্যে অভিনন্দিত করিতে করিতে কভু বা তাহার নিকটে, কভু বা হাসিয়া বুড়ীর উদ্যত লাঠির বজ্রকোপ হইতে কিছু দূরে হটিয়া দাঁড়াইতেছিল। এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক বাধা-বিঘ্নসত্ত্বেও বুড়ীর গতি এবং ছেলেদের ব্যঙ্গোক্তি কিন্তু বেশ অবিরামগতিতেই চলিয়াছিল।

ক্রমশঃ এই রহস্যালাপ গড়াইয়া আসিল প্রসাদপুর প্রাসাদসন্নিহিত রাজপথে। তখন বেলা দুইটা। পথে বড় একটা লোকচলাচল নাই। এক জন চুড়িওয়ালা এই কৌতুকদৃশ্যের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া ডাক-হাঁক বন্ধ

করিয়া দিয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া গেল। রাস্তার অপর পার্শ্বের এক জন গাড়োয়ান এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, হাসিয়া গরুর ল্যাজ মলিতে মলিতে 'চল রে বেটা চল' বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। ছেলেরা বুড়ীর বাক্য-বাণ এবং লগুড়শক্তিকে একই সঙ্গে নিঃশক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া হাঁকিল—"নানি গো নানি, এত রাগ কেন গো নানি, নানারে আনি হাজির করিব মোরা এখুনি।"

রাজা তখন বারান্দায় একাকী বসিয়াছিলেন, গোল-যোগ শুনিয়া রেলিঙের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উক্তরূপ ব্যঙ্গাভিনয় দেখিয়া তাঁহার ওষ্ঠাধরে করুণ হাসির রেখাপাত হইল। দুর্ব্বলে সবলে চিরদিনই এইরূপ নিষ্ঠুর অভিনয় চলিয়া আসিতেছে। বিধাতার করুণ নীতি প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর শক্তিকে অতিক্রম করিয়া কোন দিন সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারিবে কি না, কে জানে!

রাজা একবার গেটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার দ্বারপাল কেহ ত এই গোলযোগ নিবারণের চেষ্টা করি-তেছে না। তাঁহার মনের কথা মনেই মিলাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই এক জন প্রহরী ছেলেদের তাড়াইয়া আসিল। কারণ, বুড়ী অনন্যগতি হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া প্রহরীর আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিল। রাজা দেখিলেন, সে প্রহরী রাজ-দ্বারপাল নহে, পুলিস পাহারাওয়ালা। সে লাঠি বাগাইয়া ডাক-হাঁক করিতেই ছেলেরা এবার হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। বুড়ী কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া, একটু দম লইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে আবার পথযাত্রা করিল। পুলিসকে দেখিয়া রাজার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বন্দী। এত দিন স্বরাজ্যে বন্দী ছিলেন, এখন স্বগৃহে বন্দী। রাজা বারান্দার অন্যপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিষ্কার দিন, শুভ্র মেঘস্তরে সজ্জিত নীলাম্বরতলে ডানা বিছাইয়া দিয়া দুই একটি চিল পাতার মত ভাসি-তেছে, আশেপাশে দুই একটি ক্ষুদ্র চাতক পক্ষ আস্ফালন করিয়া পতঙ্গের আকারে উড়িতেছে, দিগন্তের ধার দিয়া বকের সার উড়িয়া গেল, কাকগুলা আম-কাঁঠালগাছের আগায় বসিয়া কা কা ডাক ছাড়িতেছিল, নিভৃত কাননকুঞ্জে গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছোট একটি পাখী সুন্দর শিশ ধরিয়াছিল, হঠাৎ শিশ বন্ধ করিয়া উড়িয়া আসিয়া রাজার সম্মুখবর্ত্তী প্রস্তরমূর্ত্তিটির মাথার উপর বসিল। পাতরের একটি স্তম্ভাসনের উপর আনতমুখী উক্ত সুগঠিতা মূর্ত্তি পা ঝুলাইয়া বসিয়া, দুইটি ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুর গাত্রে দুই হাত রাখিয়া সস্নেহ-দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিতেছে। একটি শাবক তাহার কোলের উপর শয়ান, অন্যটি মূর্ত্তির অঙ্কে পা মুড়িয়া দিয়া তাহার দিকে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আছে, যেন বলিতেছে, আমাকে কোলে উঠাইয়া লও। কোন নিপুণ স্বদেশী ভাস্কর রাজ-কন্যাকে আদর্শ করিয়া স্নেহময়ী এই শকুন্তলামূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন। রাজা ইহার দিকে চাহিয়া কন্যার কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হাসির বিবাহ দিয়া তিনি বেশ একটু স্বচ্ছন্দমনা হইয়াছেন, এখন কেবল জ্যোতির্ম্ময়ীর বিবাহের চিন্তাই যখন তখন তাঁহাকে উন্মনা করিয়া তুলে। মাথার উপর শাণিত অস্ত্র দোদুল্যমান, কখন্ খসিয়া পড়িয়া তাঁহাকে ভূ-পাতিত করিবে, তাহার ঠিক নাই। তৎপূর্ব্বে কন্যার বিবাহ হইয়া গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারি-তেন। কিন্তু শরৎকুমার ত এখন জেলে, বিচারশেষে তাহার ভাগ্যে কি আছে, কে জানে। অথচ ডাক্তার তাঁহাদের জীবনের সহিত এতদূর জড়িত যে, অন্য কাহাকেও জামাতা করিবার কথা তিনি মনেই আনিতে পারেন না। অনুষ্ঠান তত না হউক, প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী শরৎকুমা-রেরই বাগ্‌দত্তা; কন্যাও যে তৎপ্রতি অনুরাগিণী, ইহাতেও তাঁহার মনে সন্দেহ নাই।

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাভঙ্গ হইল। শুনিলেন—"ভাল আছ ত বাবা!" চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, যাঁহার সংস্রবে তিনি একেবারেই আসিতে চাহেন না, সেই ব্যক্তিই তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। কই, কেহ ত তাঁহাকে সুজন রায়ের আগমনসংবাদ জানাইয়া যায় নাই। আবার মনে পড়িয়া গেল, তিনি বন্দী, তাঁহার ভৃত্যেরাও পুলিসের হুকুমবরদার। সুজন সম্ভবতঃ পুলিসের সম্মতিক্রমেই এখানে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে জানান দিবার প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মনের এই বিরক্তিভাব তাঁহার ভদ্রতা সৌজন্যের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। মনে মনেই মনকে সবল কশাঘাত করিয়া, সহজ প্রশান্তভাবেই সুজনকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "এই যে খুড়া মশায় কি মনে ক'রে? বসতে আজ্ঞে হোক।"

"বসছি বাবা; তুমিও বোসো, এই দেখতে এলুম তোমাকে।"

দুই জনে রেলিংয়ের নিকটবর্ত্তী দুইখানা চৌকিতে উপবিষ্ট হইলেন। সুজন রায় বসিয়া রাজার দিকে বেশ ভাল করিয়া নজর দিলেন। চেহারাখানা একটু যেন রোগা রোগা, কিন্তু এখনও মূর্ত্তি দিয়ে তেজ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে!

রায় বাহাদুর বড়ই মুসড়িয়া গেলেন। কিছু পরে বলিলেন—"এখনকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছু ঠাণ্ডামেজাজের লোক, এখানে তাই তবু তোমাকে থাকতে দিয়েছে। হাকিম যে বিচার করতে আসছে, সে না কি বড় কড়া। শুনে পর্য্যন্ত ভাবনায় অস্থির হয়ে পড়েছি।"

অতুলেশ্বর মনে মনে হাসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন—"অত ভাবনা করবেন না, খুড়ো।"

"বল্লেই কি বাবা মন প্রবোধ মানে? তোমার খুড়ীমা ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন। আস্‌তে চাচ্ছিলেন আজ তিনি, আমি বল্লুম, আগে নিজে গিয়ে একবার দেখে আসি।"

"আনলেন না কেন তাঁকে? তিনি এলে খুব খুসীই হতুম।"

রাজা সত্য কথাই কহিলেন। উত্তরে সুজন বলিলেন, "হাঁ, তা আনব এবার। কিন্তু আসবেনই বা কখন্? তিনি ঠাকুরঘরে ত সারাদিন ধন্না দিয়েই প'ড়ে আছেন। বিচিত্র লীলা ভগবানের, রাজাকেও তিনি ফকীর বানাচ্ছেন—আর ফকীরকেও রাজমুকুট পরাচ্ছেন।"

সহানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহার বাক্যের মধ্য দিয়া আনন্দ লীলায়িত হইয়া উঠিল; কৌতুক-দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন—"এবার চামুণ্ডাপূজায় কত বলি দিলেন খুড়া মশায়?"

সুজন ইহার অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু না দমিয়া অন্য অর্থে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"এ বিপদের সময় বলি দেব না ত কখন্ আর দেব? শাস্ত্র যে মানে, বলির মাহাত্ম্যও তাকে মানতে হয়। আজকালকার ছেলেদের মতিগতি সব উল্টো—কিন্তু তাতে কি সংসারে সুখবৃদ্ধি হচ্ছে?"

অতুলেশ্বরও এ বাক্যবাণ সহজেই পরিপাক করিয়া লইয়া কহিলেন, "ঠিক বলেছেন খুড়ো। জীবনটা ভুলের মধ্যেই কাটলো, যদি সময় পাওয়া যায়, তা হ'লে আপনার পথ ধরেই চলতে শিখব।"

সুজন রায় জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও কি কথা বলিস? অমন কথা মুখে আনিসনে, তোর এ খুড়ো যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তোদের বিন্দুবিসর্গ চিন্তা নাস্তি। তুই ভাবিস, আমি তোর শত্রু,—বিষয়ের অংশীদার হ'লে সময় সময় শত্রুতা করতে হয় বই কি, কিন্তু এখন যে তোর অপমানে রায়বংশের অপমান, এ অপমান ত আমার প্রাণে সহ্য হচ্ছে না। এই কথা আমি মহারাণীকেও বলছিলুম, আর তোমাকেও বলছি।"

"এ সময় তাঁর দেখা পেলেন?"

"কেন পাব না? আমি কি বেগানা লোক না কি? তিনি আমার কাছে মেয়েটার জন্য কত দুঃখই করলেন। তাঁর ভারী ইচ্ছে, আমি পুত্রবধূ করি তাকে। আমিও ত এতে আপত্তির কোন কারণ দেখিনে, তুমি বল্লেই দিনক্ষণ একটা ঠিক হয়ে যায়।"

রাজার মনে এ কথায় বেশ বড় রকম একটা ক্রোধের তরঙ্গ উঠিল—কিন্তু সবলে চাপিয়া লইয়া বলিলেন—"জামাই ত আমার ঠিকই আছে, শরৎকুমার এলেই বিয়ে হয়ে যাবে।"

সুজন রায়ও ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধভাবেই বলিলেন—"সে হতভাগাটা ত জেলে পচছে, প্রসাদপুরের রাজার মেয়ের ভাগ্যে শেষে এই বর!"

"চিরদিন ত আর সে জেলে থাকবে না।"

"জেলে না থাকে—আণ্ডামানে যাবে। আমি কি না জেনেছি সে খবর?"

"আচ্ছা, বিচার ত হয়ে যাক্। তখন সে বিষয় ভাববার সময় আসবে।"

সুজন আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না; বলিয়া উঠিলেন—"অধঃপাতে যা তবে। আমি ভাল কথা বল্লেও মন্দ হয়—শত্রু কি না আমি! আচ্ছা বেশ, তাই হোক; আমার মিত্রতা উপেক্ষা করলি, শত্রুতাটা কি রকম, তাই দেখে নে এবার। তোমার জীবনের কলকাঠী বাবা হাতে নিয়ে তবে এখানে এসেছি।" বলিয়া চেকখানা দেখাইয়া বলিলেন—"এই চেক তুমি যাদের দিয়েছিলে, তারা আমার কাছেই এনেছিল—ভাঙ্গাবার জন্যে, এ চেক আমি এখনও দাখিল করিনি কোর্টে। বুঝলে ত?"

সুজনের হাতে এ চেক দেখিয়া রাজা প্রথমটা বিস্মিত হইলেন ; মুহূর্ত্তে সে বিস্ময় সন্দেহে মিলিত হইল ;—তাঁহার বিরুদ্ধে এই যে সব ষড়যন্ত্র, তাহা রায়-খুড়োরই কাণ্ড নয় ত ? তিনি উচ্চস্বরে কহিলেন—"বেশ, চেক কোর্টে দাখিলই করবেন—তার জন্য আমি ভীত নই ; জাল চেক আপনার বিরুদ্ধেই প্রমাণ দাঁড়াবে।"

রায় খুড়ো অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন ; রোষ-আস্ফালিত স্বরে কহিলেন, "জাল চেক বটে ? তুমি বল্লেই ত হবে না। ঝুঁটো কি সাঁচ্চা, জহুরী লোকেই সেটা বিচার করবে। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সবাই এই মুটোর মধ্যে, বুঝেছ যাদুধন ?"

রাজা বুঝিলেন, সুজন যাহা বলিতেছেন—তাহা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র নহে ;—এই জাল নোটই সম্ভবতঃ তাঁহার চেষ্টায় রাজপক্ষে বিরুদ্ধ প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু অতুলেশ্বর ভীরু কাপুরুষ নহেন, এ ভয় তাঁহাকে কাবু করিতে পারিল না। কেবল যত্নবদ্ধ ধৈর্য্যবাঁধ তাঁহার ধ্বসিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরেই তিনি কহিলেন—"বেশ, আপনার যা ইচ্ছা, তাই করুন। আমি সহস্র-বার মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত তবু—কন্যাপণে আত্মরক্ষা করব না।"

সুজন 'মোরিয়া' হইয়া উঠিলেন, দাঁড়াইয়া উঠিয়া গালি দিলেন—"অধঃপাতে যাও—অধঃপাতে যাও ; আমার পায়ে ধ'রে এক দিন যদি দয়া ভিক্ষা করতে না হয়, তবে আমার নাম সুজন রায় নয়।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন—রাজা পুনরায় চৌকিতে বসিলেন।

বাহিরে সিঁড়ির নিকট আসিয়া সুজন রায় দেখিলেন, জ্যোতির্ম্ময়ী দেয়ালে ঠেস দিয়া পাষাণমূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "রাজকুমারি জ্যোতির্ম্ময়ি—তুই মা !"

জ্যোতির্ম্ময়ী পাষাণমূর্ত্তির ন্যায়ই স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া রহিল—কোন উত্তর করিল না। তিনি আবার কহিলেন—"দেখ মা, তোর জন্যেই এই বিবাদবিসংবাদ, চিরকালই মেয়েদের জন্য সংসার জলে পুড়ে ছারখার হয়ে উঠেছে, সীতার জন্য সোনার লঙ্কা ছারখার ; তিলোত্তমার জন্য শুম্ভ-নিশুম্ভের মৃত্যু ; পদ্মিনীর জন্য চিতোর আক্রমণ—এ সব ত জানিস তুই। এখন তুমি যদি মা জননী আমার পুত্রবধূ হ'তে রাজি হও ত সব বিপদ খণ্ডে যায় তোমার বাবা রক্ষা পান, তোমাদের ধনসম্পদ রাজ্য সব বজায় থাকে। বল মা তুমি, তোমার একটা কথার উপরই সব নির্ভর করছে।"

হঠাৎ পাষাণমূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, তাহার ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন হইল, কি যেন সে বলিতে গিয়া আবার নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িল।

সুজন রায় আবার বলিলেন—"ভেবে দেখ মা, তুমি ইচ্ছা করলেই সব দিক্ রক্ষা হয়।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর কথা ফুটিল, সে বলিল—'ভেবেছি।"

"কি ভেবেছ ? হবে মা জননি তুমি আমার পুত্রবধূ ?"

ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিত কণ্ঠ হইতে বাক্যস্ফুট হইল, "হব।"

আনন্দ-বিস্ময়ে সুজন রায় নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। অধরোষ্ঠে হাসি বিস্ফারিত হইয়া মিলাইয়া পড়িল—তিনি গম্ভীরস্বরে কহিলেন—'সত্যি বলছিস মা ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী এবার দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল—"সত্যই বলছি। আপনার কাছে পিতার বিরুদ্ধ প্রমাণ কি আছে—যদি আমাকে দেন—তবে—"

"কি করবে তুমি ?"

"ছিঁড়ে ফেলব।"

সুজন রায় মুখে যতই আস্ফালন করুন, এই নোট কোর্টে দাখিল করিলে তাঁহার পক্ষেও ক্ষতিজনক হইতে পারে—এ ভয়টুকুও তাঁহার মনে ছিল। তিনি সহজেই চেকখানা জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতে দিয়া কহিলেন—"এই নেও মা—আমি ছিঁড়ে ফেলতুম—না হয় তুমিই ছেঁড়ো। আর একবার বল মা, আমার পুত্রবধূ হবে তুমি ?"

জ্যোতির্ম্ময়ী একটু বিরক্তির স্বরে কহিল, "একশবার এক কথা বলার ত দরকার নেই।"

"কিন্তু ইতিমধ্যে যদি শরৎকুমার এসে পড়ে ?"

শবের মত বিবর্ণ, প্রাণস্পন্দনহীন চক্ষু দুইটা জ্যোতির্ম্ময়ীর সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সতেজে মর্ম্মাহতা নারী কহিল—"তার নাম এর মধ্যে আনেন কেন ? আমি কথা দিয়েছি, বস্—সেইটে মেনে নিন ?"

সুজন রায় অবাক্ হইয়া গেলেন ! কি তেজস্বিনী অথচ সরলপ্রকৃতি রমণী ! এরূপ নারীর সান্নিধ্যে ইতঃপূর্ব্বে কোন দিন সুজন রায় আসেন নাই—এ জাতীয় জীবের মর্ম্মরহস্য ভেদ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তবে জ্যোতির্ম্ময়ী

যে বাক্যদান করিলেন, তাহা যে লঙ্ঘন করিবেন না, সেটুকু তিনি ঠিক বুঝিলেন।

আনন্দের আতিশয্যে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন, "সর্ব্বমঙ্গলা মা আমার প্রসন্ন হয়েছেন, আর কোন ভয়ভাবনা নেই। রায়বংশের ঘরে ঘরে এত দিনে মিলনের বাতী জল্‌লো। আমি মা এখন যাই, এ খবরটা তোর বাবাকে তুই জানাস, মা। আমি বাড়ী গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করি গে।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

অবসান

সারাদিনের পূজা আমার এই সাঁঝেতে আজকে সমাপন,
এই গোধূলির মিলন আলোয় প্রাণের আমার
পূজার আয়োজন!
এই সাঁঝেরি বিজনতায়
দখিন হাওয়ার কাতরতায়
আমার প্রাণের নীরবতায়
হৃদয় আমার কর্‌বো নিবেদন!

এই সাঁঝেতে আমার প্রাণে বাজ্‌লো তোমার আকর্ষণ
সন্ধ্যাদীপের ম্লান আলোকে আমার হিয়ায় তোমার নিমন্ত্রণ,
সকল প্রাণে সকল হিয়ায়
গোধূলি যায় তোমার আশায়
সকল দুখে সকল ব্যথায়
তোমার বাণী বাজ্‌লো চিরন্তন।

সারাদিনের নিগড়ঘেরা বেদনাতুর মন
তোমার পথের পানে চেয়ে সকল সময়ে রইলো এতক্ষণ।
সাঁঝের তারা উঠ্‌লো ফুটি,—
বেদনা মোর পড়্‌লো লুটি,
ফুল্ল তোমার চরণ দুটি
করিতে চায় হৃদয় আলিঙ্গন।

গেয়ে উঠি অকারণের গান—
দিনের আলো নিবে গেলে তোমার পায়ে আমার সম্প্রদান;
আমার চোখের জলের মাঝে
বেদনাতুর প্রাণ
তোমার আশায়, ভালোবাসায়
উঠলো গেয়ে গান,—
দিনের আলোর অবসানে তোমার পায়ে আমার অবসান।

কুমারী বিভা কীর্ত্তি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাট্যকার যখন নাটক লিখিতে বসেন, তখন তিনি গল্পাংশ ও প্লট (ঘটনা-বৈচিত্র্য কি ?) ঠিক করিবার পরেই চরিত্র-বৈচিত্র্য অবতারণা করিবার চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়েন। যিনি যত মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন, তিনি ততই প্রশংসার প্রত্যাশার দাবি মনে মনে রাখিতে পারেন, সেক্সপিয়র তাঁহার নাটকাবলীতে নূতন নূতন মৌলিক চরিত্রের বহুল পরিমাণে সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া তিনি নাট্যকারগণমধ্যে জগতের সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বযুগের উপাস্য হইয়া রহিয়াছেন। কেবলমাত্র নাটক কেন, চরিত্রবৈচিত্র্য ভিন্ন কাব্যের সৌন্দর্য্যও প্রস্ফুটিত হয় না। চরিত্রসমাবেশের গুণেই রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, যে রামায়ণে সীতা আছেন, লক্ষ্মণ আছেন, সেই রামায়ণেই কৈকেয়ী ও মন্থরা আছেন; যে মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন আছেন, সেই মহাভারতেই আবার শকুনি ও শিশুপাল আছে; কেবল আছে নহে, থাকার একান্ত প্রয়োজন; আয়াগো না থাকিলে কি ওথেলো কি ডেসডিমোনা, কি কাশিও কোন চরিত্রই প্রস্ফুটিত হইত না। যে মহান্ কবি এই জীব-নাট্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিও এই মানব-সমাজের মধ্যে দৈবতুলিকাপাতে বিবিধ বর্ণসমাবেশে সংখ্যাতীত নূতন নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এই চরিত্র-সন্নিবেশমধ্যে এক জন দেবোপম সর্ব্বত্যাগী সাধু হইতে এক জন নীচ স্বার্থপর পরশ্রীকাতর কুচক্রীর অভাব হইলে—এক জন দীনপালক অন্নদাতা হইতে এক জন লুণ্ঠনকারী নরঘাতী না থাকিলে—একটি অশ্রান্ত কর্ম্মবীর হইতে একটি নির্ব্বাক্ পত্রবাহক পর্য্যন্ত ভূমিকা-তালিকায় স্থান না

পাইলে এই চির-নূতন বিশ্ব-নাট্যখানি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

প্রতি চরিত্রচিত্রণে যেরূপ বিভিন্নতা আছে, আবার ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেও তেমনই অবস্থার প্রভাবে প্রবৃত্তি ও কার্য্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। যে কৈকেয়ী ঘৃণাকে ঘৃণা করিয়া নিজ জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া এক দিন দশরথের অঙ্গের বিষ-ব্রণরস নিজ মুখে টানিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈকেয়ী আবার রামের বনবাস ঘটাইয়া আবার ছাড়িলেন, বনবাসের সঙ্কল্প মস্তিষ্কে আশ্রয় করিবার মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বেই রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদ শ্রবণে তিনিই কণ্ঠস্থ রত্নহার মন্থরাকে উপহার দিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। পাশক্রীড়ায় কপট শকুনিও কুরুক্ষেত্রে ধনু ধারণ করিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সহ্যগুণের আদর্শস্থানীয়া বলিয়া যে সীতা বসুমতীসুতা বলিয়া প্রখ্যাতা, যে সীতা ভরত সম্বন্ধে একটিমাত্র রূক্ষ কথা উচ্চারণ না করিয়া, রাজরাণীর সুবর্ণ-পর্য্যঙ্কের জন্য একটিমাত্র নিশ্বাসও না ফেলিয়া বনপথে পতি-অনুগামিনী হইয়াছিলেন, সেই সীতা আবার অবস্থার চক্রে পড়িয়া স্বেচ্ছায় বনবাসী আদর্শ দেবর লক্ষ্মণকে মর্ম্মান্তিক কটু ভৎ‍র্সনা করিয়াছিলেন। এই সব বিচিত্রতা সংরক্ষণেই কবির বাহাদুরী।

গত ৩০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গের সাধারণ জীবন-নাট্যশালার সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে যে নাটক অভিনয় চলিতেছে, তাহার মধ্যে যে সকল নট-নক্ষত্র প্রবেশ প্রস্থান করিয়াছে, তাহার মধ্যে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি মৌলিক চরিত্রের ভূমিকা লইয়া বঙ্গজনরূপ দর্শকসমাজকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া শিখাইয়া মোহিত করিয়া রাখিয়া এই পুণ্য অগ্রহায়ণেই নিজ জীবনের তৃতীয়াঙ্কেই ভূমিকা শেষ করিয়া নেপথ্যাচার-গৃহে গমন করতঃ দেহপরিচ্ছদ ত্যাগপূর্ব্বক স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন।

নটবীর গ্যারিক-গিরিশেরও ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, অভিনেতামাত্রেরই যাহা কাম্য, জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল, অভিনয়কালে পাচকড়ির ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এই বাহবা বাহবা বাহবা! ব্রাভো! এই দুয়ো দুয়োর চচ্চড়াচ্চর তালি!

সম্পাদকের জীবন অনেকটা মোসাহেবের জীবন। মোসাহেব যখন যে বাবুর কাছে বসে, তখন সে সেই বাবুর প্রশংসা করে ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর নিন্দা করে, এক জন প্রত্যক্ষ তাহার প্রশংসা শুনিয়া পারিতোষিক দেন, প্রতিপক্ষও পরোক্ষে নিন্দা শুনিয়া তাহার উদ্দেশে তিরস্কার করেন। পাকা বনিয়াদী মোসাহেব সব দিক বজায় রাখিয়া সব বাবুর মন কতক কতক খুসী রাখিয়া জীবন-যাত্রাটা চালাইয়া দিতে পারেন। এই সে বছর প্রিন্স অফ ওয়েলস কলিকাতায় আসিলেন, পরদিন প্রভাতী সংবাদপত্র খুলিয়া পড়িলাম, "আরে বাপ্ রে বাপ্, রাস্তায় কি ভয়ানক ভিড়, একটা লাঠী মারিলে পঞ্চাশটা মাথা ভাঙ্গিয়া যায়, ইংরাজ ত সহস্র সহস্র, আর দেশী লোক ত লক্ষ লক্ষ।" আবার বাঙ্গালীর লিখা কাগজ খুলিয়া দেখি—"কি ঘাটে, কি রাস্তায় একটি জন-প্রাণীও নেই, একটি মাঝির সাড়া নেই, জনকতক রাজকর্ম্মচারী সাহেব মাত্র নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে গিয়ে প্রিন্সকে বরণ ক'রে ঘরে তুললে।" সাহেব যদি লিখে, মাঝামাঝি ভিড় হইয়াছিল, বাঙ্গালী তেমন বেশী ছিল না, তবে ক্লাইভ ষ্ট্রীট এসপ্লানেডের মনিবরা চটিয়া লাল হইবেন, মাসোহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, আবার বাঙ্গালী কাগজ যদি ঐ রকম লিখিতেন, আমরাও বলিয়া উঠিতাম, "অমুক কাগজ বন্ধ করিয়া দাও, এরা যে দেখছি, দেশদ্রোহী হইয়া গেল।"

পাঁচু ছিল একে সম্পাদক, তাহার উপর সবে মাত্র পাঁচকড়ি। প্রাচীন পিতা মাতা জীবিত, পুত্র-কলত্রও ছিল, সুতরাং পাঁচকড়ি থেকে সাতকড়ি বা নকড়ি হইবার চেষ্টা বেচারাকে অহোরাত্র করিতে হইত, এ অবস্থায় পায়ের পেশী খুব শক্ত না হইলে বরাবর সোজা খাড়া থাকা সব সময় তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। একে সোনায় একটু খাদ না মিশাইলে গড়ন হয় না, তাহার উপর যে পিতাকে তাঁহার তৃতীয়া তনয়ার বিবাহের অলঙ্কার ভদ্রাসন দ্বিতীয় দফা বন্ধক রাখিয়া গড়াইতে দিতে হয়, তাঁহাকে একটু ইসারা ইঙ্গিতে মিস্ত্রী মহাশয়কে বলিয়া দিতেই হয়, "সোনাটা উরির ভিতর একটু—বুঝেছ ত—যাতে অল্পে স্বল্পে, বুঝেছ ত?"

বিধাতারূপ যে স্যাকরা সোনার পাঁচকড়িকে গড়িয়া তাঁহার গলায় প্রাচীন-প্রাচীনা তরুণ-তরুণী শিশু গাঁথিয়া একছড়া মালা পরাইতে দিয়াছিলেন, তিনি সোনার পুতুলকে বেশী শক্ত করিবার জন্য তামার ভাগও বেশ

একটু মিশাইয়া দিয়াছিলেন। পাঁচকড়ির সোনার সঙ্গে যা খাদ ছিল, তাহা রাং সীসা প্রভৃতি কোন নীচ ধাতু নহে, যে ধাতুতে দেবপূজার তৈজস প্রস্তুত করিতে হয়, সেই পবিত্র তাম্র।

সম্পাদকরূপে পাঁচকড়ি যে অতীব ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন, এ কথা আমি বহু সম্পাদকের মুখে শুনিয়াছি; বঙ্গবাসীর স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ, বসুমতীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ, আমার পরম স্নেহভাজন সুরেশ সমাজপতি, বিহারীলাল সরকার প্রভৃতি অনেকেই পাঁচকড়ি বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, "টেলিগ্রাফিক" সংবাদ সম্পাদনে পাঁচকড়ি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দেখিয়াছি, তাঁহার লেখনী-ক্ষিপ্রতা, তাঁহার লিখার রসমাধুর্য্য, ওজস্বিতা ও তেজস্বিতা। তিনি বহু স্থানের, বহু লোকের, বহু সমাজের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত ছিলেন। সংস্কৃত ইংরাজী বাঙ্গালা বহু গ্রন্থ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন এবং পড়িয়া তিনি হজমও করিয়াছিলেন। উপন্যাস-ক্ষেত্রেও পাঁচকড়ির প্রতিভা বেশ উজ্জ্বল ছিল, যে ক্ষমতা বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালীরা প্রায় হারাইতে বসিয়াছে, সেই সামাজিক শিষ্টালাপ, বৈঠকী রসাভাষে পাঁচকড়িকে সহজরূপে পাওয়া যাইত; মজলিসে পাঁচকড়ি বসিলে মজলিস জমিয়া যাইত।

এ সমাজ-জীবন নাটকে যবনিকা-পতন নাই, অভিনয় চলিতেছে; কিন্তু প্রোগ্রাম খুলিয়া দেখিতেছি, পাঁচকড়ি এই যে প্রস্থান করিল,এই তাহার শেষ প্রস্থান, আর তাহার প্রবেশ নাই, সে আর আসিবে না, আর তাহার উদ্দীপ্ত বাণী আমাদিগকে মাতাইয়া তুলিবে না, আর তাহার শেষ ভাষে আমরা হাসিয়া ঢলিয়া পড়িব না, আর তাহার জ্ঞানগর্ভ কথা আমরা মস্তিষ্কে মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পাইব না;—সে মাঝে মাঝে পাঠ ভুলিয়া যাক্, মাঝে মাঝে অবান্তর কথা (Gag) প্রবেশ করাইয়া দিক, তাহার ভূমিকা-গত সকল কথা আমাদের মনের মত হউক বা না হউক, অমনই মনে হইতেছে, আমাদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল!

যে নট অভিনয়কালে দর্শকের সঙ্গে একটা সহানুভূতির সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, আত্মীয়তার বন্ধন বাঁধিয়া ফেলিতে পারে, সে এক জন প্রকৃষ্ট অভিনেতা। ভালয় মন্দয় পাঁচকড়ি আমাদের সঙ্গে সে সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিয়াছিল, সে আমাদের বড় আপনার লোক হইয়াছিল, সেই আপনার লোককে আমরা চিরতরে হারাইয়াছি। আর আমার কথা—সে ত আমার জামাই, আমিও তাহার শ্বশুর, আমার এ পোড়া শুষ্ক চক্ষুও আজ ভিজিয়া উঠিতেছে।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

"ব্যথার সাধ"

বেদনা-তাপে যার শুকা'ল সারা-হিয়া করুণাজলে তারে ঢাক।
যে বুকে আর কেহ নিল না ঠাঁই ক'রে, সে বুকে তুমি শুধু থাক॥
নিবিড় কালমেঘ গোধূলি-বেলা-শেষে,
সকল দিকে যার দাঁড়াল ঘিরে এসে,
তাহার আঁখিপুটে সুদূর প্রভাতের রঙ্গীন ছবিখানি আঁক॥

মুকুলে ঝ'রে গেল যে আশা-কুঁড়িটুকু,
সে যেন চেয়ে থাকে জেগে।
ফুলের মাঝে কবে উঠিবে ফুটে বলে,
দখিন বায়ু-ছোঁয়া লেগে।
একেলা দিশাহারা আঁধার পথমাঝে,
ক্ষত চরণে যার, চলিতে ব্যথা বাজে,
প্রদীপ আলো-খানি দু'হাতে ধ'রে তুমি,
নিকটে এসে তারে ডাক॥

পথিক যেই জন হ[illegible] গো গৃহছাড়া,
বিপুল এই বসুধায়।
পথের পাশে পাশে, সে যেন নিতি নিতি,
আপন ঘর খুঁজে পায়।
ব্যাকুল আঁখি-দুটি শেষের ক্ষণে যার,
সজল হয়ে উঠে কি লাগি বার বার,
মরণ-তুলিকায় অধর'-পরে তার হাসি-রেখা ফুটায়ে রাখ॥

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী।

সিয়ার্-মুতাখ্খরীন্

বন্ধুবর শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" ও শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমাধানের জন্য মালদহের গোলাম হোসেন সলিম্ জৈদপুরীর রিয়াজু-স-সলাতিন এবং পাটনার সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ রচিত সিয়ার্-মুতাখ্খরীন্ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য অন্য কোন পুস্তকের সাহায্য পাওয়া যাইত না। রিয়াজু-স-সলাতিন প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে রিয়াজু-স-সলাতিন অপেক্ষা মূল্যবান্ সিয়ার্-মুতাখ্খরীণ এখনও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৺গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয়ের অনুবাদ সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিবার কথা হইয়াছিল এবং ৺গৌরসুন্দর মৈত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত যোগেন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় ইহার জন্য অনেকের নিকট অগ্রিম মূল্য গ্রহণও করিয়াছিলেন; কিন্তু মাত্র ৪০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন।

সিয়ার্-মুতাখ্খরীণ অত্যন্ত মূল্যবান্ গ্রন্থ। বিশেষতঃ, ইহার গ্রন্থকার সাধারণতঃ সমসাময়িক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া ইহার মূল্য অনেক বেশী। ঔরংজীবের মৃত্যুকাল হইতে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের ভারতেতিহাসের এক প্রধান যুগের বর্ণনীয় ঘটনাপূর্ণ তথ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ, গ্রন্থকারের জীবিতকালে বঙ্গে যে সকল স্মরণীয় ঘটনা ঘটে এবং যাহার অনেকগুলিতে গ্রন্থকার স্বয়ং দর্শক এবং কোন কোন স্থলে কার্য্যকর্ত্তারূপে উপস্থিত ছিলেন, এই অমূল্য গ্রন্থে এই সকল বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল কারণে গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। গ্রন্থখানি হাজিমুস্তাফা নামধারী রেমণ্ড নামক জনৈক ফরাসী কর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থগুলি বিলাতে প্রেরিত হইবার সময়ে জলমগ্ন হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল জন বিগ্রস্ ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কেবল প্রথম খণ্ড প্রকাশেই সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে প্রায় ৭০ বৎসর কেহ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন না। অবশেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার পুস্তকপ্রকাশক ক্যাম্বে কোম্পানী বহু ব্যয়ে এই বিরাট পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন। সে সংস্করণও নিঃশেষ হওয়ায় ক্যাম্বে কোম্পানী পুনর্ব্বার এক সংস্করণ প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গভাষায় এই পুস্তক প্রকাশের কেহই আর উদ্যোগ করিতেছেন না। এরূপ পুস্তকের অনুবাদ অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্য আমরা এই প্রবন্ধে এই পুস্তকের বর্ণিত বিষয় সমূহের আলোচনায় প্রয়াস পাইব।

মুতাখ্খরীণ চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ঔরংজীবের মৃত্যু এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্রগণের গৃহ-বিবাদের বর্ণনাসহ পুস্তকারম্ভ হইয়াছে। ঔরংজীব সম্বন্ধে অবশ্য বিস্তারিত বৃত্তান্ত জানিতে হইলে অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ঔরংজীবের জীবনী পাঠ একান্ত প্রয়োজন। এই খণ্ডেই গ্রন্থকার বাদশাহ ফরকশিয়ারের সহিত হিন্দু রাজপুত্রীর বিবাহের বর্ণনা রহিয়াছে। এই বর্ণনা বিস্তৃত নহে—পরলোকগত আচার্য্য ডাঃ সি, আর্, উইলসন্ মহাশয়ের "বঙ্গদেশে ইংরাজের প্রথম বিবরণী" (Early Annals of the English in Bengal) এবং হুইলার সাহেবের "প্রাথমিক বিবরণ" (Early Record) পাঠ না করিলে ইহার বিস্তারিত ঘটনা অবগত হওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সারমান্ দৌত্যকাহিনী সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থকার কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। একমাত্র কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি রাজধানী দিল্লী হইতে দূরে থাকিতেন বলিয়া সম্ভবতঃ দিল্লীর অনেক সংবাদ তাঁহার পক্ষে অবগত হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

ডাক্তার হ্যামিল্টন কর্ত্তৃক বাদশাহ ফরকশিয়ারের ব্যাধি নিরাময়ের কথাও মুতাখ্‌খরীণে পাওয়া যায় না।

গোলাম হোসেন শিখদিগের অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন; কিন্তু শিখদিগের গ্রন্থের প্রশংসা করিয়াছেন। ফরকশিয়ারের রাজত্বকালে শিখ-বিদ্রোহ ও শিখদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের কথাও তিনি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেন নাই।

শিখদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে হইলে ম্যাকলিফের "শিখধর্ম্ম" (The Sikh Religion) নামক পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য। "মডার্ণ রিভিউ" (Modern Review) নামক মাসিক পত্রের ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার শিখদিগের উত্থান হইতে পতন সম্বন্ধে কি কি পুস্তক ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত প্রমাণপঞ্জী দিয়াছেন। সম্প্রতি-প্রকাশিত "পরবর্ত্তী মুঘল" (Later Moghals) নামক পুস্তকেও শিখদিগের সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় লিখিত "শিখগুরু ও শিখজাতি" নামক পুস্তক ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত ঐ পুস্তকের ভূমিকা পাঠেও শিখজাতিবিষয়ক অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়।

মুতাখ্‌খরীনকার অতঃপর মহারাষ্ট্রজাতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ভারতেতিহাসের সহিত বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট মহারাষ্ট্রজাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বর্ত্তমানে অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিপিবদ্ধ হইতেছে। গ্রাণ্ট ডাফের "মহারাষ্ট্র ইতিহাস" (History of the Marhattas) কামব্রে কোম্পানী ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটীর চেষ্টায় সহজলভ্য হইয়াছে। শিবাজীর জীবনী সম্বন্ধে ছয়খানি পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করিতেছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ডাক্তার সেন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত পুস্তক দুইখানিই ("Sabhasad Bakhar with extracts from Chitnis and Sivadigrijaya" এবং "the administrative History of the Marhattas") বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় যে বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবে।

বর্গীদের বঙ্গদেশ আক্রমণ সম্বন্ধে তারিখ-ই-বাংলায় কিছু কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গ্লাডউইন অনুবাদ করেন—এক্ষণে ইহা সহজলভ্য। সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞাতব্য বিষয় "মহারাষ্ট্র পুরাণে" পাওয়া যায়। এই পুঁথিখানি সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। বন্ধুবর আবদুল আলির অনুগ্রহে এ সম্বন্ধে ইংরাজ কুঠীর আমলের যে সকল পত্র আছে, তাহা আমি পাইয়াছি এবং আশা করি, মহারাষ্ট্র পুরাণের সটীক সংস্করণ আমরা শীঘ্রই যন্ত্রস্থ করিতে পারিব।

গোলাম হোসেনের পুস্তকে আমরা নাদির শাহের আক্রমণের ইতিহাস পাই। ফ্রেজার সাহেবের নাদির শাহ এবং ঐতিহাসিক আর ভিন্ লিখিত প্রবন্ধাবলী (যাহা বর্ত্তমানে "পরবর্ত্তী মুঘলের" অন্তর্ভূত হইয়াছে) পাঠে আমরা এই সময়ের বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। অধ্যাপক সরকার লিখিত এই বিষয়ক প্রবন্ধ ("Delhi during the Anarchy as told in contemporary Records") পুস্তক পাঠ না করিলে পাঠকের এই বিষয়ের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

মুতাখ্‌খরীনের দ্বিতীয় খণ্ডে বঙ্গদেশের নবাবী আমলের বিস্তৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর পরে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ, জব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা আক্রমণ, মিরজাফরের মসনদপ্রাপ্তি, মীর কাসিমের প্রাধান্য—এই সমুদয় বৃত্তান্তই বিশেষভাবে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চক্ষুর সম্মুখেই যে এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, কেবল তাহাই নহে; অনেক ঘটনার সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং তজ্জন্য গ্রন্থের মূল্য অত্যন্ত বেশী। এক জন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে পরবর্ত্তী যুগের হাজার জন নকলনবিশ দাঁড় করাইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই; তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে। এই হিসাবে মুতাখ্‌খরীনের মূল্য অত্যন্ত বেশী। বঙ্গের ইতিহাসপাঠেচ্ছু প্রত্যেকের এই খণ্ড বিশেষভাবে পাঠ একান্ত প্রয়োজনীয়।

সিয়ারের এই ভাগে হতভাগ্য রাজপুত্র ও বাদশা

শাহ আলমেরও বিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে। ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধসংক্রান্ত সকল ঘটনা এই খণ্ডেই স্থানলাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী ভাগে শাহ আলম্‌ কর্ত্তৃক কোম্পানীকে দেওয়ানী প্রদানের বিস্তারিত ঘটনা বিবৃত রহিয়াছে। মুতাখ্‌খরীনকার বলিয়াছেন, "একটি ভারবাহী পশু বিক্রয়ে যে সময় অতিবাহিত হয়, তদপেক্ষা অল্প সময়েও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন।" গোলাম হোসেন বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, ভাগ্যলক্ষ্মী যখন সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন, তখন কিছুই অসম্ভব হয় না; এবং চঞ্চলা কমলা যখন কাহারও প্রতি কুপিতা হয়েন, তখন তাহার ধন, দৌলত, পরিজনবর্গ সকলই অভাগাকে মুহূর্ত্তমধ্যে পরিত্যাগ করে। তাই ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে, দিল্লীর দরবার-গৃহের পরিবর্ত্তে লর্ড ক্লাইবের পট্টাবাসে, ইংরাজ সৈন্যগণের আহার্য্যগ্রহণের টেবলের উপর, ময়ূরতক্ত সিংহাসনের পরিবর্ত্তে "আরাম কেদারা" স্থাপন করিয়া শাহ আলম্‌ কোম্পানীকে সনন্দদান করিয়া নিজকে গৃহশত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ বিবেচনা করিলেন।

গ্রন্থকার এই খণ্ডেই বাঙ্গালার রাজস্ব ও লোকসংখ্যা হ্রাসের দ্বাদশটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার দুই একটি বর্ত্তমান কালেও প্রযুক্ত হইতে পারে। এই খণ্ডে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগের পতনের বিবরণ স্থান পাইয়াছে।

চতুর্থ ভাগে গোলাম হোসেন শিখ ও মহারাষ্ট্রদিগের কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া সম্রাট ঔরংজেবের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি যে অতিশয়োক্তি দোষে দোষী হইতে পারেন না, প্রমাণস্বরূপ তিনি যে বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত জিজিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঔরংজেব সংক্রান্ত অন্যান্য মন্তব্য তীব্র হইলেও সত্য।

এক শত ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অনুবাদক রেমণ্ড সিয়ার্‌-উল্‌-মুতাখ্‌খরীনের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ক্যাম্ব্রে কোম্পানীর অনুগ্রহে ইংরাজী অনুবাদ সুলভ হইয়াছে। প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে পরিষৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সম্পাদকতায় সিয়ার্‌-উল্‌-মুতাখ্‌খরীনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের কল্পনা করেন এবং সামান্য ৪০ পৃষ্ঠা প্রকাশিতও হইয়াছিল। বঙ্গদেশের ইতিহাস জানিতে হইলে এই পুস্তক অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বঙ্গে ইতিহাস-চর্চ্চার এক নূতন যুগ আসিয়াছে। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে,—"There is a tide in the affairs of men which taken in at the flood leads on to fortune." বঙ্গে ধনীর অভাব নাই, কৃতকর্ম্মীও দুর্লভ নহে। আমরা আশা করি, কুমার নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্রগণ এ বিষয়ে অগ্রগামী হইয়া ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

রমণীর মন

(ইংরাজী হইতে)

রমণীর মন ছায়ার মতন,
ধরিতে যাও সে পলাবে দূরে—
কাছ থেকে তার দূরে স'রে যাও
তোমারি পিছু সে বেড়াবে ঘুরে।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

জাগরণ

২

পিতার সঙ্গে আলেখ্য জীবনে এই প্রথম তাহার স্বর্গীয় পিতামহগণের পল্লীবাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স তাহার বেশী নয়, তথাপি এই বয়সেই সে তিনবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে। দারজিলিং ও সিমলার পাহাড় বোধ করি কোন বৎসরেই বাদ পড়ে নাই; চা ও ডিনারের অসংখ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে, এবং মা বাঁচিয়া থাকিতে নিজেদের বাটীতেও তাহার ত্রুটিহীন বহু আয়োজনে যোগ দিয়াছে। গান-বাজনার মজলিস হইতে সুরু করিয়া খেলাধুলা ও সাধারণ সভা-সমিতিতে কি ভাবে চলা-ফিরা করিতে হয়, সোসাইটীতে কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে হয়, কোথায়, কবে এবং কোন্ সময়ে কি পোষাক পরিতে হয়, কোন্ রঙ, কোন্ ফুল, কখন্ কাহাকে মানায়, এ সকল ব্যাপার সে নির্ভুলভাবেই শিক্ষা করিয়াছে; রুচি ও ফ্যাসান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার বাকি কিছু আর তাহার নাই, শুধু কেবল এই খবরটাই সে এত কাল লয় নাই, এ সকল কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া আসে। মা ও মেয়ে এত দিন শুধু এইটুকুমাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে তাহাদের কল্প-বৃক্ষ আছে, তাহার মূলে জলসেক করিতে হয় না, খবরদারী লইতে হয় না, শুধু তাহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই সোনা ও রূপা ঝরিয়া পড়ে। জননী ত কোন দিনই গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু আলেখ্য কখন কখন যেন লক্ষ্য করিয়াছে, এই বিপুল অপব্যয়ের যোগান দিতে পিতা যেন মাঝে মাঝে কেমন এক প্রকার বিরস, ম্লান ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। তাঁহাকে এমন আভাস দিতেও সে দেখিয়াছে বলিয়াই মনে পড়ে, যেন এতখানি বাড়াবাড়ি না হইলেই হয় ভাল। অথচ, প্রত্যুত্তরে মায়ের মুখে কেবল এই কথাই সে শুনিয়া আসিয়াছে যে, সমাজে থাকিতে গেলে ইহা না করিলেই নয়। শুধু অসভ্যদের মত বনে জঙ্গলে বাস করিলেই কোন খরচ করিতে হয় না।

পিতাকে প্রতিবাদ করিতে কখন দেখে নাই,—কিন্তু চুপ করিয়া এমন নির্জ্জীবের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে যে, ধুমধামের মাঝখানে গৃহকর্ত্তার সে আচরণ একেবারেই বিসদৃশ। কিন্তু সে তো ক্ষণিকের ব্যাপার, ক্ষণকাল পরে সে ভাব হয় ত আর তাঁহাতে থাকিত না। বিশেষতঃ তখনও কত আয়োজন, কত কায বাকি,—নিমন্ত্রিতগণের গাড়ী ও মোটর আসিবার মুহূর্ত্ত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—সে লইয়া মাথাব্যথা করিবার সময় ছিলই বা কই? এম্নি করিয়াই এই মেয়েটির ছেলেবেলা হইতে এত কাল কাটিয়াছে এবং ভবিষ্যতের দিনগুলাও এম্নি ভাবেই কাটিবার মত করিয়াই মা তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

দিন চারেক হইল, তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। জমীদারের বাড়ী, বড় লোকের বাড়ী,—বড় লোকের জন্যই নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোথাও কোন ত্রুটি নাই, তথাপি কত অভাব, কত অসুবিধাই না আলেখ্যর চোখে পড়িতেছে! বসিবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘরগুলার আগাগোড়া পেণ্টিং নূতন করিয়া না করাইলে ত একটা দিনও আর বাস করা চলে না। দরজা-জানালার কদর্য্য রঙ বদল না করিলেই নয়। আসবাবগুলা সব মান্ধাতার কালের, না আছে ছাঁদ, না আছে তাহার শ্রী, ধুলায় ধুলায় বার্ণিশ ত না থাকার মধ্যেই, সুতরাং এ বাটীতে থাকিতে হইলে এ সকলের প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা অসম্ভব। যেমন করিয়া হউক, চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে হইবে না। এই প্রস্তাব লইয়া সে দিন সকালে আলেখ্য তাহার পিতার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবা এক জন অল্পবয়সী অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, মেয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতে কহিলেন, ইনি আমাদের পুরোহিত-বংশের দৌহিত্র, অমরনাথ ন্যায়রত্ন, আমাদেরই জমীদারীর অন্তর্ভুক্ত বরাট গ্রামে এঁর পৈতৃক টোলে অধ্যাপনা সুরু করেছেন,—ইনি আমার কন্যা আলেখ্য রায়,—মা, এঁকে প্রণাম কর।

আদেশ শুনিয়া আলেখ্যর গা জলিয়া গেল। একে ত একান্ত গুরুজন ব্যতীত ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার রীতি তাহাদের সমাজে নাই বলিলেই হয়, তাহাতে আবার এই অপরিচিত লোকটি পুরোহিত বংশের। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে শিশুকাল হইতে সংখ্যাতীত অভিযোগ শুনিয়া আসিয়াছে; ইহাদের অন্ধতা, অজ্ঞতা ও নিরতিশয় সঙ্কীর্ণতাই যে দেশের সকল অনিষ্টের মূল, ইহাদের প্রতিকূলতার জন্যই যে তাহারা হিন্দু সমাজে স্থান পায় না, এই বিশ্বাসই তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এখন তাহাদেরই এক জন অজানা ব্যক্তির পদতলে কিছুতেই তাহার মাথা হেঁট হইতে চাহিল না। সে হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করিয়া কোন মতে তাহার পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল। কিন্তু এটুকু তাহার চক্ষু এড়াইল না যে, সে ব্যক্তি নমস্কার তাহার ফিরাইয়া দিল না, শুধু নীরবে একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। আলেখ্য পলকমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সে পিতার সঙ্গেই কথা কহিতে আসিয়াছিল,—সুতরাং যে অপরিচিত, তাহাকে অপরিচিতের মতই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গেই কথা কহিতে নিরত হইল, তথাপি সকল সময়েই সে যেন অনুভব করিতে লাগিল, এই অপরিচিত অধ্যাপকের অভদ্র বিস্মিত দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে যেন নিঃশব্দে আঘাত করিতেছে।

আলেখ্য কহিল, বাবা, ঘরগুলো সব কি হয়ে আছে, তুমি দেখেছ?

পিতা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, কেন মা, বেশ ভালই ত আছে।

কন্যা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল। কহিল, ওকে তুমি ভাল বল বাবা? বিশেষ ক'রে বস্‌বার আর খাবার ঘর দুটো? আমার ত মনে হয়, তাড়াতাড়ি একবার পেণ্ট করিয়ে না নিলে ওতে না বসা, না খাওয়া কোনটাই চল্‌বে না। আচ্ছা, লোকগুলো তোমার এত দিন করছিল কি? আমার মতে এদের সব জবাব দেওয়া দরকার। পুরাণো লোক দিয়ে কায হয় না,—তারা শুধু ফাঁকিই দেয়।

পিতা মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিলেন, সে ঠিক কথাই বটে, কিন্তু হোলোও ত অনেক দিন মা,—বাস না করলেও ঘর-দোরের শ্রী থাকে না।

আলেখ্য কহিল, সে শ্রী অন্য রকমের, নইলে এ কেবল তাদের অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। আমি ম্যানেজার থেকে চাকর, মালী পর্য্যন্ত সকলের কৈফিয়ৎ নেবো। দোষ পেলেই শাস্তি দেবো, বাবা, তুমি কিন্তু তাতে বাধা দিতে পারবে না।

পিতা হাসিয়া কহিলেন, বাধা দিতে যাবো কেন মা, সমস্তই ত তোমার। তোমার ভৃত্যদের তুমি শাসন করবে, আমি কেন নিষেধ কোরব? বেশ জানি, অন্যায় তুমি, কারও পরেই করবে না।

কন্যা মনে মনে খুসি হইল। কহিল, ফারনিচারগুলোর দশা এমন হয়েছে যে, সেগুলো ফেলে দিলেই হয়। চার পাঁচ হাজার টাকার কমে বোধ করি কিছুই কর্‌তে পারা যাবে না।

এত টাকা? বৃদ্ধ শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, কিন্তু এ জঙ্গলে তুমি ত থাক্‌তে পার্‌বে না আলো, দু দিনের জন্যে খরচ ক'রে সমস্তই আবার এম্‌নি ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।

আলেখ্য মাথা নাড়িল। কহিল, আমি স্থির করেছি, বাবা, এবার আমরা থাক্‌বো। যদি যেতেও হয়, বছরে অন্ততঃ, দুবার ক'রে আমরা বাড়ীতে আস্‌বই। চোখ না রাখলে সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি নিশ্চয় বুঝ্‌তে পেরেছি।

পিতা প্রফুল্ল মুখে বার বার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এত কাল পরে এ কথা যদি বুঝে থাকো আলো, তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে? এই বলিয়া অধ্যাপকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কি বল অমরনাথ, এত দিনে মেয়ে যদি এ কথা বুঝে থাকেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি আছে?

অধ্যাপক হাঁ না কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু কন্যা হাসিয়া কহিল, আমার বুঝতে ত খুব বেশী দিন লাগেনি বাবা, লাগ্‌লো তোমার। বছর দশ পনেরো আগেও যদি বুঝতে, আজ আমাকে আবার সমস্ত নূতন ক'রে করতে হোত না।

কন্যার ইচ্ছাকে বাধা দিবার শক্তি বৃদ্ধের ছিল না। কিন্তু তাঁর মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কহিলেন, যদি করতেও হয়, তার তাড়াতাড়ি কি? ধীরে সুস্থে করলেও ত চলবে।

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবা, সে হয় না। এই

অঙ্গরাগ

শিল্পী—শ্রীআর্য্যকুমার চৌধুরী

"আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস
আমার ভুবন শূন্য ক'রেছি
তোমার পূরাতে আশ।"

চয়নিকা—রবীন্দ্রনাথ।

বলিয়া সে তাহার হাতের একখানা ইংরাজি উপন্যাসের পাতার ভিতর হইতে খুঁজিয়া একখানা টেলিগ্রাম পিতার হাতে তুলিয়া দিল। তিনি পকেট হইতে চস্‌মা বাহির করিয়া কাগজখানি আদ্যোপান্ত বার দুই তিন পাঠ করিয়া কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত! কমলকিরণ তাঁর মা ও ভগিনীকে নিয়ে কলকাতায় আস্‌ছেন, সম্ভবতঃ ঘোষ সাহেবও আস্‌তে পারেন। কি নাগাদ তাঁরা এ বাড়ীতে আস্‌বেন, কিছু জানিয়েছেন?

মেয়ে কহিল, কলকাতায় এসে বোধ হয় জানাবেন।

রে সাহেব চস্‌মা খুলিয়া খাপে পুরিয়া পকেটে রাখিলেন, সমস্ত মাথা-জোড়া টাকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু বলিলেন, তাই ত—

তাহার অকাল-বৃদ্ধ পিতার অসচ্ছলতার পরিমাণ ঠিক না জানিলেও আলেখ্য কিছু দিন হইতে তাহা সন্দেহ করিতেছিল; এবং হয় ত, এখনই এ লইয়া আলোচনাও করিত না, কিন্তু তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কত টাকা তোমার আবশ্যক ব'লে মনে হয়, আলো? নিতান্তই যা না হ'লে নয়, এম্‌নি—

আলেখ্য মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল, দাম ঠিক বল্‌তে পারব না বাবা, কিন্তু গোটা চারেক শোবার ঘর অন্ততঃ চাই-ই। গোটা চারেক ড্রেসিং টেবল, গোটা দশেক ইজি চেয়ার—

সাহেব সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, গোটা দশেক? একটুখানি থামিয়া অধ্যাপকের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিলেন, অমরনাথ, তোমার বিদেশী ছাত্রদের সম্বন্ধে—দেখ, আমি বিশেষ দুঃখিত হয়েই জানাচ্ছি—সাহায্য যে কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবো, তা আমার মনে হয় না।

অধ্যাপক শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে আমারও মনে হয় না, রায় মশায়।

ক্রোধে আলেখ্যর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাহাদের পারিবারিক আলোচনার সূত্রপাতেই যে অপরিচিত অভদ্র লোকটার সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, সে শুধু কেবল বসিয়াই রহিল, তাহা নয়, প্রকারান্তরে তাহাতে যোগ দিল। সে-ও আবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। বিশেষ করিয়া পিতার প্রতি তাহার সম্বোধনের ভাবটা মেয়ের কানে যেন সূচ বিঁধিল। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু আলেখ্যর চিরদিনের শিক্ষা তাহাকে অসংযত হইতে দিল না, সে বাহিরের এই ভিক্ষুকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, না হ'লে হবে কেন বাবা। তা' ছাড়া খাটের গদিগুলো সব মেরামত করানো চাই, ঘরে কার্পেট নেই, তাও কিন্‌তে হবে, চা এবং ডিনার সেট সব আনিয়ে নিতে হবে, হয় ত তিন চার হাজারেও কুলোবে না, আরও বেশী টাকার দরকার হয়ে পড়বে।

বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

এত বড় নিশ্বাসের পরে মেয়ের পক্ষে হাসা কঠিন, তবুও সে জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল, যে সমাজের যে রকম রীতি। তাঁরা এলে তুমি ত আর রাইট রয়েল ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলে ভাঁড় এবং কলাপাত দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে পারবে না, ইজি চেয়ারের বদলে কুশাসন পেতেও অতিথি-সৎকার চলবে না। উপায় কি?

রে সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, বেশ, তাই হবে। বাস্তবিক না হলেই যখন নয়, তখন ভাবনা বৃথা। তা হ'লে তুমি একটা ফর্দ্দ তৈয়ারী ক'রে ফেল।

আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি সমস্ত ঠিক ক'রে নেবো বাবা, তুমি কিছু ভেবো না। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার ভাবনার ত কিছুই ছিল না বাবা, শুধু যদি একটুখানি চোখ রাখতে।

পিতা কথা কহিলেন না, বোধ করি, মনে মনে এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন যে, দুই চক্ষু ত এখন বিস্ফারিত হইয়াই খুলিয়াছে, কিন্তু দুশ্চিন্তার পরিমাণ তাহাতে কমিতেছে কই? মেয়ে কহিল, তোমাকে কিন্তু আমি আর সত্যিই কিছু কর্‌তে দেব না বাবা, যা কিছু করবার, আমিই কোরব। কত অপব্যয়ই না এই দীর্ঘকাল ধ'রে নির্ব্বিঘ্নে চ'লে আস্‌ছে! কিসের জন্যে এত লোকজন? চোখে দেখতে পায় না, কানে শুন্‌তে পায় না, এমন বোধ হয় বিশ পঁচিশ জন কাছারী জুড়ে ব'সে আছে। আমরণ তারা কি ফাঁকি দিয়েই কাটাবে? আমি সমস্ত বিদায় দিয়ে ইয়ং মেন বহাল কোরব। ঠিক অর্দ্ধেক লোকে ডবল কায পাবো। কতগুলো ঠাকুরবাড়ীই রয়েছে বল ত? কত

টাকাই না তাতে বৃথা ব্যয় হয়। একা এর থেকেই ত বোধ হয় আমি বছরে দশ বারো হাজার টাকা বাঁচাতে পারবো।

বৃদ্ধ বোধ করি এতক্ষণ তাঁহার আগচ্ছমান সম্মানিত অতিথিবর্গের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন, এ দিকে তেমন মন ছিল না, কিন্তু কন্যার শেষ কথাটা কানে যাইবামাত্র একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, কার থেকে বাঁচাবে বল্‌ছ মা, দেবসেবা থেকে? কিন্তু সে সমস্ত যে কর্ত্তাদের আমল থেকে চ'লে আস্‌ছে, তাতে হাত দেবে কি ক'রে?

মেয়ে কহিল, কর্ত্তারা নয় ত কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি বাবা, তুমি নিজে কতগুলো পুতুলপুজো বসিয়েছ? এ অপব্যয়ের সূত্রপাত তাঁরাই ক'রে গেছেন জানি, কিন্তু অন্যায় বা ভুল যাঁরাই কেন না ক'রে থাকুন, তার সংশোধন করা ত প্রয়োজন? তোমার ত মনে আছে বাবা, মা তোমাকে কত দিন এই সব বন্ধ ক'রে দিতে বলেছিলেন।

পিতা চুপ করিয়া শুধু একদৃষ্টে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই বিস্ময়-ক্ষুব্ধ চোখের সম্মুখে আলেখ্য কেবলমাত্র যেন নিজের লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই সহসা বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কি এই সব পুতুলপুজো বিশ্বাস কর?

পিতা কহিলেন, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের উপর ত এঁদের প্রতিষ্ঠা হয়নি, মা।

কন্যা কহিল, তবে তুমি কেন এর ব্যয় বহন করবে, বাবা?

পিতা বলিলেন, আমি ত করিনে, আলো। যাঁরা মাথায় ক'রে এনে স্থাপিত করেছিলেন, আমার সেই পিতৃ-পিতামহেরাই এখনো তাঁদের ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন। যে সব পুতুল-দেবতাদের তুমি বিশ্বাস করতে পারো না মা, তাঁদেরও বঞ্চিত করতে তোমাকে আমি দিতে পারব না।

প্রত্যুত্তরে আলেখ্য পিতার এই হীন দুর্ব্বলতার একটা তীক্ষ্ণ জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু একান্ত বিস্ময়ে সে কথা ভুলিয়া গেল। যে অধ্যাপকটি এতক্ষণ নীরবে বসিয়া-ছিল, অকস্মাৎ সে হেঁট হইয়া হাত দিয়া সাহেবের বুটের তলা হইতে ধুলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপার কি হে, অমরনাথ? তুমি আবার এ কি করলে?

অমর সবিনয়ে কহিল, কিছুই না রায় মশায়, এসে আপনাকে প্রণাম করা হয়নি, শুধু সেই ক্রটিটা এখন সেরে নিলাম।

সাহেব বলিলেন, ক্রটি কিসের হে, আমার মত লোককে তুমি প্রণাম করতে যাবে কিসের জন্যে? আমি ত ব্রাহ্মণই নয় বল্‌লে হয়।

অমর কহিল, সে আপনি জানেন। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন কোরলাম মাত্র। অজ্ঞাতে কত ভুল, কত অন্যায়ই না মানুষের হয়।

বুড়া বোধ হয় বুঝিলেন না, বলিলেন, সে তো সর্ব্বদাই হচ্ছে অমরনাথ, মানুষের ভুল-ভ্রান্তির কি আর সীমা আছে? কিন্তু আমাকে প্রণাম না করাটা তোমার ভুলের মধ্যে নয়,—আমি আর ওর যোগ্যই নয়।

অমরনাথ এ কথার প্রতিবাদ করিল না,—কোন জবাবই দিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না আলেখ্য। গায়ে পড়িয়া কথা কহা তাহার শিক্ষাও নয়, স্বভাবও নয়, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রোধে পর্য্যবসিত হইয়া প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল, বাবা, এখন কিন্তু তোমার ওঁর বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য না করলেই নয়।

ভালমানুষ বুড়া এ বিদ্রূপের ধার দিয়াও গেলেন না, আন্তরিক সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, সাহায্য করাই ত কর্ত্তব্য, মা, কিন্তু তুমি কি মনে কর, এ সময়ে আমরা বিশেষ কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারবো?

মেয়ে কহিল, সাহায্যই যদি কর বাবা, একটু লুকিয়ে কোরো। তোমার দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে বিপদ হবে।

পিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, বিপদ হবে?

অধ্যাপক হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠি-লেন। বলিলেন, বিপদ হবে না, হবে না,—আপনি কোন ভয় করবেন না। ড্রেসিং টেবল্ আর কাঁটা-চাম্‌চে-ডিসের নীচে সমস্ত চাপা প'ড়ে যাবে।

আঘাত করিতে পাইয়া আলেখ্যর মনের তিক্ততা এই অপরিচিত লোকটির বিরুদ্ধে কতকটা ফিকা হইয়া

আসিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অপরের তীক্ষ্ণ পরিহাসের প্রতিঘাতে হঠাৎ সে যেন একেবারে ক্রূর হইয়া উঠিল। আলেখ্য সব ভুলিয়া প্রত্যুত্তরে কহিল, চাপা পড়তে পারে বটে, কিন্তু বুটের ধুলোর দামটাও ত আপনাকে দিতে হবে! কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজেই যেন লজ্জায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এত বড় নিষ্ঠুর কদর্য্য কথা যে কি করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না। রে-সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি যত সাদা-সিধাই হউন, এ কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। বেহারা আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে, ভদ্রলোকগুলি বাহিরের ঘরে বহুক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিতেছেন।

বল গে যাচ্ছি, বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শান্তকণ্ঠে কহিলেন, কথাটা তোমার ভাল হয়নি আলো। অমরনাথ, তুমি একটু বোসো, আমি এখনি আস্‌ছি। এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আলেখ্য তাঁহার পিছনে পিছনেই ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু যে লোকটি বসিয়া রহিল, তাঁহারও মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। পিতা দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেই নিরতিশয় লজ্জার সহিত আস্তে আস্তে কহিল, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি স্বীকার করছি, আপনাকে ও কথা বলা আমার ভাল হয়নি।

অধ্যাপক কহিলেন, না, ভাল হয়নি।

এই সোজা কথাটাও আলেখ্যর কিন্তু ভাল লাগিল না। সে এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, পিতাকে মর্য্যাদা দেখালে কন্যার খুসি হবারই কথা। আমার বাবা অত্যন্ত ভাল মানুষ, তাঁর সঙ্গে ছলনা করাও আপনার উচিত হয়নি।

অধ্যাপক কহিলেন, ছলনা ত করিনি।

আলেখ্য প্রশ্ন করিল, আড়ম্বর ক'রে হঠাৎ পায়ের ধুলো নেওয়াই কি সত্য?

অধ্যাপক কহিলেন, সত্য বই কি।

আলেখ্য বলিল, তা' হ'লে আমার আর কিছুই বল্‌বার নেই। আমি ভুল বুঝেছিলাম। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনার পুরোহিতের ব্যবসা, সুতরাং বাবার দুর্ব্বলতায় আপনার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁর ধর্ম্ম-বিশ্বাস অন্য প্রকারের, ঠাকুর-দেবতা যিনি কোন দিন মানেন না, তাঁর পক্ষে এই অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি আপনিই অন্যায় মনে করেন না?

অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না, করিনে। অন্যায় কেবল সেইখানেই হ'তো, স্নেহের দুর্ব্বলতায় যদি তিনি আপনাকে প্রশ্রয় দিতেন,—তাঁর নিজের অবিশ্বাস যদি তাঁর কর্ত্তব্যকে ডিঙ্গিয়ে যেতো।

অধ্যাপকের জবাবের মধ্যে খোঁচা ছিল, আলেখ্যর দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিল, আপনার বক্তব্য এই যে, নিজের বিশ্বাস যার যেমনই হউক, যা চ'লে আস্‌ছে, তাকে চল্‌তে দেওয়াই কর্ত্তব্য!

অধ্যাপক হাসিলেন, বলিলেন, আপনার ওটা বিলাতী ঢঙের অত্যন্ত মামুলি যুক্তি। নিজের বিশ্বাসের দাবী একটা আছেই, কিন্তু তার পরের কথা আপনি যখন জানেন না, তখন এ তর্কে শুধু তিক্ততাই বাড়বে, আর কোন ফল হবে না। কিন্তু সে যাক্, ঠাকুরবাড়ীর পুতুল-দেবতারা সত্যই হোন্, মিথ্যাই হোন্, কথা যে কন না, এ কথা খুবই সত্য। তাঁদের অনাহারে রাখলেও তাঁরা আপত্তি করবেন না। কিন্তু এত টাকার বিলাতী আয়না এবং বিলাতী মাটীর বাসন কিন্‌লে যারা আপত্তি করবে, তারা কথাও কবে। হয় ত, খুব উঁচু গলাতেই কথা কবে। এ কায করবার চেষ্টা আপনি করবেন না।

এইবার তাঁহার সমস্ত কথার মধ্যেই এমন একটা তাচ্ছল্যের ইঙ্গিত ছিল যে, আলেখ্য নিজেকে শুধু অপমানিত নয়, লাঞ্ছিত জ্ঞান করিল। এতক্ষণ পরে সে যথার্থই ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বার বার এই লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পরিধানের হাতের সূতার মোটা কাপড়, মোটা উত্তরীয়, এবং খালি পা লক্ষ্য করিয়া অতুচ্চ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আপনি বোধ হয় এক জন নন্-কো-অপারেটর, না?

অধ্যাপক কহিলেন, হাঁ।

এখানে বটুকদেব কার নাম জানেন?

জানি। আমারই ডাক নাম।

আলেখ্য কহিল, তাই বটে! তা হ'লে সমস্তই বুঝেছি। কিন্তু জিনিষ কেনা আমার কি ক'রে বন্ধ কর্‌বেন? আমার প্রজাদের বোধ করি খাজনা দিতে নিষেধ ক'রে দেবেন?

অধ্যাপক কহিলেন, অসম্ভব নয়। প্রজাদের অনেক দুঃখের টাকা।

আলেখ্য বলিল, কিন্তু তাতেও যদি বন্ধ না হয়, বোধ হয়, ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবেন?

অধ্যাপক কহিলেন, ভাঙ্গবো কেন, আপনাকে কিন্‌তেই ত দেব না।

আলেখ্য ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় ভিতরের দুঃসহ ক্রোধ দমন করিল। শান্তকণ্ঠে কহিল, দেখুন, অমরনাথ বাবু, এ বিষয়ে আমার শেষ কথাটা আপনি শুনে রাখুন। বাবা নিরীহ মানুষ. কিন্তু আমি নিরীহ নই। তা হ'লে আমার আসার প্রয়োজন হ'ত না। আপনাদের নন্-কোঅপারেশন ভাল কি মন্দ, আমি জানি নে,—ভালও হ'তে পারে। কিন্তু আমার প্রজা, আমার আয়-ব্যয়, আমার সাংসারিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার ধাক্কা বাধিয়ে দেবেন না। পুলিসকে আমি ভালবাসিনে, তাদের দিয়ে দেশের লোককে শাস্তি দিতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমার হাত-পা বেঁধে দিয়ে আমাকে নিরুপায় ক'রে তুল্‌বেন না। এই বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল, অমরনাথ ডাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এমন যদি হয়, আপনি অন্যায় করছেন?

আলেখ্য দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার সঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের ধারণা আমার এক না-ও হ'তে পারে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। যে রহিল, সে শুধু অবাক্ হইয়া সেই মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রলোভন

চাকুরী কমিশন

এ দেশে যে সব ইংরাজ চাকুরী করিতে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের মুখে এবং তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন-স্বজাতির মুখে একটা কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা ভারতবাসীর প্রতি একান্তই দয়াপরবশ হইয়া ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য চাকুরী করিতে এ দেশে আসিয়াছেন। অথচ এ দেশে ইংরাজের আগমনাবধি আজ পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, অর্থ ব্যতীত স্বার্থত্যাগ করিয়া কোন ইংরাজ চাকুরীয়া এ দেশে চাকরী করিতে আইসেন নাই। এ দেশে ইংরাজ চাকরীয়াদের বেতনও দেশের লোকের অবস্থার অনুপাতে অত্যন্ত অধিক। তবুও এই সকল ইংরাজ চাকরীয়া কেবলই বেতন-বৃদ্ধির জন্য চীৎকার করেন। ইঁহারা নির্দ্দিষ্ট বেতনে চাকুরী করিতে আসিলেও বাট্টা বিভ্রাটের জন্য ইঁহাদিগকে ক্ষতিপূরণ (Exchange Compensation Allowance) দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে তাহা বাতিল করিয়া তাহার স্থানে সাগরান্তর ভাতা বা Over-seas Pay দেওয়া হইতেছে। তাহাতেও তাঁহাদের টাকার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। বেতনের হিসাব ধরিলে এই হিসাবেই তাঁহাদের প্রাপ্য কত বাড়িয়াছে, আমরা নিম্নে তাহা দেখাইয়া দিলাম :—

বেতন টাকা	বাট্টার ক্ষতিপূরণ টাকা আনা পাই	সাগরান্তর ভাতা টাকা
৬০০	৩৭—৮—০	১০০
৭০০	৪৩—১২—০	১৫০
৮০০	৫০—০—০	২০০
৯০০	৫৬—০—০	২০০
১০০০	৬২—৮—০	২০০
২০০০	১২৫—০—০	২৫০

৩৪—১৭

কাযেই দেখা যাইতেছে, সাগরান্তর ভাতা দিয়া বাট্টার ক্ষতিপূরণ অপেক্ষা অধিক টাকা চাকুরীয়াদের পকেটে দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যখন এ দেশে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইল, তখন এ দেশে শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়ারা বিদ্রোহ করিবার ভয় দেখাইলেন, যখন এ দেশের কালা মন্ত্রীর তাঁবে তাঁহাদিগকে কায করিতে হইবে, তখন মান থাকিবে না। বোধ হয়, তাঁহাদের মানের মূল্য টাকায় হিসাব করা যায়। সেই জন্য ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগুর আমলে তাঁহাদিগের বেতন বাড়াইয়া দিলেই তাঁহাদের কলরব নীরব হয়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে মিষ্টার লানের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব শাসন-সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই সব চাকুরীয়ার বেতনবৃদ্ধির যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সিভিল সার্ভিস............................ ৫৪ লক্ষ টাকা
পুলিস সার্ভিস..................১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
শিক্ষা সার্ভিস...................... ......১৫ লক্ষ টাকা
সেনাদলের বৃটিশ কর্ম্মচারীরা......২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা
মেডিক্যাল সার্ভিস..............৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

এই বৃদ্ধির ফলে কিছুদিন শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়াদের চীৎকার থামিয়াছিল।

তাহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টেই আর্ল উইণ্টারটন সিভিল সার্ভিসের বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

বেতন—

(ক) আরম্ভের সময় বেতন শতকরা ৫০ টাকা হিসাবে বাড়ান হইয়াছে ;

(খ) প্রতি বৎসর বেতনবৃদ্ধির নিয়ম হইয়াছে ; ফলে —পূর্ব্বে কোন কোন প্রদেশে পদোন্নতিতে যে বিলম্ব হইত, এখন আর তাহা হয় না ;

(গ) সাধারণ চাকুরীতে সকলেরই বেতন বিশেষরূপ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

পেন্সন—১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫ হাজার টাকা "এনুইটী" হিসাবে ধরা হইতেছে।

ছুটীর নিয়ম—ছুটার নিয়ম আরও সুবিধাজনক করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতনে ছুটী দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ বৎসরের গড় আয় ধরিয়া "ফার্লো" দেওয়া হইত, এখন পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ মাসের গড় বেতন ধরিয়া দেওয়া হয়।

সফরের ও বদলীর ভাতা—সফরের ও বদলীর ভাতাও পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, আরম্ভেই বেতন পূর্ব্বের তুলনায় দেড়গুণ করা হইয়াছে। "ফার্লোর" নিয়মে যে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কথা পাঠকদিগকে একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ বৎসরের গড় বেতন ধরিয়া 'ফার্লোর" বেতন দেওয়া হইত; এখন ১ বৎসরের গড় বেতন ধরা হয়। ফলে এই হয় যে, যে ব্যক্তি ১ বৎসর অস্থায়িভাবে মোটা বেতনে চাকুরী করিয়াছে, সে সেই অস্থায়ী চাকুরী শেষ হইলে স্থায়ী অল্প বেতনে চাকুরীতে না যাইয়া ১ বৎসর মোটা অস্থায়ী বেতনে ছুটী লয়। কি চমৎকার ব্যবস্থা!

ইহার উপর আরও একটা সুবিধা আছে; সেটা "অগ্রিম" লওয়া। যে কোন চাকরীয়া ছুটা লইয়া বিলাতে যাইবার সময় বিনা সুদে "অগ্রিম" টাকা লইয়া যাইতে পারেন; বিলাত হইতে ফিরিবার সময় তিনি আর এক দফা "অগ্রিম" লইয়া আসিতে পারেন। তাহার পর বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিয়াই তিনি আবার ১ হাজার টাকা "অগ্রিম" লইতে পারেন। তাহার উপর আবার তিনি মোটর কিনিলে তাহার জন্যও "অগ্রিম" লইতে পারেন। আমরা শুনিয়াছি, বিহারের গভর্ণর সার হেনরী হুইলারেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

এইরূপে এক এক জন চাকুরীয়ার "অগ্রিম" কেবলই বাড়িতে থাকে এবং শেষে যখনই সে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা হয়, তখনই তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের বেতনে খাইতে কুলায় না—তাঁহারা বিনা সুদে যে টাকা ধার লইয়াছেন, তাহা শোধ করিতে পারিবেন না। আর সেই অজুহতে তাঁহারা কেবলই বেতন বাড়াইবার জন্য চীৎকার করেন।

পরলোকগত মিষ্টার ডিগবী যখন ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থাবিষয়ক পুস্তক রচনা করেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তৎকালীন **ভারত-সচিবের বেতন যোগাইতে ৯০ হাজার ভারতবাসীর বার্ষিক আয় লাগিয়াছে।**

১৯০০ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টে যে হিসাব দাখিল করা হইয়াছিল, তাহাতে ভারতে বার্ষিক ১ হাজারের উপর বেতনের চাকুরীয়াদের বেতনের হিসাবে এইরূপ দেখা গিয়াছিল:—

(১) ১৩ হাজার ১ শত ৭৮ জন যুরোপীয়ের বার্ষিক বেতন ৮ কোটি ৭৭ লক্ষ ১৪ হাজার ৪ শত ৩১ টাকা;

(২) ১১ হাজার ৫ শত ৫৪ জন ভারতবাসীর বার্ষিক বেতন—২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪ শত ১৩ টাকা।

য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে বেতন ব্যতীত ছুটীর ভাতা বার্ষিক ৪৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৩ শত ১৪ টাকা দিতে হয় আর ভারতের রাজস্ব হইতে বিলাতে য়ুরোপীয়দিগকে দিতে হয় বৎসরে—৫ কোটি ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার ১ শত ৭৩ টাকা।

ইংরাজ বলিতেছেন বটে, এ দেশে দায়িত্বশীল শাসন বা স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাই ভারতে ইংরাজ-শাসনের উদ্দেশ্য; কিন্তু সে কথার সহিত এইরূপ বেতন দিয়া বিদেশী কর্ম্মচারী নিয়োগের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? বিলাতের লোকের বিশ্বাস, এই সব কর্ম্মচারী না থাকিলে এ দেশ সুশাসিত হইবে না। ইংরাজের এই স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবক ল্যাবুশিয়ার একবার পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন—"Englishmen are curiously intolerant when any country under their rule ventures to have the same virtues as themselves."

এবার এই চাকুরীয়াদের চাকুরীর বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য অবার একটি কমিশন বসিয়াছে। কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়ারা নানারূপ আব্দার ধরিয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের চাকুরীয়ারা মুখে বলিয়াছেন, তাঁহারা শাসন-সংস্কারের সমর্থন করেন। তাঁহারা এ দেশের

চাকুরীতে ভারতীয়দিগের অধিকারবৃদ্ধির সমর্থনের ছলে আপনাদের সুবিধা করিয়া লইবার কেমন প্রস্তাব করিয়াছেন দেখুন :—

ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দিগকে জিলার ভার দেওয়া হউক এবং সে জন্য প্রাদেশিক সার্ভিসের একটা নূতন উন্নত অঙ্গ করা হউক। সেই চাকুরীয়া ভারতবাসীরা জিলার ভার পাইবেন। আর য়ুরোপীয় চাকুরীয়ারা মহা মুরুব্বী হইয়া এক দিকে এই সব জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে আর এক দিকে ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিবেন। এইরূপে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যভার না লইয়া য়ুরোপীয় উপদেশকরা এক এক স্থানে আড্ডা গাড়িবেন। তাঁহাদিগকে যে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীন স্থানের এলাকায় বাস করিতে হইবে, এমন নহে। শ্বেতাঙ্গ উপদেষ্টারা এক একটি কেন্দ্রে—শ্বেতাঙ্গ-বারিক রচনা করিয়া তথায় বাস করিবেন। কালা আদমীরা কায করিবে, আর শ্বেতাঙ্গ উপদেষ্টারা মোটা মাহিয়ানা পাইবেন।

যুক্তপ্রদেশের এই চাকুরীয়ারা বলেন, তাঁহারা চাকুরীতে অধিকসংখ্যক ভারতবাসীর নিয়োগের বিরোধী নহেন। কেবল তাঁহারা বলেন,সৈনিক-বিভাগে যে ভাবে ভারতবাসীর সংখ্যা বাড়ান হইবে, শাসন-বিভাগেও সেইভাবে বাড়াইতে হইবে। তাঁহারা জানেন, এই কথা বলিলে তাঁহারা খুব নিরাপদ হইবেন—কারণ, ভারতের সৈনিক-বিভাগে অল্পকালমধ্যে ভারতীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়ান হইবে না।

লর্ড মেষ্টন বলিয়াছিলেন—

"শাসন-সংস্কারে দেশে যে নূতন শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইবে, শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়ারা যদি তাহার উপযোগী হয়েন এবং সর্ব্বতোভাবে তদনুসারে কায করেন, তবে বিলাতে সরকারী চাকুরীয়ারা যেরূপ আশ্রয় ও অভয় পাইয়া থাকেন, সেইরূপ পাইবেন।"

যদি তাহাই হয়, তবে আজ ভারতে শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানরা এত আবদার করিতে সাহস করেন কেমন করিয়া? প্রত্যক্ষভাবে কাযও না করিয়া মোটা মাহিয়ানা আদায় করা এবং বিদেশে চাকুরী করিতে আসার বাবদে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করা, এ সবই কি অন্যায় ও অসঙ্গত আবদার নহে? যে সব ভারতবাসী জিলার ভার লইয়া কায করিতে পারিবেন, তাঁহারা কি মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গের উপদেশ ছাড়া কায করিতে পারিবেন না? সিভিল সার্ভিসের এই শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়ারা বলিয়াছেন,তাঁহাদের দলে কোন ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে না। ইঁহাদের দেখাদেখি যুক্তপ্রদেশের শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্ম্মচারীরাও অসম্ভব আবদার ধরিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্ম্মচারীরা পুলিশের চাকুরী ৩ ভাগে বিভক্ত করিতে বলিয়াছেন :—

(১) ইম্পিরিয়াল পুলিস সার্ভিস। এ বিভাগে কালা আদমীর প্রবেশাধিকার থাকিবে না; বকের দলে একটি কাকও প্রবেশ করিবে না। কেবল তাহাই নহে—সে চাকুরীর চাকুরীয়া সংগ্রহ হইবে, খাস বিলাতে আর চাকুরীয়ারা তাঁবে থাকিবেন—খোদ ভারত-সচিবের। অর্থাৎ তাঁহারা একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্বেতাঙ্গ চাকুরী সৃষ্টি করিয়া তাহারই পুষ্টিসাধন করিবেন।

(২) ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস্। এই বিভাগে কালা ও কটা আদমীরা চাকুরী করিবেন। অর্থাৎ এই বিভাগে চাকুরী পাইবেন, ভারতবাসীরা আর চাকুরী পাইবেন—ফিরিঙ্গীরা। এ বিভাগে চাকুরীয়া সংগ্রহ হইবে, ভারতে। চাকুরীয়ারা কেহ কেহ পরীক্ষা দিয়া সাফল্যলাভ করিলে চাকুরী পাইবেন, আর কেহ কেহ তৃতীয় বিভাগ হইতে পদোন্নতিতে এই বিভাগে চাকুরী পাইবেন।

(৩) প্রাদেশিক পুলিস সার্ভিস্। এই বিভাগে চাকুরীয়া সবই নিছক কালা আদমী। নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগকে পদোন্নতি দিয়া, আর লোককে মনোনীত করিয়া এই বিভাগে চাকুরীয়ার সংখ্যা পূর্ণ করা হইবে।

এইরূপে পুলিসের চাকুরীয়াদের মধ্যে ৩ ভাগের ২ ভাগ হইবেন—কালা আদমী, আর ১ ভাগ গৌরাঙ্গ। শুনিতে মন্দ নহে। কিন্তু গৌরাঙ্গরাই মোটা মাহিয়ানা পাইবেন—যোগ্যতার পরিচয় দিলেও ভারতবাসী, কেবল ভারতবাসী বিজিত কালা আদমী বলিয়া, ধলার দলে ঘেঁসিতে পাইবে না। কালা-ধলায় প্রভেদ পাকা বনিয়াদের উপর পোক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

ধলারা থাকিবেন, বড় বড় কেন্দ্রে। কালারা ছোট খাট যায়গায় চাকুরী করিবে। ইহাতে সুবিধা এই হইবে যে, ধলারা সপরিবারে এক স্থানে বসবাস করিতে পারিবে।

কালাধলায় এই যে প্রভেদ, ইহাকে সব চাকুরীতে পাকা করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই এ দেশে ধলাদের অভিপ্রায়।

যাহারা বর্ণবিভাগ এইরূপে প্রবল ও স্থায়ী করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাহারা ভারতবাসীর কিরূপ কল্যাণকামী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

যুক্তপ্রদেশের শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীরা ইহারও উপরে গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার রিপোর্টের রচনাকারীরা বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া একটা অসম্ভব আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা এমন কথাও বলিতে সাহস করিয়াছেন যে, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পার্লামেণ্টে যে ঘোষণা হইয়াছিল, অর্থাৎ এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রতিষ্ঠাই ইংরাজ-শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, সে কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য—ভারতবর্ষের জনগণ তাহা চাহে নাই, তাহারা সিভিলিয়ানী শাসনেই সন্তুষ্ট।

যাঁহারা মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের রচয়িতা, তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবার চাকুরী কমিশনে অন্যতম সদস্য। তিনি এই উদ্ধৃত উক্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন :—

বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বের অবশ্যম্ভাবী ফল; কেন না, পূর্ব্বে সিভিল সার্ভিসে চাকুরীয়ারা—

(১) চাকুরীতে ভারতবাসীর সংখ্যাবৃদ্ধির সকল প্রস্তাব ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছেন;

(২) ভারতবাসীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ বিঘ্নবহুল করিয়াছেন;

(৩) উন্নতির প্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছেন।

সিভিল সার্ভিসের প্রভাব ভারতের উপর কিরূপ কার্য্য করিয়াছে—সিভিল সার্ভিসের দ্বারা ভারতবাসীর কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভূপেন্দ্রনাথের এই উক্তিতে যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, তেমন আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্বেতাঙ্গ সরকারের চাকরীয়া হিসাবে সিভিল সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ চাকরীয়ারা যত কাযই কেন করিয়া থাকুন না, তাঁহারা যে ভারতবাসীর স্বভাবজ অধিকার প্রাপ্তিতে বাধা দিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

ভূপেন্দ্র বাবু এমন কথাও বলিয়াছেন যে, রৌলট আইন ও পঞ্জাবী হাঙ্গামার ফলেই এ দেশে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছে।

এই চাকরী কমিশনের ফল কি হইবে, বলিতে পারি না—হয় ত ইহার ফলে শ্বেতাঙ্গ চাকরীয়াদের বেতন ও অধিকার আরও বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে ভারতবাসীর বলিবার কিছুই নাই—থাকিতেও পারে না। কেন না, ভারতবর্ষ বিজিত দেশ এবং এ দেশের নীতিপ্রবর্ত্তন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার ভারতবাসীর নাই। এ দেশে যে রাজস্ব আদায় করা হয়, তাহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে, তাহা ভারতবাসী স্থির করিয়া দিতে পারে না—এ দেশের সামরিক বিভাগে ভারতবাসী বড় চাকরী পায় না—ভারতবাসী "নিজ বাস ভূমে" "পরবাসী"—পরমুখাপেক্ষী ও পরাধীন। কিন্তু যে কোন স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের রীতি এই যে, সে দেশের চাকরীগুলিতে সে দেশের লোকেরই অধিকার স্বীকৃত হয় এবং কেবল প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে চাকরীয়া আমদানী করা হইয়া থাকে—করা সঙ্গতও বটে। এ দেশে প্রয়োজন হইলে যে কোন দেশ হইতে বিশেষজ্ঞ চাকরীয়া আনিবার প্রস্তাবে কেহই আপত্তি করিতে পারেন না। কিন্তু বিদেশী শাসক আমদানী না করিলে এ দেশের রক্ষাকার্য্য ও শাসনকার্য্য চলিবে না—এ কথা আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ রাজনীতিক বলিয়াছেন—সুশাসক কখন স্বায়ত্ত-শাসনের সমান হইতে পারে না—A good Government cannot be a substitute for self-government.

লর্ড সিংহ যে চরমপন্থী, এমন কথা তাঁহার কোন শত্রুও বলিতে পারিবেন না। তিনিও বলিয়াছেন, বিদেশীরা আমাদের দেশ রক্ষা করিবে, এ বিশ্বাস জাতিগঠনের অনুকূল নহে। যে দেশ বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত আপনার শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতে না পারে, সে দেশ কখন উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

এ দেশে বিদেশী শাসক আমদানী করার ফলে দেশের কিরূপ অর্থক্ষয় বা রক্তমোক্ষণ হইতেছে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। আমরা বলি, এ দেশের সব চাকুরীতে কেবল এ দেশের লোকেরই জন্মগত অধিকার, এই নীতি

অবলম্বন করিলে তবে ভারতবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা করা হয়। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত বিদেশ হইতে চাকুরীয়া আমদানী কোন কারণেই সমর্থিত হইতে পারে না এবং সেরূপ প্রয়োজনও প্রতিপন্ন হয় নাই।

চাকুরী কমিশনের সিদ্ধান্ত কি হইবে, বলিতে পারি না। কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, যত দিন এ দেশের লোকের দ্বারা এ দেশ রক্ষার ও শাসনের ব্যবস্থা না হইবে, তত দিন এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রভাব কেবল উপহাস বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

সূর্য্যকুমার অগস্তি

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বেলা ৫টার সময় সূর্য্যাস্তের সহিত মেদিনীপুরের উজ্জ্বলতম রত্ন ও বঙ্গীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-সমাজের অলঙ্কার, স্বনামধন্য সূর্য্যকুমার অগস্তি মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত গড়বেতা গ্রামের এক উচ্চ-বংশীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণকুলে ১২৬৩ সালের মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষরা পশ্চিম হইতে আসিয়া ঐ গ্রামে বসবাস করেন। এ দেশে বহুকাল বাস করার জন্য তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গদেশীয় অনেক আচার-ব্যবহার ও ভাষার প্রচলন হইয়া পড়ে।

তাঁহার পিতা ঠাকুরলাল অগস্তি মহাশয় অত্যন্ত কৃতী, উদ্যোগী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ঠাকুরলাল কেবলমাত্র নিজ চেষ্টায় তৎকাল-প্রচলিত ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিয়া মোক্তারী পাশ করেন ও তাহাতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়া যথেষ্ট বিষয়সম্পত্তি অর্জ্জন করেন।

সূর্য্যকুমার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার অপূর্ব্ব মেধা ও প্রায় শ্রুতিধরের ন্যায় স্মরণশক্তি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নিজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের জীবনের প্রত্যেক দিনের ঘটনার তারিখ, মাস ও সময় অতি সুস্পষ্ট-রূপে স্মরণ করিয়া বলিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার অনেক লক্ষণ দেখা গিয়াছিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কুঁচিয়া-কোল রাধাবল্লভ হাইস্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ২০৲ টাকা বৃত্তি পায়েন ও উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্ররূপে পরিগণিত হয়েন।

বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার প্রগাঢ় মনো-যোগ দেখা গিয়াছিল। বিদ্যার্জ্জনের সময় তিনি বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পড়িবার সময় যদি কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এ জন্য সর্ব্বদাই ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে বসিতেন। এক দিন দ্বিতলগৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি পড়িতেছিলেন, দৈবক্রমে গৃহে অগ্নিসংযোগ হয় এবং ঠিক তাঁহার ঘরখানিই পুড়িতে আরম্ভ হয়। তিনি এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে থাকেন যে, ঘর পুড়িতেছে জানিতেও পারেন নাই। তাঁহার মাতা ঠাকু-রাণী বার বার দ্বারে আঘাত করিয়া বলেন, "সূর্য্য, শীঘ্র বাহিরে এস, ঘরে আগুন লাগিয়াছে।" তখন তাঁহার জ্ঞান হয়। তাঁহার পরিণত জীবনেও যে ব্যায়াম ও পরি-শ্রমের অভ্যাস তাঁহাকে সাধারণ বাঙ্গালী হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, বাল্যকাল হইতে তাহারও অনুশীলন হয়। তিনি বি, এ, এম, এ, প্রভৃতি সমুদায় পরীক্ষাই কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে দেন, ও সকল পরীক্ষাতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ঘড়ী, স্বর্ণপদক, পুস্তক ও টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া ১০০০ হাজার টাকা পুর-স্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হয়েন।

এইরূপ অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ও জেনারল্ এসেমব্লি এবং ঢাকা কলেজে অধ্যাপকের কায করেন। অল্পদিনের জন্য তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়া-ছিলেন। ইতোমধ্যে তিনি এ দেশে সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ পরী-ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিভিলিয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার পরম অনুরাগ ছিল। গভর্ণ-মেণ্টের কার্য্য করিতে করিতে তিনি হাই ষ্ট্যাণ্ডার্ড সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া ২ হাজার টাকা বৃত্তি পায়েন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত ২৮ বৎসর রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বালেশ্বর জিলা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

পাবনা জিলায় অবস্থানকালে এক সময় বাজারে

আগুন লাগে। ম্যাজিষ্ট্রেট অগস্তি সাহেব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দেখিলেন যে, এক জন লোক অগ্নি নিবারণের জন্য জল ঢালিবার ইচ্ছায় ছাতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সিঁড়ি অভাবে উঠিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলেন যে,"তুমি আমার কাঁধে চড়িয়া ছাতে উঠ। সে ব্যক্তি ইতস্ততঃ করিতেছিল; কিন্তু তাঁহার বারংবার অনুরোধে অবশেষে তাঁহার কথামত ছাতে উঠিয়া যায়। তাঁহার ঐরূপ ব্যবহার দর্শনে সে সময় সকলেই চমৎকৃত হয়।
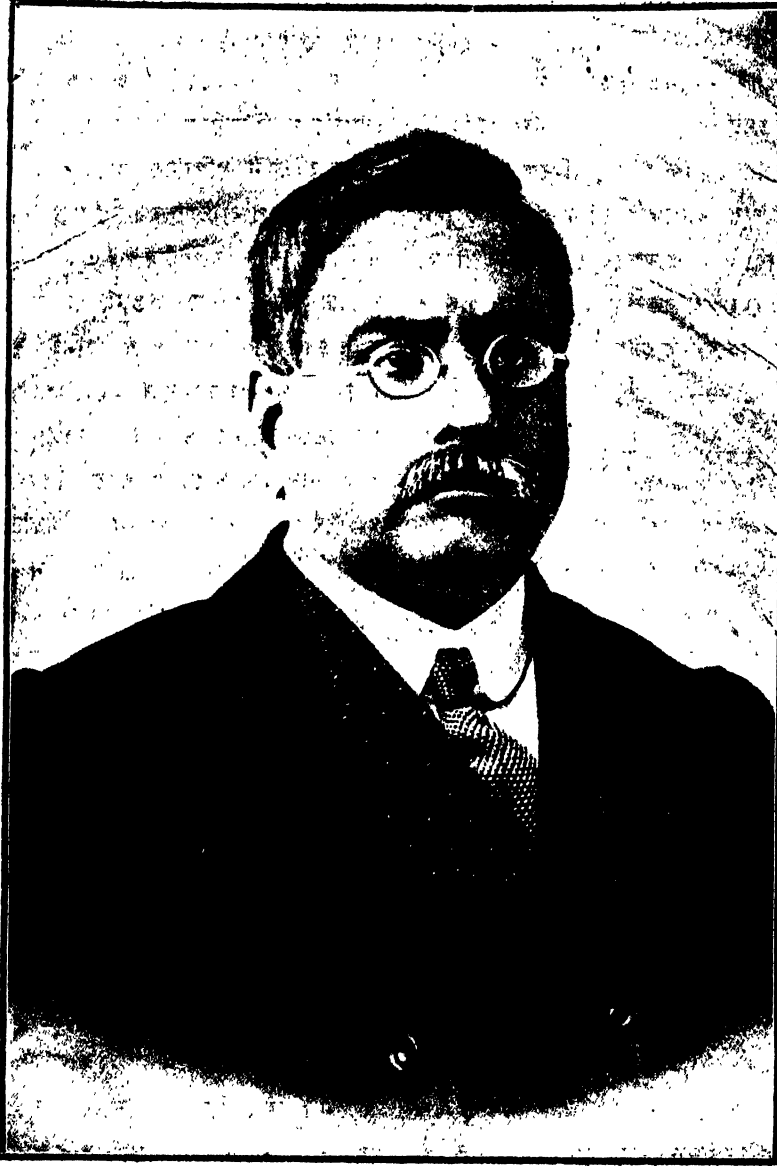
সূর্য্যকুমার অগস্তি।

তাঁহার ন্যায় সরল ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। যখন জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে অবস্থান করিতেন, তখনও অশ্বারোহণে কিংবা অন্য কোন যানে ভ্রমণে গিয়া পথের পথিককে, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে কিংবা মুটেকে নিজ হইতে ডাকিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এইরূপে রাজকার্য্য-পরিচালন সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া সেখানের কৃষক ও অপরাপর লোকদের সহিত নানারূপ ঘনিষ্ঠ আলাপে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিতেন ও তাহাদের উপকারের অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।

রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া অগস্তি মহাশয় তাঁহার মেদিনীপুরস্থ 'মলয়াবাস' বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। চকিৎসার্থ তিনি গত বৎসর কলিকাতায় আইসেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ও আজীবন সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। কঠিন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ফরাসী ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন ও অবসর গ্রহণ করিয়া ফার্শী শিখেন।

সূর্য্যকুমার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, অগস্তি মহাশয় তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

দেশহিতকর সমুদয় কার্য্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তিনি ঐ সব কার্য্যে যোগদান করিতেন।

যখন ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী মেদিনীপুরে যায়েন, তখন তিনি সভাপতি হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহার হৃদয়ে অতি প্রগাঢ় স্বদেশভক্তি ছিল, কিন্তু তিনি তাহা বাক্যচ্ছটা দ্বারা আড়ম্বর সহকারে কখনও প্রকাশ করেন নাই।

তাঁহার জন্মস্থান গড়বেতা গ্রামে তিনি নিজ চেষ্টায় একটি এনট্রান্স স্কুল স্থাপিত করেন ও আজীবন ঐ স্কুলের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন; স্ত্রীশিক্ষায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল, তিনি নিজ কন্যাদিগকে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ভাষায় ও সঙ্গীতে সুশিক্ষিতা করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুর ১৫ মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ অটুট ছিল যে, তিনি এত শীঘ্র ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, কেহই তাহা মনে করেন নাই।

——

কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার

মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'হিন্দু'র সম্পাদক কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার মহাশয় লোকান্তরিত হইয়াছেন। বর্ষাধিককাল হইতে তিনি অসুস্থ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন, ইহা আমরা মনে করিতে পারি নাই। ভারতবর্ষে যে নূতন সংবাদ-পত্রসেবক-সঙ্ঘ গঠিত হইতেছে, উপযুক্ততম ব্যক্তি বিবেচনায় আয়াঙ্গার মহাশয়কেই তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সে সঙ্ঘ তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিল না।

আয়াঙ্গার মহাশয় প্রথমে মাদ্রাজ প্রদেশে মফঃস্বলে ওকালতী করিতেন; কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথা হইতে মাদ্রাজে আসিয়া তিনি 'হিন্দু' পত্র ক্রয় করেন। তখন করুণাকর মেনন ও জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ারের মত সুযোগ্য সংবাদপত্র-সম্পাদকের চেষ্টাতেও 'হিন্দু' আর্থিক হিসাবে লাভজনক হয় নাই। আয়াঙ্গার মহাশয় সে পত্র ক্রয় করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 'হিন্দু' দক্ষিণ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংবাদপত্রে পরিণত হয়। আর্থিক হিসাবেও 'হিন্দু' লাভজনক হইয়াছিল।

কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার।

আয়াঙ্গার মহাশয়ের রাজনীতিক দূরদর্শিতা যেমন অসাধারণ ছিল, নির্ভীকতাও তেমনই প্রবল ছিল। তিনি মহাত্মা গন্ধীর অহিংস অসহযোগনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠিত আইন-অমান্য-তদন্ত-সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিয়া রিপোর্ট রচনা করিয়াছিলেন। সে রিপোর্টে তিনি মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিরই পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় যখন বিলাতের মন্ত্রিসভার আহ্বানে ভারতীয় সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে বিলাতে গমন করেন, তখন 'হিন্দু' বিলাতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তিনি তাহার পূর্ব্বে কখন ভারতের বাহিরে গমন করেন নাই—বিদেশী বেশে ও আহার্য্যে তিনি অনভ্যস্ত। তবুও—অজস্র অসুবিধা অনিবার্য্য জানিয়াও তিনি যে বিলাতে গিয়াছিলেন, সে কেবল পাছে তিনি না যাইলে মাদ্রাজ সরকার কোন খয়ের খাঁ সম্পাদককে প্রেরণ করেন, এই শঙ্কায়।

আজ মনে পড়ে, যে দিন বোম্বাই বন্দরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শ্রীনিবাসন ও ভাগিনেয় 'স্বদেশ-মিত্রম্'-সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার—পরিণতবয়স্ক আয়াঙ্গার মহাশয়কে আমাদের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিয়া—বিদেশে তাঁহাকে স্বজনের মত দেখিবার জন্য—আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে বন্দর হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। আজ মনে পড়ে, কয় মাস উভয়ের এক সঙ্গে অবস্থিতি—এক পক্ষে জ্যেষ্ঠের স্নেহ, অপর পক্ষে কনিষ্ঠের শ্রদ্ধা। আজ মনে পড়ে, বিলাতে উভয়ে একযোগে দেশের অভাব অভিযোগের বিষয় বিবৃত করা। আজ মনে পড়ে, কলম্বো বন্দরে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সমাগত স্বজনদিগের নিকট তাঁহার উক্তি—"ঘোষ বিদেশে আমার অভিভাবক ছিলেন।" আজ মনে পড়ে, মাদ্রাজে তাঁহার আদর-যত্ন। আজ মনে পড়ে, কলিকাতায় যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখনই তাঁহার সাদর আলিঙ্গন। আজ সে সব স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

আজ ভারতের এক জন প্রকৃত কর্ম্মীর তিরোধান হইল—আজ ভারতীয় সংবাদপত্রসেবকদিগের যিনি অন্যতম নেতা ছিলেন, তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইলেন। আজ কংগ্রেস একজন উপদেষ্টা হারাইল। আজ আমরা একজন স্নেহশীল বন্ধু হারাইলাম।

এ দেশে সংবাদপত্রসেবা কিরূপ বিপদ ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আয়াঙ্গার মহাশয় সেই কার্য্য যেরূপ দক্ষতা ও নির্ভীকতার সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করিবে।

রহিল কেবল স্মৃতি; আর রহিল—তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে পুষ্ট তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি 'হিন্দু'। আমরা 'হিন্দুর' কল্যাণ কামনা করিয়া তাঁহার পুত্রদ্বয়—শ্রীমান শ্রীনিবাসন ও শ্রীমান গোপালনকে তাঁহাদের এই দারুণ শোকে আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-নির্ব্বাচন

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় গঠিত ব্যবস্থাপক সভার প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়াছে; এবার দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ হইবে। ৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম পর্ব্বের আরম্ভ হয়, তখন দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপ্ত হইয়াছে; সে আন্দোলনের কার্য্যপদ্ধতির অন্যতম—ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন। সে সময় কলিকাতায় লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কংগ্রেসের বহুমত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য সে বার বহু নেতাই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং অনেক ভোটার ভোট দেন নাই। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, পরে নাগপুরে ও আমেদাবাদেও সেই প্রস্তাবই অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহার পর মহাত্মা গন্ধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গয়ায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ-বিষয়ে কংগ্রেসের অনুমতি চাহিয়াও পায়েন নাই। পরে দিল্লীতে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে স্থির হয়, কংগ্রেসকর্ম্মীরা কেহ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহিলে কংগ্রেস তাহাতে আপত্তি করিবেন না।

পূর্ব্ববার জাতীয় দল নির্ব্বাচনপ্রার্থী না হওয়ায় মডারেট বা মধ্যপন্থীরাই সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া শাসকরা মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৩ বৎসর পূর্ণ হয় হয়, এমন সময় দিল্লীতে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে ভারত সরকারের হোম-মেম্বার সার ম্যালকম হেলী বলিয়াছেন—সাবধান, যদি অসহযোগীরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করে, তবে তাহারা সব পণ্ড করিবে।

কিন্তু এবার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে স্বরাজ্যদলের—অর্থাৎ যে দল অসহযোগনীতি পরিহার না করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের জয় হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাভব তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বোম্বাইয়ে সার চিমনলাল শীতলবাদ, মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত আয়ার ও যুক্তপ্রদেশে শ্রীযুক্ত চিন্তামণিও পরাভূত হইয়াছেন।

স্বরাজ্যদল যে পদ্ধতির অনুসরণ করিবেন বলিয়াছেন, তাহা আমরা সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না। তাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমেই সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ স্বায়ত্ত-শাসন

চাহিবেন এবং তাহা না পাইলে সর্বপ্রযত্নে সরকারের সব প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া সরকারের শাসনের কল বিকল করিবার চেষ্টা করিবেন। আমরা গত মাসে দেখাইয়াছি, বর্তমানে ব্যবস্থাপক সভা যেরূপে গঠিত, তাহাতে তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। এককালে আয়ার্লণ্ডের প্রতিনিধিরা বিলাতে পার্লামেণ্টে এইরূপ কায করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ঈপ্সিত ফললাভ হয় নাই। পরে তাঁহারা Direct action অবলম্বন করায় দেশে রক্তের স্রোতঃ বহে। বহু রক্তপাতের পর আজ আয়ার্লণ্ডে নূতন শাসননীতির উদ্ভব হইতেছে। সে পথ পরিহার্য্য বিবেচনা করিয়াই মহাত্মা গন্ধী এ দেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং মিশরের জননায়ক জজলুল পাশাও স্বীকার করিয়াছেন, দুর্ব্বল জাতির পক্ষে সেরূপ অস্ত্র আর নাই।

স্বরাজ্যদল যে অসহযোগনীতি ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা সরকারের শাসনের কল অচল করিতে না পারিলেও যে, নানারূপ বিঘ্ন ঘটাইতে পারেন,সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সে কথা সরকার বুঝিয়াছেন।

সংপ্রতি বাঙ্গালার গভর্ণর বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি চিত্তরঞ্জনকে হস্তান্তরিত বিভাগের ভার তাঁহার দলকে লইবার কথা বলিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার দলস্থ ব্যক্তিদিগের মত লইয়া এ কথার উত্তর দিবেন।

চিত্তরঞ্জন কি উত্তর দিবেন, বলিতে পারি না। কিন্তু স্বরাজ্যদলে যাহারা যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—তাঁহারা সরকারের অধীনে কোন চাকরী গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার দল মন্ত্রী হইলে কি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হইবে না? তাহার পর কথা—স্বরাজ্যদল বলিয়াছেন; তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিবেন এবং তাহা না পাইলে অবিচারিতভাবে সরকারের সকল প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। অবশ্য স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিতে হইলে সে প্রস্তাব কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা চলিবে না—এসেম্ব্লীতে তাহা উপস্থাপিত করিতে হইবে। তথায় যদি সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়, তবে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা কি করিবেন?

তবে স্বরাজ্যদল আর একটি কাজ করিতে পারেন তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহারা স্বদলের না হইলেও স্বতন্ত্র চারীদিগের কাহারও কাহারও নিয়োগে বাধা দিবেন না। বাঙ্গালায় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী সেইরূপ প্রতিনিধিদিগের অন্যতম। কিন্তু যদি স্বরাজ্যদলের কোন একদল মন্ত্রীর কার্য্যের সমর্থন করেন, তবে কি তাঁহারা প্রকারান্তরে সরকারের সহিত সহযোগই করিবেন না?

মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসকর্ম্মীরা স্বরাজ্যদলের মতেরই সমর্থন করেন নাই। তাঁহারা আইন অমান্য তদন্ত সমিতির কাছে বলিয়াছিলেন, তাঁহারা মন্ত্রীর পদ পাইলে তাহাও লইবেন এবং দেশের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সরকারের সহিত এক-যোগে কাযও করিবেন।

স্বরাজ্যদল কিন্তু তাহা বলেন নাই।

এ অবস্থায় স্বরাজ্য দল এখন কি করিবেন?

মহাত্মা গন্ধীর প্রভাবে দেশের জনগণ যে ভাবের ভাবুক হইয়াছিল, তাহাতে কংগ্রেসের নামে ভোট প্রার্থনা করাতেই স্বরাজ্যদলের প্রার্থীরা দেশের লোকের ভোট পাইয়াছেন। ইহা হইতেই অহিংস অসহযোগের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপন্ন হইয়াছে। আর সেই জন্যই, বোধ হয়, বাঙ্গালার গভর্ণর—অসহযোগ আন্দোলনকে বিষদৃষ্টিতে দেখিলেও—বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলের দলপতিকে ডাকিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভার লইবার ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। স্বরাজ্যদল কি অসহযোগের সেই প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশের উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল করিবেন?

এবার নির্ব্বাচনফলে ব্যুরোক্রেশী যে বিশেষরূপ বিচলিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের ফলে তাঁহারা কি এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের কার্য্যে অবহিত হইবেন, এমন মনে করা যায় কি? এমনও হইতে পারে যে, শাসন-সংস্কার সাফল্য লাভ করিল না বলিয়া তাঁহারা পুরাতন পূর্ণ স্বৈরাচার শাসন-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তন করিতে চাহিবেন। তাহা হইলে তখন আবার দেশের পক্ষে অহিংস অসহযোগ নীতি অবলম্বন ব্যতীত পথ থাকিবে না।

কিন্তু দেশের লোক যদি ধৈর্য্য ধরিয়া অহিংস

অসহযোগের পথেই চলিতে থাকিতেন, তবে যে আমাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইত, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই—থাকিতেও পারে না।

বাঙ্গালায় গভর্ণর যেমন চিত্তরঞ্জনকে ডাকিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভারগ্রহণের কথা বলিয়াছেন, অন্যান্য প্রদেশে গভর্ণররা সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। কাজেই ভারতের সর্ব্বত্র ব্যুরোক্রেশী একই নীতি অবলম্বন করিবেন, কি পরীক্ষার হিসাবে কেবল বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলকে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভার দিয়া ফলাফল লক্ষ্য করিবেন, বলিতে পারি না। তবে কলিকাতায় বড় লাটের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন কর্ত্তৃক স্বরাজ্যদলের দলপতি চিত্তরঞ্জনের নিকট এইরূপ প্রস্তাবের বিশেষ কারণও যে থাকিতে পারে না, এমন নহে।

চিত্তরঞ্জন স্বয়ং ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন নাই। তিনি যদি তাঁহার দলের মতানুসারে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য মন্ত্রী বাছিয়া দেন, তবে কি তিনি তখনও ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে থাকিবেন? না—সভায় প্রবেশ করিবেন? চিত্তরঞ্জনের দল যদি হস্তান্তরিত বিভাগগুলির ভার গ্রহণ করেন, তবে সিভিল সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ চাকুরীয়ারা কি করিবেন?

ভারতে ইংরাজ-শাসন

বাঙ্গালার এক জন ছোট লাট এক বার বলিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল এ দেশে চাকরী করিয়া তাঁহারা যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহারা স্বদেশে প্রবাসী—যেন যাদুঘরে রক্ষিত জিনিষ। আজকাল অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানরা বিলাতে সভা-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব হোম-মেম্বার সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট দেশে ফিরিয়া সেই কাযে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সংপ্রতি তিনি বিলাতে রয়াল কলোনিয়ন্স ইনষ্টিটিউটে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন।

সেই প্রবন্ধে সার উইলিয়ম কয়টা কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কতকগুলি বিষয়ে ভারতে ইংরাজ সরকারের ত্রুটি অস্বীকার করা যায় না—

(১) ভারত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার-চেষ্টা সাফল্যলাভ করে নাই।

(২) ভারত সরকারের পক্ষে কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে আরও অধিক অর্থ ও সময় নিয়োগ করা কর্ত্তব্য ছিল।

(৩) সরকার দেশের লোককে সামরিক শিক্ষাপ্রদান করেন নাই।

(৪) সরকার এ দেশের লোককে শাসন-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ দেন নাই।

(৫) সরকার এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন নাই।

কেবল তাহাই নহে, ঐতিহাসিকরা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, এ দেশে ইংরাজরা ভারতে ভারতীয়ের সাহায্যের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই; ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার ও উপদেশের তেমন আদর করেন নাই এবং যে স্বৈরাচারী শাসকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সহিত দেশের জনগণের সম্বন্ধ নাই।

সার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট যে কথা বলিয়াছেন, সে সকলের উপর কোন কথা এ দেশের লোকও কেহ বলে নাই। এ দেশে ইংরাজ সরকার যদি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের, কৃষি-কার্য্যের উন্নতির, দেশের লোককে সামরিক শিক্ষাপ্রদানের, এবং শাসন-ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুযোগ না দিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কিরূপে এ দেশে তাঁহাদের শাসনের সমর্থন করিতে পারেন।

তবুও সার উইলিয়ম স্বাস্থ্যের কথা বলেন নাই। তিনি বরং বলিয়াছেন, এ দেশে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে; কিন্তু তাহার অনুপাত কিরূপ? এই বাঙ্গালা দেশে ব্যাধি-বিস্তারহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ কিরূপ বিঘ্নবহুল হইয়াছে, তাহার আলোচনা আমরা ইতঃপূর্ব্বে একাধিকার করিয়াছি। ভারতবর্ষে জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, তাহা যে অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্প, তাহাও বোধ হয়, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এ দেশে শিল্পনাশের দায়িত্ব ইংরাজের অনুসৃত নীতির কতটা, তাহার আলোচনা আজ আর করিব না। তাহা সকলেই অবগত আছেন। আজও টেরিফ কমিশনে

শ্বেতাঙ্গদিগের সাক্ষ্যে তাহা বুঝা যাইতেছে এবং এখনও বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক বসানয় ম্যাঞ্চেষ্টারের কলরব নিবৃত্ত হয় নাই। কাযেই শেষে কৃষিই এ দেশে লোকের একমাত্র উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সার উইলিয়ম—ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব হোম-মেম্বার স্যার উইলিয়ম আজ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষির উন্নতি-সাধনে আবশ্যক অর্থ ও সময় ব্যয় করেন নাই। এই স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কি বলা যায় না, ভারতের দারিদ্র্যবৃদ্ধির দায়িত্ব এ দেশে ইংরাজ অস্বীকার করিতে পারেন না?

সার উইলিয়ম এ দেশে ইংরাজ-শাসনের যে সকল ক্রটি স্বীকার করিয়াছেন, বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে সেই সকলই যে যথেষ্ট, সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

তাই না কি?

স্বরাজ

উন্নতির দীর্ঘপথ—পর্ব্বত চূড়ায়
ঈপ্সিত স্বরাজ্য-সূর্য্য কিবা শোভা পায়।

সেই পথ ভারতের—বাধা পায় পায়—
ব্যুরোক্রেশী লিবারল স্বরাজ্য জড়ায়॥

১লা আশ্বিন—

কংগ্রেসের চতুর্থ দিনের অধিবেশনে পূর্ব্ব দিন বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতে নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত। য়ারবেদা জেলে সিক্ষী কয়েদীর মৃত্যুতে ১০ জন কয়েদী গুণ্ডামিয়ার অভিযুক্ত। বোম্বায়ে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব আপত্তির জন্য অগ্রাহ্য হইল। মালটায় ভূমিকম্প। জাতি-সংঘের স্বাধীন রাজ্য ফিউমে ইটালীর জঙ্গীলাট নিযুক্ত। য়্যালবিনিয়ার হত্যাকাণ্ডের জন্য ইটালীর নিকট গ্রীকদের ক্ষমা-প্রার্থনা।

২রা আশ্বিন—

কংগ্রেসের ও বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন। আলিপুর ষড়যন্ত্রের মামলা আরম্ভ। নার্শারীর ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ এস পি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর। জার্ম্মাণ সমস্যায় ফ্রান্সে বৃটিশ মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা।

৩রা আশ্বিন—

হায়দ্রাবাদে মাদ্রাজের হিন্দু পত্রের প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ। কলিকাতা, রামবাগানে মোটর ডাকাতির অভিযোগে চার ব্যক্তি দায়রায় সোপর্দ্দ। মাদারীপুরে ডাকাতিতে ৮ হাজার টাকা লুণ্ঠনের সংবাদ। পাঁচ বৎসর পরে খিদিরপুরের পুলে আবার ট্রাম চলিল। বোম্বায়ে ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি। মাদ্রাজের ডাকাত সর্দ্দার জম্বুলিঙ্গম্ পুলিসের গুলীতে নিহত। আইরিশ পার্লামেণ্টের অধিবেশন। বুলগেরিয়ায় আবার বিদ্রোহ।

৪ঠা আশ্বিন—

নাভায় পণ্ডিত জহরলাল, অধ্যক্ষ গিডবানী ও শ্রীযুত সন্তানম—কংগ্রেসের এই তিন প্রতিনিধি আকালী আন্দোলনের তদন্ত করিতে যাইয়া গ্রেপ্তার। কানপুরে শ্রীযুত দাশ ও পণ্ডিত মতিলালের সংবর্দ্ধনা। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ড ভোগ করায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অযোগ্য সাব্যস্ত। যুক্তপ্রদেশ, গোণ্ডার হাঙ্গামায় ৪৬ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান গ্রেপ্তার। মরক্কোয় স্পেনের গোলাবৃষ্টি। স্পেনে জঙ্গী শাসন।

৫ই আশ্বিন—

মুলতানে লালা আমীরচাঁদের কারামুক্তি। ফরিদকোটে গুরুদ্বারের লঙ্গরে আকালীদের প্রবেশ নিষেধে গ্রন্থী সাহেবের প্রায়োপবেশন। কিউল ষ্টেশনে মোগলসরাই এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কক্ষে কর্ণেল কেনেডীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যাইল। মেদিনীপুরে সাঁওতাল হাঙ্গামার মামলায় ১৯ জনের অব্যাহতি, বাকী ৩১ জনের শাস্তি লয়েড ব্যাঙ্কের টাকা ভাঙ্গার অভিযোগে বৃটিশ চন্দননগরে খানাতল্লাস ও কয়েকজন গ্রেপ্তার। ঘৃতে ভেজাল দেওয়ায় মজঃফরপুরে ৪ জন ব্যবসায়ী একধরে। জেনাইনা কাণ্ডে নিহত দূতদের শবদেহ সসম্মানে রোমে আনয়ন।

৬ই আশ্বিন—

কাউন্সিল-বিরোধী ফতোয়ার সংশোধন উদ্দেশ্যে জমিয়ৎ-উলেমার সাব-কমিটী গঠন। খড়দহ হইতে আহিরীটোলা ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমান প্রফুল্লকুমার ঘোষের প্রথম স্থান অধিকার। দক্ষিণ পারস্যে ভূমিকম্প, অনেক ঘর-বাড়ী জখম। মর্ড মলির লোকান্তর। সোফিয়ার নিকট যুদ্ধ।

৭ই আশ্বিন—

নাভার কারাগারে পণ্ডিত জহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পণ্ডিত মতিলালের বড় লাট প্রভৃতির নিকট তার, সাক্ষাতে সরকারী সর্ত্তে অসম্মত হওয়ায় নাভায় পণ্ডিতজীর প্রতি ১৪৪ ধারা জারী। মৌলানা মহম্মদ আলি কোকনদ কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত। গৌহাটী বিদ্রোহ মামলায় নলিনীকান্ত ঘোষের কারামুক্তি। নাভার আকালীদিগকে দুই শত মাইলেরও অধিক দূরে লইয়া যাইয়া বনমধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। গোরক্ষপুরে বন্যায় ট্রেণ চলাচল বন্ধ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের সম্পর্ক ত্যাগের সংবাদ।

৮ই আশ্বিন—

কলিকাতায় শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ সেন, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত, ও অমৃতলাল সরকার এবং হুগলীতে বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনে ধৃত; শেষোক্ত চারি জন মেদিনীপুরে প্রেরিত, অবশিষ্ট ৭ জন আলিপুরে রক্ষিত; বিশেষ কংগ্রেস হইতে প্রত্যাগত শ্রীযুত কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ধৃত; ঢাকা, নরসিংদী থানায় শ্রীমান সতীশচন্দ্র পাকড়াশীও (মুক্ত রাজ-বন্দী) গ্রেপ্তার। তুরস্ক সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত। ইটালীর কর্ফিউ পরিত্যাগ।

৯ই আশ্বিন—

হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে বরেন্দ্র ঘোষের আপীল ডিসমিস। জৈতো রেল ষ্টেশন হইতে জনৈক য়ুরোপীয় সংবাদদাতার বহিষ্কার; আকালীদের গ্রেপ্তারে নিষ্ঠুরতার অভিযোগ। কর্ণেল কেনেডীর হত্যাকাণ্ডের জন্য সন্দেহে একজন ফিরিঙ্গী ও পাঞ্জাবী গ্রেপ্তার। জার্ম্মাণীতে শান্ত প্রতিরোধ প্রত্যাহৃত, গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কায় ব্যাভেরিয়ায় সামরিক আইন জারী।

১০ই আশ্বিন—

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও কপিলদেব মালব্য ভারত সরকারের ব্যবস্থায় ব্যবহারাজীব রূপে নাভায় পণ্ডিত জহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নোয়াখালীর দায়রার মামলায় মোক্তাররা আসামীপক্ষ সমর্থনের অধিকার পাইলেন। শান্তিভঙ্গের ভয়ে সমগ্র জার্ম্মাণী জঙ্গী শাসনকর্ত্তার অধীন করা হইল। কফিউ আবার গ্রীকদের হস্তে অর্পিত হইল।

১১ই আশ্বিন—

১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের বন্দীদের জন্য বাঙ্গালা সরকার কর্ত্তৃক বিচারের আশ্বাস। য়ারবেদা জেল হাঙ্গামায় কয়জনের শাস্তি। বুলগেরিয়ায় বিদ্রোহীদের পরাজয়। তুরস্ক হইতে বৃটিশ সেনাপতির বিদায়গ্রহণ।

১২ই আশ্বিন—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে পণ্ডিত শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, মৌলবী মজিবর রহমান প্রভৃতির পদত্যাগ-পত্র গৃহীত। সবরমতীর সত্যাগ্রহাশ্রমে ফিলাডেলফিয়ার অধ্যাপক মিঃ ড্রু পিয়ারসন। বুন্দী রাজ্যে রাজস্থান সেবা সংঘের সম্পাদকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনের বিচার-ভার একটি কমিটীর হস্তে দেওয়া হইল। ডুমরাও রাজ্যের মামলার আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার সংবাদ। লক্ষ্ণৌ প্লাবনে য়ুরোপীয়ের মৃত্যু সংবাদ। আসাম সরকারের ব্যয়-সংকোচের সঙ্কল্প।

১৩ই আশ্বিন—

কলিকাতায় আনন্দ বাজার আফিসে খানাতল্লাস; সম্পাদক ও মুদ্রাকর ধৃত। শ্রীযুত অমলেন্দু দাসগুপ্ত, কালীপদ রায়চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় বহরমপুরে গ্রেপ্তার। ইটালী-ভ্রমণে বহির্গত ভারত বন্ধু পিয়ারসন হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত। জার্ম্মাণীর ডুসেলডর্ফে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতীদের আন্দোলনে পুলিস ও সৈন্যের গুলী, বহু লোক হতাহত; বর্লিনের নিকটেও বিদ্রোহ।

১৪ই আশ্বিন—

য়ারবেদা জেলে মৌলানা হসরৎ মোহানী জেল আইন ভঙ্গের জন্য আরও ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। আকালী আন্দোলনে বড়লাট কর্ত্তৃক বৃটিশ অফিসারদের উদ্দেশ্যে গোপন ইস্তাহার প্রকাশের কথা। চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটীতে চিত্তরঞ্জনের সংবর্দ্ধনার সঙ্কল্প। অমৃতে কৃপাণ তৈয়ার নিষিদ্ধ। পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের লোকান্তর। লণ্ডনে সাম্রাজ্য-সংঘের অধিবেশন।

১৫ই আশ্বিন—

বোম্বাই ও পুণায় দেড় শত মহিলা য়ারবেদায় মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না পাইয়া জেলের ফটকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়াছেন। ঝিন্দে আকালীদের গ্রেপ্তার। কলিকাতায় ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী শ্রীযুত জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

১৬ই আশ্বিন—

ধারবারে শ্রীযুত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডের প্রতি ১৪৪ ধারা জারী। নাভায় পণ্ডিত জহরলালের বর্ণনাপত্রে বিচারে শাসন-বিভাগের প্রভাবের অভিযোগ। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক একতা সংস্থাপক কমিটীর কায আরম্ভ। বরেন্দ্র ঘোষের মামলায় বিলাতে আপীলের প্রার্থনা। আদমশুমারীর প্রথমাংশ প্রকাশিত। অশ্লীল পুস্তক প্রকাশের অভিযোগে শিশির সম্পাদক গ্রেপ্তার।

১৭ই আশ্বিন—

বাঙ্গালায় তিন রেগুলেশনের ধর-পাকড়ে সরকারের কৈফিয়ৎ;—রাজদ্রোহের জন্যই নির্ব্বাসন। নাভায় পণ্ডিত জহরলাল, গিদবাণী ও সন্তানমের প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ, কিন্তু দণ্ড স্থগিত রাখিয়া তাঁহাদের নাভা-ত্যাগের অনুমতি। ডাঃ কাদম্বিনী গাঙ্গুলী লোকান্তরিত। জার্ম্মাণ মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। ইংলণ্ডে প্রবল ঝটিকা। জার্ম্মাণী ফ্রান্সের যে ৩০খানি বিমান আকাশ-পথে হইতে নামাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা বাজেয়াপ্ত করিলেন।

১৮ই আশ্বিন—

অন্যতম পঞ্জাব-নেতা রিসলদার রণযোধ সিংএর প্রতি ১১ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা। পাটনা ও ছাপরায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের লোকের জয়। অমৃতসরে ডাক বিভাগে সেন্সারী কড়াকড়ির সংবাদ; লাট অভিনন্দনে মুসলমান সমাজের আপত্তি।

১৯শে আশ্বিন—

কলিকাতায় আত্মশক্তি অফিসে খানাতল্লাস। কুমিল্লায় শ্রীযুত সতীন্দ্রমোহন রায় ৩ আইনে গ্রেপ্তার। চন্দননগর হইতে আহিরীটোলা পর্য্যন্ত ২২ মাইল সন্তরণে শ্রীমান আশুতোষ দত্ত প্রথম হইলেন। মধুপুর ও গিরিডী ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত যাত্রীগাড়ীর ডাক-ঘর হইতে বীমা করা চিঠিপত্র আদি লুঠ। তুরস্কে নূতন ৪০ হাজার সৈন্য-সংগ্রহের আদেশ।

২০শে আশ্বিন—

কলিকাতায় খদ্দর মেলার উদ্বোধন। মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার প্রতিবাদে আমেদাবাদে হরতাল। ফিজিয়া করের বিরুদ্ধে ফিজীর ভারতীয়গণের প্রতিবাদ।

২১শে আশ্বিন—

দিল্লীর তেজ-সম্পাদকের কারাদণ্ড। পঞ্জাবে ৩ রেগুলেশনে অধ্যাপক গোলাম হোসেনের গ্রেপ্তারের সংবাদ। শ্রীযুত মোহিনীমোহন ঘোষের কারামুক্তি। ৩ রেগুলেশনে গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসনের বিরুদ্ধে কলিকাতায় টাউন হলে প্রতিবাদ সভা। নোটজালের মামলায় কে বি সেনের স্বীকারোক্তি। বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে শ্রীমতী হরিমতি দত্তের দশ হাজার টাকা দান। বরেন্দ্র ঘোষের বিলাতে আপীলের আবেদন মঞ্জুর। শাহারাণপুরের নিকট ট্রেণ-সংঘর্ষে ১২ জন নিহত ও ৩০ জন আহত। কনষ্ট্যাণ্টিনোপলে সুরাপান নিষেধ।

২২শে আশ্বিন—

মার্কিণ ও বৃটিশ উপনিবেশ সমূহে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহারে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটীতে ঐ সব দেশের লোকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ব্যবস্থা। লাহোর কংগ্রেসের সম্পাদক লালা কেদারনাথ রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন। নোট জালের অভিযোগে বেহালায় একজন গ্র্যাজুয়েট, একজন উকীল ও আর ৪ জন গ্রেপ্তার। একজন জৈন সাধু ৮১ দিনের উপবাসের পর অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। পারস্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী গ্রেপ্তার।

২৩শে আশ্বিন—

রাজদ্রোহের অভিযোগ হইতে আনন্দ বাজারের অব্যাহতি। বেলুড়ে কোন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতিতে ৫ হাজার টাকা

লুঠ, ডাকাতের সঙ্গে মোটর গাড়ী ও রিভলভার। রঙ্গপুরে বরদা-সুন্দরীর মামলার মুসলমান আসামীরা দায়রায় সোপর্দ্দ। নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক গো-পালন মহামণ্ডলের অধিবেশন। কেনিয়ায় ভারতীয় কর্ম্মচারীদের কর্ম্মচ্যুত করিবার ও ভারতীয়দের দোকান বয়কটের চক্রান্ত।

২৪শে আশ্বিন—

রেঙ্গুন-মেল সম্পাদক শ্রীযুত এস সদানন্দের মুক্তি। আজমীরে ৬ জন নেতা গ্রেপ্তার। কলম-ই-শরিফ নামক পুস্তকের জন্য লাহোরে আবার রাজদ্রোহ মামলা। মরিশাসের জন্য শ্রমিক-সংগ্রহে যুক্তপ্রদেশে আড়কাঠি নিয়োগের অভিযোগ। রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজের মানহানি মামলায় আসামী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রেজার একশত টাকা ক্ষতিপূরণের দায়ী। লাহোরের নিকটে এক ময়দার কলে আগুন লাগায় প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি; কলটি লালা হরকিষেণ লালের। ব্যাভেরিয়ার রাজতন্ত্রীদের অভ্যুত্থান।

২৫শে আশ্বিন—

লাহোর ওডোয়ার নায়ার মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য কমিশনার নিযুক্ত। নিজাম রাজ্যে শিল্প মন্ত্রি-পদের সৃষ্টি। চম্বার রাজা আবার রাজ্যে ফিরিতে পাইলেন। রূঢ়ে বেকারদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ইংলণ্ডে ঝড়ের ফলে জলপথে অনেকলোক ও জাহাজ প্রভৃতি জখম।

২৬শে আশ্বিন—

অমৃতসরে গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর অফিসে ও কমিটীর কর্ম্মচারীদের বাটীতে পুলিসের হানা। কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার বাহাদুর মহাতব সিং এবং আরও ১৮ জন গণ্যমান্য কর্ম্মচারী গ্রেপ্তার। কলিকাতা, কলেজ স্কোয়ারের বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শিবরাম নামে ৬ বৎসরের শিশু আধ মাইল সাঁতার কাটিয়া কাপ ও মেডেল পাইয়াছে। এটোয়া মিউনিসিপ্যালিটীতে হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যে কায-কর্ম্মে বাধা। ওয়ারসার কেল্লায় অগ্নিকাণ্ডে দুই শতাধিক নিহত ও পাঁচ শত আহত। জার্ম্মাণীতে আপৎকালীন আইন পাশ।

২৭শে আশ্বিন—

তুমুল বৃষ্টির জন্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রেলপথ জখম। পটুয়াখালী কাটিয়াপাড়ায় সশস্ত্র ডাকাতিতে ৮ হাজার টাকা লুঠ। মাদ্রাজে কর্ণুল জেলায় বোমার আঘাতে পল্লী-ম্যাজিষ্ট্রেটের মৃত্যু সংবাদ।

২৮শে আশ্বিন—

বারাণসীর কনফারেন্সে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর কথা। কেনায়ার ব্যবস্থার প্রতিবাদে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের জিনিষপত্র বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত। গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটী ও আকালীদল বে-আইনী সভা বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত; অমৃতসরে ও তরণতারণে আরও কতিপয় নেতা গ্রেপ্তার। তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়ার রাজনীতিক ও আর্থনীতিক মিত্রতার কথাবার্ত্তা। জার্ম্মাণীর ক্ষতিপূরণ সমস্যার কমিশনের হস্তে সমাধান-ভার অর্পণে মিত্রশক্তির সকলের সম্মতি।

২৯শে আশ্বিন—

নেশন সম্পাদক গুরুদিৎ সিং গ্রেপ্তার ও অমৃতসরে নীত; আকালী ও পরদেশী পত্রের আফিসে খানাতল্লাস; অফিস দুইটিতে পুলিসের তালা-চাবী; পঞ্জাবের নানা স্থানে নূতন নূতন গ্রেপ্তার; মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৩৫।

৩০শে আশ্বিন—

এক বৎসরের কারাভোগের পর স্বামী বিশ্বানন্দের মুক্তি। জলন্ধরে শিখ লীগের মণ্ডপে পুলিসের বাধা, পুলিস ছাউনী সরাইয়া দিতেছে। লীগের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির প্রতি ১৪৪ ধারায় বক্তৃতা বন্ধের আদেশ; অমৃতসরে বে-আইনী প্রবন্ধক কমিটির জন্য নূতন কর্ম্মীর দল অগ্রসর। বাধার জন্য জলন্ধরের পার্শ্বে হুশিয়ারপুর জেলায় লীগের অধিবেশন। কাশীপুরে ক্লাইভ ব্যাঙ্ক পাটের কলে অগ্নিকাণ্ডে ৬৫ হাজার টাকার ক্ষতি। শাহারাণপুরের নিকট ট্রেণ-সংঘর্ষের জন্য গার্ড ও ষ্টেশন মাষ্টার গ্রেপ্তার। ভারত সরকারের ভারতীয় বার-কমিটী নিয়োগের সঙ্কল্প। রেঙ্গুনে 'কলিকাতা ফুটবল ক্লাবে'র বিষম পরাজয়। ভারতে বে-তার টেলিগ্রাফের ষ্টেশন তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে ভারতীয় রেডিয়ো-টেলিগ্রাফ কোম্পানী গঠিত।

১লা কার্ত্তিক—

বেতুল জেল হইতে শ্রীযুত সুন্দরলালজীর কারামুক্তি; জব্বলপুরে অভিনন্দন। শ্রীযুত শেঠ যমুনালাল বাজাজের মোটর ও বগী গাড়ী ওয়ার্দ্ধায় বিক্রয় না হওয়ায় কর্ত্তৃপক্ষ (জরিমানা আদায়ের জন্য) রাজকোটে পাঠাইয়া দিলেন। মোসলেম লীগের পুনর্গঠনের জন্য দিল্লীতে নেতাদের সভায় কমিটী গঠিত। ঝাঁসীতে রামলীলা শোভাযাত্রায় মুসলমানদের আক্রমণে ৫ জন হিন্দু আহত। পারস্যে রুসিয়ানদের বলশেভিক-বাদ ও বৃটিশ-বিদ্বেষ প্রচারের সংবাদ। কেপটাউনে বণিকসভার কংগ্রেসে ট্রান্সভালের এশিয়া-বিরোধী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত।

২রা কার্ত্তিক—

পাঞ্জাব সরকার কর্ত্তৃক পাঞ্জাবী সংবাদপত্রসমূহে শিরোমণি প্রবন্ধক কমিটী ও আকালী দলের ইস্তাহার প্রকাশ নিষিদ্ধ। তিহরীতে রাজমাতার লোকান্তর।

৩রা কার্ত্তিক—

করাচীর আল-ওয়াহিদ সম্পাদক মাষ্টার দীন মহম্মদের কারামুক্তি। প্রবন্ধক কমিটীর কার্য্যকরী সভার আরও দুই জন সদস্য গ্রেপ্তার। পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় প্রবন্ধক কমিটীর সমস্যা আলোচনায় বাধা। ঝাঁসী মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক মৌলানা মহম্মদ আলির অভিনন্দন। সাম্রাজ্য-সংঘে সার সাপ্রু কর্ত্তৃক উপনিবেশের ভারতীয়দের জন্য সমান ব্যবহার পাইবার চেষ্টায় ভারত হইতে পণ্ডিত মালব্যের সমর্থন। কুরম-আফগান সীমান্ত সমস্যার সমাধান চেষ্টায় কমিশনের অধিবেশন। কানাডা হইতে প্রিন্স অব ওয়েলসের লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন। তুর্কীস্থান ও আফগানিস্থানে বলশেভিক চক্রান্ত। বারলিন গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্যাভেরিয়ার রাজনীতিক সংঘর্ষ।

৪ঠা কার্ত্তিক—

এক সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর আকালী ও আকালী পরদেশী পত্রের পুনঃপ্রকাশ। রাজস্থান মল্লবিদ্যাশালায় খানাতল্লাস। উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ একরাম রসুল দেড় বৎসর কারাভোগের পর মুক্তি পাইলেন। আইলা-স্থাপেলে রেনিশ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

৫ই কার্ত্তিক—

পঞ্জাব কাউন্সিলে রাজনীতিক কয়েদীদের মুক্তি-প্রদানের প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য। মহাপ্রাণ মিঃ সি এফ এণ্ড্রুজের সভাপতিত্বে নওগাঁয় আসাম ছাত্রসম্মিলনের অধিবেশন। কাশীতে টিকরী ঘাট হইতে দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত ১১ মাইল সাঁতারে শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রথম হইলেন। বিলাতে সার সাপ্রুর উপনিবেশ সমস্তার সমাধান চেষ্টায় জেনারেল স্মাটসের অসম্মতি। গ্রীসে নানা স্থানে সৈন্তদের বিদ্রোহ।

৬ই কার্ত্তিক—

জব্বলপুর টাউনহলে স্বরাষ্ট্রসচিবের সংবর্দ্ধনা বয়কটে পিকেটিং। শ্রীযুত সুলতান আহমদ পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইলেন। জার্ম্মাণীতে স্বাতন্ত্রিক দলের অভ্যুত্থান, বহু সহর অধিকার; রেনিশ প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সহিত রূঢ়ের ব্যবসায়ীদের মীমাংসা-চেষ্টা ব্যর্থ।

৭ই কার্ত্তিক—

প্রবন্ধক কমিটার জ্ঞানী গুরুমুখ সিং ও তেজ সিং গ্রেপ্তার। হুশিয়ারপুর জেলায় বাবর আকালী নেতা ধন্না সিংএর গ্রেপ্তারের সময় বোমা বিস্ফোরণ, ৫ জন কনষ্টেবল ও ধন্না সিং নিহত, ২ জন পদস্থ য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী আহত হাথরসে প্রাদেশিক মাড়বারী অগ্রবাল সভায় বিদেশী-বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, স্ত্রী-শিক্ষা, মাদক বর্জ্জন প্রভৃতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত। বারাণসীর কুলী ডিপোর মরিশস-যাত্রীদের মধ্য হইতে ডাঃ মণিলাল কর্ত্তৃক ছোটেলাল নামে এক ব্রাহ্মণ-তনয়ের উদ্ধার। সিন্ধু, সক্করে জগতের মধ্যে বৃহত্তম সেচের খাল খনন আরম্ভ। সাম্রাজ্য-সংঘে সার সাপ্রু ও বিকানীরের মহারাজার বক্তৃতা।

৮ই কার্ত্তিক—

নাগপুরে নূতন এক মসজিদের সম্মুখে গান-বাজনা বন্ধের সরকারী আদেশ অগ্রাহ্য করায় ১৫ জন হিন্দুর গ্রেপ্তার। এলাহাবাদে বড় লাটের অভ্যর্থনায় মিউনিসিপ্যালিটীর অসম্মতি। মাদ্রাজের ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ টাকা তহবিলের অভিযোগে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অভিযুক্ত। যুক্তপ্রদেশে রাজভক্তদের সাহায্যের জন্ত ব্যবস্থাপক সভায় লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ বৃটেন হইতে আয়ারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসনের জন্ত ৬ জন আইরিশ ২৯৪১ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ পাইলেন। জার্ম্মাণীর নানা স্থানে স্বাতন্ত্রিকগণের পরাভব।

৯ই কার্ত্তিক—

অমৃতসর জেলের ভিতর আকালী নেতাদের মামলা আরম্ভ, মামলা সম্পর্কে পণ্ডিত মতিলালের তথায় গমন। রাজকোট জেল হইতে মৌলানা সৌকৎ আলির কারামুক্তি। সাম্প্রদায়িক সমস্তার লালা লজপৎ রায় ও ডাঃ আনসারী কর্ত্তৃক একটা খসড়া ব্যবস্থা-পত্র প্রস্তুত। ইরাণে তাঁজ-বিগ্রহের সংবাদ। পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভা সাম্রাজ্য প্রদর্শনীর জন্ত স্থায়ীর বরাদ্দ কমাইতে পারিলেন না; পাঞ্জাবে সেচের খালের জন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা ঋণ লওয়া হইল। পঞ্জাব মন্ত্রী লালা হরকিষেণ লালের পদত্যাগে গবর্ণরের সম্মতি। রয়্যাল সার্ভিস কমিশনে সার চীমনলাল শীতলবাদের পদত্যাগ, শ্রীযুত এম এম সমর্থ নিযুক্ত। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সমিতিতে শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীই ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত। গ্রীক বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ।

১০ই কার্ত্তিক—

বাঙ্গালার রাজবন্দীদের প্রতি সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহারের সংবাদ। পঞ্জাব সরকার নূতন লরেন্স মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে অস্বীকার করায় লাহোর মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক সরকারকে পুরাতন মূর্ত্তি সরাইয়া লইবার অনুরোধ। বাঙ্গালা সরকার হাবড়ার ভাসমান পুলের স্থানে ক্যান্টিলিভার সেতু রচনা করানই স্থির করিলেন। মহীশূরে শাসন-ব্যবস্থায় নূতন সংস্কার। লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল ব্রুম চৌধুরী মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হইলেন। ভাগলপুরে সরকারী মেডিকেল স্কুল খুলিবার সঙ্কল্প। যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী বয়কটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য। সর্দ্দার সেপা পারজের নূতন প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

১১ই কার্ত্তিক—

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল দাশরথি সান্যাল মহাশয়ের পরলোক। দিল্লী, শোণপথে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধে রামলীলা মেলা স্থগিত।

১২ই কার্ত্তিক—

বড় লাটের লক্ষ্ণৌ-গমনে হরতাল। মৌলানা মহম্মদ আলির অভ্যর্থনায় সরকারী আপত্তিতে আমেদাবাদ, বোরসাদ মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও এক ভূতপূর্ব্ব সভাপতির পদত্যাগ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে বয়কটের ও কলিকাতা করপোরেশন নির্ব্বাচনের সাব-কমিটি গঠন, সাম্প্রদায়িক-সমস্তা সমাধান জন্ত দিল্লী কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য। কলিকাতায় ডাক ও আর এম এস বিভাগের কনফারেন্স। ধন্না সিংএর গ্রেপ্তারে নিহত কনষ্টেবল ৫ জনের পরিবারবর্গের জন্ত ভূমির ও আর এক জনের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্ত পেন্সনের ব্যবস্থা। পঞ্জাব, বিশালপুরে কালীমন্দিরে পূজা-নিরত স্ত্রীলোকদের উপর সশস্ত্র মুসলমানদের আক্রমণ; হিন্দুদের সহিত সংঘর্ষে দুই পক্ষে হতাহত। সাম্রাজ্য-সংঘে জেনারেল স্মাটসের প্রতিকূলতা, ঔপনিবেশিক সচিবেরও সহানুভূতির অভাব। সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থাপক সভা বৃটিশের নৌ-বিভাগীয় আড্ডার জন্ত ভূমিক্রয়ের নিমিত্ত ৫ লক্ষ ডলার মঞ্জুর করিলেন। ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ বোনার-ল'র লোকান্তর।

১৩ই কার্ত্তিক—

লাহোরের প্রতাপ সম্পাদকের রাজদ্রোহ অপরাধে ৩০০ টাকা অর্থদণ্ড। পুণা মিউনিসিপ্যালিটীর লাট অভিনন্দনে অসম্মতি। জামীন না দেওয়ায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্ব্বাচনে যোগ দিতে পারেন বলিয়া যুক্তপ্রদেশের সরকারের সিদ্ধান্ত। এঙ্গোরার জাতীয় পরিষৎ কর্ত্তৃক তুরস্ককে সাধারণতন্ত্রে পরিণত করার সমর্থন; তুরস্কে সাধারণতন্ত্রের ঘোষণা, ইসমিদ পাশা নূতন প্রধান মন্ত্রী।

১৪ই কার্ত্তিক—

জার্ম্মাণীতে এখনও স্বাতন্ত্রিক আন্দোলনের বিস্তার। জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্স হল্যাণ্ড হইতে স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। স্যালোনিকার সামরিক বিচারে বিদ্রোহী ১৯ জন গ্রীক অফিসারের প্রতি নানারূপ দণ্ডের ব্যবস্থা।

১৫ই কার্ত্তিক—

বড় লাটের এলাহাবাদ-গমনে হরতাল। কংগ্রেস কর্ত্তৃক নূতন হিন্দু-মুসলমান তদন্ত কমিটি গঠিত। আকালী-পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক সর্দ্দার মঙ্গল সিং গ্রেপ্তার। রেঙ্গুন মেলের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত মজর আলি সোখতের ২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি। ১৫ই সেপ্টেম্বরের ভ্যানগার্ড বাজেয়াপ্ত।

সম্পাদক—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী" বৈদ্যুতিক মেশিন যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিদ্রিতা

শিল্পী শ্রীভবানীচরণ লাহা
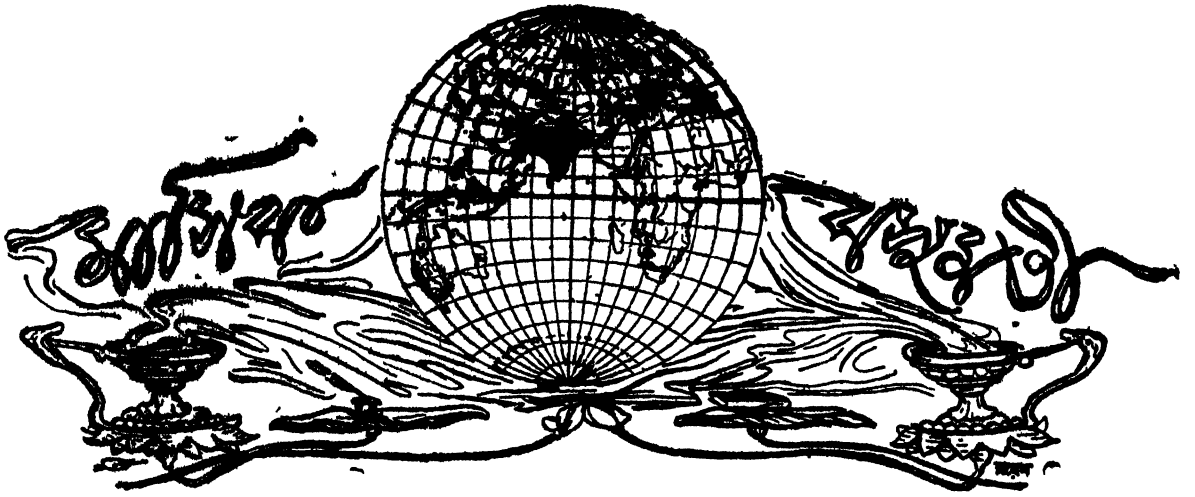
২য় বর্ষ } ২য় * পৌষ, ১৩৩০ * খণ্ড { ৩য় সংখ্যা

শ্রীরামকৃষ্ণ

১

গদাধর এখনও শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বিহিত বিধানে নিত্য বৈধী পূজা সমাধা করা তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। ভালবাসার স্থষ্টিছাড়া রীতি, কোনরূপ বিধি-নিষেধের বাধা মানে না।' গদাধরের অলৌকিক অনুরাগ তাই পূজার পূর্ব্বে কোন দিন ভোগ নিবেদন করিয়া বসে; কোন দিন মায়ের পূজার জন্ত গাঁথা-মালা আপন গলায় তুলিয়া দেয়। দেবালয়ের কর্ম্মচারিগণ ছোট-ভট্চাযের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ভয় ভয় করিয়া দেখে, মনে মনে গাঁথিয়া রাখে। বলা ত যায় না! কোন সময় যদি অনুকূল অবস্থায় পাইয়া, পূজকের এই সকল অরাজক আচার শুনাইয়া বাবুকে এখনও কাবু করা যায়! কে বলিতে পারে! কিন্তু সে সময়ও কোন দিন আসিল না, আর মথুরবাবুরও কাবু হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ছোট-ভট্চাযের উপর তাঁহার ভক্তি-শ্রদ্ধা, প্রীতি-ভালবাসা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুতরাং আপাততঃ তাহাদের নিষ্ফল আক্রোশ শৈলমূলে তটিনীর ন্যায় মাথা কুটিতে লাগিল। তথাপি তাহারা মনকে বুঝাইতে ক্রটি করে না—বাপু হে! ব্যস্ত হইলে চলিবে না। চিরদিন কখন সমান যায় না। এক দিন আসিবে, যে দিন—দিন আসিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন—দেবালয়ের কর্ম্মচারিবর্গের ভাগ্য বিধায়িনী রাণী রাসমণি। এই নিঃশঙ্ক-কর্ম্ম-পরায়ণা রমণীর সম্মুখে কর্ম্মচারিগণ শঙ্কায় মন্ত্রাহত সর্পের ন্যায় নতশির হইয়া পড়িত। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুইটি যেন মশালের মত জ্বলে। আজ সকলে শশব্যস্ত। হস্ত আজ হুঁকার দিকে অগ্রসর হইতে ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছে। যার কায নাই, অভাবপক্ষে তার অছিলা আছে। রাণীর কিন্তু কাহারও উপর লক্ষ্য নাই। দেবালয়ে আসিয়া প্রথম সকল দেব-দেবীকে প্রণাম করিলেন, তার পর পরিচারিকা সঙ্গে স্নানার্থিনী হইয়া গঙ্গাভিমুখে চলিলেন। রাণীর আগমনে উদ্যান সহসা যেন সজাগ হইয়া উঠিল। এ দিকে স্নান সমাপনান্তে রাণী ধীরে ধীরে শ্রীভবতারিণীর মন্দিরে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির সন্নিকটে আহ্নিক-পূজায় বসিলেন। ফুল-বিল্বদল বাছিতে বাছিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গদাধরের উপর। তাহার মিষ্ট কণ্ঠের সুধা-বর্ষণ—রাসমণির এক অপূর্ব্ব আকর্ষণ ছিল। অবসর পাইলেই তিনি সে অমৃত আস্বাদনের জন্ত লালায়িত হইতেন। রাণী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী, সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ বহু গায়ক পুরস্কার-লোভে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া তাঁহার কর্ণে সুধা সিঞ্চন করিয়াছে, কিন্তু এই অশিক্ষিত

যুবকের স্বভাবদত্ত শক্তির কাছে সব নগণ্য। ইহার স্বর-লহরীতে মাধুরী যেন প্রাণময়ী হইয়া খেলিয়া বেড়ায়! বুঝা যায় না—গান কি ইন্দ্রজাল-রচনা! ইহার ভাবের হিল্লোলে শ্রীমন্দির যেন টল্ টল্ করে, পাষাণ-প্রতিমার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরে! ধ্যান-জপের যাহা বশীভূত নয়, সেই মন আপনা হইতে উধাও হইয়া দেবী-পাদ-পদ্মে লয় হয়। গান শুনাইবার জন্য রাণী ছোট-ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। গান আরম্ভ হইল। কিন্তু আদালতে একটি বিশিষ্ট মোকদ্দমার কথা ভাবিতে ভাবিতে রাণীর মন আজ ক্ষণে ক্ষণে বিষয়ারণ্যে হারাইয়া যাইতেছে। রাসমণি যত্নে তাহাকে ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু আবার সে ছুটিয়া পলায়। এমনই করিতে করিতে অবশেষে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এই সময় গানও থামিয়া গেল এবং গদাধর রাণীর শরীরে করাঘাত করিয়া উগ্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, "এখানেও ঐ ভাবনা ঐ চিন্তা!"

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

মন্দিরে যদি সহসা বজ্রপাত হইত, কেহ এমন চকিত হইত না। দ্বারবান্ ও পরিচারিকাগণ মহা গণ্ডগোল করিয়া উঠিল, ছোট-ভট্চায আজ রাণী মায়ের গায়ে হাত তুলিয়াছেন! হঠাৎ ঝড় উঠিলে যেমন ধূলা ছুটে, কথাটা তেমনই নিমেষে মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। কর্ম্মচারিমহাশয়গণ জুতা, খাতা, কলম ফেলিয়া মন্দিরাভিমুখে ছুটিয়া আসিলেন এবং আসিয়া দেখিলেন, বিচারকের সম্মুখে অপরাধিনীর ন্যায় বিপুল বৈভবশালিনী রাণী দীনহীন ব্রাহ্মণসন্তানের সম্মুখে বসিয়া আছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদের মনে হইল, আজিকার এ ব্যাপার অল্পে
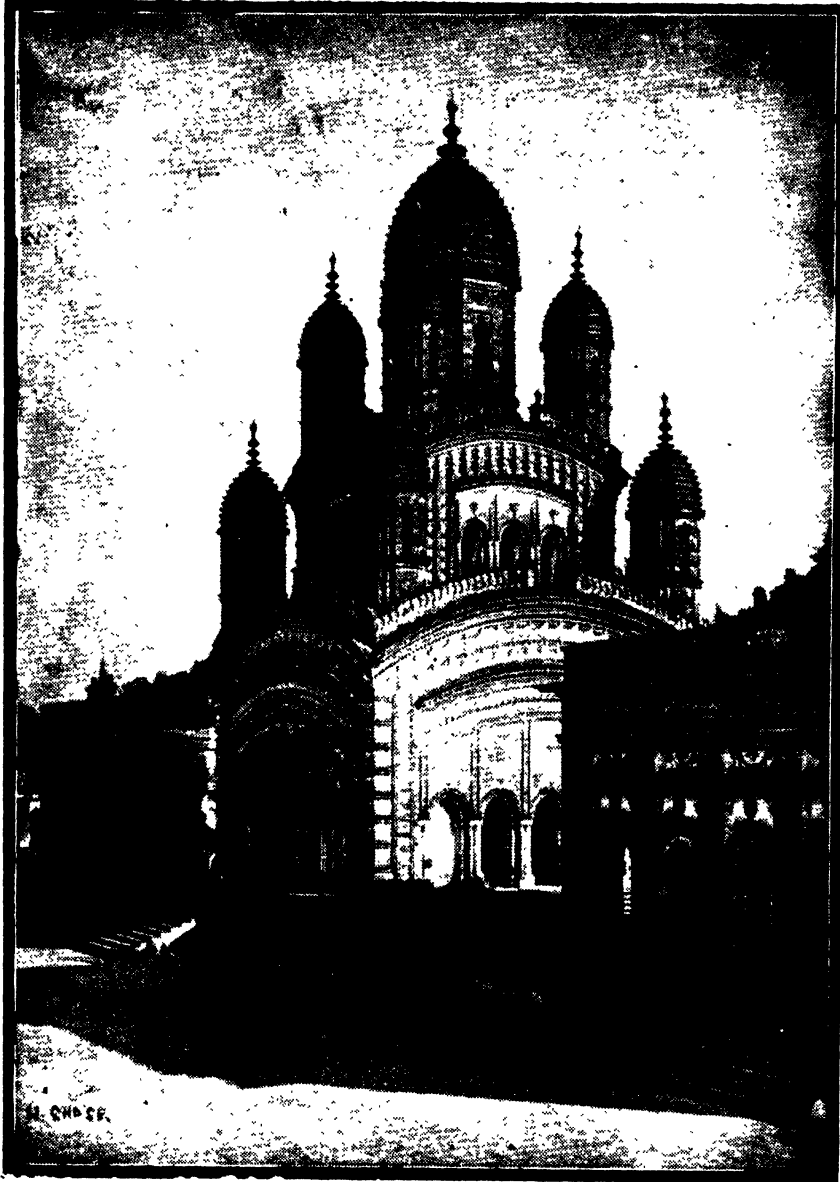
অন্নে মিটিবে না। কিন্তু বড়-মহাশয় ছোট-মহাশয়দিগের উপর এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যাহার ভাবার্থ—কেমন! যা বলেছিলাম, তা ঠিক ত! ছোট-মহাশয়দিগের মধ্যে একটা অনুচ্চ আলোচনা চলিল। বাহিরে যখন প্রভাত-কাকলীর ন্যায় এমনই অস্পষ্ট কানাকানি, মন্দিরের ভিতরে তখন দণ্ডিতা ও দণ্ডদাতা উভয়েই স্থির, নিস্তব্ধ, গম্ভীর। গদাধরের মুখে ঈষৎ হাসি, কিন্তু রাণীর সলজ্জ সঙ্গে নিরন্তর যুদ্ধ চলিতেছে। বৈধব্য যখন মণির মহল লুঠ করিয়া তাঁহার হাতে কেবল মাটীর বৈভব—জমীদারীর জঞ্জাল তুলিয়া দিল, পাছে সে জঞ্জাল মোহিনীজাল পাতিয়া তাঁহার বাসনাকে আবদ্ধ করে, এই ভয়ে নিত্যস্মৃতি জাগাইয়া রাখিবার জন্য, তিনি জমীদারীর শিলমোহরে নামাঙ্কিত করিয়াছিলেন—"কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" কোথায় সে অভিলাষ? প্রফুল্ল কোকনদ-লাঞ্ছিত,

শান্তি-কুটীর।

বদনে ঈষৎ বিষণ্ণতার আভাস দেখিয়া মহাশয়গণ মনে মনে সম্ভবতঃ অনুমান করিলেন, ক্রোধাগ্নি ঘনাইয়া উঠিতেছে, এইবার নির্ঘাত বজ্রাঘাত! কিন্তু রাণীর অন্তর তখন ক্ষুব্ধ সিন্ধুর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এ কি বিষম বিষয়াসক্তি! স্বামী যে দিন তাঁহার মাথার উপর কতকগুলি কর্ত্তব্যের বোঝা চাপাইয়া সংসারের ভোগ-সুখ সমস্ত হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, সেই দিন হইতে এই আসক্তির দেব-দেব-বাঞ্ছিত ঐ ত সে শ্রীপদ, রাণীর চক্ষুর সমক্ষে মৃত্যুঞ্জয়বক্ষে বিরাজমান! ঐ ত সাক্ষাৎ জগজ্জননী—বরাভয়-করা, মানস-তামস-হরা, কাল-ভয়-বারিণী, ভব-বন্ধন-হারিণী ভবতারিণী! কিন্তু কোথায় তাঁহার অভিলাষ? বাসনার এ কি উপহাস! নিশ্বাস প্রায় শেষ, শ্যামকেশ সিত হইয়াছে, দিন দিন দেহ অশক্ত, এখনও, হায়, বিষয়াসক্ত মন মোকর্দ্দমার তদ্বিরে ফিরিতেছে! কিন্তু অচিরে যে

ডিক্রিজারী হইয়া পাঁচ ভূতের এই ইজারা-মহল—লাটে উঠিবে, তার উপায় কি? ওঃ, মন কি প্রতারক! গঙ্গায় অঙ্গ পবিত্র করে, মায়ের এই পুণ্যমন্দিরে ফুল-চন্দন—ভক্তি-ভালবাসার পরিবর্ত্তে অঞ্জলিভরে আবর্জ্জনা—বিষয়-বাসনা এনেছে পূজার জন্য! কিন্তু দীনহীন ব্রাহ্মণ যুবক-রূপে কে এ মহাপুরুষ! আমার চিত্তের দুর্ব্বলতা, অন্তরের কথা, মনের জুয়াচুরি এ জান্‌লে কেমন ক'রে? প্রখর অন্তর্দৃষ্টিশালিনী রাণী বুঝিলেন, এ যে-ই হ'ক, নিশ্চয় হবে। মহাশয়গণের আসরে অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। এ দিকে রাণী অন্দরে গিয়া জামাতা মথুর মোহনের কাছে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিলেন, ছোট-ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের কোন দোষ নাই ওঁর উপর কোন অত্যাচার না হয়। উনি যেমন ভাবে চলিতেছেন, চলুন! যেমন করিয়া পূজা করেন, করুন।

এ দিকে বিধানের জন্য মহাশয়গণ উদ্গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অনতিপরে অন্তঃপুর হইতে যে

পঞ্চবটী।

এক জন নিপুণ ভবরোগ-বৈদ্য! ইহার হাতের আঘাত—অপমান নহে, করুণার দান!

বাহিরে কি হইতেছিল, রাসমণির এতক্ষণ হুঁস ছিল না এবং তাঁহার মৌন অবস্থানে মহাশয়গণের গণ্ডগোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছিল। রাণীর রক্তচক্ষু-পাতে সকলে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। বড়-মহাশয় ভাবিলেন, রাসমণি একে রমণী, তায় রাণী। এই লজ্জাকর ঘটনায় বিষম অপ্রতিভ হইয়াছেন, এখান থেকে সরিয়া যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মথুরবাবু এলেই, রাণী অন্দরে গেলেই এর বিধান বিধান আসিল, তাহা অতি বড় উন্মাদেরও কল্পনাতীত! বিধান আসিল, ছোট-ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের জন্য—মিছরীর পানা ও মিষ্টান্ন। বড়-মহাশয় আসরে একটিমাত্র ক্ষুদ্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এ ত জানাই ছিল—বড়লোকের বড় কথা! ওদের মায়া বোঝা শক্ত!

মথুর বুঝিলেন, রাণীর প্রতি বাবার এই আচরণ, আধ্যাত্মিক প্রেরণা হইলেও, উন্মত্ততার প্রথম উত্তেজনা। এখন হইতে ইহার ব্যবস্থা না করিলে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। কলিকাতার তখনকার প্রসিদ্ধ কবিরাজ

গঙ্গাপ্রসাদ সেন চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কেবল ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া মথুর নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অবসর পাইলেই গদাধরকে তর্ক-যুক্তি সহায়ে বুঝাইতে লাগিলেন যে, সাধনায় যথেচ্ছাচার কখনই কল্যাণকর হইতে পারে না। সকলই একটা নিয়মের অধীন। এমন কি, ঈশ্বরও তাঁহার কৃত নিয়মে বাধ্য। তা রদ করবার সাধ্য তাঁরও নাই।

মথুর এ কথা মানিয়া লইলেন না। সেদিনকার মত কথাটা এইখানেই থামিল। পরদিন গদাধর উদ্যানপথে আসিতে আসিতে দেখিল, একটা লাল জবার গাছে একই ডালে দুই ফেঁকড়িতে দুইটি ফুল ফুটিয়াছে, একটি টক্‌টকে লাল, আর একটি ধব্‌ধবে সাদা। ডালসুদ্ধ ফুলদুটি তুলিয়া আনিয়া মথুরকে দিয়া বলিল, এই দেখ।

মথুর অবনতমস্তকে বলিলেন, আমার হার হয়েছে, বাবা!
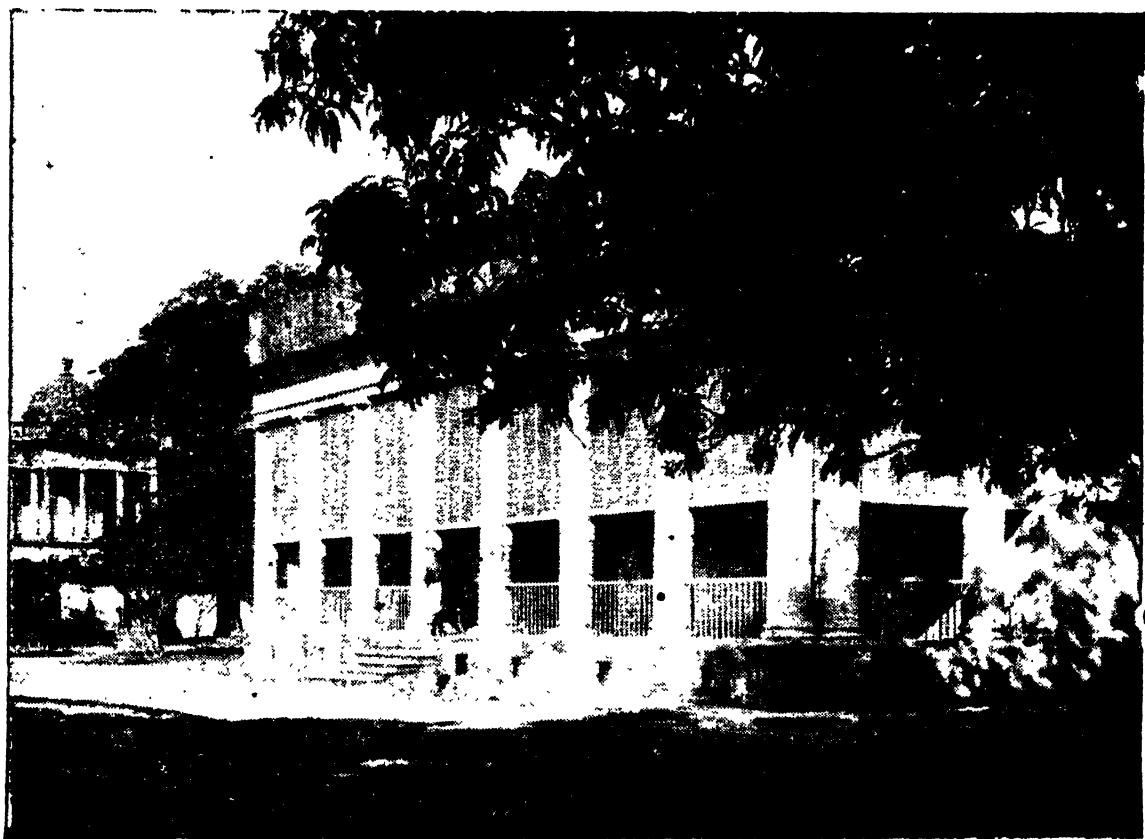
বাবু-কুঠী—দূরে নহবৎখানা।

গদাধর উত্তরিল, ও তোমার কি কথা! যাঁর নিয়ম, তিনি ইচ্ছা করলে তা রদ, বদল, বাহাল, সবই করতে পারেন।

মথুর কহিলেন, না, বাবা, তা কখন হ'তে পারে না। লালফুলের গাছে লাল ফুলই হবে, সাদা ফুল কখন জন্মাতে পারে না।

গদাধর বলিল, না। তিনি ইচ্ছা করলে তাও হ'তে পারে।

অলৌকিকে অবিশ্বাস-সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-জড়বাদী, সংশয়-নিদান পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙ্গালায় তখন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এই বিজাতীয় শিক্ষার প্রথম ফল, মথুরমোহন তাঁহাদেরই এক জন। সনাতন ধর্ম্মের সকল সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত, এ কথা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবার মত প্রকৃতি তাঁহার ছিল না। গদাধরকে ভালবাসিলেও মথুর তাহাকে প্রতিপদে পরীক্ষা করিতে

ত্রুটি করেন নাই। যে দিন, কিন্তু, তিনি গদাধরকে শিব ও শ্যামারূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার সকল পরীক্ষার শেষ হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী ও পঞ্চবটীর মাঝখানে বাবুদের কুঠী—রাণী এবং তাঁহার পরিবারবর্গের বাস-ভবন। দেবালয়-দর্শনে আসিলে বাবুরা এইখানেই বাস করিতেন। দেবালয়ের যে কক্ষ গদাধরের বাস-গৃহরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে একটি বারান্দা পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে। আপন ভাবে বিভোর গদাধর এক দিন এই বারান্দায় দ্রুত বিচরণ করিতেছিল। মথুরমোহন সে দিন বাবুকুঠীর একটি কক্ষে বসিয়া ছিলেন। সেখান হইতে ঐ বারান্দা বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার চক্ষু কখন বা গদাধরের উপর, কখন অন্যত্র সন্নিবিষ্ট। দেখিতে দেখিতে মথুরের দৃষ্টি সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। এ কি! এ ত বাবা নয়! এ যে আমার মা—শ্রীমন্দির-বাসিনী ঐ ভবতারিণী, বরাভয়করে আমাকে অভয়দান করছেন! মা কি হর-হৃদি হ'তে নেমে এসে আমাকে দেখা দিলেন? কিন্তু গদাধরের দেহাশ্রিত দেবী যখন পশ্চাৎ ফিরিলেন, মথুর দেখিলেন—দেবদেব! মথুর দুই করে দুই চক্ষু উত্তমরূপে মুছিয়া আবার চাহিলেন, আবার তাই! যখন এগিয়ে আসে—শ্যামা; যখন পিছাইয়া যায়—শিব! এমনই বারবার! তখন আর সংশয়ের শাণিত দৃষ্টি, পরীক্ষার কঠোর বিচার কিছুই রহিল না। মথুর ছুটিয়া আসিয়া গদাধরের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া অজস্র অশ্রুজলে তাহার পদযুগল সিক্ত করিতে লাগিলেন। গদাধর ত মহা বিপন্ন। পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, তুমি এ কি করছ! আপনি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে এ কাণ্ড দেখলে বল্‌বে কি? সে কথা কে শুনে! গদাধরের তখন ভয় হইল, এ ব্যাপার যদি রাণীর কানে উঠে! ভাব্‌বে, কি হয় ত গুণ-টুন্ করেছে। অনেক বুঝাইয়া বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া গদাধর মথুরকে শান্ত করিল এবং তাঁহার মুখে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা শুনিয়া বলিল, আমি, কিন্তু, বাবু, এর বিন্দু-বিসর্গও জানি না।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজের চিকিৎসাধীন থাকিয়াও গদাধরের বায়ুরোগের বিশেষ কোন প্রতীকার হইল না। মথুর বুঝিলেন, দেবকার্য্য হইতে বাবাকে কিছু দিনের জন্য একেবারে অব্যাহতি না দিলে তাহার দেহ নিরাময় হইবে না। কিন্তু উপায় কি? উপায় আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল।

গদাধরের খুড়্‌তুতো ভাই রামতারক ওরফে হলধারী এই কার্য্যান্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। মথুর আপাততঃ তাঁহাকে শ্রীভবতারিণীর পূজক নিযুক্ত করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

মানব ও তৃণ

মানব কহিল,—"ও'রে তৃণ,—ও রে চরণে দলিত ও রে,
সারাটি জীবন কাটাইলি নর-চরণের তলে প'ড়ে!
পশুর আহার জীবনে তোমার চরম সার্থকতা,
তোমার মতন ঘৃণিত জগতে কে বা আর আছে কোথা?"
ঈষৎ হাসিয়া মাথা তুলি' তৃণ কহিল,—"নাহি কি মনে,
মস্তকে তব আশীষের ধারা বরষি ধান্য-সনে!"

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অহ্‌মদাবাদ

শাহীবাগ প্রাসাদ—শাবরমতী নদীগর্ভ হইতে।

অহ্‌মদাবাদ নামটা আরবদের অনুকরণে বোম্বাই প্রদেশের লোক এহ্‌মেদাবাদ উচ্চারণ করিয়া থাকে; প্রকৃত নামটা কিন্তু অহ্‌মদাবাদ। অহ্‌মদাবাদ এখন আমাদের দেশে ও বিদেশে অহ্‌মদাবাদ নামে এত সুপরিচিত যে, তাহার অবস্থানের পরিচয় দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বোম্বাই হইতে অহ্‌মদাবাদ এক রাত্রির পথ; কিন্তু কলিকাতা হইতে যাইতে হইলে ঘুরিয়া যাইতে হয়। কর্ড লাইন দিয়া শীঘ্র যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে আগ্রায় যাইতে হয় এবং সেখান হইতে বোম্বে-বরোদা এণ্ড সেন্‌ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে দিয়া আজমীরের পথে অহ্‌মদাবাদ যাওয়া যায়। অন্ত পথে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান বা বেঙ্গল নাগপুর রেল দিয়া বোম্বাই প্রদেশের প্রথম নগর ভুসাবলে পৌছান যায় এবং সেখান হইতে তাপ্তিভেলী রেলওয়ে দিয়া সুরতে যাইতে হয় এবং তথায় গাড়ী বদল করিয়া বোম্বে-বরোদা লাইনের ব্রড গেজ (Broad Gauge) ধরিয়া অহ্‌মদাবাদে পৌছিতে হয়।

গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি কাপড়ের কল হওয়াতে অহ্‌মদাবাদ নগর আকারে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহা রেলের একটি বড় জংশন। বোম্বাই হইতে আজমীর, মালব, আগ্রা বা দিল্লী যাইতে হইলে বোম্বে-বরোদা লাইনের বড় গাড়ী ছাড়িয়া এই অহ্‌মদাবাদে মিটর গেজ লাইনের গাড়ীতে উঠিতে হয়।

অহ্মদাবাদ হইতে ঢোলকা, ঈদর প্রভৃতি স্থানে যাইবার ছোট লাইন আছে এবং কাঠিয়াবাড়ে যাইতে হইলে অহ্মদাবাদ ষ্টেশন দিয়াই যাইতে হয়। অহমদাবাদে গত আট বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কমই দেখিয়াছি। বোম্বাইতে মডারেটদলের কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে এবং অহ্মদাবাদ কংগ্রেস উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী সেখানে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমাদের প্রদেশের লোক সাধারণতঃ দেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া এত দূর পর্য্যন্ত যান না।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, ১৪১০ খৃষ্টাব্দের পরে এবং ১৪৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজা প্রথম অহ্মদ শাহ্ কর্ণাবতী এবং অসাবল নামক দুইটি প্রাচীন গ্রাম একত্র করিয়া যে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম অহ্মদাবাদ। এই নগর অনেক দিন ধরিয়া গুজরাটের রাজধানী ছিল, মধ্যে এক শত বৎসর আন্দাজ গুজরাটের রাজধানী চাম্পানেরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরে যত দিন গুজরাট স্বাধীন ছিল, তত দিন
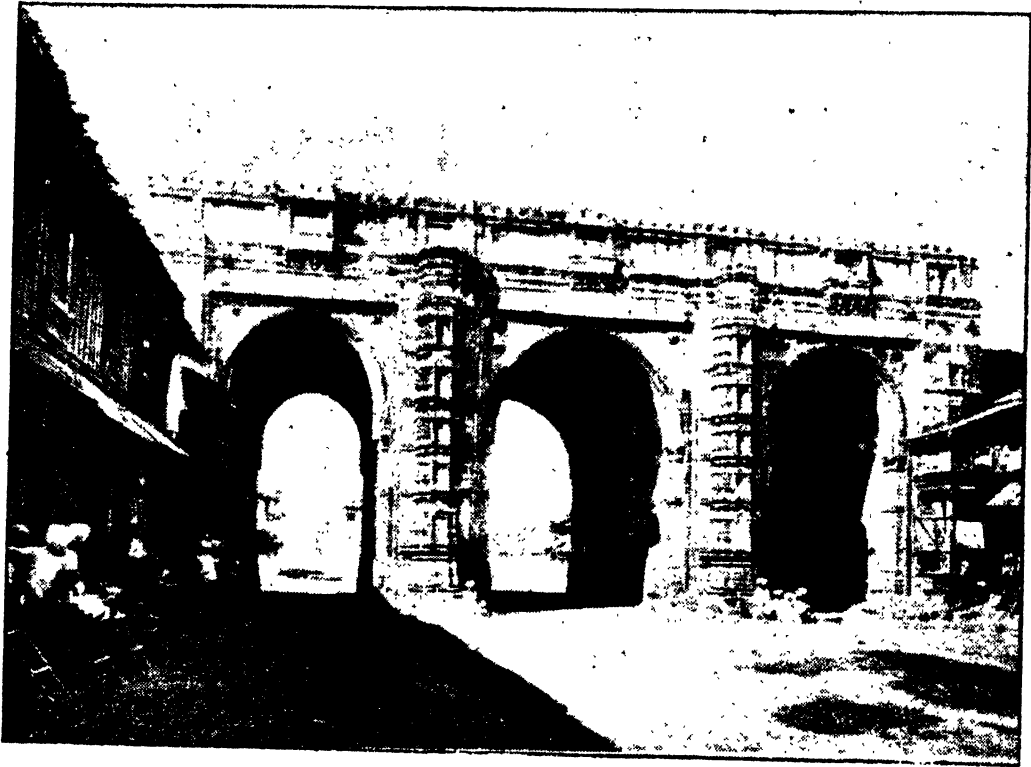
তিন দরওয়াজা।

অহ্মদাবাদে এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক কয়লার ব্যবসা করেন, তাঁহার নামটি আমি ভুলিয়া গিয়াছি; এতদ্ব্যতীত পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের এক জন এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রান্তীজে বাস করিতেন, তিনিও এখন বদলী হইয়া অন্যত্র গিয়াছেন।

অহ্মদাবাদ আগ্রা ও দিল্লীর তুলনায় খুব পুরাতন সহর নহে। সম্ভবতঃ আগ্রা স্থাপিত হইবার দুই এক শত বৎসর পূর্ব্বে অহ্মদাবাদ নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুজরাটের সুলতানরা অহ্মদাবাদেই বাস করিতেন। আকবর গুজরাট জয় করিয়া তাহা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন এবং যত দিন গুজরাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তত দিন অহ্মদাবাদেই তাহার রাজধানী ছিল। যে বৎসরে পলাশীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই বৎসরে গুজরাট মারাঠা গায়কবাড়গণ কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজদিগের হস্তে আসে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে অহ্মদাবাদ নগর ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং তদবধি ইহা বোম্বাই প্রদেশের দ্বিতীয় নগর।

শাবরমতী নদীর একটি বাঁকের অনতিদূরে এই নগরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন ইহার পশ্চিম দিকে ও উত্তর দিকে নদী; কারণ, বর্ত্তমান অহ্মদাবাদ প্রাচীন নগরপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া চারিদিকেই বাড়িয়াছে। গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদের সময়ে এবং মোগল বাদশাহ্‌দের আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই সকল গ্রাম জনাকীর্ণ উপনগরে পরিণত হইয়াছিল।

অহ্মদাবাদ ষ্টেশনে নামিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হইলে কালুপুর, পাঁচকুয়া বা সারণপুর দরওয়াজা দিয়া নগরের প্রাচীন বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বর্ত্তমান নগর-প্রাচীর বরোদার গায়কবাড়বংশের অধিকারকালে নির্ম্মিত, তবে দর্‌ওয়াজাগুলি আরও পুরাতন। উত্তর দিকে

শাহীবাগ প্রাসাদের দক্ষিণদিক।

সময়ের প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বাহিরে আসর্ব্বা, দরিয়াপুর, সারসপুর, রাজপুর-হীরপুর, কাঙ্গাইপুরা, বহরামপুর, ওসমানপুরা, কোচরাবপালড়ি প্রভৃতি গ্রামে অনেক ঘরবাড়ীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী আমলে এই সকল গ্রাম যেমন উপনগর হইয়া উঠিয়াছে, গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদের সময়ে এবং শাহ্‌জহান ও সাহাপুর, হালিম, দিল্লী ও দরিয়াপুর—এই চারিটি দর্‌ওয়াজা আছে। পূর্ব্ব দিকে প্রেমাভাই, কালুপুর, পাঁচকুয়া, সারণপুর নামক চারিটি দর্‌ওয়াজা আছে। দক্ষিণ দিকে রায়পুর, অষ্টোডিয়া, মহুড়া ও জামালপুর নামক চারিটি দর্‌ওয়াজা আছে। নগরের পশ্চিম দিকে নদী, কিন্তু এই দিকেও খানপুর, বারদারী, রাম, গণেশ, রায়খড় ও খাঁজহান্

নামক পাঁচটি দর্ওয়াজা আছে। অহ্‌মদাবাদ নগরে দেখিবার জিনিষ কেবল পুরাতন মস্‌জিদ ও কবর। গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদের আমলের কোনও প্রাসাদ এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। নগরের ভিতরে প্রধান রাজপথের উপরে একটি প্রকাণ্ড তিন খিলানের ফটক আছে। মস্‌জিদ ও কবর ব্যতীত অহমদাবাদ সহরে গুজরাটের স্বাধীন রাজাদের আমলের ইমারত এই একটিমাত্র। এই ফটক বা দর্ওয়াজার নাম 'তিন দর্ওয়াজা'। দূর হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মধ্যের দর্ওয়াজাটি সাড়ে ১৭ ফুট এবং পার্শ্বের দুইটি ১৩ ফুট চওড়া এবং প্রত্যেক খিলান ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক খিলানের দেওয়াল ৩৭ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট চওড়া। প্রত্যেক খিলানের উপর দর্ওয়াজার সম্মুখে ও পিছনে এক একটি ছোট বারান্দা আছে এবং এক কালে দর্ওয়াজার উপরে খোলার চাল দেওয়া ছাদ ছিল; কিন্তু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই দর্ওয়াজা মেরামতের সময় তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে।

শাহীবাগ—প্রথম স্তরের উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ।

দেখিলে এটিকে একটি মস্‌জিদ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু পরে গাড়ী বা মোটর যখন ইহার ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, তখন বুঝিতে পারা যায় যে, মুর্শিদাবাদের ত্রিপুলিয়া দর্ওয়াজা বা লক্ষ্ণৌয়ের রুমী দর্ওয়াজার মত ইহাও এককালে প্রাসাদের প্রধান তোরণ ছিল, কিন্তু কালে ইহার সম্মুখে ও পশ্চাতে অনেক বাড়ী ঘর তৈয়ারী হওয়ায় ইহার পুরাতন শোভা

গুজরাটের স্বাধীন সুলতানের প্রাসাদের উদ্যান এই 'তিন দর্ওয়াজা' হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি ফোয়ারা বা করঞ্জ ছিল এবং ফোয়ারার চত্বরের চারিদিকে কমলানেবু, সর্ব্বতীনেবু ও তালগাছ ছিল। বড় বড় রাজকর্ম্মচারী ও করদ রাজারা এই উদ্যানে নিজেদের অনুচরদিগকে সাজাইয়া গোছাইয়া রিশালা ও সওয়ারী

(Procession) ঠিক করিয়া লইতেন এবং প্রাসাদের দ্বিতীয় তোরণ দিয়া সুলতানের দরবারে যাইতেন। গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদিগের প্রাসাদের নাম ছিল ভদর্ বা ভদ্র। এখনও ইংরাজ-রাজার সমস্ত আফিস ও কাছারী এই ভদরের প্রাচীর-ঘেরা এলাকার মধ্যে অবস্থিত। ভদরের দর্ওয়াজার খিলান ব্যতীত এখন আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। মোগল বাদশাহ্দিগের আমলে আজম খাঁ নামক এক জন কর্ম্মচারী ভদরের দর্ওয়াজার সম্মুখে সেই অংশ রাণপুর নামক স্থানে এই আজম খাঁ আর একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজম খাঁর প্রাসাদ ভদরের প্রধান তোরণের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং ইহা দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি সরাই, বর্ত্তমানকালে ইহা অহ্মদাবাদ নগরের প্রধান ডাকঘর। ডাকঘরটি সরাইয়ের প্রবেশের দুয়ারে অবস্থিত এবং এই সরাইয়ের গম্বুজ অহমদাবাদ নগরের সর্ব্বোচ্চ গুম্বজ। এই দর্ওয়াজার উত্তর দিকে একটি অতি ক্ষুদ্র অঙ্গন এবং কয়েকটি দ্বিতল

আজম খাঁর প্রাসাদ—এক্ষণে অহ্মদাবাদ জেলে পরিণত।

একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা এখনও আজম খাঁর প্রাসাদ বলিয়াই পরিচিত। মীর মহম্মদ বাকের, শাহ্জহানের রাজত্বকালে আজম খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইংরাজরা যখন উড়িষ্যার উপকূলে পিপলীতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন তখন, অর্থাৎ—১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে এই আজম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে আজম খাঁ গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান অহ্মদাবাদ জিলার যে অংশ কাঠিয়াবাড়ে অবস্থিত, প্রকোষ্ঠ আছে, ইহাই আজম খাঁর সরাই। গুম্বজের উপরে একটি শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, বাদশাহ্ শাহ্জহানের রাজ্যকালে ১৪৪৭ হিজিরা অর্থাৎ—১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে আজম খাঁ কর্ত্তৃক এই সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আজম খাঁর সরাইয়ের দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড ফটক আছে, ইহাই আজম খাঁর প্রাসাদের ফটক। প্রাসাদটি দ্বিতল, ইহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এখন অহ্মদাবাদের

ছোট আদালতের সিভিলজেল অবস্থিত। দ্বিতলের প্রকোষ্ঠগুলি এখন অহ্মদাবাদ জিলার জজ-সাহেবের রেকর্ড রুম। এই আজম খাঁর প্রাসাদের ছাদের উপর অহ্মদাবাদের মোগল-বাদশাহীর একমাত্র চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, সেটি একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বেদী। বেদীটি, কৃষ্ণ, হরিদ্রা ও শ্বেতবর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত এবং ইহা অষ্টকোণ। এই বেদীর উপর বসিয়া বাদশাহ্ অথবা সুবাদার তিন শাহ্জহান (তখন মীরজা খুরম) ৭ বৎসরকাল গুজরাটের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে মম্‌তাজ-ই-মহল্ আরজুমন্দ্ বানু বেগমের ব্যবহারের জন্য এই উত্থান ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শাহ্জহান বা মীরজা খুরম ১৬১৬—১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গুজরাটের সুবাদার ছিলেন, এই সময়ে শাহীবাদ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরিব্রাজক Mandelslo ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে

শাহীবাগ প্রাসাদের তৃতীয় স্তর।

দর্‌ওয়াজার দিকে অথবা ভদর প্রাসাদের মধ্যে সৈন্য-সমাবেশ বা হস্তিযুদ্ধ দেখিতে পাইতেন।

অহ্মদাবাদের দ্বিতীয় প্রাসাদটিও মোগল আমলের, ইহা নগর-প্রাচীরের বাহিরে শাবরমতী নদীতীরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহীবাগ। নগরের উত্তর দিকে দরিয়াপুর বা দিল্লী দর্‌ওয়াজা হইতে ২ মাইল দূরে এই উত্থান-প্রাসাদ অবস্থিত। জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অহ্মদাবাদে আসিয়া এই উত্থানের শোভা দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন। উত্থানটি ক্ষুদ্র এবং প্রাসাদটিও অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ইহা এত রমণীয়রূপে সজ্জিত ছিল যে, Mandelslo, Thevenot প্রভৃতি বিদেশীয় পর্য্যটকগণ এই উত্থান-প্রাসাদের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে James Forbes নামক এক জন ইংরাজ শাহীবাগ প্রাসাদ দেখিয়া তাঁহার গ্রন্থে নদীতীর হইতে

শাহীবাগ প্রাসাদ—দ্বিতীয় স্তর শাহ্‌জহানের বাসগৃহ

শাহীবাগ প্রাসাদের তৃতীয় স্তরের মঞ্চ—জলপ্রপাতের উপর ঘাস জন্মিয়াছে।

একটি দ্বিতল পথ আছে। ঝড়বৃষ্টির সময় বাদশাহ্ নদীতীরের আবৃত পথ দিয়া অন্দরমহলে যাইতেন; কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহার তাঞ্জাম বা নালকী উপরে উন্মুক্ত পথ দিয়া যাইত। বড় শাহীবাগ এখন অহ্মদাবাদ বিভাগের কমিশনারের বাসস্থান। ইহা ত্রিতল; কিন্তু তৃতীয় তলটি নূতন। বড় শাহীবাগের উত্তর দিকে, অর্থাৎ—নদীতীরে একটি প্রশস্ত চত্বর আছে এবং এই চত্বর হইতে দুইটি সোপানশ্রেণী নদীগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন অহ্মদাবাদ জিলার জজ ছিলেন, তখন এই শাহীবাগে অবস্থানকালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ক্ষুধিত পাষাণ" নামক প্রসিদ্ধ আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। চত্বরের উপরে নয়টি ফোয়ারা ও বহু জলপ্রণালী ছিল। এই চত্বরের অধিকাংশ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের বন্যায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পুনর্নির্ম্মাণকালে ফোয়ারা বা জলপ্রণালীগুলি সংস্কার করা হয় নাই।

শাহীবাগ—সদর হইতে অন্দরমহলে যাইবার রাস্তা।

ইহার একখানা চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, তখন শাহীবাগের শেষ দশা। তিনি বলেন, উক্ত রাজার এই উদ্যান এক কালে শাবরমতী নদীতীর হইতে নগরপ্রাচীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার সময়ে দুই চারিটি বিদেশীয় বৃক্ষ এই প্রাসাদের উদ্যানে দেখিতে পাওয়া যাইত।

শাহীবাগ প্রাসাদ দুই ভাগে বিভক্ত। যে অংশে শাহজহান বাস করিতেন, তাহার নাম বড় শাহীবাগ আর যে অংশে বেগমরা বাস করিতেন, সে অংশের নাম ছোট শাহীবাগ। বড় শাহীবাগ হইতে ছোট শাহীবাগে যাইবার

এই চত্বরের উত্তর দিকে বড় শাহীবাগ প্রাসাদ। এই প্রাসাদের নিম্নতলে নদীর দিকে তিনটি প্রকাণ্ড কক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্রায় বা দিল্লীতে শাহজহানের প্রাসাদসমূহে মর্ম্মরের উপর যে বহুমূল্য চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, এই তিনটি কক্ষের ছাদে সেই জাতীয় চিত্র আছে। মধ্যস্থলের বৃহৎ কক্ষটির পশ্চাতের দেওয়ালে একখানি বৃহৎ লাল রঙ্গের পাতরে মাছের আঁশ খোদিত আছে। দ্বিতলের

জল-প্রণালী হইতে জল এই মাছের আঁশ বহিয়া ঝির ঝির করিয়া একটি চৌবাচ্চায় পড়িত এবং চৌবাচ্চার জল কক্ষের মধ্যস্থলের পয়ঃপ্রণালী দিয়া আর একখানি মাছের আঁশযুক্ত লালপাতর বহিয়া নীচের, অর্থাৎ —নদীতীরের চত্বরের পয়ঃপ্রণালীতে পড়িত। এই জাতীয় লালপাতর মথুরা বা আগ্রা ব্যতীত ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যায় না। নিম্নতলে অন্য তিন দিকের কক্ষগুলি ছোট ছোট এবং মৃত্তিকায় অর্দ্ধ-প্রোথিত, বোধ হয় গ্রীষ্মকালে এই কামরাগুলি তহ্‌খানারূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতলে চারিদিকে প্রশস্ত চত্বর ছিল এবং এই চত্বরের মধ্যে গভীর পয়ঃপ্রণালী ছিল। দ্বিতলে মধ্যস্থলে তিনটি বৃহৎ কক্ষ আছে এবং ইহার দুই পার্শ্বে তিনটি করিয়া ছয়টি ছোট কামরা আছে। এই ছয়টি কামরার মধ্যে কোণের চারিটি কামরা দ্বিতল। দ্বিতলে ছাতের উপর উঠিবার জন্য চারটি সিঁড়ি আছে এবং ছাতের মধ্যস্থলে আজম খাঁর প্রাসাদের বেদীর ন্যায় একটি বেদী আছে। এককালে বোধ হয় এই বেদীটিও আজম খাঁর প্রাসাদের বেদীর ন্যায় মর্ম্মরপ্রস্তরে আচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু এখন আর মর্ম্মরের চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। ত্রিতলের কক্ষ ও বারান্দা আধুনিক। প্রাসাদের উত্তর দিকে কমিশনার সাহেবের উদ্যান, এই উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চৌবাচ্চায় মর্ম্মরনির্ম্মিত একটি বৃহৎ ফোয়ারা আছে। এই ফোয়ারাটি আগ্রা বা দিল্লীর অন্যান্য ফোয়ারার মত নহে। ইহা গুজরাটের নিজস্ব শিল্পরীতি অনুসারে ক্ষোদিত একটি ক্ষুদ্র শ্বেতমর্ম্মরের স্তম্ভ। এইরূপ ফোয়ারা গুজরাটের বা ভারতের অন্য কোথায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

শাহ্‌জহানের আরামগৃহ—ফোয়ারা ও প্রস্রবণ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হারজিৎ

১

কানাইবাটীর কেনারাম ঘোষের ছেলে বেচারাম ঘোষ সাড়ে তিন কাঠা জমীর জন্য মামলায় তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া যে দিন হাইকোর্ট হইতে বিজয়লক্ষ্মীকে লইয়া ঘরে ফিরিল, এবং গ্রাম্যদেবতা বিশালাক্ষীর নিকট যোড়া পাঁঠা কাটিয়া বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজ প্রদান করিল, সে দিন বন্ধুবর্গের উল্লাসধ্বনিতে বিজয়গর্ব্বিত হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিলেও বেচারাম এমন হর্ষে বিষাদ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কেন না, বেচারাম তখন বেশ বুঝিয়াছিল যে, এই বিজয়লক্ষ্মীর আগমনের পূর্ব্বেই তাহার ঘরের লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার গর্ব্বোন্নত মস্তককে গভীর দৈন্যের পদতলে লুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছে।

মামলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার নেশা যতই ছুটিয়া আসিতে লাগিল, ততই বেচারাম স্বীয় অপরিণামদর্শিতা স্মরণে চমকিয়া উঠিতে থাকিল। ষাট বিঘা জমী চাষ, ঘরে পাঁচখানা লাঙ্গল, গোয়ালে বারোটা হেলে, চারিটা গাই, বাড়ীর ভিতর সারি সারি ধানের মরাই, ঘরে বাহিরে মালক্ষ্মীর কৃপার চিহ্ন লোকজনের সমাগম। দুই বেলায় ত্রিশ চল্লিশখানা পাতা পড়িতেছে, কুটুম্বের কুটুম্ব আসিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতেছে, অতিথি আসিয়া এক মুঠা ভাত বা এক মুঠা মুড়ি চাহিয়া নিরাশ হয় নাই। এটা চার বছরের আগেকার অবস্থা।

আর চার বৎসর পরে আজ সে অবস্থার কোনই চিহ্ন নাই। কোন নবাগত ব্যক্তিই তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিতে পারিবে না, বেচারাম ঘোষের অবস্থা এককালে অন্যরূপ ছিল। এরূপ বলিবার তেমন কোন নিদর্শনই সে খুঁজিয়া পাইবে না। ষাট বিঘা জমীর মধ্যে পঞ্চান্ন বিঘা জমী বন্ধক পড়িয়া মহাজনের অধিকারভুক্ত হইয়া রহিয়াছে, মাত্র পাঁচ বিঘা তাহার নিজ অধিকারে আছে। মোকর্দ্দমার ঘূর্ণিবাতাসে বড় বড় ধানের মরাইগুলা কোথায় যে উড়িয়া গিয়াছে, তাহার আর কোন নিদর্শনই নাই; শুধু সব চেয়ে বড় মরাইটা অল্প দিন পূর্ব্বে শূন্য হওয়ায় তাহার তলাটা প্রতিমাশূন্য কাঠামোর মত এখনও উঠানের খানিকটা জুড়িয়া রহিয়াছে। গোয়ালে মহিষের মত বড় বড় হেলে গরুগুলার একটাও নাই, দুইটা অস্থিচর্ম্মসার বলদ বড় গোয়ালের একটি পাশে দাঁড়াইয়া দীননেত্রে শুক্‌না খড়গুলার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বৈঠকখানার কাঠের খুঁটীগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বুড়া চাকর মধু বাগ্দী কাঁচা বাঁশের ঠেক্‌নো দিয়া চালটাকে কোনরূপে খাড়া করিয়া রাখিয়াছে। বাড়ীতে কুটুম্বের নামগন্ধও নাই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ছাড়া একটিও আগন্তুকের পাতা পড়ে না। সারাদিনের মধ্যে একটি অতিথি বা ভিখারী দ্বারে আসে কি না সন্দেহ। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় আর আলো জ্বলে না, তিনটা কলিকায় তামাকও আর পোড়ে না। বাড়ীর ভিতর একটিমাত্র কেরোসীনের ডিবা সন্ধ্যার পর কিয়ৎক্ষণমাত্র জ্বলিয়া নির্ব্বাপিত হয়, প্রয়োজন না হইলে তাহা আর জ্বলে না। যে বাড়ীখানা রাত্রি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত লোকজনের কোলাহলে মুখরিত থাকিত, সন্ধ্যার পরই তাহা এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত যে, সে নিস্তব্ধতার মধ্যে বেচারামের প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিত। হায় রে মোকর্দ্দমা!

বেচারাম হিসাব করিয়া দেখিল, বন্ধকী জমীজমা বা অলঙ্কারপত্রের আশা ছাড়িয়া দিলেও এখনও মহাজনের কাছে যে ঋণ আছে, সুদে আসলে তাহার পরিমাণ সাত শতের কম হইবে না। এই ঋণ সে কিরূপে শোধ করিবে, তাহাই ভাবিয়া বেচারাম আকুল হইয়া পড়িল।

শুধু ঋণের জন্য চিন্তা নহে, সংসার কিরূপে চলিবে, সেই চিন্তাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া পড়িয়াছিল। পাঁচ বিঘা জমীতে কতই বা ফসল হইবে? জমী চাষ করিতে পয়সা খরচ আছে। তা ছাড়া জমীদারের কাছে দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়িয়াছে। ঘরে এমন একরত্তি সোনারূপা

নাই, যাহা বেচিয়া একটা দিনও চালাইতে পারা যায়। হায়, কি কুক্ষণেই সে সাড়ে তিন কাঠা জমী লইয়া মথুর মালিকের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল! • •

তা যখন বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিবাদের পরিণামটা যে এমন শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বেচারাম কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই। মথুর মালিক—নীচজাতি চাঁড়াল, যাহার বাপ বেচারামের ঘরে মজুর খাটিয়া গিয়াছে, বিধবা বোনের দুই চারি শত টাকা পাইয়া, এবং হাড়ের চালানী ব্যবসায়ে বেঙের আধুলির মত দুই পাঁচ শত টাকার স্বচ্ছল করিয়া সে যে ভদ্রলোকের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে, সামান্য এক টুক্‌রা জমী লইয়া বেচারাম ঘোষের সহিত পাল্লা দিবে, ইহা একেবারেই অসহ্য। মথুর মালিক কত টাকার সংস্থান করিয়াছে? তাহা যে বেচারামের একটা ফুৎকারের যোগ্যও নহে।

বাগানের পাশে কাঠা তিনেক পতিত জমী। তাহার পাশেই মথুরের বাড়ী। বাড়ীর বাহিরে আসিলেই মথুরকে সেই জমীতে পা দিতে হইবে, সেই জমীটুকু ছাড়া মথুরের একটা গরু বাঁধিবারও উপায় নাই। মথুর সেখানে গরু বাঁধিয়াছিল; গরুটা দড়ি ছিঁড়িয়া বেচারামের বাগানে ঢুকিয়া কতকগুলা গাছপালা নষ্ট করে। ইহাতে বেচারাম ক্রুদ্ধ হইয়া মথুরকে গালাগালি করিল, উত্তরে মথুরও দুই চারিটা কড়া কথা বলিল। ইহাই হইল বিবাদের সূত্রপাত।

তার পর মথুর জমীদারের কাছে গিয়া সেই পতিত জমীটুকু কবুলতি করিয়া লইয়া সেখানে বেড়া দিল। সেই জমীর উপর দিয়া বেচারামের বাগানে ঢকিবার পথ। অন্য দিকে পথ করিয়া লইবার উপায় থাকিলেও বেচারাম তাহা করিয়া মথুর মালিকের কাছে মাথা নীচু করিতে পারিল না। সে জমীটুকু আপনার নিষ্কর বলিয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া দিল। এই বেড়া ভাঙ্গা লইয়া মোকর্দ্দমা আরম্ভ হইল। মথুর মালিক বেচারামের নামে বেড়া ভাঙ্গা, অনধিকারপ্রবেশ ইত্যাদি অভিযোগে আদালতে নালিশ রুজু করিল। ইহা দেখিয়া গ্রামের অধিকাংশ লোকই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিল। মামলা-মোকর্দ্দমায় সবিশেষ পারদর্শী রাঘব মুখুয্যে আসিয়া বেচারামকে বলিলেন, "ভদ্রলোকের আর মান থাকে না, বেচারাম, ব্যাটা ছোটলোককে রীতিমত শিক্ষা দিতে হবে। কোন চিন্তা নাই তোমার, এ মামলায় তোমার জিত না হয়, আমার নাম রাঘব মুখুয্যেই নয়।"

মুখুয্যে মশায়ের মত মামলাবাজ পৃষ্ঠপোষক পাইয়া বেচারাম আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিল। এ দিকে বেচারাম ঘোষের উন্নতি জমীদার ক্রুর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সুতরাং তিনি শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জ্জুনের ন্যায় মথুরের পিছনে থাকিয়া বেচারামরূপ ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। নিম্ন-আদালতে মথুর জয়ী হইলে বেচারাম আপীল করিল। আপীলে মথুর হারিয়া গেল। তখন জমীদার স্বয়ং স্বীয় অধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে লইয়া গেলেন। সেখানে দুই বৎসর মোকর্দ্দমা চলিল। দুই বৎসর পরে বেচারামের সর্ব্বস্ব বিনিময়ে দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদালত বেচারামকে বিজয়পত্র লিখিয়া দিল। সেই বিজয়পত্র মাথায় বাঁধিয়া বেচারাম ঘরে ফিরিয়া দেখিল, প্রকৃতপক্ষে সে বিজয়ী হয় নাই, বিজিত হইয়াছে।

২

"কি ভাবচো হে বেচারাম?"

বৈঠকখানায় বাঁশের খুঁটী ঠেস্ দিয়া বেচারাম তখন অনেক কথাই ভাবিতেছিল। অতীতের কথা ভাবিতেছিল, বর্ত্তমানের কথা ভাবিতেছিল, ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছিল, আজ সকালে উঠিতেই গৃহিণী বলিয়াছে, চাল কিনিয়া আনিলে তবে হাঁড়ী চড়িবে, সে কথাটা ভাবিতেছিল, আর আজ যে কোথা হইতে চাল আসিবে, তাহাই ভাবিয়া যেন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। এমন সময় মুখুয্যে মশায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবচো হে বেচারাম?"

উত্তরে বেচারাম দেঁতো হাসি হাসিয়া বলিল, "কি আর ভাববো, খুড়োঠাকুর, ভাবনা-চিন্তে যা ছিল, সে সব তো চুকে গিয়েছে।"

গর্ব্বপ্রফুল্ল মুখে মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "তা আর যাবে না? রাঘব মুখুয্যে যে পক্ষে আছে, সে পক্ষে যত বড়ই কেন মোকর্দ্দমা হোক্ না, জিত হবেই হবে। তোমার তো এ তুচ্ছ মোকর্দ্দমা! ধনেখালির চৌধুরীদের মোকর্দ্দমার কথা শুনেছ কি? দশ বছর—দশটি বছর ধ'রে মামলা, তেরো হাজার টাকা খরচ। সে মামলার মূলেও তোমার এই মুখুয্যে মশায়। এই গাঁয়েরই মুখুয্যে মশায় ট্যানা-পরা

বামুন, কিন্তু উকীল-বেলেষ্টারদের কাছে তার কত মান দেখেছ তো ?"

বেচারাম বলিল, "তা দেখেছি বৈ কি খুড়োঠাকুর !"

বলিয়া সে বসিবার জন্ম মুখুয্যে মশায়কে আসন পাতিয়া দিল। আসন গ্রহণ করিয়া মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "তা যাক্ সে মান-সম্মানের কথা। এখন আমি যা বলেছিলাম— 'তোমার কোন চিন্তা নাই বেচারাম'—কাযে তা করেছি তো?"

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বেচারাম বলিল, "তা করেছ বৈ কি, খুড়োঠাকুর, তোমার দয়াতেই এ মামলায় জিত হয়েছে।"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন করিয়া মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "আমার দয়ায় নয়, জগদম্বার দয়ায় হয়েছে। তোমাকে বলবো কি বেচারাম, নাইতে খেতে শুতে তিন বেলা মায়ের কাছে মাথা কুটেছি, যাতে তোমার মান থাকে। বল্লে তুমি বিশ্বাস করবে না, বেচারাম, আপীলে মামলার হাল যখন ঘুরে পড়লো, তখন ঐ মথ্রো ব্যাটা এক দিন নগদ আড়াই-শো টাকার নোট এনে পায়ের কাছে ফেলে দিলে। আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করলে, মোকর্দ্দমা চুকে গেলে আর আড়াই শো দেবে। আমি বলি, আরে রামচন্দ্র! রাঘব মুখুয্যে এমন বেইমান নয়। এমন পয়সা যদি নিতাম, বেচারাম, তা হ'লে তোমার ব্যাটার কল্যাণে আজ কোটা-বালাখানা তুলে ফেলতাম। কিন্তু আমি তো পয়সার প্রত্যাশী নই, শুধু উপকার—পরের উপকার।"

বেচারাম বলিল, "তা বৈ কি খুড়োঠাকুর, তোমার মত উপকারী লোক আর দেখতে পাওয়া যায় না।"

আত্মপ্রশংসা শ্রবণে কুণ্ঠিত হইয়া মুখুয্যে মশায় বলিলেন,"কিছু না, কিছু না,আমি অতি অধম,অতি তুচ্ছ লোক। যাক্, কত খরচ হ'লো, হিসেব ক'রে দেখেছ ?"

"দেখেছি, তিন হাজার দু'শো তেত্রিশ।"

"মোটে তিন হাজার! তবে তো তোমার খুব সস্তায় কায হয়েছে হে। এমন একটা মামলা পাঁচ হাজার সাড়ে পাঁচ হাজারের কমে পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, খুড়োঠাকুর।"

"তা যাক্, মানরক্ষা হয়েছে তো ?"

"হয়েছে, কিন্তু কা'ল কি খাব, তার ঠিক নাই।"

ঈষৎ রাগতভাবে মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "মজুর খেটে খাবে, ভিক্ষা ক'রে খাবে। জেদ বজায় করেছ তো। মরদ-বাচ্চা, জান দিয়েও জেদ বজায় রাখতে হবে। মরদকা বাত হাতীকা দাঁত।"

বেচারাম নতমুখে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "এখন এক কায কর, ঐ যায়গায় বেড়া লাগাও, ব্যাটা চাঁড়াল যেন ঘরের বার হ'তে না পারে।"

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেচারাম বলিল, "তা দেব।"

মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, ঐ যায়গায় পায়খানা তৈরী করি। আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। ভাল কথা, আমার ক'বার কলকাতা যাওয়ার রাহাখরচ, বাসা-ভাড়া, খোরাকী কিছু পাওনা আছে। বেশী নয়, একত্রিশ টাকা তিন আনা দু' পাই। আর সেই নতুন বেলেষ্টারের এক দিনের ফি আমি নিজ থেকে দিয়েছিলাম, মনে আছে তো ?"

বেচা। হাঁ, আছে।

মুখু। তা হ'লে একত্রিশ আর কুড়িতে হচ্ছে একান্ন। মোটের উপর একান্ন টাকা তিন আনা দু' পাই। তা এটা আজকালের মধ্যে পাওয়া যাবে কি ?

ম্লানমুখে বেচারাম বলিল, "দিন কতক দেরী হবে খুড়োঠাকুর।"

ঈষৎ অসন্তুষ্টভাবে মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "তাই তো হে, দেরী হবে আবার ? কদ্দিন দেরী হবে? দিন পাঁচেক পরে দিতে পারবে ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বেচারাম বলিল, "তাই দেব। কিন্তু খুড়োঠাকুর, আপাততঃ আজ একটা টাকা ধার দিতে পার ?"

ব্যস্ততার সহিত মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "ধার? তোমাকে একটা টাকা ধার দেব, এ আর এমন বেশী কথা কি ? তোমাকে কি অবিশ্বাস আছে ? কিন্তু, আহা, একটু আগে যদি বলতে! এই আসবার সময় দীনে কলুর দোকানে তিন টাকা দিয়ে এলাম। তা দিন দুই পরে যদি দরকার হয়, দিতে পারি।"

বলিয়া মুখুয্যে মশায় গাত্রোত্থান করিলেন। বেচারাম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মুখুয্যে মশায়ের কথায় তাহার

বড় দুঃখেও হাসি আসিল। এই মুখুয্যে মশায় তাহার নিকট হইতে কতবার কত টাকা, কত ধান ধার লইয়াছেন, সে ধার কখন শোধ করিয়াছেন, কখন করেন নাই; ব্রাহ্মণের স্থলে যাইতেছে বলিয়া বেচারাম তাগাদা করিয়া তাহা আদায়ের চেষ্টাও করে নাই। সেই মুখুয্যে মশায় আজ একটা টাকা ধার দিতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা তুলিয়া বসিলেন, এবং মুখে অবিশ্বাস নাই বলিলেও বিশ্বাস করিয়া টাকাটা ধার দিতে পারিলেন না। হায় রে অবস্থার পরিবর্ত্তন! হায় রে মোকর্দ্দমা!

বড় মেয়ে রুক্মিণী আসিয়া বলিল, "এখানে ব'সে আছ বাবা, চাল আন্‌তে যাও নি?"

"এই যাই" বলিয়া বেচারাম উঠিয়া দাঁড়াইল।

৩

বেচারাম উঠিল বটে, কিন্তু কোথায় যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। দোকানে যে ধার হইয়াছে, তাহারই কড়া তাগাদা চলিতেছে,সুতরাং সেখানে পুনরায় ধার পাওয়া অসম্ভব। শুধু হাতে নগদ টাকাই বা কে ধার দিবে? ঘরে সোনারূপা এমন একটু নাই, যাহা বন্ধক দিয়া একটা টাকাও পাওয়া যাইতে পারে। থাকিবার মধ্যে আছে পিতল-কাঁসার বাসন। কিন্তু তাহা লইয়া কোথায় যাইবে? যে বেচারাম ঘোষ মুখের কথা খসাইলেই লোকে দুই চারি শত টাকা ধার দিতে ব্যস্ত হইত, সে আজ কোন্ মুখে পিতল-কাঁসার বাসন লইয়া বাঁধা দিতে যাইবে? অথচ আজ চাল না হইলে ঘরে হাঁড়ী চড়িবে না, ছেলেগুলা ক্ষুধায় এক মুঠা ভাত পাইবে না। ওঃ ভগবান্!

ভাবিতে ভাবিতে ঘুরিতে ঘুরিতে বেচারাম বাগানের পাশে সেই বিজয়লব্ধ জমীটুকুর কাছে উপস্থিত হইল। বাগানটা তখন পরহস্তগত হইয়াছে, শুধু জমীটুকুই অধিকারে আসিয়াছে। জমীর উপর কয়েকটা গাবভেরেণ্ডার গাছ, আর রাঙ্‌চিতার জঙ্গল। বেচারাম সেই জঙ্গলের পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এমন সময় মথুর ধীরে ধীরে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। বেচারাম ক্রূর দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। মথুর এক পা এক পা করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে বলিল, "কি দেখছো ঘোষজা মশাই? এ জমীটায় কিছু হবে না। নাহক্ কতকগুলো টাকা জলে গেল।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেচারাম বলিল, "আমি এখানে একটা পায়খানা তৈরী করবো।"

ঈষৎ হাসিয়া মথুর বলিল, "তা আপনকার যায়গা, আপনি যা খুসী তাই কত্তে পার। তবে আপনকার চরণে আমার একটু নিবেদন ছিল।"

বেচা। কি নিবেদন?

মথুর। যায়গাটা আমার হকসবার মধ্যে। তা যদি দয়া ক'রে এটুকু আমাকে কবুলতি ক'রে দাও।

বেচা। উহুঁ।

মথুর। বিক্রী?

বেচা। কত টাকা দিতে পার?

মথুর। যা ন্যায্য মূল্য হয়।

বেচা। এর ন্যায্য মূল্য তিন হাজার টাকা।

মথুর বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বেচারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বেচারাম বলিল, "মোকর্দ্দমায় তিন হাজার তিন শো টাকা খরচ হয়েছে। তিন শো টাকা আমি ছেড়ে দিতে পারি।"

বেচারামের কথায় মথুরের বিস্ময় অপনোদিত হইল। সে তখন সহাস্যমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এত টাকা আমার বাপ চোদ্দপুরুষে কখনো দেখে নি। আমি বড় জোর তিনশো টাকা দিতে পারি।"

বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বেচারাম বলিল, "এর একটা রাঙ্‌চিতা গাছের দাম তিনশো টাকা।"

"এটা ন্যায্য কথা বটে" বলিয়া মথুর মস্তক সঞ্চালন করিল। বেচারাম তাহার মুখের দিকে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হইল। মথুর তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনকার চরণে আর একটা আর্জ্জি আছে।"

বেচারাম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

মথুর বলিল, "মেয়েটার বিয়ে দেব মনে কচ্চি। তা পাঁচ জন কুটুমসাক্ষাৎ এলে আমার তো বসতে দেবার যায়গা নাই। তা দিন কতকের জন্যে এই যায়গাটা যদি ছেড়ে দেন।"

মাথা নাড়িয়া বেচারাম বলিল, "তা হ'তে পারে না।"

মথুর সবিনয়ে বলিল, "যায়গা থাকলে অনেকে তো ভাড়া দেয় ঘোষজা মশাই।"

কর্কশকণ্ঠে বেচারাম বলিল, "ভাড়া দিতে হয়, অপরকে দেব, তোমাকে নয়।"

মথুর। আমার দোষ কি ঘোষজা মশাই?

বেচা। পায়ের জুতো পায়ে থাক্‌লে কোন দোষ হয় না; কিন্তু সে মাথায় উঠতে চাইলে সেটা ভাল দেখায় না।

দন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া মথুর বলিল, "অমনতর কথা কইবে না, মশাই, আমি আপনকায়দের পায়ের জুতো হয়ে পায়ের তলাতেই প'ড়ে রয়েছি।"

তীব্র ভ্রূভঙ্গীসহকারে বেচারাম বলিল, "জুতো যতই বেড়ে উঠুক, পায়ের তলায় তাকে থাকতেই হবে।"

বেচারাম ক্রোধভরে সে স্থান ত্যাগ করিল। মথুর বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর গিয়া বেচারাম ভাবিল, যায়গাটা ভাড়া দিলে ক্ষতি কি ছিল? কিছু টাকা তো পাওয়া যাইত; চাই কি, অগ্রিম বলিয়া আজ দুই এক টাকা দিতেও পারিত। কিন্তু ছিঃ, যে মথুর মালিকের জন্য বেচারাম ঘোষ আজ সর্ব্বস্বান্ত, সামান্য দুই পাঁচটা টাকার জন্য ঐ যায়গায় তাহাকেই উঠিতে দিবে? লোক বলিবে কি? বেচারাম ঘোষ কি একেবারেই মরিয়া গিয়াছে?

বেচারাম ফিরিয়া ঘরে আসিল, এবং রূপাবাঁধান হুঁকাটা বাহির করিয়া সেটাকে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল; তাহার পর পোদ্দারের দোকানে সেই রূপা বেচিয়া কয়েক দিনের ভাতের সংস্থান করিল।

পরদিন বেচারাম চাকর মধুকে সঙ্গে লইয়া জমীটার চারি পাশে বেড়া দিয়া আসিল। মথুর অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু বেচারাম তাহার অনুনয়ে কর্ণপাত করিল না।

মথুর জানিত, মুখুয্যে মশায় বেচারামের প্রধান মন্ত্রী। সুতরাং বেচারামকে সম্মত করাইতে না পারিয়া সে মুখুয্যে মশায়ের শরণাপন্ন হইল। মুখুয্যে মশায় তাহাকে পরামর্শ দিলেন, "যায়গা বেচারামের হ'লেও তোমার ওখানে হাঁটবার অধিকার আছে। তুমি জোর ক'রে বেড়া ভেঙে দাও।"

মথুর বলিল, "ওনা যদি ফৌজদারী বাধান?"

মুখুয্যে মশায় তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ওনার আর সে দিন নাই; সে বিষদাঁত ভেঙে গিয়েছে। এখন পেটের ভাত জোটে না, ফৌজদারী বাধাবে! আর যদিই তা বাধে, তোমার কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে জিতিয়ে দেব।"

মুখুয্যে মশায় যে কিরূপে জয়ী করিয়া দিবেন, তাহা বুঝিতে মথুরের বাকী ছিল না। সুতরাং সে মুখুয্যে মশায়ের পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া বেড়া ভাঙ্গিতে গেল না। সংক্ষেপে মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিল; তাহার পর অন্য দিকে পাঁচীল কাটিয়া বাড়ীর বাহিরে যাইবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইল। এজন্য অবশ্য সে মূর্খ ছোটলোক বলিয়া মুখুয্যে মশায়ের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিল।

৪

"হ্যাঁদে কত্তা, আর শুনেছো?"

"কি হয়েছে, পচার মা?"

"বেচু ঘোষেদের আজ দু'দিন হাঁড়ী চড়ে নি।"

বিস্ময়ের সহিত মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "কেন হাঁড়ী চড়েনি, পচার মা?"

পচার মা স্বামীর এই অজ্ঞতায় যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "ন্যাকা আর কি! হাঁড়ীতে দেবার কিছু থাকলে তো হাঁড়ী চড়বে।"

মথুর বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বলিস্ কি, পচার মা, এতদূর হয়েছে?"

ঘাড় নাড়িয়া পচার মা বলিল, "হয়েছে বৈ কি গো! আমি মুখুয্যে-গিন্নীর কাছে শুন্‌লুম। বামনী বল্লে কি জানো, 'বেশ হয়েচে, পচার মা, যেমন তোদের সঙ্গে মামলা ক'রে রাস্তা বন্ধ করেছে।' তা আমি বলি, হাঁগা, মামলাই করুক, আর যাই করুক, ভদ্দর লোকের ঘর, আহা, ছেলে-পিলেগুলো পর্য্যন্ত উপোস দিচ্ছে।"

ব্যগ্রকণ্ঠে মথুর জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যিই উপোস দিচ্ছে?"

পচার মা বলিল, "আমি কি মিছে বল্‌ছি গা? আমি আবার আস্‌বার সময় ওদের বাড়ী হয়ে এলুম। বড় মেয়েটা কাঁদতে লাগলো।"

মথুর মাটীর দিকে চাহিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

পচার মা বলিল, "শুধু কি ভাই' গা, তার ওপর গিন্নী মর-মর, বাঁচে কি না ঠিক নেই। আবার—"

"আবার কি হয়েছে?"

"মহাজনে নাকি দেনার দায়ে নালিশ ক'রে ঘরভিটেয় কোরোক্ দিয়েছে, দু'চার দিনেই নীলেম ক'রে নেবে।"

মথুর বসিয়া ছিল; হঠাৎ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক শুনে এয়েছিস্?"

"হাঁ গো, মুখুয্যে-গিন্নী বল্লে, বেচু ঘোষের বড় মেয়েটার কাছেও শুন্‌লুম। আহা, মেয়েটা বল্‌তে বল্‌তে কেঁদে ফেল্লে।"

মথুর আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, এবং মুখুয্যে মশায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিল, "এই নীলেমটা আমায় কিনে দিতে হবে, ঠাকুরমশাই, আমি আপনকারকে পান খেতে একশো টাকা দেব।"

মুখুয্যে মশায় হাসিতে হাসিতে ইহাতে সম্মত হইলেন।

নীলামে বেচু ঘোষের বাড়ীখানা খরিদ করা হইবে শুনিয়া পচার মা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাদে কত্তা, ঘোষেদের ঘর-বাড়ী কিন্‌ছো তো, কিন্তু কিনে কি হবে?"

মথুর বলিল, "কি হবে আবার! আমরা থাকবো।"

সবিস্ময়ে পচার মা বলিল, "কও কথা, কত্তা, অত বড় বাড়ীতে আমরা থাকবো কি ক'রে? হাঁপিয়ে উঠবো যে!"

হাসিতে হাসিতে মথুর বলিল, "মর্ মাগী, বড় বাড়ীতে থাক্‌লে বুঝি হাঁপিয়ে উঠতে হয়? ছেলেপিলে নিয়ে দিব্যি হাত-পা ছড়িয়ে থাক্‌বি।"

পচার মা বলিল, "কে জানে, কত্তা, তোমার কি রকম হাত-পা ছড়িয়ে থাকা! তা থাক গে যাও, কিন্তু আমার গয়নাগুলো ছাড়িয়ে দেবে কবে?"

মথুর বলিল, "গয়নার তরে ভাবনা কি? হাতে টাকা এলেই ছাড়িয়ে দেব।"

পচার মা বলিল, "তা আমরা তো ওদের বাড়ীতে থাকবো, কিন্তু ওরা কোথায় থাকবে, কত্তা?"

"গাছতলায়।"

"বল কি, কত্তা, ছেলেমেয়ে নিয়ে গাছতলায় থাক্‌বে কি গো?"

"তা নয় তো ঘরবাড়ী পাবে কোথায়?"

একটু ভাবিয়া পচার মা বলিল, "এক কায কর, কত্তা।"

"কি কায করবো?"

"ওদের বাড়ী কিনবে, তা কিনবে, কিন্তু ওরা ঐ বাড়ীতেই থাকুক্।"

মথুর হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "দূর মাগী, তুই নেহাৎ চাঁড়ালের মেয়ে।"

"আর তুমিই কোন্ বামুন ঠাকুর" বলিয়া পচার মাও হাসিয়া উঠিল।

মথুর বলিল, "চাঁড়াল হ'লেও আমি তোর মত নিরেট বোকা নই।"

ঠোঁট ফুলাইয়া পচার মা বলিল, "ওঃ, ভারী তো সেয়ানা তুমি! তাই একটা ভদ্দর লোককে গাছতলায় তাড়িয়ে দিয়ে তার ঘরে গিয়ে তুমি থাকবে। তা থাক্‌তে হয়, তুমি থাকবে, আমি কিন্তু এই কুঁড়ে ছেড়ে কক্ষনো যাব না।"

বলিয়া সে মুখ ভারী করিয়া এক দিকে চলিয়া গেল।

মথুর বসিয়া আপন মনে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

৫

"রুক্মিণি!"

"কেন বাবা?"

"সব ঠিক ক'রে রাখ। কা'লই বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে।"

"কা'লই?"

একটু রাগতভাবে বেচারাম বলিল, "হাঁ, কা'লই। ও নোটিশ দেওয়ার আগেই আমি বাড়ী ছেড়ে যাব।"

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু মাকে কি ক'রে নিয়ে যাবে?"

কঠোরস্বরে বেচারাম বলিল, "যেমন ক'রে হোক, নিয়ে যেতেই হবে।"

"নিয়ে কোথায় থাকবে?"

"আপাততঃ নদীর ধারে বড় বটগাছটার নীচে।"

ভয়ে শিহরিয়া রুক্মিণী বলিল, "বল কি, বাবা, গাছতলায়!"

বেচা। তা নয় তো কোটা-বালাখানা কোথায় পাব?

রুক্মি। কিন্তু গাছতলায় থাকলে মা বাঁচবে কি?

বেচা। না বাঁচে ভালই। ম'লে নদীর জলে টেনে ফেলে দেব।

রুক্মিণী কাঁদিয়া উঠিল। বেচারাম তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদলে হবে না। যা গুছিয়ে নিতে হয়, আজকার মধ্যে সব গুছিয়ে নাও। কা'ল সকালে আমি বাড়ী ছেড়ে যাবই যাব।"

"কেন বাড়ী ছেড়ে যাবে, ঘোষজা মশায়?"

সম্মুখে মথুরকে দেখিয়া বেচারাম চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ, আজই নোটিশ দিতে আসিয়াছে না কি? মথুর আসিয়া বৈঠকখানার এক পাশে বেচারামের সম্মুখে বসিল। তাহার পর বেচারামকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী কার যে, বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাবে, ঘোষজা মশায়?"

তীব্র দৃষ্টিতে মথুরের দিকে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বেচারাম বলিল, "তুমি কি আমাকে বিদ্রূপ কত্তে এসেছ, মথুর?"

সবিনয়ে মথুর বলিল, "আপনকার মত লোকের সঙ্গে আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবো, এটা কি মনে কর, ঘোষজা মশায়?"

বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করিয়া বেচারাম জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি জন্য এমন সময় এসেছ?"

মথুর বগলদাবা হইতে কাপড়ে জড়ান একখানা কাগজ বাহির করিয়া, তাহা বেচারামের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দেখ দেখি, ঘোষজা মশাই, এই কোবালাটা ঠিক হয়েছে কি না?"

বেচারাম কাগজখানা হাতে লইয়াই বুঝিতে পারিল, ইহা রেজেষ্টারী করা কোবালা। তাহার পর সেখানা খুলিয়া খানিক পড়িয়াই সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি, মথুর, তুমি আমার ঘর-ভিটে নীলামে কিনে আবার আমাকেই বিক্রী কচ্ছো?"

সহাস্যমুখে মথুর বলিল, "তা আপনকারকে বেচবো না তো বেচতে যাব কি চিন্তে হাড়ীকে?"

"কিন্তু টাকা—"

"টাকা আপনকারদের চরণের ধুলো।"

"তুমি কি তোমার দরজায় বেড়া দেওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছো, মথুর?"

মথুর হাসিয়া বলিল, "ছোটলোক আমরা, অত শোধ-বোধ জানি না। তবে সব সময়ে আমাদের মগজের ঠিক থাকে না। তাই আমার বাপ যে আপনকারদের খেয়ে মানুষ, সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম। কিন্তু ছোটলোক ব'লে একশো বারই কি ভুল হয়, ঘোষজা মশাই? আমি হচ্ছি চাকর, আপনি হচ্ছো মনিব; আপনি আমাকে দশ ঘা মাত্তে পার, কিন্তু আপনকার মাথায় লাঠী পড়তে দেখ্‌লে আমি কি চুপ ক'রে দেখতে পারি?"

রুদ্ধকণ্ঠে বেচারাম ডাকিল, "মথুর!"

মথুর বলিল, "যাক্‌, এখন আপনি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে মাঠাকরুণকে একটা ডাক্তার-বদ্যি দেখাও। আমি এখন চল্‌লুম, মাগী আমার বাট চেয়ে হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে আছে। আপনকাররা বাড়ী ছেড়ে যাবে না খবর পেলে তবে সে বাসী মুখে জল দেবে।"

মথুর আর অপেক্ষা না করিয়া উঠিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিল। বেচারাম স্থির নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

রুক্মিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে বাবা?"

বেচারাম বলিল, "হবে আর কি, এত দিন মামলা ক'রে আমি হেরে গেলুম, জিতে গেল মথুর মালিক। ব্যাটা চাঁড়াল ঐ কুঁড়ে ঘরের ভেতর থেকে হাইকোর্টের অমন পাতরগাঁথা ইমারতকে হারিয়ে দিলে, রুক্মিণি!"

রুক্মিণী অবাক্ হইয়া পিতার হর্ষ-বিস্ময়-সমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

ঔষধের গাছ-গাছড়া

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে (বৈশাখ) আমরা ঔষধের গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে কতিপয় মূল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। প্রতীচ্য জগতে আজকাল এই শ্রেণীর দ্রব্য বিশেষরূপে অধীত হইতেছে এবং ঔষধ উদ্ভিদের উৎপত্তি, স্বরূপ, লক্ষণ, ব্যবসায়ে দৃষ্ট প্রকারভেদ, ভেজাল প্রভৃতি নির্ণয় করার বিদ্যার নামকরণ হইয়াছে Pharmacognosy। যে সমুদয় দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে Pharmacy শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সে সকল স্থানেই Pharmacognosyর চর্চ্চা ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের দেশের অবস্থা এ হিসাবে শোচনীয়। এক দিকে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের উপর শিক্ষিত জনসমাজের বিশেষ আস্থা নাই। অনেক কবিরাজ নিজে কম গাছড়াই চিনেন; সে জন্য তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময় 'বেদে' শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্য দিকে এতদ্দেশে বিলাতের ন্যায় খাদ্য ও ঔষধ সংক্রান্ত আইন (Food and Drugs Act) না থাকায় যে কোন উপাদানে প্রস্তুত যে কোন প্রকার ঔষধ বাজারে চলিয়া যাইতেছে; এবং তাহা চলা সম্ভবপর বলিয়াই অবিশুদ্ধ গাছগাছড়ার অবাধে কাটতি হইতেছে।

বিগত লোকগণনার ফলাফল যতদূর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ভারতের অনেক স্থলে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। বঙ্গদেশের কতিপয় জেলায় ইহা বিশেষরূপে পরিদৃষ্ট হয়। খাদ্যাভাব অবশ্য জনসংখ্যাহ্রাসের মূল কারণ। কিন্তু রোগের উপযুক্ত ঔষধ না পাইয়া যে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করিতে হইলে শুধুই যে দেশমধ্যে প্রাপ্ত ঔষধ-দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা নয়; গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও চাষ, তাহাদের পরীক্ষার অনুষ্ঠান এবং তৎসমুদয় হইতে প্রস্তুত ঔষধাদি যাহাতে প্রকৃত ফলদায়ক ও সুলভ হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঔষধ-প্রয়োগরূপ-প্রস্তুত বিদ্যা (Pharmacy) শিক্ষা দেওয়ার সময় আসিয়াছে। এ সম্বন্ধে কালবিলম্ব করিয়া ভারতীয় ঔষধশিল্পের কেবল ক্ষতি করা হইতেছে মাত্র। উচ্চাঙ্গের Pharmacy ও Pharmacognosy অধ্যয়ন করিতে হইলে ৫।৬টি বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। ঔষধ উদ্ভিদচাষও বিশেষ জ্ঞানসাপেক্ষ। গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। এইরূপ শিক্ষা প্রদানের জন্য আবশ্যকীয় স্কুল-কলেজ, পরীক্ষাগার, ঔষধক্ষেত্র প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং এই সমুদয় জটিল বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া, সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোক বৈজ্ঞানিক প্রথায় ঔষধের গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া কি প্রকারে লাভবান্ হইতে পারেন, তাহাই প্রথমে দেখা যাউক।

বিলাত হইতে আমদানী, সুন্দর প্যাক করা, সুপরিষ্কৃত গাছগাছড়া ও আমাদের বেণের দোকানের ধূলিবালি-মণ্ডিত, আবর্জ্জনাবহুল গাছড়া যাঁহারা তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিলাতী ঔষধ-উদ্ভিদের মূল্য কেন অধিক, এবং দেশীয় গাছড়ায় প্রস্তুত ঔষধাবলীর উপর লোকের শ্রদ্ধা কমিয়া যাইতেছে কেন? অগ্রেই দেখা দরকার যে, প্রকৃত উদ্ভিদ সংগ্রহ হইল কি না? তৎপরে সেই উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদাংশ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক করা আবশ্যক। শুষ্ক গাছড়া এরূপভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যেন তাহার বর্ণ, আকৃতি ও গুণের বৈলক্ষণ্য না হয়। স্থূলতঃ এই কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর না রাখিলে গাছড়া-ব্যবসায়ে সফল হওয়া অসম্ভব। আমরা এ স্থলে গাছড়া-ব্যবসায়-অভিলাষী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যার্থ সংক্ষেপে কতিপয় প্রণালীর উল্লেখ করিতেছি।

ঔষধের জন্য কয়েকটি উদ্ভিদের সমস্ত গাছই ব্যবহৃত হয়; আবার অন্য কতকগুলির অংশমাত্রই আবশ্যক হয়।

মুক্তাঝুরি, ক্ষীরুই প্রভৃতির সমস্ত গাছই ব্যবহারে আসে। এরূপ স্থলে পুষ্পমুকুল দেখা দিলেই, কিন্তু পুষ্পিত হইবার আগে গাছ উঠান দরকার। মূল উত্তমরূপে ঝাড়িয়া, জলে ধুইয়া লইয়া শুষ্ক পত্রাদি ফেলিয়া দিয়া ১০।১২টি গাছ ডগার দিকে একত্র করিয়া বাঁধিয়া শুকাইতে দিতে হয়। বর্ষার সময় না হইলে সাক্ষাৎভাবে রৌদ্রে পত্রপুষ্প-যুক্ত গাছ শুকান ঠিক নয়। অর্দ্ধচ্ছায়াযুক্ত স্থানে, যেখানে যথেষ্ট বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান—যেমন ঘরের প্রশস্ত বারান্দা, আটচালা, চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি—সেইরূপ স্থানেই গাছড়া শুকানর বন্দোবস্ত করা ভাল। মৃত্তিকার উপর গাছ না দিয়া বাঁকারি, শর অথবা নলকাঠির ২।৩ হাত উচ্চ মাচানের উপর পাতলা করিয়া বিছাইয়া দিলে গাছড়া শীঘ্র শুষ্ক হয়। কতকগুলি সম্পূর্ণ গাছ সংগ্রহের সময় মূল বাদ দিলেও চলে। যেমন কালমেঘ, চিরতা ইত্যাদি। কিন্তু উভয় স্থলে ডগা বাঁধিয়া দিলেও নীচের দিকে গাছগুলি পাখার আকারে ছাড়াইয়া দেওয়া দরকার।

মূল তুলিবার প্রশস্ত সময় দুইটি;—ফুল ফুটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অথবা পত্রপুষ্প ঝরিয়া গিয়া পুনরায় নূতন পত্র হইবার মধ্যবর্ত্তী সময়। উঠানর সময় যাহাতে মূল কাটিয়া অথবা ভাঙ্গিয়া না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। য়ুরোপের স্থানে স্থানে সচ্ছিদ্র কাঠের বাক্সে মূলগুলি ভর্ত্তি করিয়া অগভীর পার্ব্বত্য নদীর গর্ভে উহা রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রবহমান বারি নিজেই মূলগাত্রস্থ সমস্ত কর্দ্দম প্রভৃতি ধুইয়া লইয়া যায়। এতদ্দেশে বেতের ঝুড়িতে মূলগুলি রাখিয়া পুকুরের জলে খুব নাড়াচাড়া করিলে মূল যথেষ্ট পরিষ্কার হয়। অন্যথা টবের জলে বুরুশ দিয়া সাফ করাই ভাল। কোন কোন মূলের উপরের চর্ম্মবৎ ত্বক তুলিয়া ফেলা দরকার, রেশাখিতমি তাহার দৃষ্টান্ত। মূল খুব মোটা হইলে উহাকে দীর্ঘে অথবা প্রস্থে চিরিয়া পাতলা করিয়া লইলে শুকাইবার সুবিধা হয়। খণ্ডগুলি ২।৩ ইঞ্চির বড় হওয়া উচিত নয়। শুকাইতে দেওয়ার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র মূল (Rootlets) ও উপরের কাণ্ডাংশ বাদ দিয়া প্রত্যেক মূলের মধ্যে কিছু কিছু তফাৎ রাখিয়া শুকান আবশ্যক। গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিলে 'ছাতা' ধরিয়া যাওয়া সম্ভব। সাধারণতঃ ১৫।২০ দিনের আগে মূল পূর্ণ শুষ্ক হয় না। যখন বাঁকাইলে মূল সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহা ভিতরে বাহিরে সম্পূর্ণ শুকাইয়াছে। কন্দ প্রভৃতি মৃত্তিকার নিম্নস্থিত কাণ্ডাংশ শুকাইবার প্রথা প্রায় মূলেরই ন্যায়। কিন্তু জঙ্গলী পেঁয়াজ (Squill) প্রভৃতির বাহিরের পর্দ্দাটি তুলিয়া ফেলিয়া উহাদিগকে দৈর্ঘিকভাবে পাতলা পাতলা করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। শঠী, আরারুট, আদা প্রভৃতিরও ছাল তুলিয়া ফেলা দরকার।

বাকস, ধুতুরা প্রভৃতি গাছের পাতা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় পাতাগুলি এক একটি করিয়া এবং গাছের উর্দ্ধাংশ কোমল পত্র সমেত তুলিতে পারা যায়। নিম্নের কঠিন কাণ্ড ও দাগযুক্ত, কীটদষ্ট অংশাদি অনাবশ্যকীয়। মাচানের উপর জাল অথবা পাতলা কাপড় বিছাইয়া পাতা শুকাইতে পারা যায়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, যে কোন উদ্ভিদ অথবা উদ্ভিদাংশ রাত্রে আবৃত স্থানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। যে ঘরে রাখা হইবে, তাহাতে যেন বায়ু-চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। পাতা যত শীঘ্র শুষ্ক হইবে, ততই তাহার বর্ণ ঠিক থাকিবে। হঠাৎ জল বৃষ্টি হইলে শুষ্ক কিংবা অর্দ্ধ-শুষ্ক গাছড়া যাহাতে ভিজিয়া না যায়, তজ্জন্য পাল অথবা হোগলার টাটির পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখা ভাল।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত পুষ্পের সংখ্যা খুবই কম। গন্ধসার প্রস্তুতেই ইহাদের ব্যবহার সমধিক। তথাপি গোলাপের কুঁড়ি ও পাঁপড়ি, শুল বনাফসা প্রভৃতির অল্পবিস্তর ব্যবহার আছে। গাজিপুরের প্রসিদ্ধ গোলাপক্ষেত্রে Rosa damasceua জাতীয় গোলাপের চাষ হয়। এতদ্ভিন্ন R. Centifolia ও R. gallicaর যথাক্রমে পাপড়ি ও কুঁড়ি কোন কোন ঔষধ প্রস্তুতে আবশ্যক হয়। কুঁড়িতে সামান্য পরিমাণে বোঁটা থাকিতে পারে, কিন্তু পাঁপড়িগুলি পৃথক্ করিয়া শুকান উচিত। ফুল খুব শীঘ্র শুকান দরকার। মাচানের উপর কাগজ পাতিয়া দিয়া তাহাতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ফুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া নীচে ঘুঁটের আগুন রাখিতে পারা যায়। কিন্তু ঘর হইতে ধোঁয়া বাহির হইয়া গেলে তার পর ফুল লইয়া যাওয়া ভাল। নতুবা ফুল বিবর্ণ ও ধূমগন্ধযুক্ত হইয়া যাইতে পারে। গোলাপ, বনাফসা ব্যতীত ভুট্টার গর্ভ কেশর (Corn Silk) গুলখয়রা, গাঁদার পাপড়ি প্রভৃতিও বাজারে বিক্রয় হয়।

সাধারণতঃ ঔষধার্থ ব্যবহৃত ফল পূর্ণ পরিপক্ক হইবার অনতিপূর্ব্বেই তোলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বেলের উল্লেখ করিতে পারা যায়। পাকিবার কিছু আগে তুলিলে বেলের প্রধান উপাদান, আঠাবৎ পদার্থ, যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং খোসা বঁটি অথবা কাটারি দ্বারা ছাড়াইয়া চাকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর হয়। পূর্ণ পক্ক বেলে তাহা হয় না। তখন খোসাশুদ্ধ ফলই ভাঙ্গিয়া টুকরা করিয়া শুকাইতে হয়; তাহাতে বিক্রয়ের দর অনেক কমিয়া যায়। ধনে, মৌরী, জোয়ান প্রভৃতি যেগুলিকে লোকে সাধারণতঃ বীজ মনে করে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ফল। এইরূপ ফলকে শুষ্ক করা অপেক্ষাকৃত সহজ। পক্ষান্তরে, সোঁদাল প্রভৃতি বড় বড় ফলকে শুষ্ক করিতে সময় লাগে। সোঁদালের ফল অপেক্ষা শাঁস সংরক্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। বিলাতী ব্যবসায়ীরা উহাই অধিক পছন্দ করেন এবং উহাই সোঁদালের কার্য্যকর অংশ। তেঁতুলের ন্যায় ইহারও বীজ বাহির করিয়া শাঁস বড় বড় পিপায় চালান যায়।

বীজ পূর্ণ-পরিপক্ক অবস্থাতেই সংগ্রহ করিতে হয়। কোন কোন ফল আপনা আপনি ফাটিয়া গিয়া বীজ মুক্ত করিয়া দেয়, যেমন আকন্দ, ধুতুরা প্রভৃতি। আবার কোন কোন ফল পড়িয়া পচিয়া গেলে বীজ মুক্ত হয়—কুচিলা, কালজাম ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। ফল বিদারিত অথবা বৃন্তচ্যুত হইবার আগেই উহা তুলিয়া বীজ বাহির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অধিকাংশ বীজই রৌদ্রে শুকাইতে পারা যায়। কোমল ফলের (জাম) বীজ শুকাইবার আগে এরূপভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয় যে, উহাতে শাঁস আদৌ লাগিয়া না থাকে। তাহাতে বীজ যেমন শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়, তেমনই অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। চালমুগরা, ধুতুরা প্রভৃতি কঠিন ফলের বীজ বাহির করিবার সময় বীজের সঙ্গে ফলের অন্যান্য অংশ যাহাতে মিশ্রিত হইয়া না যায়, তাহা দেখা দরকার।

সর্ব্বশেষে ত্বকের কথা। মূল ও কাণ্ডত্বক্ উভয়ই প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রায় একরূপ। ওলটকম্বল, ছুলা প্রভৃতির গাছে শিকড়ের ছালে একপ্রকার পিচ্ছিল পদার্থ আছে। ত্বক্ এরূপভাবে ধারাল ছুরী অথবা অন্য যন্ত্র দ্বারা তোলা দরকার যে, এক দিকে কাষ্ঠাংশ চলিয়া না আসে এবং অন্য দিকে ত্বকাংশ থাকিয়া না যায়। ছালের সমস্ত রোগযুক্ত ও বিবর্ণ অংশ পরিত্যাজ্য। অপক্ক অথবা পুরাতন গাছ হইতে ত্বক্ লওয়া উচিত নয়। বসন্তকালে প্রথম পত্রোদ্গমের কিছু পূর্ব্বে অথবা হেমন্তে পত্রাদি ঝরিয়া গেলে ত্বক্ সংগ্রহ করিতে পারা যায়।

ঔষধের গাছ-গাছড়া যে কোন দেশের কাঁচা মালের একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। এই শ্রেণীর মালের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিয়া শুধু যে ঔষধ শিল্পের পরিপুষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নহে, জাতীয় ধনাগমের একটি প্রধান আকরের কোন সদ্ব্যবহার হইতেছে না। অন্যান্য সুসভ্য দেশে এ বিষয়ে কিরূপ প্রবল চেষ্টা চলিতেছে, তাহা দুই একটি উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গারির অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ২।৩টি নূতন দেশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তন্মধ্যে জেচোস্লোভাকিয়া (Czecho-Slovakia) অন্যতম। মধ্য ইউরোপে পূর্ব্ব হইতেই গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও চাষের প্রচলন ছিল। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পর জেচো-স্লোভাকিয়া এই ব্যবসায়ে অগ্রণী হইতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। স্বাস্থ্য-সচিবের অধীনে ঔষধ উদ্ভিদ সংগ্রহের ও যাবতীয় উপায়ে জাতীয় গাছড়া ব্যবসায় পোষণ করিবার জন্য একটি কেন্দ্র কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। কৃষি বিভাগে এক জন ঔষধ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ ও এক জন গাছড়া সংগ্রহের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ৪।৫টি বড় বড় সহরে ঔষধক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে ও সচিত্র পুস্তিকা বিতরণ দ্বারা সকলেই ঔষধ-উদ্ভিদ বিষয়ক আবশ্যকীয় তথ্যাদি জানিতে পারিতেছে। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি গাছড়া উৎপাদন ও সংগ্রহ কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। এই নূতন দেশের চেষ্টা যে অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, ১৯২১ সালে গাছড়া আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে যথাক্রমে ১১৯২০০ ও ৬৩৮৭০০ কিলো (১ কিলো-মোটামুটি ১ সের)। ১৯২২ সালে ব্যবসায়ের আয়তন দ্বিগুণ হওয়া সম্ভব। মার্কিণে সরকারী উদ্ভিদ গবেষণা বিভাগের Drug and Poisonous Plant Investigation একটি বিশেষ শাখা। উক্ত রাজ্যে উইসকন্‌সিন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ও ঔষধ-উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষা প্রদানে ও তৎসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এতদুভয়ের সমবেত

চেষ্টায় ও ঔষধব্যবসায়িগণের আর্থিক সাহায্যে উইস্কন্সিনে উদ্ভিজ্জ ঔষধ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি ক্ষেত্র ও পরীক্ষাগার কয়েক বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এইরূপ আদর্শের অনুষ্ঠানের একান্ত অভাব। সেই জন্য সে দিন ডাক্তার গ্রিনিস্ প্রমুখ ঔষধ-উদ্ভিদ্-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ঔষধের গাছগাছড়া সদ্ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বনে ইংলণ্ড এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ইংলণ্ডের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন ভারতে ঔষধ-উদ্ভিদের ব্যবসায় যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু অনাদৃত ঔষধ উদ্ভিদ্ ব্যবসায়কে পুনর্গঠিত করিয়া, উক্ত শ্রেণীর বিদেশীয় ব্যবসার সমকক্ষ করিয়া তোলার উপায় কি? এ দেশে ক্ষেত্রজ এবং বন্য ঔষধের সদ্ব্যবহারে কেবল যে একটি নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর লোক লাভবান্ হইবে, তাহা নহে। এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, বহির্ব্বাণিজ্যে অথবা অন্তর্ব্বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িগণ ও ঔষধ প্রস্তুত এবং সেবনকারিগণ—সকলেরই ঔষধের গাছড়ার সহিত সম্বন্ধ আছে। যদি প্রকৃত গাছড়া উত্তমরূপে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়া বাজারে আইসে, তাহা হইলে সকলেরই এক দিক নয় অন্য দিকে লাভ হয়। সেই জন্য এই ব্যবসায়ে কোন স্থায়ী উন্নতি সাধিত করিতে হইলে সকলেরই সমবেত চেষ্টা দরকার।

ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রধানতঃ তিনটি কারণে গাছড়া ব্যবসায়ের বর্ত্তমান অবনতি ঘটিয়াছে।—১ম :—কি ডাক্তারি, কি কবিরাজি, কোন ঔষধের বিশুদ্ধতার একটা বাঁধাবাঁধি ধারা (Standard) এ দেশে এখন নাই। ঔষধের আইন না হইলে সেরূপ ধারার প্রচলন হওয়া অসম্ভব এবং তাহা প্রচলন না হইলেও বিশুদ্ধ গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুতের অতি অল্প লোকেরই আগ্রহ হইবে। ২য় :—জ্ঞানের অভাব—কি কি কারণে কোন বিশেষ উদ্ভিদের উপকারিতা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, প্রকৃত উদ্ভিদ্ চিনিবার উপায় কি এবং উহার গুণাবলী কি প্রকারে সংরক্ষিত হইতে পারে, সে সমুদয় কম ঔষধ-ব্যবসায়ীই জানেন অথবা জানিতে চেষ্টা করেন। ৩য় :—দেশের বিভিন্ন গাছড়া ব্যবসায়ের কেন্দ্রের মধ্যে আবশ্যকীয় সংবাদ আদান-প্রদানের প্রথা নাই। এই শেষোক্ত অসুবিধার জন্য মূল্যের গুরুতর তারতম্য দেখা যায়; এবং আবশ্যক হইলে বহুল পরিমাণে কোন গাছড়া সহজে পাওয়া যায় না।

এই সমুদয় অসুবিধা দূর করিয়া ভারতের অপর্য্যাপ্ত ঔষধের কাঁচা মালকে অর্থাগমের আকরে পরিণত করিতে হইলে এরূপ একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, যাহা হইতে সাধারণে ঔষধ উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান, বিভিন্ন কেন্দ্রের বাজার দর ও সংরক্ষণের এবং ব্যবসায়ের জন্য চালানের পদ্ধতিবিষয়ক খবর সহজে পাইতে পারে। ভারতের কোন্ স্থলে কোন্ ঔষধ-উদ্ভিদ্ স্বভাবতঃ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তাহা এখনও সঠিক জানা নাই। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যতদূর খবর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা একটি বিশেষ পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং উক্তরূপ উদ্ভিদ্-বিষয়ক ব্যবসায়ীর অবশ্যজ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চলা একান্ত আবশ্যক। বন, কৃষি ও শিল্প বিভাগ এ বিষয়ে মনযোগ দিলে অনেক মূল্যবান্ কায করিতে পারেন। কিন্তু সে চেষ্টা এখনও দেখা যায় না। ঔষধের গাছগাছড়া শুধু যে ঔষধে ব্যবহার হয়, তাহা নহে। বাবলার ছাল, ফল ও আঠা ঔষধে প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু চামড়া কষের জন্য ছাল ও ফল ও নানাবিধ শিল্পে আঠার ব্যবহার ঔষধার্থ ব্যবহৃত পরিমাণ হইতে অনেক অধিক। এইরূপ উদাহরণ বিস্তর দিতে পারা যায়। সুতরাং ইহা আশা করা অযৌক্তিক নহে যে, ঔষধ উদ্ভিদ্ সংগ্রহ ও চাষের উন্নতি সাধিত হইলে শুধু ঔষধ-শিল্পের নহে, অন্যান্য বহুবিধ শিল্পেরও অনেক উপকার সাধিত হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

শক্তিপূজা

(১) শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, দুগ্ধ ও ধবলত্ব যেমন অভেদ, ব্রহ্ম ও শক্তি তেমনই অভেদ। যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন না, তখন ব্রহ্ম; আর যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তখন শক্তি।" একই ব্রহ্ম, অনাদি-সিদ্ধ মায়া হেতু ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম হইয়াছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের প্রাথমিক ঈক্ষণ কথিত আছে। 'তদা ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়'; তিনি আলোচনা করিলেন, বহু হইব, উৎপন্ন হইব। 'সোঽকাময়ত' তিনি ইচ্ছা করিলেন; 'তৎ তপঃ অকুরুত', তিনি তপঃ সৃজন করিলেন ইত্যাদি। জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ার সমষ্টিকে ব্রহ্মধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন। কারণ, এই ধর্ম্ম তাঁহার স্বাভাবিক। শ্রুতিতে আছে, 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'; যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি বা দুগ্ধ ও ধবলত্ব। ব্রহ্মের 'ধর্ম্ম' এ জন্য 'শক্তি' সংজ্ঞা হইয়াছে।

সেই শক্তি জড় বা জীব নহেন। কিন্তু অতি কোমল চিৎশক্তি, সে জন্য ব্রহ্ম কোটি। ব্যষ্টি জ্ঞান, ব্যষ্টি ইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়া মহাসরস্বতী মহাকালী মহালক্ষ্মী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। সমষ্টি-জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া চণ্ডী নামে ব্যবহৃত হন। এই ব্যষ্টি জ্ঞান, ব্যষ্টি ইচ্ছা, ব্যষ্টি ক্রিয়ার অপর নাম বামা, জ্যেষ্ঠা, অতি রৌদ্রী অথবা পশ্যন্তী, মধ্যমা, বৈখরী; অথবা ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র। আর সমষ্টি জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়ার নাম অম্বিকা শান্তা পরা; ত্রিতয়ের সমষ্টি এ জন্য তুরীয়া। পরব্রহ্মের পট্টমহিষী এই মায়াশক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে চণ্ডী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"জননি পদপঙ্কজং দেহি শরণাগতজনে
কৃপাবলোকনে তারিণী।
তপন-তনয়-ভয়-চয়-বারিণী॥
প্রণবরূপিণী সারা কৃপানাথ-দারা তারা
ভব-পারাবার-তরণী।
সগুণা নিগুর্ণা স্থূলা সূক্ষ্মা মূলা মূলহীনা,
মূলাধার—অমল-কমলবাসিনী।
আগমনিগমাতীতা খিল মাতা খিল পিতা
পুরুষ-প্রকৃতিরূপিণী।
হংসরূপে সর্ব্বভূতে বিহরসি শৈলসুতে
উৎপত্তি-প্রলয়-স্থিতি-ত্রিধা-কারিণী।"

(২) মাতৃভাব আশ্রয়

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে ডাকিলেই হইল, দেব-দেবীর দরকার কি? তাঁহারা ঠাট্টা করেন,'ইহা গচ্ছ' বল কাহাকে?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যেমন মর্ত্ত্যলোকে মানুষ প্রভৃতি নানা জীব বাস করে, সেইরূপ বিভিন্ন লোকে দেবদেবীও আছেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা মানুষের নানা কর্ম্মে সাহায্য করেন। সে জন্য দেবদেবীকে ডাকা কি পূজা নিষ্ফল নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীতে ব্যক্তিবিশেষের আরাধনা করিলে সাংসারিক লাভ হইয়া থাকে, আর দেবদেবীর পূজা সাংসারিক হিসাবে নিষ্ফল হইবে কেন? ভগবান্ বলিয়াছেন, "লভতে চ ততঃ কামান্" সেই সব দেবতা হইতে সংকল্পিত কাম পাইয়া থাকে। আরও, দেবদেবীরা অতীন্দ্রিয়। ঐরূপ পূজাতে অতীন্দ্রিয় জিনিষে বিশ্বাস হয়। তাহার পর ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় ত বটেই, আবার অনন্তশক্তি। তাঁহাকে ধারণা করা সহজ নহে। অনন্তশক্তির ধারণা একরূপ অসম্ভব। সে জন্য খণ্ড খণ্ড শক্তি কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ডাকা সোজা হয়। ঠাকুর বলিতেন, "গঙ্গাস্পর্শ মানে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ছুঁতে হবে, তা নয়। যেখানে হ'ক, স্পর্শ করলেই গঙ্গাস্পর্শ করা হয়।" সে জন্য সাধকরা অনন্তের অনন্ত ভাব ধরিতে না যাইয়া এক একটা ভাব আশ্রয় করেন। পিতৃভাব, সখ্যভাব, মাতৃভাব, মধুরভাব ইত্যাদি। ঠাকুর বলিয়াছেন, সকল ভাবের চেয়ে মাতৃভাব শুদ্ধ। পড়িবার আশঙ্কা নাই।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈস্তপোদানদৃঢ়ব্রতৈঃ।
ক্ষীণাঘানাং সাধকানাং কুলাচারে মতির্ভবেৎ॥

কুলাচারগতা বুদ্ধির্ভবেদাশু সুনির্ম্মলা।
তদাদ্যাচরণাম্ভোজে মতিস্তেষাং প্রজায়তে॥

তপস্যা, দান, ব্রত ও বহু জন্মের পুণ্য দ্বারা যাঁহাদের পাপক্ষয় হইয়াছে, সেই সব সাধকের কুলাচারে মতি হয়। কুলাচার অভ্যাস করিলে বুদ্ধি শীঘ্র নির্ম্মল হয়। বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে আদ্যার চরণাম্ভোজে মতি বেড়ে যায়।

(৩) নারীপূজা

কুলাচার অর্থাৎ নারীপূজা।

শক্তিঃ শিবঃ শিবঃ শক্তিঃ শক্তির্ব্রহ্মা জনার্দ্দনঃ।
শক্তিরিন্দ্রো রবিঃ শক্তিঃ শক্তিশ্চন্দ্রো গ্রহো ধ্রুবম্।
শক্তিরূপং জগৎ সর্ব্বং যো ন জানাতি নারকী॥

শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্মা শক্তি, জনার্দ্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি, গ্রহগণ শক্তি, এই জগৎই শক্তি অর্থাৎ সবই শক্তির খেলা, তিনিই এই সব হইয়াছেন, এরূপ যে দর্শন না করে, সে নারকী।

বিদ্যাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।

সব নারী তোমার অংশ।

বালাং বা যৌবনোন্মত্তাং বৃদ্ধাং বা সুন্দরীং তথা।
কুৎসিতাং বা মহাদুষ্টাং নমস্কৃত্য বিভাবয়েৎ॥

বালিকা, যৌবনোন্মত্তা, বৃদ্ধা বা সুন্দরী বা কুৎসিতা বা মহাদুষ্টা স্ত্রীলোককেও নমস্কার করিয়া জগন্মাতা চিন্তা করিবে। বিশেষতঃ কুমারীতে জগন্মাতা দর্শন করিবে।

কুমারীপূজনপ্রীতা, কুমারীপূজকালয়া।
কুমারীভোজনানন্দা, কুমারীরূপধারিণী॥

কুমারীকে পূজা করিলে তুমি প্রীত হও, কুমারীপূজকের আলয়ে তুমি থাক, কুমারীকে ভোজন করাইলে তোমার আনন্দ হয়, তুমি কুমারীরূপধারিণী।

একটি তিন চারি বৎসরের শিশুকুমারীর হৃদয়ের ভাব চিন্তা করিতে হইবে। শিশুকুমারীর যৌবনোদ্গমে যে সব ভাব পরিস্ফুট হইবে, শৈশব অবস্থায় সে সব সংস্কার নিশ্চয় আছে। কারণ, যদি উহা না থাকে, পরে উহা প্রকাশিত হইত না। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' যেটি আছে, সেইটি হয়; যেটা নাই, সেটা হয় না। কিন্তু সেই সব সংস্কার নিদ্রিত আছে, বুঝিতে হইবে। এইটির সহিত প্রলয় অবস্থার সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যৌবনোদ্গমে যে সব ভাব, রমণ-বাসনা, রমণ, জনন প্রভৃতি কার্য্য তখনও প্রকাশ হয় নাই, অথচ সেই সব সংস্কার রহিয়াছে। এইটি অন্তর্যামী অবস্থা। এই নিদ্রিত সংস্কারগুলি বালিকা জানিতে পারে না। কিন্তু মহামায়া চিৎশক্তি, সেই জন্য এই সব নিদ্রিত সংস্কার জানেন। সেই জন্য শিশুকুমারী প্রাজ্ঞ আর মহামায়া সর্ব্বজ্ঞ। পরে যৌবনচিহ্ন প্রকাশ হইবার উপক্রম হইলে বালিকার আপনা আপনি অস্ফুট রমণবাসনামাত্র উদ্রিক্ত হয়, এইটির সহিত মহামায়ার হিরণ্যগর্ভ অবস্থার সাদৃশ্য বুঝিতে হইবে। পরে তাহার রমণ ও জননকার্য্যের সংস্কার প্রকট হয় এবং তদনুযায়ী দেহাবয়ব পরিস্ফুট হয়। এইটি মহামায়ার বিরাট অবস্থার সহিত সাদৃশ্য আছে। কুমারীতে মাতৃত্বভাব প্রথমে নিদ্রিত, পরে স্ফুট হয়, সে জন্য কুমারী মহামায়ার অনুকল্পরূপে পূজিত হয়েন।

"স্ত্রীষু রোষং প্রহারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা"

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি রোষ ও প্রহার, বুদ্ধিমান্ নিয়ত ত্যাগ করিবেন। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মা বিরাজে ঘরে ঘরে,
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে॥"

স্ত্রীলোককে এইরূপ মাতৃভাবে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি নির্ম্মল হয় ও জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি হু হু করিয়া বাড়িয়া যায়।

(৪) মাতৃপূজার বৈশিষ্ট্য

মহামায়ার উপাসনার বৈশিষ্ট্য—(১) তিনি অত্যন্ত কোমলান্তঃকরণা ও (২) ভুক্তিমুক্তিদাত্রী।

আদ্যাপ্যশেষজগতাং নব-যৌবনাসি।
শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি॥

তুমি নিখিল জগতের আদ্যা হইলেও নব-যৌবনা আর শৈলাধিরাজতনয়া হইলেও অতি কোমলচিত্তা।

যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো
যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।

শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥

অন্য দেবতার উপাসনায় যদি ভোগলাভ হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হয় না; যদি মোক্ষলাভ হয়, ভোগলাভ হয় না; কিন্তু মা'র চরণপদ্মের অর্চ্চকদিগের ভোগ মোক্ষ দুই-ই করতলগত হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ,
মা'র ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ॥"

(৫) শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্ব

এই প্রসঙ্গে শাক্ত-বৈষ্ণবের ঝগড়া উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুর নিন্দা করিলে দুর্গা খুব খুসী হইবেন বা দুর্গার নিন্দা করিলে বিষ্ণু খুব খুসী হইবেন।

দেবীবিষ্ণুশিবাদীনাং একত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
ভেদকৃৎ নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

দেবী, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার অভিন্নত্ব চিন্তা করিবে। যিনি ভিন্ন দেখেন, তিনি প্রলয়কাল অবধি নরক প্রাপ্ত হয়েন।

একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বান্ এব বিনিন্দতি।

একের নিন্দা করিলে সকলেরই নিন্দা করা হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"মন কোরো না দ্বেষাদ্বেষী।
ওরে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সকল আমার এলোকেশী ॥

বচন আছে,—

একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য ভিন্না চতুর্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পৌরুষে চ বিষ্ণুঃ কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা ॥

পরমেশ্বরের একই শক্তি বিভিন্ন হইয়াছেন, ভোগে ভবানী, পৌরুষে বিষ্ণু, কোপে কালী, সমরে দুর্গা হইয়াছেন।

(৬) কালাভিমানিনী দেবতা

সকলেরই স্বীকার্য্য, আকাশ ও কালকে বাদ দিয়া কিছু উপলব্ধি করা যায় না। আকাশ অর্থাৎ অবকাশ। দিক্ আকাশের অন্তর্গত।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।
বিশ্বাসোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥

কালের নানারূপ বিভাগ, দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি। আমরা দেখিতেছি, অন্ত গত কল্যকে গ্রাস করিতেছে, পক্ষ দিবসকে গ্রাস করিতেছে, মাস পক্ষকে গ্রাস করিতেছে, ঋতু মাসকে গ্রাস করিতেছে, সংবৎসর ঋতুকে গ্রাস করিতেছে, যুগ সংবৎসরকে গ্রাস করিতেছে, কল্প যুগকে গ্রাস করিতেছে। কল্পের পর আর কালের ব্যবহারিক কল্পনা হয় না। সে জন্য কল্পকে মহাকাল গ্রাস করিতেছে অনুমান করা হয়। অতএব বলিতে হইবে, কাল অপেক্ষা সংহারক আর কিছুই নাই। কালের সংহারমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ। মহাকালকে কালিকা গ্রাস করিতেছেন অনুমান করা হয় অর্থাৎ তিনি কালের অতীত বস্তু।

প্রতিদিন তিন ভাগে বিভক্ত;—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন। প্রাতঃকালের অভিমানিনী দেবতা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নের অভিমানিনী দেবতা সাবিত্রী, সায়াহ্নের অভিমানিনী দেবতা সরস্বতী। সেইরূপ দিবসাভিমানিনী দেবতা আছেন, রাত্রি-অভিমানিনী দেবতা আছেন, পক্ষাভিমানিনী দেবতা আছেন, মাসাভিমানিনী দেবতা আছেন, ঋতু-অভিমানিনী দেবতা আছেন, অয়ন-অভিমানিনী দেবতা আছেন, সংবৎসরাভিমানিনী দেবতা আছেন, যুগাভিমানিনী দেবতা আছেন, কল্পাভিমানিনী দেবতা আছেন, মহাকালাভিমানিনী দেবতা আছেন।

কালের আর একটি বিভাগ—চাতুর্ম্মাস্য। তিন চাতুর্ম্মাস্যে এক সংবৎসর। প্রতি চাতুর্ম্মাস্যে বিভিন্ন জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-লতা, শস্য জন্মায়। তাহাতে কালের উৎপাদয়িত্রী শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়।

আবার কালের নৃত্য সকলের প্রত্যক্ষ। রাত্রির পর দিবা, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, সংবৎসরের পর সংবৎসর, এইরূপ অবিরাম নৃত্য চলিয়াছে। কালের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেকের নিয়মিত আয়ুষ্কাল অবধি বাল্য যৌবন জরা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কালে লয় হইতেছেন।

(৭) আকাশ-অভিমানিনী দেবতা

কালের যেরূপ বিভাগ অনুমান করা যায়, আকাশের সেইরূপ বিভাগ আছে।

সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ॥

আকাশের গুণ শব্দ। শব্দ দ্বিবিধ,—ধ্বনি ও বর্ণ। বর্ণ একপঞ্চাশৎ। এক একটি বর্ণ দেবদেবীরূপে পূজিত হয়। বর্ণগুলিকে মন্ত্রমাতৃকা বলে, মাত্রা—স্বরবর্ণ, অর্দ্ধমাত্রা—ব্যঞ্জনবর্ণ।

বর্ণ	দেবতা	শক্তি	বর্ণ	দেবতা	শক্তি
অ	শ্রীকণ্ঠ	পূর্ণোদরী	ঞ	সর্ব্ব	নাগরী
আ	অনন্ত	বিজয়া	ট	সোমেশ	খেচরী
ই	সূক্ষ্ম	শাল্মলী	ঠ	লাঙ্গলী	মঞ্জরী
ঈ	ত্রিমূর্ত্তি	লোলাক্ষী	ড	দারুক	রূপিণী
উ	অমরেশ্বর	বর্ত্তুলাক্ষী	ঢ	অর্দ্ধনারীশ্বর	ধীরিণী
ঊ	অর্ঘীশ	দীর্ঘঘোণা	ণ	উমাকান্ত	কাকোদরী
ঋ	ভারভূতীশ	সুদীর্ঘমুখী	ত	আষাঢ়ি	পূতনা
ৠ	অতিথীশ	গোমুখী	থ	দণ্ডী	ভদ্রকালী
ঌ	স্থাণুক	দীর্ঘজঙ্ঘা	দ	অদ্রি	যোগিনী
ৡ	হর	কুণ্ডোদরী	ধ	মীন	শঙ্খিনী
এ	ঝিণ্টীশ	ঊর্দ্ধকেশী	ন	মেষ	গর্জ্জিনী
ঐ	ভৌতিক	বিকৃতমুখী	প	লোহিত	কালরাত্রি
ও	সদ্যোজাত	জ্বালামুখী	ফ	শিখি	কুব্জিনী
ঔ	অনুগ্রহেশ্বর	উল্কামুখী	ব	ছগলণ্ড	কপর্দ্দিনী
ং	অক্রূর	চুল্লীমুখী	ভ	দ্বিরণ্ডেশ	
ঃ	মহাসেন	বিদ্যামুখী	ম	মহাকাল	জয়া
ক	ক্রোধীশ	মহাকালী	য	বলী	সুমুখেশ্বরী
খ	চণ্ডেশ	সরস্বতী	র	ভুজঙ্গেশ্বর	রেবতী
গ	পঞ্চান্তক	গৌরী	ল	পিনাকী	মাধবী
ঘ	শিবোত্তম	ত্রৈলোক্যবিদ্যা	ব	খড়্গীশ	বারুণী
ঙ	একরুদ্র	মন্ত্রশক্তি	শ	বকেশ্বর	বায়বী
চ	কূর্ম্ম	আত্মশক্তি	ষ	শ্বেত	রক্ষোবিদারিণী
ছ	একনেত্রেশ	ভূতমাতা	স	ভৃগ্বীশ	সহজা
জ	চতুরানন	লম্বোদরী	হ	নকুলি	লক্ষ্মী
ঝ	অজেশ	দ্রাবিণী	ল	শিব	ব্যাপিনী
			ক্ষ	সংবর্ত্তক	মায়া

একটি একটি বর্ণ এক একটি দেব-দেবী, সেইরূপ বর্ণ-সমষ্টিই কালিকা। বর্ণসমষ্টি বুঝাইবার জন্য কালীর গলে মুণ্ডমালা। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"যত শুন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।"

কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে বিরাজ করেন।

আকাশ আবার অবকাশাত্মক। এই হিসাবে দিক্‌গুলিকে আকাশের বিভাগ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, বায়ু, ঈশান, নৈর্ঋত, ঊর্দ্ধ, অধঃ। খণ্ডকালগুলি যেমন কালের অন্তর্গত, সকল দিক্‌গুলি সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত। পূর্ব্বদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম ইন্দ্র; অগ্নিদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম অগ্নি; দক্ষিণদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম যম; নৈর্ঋতদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম নির্ঋতি; পশ্চিমদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম বরুণ; বায়ুদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম বায়ু; উত্তরদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম কুবের; ঈশানদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম ঈশান; ঊর্দ্ধদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মা; অধোদিক্-অভিমানিনী দেবতা আছেন, তাঁহার নাম অনন্ত।

যেমন এক একটি দিক্-অভিমানিনী দেবতা কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সমষ্টি আকাশাভিমানিনী দেবতাই কালিকা। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
তুমি নগর ফির মায়া-ঘোরে
প্রদক্ষিণ দিই শ্যামা মারে॥

আমরা দেখি, কালের মাপকাঠী সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি; অর্থাৎ এইগুলি দ্বারা কালের পরিমাণ করা যায়। সেইরূপ দিক্‌গুলির মাপকাঠীও সূর্য্য। প্রথমে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয়েন, সে জন্য ঐ দিকের নাম প্রাচী। তাহার বিপরীত প্রতীচী। পূর্ব্বাভিমুখে সূর্য্যের পরিভ্রমণ হয়, সে জন্য অবাচী বা দক্ষিণ। তাহার বিপরীত উদীচী বা উত্তর। সে জন্য কালিকার সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, তিনটি নয়ন কল্পিত হয়।

(৮) মহামায়া বিশ্ব অনুগ

কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ কালের সহিত জড়িত। কার্য্য বুঝিতে হইলে কারণ বুঝিতে হয়। এই জন্য সৃষ্টি বুঝিতে হইলে মহাকারণ প্রথমে বুঝিতে হয়। এই মহাকারণ মহামায়া। ব্রহ্ম আকাশ, কাল বা কার্য্য-কারণের অতীত। কারণ বলিলেই কার্য্য বলা হয়। কার্য্য কারণের পরিণাম মাত্র। ব্রহ্ম অপরিণামী, নির্ব্বিকার, সে জন্য তিনি কার্য্যকারণের অতীত বস্তু। মহামায়া জীবজগতের উৎপাদয়িত্রী, সে জন্য মহামায়া কারণ, জীবজগৎ কার্য্য। তিনি বিশ্ব অনুগ।

(৯) শক্তিপূজা কি সকাম উপাসনা ?

ভগবান্ বলিয়াছেন,

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥"

আমার চতুর্ব্বিধ ভক্ত—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ইহারা সকলেই সুকৃতী। তিনি বলিয়াছেন,'উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে।' ইহারা সকলেই মহানর অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিবে। তবে জ্ঞানী তু আত্মৈব। জ্ঞানী আমার আত্মা। অর্থার্থী হইলেই যে খুব খারাপ, তাহা নহে। অনেকের ধারণা, শক্তিপূজা কেবল কামনা—ভিক্ষা।

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।"

কিন্তু এই ব্যক্যগুলির ঠিক অর্থ বুঝিলে এ ধারণা থাকিবে না। "প্রদীপ" টীকাতে আছে,—"রূপং দেহি" অর্থাৎ হে দেবি ! আমার উপর প্রসন্না হইয়া "রূপং দেহি" পরমার্থ বস্তু দাও, জয়ং দেহি অর্থাৎ পরমাত্মস্বরূপ দাও। "যশো দেহি" তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদন জন্য যশঃ দাও। "দ্বিষো জহি" আমার কামক্রোধাদি শত্রু নাশ কর।

"পত্নীং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্।
তারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোদ্ভবাম্ ॥"

হে দেবি ! সৎকুলোদ্ভবা মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা পত্নী দাও ; যিনি এই ভীষণ সংসারসাগর হইতে আমাকে নিস্তার করিবেন। মার্কণ্ডের পুরাণে মদালসার কথা আছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণে চূড়ালার কথা আছে। মদালসা কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। চূড়ালা কর্ত্তৃক তাঁহার পতি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

শ্রীবিহারীলাল সরকার।

মুক্তি-পরশ

বিলাস-প্রাসাদে নাহি লোভ মোর সে থাক্, বন্ধু, তোমার তরে,
গিরিপাদমূলে কুটীর আমারে দিল ভগবান্ করুণা ক'রে।

এ কুটীর হোক্ অক্ষয় ধ্রুব সে যে পুণ্যের গোলোক সম,
মিলনের প্রেম অমরাবতী সে—সাধনার তপোবন সে মম।

প্রভাত-রবির জাগরণ-রেখা প্রথম প্রবেশে আমার ঘরে,
করুণাসিক্ত স্নেহের শিশির সকলের আগে হেথায় ঝরে।

আমার ক্ষুদ্র কুটীর ঘেরিয়া হেসে সুধাংশু জাগিয়া উঠে,
বরষা মমতা-স্তন্য বিলায় তৃষা-বিশুষ্ক মরমপুটে।

বায়ু হ'ল হেথা মৃদু মন্থর হৈমপুরীর সুরভি বহি',
গিরিগুহা দিল তটিনী-জনম প্রসবের ব্যথা নীরবে সহি'।

মিশিতে তটিনী-ভগিনীর সনে চঞ্চলি এল ঝরণা ছুটে,
তরল হাস্যে চপল লাস্যে আনন্দ যেন শতধা লুটে।

অনিন্দ্য অনবদ্য কুসুম অগুরু গন্ধে সিনান ক'রে—
বুকের মমতা মধুপকটি উপহার দেয় সোহাগভরে।

বিহগ-কূজনে অলি-গুঞ্জনে চলিছে নিয়ত সুরের খেলা,
প্রকৃতি আদরে এ মোর কুটীরে বসাল কত না রূপের মেলা।

কপোত কপোতী অতিথি আমার, ময়ূর ময়ূরী গৃহের জন,
কুশল বারতা শুধাইতে নিতি আসে যে হরিণহরিণীগণ।

অবরোধি শত বিপদভুজঙ্গ এ অসহায়ের রক্ষা লাগি—
ধ্যান-প্রশান্ত শুভ্র হিমগিরি রক্ষীর মত রয়েছে জাগি।

ক্ষ্যাপা ভোলা মোর পাগল গিরিশ বিরাজে আমার মাথার'পরে,
জানি না কি রসে মজাইল মোরে কি নাম যে দিল কণ্ঠভরে।

বিলাস-প্রাসাদে নাহি লোভ মোর, এ কুটীর রব আঁকড়ি ধরি,
এত সুখ এত সন্তোষ ফেলি সংস রে যাব কেমন করি !

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।
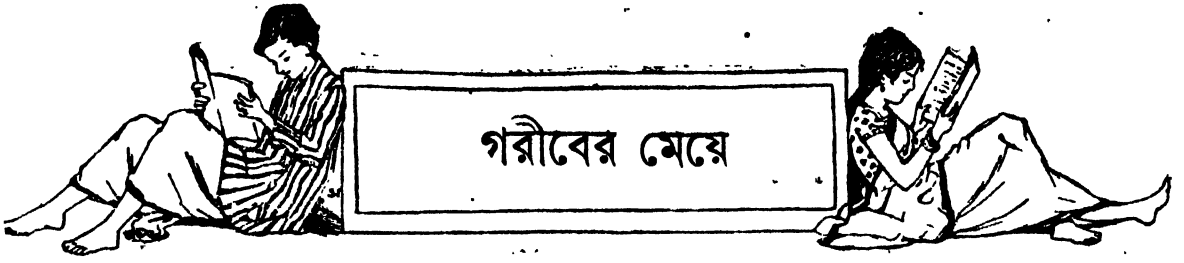
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সে দিন বাড়ী ফিরিবার মুখে সারা পথটাই নীলিমা গভীর উৎকণ্ঠার সহিত ভাবিতে ভাবিতে আসিল যে, সে দিন বাড়ী ফিরিয়া সে মা'র কাছে প্রথমেই জানিয়া লইবে যে, খৃষ্টধর্ম্মের চেয়ে হিন্দুধর্ম্ম বড় কি ছোট? খৃষ্টান না হইয়া হিন্দু থাকিলেই মানুষকে অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় কি না, হিন্দু থাকিয়াও স্বর্গযাত্রা করা চলে কি না—সে সম্বন্ধেও সবিশেষ জানিয়া লইবার জন্য তাহার সারা চিত্তে উদ্বেগ ও আগ্রহের যেন আর অন্ত রহিল না। মিসেস্ গুঁই আজ বিদায়কালে পুনশ্চ তাহাকে দৃঢ় আদেশের সহিত বলিয়া দিয়াছেন,—মিস্ হর্ণ নিশ্চিত বিশ্বাসে তাহার পিঠ চাপাড়াইয়া বলিয়াছেন,—কা'ল তাঁহারা তাহাকে 'গুড বিলিভার' দেখিতে উৎসুক রহিলেন। অসহ্য অশিক্ষিত ষাঁড়ে চড়া মহাদেব, ঠুঁটো জগন্নাথ, কুচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ, উলঙ্গিনী কালী (হোয়াট এসেম!) এদের প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া সেভিয়ারের শরণাপন্ন হইলেই যখন তাহার দীন-আত্মা অনন্ত অসীম সুখের অধিকারলাভে সমর্থ হয়, তখন অনর্থক নিজের ক্ষুধিত আত্মাকে সেই অনায়াসসাধ্য সুধাপাত্র কেনই বা সে পান করাইয়া চির-অমরতা দান না করিয়া থাকে? এ না করিলে তাহার পাপ আবার অন্যান্য 'হীদেন'-দের চেয়ে কোটিগুণ অধিকতরই হইবে। যেহেতু, যীশুকে 'খৃষ্ট' এবং তিনিই যে একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র এবং সকলের ত্রাণকর্ত্তা, তাহার সম্বন্ধে নীলিমাকে বহুদিন ধরিয়া বিশেষভাবে জ্ঞান দান করা হইয়াছে। যেহেতু, নীলিমা বিশেষভাবেই জানে যে, পিতৃ-পুরুষ দায়ুদ প্রবাচক ছিলেন এবং ঈশ্বর দিব্যপূর্ব্বক তাঁহার কাছে শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসজাত এক জনকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবেন, এই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া খৃষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে এই কথা কহিলেন যে, তাঁহাকে পাতালে ফেলিয়া রাখা হইল না। তাঁহার মাংসও ক্ষয় পাইল না। এই যীশুকে ঈশ্বর উঠাইলেন, আমরা সকলে এ বিষয়ে সাক্ষী। অতএব ঈশ্বরের দক্ষিণহস্ত দ্বারা উন্নীত হওয়াতে এবং পিতার কাছে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাহা তিনি বর্ষণ করলেন। কারণ, দায়ুদ স্বর্গে আরোহণ করেন নাই; কিন্তু তিনি নিজেই বলেন,—'প্রভু আমার, প্রভুকে বলিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে উপবেশন কর, যে পর্য্যন্ত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার চরণের পদাসন না করি, অতএব সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যে যীশুকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহাকেই ঈশ্বর প্রভু ও খৃষ্ট উভয়ই করিয়াছেন।'

মিস্ হর্ণ শাম্পানীর দ্বারের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পুনশ্চ কহিলেন, "মন পরিবর্ত্তন কর, এবং তোমাদের পাপবিমোচনার্থ তোমরা প্রত্যেকে যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও; তাহাতে তোমরা পবিত্র আত্মদান প্রাপ্ত হইবে।"

নীলিমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া এই শেষ কথাগুলারই প্রতিধ্বনি অনবরত তাহারই নিজের উভয় কর্ণে ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল,—'তোমাদের পাপবিমোচনার্থ তোমরা যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ হও * *' যদি বাস্তবিকই সেই ঘোরতররূপ অনন্ত নরকজ্বালা হইতে মুক্তিলাভানন্তর ইহাতে অনন্তকালের জন্য সুখসেব্য স্বর্গবাস ঘটে, তবে কেনই বা সে "যীশুখৃষ্টের নামে বাপ্তাইজ" না হইবে? মিসেস্ গুঁই বলিয়াছেন, "অবিশ্বাসীর আত্মাকে সহস্রকোটি বিষাক্ত কীট সহস্র সহস্র কোটি বর্ষ ধরিয়া প্রতিনিয়ত কুরিয়া কুরিয়া কাটিয়া কাটিয়া খাইতে থাকিবে; কাহারও সাধ্য নাই যে, সে দুর্দ্দশার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।"

নীলিমার মায়ের মুখ মনে পড়িয়া গেল। মা'র কথা মনে হইল। মা, তার স্নেহময়ী মা, তিনি যে তার সামান্য একটু মাথা ধরিলে কতই না ব্যাকুল হইয়া, সেটুকু ক্লেশ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সচেষ্ট হয়েন, আর ঐ অত

বড় বিপাকের মধ্যে তাহাকে ডুবিতে দেখিয়া সেই মা কি কখন নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবেন ? কখনই না,কখনই না—মা তাহাকে নিশ্চয়—নিশ্চয়—সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন, ঘৃণিত ও বিষাক্ত কৃমিকীটে পরিপূর্ণ, গলিত ময়লায় শ্বাসরোধকারী দারুণ দুর্গন্ধে ভরা নরককুণ্ড হইতে, গলিত লৌহের তরল অগ্নির ভীষণ আধার হইতে নিশ্চয়—নিশ্চয় রক্ষা করিবেন ! অসম্ভব, নীলিমার এ দুরবস্থা তার মা থাকিতে ঘটা একান্তই অসম্ভব ! মা'র কাছে কোনমতে এই মুহূর্ত্তেই গিয়া পৌঁছিতে তার সমস্ত মনপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকল একান্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। অথচ কি ধীর-মন্থর গতি ওই বলদ দুইটার পায়ে, আর সেণ্টপিটার মিশন স্কুল হইতে নীলিমাদের বাড়ীর রাস্তাটাও কি না তেমনই বিষম দীর্ঘ !

বাড়ী ফিরিয়া এক রকম ছুটিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে নীলিমা উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—"মা !"

অধীর ও উদ্‌গ্রীব আগ্রহে মায়ের ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু এ কি ! নীলিমার সকল ব্যগ্রতাই যে সহসা ঘোর নৈরাশ্যের তীরে আছাড় খাইয়া পড়িল ! এ অসময়ে তাহার মায়ের ভাঁড়ার ঘরের মধ্য হইতে তাহার পিতার কণ্ঠের সাড়া আসিতেছে কেন ? নীলিমা সহসা নিজের অনন্ত নরকযন্ত্রণার ভয়াবহতা বিস্মৃত হইয়া গিয়া তাহার মায়ের আসন্ন কোন বিপৎপাতের সভয় কল্পনায় শুষ্ক হইয়া উঠিল। নিশ্চয় কোন কিছু অঘটন না ঘটিলে এ সময় তাহার পিতাকে ইটখোলার তদারক ফেলিয়া এখানে টানিয়া আনে নাই। তার উপর তাঁর ভাণ্ডারগৃহ প্রবেশেই যে মস্ত বড় একটা বিপদের সূচনা করিতেছে। নীলিমা স্রোতোহত কুসুমদামের মতই সেইখানে নিশ্চল হইয়া রহিল এবং সেখান হইতেই সে এই কথাগুলি শুনিতে পাইল।

"বল কি তুমি গিন্নি ! গোঁড়াটাকে ত আজ বছর চারেক হ'তে চল্লো ভুবন রায় পুষছে, তোমার বাড়ীমুখো হ'তে দেয় নি,—বাড়ীতে থাক্‌বার মধ্যে ত তুমি আর তোমার মেয়ে,আর ঐ দাসী মাগী এক বেলায় দু মুঠো খায়, আর আমার কথা ছেড়েই রাখো না কেন, আমি ক'টাই বা ভাত মুখে দিই ? রাত্রে ত গোনা সাতখানি রুটীর বেশী যদি কখনও নিয়ে থাকি ত বড় জোর—দু'খানা। তা ঐতেই তোমার মাসকাবারের দু দিন আগে চাল, গম, নুণ, আলু সব কিছু ফুরিয়ে গেল ! কি হয় বল দেখি ?"

নীলিমা তাহার মায়ের মুখ হইতে এই রূঢ় প্রশ্নের কোন সঙ্গত বা অসঙ্গত উত্তরই শুনিতে পাইল না। অপ্রাপ্ত উত্তরের জন্য ক্ষণকাল সময়ক্ষেপ করিয়া তাহার পিতাই পুনশ্চ আরম্ভ করিলেন,—"নিশ্চয়ই চাল টাল নিয়ে কিছু করা হয়ে থাকে. নিশ্চয়ই কোন কিছু হয়।—না হ'লে বলি, দুটো মানুষের পেটে তো আর রাক্ষস ঢোকেনি ? সব যায় কোথায় ? ভাল কথা, ধোপার হিসাবে যে এবার দেখছি সাতখানা ধুতী লিখে রেখেছ, আবার রুমাল একখানা রয়েছে, তার মানেটা কি ? এক ধোপে তিন তিনখানা ধুতী প'রে বাহারটা দিলেন কে শুনি ? রুমালখানা কার ? তোমার না কি ?"

নীলিমার বুক টিপ্ টিপ্ করিতে লাগিল। শেষ কথা কয়টা তাহার মা'র উদ্দেশ্যে তাহার পিতা যে স্বরে যে শ্লেষের ভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে তাহার মনের মধ্যে মা'র জন্য একটা দারুণ অপমানের আঘাত লাগিল। তাহার চিরসহনশীলা সর্ব্বত্যাগিণী মায়ের প্রতি এ শ্লেষের বিদ্রূপ কাহারও পক্ষেই যে অশোভন ! অথচ তাহার বাবা খুব নিশ্চয় করিয়াই জানেন যে, এ রুমাল কাচান কার।

এবারও স্বর্ণলতার নিকট হইতে কোন কৈফিয়ৎ আদায় করা গেল না। তিনি যথাপূর্ব্ব মৌনী হইয়াই রহিলেন। নীলিমা অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথে তাঁহার স্তব্ধ নির্ব্বাক্ প্রস্তর-মূর্ত্তির একটা অস্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইতেছিল। তাঁহার পাতলা ও শুষ্ক ঠোঁট দুখানি পরস্পরে এমনই আঁটিয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় যে, বুঝি বাটালীর চাড় না দিয়া উহাকে আর এ জন্মে খুলিতে পারাই যাইবে না। নীলিমা কণ্ঠোত্থিত দীর্ঘশ্বাস সাবধানে নিরোধ পূর্ব্বক ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, 'বোবার নাকি শত্রু নাই !' কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঐ প্রবচনটির মর্য্যাদা আদৌ রক্ষিত হইল না, স্বর্ণলতার সহিষ্ণুতাপূর্ণ মৌনতার সকল সম্মানকে তুচ্ছতর করিয়া দিয়া অনুকূলচন্দ্রের হিংস্র ও কুটিল কণ্ঠ তীক্ষ্ণ শ্লেষের সহিত উচ্চারণ করিল—'বল না ? কথা কইছ না কেন ? বল ? কোন্ রাণীধীরাণী মহারাণীর ধোপে দু'খানা কাপড়ে কুলোয় না ? আবার রুমাল দিয়ে মুখ মোছবার দরকার হয় ? এত যার সখ, তাঁকে বলো, নিজে যেন গিয়ে

টাকা রোজগার ক'রে আনেন। তার বাবা শালা তো আর চোর দায়ে ধরা প'ড়ে যায় নি যে, বারমাস পাতর পাতর খাবার ভাত জোগাবে, কাপড় জোগাবে, আবার রুমাল জোগাবে এবং তার কাচাই জোগাবে। তিনখানা কাপড় কেন পরা হয়েছিল শুনি? রুমালই বা জুটলো কোত্থেকে?"

স্বর্ণলতার সেই প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তির সেই পরস্পর-সংযুক্ত ওষ্ঠাধর এবার ঈষৎ কম্পিত হইল এবং উহার মধ্য হইতে ধীর ও শান্তভাবে উত্তর বাহির হইয়া আসিল—"স্কুলে প্রাইজের দিন পরবে ব'লে একখানা আধময়লা সাড়ী বেশীর ভাগ কাচিয়ে নিয়েছিলেম।"

"বিবি বেসান্তের জন্যে! তাই বল! তা সেজে গুজে পরীটি হয়ে তিনি তো দিব্যি স্কুল-ঘর কর্‌চেন, একটা বরও তো কই এখন পর্য্যন্ত জোগাড় কর্‌বার নাম নেই! কি হলো তা হ'লে, আর তাঁকে এতদিন ধ'রে লেখাপড়া শিখিয়ে টিখিয়ে লায়েক ক'রে—যদি নিজের একটা হিল্লে লাগিয়ে নিতেই না পারলেন?"

নীলিমার পায়ের আঙ্গুলের ডগা হইতে মাথার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত যেন একটা ভীষণ লজ্জার প্রভাবে শিহরিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার শরীরের রক্তে সেই অকথ্য লজ্জার জ্বালা যেন আগুন হইয়া ধোঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। দাঁত দিয়া সে এমনই জোরে নিজের ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিল যে, তাহাতে তাহার ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িল।

তাহার মায়ের মুখ সে এখন আর দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তিনি যে এত বড় নির্লজ্জ অপমানেরও পর একটিমাত্র প্রতিবাদ করিলেন না, ইহাতে তাহার বাপেরও চেয়ে মায়ের প্রতিই অধিকমাত্রায় ক্রোধ ও অভিমান জন্মিল। এ কি অন্যায় চুপ করিয়া থাকা! সংসারে স্বামীই সব? মেয়ে কেউ নয়? বাপ হইয়া মেয়েকে এমন দুরন্ত অপমানটা করিলেন; অথচ ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য একটিমাত্র জিহ্বাও নড়িল না? নীলিমা না হয় মেয়ে হইবার অপরাধে এও সহ্য করিবে, কিন্তু তাহার মায়ের ত উচিত ছিল, তাঁহার হইয়া দুইটা কথা বলা! তবে কি মাও আর তাহাকে আগের মতন যথেষ্ট ভালবাসেন না? তাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? মা তো কখন নিজের পক্ষেও অপমানের চূড়ান্ত হইয়াও মুখ খোলেন না? তবে কি মিসেস গুঁইএর কথাই ঠিক? তিনি যে বলেন, হিঁদুর মেয়েরা কেবল লাথি-ঝাঁটা খাবার জন্যই জন্মিয়াছে। তাঁহারা ক্রীতদাসীর চাইতেও অধম, পালিত পশুর অপেক্ষাও অধীন এবং পোষা কুকুরের হইতেও প্রভুপদানত! তা মিথ্যাই বা কি? তাহার মায়ের যে অবস্থা সে আজন্ম ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে, সে আর এই মিসেস গুঁইএর বর্ণনা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি? এই হিন্দুর মেয়ের জীবন? জীবন্তেই ত তাহাদের নরকের দ্বারে বসিয়া কাটাইতে হয়, মরণের পরে যে নরকে যাইতে হইবে, সে আর এমন বিচিত্র কি? না, এর চেয়ে নিশ্চয়ই খৃষ্টধর্ম্ম ভাল। কিন্তু খৃষ্টও তো পুরুষকে "স্ত্রীজাতির মস্তক" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন?

ঘরের মধ্য হইতে অনুকূলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"দেখ, ও সব নবাবী আমার ভাত খেয়ে চল্‌বে না, তা তোমাদিগকে এই স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিচ্ছি। এক ধোপে তিন তিনখানা কাপড় কাচান? আমার বাপ কখন এমন কথা কানে শোনেনি। তা আবার একটা ধুম্বোধাড়ী মেয়ের জন্যে? গেছি আর কি! আর দেখ, চাকটাল-গুলোও একটু কম ক'রে খরচ করো, আমি কি শেষে তোমাদের জন্যে সিঁদকাঠি নিয়ে সিঁদ কাট্‌তে যাব নাকি? পাব কোথায়? আচ্ছা, আমার আবার এখুনি ইটখোলায় ফির্‌তে হবে। দাও দেখি এক গেলাস খাবার জল, পেটটায় কেমন ক্ষিদে ক্ষিদে বোধ হচ্ছে।"

নীলিমা ধীরে ধীরে সেখান হইতে অপসৃত হইয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার মনের মধ্যে একটা ভীষণ বিদ্রোহের ঝড়ের হাওয়া অবিরল বেগেই বহিতে থাকিল। মন তাহার পিতৃ-অবিচারের আঘাতে আঘাতে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। পূর্ব্বসঞ্চিত যতটুকু সম্বল—যতটুকু বিবেক-বুদ্ধি তাহার জমা করা ছিল, সেই সামান্য সঙ্গতির পুঁজি লইয়া সে এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্দ্দম আক্রমণকে প্রতি-রোধচেষ্টা যে করে নাই, তাও নয়; কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষের অজস্র শরক্ষেপে সে দুর্ব্বল চেষ্টা কোথায় যে ভাসিয়া গেল, তার খবরই রহিল না, শেষকালে নিজের কাছেই সে নিজে

পরাস্ত হইয়া এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়া ফেলিল যে, হিন্দু-ধর্ম্মে কিছুই সার নাই এবং হিন্দুধর্ম্মের উপাসক যাহারা, তাহাদের মধ্যটাও অতএব অসার হওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহার প্রমাণ তাহারই বাপ-মা। হিন্দু স্বামীর কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মবুদ্ধি যে কত বড় নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার উপর সংন্যস্ত, তাহা সে আজন্ম ধরিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে, আর হিন্দু-নারীও যে পুরুষের হাতের কত বড় খেলার পুতুল, তাহাও তাহার এক দিনের দেখা নয়। এই হিন্দুসমাজে স্বামি-স্ত্রী সম্পর্ক! এই হিন্দু-পুরুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, এই হিন্দু স্ত্রীর পাতিব্রত্য! এই যদি হিন্দু হওয়ার ফল হয়, অমন হিন্দুত্বে জলাঞ্জলি দেওয়াই সহস্রবার ভাল। তাহার মায়ের যে জীবন সে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে, একটা পাশবদ্ধ জন্তুর জীবনের অপেক্ষা সে জীবনে প্রভেদ কতটুকুই?

কিন্তু হিন্দু-সমাজের সকল পুরুষই কি তাহার পিতার মত হৃদয়হীন? সব নারীই কি তাহার মায়ের মত চির-অত্যাচার-পীড়নে জড়পিণ্ডে পরিণত? এ কথাটাও নীলিমার বিদ্রোহবিষে জর্জ্জরিত বিদ্বিষ্ট চিত্তে যে উদিত হয় নাই, তা নয়; কিন্তু ইহার সমাধান সে তাহার নিজের স্বল্প অভিজ্ঞতার মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পিতার অভদ্র আচরণে তাহাদের বাড়ীতে সহরের কোন ভদ্রপরিবারের মেয়েদের আসা যাওয়া কোন দিনই থাকিতে পায় নাই। বিশেষ কোন বড় সমারোহকার্য্যের নিমন্ত্রণ কদাচিৎ আসিলে লৌকিকতা দিবার ভয়ে অনুকূলচন্দ্র স্ত্রীকন্যাকে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দিত না। সহপাঠীদের বাড়ীতে কদাচিৎ কোন কিছু উপলক্ষে সে দু'তিনবার নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছে। সেইটুকুই তাহার হিন্দুসমাজের সহিত পরিচয়। তাহা ভিন্ন বাড়ীর আশেপাশের হিন্দু নামধেয় অন্ত্যজজাতীয় স্ত্রীপুরুষের কলহ-কাকলিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের কতকটা আভাস তাহার চোখে পড়িয়াছে। প্রকৃত হিন্দুর কি আশয়, কি আচরণ, সে সকলের কোন ধারণাই সে কোন দিনই দেখিতে পায় নাই। আজ নিজের সেইটুকু সঞ্চয়কে লইয়াই সে হিন্দুনারীর অবস্থা, তাহাদের আচার-ব্যবহার, তাহাদের আশা আগ্রহ এই সমুদয়ের বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া সে সেখানেও কোন কিছু একটা বড় জিনিষকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। নিমন্ত্রণ-গৃহে সে হিন্দুনারীকে অপরের পাতে মাছের মুড়া পড়িতে দেখিয়া নিজেকে খর্ব্ব বোধে অভিমানভরে ছল ধরিয়া অনাহারে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়াছে; প্রতিবাসিনীর অঙ্গে অলঙ্কারপ্রাচুর্য্য দেখিয়া নিজের কপালের ও অলঙ্কার-প্রদানে অসমর্থ 'পোড়ামুখো-'মিন্‌ষের প্রতি অজস্র গালি-বর্ষণ করিতে শুনিয়াছে। নিমন্ত্রককে বস্ত্রালঙ্কারের জাঁক-জমক দেখিয়া আদর-আপ্যায়নের তারতম্য করিতে দেখিয়াছে। কোন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর বর্ষীয়সী পত্নীকে তাঁহার দরিদ্র প্রতিবেশিনী সম্বন্ধে তীব্র ঘৃণার সহিত বলিতে শুনিয়াছে—"কেরাণী-ধ্যারানীদের বউএর সঙ্গে আমি কথা কইনে।"—তবে এই কি হিন্দুর সমাজ? হিন্দুনারীর কি এই সঙ্কীর্ণ শিক্ষা? অথবা ইহা ভিন্ন তাহাদের আর উপায়ই বা কি? পুরুষ তাহাদের কণ্ঠে চরণে লৌহনিগড় বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের সেবাদাসী মাত্র করিয়া রাখিয়াছে, কেমন করিয়া মুক্তবায়ুজাত বিশুদ্ধ জীবনের সহিত তাহারা পরিচিত হইতে পারিবে? মানবজীবনের প্রকৃত সার্থকতা কোথায়, তাহার কোন সংবাদই কি তাহাদের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীঘেরা জীবনের মধ্যে প্রবেশপথই পাইয়াছে? দু'খানা গহনা পরিয়া নিমন্ত্রণবাড়ীর বড় মাছের মুড়াটাকে উপভোগ করিতে পাওয়াই বোধ করি তাহাদের হিসাবে নারীজীবনের চরমপ্রাপ্তি!

নীলিমার চিত্ত একটা গভীর ব্যথায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। নিজের ধর্ম্মসমাজকে অপরের সহিত তুলনায় অত নীচে নামাইয়া দিতে বুকে তাহার কাঁটা ফুটিতেছিল, অথচ তা ভিন্ন আর যেন কোন পথই সে দেখিতে পাইল না। তাহাদের স্কুলের মেয়েরা—মিসেস গুই, মিসেস গুঁইএর সতীনঝি মিস্ এনা সরকার, সে মধ্যে মধ্যে তাহাদের মিশন স্কুলে বেড়াইতে আসে; এমন কি, তাহাদের অরফ্যানেজের হিন্দুস্থানী মেয়েগুলা, দাইয়া শুদ্ধ কেমন সতেজ, কেমন স্বাধীন, কেমন সুখচঞ্চল ও আত্মনির্ভরশীল! তাহার মা অকারণে তাহার বাপের কাছে কি অকথ্য লজ্জাকর লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিতা হইয়াও ঘৃণ্য অপরাধীর মত নীরবে নির্ব্বিবাদে সে লাঞ্ছনাকে বুকে তুলিয়া লইতেছেন, এমন কি, নিজের মেয়ের প্রতি হীন অবিচারকে পর্য্যন্ত এতটুকু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য বা শক্তি তাঁহার নাই, অথচ খৃষ্টান-স্কুলের একটা ক্ষুদ্র টিচারও সে দিন 'বড়মেমের' নিকট গালি খাইয়া আদালতে যাইবার ভয় দেখাইল। না; হিন্দুত্বে

পুরুষত্ব নাশ করে, নারীত্ব জড়ত্বে পরিণত হয়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে অবনত হইয়া পড়ে। এমন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিতে যাওয়া প্রবল মিথ্যাকে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দান, নীলিমা মিথ্যাকে—ছলনাকে একান্তমনে ঘৃণা করে। সে যাহাকে নিকৃষ্ট বোধ করিয়াছে, তাহার আশ্রয় গ্রহণ কখনই করিবে না। এবার অন্তরের সহিতই সে মিসেস শুঁই ও মিস হর্ণেলের কাছে স্বীকার করিবে যে, খৃষ্টধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সে যীশুখৃষ্টকেই মানিবে। দেবতার পূজা মনে মনেও আর করিবে না।

রাত্রে মায়ে ও মেয়েতে এক বিছানায় শুইত। নীলিমার যত কিছু মনের কথা এই সময়েই সে তাহার মায়ের কাছে সেগুলি নিবেদন করিয়া দিত। স্বর্ণলতা যথাসাধ্য তাহার প্রশ্নের সমাধান করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইতেন। ঘুমাইবার পূর্ব্বে নিজের কপালে মায়ের নীরস অধরের একটি স্নিগ্ধস্পর্শ সে প্রাণপণে কামনা করিত, যদি কোন দিন গভীর চিন্তার ভারে আচ্ছন্নচিত্তা মাতা সেটুকু দান করিতে ভুল করিতেন,পাওনাদার তাঁহাকে রেহাই দিত না। 'আঃ, মা! আজ আর ঘুম হবে না দেখ্‌ছি।' বলিয়া মা'র কোল ঘেঁষিয়া আসিত। তাহাতেও কার্য্য হাঁসিল না হইল ত অভিমানভরে 'তোমার আজ কি হয়েছে মা? আঃ, কি যে করছো?' এমনই করিয়া নিজের দিকে তাঁহার বিক্ষিপ্ত চিত্তটিকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিজের প্রাপ্যটুকু সে অনাদায়ী ফেলিয়া রাখিত না। বিশেষ করিয়া ধরিতে গেলে সমস্ত রাত্রিদিনের এইটুকুই তার প্রধানতম সম্বল। এ ভিন্ন আর মায়ের কোল, মায়ের আদর, মায়ের স্নেহ উপভোগ করিবার অবসর সে আর ভাল করিয়া কখন্ পায়? ভোরে উঠিয়াই মা তাহার ঘরের কাযে লাগিবেন, সে যতটুকু সাধ্য সে সম্বন্ধে তাঁহার সাহায্যে লাগিবে, তার পর নাকেমুখে ভাত গুঁজিয়া স্কুলে ছোটা, ফিরিবার অল্প পরেই প্রায় অনুকূলচন্দ্রের গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের কাল আসিয়া পৌঁছিয়া যায়। কারণ, তেল পুড়িবার ভয়ে এ বাড়ীর লোকরা কখনই সন্ধ্যার পরে বিছানার বাহিরে থাকে না।

আজ বিছানায় ঢুকিয়াও নীলিমা নিজের চিন্তাধারাতেই ভাসিয়া চলিল, মা যে কতক্ষণে আসিলেন, সে তাহা ভাল করিয়া জানিতেও পারিল না। স্বর্ণলতা অন্য দিন বিছানার মধ্যে প্রবেশপথেই মেয়ের নিবিড় আগ্রহে ভরা বাহুবেষ্টনে বদ্ধ হইয়া থাকেন, আজ মশারি গুঁজিয়া নিজের বালিসে মাথা রাখার পরও মেয়ের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া কিছু বিস্মিত, কিছু আশাহত ভাবে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবার পর মনে মনে এই সমাধান করিয়া লইলেন যে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আজ অপরাহ্নে নীলিমার মুখ দেখিয়া, তাহার শরীর যে আদৌ ভাল নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহার মনের মধ্যে যথেষ্টই শঙ্কা ও সংশয় জন্মিয়া উঠিয়াছিল, তাই এখন শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে মনে করিয়াই তাঁহার উদ্বেগশঙ্কিত ভীরু চিত্ত অনেকখানি স্বস্তি বোধ করিল। গভীরতর একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া তিনি অপর দিকে ফিরিয়া শুইয়া অত্যন্ত সাবধানে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন, ভয়—পাছে অসুস্থ কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হয়! নিজের অতৃপ্ত ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ চিত্ত যে বুভুক্ষু হইয়াই আজ পড়িয়া রহিল, তাহার জন্য মনের মধ্যে কিছু কি ব্যথা জাগে নাই? কিন্তু সে জাগিলেই কি হইবে, স্বর্ণলতা ত নিজের বলিতে কোথাও কিছু বাকী রাখে নাই। নিজের আশা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, কিছুরই ত তার বহিঃপ্রকাশ নাই। যা আছে, তা তাহার ঐ মৌন সুপ্তশান্ত বুকের অতলের মধ্যেই তলাইয়া আছে।

নীলিমার যখন মায়ের কথা মনে পড়িল, তখন তাহার বোধ হইল, মা তাহাকে তাহার চিরদিনের প্রাপ্য সেই সামান্য আদরটুকু পর্য্যন্ত না জানাইয়াই দিব্য নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন! তাহার মনে হইল, সে দিন যে মিস হার্ণকে বলিতেছিলেন, এ দেশের লোকদের মনে 'ফিলিং' জিনিসটা নাই। তারা এখনও সেই আদিম ভাবেই আছে, এর অর্থ তাহাদের মধ্যে সম্যক্‌রূপে জ্ঞানের বিকাশ নাই, তাই অন্যের মন বুঝিয়া মনের বিনিময় করিতে তাহারা জানে না; শুধু প্রতিপালিত জীববিশেষের মত গতানুগতিকভাবে চলিতে বা আদেশ পালন করিতে পারে। এ কথাগুলার মধ্যে আদৌ মিথ্যা বা অতিরঞ্জন দোষ নাই। সে দিন সে যে মিস হর্ণেলের প্রতি ইহার জন্য মনে মনে অতিমাত্রায় রুষ্ট হইয়াছিল, তার জন্য তাহার অনুতপ্ত হওয়াই উচিত।

সে দিন স্কুলে গিয়া সে মাথা ঝুঁকানর পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানী ও অন্য কয়জন বাঙ্গালী সহপাঠিকাদের দৃষ্টান্তে হাঁটু

গাড়িয়া বসিয়া মিসেস শুঁইকে নমস্কার করিল। যীশুর গান সে এত দিন মুখেই উচ্চারণ করিত, সে দিন প্রাণ দিয়া গাহিল, তার পর জিজ্ঞাসিত হইবার পূর্ব্বেই মিসেস শুঁইএর সামনে আসিয়া আপনা হইতেই বলিয়া বসিল, "আজ থেকে আমি আর দেবদেবী মানি না, একমাত্র যীশুখৃষ্টকেই এবার থেকে তাদের যায়গা দিলুম।"

তাহার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় মিসেস শুঁই কিছু বিস্মিত ভাবে তাঁহার মিট্‌মিটে চোখ চশমার পরকলার মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মুখে তাহার অস্বাভাবিক কিছু দেখা না গেলেও সেখানে যে গলার স্বরের সহিত একটা সামঞ্জস্য সুরক্ষিতই রহিয়াছে, সেটা সেই ছেলে-ধরা কার্য্যে বিচক্ষণা মহিলাটির বুঝিতে বাকী থাকিল না। তিনি অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া উঠিয়া উহাকে নিজের ছিটের গাউনের পকেট হইতে বাহির করিয়া একটা চকোলেট হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "এই নে। একটা চকোলেট খা।"

নীলিমা সেটা লইয়া একবার ইতস্ততঃ করিল, বারেক তাহার মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তার পর সে হঠাৎ কঠিন দৃঢ় হইয়া উঠিয়া সেটা টপ্‌ করিয়া নিজের মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিল। ইহার পূর্ব্বে তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া কাঠ হইলেও সে কোন দিন স্কুলের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক ঢোক জলপান পর্য্যন্ত করে নাই।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

যা'ব কি যা'ব না—মিছে এ ভাবনা

রোগশয্যার খেয়াল

২য় কিস্তি

(পৌষ-পার্ব্বণের তত্ত্ব)

[পূজার তত্ত্বে পাঠকবর্গকে নবরত্ন উপঢৌকন দিয়াছিলাম। পৌষের তত্ত্বে ত্রিরত্ন উপঢৌকন দিতেছি। এক ডজন পূর্ণ হইল। 'তেরো-স্পর্শ' (বড়দিনের সওগাত) লইয়া তের রত্ন হইলে এক ডজনকে baker's dozen মনে করিলেই হিসাবের গোল চুকিয়া যাইবে। (লেখকেরও তো এখন 'বেকার' অবস্থা !) রত্ন-সংখ্যা তের হওয়াতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই ; এই তো সে দিন (কার্ত্তিকের) 'বসুমতী'তে একুশ রত্নের সন্ধান পাইলাম। ফলতঃ তিন বা নয়ে রত্ন ফুরাইবার কথা নহে। কেন না, বসুমতী অনন্ত রত্নপ্রসবিনী !]

বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

(১) কাশী না ফাঁসি ?

অন্য অন্য বার কাশীবাস করিতে আসিয়া কাশী চাষ করিয়া ফেলি। (শুনিয়াছি, উদ্ভট বচনও আছে, 'কাশীতে হণ্টনং কুর্য্যাৎ।' এই হাঁটার চোটেই অর্থাৎ 'নিত্য যাত্রা'র ফলেই কাশীর বুড়াবুড়ীদের মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুঃ।) দশাশ্বমেধ-কেদার ঘাটে বৈকালিক বিচরণ তো ঘটেই, বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা-ঢুণ্ডি-শনৈশ্চর-সাক্ষিবিনায়ক এই পঞ্চদেবতার 'প্রাতরেব ইষ্টদর্শনম্' তো বটেই। ইহা ছাড়া আজ দশাশ্বমেধ-ঘাট শীতলা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে অসিসঙ্গম ; কা'ল মণিকর্ণিকা-ঘাট হইতে ঘাটে ঘাটে পঞ্চগঙ্গা-ঘাট (বরুণা-সঙ্গম পর্য্যন্ত ঘাটে ঘাটে হাঁটা ঘটে নাই) ; পরশু অসিসঙ্গমে নৃসিংহ-জগন্নাথ-দর্শন ; 'তরশু' বরুণাসঙ্গমে আদিকেশব-খড়্গবিনায়ক-দর্শন ; কোনও দিন পঞ্চগঙ্গা-ঘাটে বিন্দুমাধব-দর্শন (রোহণে কখনও সাহস হয় নাই) ; কোনও দিন গোপাল-মন্দিরে গোপালবিগ্রহ ও তাঁহার বহুমূল্য আসবাব-দর্শন,

কাশীর ঘাটের দৃশ্য।

কোনও দিন দুর্গাবাড়ী মেনকার বাড়ী, গুরুধাম, আনন্দবাগ, সঙ্কটমোচন; কোনও দিন অদ্বৈত-আশ্রম, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম, শান্তিকুঞ্জ, জ্ঞান-গেহ, হিন্দুকলেজ হইয়া কামাখ্যা-বটুকনাথ-পশুপতিনাথ বৈদ্যনাথ শঙ্কর-মঠ-দর্শনান্তে 'গৈবী' পর্য্যন্ত 'ধাওয়া' করা; কোনও দিন নাদেশ্বর-প্রাসাদ ও কুইন্স কলেজ; কোনও দিন 'রথতলা' ছাড়াইয়া বহু দূরে রাজা মতিচাঁদের বাগান, কোনও দিন একারোহণে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন, ইত্যাদি। ফলতঃ, ঘূরণ-চক্রের বিরাম থাকে না।

বিন্দুমাধবের ধ্বজা।

আর এবার কাশীবাস কাশীগ্রাস হইয়াছে (যেমন রাহু-গ্রাস কালগ্রাস)! শয়ন-কক্ষের কুক্ষি, রোগশয্যারূপ পূতনার ক্রোড়, আমাকে গ্রাস করিয়াছে; 'যাত্রা'য় বাহির হওয়া দূরে থাকুক, বিছানা হইতে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পায়ে ভর করিয়া দাঁড়ানও অসাধ্য হইয়াছে, নারায়ণের অনন্ত-শয্যা বা ভীষ্মের শরশয্যা বলিলে ছোট মুখে বড় কথা বলা হয়, (Blasphemy) দেব বা দেবকল্প মানবের অবমাননা করা হয়, তাই সে তুলনার কথা তুলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। নারায়ণের যোগনিদ্রা, আর আমার রোগনিদ্রা, না, না, রোগতন্দ্রা; অসহ্য যন্ত্রণার পর মধ্যে মধ্যে অবসাদ-বশতঃ ঝিমুনি আসে; যেমন চোরের রাত্রিবাসই লাভ, তেমনি আতুরের ঐ কাকনিদ্রা-টুকুই (dog-sleep) লাভ। ভীষ্মদেব শরশয্যায় পড়িয়া কত জ্ঞান-উপদেশ দিয়াছিলেন, কত তত্ত্বকথা বলিয়াছিলেন—আর আমি 'খেয়াল' ধরিয়াছি (ধ্রুপদ যে এই ক্ষুদ্র শক্তির অতীত), চুটকী-চটক চালাইয়া পাঠকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছি—অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য রোগযন্ত্রণা ভুলিতেছি। গুপ্ত-কবির পাঁঠা যেমন 'আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে', তেমনি আমিও নিজের দুর্দ্দশা লইয়া নিজেই রঙ্গ করিতেছি। (এবারকার উপমাটা বোধ হয় লাগসই হইল!) শেক্স্পীয়রের কথাটা বড় পাকা—'Misery makes sport to mock itself.'
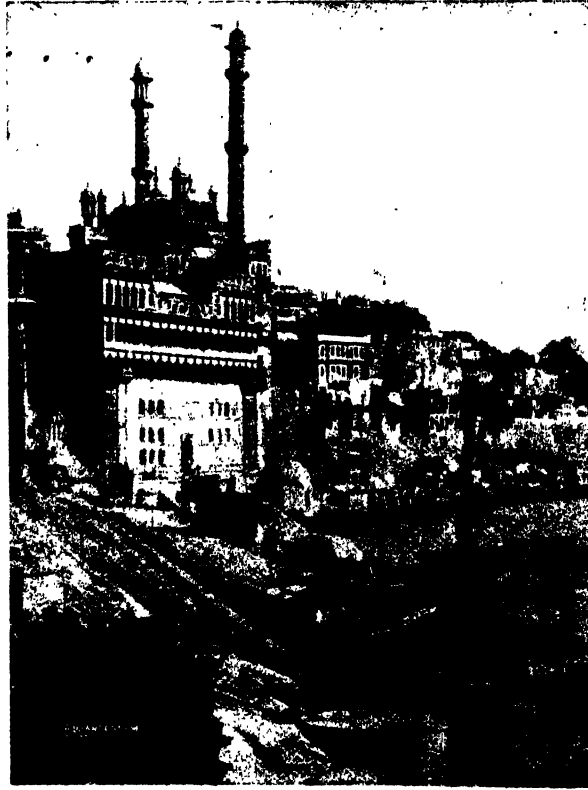
ভোঁসলা-ঘাট।

এবার কাশীবাস রাহুগ্রাসই বটে। বাস্তবিক, জ্যোতির্বীরাও বলিয়াছেন, রাহু আমার প্রতি বিরূপ; 'ক্রূর' কেতুও রাহুর শানাইয়ের সঙ্গে পোঁ ধরিয়াছেন, ইনি যে 'জয়কেতে!' ইহার উপর কুম্ভের কুঁজরোমিও আছে, আর স্বয়ং মঙ্গল অমঙ্গল ঘটাইতেছেন। (হা শম্ভু, তুমিও বাম! Thou too, Brutus!) আবার সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্র 'বক্র' হইয়া অর্থাৎ বাঁকিয়া বসিয়া ম্লেচ্ছভাষার 'গুরু মহাশয়' এ অধীনের ঘরশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, 'অন্যে খোজা প্রহরীদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ফলতঃ এতগুলি গ্রহের ফেরে পড়িয়া আমার দশা দাঁড়াইয়াছে—সপ্তরথিবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। তাই এবার কাশীবাস আর 'সুখের প্রবাস' * নহে, দুঃখের আবাস। কাশীবাস কাশীত্রাস হইয়া পড়িয়াছে। প্রহ্লাদের যেমন কৃষ্ণনামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত, তেমনি এই অধমের কাশীধামের আদ্যক্ষর 'ক অক্ষর' শুনিয়া পুলকসঞ্চার হইত। কিন্তু এবার পুলকের
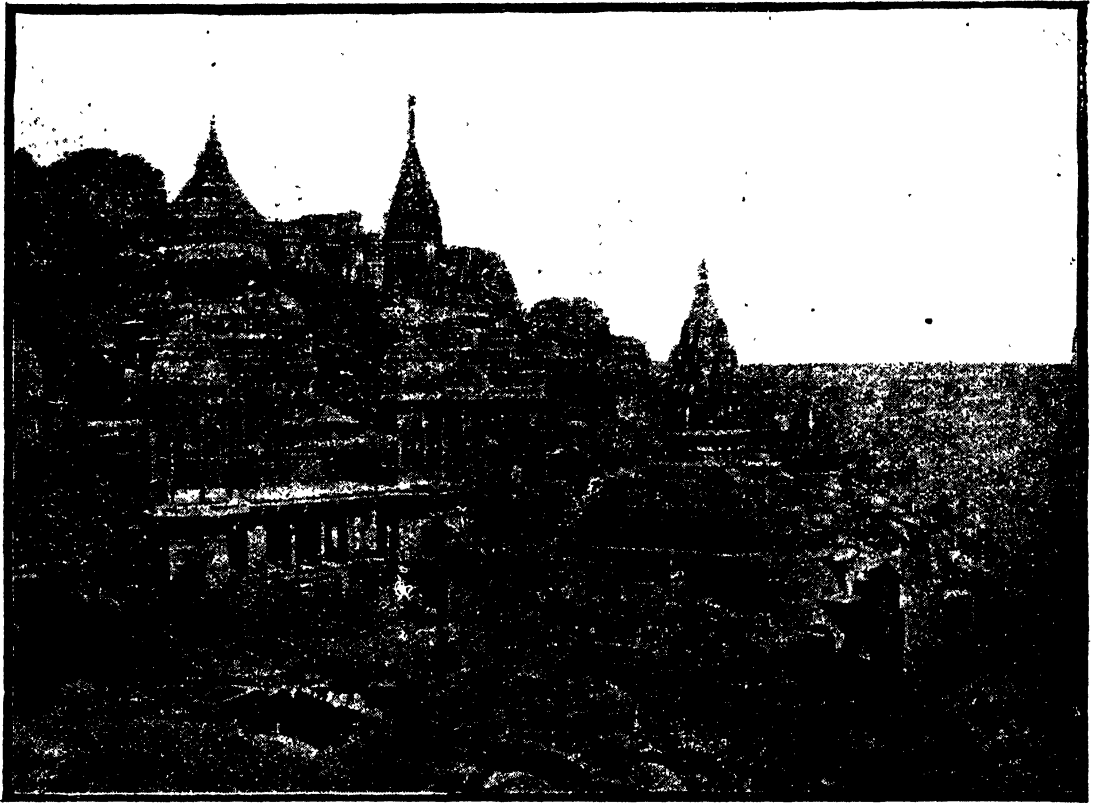
মণিকর্ণিকার শ্মশান-ঘাট।

পরে কা কথা।' অপিচ, চন্দ্র নিজে রাহুগ্রাসের যন্ত্রণা জানিয়াও আমাকে এই রোগগ্রাসে ফেলিয়াছেন। আর সবের সেরা, শনির দৃষ্টিও এই আতুরের উপর পড়িয়াছে। শনি যে-সে নহেন, 'যমাগ্রজ,' সুতরাং তাঁহার প্রতাপ যম-যন্ত্রণার উপরও এক কাঠি উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? অথচ জ্যোতিশাস্ত্রে নাকি লেখে, শনি ক্লীবগ্রহ। ক্লীবের এই দাপট—তুরকী অন্তঃপুরের (Turkish harem) পরিবর্ত্তে আতঙ্কের আবির্ভাব হইতেছে (যেমন জলাতঙ্ক!) 'যেষাং কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।'—এই তো চিরদিন জানিতাম। কিন্তু আমার এবার কাশীতে 'গতি' গতিকে অনন্ত দুর্গতি হইয়া দাঁড়াইল। অবিমুক্ত-ক্ষেত্রে 'গতি' হইলে † তো সদগতি অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্তিই

* লেখকের 'ফোয়ারা'র উক্ত-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† শুনিয়াছি, লেখকের কাশীপ্রাপ্তির গুজবও কলিকাতায়

দশাশ্বমেধ-ঘাট
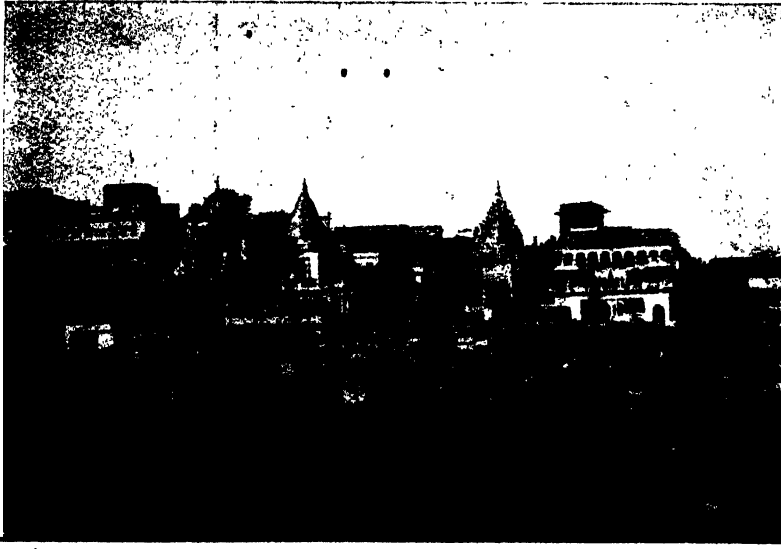
তো বটে। কাঁচিই বা বলি কেন? মাসগুলা তো সবই আষাঢ়ান্ত দিনের মত দীর্ঘ, ৩১।৩২ দিনের পাকি ওজনের, কোনটাই সোজাসুজি ৩০ দিনের নহে, কাঁচি ২৮।২৯ দিনের তো নহেই। পৌছানর পরদিন অক্ষয়তৃতীয়া ছিল, সে দিন নাকি সত্যযুগোৎপত্তি। কিন্তু আমার কপালে কলির প্রকোপে সত্যযুগের সুখভোগের পরিবর্ত্তে দুঃখভোগই ঘটিল। কোথায় কাশী-কোতোয়াল কালভৈরব কাশীর উৎপাত-গুলাকে (undesirables) ঝাঁটাইয়া কাশী হইতে তাড়ায়, গঙ্গাপার করিয়া দিয়া তবে ছাড়ে, আর আমাকে দেখিতেছি ধরিয়া বাঁধিয়া মারিতেছে। পড়িয়া পড়িয়া মা'র খাইতেছি, চোরের মা'র হজম করিতেছি, নিদারুণ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। এ যেন নাগপাশে বন্ধন, বত্রিশ বন্ধনে বত্রিশ নাড়ী টন্‌টন্ করিতেছে। ক্রূর গ্রহের এমনি নিগ্রহ, অবিরত কেবলই পাক দিয়া বিপাকে ফেলিতেছে। যখনই যাইবার দিন করিতেছি, হইত; কিন্তু পাপীর ভাগ্যে এমন সদ্গতি মিলিবে কেন? তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, কাশী না ফাঁসি?

(২) কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা

অগস্ত্য কাশী হইতে অগস্ত্যযাত্রা করিয়াছিলেন, আর আমার কাশীতে অগস্ত্যযাত্রা হইয়াছে। শুভ বৈশাখের পঞ্চম দিবসে এখানে পৌছিয়াছি; আর শ্রাবণ শেষ হইতে চলিল, স্থাণুবৎ অচল হইয়া এখানে আছি। পাকা চারি মাস না হইলেও কাঁচি

কেদার-ঘাট।

রটিয়াছিল। মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিলে নাকি আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। তাই বুঝি মৃত্যুঞ্জয় (fresh lease of life) জীবনের পাট্টা নূতন করিয়া দিয়াছেন। (মহামৃত্যুঞ্জয়-কবচ-ধারণের ফলেও এরূপ ঘটিতে পারে।) তা' যেরূপ ভুগিয়াছি, অন্য লোক হইলে টিকিত না, যাই কাঠপ্রাণ তাই মরি নাই। 'ভাগ্যে ভাগ্যে রহল পরাণ।' মরিব কেন? মরিলে তো সকল যন্ত্রণা ফুরায়। 'দুঃখ সংবেদনায়ৈব ময়ি চৈতন্য-মাহিতম্।' 'এ জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা।' সে দিন একটি বৈজ্ঞানিক মত দেখিলাম, স্থূলকায় লোক অল্পায়ুঃ হয়। চক্রী এই চিরদুঃখীকে দীর্ঘজীবী করিবার অভিপ্রায়েই সম্প্রতি কৃশকায় করিয়া দিয়াছেন। 'প্রভু বিষম দয়ালু,' 'Great are thy tender mercies, O Lord.!'

তখনই একটা না একটা বিঘ্ন ঘটাইয়া দিনটাকে পণ্ড করিতেছে। আর যাত্রিক দিনগুলাও কি লম্বা লম্বা অন্তরে—২৯।৩০ আষাঢ়, ১২।১৩।১৪ শ্রাবণ, ২৩।২৫।২৯।৩১ শ্রাবণ। ইহাও গ্রহের ফের। নিজে যদি মন্দের ভাল হইলাম, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা একে একে শয্যাগত হইতে লাগিল—ফোড়া, ডেঙ্গু, আমাশয়। ফলে, যাত্রা বন্ধ।

ললিতা ঘাট।

বৎসরখানেকের মধ্যে স্বাস্থ্য-লাভের জন্য তিন স্থানে গেলাম—গত গ্রীষ্মের ছুটিতে পুরীতে—সেই-খানেই রোগের সূত্রপাত করিয়া আসিলাম, পরন্তু পুত্র দুইটি বিষম টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইল, সেই অবস্থায় তাহাদিগকে লইয়া ফিরিলাম—ফিরিয়া কি কঠোর শাস্তি পাইলাম, তাহা বলিয়া আর পাঠকবর্গকে মনঃকষ্ট দিব না। তাহার পর, বড়দিনের বন্ধে বাঁকীপুর গেলাম, সেখানে একপক্ষ-কাল-বাসেই রক্ত-আমাশয় তো আবার চাগিলই, পরন্ত পা ফুলিল, 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' মানে মানে 'যঃ পলায়তি স জীবতি' নীতির অনুসরণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। তাল সামলাইতে মাস দুই গেল। একটু সুস্থ হইয়া শরীর সারার জন্য এবার গ্রীষ্মের ছুটি হইতেই কাশী ছুটিলাম। এই 'বার বার তিনবার' বায়ুপরিবর্ত্তনের চেষ্টায় শেষবার ফল সব্‌সে আচ্ছা হইল, যথেষ্ট আক্কেল হইল, অর্থনাশ মনস্তাপ রোগভোগের চূড়ান্ত হইল। তাই এবার সঙ্কল্প করিয়াছি, যো-সো করিয়া একবার কলিকাতা ফিরিতে পারিলে আর নেড়া বেলতলায় যায় না, 'ন গঙ্গদত্তঃ পুনরেতি কূপম্।' * কলিকাতার কূপমণ্ডূক হইয়া থাকিয়া প্রাণবায়ু বাহির হইবার উপক্রম হইলেও আর বায়ুপরিবর্ত্তনে বাহির হইব না। ভরা ভাদর না পড়িতে পড়িতে ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরিতে পারিলে বাঁচি।

মণিকর্ণিকা-ঘাট।

(৩) শম্বূকের দশা

স্কুলে পড়ুয়া-অবস্থায় তখনকার দিনে প্রচলিত বার্ণার্ড স্মিথের

* কাশী শিবের পুরী, আর শিবের বিল্বমূলে বাস। বৃদ্ধকালেশ্বরের কূপের জলও রোগীর জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জ্ঞানবাপীও স্মর্তব্য। ইতি 'অলমতিবিস্তরেণ সহৃদয়েষু।'
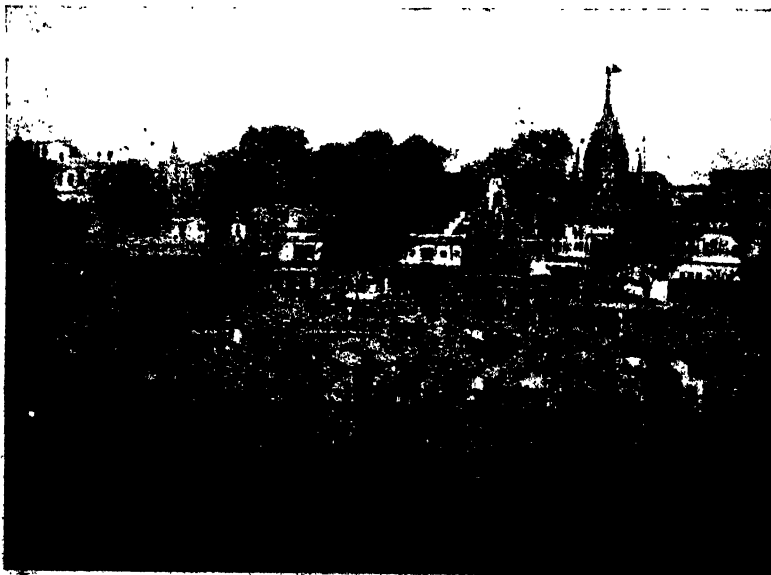
এরিথ্‌মেটিকে (চক্রবর্ত্তী চট্টরাজ গৌরীশঙ্কর বিপিন গুপ্ত তখনও গোকুলে বাড়িতেছেন) snailএর অঙ্ক কষিতে অনেক বেগ পাইতে হইত। তাই এই অকাল-বার্দ্ধক্যে অঙ্কশাস্ত্রের প্রায় আর সব ভুলিয়াছি, কিন্তু উল্লিখিত অঙ্কটি বেশ মনে আছে। (snail) শম্বূকের অদ্ভুত অভ্যাস—সে রোজ গাছে খানিক করিয়া উঠে, আবার খানিক করিয়া নামে; তবে যতটা উঠে, তা'র চেয়ে কম নামে। (এটা কিন্তু Gravitation অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের এক দিনের নামার পরিমাণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই সঙ্কেতে কিন্তু আমার মাথা আরও গুলাইয়া যাইত। শম্বূক শেষ দিন নামে না কেন? তাহার চিরজীবনের অভ্যাস, তাহার জাতীয়-প্রকৃতিগত সংস্কার (instinct) বদলাইয়া যাইবে কেন? উচ্চে উঠিয়া পায়াভারী হইবে? 'নীচঃ শ্লাঘ্যপদং প্রাপ্য' মদগর্ব্বে আর মাটিতে পা দিবে না? আসল কথা, একবার গাছের আগায় পৌঁছিলে অঙ্কের সমাধান হইল, তাহার পর শামুক নামুক বা উঠুক, বাঁচুক
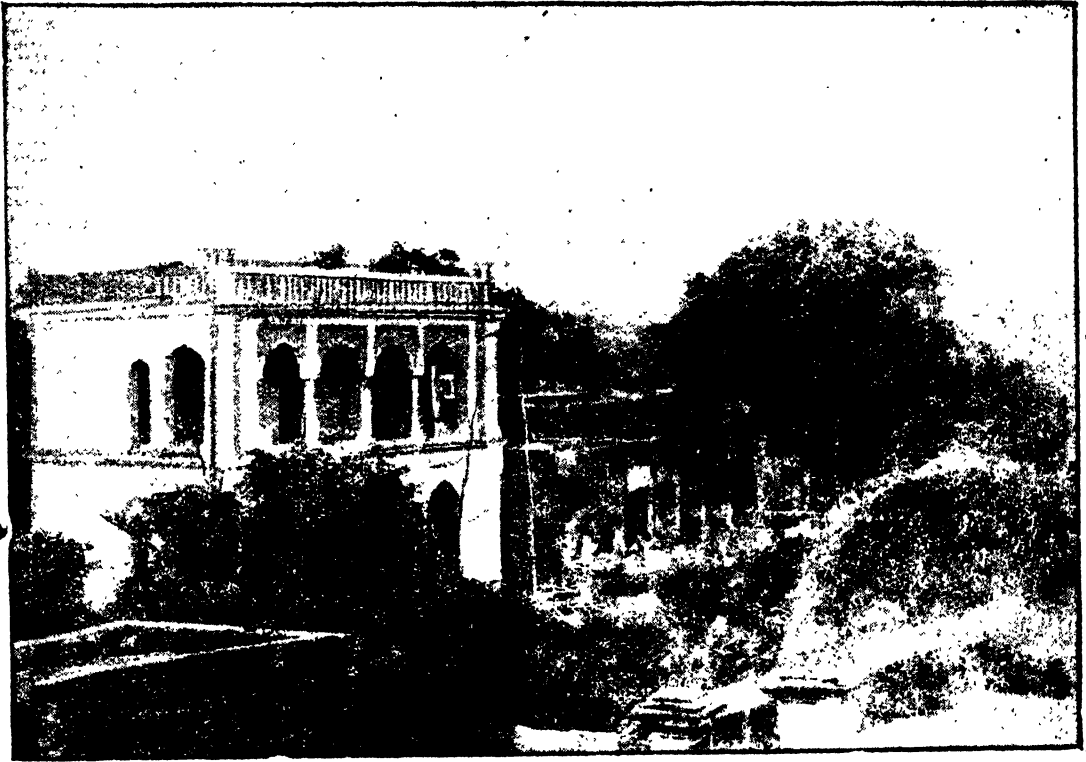
অদ্বৈতাশ্রম—লাটু মহারাজের মন্দির।

নিয়মের ঠিক উল্টা!) সুতরাং সে শেষে এক দিন গাছের আগায় উঠিয়াছিল। অঙ্কের প্রশ্ন—এইরূপ উঠানামার হিড়িকে সে কত দিনে গাছের আগায় উঠিবে? (অবশ্য গাছের উচ্চতা ও উঠানামার হার অঙ্কে প্রদত্ত আছে।) অঙ্কটা কষিবার সময় বড় গোলযোগ ঠেকিত, সোজাসুজি বিয়োগ ও ভাগ করিয়া কষিয়া গেলে উত্তরটি বইএর সঙ্গে মিলিত না। কষিবার একটি সঙ্কেত মাষ্টার মহাশয় শিখাইয়াছিলেন—শম্বূক শেষ দিন নামিবে না, অতএব বা মরুক, তাহার সহিত অঙ্কের আর কোনও সম্পর্ক নাই। কিন্তু এ ভাবে মাষ্টার মহাশয় কথাটা কোনও দিন বুঝান নাই। (যাক্, আর গুরুনিন্দা করিব না। এই সব পাপেই তো রোগভোগ দুঃখকষ্ট পাইতেছি। আর পাপের ভরা বাড়াইব না।)

আমারও দশা ঠিক এই শম্বূকের মতই। এক দিন বলসঞ্চয় করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেছি, আবার পরদিন রোগে পড়িয়া বলক্ষয়ে শয্যাশায়ী হইতেছি। তবে সঞ্চয়

বোধ হয় ক্ষয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, নতুবা খাড়া হইয়া উঠিতে, চলিতে ফিরিতে (যদিও টলিতে টলিতে) পারিতাম না। ঠিক শম্বূকের মতই উঠার হার পড়ার হার অপেক্ষা অল্প বেশী। অতি ধীরে ধীরে আরোগ্যের দিকে আগাইতেছি। 'শনৈঃ পন্থাঃ।' যথালাভ।

Snail, snail-slow হইলেও শেষটা গাছের আগায়, গন্তব্যস্থলে, goalএ, পৌছিয়াছিল। আমি কোনও দিন কলিকাতায় পৌছিব কি? সশরীরে না হইলেও, মনে মনে কলিকাতার পথে খানিক করিয়া আগাইতেছি, আবার রোগে পড়িয়া ধপ্ করিয়া সে পথ হইতে পড়িয়া যাইতেছি। (পুনঃ শম্বূক!) জানি না, কবে এ উঠানামার অন্ত হইবে? * শম্বূক হয় তো গাছের আগায় উঠিয়া আবার নামিয়াছিল। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, একবার ঠিকানায় পৌছিলে আর কখনও 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি'—বিবাহের বরযাত্রী হইয়াও নহে, সাহিত্য-সম্মিলনের বর হইয়াও নহে। †

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* উঠানামার কথায় বৈজ্ঞানিক-বৃন্দ হয় তো একটা গলদ ধরিয়া বসিবেন আর তুলনাটিতে খুঁত কাড়িবেন—শম্বূক উঠে গাছের আগার দিকে, upএ, আর নামে গাছের গোড়ার দিকে, downএ, কিন্তু আমার কলিকাতার দিকে down journey up journey নহে, যদিও uphill work বটে!

† পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, লেখক মহাশয় ভরা ভাদ্রের পূর্ব্বেই প্রাণে প্রাণে ঠিকানায় পৌছিয়াছেন।—সম্পাদক।

পতিতা

সন্ন্যাস ল'য়ে চ'লে গেল স্বামী নিশীথে ত্যজিয়া গেহ,
বালিকার ব্যথা জুড়াইতে ঘরে আর না রহিল কেহ;
কবে ঘুমঘোর দিয়াছিল তার অধরে অধর মিলে,
"নরকের দ্বার জানি' নারী" সার চলে গেল তাই ফেলে।

সম্বলহীন ক্ষুণ্ণ মলিন ধূলায় পড়িনু লুটি,
জানি না কখন শুকাল নয়ন, আবার দাঁড়ানু উঠি।
পোড়া রূপ ছিল লুকায়ে কোথায়, যৌবন সহ জোটে,
মদির বাসনা রুধিরের রাগে অধরে ঘনা'য়ে ওঠে।

স্বচ্ছ সুনীল উজল নয়ন আকুল আবেগে জাগে,
তুষারস্নিগ্ধ ক্ষুব্ধ উরস লুব্ধ পরশ মাগে;
অভাগীর যত উপবাসী আশা বক্ষে ছিল যা সুপ্ত,
মানিল না তারা বসনের কারা, রহিল না আর গুপ্ত।

ভুবন-ভুলান রূপের আগুন দহিল কি শেষে বিশ্ব!
লুটা'য়ে পড়িল পুরুষের প্রাণ পদতলে হ'তে নিঃস্ব।
শিক্ষিত যত ধনী অভিজাত চাতুরী খেলিল কত,
স্পষ্ট করিয়া এ দেহ মাগিল গ্রাম্য পামর যত।

রোষে অনুনয়ে কত অভিনয়ে সবারে বারিনু একা,
ছিল নাক জ্ঞান রমণীর মান শূন্যে সলিল-লেখা।

নিষ্ফল হয়ে কুৎসাতে মোর সঁপিল তাহারা প্রাণ,
গ্রামেতে রটিল আমি যে অসতী—সতীত্ব আমার ভাণ।
ঘরে থাকা হায় হ'ল মোর দায় এমনি সবার কথা,
শিহরি সরমে স্মরিনু চরমে মরমে পাইয়ে ব্যথা।

একদা নিশীথে বাহিরিনু পথে তরুণী রূপসী একা,
ভয়ে ভয়ে চলি গ্রাম দূরে ফেলি' পাছে হয় কারো দেখা।
মানস-মোহন তরুণ তাপস নয়নের পথে এল,
শুনি তার কথা, হৃদয়ের মাঝে তড়িৎ খেলিয়া গেল।

অনলের লেখা লালসার শিখা নয়নে যে তার জ্বলে,
না বুঝিয়া তাহা অভাগিনী আমি বিকাইনু পদতলে।
"বৈষ্ণবী রীতি—পরকীয়া প্রেম" কহিল "ধরম সার;
পরপ্রেমে গলে' এ দেহ বিকা'লে অবসান যাতনার।"

মূর্খ রমণী সূক্ষ্ম বুঝিনি জানিনি তাপস ভণ্ড,
নিমিষের ভুল মজাইবে কুল—রমণীর গুরুদণ্ড।
আঁধারের কথা গুপ্ত বারতা শুচি হ'ল মুছে ফেলি',
পূত যোগিবর যায় নিজ ঘর, অবহেলে মোরে ঠেলি।

অপরাধী প্রায় পড়িলাম পায় কহিলাম "যাবে কোথা"
"পতিতা যে তুমি" বলিয়া চলিল, আর না কহিল কথা!

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গাঙ্গুলী।

দর্শন-পরিচয়

ভবদুপগমশূন্যে মন্মনোদুর্গমধ্যে
নিবসতি ভয়হীনঃ কামবৈরিন্ রিপুস্তে।
স যদি তব বিজেয়স্তূর্ণমাগচ্ছ শম্ভো
নৃপতিরধিমৃগব্যং কিং ন কান্তারমেতি ॥

শ্রীশ্রী৺ ভগবান্ মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া দর্শনের কথা কিঞ্চিৎ বলিতেছি। প্রারম্ভে বিদ্যার প্রসঙ্গ;—দর্শন বিদ্যারই অন্তর্গত কি না। বিদ্যা একবিধ শিক্ষণীয়,—শিক্ষণীয় বিষয় দুই ভাগে বিভাজ্য—সহজ ও আগন্তুক। গমন, উপবেশন, শব্দোচ্চারণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় সহজ—প্রাণীর জন্মগত যে সংস্কার, তাহার ফলে এবং নিত্যসম্মুখীন আদর্শের প্রভাবে গমনাদির শিক্ষা হইয়া থাকে। সহজ শিক্ষার সহিত প্রাণীর অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই সহজাত শিক্ষা বিস্তৃত। ইহার বিষয়ও নিতান্ত অল্প নহে, তাহা হইলেও শিক্ষার বিশেষ রেখায়—বিদ্যার মধ্যে এগুলির স্থান নাই। তাহা না থাকুক, এই সহজ শিক্ষার ধারাই কিন্তু সর্ব্ববিধ শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। সহজের কথা ছাড়িয়া আগন্তুকের কথা ধরিতেছি। শিক্ষণীয় আগন্তুক বিষয়েরও দুই ভাগ;—বিদ্যা ও কলা। যে জ্ঞানের সহিত পরলোকের সম্বন্ধ আছে—সেই জ্ঞান যাহার শিক্ষা-সহায়তায় উৎপন্ন হয়, তাহাই বিদ্যা—আর পরলোকজ্ঞানের কারণ-পরম্পরার মধ্যে যাহার শিক্ষার স্থান নাই, তাহাই কলা। বিদ্যা অর্জ্জিত হইলে কতিপয় কলাকে পারলৌকিক অভ্যুদয়ে বিদ্যার সহকারিণী করা যায় বটে; কিন্তু তাহা পরলোকজ্ঞানের কারণ নহে।

পরলোকজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান বিষয় অবিনশ্বর আত্মা। আত্মতত্ত্বের উপদেশ বেদে আছে। বেদ কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই তিন ভাগে বিভক্ত। কর্ম্মকাণ্ডে আত্মতত্ত্বের উপদেশ সংক্ষিপ্ত, তবে পরলোকজ্ঞানের উপযোগী ভাব অনেক আছে, স্বর্গের কথা, দেবতার কথা, যাগযজ্ঞ, তাহার ফল বর্ণনা ইত্যাদি। উপাসনাকাণ্ডে উপাস্য তত্ত্ব ও জ্ঞানকাণ্ডে আত্মতত্ত্ব সবিস্তারে উপদিষ্ট। উপাস্যতত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের অনুগামী, বেদের বিবরণ বলিলেই হয়। বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র জানিতে হইলে ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি জ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং ব্যাকরণ প্রভৃতিও পরলোকজ্ঞানের সহায়। অতএব ইহাও বিদ্যার অন্তর্গত। বিদ্যা চারি প্রকার;—(১) আন্বীক্ষিকী, (২) ত্রয়ী, (৩) বার্ত্তা ও (৪) দণ্ডনীতি। কলা চৌষট্টি প্রকার—গীত, বাদ্য, নৃত্য, চিত্রকর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শিল্প। নৃত্যগীত প্রভৃতির পরিজ্ঞান পরলোকজ্ঞানের কারণপরম্পরার মধ্যে নাই। নৃত্য-গীত না জানিলেও বেদজ্ঞান ও তদ্দ্বারা পরলোকজ্ঞান ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বে যে চারি প্রকার বিদ্যা বলিয়াছি,তন্মধ্যে ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতির সাক্ষাৎসম্বন্ধে উল্লেখ না থাকিলেও বেদার্থজ্ঞানে তাহার উপযোগিতা আছে বলিয়া উহা বেদাঙ্গ; এই জন্য উহা (২) চিহ্নিত 'ত্রয়ী' বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। 'ত্রয়ী' ঋগ্ যজুঃ সাম। অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু, পদ্যগ্রথিত মন্ত্রই ঋক্ নামে প্রসিদ্ধ। অথর্ব্ববেদ পদ্যময়। ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রয়ীর বিবরণ বলিয়া তাহাও ত্রয়ী। (৪) দণ্ডনীতি বর্ণাশ্রমব্যবস্থার অনুকূল,—বর্ণাশ্রমব্যবস্থা না থাকিলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত হয়। দণ্ডনীতি রাজধর্ম্ম। মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়া যে পঠন, অনুবাদ দেখিয়া যে জ্ঞান চয়ন, তাহা অধ্যয়ন নহে, আমাদের শাস্ত্রানুগত অধ্যয়ন, গুরুমুখ হইতে গ্রহণ অর্থাৎ মূর্ত্তিমতী বিদ্যার উপাসনা। সহজ শিক্ষায় গমন, উপবেশন, শব্দোচ্চারণ, মাতৃভাষা ব্যবহার ইত্যাদি হইয়া থাকে; আগন্তুক শিক্ষায় সেই ধারা অনুবর্ত্তিত। সহজাত সংস্কারের অনুকূলতা লাভের সহায় বর্ণভেদ, পূর্ব্বকর্ম্মজনিত অদৃষ্ট যেমন জন্মে অভিব্যক্ত, তেমনই সংস্কারও অভিব্যক্ত হইবার যোগ্য। তবে যদি প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বসংস্কার প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ব্যাঘ্রপালিত মানবশিশুর উদাহরণ এ স্থলে স্মর্ত্তব্য। সেই প্রতিকূল অবস্থা না আসে, এই জন্যই আশ্রমব্যবস্থা। মাতার বা ধাত্রীর সাহচর্য্য যেমন সহজ শিক্ষায় কার্য্যকর হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবন্ত বিদ্যাবিগ্রহ গুরুর সাহচর্য্য এই আগন্তুক শিক্ষায় কার্য্যকর হয়। এরূপ

বিদ্যাশিক্ষা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচারবাহুল্যে হয় না। আমাদিগের টোলের শিক্ষাপ্রণালী সেই পুরাতন অধ্যয়ন-প্রথার ভগ্নাবশেষ, এখন পরীক্ষার প্রলোভনে সে ভগ্নাবশেষও অদৃশ্যপ্রায়, প্রতীচ্য শিক্ষার অনুচিকীর্ষা-প্রসূত ভস্মস্তূপ সেই ভগ্নাবশষকে আবৃত করিতেছে।

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"

ভগবান্ মনু এই বচনে স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞাদি নিষেধ করিয়াছেন। পৃথক্ অর্থাৎ পতিসাহচর্য্য ব্যতীত যজ্ঞ-ব্রতাদি স্ত্রীলোকের নিষিদ্ধ। বেদে যে দম্পতি-অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের সংবাদ আছে, মনু তাহার বিরুদ্ধে কথা ত বলেনই নাই, বরং সেই কথারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পতিশুশ্রূষা কেবল পতির চরণ-সংবাহন নহে, পতির সহ ধর্ম্মাচরণ প্রকৃত পতিশুশ্রূষা। সেই জন্যই মনুবচনে 'পৃথক্' পদ আছে। এ 'পৃথক্' পদটি অনর্থক নহে। 'নাস্তি স্ত্রীণাং যজ্ঞো ন ব্রতং' ইত্যাদি না বলিয়া যে 'পৃথগ্ যজ্ঞো"—ইত্যাদি বলিয়াছেন, তাহাতেই দাম্পত্যধর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তক ও তাহার অনুবাদে এ সকল দৃষ্টি হয় না, হয় কেবল 'বিদ্যামদ।' এ দেশের অধ্যয়ন-বিদ্যার্জ্জন বিদ্যামদের জন্য নহে; পরলোকজ্ঞানের জন্য। আমাদের প্রাচীন দণ্ডনীতির ব্যবহার থাকিলে এরূপ বিদ্যামদের অবসর থাকিত না। প্রকৃত বিদ্যার প্রসার হইত। দণ্ডনীতি এই ভাবে পরলোকজ্ঞানে সহায় (৩) বার্ত্তা ব্যতীত যজ্ঞোপযোগী পবিত্রান্ন উৎপাদনের জ্ঞান হয় না, যজ্ঞীয় অন্ন ব্যতীত অন্যবিধ অন্ন ভোজনে পরলোকজ্ঞানের যথার্থ অধিকারী হওয়া যায় না। অতএব পরলোকজ্ঞানের কারণ-পরম্পরার মধ্যে বার্ত্তাও অবস্থিত। বার্ত্তা—কৃষিবাণিজ্য-পশুপালন প্রভৃতি বিদ্যা। আর (১) আন্বীক্ষিকী দর্শন-শাস্ত্র। পরলোকজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের সাক্ষাৎ ফল, আত্মতত্ত্বের বিচার দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ আছে, অদৃষ্টবিচার আছে, পূর্ব্বাপর জন্মের কথা আছে। তদ্ভিন্ন বেদপ্রামাণ্য স্থাপন, প্রতিকূল তর্ক নিরাকরণ ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে ত্রয়ী প্রভৃতির সহায়তা দ্বারাও দর্শনশাস্ত্র পরলোকজ্ঞানের উপযোগী। এই জন্য সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী অদ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদ কৌটিল্য বলিয়াছেন—

প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং সেয়মান্বীক্ষিকী মতা॥

আন্বীক্ষিকী—সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ, সর্ব্বকর্ম্মের উপায় এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়।

পরলোকজ্ঞান—আন্বীক্ষিকী বিদ্যার ফল হইলেও—কেবল পরলোকজ্ঞানই এই বিদ্যার ফল, তাহা নহে,—কেবল যে কথার 'কচকচি,' তাহাও নহে,—তবে কি আন্বীক্ষিকী ইহলোক পরলোকের উপায়?

কৌটিল্য আন্বীক্ষিকীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—(১) সাংখ্য, (২) যোগ ও (৩) লোকায়ত। যোগ ও লোকায়ত সম্বন্ধে কোন কোন কথা আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি, কিন্তু তাহা আলোচনার্থ সূচনামাত্র। এ স্থানে সে সব কথার উল্লেখ করিব না। সিদ্ধান্তের আভাস এ স্থলে প্রদান করিব। জগতে যত প্রকার দর্শন ছিল, আছে এবং হইবে—তৎসমস্তই এই ত্রিবিধ আন্বীক্ষিকীর অন্তর্গত। সংখ্যা—সম্যক্খ্যাতি, দর্শনশাস্ত্রে-সম্যক্জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানই সম্যক্খ্যাতি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। 'অসৎখ্যাতি' 'অন্যথাখ্যাতি' ইত্যাদি স্থলে 'খ্যাতি' শব্দ জ্ঞানার্থে ব্যবহৃত, কেন না, উহা ভ্রমেরই নামান্তর। ভ্রম যে একপ্রকার জ্ঞান, তাহা নির্ব্বিবাদ, কিন্তু তাহা 'সম্যক্' নহে—সম্যক্খ্যাতি—সম্যক্জ্ঞান তাহা অভ্রান্ত বা প্রমা ইহা পুরুষের—আত্মার স্বরূপ; এই সম্যক্জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্রই সাংখ্য। বিশেষতঃ যে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানস্বরূপ ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই সম্যক্ অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশূন্য বলেন নাই, সেই শাস্ত্র সাংখ্য। এই সাংখ্য নাম ব্যাপক। কপিলোক্ত সাংখ্যদর্শন ও পতঞ্জলিকৃত সাংখ্যপ্রবচন দর্শন বা পাতঞ্জল এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত বেদান্তমতও এই সাংখ্যের অন্তর্গত। কৌটিল্যের বহু পরে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার আন্বীক্ষিকী বিভাগের মধ্যে শাঙ্কর মতও প্রবিষ্ট। সাংখ্যের নামান্তর চিদ্বাদ, প্রজ্ঞানবাদ বা চৈতন্যবাদ হইতে পারে। এই জন্য শাস্ত্রে আছে—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং", কেবল জ্ঞানের উপরেই সাংখ্য প্রতিষ্ঠিত। যোগ—কেবল জ্ঞান নহে—বা কেবল আত্মা নহে—অন্যেরও যোগ আছে—অন্য কি না জড়পদার্থ; তাহা আশ্রয় করিয়া যে মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা যোগ। চিদচিদ্বাদ বা চিজ্জড় ইহার

নামান্তর হইতে পারে। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি প্রচলিত মতে আত্মা অবিনশ্বর, আকাশও অবিনশ্বর, আত্মা চেতন, আকাশ জড়পদার্থ। কেবল আকাশ নহে, পরমাণু প্রভৃতি বহু জড়পদার্থই নিত্য, আত্মার বিশেষ গুণ সুখ-দুঃখাদি বিধ্বস্ত হয়, আকাশের বিশেষ গুণ—শব্দও বিধ্বস্ত হয়। পক্ষান্তরে, চেতন পরমাত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান যত্ন প্রভৃতির বিনাশ হয় না—জড়পদার্থ জলীয় পরমাণুর বিশেষ গুণ—রূপরস প্রভৃতিরও বিনাশ হয় না। এই যে জড় ও চিতের—এই যে সমাবস্থাপন্ন জড়চিতের যোগ—সম্বন্ধ—ইহা যে দর্শনশাস্ত্রের সম্মত, তাহা যোগ নামে খ্যাত। এই কারণে ন্যায়সূত্রভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন—'অসদুৎপদ্যতে' অসৎ-পদার্থের—পূর্ব্বে যাহা ছিল না, সেই পদার্থের উৎপত্তি 'যোগানাং' যোগমতে স্বীকৃত। বর্ত্তমান সময়ে যাহা যোগদর্শন নামে খ্যাত, তাহার 'অসদুৎপদ্যতে' এ মত নহে, সাংখ্যের ন্যায় সেই মতেও সতেরই উৎপত্তি। একটু পরিষ্কার করিয়া বলি,—ন্যায়,বৈশেষিক প্রভৃতির মত এই যে, যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে থাকে না,—মৃত্তিকা লইয়া ঘট গঠন করিতে হইলে মৃত্তিকা ভিজাইয়া মর্দ্দন করিয়া তাহা 'তাল' করিবে। তাহার পর তাহা পিটাইয়া পিটাইয়া ঘটের নিম্ন অর্দ্ধভাগ করিলে, অপর তালে ঊর্দ্ধ অর্দ্ধভাগ করিলে, ইহার মধ্যে যে অংশ বৃহৎ, তাহার নাম কপাল ও যে অংশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহা কপালিকা—সেই কপাল ও কপালিকা যোড় লাগাইলে তবে ঘট হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, যখন মৃত্তিকা, যখন মৃত্তিকার 'তাল', যখন কপাল কপালিকা, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘট ছিল না, যতক্ষণ ঐ কপাল-কপালিকার 'যোড় লাগান' বিজাতীয় সংযোগ না হইবে, ততক্ষণ ঘট হয় না—অতএব তখন ঘট 'অসৎ' তাহার উৎপত্তি হইল।

যোগসূত্র বা পাতঞ্জলমত, সাংখ্যমতের অনুরূপ। তাঁহারা বলেন,—ঘটের দুইটি অবস্থা ;—অব্যক্ত ও ব্যক্ত। ঘট—কপাল-কপালিকার সংযোগের পর ব্যক্তাবস্থায় উপনীত হয়, পূর্ব্বে তাহা অব্যক্তাবস্থাতে মৃত্তিকাতেও থাকে। যদি ঘট একান্তই অসৎ অথচ তাহার উৎপত্তি হয়, ইহা মানিতে হয়,তবে কপাল-কপালিকা কেন, আকাশ হইতেও ঘট হইতে পারে। যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি ত মানিয়াছই। তাহা যখন হয় না, তখন অসতের উৎপত্তি বলিও না। ঘটের অব্যক্তাবস্থা মৃত্তিকাবস্থা—সেই অব্যক্তাবস্থায় অবস্থিত ঘটেরই আবির্ভাব হইতেছে। আবির্ভাবের কারণ—কুলালের প্রযত্নাদি। ন্যায়, বৈশেষিক এ কথার উত্তরে বলেন—কোন্ কার্য্যের কি কারণ, তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছি, যাহা কারণ নহে, তাহা হইতে ঘটের উৎপত্তি হইবে কেন? আকাশ ঘটের কারণ নহে, সুতরাং তাহা হইতে ঘট হয় না। পূর্ব্বে 'অসৎ' হইলেও যখন ঘটের সমস্ত কারণ মিলিত হয়, তখন তাহা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়। বৈশেষিক প্রভৃতিকে 'যোগ' বলিলে 'অসৎ উৎপদ্যতে' 'যোগানাং' এই বাৎস্যায়ন-বাক্য সঙ্গত হয়।

অতএব যোগ নামে পরিচিত দর্শনশাস্ত্র যে পূর্ব্বে চিদচিদ্‌বাদপূর্ণ ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনকে বুঝাইত, তাহা নিশ্চয়। তবে একটিমাত্র কথা এই যে, কৌটিল্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রে যে 'যোগং' শব্দ আছে এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্যে যে 'যোগানাং' আছে—তাহা বিশুদ্ধ কি না 'যৌগং' এবং 'যৌগানাং' নহে ত? যৌগ শব্দ হইলে তাহা যুগ শব্দ হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে। যুগ—চিৎ—অচিৎ—এই দুই। হেমচন্দ্র সূরি যৌগ অর্থে নৈয়ায়িক বলিয়াছেন। যে পাঠই হউক, ফল যখন সমান, তখন সে সম্বন্ধে অধিক বিচার উপস্থিত করিলাম না। এখন এক আপত্তি এই যে,'সাংখ্য ও পাতঞ্জল উভয় মতেই যখন প্রকৃতিপুরুষ স্বীকৃত, প্রকৃতি অচেতন—পুরুষ চেতন—তখন চিদচিদ্‌-বাদীর মধ্যে ইঁহাদিগকেও ত গ্রহণ করা উচিত। ইহার উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; প্রকৃতিপুরুষ স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বা পরিণাম আছে—পুরুষের তাহা নাই—সুতরাং চিৎস্বরূপ যে পুরুষ, তাঁহার যে অপরিবর্ত্তন-শীলত্ব, তাহা আর কাহাতেও নাই। এই জন্য চিৎ শ্রেষ্ঠ, অচিৎ ইহার তুল্য নহে—এই ভাবে সাংখ্যমতে ও পাতঞ্জল-মতে চেতনবাদ প্রতিষ্ঠিত। লোকায়ত—জড়বাদ। চেতন পৃথক্ বস্তু নহে—জড়েরই অবস্থাবিশেষ। চৈতন্য দেহেরই ধর্ম্ম। চার্ব্বাক প্রভৃতির এই মত।

আন্বীক্ষিকী চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের উপায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষই এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থ। বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি প্রধানতঃ অর্থ ও কামের উপায়। অর্থপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা কামনা চরিতার্থ এই দুই বিদ্যার সাহায্যে হইতে পারে, অর্থ

দ্বারা ধর্ম্মার্জ্জনও হইতে পারে, রাজার দণ্ডনীতি অনুসরণে, ধর্ম্মস্থাপন ও স্বধর্ম্মাচরণ করা হয়। ত্রয়ী প্রধানতঃ ধর্ম্মের সাধন। ধর্ম্মাবলম্বনে অর্থ ও কামপ্রাপ্তিও ইহাতে হইয়া থাকে। ত্রিবিধ আন্বীক্ষিকীর মধ্যে সাংখ্য-আন্বীক্ষিকীর সাক্ষাৎ ফল মোক্ষ। যোগ-আন্বীক্ষিকী স্বর্গ ও মোক্ষের হেতু। স্বর্গের হেতু যাহা, তাহাই ধর্ম্মের উপায়। তাহার স্থূলভাবে প্রয়োগ—অর্থ ও কামপ্রাপ্তির হেতু। যোগ-আন্বীক্ষিকী বা পূর্ব্বমীমাংসা-ন্যায়-বৈশেষিক 'ত্রয়ী' তাৎপর্য্য পরিশোধিত করিয়া তাহার ভাবগ্রহণে বিশেষ সহায় হইয়া থাকেন। ত্রয়ীর পরিশুদ্ধ ভাগ গৃহীত হইলে তদনুযায়ী ধর্ম্মাচরণ ঘটিয়া থাকে, সেই ধর্ম্মের ফল,—কামনা সত্ত্বে স্বর্গ এবং নিষ্কামের চিত্তশুদ্ধি, ভক্তের ভক্তি, মুমুক্ষুর মুক্তি; কেন না, এই সকল দর্শনশাস্ত্র উপাস্য উপাসক ভাবের বিশেষ অনুকূল। বৈষ্ণবসম্প্রদায় এই মতেরই অনুবর্ত্তী। আর লোকায়ত আন্বীক্ষিকী 'বার্ত্তা' বিদ্যার এবং 'দণ্ডনীতি' বিদ্যার বিশেষ অনুকূল। যে বৈরাগ্য অর্থ-কামের বিরোধী, সাংখ্য-চিন্বাদ তাহার বিশেষ অনুকূল—তেমনই জড়বাদ তাহার প্রতিকূল, কাযেই অর্থ-কাম-সাধন বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির সহিত লোকায়ত মতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। লোকায়ত, লোকে যাহার বিস্তার বা প্রত্যক্ষের মধ্যে যাহার সীমা, তাহা লোকায়ত; সেই লোকায়ত সাধারণ মানবের বোধগম্য। পৃথিবী, জল, তেজ সকলই লোক প্রসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষ। তাহাকে উড়াইয়া পরিদৃশ্যমান ভোগ্য ও ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া অলৌকিকের অনুসন্ধান লোকায়ত করে না। তাই তাহারা কৃষি-বাণিজ্য, পশুপালন, শিল্পকলা এবং সমাজশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাজকীয় বিধি-নিষেধের পক্ষপাতী। এই লোকায়ত মতই প্রতীচ্যের প্রধান আশ্রয়। আমাদের দেশে ইহা প্রচলিত থাকিলেও ইহার অসীম আধিপত্য ছিল না, ইহাকে সাংখ্যের সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধে মিলিত হইতে হইয়াছিল। সাংখ্য গৃহস্বামী, লোকায়ত তাঁহার গৃহিণী। এই যে প্রেমপূর্ণ দাম্পত্য, ইহাই যোগ বা যৌগ। বৈরাগ্যের সহিত রাগ, নিবৃত্তির সহিত প্রবৃত্তি, ত্যাগের সহিত ভোগ সম্মিলিত হইয়া এই বর্ণাশ্রমকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল। যোগ বা যৌগ শাস্ত্রান্তর্গত ন্যায়শাস্ত্রে লোকায়ত মত ও উপেক্ষিত না হওয়াতে বরং সম্মিলিত হওয়াতে কোন সময় নৈয়ায়িক 'লোকায়তিক মুখ্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। (হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব, ৬৬ অঃ) যাহারা কেবল জড়বাদী, যাহারা ধর্ম্মাচরণের বিরোধী, তাহারা হীনলৌকায়তিক, নৈয়ায়িক তাহা নহেন—তিনি কেবল জড়বাদী নহেন এবং ধর্ম্মের বিরোধী নহেন, পরন্তু অর্থকামেরও বিরোধী নহেন—তাঁহারা এই জন্য লোকায়তিক মুখ্য। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে নিঃশ্রেয়স শব্দের ব্যাখ্যানস্থলে কথিত হইয়াছে—'যথাবিদ্যং বেদিতব্যং' বিদ্যা অনুসারে নিঃশ্রেয়স বিভিন্ন হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিদ্যায় নিঃশ্রেয়স মোক্ষ। অতএব ন্যায়দর্শনের পদার্থনির্দ্দেশ লোকায়তমতসিদ্ধ ঐহিক সুখ বা নিঃশ্রেয়সকে পরিত্যাগ করিয়া নহে। কেবল যে তাহাই নিঃশ্রেয়স—ধর্ম্মের ফল স্বর্গ ও জ্ঞানের ফল মোক্ষ যে নিঃশ্রেয়স নহে, তাহাও নৈয়ায়িক বলেন না, প্রত্যুত লোকায়ত নিঃশ্রেয়স অপেক্ষা স্বর্গ শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ অপেক্ষা মোক্ষ শ্রেষ্ঠ, ইহাই নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত। গৃহস্থ-পরিবারের সকল ব্যক্তি কিছু সমান হয় না, সকল পুত্র তুল্য হয় না। বিচক্ষণ পিতামাতা সৎপুত্রদিগের যেমন অনুকূলতা করেন, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলকে সৎপথে আনিতেও চেষ্টা করেন, তাহা বলিয়া কিন্তু তাহাকে একেবারে মোক্ষপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন না, একটা নিয়মের মধ্যে আনিতে যত্ন করেন, তাহাই গীতায় 'ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি' বলিয়া কীর্ত্তিত। যোগ বা যৌগ দর্শনের একটা ধারা সেই ভাবে প্রবাহিত। ন্যায়দর্শন সেই ধারা জগতে অর্পণ করিয়া দর্শনরাজ্যে সিংহাসন লাভ করিয়াছেন।

যেমন পুস্তকের উপদেশ মাত্র পাঠ করিয়া চিত্রকর্ম্ম শিক্ষা করা যায় না, সেইরূপ রচনাপাঠেও দর্শনশাস্ত্রে বা কোন শ্রেষ্ঠ বিদ্যাতে অধিকারী হওয়া যায় না। যাহা কলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বিদ্যার আক্ষরিক জ্ঞান পুস্তকের সাহায্যে হইতে পারে, আন্তরিক জ্ঞান গুরুসাহায্য ব্যতীত ঘটে না।

লোকায়ত মত খাঁটি চার্ব্বাকমত, পরলোকের প্রতিকূলে তর্ক উত্থাপন করিয়াই পরলোকজ্ঞানের হেতু হইয়াছে, এই জন্যই তাহারও বিদ্যা সংজ্ঞা। সে বিদ্যাও কেবল পুস্তক পাঠে হয় না। তবে লোকায়ত বলিয়া তাহা অন্য বিদ্যা অপেক্ষা অল্প আয়াসে আয়ত্ত হয়, এই যা প্রভেদ। এটুকু দর্শনপরিচয়ের উপসংহার।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

২

স্বদেশীর সময় সমগ্র ভারতের দৃষ্টি অশ্বিনীকুমারের দিকে স্তব্ধ হইল। তাঁহারই নেতৃত্বে এক বৎসরে বরিশালে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ৩ কোটি টাকা কমিয়া গেল। বরিশালের বিভিন্ন স্থানের ৫২টি বিদেশী সুরা-বিপণির মধ্যে ৫২টির মালিকেরাই ক্রেতার অভাবে দোকান বন্ধ করিল। ফুলারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মাত্র ১টির জীবন কোনও মতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল। স্বদেশীর আবর্ত্তে অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে অনেক বিলাসী ব্যসনী ধনীর দুলালও সুরার মোহ একেবারেই ত্যাগ করিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও বিবাহে কিংবা শ্রাদ্ধে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে সাহসী হইল না। ফুলার আসিয়া বরিশালের নিরীহ নগরবাসিগণের প্রতি গুর্খা লেলাইয়া দিলেন। মুক্ত তরবারি হস্তে বরিশালের রাস্তা দিয়া আগে আগে চলিলেন—গুর্খাদিগের শ্বেত পরিচালক, বৃটিশ কাপ্তেন। পশ্চাতে চলিল অস্ত্রপাণি, প্রভুর আদেশ নির্ব্বিচারে প্রতিপালনে অভ্যস্ত, নিরক্ষর, নির্ম্মম, নির্ভীক, হিমালয়ের পার্ব্বত্য সৈনিকের দল। রাস্তার লোকের মাথা কাটিল, বিপণির পর বিপণি লুণ্ঠিত হইল, রমণীর সম্মানও অক্ষুণ্ণ রহিল না। কিন্তু এত অত্যাচারেও বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড়ের, বিলাতী লবণের ক্রেতা বা বিক্রেতা জুটিল না। অশ্বিনীকুমার-পরিচালিত বরিশাল লাঞ্ছিত হইল, কিন্তু স্বদেশী সাধনায় সমান অটল রহিল। প্রেতের ভ্রূকুটি তাঁহার শব-সাধনা ভঙ্গ করিতে পারিল নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেটের পর ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী হইল, ফুলার চলিয়া গেলেন, হেয়ার আসিলেন, হিন্দু-মুসলমানে ভেদমন্ত্র প্রচারিত হইতে লাগিল, অশ্বিনীকুমার লাঞ্ছিত হইলেন। কনফারেন্স ভাঙ্গিল, কিন্তু বরিশাল টলিল না। তখন জন বুলের যোগ্য প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট বুলারের মাথায় নূতন বুদ্ধি যোগাইল। তিনি স্থির করিলেন, নূতন বাজার বসাইয়া বিলাতী পণ্যের প্রচলন করিতে হইবে। সরকারের মর্জ্জি হইলে স্থানেরও অভাব হয় না, টাকারও অকুলন হয় না। স্থানও পাওয়া গেল, সারি সারি দোকানঘরও নির্ম্মিত হইল, এমন কি, নহবতখানাও প্রস্তুত করিতে ত্রুটি হয় নাই। বুলারের বাজারে কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যের। তামাসা দেখিতেও বরিশালের বালখিল্যেরা বুলারের বাজারে যায় নাই। সরকারের শক্তি অশ্বিনীকুমারের শক্তি দ্বারা এমনই সংযত, প্রতিহত, পরাজিত হইয়াছিল।

যিনি এমন অঘটন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন, সুপ্ত জাতির নয়নে যিনি জাগরণের চাঞ্চল্য আনিয়াছিলেন, উদাসীনের প্রাণে যিনি দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইয়াছিলেন, তিনি যে অসাধারণ মহাপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন, অশ্বিনীকুমারের প্রতিভা ছিল না। হয় ত ছিল না। চুলচেরা হিসাব করিলে দেখা যাইবে, ও ধরণের প্রতিভা খ্রীষ্টেরও ছিল না, বুদ্ধেরও ছিল না। প্রতিভাবান্ পণ্ডিত বিশ্বম্ভর বিদ্যাসাগরের নাম আজ নদীয়াবাসী ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রতিভার পথ হেলায় পরিহার করিয়া যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উদগ্র উল্লাসে প্রেমের পথে নাচিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা আজও বাঙ্গালার ঘরে ঘরে হইতেছে। বরিশালের সৌভাগ্য, অশ্বিনীকুমারের প্রতিভা ছিল না, অথবা থাকিলেও তিনি তাহার উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করেন নাই। প্রতিভা হয় ত তাঁহার ও বরিশালের নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করিত। প্রতিভা হয় ত বরিশালের নির্ধন ভিখারীর নিকট তাহার চিরমুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিত। প্রতিভা হয় ত তাঁহাকে টানিয়া লইত নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে; প্রেম তাঁহাকে আনিয়াছিল একবারে সকলের মধ্যে। বরিশালের সকলেরই নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারের কোল ঠিক ধরণীর মতই সমান আদরে পাতা ছিল। তাই ত সকলে তাঁহার আদেশের এতটুকু অন্যথা করিতে পারে নাই।

নেতা হইবার জন্য যতগুলি গুণের দরকার, তাহা অশ্বিনীকুমারের সকলই ছিল। তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে কখনও অসামঞ্জস্য দেখা যাইত না। এক দিন বেলা দ্বিপ্রহরে

আহারান্তে অশ্বিনীকুমার তাঁহার বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, এক জন দরিদ্র মুসলমান বেঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ঘরে তখন আর কেহ ছিল না। সেখানে আসবাবেরও বিশেষ বাহুল্য নাই। খান-দুই কেদারা। কবে তাঁহাকে কে এক জন একটা তিব্বতী মেষের চামর উপহার দিয়াছিল, না ছিঁড়িয়া যাওয়া পর্য্যন্ত সেটাই কখনও এ চেয়ারখানা, কখনও ও চেয়ারখানার কাঁধে ঝুলিত। খান দুই টেবল। তাহার উপর কানিংহামের 'ভিলস টোপস' হইতে টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ পর্য্যন্ত নানা জাতীয় কেতাব এবং টাটকা ও বাসি ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আনীত নানা ভাষার বিবিধ খবরের কাগজ নিতান্ত বিশৃঙ্খল-ভাবে চিঠিপত্র, দোয়াত-কলম প্রভৃতির সহিত ছড়ান। একখানা বেঞ্চ আর একখানা তক্তা-পোষ। তক্তাপোষ-খানির উপর একটা সতরঞ্চের উপর সাদা চাদর বিছান, গোটা দুই তাকিয়া-বালিস। ঐখানেই অশ্বিনীকুমার বসিতেন। বালিসের প্রয়োজন হইত আহারান্তে একটু বিশ্রামের জন্য। মুসলমান কৃষকটিকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমার আর তক্তাপোষের দিকে গেলেন না। বেঞ্চের উপর সেই অজ্ঞাতকুলশীল কৃষকের কাঁধে হাত দিয়া বসিলেন; বলিলেন—"কি ভাই, অনেকক্ষণ একলা বসাইয়া রাখিয়াছি বোধ হয়।" মুসলমান কৃষকটি আনন্দে গদগদ হইয়া উত্তর দিল—"বাবু, আপনার কাছে আসিয়াছিলাম একটা প্রশ্নের মীমাংসা করিতে, কিন্তু না জিজ্ঞাসা করিতেই তাহার জবাব মিলিয়া গিয়াছে। আপনারা বক্তৃতায় সময় বলিয়া থাকেন, আমরা সকলে সমান, সকলেই ভাই ভাই। আমার সন্দেহ হইয়াছিল, সে কথাটা সত্য কি না, কিন্তু আপনি যখন আমার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে আমার কাঁধে হাত দিয়া বসিলেন, তখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। বাবু, আপনাকে সেলাম!" অশ্বিনীকুমার যে সত্য সত্যই সকল মানুষকে সমান মনে করিতেন, তাহার ইহা অপেক্ষাও বড় প্রমাণ তিনি দিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীর পায়খানা পরিষ্কার করিত গোপাল মেথর। গোপাল মদ্যপান করিত; সকল মেথরই করে। কিন্তু সকল মানুষ দোষ বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণের বিচার করে না, করিতে পারে না। সরলধর্ম্মী অশ্বিনীকুমার পারিতেন। তিনি দেখিতেন, প্রত্যহ ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক, গোপালের কর্ত্তব্যে এতটুকু ত্রুটি হইবার যো নাই। এক দিনও তাহার কায সারিতে দেরী হয় না, এক দিনও সে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অবহেলা করে না। অশ্বিনীকুমার মুগ্ধ হইলেন, বড়মানুষ মনিব মেথরের উপর খুসী হইলে তাহার কিছু বক্‌সিস মিলিতে পারে—একখানা কাপড়, একটা জামা, গোটা দুই টাকা। গোপাল এ সকলের কিছুই পাইল না, সে পাইল অশ্বিনীকুমারের কোল। এক দিন প্রত্যূষে বিষ্ঠার ভাড় মাথায় করিয়া গোপাল বাহির হইয়াই দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাবু! বাবু ডাকিলেন, "গোপাল তুই আয়! তুই আমার কোল দে!" সে অবস্থায় গোপাল কেমন করিয়া বাবুর কাছে যায়। সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু যাইতে তাহাকে হইল,

সস্ত্রীক অশ্বিনীকুমার।

অশ্বিনীকুমার গোপালকে বুকে টানিয়া লইতে আসিয়াছিলেন, তাহাকে বুকে না ধরিয়া তিনি ফিরিলেন না। রামায়ণের কবি বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রের কাহিনী গাহিতে গাহিতে তাঁহার মহত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন, তিনি চণ্ডাল অনার্য্য গুহককে কোল দিয়াছিলেন। সে ত্রেতাযুগের কথা। জরা কলিতে অশ্বিনীকুমার গোপাল মেথরকে কোল দিয়া নবপ্রেমের যে মহিমময় আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা কি ত্রেতার তুলনায় কখনও নিষ্প্রভ হইবে?

কাহাকেও তিনি ব্যথা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার আদর পাওয়া সৌভাগ্যের কথা বটে, কিন্তু সে সৌভাগ্য সকলেই অর্জ্জন করিতে পারিত। এক শিখ যুবক আসিয়া দেখিল, অশ্বিনীকুমারের টেবলের উপর ছড়ান অন্যান্য কেতাবের মধ্যে একখানি গ্রন্থ-সাহেব রহিয়াছে। যুবক ক্ষুণ্ণ হইল, বলিল, "বাবু, আপনার কাছে গ্রন্থ-সাহেবের এমন অনাদর হয়? এ গ্রন্থ কি এমন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে আছে? ইহাকে গদির উপর চারিদিকে তাকিয়া দিয়া রাখিতে হয়।" অশ্বিনীকুমার অবশ্য মনে করিতেন না যে, তাঁহার নিকট গ্রন্থ-সাহেবের অমর্য্যাদা হইয়াছে, তিনি যে যত্নে ভাগবত রাখিয়াছেন, গ্রন্থ-সাহেবও তাঁহার নিকট তদপেক্ষা কম যত্ন পায় নাই। কিন্তু সুদূর পঞ্জাব হইতে আগত এই শিখ যুবককে ব্যথা দিতে তিনি পারিলেন না। সেই দিন হইতে গ্রন্থ-সাহেব গদিতে বসিল। যাহার মন রক্ষার জন্য এত তাড়াতাড়ি গদি প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সামান্য এক জন দ্বারবান। অশ্বিনীকুমারের বসিবার ঘরে একটা পেন্সিলে আঁকা গণ্ডারের ছবি ছিল। সেখানি তিনি ভাল করিয়া ফ্রেমে আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। বহু আয়াসে সংগৃহীত অনেক বিলাতী ছবি সে ঘর হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু গণ্ডার তাহার স্বস্থানে অচল অটল। একটি ছাত্র তাঁহাকে এই ছবিখানি উপহার দিয়াছিল, তাহার অনাদর কি অশ্বিনীকুমার করিতে পারেন?

ভক্তিযোগে অশ্বিনীকুমার।

তিনি বরিশালের নেতা, তাই বরিশালের একটি গ্রামও তাঁহার অপরিচিত ছিল না। কোন্ গ্রামে কাযের লোক কে আছে, তাহা তিনি এক নিমিষে বলিয়া দিতে পারিতেন। কোন্ গ্রামে যাইবার সহজ পথ কোন্‌টি, তাহা তিনি যেমন জানিতেন, বরিশালের সহরের লোকের মধ্যে আর কেহ তেমন জানিত না। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্ব্বে আমি আমার একটি তরুণ ছাত্র বন্ধুকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ আলাপের পর অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে?" ছাত্রটি মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের ছোট গ্রামটা অশ্বিনীকুমারের অপরিচিত। সে বলিল, "আজ্ঞে,—এর কাছে।" "আরে, নামটাই বলিয়া ফেল না?" নাম যখন বলা হইল, তখন অশ্বিনীকুমার সেখানকার চারি পাঁচ জন ভদ্রলোকের নাম করিয়া তাঁহাদের কাহার সহিত ছাত্রটির কি সম্পর্ক, কে কোথায় কি করিতেছেন, কেমন আছেন, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা উভয়েই অবাক্!

যিনি তাঁহাদের সকল খবর রাখেন, সকল অভাব অভিযোগ দূর করেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন আসে যাঁহার নিকট হইতে, কলেরার সময় চিকিৎসক পাঠান যিনি, যাঁহার হিন্দুমুসলমানে ভেদ নাই, গোপাল মেথরকেও যিনি প্রেমে

গদগদ হইয়া কোল দেন, তাঁহাকে ত বরিশালবাসী দেবতা জ্ঞান করিবেই। নূতন গাছের প্রথম ফলটি তাই বরিশালের গৃহস্থ সুফলের আশায় অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে মানত করিত। যে ব্যাপারীর আলের গুড় কেবল পুড়িয়া যায়, সে-ও প্রথম ভাল গুড়খানা "বাবুর" নামে রাখিয়া দিত। আমি নিজে জানি, মৃত্যুশয্যাশায়ী পুত্রের জননী আকুল হইয়া অনুনয় করিয়াছে—"ওরে, অশ্বিনী বাবুকে আনিয়া দে, তাহার পায়ের ধুলা পাইলেই বাছা আমার আরাম হইবে।" আরও জানি, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত বরিশালে প্রবাসী এক সরল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমারের মুক্তির জন্য অশ্বিনীকুমারের নামে পুরিতরকারীর ভোগ মানত করিয়াছিল। এই দীন লেখক নিজে সে ভোগের প্রসাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের প্রাণ ছিল, প্রেম ছিল, কিন্তু আরও গুণ না থাকিলে তাঁহার আদেশ ব্যতীত বরিশালের ব্যবসায়ী শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের নিকট বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় করিতে অসম্মত হইত না। গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লওয়ার বিদ্যাটা ব্রজমোহন দত্তের পুত্রের একেবারেই অনধিগত ছিল। যাহারা তাঁহার হুকুম মানে, যাহারা তাঁহার নামের দোহাই দেয়, তাহাদের ভুলভ্রান্তি কেমন করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তাহাদের কৃত কর্ম্মের সকল দায়িত্ব সানন্দে বহন করিতে তিনি কখনও ইতস্ততঃ করেন নাই, করিলে তাঁহার নির্ব্বাসন হইত না। স্বদেশীর সময় হিন্দুস্থানী রজকরা বলিল, বিলাতী কাপড় ধুইতে নারাজ হইলে জমীদার যদি আমাদের জায়গা না দেয়? অশ্বিনীকুমার বলিলেন, "যায়গা আমি দিব, কোন অত্যাচার হইলে আমি রক্ষা করিব"। বাবুর কথার নড়চড় নাই, রজকরা নিশ্চিন্তচিত্তে ঘরে ফিরিয়া গেল। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে শক্তি অনুসারে রুচি অনুসারে বিভিন্ন কাযের ভার দিতেন। সে পথে যাহাতে তাহারা চলিতে পারে, তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য সকল অভিযোগ, সকল গঞ্জনা তিনি নিরুদ্বেগে সহ্য করিতেন। এক দিন তিনি একটি রুগ্ন বন্ধুর স্বাস্থ্যসমাচার লইতে গিয়াছেন। কথায় কথায় তাঁহার একটি প্রিয় ছাত্রের কথা উঠিল। সেই ছাত্রটি রুগ্ন বন্ধুর আত্মীয়। তাহার পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত অস্বচ্ছল। কিন্তু ছাত্রটির এক জন নিকট-আত্মীয় দীর্ঘকাল পুলিস বিভাগে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া সেই সময় অবসর গ্রহণ করিতেছেন। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, তাঁহার বিশ্বস্ততার পুরস্কারস্বরূপ তিনি তাহার একটি আত্মীয়কে পুলিস বিভাগে গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। কিন্তু ছাত্রটি নিত্য অশ্বিনীকুমারের কাছে যায়। একটা গুরু কর্ত্তব্যতার অশ্বিনীকুমার তাহার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, সুতরাং পুলিসের চাকরী লইতে সে রাজি হইল না। তাহার আত্মীয়রা অশ্বিনীকুমারকে ধরিবার সঙ্কল্প করিল। সেই জন্যই কথায় কথায় অশ্বিনীকুমারের এই বন্ধু সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিল। কিন্তু ফল হইল না। অশ্বিনীকুমার বলিলেন, তাহার ইচ্ছা হয়, সে যাউক, কিন্তু আমি অমন ছেলেকে ছাড়িয়া দিব না। তাহারই কিছুক্ষণ পরে সেই ছাত্রটি অশ্বিনীকুমারের নিকট উপস্থিত। তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, দারোগা হইবি?" ছাত্র বলিল, "আমি দারোগা হইব না। কিন্তু আমার বাড়ীর লোকরা আপনাকে বড় মন্দ বলিতেছে। তাহারা বলে, আপনিই নাকি আমার মাথাটি খাইয়াছেন।" অশ্বিনীকুমার হাসিয়া বলিলেন,—"বলুক, তোকে ত গালমন্দ করে নাই; আমার ও রকম গাল খাওয়া অভ্যাস আছে।" বলা বাহুল্য, সেই ছাত্রটি অশ্বিনীকুমারের উপদেশে চলিয়া আর্থিক হিসাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

অশ্বিনীকুমার কোন্ কাযের ভার কাহার উপর দিতে হইবে, তাহা বেশ বুঝিতেন। কাযের লোক খুঁজিয়া বাহির করিবার তাঁহার এই অসাধারণ ক্ষমতা স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছিল। স্বদেশীর উন্মাদনায় মত্ত অসংখ্য যুবকের মধ্য হইতে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দকে তিনিই বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে বরিশালের এক জন অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত কায়স্থ দর্জ্জি স্বদেশীর অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার জানিতেন, এ দেশে শিক্ষা প্রচার হয় কথকতার মধ্য দিয়া, ধর্ম্মকথার মধ্য দিয়া, গানের মধ্য দিয়া। বক্তৃতা সাধারণ লোকের মন তেমন স্পর্শ করে না, অথচ দেশের সাধারণ লোক স্বদেশীর ভাব সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করিলে এই আন্দোলন জয়যুক্ত হইবে না। তাই তিনি জারিওয়ালা

মুসলমান কবিদিগের দ্বারা সরল গ্রাম্য ভাষায় স্বদেশী গান লিখাইলেন। এই কবিরা নিরক্ষর পল্লীবাসী কৃষকদিগকে বুঝাইয়া দিল—উপাধির অসারতা গোলামীর হীনতা, পরাধীনতার লাঞ্ছনা। তাহাদের গানে বরিশালের মূক সাধারণের ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তাহারাও যে ইংরাজ রাজনীতিবিদ্‌গণের স্তোকবাক্যে মিথ্যাপ্রলোভনে ভুলে নাই, তাহাই জানাইবার জন্য মফিজুদ্দীন বয়াতি, বিলাতী আশ্বাসের উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"এ দেবো, তা দেবো ব'লে
অবশেষে ভুজজিনীর পা দেখায়।"

এই সময়েই অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে স্বনামখ্যাত মুকুন্দ দাস তাঁহার স্বদেশী যাত্রার গান বাঁধিলেন। ক্ষমতামদমত্ত ফুলারকে বরিশালের তরফ হইতে তিনি শুনাইয়া দিলেন—

"ফুলার আর কি দেখাও ভয়?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন ত অধীন নয়।
হাত বাঁধবে পা বাঁধবে, ধ'রে না হয় ফাঁসি দেবে,
মনকে বাঁধিতে পার তোমার এমন শক্তি নয়,—
ফুলার এমন শক্তি নয়!"

অশ্বিনীকুমারের বাণী তাঁহার গানে ভাষা পাইয়া গুর্খা-লাঞ্ছিত বরিশালকে ভরসা দিল—

"ওরে মা'র নাম নিয়ে ভাসানো তরী
যে দিন ডুবে যাবে রে ভবে
যে দিন ডুবে যাবে রে
সে দিন রবি চন্দ্র ধ্রুব তারা
তারাও ডুবে যাবে রে ভবে
তারাও ডুবে যাবে রে!"

আরও কিছুকাল পরে আর একটি যুবক নূতন ভাবে কথকতা আরম্ভ করিলেন। ইঁহাকে অশ্বিনীকুমার দুর্নীতির গভীরতম পঙ্ক হইতে তুলিয়া লইয়াছিলেন। নীতিবাগীশ কেহ হয় ত ইঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার দেখিয়াছিলেন, ইঁহার অসাধারণ বাক্‌পটুতা, বাক্য-বিন্যাসের কৌশল, সুকণ্ঠে মধুর গান গাহিবার শক্তি আর অভিনয়নৈপুণ্য। তাই নীলকণ্ঠের মত ইঁহার সঙ্গ-জনিত আবেশের বিষ পান করিতে প্রস্তুত হইয়াই তিনি ইঁহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইয়া কাযের মানুষ গড়িয়া লইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

নিজের দেশের উন্নতি করিতে হইলে অপর যে সকল পরাধীন দেশ অশেষ বাধাবিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া অবশেষে স্বাধীনতার দুরারোহ সুবর্ণ-পীঠতলে পূজার অর্ঘ্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে, তাহাদের সাধনার পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রয়োজন। অশ্বিনীকুমার এই উদ্দেশ্যেই ব্রজমোহন কলেজের লাইব্রেরীতে ইটালীর স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, হাঙ্গেরীর স্বাধীনতালাভের প্রয়াস পরিচয়, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, জাপানের জাগরণ-সম্পর্কীয় বহু গ্রন্থ আনাইয়াছিলেন।—তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাঁহার স্নেহভাজন ছাত্রগণ বাঙ্গালা ভাষায় ১৯ খানি গ্রন্থ রচনা করে। এই ১৯ খানি বহির তালিকা তাঁহার একখানি ডায়েরিতে ছিল। শুনিয়াছি, তাঁহারই অন্নে পুষ্ট এক নরাধম এই ডায়েরিখানি চুরি করিয়া পুলিসের হাতে দিয়াছিল। যতদূর মনে আছে, সেই বইগুলির তালিকা দিতেছি।—

১। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।
২। ইটালীর স্বাধীনতার ইতিহাস।
৩। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস
৪। হাঙ্গেরীর স্বাধীনতালাভের ইতিহাস
৫। আধুনিক জাপানের ইতিহাস।
৬। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস।
৭। মারাঠা জাতির ইতিহাস।
৮। শিখজাতির ইতিহাস।
৯। রাজপুতদিগের ইতিহাস।
১০। ভারতবর্ষের ইতিহাস।
১১। রামায়ণের বিষয়ানুক্রমিক সূচী (index)
১২। মহাভারতের বিষয়ানুক্রমিক সূচী।

অপর ৭ খানি গ্রন্থের নাম এখন আর মনে পড়িতেছে না। কোনও ইংরাজী বহি অনুবাদের তিনি বিরোধী ছিলেন। বিদেশী ইতিহাসগুলি ও অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তৎসন্নিবেশিত তথ্যগুলি সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করিয়া, পরে অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীর উপযোগী ভাষায় লিখিতে হইবে; আর ভারতবর্ষের ইতিহাস হইবে মৌলিক গবেষণার বিষয়,

ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। এই কাযের জন্ত তিনি লোকও বাছিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন, বরিশালের এক জন কৃতবিদ্য উকীল। আর এক অল্পবয়স্ক, অল্পশিক্ষিত অমার্জ্জিতবুদ্ধি যুবককে দিয়া অশ্বিনীকুমার ইটালীর স্বাধীনতার ইতিহাস লিখাইয়াছিলেন। যাঁহারা অশ্বিনীকুমারের এই ছাত্রটির কথা জানেন, তাঁহারা বানর কর্ত্তৃক নাই। বরিশালে ট্যানারী স্থাপিত হইলে তিনি সেখানকার জুতা ব্যতীত অন্ত স্বদেশী জুতাও ব্যবহার করেন নাই। বিশেষতঃ স্বদেশীর সময়ও দেশের শিল্পসম্ভারবৃদ্ধির জন্ত সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার একটি তরুণ ছাত্র অশ্বিনীকুমারকে লিখিল—"আমি জাপানে যাইব, পটারি শিখিতে, আমাকে অনুমতি দিন, আমি Scientific and Industrial Asscosciation এর কাছে আবেদন পাঠাই।"

বরিশালে চিতাভস্ম লইয়া শোভাযাত্রা।

সাগরবন্ধন রামায়ণকাব্যের অসম্ভব কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না।

অশ্বিনীকুমার কায করাইতেন তরুণ যুবক ও বালকদিগের দ্বারা। ইহারা উৎসাহী, কিন্তু চঞ্চল। একটি কায করিতে করিতে অপর একটি কাযের মোহে ইহারা উদ্‌ভ্রান্ত হয়। তাই ইহাদের উপর অশ্বিনীকুমারকে বড়ই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইত। তিনি শিল্প-বাণিজ্যপ্রসারের জন্ত উপযুক্ত লোককে উৎসাহ দিতে কখনই ত্রুটি করেন এই কাযের যোগ্য অধিকারীকে তিনি নিশ্চয়ই প্রার্থিত অনুমতি দিতেন; কিন্তু এ ছাত্রটিকে দিলেন না। তাহার বিষয়বুদ্ধি নিতান্ত কম, বৈশ্যবৃত্তির সে একেবারেই অনধিকারী। অশ্বিনীকুমার তাহাকে লিখিলেন—"আমি মোটেই ইচ্ছা করি না যে, তোমার ঐ মস্তিষ্ক কুম্ভকারের শিল্পে সঙ্কীর্ণ ও আবদ্ধ থাকে।" তরুণ যুবকের অভিমানও আহত হইল না, সে নিরস্ত হইল; অশ্বিনীকুমার তাহার জন্ত যে কার্য্য স্থির করিয়াছিলেন, সে আবার তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

স্বদেশীর সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকরাও নীরব রহেন নাই। এক জন শিক্ষক স্বদেশ-প্রেমের কবিতা লিখিলেন, আর এক জন স্বদেশীর জন্য লাঞ্ছনার কাহিনী সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলেন, আর এক জন স্বদেশী গান সংগ্রহ করিলেন, অধ্যক্ষ রজনীকান্ত বরিশালের সভায় ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র গ্রামে গ্রামে স্বদেশবান্ধব সমিতির শাখা সংস্থাপন করিয়া আসিলেন, ছাত্ররা দিবারাত্রি বাজারে বাজারে পিকেটিং করিতে লাগিল। অশ্বিনীকুমার সমগ্র বরিশাল হইতে বাছিয়া বাছিয়া কর্ম্মী বাহির করিলেন, তাহাদের কার্য্যের জন্য তিনি প্রশংসা দাবী করিতেন না, অকার্য্যের অপযশ মাথা পাতিয়া লইতেন, মানুষ বুঝিয়া বিশেষ কাযের ভার দিতেন; তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যরাও সানন্দে তাঁহার আদেশ পালন করিতে লাগিল। তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলি-হেলনে পরিচালিত হইল। একটি কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলী বাতি জলিয়া উঠে, তেমনই বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছার দ্বারা। তাঁহার ইচ্ছার সহিত বরিশালের ইচ্ছার প্রভেদ ছিল না। প্রতিভায়, যাহা সম্ভব হইত না, অশ্বিনীকুমার প্রেম দিয়া, ত্যাগ দিয়া, ভক্তি দিয়া তাহাই সম্ভব করিয়াছিলেন। তাই বরিশাল স্বদেশীর যুগে বাঙ্গালা বোষ্টন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল; তাই বরিশালের হুঙ্কারে মর্লির আসন টলিয়াছিল; তাই বরিশালের নদীবক্ষে ফুলার উন্মাদের আচরণ করিয়াছিলেন। অসহযোগের যুগে বরিশালে অশ্বিনীকুমার ছিলেন না—তাই সেখানে দলাদলি, শিবার কলরব, প্রেতের তাণ্ডব।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

ব্যক্ত

নিত্য-যৌবনের মাঝে উঠিয়াছি জাগি।
কামাতীত কাম মোর বাড়াইছে বাহু
তোমারে ধরিতে বুকে; দুষ্ট ক্রূর রাহু
তোমারে রেখেছে ঢেকে, তবু তোমা লাগি'
ফিরিতেছি বনপথে—কুঞ্জে—তরুতলে;
দেখিলাম শেষে, প্রিয়া, সরসীর তীরে,
যেন চির-পরিচিতা—পুষ্পিত শরীরে
শত বসন্তের শোভা, চঞ্চল অঞ্চলে,
চলিয়াছ মৃদুপদে—সহাস নয়নে,
ছন্দোময়ী কবিতা কি শরীরিণী গীতি!
কহিলাম মৃদুভাষে;—"মোর চিত্ত নিতি
তোমারে খুঁজিছে প্রেম স্বপনে স্বপনে।
হে মঞ্জু মঞ্জরী মোরে—দেহ বরমালা।"
প্রেমকোপে হাসি দর্পে চলি' গেলে বালা!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

বাঙ্গালার আবগারী তত্ত্ব

মদ, গাঁজা, আফিম ও চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের সেবায় আমরা দরিদ্র বাঙ্গালীরা বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করি, তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের থাকা উচিত। এই বিপুল অর্থের অতি সামান্য অংশও সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইলে যে কত উপকার হইত—তাহা পাঠকগণ নিজেই অনুমান করিতে পারিবেন।

আবগারী টেক্স বাবদে অর্থাৎ মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি খাইতে গিয়া নেশাখোরগণ গবর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত-রূপ আক্কেল-সেলামী প্রদান করিয়াছে :—

১৯২০	খৃষ্টাব্দ	১৮১০৮৪৪৮	টাকা
১৯২১	„	১৯৬৩৩৩১৭	„
১৯২২	„	১৮৩৫০৮৯৬	„

১৯২২ খৃষ্টাব্দে তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা প্রায় ১২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা কম শুল্ক আদায় হইয়াছে। এই ১২ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার ক্ষতির (?) জন্য সরকার অসহযোগী-দের উপর অনেক দোষারোপ (?) করিয়াছেন। আমা-দের কিন্তু মনে হয়, বাঙ্গালা দেশের এই লক্ষ লক্ষ টাকা বাঁচাইবার জন্য অসহযোগীদের নিকট সকলেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের তীব্র মন্তব্যই অসহ-যোগীদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার্টিফিকেট।

কোন্ কোন্ নেশার বাবদে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কত কম আয় হইয়াছে, তাহাও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।—নিম্নে হিসাব দেওয়া গেল :—

মাদক দ্রব্যের নাম	গত বৎসরে তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কত কম টেক্স আদায় হইয়াছে।	
দেশী মদ	৪৭৭৮০১	টাকা
গাঁজা চরস প্রভৃতি	৩৪৭১৮২	„
বিদেশী মদ্য (ঔষধ ব্যতীত)	২৫৮৫০৮	„
আফিম	১৮৪৯৮৩	„
তাড়ি	১৩২০১০	„

ঔষধার্থে আনীত মদ (যেমন ম্যানোলা, ভাইব্রোনা প্রভৃতি) এবং রং বার্ণিশ ইত্যাদির জন্য আনীত স্পিরিট বাবদে গত বৎসর তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ১০৬৯৩৮ টাকা বেশী শুল্ক আদায় হইয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ হইতে আবগারী শুল্ক বাবদে যত টাকা আদায় হয়, উহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে জনপ্রতি নিম্নলিখিতরূপ পড়ে :—

বৎসর	প্রতি জনপ্রতি টেক্স
১৯১৯—২০	৬ আনা ৪ পাই
১৯২০—২১	৬ আনা ১০ পাই
১৯২১—২২	৬ আনা ৩ পাই

অর্থাৎ ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক লোক গড়ে তৎপূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা—৭ পাই কম টেক্স দিয়াছে।

এক্ষণে এক একটি মাদক দ্রব্য সম্বন্ধে পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাউক :—

১। দেশী মদ

আলোচ্য বৎসরে (অর্থাৎ ১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা দেশে ৮৮টি দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে মোটের উপর ১০৭৬৮ গ্যালন মদের কাটতী কমিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ২টি জিলা ব্যতীত আর সকল জিলাতেই মদের কাটতী কমিয়া গিয়াছিল। কোন্ জিলায় কত কম কাটতী হইয়াছে এবং কি কারণে হইয়াছে, সরকারী রিপোর্টে তাহা টীকা-টিপ্পনী সহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থানে দেওয়া গেল :—

জিলা	পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা হ্রাসের পরিমাণ		কারণ (সরকারী রিপোর্ট অনুসারে)
মালদহ	১০৭৬৮	গ্যালন—	নন্‌কো-অপারেশন ও পিকেটিং
দিনাজপুর	৭৮৪১	„	ঐ ঐ
বাঁকুড়া	১৮২৬১	„	মূল্যবৃদ্ধি ও লোকের ব্যবসা মন্দা হওয়া
বাখরগঞ্জ	২৫৬১	„	লোকের অবস্থা খারাপ হওয়া
জলপাইগুড়ী	৯১৮১	„	চা-বাগানের কুলীর আয় কমিয়া যাওয়া
কুমিল্লা	৩৫৩১	„	প্রচার ও মদ্যপানে অনিচ্ছা
পাবনা	৩৩৮৬	„	মদ্যের মূল্যবৃদ্ধি
বগুড়া	৩৫৭৫	„	প্রচার ও পিকেটিং
রংপুর	৪২৪৫	„	প্রচার ও পিকেটিং
মুর্শিদাবাদ	৪৯৯৪	„	প্রচার ও পিকেটিং

রাজসাহী	৬০০৫	"	বন্‌কো-অপারেশন ও প্রচার
দার্জ্জিলিং	৮০১৮	"	ব্যবসায় মন্দা হওয়া
বীরভূম	২৩৭৭	"	সাধারণ জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি
চব্বিশপরগণা	১৮১১৫	"	প্রচার ও অসহযোগ

অন্যান্য জিলায় কমতীর পরিমাণ ও তাহার কারণ সম্বন্ধে সরকারপক্ষ হইতে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করা হয় নাই। মদের কাটতী বাড়িয়াছে মাত্র বর্দ্ধমান ও নদীয়া জিলাদ্বয়ে। বর্দ্ধমানে বৃদ্ধির পরিমাণ ৬৩৫৫ গ্যালন; খনির মজুরদিগের বেতনবৃদ্ধি হওয়াতেই নাকি তাহারা বেশী করিয়া মদ খাইয়াছে! ইহা সত্য হইলে বিশেষ চিন্তার বিষয়। নদীয়া জিলায় লাইসেন্স ও পরিদর্শন সম্বন্ধে ভাল (?) বন্দোবস্ত করাতেই নাকি বেশী কাটতী (১২৬৬ গ্যালন) হইয়াছে।

তাড়ি

তাড়ি প্রধানতঃ কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলিতেই, বিশেষতঃ পাটের কলের কুলীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হইয়া থাকে।

সন	মোট লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	২০৬৮	৫১৯৯৬৪	টাকা
১৯২০—২১	২১৫৪	৫৩৬৪০৩	"
১৯২১—২২	১০৩২	৪০৪৩৯৩	"

পচুই মদ

বাঙ্গালা দেশের কুলী, মজুর কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ইহার কাটতী অত্যন্ত বেশী। তুলনার জন্য ৩ বৎসরের হিসাব দেখান হইল:—

খৃষ্টাব্দ	মোট লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	৩৫৩৬৭	৭৯৮৯৩৮	টাকা
১৯২০—২১	৩৬২২২	৯৬০৮৩৪	"
১৯২১—২২	১৭৩০৪	১০০৮৯১২	"

১৯২১—২২ খৃষ্টাব্দে লাইসেন্সের সংখ্যা অনেক কমিয়া গেলেও মোট আয় অনেক বেশী হইয়াছে। কেবলমাত্র বর্দ্ধমান বীরভূমের কাটতীর জন্যই এই আয় বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে আসানসোলের খনির কুলীদের মধ্যে অধিক কাটতী হওয়াতেই নাকি শুল্কের পরিমাণ বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

বিলাতী মদ

য়ুরোপীয়, ফিরিঙ্গী, এবং দেশের শিক্ষিত (?) ও ভদ্র (!) লোকদের মধ্যেই নাকি বিলাতী মদের কাটতী বেশী। এ দেশে প্রস্তুত রম্ (Rum) নামক মদও বিলাতী মদের হিসাবে দেখান হইয়াছে:—

বৎসর	মোট লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	৫৯৭	৩০১৮৬৯	টাকা
১৯২০—২১	৭২৭	৩২২৩৫৮	"
১৯২১—২২	৮১০	৩২৪১৬৯	"

গাঁজা

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে গাঁজার কাটতীও কিছু কমিয়া গিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের মতে "A fall in the consumption was due partly to the temperance agitation which occupied such a prominent place in the Non-co-operation movement and partly to the enhanced retail prices...."

বৎসর	লাইসেন্সের সংখ্যা	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	১২৬৩	২০৫২	মণ	৩৬৪৭১৪৮	টাকা
১৯২০—২১	১২৬৭	১৮৪১	"	৩৮১৬৪৫৮	"
১৯২১—২২	১২০৬	১৬০৮	"	৩৪৩৩৪৩৬	"

মুর্শিদাবাদ, খুলনা, ময়মনসিং, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, পাবনা ও দার্জ্জিলিং এই কয়েকটি জিলায় শতকরা ১০ ভাগের অধিক কাটতী কমিয়া গিয়াছে এবং ত্রিপুরা, মালদহ, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, রাজসাহী ও বীরভূম এই কয় জিলায় শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক কাটতী কমিয়া গিয়াছে। কলিকাতা, হাওড়া, চব্বিশ পরগণা, হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েকটি জিলায় কাটতী বাড়িয়া গিয়াছে।

ভাঙ্

বৎসর	মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	৭২৪	মণ	১৬১৪৭৭	টাকা
১৯২০—২১	৭৮০	"	১৭৭৬৩৫	"
১৯২১—২২	৬৭৪	"	১৯১৫০০	"

আফিম

বাঙ্গালা দেশে আফিমসেবীর সংখ্যা বড় কম নহে এবং আফিম খাইয়া বাঙ্গালী যে আক্কেল সেলামী দেয়, তাহার পরিমাণও নেহাৎ অল্প নয়। অনেক গাঁজাখোর ও মদ-খোর শেষ বয়সে আফিম ধরিয়া থাকে।

বৎসর	মোট পরিমাণ		মোট শুল্ক	
১৯১৯—২০	১০৩৮	মণ	৩২৪৮৮২০	টাকা
১৯২০—২১	১০৬৬	"	৩৪০০৯১৩	"
১৯২১—২২	১০১১	"	৩২১৫৯৩০	"

কোকেন

কোকেন বিক্রয়ের মোট পরিমাণ কত এবং উহাতে গভর্ণমেণ্টেরই বা কত লাভ হইয়াছে, তাহা সরকারী রিপোর্টে স্বতন্ত্রভাবে প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার কারণ কি, তাহাও পরিষ্কার বুঝা গেল না।

বাঙ্গালার আবগারী বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে আমাদের অনেকগুলি শিখিবার বিষয় আছে—

১। গভর্ণমেণ্ট যতই উষ্মা প্রকাশ করুন না কেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, অসহযোগ আন্দোলনের ফলে প্রায় সকল প্রকার মাদক দ্রব্যের কাটতীই কিছু কমিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দরিদ্র কুলী, মজুর, কৃষক প্রভৃতিকে সুবুদ্ধি প্রদান করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মিগণ যে বহু লক্ষ টাকা অপব্যয় হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন। মহাত্মা গন্ধীর ও কংগ্রেসের আহ্বান সকল নেশাখোরের মনেই আঘাত করিয়াছে, কেবল পারে নাই শিক্ষিত ও ভদ্র (?) নেশাখোরগুলিকে। বিলাতী মদের কাটতীর ক্রমশঃ বৃদ্ধিই উহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ। যাঁহারা মদ-গাঁজার দোকানের সম্মুখে পিকেটিং করিয়াছেন, তাঁহাদেরও অভিজ্ঞতা এইরূপ। তাঁহাদের অনুরোধে কুলী, মেথর প্রভৃতি বুঝ মানিয়া ফিরিয়া গিয়াছে এবং স্ব সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোককে যথাসাধ্য নিবারণ করিয়াছে; কিন্তু ভদ্র ও শিক্ষিত নেশাখোর পশুগুলি কোনও প্রকার অনুরোধ উপরোধের বাধ্য ত হয়ই নাই, পরন্তু পুলিস ও টিকটিকির সাহায্যে কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিতে ত্রুটি করে নাই!!

২। বাঙ্গালা দেশের কতকগুলি জিলা অধঃপাতের অতি নিম্ন স্তরে পৌছিয়াছে—যথা বর্দ্ধমান, হাওড়া, হুগলী, এবং আংশিক ভাবে বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর। এই সকল জিলায় মদ, তাড়ি ও গাঁজা প্রভৃতির দোকান পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থানে পল্লীর জমীদার ও অবস্থাপন্ন লোকগণ এগুলির পৃষ্ঠপোষক। এই সকল জিলায় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাত (হাওড়া ব্যতীত) অত্যন্ত কম এবং জনসধারণের নৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত হীন। পাড়া-গাঁয়ের ক্ষুদ্র বাজারেও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের বস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তাড়ির নামও অনেকে জানে না, মদের দোকানও অনেক স্থানে ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। খুব বড় বড় বাজার ও বন্দর ছাড়া গ্রামের সাধারণ হাটবাজারে পতিতা স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায় না। আশা করি, উপরে উক্ত জিলার কর্ম্মিগণের দৃষ্টি এই বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইবে।

৩। ম্যাজিক লণ্ঠন, পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে খুব তেজের সহিত প্রচারকার্য্য চালাইতে পারিলে, নিশ্চয়ই ভাল ফল লাভ হইবে। মাদক দ্রব্যের অপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে খুব ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে ফল স্থায়ীও হইবে। পাটের কল ও কয়লার খনির নিকটে সরবত প্রভৃতি নির্দ্দোষ অথচ শ্রান্তি-দূরকারক পানীয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে কল্যাণ সাধিত হইবে। আমেরিকার মাদক-নিবারণী সমিতির দল অনেক সহরে এইরূপ পানীয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নানা প্রকার পুস্তক, পত্রিকা, বক্তৃতা প্রভৃতির দ্বারা লোকের বিবেকবুদ্ধিকে সর্ব্বদা সজাগ রাখি-বার চেষ্টা করিতেছেন।

বাঙ্গালার ন্যায় দরিদ্রপ্রধান স্থানে প্রতি বৎসর প্রায় ২ কোটিরও অধিক টাকা * নেশার বাবদে উড়িয়া যাইতেছে!!

---

* শুল্কসহ মাদকদ্রব্যের মূল্য ২ কোটি টাকারও অধিক হইবে।

এই বিরাট অর্থরাশি রক্ষিত হইয়া সৎকাযে ব্যয়িত হইলে যে কত উপকার হইতে পারে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে হইবে। কেবল মদ বা গাঁজার টাকায় কতগুলি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার,কূপ খনন, ডিস্পেন্সারী ও বিদ্যালয় স্থাপন বা কত লক্ষ শিশুর দুগ্ধের সংস্থান ইত্যাদি হইতে পারে, তাহা অঙ্ক ও চার্টের সাহায্যে জনসাধারণের চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। নেশার মোহে প্রতি বৎসর বাঙ্গালায় কত লক্ষ লোক স্বাস্থ্যহীন ও অর্থহীন হইতেছে, কত সুখের সংসারে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহার একটা সুস্পষ্ট ছবি বাঙ্গালার লোকের চোখের সামনে ধরিতে হইবে। আশা করি, দেশের এক দল নীরব-কর্ম্মী রাজনীতিক দলাদলির সিদ্ধিঘোঁটা হইতে দূরে থাকিয়া কেবল এই কাযটিতে আত্মনিয়োগ করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত।

বদ্ধ পাগল

যা ভাবে তা মুখেতেই ব'লে ফেলে যেই,
ভিতরে বাহিরে যা'র গরমিল নেই,
মনের দুয়ারে যা'র নাহিক আগল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

যাকে পায় তার সাথে হেসে কথা কয়,
অবিচারে গায়ে প'ড়ে করে পরিচয়,
সদা থাকে উল্লাসে হাসে খলখল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

প্রাণভরে গলা ছেড়ে গায় যে বা গান,
নাহি মান-অপমান-জ্ঞান অভিমান,
লোক বুঝে করে না যে মনের বদল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

বুঝে না যে আপনার আরাম বিলাস,
আপনার গণ্ডার হিসাব নিকাশ,
দান করে, রাখে নাক নিজ সম্বল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

দিল্ খোলা প্রাণভোলা যা'র রসবোধ,
হিংসকে ক্ষমে, নাহি লয় প্রতিশোধ,
দুঃখীরে বুকে ধ'রে ফেলে আঁখি-জল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

উৎসবে উৎসাহে ঢালে প্রাণমন,
আর্ত্তেরে বাঁচাইতে করে প্রাণপণ,
জানে না চাতুরী চাটু ফাঁকিজুঁকি ছল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

প্রকৃতির সাথে যা'র প্রেম-পরিচয়,
আকাশ বাতাস যা'র মাতায় হৃদয়,
ভক্ত ভাবুক কবি শিল্পী সরল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

শ্রীহরিরে প্রাণভরে স্মরে অনুক্ষণ,
পূজে যেবা দেবদ্বিজে সেবে সাধুজন,
অবিরাম হরিনামে নয়ন সজল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

স্বদেশের তরে যেবা লাঞ্ছনা সয়,
করে নাক কারাগার মরণের ভয়,
ধনবান্ পরিজন তেয়াগে সকল,
লোকে কয় তারে ক্ষ্যাপা বদ্ধ পাগল।

শ্রীকালিদাস রায়

জার্ম্মাণ কুল্‌টুর

প্রথম অধ্যায়—জার্ম্মাণীর জ্ঞান-মণ্ডল

১

বৎসর দশেক পূর্ব্বে জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের নাম ভারতীয় পণ্ডিতমহলের অতি অল্পই জানা ছিল। ভারতবর্ষের স্কুল-কলেজে কোন কোন জার্ম্মাণ গ্রন্থের ইংরাজী তর্জ্জমা ব্যবহার করা হইত; কিন্তু মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণীর নাম আমাদের বিদ্যাপীঠের আব-হাওয়ায় বড় স্থান পাইত না।

আজকাল আর সে কথা বলা চলে না। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই জার্ম্মাণ জানা অধ্যাপক ও লেখক বিদ্যাচর্চ্চা করিতেছেন। জার্ম্মাণ ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদিগের প্রণীত কেতাব হিন্দু-মুসলমান-মহলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

অধিকন্তু কোন কোন সাহিত্য দর্শন-বিজ্ঞানসেবী নিজ নিজ বিদ্যার সীমানা বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সূত্রে তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণীর বিভিন্ন পরিষৎ পত্রিকা নিয়মিতরূপে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে হয়।

ফলতঃ জার্ম্মাণ পণ্ডিতমণ্ডলের নূতন নূতন সন্ধান ও সিদ্ধান্তগুলা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় জ্ঞান-মণ্ডলের গবেষকদিগের গোচর হইতেছে। ভারতবর্ষে বসিয়াই ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক বহু জার্ম্মাণ পণ্ডিতের কাযকর্ম্ম সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতেছেন।

তাহা ছাড়া আজকাল জার্ম্মাণীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে ভারতীয় অধ্যাপক ও ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাহার ফলে সর্ব্বোচ্চ জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে ভারতবাসীর সাক্ষাৎসম্বন্ধে লেনদেন সুরু হইয়াছে। ক্রমে তাঁহাদের নাম ভারতের সহরে সহরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

২

জার্ম্মাণদিগের এঞ্জিনিয়ারিং-পরিষৎ এক বিপুল বৈজ্ঞানিক-সঙ্ঘ। সভ্যসংখ্যা ২৭ হাজার। এই পরিষৎ ৭ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এঞ্জিনিয়ারিংবিষয়ক পত্রিকা চালাইয়া থাকেন। সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট এবং কাগজ-গুলার প্রধান সম্পাদকের নাম শ্রীযুত মাটাশাস। কোন কোন পত্রিকার কাটতি ৩৫ হাজার।

মাটাশাস ষ্টীম এঞ্জিনের যন্ত্রপাতি বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ। জার্ম্মাণীর নানা কারখানার কাযে এবং সরকারী শিল্প বিভা-গের নানা শিল্পবিদ্যায় মাটাশাসের ডাক পড়ে। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের এঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক বিদ্যার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানেও ইনি সময় দিয়াছেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্য ইঁহার আগ্রহ দেখা যায়।

মাটাশাস বলিতেছেন,—রাইনল্যাণ্ডের কোন কোন ফ্যাক্টরীতে মজুরদিগের কায আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য পরীক্ষা চলিতেছে। মজুররা যখন কলযন্ত্র সেবা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেই সময়ে কারখানার ভিতর সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে মজুররা নিজ নিজ কায মনোযোগের সহিত নিষ্পন্ন করে।

৩

ভারতবর্ষে যাঁহারা রাসায়নিক গবেষণা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই অধ্যাপক নার্ণষ্টের ক্রয়গুলিশের এবং হাবার নাম শুনিয়াছেন। কাইসার হিলহেল্ম ইনষ্টিটিউট অথবা বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঁহারা কায করেন। অধ্যাপক টোমস ফার্ম্মেসি অর্থাৎ ঔষধ তৈয়ারি সংক্রান্ত রসায়নের প্রধান অধ্যাপক। ইঁহারা সকলেই ভারতীয় গবেষক বা ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন। শ্রীযুত আইনষ্টাইনও উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় বিজ্ঞানসেবীদের নাম শুনিয়াছেন।

উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক ডীলস এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ বিষয়ক গ্রন্থ নিজ মিউজিয়ামে আনাইয়া রাখিয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে কয়েক জন ভারতীয় ছাত্র কায করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হাবার্লাণ্ড শারীরবিদ্যার অধ্যাপক। ইঁহার ফিজিওলোগিসেস ইনষ্টিটিউটে শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু উদ্ভিদের চেতনা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া গিয়াছেন।

লাইপৎসিগের পশুশালার ডিরেক্টর গেবিং সিংহ-শাবকের লালনপালনে ওস্তাদ। য়ুরোপ ও আমেরিকার নানাদেশের পশুশালায় ইঁহার "তৈয়ারি" সিংহ বিক্রী হয়। গেবিং ভারতীয় ছাত্রদিগকে জুয়লজি বিদ্যায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

৪

খাঁটি দর্শনবিষয়ক গবেষণায় যে সকল জার্ম্মাণ পণ্ডিত নামজাদা, তাঁহাদের সঙ্গে কোন ভারতসন্তান উচ্চ অঙ্গের কায করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। তবে জার্ম্মাণীতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদি বিদ্যাগুলির সকল ছাত্রকেই কিছু কিছু দর্শন আলোচনা করিতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ফ্যাকল্টিই এই সকল বিদ্যাবিষয়ক অধ্যয়ন অধ্যাপনার কর্ত্তা। দর্শন এই সকল বিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। কাযেই জার্ম্মাণীর প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই জার্ম্মাণ দার্শনিকদের এবং দর্শনের অধ্যাপকদের ধরণ-ধারণ জানেন।

জার্ম্মাণীর ভিতরে কাণ্ট ফিক্‌টে এবং হেগেল জগদ্‌গুরুবিশেষ। আজকালকার দার্শনিকগণের মধ্যে হুব্‌ণ্ট বিশ্ববিশ্রুত, ইঁহাকে শারীরবিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত চিত্তবিজ্ঞানের অন্যতম জনকরূপে সম্মান করা হয়। লজিক বা তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক সিগ্‌হ্বার্ট ভারতেও অপরিচিত নহেন।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিদ্যার অধ্যাপকরা ভারতীয় ছাত্রদের সংস্পর্শে আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের বিভাগে অধ্যাপক সুমাখারের সঙ্গে কোন কোন ভারতীয় ছাত্র কায করিয়াছে। বিলাতের ভারতীয় ছাত্ররা ইংরাজ ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সুপারিস লইয়া সুমাখারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তিনি ইংলণ্ড-প্রেমিক।

জার্ম্মাণ সাহিত্যের ইতিহাস সমালোচনা সম্বন্ধে যে সকল পণ্ডিত নামজাদা, তাঁহাদের সঙ্গে ভারতসন্তানের কাযকর্ম্ম এখানে বড় বেশী চলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ব্রাণ্ডলকে ভারতীয় ছাত্ররা জানেন, ইনি জার্ম্মাণীতে সেক্‌সপীয়রের সাহিত্যবিষয়ে বিশেষজ্ঞ।

৫

বিদেশী ছাত্ররা বার্লিনে আসিলে প্রথমেই তাহা লইয়া মহা গণ্ডগোলে পড়ে। অধিকন্তু জার্ম্মাণীর স্কুলকলেজে ভর্ত্তি হইতে হইলে বিদেশীর পক্ষে অনেক সরকারী আফিসের ভিতর দিয়া যাওয়া আসা করিতে হয়। শিক্ষা-সচিবের অধীনে এই সকল আফিসে কায পরিচালিত হইয়া থাকে।

অধ্যাপক বেম্মে শিক্ষাসচিবের আফিসের এক জন বড় কর্ম্মচারী। ইঁহাকে বিদেশী ছাত্রদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত বাহাল করা হইয়াছে। এই সূত্রে প্রত্যেক ভারতসন্তানকেই দুই একবার বেম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়।

শিক্ষাবিভাগের উপ-মন্ত্রী কার্ল বেকারের সঙ্গে কোন কোন ভারতবাসীর দেখাশুনা হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী ইত্যাদি ভারতীয় পর্য্যটক বেকারের নিমন্ত্রণে শিক্ষা দরবারের প্রধান প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিদেশী অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা আছে। বার্লিনের এই বিদেশী বিভাগের কর্ত্তা অধ্যাপক ফোগেল। ইনি ভূগোলবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ফোগেলের বক্তৃতালয়ে ভারতসন্তানেরও ডাক পড়িয়াছে।

৬

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা জোরের সহিত চলিতেছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের ভিতর জার্ম্মাণ-জানা লোক দিন দিন বাড়িতেছে। কাযেই জার্ম্মাণীর প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধান ভারতে আজকাল সুবিদিত।

জার্ম্মাণীর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ভারতীয় ভাষা—অন্ততঃপক্ষে সংস্কৃত এবং পালি শিখাইবার আয়োজন আছে। ভ্যুর্টসবুর্গের শ্রীযুক্ত জোলি, বনের যাকোবি, ব্রেস্‌লাওয়ের হিল্লেব্রাণ্ট্‌, গেটিঙ্গেনের ফিক্‌, বার্লিনের লিডার্স ইত্যাদির সঙ্গে ভারতীয় ছাত্র বা অধ্যাপক কাযকর্ম্ম করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ প্রাচ্যতত্ত্বপণ্ডিতগণের পরিষৎকে ডয়চে মর্গেনলাণ্ডিশে গেজেল শাফ্‌ট বলে। এই পরিষদের ভারতীয় সভ্য এক প্রকার ছিলই না বলা চলে। কিন্তু বৎসরখানেকের চেষ্টায় কয়েক জন ভারতবাসী সভ্য হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। বোম্বাই, কাশী ইত্যাদি নগর হইতে কেহ কেহ অর্থ-সাহায্যও পাঠাইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইত্যাদি সভা হইতে গ্রন্থ-পত্রিকাদিও আসিয়াছে।

গেজেল শাফ্‌টের কর্ম্মকর্ত্তার নাম ল্যিটকে। ইনি নিজে প্রাচ্যতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ নহেন। সাধারণ ফিললজিতে ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছেন। কতকগুলা বড় বড় প্রকাশকের ইনি ম্যানেজার। বার্লিনের প্রবাসী ভারত-সন্তানদের সঙ্গে ল্যিটকের লেনদেন আছে।

৭

বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে নব্যভারতীয় চিত্রাবলীর বাজার বসায় জার্ম্মাণীর চিত্রকর, চিত্রসমালোচক, মিউজিয়াম-পরিচালক এবং শিল্প-ব্যবসায়ীরা একসঙ্গে বহু ভারতীয় শিল্পীর নাম জানিতে পারিয়াছে। গ্যালারির ডিরেক্টর জুষ্টি এবং শিল্প-সচিব হেবেট্‌সোল্ড এই সূত্রে এক নয়া ভারত আবিষ্কার করিয়াছেন, বলিতে পারি।

লাইপৎসিসের "ডার সিসেরোণে," বার্লিনের "কুন্‌ষ্ট-ক্রোণিক" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শিল্প-পত্রিকায় ভারতীয় প্রদর্শনীর সমালোচনা বাহির হইয়াছে। জার্ম্মাণীর শিল্প-সমালোচকদের মধ্যে "টাগেব্লাট" কাগজের শ্রীযুক্ত ষ্টাল, "ফোসিসেৎসাইটুঙে"র অস্‌বর্ণ এবং "ডয়েচে আল্‌গেমাইনেৎসাইটুঙে"র ফেক্‌টার জার্ম্মাণ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহারা সকলেই জার্ম্মাণ শিল্প-প্রেমিকগণকে তরুণ ভারতের শিল্প-সাধনার কথা জানাইয়া দিয়াছেন। বার্লিনের ডয়চে কুন্তসাও নামক মাসিক পত্রিকায়ও এই বিষয়ে আলোচনা বাহির হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বইয়ের ব্যবসা

১

কেতাব ছাপা হয় জার্ম্মাণীতে বিস্তর। প্রকাশকের সংখ্যা অগণিত। বার্লিনকে গ্রন্থ-ব্যবসায়ের কেন্দ্র বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। মেহাৎ নগণ্য নগরের প্রকাশকরাও অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের রচনা প্রকাশ করিয়া থাকে। জার্ম্মাণ সমাজের জ্ঞান-মণ্ডলে কোন দুই চার জন প্রকাশকের একচেটিয়া প্রভাব নাই। অন্যান্য শিল্প ও ব্যবসায়ের মত কেতাবের ব্যবসায়েও জার্ম্মাণী বহুত্বের প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে।

প্যারিসের "লামুভেল রেভ্যি ফ্রাঁসেজ" মাসিকে শ্রীযুক্ত ফেলিক্‌স্ ব্যাণ্ডো লিখিয়াছেন :—"১৯১১ সালে জার্ম্মাণীতে কেতাব প্রকাশিত হইয়াছিল সংখ্যায় ৩১ হাজার। সেই বৎসর ফ্রান্সে প্রকাশিত হইয়াছিল মাত্র ১১ হাজার আর বিলাতে ১০ হাজার। লড়াইয়ের ফলে জার্ম্মাণ সমাজে গ্রন্থ-ব্যবসায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বিলাত, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীর তুলনা করিলে আজও ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অনুপাতই প্রায় রহিয়া গিয়াছে।"

জার্ম্মাণীতে পুস্তকের দোকানমাত্রেই ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই আবার পুরাতন শিল্পের বাজার। বার্লিন, লাইপৎসিগ, মিউনিক ইত্যাদি যে কোন সহরের বইয়ের দোকানেই এই দস্তুর। অবশ্য ছবি এবং পুরাতন শিল্পদ্রব্যের জন্য স্বতন্ত্র দোকানও আছে অনেক।

বইয়ের দোকানে ছবি বিক্রয়ের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সুরু করা মন্দ নহে। আজকাল ভারতবর্ষে কেতাব কেনার ঝোঁক দেখা যাইতেছে। বইয়ের দোকানে যাওয়া আসা করা শিক্ষিত লোকজনের স্বভাবে দাঁড়াইতেছে। এইরূপ যাওয়া আসা করিতে করিতে দেশী বিদেশী আধুনিক প্রাচীন ছবি দেখিতে পাইলে ভারতবাসীর মেজাজে এক নয়া খেয়াল গজাইতে পারিবে।

পুস্তক-বিক্রেতাদের ভিতর কেহ কেহ সুকুমার শিল্পের নমুনা কতকগুলা দোকানে ঝুলাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিলে আমাদের যুবাবুড়ার চোখ তৈয়ারী করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে কালে তাঁহারা নিজেই ব্যবসায়ে লাভবান্ হইতে পারিবেন। সুকুমার শিল্পের ব্যবসায় ভারতে অল্পকালের ভিতরই জাঁকিয়া উঠিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

২

দর্শন, বিজ্ঞান, এঞ্জিনিয়ারিং, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকার প্রকাশকগণ জার্ম্মাণ সমাজে সুপরিচিত সন্দেহ

নাই। কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই কাব্য, নাটক, উপন্যাস, সঙ্গীত ইত্যাদির রচয়িতারাই আবালবৃদ্ধবনিতার অতি প্রিয়। খবরের কাগজের মাহাত্ম্যে রাষ্ট্রনৈতিক নামজাদা পাণ্ডারা প্রতিদিনই ঘরে ঘরে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রধুরন্ধরদের যশ ক্ষণস্থায়ী। কবি, গল্পলেখক, নাটককার, ঔপন্যাসিক, গায়ক, বাদক ইত্যাদির নামই সাধারণ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত পূজা পাইয়া থাকে। কাযেই এই সকল সাহিত্য ও শিল্পরচয়িতাদের প্রকাশকরাই সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠিত। জার্ম্মাণীতেও এইরূপই দেখিতেছি।

বার্লিনের ফিশার কোম্পানী জার্ম্মাণীর বড় বড় সাহিত্যস্রষ্টাদের প্রকাশক। হাউপটমান, টমাসমান, ডেহমেল ইত্যাদি নাটককার ও কবির রচনা এই কোম্পানীর আয়োজনে প্রচারিত হইয়াছে। ফিশার প্রধানতঃ জার্ম্মাণ লেখকগণের বাজার সাজাইয়াছে। বিদেশী গ্রন্থকারদিগের ভিতর য়ুরোপের টিউটনজাতীয় লেখকরা এই বাজারে ঠাঁই পাইয়াছেন। স্কাণ্ডিনাভিয়ান সাহিত্যের জার্ম্মাণ অনুবাদ ফিশারের বিদেশী-প্রচারের বৈশিষ্ট্য। ফরাসী সাহিত্য বয়কট করা ফিশারের এক রোগ বোধ হইতেছে।

৩

ফিশারের "গোঁড়া স্বদেশী" গোটা জার্ম্মাণীকে একঘেয়ে করিয়া রাখে নাই। বিদেশী-প্রচারের জন্যও অনেক প্রকাশক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

য়েনার ডিড্‌রিশ কোম্পানী টিউটনিক জাতির সীমানা ছাড়াইয়াছে। ইহার এক হাত ঠেকিয়াছে রুশসাহিত্যে, অপর হাত ফরাসীসাহিত্যে।

বিশ্ব-সাহিত্যের বিপুল বাজার বসাইয়াছে, লাইপৎসিগের ইন্‌সেল কোম্পানী। বর্ত্তমান জগতের নামজাদা বহু লেখককে এই আসরে দেখিতে পাই। ফ্রান্সের জিদ, বেলজিয়ামের হ্যারহেবেন, বিলাতী ব্রাউনিঙ, রুশ গোগোল, মার্কিণ হ্বিটম্যান ইত্যাদি অনেকের সঙ্গে ইন্‌সেল জার্ম্মাণদিগকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে। ভারতীয় জয়দেব এবং কালিদাস আর গ্রীক ইস্কীলস এবং সোফোক্লেশ ইত্যাদির সঙ্গেও এই বিশ্বশক্তির বাজারে মোলাকাৎ হয়।

টমাসমান রাজপন্থী কাইজারতন্ত্রী সাম্রাজ্যধর্ম্মী লেখক। কিন্তু তাঁহার ভাই হাইনরিথমান রিপাব্লিকপন্থী—গণতন্ত্রী মানব-সেবক। ইঁহার লিখাও বিক্রয় হয় ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার, মিউনিকের কুর্টহ্বোল্‌ফ্‌ হাইনরিথমানের প্রকাশক। কবি উন্‌রু, নাটককার হ্বের্ফেল ইত্যাদির প্রচার করিয়াছে হ্বোল্‌ফ্‌। নয়া জার্ম্মাণীর এই আসরেই রবীন্দ্রনাথের ঠাঁই।

ইন্‌সেল এবং হ্বোল্‌ফ দুই কোম্পানীই আর একটা নয়া পথের পথিক। বিদেশী সাহিত্যের তর্জ্জমা মাত্র নহে,—বিদেশী ভাষায় বিদেশী মূলগ্রন্থগুলার প্রচার করিয়া ইহারা জার্ম্মাণীর ভিতর দুনিয়াখানা আনিয়া ধরিতেছে। ইহাদের আয়োজনে জার্ম্মাণরা সস্তায় ফরাসী মোলিয়্যার, মুসে, বাল্‌জাক ইত্যাদি কিনিয়া ঘর সাজাইতে পারিতেছে।

৪

জার্ম্মাণীর প্রত্যেক দৈনিক কাগজের এক জন করিয়া সাহিত্যশিল্প-সঙ্গীতের সম্পাদক দেখিতে পাই। কোন কাগজেই কবিতা, থিয়েটার, চিত্রকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা বাদ পড়ে না। ফলতঃ আপামর সকলেই কিছু না কিছু এই সকল বিষয়ে রসলাভ করিতে পারে।

ভারতীয় সংবাদপত্রের সম্পাদনে এখনও এই রীতি দেখা দেয় নাই। এমন কি, আমাদের মাসিক পত্রিকাসমূহেও সুকুমার শিল্পসঙ্গীত নাটক ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় দায়িত্ব দেখিতে পাই না। এই দিকে পত্রিকা-প্রকাশকগণের যথোচিত দৃষ্টি পড়া উচিত।

একমাত্র চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং বাস্তুশিল্পের জন্যই জার্ম্মাণীতে বহুসংখ্যক পত্রিকা চলিতেছে। এইগুলার গঠন-পারিপাট্য এবং ফটোসম্পদ অতিশয় উচ্চশ্রেণীর অন্তর্গত। এতগুলা বড় শিল্প-পত্রিকা ফ্রান্সেও নাই। অন্যান্য বিভাগের মত, শিল্প-পত্রিকার বিভাগেও জার্ম্মাণী বহুত্বপন্থী। কোন একখানা কাগজ পড়িয়া গোটা জার্ম্মাণীর শিল্প-মত অথবা শিল্প-রীতি বুঝা সম্ভব নহে।

বার্লিনের "কুন্‌ষ্ট-ক্রোণিক" আর লাইপৎসিগের "ডার সিসোয়াণে," এই দুই কাগজেই শিল্প-প্রেমিকরা দুনিয়ার শিল্প-সংবাদ পাইয়া থাকে। জগতের কোথায় কবে কিরূপ প্রদর্শনী বসিতেছে, ঘরে বসিয়া পাঠকরা জানিতে পারে। অধিকন্তু শিল্পের "বাজার" অর্থাৎ ছবিমূর্ত্তির কেনাবেচা

সম্বন্ধেও খবর থাকে। ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, প্রদর্শনী-সমালোচনা, পুস্তক-পরিচয় ইত্যাদিও কাগজ দুইটার কলেবর পুষ্ট করে। মিউনিকের মাসিক "কুন্ষ্ট" এই হিসাবে একখানা উৎকৃষ্ট সচিত্র পত্রিকা।

৫

দুই জার্ম্মাণ যুবক একত্র একটা প্রকাশক-কোম্পানী ("ফোর্লাগ্") গড়িবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইঁহারা লেখকরূপে নিজ পরিচয় দিয়া থাকেন। শিল্প-সমজদারি ইঁহাদের রচনাবলীর বিশেষত্ব।

ফোর্লাগ্ খোলা হইবে গ্রন্থপ্রকাশের জন্য। মূর্ত্তি, চিত্র ইত্যাদির দোকানও থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাও চলিবে। পত্রিকার উদ্দেশ্য থাকিবে—সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনা।

গৌরচন্দ্রিকার ভিতর শুনিতে পাইলাম, এক জন বলিতেছেন:—"রুসজাতি আজকালকার জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদের মত সরলপ্রাণ, ধর্ম্মভীরু, ভগবদ্ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক নরনারী আর নাই। রুসিয়ার পল্লীগ্রামের কৃষাণদের ঘরে ঘরে অনেক পুরাতন ছবি প্রভৃতি রহিয়াছে। নেহাৎ কম দামে ইহাদের নিকট এইগুলা সংগ্রহ করিতে পারিব। ইহারা ব্যবসার মারপ্যাঁচ বুঝে সুঝে না। পরে জার্ম্মাণীতে আনিয়া জার্ম্মাণদের নিকট অথবা দুনিয়ার শিল্প ব্যাপারীদের নিকট এইগুলা চড়া দামে বেচিতে পারিব।"

ইহার জন্যই আধ্যাত্মিক রুসজাতির সংবর্দ্ধনা। ভারতীয় হিন্দু মুসলমানকে সরলচিত্ত এবং আধ্যাত্মিকতাময়রূপে জাহির করিবার পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রেই এই ধরণের একটা কেনা-বেচার ফিকির আছে। ফিকিরওয়ালা ব্যাপারীদের মধ্যে অনেকেই আবার শিল্পদর্শনাদির সমজদারও বটে। আর যে সকল ব্যবসায়ী নিজে সমজদার বা লেখক নহেন—তাঁহারা ছোট বড় মাঝারি সাহিত্যসেবী বাহাল করিয়া নিজ নিজ ধাঁচার বাজার কায়েম করিয়া থাকেন।

৬

জার্ম্মাণীতে, ফ্রান্সে, ইংলণ্ডে, আমেরিকায় কোন কোন কেতাবের কাটতি লক্ষের উপর গিয়া উঠে। যে যে কেতাবের চার পাঁচ হাজারের কম কাটতি সম্ভাবনা, প্রকাশকরা সাধারণতঃ সেই সব কেতাব নিজ খরচে প্রচার করিতে ঝুঁকে না। কেতাব প্রকাশ একটা ব্যবসা। লেখক মহাশয় নিজের কবিত্বের, বিজ্ঞানসেবার, দার্শনিকতার বা রসজ্ঞানের দর যত ইচ্ছা তত বাড়াইতে থাকুন; তাহাতে লোকের বেশী কিছু যায় আসে না। প্রকাশক দেখিতেছে একমাত্র—কয় মাসে কত কেতাব বিক্রয় হইবে।

যাঁহারা সুকুমার শিল্পের স্রষ্টা, তাঁহাদের "সৃষ্টি" সম্বন্ধেও দুনিয়া এইরূপ নির্ম্মম কঠোর বিচার করিতেই অভ্যস্ত। শিল্পী-মহাশয়রা ধ্যানস্থ ঋষিযোগী স্রষ্টা কত কি হইতে পারেন; হউন, দোকানদাররা বুঝে কেবল এক কথা,—লোকটার গড়া জিনিষগুলা কিনিয়া গৃহস্থরা টেবল, দেয়াল্ বা তাক সাজাইতে রাজি কি না।

মাছের ব্যবসা, আলুপটলের ব্যবসা অথবা ধুতীচাদরের ব্যবসা যেমন ব্যবসামাত্র, কেতাবের ব্যবসা, পত্রিকার ব্যবসা, ধাতুমূর্ত্তির ব্যবসা, চিত্রশিল্পের ব্যবসা ইত্যাদিও ঠিক সেই রকম ব্যবসাই বটে। মাছের বাজারে আর সুকুমার শিল্পের অথবা কাব্যসাহিত্যের বাজারে এক কাঁচ্চাও তফাৎ নাই।

ব্যবসার প্রাণ বিজ্ঞাপন। মাল বাজারে উপস্থিত হইয়াছে অথবা হইবার সম্ভাবনা আছে, এই খবরটা খরিদ্দারদের কানে যেন তেন প্রকারেণ পৌঁছান ব্যাপারীদের প্রথম কথা। এই জন্য দরকার হয় দালাল, এজেণ্ট, সংবাদপত্রের জানানী শুনানী।

শিল্প-সাহিত্যের বাজারেও দস্তুর তাহাই। সমালোচক, সমজদার, রসের ওস্তাদ মহাশয়রা এই জগতের দালাল বা এজেণ্ট। কোন মালের প্রশংসা কাগজে কাগজে ছাপা হইবে কি না, তাহা কাগজওয়ালাদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। নামজাদা দালাল নিযুক্ত করিয়া নামজাদা কাগজে সুমত প্রচার করিবার জন্য য়ুরোপ আমেরিকার শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারীরা টাকা খরচ করিতে অভ্যস্ত। ভারতবর্ষেও এই রীতি সুরু হইয়াছে, তবে এখনও বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। বড় বড় প্রকাশকমাত্রই নিজের তাঁবে কতকগুলা কাগজ ও লেখক "বাঁধা মাহিয়ানা" দিয়া কিনিয়া রাখিতে পারেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

স্বাতন্ত্র্য না সমবায় ?

১

সোজা কথায় প্রশ্নটা এই—আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিয়া স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিব, না স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া, এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিয়া দিব ? অথবা স্বারাজ্য বলিতে আমরা নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা কিংবা পরিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য বুঝিব, না আর পাঁচটা রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীন-ভাবে, তাহাদের সকলের সমকক্ষরূপে যুক্ত হইয়া, নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিব ? ইংরাজীতে এই পরিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যকে isolated sovereign independence কহে। আর পাঁচটা স্বাধীন ও সমকক্ষ রাষ্ট্রশক্তির সমবায়কে federaton বলে। এই দুইটি রাষ্ট্রীয় আদর্শ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত। ইহার মধ্যে আমরা কোন্‌টির অনুসরণ করিব, ইহাই এখন ভারতের প্রধান রাষ্ট্র-সমস্যা। স্বাতন্ত্র্য, না সমবায় ? এই প্রশ্ন তুলিয়া, এই সমস্যারই আলোচনা করিতে চাই।

২

তোমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকিতে চাও, না ইহার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া, নিঃসঙ্গ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাও,—দেশের জনসাধারণকে এই প্রশ্নটা করিলে, প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলে, অনেকেই বলিবেন,—আমরা দুনিয়ার আর দশটা বড় ও প্রতাপশালী রাষ্ট্র যেমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, ভারতবর্ষ সেইরূপই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হউক, ইহাই ইচ্ছা করি। ইহাই দেশের সত্য বহুমত। সকলে মুখ ফুটিয়া এ কথা বলিতে সাহস পায়েন না, ইহা সত্য। কেহ বা এরূপ স্বাধীনতালাভ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই অসম্ভব মনে করিয়া, এ দুরাশায় প্রশ্রয় দিতে চাহেন না, ইহাও জানি। কেহ বা ইংরাজ-রাজের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করিয়াই ভারতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা নীতিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন, এবং এই মিত্রতাহানির ভয়ে এ সকল কথা মুখেও আনিতে চাহেন না, ইহাও জানি। কিন্তু সোজা ভাবে, প্রাণ খুলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সাহস পাইলে, দেশের শতকরা সাড়ে নিরনব্বই জন লোকই নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা বা পরিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্যই চাহেন, ইহা স্বীকার করিবেন। আর দেশের জনসাধারণের মনোভাব এইরূপ বলিয়া, এই প্রশ্নটার সম্যক্ ও সমীচীন বিচার-আলোচনা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

৩

এক দিন কিন্তু অন্ততঃ দেশের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব এরূপ ছিল না। জনসাধারণও ইংরাজ-শাসনে সন্তুষ্ট ছিল। ইংরাজের সাহিত্য পড়িয়া, ইংরাজের সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া, ইংরাজের সাহিত্যে ও ইতিহাসে যে উদার ও উন্মাদনাকারী স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাতে মাতোয়ারা হইয়া, আমাদের ইংরাজী-নবিশরা তখন ইংরাজকে নিজেদের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষা-গুরুরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইংরাজের হাত ধরিয়া ক্রমে তাঁহারাও ঐ আদর্শে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, এই আশায় তখন ইংরাজের সঙ্গে সখ্যবদ্ধ হইবার জন্য সকলে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং সে-কালে ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিব, না স্বদেশকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ করিতে যাইয়া ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকাইয়া দিব, এ প্রশ্নটাই তাঁহাদের মনে জাগে নাই। তাঁহারা ভাবিতেন, আমরা এখন দুর্ব্বল, আত্মরক্ষণে ও আত্মশাসনে অক্ষম, ক্রমে যখন আমরা সবল ও সমর্থ হইয়া উঠিব, তখন ইংরাজই আপনার উদারতাগুণে, আমাদের দেশকে আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে লর্ড মেকলে এই কথা কহিয়াছিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে, মুসলমান মত-নায়ক সার এব্রাহেম রহমত উল্লাও এই কথাটাই কহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মোস্‌লেম লীগের সভাপতির অভিভাষণে (১৯১৩) এই অভিমতই প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই উইলিয়েম আরচার্ নামক এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ সাহিত্যিকও এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেন।

সার এব্রাহেম রহমত উল্লা বলেন যে, ইংরাজ-শাসন ভারতে আরও কিছুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, আমরা সত্য অর্থে একটা নেশন হইতে পারিব। আর যখন ঐ সময় উপস্থিত হইবে, আমরা নিজেদের দেশের শাসন-সংরক্ষণের ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য লাভ করিব, তখন আমরা নিশ্চয়ই এই অধিকার পাইব। ভারতবর্ষের মত একটা মহাদেশ কিছুতেই চিরদিন বিদেশীয়দের শাসনাধীনে থাকিতে পারে না। সে শাসন যতই ন্যায়ানুমোদিত ও কল্যাণকর হউক না কেন, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। ভারতবর্ষের উপরে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমাদের নিগূঢ় দায়াধিকার আছে। আমাদের অলি-অছিরা আমাদের সম্পত্তি নিশ্চয়ই আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন।

লর্ড মেকলে শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, সার এব্রাহেম রহমত উল্লা দশ বৎসর পূর্ব্বে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন। তাঁহার মূল কথা এই :—

I am one of those dreamers, who firmly believe that, given a sufficiently long spell of British rule in India, we are bound to become united as a nation in the real sense of the term. When that time arrives (as it is sure to do) we shall have qualified to rule the country ourselves and self-government will be absolutely assured to us * * * No country such as India is, can for ever remain under foriegn rule however beneficent that rule may be ; and though British rule is undoubtedly based on beneficence and righteousness, it cannot last for ever...India is our Motherland, our proved heritage, and must, in the end, be handed over to us by our guardians. I regard the connection of England with India in the nature of guardianship over minor children.

ইহার ভাবার্থ উপরেই দিয়াছি।

সার এব্রাহেম রহমত উল্লা যখন ভারতে বসিয়া এই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, উইলিয়ম আরচার সেই সময়েই বিলাতে বসিয়া ইহারই অনুরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সার এব্রাহেম কবে যে ইংরাজ এ দেশ ছাড়িয়া যাইবে, ইহা ঠিক করিয়া বলিতে বা ধরিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে উইলিয়ম আরচারের স্বপ্ন সুস্পষ্ট। উইলিয়ম আরচার স্বপ্ন দেখেন যে, ইংরাজী ২০০০ সনে ভারতের শেষ বৃটিশ-রাজপ্রতিনিধি, ১লা জানুয়ারী তারিখে, তল্পিতাল্পা লইয়া চিরদিনের মতন এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। ভারতবর্ষ নিজের হাতে নিজের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছে। এই শুভ নববর্ষ প্রভাতে, বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি ভারতের প্রজা ও সামন্তরাজগণের হাতে দেশের শাসন-অধিকার নিঃশেষে অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যাইবার সময় তিনি বৃটিশ-ভারতের ইতিহাসের সারসঙ্কলন করিয়া এই কথা বলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ-অধিকারকে স্থায়ী করা কখনই ইংরাজ নীতিজ্ঞদিগের উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতে বৃটিশ-নীতির লক্ষ্য ছিল, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য প্রস্তুত করা। সকল ইংরাজ-রাজপুরুষ এ উদ্দেশ্যটি ধরিতে পারেন নাই, ইহা সত্য। মাঝে এমনও কিছুকাল গিয়াছে, যখন ইংরাজ রাজপুরুষরা, ইংলণ্ডের প্রতাপ ও গৌরব রক্ষার জন্য ভারতে বৃটিশ প্রভুশক্তির চিরস্থায়িত্বই ইচ্ছা করিয়াছেন। শত বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে—the prevailing tendency was to assume that the glory and prestige of England demanded the eternity of the British Raj, and to regard as disloyal the most reasonable and law-abiding aspiration towards self-government. সে কালের ইংরাজ রাজপুরুষরা ভারতবর্ষ কোনও দিন শান্তিতে নিজের স্বাধীনতালাভ করিবে, ইহা কল্পনাই করিতে পারিতেন না। কিন্তু আজ তাহা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

Few could then realise that the most glorious day in the annals of England would be that which has now arrived—the day on which her great work accomplished, she could lay down her stewardship and say to a

self-controlled, self-reliant India, 'Hail and Farewell.'

"শতবর্ষ পূর্ব্বে অতি অল্প ইংরাজই ইহা অনুভব করিতে পারিতেন যে, কোনও দিন ইংরাজপ্রভুশক্তির কর্ত্তব্যকর্ম্ম শেষ হইবে এবং স্বায়ত্ত ও স্বাবলম্বী ভারতবর্ষের হাতে তাহার শাসনাধিকার অর্পণ করিয়া, ইংরাজ এ দেশ হইতে নির্ব্বিবাদে বিদায় লইতে পারিবে। আজ সেই দিন আসিয়াছে।"

কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, দেশের কোনও লোক এখন আর এ সকল ছেঁদো কথায় কর্ণপাত করে না। ইংরাজ ভারতবর্ষের কল্যাণকামনায় এ দেশে আছে, বালকও আজ আর এ কথায় বিশ্বাস করে না। ইংরাজ-শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, আমরা যে একটা ঘননিবিষ্ট নেশনরূপে গড়িয়া উঠিব, ইহা কেহই কল্পনা করে না। আরও এক শত বৎসরকাল ধরিয়া ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া আমরা আমাদের দেশের শাসন-সংরক্ষণের যোগ্যতালাভ করিব, ইহাও কেহ বিশ্বাস করে না। পরন্তু যত বেশী দিন এই শাসন-শৃঙ্খল আমাদিগকে নাগপাশের মত বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া রাখিবে, ততই আমাদের শৌর্য্য-বীর্য্য, বুদ্ধি-বিবেচনা, শক্তি-সামর্থ্য নষ্ট হইয়া, ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, বহু লোকের এই ধারণাই জন্মিয়াছে। এই জন্যই দেশের লোক আজ স্বরাজের নামে এত চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সার এব্রাহেম রহমত উল্লার মত দেশের লোকও নিঃসঙ্গ স্বাধীনতাই চাহে। কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্য ইহারা ইংরাজের দ্বারে ভিক্ষা করিতে রাজি নহে। ভিক্ষা করিয়া স্বাধীনতা পাওয়া যায় না, ইহাই দেশের লোকের স্থির ধারণা। উইলিয়ম আর্চারের আশ্বাস-বাক্যেও তাহারা আরও শতবর্ষকাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে রাজি নহে। তাহারা আজই, সাধ্যায়ত্ত হইলে, স্বরাজ পাইতে চাহে। আর এই স্বরাজ বলিতে তাহারা ইংরাজ-রাজের নিঃশেষ তিরোধানই বুঝে। ইংরাজের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া যে কখনও ভারতবর্ষ স্বরাজ-লাভ করিবে বা করিতে পারিবে, ইহা অতি অল্প লোকই কল্পনা করিতে পারেন।

৪

দেশের লোক ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ একেবারে চুকাইয়া দিতে চাহে। স্বরাজ বলিতে তাহারা নিঃশেষ ও পরিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা, ইংরাজীতে যাহাকে isolated sovereign independence বলে—তাহাই বুঝে। এরূপ বুঝাই স্বাভাবিক। দেশের লোক ইংরাজ শাসনাধীনে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল শাসন নহে, সাংঘাতিক শোষণও বটে। মুসলমান যতটা সাধ্য শাসনই করিত। ধনীদের ধনদৌলতও মাঝে মাঝে লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইত। ইংরাজ-রাজ্যে এ সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজ দেশের হাটবাজার যেমন ভাবে দখল করিয়া বসিয়াছে, মুসলমান কোনও দিন সে চেষ্টা করে নাই, করিলেও পারিত না। ইংরাজের শাসন আমাদিগকে এক দিকে অতিশয় সযত্নে লালনপালন করিবার চেষ্টা করিয়াই সর্ব্ব-বিষয়ে পঙ্গু করিয়া তুলিয়াছে। আর অন্য দিকে আমা-দিগকে সর্ব্ববিধ ব্যাপারে পঙ্গু করিয়া, ইংরাজ বণিকের শোষণ-কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে। লর্ড কার্জ্জন ১৬ বৎসর পূর্ব্বে নিজের মুখে ঝরিয়ার কয়লা-ওয়ালাদের ভোজে বক্তৃতা করিতে যাইয়া, এ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতে বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য কেবল শাসন নহে, শোষণও বটে,—খোলাখুলি তিনিই প্রথমে এই কথাটা বলিয়া ফেলেন। Exploitation and administration are parts of the same duty, in the Govenment of India—ইহা লর্ড কার্জ্জনেরই কথা। ইংরাজী exploitation শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। খনি হইতে খনিজ পদার্থ বাহির করিয়া আনা—exploitation; আর কোনও ব্যক্তি বা বিষয়কে নিজের স্বার্থসাধনে নিয়োজিত করাও exploitation; ধনবৃদ্ধিও exploitation; ধনশোষণও আবার exploitation. লর্ড কার্জ্জন এই exploitation শব্দ ধনাগমের পথ প্রশস্ত করার অর্থেই এখানে ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহা মানি। কিন্তু কোনও দেশের ধনাগমের পথ যদি বিদেশী ধনকুবেরেরা প্রশস্ত করিয়া দেন ও সেই ধনরাশিকে নিজের উদরসাৎ করেন,—তাহা হইলে, ধনবৃদ্ধি আর ধনহরণ একই হইয়া দাঁড়ায়। বসুন্ধরার লুক্কায়িত ধনরাশি বাহির হইল বলিয়া, ইহা development বটে, ধনবৃদ্ধি বটে; আবার এই নূতন ধন বিদেশে চলিয়া গেল বলিয়া ইহা নিকৃষ্ট অর্থে exploitation বা শোষণও বটে। ভারতবর্ষে ইংরাজ

সরকার চিরদিনই শাসনের দ্বারা শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই, দেশে নূতন নূতন ধনাগমের পথ আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও, দেশের লোকের দারিদ্র্য কমে নাই, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইংরাজ-শাসনের এই শোষণের দিকটা লোকের চক্ষুতে ক্রমে ক্রমে খুবই উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যত দিন ইংরাজ এ দেশের রাজা থাকিবে, তত দিন দেশের লোকের এই দুর্বিসহ দারিদ্র্যদুঃখ কখনই কমিবে না, কমিতে পারে না, বহু লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে।

বহু লোক ভাবে, এই শোষণের লোভেই ইংরাজ এই দেশ-শাসনের গুরু দায়িত্ব মাথায় করিয়া রহিয়াছে। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই শোষণের পথ একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং তখন আর কি লোভে ইংরাজ ভারতের স্বরাজের সঙ্গে আপনার সাম্রাজ্য-শক্তিকে জড়াইয়া রাখিবে? আমরা সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে রাজি হইলেও, ইংরাজের ইহাতে কোনও স্বার্থ নাই বলিয়া, সে এই ব্যবস্থায় রাজি হইবে না। সুতরাং এই কল্পিত প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কোনও ফল নাই।

এই ভাবে, বহু বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ লোকও এই প্রশ্নটাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন। অন্য পক্ষে আরও বহু লোক এতটা বিচার-বিবেচনা না করিয়াই, সরাসরি ভাবে, ইংরাজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ কাটিয়া ছাঁটিয়া নিঃসঙ্গে স্বাধীনতালাভের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহারা ইংরাজকে বিশ্বাস করেন না, ইংরাজ নীতি যে কখনও ভারতবর্ষের কল্যাণকামনা দ্বারা পরিচালিত হইবে বা হইতে পারে, ইহা এ দেশের লোক একেবারেই বিশ্বাস করেন না। এক দিন নাকি ইঁহারা অতিবিশ্বাসভরে ইংরাজের হাতে নিজেদের ভাগ্যসূত্রকে তুলিয়া দিতে রাজি হইয়াছিলেন। এক দিন নাকি ইঁহারা ইংরাজকে দেবতা বলিয়া ভাবিতেন, স্বাধীনতার সবল ও নিষ্ঠাবান্ উপাসক বলিয়া, ইংরাজ জগতের যাবতীয় পরাধীন জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য চিরদিন লালায়িত। কাফ্রি দাসদিগের দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের জন্য ইংরাজ কোটি কোটি টাকা অম্লানবদনে ব্যয় করিয়াছে। ইতালীর দাসত্ব ঘুচাইবার জন্য কত ইংরাজ ইতালীতে যাইয়া, সে দেশের স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। গ্রীসের স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার জন্য কত ইংরাজ আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া খাটিয়াছে। সেই ইংরাজ যে ভারতের স্বাধীনতা-লাভের অন্তরায় হইবে, তখন এ দেশের ইংরাজীনবিশরা ইহা ভাবিতেই পারেন নাই। এক দিন ইংরাজের উপরে তাঁহাদের এতটাই অচল শ্রদ্ধা ছিল। এখন সে শ্রদ্ধা আর নাই; সে বিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন আর আমাদের ইংরাজীনবিশরা পর্য্যন্ত ইংরাজকে বিশ্বাস করেন না। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। এরূপ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, প্রায় সকল লোকই যে নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা বা পরিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

কিন্তু কেবল ভাবের দ্বারা এই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে চলিবে না, বিষয়টার সকল দিক ধীরচিত্তে, সর্ব্বসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া আলোচনা করা চাহি। না হইলে, ইহার সত্য ও সমীচীন মীমাংসা সম্ভব হইবে না।

৫

সকলের আগে, আমাদের স্বরাজের অর্থটা কি, আমরা যে স্বরাজ চাহিতেছি,তাহার প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, গঠন ও কর্ম্ম কি, ইহাই তলাইয়া দেখিতে হইবে এবং তাহার পরে, এই স্বরাজের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোনও সঙ্গত সমন্বয় সম্ভব কি না, তাহার বিচার করিতে হইবে।

স্বরাজের সোজাসুজি মানে এই যে, আমরা আমাদের দেশের শাসন-সংরক্ষণ নিজেরা করিব, আমাদের শাসনযন্ত্রে কোনও বিদেশীর হাত থাকিবে না। অর্থাৎ (১) দেশের প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের আইনকানুন রচনা করিবেন; (২) যাহারা এই সকল আইনকানুন অনুযায়ী রাজ্য-শাসন করিবে, তাহারা সকলে এই সকল নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের দ্বারা নিযুক্ত হইবে ও সকল বিষয়ে তাহাদের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিবে; (৩) এই সকল নির্ব্বাচিত প্রজাপ্রতিনিধিগণই দেশের শাসনকার্য্যের আয়-ব্যয়ের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবেন; কোন্ হিসাবে কত ব্যয় হইবে, ইঁহারাই তাহা ঠিক করিবেন; এবং কি উপায়ে এই ব্যয়োপযোগী রাজস্ব তুলিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন; ইঁহাদের অভিমত অনুযায়ীই

কেবল প্রজার উপরে ট্যাক্স বসিতে পারিবে; আর ইঁহাদের সম্মতিক্রমেই দেশের রাজস্ব ব্যয় হইবে, এ বিষয়ে অপর কাহারও কোনও কথা কহিবার বা কর্ম্ম করিবার অধিকার থাকিবে না; (৪) এই সকল নির্ব্বাচিত প্রজাপ্রতিনিধিই দেশের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যসামন্তাদির ব্যবস্থা করিবেন, সেনাপতি প্রভৃতি নিয়োগ করিবেন, এবং সেনা বা সমরবিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণ, অন্যান্য বিভাগের রাজকর্ম্মচারীদিগের মত, এই প্রজাপ্রতিনিধি সভার আদেশ প্রতিপালন করিয়া চলিবেন; (৫) পররাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহাদি ব্যাপারেও এই প্রজাপ্রতিনিধি সভারই অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকার রহিবে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ বলিতে মোটের উপরে লোক ইহাই বুঝিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন এই, এই স্বরাজের সঙ্গে সাম্রাজ্যসম্বন্ধের বা imperial connection'এর কোনও অপরিহার্য্য বিরোধ আছে কি না? অথবা বর্ত্তমান প্রসঙ্গে—আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া এই স্বারাজ্য লাভ করিতে পারি কি না?

৬

বর্ত্তমানে বৃটিশ সাম্রাজ্য যে ভাবে আছে আর আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, তাহাতে আমাদের স্বারাজ্যের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা বিরাট বিরোধ বাধিয়াই আছে। যত দিন বৃটিশ সাম্রাজ্য নূতন করিয়া গড়িয়া না উঠিতেছে, আর আমাদেরও বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইতেছে, তত দিন এই বিরোধের কোনও মীমাংসা হইবে না, হইতেই পারে না; সুতরাং আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে পারিব কি না, এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রথম কথা, এই সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন সম্ভব কি না? বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন না হইলে, আমাদের স্বারাজ্যের সঙ্গে কিছুতেই ইহার খাপ খাইবে না, খাইতেই পারে না। ভারতের স্বারাজ্য-সমস্যার সঙ্গে বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন-সমস্যা একসূত্রে গাঁথা পড়িয়া আছে।

৭

এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যটা অনেকটা কেবল জোড়াতাড়া দিয়া এক হইয়া রহিয়াছে। এই সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বা অঙ্গের পরস্পরের মধ্যে কেবল কোনও ঘননিবিষ্টতাই যে নাই, তাহা নহে; কোনও প্রকারের নির্দ্দিষ্ট যোগবন্ধনও নাই বলিলেই চলে। এই সাম্রাজ্যের দুইটা বিভাগ—এক ভাগ শ্বেতাঙ্গ, অপর ভাগ শ্বেতেতর বর্ণের প্রজাপুঞ্জের দ্বারা অধ্যুষিত। বৃটিশ যুক্ত রাজ্য—(United Kingdom of Great Britain and Ireland), ক্যানাডা (Canada), অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড (Australia and New Zealand) এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa)—এইগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ-অংশ। ইংরাজীতে ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতিকে White Dominions কহে। এগুলিতে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বস্তুতঃ স্ব-তন্ত্র রাষ্ট্র, Sovereign states; ইংরাজ রাষ্ট্রনীতিতে আজিকালি এগুলিকে Sovereign states বলিয়াই মানিয়া লওয়া হয়। ইংলণ্ড যেমন একটা স্ব-তন্ত্র রাষ্ট্র, একটা Sovereign state, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিও সেইরূপই স্ব-তন্ত্র রাষ্ট্র বা Sovereign state. অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি, নিজেদের আইনকানুন নিজেরা নির্দ্ধারণ করে, নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা নিজেদের ইচ্ছামত নিজেরা করে। নিজেদের টাক্স নিজেরা ধার্য্য করে, নিজেরাই নিজেদের প্রয়োজন ও অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজেদের সংগৃহীত রাজস্ব ব্যয় করিয়া থাকে, এ সকল বিষয়ে বৃটিশ পার্লেমেণ্টের তাহাদের উপরে কোনও কথা কহিবার কেশাগ্রপ্রমাণ অধিকারও নাই। ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রজাপ্রতিনিধি সভাই নিজ নিজ দেশের শাসনসংরক্ষণের, আপনাপন অধিকারে শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী। "The Colonial Parliaments are responsible for the preservation of law and order within their respective territories"—এ জন্য তাহারা বৃটিশ পার্লেমেণ্টের নিকটে দায়ী নহে। এখন পর্য্যন্ত, এ সকল রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণার অধিকার নাই। এ অধিকার, আইনতঃ কেবল বৃটিশ-রাজেরই আছে। কিন্তু কোনও যুদ্ধে বৃটিশরাজের সাহায্য করিতেও ইহারা বাধ্য নহে। ইচ্ছা হইলে ইংরাজকে সৈন্যসামন্তাদি দিয়া সাহায্য করিতেও পারে, ইচ্ছা না হইলে না-ও করিতে পারে। এ বিষয়ে ইংরাজ তাহাদিগকে

জোর করিয়া কিছুতেই বাধ্য করিতে পারেন না। অতএব বৃটিশ-সাম্রাজ্যের শ্বেতাঙ্গ-বিভাগ কতকগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সমষ্টি, স্বেচ্ছায় ইহারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হইয়া আছে। ইহারা কোনও বিষয়ে এক অন্যকে বাধ্য করিতে পারে না; এক অন্যের উপরে নিজের মত জোর করিয়া চালাইতে পারে না। ফলতঃ ইহাদের নিজেদের ইচ্ছা বা খেয়াল ছাড়া, এ সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে, কোনও প্রকারের নির্দ্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট আইনকানুনের বন্ধন নাই। ইংলণ্ড যেমন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, যেমন একটা Sovereign state, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতিও সেই-রূপই এক একটা Sovereign state—ইহারা এখনও সত্যভাবে একটা রাষ্ট্রসঙ্ঘে বা 'federation'এ গড়িয়া উঠে নাই।

আর যত দিন না ইহা হইতেছে, যত দিন না বর্ত্তমান বৃটিশ সাম্রাজ্য সমবায়-সূত্রের উপরে—federation-idea বা princeple'এর উপরে নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে, যত দিন না বৃটিশ সাম্রাজ্যের Constitutional reconstruction হইতেছে, তত দিন ভারতবর্ষের স্বারাজ্য নিঃসঙ্গ স্বাধীনতা বা isolated sovereign independence'এর পথে প্রতিষ্ঠিত হইবে, না সমবায়ের বা federation'এর পথে গড়িয়া উঠিবে, এ প্রশ্নের সম্যক্ মীমাংসা হইবে না, হইতেই পারে না।

এই জন্য ভারতের স্বারাজ্য-সমস্যার সঙ্গে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন-সমস্যা অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়াইয়া আছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উন্মাদনা

ঝলমল চন্দ্রলেখা দিগন্তের ভালে,
মন্দ সান্ধ্যসমীরণে এ কি উন্মাদনা,
বধুসম কত স্মৃতি—প্রেমের কল্পনা,
কাঁপিছে বক্ষের মাঝে স্পর্শ ইন্দ্রজালে।

কাহার কটাক্ষ তীব্র নক্ষত্র ছড়ায়,
সুরভি নিশ্বাস কা'র কপোলে কপোলে
কার পুষ্পস্পর্শ বুকে মাল্যসম দোলে
কা'র লাগি কাঁদে প্রাণ বিরহ-ব্যথায়!

বাহিরে বাহিরে কেবা করে আকর্ষণ,
জলে স্থলে ফুলদলে কা'র সঙ্গস্মৃতি,
দেখেছি কি দেখি নাই কা'র দেবাকৃতি
নিত্য কিশোরীর ছবি—যৌবন-স্বপন!

নাগিনীর মত তা'র বেণী বিনোদিনী,
আমায় বেঁধেছে পাশে—হা রে ভুজঙ্গিনী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

পারস্যের জাগরণ

বিংশ শতাব্দীর আকাশে একটা নূতন সুর বাজিতেছে—বাতাসে তাহার স্পন্দন অনুভূত হইতেছে; সে সুর জাগরণের। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সকল বিষয়ে জীবনস্পন্দন লক্ষিত হইতেছে। সে হিসাবে পারস্যের জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণের অনেকেরই মুখে শুনা যাইত—"পারস্যের দুর্গতির শেষ নাই, উহা ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।" আবার কেহ কেহ দিন শুনা গিয়াছে। অবশ্য লোক স্ব স্ব স্বার্থের অনুরোধেই এমন সকল কথা রটাইয়াছিল। কিন্তু পারস্যবাসীদিগের পক্ষ হইতে কেহ চিন্তা করিয়া কোন কথা বলেন নাই।

ইদানীং পারস্যের জাগরণ দেখিয়া কতিপয় পাশ্চাত্য মনীষী এই জাতির সম্বন্ধে নানা প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন। সেগুলি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে। পারস্য সত্যই জাগিয়াছে, অথবা জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।

পারস্যের তীর্থযাত্রী—রাজপথে পান্থ-নিবাস।

এমনও বলিতেন, "যদি কোন য়ুরোপীয় বা মার্কিণ পারস্যের শাসন-সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করেন, তবে হয় ত উহা আবার জীবনসংগ্রামে টিকিয়া যাইতে পারে।" সৌখীন মৃগয়াপ্রিয় ব্যক্তিরা বলিতেন, "পারস্য বড় চমৎকার দেশ, সেখানে মৃগয়ার বড়ই সুবিধা। সে দেশে রেলের বিস্তার হইলে সর্ব্বনাশ হইবে, শোভা ও সম্পদ কিছুই থাকিবে না।" পারস্য সম্বন্ধে এমনই নানা ভাবের নানা কথা এত

সমগ্র বিশ্বে যে জাগরণ বার্ত্তার সুর বাজিতেছে, তাহা পারস্যবাসীর কর্ণরন্ধ্রেও প্রবিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং তাহারা নিদ্রাঘোর হইতে জাগিয়া উঠিয়া আপনাদের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

পারস্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কথাই আছে, তন্মধ্যে পারস্যের জনসংখ্যা আলোচনার প্রধান বিষয়। প্রাচীন যুগে পারসিকগণ অশেষ যশঃ উপার্জ্জন করিয়া

ইতিহাসে তাহাদের কীর্ত্তিকথা চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দেশের জনসংখ্যা কত, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্বের তুলনায় পারস্যের জনসংখ্যা এখন হ্রাস পাইয়াছে। ভূমির আবাদও কমিয়া গিয়াছে। বহু ক্ষেত্র অকর্ষিত অবস্থায় পতিত। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহার ফলে অসংখ্য নরনারী অন্তর্হিত হইয়াছে এবং এখনও পর্য্যন্ত তাহার জের চলিতেছে। জনশক্তির কি, আরব, ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশে তাহাদের অসাধারণ প্রভাব। য়ুরোপ ও আমেরিকাতেও সে প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে। কিন্তু লোকবল হিসাবে পারস্য শতাব্দীর পর শতাব্দী যেন ভিন্ন পথেই চলিয়াছে—লোকবল অধিক না হইলে সে দেশের জাতীয়তা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে।"

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতেই সমগ্র প্রাচ্যদেশে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এ কথা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কথাটা মিথ্যা নহে।
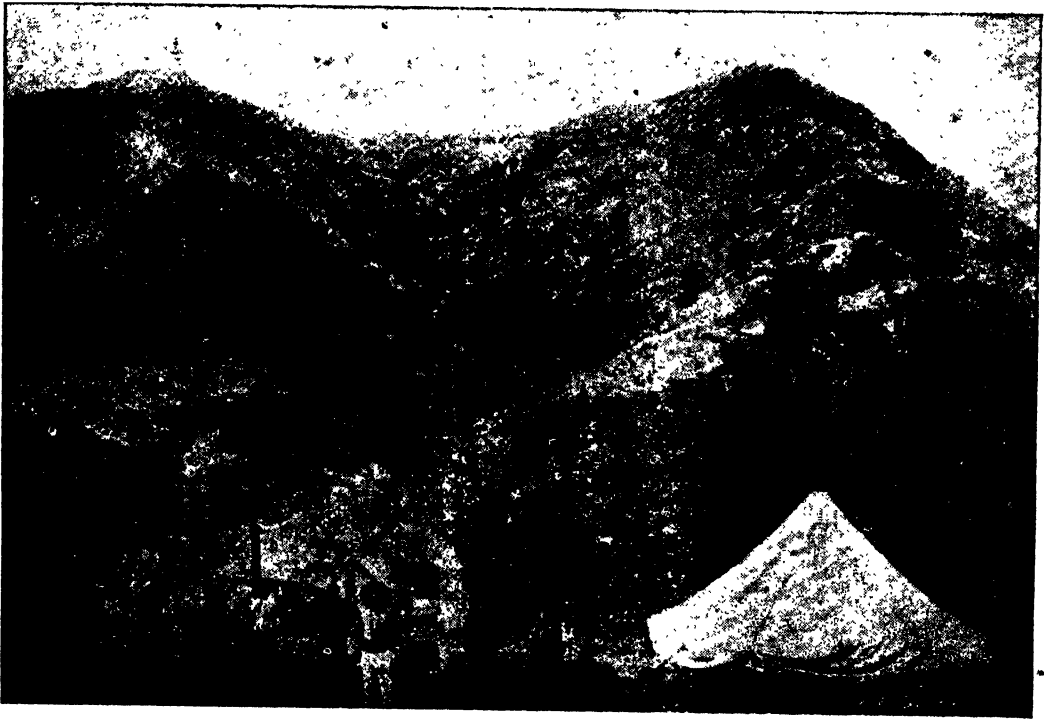
পারস্যের তৈলখনি—দালিকি।

উপরই দেশের প্রকৃত শক্তি ও প্রতিপত্তি নির্ভর করিয়া থাকে। দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে গেলে লোকবলের প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ লেখক আর্থার মুরের বর্ণনা ও হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায়, এ বিষয়ে পারস্য কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। লেখক এক স্থলে বলিয়াছেন, "পারস্যদেশে এখনও ভবিষ্যদ্দর্শী তত্ত্বজ্ঞের আবির্ভাব হইতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'বাব' ও 'বাহাউল্লা' সম্প্রদায়ের প্রভাবপ্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল এখনও দিন দিন তাহাদের প্রভাব বাড়িতেছে; এমন

রুস-জাপান যুদ্ধে জাপানের ক্ষাত্রশক্তি যখন রুসের সামরিক অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, তখন হইতেই পারস্য, তুরস্ক, চীনদেশ প্রভৃতি জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। পারস্যদেশে সেই সময় হইতেই প্রজাশক্তি নিয়মতন্ত্রশাসনাধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল। পারস্যের শাহ মজঃফর উদ্দীন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রজাদিগকে সে অধিকার দান করিয়াছিলেন। অবশ্য জনসাধারণ তাহাতে বিশেষ লাভবান্ হয় নাই। পারস্যের শাহ যে রাজক্ষমতার পরিচালন করিতেন, তাহা হস্তান্তরিত হইয়া দেশের আমীর

পারস্যের রমণীরা কাপড়ের উপর ছাপ মারিতেছে।

ওমরাহ (উ-দোলা এবং উল্‌মুল্‌ক) দিগের করতলগত হইয়াছিল। অর্থাৎ দেশের অভিজাতসম্প্রদায়ই সাম্রাজ্য-পরিচালনক্ষমতা ব্যবহার করিতেছিলেন, কদাচিৎ কোনও দলের সামরিক নেতা তাহার ফলভাগী হইতেন।

ঐতিহাসিক আর্থার মুর এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"বিগত দ্বাদশ বৎসরের পারস্য ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সৈয়দ জিয়াউদ্দীনকে বাদ দিলে, সাধারণতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ই দেশের মালিক হইয়া উঠিয়াছিলেন, তবে কখনও কখনও কোনও সামরিক শক্তি পারস্যের শাসনক্ষমতা পরিচালন করিয়াছে, তাহাও দেখা গিয়াছে।"

মহম্মদ আলী শাহ যখন পারস্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন, সেই সময় সত্তর খাঁ নামক জনৈক জাতীয় দলভুক্ত নেতা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। মহম্মদ আলী শাহ তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সত্তর খাঁ জাতীয় দল সহ তাঁহার অভিযানে বাধা প্রদান করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের বলপরীক্ষা হয়। তেব্রিজ নগরে থাকিয়া সত্তর খাঁ দক্ষতা সহকারে মহম্মদ আলী শাহের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে জাতীয় দল তিহারাণ অধিকার করিয়া সত্তর খাঁকে আতাবেগ পার্কে শ্রেষ্ঠ নেতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল এবং তাঁহার উপর দেশশাসনের ভার অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও অধিক কাল দেশ-নেতার অধিকার ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার 'হুলাকলা

পারস্যের বণিক গর্দ্দভপৃষ্ঠে তুলার বোঝা চাপাইয়া রুসিয়ায় রপ্তানী করিতেছে।

পারস্যের কৃষক—শস্য সংগ্রহ করিতেছে।

ধরা পড়ায়, ইপ্রেম নামক জনৈক আর্ম্মেনীয় যুবকের পরিচালিত বাহিনী তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধিকার ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

পারস্যে পর্য্যায়ক্রমে যতগুলি শাসনপরিষদ গঠিত হইয়াছিল, তাহার কোনটিই দৃঢ়হস্তে দেশের শাসনসংরক্ষণ ব্যাপার পরিচালিত করিতে পারে নাই। পদে পদে দৌর্ব্বল্য প্রকট হইয়াছিল। পররাষ্ট্রসংক্রান্ত নীতি লইয়া প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে কোন গবর্ণমেণ্টই সমর্থ হয়েন নাই—দেশের আভ্যন্তরীণ ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি ত দূরের কথা। "মজলিস" সাধারণ প্রজার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। দেশে শুধু করভারবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, অথচ দেশের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনের কোন চেষ্টাই হয় নাই। শাহের হস্ত হইতে দেশশাসনের ভার লইয়া দেশের অভিজাত-সম্প্রদায় দেশবাসীর কোনও কল্যাণানুষ্ঠান করেন নাই, করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত হয় নাই। "মজলিস্" ও দেশের সংবাদপত্র-নিচয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের কঠোর সমালোচনা করিতেন, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট, রাজস্ব যাহাতে "মজলিসের" করতলগত না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন—দেশের শাসনসংরক্ষণ ব্যাপারে কোনও বিধিসঙ্গত উন্নতির প্রয়াস দেখায় নাই। "মজলিস"এর সমালোচনা কোন কোন বিষয়ে কঠোর ছিল সত্য, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাহা এমন নরম সুর ধরিত যে, তাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ অনুষ্ঠিত হইত না। পারস্যের এই "মজলিস" বা পার্লামেণ্ট ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৬ বৎসর এক প্রকার অবস্থাতেই ছিল।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ জিয়াউদ্দীনের দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেণ্ট দেশের প্রকৃত উন্নতিজনক কার্য্যে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। সৈয়দ জিয়াউদ্দীন বয়সে নবীন এবং সাহিত্যিক। সাধারণ অবস্থা হইতে শুধু লেখনীপরিচালনার গুণে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বড়ঘরের সন্তান নহেন, কোনও অভিজাত বংশের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তাঁহার ওজস্বিতাপূর্ণ রচনা পাঠ করিয়া দেশের লোক তাঁহাকেই নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করে, সামরিক শক্তির সহায়তায় ক্রমে তিনি শাসনসংরক্ষণ ব্যাপারে প্রধানের কায করিতে থাকেন। তাঁহারই চেষ্টায় ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম সংস্কার ঘটে।

সর্দ্দার সিপা তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। পারস্যের ক্ষাত্রশক্তি সর্দ্দার সিপার অধীনতায় পুষ্টিলাভ করিতেছিল। কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় সর্দ্দার সিপা, সৈয়দ

জিয়াউদ্দীনকে সাহায্য করিতে বিরত হয়েন। তাহার ফলে জিয়াউদ্দীনকে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হয়। তখন হইতে পারস্যে আবার "মজলিস্" বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্দ্দার সিপা-ই এখন পারস্যের শাসন-পরিষদের ভাগ্যবিধাতা। সাধারণতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্যপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করেন না। তিনি শুধু সেনাদলের সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত আছেন। সেনাদলের বেতনাদি নিয়মিতভাবে যে গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিতে পারেন—সেই গবর্ণমেণ্টই উপযুক্ত, ইহাই তাঁহার ধারণা।

তিহারানস্থিত পারস্য পার্লামেণ্ট গৃহ।

বিগত ১৭ বৎসরে পারস্যে যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—রাষ্ট্র-বিপ্লব, মজলিস বা পার্লামেণ্ট, ঘন ঘন গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তন—তাহা হইতে বুঝা যায় যে, শাহদিগের একাধিপত্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অভিজাত সম্প্রদায় নির্বীর্য্য—জনসাধারণের উপর তাঁহাদের কোনও প্রভাব নাই। এখন জনসাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ক্ষাত্র-শক্তিসম্পন্ন সর্দ্দার সিপা-ই জননায়ক। তাঁহার ইঙ্গিতেই পারস্যের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে।

সর্দ্দার সিপা, সেনাদল হইতে বিদেশীয়গণকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছেন। পারস্যের পুলিস ও সেনাদলে এক জনও বৈদেশিক সামরিক কর্ম্মচারী নাই। দেশীয় সৈনিক ও কর্ম্মচারীর দ্বারা বাহিনী সংগঠিত হইয়াছে। সমগ্র পারস্যে এক জনও রুস সৈনিক নাই। মিঃ মুর বলেন, "বৃটিশ ও রুস দূতনিবাসের প্রভাব পারস্যে নাই বলিলেই চলে।"

পারস্যের বিংশ শতাব্দীর রবীন্‌হুড ফুচিক খাঁ, দীর্ঘকাল ধরিয়া পারস্যের ধনকুবেরগণের ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া আপনাকে পারস্যের সোভিয়েট গণতন্ত্রের সভাপতি বলিয়া ঘোষণা করিতেছিল; সর্দ্দার সিপার প্রভাবে তাহার অসামান্য ক্ষমতা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ফুচিক খাঁই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে জেনারল ডনষ্টারভিল-পরিচালিত বৃটিশবাহিনীকে পারস্যের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অশেষ দুঃখ দিয়াছিল। ৪ বৎসর ধরিয়া এই ব্যক্তি রেষ্ট জিলার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিয়াছিল। এখন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই বলিলেই চলে। কুর্দ্দ সর্দ্দার সিম্‌কো, তুরস্ক ও পারস্যের সীমান্তপ্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া তাহার বিজয়বৈজয়ন্তী উরুমিয়া জিলায় উড্ডীন রাখিয়াছিল। সর্দ্দার সিপার প্রবল-বাহিনী তাহাকে উপর্য্যুপরি নানাস্থানে পরাজিত করিয়াছে।

পারস্যের সেনাদল এ যাবৎ রুসীয় সামরিক কর্ম্মচারী-দিগের দ্বারা পরিচালিত হইত, কসাক সৈনিকগণই সমগ্র

পারস্যের প্রধান মন্ত্রী—রিজা খাঁ সর্দ্দার সিপা।

লণ্ডনস্থিত পারস্য সচিব মির্জ্জা দায়ুদ খাঁ।

পারস্য সেনাদলের শ্রেষ্ঠ ছিল; সে বাহিনীতে পারস্যের ভদ্রবংশীয় যুবকগণ প্রবেশ করিতে চাহিত না। কিন্তু এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অভিজাত সম্প্রদায় এবং বিশিষ্ট ঘরাণার যুবকগণ স্বেচ্ছায় সর্দ্দার সিপার দ্বারা পরিচালিত বাহিনীতে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা এখন বুঝিতে শিখিয়াছে, এমন সম্মানজনক কার্য্য আর নাই, জাতীয়তার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পারস্য এখন বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে বলিতে হইবে।

পারস্যের গোলন্দাজ সেনাদলের প্রদর্শনী।

সর্দ্দার সিপার দ্বারা গঠিত এই নূতন পারসিক সেনাদল বহুলাংশে য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত। তাহাদের বেশভূষা, সামরিক কলা-কৌশল য়ুরোপের উন্নততর প্রণালীকে অবলম্বন করিয়াছে। সর্দ্দার সিপা এখন আর শুধু সর্দ্দার নহেন, এখন তিনি পারস্যের প্রধান মন্ত্রী। এই পদ প্রাপ্তির ˋ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সমর-সচিব ছিলেন। সেই সময় হইতে সেনাদলের সংস্কারের প্রয়োজনীতা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পারস্য সেনাদলে কসাক অশ্বারোহী সেনাদলের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রুসিয়ার সামরিক প্রণালীতে তাহাদের বেশভূষা, সমরসজ্জা প্রভৃতি সম্পাদিত হইত, বাস্তবিক পারসিক কসাক সেনাদলের সাহস, বিক্রম,

সামরিক কর্ম্মচারী—জেনারল প্রিন্স আমাগুল্লা।

নূতন পরিচ্ছদে তরুণ সামরিক কর্ম্মচারী।

পারস্যের সেনাদলের সামরিক কর্ম্মচারি বৃন্দ।

অকুতোভয়তা, অশ্বারোহণ কৌশল যে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাদের সমুজ্জ্বল বেশভূষা দর্শকের চিত্তে একটা প্রভাব বিস্তার করিত, তাহাদের অস্ত্রচালনার কৌশল বিস্ময়কর ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে রণশাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুরোপের মহাকুরুক্ষেত্ররণে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পৃথিবীর লোক পাইয়াছে। সর্দ্দার সিপা তাহা বুঝিয়া দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে সংস্কৃত করিয়া লইতেছেন। অশ্বারোহী সেনাদলের দ্বারা বর্ত্তমান যুগে রণজয় করা অসম্ভব। তরবারি চালনা, অশ্বারোহণ-কৌশলে বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। এখন বৈজ্ঞানিক যুগ, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাবিধ মারণাস্ত্রের আবিষ্কার হইতেছে; শারীরিক শক্তি অথবা অস্ত্রচালনার কৌশল বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়াই সর্দ্দার সিপা অশ্বারোহী সেনাদলের প্রয়োজনীয়তা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইদানীং পারস্যের সেনাদলে ৬০ হাজার সৈনিক আছে, তাহাদের পোষাক খাকি রঙ্গের, যুদ্ধকালে এই খাকি পরিচ্ছদই তাহাদিগকে ধারণ করিতে হইবে। তবে চিরা-চরিত দেশীয় প্রথা অনুসারে অন্যান্য সময়ে সৈনিকগণ অন্য সুদৃশ্য পরিচ্ছদও পরিধান করিতে পারিবে।

রিজা খাঁ সর্দ্দার সিপার দক্ষিণহস্তস্বরূপ প্রিন্স আমানুল্লা মির্জ্জা এখন সমরবিভাগের প্রধান সামরিক কর্ম্মচারী। তিনি সম্প্রতি য়ুরোপে যাইয়া সমরবিভাগের উপযোগী বিবিধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করিতেছেন। পারস্য সেনাদলকে সকল প্রকার পাশ্চাত্য সমরপ্রণালীতে অভিজ্ঞ করিয়া তুলাই এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য। প্রিন্স আমানুল্লাই কুর্দ্দ সর্দ্দার বিদ্রোহী সিমকোকে পরাজিত করেন।

নবগঠিত সেনাদলে নিরক্ষরকে গ্রহণ করা হয় না।

যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি আছে এবং যাহারা ভদ্রসন্তান, এমন যুবককেই সামরিক কর্ম্মচারী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে পারস্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অবহিত। ৩টি পূরা দল যাহাতে অনায়াসে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে, পারস্য গবর্ণমেণ্ট এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলের কামান চালাইবার ও ব্যবহার করিবার দিকেই কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি অধিক।

তারহীন বার্ত্তায় অভিজ্ঞ সিগ্‌নালার, সমরক্ষেত্রের ব্যাপারে অভিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি পারস্য সেনাদলে পর্য্যাপ্ত বিদ্যমান। পারস্য যে জাগিয়া উঠিয়াছে, এই সেনাদল সংস্কারেই তহোর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মরুভূমিপ্রদেশস্থ নগরগুলিকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য উষ্ট্রবাহিনী সিস্তান নগরে অবস্থান করিতেছে। এই বাহিনীও আধুনিক সমরপ্রণালীতে শিক্ষিত।

লণ্ডনস্থিত পারস্য-সচিব মির্জ্জা দায়ুদ খাঁ পারস্য গবর্ণমেণ্টের নবপ্রবর্ত্তিত প্রণালীর অনুরক্ত ভক্ত। দেশবাসীকে তিনি য়ুরোপীয় প্রণালীতে বিদ্যাচর্চ্চা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়া থাকেন।

পারস্যের কৃষিসম্প্রদায় হইতে যাহারা সেনাদলে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অশেষগুণপণা প্রকাশ করিয়া থাকে। এ সত্যটি শুধু পারস্য দেশ বলিয়া নহে—সকল দেশের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিবাসীদিগের লক্ষ্যভেদক্ষমতা, সমতলক্ষেত্রবাসীদিগের তুলনায় অধিক। পারস্যের অধিবাসীরা সাধারণতঃ সৈনিকের জীবনযাত্রার বিশেষ অনুরাগী। এজন্য অধিকসংখ্যক ব্যক্তি সাগ্রহে পারস্যের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে।

স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সেনানিবাস, ব্যায়ামাগার সমূহও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সামরিক ব্যাপারে পারস্য যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অনতিকালমধ্যে ক্ষাত্রশক্তিতে পারস্য প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহা পারস্যের পক্ষে বিশেষ আশা ও আনন্দের কথা।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

পাগলের গান

পাগল আমি বাজাই বীণা
আনমনে চেয়ে দেখি সে এসেছে কি না?
বকুল ফুলে ফুল—শাখে শাখে,
চাঁদের বাঁকা রেখা গাছের ফাঁকে!
বাতাস বাসভরা সাদরে দেয় ধরা
আশ না মেটে তবু—সে মিঠে দিঠি বিনা!
ঐ না বাজে তার মলের রুণ রুণ?
ঐ গো শুনি যেন গানের গুন্‌গুন্!
আসে না কেন কাছে? বুঝি বা ঘরে আছে
আমারি শত কাজে ব্যাপৃত লীলা;
বাদর আঁখিজল নয়নে নামে;
বেহাগ গীতরাগ বিরাগে থামে?
কাঁদিয়ে বীণা কয়, তোমার কায নয়?
ছাড় মোরে দয়া কর, জালিও না জালিও না?
ফুল কহে তা হবে না গাও কবি;
আমরা বাঁচি প্রাণে গন্ধ লভি;
বায়ু কয় গাও ভাই, তোমাতে গতি পাই
চাঁদ বলে, ওগো চাঁদ, থামিও না থামিও না;
সবাই বোল তোল—গাওনা তোলে,
আসি যে ভুলিবারে—গিয়াছি ভুলে?
সে নাই! বুঝি বা নাই! তবুও বাজাই গাই,
বেদনায় সুধা এত, জানি না ত তা জানি না!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

উড়ো চিঠি

আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের কেউ কারও পুরো নাম ধরে ডাকতো না। নামগুলোকে দুমড়ে দাম্‌ড়ে নিংড়ে রস না বার করলে যেন ডেকে সুখ হোতো না। এর মধ্যে বয়সের কোনও খাতির ছিল না। কিন্তু জগদীশের বেলায় আড্ডার এই সনাতন নিয়মটির ব্যতিক্রম হয়েছিল। দলের সবাই তার পুরো নামের পিছনে আবার একটা "দা" যোগ কোরে তার লম্বা নামকে আরও লম্বা কোরে দিয়েছিল। জগদীশের চেহারায়, বাক্যে ও ব্যবহারে এমন একটা দাদাত্ব মাখান ছিল যে, প্রথম দর্শনের দিনেই আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই তাকে দাদার সম্মান দিয়ে ফেলেছিলুম।

সে দিন আড্ডায় নারীর ভোটের অধিকার নিয়ে আলোচনা চল্‌ছিল। বিলাসকুমার মেয়েদের স্বাধীনতার বিরোধী মত প্রকাশ করছিল আর মেয়েদের পক্ষ নিয়ে তর্ক করছিল জগদীশ। বিলাস—নামে বিলাস হোলেও জাতে ছিল সে সন্ন্যাসী। তা ছাড়া তর্কে তার বুদ্ধি মাড়োয়ারীদের জুয়ার বুদ্ধির চেয়েও ঢের প্রখর ছিল। আমরা কেউ তার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠতুম না। বিলাস যে দলে থাকতো, সে দল যুক্তিতে হেরে গেলেও শেষকালে গলাবাজিতে বাজি মাৎ করতো।

রোজ তারিখের মত সে দিনও আমরা নিঃস্বার্থভাবেই তর্ক কোরে চলেছিলুম, কিন্তু সে দিন জগদীশের যুক্তির কাছে বিলাসের যুক্তি, এমন কি, তার গলাবাজি পর্য্যন্ত থেমে গেল। বিলাসকে সেদিনকার মত রণে ভঙ্গ দিতে হোলো। তর্কের শেষে সখীচাঁদ বল্লে—"জগদীশদা, নারীর অধিকার সম্বন্ধে তুমি এক দিন বক্তৃতা দাও, আমরা বন্দোবস্ত করি।"

বক্তৃতার কথা শুনে জগদীশ একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্লে—"না না, ও সব হাঙ্গামা যদি কর, তা হোলে আড্ডায় আমার আসা বন্ধ হবে। সভা, সমিতি, বক্তৃতা সে সব অনেক দিন চুকে গিয়েছে, আর নয়।"

আমরা তাকে ধ'রে বসলুম "কেন চুকে গিয়েছে?" জগদীশ বলতে লাগলো—

"নারীর উন্নতি ও নারীর কল্যাণসাধনাকে এক দিন জীবনের প্রধান ব্রত করেছিলুম। সভা-সমিতিতে আমার বক্তৃতা, মাসিকে, সাপ্তাহিকে আমার প্রবন্ধ দেশের সনাতনপন্থীদের ব্যস্ত কোরে তুলেছিল। আমাদের বংশ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। আমার মা, খুড়ী, পিসী, ঠাকুরমা এঁরা সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পেতেন না। পাল্কী ডুবিয়ে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আমার বাবার এক পিসীর সত্য সত্য গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়েছিল। ছেলেবেলায় খুড়োদের এই নিয়ে গর্ব্ব করতে শুনেছি। এমনই পবিত্র পরিবারের একমাত্র বংশধর আমি যখন আমার স্ত্রীকে নিয়ে সভা-সমিতিতে যেতে আরম্ভ করলুম, বন্ধুসমাজে অবাধে স্ত্রীকে মিশতে দিলুম, তখন সমাজে একটা বিপুল আন্দোলনের ঢেউ উঠলো। দুই এক খানা বাঙ্গালা খবরের কাগজে ব্যঙ্গচিত্রও ছাপান হয়েছিল। কিন্তু এ সব বাধা উপ্‌চে আমার উৎসাহের স্রোত গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের আকারে ছুটতে লাগলো। উভয় পক্ষে তুমুল মসীযুদ্ধ, সভা-সমিতিতে বাক্‌-যুদ্ধ, দুই এক যায়গায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত হয়ে গেল। কয়েক বছর এই রকম অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর বিপক্ষদলের উৎসাহে যেন ভাঁটা প'ড়ে এল। আমার দলে তখন অনেক লোক; বিপক্ষ দলের অনেকেও কেউ সোজা ভাষায় কেউ বা ভাবে আমাদের মত সমর্থন করতে আরম্ভ করেছে, কোনও রকম বাধা না থাকায় আমাদের কায ধাঁ ধাঁ কোরে এগিয়ে চলেছে, স্ত্রীশিক্ষার দুটো তিনটে প্রতিষ্ঠানও খোলা হয়েছে, এই রকমে জয়ের নেশায় মন যখন আমার ভরপুর, ঠিক সেই সময় উড়ো চিঠি একখানা কানে কানে এসে ব'লে গেল—"নির্ম্মলের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর ব্যবহারটা একটু সন্দেহের চোখে দেখো। এখন থেকে সাবধান না হোলে ভবিষ্যতে পস্তাতে হবে। ইতি তোমার বন্ধু।"

আমি তখন টেবিলে ব'সে কি একটা কায করছিলুম। কাযটাজ সব চুলোয় গেল। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোলো! নির্ম্মল! সংসারে সব চেয়ে বড় বন্ধু আমার সে! সে আমায় এত বড় আঘাত দেবে?

নির্ম্মল, আমি ও শান্তি আমরা একই গ্রামের ছেলে-মেয়ে। আমরা একসঙ্গে মানুষ হয়েছি বল্লেও চলে। আমি ও নির্ম্মল একসঙ্গে স্কুল ও কলেজে পড়েছি; কলেজ থেকে বেরিয়ে আমরা হু'জনে হাত ধরাধরি কোরে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছি। সে আমার সমস্ত কাযের সর্ব্বপ্রধান সহায়—সেই নির্ম্মল! আমার মাথার ভিতর ঝিঁ ঝিঁ বাজতে লাগলো, টেবিলে মাথা দিয়ে ঘাড় হেঁট কোরে ব'সে রইলুম। বুকের মধ্যে একটা চাপা যন্ত্রণা হোতে লাগলো, আর সে রকম ব'সে থাকতে না পেরে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার সময় শান্তি বল্লে—"এখন বেরোচ্ছ যে? অপেরা হাউসে যাবে না, সিট বুক্ করা হয়ে গিয়েছে যে!" আমি বল্লুম—"তুমি যেও, বিশেষ একটা কাযে আমার যাওয়া হোলো না।"

শান্তি অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, আমি আর কথা না ব'লে তর্ তর্ কোরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে চ'লে গেলুম।

রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মনের মধ্যে নির্ম্মল ও শান্তির ব্যবহারটা ভাল কোরে আলোচনা করতে লাগলুম। নির্ম্মল সর্ব্বদাই আমার বাড়ীতে আসে। আমার অনেক বন্ধুই আমার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতো, কিন্তু নির্ম্মলের মত ঘনিষ্ঠতা আর কারও সঙ্গে ছিল না। নির্ম্মলের প্রতি শান্তিরও বিশেষ পক্ষপাতিতা দেখা যেত। অন্য বন্ধুদের চাইতে নির্ম্মলের সঙ্গ তাকে বেশী আনন্দ দিত। অনেক সময় রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে দেখেছি, সে আর শান্তি ব'সে গল্প করছে। শান্তি আমাকে না জানিয়ে তাকে দিয়ে অনেক জিনিষ কিনিয়ে আন্তো; আমি জানতে পারলে সে বলতো—"তোমার এত কায"—

ওঃ, এত দিন যে সব ঘটনাকে অতি তুচ্ছ ব'লে মনের কোণেও স্থান দিই নি; আজ সেই সব ঘটনা এক একটা রহস্যের ভাণ্ডার ব'লে মনে হোতে লাগলো।

কিন্তু শান্তি! তার প্রবৃত্তি কি এত নীচ হবে? তাই যদি হয়, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে আপনার ব'লে যাদের বুকে জড়িয়ে ধরেছি, সকলের চেয়ে বড় বেদনা যদি তাদের কাছ থেকেই পাই, তবে আর বিশ্বাস করবো কাকে? নির্ম্মল আমার জীবনবন্ধু আর শান্তি আমার প্রিয়তমা।

সংসারের ওপর একটা দারুণ ঘৃণা আমার মনের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলোকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে লাগলো। বার বার মনে হ'তে লাগলো—এই নারী! এরই কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছি? ধিক্ আমাকে!

রাত্রি দশটা অবধি দম-দেওয়া পুতুলের মত সহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে যখন বাড়ী ফিরলুম, তখন দেহ ও মন আমার অবসাদে ভোরে গিয়েছে। শান্তি তখ ও থিয়েটার দেখে ফেরেনি। খেতে আর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না, জুতোজোড়া খুলে ফেলে আমি শুয়ে পড়লুম। বুকের পকেটে সেই উড়ো চিঠিখানা ছিল, তারই মারাত্মক স্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে বিষের দাহন ছড়িয়ে দিচ্ছিল; তবু সেখানাকে অন্য কোথাও রেখে শুতে পারলুম না। বিছানায় প'ড়ে ছটফট করতে লাগলুম।

রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। দরজায় মোটর দাঁড়াবার শব্দ হলো, বুঝলুম শান্তি এসেছে। সে সিঁড়ি বয়ে খট্ খট্ ক'রে উঠে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, আমি চোখ বুজে প'ড়ে রইলুম। শান্তি কাপড় ছাড়ছে, এমন সময় নির্ম্মল নীচে থেকে চেঁচিয়ে বল্লে—"জগদীশ, এসেছে? না আমি একটু বসবো?"

শান্তি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্লে—"উনি এসেছেন।" নির্ম্মল বোধ হয় চ'লে গেল।

আধঘণ্টা পরে শান্তি আমায় ঠেলে তুলে জিজ্ঞাসা করলে—"খাওনি কেন?"

"শরীরটা ভাল নেই" ব'লে আবার পাশ ফিরলুম। আমার ব্যবহারে শান্তি বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিল। সে চুপ কোরে কিছুক্ষণ খাটের ধারে ব'সে রইলো, তার পর আলো নিবিয়ে দিয়ে পাশে এসে শুয়ে পড়লো।

আমার চোখে নিদ্রা নাই। নানারকম অদ্ভুত চিন্তা তালগোল পাকিয়ে মাথার ভিতর নাচন সুরু করেছিল। থেকে থেকে শান্তির উত্তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখে চোখে কানে এসে লাগছিল—মুমূর্ষু রোগীর কানের কাছে শ্যালিকার

পরিহাসের মত। এক একবার মনে হ'তে লাগলো যে, শান্তিকে জিজ্ঞাসা করি, কিসের জন্য সে আমাকে ছেড়ে নির্ম্মলের প্রতি আসক্ত হয়েছে? নির্ম্মল, সে আমার চেয়ে কিসে বড়, কোন্ বিষয়ে উন্নত! জিজ্ঞাসা করি, আমার এই বুকভরা ভালবাসার কি এমনই করেই প্রতিদান দিতে হয়? কিন্তু সে কথা জিজ্ঞাসা করা হ'লো না, আমার সমস্ত পৌরুষ উদ্যত হয়ে সে প্রলোভনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে লাগলো।

হঠাৎ শান্তির একখানা হাত আমার গলার ওপর এসে পড়লো। তার সেই হাতে কি মাখান ছিল, জানি না, সেই হাতের স্পর্শ পাইবামাত্র আমার দগ্ধ অন্তর যেন জুড়িয়ে গেল। আমি দু-হাতে তার হাতখানাকে চেপে ধ'রে বুকের ওপর রাখলুম; এই শান্তিকে আমি অবিশ্বাস করেছি! ছি ছি, আমার মত পাষণ্ড আর নাই। কে কোথায় নিজের মনের বিষ উদ্গার ক'রে চিঠি লিখছে, আর আমি সেই চিঠিতে বিশ্বাস ক'রে নিজের স্ত্রীকে অবিশ্বাস করছি! কি নির্ব্বোধ আমি! শান্তির স্পর্শ আমার দেহ ও মনে ঘুমের পরশ বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার হাতখানা বুকের ওপর রেখে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। যখন উঠলুম, তখন বেলা প্রায় ৯টা।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার মনের অবসাদ একেবারে কেটে গিয়েছে। আমার জন্য নির্ম্মল বসেছিল, সে দিন বিকেলে এক সভায় আমার বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। নির্ম্মল সেই সম্বন্ধে কি বলতে এসেছিল। সভার কথা উঠ্‌বামাত্র শান্তি বল্লে—"না না, উনি আজ সভায় যাবেন না, ওঁর শরীর খারাপ।"

তার পর সে আমার দিকে ফিরে বল্লে-"তুমি দিনকয়েক এই সব হুল্লোড় ছেড়ে দাও। দিনে দিনে শরীরের অবস্থা কি হচ্ছে, একবার দেখেছো? শরীর গেলে নারীর উন্নতি যা হবে, তা বুঝতেই পাচ্ছি, মাঝ থেকে ঘরের নারীটির প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হবে।"

শান্তির কথা শুনে নির্ম্মল হো হো ক'রে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো। তার পর সে বল্লে—"এ কথাটা বেশ বলেছো বৌদি, কিন্তু ভাই, আজকের মতন জগদীশকে ছেড়ে দিতে হবে। আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি, না হ'লে আমার মাথা কাটা যাবে।"

সকালবেলাটা হাসি-ঠাট্টায় মন আমার একেবারে হাল্কা হয়ে গিয়েছিল, গত রাত্রির চিন্তার জন্য নিজের মনে অনুতাপ হ'তে লাগলো। নিজের মনকে বার বার ধিক্কার দিয়ে বল্লুম—শান্তিকে কি ব'লে অবিশ্বাস করেছিলুম? আর নির্ম্মল, সে যে আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশী। তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু সে যা ছেলে, আমার কথা শুনলে পাছে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ফেলে, এই ভয়ে কাউকে কোন কথা না ব'লে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চেপে গেলুম। বিকেল নাগাদ সেই উড়ো চিঠির কথা আর মনেই রইলো না।

২

শান্তি যা আশঙ্কা করেছিল, ঠিক তাই হলো। কয়েক মাস অবিশ্রান্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে সাংঘাতিক রোগে আমাকে শয্যাশায়ী হতে হ'লো। এই রোগে প্রায় পাঁচ মাস আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। রোগের প্রথম অবস্থায় কে আমার সেবা করছে, কে আমার চিকিৎসা করছে, তার কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে আমার মস্তিষ্কের গোল হয়ে গিয়েছিল। সংসারে আমার নিকট-আত্মীয় কেউ ছিল না, কিন্তু আমার যা সহায় ছিল, তা আত্মীয়ের চেয়ে ঢের বেশী। আমার অর্থ ছিল, আমার স্ত্রী ছিল, আর ছিল আমার বন্ধু নির্ম্মল। এদের সেবা ও শুভ ইচ্ছা আমার রোগে সঞ্জীবনী সুধার চেয়ে ঢের বেশী কায করেছিল।

রোগের মধ্যে প্রথম যে দিন আমার জ্ঞান হলো—সেদিনকার কথা কখনও ভুলব না। এখনও আমার অজ্ঞানের কুয়াসা ভাল ক'রে কাটেনি; সব কথা আমি ভাল ক'রে গুছিয়ে ভাবতে পারছিলুম না। চোখ চেয়ে দেখলুম, ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। শান্তি আমার বিছানায় আমার পাশে বসেছিল। অনেকক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকেও তাকে চিন্‌তে পারলুম না। খালি মনে হ'তে লাগলো যে, এই শীর্ণ-ম্লানা নারীটি কে আমার পাশে ব'সে রয়েছে! আমার সেবার জন্য কি নার্স আনা হয়েছে? আমাকে তার কাছে রেখে শান্তি স্নান করতে গেছে মনে ক'রে আবার চোখ বুজলুম। কিন্তু চুপ

ক'রে প'ড়ে থাকতে আমার কষ্ট হ'তে লাগলো, শান্তিকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি চোখ চেয়ে বল্লুম—"শান্তি কোথায়, একবার তাকে ডেকে দিন্ না।"

শান্তি আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বল্লে—"আমাকে চিন্‌তে পারছো না? আমি যে শান্তি।"

"তুমি শান্তি! তোমার এই দুর্দ্দশা হয়েছে!"

আমি আর তার দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না, চোখ বন্ধ ক'রে ফেল্লুম।

শান্তি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

রোগশয্যা ছেড়ে উঠলুম। দিনে দিনে আমার শরীর সুস্থ হ'তে লাগলো বটে; কিন্তু আমার দেহের সমস্ত রোগ আমার মনটাকে আঁকড়ে ধ'রে রইলো। দেহ সুস্থ অথচ মন অসুস্থ, এ অবস্থা যার না হয়েছে, সে তা কল্পনা করতে পারবে না। যুক্তি-তর্ক মন দিয়ে নিজের বুদ্ধিকে আমি টেনে রাখতে চেষ্টা করছি, অন্য দিকে একটা বিরাট শক্তি আমার বুদ্ধিকে টেনে নিয়ে গিয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। মনের মধ্যে দিবারাত্র এই দুই শক্তিতে টানাটানি চলতে চলতে কখনও কখনও আমি যুক্তি হারিয়ে ফেলতুম। সে সময় আমার আর জ্ঞান থাকতো না, আমি যা তা কাণ্ড ক'রে ফেলতুম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দুই একটা এমন কাণ্ড ক'রে ফেল্‌লুম যে, তারা বিরক্ত হয়ে আমার বাড়ীতে আসা বন্ধ ক'রে দিলে। শান্তিকে যখন তখন যা তা বলতুম, সে কখনও রাগ করতো, কখনও বা একলা ব'সে কাঁদতে থাকতো। আমার মনের খোঁজ কেউ করতো না। মনের খোঁজ করবে কি, আমার মাথার অবস্থা তখনও কেউ ভাল ক'রে বুঝতেই পারে নি। নির্ম্মল কিন্তু তখনও আমার বাড়ীতে আসতো—সে যে ছিল আমার জীবনবন্ধু।

আমি দেখতুম, মাঝে মাঝে শান্তি ও নির্ম্মল কি পরামর্শ করে। তাদের কথাবার্ত্তার মাঝখানে যদি কখনও গিয়ে পড়েছি—বেশ বুঝতে পারতুম যে, তারা আগের কথা থামিয়ে দিয়ে অন্য কথা সুরু ক'রে দিয়েছে।

আবার সেই উড়ো চিঠি উড়ে এসে আমার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে যেতে লাগলো। আমার অসুস্থ মন তখন আর কোনও যুক্তি তর্ক মানতে চাইতো না। চিন্তার ধারা একবার বইতে আরম্ভ করলে উধাও হয়ে ছুটে চলতো, তাকে কিছুতেই রোধ করতে পারতুম না।

মধ্যে মধ্যে আমার মনে হ'তো—আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি! এই কথা মনের মধ্যে উদয় হইবামাত্র আমি অস্থির হয়ে পড়তুম। নিজেকে সামলাতে পারতুম না, একটুখানি আশ্রয় পাবার জন্য ছুটে শান্তির কাছে পালিয়ে যেতুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখতুম, নির্ম্মল ব'সে আছে। হতাশায় মাথা ঘুরতে থাকতো, টলতে টলতে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের ঘরের চৌকিতে শুয়ে পড়তুম।

তখন আমার মাথা ও মনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই সময় এক দিন বিকেলে আমি ছাতের উপর আলসের ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখ্‌ছি; রাস্তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কি জানি কেন মনে হলো যে, এখান থেকে প'ড়ে গেলে আর কিছু থাকে না। আগেই বলেছি যে, চিন্তা একবার সুরু হ'লে তাকে অন্য পথে ফেরানো আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। সেই কথা ভাবতে ভাবতে কে যেন আমাকে ছাতের উপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বার প্রলোভন দেখাতে লাগলো। আর একটু হলেই আমি সে দিন নীচে লাফিয়ে পড়েছিলুম আর কি! আলসের কানায় আমার ধুতিখানা কি ক'রে বেধে গিয়ে টান পড়লেই আমার চমক ভাঙলো। আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন চড়াক্ কোরে একটা তড়িৎ-তরঙ্গ খেলে গেল; আমি ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে দেখি, শান্তি আর নির্ম্মল ব'সে গল্প করছে। সে দিন আর নিজেকে সামলাতে পারলুম না, মুখে যা এল, তাই ব'লে দু-জনকে গালাগালি দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

নির্ম্মল মুখটি চুপ ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর শান্তি কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে আমার হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমায় বাতাস করতে লাগলো। শান্তি আমার একটি কথাও বল্লে না, আমিও তাকে আর কোনও কথা না ব'লে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলুম।

সকালবেলা আমাকে দেখবার জন্য এক জন নতুন

ডাক্তার এলেন, সঙ্গে নির্ম্মল। ডাক্তার আমাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন।

বায়ু-পরিবর্ত্তনের কথা শুনে আমি প্রস্তাব করলুম যে, দেশে যাওয়া যাক্। দেশে আমাদের পুরানো বাড়ী ভেঙে আমি নতুন ধরণের বাড়ী তৈরি করেছিলুম। আমার বাগান দেখবার জন্য গ্রামান্তর থেকে লোক আসতো। আমাদের দেশ তখন বেশ স্বাস্থ্যকর যায়গা ছিল। আমার প্রস্তাবে শান্তিরও অমত হলো না। আমরা দেশে গিয়ে বাস করতে লাগলুম।

দেশে ফিরে এসে নতুন আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে আমার স্বাস্থ্যের একটু একটু ক'রে উন্নতি হ'তে লাগলো। মাথার অসুখটাও অনেক কমে এল। আমি আমার আগের স্বাস্থ্য প্রায় ফিরে পেলুম।

মনের অবস্থা একটু ভাল হ'তে না হ'তেই আমি আবার কাযে মন দিলুম। একখানা উপন্যাস অর্দ্ধেক লেখা হয়ে পড়েছিল, দিনরাত ব'সে সেখানা শেষ করতে লাগলুম। দেশে সভা-সমিতির হাঙ্গামা কিছুই ছিল না, ভাববার সময়ও যথেষ্ট, কাজে একটু একটু ক'রে উৎসাহও লাগছিল। ভাবলুম, দেশে এখন কিছু দিনের জন্য থাকবো।

ওদিকে শান্তি সহরে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। অবশ্য, সে মুখে কিছু বলতো না, কিন্তু আমি বুঝতে পারতুম যে, সহরের কর্ম্ম কোলাহল, সভাসমিতির উন্মাদনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ব'সে একঘেয়ে রোগীর সেবা করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সহরে থাকতে আমি সব সময়ে শান্তিকে নিয়ে ঘুরতে পারতুম না, নির্ম্মল অনেক সময়ে তাকে এখানে সেখানে নিয়ে যেতো। এখানে নির্ম্মল নাই, সে কলকাতায় ব্যবসা করে; সে সব ছেড়ে দিয়ে গ্রামে এসে আমার মতন চুপ-চাপ ক'রে ব'সে থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও সে প্রায়ই এসে গ্রামে দিনকতক ক'রে থেকে যেতে লাগলো। নির্ম্মল যে কটা দিন থাকতো, বেশ বুঝতে পারতুম যে, সে দিনগুলো শান্তির বেশ আনন্দেই কাটছে। শান্তি নির্ম্মলের সঙ্গে অবাধে মিশতো ব'লে গ্রামের লোকরা অনেক কথা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে। কিন্তু সে সব কথা আমি গ্রাহ্যই করতুম না। তবুও আমার মন বুঝতে পারছিল যে, আমার সঙ্গ শান্তিকে আর তেমন আনন্দ দিতে পারছে না। আমি মনে মনে স্থির করলুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রে কলকাতায় যাব, তার পর যে দিকে চোখ যায়, সেই দিকে বেরিয়ে পড়বো। শান্তি যদি আবার কোনও দিন আমার অভাব অনুভব করে, তবেই ফিরে এসে আবার কাযে মন দেব—নচেৎ এই শেষ!

শান্তিকে ছেড়ে চ'লে যাব। এ চিন্তা আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠলো। কিন্তু তবুও যেতে হবে, উপায় নাই। সমস্ত ব্যাপারটা আমি শান্তির দিক দিয়ে বিচার করতে লাগলুম। শান্তি আমায় ভালবাসতো, আমি তাকে যেমন ভালবাসি, সে আমাকে তার চেয়ে কিছু কম ভালবাসতো না। কিন্তু এক জন নারী অথবা এক জন পুরুষ যদি সারা জীবন ধ'রে এক জনকেই ভালবাসতে না পারে! সকলের পক্ষে তা সম্ভব নাও হ'তে পারে। জীবনধারণ তো ওষুধ গেলা নয় যে, কোনও রকমে সেটা ঢোক ক'রে গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই হবে। এই রকম কথা ভাবতে ভাবতে আমি পাগলের মত হয়ে উঠতুম। এক একবার মনে হ'তো, শান্তিকে খুন ক'রে নিজে আত্মহত্যা করি; কিন্তু তখনই আবার মনে হয়েছে, শান্তিকে কি ক'রে খুন করবো—না না, তা পারবো না। তবে—তবে আমাকেই বিদায় নিতে হবে। তার সুখের পথে কাঁটা হ'য়ে আমি থাকবো না। সে থাক, সুখে থাক, আমি চ'লে যাব, এই আমার ভালবাসার পুরস্কার।

আমি ঠিক ক'রে ফেল্লুম যে, উপন্যাসখানা শেষ ক'রেই এক দিন নিঃশব্দে কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়বো। বিশাল এই সংসারের বুকের উপর দিয়ে কায ও অকাযের যে স্রোত বয়ে চলেছে, তারই মুখে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভেসে চ'লে যাব, দিনের শেষে সে আমায় যে ঘাটে তুলে দিয়ে যায় যাবে—কোনও চেষ্টা করবো না, কোনও দিকে ফিরে চাইবো না। শান্তিকে ছাড়তে আমার কষ্ট হবে, কিন্তু আমি চলে গেলে সে সুখে থাকবে। আমি বাড়ীতে থাকতে থাকতেই তাকে ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলুম। তাকে দেখলে দূরে স'রে স'রে যেতুম, কথা কইতে এলে কাযের অছিলা ক'রে অন্যত্র চ'লে যেতুম।

উপন্যাস লেখার নাম ক'রে লেখবার ঘরেই শুয়ে কাটাতুম। এমনই ক'রে আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগলো।

৬

তার পর সেই রাত্রি! শান্তির সঙ্গে যে দিন আমার শেষ দেখা। রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছে। আমি টেবলে ব'সে একমনে মাথা হেঁট ক'রে লিখছি, এমন সময় শান্তি এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি কিছু দিন থেকে লক্ষ্য করছিলুম যে, নির্ম্মল আর আমাদের বাড়ী আসছে না। শান্তির বোধ হয় একা মন কেমন করছিল। ইদানীং আমি তার সঙ্গে কথা বলা এক রকম বন্ধ ক'রেই দিয়েছিলুম। শান্তি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরেও আমি মুখ তুললুম না। একটু পরেই সে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে—'চল, শুতে যাই, আর লিখো না।' আমি বল্লুম—'তুমি যাও, শোও গে, আমি এইখানেই শোব।'

কথাগুলো আমার নিজের কানেই কর্কশ শোনালো। আমি অনুভব করছিলুম, শান্তির হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে আমার কাঁধের ওপর থেকে ক্রমেই শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে। তার পর সে হঠাৎ হাতখানা কাঁধ থেকে তুলে নিয়ে ঝড়ের মতন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে চ'লে গেল।

পরদিন সকালবেলা উঠে শুনলুম—শান্তি নাই!

আমাদের বিয়ের সময় শান্তিদের বাড়ী থেকে তার সঙ্গে এক ঝি এসেছিল। সে আমাদের বাড়ীতেই থাকতো, সে এসে আমায় সংবাদ দিলে যে, কা'ল রাত্রি থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাকে ব'লে দিলুম, শান্তির নাম যেন আমার বাড়ীতে আর কেউ মুখে না আনে।

শান্তির এই পলায়ন আমি যতই হাল্কাভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করতে লাগলুম, আমার ভিতরের মানুষটা যেন ততই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠতে লাগলো। ভিতর থেকে বারবার কে বলতে লাগলো—তোমার দোষেই আজ তুমি শান্তিকে হারালে। যদি আগে থাকতে একটু সাবধান হোতে!

মনে পড়লো সেই উড়ো চিঠির কথা। অজ্ঞাত বন্ধু আমার, তখন যদি তোমার কথা শুনে সাবধান হতুম!

শান্তির পলায়নের কথা সন্ধ্যার আগেই গ্রামময় রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। তার নামে নানান্ কুৎসা আমার কানে ভেসে আসতে লাগলো। অনেকে এমন কথাও বল্লে যে, তারা নির্ম্মল ও শান্তিকে নৌকা ক'রে যেতে দেখেছে। আমার মনের তখন কি রকম অবস্থা, তা বোধ হয় তোমরা বুঝতে পারছো। একে আমার অসুস্থ মন নানা চিন্তায় অধীর, তার উপর গ্রামের লোকদের নিন্দায় গৃহ আমার নরক হয়ে উঠলো। একটুখানি সহানুভূতি পাবার আশায় আমি ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কে আমায় সহানুভূতি জানাবে! গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এমন কি, ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত আমায় দেখতে আসতে লাগলো, যেন আমি একটা অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। সবার মুখেই এক কথা—"জগদীশের বৌ পালিয়ে গিয়েছে।"

সাত দিন যেতে না যেতে আমি আমার কর্ম্মচারীদের উপর বাড়ী ও বিষয়ের ভার দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বহুকাল দেশে বিদেশে পাগলের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম, কিন্তু শান্তি তো পেলুম না। নারীর স্বাধীনতা, নারীর শিক্ষা ও নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলুম, সেই নারীই আমাকে সকলের চেয়ে বড় বেদনা দিলে; যে বন্ধুর উপকারের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলুম, সেই বন্ধু আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে। শুধু আমার নয়, আমি দেখলুম আমার চারিদিকেই মানুষ এই ভাবে মানুষের বুকে, বন্ধু এই ভাবে বন্ধুর বুকে, স্বামী স্ত্রীর বুকে, স্ত্রী স্বামীর বুকে অবিশ্বাসের ছুরি হেনে চলেছে। তবে কি সমাজ, ধর্ম্ম, স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া যা কিছু শুনতে পাই, সব মিথ্যা? মানুষ তার আসল চেহারাটা এই সব রঙিন খোলস দিয়ে ঢেকে রেখেছে! সবাই সমান, শুধু সুযোগের অভাব! অবসর ও সুযোগ হ'লেই আপনা থেকেই তার এই খোলস ঝরে প'ড়ে গিয়ে তার স্বরূপমূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে! অনেক দিন চিন্তার পর আমি স্থির করলুম, আমাদের সমাজ নারীর জন্য যে ব্যবস্থা করেছে, তা ঠিকই করেছে।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরা যে বিদ্যা ও বুদ্ধির দস্যুতা ক'রে অন্য সবাইকে পায়ের নীচে চেপে রেখেছিল, তা ঠিকই করেছিল। নিজে বাঁচতে হ'লে তা না ক'রে আর উপায় নাই। ব্রাহ্মণ যত দিন অন্য সবাইকে পায়ের নীচে রাখতে পেরেছিল, তত দিনই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব ছিল। আমি নতুনপন্থীদের গালাগালি দিয়ে আমাদের দেশের সনাতন ব্যবস্থার স্বপক্ষে এক প্রবন্ধ লিখে ছদ্মনামে এক মাসিকে ছাপিয়ে বিপক্ষবাদীদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করলুম।

আমার প্রবন্ধ প্রকাশ হবার পর আট দশটা মাসিকে তার প্রতিবাদ প্রকাশিত হ'লো। সকলের প্রতিবাদের জবাব দিয়ে আবার আমি প্রবন্ধ লিখলুম। এই রকম ক'রে দুই পক্ষে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হ'লো। আমার শেষ প্রবন্ধের জবাব যিনি দিয়েছিলেন, তিনি এক জন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখা প'ড়ে মনে হলো, এত দিনে এক জন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছি। এই প্রবন্ধের জবাব দিতে আমাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। আমি স্থির করেছিলুম, এর পরে আর লিখবো না। আমার সমস্ত বুদ্ধিকে নিংড়ে এই প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। লেখা প'ড়ে নিজেরই মনে হ'তে লাগলো, এর আর উত্তর হ'তে পারে না। নারীর প্রতি মমতার শেষ স্মৃতিটুকু মন থেকে মুছে ফেলবার আগে কি জানি কেন একবার দেশে গিয়ে আমার বাড়ীখানা দেখে আসবার ইচ্ছা হ'লো। যেখানে আমার শৈশব কেটেছে, যে ঘরে আমি আমার প্রেয়সীকে নিয়ে এসে সুখের নীড় বাঁধবার আয়োজন করেছিলুম, ইহজীবনের সর্ব্বোত্তম সুখ ও দুঃখ আমি যেখানে বসে পেয়েছি—আমার সেই খেলাঘরের ইটকাঠগুলো আমাকে তাদের কোলে আহ্বান করতে লাগলো। আমি স্থির করলুম, দেশে গিয়ে একবার বাড়ীটা দেখে এসে এই প্রবন্ধ ছাপতে দিয়ে সন্ন্যাস নেবো।

৪

ঠিক পনেরো বছর পরে!

পনেরো বছর পরে আবার এক দিন সন্ধ্যার সময় আমি আমাদের গ্রামের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। ঠিক করেছিলুম যে, অন্ধকার হ'লে তার পর গ্রামের ভিতরে ঢুকবো, তাই মাঠের মধ্য দিয়ে যে লাল মাটীর পথ এঁকে বেঁকে দূরে বনের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, তারই একধারে ব'সে অন্ধকারের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। আমার চোখের সামনে বনের উপরে হোলি খেলতে খেলতে সূর্য্য অস্ত গেল। অন্ধকার গাঢ় হবার আগেই আমি উঠে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলুম।

গ্রামের আর সে শোভা নাই। রাস্তা অনেক যায়গায় ভেঙে গিয়েছে। চারিদিকে জঙ্গল আর বিশ্রী গন্ধ। অনেকখানি পথ চ'লে আমি হাটতলার মাঠে এসে দাঁড়ালুম। সেখানে তখনো অনেকগুলো ছোট বড় চালা দেখে বুঝতে পারলুম যে, এখনও সেখানে হাট বসে। হাটের এক দিকে একটা বিশাল বটগাছ ছিল, গাছটা প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। ডাল থেকে বড় বড় শেকড় নামিয়ে দিয়ে অনেকখানি যায়গা জুড়ে তখনও সে পুরোদমে সেখানে রাজত্ব করছিল। আমরা যখন ছোট ছিলুম, তখন রোজ বিকেলে গ্রামের ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে এই গাছের তলায় এসে লুকোচুরি খেলতুম, এর শেকড় ধ'রে দোল খেতুম।

চোরের মতন চুপে চুপে হাটতলার মাঠ পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সেই বটগাছটা একটা আনন্দের চীৎকার ক'রে উঠলো। তার লক্ষ পাতার হাতছানির আকর্ষণ আমি এড়াতে পারলুম না, অপরাধীর মত সেখান থেকে ফিরে ধীরে ধীরে তার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তার পল্লবে পল্লবে করতালি বেজে উঠতে লাগলো। নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গীতে সে এই পুরানো বন্ধুকে তার হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাতে লাগলো। সেখান থেকে চ'লে যাবার শক্তি আমার ছিল না, কিসের একটা মাদকতায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে পড়তে লাগলো, আমি সেইখানেই ব'সে পড়লুম। নানারকম চিন্তায় আমার হৃদয় ভরে উঠছিল। এই গাছের তলায় আমাদের সন্ধ্যাগুলো কেমন করে কাটতো! আমি, শান্তি, নির্ম্মল ও গ্রামের আরও অনেক ছেলেমেয়ে এইখানে ছুটোছুটি লুকোচুরি খেলে বেড়িয়েছি; আজ তারা সব কোথায়? আমার ছেলেবেলার সখা ও সখীরা তারা কি সুখে আছে? তারা কি সবাই বেঁচে আছে? শৈশবে আমিই ছিলুম তাদের মধ্যে সব চেয়ে

সুখী। অভাব কাকে বলে, তা আমি কখনও জানতে পারিনি। আমার ধন ছিল, রূপ ছিল, বংশমর্য্যাদা ছিল। আমার *যা ছিল, তা তো সবই আছে, জীবনপথে চলতে চলতে যা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, তাই আমার হারিয়ে গিয়েছে; তাই আজ আমার মতন দুঃখী কে আছে? ওগো বনস্পতি!* তুমি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এইখানে দাঁড়িয়ে আমার গ্রামের সবারই সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে আছ, আমার মতন দুঃখী কি আর দেখেছো?

খেলার সাথীর প্রতি সহানুভূতিতে গাছটা স্থির হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো।

কতক্ষণ সেই গাছটার তলায় বসেছিলুম, তা বলতে পারি না, যখন সেখান থেকে উঠলুম, তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর; পুব-আকাশে চাঁদটা ঢ'লে পড়েছে।

সেখান থেকে উঠে পায়ে পায়ে বাড়ী অবধি এসে পাঁচিল টপ্‌কে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়লুম। সারা রাত বাতাসের সঙ্গে খেলা ক'রে চাঁদের ঘুমপাড়ানী মন্ত্রে আমার বাগানের ফুলেরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত শিশুর মতন তালে তালে তাদের নিশ্বাস পড়ছিল; পাছে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাই সন্তর্পণে আমি আমার ঘরের পেছন দিকটায় এসে দাঁড়ালুম। আমি বাড়ীতে না থাকলেও আমার বাড়ী সেই রকমই ঝক্‌ঝক্ করছে, বাগানের যত্ন হচ্ছে দেখে আমার উদাস প্রাণেও একটা আনন্দের তরঙ্গ খেলে গেল। জন্মভূমির প্রতি মানুষের এই রকমই মায়া বটে!

বাড়ীর সমস্ত জানালা বন্ধ ছিল। আমি আমার শোবার ঘরের জানলাটার দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলুম। বাতাসের বেগে বইয়ের পাতাগুলো যেমন তাড়াতাড়ি উল্টে যায়, আমার মনের ভিতর দিয়ে অতীত জীবনের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো তেমনি ভাবে উল্টে যেতে লাগলো।

হঠাৎ শোবার ঘরের একটা জানালা খুলে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, জানালায় একটি রমণীমূর্ত্তি! আমার কোনও কর্ম্মচারী খালি বাড়ীতে এসে বাস করছে ভেবে আমি জানালার সামনে থেকে স'রে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালুম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই জানালাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে বাগান থেকে এবার বেরিয়ে পড়বো মনে করছি, এমন সময় দেখলুম, সেই নারীমূর্ত্তি বাগানে নেমে এসেছে, সে আমার *দিকেই আসতে লাগলো। আর স'রে যাবার উপায় নাই দেখে আমি সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম। নারীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।—শান্তি!!!*

আমার চোখের সাম্‌নে গাছপালা, বাগানবাড়ী, মাঠ সব যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরতে আরম্ভ করলো। তার পর সব মিলিয়ে গিয়ে রইলো কেবল—শান্তি!

শান্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। এই পনেরো বছরে তার চেহারার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নি। বরং আমার মনে হচ্ছিল, যেন সে দেখতে আরও সুন্দরী হয়েছে। আমি অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। তাকে পনেরো বছর দেখিনি, এই পনেরো বছরে আমার জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু শান্তি তো বেশ আছে!

কিছুক্ষণ পরে দেখলুম যে, শান্তির ঠোঁট যেন নড়ছে, সে কি বলছে, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—'শান্তি, আমায় কিছু বলবার আছে?' শান্তি আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

আমি আবার বল্লুম—'আমি শুনেছিলুম যে, তুমি এখান থেকে বহুদূরে চ'লে গিয়েছ; যদি গিয়েছিলে, তবে আবার ফিরে এলে কেন?'

এবার শান্তি বল্লে—'আমি আমার স্বামীকে দেখতে এসেছি।

আশ্চর্য্য! আমি এতদিন আমার অস্তিত্ব সবার কাছ থেকে একেবারে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। আমি কোথায় আছি, না আছি সে কথা আমার এক জন কর্ম্মচারী ছাড়া আর কেউ জানতো না। টাকাকড়ির প্রয়োজন হ'লে তাকে জানাতুম, সেই কি শান্তির কাছে আমার কথা বলেছে? কিন্তু আজ রাত্রে এমন সময় আমি এখানে থাকবো, সে কথা সে-ই বা জানবে কি ক'রে? আমি একটু শ্লেষের সঙ্গে বল্লুম—যাক্, শুনে সুখী হলুম যে, তুমি আমাকে দেখতে এসেছো। কিন্তু তুমি যাকে স্বামী বলছো, তুমি তো নিজেই তার সঙ্গে তোমার সে বন্ধন কেটে ফেলেছো।

"কেন ? তুমিই আমার স্বামী।"

শান্তির কথা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। বলে কি ! এত কাণ্ডের পর এখন আমাকে স্বামী ব'লে সম্ভাষণ করতে লজ্জা করছে না ? নারীচরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞের।

আমি বল্লুম—"হ্যাঁ, আইনমত এখনও আমি তোমার স্বামী, কিন্তু ধর্ম্মতঃ বোধ হয়—"

"বোধ হয় ! কেন তুমি কি আবার বিয়ে করেছ ?"

"বিয়ে ! সর্ব্বনাশ, আবার বিয়ে ! না শান্তি, বিয়ে সেই একবারই করেছিলুম। জীবনে এক জনকেই ভালবেসে-ছিলুম—তুমি ? তুমি কি এখন নির্ম্মলকেই ভালবাস ? না প্রণয়ী বদল করেছো ?"

আমার কথা শুনে শান্তি থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো। তার মাথার কাপড় খসে এলো, খোঁপা পিঠে ঝুলে পড়েছিল। আমি মানুষকে ও রকম ভাবে কাঁপতে এর আগে কখনও দেখিনি। তার প্রত্যেক চুলটি পর্য্যন্ত কাঁপছিল। আমার মনে হলো, যেন তার শরীরের ওপর দিয়ে একটা প্রবল বিদ্যুতের তরঙ্গ খেলে চ'লে গেল। কাঁপুনিটা থেমে যাবার পর সে অতি করুণ সুরে বল্লে—"ওগো, ও রকম ক'রে বোলো না। তুমি জানো না, তুমি বুঝতে পারবে না।"

"জানি না ! বুঝতে পারি না ? হ্যাঁ শান্তি, এক দিন ছিল বটে—যখন কিছুই বুঝতে পারতুম না। আমি তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, আমি নিজের ভালবাসায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমাকে হৃদয়ে বসিয়ে যখন আমি মনের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করছি, সেই সময় তুমি আমার বন্ধুর প্রেমে মশগুল হয়ে আমার কাছ থেকে পালা-বার বন্দোবস্ত করছিলে—আমি স্বীকার করছি যে, তখন সেটা বুঝতে পারিনি। তোমার অবহেলাকে সত্য অবহেলা ব'লে কখনও মনে করতে পারিনি, তাই বুঝতে পারিনি।"

—"তবে, তুমি কি সত্যিই মনে কর যে, নির্ম্মল—"

"হ্যাঁ, আমি তাই বিশ্বাস করি। তুমি কি সে কথা অস্বীকার করতে চাও ?"

শান্তি স্থির হয়ে অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিল—"নিশ্চয়ই করি। জীবনে আমি এক জনকে ভালবেসেছি, সে আমার স্বামী, সে তুমি। কিন্তু আমি যাকে ভালবেসেছি, তাকে কখনও অবিশ্বাস করিনি, সে কথা কখনও কল্পনা করতে পারি নি। তোমার অসুখের পর তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলে, তাতে আমি প্রথমে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু নির্ম্মল-ঠাকুর-পো আমায় বুঝিয়েছিল যে, তোমার মাথার গোল হয়ে গিয়েছে, তাই তুমি অমন করছো। কি করলে তুমি ভাল হবে, কি ক'রে তোমায় সুস্থ করতে পারবো, সে জন্য আমি দিবারাত্রি তার সঙ্গে পরামর্শ করতুম। কিন্তু তুমি তখন আমাদের সেই পরামর্শকে কি চোখে দেখতে, তা মনে ক'রে দেখ। তার পর এক দিন তোমার দপ্তর পরিষ্কার করতে করতে একখানা বিশ্রী চিঠি আমার চোখে পড়েছিল, সেই চিঠি পড়া মাত্র তোমার সমস্ত ব্যবহারের কারণ আমার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়লো। বুঝলুম যে, তুমি আমায় সন্দেহ কর। আমি সেই দিনই নির্ম্মলকে সেই চিঠিখানা দেখিয়ে তাকে ব'লে দিলুম—তুমি এখান থেকে চ'লে যাও, আমার চোখের সামনে আর কখনও এসো না। সে দিন সে আমার কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিয়ে গিয়েছে—"

আমি তার কথায় বাধা দিয়ে বল্লুম—"নির্ম্মল কোথায় আছে এখন ?"

"তা জানি না, তবে যাবার সময় সে ব'লে গিয়েছিল যে, মৃত্যুর পর যদি এ জীবনের শেষ না হয়, তা হ'লে সেই রাজ্যে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন আমায় এমন ক'রে তাড়িয়ে দিও না, বৌদি'। তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি।"

তার পর শান্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লে—"দেখ, প্রেম সব অত্যাচার সহ্য করতে পারে, কিন্তু প্রেম অবিশ্বাস সহ্য করে না। নির্ম্মল চ'লে যাবার পর আমি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস আন্‌বার কত চেষ্টা করেছি ; কিন্তু তুমি আমায় বার বার তাচ্ছিল্য ক'রে ফিরিয়ে দিয়েছ। শেষে আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে, এ রকম ক'রে তোমার প্রেমে বঞ্চিত হ'য়ে তোমার কাছে থাকার চেয়ে দূরে স'রে যাওয়াই মঙ্গল। তাই তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি তোমার কাছে থেকে চ'লে গিয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে যদি আমার প্রেমের সম্পর্কই চুকে গেল, তখন কেবল তুমি আমায় বিয়ে করেছ, এই দাবীতে তোমার সুখ ও শান্তির অন্তরায় হয়ে এখানে বাস করতে আমার অন্তর বিদ্রোহী

হয়ে উঠলো। আমি স্থির করলুম, যেমন করেই পারি, আমি নিজের ভরণপোষণ চালিয়ে নেব। যে কোনও কাযই হোক্ না কেন, জীবনে তোমার প্রেমই ছিল আমার প্রধান সম্পদ, সেই সৌভাগ্য থেকে যখন চ্যুত হয়েছি, তখন আর আমার মানই বা কি! কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলুম। তোমার উপর অভিমান ক'রে চ'লে গিয়েছিলুম বটে; কিন্তু তোমার প্রতি আমার ভালবাসা—তা যে অটুট ছিল, সেটা অনুভব করলুম তোমাকে ছেড়ে গিয়ে। এখান থেকে চ'লে গিয়ে দশটি দিন মাত্র আমি আমার এক বাল্যসখীর বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলুম। তুমি তাকে চেন, সে আমাদেরই গাঁয়ের মেয়ে। দশ দিন পরে ফিরে এসে দেখলুম—তুমি নাই।

"ফিরে এসে যখন দেখলুম যে, তুমি নাই, তখন আমার মন যে কি ক'রে উঠেছিল, তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে কথা পুরুষ বুঝতে পারে না। তার পর প্রতি পল, প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি দিন ধ'রে এখানে ব'সে আমার আহ্বান আমি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছি—এসো প্রিয়তম, ওগো মধুরপ্রিয়, ওগো প্রিয়মধুর, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস। তুমি কার ওপরে অবিশ্বাস ক'রে চ'লে গিয়েছ, ফিরে এস। আমার আহ্বান কি তুমি শুনতে পাওনি? কিন্তু আমি জানতুম যে, এক দিন না এক দিন তুমি ফিরে আসবেই, তোমাকে আসতেই হবে। সেই অপেক্ষায় আজও আমি এখানে ব'সে আছি।"

শান্তি চুপ করলো।

আমার মনে হ'তে লাগলো, যেন আমি আস্তে আস্তে মাটীর মধ্যে নেমে যাচ্ছি। অসহায়ের মতন হাত দু-খানা শান্তির দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম—"শান্তি, এত দুঃখ আমি তোমায় দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর শান্তি। নিজের দোষে আমিও কম দুঃখ ভোগ করিনি।"

শান্তির চোখ দিয়ে তখন টপ টপ ক'রে জল পড়ছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—"সেইটেই যে আমার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ প্রিয়তম। তুমি বল, আমার ওপর আর তোমার অবিশ্বাস নাই?"

"ভুল শান্তি, ভুল করেছি। আজ পনেরো বছর এই ভুলের পিছনে ঘুরে ঘুরে পাগল হয়ে গিয়েছি। আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

জামার পকেটে আমার প্রবন্ধখানা ছিল, সেটা টেনে এনে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলুম। শান্তি একবার অবহেলাভরে সে দিকে চেয়ে দেখলে মাত্র, আমাকে কোনও প্রশ্ন করলে না।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"শান্তি, এত দিন তুমি একলা কোন্ ঘরে থাকতে? চল আমাকে কেউ দেখতে পাবার আগে আমরা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ি।"

আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তে শান্তি ফিরে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। আমাদের পুরোনো বাড়ীর একখানা বড় ঘর ছিল, ঘরখানা বাড়ী থেকে একটু দূরে আলাদা যায়গায় তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে যত বাজে জিনিষপত্র গুদামজাত করা থাকতো। শান্তি আস্তে আস্তে এই ঘরখানায় এসে ঢুকলো।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে তাকে বল্লুম—"এত ঘর থাকতে শেষে তুমি এই গুদামঘরে বাস করছো?"

শান্তি কোনও কথা না ব'লে ঘরের মধ্যে স্তূপাকার জিনিষপত্রের ফাঁক দিয়ে রাস্তা ক'রে এগিয়ে চলতে লাগলো। তার পরে সে ঘরের এক কোণে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। আমি তার পেছনে পেছনে অগ্রসর হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি—সেখানে একটা মানুষের কঙ্কাল প'ড়ে রয়েছে! উপরের দিকে একগাছা ঝুলমাখান দড়ি ঝুলছে!

কিছুই বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"এ সব কি ব্যাপার শান্তি! এ যে আমি কিছুই বুঝতে—"

কিন্তু শান্তি! কোথায় সে? মুহূর্ত্তের মধ্যে সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

পলক ফেলতে না ফেলতে সমস্ত রহস্য আমার চোখের সামনে জল্ জল্ ক'রে ফুটে উঠলো। দুঃসহ বেদনায় ছুটে গিয়ে দড়িগাছা ধ'রে আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম—"শান্তি!"

জীর্ণ দড়ি পট্ কোরে ছিঁড়ে গেল, আমি সেই কঙ্কালের উপর ঘুরে প'ড়ে গেলুম। চোখের সামনে দিয়ে সেই উড়ো চিঠির অক্ষরগুলো বিদ্যুৎ-বর্ণে একবার চিক্ চিক্ ক'রে আমার চোখ ঝলসে দিয়ে মিলিয়ে গেল।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

দাবানলে দমকল

তিনটি পায়াবিশিষ্ট ক্যামেরার মত এক প্রকার দমকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে এক জন লোক দাবানল নির্ব্বাণ করিতে পারে। এই যন্ত্রটির ওজন প্রায় ৩০ সের হইবে। এক জন লোক সহজে ইহাকে স্কন্ধে ঝুলাইয়া বহন করিতে পারে, এমন বন্দোবস্ত আছে। তিনটি পায়ার মধ্যে একটি ফাঁপা, উহার মধ্য দিয়া জল উত্থিত হয়। কোন জলাশয়ের ধারে দমকলটি রাখিয়া উহার নল সংযোগিত করিতে হয়। অর্দ্ধ ইঞ্চের কিছু বেশী ব্যাসবিশিষ্ট মুখ হইতে যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাতে ৮১ ফুট পর্য্যন্ত দূরে জল প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। সমগ্র যন্ত্রটিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত করা যায়।

দাবানল নির্ব্বাণে নূতন দমকল।

কাঠের ঘড়ী

রুসিয়ার জনৈক কৃষক একটি কাঠের 'ওয়াচ' ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছে। শুধু স্প্রিংটি ইস্পাতের, তদ্ব্যতীত ঘড়ীর যাবতীয় অংশ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। শিল্পী এমন নিপুণতার সহিত এই ঘড়ীটি তৈয়ার করিয়াছে যে, কল-কব্জায় কোথাও ত্রুটি নাই। প্রত্যেক যন্ত্রটি যথানিয়মে সুক্ষ্মভাবে কায করিতেছে। ঘড়ীতে দম দিবামাত্র উহা চলিতে থাকে এবং সাধারণ যে কোনও ওয়াচ ঘড়ীর মত সময় রাখিয়া থাকে। নির্ম্মাতা ঘড়ীটি রুসিয়ার বর্ত্তমান নেতা লেনিন্‌কে উপহার দিয়াছে।

স্প্রিংবিহীন ঘড়ী।

নূতন ঘড়ী

ঘড়ীতে স্প্রিং না থাকিলে তাহা চলে না; কিন্তু সংপ্রতি আমেরিকায় এক প্রকার 'টাইম্‌পিস্' ঘড়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আদৌ স্প্রিং নাই। এই চতুষ্কোণ ঘড়ীর দুই পার্শ্বে দুইটি দণ্ড আছে। সরলভাবে অবস্থিত দণ্ডযুগলের মধ্যস্থ ঘড়ীটি অতি ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখে নামিতে থাকে। উহার নির্ম্মাণপ্রণালী এমন চমৎকার যে, ঘড়ীটি নীচের দিকে নামিতে আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উহা চলিতে থাকে। দণ্ডযুগলের মধ্যে খাঁচ কাটা আছে। ঘড়ীর গাত্রেও ঐ প্রকার খাঁচ আছে। উপর হইতে নিম্নস্থান পর্য্যন্ত পৌছিতে ৩৩ ঘণ্টা সময় লাগে। নীচে আসিবার পর ঘড়ী থামিয়া যায়, আবার উপরে তুলিয়া দিলে চলিতে থাকে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই ঘড়ী অন্যান্য 'টাইম্‌পিস্' ঘড়ী অপেক্ষা নিয়মিতভাবে সময় রক্ষা করে। নূতন জিনিষ বটে!

সোনার রেলপথ

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি হার্ডিং উটাস্থিত একটা

স্বর্ণনির্ম্মিত রেলপথ।

নূতন শাখা-রেলপথ খুলিবার সময় যে স্থানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের রেলপথের মাপে একটা ৯ ইঞ্চ দীর্ঘ সোনার 'রেল লাইন' নির্ম্মাণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ হার্ডিংএর স্মৃতিপূজা করিয়াছেন। উটাতে রক্ষি-বেষ্টিত অবস্থায় এই সুবর্ণ-নির্ম্মিত রেলপথের ক্ষুদ্রাংশ রক্ষিত হইয়াছিল। এখন উহা রাজধানীর যাদুঘরে সাধারণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য আনা হইয়াছে। উল্লিখিত শাখা-লাইন দিয়া মৃত প্রেসিডেন্টের দেহ সর্ব্বপ্রথম ট্রেণে লইয়া আসা হইয়াছিল।

অগ্নিদগ্ধ ক্ষত অথবা চর্ম্মরোগে বৈদ্যুতিক আলোক।

পোড়া ঘায় বৈদ্যুতিক আলোক

সংপ্রতি আমেরিকায় এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহার মধ্য হইতে বৈদ্যুতিক আলোক নিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত নিরাময় হয়। ম্যাজিক লণ্ঠন হইতে যে ভাবে আলোকধারা নির্গত হয়, এই যন্ত্র হইতেও সেই প্রণালীতে আলোকপ্রবাহ বহির্গত হইতে থাকে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, অগ্নিদগ্ধ স্থানে এই যন্ত্রনিক্ষিপ্ত আলোক নিপতিত হইলে প্রকৃতির সাহায্যে ক্ষত আপনা হইতে আরোগ্য হয়। বিভিন্ন কাচের সাহায্যে আলোক-প্রবাহকে সংক্ষিপ্ত বা প্রস্থত করিতে পারা যায়। ভীষণ দগ্ধক্ষত অথবা অন্যান্য কঠিন চর্ম্মরোগ ইহাতে নির্দ্দোষ-ভাবে সারিয়া যায়। আমাদের দেশের চিকিৎসকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

দস্তানার সাহায্যে কথা বলা

য়ুরোপের অন্ধ ও বধিরগণ দস্তানার সাহায্যে কথোপ-কথন করিয়া থাকে। যাহারা ইঙ্গিত বুঝে না, এমন ব্যক্তির সহিত কোনও কথা বলিতে হইলে বা কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে তাহারা অক্ষরযুক্ত দস্তানা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই দস্তানায় "হাঁ" ও "না" এবং ইংরাজী বর্ণমালার অক্ষর-গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে। এই বর্ণমালাগুলির সাহায্যে অন্ধ ও বধিরগণ যে কোনও অক্ষর-জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত কথা বলিতে পারে। মার্কিণ টাইপরাইটার যন্ত্রে

অক্ষরবিশিষ্ট দস্তানা।

যে প্রণালীতে অক্ষর সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক সেই ভাবে দস্তানার অঙ্গুলি ও তালুতে ইংরাজী স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সংস্থাপিত।

আলু কুটিবার যন্ত্র

সম্প্রতি আলু কুটিবার জন্য এক প্রকার ধাতুনির্ম্মিত গোলাকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই যন্ত্রমধ্যে আলু বসাইয়া চাপ দিবামাত্র সম আকারবিশিষ্ট বহু খণ্ডে উহা বিভক্ত হইয়া যাইবে। ইহাতে কাযের বিশেষ সুবিধা হয় এবং অযথা সময়ব্যয়ের সম্ভাবনাও থাকে না। যন্ত্রটির দুই পার্শ্বে দুইটি হাতল আছে, খোসা ছাড়ান আলু যন্ত্রে বসাইয়া এই হাতল দুইটি চাপিয়া ধরিতে হয়।

আলু কুটিবার যন্ত্র।

মোটর চোর ধরিবার অভিনব কৌশল

প্রতীচ্যদেশে মোটর চোরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। এ বিষয়ে মার্কিণ চোর অগ্রণী। ইহাদের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য সংপ্রতি এক প্রকার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে। গাড়ীতে উঠিয়া চোর মোটরের কল ঘুরাইবার চেষ্টা করিবামাত্র অকস্মাৎ নিম্নভাগ হইতে চোরের চরণ শৃঙ্খলিত হইয়া যায়। সে সুদৃঢ় বন্ধন ভাঙ্গিয়া তখন চোরের পলায়ন করিবার আর কোনও উপায় থাকে না। শুধু তাহাই নহে, বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ আপনা হইতে নির্গত হইতে থাকে। সেই শব্দে পুলিস অথবা পথচারীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। গাড়ীর অধিকারী আসিয়া বন্ধন মোচন না করা পর্য্যন্ত চোরের আর মুক্তির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না।
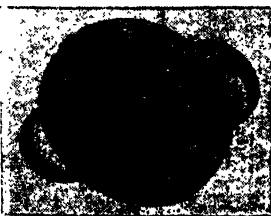
মোটর চোর ধরিবার শৃঙ্খল।

কাগজ না বদলাইয়া ১ হাজার কাগজ ছাপিবার নূতন লিখনযন্ত্র।

নূতন লিখনযন্ত্র

সংপ্রতি আমেরিকায় এক প্রকার নূতন টাইপরাইটার লিখনযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে কাগজ না বদলাইয়া একযোগে ১ হাজার কাগজ লিখিতে পারা যায়। সুদীর্ঘ কাগজ অথবা কাগজের তাড়া হাতপাখার মত ভাঁজ করিয়া যন্ত্রসংলগ্ন একটি বাক্সে রাখিতে হয়। এই বাক্সে ১ হাজার খণ্ডের উপযোগী কাগজ রাখিতে পারা যায়। পুনঃ পুনঃ কাগজ বদলাইতে গেলে যে সময়ের অপচয় ঘটে ইহাতে তাহার আশঙ্কা একেবারেই নাই। কাগজ কাটিবার জন্যও ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আপনা হইতেই কাগজ বিশ্লিষ্ট হইয়া আইসে। যদি নকল রাখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে প্রথম কাগজের নীচে কার্ব্বন কাগজ দিয়া অপর কাগজ রাখিবার ব্যবস্থাও আছে।

অভিনব ভিখারী

য়ুরোপে পথভিখারী বড় একটা নাই বলিয়া পাশ্চাত্য-জাতি গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন; কিন্তু কথাটা সর্ব্বত্র সত্য নহে। ভিক্ষুক সকল দেশেই আছে। য়ুরোপে এক

বৃদ্ধ ভিখারী ফনোগ্রাফ সহ পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে।

শ্রেণীর ভিক্ষুক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা আমাদের দেশের বৈষ্ণব ভিখারীর ন্যায় তারের যন্ত্র বাজাইয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। সংপ্রতি এই শ্রেণীর ভিখারীরা পয়সা জমাইয়া ফনোগ্রাফ যন্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে। যন্ত্রটি স্কন্ধ-দেশবিলম্বিত রজ্জুর সাহায্যে ঝুলাইয়া তাহারা পথে পথে গান গাহিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাম-স্কন্ধে একটি আধারে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট রেকর্ড সংগ্রহ করিয়া রাখে। এইরূপে গান করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে তাহাদের শ্রমের কিছু লাঘব হয়, কারণ, একবার দম দিলে অনেকক্ষণ গান চলিতে থাকে, তাহাতে হস্ত বিশ্রামলাভ করিবার অবসর পায়। ফন্দী মন্দ নহে। সম্ভবতঃ আমাদের দেশের অপেক্ষাকৃত চতুর ভিখারীরাও অবিলম্বে এই পদ্ধতির অনুকরণ করিতে পারে।

অগ্নি-প্রতিরোধকারী পরিচ্ছদ

সংপ্রতি আসবেস্‌টস্ কাপড়ে একপ্রকার পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা পরিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্য হইতে নিরাপদে নির্গত হওয়া যায়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, এই পোষাক সঙ্গে থাকিলে অগ্নির উত্তাপে দেহের কোনও অনিষ্ট হয় না। পরিচ্ছদের অন্তরালে অক্সিজেন গ্যাসপূর্ণ একটি আধার থাকে, তাহাতে বর্ম্মাবৃত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা হয়। সংপ্রতি আবিষ্কারক স্বয়ং এই পরিচ্ছদে আপাদমস্তক বিভূষিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড পার হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কাগজপত্রাদি লইয়া আসিয়াছিলেন। যে গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর আবিষ্কারক উক্ত পরিচ্ছদমণ্ডিত হইয়া অগ্নিরাশির মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিলেন। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, তাঁহার দেহের কুত্রাপি কোনও ক্ষতি হয় নাই।

মানুষ মাছ

আমেরিকার মৎস্যশীকারীরা ইদানীং মাছ ধরার পরিবর্ত্তে ছিপে করিয়া মানুষ গাঁথিয়া আমোদ অনুভব করিয়া থাকে। সমুদ্রে বৃহৎ জাতীয় মৎস্য ধরিবার উপযোগী ছিপ ও সুতা লইয়া শীকারী কোনও সন্তরণকারীর সহিত বাজী রাখে। সন্তরণকারীর মস্তকে একটা শিরস্ত্রাণ থাকে। তাহাতে একটি কড়া সংযুক্ত থাকে। সেই কড়ায় ছিপের সুতা বাঁধিয়া দিয়া সন্তরণকারী জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তীরে বসিয়া শিকারী তাহাকে বঁড়শীবিদ্ধ মাছের ন্যায় খেলাইতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময় সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া জলের মানুষ মাছ ও তীরের শীকারী মানুষের লড়াই আরম্ভ হয়। শীকারী মানুষ-মাছকে জল হইতে টানিয়া নিজের কাছে আনিবার চেষ্টা করে, আর জলের মানুষ-মাছ সাঁতার দিয়া তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা
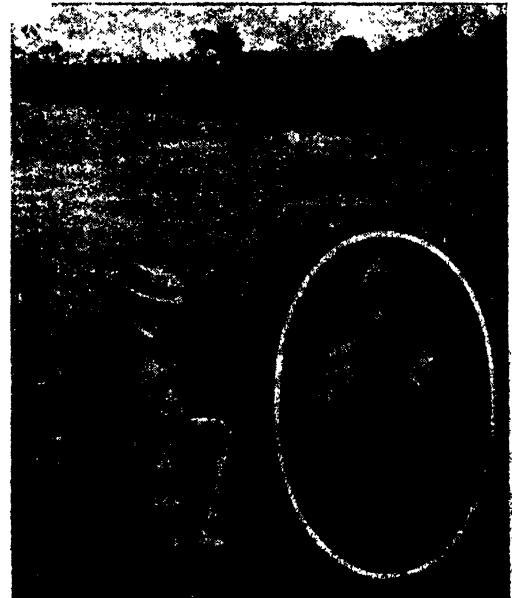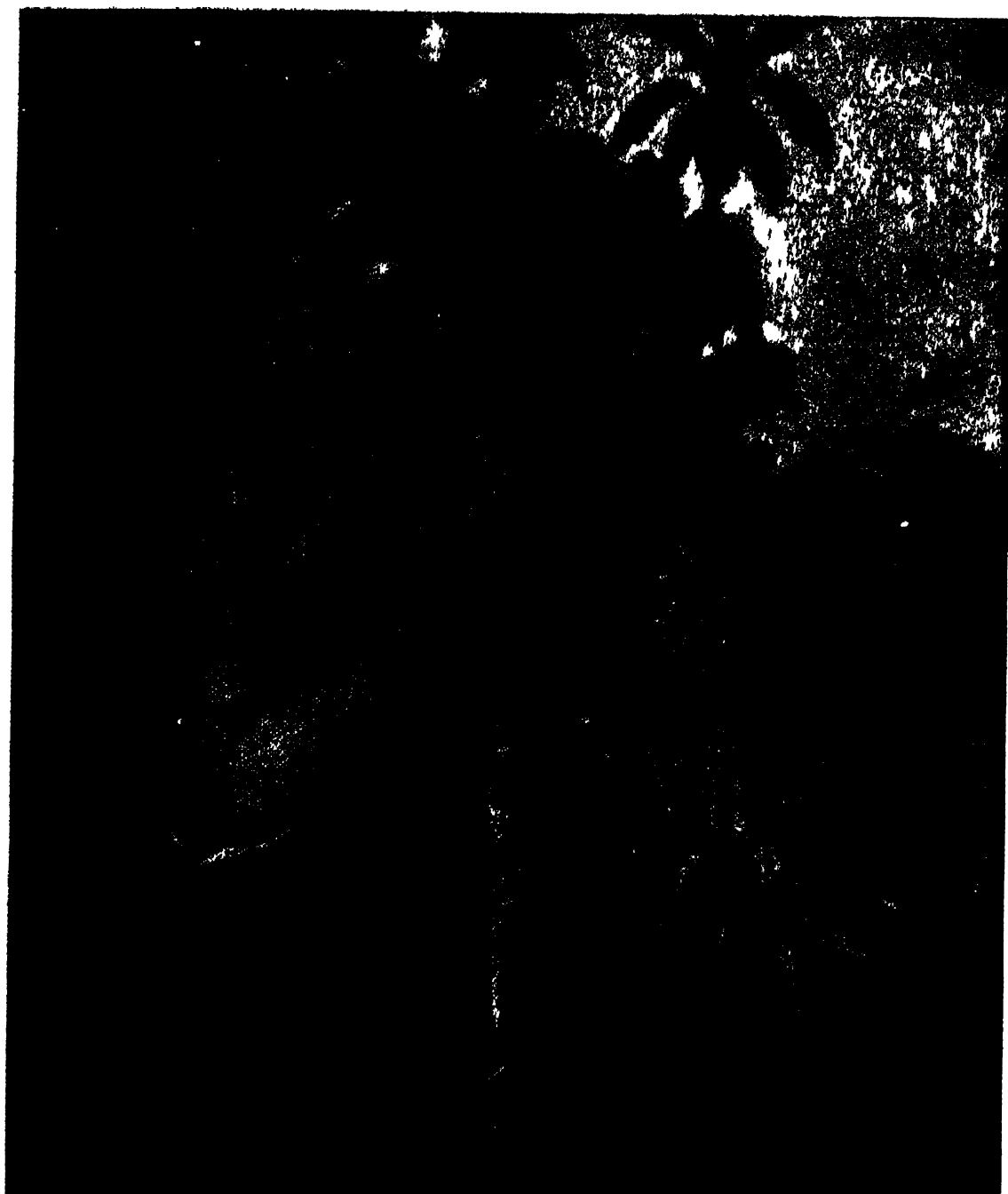
মানুষ-মাছ।

প্রার্থনা

শিল্পী—এস, এন, দাস] [জে, এন, মণ্ডলের চিত্রশালা হইতে

করে। এই খেলা ১০ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। ইহার মধ্যে যদি মানুষ-মাছ দূরে থাকিতে পারে অথবা সূতা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে, তবে সে-ই বাজী জিতে। আর যদি তীরের মানুষ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিতে পারে তবে সে-ই জয়ী হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পনিদর্শন

ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে কোনও ক্ষুদ্র নদীর ভূগর্ভনিহিত স্রোতোধারা নির্ণয় করিবার সময় এক ব্যক্তি বহুসংখ্যক মৃত্তিকানির্ম্মিত পশুর আকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এই সকল আদর্শ যে সমুদয় জীবের, তাহারা ২৫ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশে বিদ্যমান ছিল। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র য়ুরোপ হইতে ঐ জাতীয় প্রাণী অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। আবিষ্কারক যে গুহানিচয়ের মধ্যে উল্লিখিত শিল্পাদর্শগুলি পাইয়াছিলেন, তাহার কোন একটি গুহার প্রাচীরে নানাবিধ মূর্ত্তির আকার ক্ষোদিত আছে। তন্মধ্যে মস্তকবিহীন একটি ভল্লুকশাবকের মূর্ত্তিও আছে। উহারই অনতিদূরে একটি পূর্ণবয়স্ক জীবের মস্তকের একাংশ ক্ষোদিত অবস্থায় রহিয়াছে। একটি গুহার পার্শ্বে ২টি ব্যাঘ্র অথবা সিংহ জাতীয় প্রাণীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কোনও জীবের কঙ্কাল এ পর্য্যন্ত সে অঞ্চলের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মোটর বাইক ও মানুষ বেড়া

জার্ম্মাণীতে এক ব্যক্তি সংপ্রতি মোটর বাইক্‌এ চড়িয়া মানুষের বেড়া ডিঙ্গাইয়া যাইবার খেলা দেখাইয়াছেন। চায়ের পিরিচের আকারবিশিষ্ট কাঠের পথ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দিয়া মোটরবাইক্‌ চালাইয়া এই বাজী দেখান হইয়া থাকে। চালক দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইয়া, ইহাদিগকে অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন করিয়া অপর পার্শ্বে পৌঁছিয়া থাকেন। যে স্থান হইতে গাড়ী লম্ফ প্রদান করে, সেই স্থানটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ।

চালক মানুষবেড়া উল্লঙ্ঘন করিবার উপক্রম করিতেছে।

প্রস্তরনির্ম্মিত ভূমণ্ডল।

পাতরের পৃথিবী

ইংলণ্ডে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত পৃথিবীর মূর্ত্তি আছে। পাহাড় কাটিয়া অখণ্ড প্রস্তর হইতে উহা গঠিত। পথচারীরা উহা হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই গোলকের ওজন প্রায় ১ হাজার ৯৩ মণ হইবে। উহার ব্যাস ১০ ফুট। গোলকের উপরিভাগে প্রত্যেক মহাদেশ ও সমুদ্রের আকার ক্ষোদিত। বিষুবরেখা প্রভৃতিও বাদ পড়ে নাই।

আমার ডায়েরী

২রা জানুয়ারী।—এবার আর সে যাওয়া নয়—যা এতদিন মনে মনে কল্পনা করেই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছি। "এবার চলিনু তবে,সময় হয়েছে নিকট,এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" এমনই কতই ছন্দ সে বেদনাকে ঘিরে ঘিরে উচ্ছল জল-কল্লোলের মতই বেজেছে। কিন্তু আজ? কোন্ কথা, কোন্ ব্যথা আজ একে ভাষা দিতে পারে বা অনুভবে আন্‌তে পারে? রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, আর ঘণ্টা কতকের পরেই এই দাহকারী আবেষ্টনের দূরে গিয়ে ড়্ব! যে দেশ এক দিন আমার স্বর্গতুল্য মনে হয়েছিল, আজ সে যেন আমার জতুগৃহস্বরূপ। এর বাতাসেও যেন দাহ্য পদার্থের গন্ধ ভেসে আস্‌ছে। যতক্ষণ যত দিন আমি এখানে থাক্‌ব, তত দিন ততক্ষণ সেই গভীর ঘৃণার বেষ্টন হ'তে তো নিজেকে দূরে সরাতে পার্‌ব না! সে জান্‌বে, সেই গূঢ় উদ্দেশ্রেই আমি এখনও এ দেশে ব'সে আছি, এখনও সেই আশাতেই দিন কাটাচ্ছি। যে দিন আমি চ'লে যাবার খবর সগুণার কানে যাবে, সে সে দিনও ঘৃণার হাসি হেসে ভাববে 'এইবারে নীচ স্বার্থপরটা হতাশ হ'য়ে ফিরে গিয়েছে।' হোক্, তবুও সে স্বস্তি বোধ কর্‌বে ত'। শান্তি পাবে ত মনে মনে। চাই কি, দিন কতক পরে বাপের কাছেও ফিরে আসতে পারে।

ওরে চল্ চল্, আগুন আগুন; সব মুছে গেছে, রয়েছে কেবল বিপুল "দহন দাহের" শেষ চিহ্ন গভীর ক্ষত, আর তার জ্বালা! ঘৃণা—ঘৃণা—নীচ স্বার্থপর! "মোট ঘাট" সব বাঁধা হয়ে গেছে,বয়েল্ গাড়ীতে সে সব বোঝাই দিয়ে সজল-লোচন চাপরাসীটা 'বুক' করতে অনেকটা আগেই রওনা হয়ে গেছে। ঝি চাকর কটা কেঁদে আকুল। দিদিকে একটু তাগিদ দেবার জন্ত রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, তিনি আমার রাস্তার খাবার তৈরীর শেষ তখনও ক'রে উঠতে পারেন নি, রোদনপরায়ণ 'মহারাজ'কে তখনও লুচি বেলে দিতে দিতে নিজেও তাদের সঙ্গে চোখের জল মুছছেন। একটা তীক্ষ্ণ হাসিই যেন অন্তরের মধ্য হ'তে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমিও তো চেয়ে-ছিলাম গো যে, চোখের জলে এই দেশকে স্নান করিয়ে এর ধুলোকণাকেও শত চুম্বন ক'রে ভক্ত তীর্থযাত্রীর মত এর পায়ে জীবনের পুঞ্জীভূত সার সামগ্রী শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম সব পুষ্পাঞ্জলির মত দান ক'রে রিক্ততার গৌরবপূর্ণ চিত্তে এখান হ'তে চ'লে যাব! স্বপ্নেও জানিনি যে, আমার এ পলায়ন দাবানলের কবলমুক্ত অর্দ্ধদগ্ধ বন্যজন্তর সঙ্গে তুলনীয় হবে।

এইবার একেও—এই আমার বিচিত্র ডায়েরীকেও বন্ধ করি! আর কেন! বেশী সময় তো আর নেই! উঠতে হবে এইবার। যাই, দিদির কতদূর দেখি! তাঁর খাওয়া হয়নি তখনও দেখেছি! এ খাতাটা নিয়ে কি কর্‌ব আর। এখানেই ফেলে দিয়ে যাবার মত ভাগ্য তো নয়, কে কোথায় নিয়ে উপস্থিত কর্‌বে, কি হবে, থাক্! পথেই এঁর গতি করতে হবে। কি হবে আর এতে?

একটি কায কর্‌তে পার্‌লাম না, কাকাকে প্রণাম করতে কিছুতেই সাহসে কুলালো না! কি বল্‌বেন, কি করবেন তিনি? থাক! যেতে যে হবেই, কেন আর উভয় পক্ষেরই কষ্ট বাড়ানো! কষ্ট কি এতেও নেই? এই যে অকারণ স্নেহশীল আজ কয় মাসের অকৃত্রিম বন্ধু—যিনি আমারই জন্ত নিজের একমাত্র সন্তানের উপরও অবিচার করেছেন, তাঁর সেই স্নেহের প্রতিদানে তাঁকে না ব'লে এক রকম লুকিয়েই তাঁর একটু পায়ের ধুলোও না নিয়ে আমি চ'লে যাচ্ছি! আর তিনি? এ খবর যখন তিনি শুন্‌বেন? যাক্, এও আমার এই যাত্রাপথের এক পাথেয়! একেও নিতে হবে কাঁধে তুলে।

* * * * *

চলেছি, কখনও ঘন ঘন, কখনও মরুর মত ধুধু প্রান্তর কখনও গিরিদরী উপত্যকার মাঝ দিয়ে বেগে ছুটে চলেছি—ঝড়ের মত, হুহু ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দের সঙ্গেই ভাসতে ভাসতে!

বুঝতে পার্‌ছি না এখনও, এরই মধ্যে কি কি ঘটে গেল! এই খাতাটার আর কায নেই ভেবেছিলাম, কিন্তু দেখছি, একেই তো খুলে বসেছি আবার এখনও! যা যা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না, তাদেরই লিখে রাখতে হবে এই জীবনখাতায়! কেন তা জানি না, তবু লিখতেই হবে।

একটি একটি ক'রে লিখে লিখে বুঝি অঙ্ক ক'সে তবে যেমন তার আদি মধ্য অন্ত প্রশ্ন মীমাংসা উত্তর স্থির করতে হয়, তেমনি ক'রে! কিন্তু এ অঙ্কের কি শেষ ফল এখনই নজরে পড়বে? এর কি শেষ হবে এখনই? না গো, এ যে চিরজীবন ধ'রেই ক'সে যেতে হবে।

যাঁর জন্ম এই ছ'মাস ওখানে বাস, সেই দিদিই আমার সঙ্গে নেই! একা চলেছি! তাঁর হাতের বাঁধা জিনিষপত্র, তাঁর হাতের সাজা পান, প্রস্তুত মিষ্টান্ন আমার সঙ্গে চলেছে, কেবল সঙ্গে নেই তিনিই! এইটুকু স্নেহ সম্বল, এইটুকু লাভ নিয়েও আমি এখান থেকে বেরুতে পারলাম না! সব—সব নিঃশেষে সর্ব্বশেষ সামান্ত স্নেহ-আশ্রয়টুকুও নিঃশব্দে সেইখানেই দিয়ে আস্‌তে হ'ল। যেখানে আমার এই দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের জীবনের—যাক্!

টঙ্গা আনতে চাকরকে হুকুম দিয়ে দিদির খোঁজে গিয়ে দেখি, তিনি ঘরে নেই। চাকরাণীও নেই। মহারাজকে প্রায় চোখ রাঙিয়েই খবর আদায় কর্‌লাম। দিদি চৌধুরী সাহেবের বাংলায় তাঁকে দেখতে গিয়েছেন। চৌধুরী সাহেবের (সগুণার বাবার) বাড়ীর দাই আমাদের দাইয়ের বোনঝি,—মাসীকে কা'ল নাকি বলেছিল যে, সাহেবের অসুখ তো খুব বেশী! আজ তিন চার দিন থেকে কিছু খায় না, তবু বেটীকেও ডাক্‌বে না, ডাক্তারও দেখাবে না, ছোট কুঠীর সাহেবও তো চ'লে যাচ্ছেন, এইবার বুড়ো বেচারা মরেই যাবে। এই কথা এখনই শুনে দিদি প্রায় না খেয়েই উঠে প'ড়ে দাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন! নিশ্চয় চৌধুরী সাহেবকেই দেখতে গেছেন! এখনই আসবেন,সে জন্যে আমার "কুচ্ছু ভাবনা না আসে।"

'মহারাজ তো বল্‌লেন ভাবনা নেই, কিন্তু আমার যে ভাবনার পাহাড় মাথায় চাপলো! সত্যি কি তাঁর অসুখ বেশী? আমি খবর নিইনি বটে, কিন্তু তিনিও তো দেননি। আমার যাবার খবর জেনেই কি তাঁর এই প্রতিশোধ দেবার চেষ্টা? কিংবা এ আকস্মিক ঘটনা? খবর তিনি ইচ্ছা করেই যে দেন নি, সে বেশ বোঝা যাচ্ছে! দাইয়ের মুখে এটা তো দৈবাতের ব্যাপার! চাই কি, এটুকু খবরে বিচলিত না হয়ে আমরা চ'লে যেতেও পারতাম। আমি বোধ হয় এখনও তাই-ই করতাম, কিন্তু দিদি যা করলেন, এর ফল কি হবে, তা যে বুঝতে পারছি না!

টঙ্গা এলো—সময় ব'য়ে চল্‌লো। আর দেরী করলে ট্রেণ পাব না বুঝে অগত্যা আমায়ও চল্‌তে হলো—যেখানে যাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আমি পালাচ্ছিলাম, সেইখানে তাঁরই কাছে! দিদি কি বিভ্রাট বাধালেন এই যাত্রার সময়ে, একটু বিরক্তিই আস্‌ছিলো যেন ভেবে। মন তখন প্রচণ্ড শুষ্কতায় একেবারে রুক্ষ রসহীন, মমতার লেশও তাতে ছিল না যে!

গিয়ে যা দেখলাম, স্তম্ভিতই হয়ে গেলাম। ইনি এতখানি অসুস্থ হয়েছেন, তবু জানান নি তো! বোধ হয়, স্নেহ-পাত্রের অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে ব্যথিত হয়েই এমন করেছেন। আমি যে তাঁকে না ব'লেই পালাচ্ছি, তাও হয় ত ইনি জানেন! মনটার তখন এমন অবস্থা যে, তাঁর এই কাণ্ড দেখেও মনে হ'ল, যতই আঘাত এঁকে দিই, তবু এ ভিন্ন আমার গত্যন্তর কোথায়! আমায় যে যেতেই হবে।

দিদির কোলে মাথা রেখে একেবারে অজ্ঞানের মতই তিনি প'ড়ে আছেন, শরীর অত্যন্ত শীর্ণ, ম্লান! মনে পড়লো, আমাশার অসুখে ইনি কিছুদিন হ'তেই কষ্ট পাচ্ছেন; সেটা হয়ত বেশী রকম বেড়ে গেছে! কিন্তু এই জ্ঞানহীন অবস্থা—এ কি দৌর্ব্বল্যে, না আরও কিছু? সভয়ে আমি দিদির পানে চাইতেই দিদি মৃদুস্বরে বল্‌লেন—"ভয় নেই, ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি, সগুণাও এসে পড়লো ব'লে।" বুঝলাম, দিদি এসেই তাঁদের খবর দিয়েছেন। সম্মুখে অজ্ঞান রোগী—তবু আমার মনের মধ্যে আশার একটা দমকা বাতাস ব'য়ে গেল! এই ব্যাপারে বুঝি একটা শুভ-সংঘটনই ঘটে উঠবে! সগুণাকে তাঁর গৃহে বাপের কোলে প্রতিষ্ঠিতই দেখে যেতে পারব!

নিঃশব্দে দিদির সাহায্য করতে লাগলাম। সে ট্রেণে যাবার ভরসা ছেড়েই দিতে হ'ল। কাকার এই অজ্ঞান ভাবটা একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল বলেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল। ডাক্তারও তখনই এসে প'ড়ে আমার মতেরই পোষকতা করলেন। তবে তাঁর দৌর্ব্বল্য ও ব্যারামটা যে বেশ আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, সেটুকুও জানাতে দেরী করলেন না।

তিন জনের পাশে আর এক জনও এসে তখন দাঁড়িয়েছেন। তিনি সগুণা। নিঃশব্দে দিদি তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে কাকার মুখের সামনে বসতে বললেন—যাতে তাঁর

জ্ঞান আসতেই মেয়েকে দেখতে পান! সগুণা তা না গিয়ে দিদির পাশে ব'সে পড়লেন। হাত-পা তখন তাঁর স্পষ্টই কাঁপছিলো, চোখেও জল ঝরছে! দিদি তাকে এক হাতে স্পর্শ ক'রে নিঃশব্দে যেন সান্ত্বনা ও সাহস দিতে চাইলেন।

রোগীর সংবিৎ তখন ফিরেছে। আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে দিদির মুখপানে চেয়ে তিনি "মা" ব'লে এমন একটা আর্ত্ত করুণ স্বরে ডেকে উঠলেন—যাতে আমার সেই শুষ্ক নীরস ঈষৎ বিব্রত ব্যস্ত মনের উপরও একটা ধাক্কা এসে পৌঁছুলো। কি করছিলাম আমি! তাঁর কোন খবর না নিয়ে এমন ক'রে চ'লে যাওয়া এ যে ঘোর কৃতঘ্নতারই পরিচায়ক! ভগবান্ যে দিদির পুণ্যে আমায় একটা দারুণ পাপ হতেই রক্ষা করলেন, একটু বুঝতে দেরী হ'ল না! এ কৃতজ্ঞতাটুকু আমার কাছে তাঁর চেয়ে দিদিরই প্রাপ্য ব'লে মনে হ'ল।

কাকার আর্ত্তস্বরের উত্তরে দিদি তাঁর করুণাসুন্দর মুখ তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নিজের স্নেহসজল দৃষ্টি তাঁর অসহায় দৃষ্টির উপর স্থাপিত ক'রে ডাকলেন—"কাকা!" দিদির পানে চেয়ে চেয়ে তাঁর চোখের কোণ যেন সজল হয়ে উঠলো। অস্ফুটে আবার যেন কি বল্‌তে চাইলেন। সে বার আর স্বর না ফুটায় ডাক্তার ষ্টিমুল্যাণ্ট পথ্য তাঁর মুখের গোড়ায় ধরতেই তিনি হঠাৎ অস্বাভাবিক জোরে হাতের ধাক্কায় সেটাকে সরিয়ে দিলেন। দিদির পানেও চেয়ে সহসা তেমনই অস্বাভাবিক সজোর কণ্ঠে বললেন, "নীরেন চ'লে গেল তো গেল? বেশ! তবে তুমি এখনও কেন রয়েছ? যাও, তুমিও যাও, কাউকে চাই না আমি! এমনি ক'রেই আমি—যাও, তুমিই কেন এসেছ আমায় দেখতে, কে তুমি আমার?"

তাঁর জোর গলায় ও ভাবের এই পরিবর্ত্তনে সন্ত্রস্ত হয়ে সকলে তাঁর নিকটস্থ হতেই দেখা গেল, আবার তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। সে ক্ষীণ শরীরে এতখানি উত্তেজনা ধারণ করার শক্তি কোথায়! ডাক্তারের সঙ্গে দিদি আর সগুণা তাঁর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেন, আমি কেবল জড়ের মত দূরে স'রে রইলাম। নিজের ইতিকর্ত্তব্যতাও এরই মধ্যে ভেবে নিচ্ছিলাম! যেতে যখন আমায় হবেই, তখন কেন আর বারে বারে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। তাঁর এই ধারণাই বজায় রেখে আমি ধীরে ধীরে স'রে যাই; কেবল তাঁকে একটু প্রকৃতিস্থ দেখে যেতে চাই মাত্র।

শীঘ্রই আবার তিনি সুস্থতা পেলেন, আর তারই মধ্যে ইঙ্গিতে আমি দিদিকে আমার ইচ্ছাটা জানিয়ে দিলাম। দিদিও আমার অবস্থাটা ভালই বুঝছিলেন নিশ্চয়, নইলে একটুখানি মাত্র ভেবে নিয়ে অনেকখানি ক্লিষ্টতার সঙ্গেও আমার পানে সম্মতির দৃষ্টিতে চেয়ে তার পরেই একটু যেন উদ্বিগ্ন প্রশ্নের সঙ্গেই আমার পানে দৃষ্টি ফিরালেন। তিনি নিজে কি করবেন, এই সমস্যাই বোধ হয় সে দৃষ্টির অর্থ ছিল! আমায় কিন্তু ভাবতে হ'ল না—উত্তরও দিতে হ'ল না! ভগবান্‌ই যেন তখনই সে মীমংসাও ক'রে দিলেন। কাকা আবার দিদির পানে চেয়ে চেয়ে মৃদুস্বরে যেন নিজ মনেই বল্‌লেন, "কিন্তু তুমি তো যেতে পারনি! কে তুমি আমার! তোমায় আমি অপমানই বরং করেছি, দুঃখ দিয়েছি—তবু তারা যা পারলে, তুমি তো তা পারলে না! কি ক'রে তা পারবে! তোমায় যে আমি চিনেছি—তার অসুখের সময়েই! তুমি যে মায়ের জাত মা, আমাদের ঘরের অশিক্ষিত মেয়ে যে তুমি! তাই মরণাপন্নকে ফেলে যেতে পারলে না। আর জন্মে তুমিই আমার মেয়ে—না না—মা—মা ছিলে, মা বুঝি, তাই—" ব্যথিতের দুই চক্ষু দিয়ে এইবার জলের ধারা নাম্‌লো—আর সেই সঙ্গে সব চোখগুলোই ভিজে উঠলো। দিদি স্নিগ্ধ হস্তে রোগীর মস্তক স্পর্শ ক'রে "এইটুকু খান্ তো, কাকা" ব'লে মুখের গোড়ায় পথ্য ধরতেই "দাও মা" ব'লে নিরাপত্তিতে তিনি তখন সেটুকু পান করলেন! তাঁর পাণ্ডুশীর্ণ মুখে একটা আশ্রয়প্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা যেন তখনই ফুটে উঠলো। দিদি তখন আস্তে আস্তে তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে বল্‌লেন—"আপনার অসুখ শুনে সগুণা যে চ'লে এসেছে, কাকা, আমার সঙ্গে সেও যে আপনার সেবা করছে, দেখতে পাচ্ছেন না?" পিতা এ সংবাদে আবার কি রকম না জানি হয়ে পড়েন, সেই আশঙ্কায় আমি প্রায় রুদ্ধশ্বাসেই তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম, সগুণা দিদির পাশে ব'সে না জানি তখন কি ভাবছিলেন! কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না বা বল্লেন না! স্থিরভাবেই এ সংবাদ শুনে গেলেন, একটু পরে বল্‌লেন—"আমি ঘুমুব।" তখনই আবার শঙ্কিতনেত্রে দিদির পানে চেয়ে বল্‌লেন—

"তুমি উঠে যেও না যেন; ব'সে থাক্‌বে ত আমার কাছে ?" দিদি মাথা নেড়ে স্বীকার করায় তখন তিনি যেন নিশ্চিন্ত মনে চক্ষু মুদ্‌লেন। • •

নিঃশব্দপদে আমি বাইরে চ'লে এলাম। পাপের এই উদাসীনতা না জানি সগুণার মনে কতখানি আঘাত করলে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, এ ব্যাপারটা যেন অত্যন্তই স্বাভাবিক! দুই পক্ষেরই এতে অনেকখানি বাঁচন হয়ে গেল—অনেকগুলো পরের চোখের সাম্‌নে থেকে! এইই ভাল হ'ল!

ডাক্তার ও সগুণা বাইরে বেরিয়ে এলেন। বুঝলাম, ডাক্তারের আহ্বানেই সগুণা তাঁর সঙ্গে এসেছেন। রোগী যে দুশ্চিকিৎস্য রোগে কিছুদিন হ'তে ঔষধপথ্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেকে বেশ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ই এনে ফেলেছেন, সব চেয়ে তাঁর দুর্ব্বলতাই যে চিন্তার বিষয় হয়েছে, এই মতগুলি ব্যক্ত ক'রে ডাক্তার সগুণা ও আমাকে রোগীর সম্বন্ধে খুব যত্ন ও মনোযোগ নেবার ইঙ্গিত করলেন। সগুণা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কেবল শুনেই যেতে লাগলেন। আমি ডাক্তারকে ভরসা দিলাম—"দিদি যখন ভার নিয়েছেন, তখন শুশ্রূষার বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন, আর ইনিও আছেন,—দুজনে—" "তাই নাকি ?" ডাক্তার উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠলেন—"আপনার দিদিকে রোগীর কাছে রাখছেন তা হ'লে ? তা হ'লে তো আর ভাবনাই নেই! আপনার ব্যারামের সময় ওঁর যা যত্ন করবার ক্ষমতা দেখেছি, বড় বড় নার্সরা তেমন পারেন না। মশায়, আপনাকে কি এবার বাঁচাতে পারা যেত, যদি না—" "এ'র কি কি পথ্য আপনি ব্যবস্থা করলেন—কবার কোন্ কোন্ সময়ে" ইত্যাদি প্রশ্নে আমি সত্রস্তে এই ডাক্তারপুঙ্গবের বাক্যস্রোতকে অন্যদিকে চালিয়ে দিলাম। এই সরকারী ডাক্তারটিই "সাহেব" ডাক্তারের সহকারী থেকে আমার সেই অসুখের আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ করেছিলেন। সগুণার সাম্‌নে সেই অসুখের উল্লেখ আমাকে মাটীর সঙ্গেই যেন মিশিয়ে দিতে চাইলে। ডাক্তার আবার সগুণাকে পিতার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়ে ও ও-বেলা এসে যে তিনি দিদির সঙ্গে রোগীর চিকিৎসার সম্বন্ধেও 'কন্সল্ট' করবেন, দিদি যে এখনকার হেটোমেঠো ডাক্তারের চেয়ে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, সে কথা বার বার ক'রে জানিয়ে বিদায় নিলে আমিও যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু ইতস্ততঃ ক'রে সগুণাদেবীকেই বল্লাম, "আপনি যদি কাকার কাছে ব'সে দিদিকে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন তো বড় ভাল হয়।" আর যে আমি সেখানে এক মুহূর্ত্তও কাটাতে পারছিলাম না। সগুণা একটু এগিয়ে গেলেন, তার পরেই ফিরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে বল্লেন (কতদিন কতকাল পরে তাঁর আমার সঙ্গে এই কথাটুকুও বলা!) "তিনি উঠে এলে বাবা হয় ত জেগে উঠবেন! আপনিই তাঁর কাছে গেলে ভাল হ'ত।" কিন্তু যদি কাকা না ঘুমিয়ে থাকেন—যদি ধরা পড়ি, দুই এক মুহূর্ত্ত ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবতেই দেখি, দিদি নিজেই বেরিয়ে আস্‌ছেন। আমাদের তাঁর দিকে একসঙ্গে চাইতে দেখেই প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলেন, "বেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

আমি এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলা নিতেই তিনি একটু শঙ্কিতমুখে বল্‌লেন—"চল্‌লে ?" "হ্যাঁ দিদি।" "কিন্তু আমার কথা নীরেন,—আমি কি করব ?"

"এখনও কি তা জিজ্ঞাসা করবেন, দিদি ?" আমার আগে আপনিই তো তা দেখতে পেয়েছেন। আসি, দিদি।" আবার আমি তাঁর পায়ের কাছে নত হ'তেই তিনি ঠিক মায়ের মতই অধীর আবেগে আমার মাথার উপরে হাত রাখলেন,—যেন মাথাটিকে কোলেই টেনে নেবেন, কিন্তু চিরসংযতহৃদয়া বিধবা তখনই যেন নিজেকে সামলে হাতটা নামিয়ে নিয়ে বেদনারুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন "এখনই—এখনই, নীরেন ? ট্রেণ তো নেই এখন আর।" "আছে খানিক পরে একটা প্যাসেঞ্জার।" ব'লে নিঃশব্দে আমি সগুণার দিকে মাথাটা নীচু করতেই আবারও আমার উদ্দেশে তাঁর একটু ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—"এ সময়ে আপনিও থাক্‌লে বাবা হয় ত সুখী হ'তেন,—আমাদেরও অনেকটা ভরসা থাক্‌তো।"

এই যথেষ্ট—আর না, এর চেয়ে আর লোভ নয়! আমার এইই যে আশাতীত ধারণাতীত লাভ! মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে পরলোকের একটু আশ্বাসবাণীর মত কে বিধান করলেন এটুকু আজ আমার জন্য ? প্রণাম তাঁকে—শত শত প্রণাম।

নিজে উত্তর দেবার সামর্থ্য হ'ল না—চাইলাম আমার দিদির পানে। মুহূর্ত্তে তিনিও নিজের বিচলিত ভাব

সামলে নিয়ে গম্ভীরমুখে সগুণাকে আমার হয়ে উত্তর দিলেন, "না—নীরেনকে যেতেই হবে। এসো তবে, ভাই।"

নীরবে চ'লে আস্তে আস্তে একবার পরম ও চরম দুর্ব্বলতার শেষ সীমায় পৌঁছে পেছন ফিরে চেয়ে দেখলাম, দিদি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছেন, আর তাঁর চোখের জল ঝর্ ঝর্ ক'রে ঝর্ণার মতই ঝ'রে পড়ছে। জগতে গর্ভধারিণী মা ছাড়া আর তাঁরই মত স্নেহশীলা ভগিনী ছাড়া পরের জন্য এমন ক'রে কেউ যে কাঁদতে পারে, এ যে আর কখনও দেখিনি! অন্য কেউই কি দেখেছে? সন্দেহ হয়।

তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সগুণা শুষ্কমুখে কেমন যেন স্তব্ধভাবে তাঁরই দৃষ্টির অনুসরণ ক'রে চেয়ে আছে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে সেই মাটীর উপরে একবার বুক দিয়ে শুয়ে তাকে সাষ্টাঙ্গে আমার শেষ অভিবাদন জানিয়ে চ'লে আসতে ইচ্ছে হ'ল—পারলাম না, লজ্জায় বাধলো। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তেমনই চলেই এলাম।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।

ভাগাভাগি

মার্কিণ (ইংলণ্ডের প্রতি)—

আমরা দুটি ভাই আর কিছু না চাই—

সারা জগত ভাগ করে নে, যে যা'র বাড়ী যাই।

বিষম সমস্যা

"এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে।"

গলির মোড়ে, রায়েদের রকে, দত্তদের দরজায়, সেনেদের সদরে, বাঁড়ুয্যেদের বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, হেদোর কোণে, গোলদীঘির ধারে যুবকের দল চক্র ক'রে ব'সে দাঁড়িয়ে আবার এ সব কি ফিস্‌ফিস্ কচ্ছে? কারও মুখ গম্ভীর, কারও সুচারু ভুরু কুঞ্চিত, কারও ঠোঁটে টেপা হাসি, কেউ বা উঁচু ক'রে তোলা ডানহাতের মুঠো বাঁহাতের চেটোর ওপর ধপাৎ ক'রে ফেলে নিজের কথাগুলো শ্রোতার বুকের ভেতর যেন ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা কচ্ছে। চল্‌তে চল্‌তে টের পেলেম, একটা কথা যেন কানের ভেতর ফস ক'রে ঢুকে গেল—"তাই ত' সি, আর, দাশের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি!" ঠিক কথা; ছোকরাটির নাড়ীজ্ঞান আছে। মাথা খারাপ না হ'লে কোন বুদ্ধিমান্ কি রাজনৈতিক সমস্যার একটা সহজ-বোধ্য ভাষ্য প্রকাশ করে? পলিটিক্সের ভাষার ভিতর গূঢ় হইতে গূঢ়তম অর্থ লুক্কায়িত থাকা বিশেষ প্রয়োজন। হেঁয়ালি ভেঙে দিলেই পলিটিক্স একটা সোজা খেলো কথা হয়ে দাঁড়ায়। প্রাচীনকালে এ দেশে যিনি প্রধান পলিটিসিয়ান্ ছিলেন, তাঁহার নাম কৌটিল্য। বিশ্বরাজ্যের নিয়ন্তাকেও পৌরাণিকরা চক্রী নামে আখ্যাত করিতে দ্বিধা করেন নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পলিটিক্যাল্ গ্রন্থ গীতা। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে এই গীতার বাণী শ্রীভগবানের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। মহাত্মা অর্জ্জুনের প্রাণে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় তিনি জ্ঞাতি-বন্ধু-গুরুজন-হনন ভয়ে গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া সমরবিমুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু গীতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত হইল, অমনি সংহারমূর্ত্তিতে আবার মার মার রবে গাণ্ডীব গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য-বর শঙ্কর আবার এই গীতা পাঠ করিয়াই আপনাতে ও পরব্রহ্মে অভেদ বোধ করিলেন। শচীনন্দন নিমাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ গীতা পাঠ করিয়াই আবার তাঁহার চৈতন্য উদয় হইল, তিনি দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন, বঙ্গদেশে বিষয়বাসনাত্যাগ-বৃত্তির বীজ ছড়াইয়া দিয়া গেলেন।

"শঙ্খবণিকের করাত যেমন যাইতে আসিতে কাটে।" পলিটিক্সের ভাষাও তেমনই হওয়া উচিত। একটা ছোট-খাট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্; এই দেখুন না, কলিকাতার ইংরাজের কাগজ "ষ্টেটসম্যান"—এ দেশে বিলাতী মাল আমদানীর পক্ষে যখন ওকালতী করিতে হয়, তখন বলেন যে, ভারতের কোটি কোটি দীন-দুঃখী নর-নারীকে সুলভে পরিধেয়াদি ব্যবহার্য্য সরবরাহ করা রূপ পরোপকারবৃত্তির উত্তেজনাতেই আমরা এই বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নিজের কোন স্বার্থ নাই; আবার তাঁহাদেরই বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত অষ্ট্রেলিয়ান যদি এমন কিছু কায করেন যাহাতে রাঢ়ভূমি ইংলণ্ডের লভ্যের খাতায় কিছু কম পড়ে, তখনই অষ্ট্রেলিয়াকে দু'কথা শুনাইয়া দিয়া বলেন,—"কেবল তোমাদেরই উপকারের জন্য তোমাদের মাল বিক্রয়ের একটা বাজার আমরা ইংলণ্ডে খুলিয়া রাখিয়াছি।" পলিটিক্স সাহিত্যে এইটি হচ্ছে এ, বি, সি, তবু ইংরাজ জাতিতে বৈশ্য, রাজনৈতিকতন্ত্রে তিনি এম্যাটের মাত্র। আমাদের স্বরাজ দরাজ খৈরজ গরজ নারাজ সকল দলেরই পলিটিক্স শিক্ষা ইংরাজের নিকট; সুতরাং অনেক সময়ে মনের মতলব চাপিয়া রাখিয়া কায করিতে পারেন না, কথা ফাঁক করিয়া দেন।

চিত্তরঞ্জন বাবু তেমন যদি পাকা পলিটিসিয়ান হতেন, তা হ'লে আগে ৮০ জন মুসলমানকে চাকরীর চেয়ারে বসাইয়া তবে ২০ জন হিন্দু ফাঁকে ফোঁকে 'সেবকশ্রী'র টুল পাতিবার চেষ্টা দেখিবেন, এই রকম একটা বেফাঁস কথা না ব'লে মনের ভাবটা এরূপ ভাবে ব্যক্ত করতেন যে, "যখন দেখা যায়, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাঠ, হাতুড়ী, করাত, নাপতের নরুন, ধোপার পাটা, কুমোরের চাক, ঢাকীর ঢাক, তাঁতির তাঁত, অন্নের পাত, সকলই ক্রমে হিন্দু বাঙ্গালীদের হাত কাঁধ কোল থেকে স'রে অন্য জাতির কাছে গিয়ে তাদের ছাতির বলবৃদ্ধি কচ্ছে, তখন আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করা গেল যে, শতকরা বিশ জন বই অ-মুসলমান

বাঙ্গালী মলেও আর চাকরী করবে না; মুসলমান ভ্রাতারা ইচ্ছা করেন, সব বড় বড় মাইনের চাকরী তাঁরা নিতে পারেন, চাকরী ক'রে আমরা যেমন গোল্লায় গেছি, তেমনই তাঁরা যেতে পারেন, আমরা তাতে একটিও কথা কহিব না।" গো-বধ সম্বন্ধে বলিলেই হইত যে, যখন শাস্ত্রে দেখা যাইতেছে, গো-হত্যা, গো-মাংস, গো-রক্ত এ সকল কথা মুখে আনিলে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তখন স্বরাজ্যদল ধার্য্য করিলেন, কোন সভাসমিতি কৌন্সিল বৈঠক বা অপর কোনও স্থানে কোনও হিন্দু কখনও গো-হত্যা শব্দ মুখে আনিতে পারিবেন না, তা যা হবার হোক্। আর কৌন্সিলে মুসলমান প্রভাব দৃঢ়তর করিবার প্রস্তাবটা ঘুরাইয়া বলিতে পারিতেন যে, যখন গভর্ণর বাহাদুর মেজরিটী দেখিয়াই মিনিষ্টার নিযুক্ত করিবেন, তখন ঐ মিনিষ্টারী পদের অবশ্যম্ভাবী বিপদ চৌষট্টি হাজারী কলঙ্কের পশরা মস্তকে বহিবার আশঙ্কায় অ-মুসলমানরা অতি অল্পসংখ্যায় মাত্র কৌন্সিলে প্রবেশ করিবেন। এইরূপে বাজনা খাজনা যা কিছু কথা সবই পলিটিক্যাল্ তাবাচক্রে ফেলিয়া আসল মতলব চাপিয়া রাখিতে পারিতেন।

কাঞ্চনসঞ্চয়ের মোহ কাটাইয়া চিত্তরঞ্জন যে দেবলাঞ্ছন পূজ্যের আসন ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা টল্ টল্ করিতেছে প্রসাদ বাঁটিবার সময়; মুসলমানদিগের জন্ত তিনি কাঁচা পাকা দুই রকম সিন্নির ব্যবস্থা করিয়া হিন্দু ভক্তদের মাত্র দুফোঁটা করিয়া চরণামৃত দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমরা যে শাক্ত ভক্ত, পাঁঠার মুড়ির প্রত্যাশা রাখি, কালীঘাটের কূলে বাস করিয়াও দেশবন্ধু এ কথা ভুলিয়া গেলেন।

রাজনৈতিক ভারতবর্ষের বিষম সমস্যা হিন্দু-মুসলমানে ইউনিটি বা একতা। মহাত্মা গন্ধী যখন অসহযোগ মন্ত্রে ভারতবাসীকে দীক্ষিত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন তাঁহার মনের এই ভাব ছিল যে, ইংরাজ যখন শাসক, আমরা শাসিত, ইংরাজ শক্তিমান্, আমরা অশক্ত, ইংরাজের হস্তে দাতার ভাণ্ডার, আমাদের স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, ইংরাজ দখলদার, আমরা বে-দখল, তখন ইংরাজের কার্য্যে সহযোগী হওয়া অর্থ ইংরাজ স্বার্থের পরিপোষণ ভিন্ন অন্ত কিছুই হইতে পারে না।

ইংরাজ সম্বন্ধে এই সহযোগের কথা যেমন খাটে, মুসলমানদিগের সম্বন্ধেও তেমনই অনেকটা খাটে। ইংরাজ যেমন বলেন, তোমরা বিজিত, আমরা জেতা; তোমরা বর্ব্বর, আমরা তোমাদিগকে সভ্য করিতেছি; শাস্ত্রীর সাহায্যে তোমাদের শান্তিরক্ষা করিতেছি, আফিস খুলিয়া তোমাদের বাবুদের চাকরী দিতেছি, কল বসাইয়া তোমাদের জোলা মালা দাঁড়ীমাঝি ছুতার কামার ছেলে জেলে সবাইকে মোটা মোটা মাহিনায় কুলিগিরী দিতেছি, তারা সারাদিনের কর্ম্মের আনন্দে বিভোর হইয়া সন্ধ্যাবেলা তাড়ির কলসী লইয়া বসিতেছে; তেমনই মুসলমানরা-ও বলিতে পারেন যে, ইংরাজরা ক'দিনই বা তোমাদের উপকার করিতেছেন, এই বাঙ্গালা দেশেই এখনও কোম্পানীর শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া-ও এখন-ও দেড় শত বৎসর পূর্ণ হয়নি, সমগ্র ভারতে ত আর-ও কম দিন; আর আমরা ইতিপূর্ব্বে সাত শত বৎসরের-ও উপর তোমাদের লালনপালন করিয়াছি, ইজের পরাইয়াছি, মাথায় মোড়েসা বসাইয়াছি, কোপ্তা কোর্ম্মা পোলাও রাঁধিতে শিখাইয়াছি, আতর গোলাপ মাখাইয়াছি, সুতরাং আমাদের দাবী অবশ্য তোমাদের পূর্ব্বে-ই গ্রাহ্য হওয়া উচিত।

তোমাদের আর্য্য দ্রাবিড় প্রভৃতি নাম, ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি নাম বহু দিন লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দু বা হিন্দুস্থান এ নাম আমাদের দেওয়া; এরূপ ভাবের অস্তিত্ব মুসলমানহৃদয়ে অতি সহজ।

বাস্তবিক, আমরা যে এখন ইণ্ডিয়ান বলিয়া গর্ব্ব করি, সে আখ্যা য়ুরোপেরই প্রদত্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্রা যতই গোলমাল করুন, মুসলমান আমলের পূর্ব্বে যে হিন্দুস্থানী কথা ছিল, তাহা ত পুরাণ ইতিহাসে দেখিতে পাই না।

মুসলমানরা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, কণিকামাত্র প্রসাদ ভোজনই তোমাদের ভাগ্যে বহুকাল হইতে ব্যবস্থা হইয়াছে। নৈবেদ্য অগ্রে আমাদের সম্মুখেই নিবেদিত হইত, আমরা কৃপা করিয়া তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতাম মাত্র। তোমরা ভুলিয়া যাও যে, এ দেশ এক দিন তোমাদের ছিল, তোমরা একটা জাতি বা মানুষ ছিলে; এ রাজ্য আমরা অধিকার করিয়াছিলাম, বহু শতাব্দী ভোগের পর ইংরাজ আসিয়া আমাদিগের-ই হস্ত হইতে হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড নিজ করকবলিত করিয়াছে, সুতরাং ষোড়শোপচারে ভোগগ্রহণ করিবার অধিকার

বসুমতী প্রেস।

[ভাস্কর—শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক।

সান্ধ্য-দীপ

এক্ষণে তাঁহাদের-ই। কিন্তু প্রসাদের অগ্রভাগ আমাদের প্রাপ্য, উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্ট তোমরা আশা করিলে-ও করিতে পার।

বড় বড় চাকরীর জন্য এত দিন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক অধিকসংখ্যায় ইংরাজী পড়েন নাই বা পরীক্ষায় পাশ করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা ধী, মেধা, অধ্যবসায় বা স্মৃতিশক্তিতে হীন। ইসলামধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ও খানদানীর জোরেই তাঁহারা নবাবী আমলে শাসনাদি বিভাগে মোটা মাহিনার উচ্চপদ লাভ করিতেন; তাঁবেদারীর জন্য বিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজন, সুতরাং সুবাদার ফৌজদার মজুমদার কাজী কোতোয়াল, এমন কি, দারোগা প্রভৃতির তাঁবেদারী করিবার জন্যই হিন্দুদিগকে কেতাবী এলেম কিছু কিছু আদায় করিতে হইত। বহু বহু শত বৎসরের অভ্যাস সহজে ত্যাগ করা যায় না, সুতরাং উচ্চপদলাভে মুসলমানদের যে জাতিগত অধিকার আছে, এ কথা কিঞ্চিদধিক শত বৎসরে মুসলমানগণ কেমন করিয়া বিস্মৃত হইবেন? আবার বৎসরত্রয়মাত্র পূর্ব্বে রিফরমযুগের প্রারম্ভেই ইংরাজরাজ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, ইণ্ডিয়াতে তিনটি জাতি গণ্য, বাকি সব ইতরে জনাঃ; অর্থাৎ য়ুরোপীয়ান, য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ম্যাহমিডান, অবশিষ্ট সব নন্-ম্যাহমিডান্ বা অ মুসলমান।

নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে স্বার্থের সমতা না হইলে কখনও একতা হয় না। পরের বাড়ী লুঠিবার সময় দস্যুদলের মধ্যে একটা একতা হয়, আবার সেই লুণ্ঠিত দ্রব্য বাটপাড়ের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য চোরদের মধ্যে একতার প্রথা আছে। মকদ্দমার সময় উকীলে মক্কেলে একটা পাকাপাকি ইউনিটি জন্মিয়া থাকে। স্বাধীনে-অধীনে, প্রভুভৃত্যে, শক্তে অশক্তে যে মিলনের সম্বন্ধ, তাহার নাম একতা নহে। ইংরাজের বাণিজ্যপ্রসারণ সম্বন্ধে বা স্বজাতিপ্রীতির পথে আদতে বাধা দিও না, ইংরাজ তোমার সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া কায করিবে, তাহাকে সব মিশন বলিতে হিউমিলিয়েসন বোধ হয়, কো-অপারেসন বল, ইউনিয়ন বল, কোন আপত্তি নাই। মুসলমানদের সঙ্গে-ও একতা রাখিতে ইচ্ছা কর, তাঁহাদের সকল আবদার অগ্রে রক্ষা কর;—পিছু হটো। পিছু হটো।

ব্যারিষ্টার আমীর আলীর পুরুষানুক্রমে বাস বাঙ্গালা দেশে, তিনি বাঙ্গালীর বাঙ্গালী। কিন্তু তিনিও যখন ইংলণ্ডে চিরবাসের সঙ্কল্প করিয়া বঙ্গভূমি হইতে শেষ বিদায়-গ্রহণ করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, এ দেশও আমার বিদেশ, ইংলণ্ডও আমার বিদেশ; সুতরাং আমি যে বাঙ্গালা ছাড়িয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি, ইহাতে আমার বিশেষ আক্ষেপের কারণ কিছুই নাই। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের স্বর্গীয় স্বপ্ন এই যে, সমগ্র জগৎ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্যের মধ্যে এক বিরাট ভ্রাতৃভাবের সৃষ্টি করিবে। অ'জ সি, আর, দাশ মহাশয় কল্‌মা পড়িয়া শের দানিস খাঁ নাম গ্রহণ করুন, দেখিবেন, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মুসলমানবাহু তাঁহাকে সত্য সত্য ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য সস্নেহে বিস্তারিত হইবে; এখন আমরা মুসলমান ভাই-ই বলি, আর মুসলমানরা হিন্দু ভাই-ই বলুন, সবই ইংরাজীর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।

ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের আবার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় আদেশে এ দেশে আবার বাদশাহী আমল আসিবে, কোন মুসলমান সম্রাটের বকৃতের অপেক্ষাতে-ই দিল্লীর তক্ত আম-খাসে মজুত রহিয়াছে। রাস্তা হইতে ডাকিয়া যে কোন মুসলমানকে আলাদা জিজ্ঞাসা করুন, উত্তরে এ অধীনের কথা সত্য বলিয়া বুঝিবেন। এই কলিকাতার রাস্তায় আমি বাল্যকালে হিন্দু পথিকের সহিত বিবাদ করিয়া ভিস্তিকে বলিতে শুনিয়াছি—"জানিস্ হালা, মুই বাদশার জাত।"

আমরা যদি এত কাল পরে-ও ভীমার্জ্জুন, প্রতাপ, পৃথ্বী স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলে মুসলমানরা কেন না বাবর আকবর আলমগীর স্মরণ করিবেন?

ইউনিটি আমাদের হিন্দু-মুসলমানে এক রকম ছিল, অন্ততঃ টলারেসন—যাকে সাদা বাঙ্গালায় "ক্ষেমা-ঘেন্না" বলে। পল্লীগ্রামে ত আছেই; এই কলিকাতার দর্জ্জিপাড়া তালতলা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু-মুসলমানরা পাশাপাশি বাড়ীতে চাচা, মামু, দোস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতাইয়া পাঁচ ছ' পুরুষ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিয়া আসিতেছে। কাল হ'ল এক ইংরাজী-পড়া চাকরী আর তার ওপর এক পলিটিক্স নিয়ে। ইংরাজরা পলিটিক্সের সর্ব্ববিষয়ে পাকা না হইলেও ভেদ-নীতিজ্ঞানে একেবারে সিদ্ধ।

জাতিগত অধিকার যে কি পেয়েছি, পেটের জ্বালায় তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, কিন্তু ব্যক্তিগত মাহিয়ানা বা মর্য্যাদা নিয়ে হিঁদুতে হিঁদুতে, হিঁদু মোছলমানে ঘরওয়া লড়ায়ের কি আখড়াই বাজনা-ই না বেজে উঠেছে।

আসল কথা হচ্ছে যে, এখন আমরা চ'টে গেছি ইংরেজের ওপর। চটেছি নানা কারণে। প্রথমতঃ যাঁদের সচ্ছল অবস্থা, তাঁরা বল্‌ছেন, এ কথা সত্য যে, সাহেব না হ'লে সভ্যও কেউ হয় না, শিক্ষিতও কেউ হ'তে পারে না, রাজ্যশাসনও কেউ কর্ত্তে পারে না; কিন্তু রং ছাড়া সাহেব হ'তে আমাদের আর বাকীটা কি? এক পুরুষ ইংরাজী পড়ার পরেই আমরা চাপকানের ঝুল হাঁটুর নীচে নামান বন্ধ করেছি, দাড়ী রাখতে আরম্ভ করেছি; যখন স্বায়ত্তশাসন বল্‌তে শিখেছি, তখনই পার্শী কোট নাম দিয়ে একটা ইংরেজী কোট জাল করেছি; স্বরাজ স্বরাজ ব'লে চেঁচিয়েছি আর একেবারে হ্যাট-কোট নেক্‌টাই এবং গোঁফের দু'দিক মুড়ানো। আর আমরা বাঙ্গালী বলি না, একেবারে ইণ্ডিয়ান্; বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলে, ফুটবল খেলে—নাম হয় ইণ্ডিয়ান্ টিম্ জিতেছে। এতগুলো তুরুপ হাতে, তবু বদ রং ব'লে আমাদের হাতে রাজ্যভার ছেড়ে দেবে না কেন? দ্বিতীয়তঃ, নৈরাশ্যের দলের নালিশ যে, ফাঁকি দিয়ে আমাদের কাছ থেকে এত স্কুলকলেজের মাইনে নিলে, এত বিলিতী বই কাগজ কলম খাতা ফাউণ্টেনপেন্ বেচলে, প্যাণ্ট কোট চাপকান গাউন গছিয়ে ডিক্রী দিলে, এখন অন্ন দেবার সময়—"নো ভেক্যান্সি" বল কেন? তৃতীয়তঃ আর এক দল আছেন, যাঁদের এক গোলামী একঘেয়ে দাঁড়িয়েছে, যা হোক একটা মনিব বদলালে বাঁচি! আর শেষ সর্ব্বসাধারণ দল,—খাটছি খুটছি, গোটাকতক টাকাও গুণে পাচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কুলোয় না। বাঙ্গালার শেষ নবাবদের সময়েও আর কিছু থাক না থাক, চালটা খুব সস্তা ছিল; এখন মাগ্‌গির চোটে আমাদের মনুষ্যত্বে এমন মর্ম্মান্তিক ঘা প'ড়েছে যে কেউ এলে এক মুঠো অন্ন দেওয়া দূরে থাক, পরিবারস্থ কোন লোক যদি চাড্ডি ভাত বেশী খায় ত' মনে মনে রাগ হয়। দশ জনকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালে অন্ততঃ এক এক জনের পাতে এক পোয়া সন্দেশ না দিলে আর ভাল দেখায় না; কিন্তু ভাদ্রমাসেও এক পোয়া সন্দেশের দাম আট আনা, আর লগসার বাজারে এক টাকা। তার ওপর আবার আজকালকার সভ্যতা বজায় রাখতে গেলে বাব-বিস্তর; চা চুরোট সাবান কোকো তোয়ালে কাপ সসার ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা ভাবেন যে, মরতে ত বসেছি, তা যা হোক একটা গোলমাল লণ্ডভণ্ড হয়ে একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

এই জন্তই আমাদের মুসলমানদের সঙ্গে পলিটিক্যাল ইউনিটি স্থাপনের এত আগ্রহ। হিন্দুস্থান ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নাই,—গিয়ে আশ্রয় নেবার আর কোন যায়গাও নাই; কিন্তু মুসলমানদের সে আপদ নাই; এখনও আশেপাশে তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান, পার্শিয়া প্রভৃতি অনেক স্বাধীন মুসলমানরাজ্য রয়েছে, সুতরাং ইণ্ডিয়ানদের উপকারের জন্য ইণ্ডিয়ায় বাস করা রূপ ঝকমারির মাসুল তাঁরা পুরা দাবীতেই চাহিয়া থাকেন। আর এই ইণ্ডিয়াতেই তাঁরা দলেবলে কম পুরু নহেন; তার ওপর আমাদের শুচিবাই সেই দলকে নিত্য বৃদ্ধি করিতেছে; রামচাঁদ একবার রহমৎ উল্লা হ'লে আর বাবার খাতির রাখে না, তার যে কলসের জল এক দিন তুমি অবজ্ঞায় স্পর্শ করনি, সেই কলসের জলই তখন সে কুলকুচো ক'রে তোমার গায়ে দেয়।

সভাই কর আর সমিতিই কর, লেক্‌চারই ঝাড় আর ট্রাক্টই ছাপাও, মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখতে গেলে সিংহের প্রাপ্য সিংহকে দিতেই হবে; মুড়িটি হালদার মহাশয়ের জন্য না রাখলে কালীঘাটের পাঁঠায় কোপ পড়ে না, আর সে মুড়ির পরিমাপ মেরুদণ্ডের আধখানা অবধি।

আমাদের অনেক দেশহিতৈষীরা বলেন যে, মুসলমানও বাইরে থেকে এসে আমাদের দেশ জয় করেছিলেন, ইংরাজও বাইরে থেকে এসে জয় করেছে, কিন্তু মুসলমান এসে আমাদের দেশে আমাদের সঙ্গে একত্রে বাস করেছেন, তাই তিনি আমাদের ভাই, আর ইংরাজ বসন্তের কোকিল, দু'দিন কুহু কুহু শুনিয়ে ফলটা পাকড়টায় ঠোকর মেরে উধাও হয়ে উড়ে যায়, তাই সে তাইরে—নারে—না। যদি ডিক্রীদার মহাজন খাতকের ভিটেতে বাঁশগাড়ি ক'রে ব'সে ওপর মহলটহল দখল ক'রে নিয়ে পূর্ব্বের স্বত্বাধিকারীকে মাথা গুঁজে থাকবার জন্যে নীচেকার গোটাদুই ঘর ছেড়ে দেয়, তা হ'লে তাতে মহাজনের যতটা বদান্যতা প্রকাশ

পায়, মোগল-পাঠানও এ দেশে বাস ক'রে ততটুকু উদারতা দেখিয়েছিলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষটায় বরফ পড়ে না আর সিমলা-দার্জ্জিলিংয়ে বার মাস ডিসেম্বর জানুয়ারী নয় তাই রক্ষে, ইংরোজরা যায় আসে, এক দিন হয় ত সবাই-ই যাবে।

কিন্তু—একজনেরা দু'ভাই ছিল; বড় ভাই কেরাণী, ছোট ভাই উকীল। বাপ মরবার পর দু'ভাইয়ে বিষয় ভাগাভাগি হ'ল; উকীল ভাই-ই ভাগ বাঁটরায় সব বন্দোবস্ত ক'রে ঘরে ঢুকে নিজের স্ত্রীকে ডেকে বল্লেন,—"ছোটবৌ, ভারি মজা ক'রে এসেছি, বখরায় আমারই জিত।" ছোটবৌ বল্লেন, "কি রকমটা শুনি?" উকীল উত্তর কল্লেন—"মাকে দিয়েছি দাদার বখরায় ফেলে, আর আমি নিয়েছি ঠাকুর, একমুঠো ভিজে চাল আর দুটো ছোলা কি একটা কলা।" তখন উকীলের উকীল ছোটবৌ ঠাকুরুণ বল্লেন,—"আ পোড়া বুদ্ধি! আ মুখে আগুন! এই বুঝি তোমার উকীলি বিদ্যে! মা তো হয় পাঁচ বছর, নয় বড় জোর দশ বছর, আর ঠাকুর যে অমর, অমর—অ মিন্সে, অমর! চিরকালটা খাবে আর জ্বালাবে।"

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

স্বর্গ ও মর্ত্ত

অনেকখানিই স্বর্গ এসেছে মর্ত্তে নেমে
কণ্ঠ ভরিয়া পিয়েছি অমিয়া প্রিয়ার প্রেমে,
সন্তাপহর শিশু-সন্তান-মহোৎসবে
সন্তানকের সন্ধান মোর মিলেছে ভবে।
মন্দিরে মোর ঘেরি মন্দার ছড়ায় বিভা,
প্রিয়-পরিজন নন্দনবনে রয়েছি কিবা।
ধরার শোভাই করেছে আমারে নির্নিমেষ,
বন্ধুসভায় দেবেরই সঙ্গ মিলেছে বেশ।
স্বর্গজার স্নিগ্ধতা হেরি প্রেমিক চোখে,
চির-বসন্ত করেছে অজর মানসলোকে।
জ্ঞানবিজ্ঞান, হেথায় কল্পতরুর সম,
সারাটি বিশ্ব ঘুরি কল্পনা-বিমানে মম।
বাকী যাহা আছে স্বরগে, তাহাতে নাহিক লোভ,
না পেয়ে দুঃখ নেই এক কণা, বিন্দু ক্ষোভ।
স্বর্গে যা নাই তাও মিলিয়াছে, মায়ের স্নেহ,
পেয়েছি হেথায় অবাধ অগাধ অপরিমেয়।
স্বরগে, শুনেছি, বেদনা নাহিক একটি কণা,
বেদনা বিহনে জননীয়ো নেই সম্ভাবনা।
হেথায় গর্ভধারিণী আমার সহিয়া ক্লেশ,
কভু দিনে রাতে দেন নাক পেতে দুঃখলেশ।
অন্নপূর্ণা ধরণী হেথায় হৃদয় চিরি,
অন্নে তুষিয়া শতবাহু দিয়ে রয়েছে ঘিরি'।
দেশমাতা হেথা সহি' লাঞ্ছনা অশেষ দুখে,
শস্যে তুষিয়া বসনে ভূষিয়া রেখেছে বুকে।
প্রকৃতি হেথায় ভরি ফুলে ষড়ঋতুর ডালা,
কণ্টকব্যথা সহিয়া, কণ্ঠে পরায় মালা।
হেথা শতনদী সহি কঙ্কর উপল ব্যথা,
বিতরে স্নিগ্ধ কলতরঙ্গে বৎসলতা।
বিমান-জননী বক্ষে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়ে,
অবিরলধারে মাতৃমমতা বরিষে শিরে।
জননীর রূপ ধরেছে এখানে সরস্বতী,
আমারি লাগিয়া শিল্পজননী স্তন্যবতী।
স্বর্গেরে মোর মর্ত্তজননী গিয়াছে জিতে,
নাহি কোনো ক্ষোভ, স্বর্গের লোভ নাই এ চিতে।

শ্রীকালিদাস রায়।

বিলাতী নির্ব্বাচন

বিগত ৮ই ডিসেম্বর বিলাতে পার্লামেণ্টের কমন্স সভার সদস্য-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সাধারণতঃ পার্লামেণ্টের স্থিতিকাল পাঁচ বৎসর হইয়া থাকে। অর্থাৎ পাঁচ বৎসর অন্তর বিলাতের জনসমাজ তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদিগকে কমন্স সভার সদস্যরূপে প্রেরণ করেন। কোনরূপ বিশেষ ব্যাপার না ঘটিলে এই নিয়মের প্রায় ব্যতিক্রম হয় না। এবার কিন্তু সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দেই পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন হইয়াছিল। তখন মিঃ বনার্ ল রক্ষণশীল দলের নায়ক ছিলেন। তাহার পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর নানা কারণে ইংলণ্ডের লোক অত্যন্ত উত্যক্ত এবং 'তিতিবিরক্ত' হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ বনার্ ল তাঁহার দেশের লোকের নাড়ী দেখিয়া সেই ভাবটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি নির্ব্বাচনের ধুয়া ধরিয়াছিলেন,"শান্তি এবং বিশ্রাম",অর্থাৎ এখন ইংলণ্ডের লোক শান্তি এবং বিশ্রাম চাহে। সে কথা ইংলণ্ডের জনসমাজের কর্ণে বড়ই মধুর ধ্বনি করিয়াছিল। অনেক লোক সেই কথা শুনিয়া গলিয়া তাঁহার দিকেই ঢলিয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নির্ব্বাচনে তিনিই জয়ী হইয়াছিলেন। তাঁহার দলস্থ প্রায় সাড়ে তিন শত কন্সার্ভেটিভ বা রক্ষণশীল কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

বিগত কমন্স সভায় কোন্ দলের কত সদস্য ছিলেন, তাহার একটা হিসাব দেখুন। যে সময় কমন্স সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে সময় উহার সদস্যদিগের দলগত বলাবল এইরূপই ছিল;—

কন্সারভেটিভ বা রক্ষণশীল	সদস্য	৩৪৬	জন
লেবর বা শ্রমিক	সদস্য	১৪৭	জন
লিবারল বা উদারনৈতিক	সদস্য	১১৫	জন
বেদলে	সদস্য	৭	জন
সর্ব্বসাকল্যে		৬১৫	

সেবার মিঃ বনার্ ল মহাশয়ের দলস্থ লোক অর্থাৎ রক্ষণশীল দল সংখ্যায় অধিক হওয়াতে তিনিই মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন। পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্যে যে দলের সংখ্যাধিক্য হয়, সেই দলই তাঁহাদের মধ্য হইতে যোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিয়া থাকেন। কিন্তু সে নির্ব্বাচনটা ভিতরে ভিতরেই হয়; প্রকাশ্যে হয় না। কারণ, সম্রাটই মন্ত্রি-মনোনয়নের প্রধান কর্ত্তা। সে কার্য্যে তাঁহারই বৈধ অধিকার। অনেক সময় সংখ্যাধিক দলের প্রধান পাণ্ডাকে ডাকিয়াই সম্রাট মন্ত্রিত্ব দিয়া থাকেন। অনেক সময় দলস্থ কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তির মধ্য হইতে বাছিয়া সম্রাটকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দিতে হয়। মনোনয়নকালে মনোনীত ব্যক্তি তাঁহার দলের নেতৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব করিতে পারিবেন কি না, সম্রাট কেবল তাহাই দেখিয়া থাকেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে সম্রাট মিঃ বনার্ ল মহাশয়কেই ডাকিয়া মন্ত্রিত্ব দিয়াছিলেন।

মিঃ বনার্ ল।

কিন্তু প্রধান মন্ত্রী কখনই একাকী বৃটিশ জাতির বিশাল রাজকার্য্য পরিচালিত করেন না। আর কতকগুলি মন্ত্রীর সহিত সভারূঢ় হইয়া তাঁহাকে রাজ-কার্য্য চালাইতে হয়। সাধারণতঃ এইরূপ সচিবের সংখ্যা বিশ জন হইয়া থাকে।

ইঁহারা সকলেই সম্রাটের মন্ত্রী; সুতরাং ইঁহাদিগকে মনোনীত করিবার অধিকার সম্রাটেরই আছে। তবে সম্রাট অধুনা ঐ মনোনয়নের ভার তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর হস্তে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। সচিব-প্রধান তাঁহার দলস্থ যোগ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে কে কোন্ কাযের উপযুক্ত, তাহা দেখিয়া তাঁহার অধস্তন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এক এক জন মন্ত্রী অবস্থা বুঝিয়া একটি বা দুইটি বিভাগের কর্ত্তৃত্ব লইয়া থাকেন। মন্ত্রিগণের এই সমষ্টি বা সমিতিকে ইংরাজী ভাষায় ক্যাবিনেট (মন্ত্রিসভা) বলে। আইনমতে ক্যাবিনেটের স্থিতিকাল সম্রাটের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও কার্য্যতঃ জনমতপ্রধান ইংলণ্ডে এখন কমন্স সভার শুভেচ্ছায় উপরই উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে রিফর্ম্ম অ্যাক্ট বা সংস্কার আইন প্রণীত হয়। সেই সময় হইতেই ক্যাবিনেট বা সচিব-সংসদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন ইংলণ্ডে রাজকার্য্য পরিচালনে এই সংসদের শক্তি এক প্রকার অপ্রতিহত। তবে ইহার প্রধান বল কমন্স সভার সমর্থন। যত দিন কমন্স সভা, অর্থাৎ উহার অধিকাংশ সদস্য ক্যাবিনেটের নীতির এবং কার্য্য-পদ্ধতির সমর্থন করেন, তত দিন মন্ত্রি-সভার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যখন এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, কমন্স সভায় অধিকাংশ সদস্য এই মত প্রকাশ করেন যে, মন্ত্রিসভার কার্য্যের উপর তাঁহাদের একেবারেই আস্থা নাই, তখন মন্ত্রীদিগকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে হয়। এক জন সদস্য প্রথমে এই বিষয়ে প্রস্তাব উপস্থিত করিলে পর কয়েক জন উহার অনুমোদন এবং সমর্থন করেন। তাহার পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। যদি অধিকাংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ এবং নূতন করিয়া নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ভোটকে আস্থাহীনতার ভোট (Vote of Want of Confidence) বলে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মন্ত্রিদল সকল সময় এই আস্থাহীনতার ভোট পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কমন্স সভায় তাঁহাদের দলস্থ লোকের সংখ্যা অধিক নহে, অমনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ।

যে কমন্স সভার ভোটের উপরেই বিলাতের শাসন-তরণীর কাণ্ডারীদিগের পরমায়ু এমন ভাবে নির্ভর করিতেছে, সেই মন্ত্রিসমাজের মতাবলম্বী ও সম্পূর্ণ সমর্থক লোক যদি কমন্স সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় না থাকে, তাহা হইলে মন্ত্রীদিগের পক্ষে কার্য্য পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং দলাদলির দ্বারা শাসন-কার্য্য পরিচালনাই এই প্রকার শাসন-প্রণালীর একান্ত আনুষঙ্গ ব্যাপার। দলাদলি না হইলে এই শাসনযন্ত্র চালান অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

ইংলণ্ডের এই দলাদলির ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক। ইহার সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করিতে যাইলে প্রবন্ধ অতিকায় হইয়া উঠিবে। নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বিলাতী পার্লামেণ্ট বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সে সকল কথা এখানে বলা অসম্ভব। তবে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অতি পূর্ব্বকালে ইংলণ্ডের প্রত্যেক শায়ার বা জিলা হইতে দুই জন মাত্র নাইট কাউন্টি কাউন্সিল কর্ত্তৃক পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেন। শেরিফ-ই ঐ নির্ব্বাচন করাইতেন। তখন কমন্স সভায় সভ্যদিগের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কচিৎ মতভেদ হইলেও বর্ত্তমান সময়ের মত দলাদলি হইত না। ৫ জনে পরামর্শ করিয়া কায করিতে গেলে যেরূপ

মতভেদ হয়, সেইরূপ মতভেদই কখন কখন আত্মপ্রকাশ করিত। সে সময় ইংলণ্ডে রাজশক্তি এবং পার্লামেণ্টে রাজকীয় দলই প্রবল ছিল। আভিজাত এবং ধর্ম্মযাজকগণই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাহার পর রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে পিউরিটানদের আবির্ভাব হয়। উহারা ধীরে ধীরে জনসমাজের উপর আধিপত্য বিস্তৃত করিতে থাকে। টিউডরবংশীয় রাজগণের আমলে ইংলণ্ডের জনসমাজ নানা রূপে বিপন্ন হইলেও শিল্প এবং বাণিজ্যসম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রাজ্ঞী এলিজাবেথের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (Grammar School) প্রসার, এবং ইংরাজী সাহিত্যের বিকাশ হওয়াতে মধ্যশ্রেণীর লোকের বুদ্ধি বিশেষ উন্নত ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-সংস্কারের কোলাহল, সাগরপথে গমনাগমনের বৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের সন্ধুক্ষণ ও প্রবর্দ্ধমান জাতীয় শক্তির অনুভূতি ইংরাজ জাতির সাহস, আত্মশক্তিতে প্রত্যয় এবং জাতীয় গর্ব্বের অনুভূতি বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিল। সেই সময় ধর্ম্মমত লইয়া পিউরিটানদলের আবির্ভাব হয়। ইহাদের মত এবং প্রভাব মধ্যশ্রেণীর লোকসমাজে দ্রুত প্রসার লাভ করে। এই সময় পর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী জনসমাজ আভিজাত ও ধর্ম্মযাজকদিগের অনুবর্ত্তী ছিল। কিন্তু অতঃপর তাঁহারা রাজনীতিক বিষয়ে আর উচ্চ শ্রেণীর মতানুবর্ত্তন না করিয়া স্বাধীনভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্লামেণ্টেও তাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল ইংলণ্ডে রাজনীতিক দলাদলির সূত্রপাত।

প্রথম জেম্‌সের আমলে পিউরিটান দল বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। রাজা প্রথম চার্লসের আমলে রাজা ও তাঁহার সহযোগী আর্চ্চ বিশপ লর্ডের দমননীতির প্রভাবে পিউরিটান মতাবলম্বীরা প্রবল হইয়া উঠেন। লং পার্লামেণ্টে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এই সময়ে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর লোকগণ ব্যবহারাজীবদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইতেন। তখন পার্লামেণ্টে দুইটি মাত্র দল হইয়াছিল। একটি রাজার সমর্থক দল, আর একটি রাজার প্রতিপক্ষ দল। এই সময়ে পিউরিটান বা রাজনীতিক্ষেত্রে রাজনীতির প্রতিকূল সমালোচক দলকে অবজ্ঞাভরে 'রাউণ্ড হেড' বা "মুণ্ডিতমুণ্ড" (নেড়া) বলা হইত; আর রাজকীয় দলকে 'ক্যাভেলিয়ার' অর্থাৎ অশ্বারোহী এই গর্ব্বিত অভিখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে "এক্সক্লুশান বিল" (Exclusion Bill) কমন্স সভায় উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। সেই সময় রাউণ্ডহেড বা গভর্মেণ্টের প্রতিপক্ষীয় দল ঐ আইনের পাণ্ডুলিপি পার্লামেণ্টে পেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পিটিশনার্স (Petitioners) এবং রাজপক্ষীয় দল ঐ প্রস্তাবকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া উঁহাদিগকে য়্যাভরার্স (Abhorrers) বলা হইত। কিন্তু এই নাম অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমে রাজকীয় দলকে 'টোরী' এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষ দলকে "হুইগ" বলা হইয়াছিল। টোরী এই নাম প্রথমে আয়ার্লণ্ডের জলা অঞ্চলে পলায়িত দস্যুদলকে প্রদত্ত হয়। এই সময় পার্লামেণ্টের সরকারপক্ষীয় দলকে অবজ্ঞা সহকারে সেই নামই প্রদত্ত হয়। আর স্কটলণ্ডের পশ্চিম অঞ্চলের 'কভেনেণ্টার্স'দিগকে 'হুইগ' এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। সেই নামই এই সময় পার্লামেণ্টের উন্নতিশীল

উইনষ্টন চার্চ্চহিল।

সরকারের প্রতিপক্ষ দলকে প্রদত্ত হয়। এই নামই পার্লামেণ্টে বহু দিন চলিয়া আসিয়াছিল। রাজা তৃতীয় উইলিয়মের আমল পর্য্যন্ত টোরীদল রাজশক্তিরই রক্ষক এবং হুইগদল প্রজাশক্তিরই বর্দ্ধকরূপে বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিরাজ করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের "গৌরবমণ্ডিত বিদ্রোহের" পর ইংলণ্ডের রাজশক্তি সঙ্কুচিত এবং প্রজাশক্তি প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার পর তৃতীয় উইলিয়মের সিংহাসন আরোহণের সময় 'বিল অব রাইট্‌স্' বিধিবদ্ধ হইলে ইংলণ্ডের রাজা কতকগুলি বিধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে বাধ্য হয়েন। সেই হইতে ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্র বিধি-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮৩২ খৃষ্টাব্দে) যখন রিফর্ম্ম বিল আইনে পরিণত হয়, তখন টোরীরা 'কন্সারভেটিভ' অর্থাৎ স্থিতিশীল নাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তখন রাজশক্তির রক্ষক না হইয়া ইংলণ্ডের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষা করিবেন বলিয়া আপনাদের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করেন। পক্ষান্তরে, হুইগরা লিবারল নাম গ্রহণ পূর্ব্বক এই মত প্রচার করেন যে, নাগরিক অধিকার সম্ভোগে ও ধর্ম্মাচরণে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা প্রদান করিতে চাহেন। ইঁহারাই ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাস ব্যবসায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মিঃ আস্কুইথ।

এখন বৃটেনে রাজশক্তি প্রধান মন্ত্রীর মনোনয়নে এবং পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত বিধিতে সম্মতিদানেই সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। রাজার আরও কিছু অধিকার আছে, কিন্তু লোকমতের প্রতিকূলে তিনি কখনই সে অধিকারের পরিচালনা করেন না। এখন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় যে দল প্রবল হয়, সেই দলের অবলম্বিত নীতি অনুসারেই ইংলণ্ড শাসিত হইয়া থাকে। সম্রাটকে সেই দল হইতেই মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিতে হয়। মন্ত্রীই দেশের লোকের এবং পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহার কৃত কর্ম্মের জন্য দায়ী হইয়া থাকেন। যত দিন কমন্স সভায় কন্সারভেটিভ ও লিবারল এই দুইটি দল ছিল, তত দিন সামান্য সংখ্যাধিক্যই প্রত্যেক দলকে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিত। যে দলের হস্তে শাসনযন্ত্র পরিচালনের ক্ষমতা ন্যস্ত, সেই দল কমন্স সভার স্পীকারের দক্ষিণ হস্তের দিকে বসেন। তাঁহাদের বসিবার প্রথম আসনশ্রেণীকে ট্রেজারী বেঞ্চ বলে। এখন সময় সময় শাসনকার্য্য পরিচালকদলের আসনগুলিকেই ট্রেজারী বেঞ্চ বলা হইয়া থাকে। আর যে দল তাঁহাদের প্রতিপক্ষ এবং সরকারী কার্য্যের সমালোচক, তাঁহারা স্পীকারের বাম হস্তের দিকে বসিয়া থাকেন। ইঁহাদের আসনকে অপোজিশন বেঞ্চ বলে।

এই দলাদলির ভিতর আবার অনেক গর্ব্বিত দল

আছে। সে দলের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব না। গ্লাডষ্টোন যখন আয়ার্লাণ্ডকে হোমরুল দিতে চাহেন, সেই সময় এক দল লিবারল বা উদারনীতিক তত অধিক মাত্রায় উদারতা দেখাইয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা স্বদল ছাড়িয়া কন্সারভেটিভদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তদবধি কন্সারভেটিভরা আপনাদিগকে ইউনিয়নিষ্ট বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া আসিতেছেন। উদারনীতিক দলের এক শ্রেণীর লোক একটু অধিক উদরতা দেখাইতেন বলিয়া 'র‍্যাডিক্যাল' নামে পরিচিত ছিলেন। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টে মোটের উপর দুইটি দলই ছিল।

এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পার্লামেণ্টে দুইটির স্থানে তিনটি দল হইয়াছে। এখন শ্রমিক দলের প্রতিনিধিরা ক্রমশঃ সংখ্যায় অধিক হইতেছেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনে এই শ্রমিক সদস্যসংখ্যা যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা উপরের তালিকা দেখিলেই বুঝা যায়। বিগত নির্ব্বাচনে কনসারভেটিভ বা ইউনিয়নিষ্ট সদস্যসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক ও উদারনীতিক সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারকার এই নির্ব্বাচনের ফলে কোন্ পক্ষের কত জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রক্ষণশীল	সদস্য	২৫৫
শ্রমিক	সদস্য	১৯১
উদারনীতিক	সদস্য	১৫৮
ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট	সদস্য	৭
		৬১১ *

এখন দেখা যাইতেছে যে, কন্সারভেটিভ দল সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও অন্য সকল দল একত্র করিলে তাঁহাদের সংখ্যা অনেক অল্প হয়। শ্রমিক, উদারনীতিক এবং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল একত্র করিলে তাঁহাদের সংখ্যা হইবে ৩শত ৫০এরও অধিক। এই সাড়ে ৩ শত সদস্য যদি একযোগে বিশ্বাসহীনতার ভোট উপস্থিত করেন, তাহা হইলে রক্ষণশীল মন্ত্রীদিগকে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিতে হইবে। এবার কন্সারভেটিভ দল যে উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য লইয়া আর তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন না। ইদানীং নানা কারণে ইংলণ্ডে বেকার-সমস্যা অতি প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গত বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ মজুর কর্ম্মের অভাবে ঘরে বসিয়া ছিল। তাহার পর মধ্যে মধ্যে কেহ কেহ কায পাইয়াছে, আবার তাহাদের কায গিয়াছে। মিঃ বনার লয়ের মৃত্যুর পর মিঃ বলডুইন কন্সারভেটিভ দলের নেতা ও বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যদি বৃটেনের ঐ বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তথায় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে; বহু লোক অনাহারেও মরিতে পারে। স্বাধীন জাতির গবমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে পারেন না। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, য়ুরোপের কেন্দ্রশক্তিবর্গের ও রুসিয়ার অবস্থাবিপর্য্যয়ে এবং ফ্রান্স কর্ত্তৃক জার্ম্মাণীর রূঢ় অঞ্চল অধিকৃত হওয়াতেই বিলাতী পণ্য আর ঐ সকল দেশে বিকাইতেছে না। পণ্য বিকাইতেছে না বলিয়াই মজুরদের কর্ম্ম জুটিতেছে না। অনেক কলের কায বন্ধ আছে। সেই জন্য মিঃ বলডুইন মতলব করিয়াছিলেন যে, যদি অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিহার করিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে রক্ষানীতি অবলম্বন করা যায়, এবং এমন ভাবে শুল্কের প্রাকার রচনা করা যায় যে, অন্য দেশের পণ্য আর সহজে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলাতী পণ্যের যথেষ্ট কাট্তি হইবে। বিলাতী মজুররা অনায়াসেই কলে কর্ম্ম পাইবে। তখন তাঁহার দলে কমন্স সভায় যত সদস্য ছিলেন, তাঁহাদের ভোটে তিনি হয় ত অবাধ বাণিজ্যনীতি রহিত করিয়া বৃটেনে রক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি রক্ষানীতির প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে দেশের লোকের মত কি, তাহা জানিবার জন্য সেই পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া আবার নূতন করিয়া নির্ব্বাচন উপস্থিত

* বিলাতের 'টাইমস' হইতে এই তালিকা গৃহীত হইল। রয়টার যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিতীয় দিনের নির্ব্বাচনের ফল এইরূপ আছে ;—কন্সারভেটিভ ২৫৯, শ্রমিক ১৮৭, উদারনীতিক ১৫৮, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ৮ জন। তৎপরে ৪ জন কন্সারভেটিভ, ১ জন শ্রমিক, ৩ জন উদারনীতিক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সংবাদ আসে। সম্ভবতঃ রয়টারের সংবাদে ভুল আছে। এই তালিকা গৃহীত হইবার সময় ৪ জনের নির্ব্বাচন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কারণ, মোট সদস্যসংখ্যা এখন ৬১৫ জন।—লেখক।

করিলেন। তিনি অবশ্য বলিয়াছিলেন যে, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি সংসারের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষের উপর কড়া হারে আমদানী শুল্ক বসাইবেন না। কিন্তু বহু লোক মনে করিল যে, একবার যদি রক্ষাশুল্ক প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাহার তরঙ্গ কতদূর বিস্তৃত হইবে, তাহা বলা যায় না। হয় ত খাদ্যদ্রব্যের উপরও কর বসান হইতে পারে। বিশেষতঃ সম্প্রতি বিলাতে নারীজাতি ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। এই নারীজাতির হস্তেই বিলাতী গৃহস্থের আয়ব্যয়ের ভার থাকে। ইহারা ব্যয়বৃদ্ধির ভয়ে এবার রক্ষণশীলদিগকে অধিক ভোট দেয় নাই। কাযেই এবার রক্ষণশীলদলের সদস্যসংখ্যা অল্প হইয়া পড়িয়াছে। শ্রমজীবী এবং উদারনীতিকদিগের মোট সংখ্যা অধিক হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই অবাধ বাণিজ্যনীতির পক্ষপাতী অর্থাৎ রক্ষানীতির বিরোধী। সুতরাং কমন্সসভায় বাণিজ্যনীতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেই সাড়ে ৩ শত সদস্য তাহার বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। অগত্যা কন্সারভেটিভদিগের পক্ষে ঐরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করাও সমীচীন হইবে না। কারণ, এক দিকে অন্য ২টি দল যেমন রক্ষানীতির প্রতিকূলবাদী তেমনই তাঁহাদের দলের ম্যাঞ্চেষ্টার ও স্কটলণ্ডের বহু প্রতিনিধিই অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী। এরূপ স্থলে যে প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশের লোকের মতামত জানিবার জন্য তাঁহারা এই নির্ব্বাচনে নামিয়াছিলেন, সেই প্রস্তাব পরিত্যাগ ভিন্ন তাঁহাদের অন্য গতি নাই।

বিগত নির্ব্বাচনের সময় এই অবাধ বাণিজ্যনীতি ও রক্ষানীতি লইয়া বিলাতের বক্তৃতামঞ্চে এবং সংবাদপত্রে বিশেষ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। উদারনীতিকদিগের দলে অনেক সুপণ্ডিত সুবক্তা আছেন। তন্মধ্যে মিঃ লয়েড জর্জ্জ, মিঃ আস্কুইথ, মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চহিল প্রভৃতি সকলেই বক্তৃতাকুশল। তাঁহারা ভাষার তেজস্বিতায় এবং তথ্যের সমাবেশে বহু লোককে রক্ষানীতির উপর বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অসংযতবাক্ লয়েড জর্জ্জ বক্তৃতায় লোক মাতাইতে বেশ পারেন। মিঃ আস্কুইথ সুপণ্ডিত, ধীরবুদ্ধি এবং কার্য্যকুশল। তিনিই এখন উদারনীতিক দলের নেতা।

লর্ড বালফুর।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এবারকার নির্ব্বাচনে বিলাতে গুণ্ডামী অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইয়াছে। গ্লাসগো সহরের সেণ্ট-রোলক্স অঞ্চলে মিস ভায়লেট রবারটন রক্ষণশীল দলের পক্ষ হইতে পার্লামেণ্টের সদস্যপদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন। বিগত ৩১শে নবেম্বর তারিখে স্কুলগৃহে একটি বক্তৃতা দিতেছিলেন। এই ব্যাপারে গুণ্ডার দল তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক বারংবার পদাঘাত এবং তাঁহার মুখে নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ করে। সে জন্য তাঁহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হইয়াছিল। উদারনীতিক দলের সদস্যপদপ্রার্থী মিঃ হগবিন যখন উত্তর ব্যাটার্সিতে বক্তৃতা করেন, তখন তাঁহার সভায় গুণ্ডারা যাইয়া বিষম গোল করে। ইনি বলিয়াছেন যে, প্রায় ৩ শত গুণ্ডা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। শ্রীমতী আস্কুইথের ভ্রাতা মিঃ টেনাণ্টকে গ্লাসগো সহরে পুলিস দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। উদারনীতিক

দলের অন্যতম নেতা উইনষ্টন চার্চ্চহিলকে গুণ্ডাদের চীৎকারে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। লর্ড ইউষ্টেস পার্সির সদস্যগিরি সমর্থনের জন্য একটি সভা

লর্ড এবং লেডী পার্সি।

বসে। সেই সভায় গুণ্ডার দল নিতান্ত অসভ্যের ন্যায় গোলমাল করে। একটা ভগ্ন চায়ের পেয়ালা গুণ্ডাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া লেডী পার্সির মুখে লাগে। তাহার পর যখন লর্ড এবং লেডী পার্সি তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন, তখন গুণ্ডার দল গাড়ীখানিকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। সেই জনতার ভিতর গাড়ীতে উঠিবার সময় লেডী

মিস্ রথারটন।
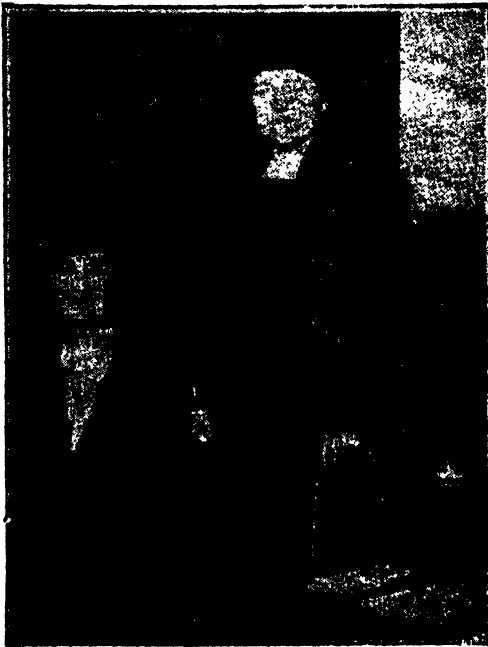
ইউষ্টেস পার্সির দক্ষিণ হস্তটি পিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তিনি যখন যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিলেন, তখন বহিঃস্থিত গুণ্ডার দল যেন আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার ও তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। মনমাথশায়ারের নিউপোর্ট বন্দরে কন্সারভেটিভদলের সদস্যপদপ্রার্থী মিঃ আর, জে, কেরী ও তাঁহার পত্নী দুর্ব্বৃত্ত জনতাকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং প্রহৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়ের উপরই পাতর ও কর্দ্দমবৃষ্টি করা হয়। গুণ্ডার দলের অত্যাচারে অনেক সভা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। বহু স্থানে সদস্যপদ-প্রার্থীদিগের স্ত্রীদিকেও আক্রমণ ও প্রহার করা হইয়াছিল। এডমণ্টনের রক্ষণশীল পক্ষ হইতে নির্ব্বাচন-কামী মিঃ আর, এস, ব্রাউন বলেন যে, তিনি গুণ্ডার ভয়ে সভা আহ্বান করিতে পারেন নাই; সভা

মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড।

করিলেও লোক তথায় গুণ্ডার ভয়ে আগমন করে নাই। ইউ-নিয়নিষ্ট ডিষ্ট্রিক্ট কমিটী বলেন, গুণ্ডারা তাঁহাদের সভাগৃহের জানালা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। শ্রমিক দলের প্রভাববিস্তারের সহিত যদি ইংলণ্ডে এইরূপ ব্যাপার ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে উহা বিলক্ষণ চিন্তার কথা। তবে অনেকেই বলিতে-ছেন যে, শ্রমিকসম্প্রদায় এই কার্য্য করেন নাই; তাঁহারা ঐরূপ কার্য্যের বিরোধী। উহা করিয়াছে কমিউনিষ্ট দলের লোক। ইহারা মস্কৌয়ের সোভিয়েট অর্থাৎ বলসেবিকদিগের নিকট হইতে ঘুষ খাইয়া এই বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়াছে। শ্রমজীবী পক্ষের যে সকল সদস্য রিপাবলিক্যানদিগের মতে মত দিতে চাহেন নাই, তাঁহাদিগের সভাতেও গুণ্ডারা হাঙ্গামা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। শ্রমজীবীদিগের

১০ জন সদস্যপদপ্রার্থী যখন তাঁহাদের জন্য নির্ব্বাচনের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের হস্তে একটি কপর্দ্দকও ছিল না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে মস্কো হইতে ৩ শত পাউণ্ড (সাড়ে ৪ হাজার টাকা) পাইয়াছেন। উৎকট সাম্যবাদের ফল কি হয়, এই ব্যাপারে আমাদের দেশের লোকেরও তাহা প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক, নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এখন শুনা যাইতেছে যে, মিঃ বলডুইন পদত্যাগ করিবেন না। তবে তিনি আর বাণিজ্যনীতি পরিবর্ত্তন করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন না। মধ্যে শুনা গিয়াছিল যে, লর্ড বালফুরকেই কন্সারভেটিভ দলের মন্ত্রী করা হইবে। কিন্তু তাহা হইবে না। তবে যাহাই হউক, এবার কন্সারভেটিভ দলের পক্ষে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত করা সম্ভব হইবে না। কারণ, পররাষ্ট্রনীতি, গৃহসংস্থান ব্যবস্থা, কর-ধার্য্যের হার প্রভৃতি লইয়া অন্য দুই

মিঃ বলডুইন।

দলের সহিত তাঁহাদের মত-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। উদার-নীতিক দলের নায়ক মিঃ আস্কুইথও বলিয়াছেন যে, তিনি কন্সারভেটিভদিগের সহিত মিলিত হইবেন না।

কন্সারভেটিভ বা ইউ-নিয়নিষ্টদলের নিম্নেই শ্রম-জীবীদল হইয়াছেন। তাহাদের দলপতি মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন এবার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। ভারতবাসী সাকলাৎ-ওয়ালাও এবার নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। এই দলের কয়েকটি বড় গুরু সঙ্কল্প আছে। ইঁহারা মূলধনের উপর কর ধার্য্য করিতে এবং কতকগুলি কারবারকে জাতীয় সম্পত্তি করিতে চাহেন। এই দলের অন্যতম সদস্য মিঃ পিথিক লরেন্সই ক্যাপিটাল লেভী অর্থাৎ মূলধনের উপর চড়া হারে কর বসাইবার প্রস্তাব উদ্ভাবিত করিয়াছেন। ইনিই লিষ্টার সহরের পশ্চিম বিভাগ হইতে উদারনীতিক মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং নির্ব্বাচিত

মিস্ সুসোন লরেন্স

ভাইকাউণ্টেস এসটর।
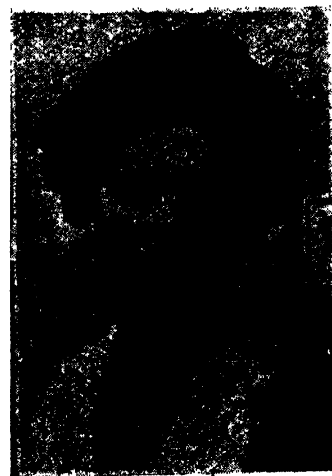
হইয়াছেন। এই মিঃ চার্চ্চহিল উপনিবেশ সচিব থাকিয়া উপনিবেশপ্রবাসী ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদানে আপত্তি করিয়াছিলেন। ইহাদের ক্যাপিটাললেভী এবং ন্যাসানালিজেশন উভয় মতই রক্ষণশীল ও উদারনীতিক এই দুই দলের মতবিরুদ্ধ। সুতরাং ইঁহারাও স্বতন্ত্র হইয়া বহু দিন যে শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিতে পারিবেন, তাহা নহে। এই দলের কর্ণেল জোসিয়া ওয়েজ উড নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতবাসীর সহিত ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে। শুনিতেছি, শ্রমিকদল শাসনভার পাইলে ইনিই ভারত সচিব হইবেন।

উদারনীতিক দল এই ব্যাপারে সম্মিলিত হইয়াছেন। ইঁহারাও এখন আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন। তবে ইঁহারা শাসনকার্য্য চালাইতে চেষ্টা করিলে জনকয়েক শান্ত শ্রমজীবীর ভোট পাইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইঁহারা শাসনযন্ত্র চালাইতে সমর্থ হইবেন কি না সন্দেহ।

আমাদের সহকারী ভারত-সচিব আর্ল উইণ্টার্টন এবার ভোটসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন। এবার শাসনযন্ত্র-পরিচালন-সমস্যা বড়ই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন আর কখনও হয় নাই।

৪ জন নারী এবার কমন্স সভার সদস্য নির্ব্বাচিতা হইয়াছেন।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

স্বরাজের পথে

কোকনদ

মহম্মদ তোগলকের মসজিদ, রাজমহেন্দ্রী—সম্মুখ।
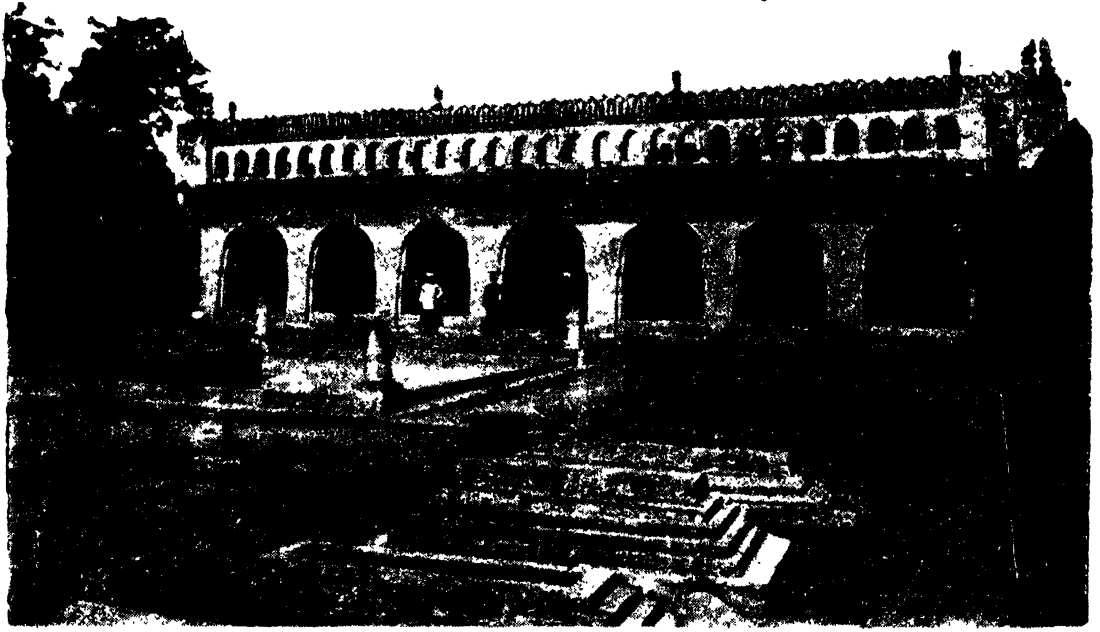
কোকনদ পুরাতন নগর নহে; অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা নগরাখ্যা লাভ করিয়াছে। সামলকোট হইতে একটি রেলের লাইন কোকনদ সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং এই রেল লাইনের শেষ ষ্টেশনের নাম কোকনদ বন্দর। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের এই প্রদেশ বাণিজ্যের একটা প্রধান কেন্দ্র; কারণ, সিন্ধু ও গঙ্গার ন্যায় শতধারায় বিভক্ত হইয়া গোদাবরী নদী এই স্থানে সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই গোদাবরী বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলায় জন্মলাভ করিয়া হায়দারাবাদের নিজামের রাজ্যের সমস্তটা পার হইয়া রাজমহেন্দ্রীর ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের উপত্যকাভূমির পূর্ব্বসীমাস্থিত পর্ব্বতমালা হইতে নামিয়া অন্ধ্রদেশের সমতল ভূমিতে পড়িয়াছে। গোদাবরী নদী যে স্থানে পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালা হইতে অন্ধ্রদেশের সমতল ভূমিতে নামিয়াছে, সেই স্থানের প্রধান নগরের নাম রেকাপল্লী। রেকাপল্লী হইতে প্রায় ৫০ মাইল গোদাবরী এক খাতেই প্রবাহিত। রাজমহেন্দ্রী নগরে আসিয়া গোদাবরী ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, এই সমস্ত শাখার মধ্যে দুইটি প্রধান, উত্তরের শাখাটি য়নম্ (Yanaon) নামক ফরাসী রাজ্যভুক্ত নগরের তল দিয়া বহিয়া কোকনদের নিকটে সমুদ্রতীরে আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিতীয় শাখাটি নর্শাপুর নামক নগরের তল দিয়া বহিয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে। অতীত যুগ হইতে গোদাবরী নদী সমস্ত দাক্ষিণাত্যের ধনসম্পদ বহিয়া আনিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত করিত। দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরী এই গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত. এবং সাতবাহন ও অন্ধ্ররাজ্যের সমস্ত বাণিজ্য ২টি নদী অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ দিকে আসিত; ইহাদের মধ্যে গোদাবরীই প্রধান, অপরটি কৃষ্ণা। গোদাবরীতীরে রাজমহেন্দ্রী ও কৃষ্ণাতীরে মসলিপত্তনম্, প্রধান বন্দর ছিল। কৃষ্ণা আধুনিক সেতারা জিলায় মহাবালেশ্বর পর্ব্বতের পাদমূলে ঢোমগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব্বে, পরে উত্তরপূর্ব্বে প্রবাহিতা হইয়াছে। মলুগোণ্ডা পর্য্যন্ত ইহা

নিজামের রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত এবং নলগোণ্ডার পরে কৃষ্ণা নদীও পূর্ব্বঘাট পরিত্যাগ করিয়া গোদাবরীর সমান্তরালে প্রবাহিতা। অন্ধ্রদেশের সমতল ভূমিতে কৃষ্ণা ও গোদাবরী—ছুইটি নদীই দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রবাহিতা।

গোদাবরী নদী যখন দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য বহিয়া কোকনদের নিকটে সমুদ্রতীরে আসিত, তখন পৃথিবীর নানাদেশের বণিক ও বাণিজ্যপোত তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সমুদ্রের উপকূলে উপস্থিত থাকিত। হিন্দু যখন য়ুরোপ হইতে জাহাজে চড়িয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলে আরবের জাহাজ ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্বসমুদ্র হইতে দূর হইয়াছিল। বণিকের ছদ্মবেশে পর্ত্তুগীজজাতি, হিন্দু ও মুসলমানের বাণিজ্যতরী লুণ্ঠন করিয়া একসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের সমুদ্রযাত্রা প্রায় রহিত করিয়া দিয়াছিল, এবং আরব সাগর হইতে চীন সাগর পর্য্যন্ত দুর্গ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ বণিক প্রথমে বাণিজ্য ও পরে ধর্ম্ম

মহম্মদ তোগলকের মসজিদের উত্তর দিক।

স্বাধীন ছিল, তখন অন্ধ্র ও কলিঙ্গ দেশের বাণিজ্যপোত ব্রহ্ম, শ্যাম, আনাম, সুমাত্রাদ্বীপ, যবদ্বীপ, এমন কি, সুদূর ফিলিপাইন পর্য্যন্ত যাত্রা করিত। পরে হিন্দুর অবনতি আরম্ভ হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরব ও হব্‌সী মুসলমানরা পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়েও অন্ধ্র ও কলিঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। ভাস্কো ডি গামা ফিরিঙ্গী বণিকের উপকারের জন্য প্রচারের অছিলায় কেমন করিয়া ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলমানের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য লোপ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই; যে সময়ের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের বাণিজ্যের সহিত পর্ত্তুগীজের বাণিজ্যও সমাধি লাভ করিয়াছে। তখন ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিক ভারতবর্ষের ও চীন দেশের বাণিজ্য গ্রাস করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু

বণিকের ন্যায় এই সমস্ত ফিরিঙ্গী বণিকও দাক্ষিণাত্যের পণ্যসম্ভারের জন্য গোদাবরী নদীর মুখে বসিয়া থাকিত। ওলন্দাজ বণিকসম্প্রদায় কোকনদের নিকটে জগন্নাথপুরে এবং ফরাসী বণিকসম্প্রদায় গোদাবরী নদীতীরে য়নমে কুঠী তৈয়ারী করিয়াছিল। এই সমস্ত বিদেশীয় বণিকের মধ্যে ওলন্দাজ জাতিই প্রকৃত বণিকের জাতি; তাহারা কেবল বাণিজ্য করিতেই আসিয়াছিল, তদুপলক্ষে তাহারা যবদ্বীপ ও সিংহলদ্বীপ প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সিংহলদ্বীপ অধিক দিন রাখিতে পারে নাই এবং কোকনদের কুঠীর ন্যায় শ্রীরামপুর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি স্থানের কুঠী ও দুর্গ এখন আর ওলন্দাজজাতির অধিকারভুক্ত নাই। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষটা ইংরাজের এবং পণ্ডীচেরী, চন্দননগরের ন্যায় কোকনদের নিকটবর্ত্তী য়নম এখনও ফরাসী জাতির অধিকারে আছে।

আমরা মনে করিতাম যে, সংস্কৃত কোকনদ শব্দ হইতেই কোকনদ বন্দরের নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু গেজেটিয়ারে দেখিতেছি যে, ইহার প্রকৃত নাম কাকীনাদ। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে কোকনদ বড় বন্দর হইয়াছে, ইহার দক্ষিণে য়নমের নিকটে করিঙ্গা উপসাগর মজিয়া উঠিলে তবে কোকনদ বন্দর আখ্যা পাইয়াছে এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের গৃহ-যুদ্ধের সময়ে (American Civil War) গুনটুরের বস্তাবন্দী সমস্ত তুলা এই কোকনদ বন্দরে জাহাজ বোঝাই হইয়া বিলাতে চালান হইত বলিয়া ইহা মাদ্রাজ প্রদেশের দ্বিতীয় বন্দরে পরিণত হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল হওয়ায় কোকনদের অনেক অবনতি হইয়াছে এবং হিন্দুর স্বাধীনতার যুগ হইতে ইংরাজ-রাজ্যের আরম্ভ পর্য্যন্ত গোদাবরীর মুখের বন্দরগুলির যে প্রাধান্য ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। কারণ,

কোতবল্লু গ্রামে অন্ধ্ররাজ শ্রীশাতকর্ণীর শিলালিপি।

ইংরাজের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই গোদাবরী নদীর তিন-চতুর্থাংশ নিজামের রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। গোদাবরী নদীর যে অংশ এখন নাসিক জিলায় আছে, সে অংশে বারমাস নৌকা চলে না। দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন রাজধানী প্রতিষ্ঠান (আধুনিক মুঙ্গী-পৈঠন্) হইতে বস্তর রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত মহাদেবপুর পর্য্যন্ত এককালে নৌকা চলিত ; কিন্তু এখন আর চলে না। মহাদেবপুর হইতে

• কোকনদের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত জগন্নাথপুরের ওলন্দাজ কুঠী শ্রীরামপুরের কুঠীর সঙ্গে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে খরিদ করিয়া লইয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ ও ওলন্দাজে যুদ্ধ হইয়াছিল,তখন পূর্ব্ব-সমুদ্রতীরে চোলমণ্ডলে (Coromandel coast) ওলন্দাজ জাতির যত কুঠী ছিল, ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে গুলি সমস্তই দখল করিয়া লইয়াছিলেন। সেই সময়ে
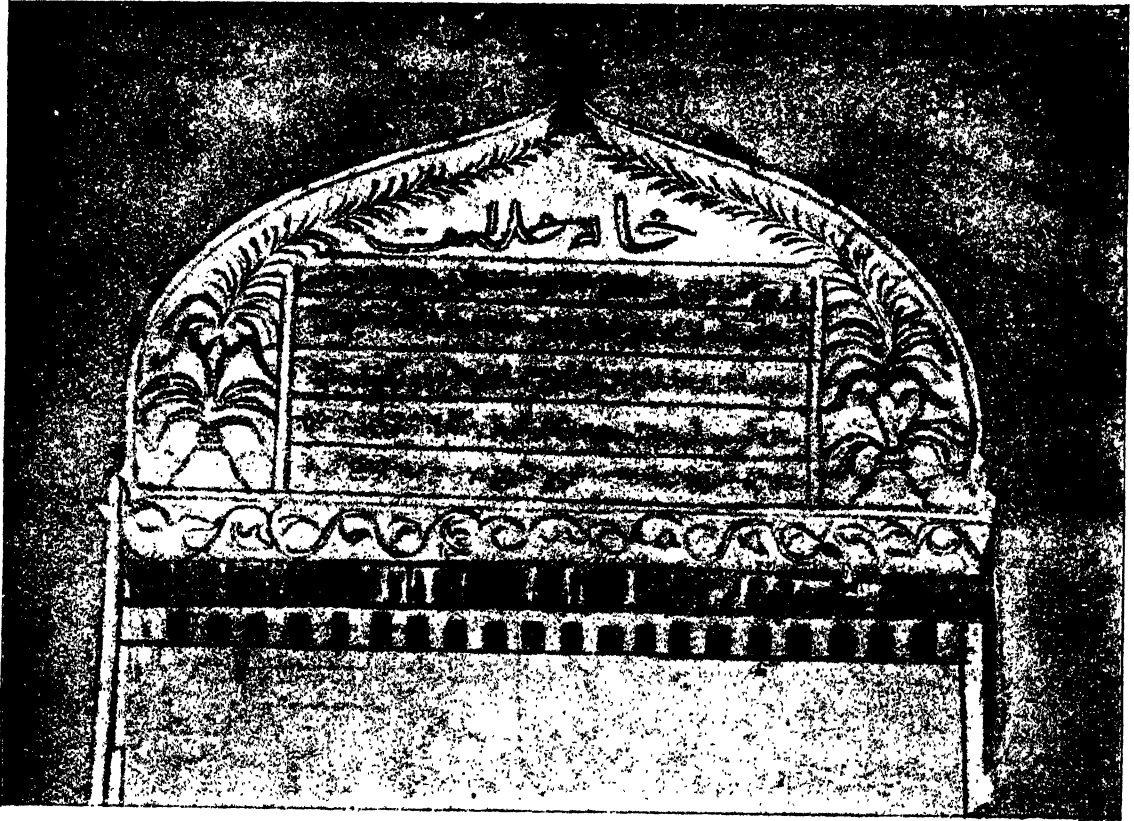
মহম্মদ তোগলকের মসজিদের আরবী শিলালিপি।

গোদাবরী বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে এবং এই স্থান হইতে রেকাপল্লী পর্য্যন্ত ইহা নিজামরাজ্যের পূর্ব্বসীমা। মহাদেবপুর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বারমাস নৌকা চলে এবং ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ যখন সত্য সত্যই ভারতের পণ্যসম্ভারের জন্যই গোদাবরীর মুখে উপস্থিত থাকিত, তখন দাক্ষিণাত্যের পণ্যসম্ভার গোদাবরী নদীই নৌকা-যোগে আনিয়া দিত।

মাদ্রাজের নিকটে সাদ্‌রাজ, বিশাখপত্তনের (Vizaga-patam) নিকট বিমলীপত্তন, টিউটিকরীনের সহিত জগন্নাথপুরের কুঠীও ইংরাজের দখলে আসিয়াছিল। জগন্নাথপুরের কুঠী এককালে নাগপত্তনের (Negapatam) অধীন ছিল। ওলন্দাজ ঐতিহাসিকরা বলেন যে, তখন গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত এই অঞ্চলের প্রধান বন্দরের নাম ছিল দাত্তিজেরুণ (Daatijeroon)।

জগন্নাথপুরের কুঠীর অধীন গোল্লাপলম্ ও গুণ্ডবরম্ নামক ২টি গ্রামে ২টি ছোট কুঠী ছিল। ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যের আমলে জগন্নাথপুরে প্রতি বৎসর ৭৫ হাজার প্যাগোডার (মান্দ্রাজী টাকা) মসলা আমদানী হইত এবং বাকী ৭৫ হাজার টাকা নগদ আসিত। কুঠীর আমদানী মোট এই দেড় লক্ষ টাকার মধ্যে ৪০ হাজার টাকার দেশী ছিটের কাপড় কেনা হইত, জগন্নাথপুরের কুঠী ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভাল রকম চলিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে মহীশূরের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় কুঠী-বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আসিয়াখণ্ডে বা য়ুরোপে যে সমস্ত সমুদ্রগামী জাহাজ তৈয়ারী হইত, সে সমস্ত স্বচ্ছন্দে বড় নদী বহিয়া কতকদূর যাইতে পারিত। এককালে জাহাজ ভাগীরথী বা সরস্বতী বহিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিত, সিন্ধুনদ বহিয়া ঠঠ্‌ঠা বন্দরে পৌছিত ; সেই সময়ে সমুদ্রগামী জাহাজও গোদাবরী বহিয়া রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত পৌছিত। এককালে রাজমহেন্দ্রী গোদাবরীর প্রধান বন্দর ছিল। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান মহম্মদ বিন তোগলক্ শাহ রাজমহেন্দ্রীর নিকটে কোণ্ডপল্লী দুর্গ অধিকার করিয়া হিন্দুর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। সে সময় যে রকম জাহাজ তৈয়ারী হইত, এখনও সেই রকম জাহাজ তৈয়ারী হইয়া থাকে। আমাদের দেশে চট্টগ্রামে যেমন কাঠের জাহাজ এখন তৈয়ারী হয়, সেইরূপ জগন্নাথপুরের নিকট করিঙ্গা উপসাগরে ছোট কাঠের জাহাজ এখনও তৈয়ারী হইয়া থাকে। এই জাহাজগুলি আমাদের দেশের হাজার মণের নৌকার আকারে, কেবল সম্মুখের ও পিছনের গড়ন একটু তফাৎ। চোলমণ্ডল উপকূলে এই জাতীয় ছোট জাহাজই কূলে আসিয়া লাগিতে পারে। কারণ, পূর্ব্ব উপকূলের সমুদ্র কূলের নিকট গভীর নহে। এখনও কোকনদ বন্দরে বড় জাহাজ আসিয়া লাগিতে পারে না, সে গুলি কোকনদের পৌনে ৫ মাইল দূরে নঙ্গর করে। কোকনদের নিকটে যে স্থানে ছোট জাহাজ তৈয়ারী হয়, সে স্থানের নাম তল্লরেবু। পূর্ব্বে তল্লরেবু, করিঙ্গা ও ইঞ্জারম্ নামক কোকনদ ও জগন্নাথপুরের নিকটবর্ত্তী ৩টি ছোট ছোট বন্দরে ছোট জাহাজ তৈয়ারী হইত। এই সমস্ত জাহাজ গোদাবরী বহিয়া রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত পৌছিত ; সেই জন্যই সে কালের সপ্তগ্রাম, ভরুকচ্ছ বা ভরোচ্, ঠঠ্‌ঠার মত রাজমহেন্দ্রী প্রধান বন্দর ছিল। মুসলমানরা যখন প্রথম এ দেশ আক্রমণ করে, তখন কলিঙ্গ দেশ ও অন্ধ্র দেশে উড়িষ্যার গঙ্গ-বংশীয় রাজাদের অধিকারে ছিল। অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের বংশধর ভানুদেব দ্বিতীয় যখন উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র দেশের রাজা, তখন দিল্লীর সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন তোগলক্ শাহের আদেশে তাঁহার পুত্র মহম্মদ, যিনি পরে মহম্মদ তোগলক্ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্ব উপকূলে আসিয়া অন্ধ্র দেশের অন্যতম প্রধান বন্দর রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন।

মহম্মদ অন্যান্য মুসলমান বিজেতার ন্যায় রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়া এই নগরের প্রধান হিন্দু মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিয়া একটি মস্‌জিদ্ তৈয়ারী করিয়াছিলেন এবং এই মস্‌জিদটি মান্দ্রাজ প্রদেশের পুরাতন মস্‌জিদ্‌গুলির মধ্যে অন্যতম। মস্‌জিদের ইলাকার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড চত্বর, এই চত্বরের প্রধান ফটক এককালে হিন্দু মন্দিরের তোরণ ছিল। ফটকের উপরের অংশটি ভাঙ্গিয়া কাল পাতরের উপর আরবী, পারশী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় গিয়াস্-উদ্দীন তোগলক শাহের পুত্র মহম্মদের বিজয়কাহিনী ক্ষোদিত আছে। ফটকের নীচের অংশে পাতরের গাত্রে দ্বারপালের মূর্ত্তি ক্ষোদিত ছিল ; তাহা চাঁছিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। কেবল নক্সার কায নষ্ট করা হয় নাই। ফটকের পিছনের বারান্দায় হিন্দু মন্দিরের মণ্ডপের বড় থামগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। দিল্লীতে কুতব্ মীনারের নিকটে মস্‌জিদ্ কুবৎ-ই-ইসলামে এবং আলাউদ্দীন খিলজীর মস্‌জিদে, আজমীরে আড়াই-দিন-কি-ঝোপড়ায় ও অহ্‌মদাবাদ এবং খম্বায়তের (Camleay) জুম্মা মস্‌জিদে, বাঙ্গালা দেশে পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ্, ছোট পাণ্ডুয়ার জুম্মা মস্‌জিদ্, ত্রিবেণীর বড় মস্‌জিদ্ প্রভৃতি নানা মস্‌জিদে এইরূপে প্রথম মুসলমান বিজেতারা হিন্দুর মন্দিরের থাম ও অন্যান্য পাতর লইয়া মস্‌জিদ্ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। ফটকের ভিতরে, এখন যেখানে মুসলমানরা নমাজ করিতে যাইবার পূর্ব্বে অজু করিয়া থাকেন, সে স্থানটা, পূর্ব্বে হিন্দু মন্দিরের গর্ভগৃহ ছিল। আগেকার হিন্দু মন্দিরে যে স্থানে ঠাকুর বসান হইত, সে স্থানটা সম্মুখের নাটমন্দির অপেক্ষা নীচু করা হইত,

মধ্যযুগের সমস্ত হিন্দু-মন্দিরেই এই রকম গঠন দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটা নীচু বলিয়া ইহাকে গর্ভ বলা হইত এবং ঠাকুরের ঘর বলিয়া সাদা কথায় ঠাকুরের ঘর বলা হইত। উঠানের পশ্চিম দিকে যেখানে এখন নমাজ হয়, অর্থাৎ—আসল মস্‌জিদ্‌টি অবস্থিত, সে স্থানেও হিন্দু মন্দিরের মণ্ডপের অনেক পাতরের থাম ব্যবহার করা হইয়াছে। হিন্দু মন্দিরের চত্বরের দুই দিকে বড় বড় পাতরের দেওয়াল ছিল; তাহা এখনও আছে। মস্‌জিদের সম্মুখে ৭টি খিলান এবং ভিতরে ২ সারি হিন্দু মন্দিরের পাতরের থাম আছে। চুণকামের চোটে পাতরের নক্সার কায ক্রমশঃ ঢাকিয়া যাইতেছে। চত্বরের বা উঠানের উত্তরপশ্চিম কোণে একটি প্রাচীন ইঁদারা আছে, পাতর কাটিয়া এই ইঁদারার জল বাহির করিতে হইয়াছিল, ইহার উপরের অংশ পাতর দিয়া বাঁধান। শুনিতে পাওয়া যায় যে, যখন নদীর জল কমিয়া যায়, তখনও এই কূপে ১৮ ফুট জল থাকে।

রাজমহেন্দ্রীর অন্য হিন্দু মন্দিরগুলি আধুনিক। কোটি-লিঙ্গেশ্বরের মন্দির গোদাবরীর উত্তরতীরে একটি বৃহৎ অনাদিলিঙ্গের উপর অবস্থিত। পাণ্ডারা বলেন যে, রাম সীতা-উদ্ধারের সময় অনেক রাক্ষস মারিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য এক কোটি লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। গোদাবরীর তীরে তিনি এক রাত্রিতেই এক লক্ষ লিঙ্গ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু একটি লিঙ্গ অপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া যায়, সেই জন্য তিনি জগন্নাথের নিকট ভাগেশ্বরে কোটি সংখ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য গোদাবরীতীরের কোটি লিঙ্গের সম্মুখে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। পাণ্ডারা বলে যে, অনেক লিঙ্গ গোদাবরীতীরে মাটীতে পুতিয়া গিয়াছে, খুঁড়িলে বাহির হইতে পারে। কোটিলিঙ্গেশ্বরের মন্দির দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আধুনিক মন্দির নির্ম্মিত হইবার বহু পূর্ব্বে এই স্থানে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। বার বৎসর অন্তর কাশীতে প্রয়াগে যেমন কুম্ভমেলা হয়, সেইরূপ রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরীতীরে একটি উৎসব হয়, তাহার নাম "পুষ্করম্।" সেই সময়ে গোদাবরী সমস্ত তীর্থনদীর পবিত্রতা একা সংগ্রহ করেন; গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, সরস্বতী প্রভৃতি আর্য্যের সমস্ত পবিত্রা নদী গোদাবরীসঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, নানা দেশ হইতে যাত্রী আসে এবং বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হয়। রাজমহেন্দ্রীতে আর একটি হিন্দু মন্দির আছে, সেটিও পাতরের তৈয়ারী; কিন্তু পুরাতন নহে। পাণ্ডারা বলেন যে, মার্কণ্ডেয় ঋষি কেবল ১৬ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইলে সপ্তর্ষিগণ তাঁহাকে মহাদেবের উপাসনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই উপদেশ অনুসারে এই গোদাবরীতীরে মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি অর্চ্চনা করিয়া মার্কণ্ডেয় চিরজীবন লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই এই লিঙ্গ মার্কণ্ডেয়স্বামী নামে পরিচিত, মার্কণ্ডেয়স্বামীর মন্দির কোটিলিঙ্গেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত এবং ইহার উত্তরদিকে একটি সুন্দর গোপুর আছে। গোপুর বলিতে হিন্দু মন্দিরের তোরণ বুঝায়। ইহার সম্মুখে একটি পাতরের থামের উপরে বারান্দা ও তাহার পশ্চাতে কল্যাণ-মণ্ডপ বা নাটমন্দির আছে।

রাজমহেন্দ্রীর অনতিদূরে একটি পাহাড়ের গাত্রে সাতবাহনবংশীয় রাজাদের একটি শিলালিপি আছে, তাহাতে রাজার নামটা এখন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সাধারণ লোক এই বংশের রাজাদিগকে অন্ধ্র বলিয়া থাকে। কিন্তু ইঁহারা অন্ধ্রদেশে উৎপন্ন নহেন। বন্ধুবর ডাক্তার বিষ্ণু-সীতারাম সুখ্‌ঠঙ্কর প্রমাণ করিয়াছেন যে,সাতবাহন রাজারা বোম্বাই প্রদেশের লোক। রাজমহেন্দ্রীর নিকটের এই শিলালিপি সাতবাহন রাজাদের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরের শিলা-লিপি।

রাজমহেন্দ্রীর আসল নাম রাজমহেন্দ্রপুরম বা রাজ-মহেন্দ্রবরম্। এককালে ইহা বেঙ্গীর চালুক্য বংশের অধিকারে ছিল, পরে রাজেন্দ্রচোল রাজমহেন্দ্রীর রাজা হইয়াছিলেন। কোল রাজাদিগের পরে বরঙ্গলের কাকতীয়-বংশীয় রাজারা এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। গিয়াস্-উদ্দীন তোগলক্ শাহের রাজ্যকালে তাঁহার পুত্র মহম্মদ বিন্ তোগলক্ শাহ রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু মুসলমানরা অধিক দিন উহা রাখিতে পারেন নাই। উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় রাজারা বহুদিন রাজমহেন্দ্রী দখল করিয়া ছিলেন। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে বহমণীবংশীয় সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু

এবারও মুসলমানরা রাজমহেন্দ্রী নিজেদের দখলে রাখিতে পারেন নাই। উড়িষ্যার গজপতি রাজারা আবার উহা দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় রাজমহেন্দ্রী জয় করিয়া আবার তাহা উড়িষ্যার গজপতিবংশীয় রাজাদের ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। গোলকুণ্ডা বা হায়দরাবাদের কুতবশাহীবংশীয় সুলতানদের সেনাপতি রাফৎ খাঁ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকাল অবরোধের পর রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজমহেন্দ্রী মুসলমানদের অধিকারে ছিল। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজমহেন্দ্রী বিখ্যাত ফরাসী সেনাপতি বুসীর সেনাদলের কেন্দ্র ছিল, কোন্তোরে পরাজিত হইবার পরে ফরাসী সেনানী কনফ্লাঁ রাজমহেন্দ্রী নগরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। উত্তর সরকার দুইটি ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আসিলে রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী নদীর বদ্বীপের সহিত ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চির-সুন্দর

ওগো সুন্দর পরমানন্দ, সুন্দর তব বিশ্বভূমি,
স্রষ্টৃ মাধুরী লভেছে সৃষ্টি, ধ্বংসেও আছ কান্ত তুমি।
মঙ্গলঘট নিঃশেষ করি রুদ্রও তব পারেনি পি'তে,
ভীষণেও আছে অলোককান্তি তব রচনার সাক্ষ্য দিতে।

মেরু মনোহর মেরুপ্রভা'তে মরু মনোহর মরীচিকায়,
গহন,—কুসুমে, অররিচন্দ্র নিশীথ গগন তারকা ভায়।
সাগরগর্ভ রত্নদ্যুতিতে, উপকূলকূল তমাল তালে,
অশনি, তড়িতে, গিরিদরীগুহা যোগীর জটার রশ্মিজালে।

গিরির শৃঙ্গ তুষার পুঞ্জে, উষার অরুণ পট্টবাসে,
মশান শোভন দেবীর বোধনে, শ্মশান শিবের অট্টহাসে।
প্রান্তর আলো আলেয়ামালায়, বর্ণে বিম্ব, স্বর্ণে খনি,
ঝোপের আঁধার খদ্যোতিকায়, কেশরে সিংহ, মণিতে ফণী।

বন্যা শোভন উর্ব্বরতায়, পঙ্কের শোভা সরোজমালা,
কূজনে গুঞ্জে, কোকিল মধুপ, শীতল ছায়ায় রৌদ্রজ্বালা।
শৈশব চারু অকারণ হাসে, যৌবন চারু প্রেমের স্বাদে,
পলিত জরাও সৌম্যশোভন, তোমার শুভ্র আশীর্ব্বাদে।

দৈন্য শোভন শমসংযমে, বিরহ শোভন প্রিয়ের ধ্যানে,
প্রসববেদনা অঙ্কশশীতে, কৃচ্ছ্রসাধনা সিদ্ধিজ্ঞানে।
বিয়োগ-আৰ্ত্তি অনুসন্তাপ রুচির অশ্রু মুকুতাহারে,
মরণো মধুর তোমার চরণসরোজমধুতে ধরার পারে।

শ্রীকালিদাস রায়।

পঁচিশ বছর পরে

১

পঁচিশ বছর পরে।
কত না সে আশা,—কত বাসা বাঁধা,
কত হাসিরাশি, কত না সে কাঁদা,
একে একে আজি ভাসিছে নয়নে, থরে থরে থরে থরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

২

আজি একা বসি' এই বাতায়নে,
শূন্য ভবনে, শূন্য শয়নে,
কত কথা গত দীর্ঘ জীবনে,—ভাবিতে নয়ন ঝরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

৩

কত কি যে ছিল, কিছু নাই তা'র,
মনে পড়ে শুধু সে ছেলেখেলার
সোণার স্বপন; এখনো ভাবিলে, চিত্ত পাগল করে।
পঁচিশ বছর পরে॥

৪

ঐ তরু-পাশে ছিল অভাগার—
কত না সাধের মালতী-লতার—
কুঞ্জ, যাহার স্মরণে হৃদয়ে আজিও অমিয়া ক্ষরে!
পঁচিশ বছর পরে॥

৫

ঐ সে গ্রামের বারোয়ারি তলা;
ঐ পাঠশালা, যেথা ছাড়ি গলা,
পড়িতাম কত, ভয়ে ভয়ে বসি' সেই বেতখানা স্ম'রে।
পঁচিশ বছর পরে॥

৬

কিছু নাই আজ, এলো মেলো সব,
সে যুগের সেই বিপুল বিভব
ছায়াবাজি প্রায় লুকা'ল কোথায়,
কে নিল রে তাহা হরে?
পঁচিশ বছর পরে॥

৭

ঐ সে বিশাল অশথ দাঁড়ায়ে,
কালের করাল নিশান উড়ায়ে
বিধির বিষম বিধান ঘোষণা করিছে ঊর্দ্ধ করে।
পঁচিশ বছর পরে॥

৮

সেই যে প্রাণের সুহৃদ্ প্রমোদ,
যা'রে হেরি হতো অতুল আমোদ;
ঐ ত সে যায়, ফিরে না তাকায়, ব্যস্ত—আপন তরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

৯

ঐ হরষিত, অমর-দুর্লভ
আছিল রে যা'র চরিত্র-বিভব,
করুণার কত শতদল যা'র ফুটিত মানস-সরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১০

অনাথের নাথ, দয়ায় অতুল,
সুত-বিহীনার—সুত সমতুল,
যেখানে বেদনা, সেথা হরষিত কাঁদিত করুণস্বরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১১

আজি, আহা, তা'র একি বিপরীত!
কোথা গেল সেই মধুর অতীত?
(এবে) আপনার তরে, হেন কায নেই,
হরষিত যা' না করে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১২

সন্ধ্যার দীপ তুলসীতলায়,
জ্বলে না রে আর পোড়া বাঙ্গালায়!
বাল্যের সেই গোধুলি খেলার স্মরণে নয়ন-ঝরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১৩

গ্রাম্যদেবতা মন্দির ঐ
জঙ্গলে ঘেরা, সে আমোদ কৈ?
সান্ধ্য-আরতি বাজে না ত আর পল্লী মুখর ক'রে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১৪

ঐ খেয়াঘাট, খেয়া নাহি তায়,
লোক নাই, কেবা পারাপারে যায়!
মিটিমিটি আলো জ্বলিতেছে ঐ পাটনীর ভাঙ্গা ঘরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১৫

পল্লীর ছায়া ঘন তটিনীর—
তটে, যেথা কত মধুযামিনীর
জ্যোছনার সাথে আলাপ করিত লহরী আলস ভরে।
পঁচিশ বছর পরে॥

১৬

আজ সেই তট নীরব নিঝুম,
জন হীন গ্রাম, যেন কত ঘুম!
পল্লী-রাণীর সাধের বাগান আগুনে পোড়া'ল কে রে?
পঁচিশ বছর পরে॥

১৭

ঘরে ঘরে ছিল আনন্দের ঢেউ,
আজি সব ফাঁকা, কোথা নেই কেউ,
ঘাট-বাট-মাঠ শ্মশানের মত শুধু হাহাকার করে।
পঁচিশ বছর পরে॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

রাজনীতিক প্রসঙ্গ

১।—ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচন

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারের ফলে সৃষ্ট ব্যবস্থাপক সভাসমূহের প্রথম পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে ; ৩ বৎসর পরে আবার সদস্য নির্ব্বাচন হইয়াছে। ৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন প্রথম নির্ব্বাচন হয়, তখন অসহযোগ আন্দোলনের ফলে অনেক উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন নাই।

এবার নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অসহযোগীদিগের মধ্যে এক দল আপনাদিগকে অসহযোগী বলিয়া পরিচিত করিয়া অসহ-যোগের কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার আয়োজন করেন। বঙ্গদেশে তাঁহাদের নেতা—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ। গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হইয়া তিনি অসহযোগের কার্য্যপদ্ধতির এই পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াস করেন এবং ব্যর্থকাম হইয়া যে নূতন দল গঠিত করেন, তাহা "স্বরাজ্যদল" বলিয়া অভিহিত হয়। সেই দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের জন্য কংগ্রেসের অনুমতি পাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। বোধ হয়, কংগ্রেসের নামে ভোট চাহিয়া নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ করাই তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় দিল্লীতে কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয় এবং তাহাতে স্থির হয়, ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে যাঁহাদের ধর্ম্ম বা বিবেকগত আপত্তি নাই, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন। সদ্যকারামুক্ত মৌলানা মহম্মদ আলী তাঁহাদিগের সেই প্রস্তাব গ্রহণে সাহায্য করিয়াছিলেন। পরে—কোকনদে কংগ্রেসের অধি-বেশনে সভাপতি হইয়া মৌলানা সাহেব তাঁহার সে কার্য্যের কারণ বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশচেষ্টায় আপনারা কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে অনবহিত হইয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রে-সকে দুর্ব্বল করায় কংগ্রেসের অপর দলেরও সে কার্য্যে উদ্যমশৈথিল্য লক্ষিত হইয়াছিল। অথচ গঠন-কার্য্য সম্পন্ন না হইলে দেশে কখনই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সেই জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অনুমতি পাইলে স্বরাজ্য-দলও গঠন-কার্য্যে অবহিত হইবেন, এই আশায় মৌলানা সাহেব তাঁহাদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় গমনের অনুমতি দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। মৌলানা সাহেব যখন কারা-গারে, তখন সর্ত্ত হইয়াছিল, কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন স্থগিদ রাখিবেন এবং স্বরাজ্যদল গঠন-কার্য্যে, বিশেষ স্বেচ্ছাসেবক ও অর্থ সংগ্রহে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সর্ত্ত রক্ষিত হইলেও স্বরাজ্যদল প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। এবারও তাঁহারা কি করিবেন, বলা যায় না।

সে যাহাই হউক, কংগ্রেসে অনুমতি পাইবার অল্প দিন পরেই নির্ব্বাচন হয় এবং সে নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল যে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সন্দেহ নাই। কেবল বাঙ্গালায় নহে, পরন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও এই দলের লোকরা অপর দলের অনেক প্রার্থীকে পরাভূত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ে সার চিমনলাল শীতল-বাদ, যুক্তপ্রদেশে মিষ্টার চিন্তামণি, মাদ্রাজে শেষগিরি আয়ার প্রভৃতির পরাভব উল্লেখযোগ্য।

মহাত্মা গন্ধী বারদলীতে যে কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহাতে উত্তেজনা ছিল না। তিনি আইন অমান্য আন্দো-লনের সকল আয়োজন সম্পন্ন করিয়া যখন সেই কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করেন, তখন কেহ কেহ মনে করিয়াছিল, তিনি মুক্তির দ্বার পর্য্যন্ত আপনার বিজয়বাহিনী লইয়া যাইয়া দুর্গের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তিনি যে কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তদনুসারে কায করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী ছিল সত্য, কিন্তু সে জন্য যে ধৈর্য্যের ও আগ্রহের প্রয়োজন, তাঁহার মতাবলম্বী-দিগের মধ্যে সকলের তাহা ছিল না। তাহার পর স্বরাজ্য-দলের কার্য্যে গঠন-কার্য্য অবজ্ঞাত হইতেছিল। দেশে যেন অবসাদ আসিয়াছিল। বোধ হয়, সেই সকল কারণে দেশের লোক পরিবর্ত্তন চাহিতেছিল। বিশেষ তাহারা পুরা-তন অর্থাৎ মডারেট দলের উপর বিরক্ত ছিল। তাই কংগ্রেসের

নামে স্বরাজ্যদল ভোট চাহিলে তাহারা অবিচারিতচিত্তে সেই দলের প্রার্থীদিগকেই সাগ্রহে ভোট দিয়াছিল।

বাঙ্গালায় ২ জন প্রার্থীর পরাভবে স্বরাজ্যদলের সাফল্য বিশেষভাবে স্বপ্রকাশ করে—এক জন ৬০ বৎসরকাল বাঙ্গালার রাজনীতিক নেতা বাগ্মিবর সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; আর এক জন বাঙ্গালার এডভোকেট জেনারল শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ। উভয়েরই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত। সতীশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বে কেহ শুনে নাই। এই আন্দোলনে যোগ দিয়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং কারাবরণও করিয়াছিলেন। আর সুরেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় চিকিৎসক হিসাবে সুপরিচিত হইলেও রাজনীতিক্ষেত্রে কখন পদার্পণ করেন নাই। অথচ তিনি সুরেন্দ্রনাথের মত প্রবীণ কর্ম্মীকে অনায়াসে পরাভূত করেন। কাযেই বলিতে হয়, ইহা সাময়িক মতপ্রাবল্যের ফল।

বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ স্বয়ং প্রথমে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন নাই এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যতীত পূর্ব্ববারের আর ২ জন মন্ত্রীর (শ্রীযুক্ত প্রভাষচন্দ্র মিত্র ও নবাব নবাব আলী চৌধুরী) নির্ব্বাচন বন্ধ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দলভুক্ত নহেন—অর্থাৎ তাঁহার দলের প্রতি-শ্রুতিপত্রে সহি দেন নাই, এমন লোকও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং কুমিল্লায় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। অখিলবাবু স্বরাজ্যদলের স্বৈরাচারের পরিচয় প্রকাশ করিয়া দেন এবং বলেন, স্বরাজ্যদল তাঁহার নিকট যে টাকা চাহিয়াছিলেন, তাহা না পাওয়ায়, প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্তকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি স্বরাজ্যদলের শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বসুর ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের কথা হইতে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত করিয়াছেন। কংগ্রেসের দিল্লীর অধিবেশনেও এই দলের অনাচার-পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—সে দল বারাণসী হিন্দু কলেজ হইতে কতকগুলি ছাত্রকে প্রতিনিধি করিয়া লইয়া যায় এবং না কি তাহা-দিগকে বেনামীতে ভোট দিবার জন্য অনুরোধ করে।

সে যাহাই হউক, বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদল যে নির্ব্বাচনে অপ্রত্যাশিত সাফল্যলাভ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং মুসলমানদিগকে যদি স্বতন্ত্র দল বলিয়া ধরা যায়, তবে—absolute majority—না পাইলেও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারাই যে প্রবল পক্ষ, এমন কথাও বলা যাইতে পারে। এইরূপে নির্ব্বাচন শেষ হয়।

২।—মন্ত্রিমণ্ডল গঠন

ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন শেষ হইলে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হয়েন। বিলাতে প্রথা এই যে, যে দলের প্রতিনিধিরা পার্লামেণ্টে সংখ্যায় প্রবল, সেই দলের নেতাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বলা হয়। সেই প্রথার অনুসরণ করিয়া লর্ড লিটন স্বরাজ্য-দলের প্রাবল্য বুঝিয়া সে দলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে ডাকিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সরকারের পক্ষ হইতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মর্ম্মার্থ এই—

বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার সরকারকে (অর্থাৎ সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিভাগকে) এক রূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। সেই নীতি অনুসারে—সরকারকে দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে একীভূত করিবার চেষ্টায় তিনি এ বারও সরকার গঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আগামী ১৬ই জানুয়ারী তারিখে শাসন পরিষদ হইতে বর্দ্ধমানে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অবসর গ্রহণ করিবার কথা। তাহা হইলে নির্ব্বাচনের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এবং হস্তান্তরিত বিভাগে তাঁহার প্রভাব-পরিচয় সম্যক্ অনুভূত না হইতেই তিনি পদত্যাগ করেন। সেই জন্য গভর্ণরের অনুরোধে ভারত-সচিবের সম্মতিক্রমে যত দিন প্রয়োজন তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইবে।

তাহার পর হস্তান্তরিত বিভাগের কথা। যখন নির্ব্বা-চনের ফল জানা গেল, তখন দেখা গেল, সম্প্রদায় হিসাবে ধরিলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংখ্যায় অধিক; আর তাঁহারা যদি স্বাধীন বা স্বতন্ত্র জাতীয়দলের সহিত একযোগে কায করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের মধ্যে তাঁহারাই অর্দ্ধাংশের অধিক হইবেন। সেই জন্য গভর্ণর সে দলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশকে অন্যতম মন্ত্রী হইতে অনুরোধ করেন এবং

তাঁহার দলের সদস্যদিগের মধ্য হইতে আর ২ জন মন্ত্রী হইবার মত লোকের নামও গভর্ণরের কাছে বলিতে বলেন।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন গভর্ণরকে পত্র লিখিয়া জানান, তাঁহার দল যে শাসন-পদ্ধতি নষ্ট করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন,তাহারই অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতে পারেন না এবং ধ্বংসসাধনের জন্যই গভর্ণরের অনুরোধ পালন করাও সঙ্গত নহে।

তখন গভর্ণর স্বাধীন বা স্বতন্ত্র জাতীয়দলের নেতা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আহ্বান করিয়া

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।

একযোগে মন্ত্রী হইতে অনুরোধ করেন। নিজ দলের সহিত পরামর্শ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় জানান, তাঁহার দল হইতে আর ২ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করিলে তিনি মন্ত্রী হইতে সম্মত বটে, কিন্তু অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা মন্ত্রী হইলে তাঁহাদের সহিত একযোগে কায করিতে সম্মত নহেন। কিন্তু এই দল অন্যান্য দলের অপেক্ষা সংখ্যায় প্রবল নহে; পরন্তু চিত্তরঞ্জন গভর্ণরকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, স্বতন্ত্রদল বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে কায করিবেন বলিয়া স্বরাজ্যদল সে ব্যবস্থাপক সভায় অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত দলের মন্ত্রীদিগের সমর্থন করিবেন না। তখন বাধ্য হইয়া গভর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় অন্যান্য দলের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাস্থ্য-বিভাগদ্বয়ের ভার প্রদান করিলেন এবং মৌলবী ফজলুল হক অস্থায়িভাবে শিক্ষা,কৃষি ও শিল্প বিভাগগুলির ভার লইলেন। তৃতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর কার্য্যভার বিভাগের বিষয় বিবেচিত হইবে।

২৩শে ডিসেম্বর তারিখে গভর্ণর এই ইস্তাহার প্রচার করেন।
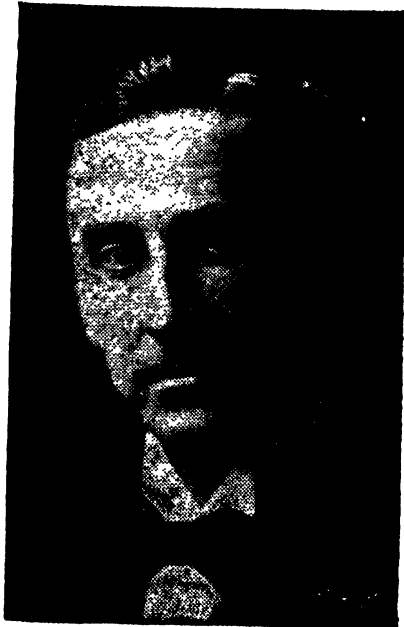
লর্ড লিটন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক।

তাহার পর তিনি মিষ্টার গাজনভীকে তৃতীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

চিত্তরঞ্জনের পত্রের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা গভর্ণরের ইস্তাহারের আলোচনা করিব।

চিত্তরঞ্জন নিজে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। গভর্ণর তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে কেবল অন্যতম মন্ত্রী হইতে আহ্বান করিয়াছিলেন। সে কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু চক্রবর্ত্তী মহাশয় আর যে সব সর্ত্তে মন্ত্রী হইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, গবর্ণর সে সকল সর্ত্তে সম্মত ছিলেন কি? চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বরাজ্যদলের নহেন অর্থাৎ যে দল বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতির বিনাশসাধন করিতে চাহেন, সে দলভুক্ত নহেন; আবার তিনি কনষ্টিটিউশনাল দলেরও নহেন। তিনি অবিচারিতচিত্তে সরকারের সকল প্রস্তাবের সমর্থন করিতে প্রস্তুত নহেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতেও Parliamentary action'এর অবসর আছে কি না, তাহা দেখিতে প্রস্তুত ছিলেন। এ অবস্থায় মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্ত করা সঙ্গত ও সম্ভব—

(১) মন্ত্রীরা বার্ষিক ৬৪ হাজার অপেক্ষা অল্প, ইচ্ছানুরূপ বেতন গ্রহণ করিতে পারিবেন;

মৌলবী ফজলুল হক

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ।

(২) প্রয়োজন মনে করিলে তাঁহারা শাসনপরিষদের সদস্যদিগের যে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে ও বক্তৃতা করিতে পারিবেন;

(৩) ৬ জন মন্ত্রী একই দল হইতে নিযুক্ত হইবেন;

(৪) গভর্ণর যে সকল সদস্য মনোনীত করিবেন, তাঁহাদের নিয়োগও মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া করিবেন;

(৫) পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়াই গবর্ণর যে সব বিভাগের ভার হস্তান্তরিত করিতে পারেন, সে সব বিভাগের ভার মন্ত্রীদিগকে দিতে হইবে।

দ্বিতীয় ও পঞ্চম দফায় যে ২টি সর্ত্ত লিখিত হইয়াছে, সে ২টিতে সম্মত হওয়া যে গভর্ণরের পক্ষে অসম্ভব নহে, তাহা শাসন-সংস্কার আইন পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

সে যাহাই হউক, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া গভর্ণর অন্যান্য দল হইতে ৩ জন মন্ত্রী মনোনীত করিয়াছেন—

(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। মল্লিক মহাশয় আলীপুরের উকীল ও বহুদিন হইতে কংগ্রেসকর্ম্মী। স্বাধীন নেতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও আছে। কলিকাতায় যে দিন পুলিস শ্রীমতী বাসন্তী দেবী, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী ও শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে গ্রেপ্তার করে, সে দিন তিনি বড় লাটের সহিত ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া নিমন্ত্রণ সভা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হইয়া তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তবে তাঁহার ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচন নাকচ করিবার জন্য স্বরাজ্য-দলের দলপতি চিত্ত-রঞ্জনের শ্যালক মিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ হালদার দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি সে দরখাস্ত গ্রাহ্য হয়, তবে তাঁহাকে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে হইবে। সেরূপ নির্ব্বা-চনের পূর্ব্বে তিনি ৬ মাস পর্য্যন্ত মন্ত্রী থাকিতে পারেন।

(২) মৌলবী ফজলুল হক সুশিক্ষিত মুসলমান। তিনি সরকারী চাকরীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। কিন্তু সে পদ ত্যাগ করিয়া আসিয়া হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলেন। বক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। তিনি যে ব্যবস্থাপক সভার বিতর্কে স্বীয় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইবেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। তিনি শিক্ষাবিভাগের ভার পাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং মফঃস্বলের লোক—বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পাঠশালার ও মোক্তাবের অবস্থা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন আশা করা যায় যে, তিনি সে অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিবেন।

(৩) মিষ্টার গাজনভী সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশের বংশধর। তিনি শিক্ষাব্যপদেশে বিলাতে গিয়া কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রিয়। শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিনি বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

মন্ত্রিত্রয়ের কার্য্য-কাল সে বড় সুখের হইবে, এমন মনে হয় না। কারণ, স্বরাজ্য-দল বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি ধ্বংস করিবেন, এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।

৩।—চিত্ত-রঞ্জনের পত্র

মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া স্বরাজ্যদলের দলপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গালার গভর্ণরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আপনি আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা আমার দলের গোচর করিয়াছি। স্বরাজ্যদলের মত এই যে, আমরা চাকরী লইব না। শাসন-সংস্কারে আমাদিগকে যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, আমরা তাহা ব্যবহার করিয়া দ্বিধাবিভক্ত শাসনপ্রণালী বিনষ্ট করিব, এই প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছি। চাকরী লইলে স্বরাজ্যদল আর সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না। আমরা জানি, চাকরী

লইলে ভিতর হইতে (সরকারকে) বাধা দেওয়া সম্ভব; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান পদ্ধতিতে আপনি যে চাকরী দিতে পারেন, তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে বাধা দিবার অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। এ দেশের নবজাগ্রত লোকমত শাসন-পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন চাহিতেছে, যত দিন তাহা না হয় অথবা যত দিন সাধারণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে (সরকারের) মনোভাব-পরিবর্ত্তন সূচিত না হয়, তত দিন এ দেশের লোক ইচ্ছা করিয়া (সরকারের সহিত) সহযোগ করিতে পারিবে না। হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমি দুঃখিত হইলাম।

চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার আহ্বানে সম্মত হওয়া সঙ্গত ছিল কি না, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, স্বরাজ্যদল চাকরী লইবেন না, এই সর্ত্তে ভোট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই পত্রে যে স্বৈরাচারের পরিচয় আছে ও ইহাতে যে অসহযোগের মূলনীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে লালা লজপত রায়ের মত আমরা নিম্নে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অতিরিক্ত অধিবেশন হয়, লালা লজপত রায় তাহার সভাপতি ছিলেন। সেই সভায় স্থির হয়, ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই সঙ্গত। তদনুসারে লালা লজপত রায় কার্য্য করেন। সংপ্রতি কারামুক্ত হইয়া আসিয়া তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন না করিয়া তাহা অধিকার করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে তিনি স্বরাজ্যদলেরই সহিত একমত। বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের দলপতির পত্র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। তিনি যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সম্মত হয়েন নাই, তাহাতে তিনি ভুল করেন নাই; কারণ, যে সর্ত্তে স্বরাজ্যদল নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা চাকরী গ্রহণ করিতে পারেন না। সে উত্তর দিতে বিচারবিবেচনার প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু দলের লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা যদি চিত্তরঞ্জন শিষ্টাচারসম্মত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের সহিত পরামর্শ না করিয়া স্বরাজ্যদলের কেন্দ্রীয় সমিতির সহিত পরামর্শ করাই তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ছিল। এ বিষয়ে মতপ্রকাশের অধিকার কেবল সেই সমিতিরই ছিল। সে সমিতির অধিকার অস্বীকার করিয়া কেবল বঙ্গীয় স্বরাজ্যদলের মতানুবর্ত্তী হইয়া লর্ড লিটনকে পত্র লিখিয়া চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্যদলের একতা নষ্ট করিয়াছেন (Has virtually destroyed the solidarity of the Swaraj Party) লর্ড লিটন প্রাদেশিক শাসক। তিনি প্রাদেশিক প্রয়োজনে চিত্তরঞ্জনকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনের পক্ষে সমগ্র দেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সে আহ্বানের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তিনি স্বরাজ্যদলের দলপতি; সুতরাং কেন্দ্রীয় সমিতির নিয়মানুসারে কায করিতে তিনি বাধ্য। যদি তিনি লর্ড লিটনের আহ্বান পাইয়াই সে সমিতির সহিত পরামর্শ করিতেন, তবেই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের সভা ডাকিয়া সেই সভার মতানুসারে কায করিয়াছেন। সে সমিতিকে উপেক্ষা করিয়া তিনি যে দলের মতানুসারে কায করিয়াছেন, সে দলের কায অসহযোগের মূল নীতির বিরোধী এবং স্বরাজ্যদলের মতেরও বিরোধী। চিত্তরঞ্জন লর্ড লিটনকে লিখিয়াছেন—শাসন-সংস্কারে যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, স্বরাজ্যদল তাহা ব্যবহার করিয়া দ্বিধাবিভক্ত শাসন-প্রণালী বিনষ্ট করিবেন। দ্বিধাবিভক্ত শাসন পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন ব্যতীত স্বরাজ্যদলের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? তাহার উচ্ছেদ সাধিত হইলেই কি তাঁহারা তৃপ্ত হইবেন? কংগ্রেস এই দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধনই বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। মডারেট বা লিবারল দলের সম্প্রদায়বিশেষ ইহাই চাহেন বটে, কিন্তু স্বরাজ্যদল কখনই ইহা তাঁহাদের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদল ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন—বাঙ্গালার দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন কাহারও কাম্য নহে। বাঙ্গালায় দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতির উচ্ছেদ সাধিত হইলেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তবে কি চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালায় দ্বিধাবিভক্ত শাসন-পদ্ধতি নষ্ট হইলে বা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলেই সন্তুষ্ট হইবেন? মোট কথা, চিত্তরঞ্জন যে ভাষায় উত্তর দিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সমিতির সম্মতি ব্যতীত তাহা ব্যবহারের অধিকার তাঁহার ছিল না।

চিত্তরঞ্জনের কার্য্যের আলোচনা করিয়া লালা লজপত রায় বলিয়াছেন, অতঃপর প্রত্যেক প্রদেশে স্বরাজ্যদল ইচ্ছামত কায করিলে চিত্তরঞ্জন তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন না।

৪।—স্বরাজ্যদলের কার্য্য-নির্দ্ধারণ

বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে ও ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব স্থির করেন। আমরা প্রথমে তাঁহাদের ব্যবস্থাপক সভায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের তালিকা প্রদান করিতেছি :—

নিম্নলিখিত কাযগুলি পর পর করা হইবে—

(১) যাহাতে সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়, সে জন্য জিদ করিতে হইবে;

(২) চণ্ডনীতিমূলক সকল আইনের প্রত্যাহার জন্য জিদ করিতে হইবে;

(৩) চণ্ডনীতিমূলক সকল আইনের প্রত্যাহার জন্য লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীকে অনুরোধ করা হইবে;

(৪) প্রাদেশিক দায়িত্বশীল শাসনের অনুকূল জাতীয় দাবী স্থির করিতে হইবে;

(৫) প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদিগের প্রতি অবিশ্বাস জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে;

(৬) প্রয়োজন হইলে মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাস বা বন্ধ করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে;

(৭) জাতীয় দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত সরকারের সকল প্রস্তাব নামঞ্জুর করা বা স্থগিদ রাখা হইবে;

(৮) জাতীয় দাবী পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি বাজেট পেশ করা হয় এবং তাহার পূর্ব্বে সে দাবী পূর্ণ করিতে সরকারের অভিপ্রায়ের কোন পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে বাজেট নামঞ্জুর করা হইবে;

(৯) দলের লোক একযোগে কায করিবেন এবং বহুমতানুসারেই কায করা হইবে।

(১০) অসুস্থতা বা বিশেষ কার্য্য ব্যতীত স্বরাজ্যদলের কোন সদস্য ব্যবস্থাপক সভায় অনুপস্থিত থাকিবেন না;

(১১) জাতীয় দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত স্বরাজ্যদলের কোন প্রতিনিধি সরকারী চাকরী স্বীকার করিবেন না।

এই সব কাযের আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে, স্বরাজ্যদল নূতন সাজে সাজাইয়া পুরাতন "আবেদন নিবেদন" নীতিই আসরে আনিতে চাহেন। যে সরকারের সহিত অসহযোগ তাঁহারা মূলনীতি করিয়া ধার্য্য করিয়াছেন, সেই সরকারের কাছেই জিদ ও দাবী করিবেন, জিদ বজায় না থাকিলে বা দাবী পূরণ না হইলে প্রতিবাদের দ্বারা সরকারকে বিব্রত করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রতিবাদের দ্বারা তাঁহারা যে সরকারের শাসনকল অচল করিতে পারেন না, তাহা কাহারও অবিদিত নাই—বোধ হয়, স্বরাজ্যদলেরও নহে। তবে তাঁহারা প্রতিবাদের দ্বারা কি ফল লাভ করিবার আশা করেন? প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রতিবাদ করিলে তাহার কি মূল্য থাকে? তাঁহারা অসহযোগের দ্বারা সরকারকে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিতে ও চণ্ডনীতিমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করিবেন না—কেবল আশা করেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া ও বক্তৃতা করিয়া সে কায সম্ভব করিয়া তুলিবেন! ভাব দেখিয়া মনে হয়, স্বরাজ্যদল প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের জন্যই ব্যস্ত। লালা লজপত রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সরকার যদি বোম্বাই বা মাদ্রাজকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান না করিয়া বাঙ্গালাকে প্রদান করেন, তখন বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের অবস্থা কিরূপ হইবে? তাঁহারা কি সে দান গ্রহণ করিবেন? তাঁহারা এমন কথা বলেন নাই যে, সমগ্র ভারত পূর্ণ স্বরাজ না পাইলে তাঁহারা বাঙ্গালায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন গ্রহণ করিবেন না। যদি তাহা না থাকে, তবে কি বুঝিতে হইবে, তাঁহারা ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নহেন—ব্যস্ত কেবল বাঙ্গালায় প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার জন্য? তাহা হইলে তাঁহারা সমগ্র দেশের জন্য মুক্তির সন্ধান করেন না, আপনারা আংশিক মুক্তিলাভ করিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন!

কাযেই এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল যে কায করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজের আদর্শের পরিপন্থী।

এখন ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। তাঁহাদের

কার্য্য-তালিকায় দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করা, জাতীয়তার ভিত্তি-রূপে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্ত্তন, শালিসী আদালত স্থাপন বা স্বাবলম্বনের শিক্ষা ও অর্থনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে খদ্দর প্রচার—এ সকলের স্থান নাই, তাঁহারা একটিমাত্র কাযের কথা বলিয়াছেন—হিন্দু মুসলমানে নির্ব্বাচনে ও চাকরীতে বাটোয়ারা করা।

স্বরাজ্যদলের প্রস্তাব—

(১) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যানুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইবে।

(২) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটী, জিলাবোর্ড, লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডে অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য অনুসারে—যাহাদের সংখ্যাধিক্য, তাহারা শতকরা ৬০ জন ও যাহাদের সংখ্যাল্পতা, তাহারা ৪০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পাইবে।

(৩) সরকারী চাকরীর শতকরা ৫৫টি মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। ভিন্ন ভিন্ন চাকরীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং যত দিন পর্য্যন্ত সরকারী চাকরীতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন না হয়, তত দিন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প উপযোগিতার প্রমাণ দিলেই মুসলমানকেই চাকরী দেওয়া হইবে।

(৪)(ক) যে আইনে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের সংস্রব আছে, সেই সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের শতকরা ৭৫ জনের সম্মতি ব্যতীত সে আইন উপস্থাপিত করা হইবে না।

(খ) মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য করা হইবে না।

(গ) ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য গোহত্যায় বাধা দেওয়া হইবে না।

(ঘ) খাদ্যের জন্য গোহত্যা নিবারণকল্পে কোন আইন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হইবে না। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা ব্যবস্থাপক সভার বাহিরে একটা মিটমাটের চেষ্টা করিবেন।

(ঙ) যাহাতে হিন্দুদিগের মনে আঘাত না লাগে, এমন ভাবে গোহত্যা করা হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(চ) হিন্দু মুসলমানে বিরোধ নিবারণ করিবার বা বিরোধ ঘটিলে সালিশ করিবার জন্য প্রতি বৎসর প্রতি মহকুমায় অর্দ্ধেক হিন্দু ও অর্দ্ধেক মুসলমান লইয়া সমিতি গঠিত করা হইবে।

এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে মত প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা লালা লজপত রায়ের মতের সারাংশ প্রদান করিতেছি—

চিত্তরঞ্জন যখন বাঙ্গালায় তাঁহার স্বরাজ্যদল লইয়া রফা-ব্যবস্থা রচনা করিতেছিলেন, তখন তিনি অবশ্যই জানিতেন, দিল্লীতে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ অনুসারে নিখিল ভারতের জন্য রফাব্যবস্থার সর্ত্ত স্থির হইতেছিল; হয় ত বা তাহার খসড়া তাঁহার কাছে ছিল। দিল্লীতে স্থির হয়, খসড়া কংগ্রেসকর্ম্মি-মডারেট-নির্ব্বিশেষে সকল খ্যাতনামা ভারত-বাসীর নিকট মতপ্রকাশার্থ দাখিল করা হইবে। বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল তাহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে পারিতেন। তাহা না করিয়া তাঁহারা সে কথা অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া কতকগুলি সর্ত্ত সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবজ্ঞাত হইয়াছে;—

(১) কোন প্রদেশের জন্যও কেবল স্বরাজ্যদল এরূপ সর্ত্ত স্থির করিতে পারেন না; সে অধিকার তাঁহাদের নাই।

(২) প্রাদেশিক সর্ত্তগুলি জাতীয় সর্ত্তব্যবস্থার অনুগামী হইবে, পূর্ব্বগামী হইতে পারে না।

(৩) জাতীয় সর্ত্তব্যবস্থা স্থির হইবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা করিলে প্রথমোক্তের পথ বিঘ্নবহুল করা হয়।

(৪) ভারতের সমস্ত জাতির জন্য সর্ত্তব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে, কেবল হিন্দু-মুসলমানের জন্য নহে। ব্যবস্থা কেবল হিন্দু-মুসলমানের হইলে চলিবে না।

(৫) বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে জাতীয় একতাসাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তাহাতে কালনির্দ্ধারণ পর্য্যন্ত নাই। দেখিলেই মনে হয়, ইহা বর্ত্তমানের জন্য কল্পিত—ভবিষ্যতের জন্য নহে। সাম্প্রদায়িকভাবে চাকরীর ভাগ করা জাতীয়তার পরিপন্থী।

(৬) সকল সময় ও সকল ব্যাপারে মসজেদের সম্মুখে গীতবাদ্য বারণ করা এত বড় অনাচার যে, মুসলমান নৃপতিরাও কখন সেরূপ ব্যবস্থা করেন নাই।

(৭) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রদায়িক হিসাবে প্রতিনিধির সংখ্যা ৬০ ও ৪০ নির্দ্ধারিত করা প্রতিনিধি-মূলক গভর্ণমেণ্টের মূলনীতির বিরোধী।

(৮) বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এরূপ ব্যবস্থায় মুসলমানাতিরিক্ত সম্প্রদায়সমূহ কখনই সম্মত হইবেন না এবং তাঁহাদের অসম্মতি মুসলমানদিগের মনে যে বিরক্তির সঞ্চার করিবে, তাহাতে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতিস্থাপন আরও দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

৫।—হিন্দু-মুসলমান 'প্যাক্ট'

এখন হিন্দু-মুসলমানে এই ব্যবস্থা বা 'প্যাক্টের' ইতিহাসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায়, বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনজন্য বিলাতের সরকারের কাছে লিখিতেছেন। সেই কথা অবগত হইয়া বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন বে-সরকারী সদস্য তাঁহার কাছে এক পত্র লিখিয়া শাসন-সংস্কারের খসড়া দেন। সেই বৎসরই লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের ও মসলেম লীগের অধিবেশন হয় এবং উভয় সভায় একইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাহাতে বলা হয়, সমরান্তে নূতন বন্দোবস্তের সময় ভারতবর্ষকে যেন স্বায়ত্তশাসনশীল সাম্রাজ্যাংশের অধিকার প্রদান করা হয়। সেই প্রস্তাবেই প্রথম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনমণ্ডলী প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত আর কোথাও সে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কথা হয় না। সে প্রস্তাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল :—

পঞ্জাব	(নির্ব্বাচিত ভারতীয় সদস্যদিগের)	অর্দ্ধাংশ
যুক্তপ্রদেশ ...	(„ „)	শতকরা ৩০ জন
বাঙ্গালা ...	(„ „)	শতকরা ৪০ জন
বিহার ...	(„ „)	শতকরা ২৫ জন
মধ্যপ্রদেশ ...	(„ „)	শতকরা ২৫ জন
মাদ্রাজ ...	(„ „)	শতকরা ১৫ জন
বোম্বাই ...	(„ „)	এক-তৃতীয়াংশ

উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থা স্থির করেন এবং মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারেও এই ভিত্তি গৃহীত হয়।

আজ সহসা সে ব্যবস্থা বাতিল করিয়া বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল যে ব্যবস্থা করিতেছেন, সকল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানেও যে ভাবে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন করিতে চাহিতেছেন, তাহাতে যোগ্যতার স্থানে সম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠা হইবে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন জিলায় হিন্দু মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান সদস্যের পরিমাণ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

জিলা	অধিবাসীর শতকরা		জিলা বোর্ডে শতকরা		লোকাল বোর্ডে শতকরা	
	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
বর্দ্ধমান	৭৮·০০	১৮·৫	৮৮·৯	১১·১	৭৯·৮	২০·৫
বীরভুম	৬৮·১	২৫·১	৮১·৭	১৮·৭	৭৫·0	২৫·০
বাঁকুড়া	৮৬·৭	৪·৬	৯১·৭	৮·৩	৮৬·৭	১৩·০
মেদিনীপুর	৮৮·২	৬·৪	৯১·৭	৮·৩	৯৪·১	৫·৯
হুগলী	৮১·০	১৬·১	৮৪·৭	১৫·৩	৮১·৩	১৮·৭
হাওড়া	৭৯·৩	২০·৩	৯৪·৪	৫·৬	৮৭·৫	১৭·৫
২৪ পরগণা	৬৪·২	৩৪·৬	৭৬·৭	২৩·৩	৬৬·ন	৩৩·৮
নদীয়া	৩৯·১	৬০·২	৮০·০	২০·০	৭১·৩	২৮·৭
মুর্শিদাবাদ	৪৫·১	৫৭·৬	৫৫·৬	৪৪·৪	৫০·৮	৪৯·২
যশোহর	৩৮·০	৬১·৮	৮০·৪	১৬·৬	৬৬·৭	৩৩·৩
খুলনা	৫০·০	৪৯·৮	৮১·৩	১৮·৭	৬২·১	৩৭·৯
ঢাকা	৩৪·২	৬৫·৪	৭২·৮	২৭·২	৭০·৯	২৯·৮
ময়মনসিংহ	২৪·৩	৭৪·৯	৫৪·২	৪৫·৮	৩৯·০	৬১·০
ফরিদপুর	৩৬·৬	৬৩·৫	৫৮·৪	৪১·৬	৫৪·৬	৪৫·৪
বাকরগঞ্জ	২৮·৮	৭০·৬	৫০·০	৫০·০	৪৩·৬	৫৬·৪
চট্টগ্রাম	২২·৬	৭২·৮	৫০·০	৫০·০	৪৩·৩	৫৬·৭
ত্রিপুরা	২৫·৮	৭৪·১	৪৬·৭	৫৩·৩	৩৪·০	৬৬·০
নোয়াখালি	২২·৪	৭৭·৬	২৯·২	৭০·৮	৩১·২	৬৮·৮
রাজসাহী	২১·৪	৭৬·৫	৪৫·২	৫৪·৫	৩৩·৪	৬৬·৬
দিনাজপুর	৪৪·১	৪৯·১	৬৬·৭	৩৩·৩	৬০·০	৪০·০
জলপাইগুড়ী	৫৫·০	২৪·৮	৮৫·৭	১৪·৩	৮৮·৯	১১·১
রংপুর	৩১·৬	৬৮·০	৫৫·৬	৪৪·৪	৪৬·৩	৫৩·৭
বগুড়া	১৬৬	৮২·৫	৫০·৫	৫০·০	৪০·৭	৫৯·৩
পাবনা	২৪·১	৭৫·৮	৫৮·৪	৪৫·৬	৫২·৮	৪৭·২
মালদহ	৪০·৬	৫১·৫	৬৬·৭	৩৩·৩	—	—
সমগ্র প্রদেশ	৪৩·৭	৫৩·৬	৬৭·০	৩৩·০	৬০·৮	৩৯·৫

এখন ইহার মধ্যে কয়টি জিলার অবস্থার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক—

(১) বর্দ্ধমানে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৭৮ ও মুসলমানের ১৮। জিলা বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধি শতকরা ৮৮ আর মুসলমান ১১। স্বরাজ্যদলের মতে কায হইলে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৬০ দাঁড়াইবে অর্থাৎ শতকরা ২৮ কমিয়া যাইবে।

(২) মেদিনীপুরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৮ আর মুসলমানের ৬ মাত্র। বর্ত্তমানে তথায় জিলা বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধি শতকরা ৯১ আর মুসলমান শতকরা ৮ মাত্র।

স্বরাজ্যদলের মত প্রবল হইলে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৩১ কমিয়া যাইবে।

এই ২ জিলায় হিন্দুদিগের প্রতিনিধি-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় কি হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার করাই হইবে না?

তাহার পর যশোহরের কথা ধরা যাউক। যশোহরে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৩৮ ও মুসলমানের ৬১ হইলেও জিলা বোর্ডে প্রতিনিধির মধ্যে শতকরা ৮৩ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমান। বলা বাহুল্য, যোগ্যতার জন্যই অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান অধিক হইলেও প্রতিনিধিদলে হিন্দুর প্রাবল্য, কিন্তু স্বরাজদলের মত যদি গৃহীত হয়, তবে সে অবস্থার পরির্ত্তবন হইবে—হিন্দুর পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া যাইবে এবং মুসলমান প্রতিনিধির হার প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া যাইবে।

যশোহরের মত ঢাকায়ও অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য—হিন্দু ৩৪, মুসলমান ৬৫। কিন্তু ঢাকাতেও জিলা বোর্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৭২ জন হিন্দু ও ৭২ জন মাত্র মুসলমান।

যশোহরে ও ঢাকায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক —কাযেই এ কথা মনে করিতে পারা যায় যে, ভোটারদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। তথাপি সে ২ জিলায় জিলা বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক কেন? বলা বাহুল্য, এই সব প্রতিনিধি মুসলমানদিগের ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন কেন? এ কথা নিশ্চয় যে, মুসলমানদিগের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব অনুভব করিয়া এবং হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকাতেই মুসলমানরা সে কায করিয়াছেন। অর্থাৎ যশোহর ও ঢাকার মত মুসলমানপ্রধান জিলাতেও মুসলমানরা যোগ্যতাহেতু হিন্দুদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া আসিতেছেন। আর স্বরাজ্যদল সে সব জিলায় কেবল মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বলিয়া যোগ্যতার স্থানে সংখ্যাধিক্যকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।

সমগ্র প্রদেশের হিসাব ধরিলে দেখা যায়, অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন হিন্দু ও ৫৩ জন মুসলমান হইলেও—

(১) জিলা বার্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৬ জন হিন্দু ও ৩৩ জন মুসলমান।

(২) লোকাল বোর্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৬ জন হিন্দু ও ৩৯ জন মুসলমান।

স্বরাজ্যদল কি কারণে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে চাহেন? সমগ্র বঙ্গদেশে যখন মুসলমানদিগের সংখ্যাধিক্য, তখন মুসলমানরা ইচ্ছা করিলে—উপযুক্ত হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া অনুপযুক্ত হইলেও মুসলমানকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, বিনা আইনে—বিনা "প্যাক্টে" বাঙ্গালার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য হয়।

তাহা যে হয় নাই, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এখনও মুসলমানরা স্বরাজ্যদলের দলাদলির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন নাই—তাঁহারা হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে অনেক স্থানে যোগ্যতম প্রার্থীকেই ভোট দিয়া থাকেন। স্বরাজ্যদল নূতন ব্যবস্থা করিয়া সেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে চাহিতেছেন। যে স্থলে বিরোধ ছিল না, তাঁহারা সে স্থলেও বিরোধ বাধাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যফলে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

বঙ্গদেশে কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে মুসলমান ভোটারদিগের সংখ্যা যৎসামান্য, যথা—

খাড়ারে	...	৩ জন
সোনামুখীতে	...	৫ "
চন্দ্রকোণায়	...	৭ "
উত্তরপাড়ায়	...	১০ "
ক্ষীরপাইতে	...	১১ "
হালিসহরে	...	১৩ "

বাঙ্গালায় ১ শত ১৬টি মিউনিসিপ্যালিটীর ৩৩টিতে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা ১ শতের কম।

এই সব মিউনিসিপ্যালিটীতে শতকরা ৪০ জন সদস্য কোথায় পাওয়া যাইবে?

সুখের বিষয়, কংগ্রেস বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের এই নির্দ্ধারণ বিচার করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

৬।—নিখিল ভারত প্যাক্ট—

লালা লজপত রায়ের কথায় আমরা যে জাতীয় প্যাক্টের

উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূল কথা পাঠকদিগকে জানাইয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।—

(১) স্বরাজ অর্থাৎ ভারতে ভারতবাসীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির অধিকারলাভই এই নির্দ্ধারণে স্বাক্ষরকারী-দিগের উদ্দেশ্য।

(২) স্বরাজ গণতন্ত্রমূলক হইবে।

(৩) হিন্দীই ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে।

(৪) সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।

(৫) পাছে কোন ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয়, সেই জন্য সরকারের তহবিলের টাকা কোন ধর্ম্মের বিস্তারাদির জন্য ব্যয়িত হইবে না।

(৬) স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকলেই তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন।

(৭) বর্ত্তমানে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতির যেরূপ অভাব, তাহাতে কিছু দিনের জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতে গঠিত সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিবেন।

(৮) হিন্দুদিগের মনে যাহাতে ব্যথা না লাগে, সেই জন্য মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করিবেন—ইদ পর্ব্ব ব্যতীত অন্য সময় গোহত্যা করিবেন না।

(৯) ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সেই জন্য স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানে গঠিত সমিতির নির্দ্ধারিত সময়ে ধর্ম্মায়তনের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ রাখা হইবে।

(১০) যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্পর্কিত শোভাযাত্রা একই সময়ে পড়ে, তবে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানে গঠিত সমিতি কাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

(১১) বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নিবারণ জন্য বা বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসাকল্পে প্রাদেশিক ও স্থানীয় মীমাংসাসমিতি গঠিত করা হইবে।

(১২) প্রাচ্যসভ্যতা ও প্রাচ্যজাতিসমূহের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের একটি সঙ্ঘ গঠিত করা হইবে।

বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের রচিত "প্যাক্টের" সহিত ইহার তুলনা করিলে কি ইহাই মনে হয় না, দলের প্রয়োজনে বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল ব্যবস্থা নির্দ্ধারণে একান্ত একদেশ-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন? দলের বলবৃদ্ধির আশায় তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জাতীয়তার পরিপন্থী। বিশেষ তাহাতে যোগ্যতার বর্জ্জন হওয়ায় তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লালা লজপত রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতারা বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের এই ব্যবস্থার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে সভায় ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে। এক দিকে হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ, আর এক দিকে রাজনীতিকদিগের পক্ষ হইতে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভায় এই ব্যবস্থার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল কি কংগ্রেসের বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের নির্দ্ধারিত এই ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবেন?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কুসুম-বাসর

বিমল-বসনা নিশি, নির্ম্মল অম্বর,
ফুল, পাতা, তরু, লতা, সোহাগে কহিছে কথা,
আদরে চন্দ্রমা চুমে কলিকা-অধর,
প্রমোদে প্রমদা হাসে প্রমত্ত অন্তর।

অনুরাগে তারা জাগে, পিক কুহু গায়,
ফুলবনে ফুলশর, সাধে বাঁধে করে কর,
বালিকা কলিকাহৃদি বিকাশে আশায়,
কিশোরী কিশোর হাসি—চোখে চোখে চায়।

প্রাণে প্রাণে বিনিময়, মনে বাঁধা মন,
মরমে মরম ঢাকা, মনোভাব মুখে আঁকা,
সরল চাতুরী মাখা সরাগ বদন,
বিমল হৃদয়ছবি—নয়ন দর্পণ।

মোহিত কুসুমশর কুসুম-বাসর,
নবপ্রেম অনুরাগে, প্রেমিক প্রেমিকা জাগে,
নবীন পিপাসা প্রাণে উঠে নিরন্তর,
সাধের মিলনে সুধা ঢাল সুধাকর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

স্বরাজ্যদলের মত প্রবল হইলে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা ৩১ কমিয়া যাইবে।

এই ২ জিলায় হিন্দুদিগের প্রতিনিধি-সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় কি হিন্দুদিগের প্রতি অবিচার করাই হইবে না?

তাহার পর যশোহরের কথা ধরা যাউক। যশোহরে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৩৮ ও মুসলমানের ৬১ হইলেও জিলা বোর্ডে প্রতিনিধির মধ্যে শতকরা ৮৩ জন হিন্দু ও ১৬ জন মুসলমান। বলা বাহুল্য, যোগ্যতার জন্যই অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান অধিক হইলেও প্রতিনিধি-দলে হিন্দুর প্রাবল্য, কিন্তু স্বরাজদলের মত যদি গৃহীত হয়, তবে সে অবস্থার পরির্ত্তবন হইবে—হিন্দুর পরিমাণ অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া যাইবে এবং মুসলমান প্রতিনিধির হার প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া যাইবে।

যশোহরের মত ঢাকায়ও অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য—হিন্দু ৩৪, মুসলমান ৬৫। কিন্তু ঢাকাতেও জিলা বোর্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৭২ জন হিন্দু ও ৭২ জন মাত্র মুসলমান।

যশোহরে ও ঢাকায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক —কাযেই এ কথা মনে করিতে পারা যায় যে, ভোটারদিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য। তথাপি সে ২ জিলায় জিলা বোর্ডে হিন্দু প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক কেন? বলা বাহুল্য, এই সব প্রতিনিধি মুসলমানদিগের ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন কেন? এ কথা নিশ্চয় যে, মুসলমানদিগের মধ্যে যোগ্য লোকের অভাব অনুভব করিয়া এবং হিন্দুদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকাতেই মুসলমানরা সে কায করিয়াছেন। অর্থাৎ যশোহর ও ঢাকার মত মুসলমানপ্রধান জিলাতেও মুসলমানরা যোগ্যতাহেতু হিন্দুদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া আসিতেছেন। আর স্বরাজ্যদল সে সব জিলায় কেবল মুসলমানের সংখ্যাধিক্য বলিয়া যোগ্যতার স্থানে সংখ্যাধিক্যকে প্রাধান্য প্রদান করিয়া স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছেন না।

সমগ্র প্রদেশের হিসাব ধরিলে দেখা যায়, অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৪৩ জন হিন্দু ও ৫৩ জন মুসলমান হইলেও—

(১) জিলা বাের্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৬৭ জন হিন্দু ও ৩৩ জন মুসলমান।

(২) লোকাল বোর্ডে প্রতিনিধিদিগের শতকরা ৬০ জন হিন্দু ও ৩৯ জন মুসলমান।

স্বরাজ্যদল কি কারণে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে চাহেন? সমগ্র বঙ্গদেশে যখন মুসলমানদিগেরই সংখ্যাধিক্য, তখন মুসলমানরা ইচ্ছা করিলে—উপযুক্ত হিন্দুকে উপেক্ষা করিয়া অনুপযুক্ত হইলেও মুসলমানকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, বিনা আইনে—বিনা "প্যাক্টে" বাঙ্গালার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যাধিক্য হয়।

তাহা যে হয় নাই, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এখনও মুসলমানরা স্বরাজ্যদলের দলাদলির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন নাই—তাঁহারা হিন্দু-মুসসমাননির্ব্বিশেষে অনেক স্থানে যোগ্যতম প্রার্থীকেই ভোট দিয়া থাকেন। স্বরাজ্যদল নূতন ব্যবস্থা করিয়া সেই স্বাভাবিক ও সঙ্গত অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে চাহিতেছেন। যে স্থলে বিরোধ ছিল না, তাঁহারা সে স্থলেও বিরোধ বাধাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যফলে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠিবে।

বঙ্গদেশে কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটীতে মুসলমান ভোটারদিগের সংখ্যা যৎসামান্য, যথা—

খাড়ারে	...	৩ জন
সোনামুখীতে	...	৫ "
চন্দ্রকোণায়	...	৭ "
উত্তরপাড়ায়	...	১০ "
ক্ষীরপাইতে	...	১১ "
হালিসহরে	...	১৩ "

বাঙ্গালায় ১ শত ১৬টি মিউনিসিপ্যালিটীর ৩৩টিতে মুসলমান ভোটারের সংখ্যা ১ শতের কম।

এই সব মিউনিসিপ্যালিটীতে শতকরা ৪০ জন সদস্য কোথায় পাওয়া যাইবে?

সুখের বিষয়, কংগ্রেস বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের এই নির্দ্ধারণ বিচার করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই।

৬।—নিখিল ভারত প্যাক্ট—

লালা লজপত রায়ের কথায় আমরা যে জাতীয় প্যাক্টের

উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূল কথা পাঠকদিগকে জানাইয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব।—

(১) স্বরাজ অর্থাৎ ভারতে ভারতবাসীর অন্যান্য স্বাধীন জাতির অধিকারলাভই এই নির্দ্ধারণে স্বাক্ষরকারী-দিগের উদ্দেশ্য।

(২) স্বরাজ গণতন্ত্রমূলক হইবে।

(৩) হিন্দীই ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে।

(৪) সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা প্রদান করা হইবে।

(৫) পাছে কোন ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হয়, সেই জন্য সরকারের তহবিলের টাকা কোন ধর্ম্মের বিস্তারাদির জন্য ব্যয়িত হইবে না।

(৬) স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সকলেই তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন।

(৭) বর্ত্তমানে সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সম্প্রীতির যেরূপ অভাব, তাহাতে কিছু দিনের জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতে গঠিত সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ব্যবস্থাপক সভায় স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার লাভ করিবেন।

(৮) হিন্দুদিগের মনে যাহাতে ব্যথা না লাগে, সেই জন্য মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করিবেন—ইদ পর্ব্ব ব্যতীত অন্য সময় গোহত্যা করিবেন না।

(৯) ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, সেই জন্য স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানে গঠিত সমিতির নির্দ্ধারিত সময়ে ধর্ম্মায়তনের সম্মুখে গীতবাদ্য বন্ধ রাখা হইবে।

(১০) যদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্পর্কিত শোভাযাত্রা একই সময়ে পড়ে, তবে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানে গঠিত সমিতি কাহারা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

(১১) বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ নিবারণ জন্য বা বিরোধ ঘটিলে তাহার মীমাংসাকল্পে প্রাদেশিক ও স্থানীয় মীমাংসাসমিতি গঠিত করা হইবে।

(১২) প্রাচ্যসভ্যতা ও প্রাচ্যজাতিসমূহের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য দেশসমূহের একটি সঙ্ঘ গঠিত করা হইবে।

বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের রচিত "প্যাক্‌টের" সহিত ইহার তুলনা করিলে কি ইহাই মনে হয় না, দলের প্রয়োজনে বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল ব্যবস্থা নির্দ্ধারণে একান্ত একদেশ-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন? দলের বলবৃদ্ধির আশায় তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জাতীয়তার পরিপন্থী। বিশেষ তাহাতে যোগ্যতার বর্জ্জন হওয়ায় তাহা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। লালা লজপত রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি নেতারা বাঙ্গালার স্বরাজ্যদলের এই ব্যবস্থার বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে সভায় ইহার প্রতিবাদ হইয়াছে। এক দিকে হিন্দুদিগের পক্ষ হইতে দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহ, আর এক দিকে রাজনীতিকদিগের পক্ষ হইতে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভায় এই ব্যবস্থার দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর বাঙ্গালার স্বরাজ্যদল কি কংগ্রেসের বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহাদের নির্দ্ধারিত এই ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবেন?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কুসুম-বাসর

বিমল-বসনা নিশি, নির্ম্মল অম্বর,
ফুল, পাতা, তরু, লতা, সোহাগে কহিছে কথা,
আদরে চন্দ্রমা চুমে কলিকা-অধর,
প্রমোদে প্রমদা হাসে প্রমত্ত অন্তর।

অনুরাগে তারা জাগে, পিক কুহু গায়,
ফুলমনে ফুলশর, সাধে বাঁধে করে কর,
বালিকা কলিকাহৃদি বিকাশে আশায়,
কিশোরী কিশোর হাসি—চোখে চোখে চায়।

প্রাণে প্রাণে বিনিময়, মনে বাঁধা মন,
মরমে মরম ঢাকা, মনোভাব মুখে আঁকা,
সরল চাতুরী মাখা সরাগ বদন,
বিমল হৃদয়ছবি—নয়ন দর্পণ।

মোহিত কুসুমশর কুসুম-বাসর,
নবপ্রেম অনুরাগে, প্রেমিক প্রেমিকা জাগে,
নবীন পিপাসা প্রাণে উঠে নিরন্তর,
সাধের মিলনে সুধা ঢাল সুধাকর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা

১

হিন্দু-মুসলমানের ভাব ও আড়ির সমস্যাটি আজকাল এত বিষম হয়ে উঠেছে যে, তার হাত হাত মীমাংসা করাটা নাকি আমাদের পক্ষে আশু কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এ মীমাংসা করতে হবে—এ মামলার বিচার না ক'রে। পলিটিসিয়ানদের মতে এ সমস্যার বিচার অকর্ত্তব্য। কেন না, এ সমস্যা বড় delicate, সুতরাং সকলে এ বিচার করতে পারে না; সুধু সেই ব্যক্তিই পারে, যে ঠুনকো জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে—যার কোমল করস্পর্শে কোন জিনিষই ভাঙ্গে না। অতি হিসেব ক'রে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে, আট আনা সত্য গোপন ক'রে, বাকী আট আনা অতি কৌশলে ঢেকেঢুকে প্রকাশ করবার, অতি প্রিয় ক'রে মিথ্যা কথা বলবার ক্ষমতা যার আছে, সে-ই কেবল delicate questionএর আলোচনা করতে পারে। এ হেন হাতসাফাই লেখক অ-পলিটিকাল লেখকদের মধ্যেও লাখে এক আধ জনের মধ্যে পাওয়া যায়! আর সাহিত্যিকদের মধ্যে ত মোটেই পাওয়া যায় না। সাহিত্য মানে যে বেফাঁস কথা—তা কে না জানে? সুতরাং আমরা এ সমস্যার আলোচনা করতে বসলে লোক ভয় পায় যে, আমরা হিতে বিপরীত ক'রে বসব। অতএব চার ধার থেকে বিজ্ঞলোক বলছে—"চুপ" "চুপ" "চুপ।"

আমি কলম ধ'রে অবধি বিজ্ঞলোকের তাড়া খেয়ে খেয়ে এই জ্ঞানলাভ করেছি যে, বিজ্ঞতার শাসন মানতে গেলে কোন কথাই বলা হয় না। সেই সঙ্গে এ সত্যও আবিষ্কার করেছি যে, বিজ্ঞলোকের শাসন মানবার কোনও কারণ নেই। কেন না, বিজ্ঞতা জিনিষটে হচ্ছে আসলে ভয়কুণ্ঠা। সত্যকথা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীতে কোন সমস্যাই delicate নয়, আসলে একমাত্র delicate জিনিষ হচ্ছে মানুষের মন। এমন সুকুমারমতি লোক অনেক আছেন, যাঁদের মন সত্যের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না, যাঁরা সত্যকথা শুনলে কানে হাত দেওয়ার চাইতে আগে-ভাগে অপরের মুখে হাত দেওয়াটা ঢের বেশী শ্রেয়ঃ মনে করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সত্য জিনিষটেকে একেবারে চাপা দেওয়া যায় না। আজ তাকে চেপে দিলে কা'ল সে আমাদের গলা চেপে ধরে। হিন্দু-মুসলমানের কৃত্রিম সদ্ভাব গড়বার চেষ্টায় যে সুধু অসদ্ভাব গড়া হয়েছে, এ সত্য ত আজ প্রত্যক্ষ।

২

হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা যে অতি delicate, এ কথা না মানলেও এ বিষয়ে বিচার করবার আর এক বাধা আছে। বিনা বিচারে যাঁরা এ বিষয়ে একটা ঘরাও মীমাংসা ক'রে ব'সে আছেন, তাঁরা বলছেন যে, আমাদের সে মীমাংসা সম্বন্ধে কোনরূপ কথা কইবার অধিকার নেই। আজ তিন চার দিন হ'ল, Forward পত্রিকার মারফৎ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু আদেশ করেছেন যে, তাঁদের দলের প্যাক্টের চাইতে যারা ভাল প্যাক্ট পকেট থেকে বার করতে না পারে, তাদের উক্ত প্যাক্ট সম্বন্ধে মুখ খোলবার এক্তিয়ার নেই। প্রথমতঃ ওরূপ সমালোচনা হচ্ছে সুধু destructive criticism, বিজয় বাবু চান—constructive জিনিষ; দ্বিতীয়তঃ ওরূপ criticismয়ে তাঁর life intolerable হয়ে ওঠে। Destructive criticism যে অসহ্য, এ কথা ব্যুরোক্রেশীর মুখে জ্ঞান হয়ে অবধি শুনে আসছি, ফলে ওরূপ ব্যুরোক্রেটিক ধমক শুনে আমরা কাতর হয়ে পড়িনে। তবে তাতে যে বিজয় বাবুর life intolerable হয়, এটা অবশ্য অতিশয় দুঃখের কথা। বিজয় বাবু যদি উক্ত প্যাক্টের নীচে এই মর্ম্মে একটি নোট লিখে দিতেন যে, "এ প্যাক্টের কেউ যেন সমালোচনা না করে, তাতে প্যাক্ট-কর্ত্তাদের কোমল হৃদয়ে অতি ব্যথা লাগবে," তা হ'লে হয় ত আমরা নিরস্ত হতুম। তবে একটা কথা বিজয় বাবুর কাছে নিবেদন করতে বাধ্য হচ্ছি। ধরুন, যদি তিনি 'স্বরাজ্য-বিজয়কাব্য' নামক একখানি মহাকাব্য কা'ল লিখে বসেন, আর তার যদি বানান, ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ আগাগোড়া ভুল হয়, আর সমগ্র কাব্যখানি একটি ভীষণ হ-য-ব-র-ল হয়, তা হ'লে সে কথা বলবার অধিকার কি

কোন লোকের থাকবে না? আর আমাদের কি তার পিঠ পিঠ এক একখানি উক্ত নমুনার 'স্বরাজ্য-বিজয় কাব্য' লিখতে হবে? ধরুন, যদি বিজয় বাবুর হুকুমে তাই আমরা ক'রে বসি—তা হ'লে সেই সব মহাকাব্যের ঠেলায় দেশের লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে কি না? আর বহু লোকের জীবন যাতে অতিষ্ঠ না হয়, তার জন্য একের life intolerable করতে আমরা বাধ্য। বিজয় বাবু আমাকে মাপ করবেন। দেশের লোককে এই সব ব্যুরোক্রেটিক ধমক দেবার অধিকার তাঁর আজও জন্মায় নি। আজও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং তিনি ও তাঁহার দলবল আজও আমাদের দেহ-মনের শাসনকর্ত্তা হয়ে উঠেন নি। আর একটি কথা, স্বরাজ্যদলের দলপতি স্বয়ং চিত্তরঞ্জন দাশ ত বলেছেন যে, ও প্যাক্টের প্রকাশের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওর criticism শোনা।

৩

যে সমস্যার কোনও আশু মীমাংসাকে লোক আশু গ্রাহ্য না করলে মীমাংসকের দল পালায় পালায়—পুরুষালি রাগ ও মেয়েলি অভিমানের কমিক অভিনয় করেন, সেটি যে অতি ট্রাজিক ব্যাপার, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় হিন্দু-মুসলমানের গোল যারা চুক্তি ক'রে চুকিয়ে দিতে পারে না, তাদের পক্ষে গোলটার কারণ কি বুঝে দেখবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মীমাংসা শিকায় তোলা থাক্, আপাততঃ সমস্যাটা কি, তাই দেখা যাক। যখন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মেটাবার কথাটাই আমাদের পলিটিক্সের সব চাইতে বড় কথা হয়ে উঠেছে, তখন এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ যে ঘটেছে, সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু এই বিরোধ জন্মালো কোথা থেকে?

এখন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। আমরা উভয়েই ত আজকের দিনে সমবস্থ। বৃটিশ রাজ্যে আমরা সুখে থাকি, দুঃখে থাকি—হিন্দু-মুসলমান সকলেই আছি সমান সুখে নয় সমান দুঃখে। ইংরাজরাজের ত ভারতবর্ষের সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি। দুটো চারটে factএর সাহায্যে দেখা যাক, কথাটা ঠিক কি না।

৪

ইংরাজের—আইন ত হিন্দু-মুসলমানে কোনও প্রভেদ করে না। আমিও চুরি করলে জেলে যাব, আমার বন্ধু মহম্মদ আলীও চুরি করলে জেলে যাবেন। অবশ্য, যদি আমাদের চুরি আদালতে প্রমাণ হয়। আর আদালতে যদি প্রমাণ না হয় ত আমরা দুজনেই বে-কসুর খালাস পাব, তা আমরা পরের যত দ্রব্য না ব'লে নিই না কেন। Penal Code, Evidence Act ও Criminal Procedure Code. ধর্ম্ম মানে না। আমরা আপোষে যা খুসী তাই contract করি না কেন—ও তিনের হাত থেকে contract out করতে পারব না,—এ রাজ্যেও নয়, স্বরাজ্যেও নয়। এখন ফৌজদারী আদালত ছেড়ে দেওয়ানী আদালতে যাওয়া যাক্। আমি যদি শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলীর কাছ থেকে টাকা ধার ক'রে থাকি, তা হ'লে সে টাকা মায় সুদ তাঁকে ফিরে দিতে দেওয়ানী আদালত হুকুম দেবে; আর বন্ধুবর যদি আমার কাছে টাকা ধার নিয়ে থাকেন ত তাঁহার নামে নালিশ করলে আমিও তাঁর বিরুদ্ধে মায় সুদ সে টাকার ডিক্রী পাব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ব'লে তিনি সুদের দায় থেকে অব্যাহতি পাবেন না। মুসলমানের ধর্ম্মে সুদ নেওয়া নিষিদ্ধ, এ আপত্তি সে আদালতে টিঁকবে না। জজ বলবেন যে, মুসলমানের পক্ষে সুদ নেওয়া না নেওয়া তার এক্তিয়ার, কিন্তু তাকে তা দিতে হবে। আর সে সুদ তাকে পেয়াদায় দেওয়াবে।

অর্থাৎ কি ফৌজদারী কি দেওয়ানী আদালতে হিন্দু-মুসলমান খালি মানুষ বলেই গ্রাহ্য হয়। আইনের চোখে টিকি-দাড়ীর কোনও প্রভেদ নেই।

৫

তার পর টেক্স আমরা সকলেই দিই এবং এক হারে দিই। নুণের উপর টেক্স বসলে হিন্দুর নুণও আক্রা হয়, মুসলমানের নুণও আক্রা হয়। পোষ্টকার্ডের দাম দ্বিগুণ হ'লে, হিন্দুকেও এক পয়সার পোষ্টকার্ড দু' পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, মুসলমানকেও ঠিক সেই দামে। নেশাও আমাদের মধ্যে কেউ কারও চাইতে সস্তায় করতে পারে না। গভর্ণমেণ্টের একচেটে মাল, আফিম মদ গাঁজা প্রভৃতি সবই

আমাদের একদরে কিনতে হয়। তার পর জমীদারের খাজনাও রায়তকে এক হারে দিতে হয়। হিন্দু জমীদারও হিন্দু প্রজাকে কম নিরিখে জমী পত্তন করেন না, আর মুসলমান জমীদারও মুসলমান প্রজাকে জমী কম খাজনায় দেন না। প্রজা হচ্ছে জমীদারের সন্তান—আর প্রজার প্রতি জমীদারমাত্রেরই স্নেহ সমান। তাঁরা বলেন, তাঁদের কাছে হাতের পাঁচটি আঙ্গুলই সমান। প্রজা যদি খাজানা না দিতে পারে ত জমীদার হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিচারে তার নামে বাকী পড়ার নালিশ ক'রে—তার ভিটেমাটী উচ্ছন্নে দেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিতা নেই। যথা জমীদার, তথা মহাজন। হিন্দু-মুসলমান খাতকের কাছ থেকে তাঁরা সমান হারে সুদ আদায় করেন।

৬

তার পর ইকনমিক্স-ক্ষেত্রে আসা যাক। এ ক্ষেত্রেও ত হিন্দুর এমন কোন অধিকার নেই, যাতে মুসলমান বঞ্চিত; আর মুসলমানেরও এমন কোন অধিকার নেই, যাতে হিন্দু বঞ্চিত। ধান ও পাট হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই বাজার দরে বেচতে হয় আর কাপড় উভয়কেই বাজার দরে কিনতে হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার ধুতি বেচে দেশের টাকা লুটে নিলে, এ কথা যদি সত্য হয় ত, সে টাকা হিন্দুর পকেট থেকেও যায়, মুসলমানের পকেট থেকেও যায়। ম্যাঞ্চেষ্টার ত খদ্দেরের ধর্ম্মের খোঁজ নেয় না। যাকে বলে বাণিজ্য ওরফে Commerce, তার সকল পথ—সকলের পক্ষে সমান খোলা। বড়বাজারে সুধু মাড়োয়ারী পয়সা কামায় না, কচ্ছি-সুরতি অনেক জাতের মুসলমানও কামায়। আর এ উভয় জাতই ক্ষণে লাখপতি ক্ষণে দেউলে হয় এবং তা একই কারণে। বিলেত থেকে মাল আমদানী দু'জনেই করে আর ভারতবর্ষ থেকে মাল—রপ্তানী দু'জনেই করে। কলের ও রেলের কুলী-গিরি করলে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই সমান মাইনে পায়। আর মাইনে বাড়াতে হিন্দুরও যে স্বার্থ, মুসলমানেরও সেই স্বার্থ। হিন্দু মুসলমানের এ ক্ষেত্রে communal interest এক, যেমন হিন্দু-মুসলমান সকল রায়তের communal interest এক। কেন না, না খেতে পেলে হিন্দুও মরে, মুসলমানও মরে, আর সম্ভবতঃ ম'রে দু'জনেই এক যায়গায় যায়—অর্থাৎ পঞ্চভূতে মিলিয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, ইকনমিক্সের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলমানের বাঁচবার ও মরবার অধিকার সমান।

৭

তার পর একেলে গবর্ণমেণ্টের হাতে কতকগুলি জিনিষ এসে পড়েছে যা পৃথিবীর কোন দেশেই সে কালে ছিল না, যথা—education ও sanitation, ভাষায় যাকে বলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এখন অন্ততঃ বাঙ্গলায় অধিকাংশ লোকের শিক্ষাও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। হিন্দু-মুসলমান-নির্বিচারে জনগণ সমান নিরক্ষর। আর লোকশিক্ষার দেশে যে অকিঞ্চিৎকর ব্যবস্থা আছে, তা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই জন্য এক। প্রাইমারি স্কুলের দ্বার অবারিত; যে খুসী সে সেখানে ঢুকতে পারে আর যখন খুসী তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তার পর আসে কলেজ। যে ম্যাট্রিক পাস করে, সে-ই সেখানে পড়্তে পারে। যে ম্যাট্রিক পাস করতে পারে না, সে সেখানে ঢুকতে পারে না। হিন্দুর ছেলেও ফেল হয়, মুসলমানের ছেলেও ফেল হয়। হিন্দুর ছেলে যদি দুয়ের সঙ্গে দুই যোগ দিয়ে পাঁচ করে ও মুসলমানের ছেলে যদি তিন করে, তা হ'লে তারা দুজনেই সমান নম্বর পায়—একশর ভিতর শূন্য। এই পাস-ফেলের কথাটা communal interestএর একটা বড় কথা হয়েছে; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে, এটা সাম্প্রদায়িক হিসাবের মধ্যে আসেই না। এ প্রস্তাব অদ্যাবধি কোন পলিটিসিয়ান করেন নি যে,লোক-সংখ্যার হিসেব থেকে ইউনিভারসিটির পরীক্ষার শতকরা ৫৫ জন মুসলমানকে পাস করতে হবে ও শতকরা ৫৫ জন হিন্দুকে ফেল করতে হবে। স্বরাজ্যেও এ নিয়ম চলবে না; কেন না, স্বরাজ্য আর যাই হোক, আশা করি, পাগলা-গারদ হবে না। তার পর sanitationএর কথা ধরা যাক। ম্যালেরিয়া কারও ধর্ম্ম মানে না। আর কালাজ্বর হ'লে হিন্দুর ও মুসলমানের পিলে মাপে সমান বড় হয়। আর যদি চিকিৎসার জন্ম হাঁসপাতালে কেউ যায়, তা হ'লে হিন্দুকেও দিন আট আনা জরিমানা দিতে হ'ত, মুসলমানকেও তাই। আর জেলে গেলেও হিন্দুকেও লাপ্সি খেতে হয়, মুসলমান-কেও লাপ্সি খেতে হয়। আর পুলিস দু'জনকেই সমান পেটে।

৮

মানুষের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক—আইন নিয়ে, টেক্স নিয়ে, কারবার নিয়ে, রোজগার নিয়ে, জেল নিয়ে, পুলিস নিয়ে, শিক্ষা নিয়ে, স্বাস্থ্য নিয়ে। আর এ সকল বিষয়েই ত হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। সুতরাং এ সব স্থলে ত বিরোধের কোনই কারণ নেই। আমরা পলিটিকালি সবাই ত এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি; সুতরাং পলিটিক্সের ক্ষেত্রে যদি আমাদের বিরোধ ঘটে, তা হ'লে সেটা প্রকৃত নয়, সম্পূর্ণ কৃত্রিম।

আর যদি কেউ বলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কারণ—হিন্দুর ধর্ম্ম এক আর মুসলমানের ধর্ম্ম আলাদা অর্থাৎ এ বিরোধের কারণ দৈহিক নয়, মানসিক; ঐহিক নয়, পারত্রিক। তা হ'লে এ বিবোধের কখনই ত মীমাংসা হবে না, কেন না, হ'তে পারে না। ভারতবর্ষের মুসলমানও সব কখনও হিন্দু হয়ে যাবে না ও হিন্দুও সব কখনও মুসলমান হয়ে যাবে না। এ কথা হিন্দুও জানে, মুসলমানও জানে এবং আশা করি, যাঁরা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় করতে চান, তাঁরাও জানেন। স্বরাজ্যের লোভে মানুষ তার স্বধর্ম্ম ছাড়বে না।

আমাদের সকলের ধর্ম্ম এক নয় ব'লে আমাদের সকলের পলিটিক্স এক হবার কি কোনও বাধা আছে? ইংরাজরাজ ত ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান উদাসীন। গবর্ণমেণ্ট মন্দির গড়বার জন্তও এক পয়সা দেয় না, মসজেদ্ গড়বার জন্তও নয়। অপর পক্ষে, রাস্তার জন্ত কিংবা রেলের জন্ত দরকার হ'লে মন্দির ভাঙ্গতে সদাই প্রস্তুত এবং মসজেদ্ ভাঙ্গতে কখনও কখনও। তার পর গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকেও মাসহারা দেয় না, মৌলবীকেও নয়; উভয়কেই দেন সুধু টাইটেল,—ব্রাহ্মণকে মহামহোপাধ্যায়, মুসলমানকে শ্সাম-শুল-উলেমা। দরগায় বাতি ও মন্দিরে ধুপ প্রজাকে নিজের খরচায় দিতে হয়। সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে আমরা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত।

দেখতে পাই, ধর্ম্মের দু'টি একটি ক্রিয়াকলাপ নিয়েই হিন্দু-মুসলমানে কাজিয়া বাধে। হিন্দু তার পূজাপার্ব্বণে সজোরে ঘণ্টা নাড়ে, ঢাক পেটে ও ভেঁপু বাজায়। এ ব্যাপারকে হিন্দুরা বলে সঙ্গীত ও মুসলমানরা বলে গোলমাল। এ বিষয়ে আমি মুসলমানদের সঙ্গে একমত। মৌলানা মহম্মদ আলী বলেছেন যে, হিন্দুরা যদি মসজেদের সুমুখে বাজনা একটু আস্তে বাজায়, তা হ'লে ত সব গোল চুকে যায়। এ প্রস্তাবে আশা করি, কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান আপত্তি করবেন না। চৈতন্যদেবের শিষ্যরা যখন নবদ্বীপে সংকীর্ত্তনের ধুম চালান, তখন খোল-করতালের চোটে সেখানকার ব্রাহ্মণপণ্ডিতরা অস্থির হয়ে উঠে বৈষ্ণবদিগকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, গান এত চেঁচিয়ে গাইবার, বাজনা এত জোরে বাজাবার প্রয়োজন কি? ভগবান্ কি কালা? সুতরাং এ প্রশ্ন আজ যদি মুসলমানরা জিজ্ঞাসা করে, হিন্দুর পক্ষ থেকে তার কোনও জবাব নেই। তার পর আসে গো-বধের কথা। এইটিই হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোড়ার কথা ও শেষ কথা এবং এইটিই হচ্ছে এ সমস্যার একমাত্র delicate question এবং এ সমস্যার একটা আপোষ মীমাংসা যত সত্বর হয়, ততই ভাল। যদি প্যাক্ট ক'রে এ গোল চুকিয়ে দিতে পারা যায়, তা হ'লে সে প্যাক্টকে আমি ফুল-চন্দন দিয়ে পূজা করতে প্রস্তুত। তবে একটি কথা বলি, আমাদের জাতীয় সকল নির্ব্বুদ্ধিতা গরুর ঘাড়ে চাপালে সে বেচারার প্রতি একটু অন্যায় করা হয়। আর গরু নিয়ে মারামারি করাটা হিন্দু-মুসলমানের পক্ষে যে অতি বুদ্ধির কায, আশা করি, কি হিন্দু কি মুসলমান কোন পলিটিসিয়ানই তা' বলবেন না। আজতক্ কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের ভিতর কোন বকরিদ riot ঘটে নি। এই থেকে বুঝা যায় যে, এ হাঙ্গাম দুর করবার উপায় হচ্ছে—পলিটিকাল প্যাক্ট নয়,—শিক্ষা।

৯

উপরি-উক্ত কারণে বুঝা যায়, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আসলে কোনও পলিটিকাল কারণ নেই। ধর্ম্মের প্রভেদ অনুসারে এ দেশে বৃটিশ যুগে কোনও পলিটিকাল প্রভেদ জন্মায় নি। য়ুরোপে ধর্ম্মের পার্থক্যের উপর বহুকাল যাবৎ পলিটিকাল অধিকারের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহুদী ও খৃষ্টান, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট সমান অধিকার সে দেশে সে দিন মাত্র পেয়েছে, তাও আবার অনেক মারামারি অনেক কাটাকাটির পর। আর এ দেশে বৃটিশরাজ যে প্রথম থেকেই আমাদের অনেক বিষয়ে সমান অধিকার দিয়েছেন আর অনেক অধিকার সম্বন্ধে সমান বঞ্চিত ক'রে রেখেছেন, তার কারণ হিন্দুও ইংরাজের স্বজাতি নয়, মুসলমানও

নয়। তার পর ইংরাজের ধর্ম্ম বেদের ধর্ম্মও নয়, কোরাণের ধর্ম্মও নয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান অসদ্ভাবের কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। অর্থাৎ বর্ত্তমান ছেড়ে এর মূল ভূত ও ভবিষ্যৎ খুঁজতে হবে।

মৌলানা মহম্মদ আলী সে দিন কোকনদ কংগ্রেসে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্মকথা ও ইতিহাস সকলকে শুনিয়ে দিয়েছেন। সে ইতিহাস মোটামুটি সত্য, কিন্তু তার ভিতর তিনি অনেক কথা উহ্য রেখে গেছেন। আমি তাঁর লিখিত ইতিহাস অবলম্বন ক'রে ও তার ফাঁকগুলো পুরিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব তার পুনরাবৃত্তি করছি। কেন না, এই ইতিহাসের আলোকে সমস্যাটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসবে।

সার সৈয়দ আহম্মদ যে এ বিরোধের সৃষ্টিকর্ত্তা, এ কথা মৌলানা মহম্মদ আলী স্বীকার করেছেন। সুতরাং কি উদ্দেশ্যে তিনি এ বিরোধের সূত্রপাত করতে ও তার প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার সন্ধান নেওয়া যাক। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর বড় জোর শতকরা দশ জন মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশীদের বংশধর, বাকী নব্বই জন পুরো ভারতবর্ষীয়। এই স্বল্পসংখ্যক মুসলমান "রইশ"দের অধিকাংশের বাসস্থান হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইংরাজরাজ ও প্রদেশের লোককে যে ভীষণ শাস্তি দেন, তার বেশীর ভাগ শাস্তি মুসলমান সম্প্রদায়কেই ভোগ করতে হয়, ফলে ও প্রদেশের মুসলমান aristocracy নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে পড়েছিল। সার সৈয়দ আহম্মদ উক্ত সম্প্রদায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পেই আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই সত্য আবিষ্কার করেন যে, ইংরাজী জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হ'লে, তাঁর সম্প্রদায় আর ভারতবর্ষে মাথা তুলতে পারবে না। স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতির তিনি মূলমন্ত্র ধরেছিলেন শিক্ষা, এবং তিনি বহু পরিশ্রমে বহু বাধা অতিক্রম ক'রে মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করবার ব্যবস্থা করতে কৃতকার্য্য হন। এ বিষয়ে তাঁর প্রধান প্রতিবাদী ছিল—তাঁর স্ব-সম্প্রদায়। ইংরাজী শিক্ষা লাভ করলে তাঁদের ছেলেরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে, এই ছিল orthodox মুসলমানদের বিশ্বাস এবং এ বিশ্বাস তাঁদের মনে এতটা বদ্ধমূল ছিল যে, তাঁরা সার সৈয়দকে ধর্ম্মদ্রোহী নাস্তিক আখ্যা দিয়েছিলেন—যেমন রাজা রামমোহন রায়কে একশ বৎসর আগে বাঙ্গালায় হিন্দু orthodox সম্প্রদায় দিয়েছিল। জনৈক ফরাসী লেখক বলেছেন যে, সার সৈয়দ আমেদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল তিনটি জিনিষ এবং সে তিনটি হচ্ছে education, loyalty এবং opposition to the Hindus। তিনি যে শিক্ষা স্ব-সম্প্রদায়কে দিতে চেয়েছিলেন, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানকে ইংরাজের প্রতি loyal করা। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের Lt. Governor Sir John Stracheyকে তিনি যে address দেন, তাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন যে, মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাদের প্রধানতঃ loyal করা এবং সেই সঙ্গে to advance our proper national interest. তার পর Sir Wilfrid Bluntএর সংবর্দ্ধনায় তিনি বলেন যে :—

"আমরা ও ইংরাজরা এই দুই দল একখানি কাঁচির দুখানি blade এর মত পরস্পর সংযুক্ত। আমাদের আন্তরিক বাসনা এই যে, বৃটিশ রাজত্ব শুধু বহুকালের জন্য নয়, চিরকালের জন্য এ দেশে অক্ষুণ্ণ থাক্।"

এই সব কথাই যথেষ্ট প্রমাণ যে, সার সৈয়দ আমেদ আজকের দিনে যাকে আমরা বলি মুসলমান communal interest, তাকে মুসলমান national interest বলতেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ইংরাজের আসন এখানে অটল হ'লেই মুসলমানদের national interest বজায় থাক্‌বে। মহম্মদ আলী বলেছেন যে, সার সৈয়দ আমেদের এ মত কালোপযোগী ছিল। এ কথা আমিও স্বীকার করি। সিপাহীবিদ্রোহের ফলাফল তিনি স্বয়ং দেখেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে সাম্প্রদায়িক আত্মরক্ষার জন্য loyal হওয়া শুধু স্বাভাবিক নয়,অতি সুবিবেচনার কায হয়েছিল। তিনি এ পথ অবলম্বন না করলে মুসলমান educationএর কথাটাও চাপা প'ড়ে যেত। এইটুকু মাত্র তাঁর ভুল হয়েছিল যে, ইংরাজের স্বার্থ ও মুসলমানের স্বার্থ এক। ইংরাজ ও মুসলমান যে একই কাঁচির দু'টি ফলক, এই ধারণাই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের গোড়ার কথা। হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়কে একটি কাঁচির দুটি ফলক স্বীকার করলে আমাদের পলিটিকাল বাঁধন দড়ি কাটবার হয় ত একটু সুবিধা হ'ত।

মুসলমানের মনে ইংরাজের সঙ্গে তাঁদের ঐক্যের ধারণা জন্মাবামাত্র হিন্দুর মঙ্গে অনৈক্যের ধারণাও তাঁদের মনে জন্ম লাভ করলে। আর যখন শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যুরোক্রেশীর মনান্তর ঘটল, তখন থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সৃষ্টি হ'ল। অর্থাৎ National Cognressএর জন্মের পিঠে পিঠে সার সৈয়দ আমেদ তার ধ্বংসকল্পে এক Patriotic Association গ'ড়ে বসলেন। এ Associationএ অবশ্য হিন্দুও ছিলেন। সার সৈয়দ আমেদ ও কাশীনরেশের ভিতর একটা পেট্রিয়টিক প্যাক্ট হ'ল। কিন্তু এ Association বহুদিন টিক্‌ল না, কেন না, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অনতিবিলম্বে আবিষ্কার করলেন যে, আলিগড়ের কলেজের প্রিন্সিপল The o dore Beck তাঁদের উভয়কেই নাচাচ্ছেন, তাঁরা কেবল ইংরাজের হাতের পুতুলমাত্র। মৌলানা মহম্মদ আলী সার সৈয়দ আমেদের এ কালের দুটি বক্তৃতার নাম উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সে বক্তৃতায় কি বলা হয়েছিল, তার উল্লেখ করেন নি—এই ভয়ে যে, সে সব পুরোনো কথায় হিন্দুর মনে ব্যথা লাগবে। কিন্তু এ ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। হিন্দুর মনে কিছুতেই ব্যথা লাগে না। ভাষায় বলে, পেটে খেলে পিঠে সয়; কিন্তু হিন্দুর পেটে না খেলেও পিঠে সয়। তবে সে বক্তৃতার কথা না তুলে মহম্মদ আলী ভালই করেছেন। কেন না খুব সম্ভবতঃ সে বক্তৃতা তাঁর লেখা নয়, ইংরাজের লেখা। সার সৈয়দ আমেদ ইংরাজী অতি কম জানতেন. কিন্তু লিখতেন ঠিক ইংরাজের মত। আর সেকালের কংগ্রেস-বিরোধী অনেক রাজা মহারাজরা ইংরাজী এক বর্ণও জানতেন না, অথচ Nineteenth Centuryতে অতি চমৎকার ইংরাজীতে—অতি বড় বড় প্রবন্ধ লিখতেন। এই থেকেই এ সব বক্তৃতারও এ সব লেখার বক্তা ও লেখকদের চেনা যায়। যদি জিজ্ঞাসা করেন, ব্যুরোক্রেশীর এতে কি স্বার্থ? তার উত্তর স্বয়ং Sir John Stracheyই দিয়েছেন। ভারতবর্ষের উপর তিনি যে বই লিখেছেন, তাতে তিনি খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। তাঁর কথা এই:—"মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কোন পলিটিকাল বিপদ ঘটবার আশঙ্কা নাই। কারণ,মুসলমানরা খৃষ্টানদের অপেক্ষা পৌত্তলিক হিন্দুদের শতগুণ বেশী ঘৃণা করে। পাশাপাশি এই দুই বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় থাকাটা ভারতবর্ষে আমাদের রাজত্বের প্রধান ভিত্তি।"—সেকালে মুসলমানের communal interest ছিল একমাত্র গভর্ণমেণ্টের চাকরী পাওয়া, তার পর হয়েছে communal representation এবং এ দুই interestএর উদ্ভাবন করেছেন ব্যুরোক্রেশী। এ দুই সম্প্রদায়কে এই ভাবে পৃথক ক'রে দিলে Indian N tionalismকে যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করা যায়, এই হচ্ছে এর গোড়ার কথা ও শেষ কথা। যারা রাজশক্তির dyarchy নষ্ট করতে উদ্যত, তারা প্রজাশক্তির এই dyarchy'র বনেদ পাকা করতে এত ব্যস্ত কেন বোঝা অসম্ভব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ

সুপণ্ডিত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ পরলোক গমন করিয়াছেন। নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত ঘোষ-কাম্‌তা নামক গ্রামে সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও তাঁহার বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বয়ং ব্রাহ্মণের পবিত্র জীবন যাত্রার প্রণালী নিষ্ঠা সহকারে পালন করিতেন। জীবনে তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন নাই। সিদ্ধান্তভূষণ
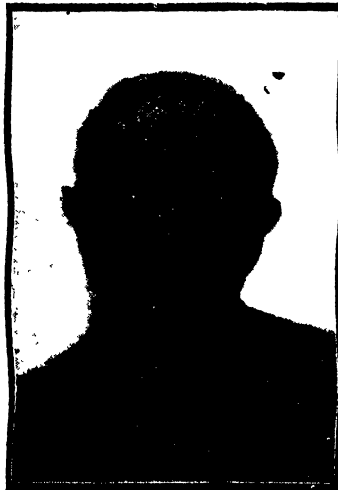
জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

মহোদয় দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু পরিশ্রম সহকারে 'মহাভারতের বৃহৎ সূচী' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি 'উড়ো জাহাজ' 'ডুবো জাহাজ' প্রভৃতির অস্তিত্ব মহাভারতের যুগে ছিল. তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আরও একটি বৃহৎ কীর্ত্তি "নিত্যকৃত্য শিক্ষা"। এই গ্রন্থখানিতে তিনি গৃহস্থের করণীয় যাবতীয় কার্য্যপদ্ধতির শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর্য্য-স্ত্রীশিক্ষা নামক আর একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

কলিকাতা প্রদর্শনী
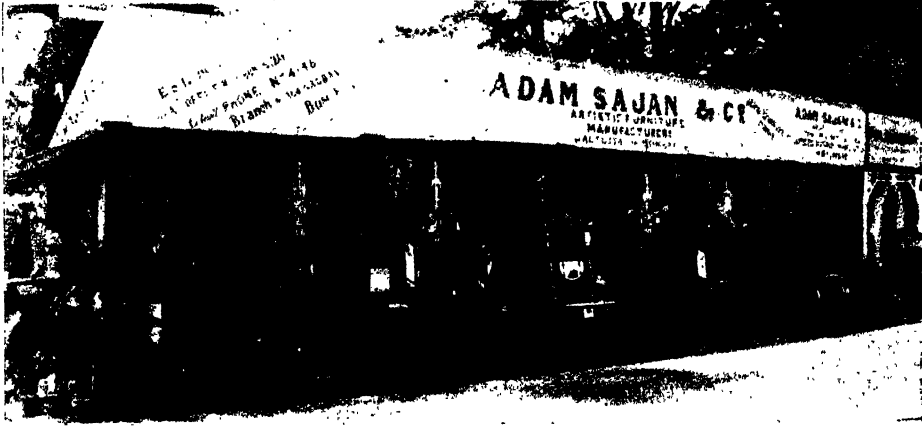
আদাম সাজান এণ্ড কোম্পানীর সুসজ্জিত আসবাবের দোকান।

সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে বিলাতে যে সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী বসিতেছে, তাহারই আয়োজনে কলিকাতায় একটি প্রদর্শনী হইয়াছে। ইহা প্রাদেশিক অনুষ্ঠান। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর ইচ্ছামত যে সব জিনিষ বিলাতী প্রদর্শ-নীতে লইয়া যাওয়া হইবে,এই সব প্রাদেশিক প্রদর্শনী তাহারই বাছাইয়ের জন্য। এ প্রদর্শনী ভারতের বা ভারতবাসীর জন্য নহে।

এহেন প্রদর্শনীতে ভারতের স্বার্থ কতটুকু, তাহা ভারতবাসী অনেকে না জানিলেও বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর ভাল করিয়াই জানা আছে। আর জানেন, দেশের প্রকৃত মঙ্গলকামী নেতৃবৃন্দ। যে সাম্রাজ্যে ভারতবাসীর অবস্থা অস্পৃশ্য অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে, যে সাম্রাজ্যে ভারতবাসীকে লাঞ্ছনা-নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা করিবার শত চেষ্টা বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীরই জন্য পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতেছে, সেই সাম্রাজ্যের প্রদর্শনীর জন্য ভারতের আহ্বান! সে আহ্বানে দেশের সকল স্থানেই লোক ঘৃণায় লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু আহ্বান যে প্রবল-পরাক্রান্ত বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীর। আর, সে আহ্বান ত দেশবাসীর স্বাধীন মতামত জানিবার জন্য নহে,—যেন ভৃত্যের প্রতি প্রভুর আহ্বানের মত। সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারের নাই। তাই তাঁহাদিগকে ভারতের স্বার্থ, তথা দেশবাসীর মতামত পদদলিত করিয়া বৃটিশ ব্যুরোক্রেশীরই মান রাখিতে হইয়াছে।

এমন দিন ভারতের এক সময় ছিল, যে সময় সে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন—সমগ্র সভ্য জগতের সম্মুখে—জগতের পণ্যশালায় আপনার শিল্প-সম্ভার প্রদর্শনী করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইতে পারিত। সে দিন ভারতের পণ্য জগতের প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করিতে পারিত, ভারতীয় শিল্পীর শিল্প-রচনা-কৌশলে সে দিন জগদ্বাসী মুগ্ধ হইত। ভারতের সে গৌরব-কাহিনী এখন অতীতের বস্তু। তথাপি ভারতকে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহার শিল্প ও কৃষি-বাণিজ্যের পরিচয় বৃটিশ সাম্রাজ্যকে প্রদর্শন করিতেই হইবে। ভারত এখন সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশের সহিত সমকক্ষতা করিতে অধিকারী বা ইচ্ছুক না থাকিলেও সাম্রাজ্যের প্রয়োজন তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে,—তা' সে জন্য তাহার ব্যয়-বাহুল্য-পীড়িত রাজকোষ হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেই হউক,
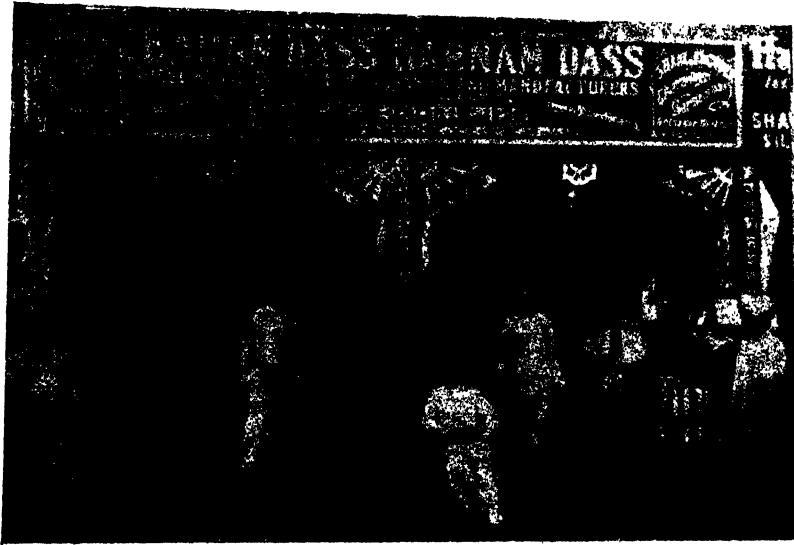
চরণদাস হরনামদাসের প্রদর্শিত বহুমূল্য শালের দোকান।

নিজেদের সুবিধার সন্ধান করিয়া লাভবান্ হইতে পারিতেন। প্রদর্শনীতে দেশের শিল্পিকুলের সহিত তাঁহাদের একটা সংযোগ সংঘটিত হইতে পারিত। কিন্তু এ ব্যবস্থা—এ প্রদর্শনী শুধু হুকুমদারের হুকুম তামিল;—জো-হুকুমের অনাবশ্যক আড়ম্বর—অপ্রয়োজনীয় প্রহসন।

ভারতের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি—সবই এখন অনাদরে অবজ্ঞায়—অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মৃতপ্রায়। সেই অনুপম প্রাচীন শিল্প শিল্পীদের সহিতই যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ভারতের মত বিরাট ও জনবহুল দেশে কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে যে উটজ শিল্পই দেশবাসীর আর্থিক সমস্যার সমাধানের পক্ষে উপযোগী, তাহা স্পষ্টবাদী আর্থনীতিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সেই উটজ শিল্পই প্রাচীন ভারতের প্রাণ এবং গৌরবেরও

অথবা বৃথা অর্থব্যয়ে তাহার অন্য আবশ্যক কার্য্যেই বাধা পড়ুক। বিলাতে সাম্রাজ্য-প্রদর্শনী বসিবে, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, ভারতকেও তেমনই তাহাতে যোগ দিতে হইবে, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না।

যে বিপুল অর্থব্যয়ে আজ দরিদ্র ভারতের অঙ্কে এই প্রাদেশিক প্রদর্শনী হইতেছে, তাহা দেশবাসীর উপকারের জন্য অনুষ্ঠিত হইলে—সরকার দেশের ও দশের মুখ চাহিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তাহাতে যেমন এ দেশবাসীর উপকার হইত, তেমনই অন্যান্য দেশের লোকও উপকৃত হইতে পারিতেন। তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তথা বর্ত্তমান সভ্য জগতের অনেকেই আপন আপন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিতে পারিতেন,—কোথাও দেশবাসীর শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা করিয়া, কোথাও বা ভারতীয় ব্যবসায়ে

পি, সেট কোম্পানীর স্বদেশী লিলি বিস্কুটের কারখানা।

কারণ। এখন কাল-প্রভাবে দেশে উটজ শিল্পের অবনতির সহিত কল-কারখানার তথা সমবায় ব্যাপারের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। বিদেশীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দরিদ্র নিরন্ন শিল্পী আর নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছে না। ভারতে আবার শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এক দিকে সেই প্রাচীন কুটীর-শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, অপর দিকে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রভাবে সৃষ্ট শিল্প সমবায়গুলির উন্নতি-বিধান করিতে হইবে। দুইটি স্বতন্ত্র কায; দুইটিরই প্রয়োজন। একটিকেও তাচ্ছিল্য করিলে আমরা বর্ত্তমান শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিব না।

কিন্তু তাহার উপায় কে আমাদিগকে করিয়া দিবে? বৎসর বৎসর এইরূপ কত শিল্প-প্রদর্শনী বসিতেছে, তাহাতে ত আমরা তেমন উপকৃত হইতেছি না,—উপকৃত হইতেছেন বিদেশীরা—যাহারা এরূপ আয়োজন, এরূপ ব্যাপার হইতে শিক্ষা-গ্রহণে সমর্থ—অভ্যস্ত। আমাদের শিল্পিকুল অজ্ঞতার অন্ধকারে ও চির-দারিদ্র্যে মগ্ন। তাহাদের পক্ষে এরূপ ব্যয়-বহুল ভাবে কোন জিনিষ শিক্ষা করা সহজ ও সম্ভব নহে। তাহাদের শিক্ষা-ক্ষেত্র প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলে। কে সেখানে তাহাদের জন্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিবে?

স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের গত কয় বৎসরের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একটিমাত্র বস্ত্র-শিল্পের পুনরুভ্যুত্থানের জন্য কত আয়াস, কত যত্ন করিতে হইতেছে। বস্ত্রশিল্পীদিগকে তাহাদের ও দশের মঙ্গলের কথা বুঝাইতে কতই না বেগ পাইতে হইতেছে। আবার, নূতনের প্রতিষ্ঠায় আরও কত অসুবিধা! ভারতের সমগ্র শিল্পরাজ্যে এইরূপ কত শত অসুবিধা আছে। কে তাহা দূর করিয়া দিবে—কবে ভারত আবার পূর্ব্ব-গৌরব প্রাপ্ত হইবে? কখনও হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

লিমটন ওয়াচ কোম্পানীর সুদৃশ্য দোকান।

কলিকাতা প্রদর্শনী সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে। কাযেই তাহার উদ্যোগীদেরও কোনও আপদ-বালাই নাই — তাঁহাদিগকে দেশের ও দশের চিন্তা লইয়া বিব্রত হইতে হয় নাই। তাঁহারা কেবল সোজা উপায় করিয়াছেন, সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর জন্য জিনিষ বাছিবার ও সে জন্য যে অর্থ-ব্যয় হইবে, তাহার আংশিক পরিশোধের। তা' সে বাছাই ভারতের পক্ষে যত লজ্জাজনক ও ভারতীয় শিল্পিকুলের যতই অপমানকরই হউক কিংবা অর্থাগমের উপায় যত ঘৃণ্য বা নিন্দিতই হউক। যাহা হউক, তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে অপচয়ের আধিক্য ও লাভের সম্ভাবনা অল্প থাকিলেও আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ প্রদর্শনীকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; কল-কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্য—বস্ত্র প্রভৃতি

উৎপন্ন বিভাগ

গোকুলদাস গোবৰ্দ্ধন-দাস কোম্পানীর হস্তিদন্তের নানাবিধ খেলানার দোকান।

যে কল-কারখানা পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, প্রদর্শনীর এই বিভাগে তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কাগজের কল ও পাটের কলের কেরামতী, কয়লার খনির উপযোগিতা—এই সব দেখাইয়া দেশের লোককে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকারিতা উপলব্ধি করাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

এই বিভাগে কয়টি ভারতীয় কল-কারখানার পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বোম্বায়ের ছগনলাল কোম্পানীর কৃত্রিম চামড়া, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কলের ডাক্তারী ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি ও

বেঙ্গল এনামেল কোম্পানী।

যে সব জিনিষ কাঁচ মাল হইতে প্রস্তুত হয়, তাহার বিভাগ; ইঞ্জিনীয়ারিং অর্থাৎ বড় বড় যন্ত্রাদির বিভাগ; রাসায়ন বিভাগ; কুটীর-শিল্প; বিহার-উড়িষ্যার বিভাগ; নারীদের প্রস্তুত শিল্প-সামগ্রী প্রভৃতির স্থান—নারী বিভাগ; কৃষি বিভাগ; ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত বিভাগ; বৈদ্যুতিক বিভাগ এবং আমোদ-প্রমোদ। বিভাগ কয়টির মধ্যে ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব-সংক্রান্ত বিভাগটি প্রায় সম্পূর্ণই সরকারী; কলিকাতার বিখ্যাত মিউজিয়ম ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হইতে তাহার অধিকাংশ সংগৃহীত। সরকারী রেকর্ড রুম হইতে কয়খানি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দলিলপত্র এবং কয় জন বে-সরকারী ভদ্রলোকের প্রদত্ত ঐতিহাসিক জিনিষপত্রও এই বিভাগে স্থান পাইয়াছে। জিনিষগুলি প্রদর্শনীতে দেখাইবার মত বটে, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য প্রদর্শনীর তথা সাধারণের প্রয়োজনের পক্ষে এগুলি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। বিহার-উড়িষ্যা তথা নারী বিভাগ শিল্প বিভাগেরই বিশেষ শাখা। অবশিষ্ট—উৎপন্ন বিভাগ, যন্ত্র বিভাগ, রাসায়নিক বিভাগ, কুটীর-শিল্প ও কৃষি বিভাগ, বৈদ্যুতিক বিভাগ। এইগুলিই বর্ত্তমান প্রদর্শনীর মূল বিভাগ।

আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং কোম্পানীর সেলাইয়ের দেশী সূতা উল্লেখযোগ্য।

নূতন জলের কল

যান্ত্রিক বিভাগে তিনটি বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার উপযুক্ত। প্রথমতঃ, হাবড়া, শিবপুরের কৃষ্ণ ট্যাপ ওয়ার্কসের আবিষ্কৃত নূতন জলের কল। এই কলের বৈশিষ্ট্য এই যে, কলের নীচে ঘড়া-বালতী প্রভৃতি পাত্র জলপূর্ণ করিবার জন্য বসাইয়া দিলে কল খুলিয়া দিবার পর জল নষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না, পাত্র পূর্ণ হইয়া যাইলে কল আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। কলিকাতা প্রভৃতি সহরের মিউনিসিপ্যালিটীগুলি এই ভাবের অপচয় রোধ করিবার জন্য হরেক রকমের উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; কিন্তু সে সকল উপায় এই নূতন কল বাহির হইবার পর হাস্যাস্পদ হইয়া দাঁড়াইল। আনন্দের বিষয়, কলটি বাঙ্গালীর আবিষ্কৃত এবং শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত। ইঁহাদের কারখানায় সাধারণ শ্রমিক দিয়া কোন কায করান হয় না; শুনিলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত যুবক নিজেরাই কারখানার সব কায করিয়া থাকেন। আরও সুখের বিষয়, এই কল ইতোমধ্যেই সুধী-সমাজে আদৃত হইতেছে। ই আই রেল কোম্পানী ও কলিকাতার ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতি ইঁহাদের এই নূতন কল লইয়া ব্যবহার করিতেছেন। রায় সাহেব শ্রীযুত কে ডি বন্দ্যোপাধ্যায় এই কলের আবিষ্কারক। তিনি বাঙ্গালী সমাজের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার কৃতিত্বে সমগ্র বাঙ্গালী সমাজ আজ গৌরবান্বিত। ইঁহারা ভ্যাকুয়াম ব্রেকের হোজ কাপলিং প্রভৃতি কয়টি জিনিষও প্রস্তুত করিয়াছেন।

দেশলাইয়ের কল

২৪ পরগণা, বেহালার ঘটক কোম্পানীর দেশলাইয়ের কল যেমন প্রদর্শনের উপযুক্ত বস্তু, তেমনই বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় শিল্পীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইঁহাদের শিক্ষিত পরিচালকবর্গ য়ুরোপীয় কল-কারখানার যন্ত্রের দোষগুণ বিচার করিয়া নিজেদের কারখানায় সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের এই কলটি তৈয়ার করাইয়াছেন।

ইঁহাদের ধান-ছাঁটাই ও চাল ঝাড়াই প্রভৃতির কলও প্রদর্শিত হইতেছে।

দাস কোম্পানী

বিখ্যাত তালা-প্রস্তুতকারক কলিকাতা কাশীপুরের দাস কোম্পানীর নাম শেষে উল্লেখ করিলেও যান্ত্রিক বিদ্যায় তাঁহাদেরও কৃতিত্ব কিছু কম নহে। তাঁহাদের তালা, লোহার সিন্দুক প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালী জন-সাধারণ অবগত আছেন।

যান্ত্রিক বিভাগে শ্রীরামপুর উইভিং স্কুলের ও কলিকাতার রিসার্চ ট্যানারীর শিল্প-কৌশল সেই সেই বিষয়ের শিল্পীদের শিক্ষার বিষয়। এই বিভাগে আরও কয় জন ভারতীয় বড় বড় ব্যবসায়ীকে দেখিতে পাওয়া যাইলেও বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের বাহুল্যে এ বিভাগটি ভারতবাসীর মনে ভীতিই আনয়ন করিয়া থাকে। এই সব কল-কারখানার ও বিদেশী ব্যবসায়ীর অনুগ্রহে কত শত কুটীরশিল্প যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যান্ত্রিক বিভাগে বিদেশী কোম্পানীর প্রস্তুত কয় প্রকার পাম্প বা জলসেচনের কল দেখা যায়। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত টিউব ওয়েলের কার্য্যকলাপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রদর্শনীতে দেখিলাম না। যাহা বাঙ্গালার পল্লী-মফস্বলের জল-সরবরাহ সমস্যা-সমাধানের উপযোগী বলিয়া শুনা যায়, তাহার ভালরূপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু প্রদর্শনী যখন দেশবাসীর প্রয়োজন নহে, তখন সে কথার উত্থাপনই বোধ হয় অন্যায়।

রাসায়ন বিভাগ

রাসায়নিক দ্রব্যের যে কয়টি ভারতীয় ও বিদেশী ব্যবসায়ী কলিকাতা অঞ্চলে আছেন, তাঁহাদেরই কতকগুলি জিনিষ এ বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। নূতনত্ব ইহাতে কিছুই নাই, অনেকগুলি জিনিষের একত্র সমাবেশ মাত্র। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেঙ্গল কেমিক্যাল ও বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর নাম উল্লেখযোগ্য।

কুটীর শিল্প

কুটীর-শিল্পের মধ্যে কার্পাস-বস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এককালে ভারতের এই বস্ত্রশিল্পের আদর ভারতের

বাহিরেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। এখন শুধু রেশম-শিল্পই ভারতের বাহিরে আদৃত হইয়া থাকে। আর, কার্পাস-বস্ত্রের উপর যে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য—চিকণের কায করা হয়, তাহাও বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কায ও ঢাকাই শাঁখা বিশেষ প্রসিদ্ধ হইলেও এখন এই দুইটি শিল্প যেন দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে।

মেদিনীপুরের মাছুরের ব্যবসায়ের আয় বাৎসরিক প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। ঘাটাল অঞ্চলের রেশমী সাড়ীর আয়ও বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আন্দাজ হইবে। মেদিনীপুরের রাধানগর ও রামজীবনপুরের কাপড়ও বেশ প্রসিদ্ধ।

বাঁকুড়া, শাসপুরের ছুরী-কাঁচি, বিষ্ণুপুরের তামাক কম লাভজনক ব্যবসা নহে। মালদহের রেশমের চাষ, বর্দ্ধমান কাঞ্চননগরের ছুরী-কাঁচি, বীরভূম ইলামবাজারের খেলানা, পাবনার বস্ত্রশিল্প, রঙ্গপুরের গাছ তামাক, দার্জ্জিলিঙ্গের কম্বল, যশোহর-খুলনার চিনির কায, মুর্শিদাবাদের রেশম, কম্বল ও কাঁসার বাসন উল্লেখযোগ্য। বাসনের কায রাজসাহীতেও কম হয় না, মুর্শিদাবাদ খাগড়ার বাসনের বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ টাকারও অধিক, কিন্তু রাজসাহীর আয়ও ৪ লক্ষ হইবে। এই উপলক্ষে আরও গুটিকয়েক জিনিষের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ফরিদপুর হইতে একটি শোলার তৈয়ারী ছোট ঘর, খুলনা হইতে একখানি কারুকার্য্যখচিত কাঁথা, পাবনার বেতের কায, কলিকাতার শ্রীযুত এ শোভানের হস্ত নির্ম্মিত কাচের জিনিষ ও বরিশালের কাঠের শ্লেট প্রদর্শিত হইয়াছে। জিনিষগুলি বেশ সুন্দর। কতকগুলি ভাল ভাল জিনিষ সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। সেগুলি আর শেষের দিকে প্রদর্শিত হইতে পায় নাই। প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা প্রশংসাযোগ্য!

শিল্প-বিদ্যালয়

সরকারী কারিগরী ও শ্রমশিল্প বিদ্যালয়ের অনেক জিনিষ প্রদর্শিত হইতেছে। সমগ্র বাঙ্গালায় এখন ১৩টি কারিগরী, ৪৬টি শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় ও ৩৫টি বয়ন বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদর্শনীতে কয়টি শিল্পের নির্ম্মাণ-কৌশল প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়াছেন।

প্রদর্শিত দ্রব্যনিচয়ের মধ্যে বহুবাজারের ঘোষ দস্তিদার কোম্পানীর হস্তিদন্তবিনির্ম্মিত নানাবিধ খেলনা, বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কসের সুদৃশ্য পুতুল, দাস কোম্পানী প্রদর্শিত দূষিত জল পরিশোধিত করিবার অল্পব্যয়সাধ্য ফিল্টার, মেডল্যাণ্ড বন্ধুর গৃহস্থগণের আবশ্যক সুপারী কাটা কল, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কসের স্বদেশী কলায়ের বাসন, আদান খাজান কোম্পানীর সুদৃশ্য গৃহসজ্জা, বেঙ্গল কেমিকেল প্রদর্শিত—কৃত্রিম বিদ্যুতালোক, বটকৃষ্ণপাল কোম্পানী প্রদর্শিত মানব-দেবের নানাবিধ মডেল প্রশংসনীয়।

নারী বিভাগ

নারী-শিল্প বিভাগের দৈন্য অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। বাঙ্গালী মেয়েদের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রদর্শনীতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বয়ন, সূচি-শিল্প, পশমের, কার্পেটের ও জরীর কায, আলিপনা, খাদ্য প্রস্তুতের কারুকার্য্য—কোনও বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

কৃষি

বাঙ্গালা কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও সরকারী কৃষি-বিভাগের আয়োজন ব্যতীত আর কিছু এ বিভাগে দেখা যায় না। বাঙ্গালার কৃষক, যাহাদের সহিত এ প্রদর্শনীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ, তাঁহারা যে কলিকাতা প্রদর্শনীর আয়োজন হইতে কোনরূপ লাভবান্ হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাও মনে হয় না।

প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ কৃষি বিভাগে প্রদর্শিত জিনিষপত্রের জন্য একখানি বাঙ্গালা বই বাহির করিয়াছেন। তাহাতে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলার মাটীর বৈশিষ্ট্য, নানা প্রকার সার, পশুর খাদ্য—কয়েক প্রকারের ঘাস, খেজুর রস ও তাহার চিনির কথা, তামাক, রেশম, আঁশপ্রধান নানা প্রকার গাছ প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু যে সরকারী কৃষি বিভাগ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কৃষক-কুলের শিখাইবার মত বিশেষ কিছুই দেখাইতে পারিলেন না, তাঁহাদের এই নূতন চেষ্টায় কৃষির উন্নতির পক্ষে কোন সাহায্য হইবে কি?

কৃষি বিভাগ যেমন বাঙ্গালায় একটা বিবরণ বাহির করিয়াছেন, শ্রমশিল্প, কারিগরী প্রভৃতি বিভাগের কর্ত্তারা

সেরূপও করেন নাই। বিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষও তাঁহাদের জিনিষপত্রের একটা তালিকা প্রকাশ করিলে পারিতেন। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট বা জিলা বোর্ডের চেষ্টায় পল্লী অঞ্চল হইতে যে সব জিনিষপত্র সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিলে অনেকে উপকৃত হইতে পারিতেন।

আমোদ প্রমোদ

প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ লোকজনকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা মত করুন আর না-ই করুন, আমোদ-প্রমোদের আয়োজনটা বেশ ভালরকম করিয়াই করিয়াছেন। আমোদ-প্রমোদের নামে কর্তারা জুয়াখেলা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিয়াছেন। যে জুয়াখেলার আড্ডা বাহিরে হইলে পুলিসের টানাটানির ভয় ছিল, তাহা প্রদর্শনীর আশ্রয়ে বেশ উদ্দাম ভাবেই চলিয়াছে। আর ভারতীয় আমোদ-প্রমোদের নমুনা দেখাইতে থিয়েটার-বায়স্কোপের সমাবেশ না করিলে কি চলিত না? আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিদেশী ব্যাপারের প্রাবল্য ঘটাইবার ইচ্ছা যদি এতই ছিল, তাহা হইলে জিমন্যাষ্টিক, জিউজিৎসু প্রভৃতি আয়োজন করিলে তাহা কম চিত্তাকর্ষক হইত না।

আমোদ-প্রমোদের বিভাগের মত খাদ্য বিভাগও এক অদ্ভুত ব্যাপার। যে ভেজাল কলিকাতার বাজারে চলিলে মিউনিসিপাল আইনে পড়িতে পারিত, তাহা প্রদর্শনীতে অবাধে চলিতেছে।

খাদ্যের সহিত পানীয়ের সম্বন্ধ শ্বেতাঙ্গ মহলে আছে বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয় প্রদর্শনীর মধ্যেও টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজন ছিল? রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর আমোদের ফোয়ারা, সেই সঙ্গে বিলাতী "বার" ও নাচের ব্যবস্থা, ভারতবাসীর চক্ষুতে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হয়।

আলোক-মালা

প্রদর্শনীটি রাত্রিতে বৈদ্যুতিক আলোকের কল্যাণে অমরপুরীর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। এ দৃশ্যে—মনোহর ইডেন উদ্যানের বৃক্ষ-লতার মধ্যে সুশৃঙ্খলার সহিত সাজান বিবিধ বর্ণের আলোক-মালার সমাবেশে, হ্রদের তীরে জলের উপর ফুকা শিশির আলোর লাল-নীল বিবিধ রঙ্গের খেলায়, আর মাঝে মাঝে সার্চ্চলাইটের চমকে অনেকেই চমকিত হইয়া থাকেন। দৃশ্যটি উপভোগ্যও বটে। কিন্তু কলিকাতায় এ অভিনয় কয়েকবার হইয়া গিয়াছে। সম্রাটের কলিকাতা আগমনের সময় যে আলোর খেলা চলিয়াছিল, তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছিল।

মোটের উপর দেশবাসী কলিকাতা প্রদর্শনীর ব্যবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কংগ্রেস উপলক্ষে পোড়া বাজারে যে প্রদর্শনী বসিয়াছিল, তাহা যে ইহা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীদুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ।

ফিরে পাওয়া

অশ্রু-সাগর পার হয়ে আজ
ফুট্‌চে কেন হাসি,
ব্যথার মাঝে কিসের সুরে
বাজ্‌ছে এ কোন্ বাঁশী!
আজকে এমন গভীর রাতে
দূর পথিকের সাথে সাথে
কোন্ বঁধুটি চল্‌চে আগে
পথের আঁধার নাশি'!

শ্রীবন্দে আলী মিয়া।

৩

বিষয়সম্পত্তির কাযে কন্যার উৎসাহ ও মনোযোগ দেখিয়া রে সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ঝাড়া-মোছা হইতে আরম্ভ করিয়া চুণ দেওয়া, রঙ দেওয়া, আসবাব পত্রের পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ইত্যাদিতে সমস্ত বাড়ীটারও এক দিকে যেমন সংস্কার সুরু হইল, অন্য দিকে শৃঙ্খলাহীন, ঢিলা-ঢালা জমীদারী সেরেস্তাতেও তেমনই অত্যন্ত কড়া নিয়ম-কানুন সকল প্রত্যহই জারি হইয়া উঠিতে লাগিল। সাংসারিক সকল ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ এই মেয়েটির মধ্যে যে এতখানি কর্ম্মপটুতা ছিল, তাহা পেন্সন-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ম্যানেজার বাবু পর্য্যন্ত স্বীকার না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার ত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবসর নাই; দাখিলা, চিঠা, কবজ, খতিয়ান, রোকড়, রোডসেস্, কাহাকে কি বলে এবং কোথায় কি হয়, জমীদারী কাযের এই সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা লইয়া আলেখ্যর কাছে তিনি ত প্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহার কি কায, কত বেতন, ফাঁকি না দিলে কতখানি কায করা যায়, এ সকল বুঝিয়া লইতে আলেখ্যর বিলম্ব হইল না। কয়েকটি স্থবির গোছের লোকের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, জেরার চোটে ম্যানেজার স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, এই সকল লোকের দ্বারা বস্তুতঃ কোন উপকারই হয় না, এবং এ কথা তিনি ইতঃপূর্ব্বে সাহেবকেও জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। তিনি এই বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন যে, এই সংসারে চাকুরি করিয়া আজ যাহারা বুড়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি জুলুম করিয়া কায আদায় করিবার আবশ্যকতা নাই, নূতন লোক বহাল করিলেই জমীদারীর কায চলিয়া যাইবে। এই জন্যই এত লোক বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

আলেখ্য কহিল, এবং এই জন্যেই বাবার খরচে কুলোয় না।

ম্যানেজার ব্রজ বাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

আলেখ্য কহিল, আমি কায চাই, দানছত্র খুলতে চাইনে।

ব্রজ বাবু সবিনয়ে কহিলেন, আপনি যেমন আদেশ করবেন, তেম্‌নি হবে।

রে সাহেব দিন দুই তিন হইল কলিকাতায় তাঁহার পুরাতন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না, এই অবকাশে আলেখ্য এক দিন ম্যানেজারকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে একখানি ছোট্ট কাগজ দিয়া কহিল, এঁদের আপনি এই মাসের মাইনেটা চুকিয়ে দিয়ে জবাব দিয়ে দেবেন। বাবা অত্যন্ত দুর্ব্বলপ্রকৃতির মানুষ, তাঁকে জানাবার প্রয়োজন নেই।

ব্রজ বাবু কম্পিত হস্তে কাগজখানি গ্রহণ করিলেন; চসমার ভিতর দিয়া নামগুলি একে একে পাঠ করিয়া তাঁহার গলা পর্য্যন্ত কাঠ হইয়া উঠিল। একটু সাম্‌লাইয়া কহিলেন, যে আজ্ঞে। কিন্তু এই নয়ন গাঙ্গুলী লোকটি বড় গরীব, তাঁর—

আলেখ্য কহিল, গরীবের জন্যে সংসারে অন্য ব্যবস্থা আছে।

ব্রজ বাবু বলিতে গেলেন, তা বটে, কিন্তু—

এই কিন্তুটা আলেখ্য শেষ করিতে দিল না, কহিল, দেখুন ম্যানেজার বাবু, এ নিয়ে আলোচনা স্বভাবতঃই

অপ্রিয়। আমি বিশেষ চিন্তা করেই স্থির করেছি,—আপনি এখন যেতে পারেন।

যে আজ্ঞা, বলিয়া বৃদ্ধ ব্রজ বাবু কাগজখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। শিক্ষিতা জমীদার কন্যার মেজাজের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না—পাছে তাঁহার নিজের নামটাও বুড়া ও অকর্ম্মণ্যদের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ইহাও তিনি নিশ্চিত জানিতেন, যাহা-দের কায গেল, তাহারা কেবল তাঁহার মুখের কথাতেই নিরস্ত হইবে না, আবেদন-নিবেদন সহি-সুপারিশ প্রভৃতি গোলামি-গিরির যাহা কিছু দুনিয়ায় প্রচলিত আছে, সমস্তই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

হইলও তাই। পরদিন চারখানা দরখাস্তই ব্রজ বাবু আলেখ্যর ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। অধীনের নিবেদনে বাঙ্গালা দেশের সেই মামুলি দারিদ্র্যের ইতিহাস ও তাহার হেতু। প্রত্যেকেই পরিবারস্থ বিধবাগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে এবং কান্নাকাটি করিয়া জানাইয়াছে যে, সে ভিন্ন তাহাদের দাঁড়াইবার আর কোথাও স্থান নাই। আলেখ্য কোনটাই গ্রাহ্য করিল না, এবং প্রত্যেক আবে-দন-পত্রের নীচেই ইংরাজী প্রথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হুকুম দিল যে, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুপায়। ব্রজ বাবু ঠিক ইহাই আশা করিয়াছিলেন, তিনি সকলকেই গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সাহেব ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত যেন তাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে। কারণ, চোখের জলের যদি কোন দাম থাকে ত সে কেবল ওই স্বেচ্ছাচারী স্বল্পবুদ্ধি বুড়ার কাছেই আদায় হইতে পারে।

দিন তিনেক পরে এক দিন সকালে আলেখ্য তাহার বসিবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া অনেকগুলা নক্সার মধ্যে হইতে তাহাদের খাবার ঘরের পেন্টিঙের ডিসাইনটা পছন্দ করিয়া বাহির করিতেছিল। এক জন অতিশয় বৃদ্ধ গোছের লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা যেমন রোগা তেমনই তাহার পরণের কাপড়-চোপড় ময়লা এবং ছেঁড়া-খোঁড়া।

আলেখ্য মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

লোকটা সহসা জবাব দিতে পারিল না—তোত্‌লা বলিয়া। তাহার পরে কহিল, আমি নয়ন গাঙ্গুলী।

আলেখ্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া কঠোরভাবে বলিল, এখানে কেন?

সে কথা বলিবার চেষ্টায় আবার কিছুক্ষণ চোখ ও মুখের নানারূপ ভঙ্গী করিয়া শেষে কহিল, আমার মেয়ের নাম দুর্গা। সে বল্লে, বাবা, তুমি তাঁর কাছে যাও, গেলেই চাকরী হবে। আমার একটি নাতি আছে, তার নাম গণপতি। তার ভারি বুদ্ধি।

ইহার চেহারা দেখিয়াই আলেখ্যর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এই সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া বুঝিল, যাহাদের জবাব দেওয়া হইয়াছে, এই লোকটি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ। সে নক্সার উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল, আমার কাছে কিছু হবে না, আপনি বাইরে যান।

লোকটা তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার সংসারের অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিল যে, এই তের টাকা বেতন ভিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণী জীবিত নাই, বছর পাঁচেক হইল ছেলেও মারা গিয়াছে, জামাই আসামে চাকুরী করিতে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

আলেখ্য বিরক্ত হইয়া কহিল, আপনার ঘরের খবর শোনবার আমার ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই; আপনি এখান থেকে যান।

গাঙ্গুলী কর্ণপাতও করিল না, সে কত কি বলিয়া চলিতে লাগিল। আলেখ্য নিরুপায় হইয়া তখন বেহারাকে ডাকিয়া এই লোকটাকে এক প্রকার জোর করিয়াই বিদায় করিয়া দিয়া পুনরায় নিজের কাযে মন দিল।

কলিকাতা হইতে কিছু কিছু আসবাব আসিয়া পৌঁছি-য়াছিল। পরদিন সকালে একটা মূল্যবান্ আয়না নিজের শোবার ঘরে খাটাইবার ব্যাপারে আলেখ্য নিজেই তত্ত্বাবধান করিতেছিল, হঠাৎ একটি বছর দশেকের ছেলের হাত ধরিয়া ম্যানেজার ব্রজ বাবু প্রবেশ করিলেন। ছেলেটির পরণের বস্ত্র এত ছেঁড়া যে, নাই বলিলেই হয়। খালি পা, খালি গা, এত কাঁদিয়াছে যে, চোখ দুটি রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আলেখ্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিতে ব্রজ বাবু মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে আসতে হলো,—

কাযের ব্যস্ততার মধ্যে ইঁহাদের আকস্মিক আগমনে আলেখ্য খুসী হইতে পারে নাই। ঘোষ সাহেবদের আসার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, অথচ বাটী সাজানো-গুছানোর কায এখনও বিস্তর বাকী; কহিল, নিতান্ত জরুরি কায নাকি?

ব্রজ বাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নয়ন গাঙ্গুলীর কামাইয়ের দরুণ পাঁচ টাকা মাইনে কাটা হয়েছিল, কিন্তু পরে বিবেচনা করবেন ব'লে একটা ভরসা দিয়েছিলেন—

আলেখ্য অপ্রসন্ন মুখে বলিল, সে বিবেচনার আমি আর প্রয়োজন দেখিনে।

ব্রজ বাবু প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস করিলেন না, ছেলেটিকে লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আলেখ্য কৌতূহলবশে সহসা জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটি কে ম্যানেজার বাবু, তাঁর নাতি বোধ করি?

ছেলেটি নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রজ বাবু তখন আস্তে আস্তে কহিলেন, চাকরী নেই শুনে মুদি কা'ল আর চালডাল কিছু দিলে না, হয় ত তার বাকীও ছিল—সারাদিন খাওয়া-দাওয়াও কারও হ'ল না—ছেলে-জামাইয়ের শোকে বুড়ো হয়ে এদানীং গাঙ্গুলী মশায়ের মাথাটাও তেমন ভাল ছিল না,—কি ভাবলে কি জানি, রাত্রেই কতকগুলো কল্কে-ফুলের বীচি বেটে খেয়ে আত্মহত্যা ক'রে ফেলে—এখন আবার পুলিস না এলে দাহ পর্য্যন্ত হওয়া—

আলেখ্য চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিল, কে আত্মহত্যা করলে?

ছেলেটি কাঁদিতেছিল, বলিল, দাদামশাই।

দাদামশাই? নয়ন গাঙ্গুলী? আত্মহত্যা করেছেন?

ব্রজ বাবু বলিলেন, হাঁ, ভোর বেলায় মারা গেছেন। টাকা পাঁচটা পেলে এদের বড় উপকার হয়। ছেলেটিকে কহিলেন, মণি, হাতযোড় ক'রে বল, মা আমাদের পাঁচ টাকা ভিক্ষে দিন। বল?

ছেলেটা কাঁদিতে কাঁদিতে হাতযোড় করিয়া তাঁহার কথাগুলা আবৃত্তি করিল। আর তাহার প্রতি অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া আলেখ্য মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিকে লইয়া ব্রজ বাবু চলিয়া গেলেন। নয়ন গাঙ্গুলীর মৃত দেহের প্রায়শ্চিত্ত হইতে সুরু করিয়া সৎকার পর্য্যন্ত কিছুই টাকার অভাবে আর আট্‌কাইয়া থাকিবে না, যাবার সময় তাহা তিনি বুঝিয়া গেলেন; কিন্তু আলেখ্যর কাছে ঘরের পেন্টিং হইতে সাজানো গুছানো যা' কিছু কায সমস্ত একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। সেখান হইতে বাহির হইয়া সে তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

মিস্ত্রী আসিয়া আলমারী রাখিবার যায়গা দেখাইয়া দিতে কহিলে আলেখ্য বলিল, এখন থাক্।

সরকার আসিয়া খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিল, যা হয় হোক্, আমি জানিনে।

একটা মেরামতির কাযের হুকুম লইতে আসিয়া ঠিকাদার ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। আলেখ্যর কেবলই মনে হইতে লাগিল, কিছুতেই আর তাহার প্রয়োজন নাই, এ দেশে আর সে মুখ দেখাইতে পারিবে না। নবীন উদ্যমে বিলাতী প্রথায়, কড়া নিয়মে কায করিতে গিয়া আরম্ভেই সে যে এত বড় ধাক্কা খাইবে, তাহা কল্পনাও করে নাই। এ কি হইয়া গেল? বিদ্বেষবশে কাহারও প্রতি সে কোন অন্যায় করে নাই,—হয় ত একটা ভুল হইয়াছে, কিন্তু এত বড় শাস্তি? একেবারে সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিল!

এক জন ছোট গোছের কর্ম্মচারীকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া সে একটি একটি করিয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিল। নয়ন গাঙ্গুলী এই সংসারে চল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে চাকরী করিয়াছে, বাস্তবিকই সে অত্যন্ত দরিদ্র, খান দুই মাটীর ঘর ছাড়া আর তাহার আপনার বলিতে এত বড় পৃথিবীতে কোথাও কিছু ছিল না,—এই তেরটি টাকা বেতনের উপরেই তাহাদের সমস্ত নির্ভর, ইহার কিছুই মিথ্যা নয়।

তেরটি টাকা কি-ই বা! অথচ একটা দরিদ্র পরিবারের সমস্ত খাওয়া-পরা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-নিরানন্দ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ইহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবন ধারণ করিয়াছিল!

এই টাকা কয়টি কত তুচ্ছ। তাহার অসংখ্য যোড়া জুতার মধ্যে এক যোড়ার দামও ইহাতে কুলায় না। কিন্তু আজ একটা লোক নিজের জীবন দিয়া যখন ইহার সত্যকার মূল্য তাহার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল, তখন

বুকের ভিতরে যেন তাহার ঝড় বহিতে লাগিল। ঐ সারা-দিনের উপবাসী ছেলেটার ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নার শব্দ তাহার কানের মধ্য দিয়া কোথায় কি করিয়া যে বিঁধিয়া ফিরিতে লাগিল, সে তাহার কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না।

সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া আলেখ্যর কতদিনের কত অর্থ-ব্যয়ের কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। তাহার নিজের, তাহার স্বর্গগত জননীর, তাহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের, তাহাদের সভ্য-সমাজের কত দিনের কত উৎসব, কত আহার-বিহার, গান-বাজনার আয়োজন, কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত গাড়ী-ঘোড়া, ফুল-ফল, কত আলোর মিথ্যা আড়ম্বর,—তাহার পরিমাণ কল্পনা করিয়া তাহার শিরার রক্ত শীতল হইয়া আসিতে চাহিল। হাতের কাছে ছোট টিপয়ের উপরে নূতন আয়নার বিলটা পড়িয়া ছিল, তাহার অঙ্কের প্রতি চোখ পড়িতেই আজ তাহার প্রথম মনে হইল, এই বস্তুটায় তাহার কতটুকুই বা প্রয়োজন, অথচ ইহারই মূল্যে এক জন লোক অনায়াসে পাঁচ বৎসরকাল বাঁচিতে পারিত! আজ তাহার নিজের হাতে প্রাণ বাহির করিবার আবশ্যক হইত না!

আজ বিকালের গাড়ীতে রে সাহেবের বাড়ী আসিবার কথা। পিতার দুর্ব্বলতার প্রতি তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল,—ইহা সে মায়ের কাছে শিখিয়াছিল। পরের অন্যায়কে তিনি জোর করিয়া খণ্ডন করিতে পারেন না, তাঁহার চক্ষু লজ্জায় বাধে। এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া কত লোক তাঁহার প্রতি অসঙ্গত উৎপাত করিয়া আসিয়াছে, তিনি কোন দিন কোন কথা বলিতে পারেন নাই, এই সকল পীড়নের শেষ করিয়া দিতে আলেখ্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছিল। প্রাচীন, অলস ও অকেযো লোক-গুলাকে বিদায় দিবার প্রস্তাবে সামান্য একটুখানি প্রতিবাদ করিয়া যখন ব্রজ বাবু পূর্ব্বের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন, সাহেবের ইহাতে সম্মতি নাই, আলেখ্য তখন সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। পিতার চিরদিনের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়াই, সে তাঁহার অবর্ত্তমানেই এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আজ অক্ষম, অতিবৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলী যখন তাহার স্বহস্তের মৃত্যু দিয়া সংসারের একটা অপরিজ্ঞাত দিকের পর্দ্দা তুলিয়া ফেলিল, তখন সেই দিকে চাহিয়া এই অনভিজ্ঞ মেয়েটির গভীর পরিতাপের সহিত একলা বসিয়া অনেক নূতন প্রশ্নের সমাধান করিবার আবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অনুপস্থিত, শক্তিহীন পিতাকে স্মরণ করিয়া সে বার বার বলিতে লাগিল, চিত্তের কোমলতা এবং দুর্ব্বলতা এক বস্তু নয়, বাবা, তোমাকে আমরা চিরদিন ভুল বুঝিয়াছি, কিন্তু কোন দিন তুমি অভিযোগ কর নাই। সেই পিতাকে মনে করিয়াই আজ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সংসার শুধুই একটা মস্ত দোকান-ঘর নয়। কেবল জিনিস ওজন করিয়া মূল্য ধার্য্য করিলেই মানুষের সকল কার্য্য সমাপ্ত হয় না। এখানে অক্ষমেরও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে,—তাহার কায করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া তাহার জীবনধারণের দাবীও বিলুপ্ত করা যায় না।

আগে সকালে বিকালে কাছারী বসিত, আলেখ্য অন্যান্য অফিসের নিয়মে তাহাকে ১১টা হইতে ৪টায় দাঁড় করাইয়াছিল। এই সময়ের অনেকখানি সময়ে সে নিজে গিয়া ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া কায-কর্ম্ম দেখিত, আজ কিন্তু সে নিজের কর্ম্মচারীদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিল না, আপনাকে সেইখানেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। খাওয়া-দাওয়া তাহার ভাল লাগিল না এবং এমনই করিয়া যখন সারাবেলা কাটিল, তখন বৈকালের দিকে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, সাহেবের খালি গাড়ী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল, তিনি আসেন নাই। কোথাও আসা-যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার কথার কখনও ব্যতিক্রম হইত না, এই দিক দিয়া সে পিতার জন্য যেমন চিন্তা বোধ করিল, তাঁহার না আসায় আর এক দিকে তেমনই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তিনি রাগ করিবেন না, একটি কঠোর বাক্য পর্য্যন্তও হয় ত উচ্চারণ করিবেন না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত; কিন্তু তাঁহার ব্যথিত নিঃশব্দ প্রশ্নের সে যে কি জবাব দিবে, কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সেই কঠিন দায় হইতে সে আজিকার মত অব্যাহতি লাভ করিয়া যেন বাঁচিয়া গেল। এই শান্তিটুকুই তখনও সে নিজের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুর মশাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কে ঠাকুর মশাই? কোথায় তিনি?

ঠিক পর্দ্দার আড়াল হইতে উত্তর আসিল, আমি অমরনাথ, এই বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

আসুন বলিয়া আহ্বান করিয়া আলেখ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যাখ্যান করিবার সময় বা সুযোগ তাহার রহিল না।

আলেখ্য হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সে দিনের মত আজও অধ্যাপক সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নমস্কার ফিরাইয়া দিবার চেষ্টামাত্রও করিলেন না। আলেখ্য লক্ষ্য করিল, কিন্তু কাহারও কোন প্রকার আচরণেই ত্রুটি ধরিবার মত মনের জোর আজ আর তাহার ছিল না।

অধ্যাপক নিজেই আসন গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে আজ আমাকে আস্‌তে হয়েছে, না হ'লে আসতাম না।

এই মানুষটি গ্রামের সকল কাযেই আছেন, অতএব তিনি যে নয়ন গাঙ্গুলীর ব্যাপারেই আসিয়াছেন, আলেখ্য মনে মনে তাহা বুঝিল, এবং পিতার অবর্ত্তমানে তাঁহাকে কি জবাব দিবে, চক্ষুর নিমিষে স্থির করিয়া লইয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, বলুন।—

অধ্যাপক একটুখানি হাসিলেন; বলিলেন, আজ আপনি নিজের মধ্যে যে কত দুঃখ পেয়েছেন, সে আর কেউ না জান্‌লেও আমি জানি। সে আলোচনা করতে আমি আসিনি, আমি আপনার শত্রু নই।

আলেখ্যর বোধ হইল, এই লোকটি যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু নিজেকে সে চঞ্চল হইতে দিল না, তেমনই সহজ ভাবেই কহিল, আপনার প্রয়োজন বলুন।

অধ্যাপক কহিলেন, বল্‌ছি। কা'ল হাটের দিন, সহর থেকে পুলিস এসে এর মধ্যেই সমস্ত ঘিরে ফেলেছে। এ কায আপনি কেন করতে গেলেন?

আলেখ্য চমকিত হইল। এখানে আসার পরদিনই সে বিশেষ কোন অনুসন্ধান বা চিন্তা না করিয়াই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছিল। হাটের সম্বন্ধে যে সকল কথা সে লিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত বা সত্য-মিথ্যায় বিজড়িত। ইহার ফলাফল সে ঠিক জানিত না; এবং বিলম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল, হয় ত সে চিঠি পৌঁছায় নাই, কিংবা পৌঁছাইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার কিছুই করিবেন না। এত দিনের ব্যবধানে চিঠির কথা সে নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ আজ এই খবর।

আলেখ্য নরম হইয়া বলিল, বেশ ত, এলেই বা তারা, কি এমন ক্ষতি?

অধ্যাপক কহিলেন, আপনি বিদেশে ছিলেন, জানেন না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সহজে এর শেষ হবে না,—দু' চার জন মারাও যদি যায় ত আমি আশ্চর্য্য হব না।

আলেখ্য ভীত হইয়া বলিল, মারা যাবে? কে মারা যাবে?

অধ্যাপক কহিলেন, কে মারা যাবে, কি ক'রে বল্‌বো? হয় ত আমিও যেতে পারি।

আপনি?

বিচিত্র কি? আত্ম-সম্মানের জন্যে যদি মরবার প্রয়োজনই হয়, আমাকেই ত সকলের আগে যেতে হবে। কিন্তু সব কথা আপনাকে বলবার এখন আমার সময় নেই, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। কা'ল সকালে কি একবার দেখা হ'তে পারে?

আলেখ্য ব্যগ্র হইয়া বলিল, পারে। আপনি যখনই আমাকে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখনই এসে হাজির হব। বাবা নেই, আমাকে কিন্তু আপনি মিথ্যে ভয় দেখাবেন না।

তাঁহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে আক্রমণের লেশমাত্রও ছিল না, অধ্যাপক শুধু একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, না, ভয় দেখান আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু কা'ল যেন সত্যই আপনার দেখা পাই।—এই বলিয়া যেমন সহজে আসিয়াছিলেন, তেমনই সহজে বাহির হইয়া গেলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হাওড়ায়-হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামা

যে সময় কোকনদে কংগ্রেসে নেতৃগণ হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি সংবর্দ্ধনের উপায় নির্দ্ধারণে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেই সময় হাওড়ায় হিন্দু-মুসলমানে হাঙ্গামায় রক্তপাত হইয়াছে।

হাওড়া পিলখানা মসজেদের পার্শ্বেই খানিকটা জমী আছে। সে জমীর অধিকারী এক জন হিন্দু। সেই জমী লইয়া মসজেদের ইমামের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ঘটিয়াছিল। ইমামের অভিপ্রায়, মসজেদের পার্শ্বস্থ জমীতে হিন্দুদিগকে বাস করিতে দিলে অসুবিধা হইবে, সুতরাং তথায় মুসলমানদিগকে বাস করিতে দেওয়া হউক। এই অসদ্ভাবের ফলে আদালতে মামলার সৃষ্টিও হইয়াছিল।

পিলখানা মসজেদ।

এই অবস্থায় গত ৩০শে ডিসেম্বর রবিবারে দেখা যায়, মসজেদের প্রাঙ্গণে একটি শূকরের শব কে রাখিয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং ঢাক পিটাইয়া স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আহ্বান করে। ক্রমে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমান সমবেত হয়। বিপদের আশঙ্কা করিয়া ইমাম কলিকাতায় টেলিফোনযোগে সংবাদ দেন এবং সংবাদ পাইয়া মিষ্টার আরিফ ও মেজর সুরাবার্দ্দী প্রমুখ মুসলমান নেতারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত জনতাকে সংযত ও শান্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুসলমানরা হিন্দুদিগের গৃহ লুঠ করিতে আরম্ভ করে। তাহারা স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গ হইতেও অলঙ্কার ছিনাইয়া লয় ও ১ জন হিন্দুর জিহ্বা কাটিয়া ও চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দেয়। আরও কয় জন হিন্দু জখম হয়।

এই ব্যাপারে মুসলমানদিগকে আমাদের কয়টি কথা বলিবার আছে—

(১) মসজেদের পার্শ্ববর্ত্তী জমী হিন্দুর; কাযেই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে জমীতে ইচ্ছামত প্রজা পত্তন করিবার অধিকার তাঁহার আছে। যদি সে জমীতে মুসলমান প্রজা পত্তন না হইলে সত্য সত্যই মসজেদের অসুবিধা হয়, তবে মসজেদের পক্ষ হইতে সে জমী খাজনা করিয়া বা কিনিয়া লওয়াই সঙ্গত ছিল। মসজেদের পার্শ্বেই হিন্দু প্রজা পত্তন হইলে কি অসুবিধা হয়? ভারতবর্ষে নানা স্থানে মসজেদের পার্শ্বে হিন্দুর বাস আছে। তাহাতে যদি মুসলমানরা আপত্তি করেন, তবে কি হিন্দুস্থানে হিন্দুর বাসের জন্য স্থান মিলিবে না?

(২) মসজেদে শূকরের শব নিক্ষেপরূপ কুকার্য্য যে হিন্দুর দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় দোষিনির্দ্দোষ বিচার না করিয়াই হিন্দুদিগের উপর অনাচার করা কি সঙ্গত?

সাধারণ হিন্দুরাও শূকর অস্পৃশ্য বোধে পরিহার করে। যেমন কোন কোন হিন্দু-সম্প্রদায় শূকর স্পর্শ করে, তেমনই আবার ইংরাজের হোটেলে চাকুরীয়া কোন কোন মুসলমানও শূকরমাংস স্পর্শ করে। এমনও হইতে পারে, লুঠ করিবার সুযোগ পাইবে বলিয়া কোন হীন মুসলমান এমন কায করিয়াছিল যে-ই এ কায করিয়া থাকুক, সে যে ঘৃণ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণিত না হইতেছে, হিন্দুর দ্বারাই এই হীন আচরণ আচরিত হইয়াছিল, ততক্ষণ হিন্দুকে দোষী মনে করিবার কোনই কারণ নাই। আর যদিই বা এমন হয় যে, কোন হিন্দু এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তবে কি সেই জন্য সকল হিন্দুর উপর অনাচার অনুষ্ঠান সমর্থন করা যায় ?

'অমৃতবাজার পত্রিকা' এই ব্যাপার সম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, এই ব্যাপারের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। তাহাতে প্রকাশ—

মন্দিরের পার্শ্বস্থ জমীর মালিক পরলোকগত নন্দলাল ঘোষ তাঁহার কোন মুসলমান প্রজার গৃহে মুসলমানদিগকে প্রার্থনার জন্য সমবেত হইতে দিতেন। সেই স্থানে যখন মসজেদ নির্ম্মিত হয়, তখন তিনি তাহাতে আপত্তি করেন নাই; পরন্তু তাঁহার পুত্ররা পার্শ্বস্থ জমী দিয়া মসজেদের কলেবরবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। মসজেদের পার্শ্বস্থ জমীতে তাঁহাদের মুসলমান প্রজা আছে এবং তাহারা অনেক সময় খাজনা দিতে গাফিলী করিলেও তাঁহারা তাহাদিগকে উৎপীড়ন করেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন মুসলমান প্রজা নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিতে অসমর্থ হইয়া জমীদারদিগকে সে জমী ইচ্ছামত বিলি করিতে বলে। জমীদাররা স্থানীয় মুসলমানদিগকে জমী লইতে বলেন। তাহারা কেহ জমা না লওয়ায় তাঁহারা এক জন ভুমীহার ব্রাহ্মণকে পত্তন করেন—প্রজা ২ শত টাকা সেলামী দিয়া জমী লয়। প্রজা যখন জমীতে ঘর তুলিবার আয়োজন করে, তখন স্থানীয় মুসলমানরা তাহাকে ভয় দেখায় এবং সে ঘরের জন্য খুঁটি পুতিতে আসিলে প্রায় ৫০ জন মুসলমান লাঠি লইয়া আসিয়া বাধা দেয়। ব্যাপারটি হাওড়া হইতে লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীতে নির্ব্বাচিত সদস্য মিষ্টার আরিফকে জানান হয় এবং জমীদাররা বলেন, মুসলমান প্রজা নিয়মিতভাবে খাজনার টাকা দিবে, মিষ্টার আরিফ সে জন্য জামিন হইলে তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জমী ফিরৎ লইয়া মুসলমান প্রজা পত্তন করিতে সম্মত আছেন। মিষ্টার আরিফ তাহাতে সম্মত হয়েন না। তখন অনন্যোপায় হইয়া জমীদাররা হিন্দু প্রজাকেই প্রজা স্বীকার করেন। কিন্তু মুসলমানরা ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, নামাজের সময় হিন্দুরা শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বাজনা বাজাইয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবে। জমীদার ও হিন্দু প্রজা প্রতিশ্রুতি দেন, নামাজের ৫ ওয়াক্তের সময় মুসলমানদিগকে কোনরূপে বিরক্ত করা হইবে না। তথাপি মুসলমানরা ঘর তুলিতে না দেওয়ায় প্রজা পুলিসে ব্যাপার জানায় এবং শেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে। তদনুসারে ২৯শে ডিসেম্বর শনিবারে মুসলমানদিগের কয় জন প্রধানের উপর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারী হয়। পরদিন প্রভাতেই মসজেদ-প্রাঙ্গণে শূকরের শব পাওয়া যায় এবং মুসলমানরা ঢাক বাজাইলে প্রায় ৩০ হাজার মুসলমান লাঠি লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও হিন্দুদিগের উপর অনাচার করে।

অনাচারের স্বরূপ আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত বিবরণ হইতে কি এমন মনে করা যাইতে পারে না, শনিবারে ১৪৪ ধারা মতে নোটিশ জারী হইবার পরই কতকগুলি মুসলমান ক্রুদ্ধ হইয়া হাঙ্গামা বাধাইবার আয়োজন করিয়াছিল ? সঙ্কেতমাত্র লাঠি লইয়া প্রায় ৩০ হাজার মুসলমানের সমাগমেও কি এই সন্দেহ দৃঢ় হয় না ?

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। হাওড়ার নেতৃগণ স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছেন। উভয় সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য নেতা লইয়া সমিতি গঠিত হইয়াছে। সমিতি এই কয়টি বিষয় স্থির করিবেন—

(১) হিন্দু মুসলমান জনগণের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা নিবারণের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন;

(২) ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ দুর্ঘটনা না ঘটে, তাহার উপায় স্থির করিবেন;

(৩) পিলখানা মসজেদ সংলগ্ন যে জমী লইয়া হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্তের উপায় করিবেন।

হাওড়ার ভুমীহার ব্রাহ্মণরা মুসলমানদিগের অনাচারের প্রতিশোধ লইতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিশ্বানন্দ

তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। এ দিকে হাওড়া খিলাফৎ কমিটীর সদস্যরা হাঁসপাতালে যাইয়া আহত হিন্দুদিগকে দেখিয়া ও তাহাদের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন।

এ সকল যে সুলক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

উপসংহারে আমরা একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব—এই হাঙ্গামার সময় পুলিস কোথায় ছিল? মসজেদে শূকরের শব দেখিয়া মুসলমানরা ঢাক পিটাইয়া সঙ্কেত করে এবং হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মুসলমান লাঠি লইয়া ঘটনাস্থলে সমবেত হয়। বিপদাশঙ্কায় ইমাম কলিকাতায় টেলিফোন করিলে কলিকাতা হইতে কয় জন মুসলমান নেতা যাইয়া উত্তেজিত জনগণকে সংযত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর মুসলমানরা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। যতক্ষণে এত ব্যাপার হয়, ততক্ষণ পুলিস কোথায় ছিল এবং কি করিতেছিল? এত ব্যাপারের পরও—সন্ধান পাইয়াও যদি পুলিস লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে না পারে, তবে সে পুলিসে দেশের লোকের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? কলিকাতায় লাটপ্রাসাদ হইতে ১ ক্রোশের মধ্যে—কলিকাতার উপকণ্ঠে এই ঘটনা ঘটিয়া গেল—পুলিস তাহা নিবারণ করিতে পারিল না! হাওড়ায় যে কাণ্ড ঘটিয়া গেল, পুলিস না থাকিলে কি তদপেক্ষা গুরুতর কাণ্ড ঘটিতে পারিত? সালঙ্গার হাটে কি ইহার অপেক্ষা সঙ্গীন ব্যাপার ঘটিয়াছিল!' কালীঘাটে ব্যাপার কিরূপ হইয়াছিল? এ বিষয়ে পুলিসের পক্ষ হইতে সরকার কি কৈফিয়ৎ দিবেন? পুলিস ত সরকারের সংরক্ষিত বিভাগ—খাসমহল; তাহার খরচও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অথচ সেই পুলিসের কর্ম্মদক্ষতার যে পরিচয় হওড়ায় পাওয়া গেল, তাহার পরও যদি সরকার পুলিসের কর্ম্মদক্ষতার কথা বলেন এবং পুলিসের জন্য আরও টাকা বরাদ্দ করিতে বলেন, তবে কি লোক বলিতে পারিবে না—"তুমি লাজের ঘাটে মুখ ধোও নি?"

বারাকপুরে মন্দির ভাঙ্গা

কলিকাতার সন্নিকটে বারাকপুর সিপাহী বিপ্লবের সময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর বারাকপুরের নাম বারাকপুর থাকিলেও বারিকে আর অধিক সৈনিক রাখা হয় না। যখন বারাকপুরে অনেক সৈনিক থাকিত, সেই সময় এক দল ব্রাহ্মণ সৈনিক এক স্থানে ধর্ম্মায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কাযটা গোপনে হয় নাই এবং সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীরাও সে স্থানে হিন্দুদিগের সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়া স্থানটুকুতে তাহাদের অধিকার কায়েমী করিয়া দিয়াছিলেন।

সংপ্রতি শ্বেতাঙ্গদিগের ঘোড়দৌড়সমিতি (Turf Club) সেই মন্দিরটি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করেন। কারণ, যে স্থানে শ্বেতাঙ্গরা ঘোড়দৌড়ের বাজী মারিবেন এবং তাঁহাদের মহিলারা অপেরাগ্লাস লইয়া দৌড় দেখিবেন, সে স্থানের মধ্যে এই মন্দিরটি বড় অশোভন দেখাইতেছিল। মুসলমানদিগের মসজেদ ভাঙ্গার বিপদের অভিজ্ঞতা শ্বেতাঙ্গদিগের আছে। কারণ, লর্ড মেষ্টন যখন যুক্তপ্রদেশের ছোট লাট, তখন কানপুরে মুসলমানদিগের একটি মসজেদ ভাঙ্গায় রক্তারক্তি হইয়াছিল এবং দাঙ্গাকারী মুসলমানদিগকে সাহায্য করায় মামুদাবাদের রাজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার কথাও যে না উঠিয়াছিল, এমন নহে। শেষে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ স্বয়ং কানপুরে আসিয়া মসজেদ পূর্ব্ববৎ গাঁথাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুরা যে সেরূপ আপত্তি করিবে, ইহা কর্ত্তারা মনেই করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যেও এক দল লোক আছে—যাহারা কেরাণী, ডেপুটী, উকীল, সংবাদপত্রসম্পাদক বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নহে। তাহারা এখনও নির্বীর্য্য হয় নাই। সেই দল এই কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া বাধা দেয় এবং সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দ তাহাদিগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ব্যাপারটি ক্রমে কঠিন হইয়া দাঁড়ায় এবং এমন সম্ভাবনাও ঘটে যে, নিরুপদ্রবে মন্দির ভাঙ্গা আর না-ও চলিতে পারে।

তখন শ্বেতাঙ্গদিগের চৈতন্যোদয় হয়। শেষে তাঁহারা সে জমীতে মন্দিরের অধিকারী হিন্দুদিগের অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, তাঁহারা মন্দিরের যে অংশ ভাঙ্গিয়াছিলেন, তাহা গাঁথাইয়া দিবেন; মন্দিরটি বৃতিবেষ্টিত করিয়া দিবেন এবং মধ্যস্থ ভূমিতে পুষ্পোদ্যানের জন্য মালীর খরচও দিবেন। সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ ও সচ্চিদানন্দ যে সত্যাগ্রহানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বারাকপুরে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছে। এখন এমন আশা

অবশ্যই করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যতে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের অধিকার ত্যাগ করিবে না। আপনার অধিকার আপনি রক্ষা না করিলে আর কেহ তাহা রক্ষা করিয়া দেয় না।

এই ব্যাপারে এক দিকে যেমন সত্যাগ্রহের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, আর এক দিকে তেমনই এ দেশে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব সপ্রকাশ হইয়াছে। ঐ করিবার আয়োজন হইয়াছিল। কানপুরে মসজেদ ভাঙ্গার পরও তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মায়তন ভাঙ্গিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠের আয়তন বৃদ্ধি করিতেছিলেন! যদি কোন মিউনিসিপ্যালিটী বা জিলা বোর্ড বাগান রচনার উদ্দেশ্যে খৃষ্টানের গির্জ্জা এমনই ভাবে ভাঙ্গিয়া লইবার উদ্যোগ করিত, তবে কিরূপ ব্যবস্থা হইত? শ্বেতাঙ্গদিগের এই ব্যবহারে বুঝা যায়, তাহারা এ দেশের লোককে মানুষ

বারাকপুরের মন্দির।

স্থানে মন্দির থাকার কথা ঘোড়দৌড় সমিতির কর্ত্তাদের অজ্ঞাত ছিল না। মন্দিরে যে হিন্দুরা দেবার্চ্চনা করিত, তাহাও তাঁহাদের না জানিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তথাপি তাঁহারা মন্দিরটি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন! আর কি জন্য মন্দির ভাঙ্গা হইতেছিল? ঘোড়দৌড়ের মাঠের প্রসারবৃদ্ধির জন্য! ঘোড়দৌড় একটা খেলা মাত্র—আর তাহার সঙ্গী জুয়াখেলা—বাজী রাখিয়া জুয়াখেলা। সেই কাযের জন্য হিন্দুর ধর্ম্মায়তন ধুলিসাৎ বলিয়া গ্রাহ্যই করে না। এ দেশের লোককে তাহাদের কবি কিপিলিং বলিয়াছে:—"আধা শয়তান, আধা শিশু" (Half-devil half-child) কিন্তু যখনই এ দেশের লোক বুঝাইতে পারিবে, তাহারাও মানুষ, তাহারাও আত্ম-সম্মানজ্ঞানশীল, তাহারাও অধিকার রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে পারে—তখনই দেখা যাইবে, শ্বেতাঙ্গের এই উদ্ধত ব্যবহার তিরোহিত হইবে।

১৬ই কার্ত্তিক—

মেবার জেলে বিচারাধীন আসামী শ্রীযুত পাঠকের সহিত সাক্ষাতে আপত্তির সংবাদ। অমৃতসরে আ'ন অমান্ত কমিটার অফিস খোলা হইয়াছে। এলাহাবাদে বড় লাট গমনে হরতাল। মতিহারীতে বিহারের অসহযোগীদের পল্লীসংঘ গঠনের সংবাদ। হাইকোর্টে কাশীমবাজারের মহারাজা, শ্রীযুত এস এন হালদার ও যতীন্দ্রনাথ ঘোষের নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত মামলা ডিসমিস, বাদীরা খরচার দায়ী। রয়্যাল কমিশনের সদস্যগণ বিলাত হইতে বোম্বায়ে আসিয়া পহুঁছিলেন। গয়ায় বিহারী লাটের অভিনন্দন। ওডোয়ার-নায়ার মামলায় লাহোরে সার উমার হায়াতের জেরা। সাম্রাজ্যসংঘে লর্ড পীল ও সার সাপ্রুর ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রকাশ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর্থনীতিক সভায় সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র কতকগুলি সমান ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত।

১৭ই কার্ত্তিক—

১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের রাজবন্দীদের প্রতি কঠোর ব্যবহারের সংবাদ। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পণ্ডিত মালব্য নির্ব্বাচিত। আলিপুরে এক নোটজালের মামলায় এক জন উকীল, এক চিত্রকর, জনৈক ফটোগ্রাফার ও একজন কনট্রাক্টর অভিযুক্ত। ভারতীয় কারা আইনের কয়েকটি সংশোধন। ধন্না সিংএর বোমায় আহত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হর্টনের মৃত্যু। দারুলামান নামক স্থানে আফগান আমীরের নূতন রাজধানীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদ। নিউইয়র্ক হইতে মিঃ লয়েড জর্জ্জের বিলাত-যাত্রা, শ্রীযুত সোমেশচন্দ্র বসুকে সে জাহাজে বিলাতে আসিতে দেওয়া হয় নাই। বৃটেন, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, শ্যাম প্রভৃতি ২১টি রাজ্যের পোরমিট সংক্রান্ত চুক্তি।

১৮ই কার্ত্তিক—

অমৃতসরে গুরুদ্বার অফিসে খানাতল্লাস। অমৃতসরে স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সময় ধৃত ডাঃ সাত্তারাম শেঠের দুই বৎসর পরে কারামুক্তি। বোম্বায়ে নিখিল ভারত সংবাদপত্রসেবী সংঘ গঠিত। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মিড্‌ল টেম্পলের ছাত্রদের মধ্যে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করার সংবাদ। মেলবোর্ণে পুলিসের ধর্ম্মঘট।

১৯শে কার্ত্তিক—

বর্দ্ধমান জেল হইতে শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেনের মুক্তি। নাগপুরে হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্যে কয় দিনে ৮০ জন হিন্দু গ্রেপ্তার। এলাহাবাদে শ্রীমান্ রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৯।০ ঘণ্টায় ৪৩ মাইল সন্তরণের সংবাদ। নেপলস সহরের আন্তর্জাতিক দার্শনিক সভায় চট্টগ্রাম কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ ডাঃ এস এন দাস নিমন্ত্রিত। রয়্যাল কমিশনের ভারতীয় সদস্যরা দিল্লী যাইয়া পহুঁছিলেন। সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ায় মনোমালিন্য।

২০শে কার্ত্তিক—

লাহোরে রাজদ্রোহজনক পুস্তিকা-প্রকাশের অপরাধে দুই ব্যক্তির কারাদণ্ড। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেসে ১লা নবেম্বর চরমানাইর দিবস বলিয়া স্থিরীকৃত। শ্রীযুত কিরণচন্দ্র রায় মধ্যপ্রদেশে ইম্পিরীয়াল ফরেষ্ট সার্ভিসে নিযুক্ত। বেগুড় ডাকাতির সম্পর্কে আর দুই জন ধৃত। আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্ত দাস-প্রথার সরকারী বিবরণ প্রকাশ। বিলাতী নির্ব্বাচন সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের মানহানির অভিযোগে লর্ড এলফ্রেড ডাগলাস অভিযুক্ত।

২১শে কার্ত্তিক—

১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের বন্দীদের বাঙ্গালা সরকারের আশ্বাস। নিজাম রাজ্যে ভারতের নানা স্থানের ২৩ খানি পত্র গত কয় মাসে বাজেয়াপ্ত হওয়ার সংবাদ। অমৃতসরে সর্দ্দার হরদিৎ সিংয়ের ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। বরিশালের জন-নায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের লোকান্তর। সাম্রাজ্যসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধিদের চেষ্টার জন্য ভারত সরকারের ধন্যবাদসূচক টেলিগ্রাম। বোম্বায়ের ছয় জন পার্শী সাইক্লিষ্ট তিন বৎসরের মধ্যে পৃথিবী-পর্য্যটনের সঙ্কল্পে বাহির হইয়াছেন, তাহারা দিল্লী হইয়া সীমান্তের দিকে যাইতেছেন। বার-কামিটা গঠন। জার্ম্মাণীর উপর সম্মিলিত পক্ষের সামরিক কর্তৃত্বের দাবী। আঙ্গোরায় বিজয়লাভে কংগ্রেসের অভিনন্দনে মুস্তাফা কামালের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন।

২২শে কার্ত্তিক—

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলিকাতায় মিউনিসিপাল নির্ব্বাচন কমিটী গঠিত। নাগপুরে শোভাযাত্রার জন্য ডাঃ খাড়ে, পরাঞ্জপে, চোলকার প্রভৃতি নেতারা ধৃত, গ্রেপ্তারের সংখ্যা ১৬০। ঢাকায় অসহযোগী উকীল শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্তের বাটীতে খানাতল্লাস। দিল্লীতে রয়্যাল কমিশনের প্রথম অধিবেশন। কুরাম মিলিশিয়ার কাপ্তেন ওয়াটস্ সস্ত্রীক পরাচিনারে নিহত। দরিয়াগঞ্জে নিখিল ভারত বালিকা গুরুকুলের উদ্বোধন। সাম্রাজ্যসংঘের শেষ অধিবেশন।

২৩শে কার্ত্তিক—

কানপুর মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃক মৌলানা সৌকৎ আলির অভিনন্দন। মেদিনীপুরে শ্রীযুত শৈলজানন্দ সেন ও আর এক ব্যক্তি ১০৮ ধারায় এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত। দিল্লীতে প্যালেষ্টাইনের মুসলমান প্রতিনিধিদের উপস্থিতি। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুত কে কে, চন্দ ও পি, আর, ফুকন নির্ব্বাচিত। ব্যাভেরিয়ায় বিদ্রোহ; ডিক্টেটর লুডেনডর্ফ গ্রেপ্তার। মেলবোর্ণে পুলিস ধর্ম্মঘটের জন্য নূতন আইন পাশ। –

২৪শে কার্ত্তিক—

নাগপুরে হিন্দুদের শোভাযাত্রায় রাজা লক্ষ্মণনারায়ণ ভোঁসলো, সার চিৎনবীশ, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতির যোগদান; গ্রেপ্তার-সংখ্যা ৪৬০।

মহীশূরে নন্দীদুর্গ খনিতে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় লক্ষ টাকা ক্ষতি। হায়দ্রাবাদে হিন্দু অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় প্রতাপগড়ের মহারাজার ৫০ হাজার টাকা দান। বোম্বাই অঞ্চলের সামন্ত রাজ্যগুলির সহিত ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপন ব্যবস্থার ঘোষণা। জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্সের সাধারণ নাগরিকরূপে হল্যাণ্ড হইতে জার্ম্মাণীতে প্রত্যাবর্ত্তন। ব্যাভেরিয়ার সামরিক আইন জারী। জাতি-সংঘে ভারতের দেয় টাকার পরিমাণ কমিল না।

২৫শে কার্ত্তিক—

নাগপুরে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার আপোষ; হিন্দুদের শোভাযাত্রায় আর বাধা দেওয়া হইতেছে না। মান্দ্রাজে অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সভা স্বরাজ্যদলের মত অগ্রাহ্য করিয়া মন্ত্রিগণকে সমর্থন করিলেন। গিরিডী ও রাণীগঞ্জের মধ্যে চলন্ত ট্রেণ হইতে ই আর কোম্পানীর ক্যাশবাক্স উধাও। যুক্তপ্রদেশ, ছত্রার নবাব কর্ত্তৃক শিক্ষা-বৃত্তির জন্য ১০ হাজার টাকা প্রদান। যুদ্ধ-বিরতি দিবস উপলক্ষে জঙ্গীলাট কর্ত্তৃক ল্যান্সডাউনে ১৮ সংখ্যক রয়্যাল গাড়োয়ালী রাইফল সৈন্যদলের স্মৃতি-রক্ষক প্রস্তর-মূর্ত্তির উন্মোচন।

২৬শে কার্ত্তিক—

নিজাম রাজ্যে গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ৪২ জন ব্যক্তি বিনা বিচারে ও বিনা অভিযোগে নানা ভাবে দণ্ডিত হওয়ার বিবরণ—কেহ আটক, কেহ বহিষ্কৃত, কেহ নির্ব্বাসিত। ব্রহ্মে পুলিস সংস্কার কমিটী গঠিত। হাইকোর্টে শ্রীযুত এস এন হালদারের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত আপীল ডিসমিস। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাথিয়াবাড়, রাজকোটে উপস্থিতি। প্রেগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সার জগদীশচন্দ্র বসুর সাদর অভ্যর্থনা।

২৭শে কার্ত্তিক—

হুগলী জেলে অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ সত্যাগ্রহের ছয় জন কয়েদী আবার জেল আইন অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ওডায়ার-নায়ার মামলায় প্রতিবাদী পক্ষের সাক্ষ্য-গ্রহণ আরম্ভ; সাক্ষ্যে সামরিক শাসন সময়ের ভীষণ বিবরণ। বোম্বাই ধারবার রাজ্যে রাজদ্রোহের অপরাধে কর্ম্মবীর ও নবশক্তি সম্পাদকের দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। হাইকোর্টে কাশীমবাজারের মহারাজার নির্ব্বাচন মামলার আপীল ও ডিসমিস। লোহজঙ্গ ওয়ারীতে সশস্ত্র যুবকদলের ডাকাতিতে ১২ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হওয়ার সংবাদ। কলিকাতা হইতে এক দল বাঙ্গালী সাইক্লিষ্টের পেশোয়ার অভিমুখে গমনে হাজার মাইলের অধিক ভ্রমণের বিবরণ। মুলতান মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক শ্রমিকদের জন্য নাইট স্কুল খোলা হইল। প্যালেষ্টাইন কংগ্রেসে নূতন জাতীয় দল কর্ত্তৃক বালফুরের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য, কেবল আরবদেরই প্যালেষ্টাইনের উপর দাবী; ঔপনিবেশিক সচিব কর্ত্তৃক দাবী অস্বীকার।

২৮শে কার্ত্তিক—

অমৃতসরে কংগ্রেস নেতাদের পরামর্শ-সভা, আইন অমান্যের আলোচনা; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি আকালী আন্দোলনে সাহায্য-প্রদানের ব্যবস্থা স্থির করিলেন; আকালী সহায়তা কমিটী গঠন। রাজদ্রোহ মামলায় পাটনার তরুণ ভারতের ক্ষমাপ্রার্থনা। সরকার কর্ত্তৃক বোরসাদ মিউনিসিপ্যালিটীর উচ্ছেদ। কলিকাতায় কাউন্সিল-নির্ব্বাচন আরম্ভ বেগারে বাধা দিবার অভিযোগে বেলামে দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত। সার সাপ্রুর ইংলণ্ড হইতে ভারত-যাত্রা। বিলাতে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব আরম্ভ। গ্রীসে ৪ জন বিদ্রোহী সেনাপতির প্রাণদণ্ডের ও আর আর অনেকের কারাদণ্ডের আদেশ। বিলাতে কৃষির জন্য সরকারী সাহায্য দেওয়া সাব্যস্ত হইল। ক্রুপ কারখানা ক্ষতিপূরণের মাল দেওয়ায় ডাইরেক্টারদের অব্যাহতি। পোর্টসৈয়দে মেজর সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (আই, এম, এস) মৃত্যু।

২৯শে কার্ত্তিক—

আকালী নেতাদের মামলায় আসামী গ্রেপ্তারের প্রাথমিক গোলমালের জন্য নূতন মঞ্জুরী। প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর। বিলাতে উদ্ভিদের ও মাছের তেল বাহির করার বিদ্যা শিখিবার জন্য নোয়াখালীর শ্রীযুত আলি করিম বৃত্তি পাইলেন। বিলাতে বেকার সমস্যার মহাসভায় সরকারের নিন্দাসূচক প্রস্তাব।

৩০শে কার্ত্তিক—

বোম্বাই করপোরেশনে লাট অভিনন্দনে ন্যাশান্যালিষ্টদের আপত্তি। আকালী সহায়তা কমিটীর ডাঃ কিচলু ও জহরলাল নেহরু অমৃতসরে রহিলেন, অধ্যক্ষ গিডবানী প্রচার বিভাগের কর্ত্তা হইলেন। ভারতে নানাস্থানে জজিরাতুল-আরব দিবস পালন। আকিয়াবের নিকটে সমুদ্র-গর্ভ হইতে একটি নূতন দ্বীপের উদ্ভব। বরিশালে অশ্বিনী বাবুর স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা।

১লা অগ্রহায়ণ—

কলিকাতায় ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত। বেঙ্গল চেম্বার লৌহ-শিল্পে রক্ষা-শুল্কের বিরোধী থাকায় বোম্বায়ের কতিপয় ভারতীয় ব্যবসায়ীর নিখিল ভারত বণিক সমিতির নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অসম্মতি। আমেদাবাদের পার্শী পল্টনের কতিপয় যুবকের গ্রেপ্তারে চাঞ্চল্য। মিঃ চার্চ্চের মৃত্যু: মামলার রায় দিবার প্রয়োজন হইল না। কুষ্টিয়া, হরিনারায়ণপুরে কার্ত্তিকপূজার বিসর্জ্জনে মুসলমানদের আক্রমণ, প্রতিমা ভঙ্গ, অনেক হিন্দু প্রহৃত।

২রা অগ্রহায়ণ—

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মান্দ্রাজ মেল কলিকাতায় আসিতে পারে নাই, এম এস এম রেলও জখম। কলিকাতায় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু নির্ব্বাচিত। বিলাত-প্রত্যাগত সহধর্ম্মিণীকে লইয়া স্পেশ্যাল ট্রেণে লর্ড লিটনের কলিকাতা আগমন। মিশরের নির্ব্বাচনে জগলুলের দলের আধিক্য।

৩রা অগ্রহায়ণ—

পুণা মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক মৌলানা মহম্মদ আলির সংবর্দ্ধনা ব্যবস্থায় সরকারী বাধা। ফরিদপুরে শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের বিরুদ্ধে মানহানি মামলার শুনানী। ঝড়-বৃষ্টিতে বেঙ্গল নাগপুর রেলের ৮০ মাইল রেলপথ অল্প-বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত; ৩ মাইল জায়গা জলের নীচে। স্পেনের রাজা ও রাণীর রোমে উপস্থিতি।

৪ঠা অগ্রহায়ণ—

প্রবন্ধক কমিটীর সভাপতি সর্দ্দার রাওল সিং গ্রেপ্তার। শ্রীযুত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য আলিপুর হইতে মেদিনীপুরে স্থানান্তরিত; শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাসের সহিত রাজবন্দীদের ষড়যন্ত্রের কথা। শ্রীযুত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী নির্ব্বাচিত। নাগপুরে আবার হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ, কয়েকজন জখম।

৫ই অগ্রহায়ণ—

আকালী সম্পাদক সর্দ্দার মঙ্গল সিং পর্য্যাপ্ত সাক্ষ্যের অভাবে মুক্তি পাইলেন। গিধৌড় মহারাজের লোকান্তর। বিহারে টেরিটোরিয়াল গঠনে মুঙ্গেরের রাজা রঘুনন্দন প্রসাদের ১০ হাজার টাকা দান। কাপ্তেন পেটাভেলের হস্তে শিক্ষিত সমাজের জন্য উপনিবেশ স্থাপন ব্যবস্থায় মহারাজ নন্দীর ৫ হাজার ও শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবীর ৫ হাজার টাকা প্রদান। বড় লাটের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শনের সময় যে সব তালুকদার দরবারে যোগ দিতে পারেন নাই, তাহাদের কৈফিয়ৎ চাওয়া হইয়াছে। নাগপুরে হিন্দুদের আত্ম-রক্ষা সমিতি-গঠন। পারস্যের শাহ মহোদয়ের ফ্রান্স-যাত্রা।

৬ই অগ্রহায়ণ—

মিঃ ড্রু পিয়ারসন কর্তৃক মহাত্মার কারাদণ্ড-রহস্য প্রকাশিত, অসহযোগের সাফল্যে আশঙ্কা। শিখ লীগের সম্পাদক সর্দ্দার রণজিৎ সিং গ্রেপ্তার। কাথিয়াবাড়ের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক তালুকদার গোপালদাস আম্বাইদাস দেশাইয়ের পুত্রগণও তালুকের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র নির্ব্বাচিত। ব্রহ্মের ব্যয়হ্রাস কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। পুণার ষ্টাফ-সার্জ্জেণ্ট কুরি তহবিল তছরূপের জন্য অভিযুক্ত, তাঁহাকে বিলাত হইতে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

৭ই অগ্রহায়ণ—

নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অধিবেশন উপলক্ষে আমেদাবাদে নেতাদের সম্মিলন। পুণা মিউনিসিপালিটী কর্তৃক মৌলানা মহম্মদ আলির অভিনন্দন। ডাঃ মণিলালের চেষ্টায় ইদরের প্রায় সকল ভীল প্রজার কারামুক্তি। জামসেদপুরে গুরু নানকজীর জন্মোৎসবের শোভাযাত্রায় সরকারী বাধা। কলিকাতা বড়বাজারে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায়ের জয়, শ্রীযুত এস আর দাশের পরাজয়। ওয়াজির দস্যুদলের বৃটিশ সৈন্যদের উপর আক্রমণের জন্য আফগানিস্থানের ক্ষতিপূরণ। জার্ম্মাণীতে স্বাতন্ত্রিক আন্দোলনের অবসান; ষ্ট্রেসম্যান গবর্ণমেণ্টের পদত্যাগ। ডাবলিন কারাগারের প্রজাতান্ত্রিক কয়েদীরা প্রায়োপবেশন পরিত্যাগ করিলেন।

৮ই অগ্রহায়ণ—

আমেদাবাদে পরিবর্ত্তন-বিরোধী কংগ্রেস-নেতাদের সভা। পেশোয়ারে জেলা খেলাফৎ কমিটীর কর্ম্মীরা জজিরৎ-উল-আরব দিবসের শোভাযাত্রা উপলক্ষে ধৃত। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত। রায় বাহাদুর লালগোপাল মুখোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজ হইলেন। শ্রীযুত বি এল মিত্র বাঙ্গালার নূতন এডভোকেট জেনারেল হইলেন। ফরাসী ও বেলজিয়ম কর্তৃপক্ষের সহিত রুঢ়ের শ্রম-শিল্পীদের আপোষ। রুসিয়া হল্যাণ্ডের নিকট ৫০০ এরোপ্লেনের বায়না দিয়াছেন।

৯ই অগ্রহায়ণ—

নীলকান্ত বড়ুয়া মহাশয়ের লোকান্তর সংবাদ। কান্দাহারে বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহের সংবাদ। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৃটিশের আর একখানি মদের জাহাজ ধৃত, গ্রেপ্তারে মাল্লাদের সহিত মারামারি।

১০ই অগ্রহায়ণ—

মুসলমান ও আরব দেশগুলি পরিদর্শনের জন্য সেন্‌ট্রাল খেলাফতের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিদলের গমনের জন্য মৌলানা সৌকৎ আলির ছাড়-পত্রের জন্য আবেদন। সবরমতী আশ্রমে ওয়ার্কিং কমিটীতে আকালী সাহায্যের এবং মোম্বাসা কংগ্রেসে প্রতিনিধি-প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত। বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান মার্কাণ্টাইল মেরিণ কমিটীর অধিবেশন। মস্কোয় বলসেভিক কর্ম্মচারী কর্তৃক কতিপয় খৃষ্টান ভগ্নী প্রভৃতি গ্রেপ্তার। বিলাতে শ্রীযুত শাপুর্জী সাকলাতওয়ালা আবার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত।

১১ই অগ্রহায়ণ—

প্রবন্ধক কমিটীর ধর্ম্ম-প্রচারক জ্ঞানী গুরুমুখ সিং কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কৃষ্ণনগর, শস্তুনগরে ডাকাতিতে গৃহস্থের চেষ্টায় এক জন ডাকাত ধৃত, আর এক জন জখম। নাগপুরে হিন্দুদের ৩টি মন্দিরে গো-মাংস নিক্ষেপ; দুষ্কৃতকারীদের ধরিবার জন্য সরকারের পুরস্কার ঘোষণা। যশোহরের নলিনীনাথ রায় মহাশয়ের লোকান্তর। প্রসিদ্ধ গণিততত্ত্ববিদ্ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লোকান্তর সংবাদ। কুমিল্লা হইতে শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত ও ঢাকায় নবাব নবাব আলি নির্ব্বাচিত। পি এম বাক্‌চী কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী কিশোরীমোহন বাগচী মহাশয়ের লোকান্তর। লর্ড গশেন মাদ্রাজের নূতন গবর্ণর নিযুক্ত। লর্ড মর্লি'র সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু। তুর্ক কর্তৃপক্ষ আনাটোলিয়ার রেলপথ কিনিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিলেন, বৃটিশের চুক্তি বাতিল হইল। বৃটিশ রণতরীর একটি বহর সাম্রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইল।

১২ই অগ্রহায়ণ—

মাদ্রাজে নূতন মন্ত্রি-সভার নিন্দাসূচক প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য। খুলনায় শ্রীযুত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়, ফরিদপুরে কুমুদশঙ্কর রায়, বাঁকুড়ায় অনিলবরণ রায় নির্ব্বাচিত। সিনফিন কয়েদী ডেনিস বেরী প্রায়োপবেশনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় গীর্জ্জায় তাহার সমাধি দেওয়াও হইল না; প্রজাতন্ত্রের অদ্ভুত বিধি।

১৩ই অগ্রহায়ণ—

পুণার পল্লী অঞ্চলে গোরা সৈন্যের গুলীতে গ্রামবাসী নিহত। নোয়াখালীতে হাজী আবদার রসীদ খাঁ, বরিশালে শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন ও ২৪ পরগণায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমল নির্ব্বাচিত। বৃটিশ কলম্বিয়ায় ভারতীয়গণকে ভোটাধিকার-প্রদানে আপত্তি। পারস্যের শাহ প্যারিসে পহুঁছিয়াছেন। নূতন জার্ম্মাণ মন্ত্রি-সভা গঠিত।

১৪ই অগ্রহায়ণ—

পূর্ব্ব আফ্রিকার কংগ্রেসে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রী হইতে স্বীকৃত হইলেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের গবর্ণরকে অভিনন্দন প্রদানে অস্বীকৃতি। নির্ব্বাচনে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়, ডাঃ বিধান রায় নির্ব্বাচিত; সার সাপ্রু ও আলোয়ারের মহারাজার ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন। মেদিনীপুরের শুদ্ধকুমার অগস্তী মহাশয়ের লোকান্তর। বেলুচিস্থানে খয়বর এজেন্সীতে পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ফিনিস দস্যুর গুলীতে নিহত। গয়ায় বাঙ্গালা-বিহারের সন্ন্যাসী সভা। বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে ধৃত স্বাতন্ত্রিকগণের কারাদণ্ড। ক্ষতিপূরণে জার্ম্মাণীর ক্ষমতা-নির্দ্ধারণের জন্য আবার দুইটি কমিটী নিয়োগের সংকল্প।

১৫ই অগ্রহায়ণ—

রেঙ্গুনে জামিয়ৎ-উলেমায় সদস্যদের প্রতি বক্তৃতা-বন্ধের আদেশ; ইন্‌সিনের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটেরও ঐরূপ আদেশ-জারী। কলিকাতা প্রদর্শনীর উদ্বোধন; বাম্বা'র ব্যবস্থাপক সভায় বন্যা-পীড়িত কৃষকদের তাগাবীর ঋণের জন্য ১২ লাখ টাকা মঞ্জুর। রুস-ইটালী বাণিজ্য সন্ধি কার্য্যে পরিণত। বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চলে কোলিশ জিতাঙ্গ পত্র বন্ধ। ভূমিকম্পে ক্ষতির জন্য জাপান নৌ-বিভাগে খরচ কমাইলেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ—

অমৃতসরে মুসলমানদেরও আকালীদের অনুরূপ মসজিদ আন্দোলনের ব্যবস্থা। বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেসে দাশ মহাশয়ই আবার সভাপতি হইলেন, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিপিন পাল ও বি চক্রবর্ত্তীকে সদস্য করা হইল না। মোহজঙ্গ ষ্টীমার-ষ্টেশনে দুই জন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার। মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে জাল নোট বাহির, তিন জন গ্রেপ্তার। চট্টগ্রামে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নির্ব্বাচিত। উত্তর ইটালীতে তুমুল বৃষ্টির ফলে সেতু, কারখানা, গ্রাম পর্য্যন্ত নষ্ট; দুই শত জীবননাশের সংবাদ।

১৭ই অগ্রহায়ণ—

ত্রিচি জেল হইতে পণ্ডিত রাজপেয়ীর মুক্তি। উৎকোচ-দমনে নজাম বাহাদুরের ফরমান জারী। যুদ্ধের যৌবনপ্রাপ্তি চিকিৎসায় বিখ্যাত ডাঃ ষ্টাইনগার্ড ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় সরকারী বন্দোবস্ত, শাসক-সমিতির প্রতিষ্ঠা। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ উত্তর মেরুপ্রদেশে রণতরী ও এরোপ্লেন পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কলিকাতা ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী" বৈদ্যুতিক-মেসিন্ যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

“ চলে গাঁও খাড়ু”   নিঝাড়ি নিঝাড়ি
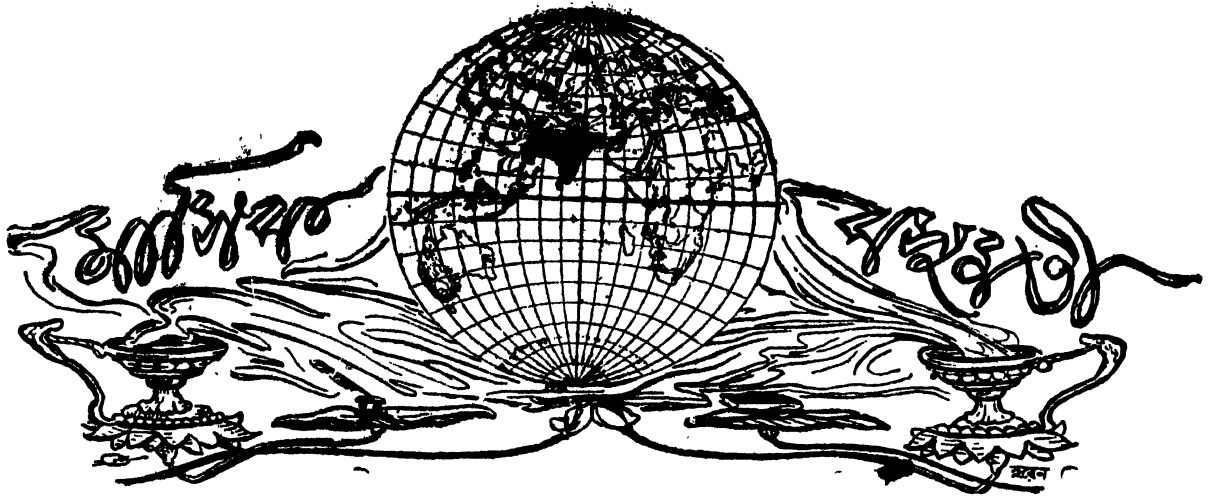
২য় বর্ষ } ২য় * মাঘ, ১৩৩০ * খণ্ড { ৪র্থ সংখ্যা

ভারত-ভারতী

নাহি বিশ্ব, নাহি দৃশ্য, দিবা-নিশামান,
বিরাজিত তম একেশ্বর ;
কাল স্তব্ধ, নাহি শব্দ, নাহি মাত্র স্থান
স্পন্দহীন কারণ-সাগর !
ধ্যানমগ্ন আদি কবি, প্রকটিল তব ছবি
ব্রহ্মবাণী অবয়বী প্রণবে প্রকাশ,
চমকিল তম হেরি মুখে মৃদুহাস !

ব্যোম ভরি ওঠে ওম্ গভীর ঝঙ্কার,
আদি কবি হৃদয়-বীণায়,
আনন্দহিল্লোলে দোলে মহা পারাবার,
শিবশক্তি সৃজন-লীলায় !
ঘূর্ণ্যমান পরমাণু, গ্রহ তারা শশী ভানু
একে একে উঠে ফুটে ছুটে সমীরণ,
কটাক্ষে তোমার জড় লভিল জীবন !

অরূপ অব্যক্ত ব্যক্ত স্বরূপে তোমার,
ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মার বাসনা !
কল্পনা-কমলাসনা সুষমা সাকার,
নিত্যানন্দারূপা নিরঞ্জনা !
সিত আভরণ কায়, সিতবাস শোভে তায়
শুভ্রশুচি তনুরুচি ভ্রমতমোহর,
করুণা পরশে খসে মোহের নিগড় !

হরষে ফুটিল ফুল পূজিতে চরণ,
নীর ভেদি উঠিল কমল—
আদরে হৃদয়পরে পাতিয়ে আসন
ধরে সাধে শ্রীপদযুগল !
জ্যোতির্ম্ময়ী তব ছবি, পৃথ্বীসনে শশী রবি
প্রদক্ষিণ করি করে মঙ্গল-আরতি ;
আনন্দে তোমায় বন্দি ভারত-ভারতি !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

কোকনদ কংগ্রেস

কোকনদ—কংগ্রেস মণ্ডপ
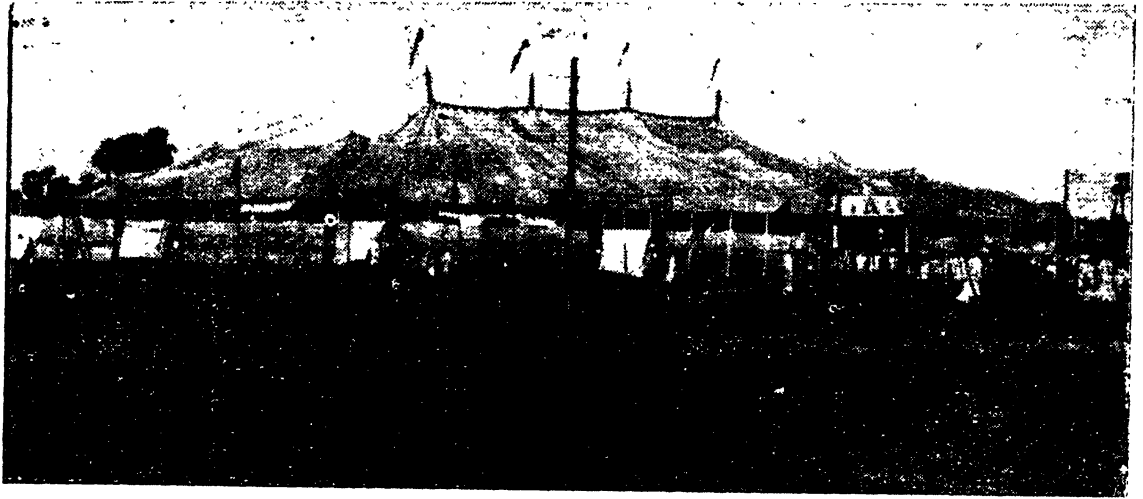
খদ্দর প্রচার সম্পর্কে কোকনদে গিয়াছিলাম; তথায় 'রথদেখা কলাবেচা' হিসাবে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনও দেখিয়া আসিয়াছি। অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব প্রভৃতি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আমার নাই—থাকিলেও আমি সে অধিকার ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক; কিন্তু কোকনদে জাতীয়-যজ্ঞে যাইয়া যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি, সেই সকলের সামান্য পরিচয় প্রদান করিব।

বাল্যকালে ট্রেঞ্চকৃত Study of Words নামক পুস্তক পাঠ করিয়া শব্দের কিরূপ অপব্যবহার হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরবীতে 'ইয়ার' বলিলে বন্ধু বুঝায়, কিন্তু বাঙ্গালায় 'ইয়ার' বলিলে যে শ্রেণীর বন্ধু বুঝায় সে শ্রেণীর প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। ইংরাজী 'Prejudice' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'পূর্ব্বাহ্নে বিচার করা'; কিন্তু মানুষ পূর্ব্বাহ্নে বিচার করিতে গেলে বিপরীত বিচার করিয়া বসে, বোধ হয়, এই জন্যই ক্রমে কথাটার অর্থ কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের সম্বন্ধে বাঙ্গালীদের যে সংস্কার, তাহা প্রায়ই না দেখিয়া গঠিত বলিয়া কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালীজাতি গর্ব্বস্ফীত হইয়া মনে করি শিক্ষায় ও ধীশক্তিতে আমরা ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অগ্রসর। এরূপ ধারণার কারণ আমরা ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইতে, বিশেষ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে, এই সংস্কারে অবিচলিত ছিলাম যে, যাহা কিছু প্রতীচ্য তাহাই অনুকরণীয় আর যাহা কিছু আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই দূষণীয় সুতরাং বর্জ্জনীয়।

তখন সংস্কারের নামে অনেকগুলি কুসংস্কার আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সুখের বিষয় তাহার প্রতিক্রিয়াও অল্পকাল পরেই আরম্ভ হয়। এমন কি যে রাজনারায়ণ বসু হিন্দুকলেজে একান্ত পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিই কিছুদিন পরে 'হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ক বক্তৃতায় স্রোতঃ ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন আমরা কুসংস্কারমুক্ত হইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আচার ব্যবহারের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার শরীর অপটু, স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং বয়সেও

নিখিল ভারত খিলাফৎ মণ্ডপ—সৌকতাবাদ, কোকনদ।

আমি বৃদ্ধ, তবুও কোকনদ হইতে যখন খদ্দর প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবার আহ্বান আসিল তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। মাদ্রাজ উপকূলে বাঁধ ও রেলের লাইন বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, কাজেই বোম্বাই ঘুরিয়া মাদ্রাজে যাইতে চার দিন চার রাত্রি লাগিল। সুখের বিষয়, সুসঙ্গীর অভাব হয় নাই। শ্রদ্ধেয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় লক্ষ্মীর উপাসনা করিবার অবকাশ পায়েন নাই—রেলের ভাড়াও কম নহে। তিনি প্রকৃত গণতান্ত্রিক নেতার মত তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইতেছিলেন। এ বিষয়েও তিনি মহাত্মা গন্ধীর প্রকৃত শিষ্যের মত কায করিয়াছেন। আর এক জন ধনী গুজরাটী ব্যবসায়ীকে দেখিলাম। তিনি ইচ্ছা করিলে হাওড়া হইতে কোকনদ পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়াই যাইতে পারিতেন। কিন্তু পাছে শ্যামবাবুর কোনরূপ অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি সস্ত্রীক শ্যামবাবুর সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাছে পথে আমাদের খাদ্যাদি সংগ্রহে কোনরূপ অসুবিধা হয়, সেই জন্য তিনি আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া ও টেলিগ্রাফ করিয়া এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক আড্ডায় আমরা গরম ভাত ও নানারূপ নিরামিষ তরকারী পাইয়াছিলাম। কোকনদে গুজরাট হইতে যত প্রতিনিধি গিয়াছিলেন, এই ব্যবসায়ী এক অন্নসত্র খুলিয়া তাঁহাদিগের সৎকার করিয়াছিলেন। সত্রের মুগের ডাইল আমি মুখরোচক বলায় তিনি স্নেহবশে আমার জন্য প্রায়ই তাহা পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার এই ব্যবহার ভারতের নূতন জাতি-গঠনের পক্ষে অমূল্য উপকরণ বলিয়াই বিবেচনা করি।

আমি রাজনীতিক আন্দোলন হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকি এবং কোকনদে কংগ্রেসে নিরপেক্ষ পরিদর্শক মাত্র। তথাপি আমি কোকনদে ট্রেণ হইতে নামিবামাত্র অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে এক ছড়া কর্পূরের মালা পরাইয়া দিলেন এবং মৌলনা ভ্রাতৃদ্বয়ের সংবর্দ্ধনার্থ সহরের মধ্য দিয়া যে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, আমাকে তাহার পুরোভাগে স্থাপিত করিলেন। এরূপ জনতা আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল এই শোভাযাত্রা চলিয়াছিল; বরাবরই রাস্তার উভয় পার্শ্বে লোকারণ্য। অন্ধ্রদেশে মহিলাদিগের পরদা নাই; সেই কারণে মহিলারা সর্ব্বত্র পরিদর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা

শোভাযাত্রাতে যে শোভাসঞ্চার হইয়াছিল, বাঙ্গালায় তাহা লক্ষিত হয় না।

অন্ধ্রদেশের অধিবাসী শতকরা ৯৯ জনের অধিক হিন্দু। দর্শকদিগের মধ্যে অধিকাংশই সুদূর পল্লী হইতে পদব্রজে এক বা দুই দিনের পথ অতিক্রম করিয়া সহরে আসিয়াছিলেন। সভাপতি ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বী। সে কথা কেহ যেন মনেও করে নাই। মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয় ভারতবাসী; তাঁহারা দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং সেজন্য লাঞ্ছনাও তিনি বলিলেন, "যদি হৃদয়ের পরিবর্ত্তনকে স্বরাজলাভ বলে, তবে আমাদের স্বরাজলাভ হইয়াছে।" শোভাযাত্রার সময় আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম—পথিপার্শ্বস্থ একটি মন্দির হইতে ব্রাহ্মণগণ আলিভ্রাতৃদ্বয়ের মস্তকে পুষ্প ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন; ভ্রাতৃদ্বয় তখনই দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অভিবাদন করিলেন। হিন্দু-মুসলমানে এই প্রীতি-পরিচয় পাইয়া অসীম আনন্দ অনুভব করিলাম।

কোকনদ কংগ্রেসমণ্ডপ—প্রধান তোরণ।

ভোগ করিয়াছেন। সেই জন্য জনসঙ্ঘ তাঁহাদিগের দর্শনলাভের আশায় ব্যাকুল হইয়াছিল। যে দেশে এরূপ উদ্বেলভাব লক্ষিত হয়, সে দেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কথা কেন উঠে, আমি বুঝিতেই পারি না। মাদ্রাজের বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক জনাব ইয়াকুব হাসান আমার পার্শ্বেই ছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এ যে জন-সমুদ্র! জননায়কের প্রতি জনগণের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি যদি স্বরাজলাভের নিদর্শন না হয়, তবে সে নিদর্শনের স্বরূপ কি?" উত্তরে

স্বেচ্ছাসেবকদিগের অমায়িকতায় ও বিনীত ব্যবহারে সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সংখ্যায় ১৫ শত। অনেকে ইংরাজী জানেন না; কিন্তু সকলে একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত—কিসে প্রতিনিধিদিগের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন। আমি বাঙ্গালী ও অন্য জাতীয় প্রতিনিধিদিগের শিবিরে যাইয়া ইঁহাদিগের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সকলেই ইঁহাদিগের অশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহারা সমস্ত রাত্রিই প্রহরীর কার্য্য করিতেন এবং কোন

অভাব জানাইবামাত্র তাহার প্রতীকার করিতেন। স্বেচ্ছাসেবকদিগের নায়করা রাত্রিকালে আসিয়া সন্ধান লইতেন, কোন স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তব্যপালনে ত্রুটি করিয়াছে কি না। এক দিন রাত্রিকালে এক জন স্বেচ্ছাসেবক ঘুমাইয়া পড়ায় নায়ক কর্ত্তৃক যে ভাবে তিরস্কৃত হইয়াছিল, সে ভাবের তিরস্কার বাঙ্গালার স্বেচ্ছাসেবকরা সহ্য করিত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। বাঙ্গালায় স্বেচ্ছাসেবকরাও অনেক সময়ে কোন আদেশ করিলে তর্ক করে—নায়কের আপামর সাধারণ আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সকলেরই পরিধানে শুভ্র খদ্দর বস্ত্র। বাঙ্গালার ন্যায় অন্ধ্রদেশের এখনও কপাল পুড়ে নাই। আমরা অতিমাত্রায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন, তাই বাঙ্গালায় ইতর ভদ্র সকলেই সূক্ষ্ম ও কোমল বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্ত; এই জন্যই বাঙ্গালায় বিদেশী কাপড়ের এত প্রচলন। অনেকে কৈফিয়ৎ দেন, তাঁহারা জোলার নিকট হইতে কাপড় কিনিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা তাঁহারা কাহার চক্ষুতে ধুলি নিক্ষেপ

কোকনদ কংগ্রেস—জাতীয় পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা।

আদেশ অবিচারিতচিত্তে পালন করা যে শৃঙ্খলার মূলমন্ত্র, তাহা তাহারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখে না।

যে দৃশ্য আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুগ্ধ করিয়াছিল এবং যাহাতে আমার সমস্ত পথক্লেশ দূর হইয়াছিল, এখন তাহারাই উল্লেখ করিব। গন্ধীনগরে প্রত্যহ দূর পল্লীগ্রাম-সমূহ হইতে এত লোকের সমাগম হইত এবং প্রদর্শনী এত জনাকুল হইয়াছিল যে, দুই তিনটি দ্বারপথে দর্শকদিগের প্রবেশব্যবস্থা করিয়াও জনতা হ্রাস করা যাইত না।

করেন? ৪০ নম্বরের উপরের যত মিহি সূতা, সবই ম্যাঞ্চেষ্টারের কলে প্রস্তুত হইয়া আইসে। সে সূতায় যে কাপড় হয়, তাহা ব্যবহার করিলে কি ম্যাঞ্চেষ্টারকে সাহায্য করা হয় না? অন্ধ্রদেশে এখনও ক্ষেত্রে তূলা হয়, ঘরে ঘরে চরকায় সূতা কাটা হয় এবং পাড়ায় পাড়ায় তন্তুবায় তাঁত চালায়; সুতরাং অন্ধ্রদেশবাসীরা দেশী বা বিদেশী কলের কাপড়ের তোয়াক্কা রাখে না। বাঙ্গালার অর্থব্যয়, ক্লেশ-স্বীকার ও চীৎকার করিয়া যাহা করিতে পারা যাইতেছে

না, অন্ধ্রদেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অতি সহজে তাহা করিয়াছে। প্রদর্শনীতে দেখা গেল, বৃদ্ধা বিনা আয়াসে অন্যূন ৬০ নম্বরের সূতা কাটিতেছে এবং সেই স্থানেই তাঁতে সেই সূতায় সুন্দর কাপড় বয়ন করা হইতেছে। ফলকথা যে সূক্ষ্মশিল্প ঢাকা অঞ্চল হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে অন্ধ্রদেশে তাহা এখনও জীবিত এবং মহাত্মার বাণী তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত আমার যমুনালাল বাজাজ মহাশয় এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "সতীশবাবুকে অন্যূন এক বৎসরের জন্য ছুটী দিয়া এই অঞ্চলে খদ্দরপ্রচার কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক হইতে অনুমতি দিউন।" তাহাতে আমি উত্তর করিয়াছিলাম, "সতীশবাবুকে বাঙ্গালা হইতে টানিয়া আনিলে কেবল বেঙ্গল কেমিক্যালেরই ক্ষতি হইবে না, বাঙ্গালায় খদ্দরপ্রচার কার্য্য অচল হইয়া দাঁড়াইবে।"

কংগ্রেসে নাচতামাসা থিয়েটার, বা জুয়াখেলার গন্ধমাত্র
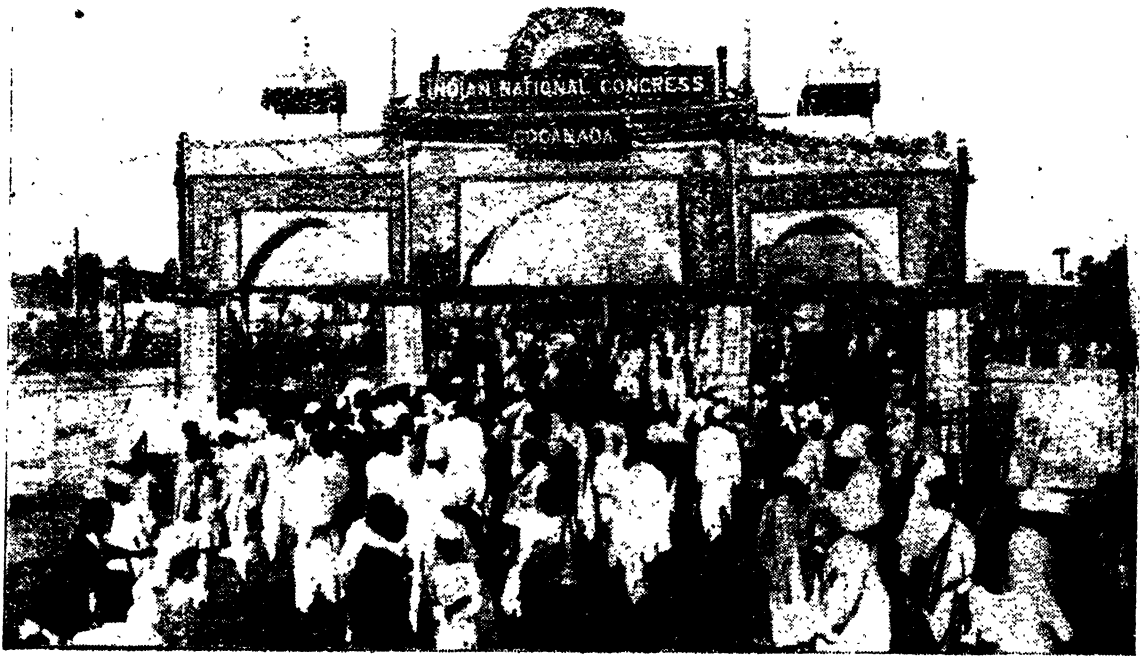
কোকনদ কংগ্রেস—কর্ণাট প্রদেশের প্রতিনিধিগণ।

স্বাস্থ্যের প্রহরী হইয়া কোকনদে উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই অবগত আছেন, বাঙ্গালা দেশে খদ্দরপ্রচার কার্য্যে তিনি কেবল আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ নহেন, পরন্তু আমাকে এই কাযে নামাইবার এক জন প্রধান পাণ্ডা। যে সাত আট দিন আমরা কোকনদে ছিলাম, সে কয় দিন প্রায় প্রত্যহই কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ খদ্দর উৎপন্ন হয়, তিনি তাহার সন্ধান লইতেন। অন্ধ্রদেশে খদ্দরপ্রচারের অসাধারণ সাফল্যে তিনি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় ছিল না। তথাপি প্রতিদিন মণ্ডপে অন্যূন ১৫ হাজার লোক আসিত—তিলার্দ্ধস্থান থাকিত না। এতদ্ব্যতীত মণ্ডপের বাহিরে ৩০।৪০ হাজার লোক একবার নেতৃবৃন্দকে দেখিবার আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরভাবে রৌদ্রে দাঁড়াইয়া অতিবাহিত করিত। ইহাদিগের জন্য মণ্ডপের বাহিরে কয় দিন দুইটি করিয়া অতিরিক্ত সভা করিতে হইয়াছিল। নেতৃগণ পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া সেই সব সভার বক্তৃতা করিতেন। এবার এই একটি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, কোন

বক্তা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলে সঙ্গে সঙ্গে তেলেগু ভাষায় জনসাধারণকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া হইত। এই যে নবজাগরণ—এই যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন, ইহা যে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীর নিকটে পৌঁছিয়াছে, ইহাতে আশা হয়, আমরা অচিরেই স্বরাজলাভ করিতে পারিব।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধ-সমালোচকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নানা দূরস্থান হইতে প্রতিনিধিদিগের এক স্থানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়া বিশেষ কোন ফললাভ হয় না—৩ দিনের তামাসায় সব শেষ হইয়া যায়। উত্তরে আমি বলি, রাজনীতির দিক বাদ দিলেও সামাজিক হিসাবে এইরূপ বার্ষিক সম্মিলনের উপযোগিতা কোনরূপেই অস্বীকার করা যায় না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতা ও প্রতিনিধিরা এক স্থানে সম্মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করিলে অনেক কুসংস্কার দূর হইয়া যায়। আরম্ভেই বলিয়াছিলাম, আমরা বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু এই তথা-কথিত পশ্চাদ্‌পদ অন্ধ্রদেশের নিকট বাঙ্গালার শিক্ষা করিবার অনেক বিষয় আছে। অন্ধ্রদেশে ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার হয় নাই, কিন্তু তথায় দেশাত্মবোধ সর্ব্বত্র পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয় দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর চেহারা দেখিলে দুঃখ হয়—দেহ অস্থিকঙ্কালসার, কোটর-প্রবিষ্ট ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষুতে চশমা, যেন মৃত্যুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া আছে। ম্যালেরিয়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা নহে; পরন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বাঙ্গালীকে দিন দিন দুর্ব্বল করিতেছে। অন্ধ্রদেশে অধিবাসীরা প্রায়ই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ। এ দেশে গব্য সুলভ; প্রায় সকলেই ঘৃত খাইতে পায়। তদ্ভিন্ন অন্ধ্রদেশে অদ্যাপি উচ্চশিক্ষার ভীষণ বন্যায় প্লাবিত না হওয়ায় তথায় যুবকদিগের স্বাস্থ্য অধিক ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

কোকনদ কংগ্রেস—বাঙ্গালা ও উৎকল প্রদেশীয় প্রতিনিধিগণ।

এবার কংগ্রেসে বিরাট ব্যবস্থা যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত

পরিচালিত হইয়াছিল, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যহ এক এক বারে প্রায় ২ সহস্র লোক পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিতেন। শেষ দিন বিদায়ভোজে ৫।৬ হাজার লোক একসঙ্গে বসিয়াছিলেন অথচ পরিবেশনে কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় নাই।

মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানের ন্যায় অন্ধ্রদেশে ব্রাহ্মণাধিপত্য নিবিষ্ট নয়। অন্ধ্রের নেতারা ব্রাহ্মণ হইলেও তথা-কথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতিবিষয়ে সচেষ্ট। এই নিম্নশ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রত্যহ প্রত্যূষে যখন পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করিতেন এবং নেতৃবৃন্দের শিবিরে আসিয়া আপনাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রার্থনা করিতেন, তখন আমার হৃদয় বিগলিত হইত। ইঁহারা ইঁহাদিগের পরিচালিত বিদ্যালয়, তাঁতশালা, প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিদর্শন করিবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং আমার প্রতিশ্রুতি আদায় না করিয়া ছাড়েন নাই। কত দিনে সে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

কোকনদ কংগ্রেসের সুমধুর স্মৃতি আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। সেই সব কথা স্মরণ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিলাম।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

শ্যাম বিহনে

১

কোকিল-বধূরে মানা কর সই
ডাকে নাক যেন আর,
শ্যামচাঁদ বিনা আজিকে আমার
হৃদয় অন্ধকার।
গুঞ্জরি' যেন আসে নাক অলি
চুমিতে কুঞ্জ-কুসুমের কলি,
কেকা-রব যেন করে না কলাপী
কুঞ্জ-কুটীরে আর।
শ্যামচাঁদ বিনা আজিকে আমার
গোকুল অন্ধকার।

২

ফুটিতে বারণ ক'রে দে লো সই
চামেলির কলিকায়,
ভরিতে কুঞ্জ-বিতান-ভবন
সৌরভ-সুষমায়।
আজি শ্যামায়িত কুঞ্জ-ভবনে,
কুসুম-গন্ধে মন্দ পবনে
বারে বারে মনে পড়ে, সই, সেই
ব্রজের চন্দ্রমায়।
তোরা ফুটিতে বারণ ক'রে দে লো, সই
চামেলির কলিকায়।

৩

চাঁদেরে ব'লে দে, সে যেন আজিকে
উঠে না গগন-গায়,
নিবিড় আঁধারে মগ্ন রহুক্
নিখিল-গোকুল-কায়।
আধ-ঘুমঘোরে জ্যোৎস্না নিরখি'
ডেকে উঠে যদি দু' একটি পাখী
কি জানি নীরব সাধনা আমার
ভেঙ্গে যায় যদি তায়।
আকাশে উঠিতে আজি, সই, মানা
কর গো চন্দ্রমায়।

৪

নিকুঞ্জে আর রহিতে নারি লো
কোথা যাব তোরা বল্?
বঁধুরে এনে দে' বঁধুরে এনে দে'
পড়ি গো চরণ-তল।
নিভাসনে দীপ দেখিস্ সজনি,
পোহায় না যেন আজি এ রজনী,
নিশি আছে ভেবে' আসে যদি শ্যাম
ফলিবে সাধন-ফল।
নিকুঞ্জে রহিতে নারি যে গো আর,
কোথা যাব তোরা বল্?

শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার।

মুক্তি ও ভক্তি

৭

ভক্তির আর একটি স্বভাব এই যে, ইহা সুদুর্লভ। ইহা আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রতীত হইতে পারে। কারণ, সর্ব্বসাধারণের ইহাই বিশ্বাস যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, বিশেষতঃ কলিযুগে। শাস্ত্রেও বহু স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, কলিযুগে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম ভাল করিয়া অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ, লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃই কমিতেছে, যজ্ঞসম্পাদনের প্রধান সাধন ঋত্বিক্ বা পুরোহিত, উপনয়ন সংস্কার ও তন্মূলক বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির অত্যন্ত অবনতি বা অভাববশতঃ বেদার্থজ্ঞান না হওয়ায় যজ্ঞ করিবার উপযুক্ত শ্রদ্ধা কদাচিৎ কোন ব্যক্তির থাকিলেও পুরোহিত পাওয়া ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা ছাড়া বিশুদ্ধ ঘৃত প্রভৃতি যজ্ঞসাধন-দ্রব্যনিচয় ভেজালের দৌরাত্ম্যে ও গোহত্যার আধিক্যবশতঃ সুদুর্লভ হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে বেদবিহিত কোন কর্ম্মই যে কলিযুগে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? বাকী রহিল জ্ঞান, এই জ্ঞানশব্দের অর্থ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা ত কোন যুগেই সুলভ ছিল না, বিশেষতঃ কলিযুগে ইহা একেবারেই অসম্ভব বলিলেও বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। কারণ, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান শব্দের অর্থ এই, কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ যে জীব বা অহং, তাহা ব্যবহারিক বা অজ্ঞানকল্পিত; নামরূপবিবর্জ্জিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই সৎ; আর সকলই মিথ্যা, এই প্রকার জ্ঞান, ইহা বলিতে বা শুনিতে ব্যক্তিবিশেষের ভাল লাগিলেও ইহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে সমর্থ অতি অল্প লোকই হইয়া থাকে, দুঃখের দারুণ কশাঘাতে ক্ষণিক বৈরাগ্যের প্রেরণায়, আমি কিছুই নহে, আমি মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য এই প্রকার জ্ঞান কোন কোন ব্যক্তির কদাচিৎ সম্ভবপর হইলেও অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত সুদৃঢ় ভোগ-বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রও তাহাই বলিয়া থাকে, গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকেও ইহা বুঝাইতে যাইয়া স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে এই অদ্বৈততত্ত্বের অনুভূতিরূপ সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য এক জন হয় ত প্রযত্ন করিয়া থাকে; সেই প্রযত্নশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বা যথার্থভাবে এই অদ্বৈততত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। সমর্থ না হইবারই ত কথা, কারণ, গুণময়ী প্রকৃতির অনাদিকাল হইতে প্রসারিত বিচিত্ররূপ সৃষ্টির মধ্যে নিপতিত, সুখভোগলালসা, রূপের অনুভূতির জন্য বদ্ধপাগল, এই দেহসর্ব্বস্বজীবের পক্ষে উন্মাদিনী রূপতৃষ্ণা বা বিষয়ভোগ বাসনার পরিহার যে কিরূপ অসম্ভব ব্যাপার, তাহা কে না বুঝে? এই রূপতৃষারই চিত্র অঙ্কনা করিতে যাইয় ভাবের কবি বিদ্যাপতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় গাহিয়াছেন—

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল।"

এই ত সংসার! রূপতৃষার দুর্ব্বিষহ দহনজ্বালায় হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহাতে নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ হোতার ন্যায় রূপাদি ভোগ্যসমূহকে অবিরত আহুতি দিতেছে, প্রতপ্ত ইক্ষুদণ্ডের চর্ব্বণবৎ মুখ পুড়িলেও রসাস্বাদের মোহময় আবেগে দহননিবৃত্তির চেষ্টা হইতেছে না, জ্বালা বাড়িতেছে, বাড়ুক, পতঙ্গের ন্যায় রূপের অনলময় সাগরে পুড়িয়া মরিতে পারিলেই যেন চরিতার্থতা লাভ করিতে পারা যায়, এই উন্মাদনাময় বিশ্বাস বা সংস্কার এক ক্ষণের জন্যও ভোগলম্পট জীবকে ছাড়িতে চাহে না। ইহাই হইল জড় ও চেতনের অনাদিসৃষ্ট ব্যবহারিক মিলনের অপরিহার্য্য পরিণাম, ইহা পরিণতিবিরস হইলেও আপাতমধুর, হেয় বলিয়া প্রতীত হইলেও অশক্যপরিহার, ইহা অনন্ত নরকের পুতিগন্ধে নিত্য কলুষিত হইলেও তোমার আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আস্বাদ্যতর বস্তু

গগনকুসুমবৎ অলীক ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, অন্তঃকরণের এই বিষয়োপভোগবাসনা নিবারণ করিবার উপায় বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও নিষিদ্ধকর্ম্মের বর্জ্জন। কলিযুগে তাহা ক্রমশঃই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, এই কারণে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা এ যুগে অতি বিরল, চিত্তশুদ্ধি না হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারও হইতে পারে না, ইহাই ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তাহাই যদি হইল, তবে জ্ঞানরূপ সাধনও এই যুগে প্রায় অসম্ভব, এই জন্য ভক্তি ব্যতীত কলিতে জীবের আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভের অন্য কোন উপায় নাই। অথচ সেই ভক্তিই যদি সুদুর্লভ হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, কলির হতভাগ্য জীবের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি কোন প্রকারেই হইতে পারে না। ভাগবতে কিন্তু ভক্তির অধিকারী যেরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই যুগে অধিকসংখ্যক মানবই ভক্তিরূপ সাধনের উপর নির্ভর করিতে পারে ও নির্ভর করিয়াও থাকে। কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির অধিকারী এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভাগবতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

"নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনাবিণ্টচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধশ্চ যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

এই দুইটি শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই—যাহাদের কর্ম্মে বিরক্তি আসিয়াছে, এবং বৈরাগ্যভরে যাহারা কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, জ্ঞানযোগ দ্বারা তাহারাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যাহারা শ্রদ্ধালু অথচ সুখভোগ কামনা করে, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই সিদ্ধিকর, কিন্তু যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ যাহার ভোগ্যবিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিও নাই, তাহার যদি আমার (ভগবানের) কথা শ্রবণে বা গুণ নাম প্রভৃতির কীর্ত্তনে, কোন ফলকামনা না থাকিলেও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেয়োলাভের সাধন হইয়া থাকে।

আরও ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে—

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেক এব গুণো মহান্।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গো দিবং ব্রজেৎ॥"

(কলিযুগ অসংখ্য দোষের আকর হইলেও ইহার এই এক মহান গুণ যে, এই যুগে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিতে পারিলেই বিষয়াসক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মনুষ্য স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয়।)

নববিধ ভক্তির মধ্যেই কীর্ত্তন পরিগণিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তন সুদুর্লভ নহে, ইহা সকলেরই বিদিত, ইহাই যদি ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে সঙ্গত হয় যে, ভক্তির ইহাই স্বভাব যে, ইহা সুদুর্লভ?

ইহার উত্তর এই যে, ভাগবতই ভক্তিকে সুদুর্লভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, যথা—

"রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্ মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ভক্তিযোগম্॥

ভাগবত ৫।৬।১৮

শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে রাজন্, ভগবান্ মুকুন্দ যদুবংশীয় ও তোমাদিগের পাণ্ডুকুলের কি নহে? উদ্ধব ও অর্জ্জুনকে দ্বার করিয়া তিনি তোমাদিগকে কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তির গূঢ়রহস্য বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন; সুতরাং তিনি তোমাদের গুরু; তোমরা সকলেই তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিলে, এই কারণে তিনি তোমাদের প্রিয়; সকল প্রকার বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া তিনি তোমাদিগকে পালন করিতেন, এই জন্য তিনি তোমাদের কুলপতি; তোমার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালন করিয়া তিনি কিঙ্করেরও কায করিয়াছেন; ইহা সকলই সত্য; কিন্তু ইহাও সত্য, তিনি মুক্তি অনায়াসেই দিয়া থাকেন; পরন্তু কোন সময়েই কাহাকেও মুক্তির ন্যায় ভক্তিযোগ শীঘ্র দান করেন না।

একই ভাগবত এইরূপে কখন ভক্তিকে অতি সুলভ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে, আবার কখনও তাহাকে অতি দুর্লভ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। ইহা আপাততঃ পরস্পর-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও ইহার মধ্যে অবিরোধকর গূঢ়রহস্য বিদ্যমান আছে, যাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এই প্রকার বিরোধশঙ্কা উঠিতে পারে না। এইক্ষণে তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভাগবতশাস্ত্রে ভক্তি দ্বিবিধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে;—অপরা ভক্তি ও পরা ভক্তি। অপরা ভক্তির আর

একটি নাম সাধনভক্তি; পরা ভক্তির আর একটি নাম সাধ্যভক্তি। এই সাধ্যভক্তিই প্রেম, প্রীতি ও ভাব প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও অভিহিত হইয়া থাকে। সাধন ভক্তি বা অপরা ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা সুলভ। এই সাধনভক্তিতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে। এই সাধনভক্তির সম্যক্ অনুষ্ঠান না হইলে সাধ্যভক্তি বা ভগবৎপ্রেম হয় না, ইহাই হইল, ভাগবত প্রভৃতি সকল ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তিরই সুদুর্লভতা শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থে যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে সেই প্রেমভক্তির স্বরূপ কি, তাহার নিশ্চয় না হইলে এই সুদুর্লভতা স্পষ্ট বুঝা যাইবে না, সেই জন্য এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে;—

ভক্তিশাস্ত্রে প্রেমই পরমপুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিই অন্যান্য শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; প্রেম কিন্তু এই চারিটির মধ্যে প্রবিষ্ট নহে, ইহা পঞ্চম পুরুষার্থ। ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অসাধারণ সিদ্ধান্ত। সেই প্রেম কাম বা ভোগাভিলাষ নহে, এই প্রেমতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া কোন ভক্তকবি বলিয়াছেন—

বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া,
যার স্বল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া।
প্রেম প্রেম বলে সবে প্রেম জানে কেবা?
প্রেম ত কখনো নহে রমণীর সেবা।
পুত্রাদির লাগি মনে আর্ত্তি যদি হয়,
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব সেও কভু নয়।

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

তবে সে প্রেম কি?—

আত্মারামের লাগি আর্ত্তি যদি হয়,
বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব মহাজনে কয়।

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

শ্রীচৈতন্যের অনুগত প্রিয় ভৃত্য গোবিন্দদাস এই কয়টি পয়ারে অতি সংক্ষেপে বিশ্বজনীন ভগবৎপ্রেমের যেরূপ সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। এই প্রেমরহস্যই সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। একটু দার্শনিকভাবে ইহার আলোচনা না করিলে, এই দুরূহ বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝা যাইবে না, সুতরাং এক্ষণে তাহাই করিব।

মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব—সুখ পাইবার জন্য অদম্য ইচ্ছা, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না—সুখ আমাদের চিরপরিচিত, সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও তাহারই পরিচয় ও তাহারই অনুভব করিবার জন্য আমরা সর্ব্বদা লালায়িত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছি। যাহা নিত্যবিরাজমান, যাহার সহিত বিচ্ছেদ কখনও সম্ভবপর নহে, তাহা পাইবার জন্য লালসার বৃশ্চিকদংশন কেন যে মানবের সর্ব্বদা হইতেছে, তাহার উত্তর কে দিবে? কে সেই রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়া আমার এই চিরদিনের ভ্রান্তি ও তন্মূলক ব্যাকুলতা মিটাইবে?

শ্রুতি বলিতেছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

(প্রাণিসমূহ আনন্দ হইতেই উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া তাহারা আনন্দেই বাঁচিয়া থাকে, আবার প্রয়াণকালে সেই আনন্দেই বিলীন হয়।)

এই আনন্দেই অভিব্যক্তি, আনন্দেই স্থিতি ও আনন্দেই লয় যদি জীবের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম বা স্বভাব, তবে এই আনন্দ পাইবার জন্য এই যে জীবের ব্যাকুলতা, এই যে দারুণ পিপাসা, ইহা আইসে কোথা হইতে?

আনন্দ পাইবার জন্য—আনন্দ আস্বাদন করিবার জন্য—আনন্দময় হইবার জন্য অনিবার্য্য অভিলাষ যেমন জীবের স্বভাব, তেমনই এই আনন্দ স্বতঃসিদ্ধ হইলেও, নিত্যপরিচিত হইলেও, ইহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা যে কেন হয়, তাহাও জানিবার জন্য তীব্র অভিলাষও আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানবীয় ভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থে—শ্রুতিতে এই নিগূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য মানবের উৎকট আকাঙ্ক্ষা কেমন সুন্দর ও সরলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে;—

"কেনেষিতং পততি মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃশ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥"

(কেনোপনিষৎ)

(কাহার প্রেরণায় সুখ খুঁজিতে মন চঞ্চল হইয়া বিষয়ে পড়িতেছে? জননীজঠর হইতে নিপতিত হইবামাত্র কে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্বারা প্রাণপ্রবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়াছে? কাহার প্রেরণায় বিষয়ভোগের জন্য বাগিন্দ্রিয় পরিচালিত হইতেছে? ওগো! সে দেবতাটি কে, যিনি আমাদের নয়নকে রূপের অনুভূতির জন্য আর শ্রবণকে শব্দ শুনিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন?)

চেতন ও জড়ের ভোগ্য-ভোক্তৃভাবে এই বিচিত্র মিলনরূপ প্রাকৃতরাজ্যে বাহিরে উপভোগ্য বিষয়নিবহের বা অন্তরে বাক্ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের যাহা কিছু ক্রিয়া, স্পন্দন বা উন্মেষ, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সুখাস্বাদন বা ভোগ, সেই সুখাস্বাদনের যাহা কিছু অন্তরায়, তাহারই দুঃখ, সুতরাং দুঃখনিবৃত্তির জন্য যত প্রকার চেষ্টা পরম্পরায় হউক্ আর সাক্ষাতেই হউক, সে সকলেরই উদ্দেশ্য ঐ সুখাস্বাদ বা ভোগ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে, সুখাস্বাদের অন্তরায় যতই প্রবল হয়, ততই সুখাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া থাকে, ইহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নহে।

এক্ষণে বিচার্য্য এই যে, এই ভোগ বা সুখাস্বাদের অন্তরায় বা দুঃখ আসে কোথা হইতে? আত্মা যদি সুখস্বরূপ হয়, প্রকাশ যদি তাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব হয়, তাহা হইলে সে প্রকাশময় আত্মাতে সুখ-স্ফুরণের অভাব ক্ষণকালের জন্যও বা হয় কেন? আর সেই অভাবের আক্রমণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবার জন্য জীবনিবহের মন ইন্দ্রিয় বা দেহের এই অবিশ্রান্ত প্রবৃত্তিই বা কিরূপে হয়? জড় প্রাকৃত রাজ্যের সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ, বৃহত্তর বা বৃহত্তম এমন কোন বস্তুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যাহার প্রভাবে চেতন, অপরিণামী, সুখময় ও প্রকাশময় চিদাত্মাতে এই অনির্ব্বচনীয় দুঃখাত্মতা উপনীত হইতে পারে। বৌদ্ধ প্রভৃতি নৈরাত্মবাদী দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের অন্য কোন উত্তর খুঁজিয়া পায়েন নাই, তাই তাঁহারা আত্মা বা অহং পদার্থকে একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চার্ব্বাকগণ এই সমস্যার অন্য কোন সমাধান করিতে না পারিয়া আত্মাকে জড়নিচয়ের পরিণতিরূপে পরিণত করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আস্তিক দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ বা আত্মাকে অর্দ্ধ জড় ও অর্দ্ধ চেতন বলিয়াছেন। এই সকল মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইহা-উপযুক্ত অবসর নহে; কারণ, ঐ প্রকার নৈরাত্মবাদী বা অর্দ্ধনৈরাত্মবাদী দার্শনিকগণের মতবাদের উপর ভক্তিসিদ্ধান্তের অস্তিত্ব নির্ভর করে না। আত্মার অবিনাশিত্ব ও ভোগপ্রপঞ্চের মায়িকত্ব যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় আত্মার অহংভাবকে কল্পিত বা অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদী বলিয়া দার্শনিকসমাজে সুপরিচিত। আর এক সম্প্রদায় জীবের অহম্ভাবকে পারমার্থিক বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়া দার্শনিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্তই ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি, এই সিদ্ধান্তানুসারে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে এই প্রাপঞ্চিক আবরণ কেন-আইসে, দুঃখসম্বন্ধ কেন হয়, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

সুখময় আত্মার সুখী হইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর আকাঙ্ক্ষার বশে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সর্ব্বদা ব্যাকুলতাময় পরিস্পন্দন বা প্রবৃত্তি কেন কোথা হইতে আইসে, এই জিজ্ঞাসার পরিচয় আমরা কেনোপনিষদে পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া সেই কেনোপনিষৎ কি বলিতেছে, এখন তাহাও দেখা যাউক;—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি ন মনো ন বিদ্মঃ
ন বিজানীমঃ যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাৎ অথোঽবিদিতাদধি
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেনস্তদ্‌বিচচক্ষিরে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা চক্ষুর বিষয় নহে বলিয়া তাহা বুঝান যায় না, মন তাহাকে ধরিতে পারে না। তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। তাহা যে কি, তাহা আমরা বিশদ ভাবে বুঝি না। কেমন করিয়া তাহাকে কেহ বুঝাইয়া দিবে? তথাপি, যাঁহারা আমাদিগকে তাহার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, তাহা জ্ঞাত বস্তুনিচয় হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ অথচ তাহা একেবারে যে অবিদিত, তাহাও নহে। হরি হরি! প্রশ্নও যেমন রহস্যময় কুজ্ঝটিকায় আবৃত, উত্তরও দেখিতেছি তদপেক্ষা অবেদ্যতার সূচীভেদ্য অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! এই উত্তর শুনিয়া হয় ত অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও দ্বিধা

বোধ করিবেন না। ভক্তিবাদী কিন্তু মনে করেন, এই উত্তরই তাঁহার জীবনের সকল সংশয়ের কুহেলিকা অপসারণ করিয়া গন্তব্য পথের দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে।

আমরা যাহাকে জানি না, চিনি না, যাহার পরিচয় দিবার ভাষার সঙ্গে আমাদের একেবারেই কোন পরিচয় নাই, তাহার অপেক্ষা অধিকভাবে জ্ঞাত বা পরিচিত যে এ সংসারে আমার কেহই নাই, এইরূপ কল্পনা কি সত্য সত্যই আমাদের নিকট গগনকুসুমের ন্যায় একান্ত অলীক? বোধ হয়, তাহা নহে; চিরপরিচিতের অপরিচয় চিরজ্ঞাতের অজ্ঞান ও চিরপ্রাপ্তের অপ্রাপ্তি ইহাই ত সংসারিক জীবের সুপরিচিত স্বভাব। একটি দৃষ্টান্তেই ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। এই ধর না কেন, এ সংসারে এমন কে আছে যে, সুন্দরকে ভাল না বাসে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহার ভালবাসার বিষয় সুন্দর বস্তুটি কি? তাহা কি সে কখনও বুঝিয়াছে না বুঝাইতে পারিয়াছে?

এ সংসারে মানুষ সকলের চেয়ে অধিক ভালবাসে আপনাকে, ইহা লোকতঃ এবং শাস্ত্রতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত; কিন্তু বল দেখি, সেই ভালবাসার পাত্র যে আপনি বা স্বয়ং অথবা অহং, তাহাকে আমাদের মধ্যে কয় জন চিনিয়াছে? যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া দার্শনিককুল এই আত্ম-নিরূপণব্যাপারে বিব্রত; কত পুথি যে তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; তাহা সত্ত্বেও তৃপ্তি নাই, এখনও রাশি রাশি পুথি লেখার ব্যাপারের বিরাম নাই। কখনও যে বিরাম হইবে, তাহার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। কৈ, যে 'আমি'কে আমি সকলের চেয়ে ভালবাসি, সুতরাং যে 'আমি' আমার এ সংসারে সকলের চেয়ে সুপরিচিত, তাহার পরিচয় দিবার ভাষা এ পর্য্যন্ত আমার—শুধু আমার কেন, সেই আদিকবি চতুরানন হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন কবি বা কোন দার্শনিকের মুখে ফুটিল না কেন? আমি যে এই অন্নরসবিকারজড়পিণ্ড দেহ নহি, তাহা অনেক সময়ে ভাবিয়া ঠিক করিয়া বসি, শাস্ত্রও আমাকে তাহা বুঝাইবার জন্য সর্ব্বদা সমুদ্যত, কিন্তু আমাকে দেখিবার জন্য যখনই সাধ হয়, তখনই আমি দর্পণের সাহায্য লইয়া থাকি। তাহাতে দেখি কি? দেখি, এই আমার ভোগায়তন শরীর, যাহা ভিতরে মল, মূত্র, অস্থি, মজ্জা, বসা, শুক্র, শোণিত, বাত, পিত্ত ও কফে পরিপূর্ণ; বাহিরে শ্লেষ্মা, অশ্রু, কেশ, রোম, নখ ও চর্ম্মে আবৃত। এই সকল আমার আমিত্বের বাহ্য ও আভ্যন্তর মালমসলার কোন্‌টী যে আমি, তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। আমি যে আমার চেয়ে সুন্দর আর কাহাকেও জানি না; কিন্তু এই মালমসলার কোনটিকেও যে আমি সুন্দর দেখি না, প্রত্যুত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকটিই আমার সম্পর্করহিত হইলেই ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য ও হেয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি। শাস্ত্রও ইহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে। ইহা কে না বুঝে? ফলে দাড়াইতেছে এই যে, আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে খুঁজিয়া পাই না; যাহাকে খুঁজিয়া পাই, যাহাকে চিনি, তাহাকে আমি ভালবাসি না; কিন্তু তাই বলিয়া আমার কাছে আমি যে অপরিচিত, অদৃশ্য বা অস্পৃশ্য, ইহা কখনও আমি মনে ভাবিতেও পারি না, আমি আমাকেই চিনি না. ইহা কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে? সে আমি যে আমার চির-পরিচিত, চির-আদৃত, চির-আস্বাদিত, তাহাকে যে কখন ভুলা যায় না, তাহার অদর্শনই ত আমার মরণ; আমার চির-পরিচিত আত্মার বা আমির যখন এই অবস্থা, তখন আমার তৃপ্তির বাহ্য সাধন কোন স্ত্রী বা পুরুষের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও যে এইরূপ অনাশ্বাসে পরিণত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? এই আত্ম-সৌন্দর্য্য ও পরসৌন্দর্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা অথচ প্রিয়তাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতও ত এই কথাই বলিতেছে:—

শ্লেষ্মাশ্রুকেশনখলোমপরীতমন্ত-
র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফবাতপিত্তম্।
জীবচ্ছবং শ্রয়তি কান্তধিয়া বতান্যা
যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥

[রুক্মিণী দেবী শ্রীভগবান্‌কে কহিতেছেন—এ সংসারে যে রমণী তোমার শ্রীচরণারবিন্দের মকরন্দসৌরভ জীবনে কোন দিন আঘ্রাণ করে নাই, সেই প্রাকৃত রমণীই জীবিত শবকে কান্ত ভাবিয়া আশ্রয় করিয়া থাকে। কারণ, সে যাহাকে সুন্দর বলিয়া ভালবাসে, তাহা বাহিরে শ্লেষ্মা, অশ্রু, কেশ, নখ ও লোমে আবৃত, আর অভ্যন্তরে তাহা মাংস, অস্থি, রক্ত, কৃমি, বিষ্ঠা, কফ, বাত ও পিত্তে পরিপূর্ণ।]

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

অহ্মদাবাদ

২
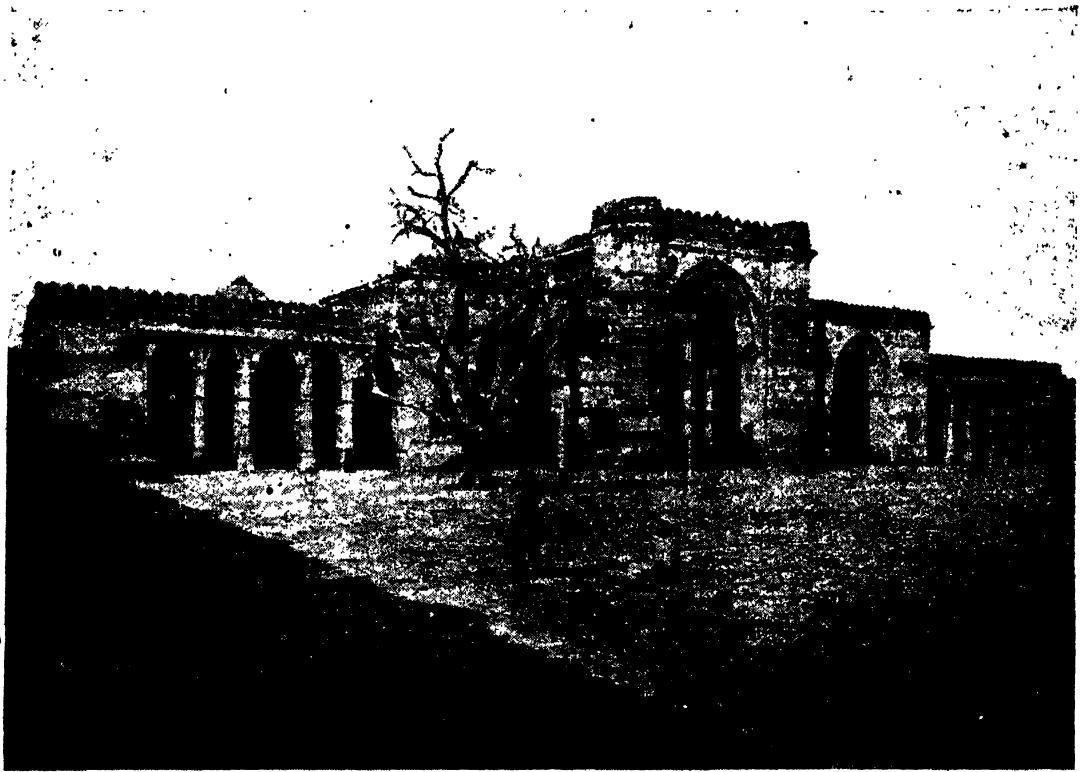
অহমদাবাদ—জামী মসজিদ।

শাহীবাগ ও আজম খাঁর প্রাসাদ ছাড়িয়া গেলে অহ্মদাবাদের দ্রষ্টব্য ইমারতের মধ্যে থাকে কেবল কবর ও মস্জিদ। অহ্মদাবাদ শহরের দেওয়ালের বাহিরে উদ্যান-প্রাসাদ দুই তিনটি আছে বটে, তাহার কথা পরে বলিব। ভদরের মধ্যে অহ্মদাবাদ শহরের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম অহ্মদ শাহ, একটি মস্জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্জিদটি ভদরের দেওয়ালে দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। অহ্মদাবাদ শহরের যেমন দেওয়াল আছে, তেমনই ভদরের চারিদিকেও একটা স্বতন্ত্র দেওয়াল আছে। আজম খাঁর প্রাসাদ ভদরের দ্বিতীয় তোরণ এবং দুইটি মস্জিদ ভদরের দেওয়ালের মধ্যে অবস্থিত। ইহা ছাড়া ভদরের দেওয়ালের মধ্যে অনেকগুলি পুরাতন বাড়ী আছে, অহ্মদাবাদের মুসলমান এতদূর অধঃপতিত যে, তাহাদিগের মসজিদ বা সমাধিমন্দির অপবিত্র করিলে তাহারা আপত্তি পর্য্যন্ত করে না। এই ভদরের মধ্যে একটি সমাধিমন্দিরে অহ্মদাবাদ জিলার Executive Engineer বাস করেন। Executive Engineerরা অধিকাংশ সময়ই ইংরাজ, তাঁহারা এই কবরের মধ্যে বসিয়া নিত্য মদ্যপান ও অখাদ্য ভোজন করে আর অহ্মদাবাদের সম্ভ্রান্ত মুসলমানরা আসিয়া তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যান। অন্যদেশে এরূপ আচরণে হয় তো আগুন জ্বলিয়া উঠিত; কিন্তু অহ্মদাবাদে মুসলমান প্রাণহীন। এক জন Executive Engineer সমাধির পাষাণখানি ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। ইঁহার কথা আমি দুই জন মুসলমান Executive

Engineerকে করিয়াছিলাম। এক জন বোম্বাই হাইকোর্টে জজ ৺বদরুদ্দীন তায়েবজীর পুত্র শ্রীযুক্ত সল্‌মান্‌ তায়েবজী, দ্বিতীয় জন, বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব নাজিম ফরীদুন্‌জাহের পুত্র সাহেবজাদা হারুণ কাদর সৈয়দ মুসা আলি মীর্জ্জা। ইঁহারা দুইজনেই শিয়া, সুতরাং অহ্‌মদাবাদের সুন্নী মুসলমানরা ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। অহ্‌মদাবাদের বিখ্যাত পীর শাহ্‌ আলমের দরগাহের কলেক্টারের আফিস ব্যতীত সমস্ত আপিসই এখন ভদরের মধ্যে অবস্থিত। এই ভদরের মধ্যে এখন দুইটি মস্‌জিদ আছে, প্রথমটি অহ্‌মদ শাহের প্রাচীন জুম্মা মস্‌জিদ ও দ্বিতীয়টি সিদি সৈয়দের মসজিদ।

অহ্‌মদ শাহের মস্‌জিদ ভদরের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই মসজিদটি অহ্‌মদশাহ ৮১৭ হিজ্রিরায় রাজপ্রাসাদের পুরুষ ও মহিলাদিগের জন্য নির্ম্মাণ
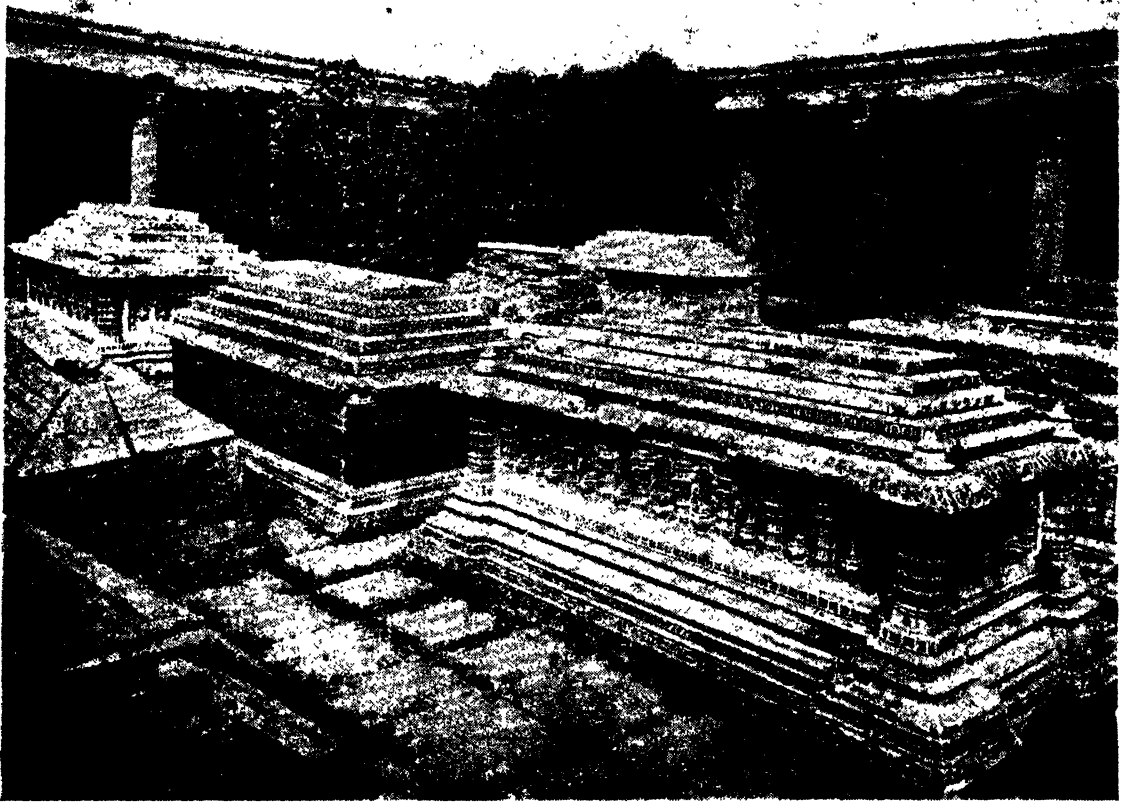
অহমদাবাদ—বেগমগণের সমাধি।

সজ্জাদানশীন পীর গোলাম হয়দর ও অহ্‌মদাবাদের ছোট আদালতের জজ শ্রীযুক্ত মহ্‌বুব্‌ মিঞা কাদ্‌রীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। শেষোক্ত ভদ্রলোকটি সুন্নী মুসলমান ওয়াকফ কমিটীর সভাপতি, তাঁহার চেষ্টায় অহমদাবাদ জিলার অনেক মসজিদের উদ্ধার হইয়াছে। ভদরের মধ্যে আর একটি কবরে Executive Engineerএর আপিস আছে, তাহা ছাড়া পুরাণো বাড়ী ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি নূতন আপিস তৈরী হইয়াছে ও হইতেছে। অহ্‌মদাবাদ জিলার করাইয়াছিলেন। এই মস্‌জিদটি এখন আর সাধারণে ব্যবহার করিতে পায় না, তাহার কারণ ইংরাজ রাজপুরুষেরাই বলিতে পারেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহার সম্মুখ জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছিল এবং এখন পর্য্যন্ত ইহার ভিতরে বাদুড়-চামচিকা-বাসের দুর্গন্ধে প্রবেশ করা যায় না। ইহা ১৪৯ ফুট দীর্ঘ ও ৫১ ফুট প্রস্থ, দুই সারিতে এই মস্‌জিদে দশটি বড় গুম্বজ আছে, এককালে মাঝখানের দুইটি বড় গুম্বজের সম্মুখে দুইটি বড় মীনার ছিল, তাহা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের

ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে পাঁচটি খিলান আছে, তাহার মধ্যে মধ্যের খিলানটি অন্য চারিটি অপেক্ষা বড় ও উচ্চ। এই খিলানের সম্মুখে মস্‌জিদের ভিতরে শ্বেতমর্ম্মরের বেদী ও মিহরাব্‌ আছে। বড় খিলান-টির ঠিক পিছনেই ছাতের কতকটা জায়গা উচ্চ। মস্‌জিদের ভিতরে আলো আনিবার জন্য এই স্থানের কতটা ছাদ উচ্চ করিয়া তাহার তিন্‌ দিকে দেওয়ালের পরিবর্ত্তে পাতরের জালি বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মস্‌জিদটি গুজরাটের রাজপরিবারের মহিলারা ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের প্রবেশের জন্য উত্তর দিকে একটি সিঁড়ি ও বারান্দা আছে। মহিলারা যে অংশে বসিয়া নমাজ পড়িতেন, সে অংশটি দ্বিতল এবং তাহার চারিদিক পাতরের জালি দিয়া ঘেরা। মহিলাদের জন্য এরূপ বন্দোবস্ত গুজরাটের পুরাতন মস্‌জিদ মাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। খম্বায়ৎ (Cambay), চম্পানের প্রভৃতি নগরের জুম্মা মস্‌জিদে ঠিক এই রকম বন্দোবস্ত আছে। অহ্‌মদশাহের পুরাতন জুম্মা মস্‌জিদের কাছে দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একটি ছোট বাগান করা হইয়াছে, তাহাতে এই সুন্দর সৌধের হতশ্রী কতকটা ফিরিয়াছে।

অহমদাবাদ—জামী মসজিদের দক্ষিণ তোরণ।

ভদরের দেওয়ালের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সিদি সৈয়দের মসজিদ অবস্থিত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাদশাহের হাবসী বা অব্‌সিনীয়ান খোজারা এই স্থানে নমাজ পড়িত এবং মস্‌জিদের নির্ম্মাতা সিদি সৈয়দ এক জন হাবসী খোজা। মস্‌জিদটি আকারে বৃহৎ নহে, এবং ইংরেজ-রাজ্যের প্রথমে অহ্‌মদাবাদের মামলত্‌দারের (সরকারী রাজস্ব তহশীলদারের) কাছারী এই মস্‌জিদের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। সরকারী আমলারা এই মস্‌জিদে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিয়া স্থানটি অত্যন্ত অপবিত্র রাখিত বলিয়া এককালে মুসলমান সম্প্রদায় অত্যন্ত আপত্তি
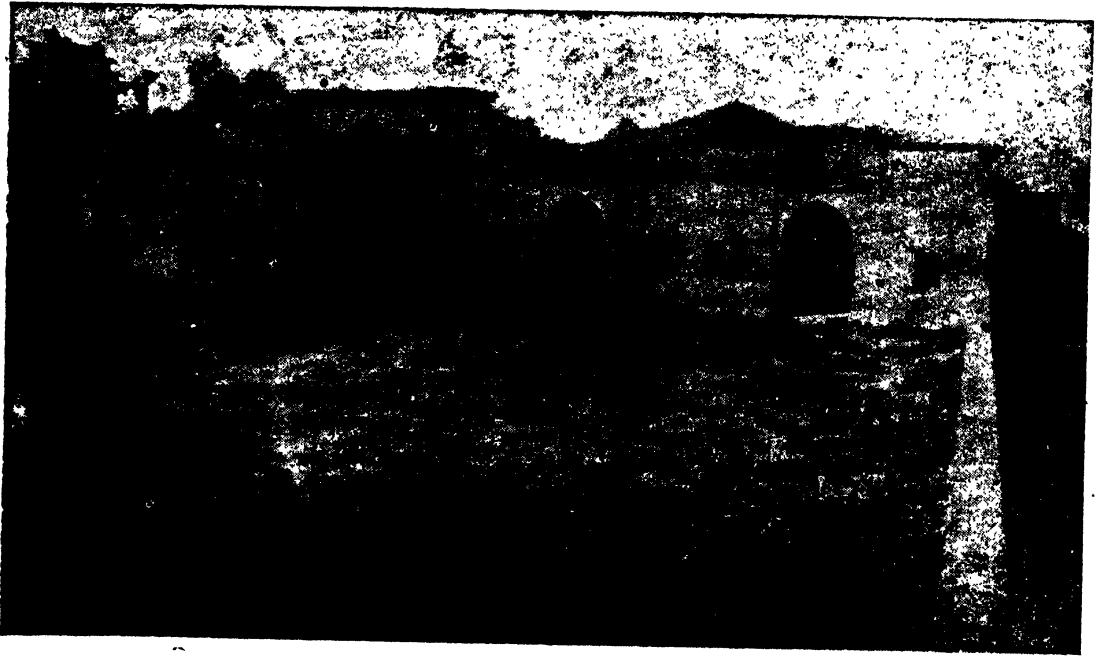
অহ্‌মদাবাদ—ভদর—অহমদ শাহের মস্‌জিদ।

করিয়াছিল। এই মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে কোন এক অজ্ঞাত-নামা মুসলমান সাধুর একটি সমাধি আছে,এক জন মুসলমান সমস্ত দিন সেই স্থানে বসিয়া থাকিয়া পৌরোহিত্য করে। সে বলে যে,এক কালে মস্‌জিদের ভিতরেই সরকারী মামলত্‌দারের কাছারী ছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর পঞ্জাবযাত্রা নিবারণ উপলক্ষে অহ্‌মদাবাদে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই সময় অহ্‌মদাবাদের লোকেরা এই মামলত্‌দারের কাছারী পুড়াইয়া দিয়াছিল এবং দশক্রোহী (দশক্রোশী) তালুকের (পরগণার) বন্দোবস্তী ও পরতালীর সমস্ত কাগজপত্র পুড়াইয়া দিয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের দাঙ্গার পরে বোম্বাই গবর্মেণ্টের আদেশে মামলত্‌দারের কাছারী স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং সুন্দর মস্‌জিদটি অপবিত্রতা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহা ৬৮ ফুট লম্বা, ৩৬ ফুট চওড়া। ইহার সম্মুখে পাঁচটি সমান খিলান আছে, এবং তদনুযায়ী পশ্চাতেও পাঁচটি খিলান আছে। এই পাঁচটি খিলানের নিম্নের অর্দ্ধেক গাঁথিয়া ভরাট করা হইয়াছে। উপরের অর্দ্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ—খিলানের কমান পাতরের জালি দিয়া ভরান, কেবল মধ্যের খিলানটি আগাগোড়া ভরাট। এই পাতরের জালি দেখিতে পৃথিবীর নানা দেশের লোক অহ্‌মদাবাদে আসে। চারিটি পাতরের জালির মধ্যে দুইটি ছোট ছোট চারকোণা খাদ্‌রী জালতি বসান। এই রকম ছোট জালতি গুজরাটের সুলতান প্রথম অহ্‌মদশাহের কবরে এবং উপনগরে বিখ্যাত মুসলমান পীর শাহ্‌ আলমের কবরে দেখিতে পাওয়া যায়। বাকী দুইটি জালতিও সুন্দর, প্রথমটিতে একটি খেজুরগাছ ও তাহাকে জড়াইয়া একটি প্রকাণ্ড লতানে গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাতরের টুক্‌রা কাটিয়া এই সুন্দর জালতিটি তৈরী হইয়াছে, দ্বিতীয় জালতিতে খর্জ্জুরজাতীয় চারিটি গাছ ও একটি বড় ও দুইটি ছোট লতার গাছ আছে, এই লতাগুলি সমস্ত জালতিটি অধিকার করিয়া আছে। এই দুইটি নক্সাকাটা জালতির ছবি ভারতবর্ষের রেলগাড়ীতে, রেলের ষ্টেশনে, কুক কোম্পানীর বিলাতী মুশাফিরের গাইড বুকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভদর ছাড়াইয়া তিন দরওয়াজার পশ্চিমদিকে সুলতান প্রথম অহ্‌মদশাহের একটি প্রকাণ্ড মস্‌জিদ আছে, ইহাই এখন অহ্‌মদাবাদের প্রধান মস্‌জিদ এবং জুম্মা মস্‌জিদ নামে
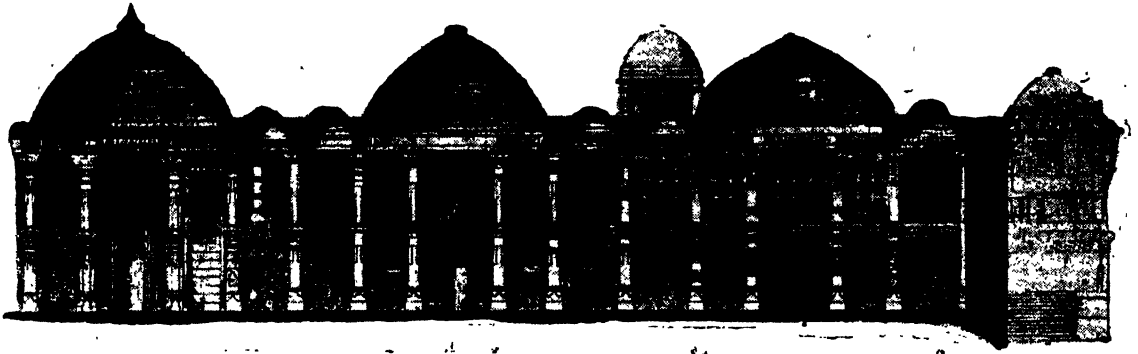
অহ্মদশাহের মস্জিদ—লম্বালম্বি।

পরিচিত। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে এই মস্জিদ নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছিল। এক কালে একটি প্রকাণ্ড মুক্ত চত্বরের মধ্যস্থলে এই মস্জিদটি অবস্থিত ছিল; কিন্তু অহ্মদাবাদ যখন বরোদার গায়কবাড় বংশের অধিকারভুক্ত ছিল, তখন এই চত্বরের অধিকাংশ স্থানে বহু হিন্দু ও মুসলমানের আবাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এই স্থানটি অহ্মদাবাদের সর্ব্বপ্রধান বাজার ছিল, ইহার নাম মাণিক চৌক। মস্জিদটি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে নিজ মস্জিদের ঘর এবং দ্বিতীয় ভাগে প্রকাণ্ড অঙ্গন ও তাহার চারিদিকে পাতরের বারান্দা ও দেওয়াল। এই প্রাঙ্গণ প্রস্তরাচ্ছাদিত এবং ইহা চারিদিকের রাস্তা ও বাজার অপেক্ষা ৭।৮ ফুট উচ্চ। প্রাঙ্গণ ৮৪ ফুট লম্বা ও ২৩৬ ফুট চওড়া। চারিদিকের বারান্দা বাদ দিলে মধ্যস্থলে পাষাণাচ্ছাদিত মুক্ত প্রাঙ্গণ ২৭৫ ফুট লম্বা ও ২১৬ ফুট চওড়া। সমস্ত মস্জিদের এলাকা দিল্লীর জুম্মা মস্জিদ অপেক্ষাও বৃহৎ; কারণ, ইহা মোট ৩৮৯ ফুট লম্বা এবং ২৪৭ ফুট চওড়া। মধ্যস্থলে নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদ প্রক্ষালনের জন্য একটি চৌবাচ্চা আছে। একসঙ্গে লক্ষ লোক এই মস্জিদে নমাজ করিতে পারে। নিজ মস্জিদটি, অর্থাৎ যে অংশের উপরে ছাত আছে, তাহা ২০৭ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফুট চওড়া, মস্জিদের সম্মুখে তিনটি বড় ও আটটি ছোট খিলান আছে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকর ইংরাজ ফর্ব্বস জুম্মা মস্জিদের যে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহার বড় খিলানের দুই পার্শ্বে দুইটি উচ্চ মীনার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মীনার দুইটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে পড়িয়া গিয়াছে। এই মীনারগুলি অত্যন্ত গুরুভার হইলেও অঙ্গুলিস্পর্শে দুলিত এবং এক একটির ভাঙ্গা পাতরের ওজন আন্দাজ ১০ হাজার মণ হইবে। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মণিয়র উইলিয়মস্ এই মীনার দুইটিকে দুলিতে দেখিয়া গিয়াছেন। সমস্ত গুজরাটের হিন্দু ও জৈন মন্দির ভাঙ্গিয়া এই মস্জিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। মস্জিদের পাতর কাটিবার মিস্ত্রী (সঙ্গ-তরাস্) রাজমজুর সমস্তই হিন্দু ছিল, সেই জন্যই মস্জিদের সম্মুখের তিনটি খিলান ব্যতীত ইহাতে মুসলমানী আমলের কাজ বা নক্সা দেখিতে পাওয়া যায় না। আবু পাহাড়ের উপরে দৈলপাড়া গ্রামে বস্তুপাল তেজঃপালের মন্দিরে ও বিমলশাহের মন্দিরে এবং জুনাগড় রাজ্যে, গীণার রৈবতক পর্ব্বত-শিখরে যে রকম স্তম্ভ ও কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, ৩ শত বৎসর পরে গুজরাটের হিন্দু-শিল্পী অহ্মদশাহের জুম্মা মস্জিদের সেই রকম কারুকার্য্যই করিয়া গিয়াছে। নমাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় মস্জিদের ভিতরে গেলে বোধ হয় যে, হিন্দুরাজ্যের কোন প্রাচীন মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছি। মন্দিরের ছাতে যে ছোট ছোট গুম্বজ আছে, তাহার তলে দাঁড়াইলে মনে হয় যে, প্রত্যেকটি একটি ১ শত ডালের বেলওয়ারী ঝাড় উল্টাইয়া বসান আছে। এই মস্জিদের প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে এবং এই দ্বারের সম্মুখে জৈনমন্দিরের অনুকরণে একটি অর্দ্ধমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা খজুরাহো দেখেন নাই, তাঁহারা অর্দ্ধমণ্ডপ কথাটি বুঝিতে পারিবেন না। মধ্যপ্রদেশে, মধ্যভারতে ও মালবে প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরে দুইটা প্রধান ভাগ থাকিত, অন্তরাল, অর্থাৎ—গর্ভগৃহ, যেখানে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন এবং দ্বিতীয়, মণ্ডপ বা নাটমন্দির। উড়িষ্যার মন্দিরে একের অধিক মণ্ডপ

জামী মস্‌জিদ—জেমস্ ফরবসের অঙ্কিত চিত্র হইতে।

হয়, এই জন্য হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র মস্‌জিদের নিকটে পাইখানা বা প্রস্রাবের স্থান আছে, সেই স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া হিন্দুস্থানের মুসলমান মস্‌জিদে প্রবেশ করে; কিন্তু অহ্‌মদাবাদের মুসলমানরা অত্যন্ত আয়েশী, তাঁহারা নূতন পুরাতন সমস্ত মস্‌জিদের ভিতরেই প্রস্রাবের ঘর তৈয়ারী করিয়াছেন বা করিতে

দেখিতে পাওয়া যায়। এই মণ্ডপ বা মণ্ডপসমূহের তিন দিকে যে খোলা বা বদ্ধ বারান্দা থাকিত, তাহারই নাম অর্দ্ধমণ্ডপ। মধ্যপ্রদেশে বিলাসপুরের নিকটে সোহাগপুর গ্রামে চেদিরাজ কর্ণের আমলের একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের মণ্ডপের উত্তরদিকের অর্দ্ধমণ্ডপ অহ্‌মদাবাদের বড় জুম্মা মস্‌জিদের প্রবেশদ্বারের ন্যায়। দুইটিতেই পাতরের থামের নীচে যে অর্দ্ধ 'ডেডো' আছে, তাহার'প্যানেলিং'একই রকম। জুম্মা মস্‌জিদের প্রাঙ্গণের তিন দিকে তিনটি দুয়ার আছে এবং প্রত্যেক দুয়ারেই এইরূপ একটি অর্দ্ধমণ্ডপ ছিল। পূর্ব্বদিকের অর্দ্ধমণ্ডপটি অহ্‌মদাবাদের মুসলমানরা পাইখানা ও প্রস্রাবের স্থান তৈয়ারী করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। অহ্‌মদাবাদের মুসলমানরা হিন্দুস্থানের মুসলমান অপেক্ষা অনেক বেশী বাবু। তাঁহারা গরমের সময় মুক্তপ্রাঙ্গণে বসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালন করিতে পারেন না, তাঁহাদের মতে অহ্‌মদাবাদ দিল্লী অপেক্ষা বেশী গরম এবং সেই জন্য অজুখানা বা হস্তপদ প্রক্ষালনের চৌবাচ্চার উপরে তাঁহারা বদ্‌খত রকমের একটা বাড়ী তৈয়ারী করাইয়াছেন। দিল্লীতে জুম্মা মস্‌জিদে অথবা লাহোরে বাদশাহী মস্‌জিদে গরম অহ্‌মদাবাদের দ্বিগুণ হইলেও হিন্দুস্থানী মুসলমানরা অজুখানার উপরে চন্দ্রাতপ আবশ্যক মনে করেন না। নমাজ পড়িবার পূর্ব্বে পাক্, অর্থাৎ—শুচি হইয়া যাইতে চাহেন। কোন কোন মস্‌জিদে প্রস্রাবের ঘর ইংরাজী "ইউরিনালের" অনুকরণে সস্তাদরের, কিন্তু বহু বর্ণের "মিণ্টনটাইল" দ্বারা আচ্ছাদিত। অহ্‌মদশাহের সাবেক জুম্মা মস্‌জিদ হরিদ্রাবর্ণের পাতরে তৈয়ারী। সাবেক জুম্মা মস্‌জিদে প্রধান মিহরাবের সম্মুখটা এবং নূতন জুম্মা মস্‌জিদের মিহ্‌রাবেরও সম্মুখের অংশ শুভ্র-মর্ম্মরের।

নূতন জুম্মা মস্‌জিদের পূর্ব্ব-তোরণের বাহিরে সুলতান প্রথম অহমদশাহের সমাধি অবস্থিত। এই সমাধির প্রবেশ-দ্বার সমাধিমন্দিরের পূর্ব্বদিকে। এককালে সমাধির চারিদিকে অনেকটা জমী সমাধিমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অহমদাবাদের বৃদ্ধ মুসলমানরা বলিয়া থাকেন যে, নূতন জুম্মা মস্‌জিদ যতটা চওড়া, নূতন জুম্মা মস্‌জিদের পূর্ব্বের দরওয়াজা হইতে মাণিক চৌক পর্য্যন্ত, অর্থাৎ—আড়াই শত ফুট চওড়া জমী বাদশাহের কবরের এলাকাভুক্ত ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজ-রাজের হুকুমে জরীপ হইয়াছিল, তখন এই ওয়াক্‌ফের মতবল্লীদের (Trustees) হাতে ৭৭৪৪ বর্গগজ জমী ছিল, কিন্তু এখন ওয়াক্‌ফ কমিটীর হাতে ৩৩৬৭ বর্গগজের অধিক জমী নাই। বাকী জমী ভূতপূর্ব্ব মতবল্লীদিগের সাধুতার অভাবে অপহৃত হইয়াছে। নূতন জুম্মা মস্‌জিদের পূর্ব্ব দরওয়াজা এবং মাণিক চৌকের উপরে অহমদশাহের সমাধির যে ফটক বা তোরণ, তাহার

চারিদিকে ছোটবড় অনেক রকমের কবর এবং মধ্যস্থলে বাদশাহের সমাধিমন্দির। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সমাধিমন্দিরটি অহ্‌মদশাহ স্বয়ং নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে একটি প্রকোষ্ঠে বাদশাহ প্রথম অহ্‌মদশাহ, তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অহ্‌মদশাহ এবং পৌত্র জলালউদ্দীন কুতবশাহ—এই তিন ব্যক্তির কবর আছে, তিনটি কবরই শুভ্র-মর্ম্মরনির্ম্মিত এবং অহ্‌মদশাহের কবরটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। যে ঘরে কবরটি আছে, তাহার উপরে একটি বড় গুম্বজ আছে। এই কক্ষের চারিদিকে পাতরের থামের উপর চারিটি বারান্দা এবং চারি কোণে চারিটি ক্ষুদ্রতর

অহ্‌মদ শাহের মস্‌জিদ—গবাক্ষপথের পর্দ্দা।

কক্ষ আছে। এই সমাধিক্ষেত্র ও সমাধিমন্দির অহ্‌মদাবাদের সুন্নী মুসলমান ওয়াকৃফ কমিটী কর্ত্তৃক পরিচালিত ও গবর্মেণ্ট হইতে বার্ষিক ২৬০১৲ টাকা বাদশাহের কবরে অন্নছত্রের জন্য প্রদত্ত হয়। নিত্য সমাধিমন্দিরের সংলগ্ন লঙ্গরখানায় (রন্ধনশালায়) খিচুড়ি রন্ধন হইয়া থাকে এবং তাহা দীনদরিদ্রকে বিতরণ করা হয়। বাদশাহের সমাধির চারিদিকে সৎ ও অসৎ উপায়ে বহু ব্যক্তি জমী দখল করিয়া লইয়া বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছে। সমাধিমন্দিরের পূর্ব্বদিকের যে তোরণ, তাহারও কতকটা বেদখল হইয়া গিয়াছে। ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে অহ্‌মদশাহের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার কবরে বা সমাধিমন্দিরের কোন স্থানে তাঁহার মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কোন শিলালেখ নাই; কিন্তু সমাধিমন্দিরের যে ঘরে বাদশাহত্রয়ের কবর আছে, তাহার দরওয়াজার উপরে একখানা আরবী শিলালেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৯৪৪ হিজিরায়, অর্থাৎ ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে (অহ্‌মদশাহের বৃদ্ধ প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহমুদের রাজ্যকালে) এই সমাধিমন্দির করহাত-উল-মুল্‌ক্‌ মেরামত করাইয়াছিলেন। সমাধিমন্দিরের সমস্ত কক্ষগুলি এক কালে মর্ম্মরমণ্ডিত ছিল, কিন্তু প্রাচীন মর্ম্মর ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় নূতন বিলাতী বা ইতালীয় মার্ব্বেল পাতর আনিয়া ইহার চারিদিকে বসান হইয়াছে। সমাধিমন্দিরের রক্ষার ভার এক দল মুসলমান পাণ্ডার হাতে। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা বাদশাহের আমল হইতে মুজাওর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। সুন্নী মুসলমান ওয়াকৃফ কমিটীর মেম্বরদিগের সহিত মুজাওরদিগের বনিবনাও নাই। এই কমিটী অহ্‌মদশাহের সমাধি ও অনেকগুলি মস্‌জিদের তত্ত্বাবধান করেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, নূতন জুম্মা মস্‌জিদের তত্ত্বাবধানের ভার শীঘ্রই ইঁহাদিগের উপর আসিবে।

অহ্‌মদশাহের সমাধিক্ষেত্র হইতে পূর্ব্বদিকে গেলে মাণিক চৌকের বর্ত্তমান রাস্তার অপর পারে অহ্‌মদশাহের বেগমদিগের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। অহ্‌মদশাহের কবরের পূর্ব্বদিকে যেমন একটি তোরণ বা ফটক আছে, বেগমদিগের কবরের পশ্চিমদিকেও সেইরূপ একটি ফটক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই ফটকের সম্মুখে, পার্শ্বে ও বাহিরে এত নূতন বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে যে, এই স্থানে যে কোন পুরাতন বাড়ী আছে, তাহা চিনিয়া লওয়া কঠিন। অনেকগুলি খোলার ঘর এবং দ্বিতল কাঠের ঘর ফটকটিকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এই ফটকের ভিতর দিয়া যে চত্বরে পৌঁছান যায়, তাহা এক কালে পাষাণাচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু অহ্‌মদাবাদের লোক তাহার সমস্তটাই বাড়ী তৈয়ারী করিয়া ফেলিয়াছে এবং এখন বহুকষ্টে দুই তিন জন লোক পাশাপাশি সমস্ত কবরটা প্রদক্ষিণ করিতে পারে। বেগমদের কবর নূতন ধরণের ইমারত। চারি পাশের জমী হইতে ৮।১০ ফুট উঁচু একটা পাতরের চাতাল আছে, এই চাতালের চারিদিকে ডবল বারান্দা, অর্থাৎ—একটা বারান্দা বাহিরে বাহিরে ও আর একটা ভিতরের দিক দিয়া চলিয়াছে। চাতালের মাঝখানটা মুক্ত, কোন ঘরবাড়ী নাই, এই স্থানে এই মুক্ত আকাশের নীচে অহ্‌মদশাহের বেগমরা সমাহিত আছেন। প্রধান কবরটি শ্বেতমর্ম্মরের; শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা অহ্‌মদ-শাহের পুত্র দ্বিতীয় মহমুদশাহের বেগম মোগলীবিবির কবর, ইনি স্বামীর মৃত্যুর পরে বিখ্যাত মুসলমান সাধু শাহআলমকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং ইঁহার পুত্র প্রথম মহমুদশাহ গুজরাটের এক জন বিখ্যাত বাদশাহ। নিকটে একটি কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত এবং অনেকগুলি শ্বেতমর্ম্মর-নির্ম্মিত সমাধি আছে। সেগুলি কাহাদের, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

এই সমাধিমন্দিরে হরিদ্রাবর্ণের পাতরে খোদাই করা জালির কায দেখিতে দেশীয় ও বিদেশীয় বহু লোকের সমাগম হয়। এরূপ সুন্দর কারুকার্য্য অহ্‌মদাবাদের আরও দুই তিন স্থানে আছে বটে, কিন্তু চিকণের মত এত মিহি কায ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। আগ্রায় তাজমহলের ভিতরে যে শুভ্রমর্ম্মরের জালি আছে, তাহা কেবল শুভ্রমর্ম্মরের বলিয়াই এত সুন্দর দেখায়, অন্য পাতরের হইলে সে জালির কায দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। অহ্‌মদাবাদে বেগমদিগের কবরের জালির কায ও বন্ধ দরওয়াজার (False doors) উপরের নক্সা ভারতবর্ষের সকল স্থানের পাতরের কাযকে হার মানাইয়া দিয়াছে। দক্ষিণে বিজয়নগরের হিন্দু রাজা-দের আমলে সূক্ষ্ম কায হইত বটে, মহীশূর রাজ্যে অনেকগুলি মন্দিরে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অহ্‌মদাবাদের মুসলমানযুগের হিন্দুশিল্পী হাম্পী (প্রাচীন বিজয়নগরের বর্ত্তমান নাম) ও হালেবিড়ের হিন্দু শিল্পীদের হারাইয়া দিয়াছে। অনেক ইংরাজ মহিলা এই স্থানের পাতরের জালির ছবি আঁকিতে আসেন এবং অহ্‌মদাবাদের শিল্পীরা অনেক সময় সলমাচুমকীর কাযে এই নক্সা নকল করিয়া থাকে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মরণ

১

নিন্দা বিধাতায় কেন কর হাহাকার,
মরণ কি অকারণ সৃষ্টি বিধাতার?
জীবনের আশা আলো হ'ত কি এমন ভাল
মৃত্যু যদি না থাকিত পশ্চাতে ইহার!

২

আলোক থাকিত যদি জগতে কেবলি
ঊষার সুষমা যেত এককালে চলি',
আঁধারের ছায়াখানি আলোর মুরতি আনি'
ফুটায় স্বদেহে, তাই হাসে যে সকলি।

শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র।

কাকীমা

১

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—ঘরে ঘরে এ প্রবাদের সার্থকতা দেখা গেলেও রাম-লক্ষ্মণের মত দুই ভাই—শশী হাজরা ও চিনিবাস হাজরা, উভয়ে যখন পৃথক্ হইবে শুনা গেল, তখন গ্রামের লোক আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। আশ্চর্য্য হইবারই কথা। বড় ছোট-অন্ত প্রাণ, ছোটও বড়-অন্ত প্রাণ; বড় হইলেও শশী চিনিবাসকে না বলিয়া একটা তুচ্ছ কাযও করে না, চিনিবাস তো দাদার গোলাম। এমন অবস্থায় তাহাদের সংসার কে যে ভাঙ্গিল, তাহা কেহই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। অনেকে বলিল, বোয়ে বোয়ে বনিবনাও হয় না; কেহ বা বলিল, শশীর দ্বিতীয় পক্ষ ভাল ঘরের মেয়ে নয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে বোয়ে বোয়ে বনিবনাও না হওয়ায় সংসার ভাঙ্গিল, তাহা নহে, সংসার ভাঙ্গিবার মূল হইয়া দাঁড়াইল,—শশীর প্রথমপক্ষের ছেলে ফেলারাম। তিন দিনের ছেলে রাখিয়া ফেলারামের মা আঁতুড়েই যখন মারা যায়, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল, এ ছেলে কখনই বাঁচিবে না। কিন্তু সেই ছেলে যখন বাঁচিয়া মানুষ হইয়া উঠিল, তখন সকলেই ছোটবোয়ের প্রশংসা করিয়া বলিল, এ ছেলে বাঁচিয়াছে শুধু ছোটবোয়ের সেবা-যত্নের গুণে।

বাস্তবিক ছোটবৌ বিনোদিনী বড় জায়ের মৃত্যুর পর কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সেই তিন দিনের ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল, তখন সে নিজেও ভাবে নাই যে, মা-হারা হইয়া এই রক্তের ডেলা বাঁচিতে পারিবে। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ, বিনোদিনীর কোলেও তখন চার পাঁচ মাসের ছেলে। স্তনে দুগ্ধ ছিল। সে একটি স্তন নিজের ছেলেকে, অপর স্তন সেই মাতৃহীন শিশুকে দিয়া তাহাকে অতিকষ্টে মানুষ করিতে লাগিল। তাহার কষ্ট সার্থক হইল, ছেলে বাঁচিয়া উঠিল।

ছেলের নামকরণের সময় চিনিবাস তাহার অনেক প্রকার শ্রুতিমধুর নাম রাখিতে চাহিল। কিন্তু বিনোদিনী তাহাতে আপত্তি জানাইয়া কহিল, "না না, ওর ভাল নাম রেখে কায নাই, ও ছেলে কি বাঁচবে মনে কর? হেলায়-ফেলার মানুষ হচ্চে, ওর নাম রাখ, ফেলা।"

ছোটবোয়ের মতানুসারে ছেলের নাম ফেলারামই রাখা হইল। কাকীমার স্নেহে যত্নে ফেলারাম মানুষ হইতে লাগিল। কথায় বলে, আঁতের চেয়ে ছড়ের টান বেশী। হেলাফেলায় মানুষ করিলেও বিনোদিনীর স্নেহযত্নটা নিজের ছেলে অপেক্ষা যেন ফেলারামের উপরেই বেশী বেশী করিয়া পড়িতে লাগিল। নিজের ছেলে উপেন কাঁদিয়া সারা হইলেও আগে ফেলারামকে শান্ত না করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে যাইত না, আগে ফেলাকে খাওয়াইয়া তবে সে উপেনকে খাওয়াইতে বসিত। চিনিবাস এজন্য কচিৎ কখন অনুযোগ করিলে বিনোদিনী উত্তর দিত, "ওগো, অপে কেঁদে সারা হ'য়ে গেলেও কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু ফেলার একটু অযত্ন হ'লে লোক কি বলবে? বড়ঠাকুরই বা কি মনে করবেন?"

শশীর বলিবার কিছুই ছিল না। কেন না, সে এক প্রকার সংসারের হাল ছাড়িয়া দিয়াই বসিয়াছিল। সে সংসারে খাটিত, কাযকর্ম্ম করিত, কিন্তু সংসারে তাহার যেন কোন আসক্তি ছিল না। চিনিবাস তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে অনুরোধ করিত; কিন্তু শশী নিতান্ত উদাসীনের ন্যায় উত্তর করিত, 'আর কেন ভাই এ সব জঞ্জাল, ফেলা বেঁচে থাক্, অপে বেঁচে থাক্, তোমরা সুখী হও, তাই দেখেই আমার সুখ।" অগত্যা চিনিবাসকে চুপ করিয়া থাকিতে হইত।

এই ভাবে চারি পাঁচ বৎসর কাটিবার পর শশী এক সময়ে কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে গিয়া যখন একটি বারো বছরের মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে ফিরিল, তখন চিনিবাসের আনন্দের সীমা রহিল না। বিনোদিনী কিন্তু একটু বিমর্ষ হইয়া বলিল, "এর চাইতে তুমি দেখে শুনে বড়ঠাকুরের বিয়ে দিলে পারতে।"

চিনিবাস স্ত্রীর কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল।

কিন্তু বছর তিন পরে নূতন বৌ সোনামণি পাকা গিন্নীর মত যখন ঘর করিতে আসিল, তখন চিনিবাস স্ত্রীর কথা স্মরণ করিয়া ভাবিল, "বাস্তবিক, এর চাইতে আমি নিজে দেখে শুনে ভাল ঘরের মেয়ের সঙ্গে যদি দাদার বিয়ে দিতাম।"

তা সোনামণি আসিয়াই যে বিনোদিনীর সহিত কোন-রূপ অপ্রিয় আচরণ করিল, বা সংসারে যাহাতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, এমন কিছু করিল, তাহা নহে। তাহার শুধু লক্ষ্য পড়িল ফেলারামের উপর। ফেলারাম তাহার কাছে যায় না, তাহাকে মা বলিয়া ডাকে না, তুচ্ছতাচ্ছীল্য করে, স্বামীর নিকট ছাড়া বিনোদিনীর কাছেও ইহা লইয়া প্রায়ই অনুযোগ করিত, এবং তাহার স্নেহযত্নের অভাবেই যে সপত্নী-পুত্র তাহার বশীভূত হয় নাই, ইহাই ভাবিয়া পাঁচ জন তাহার নিন্দা করিবে, এরূপ আশঙ্কাও প্রকাশ করিত। বিনোদিনী কি করিবে? সে ফেলাকে বুঝাইত, সোনামণির কাছে যাইবার জন্য উপদেশ দিত, তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইত। ফেলারাম কিন্তু কিছুই বুঝিত না বা শিখিত না। সংসারে সে মা-বাপ কিছুই জানে না, জানে শুধু কাকীমাকে। এই কাকীমা ছাড়া জগতে আর কাহারও নিকট যে স্নেহযত্ন আদায় করিতে হয়, ইহা সে কিছুতেই স্বীকার করিত না। সুতরাং কাকীমাকে ছাড়িয়া সে সৎমার কাছে যাইতে বা তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতে চাহিল না। সোনামণি আবদারের ছলে কখন জোর করিয়া তাহাকে কাছে টানিতে উদ্যত হইলে, ফেলা এমন উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিত যে, সোনামণি তাহাতে শুধু লজ্জিত নয়, যেন ভীত হইয়াও পড়িত। বিনোদিনী এ জন্য সময়ে সময়ে ফেলাকে তিরস্কার করিত, ধমক দিত, মারিতে যাইত; ফেলা তাহার তর্জ্জনগর্জ্জনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া পলাইত।

সোনামণি স্বামীকে বুঝাইত যে, ছোটবোয়ের অতি-রিক্ত আবদারে ছেলেটার পরকাল নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং এই ভাবে আর কিছু দিন থাকিলে সে আর কাহাকেও মানিবে না। সপত্নীপুত্রের উপর সোনামণির ঐকান্তিক [illegible]ন দেখিয়া শশী অন্তরে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিত, [illegible]ন্তু ছেলের ব্যবহার দেখিয়া তাহার উপর না রাগিয়া [illegible]কিতে পারিত না।

২

"ফেলা, ওরে ফেলা, ওরে হতভাগা ছেলে!"

একটা বাখারির ধনুক লইয়া তাহাতে কঞ্চির তীর বসাইয়া ফেলা তখন শীকারের অভিনয় করিতেছিল; কাকীমার সরোষ আহ্বান শ্রবণে চমকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া উত্তর দিল, "কেন কাকীমা?"

রোষগম্ভীরকণ্ঠে কাকীমা ডাকিল, "এ দিকে আয়।"

তীর-ধনুক ফেলিয়া ফেলারাম অপরাধীর মত ধীরে ধীরে আসিয়া কাকীমার সম্মুখে দাঁড়াইল। কাকীমা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মাকে কি বলেছিস্?"

যেন খুব বিস্ময়ের সহিত কাকীমার মুখের দিকে চাহিয়া ফেলারাম উত্তর করিল, "মাকে বলেছি? মা আবার কে?"

ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া কাকীমা বলিল, "মা কে জানিস্ না? ন্যাকা ছেলে! তোর বাপ যাকে বিয়ে ক'রে এনেছে, সে তোর কে?"

একটুও না ভাবিয়া ফেলা উত্তর করিল, "সৎমা।"

গর্জ্জন করিয়া কাকীমা বলিল, "তবে রে হতভাগা ছেলে! কে তোকে বল্লে, ও সৎমা?"

ভীতিমলিন মুখে ফেলা বলিল, "কেন, অপে বলেছে।"

"আচ্ছা, ডাক্ তো অপেকে, দেখি, সে কত বড় ওস্তাদ হয়েছে?"

ফেলা সোৎসাহে অপেকে ডাকিতে গেল। অপে কিন্তু আসিল না; মা রাগিয়া তাহাকে ডাকিতেছে শুনিয়াই সে পলায়ন করিল। অগত্যা ফেলা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, "অপে এলো না। ছুটে পালিয়ে গেল।"

বিনোদিনী তর্জ্জন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, পালিয়ে কতক্ষণ থাক্‌বে, আসুক সে। আজ তারই এক দিন কি আমারই এক দিন।"

সোনামণি ফেলার শাসন দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত-ভাবে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু শাস্তিটা ফেলার পরিবর্ত্তে অপের উপর পড়িল দেখিয়া, ক্ষুণ্ণচিত্তে অগ্রসর হইয়া বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হাঁ, হাঁ, তুমিও যেমন ছোটবৌ, ওর কথায় বিশ্বাস্ করলে? অপে কক্ষণো ওকে শিখিয়ে দেয়নি, সে ওর মত ট্যাঁটা নয়। ফেলার সব মিছে কথা।"

ফেলা সরোষ দৃষ্টিতে সোনামণির দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ, তোমাকে বলেছে মিছে কথা! সে দিন সে আমতলায় ব'সে আমাকে বল্‌লে।"

সোনামণি বলিল, "আচ্ছা, সে যেন ঐ কথাই শিখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুই যে আমাকে রাক্ষুসী ডাইনী ব'লে গাল দিলি, এ গাল তো আর অপে শিখিয়ে দেয়নি।"

সতেজকণ্ঠে ফেলা বলিল, "বেশ করেছি গাল দিয়েছি, তুমি আমার ধনুক কেড়ে নিতে এলে কেন?"

কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া সোনামণি বলিল, "তুই ঐ কঞ্চিটা ছুড়ে আমার পায়ে মারলি কেন?"

বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া ফেলা বলিল, "ওঃ, ভারী-ই তো মেরেছি! সানার ঘায়ে মূর্চ্ছো লেগে গেল আর কি!"

বিনোদিনী তাহার গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। প্রহৃত হইয়া ফেলা কাকীমার দিকে কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আমি বুঝি দেখে মেরেছি? খেলা কচ্ছিলুম, দৈবিত্তে লেগে গিয়েছে।"

গর্জ্জন করিয়া সোনামণি বলিল,"দৈবিত্তে লেগে গিয়েছে, না তুই দেখে শুনেই আমাকে মারলি রে মিথ্যুক?"

দুই হাতে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে ফেলা বলিল, "আমি মিথ্যুক, না তুমি মিথ্যুক? আমি দেখে তোমাকে মেরেছি?"

সোনামণি বলিল, "হাঁ, দেখেই তো মেরেছিস্।"

চোখের উপর হইতে হাত সরাইয়া গর্জ্জন সহকারে ফেলা বলিল, "মিছে কথা বলছো তুমি, তোমার জিভ প'চে খ'সে যাবে, তা জান?"

তীব্র ভ্রূকুটী সহকারে বিনোদিনীর দিকে ফিরিয়া রোষ-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সোনামণি বলিল, "শোন ছোটবৌ, ছেলের আস্পর্দ্দার কথা।"

বিনোদিনী কিন্তু ছেলের কথায় কোন দোষ দেখিতে পাইল না। কেন না, সে নিজেই ফেলাকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, মিথ্যা কথা বলিলে জিভ পচিয়া খসিয়া যায়। ফেলা সেই শিক্ষারই পুনরুক্তি করিল মাত্র। সুতরাং তাহার কথায় কটূক্তির কিছুমাত্র আভাস না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। ফেলা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিল না; সে রোষ-তীব্র কণ্ঠে বলিল, "এর আর কাকীমা কি শুনবে?" তুমি তো এই রকম মিছে কথা ব'লে রাতদিন আমাকে মার খাওয়াবার চেষ্টা কচ্চো।"

রোষপ্রজ্জলিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সোনামণি বলিল, "কি, আমি তোকে মার খাওয়াবার চেষ্টা কচ্চি?"

জোর গলায় ফেলা বলিল, "হাঁ, কচ্চোই তো। সে দিন তোমার কথা শুনিনি, বাবাকে তাই লাগালে। বাবা আমার কান ম'লে দিলে। আজ আবার শুধু শুধু মিছে কথা ব'লে কাকীমার কাছে মার খাওয়ালে। কেন বল তো, আমি তোমার কি করেছি?"

সোনামণির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; সে রাগে যেন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "শোন ছোটবৌ, একরত্তি ছেলের কথা। আমি দিনরাত ওকে মার খাওয়াবার চেষ্টা করি, ওকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না, পাড়ায় পাড়ায় আমার এই সব নিন্দে ক'রে বেড়ায়।"

মুখভঙ্গী করিয়া ফেলা বলিল,"হাঁ, নিন্দে ক'রে বেড়ায়।"

রোষকঠিন স্বরে বিনোদিনী ডাকিল, "ফেলা!"

জোরে ঘাড় নাড়িয়া ফেলা বলিল, "তা আমার নামে এমন সব মিছে কথা বলবে কেন?"

"বেশ করবে বলবে।"

"তবে আমিও বলবো, বেশ করবো।"

"তবে রে হতভাগা ছেলে!"

বিনোদিনী অগ্রসর হইয়া ফেলাকে ধরিতে গেল, কিন্তু ধরিতে পারিল না; ফেলা এক দৌড়ে বাড়ীর দরজা পার হইয়া চলিয়া গেল।

সোনামণি তখন বিনোদিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখলে তো ছোটবৌ, একরত্তি ছেলের আস্পর্দ্দা।"

নম্রভাবে বিনোদিনী বলিল, "কি করবো দিদি, দেখছো তো, শাসনের আমি কম কচ্চি না। তবে মারধর—মা-মরা ছেলে, মাত্তে গায়ে হাত ওঠে না।"

কর্কশকণ্ঠে সোনামণি বলিল, "মা-মরা ছেলে, মা-মরা ছেলে ক'রে আস্কারা দিয়ে তুমিই তো ওর মাথা খেয়েছ। তোমার আস্কারাতেই তো ও এতখানি ধিঙ্গী হয়ে উঠেছে। তোমার যদি শাসন থাকতো—"

সোনামণির স্নেহশূন্য কথায় বিনোদিনী এবার রাগিয়া উঠিল; বলিল, "আবার কি ক'রে শাসন কত্তে হবে বল। মেরে ফেলবো?"

তীব্রকণ্ঠে সোনামণি বলিল, "মেরে ফেলতে যাবে কেন গা, আমি কি তোমাকে মেরে ফেলতেই বলছি? কোথায় যাব মা, তুমিও আমার এই রকম দুর্নাম দিতে আরম্ভ করলে! আসুক আজ ঘরে, হয় ছেলে শাসন করুক, নয় আমার যা হয় ব্যবস্থা ক'রে দিক্। চারদিক্ থেকে এত নিন্দে দুর্নাম আমি আর সইতে পারবো না।"

রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে সোনামণি এক দিকে চলিয়া গেল। বিনোদিনী নীরবে দাঁড়াইয়া ফেলাকে লইয়া কি যে করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

৩

সোনামণি সপত্নীপুত্র কর্ত্তৃক লাঞ্ছনা ও অপমানের কাহিনী এবং সেই সঙ্গে বিনোদিনীর তীব্রোক্তি স্বামীর নিকট সালঙ্কারে সক্রন্দনে বিবৃত করিলে শশী ছেলের উপর রাগিয়া স্থির করিল, ছেলেটাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ছোটবোয়ের কাছে থাকিতে তাহাকে শাসন করা দুরূহ। সুতরাং অন্ততঃ ছেলেটার পরিণামমঙ্গলের জন্য পৃথক্ হইতেই হইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে চিনিবাসকে বলিল, "ভাই, এ বয়সে বিয়ে কত্তে আর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তোমাদের অনুরোধে সে কায কত্তে হয়েছে। এখন সংসারে তাকে নিয়ে তো ভয়ানক অশান্তি চলেছে। এখন তাকে নিয়ে কি করবো, তাই ব'লে দাও।"

দাদাকে কি করিতে বলিবে, চিনিবাস তাহা ভাবিয়া না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শশী নিজেই কিন্তু তাহাকে এই ব্যাকুলতার হাত হইতে মুক্তি দিল; বলিল, "এখন হয় তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হয়, নয় আলাদা রাখতে হয়।"

চিনিবাস চিন্তিতভাবে বলিল, "বৌঠানকে বাপের বাড়ীতে রাখা—সেটা কি ভাল কথা হয় দাদা?"

শশী জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে তোমার মতে তাকে আলাদা ক'রে দেওয়াই কি উচিত?"

তাহাকে আলাদা করিয়া দেওয়ার অর্থ যে দাদাকেও আলাদা করিয়া দেওয়া, ইহা চিনিবাস বুঝিতে পারিল; বুঝিয়া একটা দুঃখের নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "যাতে ভাল হয়, তাই কর দাদা।"

শশীও দুঃখে যেন মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "ভাল মন্দ সকলই বুঝি ভাই, কিন্তু যে কায ক'রে ফেলেছি, তার তো আর চারা নাই। আর তার জন্যে যদি আমাদের সুখের সংসারে অশান্তি ঘটে, ভাই ভাই মনান্তর উপস্থিত হয়, তার চাইতে দুঃখও আর কিছুই নাই। তার চাইতে সময় থাকতে আলাদা হ'লে যদি ভাই ভাই মনের মিল ঠিক থাকে, তবে সেইটাই কি ভাল নয়?"

ছল ছল চোখে চিনিবাস বলিল, "তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর দাদা। তোমার কথার উপর কোন দিন কথা কইনি, কইবোও না।"

তখন দুই ভায়ে পৃথক্ হইবার আয়োজন হইতে লাগিল। বিনোদিনী ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, ওঁরা আলাদা হবেন, কিন্তু ফেলা আমাদের কাছে থাকবে তো?"

চিনিবাস বলিল, "তাও কি হয় ছোটবৌ? ওঁদের ছেলে—ওঁরা যদি আমাদের কাছে না রাখেন?"

ভীতিত্রস্তভাবে বিনোদিনী বলিল, "সে কি গো, ফেলা কি ওদের কাছে থাকবে? থাকলেও বাঁচবে কি?"

স্ত্রীর আশঙ্কার কারণ চিনিবাসও বুঝিত; সুতরাং দুঃখ-গম্ভীরকণ্ঠে স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিল, "বাঁচে না বাঁচে, সে কথা ওঁরা বুঝবেন। তুমি আমি তার কি কত্তে পারি ছোটবৌ?"

বিনোদিনী বলিল, "তিন দিনের ছেলে নিয়ে আমি যে নিজের মাই-দুধ খাইয়ে ওকে মানুষ করেছি গো!"

বলিতে বলিতে বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। চিনিবাস তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেঁদে কি করবে ছোটবৌ! পরের ছেলে মানুষ করেছ, ওর ওপর তোমার তো জোর নাই।"

জোর থাকিলেও বিনোদিনীর সে জোর খাটিল না। ছেলের কথা উঠিলে শশী নিজে বিনোদিনীর সমক্ষে চিনি-বাসকে বুঝাইয়া বলিল, "ভাই, বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু ওর গর্ভে যে কিছু হবে, তার সম্ভাবনা নাই, কারণ, ওর সন্তান-স্থানে শনির দৃষ্টি আছে। কাযেই ফেলাই এখন আমার আশা-ভরসার স্থল। কিন্তু এখন থেকে সে যদি আমার সঙ্গে আলাদা হয়ে থাকে, তা হ'লে এর পর সে আমাকেই মানবে, মা আমার অবর্ত্তমানে ওকেই ভাত-কাপড় দেবে?"

জ্যেষ্ঠের এই ন্যায্য কথার উপর চিনিবাস আর কোন কথা বলিতে পারিল না; বিনোদিনীও প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইল না।

প্রতিবাদের সুর ধরিল কিন্তু ফেলা। সে কাকীমাকে ছাড়িয়া পিতা বা বিমাতার কাছে থাকিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। বিনোদিনী তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল, অনেক বুঝাইল; ফেলা কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না; সে দুই হাতে কাকীমার গলা জড়াইয়া, তাহার বুকের ভিতর মুখখানা গুঁজিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তুমি আমাকে মেরে ফেল, কেটে ফেল কাকীমা, আমি তোমাকে ছেড়ে কক্ষণো কারও কাছে যাবো না।"

হায় রে অবোধ শিশু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন যদি কোন একটা শক্তি থাকিত, যাহা দিয়া কাকীমা তোকে আগলাইয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে সে কি তোকে ছাড়িয়া দিতে চায়? কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে? কে জানিবে যে, অপের মত তুইও বিনোদিনীর বুকের একখানা পাঁজরা! বিনোদিনী শুধু নীরব অশ্রুধারায় ফেলার মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল।

আলাদা হাঁড়ী হইবার পর প্রথম দুই তিন দিন ফেলা কাকীমার কাছেই খাইল; পিতা বা বিমাতার অনেক ডাকাডাকিতেও সে তাহাদের কাছে খাইতে গেল না।

৪

চতুর্থ দিনে শশী বিনোদিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ ছোটবৌমা, ছেলেটা এই বয়সেই ভয়ানক একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে। দেখছো তো, ক'দিনই খাবার জন্যে এত সাধাসাধি হচ্ছে, কিন্তু ওর গোঁ, কিছুতেই খাবে না। ছেলেমানুষের এতটা গোঁ রাখাও তো ভাল নয়। তুমি আজ ভাত দিও না, দেখি ওকে খেতে হয় কি না।"

ভাসুরের আদেশ শুনিয়া বিনোদিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মধ্যাহ্নকালে ফেলা পাঠশালা হইতে ফিরিয়া, বিনোদিনীর কাছে গিয়া বলিল, "ক্ষিদে পেয়েচে কাকীমা, ভাত দাও।"

বেদনাজড়িত কণ্ঠে বিনোদিনী বলিল, "ভাতের এখনও দেরী আছে।"

ফেলা আর কিছু না বলিয়া ছেঁড়া ঘুড়ীখানা লইয়া তাহার সংস্কারে মনোনিবেশ করিল।

পাশের রান্নাঘর হইতে সোনামণি ডাকিয়া বলিল, "আমার ভাত হয়েছে, খাবি আয় ফেলা।"

ফেলা যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনই ভাবে বসিয়া কাগজের টুকরায় বেলের আটা মাখাইতে লাগিল। সোনামণি পুনরায় ডাকিল, "আয় না ফেলা, ভাত খাবি যে?"

ফেলা মুখ না তুলিয়াই গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না।"

সোনামণি আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "আয়, ভাত বেড়েচি।"

ফেলা আপনার হাতখানা ছিনাইয়া লইয়া উত্তর করিল, "না।"

বিনোদিনী তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "না কেন? ভাত বেড়ে ডাকাডাকি কচ্ছে, গিয়ে খেয়ে আয় না।"

জোরে মাথা নাড়িয়া ফেলা উত্তর দিল, "উহুঁ।"

বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া সোনামণি বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিল, "দেখলে, একরত্তি ছেলের গোঁ।"

শশী ঘরের ভিতরে ছিল; সে বাহিরে আসিয়া ক্রোধ-সমুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, ওর গোঁ আজ ভাঙ্চি। টেনে নিয়ে এস তো হতভাগা ছেলেকে।"

শশী বাহিরে আসিতেই বিনোদিনী ত্রস্তভাবে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সোনামণি ফেলাকে সবলে টানিয়া লইয়া গিয়া ভাতের থালার সম্মুখে বসাইয়া দিল। ফেলা ভাতের কাছে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। শশী ক্রোধ-গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিল, "যদি ভাল চাস তো ভাত খা, নইলে আজ মেরে তোর হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই করবো।"

ফেলা নীরব নিশ্চল। সোনামণি তাহার হাতখানাকে টানিয়া ভাতের থালার উপর দিতে গেল। ফেলা সরোষ দৃষ্টিতে বিমাতার মুখের দিকে চাহিয়া হাতখানা সজোরে ছিনাইয়া লইল। ইহাতে থালায় লাগিয়া কতকগুলা ভাত ইতস্ততঃ ছিট্‌কাইয়া পড়িল, কয়েকটা ভাত সোনামণির কাপড়েও পড়িল। সোনামণি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সক্রোধ কণ্ঠে বলিল, "দেখলে, সর্ব্বস্ব সকড়ি ক'রে দিলে।"

শশী আর রাগ সামলাইতে পারিল না, ছুটিয়া আসিয়া তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিল। ফেলা "ওগো কাকীমা গো" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পৃষ্ঠে, গণ্ডে, বাহুতে চটাপট্ শব্দে চড় পড়িতে আরম্ভ করিল। ফেলা ভাতের থালার কাছে লুটোপুটী খাইয়া আকুলকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, "কাকীমা গো, কাকীমা গো!"

ওরে সর্ব্বনেশে ছেলে, কাহাকে তুই ডাকিতেছিস? কাকীমা যে তোর পর। সে শুধু তোকে ভালবাসিতে পারিবে, কিন্তু এই নির্দ্দয় শাসন হইতে তোকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার যে একটুও নাই। দুই হাতে বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া বিনোদিনী নিশ্চল নিস্পন্দ ভাবে রান্নাঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া রহিল।

এত প্রহারেও ফেলা যখন ভাত খাইল না, তখন শশী "দূর হ'" বলিয়া তাহার ঘাড় ধরিয়া উঠানের দিকে ঠেলিয়া দিল। ফেলা উঠানে মুখ থুব্‌ড়িয়া পড়িয়া গেল।

বিনোদিনী মাথায় কাপড় দিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। সোনামণি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "দুনিয়া ছাড়া ছেলে বাবা, এমন ছেলে বাপ-চোদ্দ-পুরুষ দেখেনি। কিন্তু এই আমি বলছি, যে আজ ওকে ভাত দেবে, সে তার বেটার মাথা খাবে।"

শুনিয়া বিনোদিনীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

চিনিবাস আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিল, "তাই তো, বৌঠান এমন কঠিন দিব্যিটা দিলে? তা হ'লে এখন উপায়?"

বিনোদিনী বলিল, "উপায় আর কি আছে, আজ ওর সঙ্গে আমারও উপোস। তুমি খেয়ে নাও।"

চিনিবাস বলিল, "ওকে রেখে আমিই বা খাই কি ক'রে?"

বিনো। না খেতে পার, তুমিও উপোস দাও।

চিনি। আমি স্বচ্ছন্দে উপোস দিতে পারি, কিন্তু ফেলা কি উপোস দিলে বাঁচবে?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বিনোদিনী বলিল, "ওর এখন বাঁচলেই কি মলেই বা কি? আঁতুড়েই যেতো, এখন না হয় দশ বছরের হয়ে—"

বিনোদিনী আর বলিতে পারিল না; আঁচলে মুখ ঢাকিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চিনিবাস কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিল, "ভাল, এক কায করলে হয় না ছোটবৌ?"

আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কায?"

চিনিবাস বলিল, "তোমার ভাতটা দিয়ে কায নাই, আমি না হয় দিই।"

বিনোদিনী বলিল, "আমার ব্যাটা কি তোমার ব্যাটা নয়?"

চিন্তিতভাবে চিনিবাস বলিল, "তা বটে, কিন্তু ছেলেটা —দূর হোক্, এক কায কর ছোটবৌ, ভাত দাও তুমি; তার পর যা করেন ভগবান্। অপে তোমার ব্যাটা, আর ফেলা কি ব্যাটা নয়?"

বিনোদিনীর অশ্রুসিক্ত মুখে হাসির রেখা দেখা দিল; বলিল, "তুমি যদি সাহস দাও—"

জোরে মাথা নাড়িয়া চিনিবাস বলিল, "খুব সাহস দিচ্ছি। এই মা-মরা ছেলেটাকে ভাত এক মুঠো দিলে যদি ব্যাটার মাথা খেতে হয়, তা না হয় খাওয়া যাবে। দাও তুমি ভাত।"

বিনোদিনী ব্যস্ততার সহিত ভাত আনিয়া স্বামীর কোলের কাছে ধরিয়া দিল। চিনিবাস ফেলার হাত ধরিয়া ভাতের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, "আয় ফেলা, দু'জনে একসঙ্গে খাই।"

ফেলাকে ভাত দিতে দেখিয়া সোনামণি আপন মনে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, "মা গো মা, সর্ব্ব-নাশীদের জ্বালায় ছেলে শাসন করবারও জো নাই। সর্ব্বনাশীরা কি ব্যাটা-পুত নিয়েও ঘর করে না গা!"

৫

অপে বলিল, "তোকে যেমন মার খাইয়েছে, তেমনি দে তুই ভাতের হাঁড়ী ভেঙ্গে।"

শঙ্কিতভাবে ফেলা বলিল, "কিন্তু যদি জান্‌তে পারে?"

অপে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "হাঁ, জান্‌তে পারলে আর কি! তুই যেমন বোকা। জিগ্যেস করলে বলবো, বেরালে ভেঙ্গেছে।"

ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিবার জন্য ফেলারও একটু আগ্রহ ছিল। কেন না, এই ভাত খাওয়াইবার জন্যই কা'ল সোনামণি তাহাকে বেদম মার খাওয়াইয়াছে। যে ভাত খাওয়াইবার জন্য এত মার, সেই ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে উপযুক্ত প্রতিশোধ দেওয়া হয় বটে। কিন্তু যদি জানিতে পারে? রান্নাঘরের পিছনের জানালা দিয়া ফেলা ইতস্ততঃ ভাবে হাঁড়ীগুলার দিকে চাহিয়া রহিল।

অপে তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "দূর বোকা, হাঁ ক'রে কি দেখছিস? শীগ্‌গীর ভেঙ্গে ফেল্ না, কেউ এসে পড়বে যে।"

ফেলা পশ্চাতে, পার্শ্বে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কি ক'রে ভাঙ্গবো? অত দূরে তো হাত যাবে না।"

নিকটেই একখানা সরু বাঁশ পড়িয়াছিল। অপে সেটাকে আনিয়া জানালায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, "এইটা খুব জোরে ঠেলে দে।"

ফেলা আর অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া সেই বাঁশটা লইয়া হাঁড়ীর গায়ে ঠেকাইল, তা'র পরে তাহার গোড়াটা ধরিয়া সবলে একটা ধাক্কা দিল। উপর্য্যুপরি তিনটা হাঁড়ী সাজান ছিল, ধাক্কা পাইয়া সেগুলা ভুড় ভুড় শব্দে মেঝের উপর পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোনামণির সাড়া পাওয়া গেল, "রান্নাঘরে কে রে?" সাড়া পাইয়াই অপে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। ফেলা ভিতর হইতে বাঁশটা টানিয়া লইতে ব্যস্ত হইল। কিন্তু তাহা টানিয়া লইবার পূর্ব্বেই সোনামণি রান্নাঘরে ঢুকিয়া ফেলাকে দেখিতে পাইল। ফেলা তাহাকে দেখিয়া বাঁশ ফেলিয়া পলাইয়া গেল।

অপেকে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে রে অপে?"

অপে বলিল, "বেরালে জ্যেঠাইমার ভাতের হাঁড়ী ভেঙ্গে দিয়েছে।"

বিনোদিনী বলিল, "বেরালে হাঁড়ী ভেঙ্গেচে, তা তুই ছুটে এলি কেন?"

শুষ্কমুখে অপে উত্তর করিল, "আমার বড্ড ভয় হ'লো।"

সন্দিগ্ধচিত্তে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "ফেলা কোথায়?"

অপে বলিল, "সে এখনও রান্নাঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বিনোদিনী বলিল, "সেখানে দাঁড়িয়ে কেন?"

অপে কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সোনামণি চীৎকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল, "দেখ ছোটবৌ, তোমার আদুরে গোপালের কাণ্ড। রান্নাঘরের জানালায় বাঁশ গলিয়ে সব হাঁড়ী ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিয়েছে।"

রোষতীব্র দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বিনোদিনী ডাকিল, "অপে!"

কাঁদ কাঁদ মুখে অপে বলিল, "আমি ভেঙ্গেচি বুঝি, ফেলা তো—"

"হতভাগা ছেলে" বলিয়া বিনোদিনী তাহার গালে এক চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া অপে আঁ আঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সোনামণি ইহাতে যেন অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "কি আপদ্! তুমি ওকে কেন মারলে ছোটবৌ? ও তো নয়, ফেলা ভেঙ্গেচে।"

কঠোর দৃষ্টিতে অপের মুখের দিকে চাহিয়া তর্জ্জন সহকারে বিনোদিনী বলিল, "ফেলা একা ভাঙ্গেনি, ও হতভাগাও সঙ্গে ছিল।"

সোনামণি ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "না না, ও থাকবে কেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি, ফেলা বাঁশ টেনে নিচ্ছে, আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ও তো সেখানে থাকেনি।"

গর্জ্জন করিয়া বিনোদিনী বলিল, "নিশ্চয়ই ছিল, ও আগে পালিয়ে এসেছে। ও হতভাগা না থাকলে ফেলার একার মাথায় কক্ষণো এমন বদমায়েশী বুদ্ধি আসবে না।"

সোনামণি বুঝিল, ছোটবৌ শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে; ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া ফেলাকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে। বুঝিয়া সে রোষতীব্র কণ্ঠে বলিল, "তুমি নিজের ছেলেকে মেরে ফেলাকে রক্ষা করবার চেষ্টা কচ্চো। এই করেই তুমি তাহাকে গোল্লায় দিয়েছ, তা জানি। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি। আসুক আজ ঘরে, ও সর্ব্বনেশে ছেলে কত বড় ধিঙ্গী হয়েছে, তা বোঝাপড়া যাবে।"

গর্জ্জন করিতে করিতে সোনামণি নিজের ঘরে চলিয়া গেল। বিনোদিনী অপেকে ধরিয়া আসল কথা বাহির করিতে চেষ্টিত হইল।

শশী আসিয়া যখন ফেলার ভীষণ দৌরাত্ম্যের কথা অবগত হইল, তখন রাগে সে যেন জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। সত্যই ছেলেটা একেবারে অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে, কাহারও মুখ চাহিয়া আর উহাকে ধরিয়া আনিলে চলিবে না। শশী খুঁজিয়া খুঁজিয়া চিনিবাসের ঘরের তক্তাপোষের নীচে হইতে ফেলাকে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহাকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া একটা মোটা চাবুক দিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিনোদিনী নিজের ঘরের দাবায় দাঁড়াইয়া নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে এই পৈশাচিক শাসন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

গেল, গেল—প্রহারে প্রহারে ফেলার সর্ব্বশরীর ফুলিয়া উঠিয়াছে, পিঠ ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, তাহার আর্ত্ত চীৎকারে বাড়ীখানা ফাটিয়া যাইতেছে! গেল গো গেল, ফেলা বুঝি এবার যায়,—বিনোদিনীর দশ বৎসরের প্রাণান্ত চেষ্টা—বক্ষোরক্ত দিয়া তিন দিনের মাংসপিণ্ডের প্রতিপালন সব বুঝি আজ ব্যর্থ হইয়া যায়! বিনোদিনী নিঃসহায়, নিরুপায়। আর কেহ হইলে বিনোদিনী এতক্ষণ ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিত! কিন্তু প্রহারকর্ত্তা যে ভাসুর। ওগো, ছেলেটাকে রক্ষা করিতে কেহই কি নাই? গেল, গেল—ফেলা বুঝি আর চীৎকার করিতেও পারে না!

চিনিবাস বাড়ী ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি ছোটবৌ?"

বিনোদিনী রুদ্ধশ্বাসে বলিয়া উঠিল, "ওগো, এসেছ যদি, ছেলেটাকে বাঁচাও।"

চিনিবাস চঞ্চল দৃষ্টিতে একবার প্রহৃত বালকের দিকে চাহিয়াই তাহাকে ধরিতে চলিল। শশী চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার চিনিবাস, আমার ছেলে আমি শাসন করবো, তুমি ধরতে এসো না।"

চিনিবাস দাঁড়াইয়া পড়িল। বিনোদিনী কিন্তু আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না; সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া চিনিবাসের পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো, পুরুষ ব'লে তোমাদের প্রাণে কি একটুও দয়ামায়া নাই গো!"

চিনিবাস আর থাকিতে পারিল না; ছুটিয়া গিয়া জ্যেষ্ঠের প্রহারোদ্যত হাতখানা সবলে চাপিয়া ধরিল। শশী হাঁপাইতে হাঁপাইতে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চিনিবাস!"

চিনিবাস বলিল, "কচ্চো কি দাদা? আমাকে চোখ রাঙাচ্চো বটে, কিন্তু এক্ষুণি যে তোমার হাতে দড়ি পড়বে, তা বুঝতে পাচ্চো না? দেখচো না, ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে?"

শশী হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটু দূরে গিয়া বসিয়া পড়িল। চিনিবাস ফেলার হাতের পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিল, এবং তাহার মুখে চোখে জল দিয়া চৈতন্যসঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

৬

বিনোদিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার কি ব'লে গেল গা?"

কুঞ্চিতমুখে চিনিবাস উত্তর করিল, "বলবে আর কি, মাথামুণ্ডু! বাঁচলেও বাঁচতে পারে।"

উদ্বেগবিশুষ্ক মুখে বিনোদিনী বলিল, "বাঁচলেও বাঁচতে পারে—তা হ'লে কি বাঁচবে না?"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া চিনিবাস বলিল, "মরা বাঁচা ভগবানের হাত। তবে যে রকম অবস্থা—"

ব্যাকুল কণ্ঠে বিনোদিনী বলিল, "অবস্থা কি খুব খারাপ?"

মুখ মচ্কাইয়া চিনিবাস বলিল, "এখন তত খারাপ নয়, তবে পরে কি হয় বলা যায় না।"

অপেক্ষাকৃত নিরুদ্বিগ্নভাবে বিনোদিনী বলিল, "এখন তা হ'লে বাঁচবার আশা আছে বল?

একটু ম্লান হাসি হাসিয়া চিনিবাস জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আশা থাকলেই তোমার তাতে কি ছোটবৌ?"

মুখ নীচু করিয়া গাঢ় বেদনাজড়িত কণ্ঠে বিনোদিনী বলিল, "আমার—আমার তাতে লাভ আছে বৈ কি। আমি বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ করেছি। ফেলা যেখানেই থাক্, যারই হোক্, বেঁচে থাক্‌লেই আমার সুখ।"

গম্ভীরমুখে চিনিবাস বলিল, "পরের ছেলেকে মানুষ ক'রে সুখদুঃখের আশা করলে চলে না ছোটবৌ।"

স্বামীর উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিনোদিনী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। চিনিবাস জিজ্ঞাসা করিল, "আজ সারা দিনের মধ্যে একবারও যে দেখতে যাওনি ছোটবৌ?"

বিনোদিনী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি ক'রে যাব বল, আজ সকালে কি রকম কটু দিব্যি দিয়েছে, তা শোন নি?"

চিনি। কি এমন কটু দিব্যি দিয়েছে?

বিনো। সকালে ফেলাকে আদর দেওয়ার ছুতো ধ'রে আমাকে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিয়ে বল্লে, যে আমার ঘরের দরজায় পা দেবে, সে ব্যাটার মাথা খাবে, সোয়ামীর রক্তে পা ধোবে।"

চিনি। তা হ'লে তুমি বোধ হয় আর ফেলাকে দেখতে যাবে না?

দৃঢ়স্বরে বিনোদিনী বলিল, "কক্ষণো না। একটা পরের ছেলের তরে কেন এমন সব কটু দিব্যি লঙ্ঘন কর্ত্তে যাব?"

চিনিবাস বলিল, "কিন্তু তুমি না কাছে থাক্‌লে, ছেলেটার যদিও বাঁচবার আশা ছিল, তাও থাক্‌বে না। চেতনা হয়ে অবধি তো সে কাকীমা, কাকীমা কচ্ছে।"

বিনোদিনীর চোখ দুইটা হঠাৎ যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া নিতান্ত তাচ্ছীল্যের সহিত বলিল, "করুক্ সে, তুমি আমাকে আর ও সকল কথা শুনিও না।"

বলিয়াই সে ত্রস্তপদে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

স্বামীকে ফেলার কথা শুনাইতে নিষেধ করিল বটে, কিন্তু বিনোদিনী নিজে তাহার সংবাদ জানিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল। ঘরের কাজ করিতে করিতে এক একবার কান খাড়া করিয়া থাকে, কে কি বলিতেছে, ফেলার সম্বন্ধে কেহ কোন কথা কহিতেছে কি না, ফেলা রোগযন্ত্রণায় অধীর হইয়া কাকীমা, কাকীমা বলিয়া চীৎকার করিতেছে কি না। হায়, কি কুক্ষণে সে ফেলাকে মানুষ করিয়াছিল! মানুষ করিলেও তাহাকে এতটা ভালবাসিল কেন? সে এতটা ভাল না বাসিলে ফেলা তো স্বচ্ছন্দে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত, তাহার জন্য বাপের কাছে মার খাইয়া ফেলাকে আজ মরণাপন্ন হইতে হইত না। হে মা দুর্গা, হে মা কালী, বুক চিরে রক্ত দেব মা, এ যাত্রার মত ফেলাকে বাঁচাও, আর আমি তাহাকে আমার ত্রিসীমানায় আসিতে দিব না।

সন্ধ্যার পর কাযকর্ম্ম শেষ করিয়া বিনোদিনী অন্ধকার দাবার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল; বসিয়া বসিয়া মনে মনে তেত্রিশ কোটি দেবতার নিকট ফেলার আরোগ্যকামনা করিতেছিল। এমন সময় শশীর ঘর হইতে বাহির হইয়া চিনিবাস তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই বিনোদিনী উদ্বেগকম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো?"

'কি গো, ফেলা কেমন আছে'— এতগুলা কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার কণ্ঠটা রুদ্ধ হইয়া আসিল। কি জানি, ফেলার কথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে গেলে পাছে কোন অশুভ উত্তর পাওয়া যায়।

সে না বলিলেও চিনিবাস কিন্তু তাহার জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিল। বুঝিয়া সে শোকরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল, "আর কি! তিন দিনের ছেলেকে মানুষ করলে, কিন্তু দশ বছরের ছেলেকে আর রাখতে পারলে না ছোটবৌ।"

চিনিবাস অবসন্নভাবে সেইখানে বসিয়া পড়িল। এঁ্যা, ফেলা তবে বাঁচবে না? বিনোদিনীর কানের কাছ দিয়া যেন কড়্ কড়্ শব্দে বাজ ডাকিয়া গেল; তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ফেলা, ফেলা! বিনোদিনী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া শশীর ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। ঘরে শশী ছিল, পাড়ার দুই-চারি জন লোক ছিল; বিনোদিনী কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত করিল না; সে উন্মাদিনীর মত আলুথালুবেশে ছুটিয়া গিয়া ফেলার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। "ফেলা, ফেলা, বাপ আমার!"

যেন কোন্ সুদূর দেশ হইতে ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে ফেলা উত্তর দিল, "কাকীমা!"

পরক্ষণেই মৃত্যুর ভীম ঝঞ্ঝানিনাদে তাহার সে ক্ষীণ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি কোথায় ডুবিয়া গেল। শুধু বিনোদিনীর করুণ আর্ত্তনাদ নৈশগগনে প্রতিধ্বনি তুলিতে লাগিল— ফেলা, বাপ আমার!

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

নরবলি-প্রথা

প্রাচীনকালে পৃথিবীর বর্ব্বরজাতি-সমূহের মধ্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। ফিনিসিয়ার অধিবাসিগণ মলক নামক দেবতার উপাসনা করিত। মলক প্রত্যহ বহুসংখ্যক নরমুণ্ড উপহার পাইতেন। এসিয়ার কোনও কোনও অসভ্য জাতিও নরবলির দ্বারা দেবতাগণকে প্রসন্ন করিত; কিন্তু কিরূপে সেই প্রথা ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কেহ কেহ অনুমান করেন, চীনের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পার্ব্বতীয় প্রদেশ হইতে কতকগুলি অসভ্য জাতি আসামে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। কালক্রমে কতকগুলি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসামে গিয়া বাস করিতে থাকায় বর্ব্বরগণের সংস্রবে পড়িয়া তাঁহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারাই আসামীগণের তদানীন্তন রীতি-নীতি প্রথাপদ্ধতির ভিত্তি অবলম্বনে কালিকাপুরাণ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক তন্ত্রমত প্রচার করেন। সেই জন্যই কালিকাপুরাণে নরবলির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অনুমান সত্য কি না বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, কালিকাপুরাণে বর্বরজাতির রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, কুম্ভীর, বৃষ, ছাগ, মহিষ, পক্ষী প্রভৃতি ভূচর, খেচর ও জলচরের শোণিত হইতে আরম্ভ করিয়া দেবীর সমক্ষে অমূল্য মানবজীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আসামই কালিকাপুরাণের জন্মস্থান, এরূপ মনে করিবার আরও কারণ আছে। আসামের ইতিহাসপ্রণেতা গেট দেখাইয়াছেন, নরবলি-প্রথাটি পূর্ব্বে শুদ্ধ আসামেই প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, কামাখ্যা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে অন্যূন তিন শত এবং আসামের অন্যান্য স্থানে কালীমন্দির সংস্থাপনের সময় বহুসংখ্যক লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার সময় ভিন্ন নিত্যনৈমিত্তিক পূজার নিমিত্তও আসামে নরবলি হইত। তবে মন্দের ভাল এইটুকু যে, কোন ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে বধ করা হইত না। যাহারা দেবীর সমক্ষে জীবন বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইত, তাহাদিগকে "ভোগী" বলিত। ভোগিগণকে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হইত, এই সময়ের মধ্যে তাহারা যদৃচ্ছারূপ কার্য্য করিবার অনুমতি পাইত, তখন তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে কাহারও সাধ্য থাকিত না। বাঙ্গালা দেশেও শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে কাপালিক প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য জাতি ভিন্ন কেহই দেবতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নরহত্যা করিত না। কাপালিকগণ এইক্ষণে বাঙ্গালী হইলেও, বর্ব্বরজাতি হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কোনও কালেই নরবলি প্রচলিত ছিল না। সেই জন্য আমরা কোন প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে নরবলির উল্লেখ দেখিতে পাই না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে এক স্থানে নরবলির কথা আছে বটে; কিন্তু আর্য্যকুলসম্ভূত কোন ব্যক্তি নরবলি দ্বারা দেবতাকে প্রসন্ন করিয়াছে, এরূপ কথা কৃত্তিবাস বলেন নাই। রাবণপুত্র মহীরাবণ রামলক্ষ্মণকে কালীর সম্মুখে বলি দিবার জন্য তাঁহাদিগকে হরণ করিয়া পাতালে লইয়া গিয়াছিল, পরে হনূমান্ মক্ষিকার আকৃতি ধারণ পূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইয়া কালীর হস্তস্থিত খড়্গের দ্বারা মহীরাবণকে বধ করিয়াছিল, ইহাই বাঙ্গালী কবির কল্পনা। মহীরাবণ নরমাংস ভোজী রাক্ষস, সুতরাং সে নরবলি দিবার আয়োজন করিয়াছিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

কালিকাপুরাণ বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি অবলম্বনে দেবীর সম্মুখে একটি নরবলি দিলে দেবী সহস্র বৎসর এবং তিন ব্যক্তিকে বধ করিলে তিনি লক্ষাধিক বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা করিয়াই পুরাণরচয়িতা ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কিরূপে কোন্ কোন্ অস্ত্রের দ্বারা বলি দিতে হইবে, কাহারা বলির যোগ্য, কাহারা বলির অনুপযুক্ত, বলিদানের সময় কি কি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ইত্যাদি বীভৎস প্রসঙ্গসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে বলি দিতে হইবে, তাহার সুপুরুষ হওয়া আবশ্যক। বলিদানের পূর্ব্বদিন সে নিরামিষ ভোজন করিবে। বলির পূর্ব্বক্ষণে তাহার

সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখাইয়া তাহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিতে হইবে। অতঃপর তাহাকে উত্তরাস্য হইয়া দাঁড় করাইয়া বলিদাতা তাহার ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মার, নাসিকায় মেদিনীর, কর্ণযুগলে আকাশের, বদনে বিষ্ণুর, কপালে চন্দ্রের, মুখের দক্ষিণপার্শ্বে ইন্দ্রের, বামপার্শ্বে অগ্নির, স্কন্ধে যমের পূজা করিবে। পূজা সমাধা হইলে বধ্যমান ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা সম্ভাষণ করিতে হইবে :—

"হে পুরুষোত্তম, হে শুভ, তোমাতে সর্ব্বদেবতার সমাবেশ (হইয়াছে); তুমি আমাকে আশ্রয় দান কর ; আমি তোমার অনুগত ; আমার পুত্রগণকে, গাভীগণকে এবং স্বজনদিগকে তুমি রক্ষা কর। এই রাজ্য, মন্ত্রিগণ ও বন্ধুগণকে রক্ষা কর। মৃত্যু মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী, অতএব কৃপা করিয়া তোমার দেহ বিসর্জ্জন কর। হে শুভ, কঠোর তপস্যা, দান এবং যাগযজ্ঞের দ্বারা লোক যে ফল পাইয়া থাকে, তুমি আমাকে তাহা দান করিয়া নিজে মোক্ষপ্রাপ্ত হও। তোমার আশীর্ব্বাদে আমি যেন রাক্ষস-পিশাচ-ভীতি, সর্প, অসৎ নৃপতি, শত্রুগণ এবং সর্ব্বপ্রকার আপদ হইতে মুক্ত থাকি। মৃত্যু মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী, অতএব তুমি অন্তিমকালে তোমার মাংসময় স্কন্ধনিঃসৃত রুধির দানে ভগবতীর প্রীতিসম্পাদন কর।"

মন্ত্র উচ্চারিত হইলে, একখানি চন্দ্রহাস অথবা কাটারির দ্বারা বধ্যমান ব্যক্তির মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক উহা দেবীর দক্ষিণ-পার্শ্বে রাখিয়া বলিদাতা তাহার স্তবস্তুতি করিবে, ইহাই কালিকাপুরাণের ব্যবস্থা। যে সকল ব্যক্তি বলিদানের অনুপযুক্ত; কালিকাপুরাণ তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, — অন্ধ, খঞ্জ, পীড়িত, কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত, ভীরু, নপুংসক, মহা-পাতকী, স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ, রাজা, চণ্ডাল, এবং অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণ বলিদানের অযোগ্য। অর্থাৎ রাজা, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে যাহারা সুপুরুষ, সুস্থকায়, নিষ্পাপ, উদ্যমশীল, নির্ভীক, তাহারাই বলিদানের উপযুক্ত পাত্র। উত্তম ব্যবস্থা। ব্যবস্থাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পুরাণখানা আর্য্য-অনার্য্য মস্তিষ্কের সংযোগে রচিত হইয়াছিল ; উহাতে হিন্দুগণের পূজাপদ্ধতির সহিত বর্ব্বরগণের আচার-ব্যবহার একাধারে সম্মিলিত হইয়াছে। বর্ব্বরতা শুদ্ধ যে আসামের পূজাপদ্ধতিতে দৃষ্ট হইত, তাহা নহে। প্রাচীনকালে আসামে "আহম" নামে এক জাতি বাস করিত। (১) তাহারা যুদ্ধকালে শত্রু-পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা রণস্থলে দেহ ত্যাগ করিত, তাহাদের মুণ্ড এক স্থানে রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া আপনাদের বিজয়ঘোষণা করিত। আহম নৃপতিগণের মধ্যে যিনি যখন মরিতেন, তখন তাঁহার সমাধির নিমিত্ত একটি সুবৃহৎ কূপ খনন করা হইত। সেই কূপের মধ্যে মৃত ভূপতির শবদেহের সহিত তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীগণকে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা কূপটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত। যে সকল জাতির মানবজীবনের প্রতি এরূপ নির্ম্মমতা, তাহারা উপাস্য দেবতাকে নরবলি দ্বারা সুপ্রসন্ন করিবে, ইহাতে বিচিত্র কি? গেট বলিয়াছেন, এই আহম জাতিই পরিশেষে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণের হস্তে পড়িয়া হিন্দু হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দু হইলেও তাহাদের আচারব্যবহার ও রীতিনীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া পাঠকগণ যেন মনে না করেন, আমি দেবীপূজার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতেছি। ভগবান্‌কে পিতা বলিয়া সম্বোধন করায় যদি কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে মাতা বলিয়া পূজা করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

অর্থাৎ যাহারা যে প্রকারে আমাকে ভজনা করে, তাহা-দিগকে আমি সেই প্রকারে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যদি প্রশস্ত হয়, সাকার উপাসনাও অপ্রশস্ত নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান্‌কে কখন কালীরূপে, কখন কৃষ্ণরূপে, কখন যীশুখৃষ্ট, আবার কখন বা মহাম্মদের বেশে দেখিয়াছিলেন। কখন কখন বা তিনি সো (অ) হং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরব্রহ্মের সহিত মিলিয়া যাইতেন। সুতরাং ধর্ম্ম যাহাই হউক, পূজাপদ্ধতি যেরূপই হউক, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই ; কিন্তু যে কোন প্রকারের পূজাই হউক, ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া এ পর্য্যন্ত কোন সভ্য জাতি নরহত্যা করে নাই। নরবলিটি বর্ব্বরজাতির প্রথা।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

(১) "আহম" হইতে আসামের নামকরণ হইয়াছিল। আসামে "স" "হ" বলিয়া উচ্চারণ করে।

এডিনবরো ও নৌবহর

সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমরা লণ্ডন হইতে বাহিরে যাইতে পারি নাই। ১৯শে অক্টোবর (১৯১৮ খৃঃ) মধ্যাহ্নে সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর সহিত বাকিংহাম প্রাসাদে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তাহার পর আমরা সমরায়োজন দেখিতে যাত্রার উদ্যোগ করিলাম। প্রথম গন্তব্য স্থান—এডিনবরো। তথায় আমরা ইংরাজের অপরাজেয় নৌবহর দেখিব।

২১শে অক্টোবর যাত্রার দিন।

এডিনবরোর কথায় কত কথা মনে পড়িয়া গেল। বাল্যকালে যখন ঐতিহাসিক সার ওয়াল্টার স্কটের—Tales of a Grandfather পাঠ করিয়াছিলাম, তখন সেই পুস্তকে স্কটলণ্ডের সহিত আমার প্রথম পরিচয়। সে পরিচয় ঘনীভূত হইয়াছিল—সাহিত্যের দ্বারা। স্কটের উপন্যাস ও কবিতা এবং কৃষাণ কবি বার্ণসের কবিতা আমার তরুণ হৃদয়ে স্কটলণ্ডের কল্পনা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। স্কটের উপন্যাস ও কবিতা পাঠ করিলে মনে হয়, তিনি যেমন করিয়া দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার বুঝি তুলনা নাই। এডিনবরোর সঙ্গে স্কটের সাহিত্যস্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এই সহরে তিনি বাস করিয়াছিলেন। আর সহরের অধিবাসীরাও অকৃতজ্ঞ নহে। তাহারা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত, তাই সহরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথের পার্শ্বে তাঁহার স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মন্দিরমধ্যে সাহিত্যিকের মূর্ত্তি।

সার ওয়াল্টার স্কট।

কৃষাণ কবি বার্ণসও এক সময় এই সহরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগৃহটি সযত্নে রক্ষিত। তিনি কবিতায় এই সহরের বর্ণনাপ্রসঙ্গে নাগরীদিগের কথায় বলিয়াছেন :—

তোমার দুহিতাকুল,
রূপের নাহিক তুল,
পথ সব যায় উজ্জলিয়া।
রবিকরে স্বর্ণকায়
নিদাঘ-অম্বরপ্রায়,
রূপ যেন পড়ে উছলিয়া।
প্রস্ফুট কুসুমদল
শোভে যথা সমুজ্জ্বল,
শোভে তা'রা তেমনি শোভায়।
শরীরী আনন্দরাশি
যেন তা'রা চলে ভাসি',
ভরি' দিক আনন্দ-ধারায়।

স্কটলণ্ড যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই সহরেই তাহার রাজধানী ছিল এবং তৎকালের প্রয়োজনানুসারে প্রাসাদ বিরাট দুর্গমধ্যে অবস্থিত ছিল। সহরের অবস্থানস্থানটিও সুন্দর। জলকূল হইতে জমী ক্রমে উচ্চ হইয়া পর্ব্বতমালায় পরিণত হইয়াছে—কয়টি পর্ব্বত লইয়া সহর। দুর্গ সুরক্ষিত করিবার স্বাভাবিক সুবিধা বিদ্যমান।

যত দিন স্কটলণ্ড স্বাধীন স্বতন্ত্র ছিল, তত দিন ইহার প্রতিনিধিসভা বা পার্লামেণ্টের অধিকাংশ অধিবেশন এই সহরেই হইত এবং সভাগৃহ আজও দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আমরা ট্রেণে লণ্ডন ত্যাগ করিলাম। বহু দিন পূর্ব্বে কোন পর্টুগীজ লেখকের লিখিত ইংলণ্ডের বিবরণে পাঠ

স্কটের স্মৃতি-মন্দির।

করিয়াছিলাম, ইংলণ্ড একটি বিরাট পশুচারণক্ষেত্র। পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। যে দেশ কৃষি-প্রধান নহে, পরন্তু শিল্পপ্রধান, যে দেশের বিরাট কল-কারখানা হইতে বাণিজ্যের স্রোতে পণ্য জগতের সকল দেশে প্রেরিত হয়, সে দেশে পশুচারণক্ষেত্রের আধিক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? দিবালোকে লণ্ডনের বাহিরে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। ইংরাজ কৃষিকার্য্যে অবহেলা করিয়া কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করায় বড় বড় সহরের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পল্লীগ্রাম হইতে লোক আসিয়া সহরে বাস করিতেছে। পল্লীগ্রামের ক্ষেত্রে গবাদি পশু ও মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি পালিত হইতেছে। দেশের জলবায়ু শষ্প-বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। পূর্ব্বোক্ত পশুপক্ষীর পালনে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হয়; উৎকৃষ্ট গবীর ও উৎকৃষ্ট ষণ্ডের সংযোগে উৎকৃষ্টতর বৎস উৎপন্ন হয়। গবীর দুগ্ধের হিসাব রাখা হয়। উৎকৃষ্ট গবী ও ষণ্ড বহু মূল্যে বিক্রয় হয়। এক একটি গবী যে পরিমাণ দুগ্ধ দেয়, তাহা শুনিলে বাঙ্গালার অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত আমরা বিস্মিত হই। বৃহদাকার এক একটি গবী দেখিলে চক্ষু যেন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না।

মেষ ও শূকর যে কত বড় হয়, তাহা বিলাতে না দেখিলে আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। এলসবেরী হাঁস ও অর্পিংটন প্রভৃতি জাতীয় মুর্গী আকারে যেমন বৃহৎ, তেমনই সুদৃশ্য। বিলাতে শৃগালের উৎপাত না থাকায় মুর্গী স্বচ্ছন্দে মাঠে বিচরণ করে। মাঠের মধ্যে এক স্থানে একটি চালার মধ্যে বাক্স পাতা। তাহারা আসিয়া তাহাতে ডিম পাড়িয়া যায়।

বিশাল চারণক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে আমরা ট্রেণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে নিউকাশলে গাড়ী বদল করিতে হইল।

নূতন গাড়ীতে উঠিয়া প্রথম গাড়ীতে "রেগুলেটার" দেখিলাম। শীতের সময় রেগুলেটারের দ্বারা গাড়ীর মধ্যে ইচ্ছামত গরম করা চলে—তাপ বিকীর্ণ হইয়া সমগ্র গাড়ীখানির মধ্যে শৈত্য দূর করে।

ট্রেণে আমরা ২টি কামরায় ছিলাম। একটিতে মিষ্টার স্যাণ্ডব্রুক, শ্রীযুক্ত দেবধর, আমি ও আমাদের সঙ্গী বোম্বাইয়ের সিভিলিয়ান মিঃ ক্লেটন। আর একটিতে আয়াঙ্গার মহাশয়, মৌলবী মাবুব আলম ও লেফটেনাণ্ট লং। টিকিট-পরীক্ষক আমাদের কামরায় আসিলে ক্লেটন আমাদের কয় জনের "পাশ" দেখাইয়া বলিলেন, "অপর কামরায় দুই জন 'নেটিভ' ভদ্রলোক ও আর এক জন আছেন।" আমি টিকিট-পরীক্ষককে বলিলাম, "অপর কামরায় দুই জন ভারতীয় ভদ্রলোক ও এক জন 'নেটিব' আছেন।" টিকিট-পরীক্ষক চলিয়া গেলে ক্লেটন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ওরূপ বলিলেন কেন?" উত্তরে আমি বলিলাম, "এটা

স্কটের বাসগৃহ।

আপনাদের দেশ, সুতরাং আপনারাই 'নেটিব'।" তাঁহার ব্যবহৃত "নেটিব" কথায় আমার আপত্তি আছে বুঝিয়া ক্লেটন তর্কে প্রবৃত্ত হইলেন—আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, "নেটিব" শব্দটা তাঁহারা হীনতাব্যঞ্জক বলিয়া মনে করেন না। আমি বলিলাম, "এ তর্কে কোন ফল নাই। আপনি ভারত সরকারের হাজার শ্বেতাঙ্গ চাকরের এক জন মাত্র। 'নেটিব' শব্দের প্রয়োগে আমাদের আপত্তি আছে বলিয়া আপনার মনিব ভারত সরকার সৈনিক আইনে সম্প্রতি 'নেটিভ' শব্দের পরিবর্ত্তে ভারতীয় (ইণ্ডিয়ান) শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য নূতন আইন করিয়াছেন।" তখন ক্লেটন নিরুত্তর হইলেন—সেই দিন হইতে তাঁহার মুখে আর সে শব্দটি শুনিতে পাই নাই।

সন্ধ্যায় আমরা এডিনবরো ষ্টেশনে উপনীত হইলাম এবং নর্থ বৃটিশ রেলওয়ে কোম্পানীর ষ্টেশন হোটেলে আশ্রয় লইলাম।

লণ্ডন অপেক্ষা এডিনবরোয় শীত অনেক বেশী বোধ হইল। আমরা তথায় যাইব শুনিয়া শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আয়াঙ্গার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, বিকানীরের মহারাজ বলিয়াছেন, "এডিনবরো আবহ বিষয়ে নরক—সে শীতে আপনার তথায় না যাইলেই ভাল হয়।" আমরা যাইবার পূর্ব্বে ক্লেটন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সকলের

বার্ণসের গৃহ।

মাফলার (গলবন্ধ) আছে ত ?" আমার মাফলার ছিল না, মৌলবী সাহেবেরও নহে। ক্লেটন বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রী কম্ফর্টার বুনিয়াছেন—আমাদের ২ জনের জন্য ২টি আনিবেন। মৌলবী সাহেব সে সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। আমি বলিয়াছিলাম, আমি মাফলার ব্যবহার করি না; কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় একটা, কিনিয়া লইব। ব্যবহার করি না বলিয়া আমি আমার স্ত্রীর ও কন্যাদের কাছে যাহা উপহার লই নাই, আজ ক্লেটন-পত্নীর কাছে তাহা উপহার লইতে ইচ্ছা হইল না। আমি মাফলার কিনিয়াছিলাম; কিন্তু ক্লেটনের সঙ্গে বাজি ছিল, আমি যদি তাহা ব্যবহার না করি, তিনি তাহার দাম বাজি হারিবেন। সে বিষয়ে আমারই জয় হইয়াছিল।

অর্পিংটন মুর্গী।

পরদিন আমাদের নৌবহর (Grand Fleet) দেখিতে যাইবার ব্যবস্থা ছিল। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, চারিদিক কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন—

বিলাতী গবী।

পর বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সম্মুখে—ফোর্থের সেতু। ৫ হাজার লোক ৭ বৎসর দিবা-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এই সেতুনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়াছিল। ইহার বড় ২টি পাটাল ১ হাজার ৭শত ১০ ফুট করিয়া লম্বা।

বৃষ্টির মধ্যে আমরা এক-খানা খোলা ছোট ষ্টীমারে উঠিলাম। কয় মাইল অগ্রসর হইয়া বড় বড় যুদ্ধজাহাজে যাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে শীতের প্রকোপ বুঝিলাম। জুতা ও চরণাবরণ মোজা এতদুভয়ের মধ্যে যে আবার ফেল্টের আস্তরণ দিতে হয়, তাহা আমার জানাই ছিল না; কেন না, আমাদের দেশে তাহার প্রয়োজনই হয় না, সিমলা বা দিল্লীর শীতেও কোন দিন তাহার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। মনে হইতে লাগিল, বরফের উপর রাখায় চরণদ্বয় অসাড় হইয়া উঠিতেছে—ক্রমে যন্ত্রণাবোধ

কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। মনে করিয়াছিলাম, প্রাত-রাশের পর নৌবহর দেখিতে যাইতে হইবে—তাহার পূর্ব্বে সহরে এক পাক ঘুরিয়া আসিব। তাহা হইল না। হোটেলের মধ্যে দোকানে রৌপ্যে রঙ্গীন পাতর বসান স্কটলণ্ডের ব্রোচ পিন প্রভৃতি অলঙ্কার দেখিতে লাগিলাম। এগুলি দেখিতে সুন্দর—মূল্যও অল্প।

প্রাতরাশ শেষ হইবার অল্পক্ষণ পরেই নৌবহরের ২ জন কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ আমরা সামরিক বিভাগের নৌবহরের (Admiralty) অতিথি, তাঁহারা আমা-দিগকে নৌবহর দেখাইবার জন্য লইয়া চলিলেন। আমরা প্রচুর পরিমাণ গাত্রাবরণে আবৃত হইয়া মোটরে যাত্রা করিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা জলকূলে উপনীত হইলাম। তখন কুজ্ঝটিকার

এলসবেরী হাঁস।

ফোর্থের সেতু।

হইতেছিল। সে যন্ত্রণা সহ্য করা দুষ্কর হইলেও তাহার প্রতীকারের পথ জানা ছিল না। আমি পার্শ্ববর্ত্তী আয়াঙ্গার মহাশয়কে সে কথা বলিলে তিনি বলিলেন, তাঁহারও যন্ত্রণাবোধ হইতেছে। সুখের বিষয়, শীত কেবল আমাদিকেই আক্রমণ করে নাই। ইংরাজ সঙ্গীরাও শীতে কাতর হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা পদসঞ্চালন করেন। তাঁহারা আরম্ভ করিলে আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিলাম—ধুপধাপ করিয়া যেন কুচকাওয়াজকালে পা ফেলিয়া আমরা চরণের আড়ষ্টভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিলাম।

পথে "এরিণ" ও "এজিনকুর" নামক ২খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় যুদ্ধ জাহাজ দেখাইয়া আমাদিগকে বলা হইল, সে ২খানি তুর্কীর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তুর্করা জাহাজ লইতে আসিয়াছিল। এই সময় যুদ্ধঘোষণা হয় এবং তুর্কদিগকে জাহাজ হইতে বিতাড়িত ও বন্দী করিয়া ইংরাজ জাহাজ ২খানি দখল করেন। ইংরাজ দখল করিয়া জাহাজ ২খানির এই নামকরণ করিয়াছেন; পূর্ব্বে তুর্কীদের নির্দ্দেশে, নাম অন্যরূপ ছিল। পথে সেনাপতি জেলিকোর জাহাজ "আয়রণ ডিউক"ও দেখিলাম।

বারিপাতে সিক্তবস্ত্র ও শীতে কাতর অবস্থায় যখন "নেপচুন" বৃহৎ রণতরীতে উঠিলাম, তখন যে আরাম বোধ হইল, সচরাচর তাহা হয় না। জাহাজের অধ্যক্ষ আমাদিগের সিক্ত ওভারকোট ও টুপীগুলি সেঁকিয়া শুকাইয়া আনিতে দিলেন। আমরা জাহাজের উপবেশনকক্ষে যে স্থানে বৈদ্যুতিক "হিটার" হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতেছিল, সেই স্থানে বসিয়া সুস্থ হইলাম।

আমরা একটু সুস্থ হইলে অধ্যক্ষ আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ দেখাইতে চলিলেন। আমার মনে হয়, বৃটিশ

রণতরী না দেখিলে ইংরাজের যুদ্ধোপকরণের পরিমাণ যেমন পরিমাপ করা যায় না, ইংরাজের যুদ্ধ করিবার শক্তিও তেমনই বুঝা যায় না। আমি "নেপচুন" জাহাজে দৃষ্ট একটি ব্যাপারের উল্লেখ করিব। প্রথমে আমাদিগকে কামানঘরে লইয়া যাওয়া হইল। একটা বড় ঘর—তাহার মধ্যে এক জোড়া বড় কামান, টর্পিডো, লোকজন। সমস্ত ঘরটি একটি থামের উপর অবস্থিত। ঘর হইতে বাহির হইয়া আমরা উপরে ডেকে যাইলাম। তথায়—এক ধারে একটি ক্ষুদ্র ও সাধারণ যষ্টির মত স্থূল দণ্ডের উপর এক জোড়া "ফিল্ডগ্লাস" (দূরবীক্ষণ) রক্ষিত। সেই গ্লাস দিয়া দূরে দেখিতে হয়। গ্লাস যে দিকে ফিরান যায়, সমগ্র ঘরটি সে দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়া যায় যে, কামানের মুখ ও গ্লাস এক-মুখে অবস্থিত হয়। অর্থাৎ উপরে দর্শক যখন শত্রু জাহাজের দিকে দৃষ্টি স্থির করে, তখন নিম্নে কামানের মুখ সেই দিকে যায়। তখন উপর হইতে সঙ্কেত করিলেই নিম্নে লোক টর্পিডো ছাড়ে—শত্রুর জাহাজে টর্পিডো লাগে। সমস্ত কলকব্জা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া আমাদিগকে সঙ্কেত করিতে বলা হইল। আমরা সঙ্কেত করিলে একটি শূন্যগর্ভ টর্পিডো কামান হইতে বাহির হইয়া জলে পড়িল।

এইরূপে জাহাজের নানা অংশে যুদ্ধের নানারূপ উপকরণ ও আয়োজন দেখিয়া আমরা নিম্নে আহারের ঘরে আসিলাম। আহারের আয়োজনও অল্প নহে। আহারের আয়োজন যেমন বিপুল, পানীয়েরও তাহার অনুরূপ। আমাদের ইংরাজ সঙ্গিত্রয় পানীয়ের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিলেন—বোধ হয়, শীতের জন্য তাঁহারা "ইনার ব্ল্যাঙ্কেট" সংগ্রহ করিলেন।

তাহার পর ডেকে আমাদের সকলের ছবি তুলা হইল।

"নেপচুন" হইতে বিদায় হইয়া আমরা আর এক প্রকার যুদ্ধজাহাজ "কুইন এলিজাবেথ" দেখিয়া "লাইট ক্রুজার" যুদ্ধজাহাজ "সেরিস" (Ceres) দেখিতে আসিলাম। সে জাহাজ হইতেও আমাদিগকে টর্পিডো ছাড়া দেখান হইল। তথায় চা-পান সারিয়া আমরা "ডেষ্ট্রয়ার" জাহাজ "ওয়াচম্যানে" আসিলাম। "সেরিসের" ক্যাপ্টেন আমাকে সে জাহাজের নাবিকদিগের টুপীর জন্য নামাঙ্কিত ফিতা স্মৃতিচিহ্নরূপে উপহার দিলেন।

তাহার পর আমরা কূলের কাছে সাবমেরিণ বা ডুবা জাহাজ দেখিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; তাই তাহার কলকব্জা ভাল করিয়া দেখিবার সুবিধা হইল না। যাহার বলে জার্ম্মাণী সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে এবং যাহার ভয়ে ভূমধ্যসাগরে আমরা সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতাম, এই সেই সাবমেরিণ। মানুষ মারণাস্ত্রের উদ্ভাবনে যে প্রতিভা, উদ্যম ও সময় ব্যয় করে—যদি মানবের কল্যাণকর কার্য্যে তাহা ব্যয় করিত!

সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

এডিনবরোয় ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা খুব অল্প নহে। প্রধানতঃ ডাক্তারী শিখিবার জন্য ভারতীয় ছাত্ররা তথায় গমন করে। লণ্ডন অপেক্ষা এই স্থানে খরচও কম। সেই জন্যও অনেক ছাত্র লণ্ডনে না যাইয়া এডিনবরোয় গমন করে। এই সহরে ভারতীয় ছাত্রদিগের সভার একটি নিজস্ব গৃহও আছে। ২ জন ছাত্র সন্ধ্যার পর হোটেলে আসিলেন। তাঁহারা মাদ্রাজী। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের সভায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া লণ্ডনে সংবাদসরবরাহ মন্ত্রিসভার (Ministry of Information) কাছে পত্রও লিখিয়াছেন। লেফটেন্যাণ্ট লং সেই সভার কায করেন। তিনি বলিলেন, তেমন কোন পত্র তাঁহার হস্তগত হয় নাই। তাঁহারা মাদ্রাজী ভাষায় আয়াঙ্গার মহাশয়কে বলিলেন, পত্র নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে; কিন্তু তথায় ভারতীয় ছাত্রদিগের অতিরাজভক্ত খ্যাতি না থাকায় লং সে পত্র আমাদিগকে দেন নাই। কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না, তবে এ কথা যথার্থ যে, এডিনবরো হইতে আমরা গ্লাসগোয় যাইলে লং লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি ফিরিয়া যাইবার পর আমাদিগকে সে পত্র পাঠাইয়া দেন।

ছাত্ররা তখন বলিলেন, আমরা তাঁহাদের স্বদেশী, তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ ও আকাঙ্ক্ষা, আমরা একবার তাঁহাদের সভায় যাই। তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইবার আশায় ক্লেটন বলিলেন, আমরা আর ১ দিন মাত্র তথায় থাকিব এবং সে দিনটা আমরা কর্পোরেশনের অর্থাৎ লর্ড প্রোভোষ্টের অতিথি, কাযেই আমরা যাইতে পারিব না; কারণ, সমস্ত দিন আমরা কি করিব—কোথায় যাইব, তাহার বন্দোবস্ত লর্ড প্রোভোষ্ট করিয়াছেন। ক্লেটনের এই কথায় এক জন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, আমরা যদি লর্ড

প্রোভোষ্টের অনুমতি পাই, তবে ত আর কোন আপত্তি হইবে না ?" তখন ক্লেটনকে বলিতে হইল, "না।"

ক্লেটনের উত্তর পাইয়া ছাত্রটি পকেট হইতে লর্ড প্রোভোষ্টের পত্র বাহির করিয়া দেখাইলেন—তাঁহারা লর্ড প্রোভোষ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, আমরা পরদিন ভারতীয় ছাত্রদিগের সভায় চা পান করিব। ক্লেটন নির্ব্বাক্ হইলেন।

তখন যুবকদ্বয় আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং মিঃ স্যাণ্ডব্রুক, মিঃ ক্লেটন ও লেফটেনাণ্ট লং ৩ জনকে আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে ছাত্রদ্বয় আয়াঙ্গার মহাশয়ের ঘরে যাইলেন ও আমাকে তথায় যাইতে অনুরোধ জানাইলেন। তথায় তাঁহারা আমাদিগকে বলিলেন, ক্লেটনের ও লংএর ইচ্ছা ছিল না যে, আমরা ভারতীয় ছাত্রদিগের সভায় যাই। তাহার পরদিন ইঁহাদের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইবেন।

ছাত্ররা কি করিবেন, তাহা তাঁহারা তখন বলিলেন না। আমরাও পরদিন তাঁহাদের সভায় যাইবার পূর্ব্বে তাহা অনুমান করিতে পারি নাই।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

জার্ম্মাণীতে বাঙ্গালী ছাত্র

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু নামক জনৈক বাঙ্গালী ছাত্র সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে অধ্যয়ন করিতেছেন। ইঁহার নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত করাটি গ্রামে। পঠদ্দশায় ইনি রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করার ফলে ২বৎসরের জন্য নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। মুক্তিলাভের পর ইনি বরোদারাজ্যের 'কলা-ভবনে' কিছুকাল শিক্ষালাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে অরবিন্দ বিদ্যা-শিক্ষার্থ আমেরিকায় যাত্রা করেন; কিন্তু তথায় প্রবেশাধিকার না পাইয়া বাধ্য হইয়া তিনি জার্ম্মাণীতে গমন করেন। তথায় কিছুকাল শিক্ষালাভের পর তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত এম্, আই (M. I) উপাধিলাভ করিয়াছেন। সংপ্রতি পি এইচ ডি (Ph. D.) উপাধিলাভের জন্য তিনি চেষ্টা করিতেছেন। জার্ম্মাণীর অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। আন্তর্জাতিক ছাত্র-সম্মিলন (International Students Union) নামক সমিতিতে তিনি সংপ্রতি সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ফরাসী ছাত্র ব্যতীত এই সমিতিতে পৃথিবীর যাবতীয় দেশের ছাত্র আছে। ইঁহার বয়স এখন ২৮ বৎসর মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দ বসু।

বৌদ্ধদিগের প্রেততত্ত্ব

২

[এই প্রবন্ধে বৌদ্ধদিগের কতকগুলি প্রেত এবং প্রেতীর (প্রেতিনীর) গল্প লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে]

অভিজ্জমান পেত

বারাণসীর গঙ্গার অপর পারে এক গ্রামে এক জন শিকারী বাস করিত। সে হরিণ শিকার করিত এবং মাংসের উৎকৃষ্ট অংশ রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিয়া অবশিষ্ট অংশ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গৃহে লইয়া আসিত। তাহাকে মাংস লইয়া আসিতে দেখিলেই গ্রামের বালকগণ তাহার নিকট মাংস চাহিত এবং ছোট ছোট মাংসখণ্ড লাভ করিত। এক দিন শিকারের জন্য বনে গিয়া হরিণ না পাওয়ায় সে কতকগুলি উদ্দালক পুষ্প লইয়া গ্রামে ফিরিতেছিল। বালকগণ অভ্যাস বশতঃ তাহার নিকট মাংস চাহিলে সে তাহাদের প্রত্যেককে এক এক গুচ্ছ পুষ্প প্রদান করিল। এই শীকারী মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া নগ্ন ও ভীষণদর্শন প্রেতরূপ ধারণ করিল। প্রেতাবস্থায় খাদ্য এবং পানীয় কোনও রূপেই সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তাহার গ্রামের আত্মীয়গণ তাহাকে কিছু খাদ্য প্রদান করিবে, এই আশায় উদ্দালক পুষ্পের মালায় সজ্জিত হইয়া সে এক দিন পদব্রজে স্রোতের বিপরীত মুখে গঙ্গার উপর হাঁটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় মগধের রাজা বিম্বিসারের কলীয় নামক এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সীমান্তপ্রদেশে বিদ্রোহদমন পূর্ব্বক সৈন্য-সামন্ত স্থলপথে প্রেরণ করিয়া নিজে নৌকাযোগে গঙ্গার স্রোতের অনুকূলে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিলেন। তিনি পেতকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইরূপে সজ্জিত হইয়া তুমি কোথায় গমন করিতেছ? তুমি গঙ্গার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছ। তোমার গৃহ কোথায়?" পেত উত্তর করিল—"ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া আমি বারাণসীর নিকটবর্ত্তী নিজ গ্রামে যাইতেছি।" সেই উচ্চকর্ম্মচারীটি তৎক্ষণাৎ নৌকা থামাইয়া ক্ষৌরকারজাতীয় এক জন উপাসককে পেতের পক্ষ হইতে কিছু খাদ্যদ্রব্য এবং এক-জোড়া হরিদ্রাবর্ণের বস্ত্র প্রদান করিলেন। এইরূপে পেতটি আহার্য্য লাভ করিল ও বস্ত্রাচ্ছাদিত হইল। অতঃপর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কর্ম্মচারীটি বারাণসী পৌঁছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ তখন গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। বারাণসীতে পৌঁছিয়া কলীয় বুদ্ধদেবকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার উপবেশনের জন্য চন্দ্রাতপ প্রস্তুত হইল। ভগবান্ বুদ্ধ সেই চন্দ্রাতপতলে উপবিষ্ট হইলে কলীয় তাঁহাকে পূজার্চ্চনা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সম্মুখে পেতের উল্লেখ করিলেন। তাহার পর বুদ্ধদেব ভিক্ষুসঙ্ঘের দর্শনাভিলাষী হইলে বহু ভিক্ষু সেখানে সমবেত হইল। রাজা বিম্বিসারের মন্ত্রী উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পানীয় দ্বারা বুদ্ধ ও ভিক্ষুগণকে পরিতৃপ্ত করিলেন। পানভোজনান্তে বুদ্ধদেব নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসীদিগের উপস্থিতি অভিলাষ করিলেন। জনগণ উপস্থিত হইলে বহু পেত তথায় আগত হইয়া তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিপ্রভাবে দৃষ্টিগোচর হইল। পেতদিগের মধ্যে কেহ বা নগ্ন, কেহ বা ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত, কেহ বা কেশ দ্বারা নগ্ন দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আছে। কেহ বা ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর, কেহ বা চর্ম্মাচ্ছাদিত অস্থিতে পরিণত হইয়াছে। পেতগণের এই ভীষণ দুরবস্থা উপস্থিত সকলেই দর্শন করিলেন। বুদ্ধের অদ্ভুত শক্তি-প্রভাবে পেতগণ নিজেরাই নিজেদের দুষ্কৃতি ও তাহার পরিণাম বর্ণনা করিতে লাগিল। এইরূপে সৎকার্য্য ও দুষ্কার্য্যের ফলাফল বর্ণিত হইলে ভগবান্ বুদ্ধ স্বাভাবিক অপরিসীম স্নেহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জনসাধারণের কাছে ধর্ম্মের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। (Petavatthu Commentory, pp. 168—177.)

উব্বরী পেত

শাবথীনগরে এক জন উপাসিকা স্বামিবিয়োগে নিরতিশয় কাতর হইয়া সমাধি স্থানে গমন পূর্ব্বক অত্যন্ত করুণ স্বরে

ক্রন্দন করিতেছিল। বুদ্ধদেব সেই উপাসিকাতে সন্ন্যাসের প্রথম অবস্থার সঞ্চার সন্দর্শন করিয়া করুণার্দ্রচিত্তে তাহার গৃহে গমন করিলেন। সে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিল। বুদ্ধদেব তাহাকে তাহার দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, "আমি আমার প্রিয়তম স্বামীর মৃত্যুর জন্য শোক করিতেছি।" তাহার দুঃখদূরীকরণ মানসে প্রভু বুদ্ধদেব অতীতের নিম্নলিখিত কাহিনীটি বিবৃত করিলেন।

পাঞ্চালরাজ্যে কপিলনগরে কুশনি ব্রহ্মদত্ত নামক অতিশয় ধার্ম্মিক অপক্ষপাতী এক রাজা বাস করিতেন। রাজার দশবিধ কর্ত্তব্যপালনে তাঁহার কিছুমাত্র ত্রুটি ছিল না। এক দিন তাঁহার প্রজাগণ কি অবস্থায় বাস করিতেছে এবং তাঁহার সম্বন্ধেই বা তাহারা কিরূপ মত পোষণ করে, তাহাই প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি এক দরজীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া একাকী নগর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমস্ত রাজ্য দুঃখশূন্য ও ব্যাধিমুক্ত দেখিয়া এবং প্রজাগণকে সুখে ও নিরাপদে বাস করিতে দেখিয়া তিনি রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় পথে এক গ্রামে দরিদ্র ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত কোন বিধবার গৃহে উপস্থিত হইলে বিধবা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথিক, তোমার নিবাস কোথায়?" রাজা বলিলেন, "আমি দরজী। কায করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করি। যদি আপনার সূচিকর্ম্মের নিমিত্ত কোন বস্ত্র থাকে এবং আপনি যদি আমাকে খাদ্য ও পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হয়েন, তবে আমি আপনাকে সূচি-কর্ম্মে আমার নিপুণতা দেখাইতে পারি।" কিন্তু বিধবার হাতে সেরূপ কোন কায না থাকায় তিনি তাঁহাকে কোন কাযই দিতে পারিলেন না। সেখানে কিছুকাল অবস্থান করার পর ঐ বিধবার অতিশয় সুন্দরী এবং সর্ব্বসুলক্ষণা একটি কন্যা রাজার নেত্রগোচর হইল। বালিকাকে তখনও অবিবাহিতা জানিয়া তাহার কাছে রাজা কন্যার পাণিপীড়নের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাটিকে বিবাহ করিয়া সেখানে কিছুদিন যাপন করিলেন। তাহার পর ছদ্মবেশী রাজা তাহাদিগকে এক হাজার কহাপন (কাহন-কাহন পরিমিত কপর্দ্দক) প্রদান করিয়া এবং সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের আশ্বাস দিয়া চিন্তিত হইতে নিষেধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরেই রাজা মহাসমারোহে বিধবার কন্যাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন এবং উব্বরী নাম প্রদান পূর্ব্বক প্রধানা মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহারা গভীর দাম্পত্যপ্রেমে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার পর রাণীকে শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাজা পরলোকগমন করিলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। কিন্তু রাণী উব্বরীকে কেহই সান্ত্বনা দিতে পারিল না। তিনি শ্মশানে গমন পূর্ব্বক বহুদিন পর্য্যন্ত মৃত স্বামীর উদ্দেশে পুষ্প ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতেন এবং তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে উন্মত্তের মত সমাধিস্থানের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেন। সে সময়ে প্রভু বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বরূপে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। উব্বরীকে এইরূপে দুঃখে নিমগ্ন দেখিয়া তিনি সমাধিস্থানে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মদত্তের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছ কেন?" রাণী উত্তর করিলেন, "মৃত রাজা ব্রহ্মদত্তের নিমিত্ত তাঁহার রাণী উব্বরী ক্রন্দন করিতেছে।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার দুঃখদূরীকরণার্থ বলিলেন, "তুমি কি জান না যে, ব্রহ্মদত্ত নামধারী ষড়শীতিসহস্র লোকের দাহকার্য্য এই স্থলে সম্পন্ন হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে কোন্ ব্রহ্মদত্তের জন্য তুমি শোক করিতেছ?" রাণী বলিলেন, "আমি পাঞ্চালের রাজা আমার স্বামী চুড়নিপুত্তের জন্য ক্রন্দন করিতেছি।" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মদত্ত নামধারী যাহাদের দাহ-কার্য্য এই স্থানে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাদের সকলেরই একই নাম ও উপাধি ছিল, সকলেই পাঞ্চালের রাজা ছিলেন এবং তুমি তাঁহাদের সকলেরই প্রধানা মহিষী ছিলে। তবে তুমি অন্যান্য ব্রহ্মদত্তের নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া কেবল সর্ব্বশেষ ব্রহ্মদত্তের নিমিত্তই ক্রন্দন করিতেছ কেন?" এই-রূপে কর্ম্ম সম্বন্ধে এবং জীবগণের বহুজন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে আলোচনা করিয়া ও ধর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি রাণীর অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিলেন। অতঃপর রাণী সাংসারিক জীবনের অসারতা উপলব্ধি করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিলেন এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি উরুবেলায় উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি দেহ রক্ষা করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধের

আলোচনা এবং তাঁহার নিকট হইতে চারিটি মহৎ সত্যের বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপাসিকাও তাহার দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentory pp. 160—168)

সুত্ত পেত

বুদ্ধের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে শাবখীনগরের নিকট এক পচ্চেকবুদ্ধ বাস করিতেন। এক বালক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল। বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহার মাতা সম-পদ-গৌরববিশিষ্ট কোন পরিবারের এক সুন্দরী কন্যা তাহার নিমিত্ত আনয়ন করিলেন। বিবাহের দিনে বালকটি সঙ্গিগণের সহিত স্নান করিতে যাইয়া সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল। পচ্চেকবুদ্ধের সেবা করিয়া বহুপুণ্য সঞ্চয় করিলেও সে সেই কন্যার প্রতি অনুরাগের জন্য বিমান-পেতরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিল। এই পেতজন্মে সে প্রচুর ঐশ্বর্য্য এবং শক্তির অধিকারী হইয়াছিল। অতঃপর সে বালিকাকে স্বীয় আবাসে আনয়ন করিবার নিমিত্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। বালিকার দ্বারা পচ্চেক-বুদ্ধকে কোন জিনিষ প্রদান করিতে পারিলে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে মনে করিয়া, সে এক দিন পচ্চেকবুদ্ধের নিকট গমন করিল। সেই সময় পরিচ্ছদসংস্কারের জন্য পচ্চেকবুদ্ধের কিঞ্চিৎ সূত্রের প্রয়োজন ছিল। মানুষের বেশ ধারণ করিয়া সে তখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার সূত্রের প্রয়োজন থাকিলে বালিকাটির নিকট গমন করুন।" তাহার পরামর্শ অনুসারে পচ্চেক-বুদ্ধ সেই বালিকার আবাসে উপস্থিত হইলেন। বালিকা তাঁহার সূত্রের প্রয়োজন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সূত্রের একটি গুটিকা প্রদান করিল। অনন্তর পেত বালিকার মাতাকে প্রভূত ধনপ্রদান করিয়া তাহার গৃহে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক বালিকাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পৃথিবীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে সেই কন্যা মানবদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পেত তাহাকে বলিল, "তুমি সাত শত বৎসর এখানে আছ। যদি এখন তুমি মানবদিগের মধ্যে ফিরিয়া যাও, তবে আমি তোমাকে বাধাপ্রদান করিব না। কিন্তু তাহা হইলে তুমি নিদারুণ বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইবে। তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।" এই বলিয়া পেত বালিকাকে পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে রাখিয়া গেল। অতিশয় বৃদ্ধ ও অক্ষম হইলেও সে তাহার গ্রামে পৌঁছিয়া বহু দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। সাত দিন মাত্র এই পৃথিবীতে বাস করিবার পর তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সে স্বর্গে তাবত্তিংশ লোকে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentory, pp. 144—150)

উত্তরমাতু পেত

ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার পর প্রথম মহাসম্মিলন শেষ হইলে মহাকচ্চায়ন কৌশাম্বীর নিকট অরণ্যমধ্যস্থিত এক আশ্রমে দ্বাদশ জন ভিক্ষুর সহিত বাস করিতেন। এই সময়ে রাজা উদেনের গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত এক কর্ম্মচারী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অতঃপর সেই কর্ম্মচারীর পুত্র উত্তরকে পিতার কার্য্যভার প্রদানের প্রস্তাব করা হইলে সে তাহা গ্রহণ করিল। এক দিন উত্তর নগরসংস্কা-রের অভিলাষী হইয়া কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে সূত্রধরগণসহ অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মহাকচ্চা-য়নকে দেখিয়া সে আনন্দিতচিত্তে তাঁহার উপদেশাবলী শ্রবণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল। অতঃপর ত্রিরত্নের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে ভিক্ষুগণের সহিত মহাকচ্চায়নকে তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল এবং তাঁহারা তাহার গৃহে উপনীত হইলে সে থেরকে ও ভিক্ষু-গণকে নানাপ্রকারে উপহার প্রদান করিয়া প্রতিদিন তাহার গৃহেই অন্ন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। ইহার পরে সে তাহার আত্মীয়গণকেও এই সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইল এবং একটি বিহারও নির্ম্মাণ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মাতা ভীষণ কৃপণ ছিলেন এবং ভ্রান্তধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন। থের ও ভিক্ষুদিগকে উপহার প্রদান করিতে দেখিয়া তিনি এই অভিশাপ প্রদান করিলেন—"তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিক্ষুগণকে যে সমস্ত দ্রব্য উপহার প্রদান করিতেছ, পরলোকে তাহা যেন রক্তের ধারায় পরিণত হয়।" কিন্তু তিনি বিহারে কোন এক মহা উৎসবের দিনে ময়ূর-পুচ্ছের একখানি ব্যজনী প্রদানের ব্যবস্থা ও অনুমোদন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পরে এই মাতা এক

প্রেতিনী হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ময়ূরপুচ্ছের ব্যজনীদানের ব্যবস্থার অনুমোদনের ফলে তাঁহার চুল নীল, মসৃণ, সুন্দর ও দীর্ঘ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দুষ্কৃতির পরিণামে যখনই তিনি গঙ্গার জল পান করিতে যাইতেন, তখনই উহা রক্তে পরিণত হইত। এইরূপ দুঃখে ও কষ্টে তাঁহাকে ৫৫ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। অবশেষে এক দিন দিবাভাগে গঙ্গার তীরে কঙ্খারেবত নামক এক জন থেরকে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ পানীয় প্রার্থনা করিলেন এবং নিজের অতীত দুষ্কৃতি ও নিজের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিলেন। দয়ার্দ্র থের রেবত প্রেতিনীর মুক্তির জন্য ভিক্ষুসঙ্ঘকে পানীয়, খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রেতিনী শীঘ্রই সমস্ত দুর্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentory, pp. 140—144)

সংসারমোচক পেত

পুরাকালে মগধের দুইটি গ্রামে সংসারমোচক জাতির লোকরা বাস করিত। বুদ্ধের প্রতি তাহাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। মগধের ইট্ঠকাবতী গ্রামে এই সংসার-মোচক জাতির কোন পরিবারে একটি স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বহু কীট, মক্ষিকা প্রভৃতি হত্যা করিয়া সে পাপসঞ্চয় করিয়াছিল। তাহারই ফলে তাহার প্রেত-যোনিতে জন্মলাভ ঘটে। প্রেতিনী অবস্থায় পঞ্চশত বৎসর ব্যাপিয়া অপরিসীম দুঃখভোগ করিয়া অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময় সে সেই গ্রামেই সংসারমোচক জাতির অন্য এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিল। আট বৎসর বয়সে সে এক দিন যখন অন্যান্য বালিকার সহিত রাস্তায় খেলা করিতে বাহির হইয়াছে, সেই সময় মহাত্মা সারিপুত্ত ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া রাস্তা দিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে উল্লিখিত সংসারমোচক বালিকাটি ব্যতীত আর সকলেই প্রণাম করিল। থের এই ভক্তিহীনা বালিকাটিকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, সে মিথ্যাধর্ম্মবিশ্বাসী এবং পূর্ব্বজন্ম-সমূহে বহু কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও ভবিষ্যতে পুনরায় নরক-ভোগ করিবে। থেরের মন বালিকাটির জন্য করুণায় ভরিয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, বালিকাটি ভিক্ষুদিগকে একবার প্রণাম করিলেও তাহার নরকে যাইতে হইবে না এবং প্রেতজন্ম লাভ করিলেও সে সহজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। এই ভাবিয়া অন্যান্য বালিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমরা সকলেই আমাকে প্রণাম করিতেছ, কিন্তু ঐ বালিকাটি নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।" থেরের কথা শুনিয়া বালিকাগণ জোর করিয়া তাহার দ্বারা থেরকে প্রণাম করাইল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে অন্য এক সংসারমোচক পরিবারের এক যুবকের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল, এবং তাহার অল্প দিন পরেই গর্ভিণী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া সে নগ্ন, ভীষণদর্শন, ক্ষুধাতৃষ্ণা-তুরা এক প্রেতিনীজন্ম পরিগ্রহ করিল। অতঃপর একদা প্রেতিনীটি ভয়াবহ আকৃতি লইয়া সারিপুত্তের সমীপে উপস্থিত হইতেই থের তাহাকে তাহার অতীত দুষ্কৃতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রেতিনী তাঁহার নিকট তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, "আমি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সে পরিবারের ভিতর এমন একটিও লোক নাই যে, আমার নিমিত্ত পুণ্যকার্য্য বা শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগকে দানধ্যান করিতে পারে। আপনি দয়া করিয়া আমার মুক্তির ব্যবস্থা করুন।" থের তাহার নিমিত্ত খাদ্য, পানীয় ও এক খণ্ড বস্ত্র ভিক্ষুকে দান করিলেন এবং এই দান করার ফলে সে প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেবজন্ম লাভ করিল। ইহার পর এক দিন সে তাহার দেবসুলভ ঐশ্বর্য্যভূষিত হইয়া সারিপুত্তের নিকট আগমন করিলে সারিপুত্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিরূপে এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলে?" উত্তরে সে বলিল, "আপনি আমার নিমিত্ত যে খাদ্য ও পানীয় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আমি এই সকল স্বর্গীয় দ্রব্যের অধীশ্বরী হইয়াছি এবং যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার ফলে নন্দরাজার বিজয়লব্ধ পরিচ্ছদসমূহ অপেক্ষাও বহুমূল্য বহু বস্ত্র আমার অধিকারে আসিয়াছে। আপনার অনুগ্রহের দানই আমার এই সব সুখের কারণ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (Petavatthu Commentory, pp 67—72)

মত্তা পেতী

শ্রাবস্তী নামক স্থানে এক জন বৌদ্ধ গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা এবং বুদ্ধ ও 'সংঘের' অবিশ্বাসী।

বংশলোপের আশঙ্কায় সেই গৃহস্থ পুনরায় "তিস্‌সা" নাম্নী একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিল। বুদ্ধদেবের প্রতি "তিস্‌সার" অচলা ভক্তি ছিল, এবং সে শীঘ্রই স্বামীরও অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে তিস্‌সা একটি পুত্র প্রসব করিল। তাহার নাম রাখা হইল ভূত। গৃহকর্ত্রী হইয়া তিস্‌সা প্রত্যহ চারি জন ভিক্ষুকে দান করিত; কিন্তু গৃহস্থের বন্ধ্যা পত্নীটি ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতি অতিমাত্রায় ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া উঠিল। এক দিন স্নানের পর উভয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় তাহাদের স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিস্‌সার প্রতি অনুরাগবশতঃ স্বামী তিস্‌সার সঙ্গেই বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। স্বামীর এই পক্ষপাতিত্বে ক্রুদ্ধ হইয়া মত্তা কতকগুলি আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া তাহা সপত্নীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। এই সব দুষ্কৃতির জন্য মত্তা মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া অনেক প্রকারের লাঞ্ছনা ও দুঃখভোগ করিতে লাগিল। এক দিন তিস্‌সা বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে স্নান করিতেছিল, এমন সময় প্রেতিনী মত্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে পরিচয় প্রদান করিল, এবং পূর্ব্বের দুষ্কৃতির জন্য সে যে সব লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে, তাহাও বিবৃত করিল। তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মস্তকে এত আবর্জ্জনা কেন?" সে বলিল, "পূর্ব্বজন্মে তোমার মস্তকে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম—এ তাহারই পরিণাম।" তিস্‌সা মত্তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি সমস্ত শরীর কচ্ছুগাছের দ্বারা আঁচড়াইতেছ কেন?" মত্তা বলিল, "আমরা উভয়ে এক দিন ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম। তুমি ঔষধ আনিয়াছিলে, আমি কপিকচ্ছু আনিয়া তোমার বিছানার উপর বিছাইয়া রাখিয়াছিলাম—তাহারই ফলে আমাকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।" তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে বিবসনা দেখিতেছি কেন?" মত্তা বলিল, "একদা তুমি নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীর সহিত আত্মীয়ের গৃহে গমন করিতেছিলে, আমি তোমার বস্ত্র চুরি করিয়াছিলাম। সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ আমি এখন উলঙ্গ।" তিস্‌সা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীর হইতে এরূপ অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইতেছে কেন?" সে বলিল, "তোমার মালা, গন্ধদ্রব্য, অনুলেপন ইত্যাদি বিষ্ঠায় নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার দেহের এই দুর্গন্ধ তাহারই পরিণাম।" ইহার পর মত্তা আরও বলিল, "দানধ্যানের দ্বারা আমি কোন পুণ্য অর্জ্জন করি নাই, তাই আমার দুর্দ্দশারও অন্ত নাই।" তিস্‌সা বলিল, "স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসিলে আমি তোমাকে কিছু দান করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিব।" মত্তা বলিল, "আমার পরিধানে বস্ত্র নাই—আমি উলঙ্গ, সুতরাং আমাকে স্বামীর সম্মুখে আহ্বান করিও না।" 'তিস্‌সা' জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমি তোমার আর কি উপকার করিতে পারি?" প্রেতিনী তাহার নামে আট জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্য প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্য তিস্‌সাকে অনুরোধ করিল। তিস্‌সা তদনুযায়ী কার্য্য করিলে মত্তা প্রেতলোক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া 'তিস্‌সা'র সম্মুখে আবির্ভূত হইল এবং তাহাকে তাহার দানের অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। (Petavatthu Commentory, pp. 82—89)

নন্দা পেত

শাবত্থীর নিকটে কোন গ্রামে নন্দসেন নামে এক জন গৃহস্থ বাস করিত। তাহার স্ত্রী নন্দার বুদ্ধের প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। তাহা ছাড়া সে অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ, রুক্ষ-মেজাজী রমণী ছিল, এবং সর্ব্বদা স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী সকলের নামেই কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইত। মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের প্রান্তে বাস করিতে লাগিল। এক দিন তাহার স্বামী যখন গ্রামের বাহিরে যাইতেছিলেন, সে পথে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামী তাহার পরিচয় পাইবার পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে তাঁহার নিকট পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির কথা অকপটে বিবৃত করিল। স্বামী তাহাকে বলিলেন, "তুমি আমার এই উত্তরীয় বসন পরিধান কর এবং আমার সঙ্গে গৃহে চল। সেখানে তুমি অন্ন, বস্ত্র সমস্তই পাইবে এবং নিজের প্রিয় পুত্রকে দেখিতে পাইবে।" নন্দা বলিল, "আমি তোমার নিকট হইতে এরূপ ভাবে কোন সাহায্যই গ্রহণ করিতে পারিব না। তবে যদি আমার কল্যাণের জন্য তুমি ভিক্ষুদিগকে দান কর, তাহা হইলে আমার উপকার হইতে পারে।" নন্দসেন প্রেতিনীর অনুরোধ অনুসারে কার্য্য করিলে সে তাহার দুর্দ্দশা হইতে

মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentory, pp. 89—93)

ধনপাল পেত

ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'দশন্ন' প্রদেশের অন্তঃপাতী 'এরকচ্ছ' সহরে এক জন কৃপণ এবং ধর্ম্মে অবিশ্বাসী লোক বাস করিত। বুদ্ধদেবের প্রতি তাহার কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না। মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া সে একটি মরুভূমিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার তালবৃক্ষ-প্রমাণ দীর্ঘ দেহ যেমন কুৎসিত, তেমনই ভীষণদর্শন ছিল। প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ৫৫ বৎসরকাল পর্য্যন্ত সে এক কণা খাদ্য বা এক বিন্দু জলও গলাধঃকরণ করিতে পারে নাই। ক্ষুধার তাড়নায় এবং পিপাসাতুর হইয়া সে যখন ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তখনই গৌতম বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। একদা শাবত্থী নগরের কয়েক জন বণিক পাঁচ শত শকট-বোঝাই বাণিজ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া উত্তরাপথে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এক দিন সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কোন এক বৃক্ষমূলে শকট থামাইয়া তাহারা রাত্রির মত বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময় তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া পেতটি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ঝড়ে উৎপাটিত তালবৃক্ষের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া দুঃখে ও যাতনায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। বণিকরা তাহাকে তাহার এই দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমি পূর্ব্বজন্মে বণিক ছিলাম। আমার নাম ছিল ধনপাল। আমার আশী শকটপূর্ণ স্বর্ণ এবং আরও অপর্য্যাপ্ত মহামূল্য মণি-মাণিক্য ছিল। কিন্তু এত ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াও আমি সৎকার্য্যের জন্য কখনও কিছু ব্যয় করিতাম না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি ভোজন করিতাম এবং কোন লোক আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তাহাকে কুৎসিত ও কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দিতাম। এমন কি, অন্য লোককে দানধ্যান করিতে দেখিলেও তাহাদিগকে নিষেধ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। এই সমস্ত দুষ্কার্য্য দ্বারা আমি কেবল অগণ্য পাপই সঞ্চয় করিয়াছি; কিন্তু পুণ্য সঞ্চিত হইতে পারে, জীবনে কখনও এমন একটিও সৎকার্য্য করি নাই। আমার সেই সব দুষ্কৃতির জন্য আমাকে এখন এই সব দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইতেছে।"

তাহার এই নিদারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে বিচলিত হইয়া বণিকগণ তাহার মুখে জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু তাহার পাপের জন্য সে জল তাহার কণ্ঠনালী দিয়া উদরস্থ হইতে পারিল না। অতঃপর বণিকরা তাহার এই দুর্দ্দশা দূর করিবার কোন উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার সদ্গতির জন্য যদি তোমরা বুদ্ধদেব বা তাঁহার শিষ্যগণকে কিছু দান করিতে পার, তবেই পেতলোক হইতে উদ্ধার পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে।" তাহারা পেতের অনুরোধ অনুসারে কায করিলে সে তাহার দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentory, pp. 99—105)

চুলসেট্‌ঠি পেত

বারাণসী নগরে বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসী এক অর্থপিশাচ গৃহস্থ বাস করিত। ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার কিছুমাত্র মতিগতি ছিল না। মৃত্যুর পর সে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার শরীরে কিছুমাত্র রক্তমাংস ছিল না; ছিল কেবল কঙ্কাল। তাহার মস্তকে কেশ ছিল না এবং তাহার সর্ব্বদেহ উলঙ্গ ছিল। পেতটির অনুলা নামে একটি কন্যা ছিল। সে 'অন্ধকবিন্দ' নামক স্থানে তাহার স্বামিগৃহে বাস করিত। একদা পিতার সদ্গতির জন্য সে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে মনস্থ করিলে পেত সেই সঙ্কল্পের কথা অবগত হইয়া শূন্যপথে কন্যার নিকট গমন করিবার সময় রাজগহে আসিয়া উপনীত হইল। সেই সময় অজাতশত্রু দেবদত্তের প্রেরণায় নিজের পিতাকে হত্যা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছিলেন। এক দিন ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি অলিন্দে উঠিয়া এই পেতটিকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শীর্ণ-বিশীর্ণ নগ্নদেহ জীব! তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমাকে দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হইতেছে। তুমি কি চাও? আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি।" 'পেত' তখন রাজার নিকট তাহার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত করিয়া বলিল, "আমার কন্যা আমার ও পূর্ব্বপুরুষের সদ্গতি-কামনায় ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। আমি সেইখানে

যাইতেছি।" অজাতশত্রু বলিলেন, "তুমি কন্যাগৃহে গমন কর, কিন্তু ফিরিবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইও।" অতঃপর পেত তাহার কন্যার গৃহে গমন করিল এবং প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে অজাতশত্রুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমার কন্যা যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছে, তাহারা দানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সুতরাং আপনি যদি আমার নামে বুদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যবর্গকে উপহার প্রদান করেন, তবেই আমার মুক্তি সম্ভবপর।" অজাতশত্রু তাহার প্রার্থনা অনুসারেই কায করিয়াছিলেন। তাঁহার দানের দ্বারা অর্জ্জিত পুণ্যের বলেই তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়াছিল। উত্তরকালে এই প্রেত এক জন অত্যন্ত শক্তিমান্ যক্ষ হইয়াছিল। (Petavatthu Commentory, pp 105—111)

রেবতী পেত

বারাণসী নগরে কোন গৃহস্থের "নন্দিয়" নামে এক পুত্র ছিল। এই পুত্র দানে যেমন মুক্তহস্ত ছিল, বুদ্ধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধাও তেমনই গভীর ছিল। তাহার গৃহে প্রত্যহ ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইত এবং সে তাঁহাদিগকে নানা রকমের উপহার প্রদান করিত। এইরূপে অত্যন্ত অল্পবয়স হইতে নিজহস্তে দান করিবার প্রবৃত্তি তাহার ভিতর জাগ্রত হইয়া উঠে। অতঃপর সে যৌবনে পদার্পণ করিলে, তাহার পিতামাতা প্রতিবেশী কোন এক গৃহস্থের রেবতী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে আদেশ করিলেন। বুদ্ধের প্রতি রেবতীর কোনরূপ শ্রদ্ধা ছিল না এবং সে কৃপণস্বভাবা ছিল। সুতরাং "নন্দিয়" তাহার পাণিপীড়নে স্বীকৃত হইল না। "রেবতী"র পিতামাতা তখন "নন্দিয়"কে প্রলুব্ধ করিবার জন্য কন্যাকে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতে এবং দানধ্যান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। "রেবতী" কিছুদিন পিতামাতার উপদেশ অনুসারেই কায করায় নন্দিয় অবশেষে তাহাকে বিবাহ করিল। বিবাহের পরেও রেবতী নন্দিয়ের সহিত পুণ্যকার্য্য করিতে বিরত হইল না। কিছুদিন পরে নন্দিয়কে একবার বিদেশযাত্রা করিতে হইল। নন্দিয় যাইবার সময় পত্নীর হস্তে পুণ্যকার্য্যগুলির ভার অর্পণ করিয়া গেল। রেবতী কিছুদিন স্বামীর উপদেশ অনুসারে কায করিল বটে, কিন্তু এ প্রবৃত্তি তাহার বেশী দিন স্থায়ী হইল না। সে সহসা সমস্ত দানধ্যান বন্ধ করিয়া দিল। কেবল তাহাই নহে—যে সব ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য তাহার দ্বারস্থ হইত, তাহাদের অপমান করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। ইতিমধ্যে নন্দিয় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখিল যে, দানধ্যান সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর রেবতী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল এবং নন্দিয় দেবত্বলাভ করিয়া স্বর্গবাস করিতে লাগিল। স্বর্গ হইতে নন্দিয় দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, রেবতী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "তুমি পূর্ব্বজন্মে যে সব দুষ্কার্য্য করিয়াছ, তাহারই ফলে আজ প্রেতযোনি লাভ করিয়াছ। আমি যে সব পুণ্যকার্য্য করিয়াছি, তাহা যদি তুমি অনুমোদন কর, তবে এখনও মুক্তিলাভ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে।" রেবতী স্বামীর নির্দেশ অনুসারে তাঁহার কার্য্যাবলী অনুমোদন করিয়া দেবত্বলাভ করিয়াছিল। (১)

শ্রীবিমলাচরণ লাহা।

(১) বিমান বথু ভাষ্য এবং সুত্ত সংগহ দ্রষ্টব্য।

কেন?

১

কেন এ বিজনে বল ফেলে গেলে তুমি?
করিলে নন্দনবন কেন মরুভূমি?
কেন কিবা অপরাধে,
প্রাণের অ-মেটা সাধে,
কেন বাদ সাধা,—ছি ছি, কেন এ প্রবাস?
কেন বিসর্জ্জন—নাহি হ'তে অধিবাস?

২

নিশিতে ঘুমের ঘোরে,
কেন ছবিখানি ঘোরে',
নয়নে নয়ন রাখি কেন বা জাগাও,
তুলে যদি তব পানে,
তাকাই আকুল প্রাণে,
অমনি পালাও কেন? কেন ফিরে চাও?
কেন এ আঁধারে হেন বিজলী খেলাও?

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

রোগের নিদান

তিন বৎসর পূর্ব্বে মাসাধিক কাল রোগভোগের অবসানে স্বাস্থ্যলাভের স্ফূর্ত্তিতে নিতান্ত হাল্‌কাভাবে "ফোড়ার ফাঁড়া" (The carbuncle-crisis) নাম দিয়া পীড়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং বন্ধুসমাজে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ব্যাপারটাকে রঙ্গব্যঙ্গের বিষয়ে পরিণত করিয়াছিলাম। পাঠক-সাধারণের গোচর করিবার জন্য প্রবন্ধটি বঙ্গের বাহিরের একখানি অপ্রসিদ্ধনামা (অধুনালুপ্ত) মাসিক পত্রে মুদ্রিত করাইয়াই ক্ষান্ত হই নাই, সেই অকিঞ্চিৎকর রচনাকে স্থায়িত্ব (?) দিবার চেষ্টায় গ্রন্থভুক্ত করিয়াছি, সাহিত্যের জমিনে শিকড় গাড়িয়া বসিবার আশায় 'পাগলা ঝোরা'র হাস্যরসধারায় অভিষিক্ত করিয়াছি। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে,ইহা হাসি-মস্কারা, রঙ্গতামাসার জিনিষ নহে; আকাশে ধূমকেতুর উদয় যেমন নানারূপ আপদ্-বিপদের সূচনা করে বলিয়া প্রাকৃত জনের ধারণা, তেমনই দেহে কার্ব্বঙ্ক্‌লের উদ্ভব ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যভঙ্গের পূর্ব্বলক্ষণ, অভিজ্ঞগণের নাকি এই অভিমত। ডাক্তারী শাস্ত্রে নাকি বলে, বহুদিন ধরিয়া বদহজম হইলে, Mal-assimilation of food হইলে, তবে দেহে এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। অতএব শরীরস্থ এই শত্রুকে লইয়া ফষ্টিনষ্টি করিয়া নিজের ও পাঠকের আমোদ-উপভোগের চেষ্টা না করিয়া যদি সাবধান হইবার এই ইঙ্গিত (warning) সময় থাকিতে গ্রাহ্য করিতাম, তখন হইতেই সংযতাহার হইতাম, তাহা হইলে আজ এমন অকালে 'জরারোগযুক্তঃ মহাক্ষীণদীনঃ বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ' হইয়া, physical & intellectual wreck হইয়া, সকল কাযের বাহির হইয়া, পড়িয়া থাকিতাম না।

এবারও কার্ব্বঙ্ক্‌ল্ করাল ধূমকেতুর ন্যায় পুচ্ছবিস্তার করিয়াছে—যদিও এবার ইহা মূলব্যাধি নহে, জ্বর অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা বায়ু-ক্রূরতা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গরূপে episode-হিসাবে, বোঝার উপর শাক-আঁটিটা (?) হইয়া দেখা দিয়াছে। পূর্ব্ববার হইয়াছিল উদরের বামভাগে, এবার হইয়াছে দক্ষিণ হস্ততালুতে; বোধ হয়, ইহার গূঢ় ইঙ্গিত—এ অধম উদরের, দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে অসাবধান, অসংযমী,—সাবধান সংযমী হইবার জন্য দুই দুই বার তাগিদ। এখন ঠেকিয়া শিখিয়া যথাশক্তি যথাসম্ভব সাবধান সংযমী হইবার চেষ্টায় আছি; নীতিবাক্যেও আছে, চেষ্টায় অসাধ্য কিছুই নাই। এখন বেশ বুঝিতেছি, আদর্শ ব্রাহ্মণের প্রিয় সাত্ত্বিক আহার—গব্যঘৃত, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, পরমান্ন, ক্ষীর, রাবড়ী, মালাই, ক্ষীরের মিঠাই (লাডড়ু, কালাকাঁদ, বরফী, রাঘবশাই), তথা কাশীর শশীর এবং তস্য জামাতার দোকানের ঘৃতপক্ব 'খাবার'—মিহিদানা, সীতাভোগ, দরবেশ, নিখুঁতি, বঁদে, খাজা, গজা, কচুরি, নিমকি, শিঙ্গাড়া, তিখুরের জেলাপী, ছানার পোলাও—এ সব লোভনীয় খাদ্য হইতে চিরজীবন বঞ্চিত থাকিতে হইবে; এমন কি, গৃহিণীর শ্রীহস্তে প্রস্তুত লুচি-পরোটা ও (শীতকালে) কড়াইসুঁটির কচুরি, ফুলকপির শিঙ্গাড়া, হিং দেওয়া ডালপুরী, পাঁপর-ভাজা এবং পৌষপার্ব্বণের রকম রকম পিঠেপুলি * আর কখন ভোগে লাগিবে না—'সকলে খাইবে, আমি বসিয়া দেখিব!' একখানি ফুল্‌কা লুচি (এক রত্তি বেগুন-পোড়া দিয়া!) খাইব, তাহাও এখন আকাশ-কুসুম হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনে গরম মুড়ি, চা'লভাজা, চিড়েভাজা, ছোলাভাজা, তিলভাজা,কাঁঠালবীচিভাজা—তৈল-লবণ-লঙ্কা-যোগে (বেগ্‌নী ফুলুরী পকুরী আলুর চপ প্রভৃতি তেলেভাজার তো কথাই নাই)—শুধু আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়াই থাকিবে। আমিষের হাটে পাকা রুই-কাতলার মুড়া, গলদা চিংড়ি, গঙ্গার ইলিশ, ভেট্‌কি ভাঙ্গন—এ সব তো এখন বিধবার সাধে পরিণত। এই রামছাগলের দেশে কচি পাঁঠার দু'খানা নরম হাড় এই বেলা দাঁত থাকিতে থাকিতে চিবাইব, সে আশায় জলাঞ্জলি। কই মাগুর শিঙ্গি—বড়

---

* নানাবিধ চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্য আহার্য্যের নামের লম্বা ফিরিস্তীতে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে; কিন্তু তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন, লেখকের এই অবস্থায় নামই সার হইয়াছে। শাস্ত্রে বলে, ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন; নামগ্রহণে অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক ফলও তো হইতে পারে। (তা' ছাড়া কলিতে নাম-কীর্ত্তনের অশেষ গুণ।) যেমন হরিনাম-কীর্ত্তনে ভজন-পিয়াসীর নয়নের জল গড়ায়, তেমনই মুখপ্রিয় খাদ্যের নামকীর্ত্তনে ভোজনবিলাসীর জিহ্বায় জল আসে।

জোর, বাচা বাটা ট্যাংরা খয়রা—আর রোগীর পথ্য মৌরলা মাছের ঝোল—এই পর্য্যন্ত সীমামুড়া। বুঝি, জানি, মন বাঁধিয়া সহিয়া আছি। * তবে ডাল-তরকারিতে, ভাতে ভাজায়, ঝালে ঝোলে অম্বলেও হয় তো একটু আধটু অত্যাচার করিয়া বসি (এখন তো এই শাদাসিধা আহারই সম্বল) এবং তাহার ফলভোগও করি। এই শাক-পাতা-কচু-কাঁচকলার † ক্ষেত্রেও রাশ টানিতে হইলে আর কি লইয়া বাঁচি, পাঠকবর্গই বলুন। জানি না, এই মাত্রা-অতিক্রমের জন্য আবার তৃতীয় বার (বার বার তিন বার) warning পাইব কিনা, (alarm-bell) বিপৎসূচক ঘণ্টা বাজিবে কিনা, তৃতীয় আর একটি স্থানে, আরও নিম্ন-অঙ্গে, একেবারে মূলাধার ঘেঁষিয়া কার্ব্বঙ্কলের উদয় হইয়া মূলে হাবাৎ হইবার শেষ নোটিশ দিবে কিনা। হয় তো তাহাতেও সোর হইবে না। শেষে—সাপের মত—মরিয়া সোজা হইব। ভূত হইয়া 'ভূতে পশুন্তি'র দলে ভিড়িব। তবে আশ্বাসের কথা—আমার এক ভোজনবাগীশ বন্ধু বলিতেন, "কেহ বা খাইয়া মরে, কেহ বা না খাইয়া মরে; ইহার মধ্যে কাপুরুষের মত না খাইয়া মরার চেয়ে বীরের মত খাইয়া মরাই ভাল।" (বলা বাহুল্য, বন্ধুবর জীবন-মধ্যাহ্নেই এ জগৎ ছাড়িয়াছেন। টীকা অনাবশ্যক।)

সত্যকথা বলিতে কি, আমি চিরদিনই ভোজনবিলাসী—শত্রুপক্ষ বলেন, ঔদরিক বা পেটুক। এ কথা চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে 'পল্লীতত্ত্বে' খোলসা স্বীকার করিয়াছি। যৌবনকালে আহারে যে অত্যাচার-অনাচার করিয়াছি, তাহা তখনকার দাঁতের জোরে ও অগ্নির তেজে মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু পঁচিশে যাহা সহে, পঞ্চাশে (ও তদূর্দ্ধ বয়সে) তাহা সহে না। এ কথাটা এখন বেশ অবলীলাক্রমে বলিতেছি বটে, কিন্তু আয় থাকিতে এ কথা বুঝি নাই বা খেয়াল করি নাই, এখন ঠেকিয়া শিখিয়া, ভুক্তভোগী—শ্রীবিষ্ণুঃ, ভুক্তরোগী—হইয়া বুঝিয়াছি। প্রৌঢ় বয়সে স্খলিত ও শিথিলদন্ত অবস্থায় হাত গুটাই নাই, ইহাই হইতেছে আসল গলদ—তাই আজ দীর্ঘকাল রোগভোগে শয্যাগত থাকিবার পর আরোগ্যলাভ করিয়াও জীবন্মৃত হইয়া আছি—সকল কাযেই পরবশ হইয়াছি, আত্মীয়ের অনাত্মীয়ের অনুকম্পার বা অবহেলার পাত্র হইয়াছি। যৌবনের অসংযমের, অপরাধের, পাপের—এই কঠোর দণ্ড।

ভোজন-বিলাসকে 'পাপ' বলিতেছি, ইহাতে হয় তো অনেকে বিস্মিত হইবেন। কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে, 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্,' তখন দেহের উপর অত্যাচার করিয়া দেহের অনিষ্ট করিলে, স্বাস্থ্য নষ্ট করিলে, ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত জন্মে, সুতরাং ইহা পাপ নহে কি? তাই—

অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।

অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শাস্ত্রে এইরূপ নিষেধবাক্য আছে। রোগ পাপের ফল, এই বিশ্বাসেই অনেক দিন রোগে ভুগিলে শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত-চান্দ্রায়ণাদির ব্যবস্থা আছে; সূর্য্যস্তবরাজে 'সর্ব্বপাপক্ষয়-পূর্ব্বক-সর্ব্বরোগোপশমনার্থে বিনিয়োগঃ' আছে। [বলা বাহুল্য, ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া 'বিষয়কর্ম্ম' হইতে অবসর গ্রহণ করাতে অখণ্ড অবকাশে ম্লেচ্ছভাষার সাহিত্যচর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া আজ শাস্ত্র ঘাঁটিতেছি, 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্' বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।]

এ সব শাস্ত্রের বাণী নব্যতন্ত্রের পাঠকগণ হয় তো উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানও এই মতেরই পরিপোষক। শিক্ষকতা করিবার সময় ব্ল্যাকি সাহেবের 'Self-culture'-নামক পুস্তকে অনেকটা এই ধরণের কথাই যেন পড়িয়াছিলাম। তিনিও আহারাদিবিষয়ে

---

* সহৃদয় পাঠকবর্গ আশ্বস্ত হউন, এতটা অবসাদের ও বিষাদের কারণ আর বর্ত্তমান নাই। রোগশয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বেই এই কাহিনীর খসড়া হইয়াছিল—আগে মগজে, পরে কাগজে। তাহার পর, ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়াছে। সদ্যোরোগমুক্ত হইয়া দুর্ব্বার দিনে দুই এক গাল চিড়েভাজা খাইতে চাহিলে কাশীর গুণসিন্ধু ডাক্তার বাবু বলিয়াছিলেন—"স্বাভাবিক ভাবে কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে চিড়েভাজা কেন, ছোলাভাজা পর্য্যন্ত খাইতে দিব।" আমি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম, "ইচ্ছামত খাইতে ও চলিতে ফিরিতে পারিলেই স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক সকল ক্রিয়া হইবে।" উভয়েরই বাক্য ফলিয়াছে। এখন আর আহারে বাঁধাধরা ব্যবস্থা নাই, নিষেধের কসাকসি নাই,—ক্রমে ক্রমে রহিয়া সহিয়া (জনার্দ্দন-স্মরণ করিয়া) আকাঙ্ক্ষিত বহুতর আহার্য্যেরই স্বাদ লইতে পারিয়াছি, তবে অবশ্য পরিমিত ভাবে এবং কালেভদ্রে। বিশেষরূপে দুষ্পাচ্য আহার্য্যগুলির এতদিন পরখ করি নাই—মাঘের প্রচণ্ড শীতের অপেক্ষায় ছিলাম। পাঠকবর্গ শুনিয়া সুখী হইবেন, গুরুপাক ভোজ্যও পরিপাক করিতেছি। এখন মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিলে হয়।

† কলমের টানে কাঁচকলা লিখিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু পেটের পীড়ার সময় অতিরিক্ত কাঁচকলা-ভক্ষণের ফলে একণে দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিয়াছে, এই অজুহাতে ডাক্তারবাবু কাঁচকলা একদম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, 'হবিষ্যির চরসাথী কদলী রত্ন, হেদে দেখ তাহাতেও বিধি-বিড়ম্বন!' ব্রাহ্মণের আর রহিল কি?

নিয়মলঙ্ঘনকে Si ' (পাপ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিলাতের এক জন বড় ডাক্তার আরও খোলসা করিয়া কথাটা বলিয়াছেন—

"In childhood we had been taught that suffering and death came into the world through Sin. Now physicians knew that the Sin for which man was continuously paying the penalty was not necessarily his failure to comply with an arbitrary code of morality, but was in every case due to ignorance or disregard of the immutable workings of Nature." *

শাস্ত্রের দোহাই বা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই না দিলেও এই মোটা কথাটা বুঝিতে বা বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। তবে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভুক্তভোগী না হইলে এ সব খেয়াল হয় না। দুরধিগম্য শাস্ত্রের বা দুরূহ বিদেশী ভাষার সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাল্যাবধি পঠিত পুস্তকে এই শ্রেণীর হিত-উপদেশের অভাব ছিল না। কিন্তু তখন সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর ও প্রবৃত্তি ঘটে নাই। যখন মাইনার স্কুলে নিম্নশ্রেণীতে পদ্যপাঠ প্রথমভাগে পড়িলাম,—

"রসনা সুতৃপ্ত বটে মিষ্ট রসে হয়।
উদরের পীড়া কিন্তু জনমে নিশ্চয়॥"

তখন, ইহা যে আমার মোণ্ডামিঠাই খাওয়ার অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে, পণ্ডিতমহাশয়ের পাঠনার গুণে এরূপ অন্তর্মুখীন ভাব মনে কোনও দিন উদিত হয় নাই; দুরূহ শব্দের অর্থ করিতে ও কবিতা দুই ছত্র গদ্য-আকারে (Prose-order) পরিণত করিতেই মানসিক সবটুকু শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল। আবার মাইনার স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করিয়া পরীক্ষায় পাশ হইয়া যখন এন্‌ট্রেন্স স্কুলে প্রবেশ করিলাম, তখন দেবভাষার প্রথম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে "অতিভোজনং হি রোগমূলম্" পড়িলাম বটে, কিন্তু তখনও আহারে সংযমের দিকে ঝোঁক পড়িল না, ক্ষুদ্র চূর্ণকটির অন্তর্নিহিত শিক্ষার দিকে মন আকৃষ্ট হইল না, নব-পরিচিত দেবনাগর-অক্ষরের নিকষকৃষ্ণ-মূর্ত্তিধ্যানেই তন্ময় হইলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া যখন ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগে খুব ঘোরালো রকমের শ্লোকটি পাইলাম—

"রোগশোক-পরীতাপ-বন্ধন-ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধবৃক্ষাণাং ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥"

তখনও আহারে অসংযমের সহিত রোগের সম্পর্ক প্রণিধান করিবার কথা মাথায় আসে নাই—(আসিবেই বা কেন? সে তো বিজ্ঞানের এলাকা, আর সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা তো সাহিত্য-হিসাবে)—ব্যাকরণ-অভিধানের গহনবনে নব নব জ্ঞানকুসুম অর্থাৎ কাঠমল্লিকা-আহরণে ব্যাপৃত হইলাম, উক্ত শ্লোকে সন্ধিসমাসের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলাম, 'পরীতাপে' ই-বর্ণের দীর্ঘত্ব লইয়া মাথা ঘামাইলাম, ব্যসনের 'ইত্যমরকোষঃ' তথা কামজ-কোপজ দোষের শ্লোকময়ী তালিকা কষিয়া মুখস্থ করিলাম—পরীক্ষায় বেশী নম্বরও পাইলাম। আর কি চাই? সুতরাং পঠদ্দশায় এই যে তিন তিন বার সংযমসাধনে সাবধানতার ইঙ্গিত—ইংরেজ কবির ভাষায় "Three Warnings"—পাইলাম, তাহা মাঠে মারা গেল। আর ঠাকুরমার মুখে শ্রুত ডাকের বচন "রোগ নষ্ট লঘুভোজনে" তো মেয়েলি ছড়া বলিয়া "go-to-hell" বা "ন স্যাৎ" করিয়া দিলাম, ঋজুপাঠের শ্লোকটি মনে মনে লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞা ঠাকুরমার উপর টেক্কা দিলাম—

"বৃদ্ধস্য (বৃদ্ধায়াঃ) বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈব বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্ত্তনম্॥"

পঠদ্দশা পার হইয়া যখন পরকে পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম অর্থাৎ শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী হইলাম, তখন যৌবনের গর্ব্বে ও ছাত্রজীবনের সফলতার গৌরবে তথা শিক্ষাদানের আনন্দে বিভোর হইলাম, ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হইলাম এবং স্বোপার্জ্জিত অর্থে নানাবিধ সুখাদ্যভোজনে চরিতার্থ হইলাম। সুতরাং এ সময়েও পুস্তকের মারফত প্রেরিত শিক্ষা আমলে আনিলাম না। পূর্ব্বোক্ত ব্ল্যাকি সাহেবের 'Self-culture'—নামক ছাত্র-ভয়ঙ্কর পুস্তকখানির মর্ম্মার্থ ছাত্রমণ্ডলীকে বুঝাইতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত, পুস্তকস্থ শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করিবার বা

* "The Wisdom of the Body"—Harveian Oration at the Royal College of Pysicians (Prof. E. H. Starling).

করাইবার অবকাশ কোথায়? তাহার পর শিক্ষকতাকার্য্যে যখন পাকা হইয়াছি, ম্লেচ্ছভাষার সাহিত্যের পঠন-পাঠনে যখন অন্তরে বাহিরে—মস্তিষ্কে ও মুখে—কড়া পড়িয়া গিয়াছে, (the iron had entered into the soul), তখন এক সুপ্রভাতে সুসমাচার পাইলাম—বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-বিধানে মাতৃভাষার সাহিত্য পাকাপাকি-রকমে পাঠ্য (?) হইয়াছে—স্তাবকের উচ্ছ্বাসময় ভাষায় বিমাতার গৃহে মাতার স্থান হইয়াছে। মনের স্ফূর্ত্তিতে, জননী বঙ্গভাষার সম্মান-লাভের (?) আনন্দে, কলেজে ম্লেচ্ছভাষার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার সাহিত্য-পাঠনার ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইলাম। —(এ যেন কটুতিক্তকষায় কবিরাজী ঔষধ অনুপান মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করার ব্যবস্থা!) সেই অবস্থায় ও ব্যবস্থায় শ্রদ্ধাস্পদ ৺চন্দ্রনাথ বসুর "সংযমশিক্ষা" ইণ্টার-মিডিয়েট্ শ্রেণীতে পড়াইতে সুরু করিলাম; প্রবীণ বসু মহাশয়ের বর্ণিত 'আহারে সংযম'-সম্বন্ধীয় নিম্নোদ্ধৃত * ব্যাপারটি লইয়া ছাত্র ও শিক্ষকে মিলিয়া খুব হাসাহাসি করিলাম। আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা" লাখ কথার এক কথা।

যাক্, পঠন-পাঠনের পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়া, আর পাঠকবর্গের বিরক্তিভাজন হইব না। ধান ভানিতে শিবের গীত না গায়িয়া, এইবার ধানভানা আরম্ভ করিব, অর্থাৎ পীড়ার কথা পাড়িব। তবে ভয় হয়, পাছে তাহা ধানভানার মতই একঘেয়ে হইয়া পড়ে। বাস্তবিক, রোগের কাহিনী সাহিত্যভুক্ত করার চেষ্টা অসমসাহসিকতার কার্য্য, লেখক সেই অসমসাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফি "রোগশয্যার প্রলাপ" 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র মারফত পাঠকবর্গের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে রোগের কথা ছিল না বলিলেও চলে, সমাজ ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় নানা কথার সারগর্ভ আলোচনা ছিল। যে ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হইতেছে, সেই সাহিত্যে সুরসিক চার্লস্ ল্যাম্বের "The Convalescent"-নামধেয় একটি সুন্দর প্রবন্ধে রোগযন্ত্রণা ও সদ্যঃ সদ্যঃ আরোগ্যলাভের অবস্থার তুলনায় সমালোচনা আছে; কিন্তু সেই অনন্য-সাধারণ সরসতার অনুকরণ করা যা'র তা'র শক্তিতে কুলায় না। উক্ত সাহিত্যে দুইখানি পুস্তক কতকটা এই শ্রেণীর—Samuel Warren-এর "Diary of a late Physician" এবং De Foe-র "Journal of the Plague-year"; বই দুইখানি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য না হইলেও সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত বলিয়া সমালোচক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ দুইখানি যদিও প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের সঙ্কলন বলিয়া চালান হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক লেখকদ্বয়ের কল্পনার ভিত্তির উপর ইহাদের প্রতিষ্ঠা। আর এগুলি রোগীর নিজের জবানীও নহে। বক্ষ্যমাণ বিবরণ বাস্তব, এবঞ্চ ভুক্তভোগী রোগীর নিজের কথা। তবে সেই জন্যই ইহাতে (morbid details) রোগের খুঁটিনাটি কথা বেশী রকম থাকার আশঙ্কা আছে, তাহার ফলে ইহা নীরস, একঘেয়ে ও নিরতিশয় বিরক্তিকর হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। পাঠকের সমবেদনাই ইহাকে সাহিত্যরসে অভিষিক্ত করিতে পারে। ইহার সমস্ত অংশই রোগশয্যায় রচিত, সুতরাং বিশৃঙ্খল, অসংবদ্ধ, এলোমেলো (rambling discourse)—তবে তাই বলিয়া 'প্রলাপ' নহে, এ কথা বোধ হয় ভরশা করিয়া বলিতে পারি। আজ এই পর্য্যন্ত। পাঠকবর্গের কৌতূহল, সমবেদনা ও আগ্রহের পরিচয় পাইলে উল্লিখিত বিবরণ পত্রস্থ করিবার চেষ্টা করিব। *

[ক্রমশঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* পিতা পুত্রকে কহিলেন—(চিনি দেওয়া ঘন) দুধ খানিকটা খাও আর খানিকটা মুখে করিয়া বাহির-বাটীতে লইয়া গিয়া সেখানে ফেলিয়া দিয়া আচমন কর গিয়া। ভোজন-স্থান হইতে বহির্ব্বাটীর আচমনের স্থান কম দূর নহে। সুধামাধব সমস্ত পথটুকু সেই সুধাসম ক্ষীরটুকু মুখে করিয়া গেল, বড় ইচ্ছা-সত্ত্বেও একটি ফোঁটাও খাইল না বা খাইয়া ফেলিল না। পিতাকর্ত্তৃক কিছুদিন এইরূপে পরিচালিত হইয়া পুত্র আহারে নির্লোভ ও সংযত হইয়া উঠিল এবং সম্পূর্ণরূপে স্বসমাজমী হইল। (২য় সংস্করণ, চতুর্থ অধ্যায়, আহারে সংযম-শিক্ষা, ৩৭।৩০ পৃষ্ঠা।)

* বিবরণটি কয়েকমাস খসড়া-আকারে পড়িয়া ছিল। সে দিন একখানি ইংরেজী দৈনিকে দৈবাৎ দেখিলাম, জনৈক ফরাসী মহিলা রোগভোগ ও সদ্যোরোগমুক্তির বিবরণ লিখিয়া প্রাইজ পাইয়াছেন। তাই আমিও ভাবিলাম, 'অহো নিধিপ্রাপ্তেররমুপায়ঃ।' আমার এই কাহিনী প্রকাশিত করিয়া দেখি না—কপালে 'জগত্তারিণী মেডাল' যোটে কি না।

টিট্টিভ

বৈষ্ণব কবি ব্রজকাননেশ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—টিট্টিভদুন্দুভিধ্বনিভরে ও পিকপিকীবীণানিনাদে মুখরিত এই নিদাঘমঞ্জু বনভাগ দর্শন করুন।* সুদূরপ্রসারি জলাভূমির প্রত্যন্তদেশ হইতে সহসা বিহগকণ্ঠনিঃসৃত "টিট্টি টিট্টি" ধ্বনি নিদাঘনিশীথের স্তব্ধতা যখন ভঙ্গ করিয়া দেয়, তখন আমাদের ভাবিবার অবসর থাকে না যে, কুঞ্জবন মঞ্জু কিনা, অথবা এই টিট্টিভ এক দিন বৈষ্ণবপ্রীতিপূরিত বনভাগ স্বীয় দুন্দুভিধ্বনিতে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল কিনা। টিট্টি-ই-টি টিট্টি-ই-টি টিট্টি-ই-টি! এই পাখীটিকে একবার ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে হয় না? আমাদের পরিচিত পারাবতের অপেক্ষা সে বৃহত্তর বলিয়া ত মনে হয় না। চঞ্চু অনেকটা পায়রার ঠোঁটেরই মত। পা দুইটি লম্বা ও উজ্জ্বল পীতবর্ণ; পশ্চাদ্ভাগের অঙ্গুলিটি খুব ছোট। বড় বড় দুইটি চোখের পাশে রক্তাভ চর্ম্মখণ্ড ঊর্দ্ধে সম্মুখভাগে প্রসারিত। মাথা এবং বুক কালো, দেহ ধূসর; দুই চোখের তলা দিয়া একটা সাদা ডোরা কাণের উপর দিয়া কণ্ঠদেশ বাহিয়া বুকের নীচে পেটের সাদা রংএর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নাতিদীর্ঘ পুচ্ছের উপরিভাগে দুইটি সাদা ডোরা এবং প্রত্যেক ডানার পাশে ঐরূপ একটি সাদা রেখা প্রসারিত রহিয়াছে।

এইখানেই কিন্তু ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গেল না। যে সকল লক্ষণ দেখিয়া বৈজ্ঞানিক পক্ষিতত্ত্ববিৎ ইহাকে কোনও বিশিষ্ট পরিবারভুক্ত করিয়া থাকেন, তাহার অনেকগুলি কাদাখোঁচাতে বিদ্যমান এবং সেই জন্য উভয়কে এক পংক্তিতে বসান হয়; কিন্তু কাঁদাখোঁচার সঙ্গে টিট্টিভের মিলের চেয়ে অমিলের ভাগই বেশী। উভয়ের দেহায়তন প্রায় একই রকমের, পুচ্ছ হ্রস্ব, মুখব্যাদান সঙ্কীর্ণ-পরিসর; উভয়েই বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিতে অনভ্যস্ত এবং জমিতেই বিচরণ করিয়া থাকে। কাদাখোঁচার চঞ্চু সুদীর্ঘ ও অঙ্ঘ্রি হ্রস্ব; টিট্টিভের অঙ্ঘ্রি দীর্ঘ ও চঞ্চু হ্রস্ব; পারাবতসদৃশ টিট্টিভের সম্মুখস্থ দুইটি পদাঙ্গুলি জালপাদলক্ষণাক্রান্ত, কিন্তু কাদাখোঁচায় এই লক্ষণের একান্ত অভাব। কাদাখোঁচার চোখ চঞ্চু হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, অন্য কোনও বিহঙ্গে সেরূপ দেখা যায় না। টিট্টিভের বিশিষ্ট লক্ষণ তাহার নয়নোপান্তপ্রসারিত চর্ম্মখণ্ড; কাদাখোঁচার সেরূপ কিছুই নাই। কাদাখোঁচায় ঈষৎ কৃষ্ণপীতধূসর বর্ণের সমাবেশ; টিট্টিভের সর্ব্বাঙ্গে, পুচ্ছে, পতত্রে বিচিত্র সাদা ডোরা তাহার মাথার ও কণ্ঠদেশের অসিত বর্ণের সহিত মিশিয়া একটা অপরূপ বর্ণছটা ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কাদাখোঁচা কাদার মধ্যে নিঃশব্দে বিচরণ করে; টিট্টিভ মাঠে, জলাভূমির পাশে, ধানক্ষেতের ধারে লোকালয় হইতে দূরে পরিভ্রমণ করিতে করিতে আগন্তুক মানুষের পদধ্বনি শুনিবামাত্র টিট্টি-ই-টি টিট্টি-ই-টি ধ্বনি করিতে করিতে শূন্যে উত্থিত হইয়া সহসা কোথায় ভূমিতলে অবতরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহার কর্কশ কণ্ঠস্বর রাত্রিতেও শ্রুত হয়। ডাহুকের যে "কবা কবা" ধ্বনি নিশীথনীরবতা ভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহা অধিকতর কর্কশ। ডাহুককে সময়ে সময়ে খোলা মাঠে, ধান্যক্ষেত্রে, জলাভূমির ধারে টিট্টিভের মত চলিতে-ফিরিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু সে জলে থাকিতে বেশী ভালবাসে। অবয়বগত সাম্যলক্ষণবশতঃ ডাহুক জলকুক্কুট আখ্যায় অভিহিত। টিট্টিভের আকৃতি ও প্রকৃতিতে এমন কিছুই নাই, যাহাতে কুক্কুটের কথা মনে পড়ে; বরং এমন কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ আছে, যাহা পারাবতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত টিট্টিভকে Wader (জলচর) সংজ্ঞায় বিশেষিত করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। টিট্টিভের আচরণ অন্যান্য Wader (জলচর) হইতে আশ্চর্য্যরূপে স্বতন্ত্র। তাহার সমস্ত জীবনলীলা প্রায়ই শুষ্ক ভূখণ্ডের উপর পর্য্যবসিত হয়। এমন কি, উচ্চ, শুষ্ক ভূমির উপরে পদনখরসাহায্যে মৃত্তিকা সরাইয়া একটু গর্ত্তের মত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। তবে যে তাহাকে জলের নিকটে একেবারেই দেখা যায় না, তাহা নহে; কিন্তু সে কদাচ জলমধ্যে থাকিতে চায়। তবে কেন ইহাকে

* শ্রীগোবিন্দলীলামৃতম্, দ্বাদশ সর্গ, শ্লোক ৮০।৮১।

টিট্টিভ

Wader বলা হইয়া থাকে? ইহার একমাত্র সঙ্গত কারণ আমার মনে হয় যে, কাদাখোঁচাপ্রমুখ Charadriidae বিহঙ্গগণের সহিত টিট্টিভের (Plover-Lapwing এর) অবয়বগত এমন সাদৃশ্য আছে যে, সম্পূর্ণ জলচরত্ব বিদ্যমান না থাকিলেও উহাকে উক্ত Charadriidae পরিবারের অন্তর্গত না করিলে চলে না এবং সেই জন্য সাধারণভাবে উহার Wader পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হয়।

এই বিহঙ্গটিসম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে কি পরিচয় লাভ করা যায়, দেখা যাউক। রাজনিঘণ্টুকার লিখিতেছেন—

অথ টিট্টিভনামানি

টিট্টিভী-পীতপাদশ্চ সদালুতা নৃজাগরঃ।

নিশাচরী চিত্রপক্ষী জলশায়ী সুচেতনা॥

এখানে প্রথম লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে যে, টিট্টিভ "পীতপাদ।" Fauna of British India গ্রন্থে এই পাখীটির পায়ের বর্ণনা লিখিত আছে—legs bright yellow। দ্বিতীয় লক্ষণ—"সদালুতা," অর্থাৎ খণ্ডিতা; সাধারণতঃ স্ত্রীপক্ষী ও পুংপক্ষী পৃথক্ পৃথক্ একাকী বিচরণ করে। সে আবার "জলশায়ী" অর্থাৎ wader, জলচর। Fauna গ্রন্থে দেখিতে পাই—It is met with * * * * often near water, generally in pairs or singles, more rarely in scattered flocks। সে বিশেষভাবে "নৃজাগর" অর্থাৎ নিশীথে তাহার কর্কশ কণ্ঠস্বরে মানুষকে জাগাইয়া দেয়। সে "নিশাচরী" নিশাকালে বিচরণ করা তাহার স্বভাব। সে "সুচেতনা," অর্থাৎ সদাই জাগ্রত ও সতর্ক থাকে, যেন কেহ কখনও তাহাকে ঘুমাইতে দেখে নাই। মিঃ লেগ্ বলিতেছেন—"At night it is a most watchful bird, and ever ready in the jungle to alarm slumbering nature

around it with utterance of these cries ।" আর একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন,—"Nobody ever caught a Lapwing asleep" · "চিত্রপক্ষী"—অর্থাৎ বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট পাখী, মিঃ ফিনের 'the strikingly coloured bird ।" এই বর্ণবৈচিত্র্যের কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যাদবের বৈজয়ন্তীতে টিট্টিভের পরিচয়ে তাহার ধ্বনি ও শয়ন-ভঙ্গীর কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে ঃ—

টিট্টিভস্তু কটুক্বাণ উৎপাদশয়নোহণ্ডুকঃ।

তাহার ধ্বনি শ্রুতিকটু এবং সে তাহার পদদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া চিৎ হইয়া শয়ন করে। সে অণ্ডুক।

এই প্রসঙ্গে পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত টিট্টিভ-টিট্টিভীর কথার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সমুদ্রতীরে টিট্টিভী আসন্নপ্রসবা; পাছে সাগরতরঙ্গে অণ্ডগুলি নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় টিট্টিভী দূরে কোনও উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিতে স্বামীকে বলিল। টিট্টিভ তাহাকে অভয় দিয়া বলিল, সমুদ্র আমার অনিষ্ট করিতে সাহস করিবে না। স্বামিস্ত্রীর এই কথোপকথন শুনিয়া অম্বুনিধি চিন্তা করিতে লাগিল,—অহো!

"উৎক্ষিপ্য টিট্টিভঃ পাদৌ শেতে ভঙ্গভয়াদিব।
স্বচিত্তকল্পিতো গর্ব্বঃ কস্য নাম ন বিদ্যতে॥"

কথা ১৫। শ্লোক ৩২৯

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে টিট্টিভ পদদ্বয় উৎক্ষেপ করিয়া শয়ন করে। স্বীয় চিত্তকল্পিত গর্ব্ব কাহার নাই?

"উৎক্ষিপ্য পাদৌ শেতে"—এইখানেই উৎপাদশয়ন টিট্টিভের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। পঞ্চতন্ত্রকার তাঁহার টিট্টিভের নাম রাখিয়াছেন—উত্তানপাদ। বাস্তবিক সে উর্দ্ধপদ হইয়া শয়ন করে কি না, সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কোনও পাশ্চাত্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু ইহাকে ঘুমাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সে সর্ব্বদাই সজাগ, সচেতন। মিঃ মনিয়ার উইলিয়ম্‌স বোধ হয় পাখীটার এই অদ্ভুত শয়নভঙ্গীর কথাতে আস্থাস্থাপন করিতে না পারিয়া 'উৎপাদশয়ন' শব্দের অর্থ করিয়াছেন Sleeping while standing on the legs অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা যায়। অবশ্যই এ ব্যাখ্যা প্রমাদপূর্ণ, কারণ, ইহা টিট্টিভচরিত্রে কোনও বিশিষ্টতার নির্দ্দেশ করিতেছে না। সব পাখীই পায়ের উপর ভর দিয়া নিদ্রা যাইতে সমর্থ। পঞ্চতন্ত্রের কথায় টিট্টিভ সম্বন্ধে যে প্রাচীন কিম্বদন্তীর আভাস পাওয়া গেল, তাহাতেই উৎপাদশয়ন অভিধার সার্থকতা বুঝিতে পারা যায়।

প্রসূত ডিম্বের প্রতি অত্যধিক আসক্তিবশতঃ, বোধ করি, ইহাকে 'অণ্ডুক' বলা হইয়াছে। ভূমিতলে সযত্নরক্ষিত ডিম্বগুলির নিকটে কাহাকেও আসিতে দেখিলে সে চঞ্চল হইয়া উঠে। ছলে কৌশলে আগন্তুককে সেখান হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য সে বিচিত্র ভঙ্গীতে কখনও উড়িতে থাকে, কখনও বা ভূমিতে অবতরণ করিয়া রূপে, শব্দে, গতিভঙ্গীতে পথিককে প্রলুব্ধ করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পঞ্চতন্ত্রের টিট্টিভী যখন ডিম্বপ্রসব করে নাই, তখনই তাহার দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে—কেমন করিয়া অণ্ডগুলিকে সর্ব্বগ্রাসী সমুদ্রের কবল হইতে রক্ষা করা যায়। সাগরতরঙ্গে ডিম্ব যখন ভাসিয়া গেল, তখন দেবতার শরণাপন্ন হইয়া তাহার উদ্ধারসাধন করা হইল। গল্পের কথা হইলেও, বোধ করি, ইহার মধ্যে টিট্টিভ-চরিত্রের একটি বিচিত্র রহস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও প্রচলিত সংস্কৃত অভিধানে "অণ্ডুক" শব্দটি ব্যাখ্যাত নাই।

তা' না হউক, কিন্তু টিট্টিভীর নীড়রচনা ও অণ্ডপ্রসব ব্যাপার নিরতিশয় রহস্যময় নহে। ভারতবর্ষে সর্ব্বত্রই ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখে এমন স্থানে তাহারা কুলায় সংস্থান করে যে, তাহার কাছাকাছি হয় নদী, না হয় জলাভূমি অথবা পুষ্করিণী অবস্থিত। এই জলাশয়সামীপ্য টিট্টিভের নীড়রচনার পক্ষে, বোধ করি, বিশেষ আবশ্যক। মিঃ হিউম্ লিখিতেছেন—they lay almost anywhere, provided there is water somewhere in the neighbourhood; অর্থাৎ নিকটে কোথাও জল থাকিলেই হইল। বর্ষার প্রারম্ভে তাহারা শুষ্কতর ভূমি নীড়রচনার অনুকূল মনে করে। ভূপৃষ্ঠে নাতিগভীর গর্ত্তে ডিম্বগুলি সাধারণতঃ রক্ষিত হয়; এই গর্ত্তটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড অথবা বালুকাস্তূপ দ্বারা বেষ্টিত থাকে। নীড়াভ্যন্তরে যে সকল খড়কুটা, ঘাস বা কাঠের টুকরা সজ্জিত থাকে, সেগুলা বন্যায় প্রায় ভাসিয়া আসে; অথবা নদীসৈকতে বা সাগরবেলায় তরঙ্গভঙ্গে বালুতটে প্রক্ষিপ্ত হয়। ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত ইহাদের সন্তানজননকাল; তাই অপেক্ষাকৃত

নিম্নভূমিতে বন্যাপ্রাবল্যের সম্ভাবনা। পঞ্চতন্ত্রের টিট্টিভী বালুকাময় সমুদ্রতটে ডিম্ব রক্ষা করিয়াছিল; সাগরতরঙ্গের কবল হইতে সেগুলিকে বাঁচাইবার জন্য অপেক্ষাকৃত শুষ্কতর স্থানে লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল। টিট্টিভীর বংশরক্ষার এই প্রবল instinct বৈজ্ঞানিকের উপেক্ষণীয় নহে। এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া অ্যালান হিউম লিখিয়াছেন,—After the rains have commenced, they like drier situations। শুধু যে তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে নীড়টি স্থাপিত করে, তাহা নহে; গিরিগাত্রে ও সমুদ্রবক্ষ হইতে ৩।৪ হাজার ফুট উচ্চে তাহাদের নীড় দৃষ্ট হইয়া থাকে। কুলায়মধ্যে একত্র চারিটির অধিক ডিম্ব দেখা যায় না। ডিম্বের এক অগ্রভাগ সরু, অপর প্রান্তটি বেশ মোটা ও চওড়া। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুই প্রান্ত সমান গোলাকার অথবা সমস্ত ডিম্বটা লম্বাভাবের দেখা গিয়াছে। বর্ণ কোথাও ঈষৎ পীত বা ঈষৎ হরিৎ; কোথাও বা পীত রক্তাভ—কিন্তু ধূসর বা গাঢ় কৃষ্ণ রেখাসমন্বিত। ডিম্বগুলি দেখিতে সুচিক্কণ নহে। ডিম ফুটিয়া শাবক বাহির হইতে অন্যূন তিন সপ্তাহ লাগে।

ইংরাজীতে টিট্টিভের এক অপরূপ নামকরণ হইয়াছে,—ডিড-হি-ডু-ইট (Did-he-do-it), পিটি-টু-ডু-ইট (Pity-to-do-it)। অবশ্যই পাখীটির কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির অনুকরণে এই পরিচয় দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশেও, বোধ হয়, এই কারণেই ইহার নাম হইয়াছে "টিট্টি"। পাশ্চাত্য পক্ষিতত্ত্বজ্ঞ ইহাকে Red-wattled Lapwing আখ্যায় অভিহিত করেন। এই অভিধার মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্য একটু বর্ণিত রহিয়াছে। Charadriidae পরিবারভুক্ত অন্যান্য বিহঙ্গবর্গের চোখের উপরিভাগে ঐ red-wattle বা লাল চর্ম্মখণ্ড থাকে না। ইহার জাতিবর্গের মধ্যে আর এক Lapwing বিহঙ্গের চক্ষুর উপরে প্রলম্বিত পীত মাংসখণ্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমাদের টিট্টিভের মত ইহাকে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ও আসামে ইহাদের আর একটি জাতি আছে, যাহার ডানায় কাঁটার মত একটা খোঁচা (spur) আছে, কিন্তু চোখের উপরে পূর্ব্বোক্ত চর্ম্মখণ্ড নাই; কিন্তু মাথার উপরে একটা লম্বা চূড়া বর্ত্তমান। অনেকে দলবদ্ধ হইয়া একত্র বিচরণ করা ইহাদের কাহারও স্বভাব নহে; পরন্তু প্রায় একাকী অথবা কচিৎ দুই একটা সহচর সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে ইহারা ভালবাসে। আরও একটা কথা এই যে, ইহারা সকলেই এ দেশের স্থায়ী অধিবাসী;—বিদেশ হইতে ঋতুবিশেষে আগন্তুকমাত্র নহে। এইখানেই তাহারা যথাসময়ে নীড়রচনা ও সন্তানপালনাদি করে। উপরে বর্ণিত পক্ষীগুলি ব্যতীত আরও যে সমস্ত Lapwingএর সহিত আমরা পরিচিত, তাহাদের সকলেই প্রায় শীত ঋতুতে ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়া বিক্ষিপ্তভাবে এ দেশের অনুকূল আবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক মাস অতিবাহিত করে। তাহাদের মধ্যে একটা পাখী দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে এত ভালবাসে যে, পাশ্চাত্য পর্য্যবেক্ষক তাহাকে Sociable Lapwing আখ্যা দিয়াছেন। সামাজিকতাই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দূর-সম্পর্কীয় আরও কয়েকটা জাতি ইহাদের আছে, যাহাদের অপেক্ষাকৃত বড় বড় চোখ ও বড় বড় মাথা, আর পক্ষের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ; কিন্তু পশ্চাতের পদাঙ্গুলি নাই। সাধারণতঃ ইহাদিগকে Lapwing বলা হয় না, Plover বলা হয়।

এই Plover পাখীদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কতকগুলি আয়তনে ঘুঘু পাখীর মত, কতকগুলি খুব ছোট, কাহারও বা পৃষ্ঠদেশে বর্ণবৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। ইহাদের সকলেই প্রায় যাযাবর,—ঋতুবিশেষে দেশবিদেশে আনাগোনা করে।

কৃষিজীবী মানবের পক্ষে টিট্টিভের উপকারিতা কিছু আছে কি না, এ স্থলে তাহার একটু উল্লেখ করা আবশ্যক। টিট্টিভ কীটপতঙ্গভুক্; শঙ্খশম্বুককর্কটাদিও তাহার ভক্ষ্য। অনেকগুলি টিট্টিভের অন্ত্র পরীক্ষা করিয়া কীটতত্ত্ববিৎ ও বিহঙ্গতত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিতরা ইহাদের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অনেক সাহায্য করিয়াছেন। ৯টি পাখীর পাকস্থলী হইতে ১১৮টা পোকা পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে ৫১টা মানুষের অনিষ্টকর। আবার দেখা গেল যে, উক্ত ৯টা পাখীর মধ্যে ৬টা পাখী কেবলমাত্র অপকারী কীটই ভক্ষণ করিয়াছে। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, টিট্টিভ কৃষিজীবী মানবের সহায়ক বন্ধু।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

৩

অশ্বিনীকুমার রাজনীতিক্ষেত্রে তিলকের মতানুবর্ত্তী ছিলেন। তিলক বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও তিলকের অসামান্য প্রতিভা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও অকৃত্রিম দেশভক্তি অশ্বিনীকুমারকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের পর স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম যুগেও তিনি দুইএকবার বিলাতে বহু স্বাক্ষরসংযুক্ত আবেদন পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আর তিনি আবেদন ও নিবেদনের থালা নতশিরে বহিতে সম্মত হয়েন নাই। তিনি ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, তাই তিনি মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :—

অগ্নিময়ী মা গো আজি ডাকি সকলে মা!
জগৎ জোড়া ঐ যে আগুন এক ফিন্‌কি দে তার মা!
ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মরা প্রাণ উঠবে জ্বলে,
রুদ্র দম্ভে তেজোবলে
পুড়ে হব সোনা!
বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ
ঐ আগুনে মা করব ধ্বংস
পাষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখব না!
ওগো মা, মা, মা!

বহু সভায় অশ্বিনীকুমার বরিশালের অধিবাসিগণকে বলিয়াছেন—'অত্যাচার যে করে, সে যেমন অন্যায় করে, যে সহ্য করে, সে-ও তেমনই অন্যায় করে। কেহ এক ঘা দিলে দশ ঘা ফিরাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইও না।' যাহারা সেই 'পাঁচশো বছর' নীরবে সকলই সহিয়া আসিয়াছে, সেই পতিত পরপদানত জাতির এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া অশ্বিনীকুমার বাঙ্গালায় বিপ্লববাদ প্রচার করেন নাই, গুপ্তহত্যা দ্বারা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতালাভের প্রয়াস তিনি নিতান্তই অসমীচীন মনে করিতেন। নব জাগরণের মাদনায় বরিশালের তরুণ চিত্ত যখন আন্দোলিত, তখনও আমাদের শাসকসম্প্রদায় পূর্ব্বের অভ্যাস, পূর্ব্বের ধারণা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নেটিভের কানে তাহাদের বরাবরকার দখলী স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে যাওয়াতেই গোটা কয়েক সাহেব মারার মামলা তখন হইয়াছিল। তাহার জন্য অশ্বিনীকুমারের শিক্ষা কতটা দায়ী, তাহা স্থির করিবার সময় এখনও হয় নাই। সরকারী দপ্তরে বোধ হয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইতে বিলম্ব হয় নাই।

অশ্বিনীকুমার বাল্যকাল হইতেই জনপ্রিয়। যৌবন হইতেই বরিশালের আপামর সাধারণ বিনা বিচারে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং জয়ধ্বনিতে তিনি স্ফীত, বিচলিত হইতেন না। সুরাটে যখন নরম ও গরম দলের কলহ বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তখন গরম দলের কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন—অশ্বিনীকুমারকেই কংগ্রেসের সভাপতিপদে বরণ করা হউক। তখন অশ্বিনীকুমারের নাম ভারতবিখ্যাত। তিনি সুরাটের রাস্তায় বাহির হইলেই চারিদিক্ হইতে বিরাট জনতা চীৎকার করিয়া উঠিত—"অশ্বিনীকুমার দত্ কি জয়!" অশ্বিনীকুমারের হাসি পাইত, তিনি বলিয়াছিলেন—"আর আমি মনে মনে বলিতাম, ভোলা কুকুরকী জয়।" এই জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি ধীর স্থির নির্ব্বিকার রহিলেও, পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামের ভাগ্যবিধাতার চিত্ত নিতান্তই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। বরিশালে বিলাতী মাল বিক্রয় হয় না, বরিশালের লোক বিলাতী মানুষের ধমকে নরম হয় না, বরিশালের লোক লাট সাহেবের সংবর্দ্ধনায় যোগ দেয় না, অতএব যে কোন উপায়ে বরিশালকে সায়েস্তা করিতে হইবে। আর তাহার একমাত্র উপায় অশ্বিনীকুমার দত্তকে বরিশাল হইতে স্থানান্তরে নির্ব্বাসন এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের Disaffiliation.

বরিশালবাসীরা করিয়াছিল বিলাতী বয়কট আর সুবে বাঙ্গালার অর্দ্ধেক মালিক ফুলার সাহেব বয়কট করিয়াছিলেন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে। অশ্বিনীকুমার দত্তের

স্কুলের ছাত্ররা আর সরকারী চাকুরী পাইবে না! চাকুরী-জীবী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভয়ের কথা আর কি হইতে পারে? তথাপি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কক্ষ ছাত্রশূন্য হইল না। ফুলারের হুকুমে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইল। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও পারিতোষিক তিনিই পাইলেন, কিন্তু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্মেণ্ট তাহাকে সরকারী বৃত্তি দিলেন না। বৃত্তির লোভে দেবপ্রসাদ বাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন না, তিনি কলেজ বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত ঝগড়া করিয়া বানরীপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টিও সরকারীহুকুমে অপাংক্তেয় হইয়াছিল। বানরীপাড়া স্কুলের মেধাবী ছাত্র শ্রীযুত মধুসূদন সরকারও ফুলারী বিচারে সরকারী বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও কোন সরকারী বিদ্যালয়ে নাম লিখাইয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজি হইলেন না; ব্রজমোহনের নিষিদ্ধ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন ফুলারের ভ্রূকুটিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি ত হইলই না, বরং ভাল ভাল ছাত্র আসাতে অধ্যাপকগণের উৎসাহবৃদ্ধি হইল। পরীক্ষার ফল আরও ভাল হইতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নথিপত্র খুঁজিলে বোধ হয় স্থির করা কঠিন হইবে না, ফুলার সাহেব ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিনাশসঙ্কল্পে সিনেটের কাছে চিঠি অথবা হুকুমনামা করে পাঠাইয়াছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সার আশুতোষ অশ্বিনীকুমারকে পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। অশ্বিনীকুমারের নিকট শুনিয়াছি, ভাইস-চ্যান্সেলার হইবার বহু পূর্ব্বে হাইকোর্টের উকীল ও সিনেটের সাধারণ সভ্য ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ব্রজমোহন কলেজের affiliation প্রাপ্তির সহায়তা করিয়াছিলেন। এতকাল পরে ফুলারের হুকুমে তিনি সহসা বরিশালের একমাত্র কলেজটিকে রসাতলে দিতে রাজি হইলেন না। লাট সাহেবের নালিশ বিনা তদন্তে গৃহীত হইল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে তদন্তে বোধ হয় প্রথম আসিলেন ডাক্তার পি, কে, রায়। বাঙ্গালী হইতেই বাঙ্গালীর ভয় বেশী। বিশেষতঃ আর এক জন বাঙ্গালী সাহেব ইতোমধ্যে ব্রজমোহন স্কুলের বিরুদ্ধে সরকারের বরাবর এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। আবার সাহেব-ঘেঁষা বলিয়া ডাক্তার রায়ের একটা বদনাম ছিল। সুতরাং বরিশালের লোকের মনে একটু উদ্বেগ হইল। ডাক্তার রায় কিন্তু ব্রজমোহন কলেজের পক্ষেই রিপোর্ট দিলেন। সরকারী কায শেষ হইয়া গেলে ডাক্তার রায় অশ্বিনীকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাদটা মিটাইয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। এই উপলক্ষে ডাক্তার রায়

প্রৌঢ় অশ্বিনীকুমার

সিবিলিয়ানপুঙ্গব লায়নের বিবাদের সূত্রপাত হয়। কানিংহাম লিখিলেন—"ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় বঙ্গদেশে থাকিতে বাঙ্গালী ছাত্ররা অক্সফোর্ডে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেন যায়, আমি বুঝিতে পারি না।" রাগবির বিখ্যাত হেড ম্যাষ্টার ডাক্তার আরনেড তাঁহার ছাত্রগণকে প্রকৃত খৃষ্টান ভদ্রলোকের উপদেশ শিক্ষা দিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অশ্বিনীকুমার প্রকৃত মানুষ গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই বোধ হয়, মহানুভব কানিংহাম অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্রজমোহনের যশঃ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।
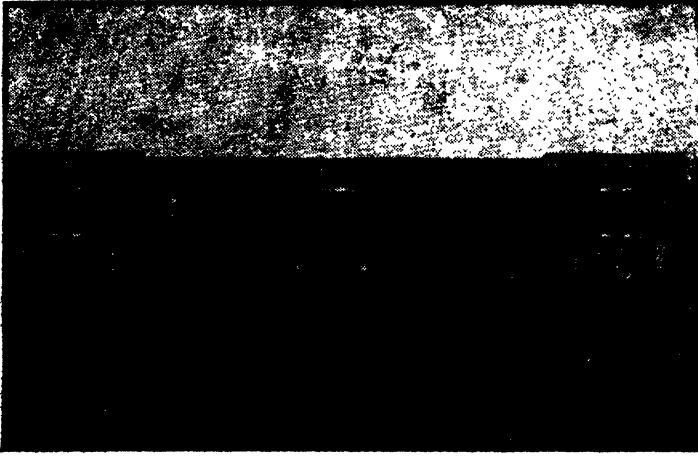
ব্রজমোহন কলেজ

পশ্চিমবঙ্গের যে সুবিখ্যাত নেতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, এখানে আর তাঁহার নাম নাই করিলাম। বোধ হয়, দ্বিতীয়বার সরকারী অভিযোগ তদন্তের ভার অর্পিত হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ জেম্‌স্ এবং অধুনা-বিস্মৃত অধ্যাপক কানিংহামের উপর। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমার সস্নেহে কানিংহামের নাম স্মরণ করিতেন।

যে সকল ইংরাজের চরিত্রমাহাত্ম্যে ইংরাজ সাম্রাজ্য আজিও টিকিয়া আছে, ইংরাজের সুবিচারের প্রতি কতক ভারতবাসীর বিশ্বাস আজিও বিচলিত হয় নাই, কানিংহামের আসন তাহাদের মধ্যে। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন্ বিষয়ের অধ্যাপনা করিতেন, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছি, বোধ হয় কেমিষ্ট্রি। অধ্যাপনায় তিনি যশঃ অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু সত্যের জন্য তিনি যেমন নির্ভীকভাবে ভারত সরকারের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে প্রকৃত মানুষ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অধ্যক্ষ জেম্‌স্ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের দোষ বাহির করা দূরে থাকুক, অজস্র প্রশংসা করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতেই তাঁহার সহিত

এইখানে কানিংহামের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি। তিনি বিলাতে থাকিতেই অশ্বিনীকুমারের নাম শুনিয়াছিলেন। বরিশালে আসিয়া অশ্বিনীকুমারের কার্য্যকলাপ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। এক দিন নির্জ্জনে বসিয়া অশ্বিনীকুমারের জীবনের সমস্ত কথা তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া লিখিয়া লইলেন। অশ্বিনীকুমারের জীবদ্দশায় কানিংহাম তাঁহার সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন না প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তখন প্রৌঢ় আর কানিংহাম যুবক। তিনি জানিতেন না যে,

ব্রজমোহন স্কুল *

তাঁহাকেই আগে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে।

যখন অশ্বিনীকুমার বিনা বিচারে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের তিন আইন অনুসারে নির্ব্বাসিত হন, তখন কানিংহাম এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার কোন বন্ধুর নিকট বিলাতে চিঠি লেখেন। এই বন্ধু পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন, তিনি কানিংহামের পত্র ভারত-সচিবের নিকট যথাসময়ে পেশ করেন। পত্রে কানিংহাম অশ্বিনীকুমারের পূতচরিত্রের বহু স্তুতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন, ইঁহাকে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করায় দেশের লোকের মনে ইংরাজ সরকারের প্রতি অভক্তি জন্মিয়াছে। ভারত-সচিব নাকি চিঠিখানা এখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়াছিলেন এবং এখানকার কর্ত্তারা চিঠিখানা পাইয়া কানিংহামকে পদত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কানিংহাম এই হুকুম মান্য করিতে রাজি হয়েন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, সরকার ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে বরখাস্ত করিতে পারেন, তিনি পদত্যাগ করিবেন না। তাঁহার চাকরী কাড়িয়া লওয়ার বোধ হয় অনেক বাধা ছিল, কিন্তু তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বদলী করা খুবই সহজ ছিল। কলিকাতা সহর হইতে তিনি বদলী হইয়া ছোটনাগপুরের অস্বাস্থ্যকর জঙ্গলে স্কুলের ইন্সপেক্টর হইয়া গেলেন। সেইখানেই আমাশয় রোগে তিনি অকালে পরলোকগমন করেন।

এই কথাগুলি অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনিয়াছি। অপ্রিয় সত্য বলিবার অপরাধে "শিখের ইতিহাস" প্রণেতা কানিংহামও মধ্যভারতে বদলী হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ম্যালিসন বলিয়াছেন, ডালহৌসীর কলমের এক খোঁচায় ঐতিহাসিক কানিংহামের প্রাণ গিয়াছিল। অধ্যাপক কানিংহামের প্রাণও কাহার কলমের খোঁচায় গিয়াছিল কিনা জানি না, অনুসন্ধান করিয়াও লাভ নাই। অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন, কানিংহামের জীবনের শেষ বক্তৃতায়ও তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আজ ব্রজমোহনের এক জন ছাত্র যদি তাঁহার মাতৃসম বিদ্যালয়ের এই বিদেশী বন্ধুর কথা স্মরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত করে, আশা করি, সহৃদয় পাঠকরা ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন না।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রকৃত বিপদ উপস্থিত হইল অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনের সঙ্গে। যত দিন অশ্বিনীকুমার ছিলেন, তত দিন ছাত্রদের প্রাণে কোন আতঙ্ক ছিল না। যত বড় কড়া ইন্সপেক্টরই আসুন, অশ্বিনীকুমারের সংস্পর্শে আসিলে তিনি আর তাঁহার এত সাধের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন অনিষ্ট করিতেন না। পি, কে, রায়, জেম্‌স্‌, কানিংহাম সকলেই ত বিদ্যালয়ের পক্ষে সুপারিস করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন অশ্বিনীকুমার নাই, এখন এই বিদ্যালয়কে সরকারের কোপ হইতে কে বাঁচায়? ছাত্ররা হতাশ্বাস হইল, তাহাদের অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হইলেন, অধ্যাপকরাও যে চিন্তিত না হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তখন তাঁহারা জানিতেন না যে, ভাইস চ্যান্সেলার সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পূর্ব্ববঙ্গের সরকারী ধমকে ভয় পাইবার পাত্র নহেন, তিনি ছোট লাটের হুকুমে Affiliation কাড়িয়া লইবেন না।

এই সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করিলেন অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ। রজনীকান্তের দিন কাটিত অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে। বিশেষতঃ পত্নীবিয়োগের পরে তিনি আর তেমন করিয়া বাহিরের কাযে মিশিতেন না। তাঁহার সন্তানদের স্বাস্থ্যও বরিশালে ভাল ছিল না, বরিশালেই তিনি তাঁহার পত্নীকে হারান, বরিশাল তাঁহার জন্মভূমি নহে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহা তাঁহার বিদ্যার অনুপাতে নিতান্তই অল্প, কেবল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ বশতঃই তিনি বরিশালে রহিয়া গিয়াছিলেন। কলেজের আফিসসংক্রান্ত কায একরকম ভাইস প্রিন্সিপালের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক গাদা বই লইয়া কলেজে আসিতেন, লাইব্রেরী হইতে আর এক গাদা কেতাব লইয়া বাড়ীতে ফিরিতেন। ছাত্ররা তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইত, তাঁহার সরল সস্নেহ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে তাহারা পিতার মত ভালবাসিত, ভক্তি করিত। কিন্তু এই আপন-ভোলা অধ্যয়নশীল মানুষটি যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা তখন তাহারা অনুমানও করিতে পারে নাই। অশ্বিনীকুমার মানুষ চিনিতেন, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও কলেজটাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, এমন লোকের উপরই কলেজের ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

স্বদেশীর সময় রজনীকান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ্য সভায় পাঠ করিয়াছিলেন, সে সকল তাঁহার পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক। বরিশালের কনফারেন্স ভাঙ্গার পর ইংরাজের আদালতে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রহৃত হইয়াও আমি নালিশ করি নাই, কারণ, ইংরাজের ন্যায়নিষ্ঠায় আমার আস্থা নাই।' তখন বরিশালবাসী তাঁহার নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়াছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেই একান্ত সঙ্কটের দিনে আবার রজনীকান্ত গ্রন্থরাশির মধ্য হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন। ছাত্ররা বলাবলি করিতেছে, কখন্ কলেজ উঠিয়া যায়, তাহার ঠিক নাই, তাহারা ট্রান্সফার চাহে। রজনীকান্ত তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—"তোমরা ট্রান্সফার নিও না, নিশ্চিন্ত হইয়া পড়াশুনা কর, কলেজ থাকিবে। যৌবনে বাঁকিপুরে রামমোহন রায় একাডেমি স্থাপনের জন্য মাসিক ১০ টাকা বেতনে কায করিয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে আবার ১০ টাকা বেতনে খাটিব, কিন্তু ব্রজমোহন কলেজে উঠিয়া যাইতে দিব না।" এক জন মানুষের দৃঢ়তায় ব্রজমোহন কলেজ রক্ষা পাইল। সরকারী চেষ্টা দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হইল। বাঙ্গালা দেশে বিনা বিজ্ঞাপনে খাঁটি জিনিষও কাটে না। এই কলিকাতা সহরেই জ্ঞানবীর পরমত্যাগী রজনীকান্ত নীরবে শিক্ষকতা করিতেছেন। কিন্তু কয় জন তাঁহার খবর রাখে?

ব্রজমোহন বিদ্যালয় তুলিয়া দিবার পথে কিছু বাধা ছিল, কিন্তু বরিশালের প্রাণ অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসিত করা ছিল নিতান্তই সহজ। সরকারের হাতে ১৮১৮ সালের ৩ আইন ছিল, আর নূতন আইন করিয়া লইতেই বা কত দিন? কি অপরাধে অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহা জানি না। ৩ আইনের ধারায় অপরাধ জানাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। কেহ কেহ বলেন, অশ্বিনীকুমারের যে ডায়েরীখানা চুরি গিয়াছিল, তাহাতেই বোধ হয়, কোন অপরাধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জানি না সত্য কি না—ম্যাটসিনির যৌবনকালে ইটালীতে To think politics was a crime, রাজনীতি চিন্তা করাও অপরাধ ছিল। যদি সরকারী কোন আফিসে সে ডায়েরীখানা থাকে এবং যদি কখনও তাহা পাওয়া যায়, তবে ইহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা যাইবে। এক জন যুবক এই ডায়েরী অপহরণ করিয়াছিল বলিয়া অশ্বিনীকুমারের আত্মীয়রা সন্দেহ করিতেন, ইহার অল্পকাল পরেই এই যুবক পুলিস বিভাগে মোটা মাহিনার চাকুরী পাইয়াছিল। ইহাও শুনা গিয়াছে যে, অশ্বিনীকুমার না কি একজন গুর্খা সৈনিকের রাজভক্তি বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সরকারের ইহাই ছিল প্রকৃত অভিযোগ। যাঁহারা অশ্বিনীকুমারকে একটুও জানেন, তাঁহারা এই অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না। যিনি কোন কথা কখনও গোপন রাখিতে জানিতেন না, তিনি যাইবেন ষড়যন্ত্রের কুটিল পথে? অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে একটা চুরি হইয়াছিল। চতুর তস্কর অধ্যাপক মহাশয়ের গৃহিণীর অলঙ্কারের সহিত ভুল করিয়াই হউক, অথবা তাড়াতাড়িতেই হউক, স্বদেশ-বান্ধব সমিতি সম্পর্কীয় কতকগুলি কাগজপত্রও চুরি করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এই চুরির সহিতও অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইহার সকলই অনুমান। সত্য কথা জানিবার উপায় নাই। নির্ব্বাসনের ঠিক দুই দিন আগে অশ্বিনীকুমার খবর পাইয়াছিলেন, ৩ আইনের পরোয়ানা আসিতেছে। তিনি প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন।

বেলা ১০ টা কি ১১ টার সময় কয়েক জন ইংরাজ কর্ম্মচারী কয়েক জন দেশীয় সিপাহী লইয়া যখন অশ্বিনীকুমারের বাড়ীতে উপস্থিত, তখন তিনি জগদীশবাবুর বাসায় ছিলেন। খবর পাইয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন। কেমন করিয়া সমগ্র বরিশালে রাষ্ট্র হইল, অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে পুলিস আসিয়াছে দেখিতে দেখিতে গৃহপ্রাঙ্গণ লোকারণ্য হইয়া গেল। বাড়ীতে তখন ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে, ক্ষুব্ধ জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, অশ্বিনীকুমার যদি বিপ্লববাদী হইতেন, তখন তাঁহার এক ইঙ্গিতে ঐ সামান্য কয়েক জন শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীর ভাগ্যে কি ঘটিত কে বলিতে পারে। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমস্ত গুছাইয়া লইলেন, গ্রন্থের মধ্যে লইলেন, খুব বড় বড় অক্ষরে ছাপা একখানা শ্রীমদ্ভাগবত। বাহির হইবার পূর্ব্বে ভিতরের কক্ষের দিকে একবার মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"লাজপত রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ তাহাই।" অশ্বিনীকুমারকে লইয়া সাহেবরা যখন সিঁড়িতে পা বাড়াইয়াছেন, তখন কোথা হইতে এক পাগল এক নরকপাল লইয়া আসিয়া উপস্থিত। সাহেবের মুখের সামনে মড়ার মাথা তুলিয়া পাগল উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এ অধর্ম্ম ভগবান্ বেশী দিন সহিবেন না। দুই দিন পরে পরিণাম যাহা হইবে, তাহা আমার হাতে দেখিয়া লইও।"

তার পর অশ্বিনীকুমার গাড়ীতে উঠিলেন। সহসা

দ্বিপ্রহরের সূর্য্য কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মেঘাচ্ছন্ন হইল, সেই বিরাট জনতা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, আর সেই মহাশব্দে ভীত অশ্ব একেবারে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। তার পর আবার গাড়ী ছুটিল, পশ্চাতে সেই জনতা। সমস্ত বরিশাল সে দিন নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল। সেইখানে তাহারা আর এক দুঃসংবাদ শুনিল, কেবল অশ্বিনীকুমার নহেন, তাঁহার সুদক্ষ সহকারী অধ্যাপক সতীশচন্দ্রও বন্দী। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরহবিধুর নন্দ-পুরবাসীদিগের প্রাণে কি ব্যথা বাজিয়াছিল, তাহা বরিশালবাসীরা সে দিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল। ব্যাকুল নরনারী কেমন করিয়া অক্রূরের রথের পশ্চাতে ছুটিয়াছিল, তাহা সে দিন নদীর তীরপথে ষ্টীমারের অনুসরণে ধাবমান উদ্‌ভ্রান্ত বরিশালবাসিগণকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন। সমস্ত সহর সে দিন অনাহারে কাটাইয়াছিল। কেহ কেহ নদীতীর হইতে ঘরে ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিল, কেহ কেহ সে দিন ঘরে ফিরিল না, জ্ঞানবুদ্ধিহীন হইয়া সেই নদীতীরেই বসিয়া রহিল। কেবল বাঙ্গালী নহে, অশ্বিনীকুমারের এ বিয়োগব্যথাকাতর এক জন হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালা দুই দিন উপবাসের পর শয্যাত্যাগ করিয়াছিল। বহুদিন পরে সে যখন জানিতে পারিল, অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌর কারাগারে, তখন সে দেশে ফিরিয়া ৮০ মাইল হাঁটিয়া অশ্বিনীকুমারের খোঁজ লইতে গিয়াছিল। সঙ্গে তাহার বড় কষ্টে সঞ্চিত গুটি কয়েক টাকা লইয়াছিল। উৎকোচ না পাইলে নিষ্ঠুর কারারক্ষীরা তাহাকে অশ্বিনীকুমারের খবর যদি না দেয়। এই ব্যক্তি বন্দী অশ্বিনীকুমারের মুক্তির জন্য তাঁহারই নামে পুরি-তরকারির ভোগ মানত করিয়াছিল।

দীর্ঘনির্ব্বাসনের পরে অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে ফিরিয়া
অধ্যাপক কা... আমরা তাঁহার নির্ব্বাসনকাহিনী জানিয়াছি-
গিয়াছিল কিনা জা... ন শ্যামবাবুর Sorrows & Solitude
অশ্বিনীকুমার বলিয়াছে... ঠাকুরতার নির্ব্বাসনের কথা বাহির
তায়ও তিনি ব্রজমোহন ...গকে তাঁহার নির্ব্বাসনের কাহিনী
আজ ব্রজমোহনের এক জ... লাম। তিনি হাসিয়া বলিতেন,
লয়ের এই বিদেশী বন্ধুর কথা শু... ত ত তেমন কিছু হয় নাই,
করে, আশা করি, সহৃদয় পাঠক... ই ত অনুভব করি নাই।"
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রকৃ... বোধ হয়, কেবল অশ্বিনী-
অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনের সঙ্গে।

তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলিবার অধিকারী আমি নহি, তাহার বিশেষ সংবাদও আমি জানি না, সে সাধনাও আমার নাই। সে কাযের যোগ্য অধিকারী পূজ্যপাদ জগদীশচন্দ্র, বন্ধুর জীবনকাহিনী আমাদিগকে কখনও বলিবেন কি না জানি না। তবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, বিভিন্ন সময়ে অশ্বিনীকুমারকে একেবারে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বলিয়া মনে হইয়াছে। তিনি যখন অধ্যাপনা করিতেন, তখন তিনি এক মানুষ আর যখন তিনি ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তখন তিনি একেবারে আর এক মানুষ। অধ্যাপনার সময় তিনি যুক্তি-তর্ক সকলের বিচার করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মালোচনার সময় চলিতেন সরল বিশ্বাসের পথে। এক দিন তিনি জগদীশ বাবুর বাসায় হিন্দী ভক্তমাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সে দিনকার বিষয় ছিল—মীরাবাঈ! মীরাবাঈর কাহিনী পড়িতে পড়িতে অশ্বিনীকুমারের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। শ্রোতাদেরও অনেকেরই চক্ষুর পাতা আর্দ্র। এমন সময়ে অশ্বিনীকুমার পড়িলেন—অতঃপর মীরাবাঈ উদয়পুরে ফিরিয়া গেলেন। মীরাবাঈর সময়ে উদয়পুরের অস্তিত্ব ছিল না, মীরাবাঈর বহু পরে উদয়সিংহ কর্ত্তৃক উদয়পুর নগর স্থাপিত হয়। এ রকমের অনেক ভুল ভক্তমালের পাতায় পাতায় পাওয়া যাইবে। কেন না, গ্রন্থকার ভক্ত ছিলেন, ঐতিহাসিক ছিলেন না, তাঁহার নিকট সন, তারিখের কোন মূল্য নাই। শ্রোতাদের মধ্যে অশ্বিনীকুমারের এক জন স্নেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন। ইনি অশ্বিনীকুমারের উৎসাহেই ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। দিন কয়েক পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার ইঁহার সঙ্গে ভক্তমালবর্ণিত মীরাবাঈর উপাখ্যানের অনৈতিহাসিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ছাত্রটি এ দিনও সেই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ইহাকে এখান হইতে সরাইয়া দেও, এ স্থান ঐতিহাসিকের জন্য নহে।" ছাত্রটি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন অধ্যাপক অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে, আর ভক্তমাল পাঠ করিতেছিলেন ভক্ত অশ্বিনীকুমার। এই ভাবে নিজেকে বহু করিবার ক্ষমতাই অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসনের সময় solitude অনুভব করিতে দেয় নাই।

অশ্বিনীকুমার ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কর্ম্মবিমুখ ভক্তির

অনুমোদন করেন নাই। তিনি সংসারী ছিলেন, সংসারের জীবের হিতেই ত জীবনপাত করিয়া গেলেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। বিবাহিত হইয়াও তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। সাধারণ জীবনে তিনি আনন্দমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহাকে আনন্দের একটা জীবন্ত-উৎস বলিলেও চলে। যাহা অপরের নিকট দুঃসহ যন্ত্রণা, তাঁহার নিকট তাহাও পরিহাসের বিষয়। বহুমূত্র রোগে দেহে ভয়ানক দাহ হইত—তিনি বলিতেন—"হইবে না? শরীরটা হইয়াছে একটা চিনির কল—একটু গরম না হইলে, চিনি তৈয়ার হইবে কেন?" যে অবস্থায় অন্য রোগী শয্যাত্যাগ করিতে পারে না, সে অবস্থায়ও তিনি চারি পাঁচ মাইল হাঁটিয়া বেড়াইতেন। চিকিৎসকরা আশ্চর্য্য হইত, তিনি হাসিয়া বলিতেন—"আনন্দে আছি যে।" ছাত্রবন্ধুদিগের নিকট বলিতেন—"ওরে, আমিও তোদের সমবয়সী রে, আমার বয়স মাত্র সতেরো বৎসর।" এই আনন্দ, এই পরিহাসপ্রিয়তা তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই; তাই নির্ব্বাসনের সময়ে তিনি কোন ক্লেশ—কোন দুঃখ অনুভব করেন নাই।

লক্ষ্ণৌর জেলে বসিয়া অশ্বিনীকুমার অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেন, ভগবদারাধনা করিতেন, আর মনের ভাব অনেক সময়ে গানের আকারে লিপিবদ্ধ করিতেন। বোধ হয়, এই সময় ১৮টি ১৯টি গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কখনও নীরব রজনীতে বিমল জ্যোৎস্না দেখিয়া ভাবমত্ত অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছেন—

ঐ জ্যোৎস্না আমি খাব!
ঐ জ্যোৎস্নার ঠাকুরকে নিয়ে
জ্যোৎস্নায় আমি শোব!

কখনও মেঘের আড়াল হইতে কোন চিরপরিচিত আনন্দস্বরূপের সন্ধান পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—

মেঘের আড়ালে থেকে উঁকি মারে কে?
এ যে চিনি চিনি চিনি করি, আবার
চিনি নাও যে!

তার পরে—

ও যে চিরদিনের অচিন চেনা
এই বুঝি রে সে!

চিরকিশোর নন্দকিশোরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দী অশ্বিনীকুমার কখনও বা প্রশ্ন করিয়াছেন—

কভু কি ফুরাবে না রে সতেরো বছর তোর

আবার এক নিরভ্র জ্যোৎস্নামত্তা যামিনীতে নীরব কারাকক্ষে বসিয়া দুরাগত বংশীধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ ভক্ত তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

বিনোদিয়া, তুই কি ঐ বাজাস্ বাঁশী তোর?
মরমে গেল যে ধ্বনি প্রাণ হ'ল ভোর।
সৃষ্টির পাড়েতে বসি, বাজাস্ তুই মোহন বাঁশী,
কত কালের কথা আসি পশে প্রাণে মোর।
সেই সৃষ্টির আগের কথা, যেথা নাই "আমি"
নাই "মমতা,"
মনে আসে সেই বারতা যার নাই ওর॥
ভাবিতে ভাবিতে তাই, বিদেহ যে হয়ে যাই,
সত্ত্ব রজর মুখে ছাই, খ'সে যায় ডোর।
তোর মধুর বাঁশীর তানে, কি হয় মন, মনই জানে,
আবার মন যে থাকে না মনে—ওরে মনচোর॥

ভগবান্‌কে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা আর একটি গানে বড় সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই,
কারে কব সে সব কথা? শুন্‌লে পাগল বল্‌বে ভাই।
চাঁদ এসে কোলে পড়ে, প্রাণে মধু নির্ঝর ঝরে,
হীরা মাণিক মরি মরি, হৃদয়মাঝে দেখতে পাই।
যারে দেখি সেই মিষ্টি, সবাই করে সুধাবৃষ্টি,
ঘুচে যায় ইষ্টি রিষ্টি, শত্তুর মিত্তির ভেদ নাই।
কি যেন কি পিয়ে পিয়ে, ভাবে হয় বিভোর হিয়ে,
ধূলোমুঠো হাতে নিয়ে, শত শত চুমো খাই॥

সত্য সত্যই এক দিন আনন্দবিহ্বল অশ্বিনীকুমার সেই কারাকক্ষে নৃত্য করিতে করিতে দেওয়ালে চুমা খাইয়াছিলেন। তিনি মাঘোৎসবের সময়ে শ্রীযুত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীকে লিখিয়াছিলেন—"এখানেও মাঘোৎসবের ঠাকুরের সত্তা অনুভব করিতেছি। Solitude তিনি কেমন করিয়া বোধ করিবেন? কিন্তু কোন দিনই যে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার চিত্ত এই সু-উচ্চ স্বর্গলোক হইতে নামিয়া আসে নাই, তাহা নহে। তিনি বলিয়াছেন—"এক দিন কেমন যেন হইল।

অনেক দিন অনাথের (ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার দত্ত) চিঠি পাই না। ভয়ানক কান্না পাইতে লাগিল। খানিকটা কাঁদিলাম। তার পরই বড় হাসি পাইল। ভাবিলাম, আমি কি পাগল? এ কি করিতেছি?

অশ্বিনীকুমারের ভক্তির স্বরূপ বুঝান বড় কঠিন। ভগবান্‌কে তিনি ভক্তি করিতেন, কিন্তু অবিশ্বাসীকেও ভালবাসিতে পারিতেন। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের আত্মজীবন তাঁহার অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি তাহার শেষ কয়েক ছত্র কত বার আমাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। যেখানে স্পেন্সার এই লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ কোথায় কি উদ্দেশ্যে ছুটিয়া যাইতেছে, স্থির করিতে না পারিয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন—সেইখানটা পড়িতে পড়িতে তিনি বলিতেন,—"এখানে কিন্তু আমাদের জিত! স্পেন্সারের মত প্রতিভা ও বুদ্ধি না থাকিলেও এ কথাটা বুঝিতে কিন্তু মুস্কিল হয় না।" তার পরই হাসিতে হাসিতে বলিতেন— "তাই বলিয়া মনে করিস না, ঠাকুর স্পেন্সারের উপর রাগ করিয়াছেন। তা কি তিনি পারেন? যে ভাল স্পেন্সার মানুষ; এখন তিনি হয় ত স্পেন্সারকে কোলে লইয়া বলিতেছেন— 'দেখ দেখি আমি আছি কি না?' গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক জন পরম ধার্ম্মিক মাসিক-সম্পাদক গর্ব্ব করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তিনি গিরিশ ঘোষের কোন নাটক পড়েন নাই। অশ্বিনীকুমার কেবল যে পড়িয়াছিলেন, তাহা নহে, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং গিরিশবাবুর বাড়ীতে গিয়া একটা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য প্রায় তিন ঘণ্টা বসিয়া ছিলেন। গিরিশবাবু বেলা বারোটার সময় বাড়ীতে ফিরিলে অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া পরিচয় না দিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলেন। সরল ভক্ত গিরিশকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

নির্ব্বাসনের কালেও অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তা হারান নাই। কারাগারে তাঁহার খাওয়ার ও চিকিৎসার বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। অনেক দামে অনেক ভাল ভাল মেওয়া তাঁহার জন্য অনেক দূর হইতে আমদানী হইত। তাঁহার সামান্য ইচ্ছা পূর্ণ হইতেও দেরী হইত না। তাই তিনি রহস্যভাবে লিখিয়াছিলেন—

আমায় সখের কয়েদী করেছে,
খাবার শোবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।
পূরব-জনমে যেন
কার গো সখের ময়না ছিনু,
নবাব ছিল সে এই লক্ষ্ণৌ,
তাই হেথা এনেছে।
ছিল নবাব সেবারে যে,
এবারে লাট হয়েছে সে,
সোনার পিঞ্জর আমার
গোরা-বারিক বনেছে।
সেই সেই সুখাদ্য নানা,
সেই কদলী সেই বেদানা,
সেই পুরানো টানে এসে,
আবার জুটেছে!
তখন যা বলাতে তাই বলিতাম,
যা শোনাতে তাই শুনিতাম,
সোনাকানী ময়না ব'লে
তাই আদর করেছে।
এখন, যা বলাবে তাই বলিব,
যা শোনাবে তাই শুনিব,
সে দিন ত নাই রে যাদু
সে বুদ্ধি ঘুচেছে॥

লক্ষ্ণৌর ইংরাজ জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট মাসে মাসে জেলে অশ্বিনীকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে কখনও কখনও বাহিরের দুই একটা সংবাদও দিতেন। পার্লামেণ্টে তাঁহার মুক্তির জন্য কি-আন্দোলন হইতেছে, তাহা ইঁহাদিগেরই নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন। ইঁহারা এক দিন অশ্বিনীকুমারকে ধরিলেন—"এই গৃহপ্রাঙ্গণে তোমাকে একটা বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে। পরে আমরা বলিতে পারিব, এখানে অশ্বিনীকুমার দত্তের রোপিত একটা গাছ আছে। মহাত্মা (great) অশ্বিনীকুমার যখন এখানে ছিলেন, তখন তিনি নিজের হাতে এই গাছটা লাগাইয়াছিলেন।" অশ্বিনীকুমার প্রথমতঃ রাজি হইলেন না,— বলিলেন,—"আমি নিঃসন্তান। আমার কোথাও কোন চিহ্ন থাকে, ইহা ভগবানের অভিপ্রায় নহে।" সাহেবরা কিছুতেই ছাড়িবেন না, অগত্যা অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, কি গাছ লাগাইতে হইবে?" সাহেবরা বলিলেন—"যে গাছ তোমার পছন্দ হয়।" অশ্বিনীকুমার

হাসিয়া বলিলেন, "আমি সরিষা গাছ লাগাইব।" মুক্তির পরে বলিয়াছেন—"ভাবলাম, যাই ব্যাটাদের ভিটেয় সরষে বুনে।"

নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়াই অশ্বিনীকুমারকে আবার ব্রজমোহন কলেজ লইয়া ব্যস্ত হইতে হইল। বরিশাল তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে উৎফুল্ল; কিন্তু তিনি কলেজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বিগ্ন। কলিকাতায় শুনিয়া গিয়াছিলেন, এবার কেবল পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট নহেন, ভারত সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতেছেন—ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে শায়েস্তা করিতে হইবে, অশ্বিনী দত্তের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এই বিদ্যালয়টি গড়িয়া তুলিতেই অশ্বিনীকুমারের জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি যৌবনে সরকারের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থ-সাহায্যও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এবারে সেই সাহায্য বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সরকারী শাসন মানিয়া চলিতে হইবে, কলেজের তত্ত্বাবধানভার এক কমিটির হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে—যাহার সভাপতি হইবেন এক জন সরকারী কর্ম্মচারী। অশ্বিনীকুমারের নিজের ইচ্ছা ছিল—এ প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করিবেন, কলেজ তুলিয়া দিবেন, অন্ততঃ তাঁহার পিতার নাম আর কলেজের সহিত সংযুক্ত থাকিতে দিবেন না। তিনি বলিলেন—চিরকাল বেসরকারী কলেজ চালাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জীবনের সায়াহ্নে দেখিলাম, ইহা আর চলে না। বেশ, সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিলাম। বরিশালের লোকেরা অন্য কলেজ স্থাপন করুক। কিন্তু তাঁহারা—সহকর্ম্মিগণ, বন্ধুগণ, কলেজের অধ্যাপকগণ কেহই এই সঙ্কল্পের সমর্থন করিলেন না। অধ্যক্ষ রজনীকান্ত বলিলেন—'আমি এত দিন খাটিয়াছি ব্রজমোহন কলেজের জন্য। কলেজের নাম পরিবর্ত্তিত হইলে আমি এখানে থাকিব না।' অবশেষে অশ্বিনীকুমারকে সরকারের সঙ্গে রফা করিতে হইল। সে রফার প্রথম বলি হইলেন—রজনীকান্ত নিজে। দ্বিতীয় বলি—নির্ব্বাসনপ্রত্যাগত সতীশচন্দ্র। তৃতীয় বলি—ব্রজমোহন স্কুলের তিন জন শিক্ষক। মাতার মৃত্যুতে অশ্বিনীকুমার অশ্রুমোচন করেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের বিদায়ের দিনে তিনি বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার Round Table এত দিনে সত্য সত্যই ভাঙ্গিয়া গেল! অশ্বিনীকুমারের সহিত সরকারপক্ষের প্রথম যে সব সর্ত্তে আপোষ হয়, বলা বাহুল্য, তাহা অক্ষুণ্ণ রহে নাই। কেমন করিয়া বাঙ্গালী প্রথম সবজজের স্থলে ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট কলেজ কমিটির সভাপতি হইলেন, কেমন করিয়া সরকারপক্ষের নূতন নূতন জিদ অশ্বিনীকুমারকে মানিতে হইল, তাহার ইতিহাস আমার জানা নাই। সিবিল সার্ব্বিসের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ তাহা জানেন। স্যার চার্লস বেলি, স্যার বীটসন বেল ও লর্ড কারমাইকেল ইংরাজের রাজনীতির এই বিজয়-কাহিনী ভাল করিয়া বলিতে পারিবেন। শুনিয়াছি, বেল সাহেব আপত্তি না করিলে কলেজটি সরকার একেবারে খাস করিয়া লইতেন। নূতন ব্যবস্থায় ব্রজমোহন কলেজ নামে মাত্র জীবিত রহিয়াছে, কিন্তু সে পুরাতন ব্রজমোহন বিদ্যালয় আর নাই। অশ্বিনীকুমার মৃত্যুশয্যায়ও কলেজের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বরিশালবাসীর যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তবে কলেজ সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের শেষ ইচ্ছা প্রতিপালনে তাঁহারা পরাঙ্মুখ হইবেন না।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ভগ্নস্বাস্থ্য অশ্বিনীকুমার বরিশালে ছিলেন না। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বরিশালের হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছিল। আর যে তিনি কখনও বরিশালে ফিরিতে পারিবেন, ইহা কেহ আশা করিতে পারে নাই। কিন্তু বরিশালে শেষ কন্‌ফারেন্সের সময় অশ্বিনীকুমার দূরে থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহভাজন শিষ্যগণের একান্ত অনুরোধ না মানিয়া পীড়িত দুর্ব্বল দেহে আবার বরিশালে ফিরিলেন। জীর্ণদেহ সে পরিশ্রম আর সহ্য করিতে পারিল না। তার পর একান্ত দুর্ব্বল দেহে বরিশাল ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে আসিলেন। এইখানেই তাঁহার তিরোধান হইল। বরিশালে ফিরিয়া গেল তাঁহার নশ্বর দেহের নশ্বর অবশেষ ভস্মরাশি। এখন তাহাই বরিশালবাসীর একমাত্র সম্বল।

শেষ অবস্থায় আশাবাদের জীবন্তমূর্ত্তি অশ্বিনীকুমারের মুখেও কখন কখন নিরাশার কথা শুনিয়াছি। কর্ম্মযোগ অসমাপ্ত রহিয়া গেল, লেখা হইল না। জীবন-প্রভাতে বরিশালে যে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে স্মৃতিও মাঝে মাঝে তাঁহাকে পীড়িত করিত। আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়া দিত তাঁহার শিষ্যদিগের আচরণ। তাহাদিগকে কত যত্নে

শিক্ষা দিয়াছেন, কত মহান্ আদর্শ তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের নিকট কত আশা করিতেন, সে আশা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্রজমোহন কলেজের আদর্শ চূর্ণ হইয়াছে। ব্রজমোহন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। অথচ অশ্বিনীকুমার তখনও জীবিত ছিলেন। এক বৎসর আগে তাঁহার সেই প্রখর স্মৃতিশক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। যিনি অহরহঃ সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা, পার্শী, হিন্দী কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তিনি কিছু কালের জন্য পরমাত্মীয়গণের নাম স্মরণ করিতেও অক্ষম হইয়াছিলেন। যিনি মুহূর্ত্তকাল অলস থাকিতে পারিতেন না, তিনি শেষে একেবারে শয্যাগত হইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আমি এখন শুধু আছি—এ 'সৎ' এর অবস্থা।" ইহার উপর আবার বরিশাল হইতে এক একটা বিশ্রী খবর আসিত আর সেই বিরাট পুরুষের মহান্ হৃদয় অব্যক্ত যন্ত্রণায় মথিত হইত।

কিন্তু কর্ম্মের স্পৃহা তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। নির্ব্বাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করেন নাই। মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি বরিশালের সরকারী উকীল মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"নির্ব্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" কোন্ দেশে? "এই ভারতবর্ষে।" কোন্ প্রদেশে? "সোনার বাঙ্গালায়"। "কোন্ জিলায়?" "তাও আবার বলিতে হয়? বরিশালে। কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোক ত আর দেখিতে পাইতেছি না। এক জন ছিল, আপনি তাহাকে ফাঁসি দিয়াছেন।" "কে সে?" "আবদুল।" আবদুল দুর্দ্দান্ত দস্যু, নির্ম্মম নরহন্তা, কিন্তু সে অত্যন্ত নির্ভীক, ফাঁসির আগের রাত্রিতেও নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াছিল।

বরিশালের এখন একমাত্র ভরসা এই যে, বরিশালেরই কোন গ্রামে, বরিশালেরই কোন্ ঘরে আবদুলের মত নির্ভীক পিতার কোলে তেজস্বী কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার আবার আসিবেন। আবার তাঁহার নেতৃত্বে বরিশাল মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

পুরানো আসন

তোমারি লাগিয়া রেখেছি পাতিয়া পুরানো আসনখানি।
দেখ দেখ ঐ ভাঙ্গা সাজি ভ'রে রেখেছি কুসুম আনি॥
কত না যতনে গাঁথা ফুলহার,
ভেবেছিনু দিব চরণে তোমার,
নয়নের জলে ধোয়াবো চরণ, ঘুচাবো পথের গ্লানি।
তোমারি লাগিয়া রেখেছি পাতিয়া পুরানো আসনখানি॥

তড়িতের মত চকিতে আসিয়া,
কোথা গেলে ওগো স্বপনে ভাসিয়া,
হৃদয়ের রাজা কোথা সে আমার অজানা দেশের প্রাণী!
তোমারি লাগিয়া রেখেছি পাতিয়া পুরানো আসনখানি॥

কত ফুল তুলি হৃদয়-মাঝারে,
রেখেছিনু সখা সাজাতে তোমারে,
কে হরিল আহা! দুখিনীর তাহা অকালে অশনি হানি!
তোমারি লাগিয়া রেখেছি পাতিয়া পুরানো আসনখানি॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

নবীন জাপান

জাপানী দোকান ও গুদামঘর।

ভূমিকম্পে জাপানের সর্ব্বনাশ হইয়াছে— প্রসিদ্ধ নগর টৌকিও এবং শ্রেষ্ঠ বন্দর ইয়োকোহামা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, সে কথা সত্য; কিন্তু উদ্যমশীল, বলদৃপ্ত এবং বর্দ্ধমান জাপানীরা যে বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ জাতিগণের অন্যতম, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই জাতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীরা নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, সকলেই জাপানের শক্তি সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয়। বাস্তবিক জাপান যে এসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং পাশ্চাত্য শক্তিশালী জাতিগণের সমকক্ষ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অচিরে জাপানীরা টৌকিও এবং ইয়োকোহামার শ্মশানে আবার সোনার দেউল গড়িয়া তুলিতে পারিবে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

ডাক্তার উইলিয়ম্ গ্রিফিস্ নামক জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপানের 'ইম্পিরিয়াল' (রাজকীয়) বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। সেই সূত্রে তিনি জাপানী জাতিকে নানাদিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। কেমন করিয়া জাপানীরা অল্পকালের চেষ্টায় এমন শক্তি ও বিত্তশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জাপানীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সন্ন্যাসী জাতিরূপে এসিয়ার এক প্রান্তে পড়িয়া ছিল; কিন্তু অকস্মাৎ কিরূপে তাহারা এমন পরাক্রান্ত এবং ব্যবসায়ী জাতিতে পরিণত হইল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। জাপানের এই অভ্যুত্থান বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। বেশী দিন ধরিয়া নহে, এক জন মানুষের জীবদ্দশায় এই অঘটন সংঘটিত হইয়াছে। এক শতাব্দীর মধ্যে জাপানের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ এবং ঐশ্বর্য্য বিশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপ আকস্মিক অভ্যুত্থানের কারণ কি? ডাক্তার গ্রিফিসের মতে ইহার দুইটি হেতু আছে। আধ্যাত্মিক ও বাহ্য—উভয় দিক্ দিয়া জাপান শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। প্রথম ও প্রধান কারণ 'ওইওমি' (Oyomei) দর্শন।

ময়াজিমা নগরের রাজপথে আলু বিক্রয়ের দৃশ্য।
এই নগর জাপানের প্রসিদ্ধ দ্বীপ মিয়াজিমাতে প্রতিষ্ঠিত জাপানীদিগের ইহা প্রধান তীর্থক্ষেত্র
এই তীর্থে মানবের মৃত্যু ও জন্মগ্রহণ নিষিদ্ধ

উল্লিখিত যুগে য়ুরোপের সহিত জাপানের ঘনিষ্ঠতাও ঘটিয়াছিল। সে ঘনিষ্ঠতা বা সংযোগ অবিচ্ছিন্নভাবেই ছিল। নাগাসাকির ওলন্দাজদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় এই যোগসূত্র ছিন্ন হইতে পারে নাই। ৭০ বৎসর ধরিয়া পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয় বণিক, সামরিক কর্ম্মচারী ও ইঞ্জিনীয়ারদিগের সাহচর্য্যে থাকায় জাপানী ভাষা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, সামরিক বিজ্ঞান ও আহারপ্রণালীতে তাহাদিগের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। ওলন্দাজদিগের জীবনযাত্রার যাবতীয় বিষয়ের প্রভাবই জাপানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জাপানীরা সকল বিষয়েই তাহাদিগের অনুকরণ করিত।

ডাক্তার গ্রিফিস যখন জাপান রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় জাপানের বহুদিন হইতে এই দর্শনের প্রভাব জাপানীদিগের মন হইতে চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়সের মতবাদকে সরাইয়া দিতেছিল। জাপানকে যাঁহারা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই 'ভক্তজনশ্রেষ্ঠাই' ওইওমি দর্শনের ভক্ত ছিলেন এবং পার্থিব কর্ম্ম-প্রবণতা তাঁহাদিগের চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই প্রভাব না থাকিলে আজ জাপান কখনই বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হইতে পারিত না। চীনদেশ হইতেই সপ্তদশ শতাব্দীতে ওয়াং ইয়াং-মিং দর্শন (জাপানী ভাষায় ইহাকে ওইওমি কহে) জাপানে আমদানী হয়। ক্রমে এই দর্শনের বিস্তার ঘটিতে থাকে। কেভাবে, প্রবন্ধে এই দর্শনসংক্রান্ত বিষয়ের বহু আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। জাপানী ছাত্রগণ ঐ সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে থাকে। ৫০টি বিভিন্ন কেন্দ্রে উল্লিখিত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। এই দর্শনবাদ যাহাতে লোকপ্রিয় হয়, সেজন্য প্রচারকগণ প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়াছিলেন। আড়াই শত বৎসর ধরিয়া এই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার পর নদীতে বন্যা আসিল, সমগ্রদেশ সেই প্লাবনে ভাসিয়া গেল। জাপানী জাতি পৃথিবীর মধ্যে শক্তিশালী বলিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আত্মপ্রাধান্য অর্জ্জন করিয়া লইল।

জাপানী সংবাদপত্র-বিক্রেতা, অবসরকালে সংবাদপত্র পড়িতেছে।

বিভিন্ন স্থানের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আত্মজীবনচরিত দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি তাহা পাঠে বুঝিয়াছিলেন যে, প্রত্যেকরই জীবনে ওলন্দাজদিগের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এক কথায় সমগ্র জাপান ওলন্দাজপ্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

জাপানে পাখা তৈয়ার প্রণালী।

শত শত জাপানী চিকিৎসক ওলন্দাজভাষা অধ্যয়ন করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় ঔষধ ব্যবহার করিত। নাগাসাকিতে ডাক্তার পম্‌পে ভ্যান্ মার্‌দার্‌ভুর্‌ট্‌ নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ চিকিৎসক একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় সুশিক্ষিত জাপানী সহকারী চিকিৎসকগণ কায করিত। ওলন্দাজ ও জাপানী শিল্পীরা মিশিয়া সেই সময় একখানি বাষ্পীয় পোতও নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

জাপান সমুদ্রে মার্কিণপোতসমূহ তিমিমৎস্য শীকার করিতে যাইত, নানাপ্রকারে বিপন্ন হইয়া মার্কিণগণ জাপান দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত। সেই সময় তাহাদের নিকট হইতেও জাপানীরা অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার অবকাশ পাইত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্ক হইতে রেনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড নামক জনৈক পোতপরিচালক জাহাজডুবী হইবার পর, নাগাসাকিতে আশ্রয় লাভ করেন। জাপানীরা তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগের শিক্ষকরূপে কিছুদিন তথায় অবস্থানও করিয়াছিলেন।

টোকিও নগরের টেলিফোনযন্ত্রে নারী কায করিতেছে।

প্রেসিডেণ্ট ফিলমোর যে নৌ-বহর গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার বন্দর হইতে প্রাচী সমুদ্রে যাত্রা করে। জাপানের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মাৎসুহিতো সেই স্মরণীয় বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত নৌ-বহর আমেরিকাজাত নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। কমোডোর পেরী ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের সহিত মিত্রতার বন্ধন দৃঢ় করিয়া লয়েন। নাগাসাকিতে তদুপলক্ষে জাপানের প্রথক শ্রমশিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল।

সিজুকা নামক স্থানে সেই বৎসরের প্রদর্শিত শ্রম-শিল্পজাত দ্রব্যাদির নমুনা রক্ষিত আছে। তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে, কৃষি ও সূক্ষ্ম কলাশিল্প সম্বন্ধে সে সময়ে জাপান আমেরিকার অনুকরণ করিত। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ১৮৭০ খৃঃ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওয়াসিংটন হইতে বৈজ্ঞানিক

ইয়োকোহামার রাজপথ—পাথরের রঙ্গালয়। এই বন্দর পেরী ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গঠিত করেন।

জাপানী নারীরা রেশমের গুটী হইতে রেশম বাহির করিতেছে।
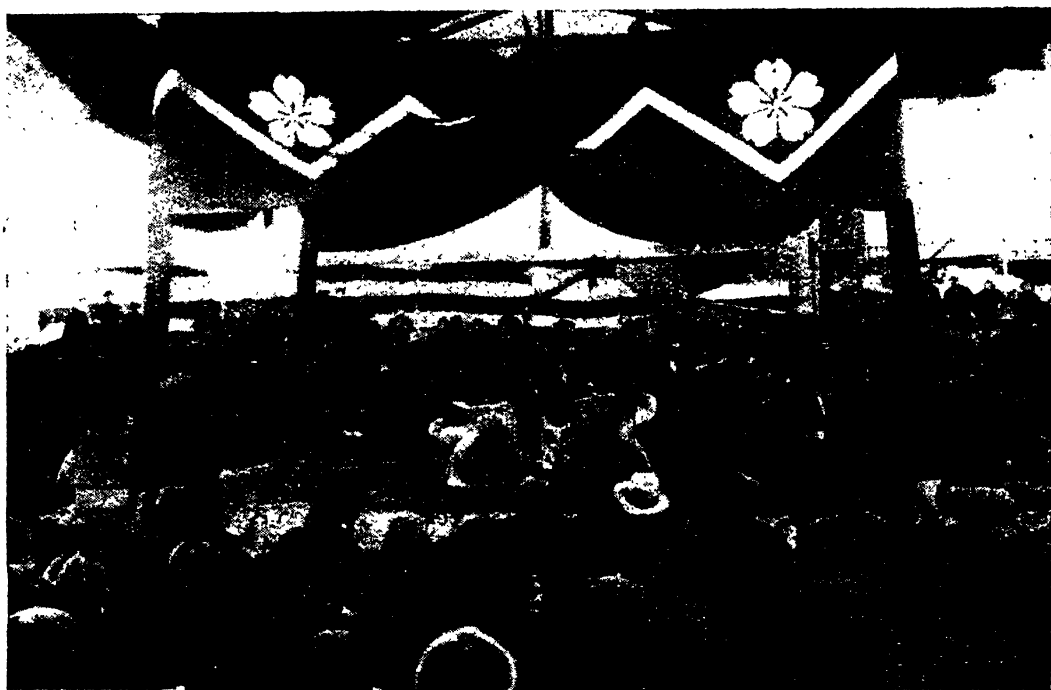
জাপানী পালোয়ান কুস্তি লড়িতেছে।

জাপানী চা-ক্ষেত্র।

জাপানী কৃষক শস্যবপন করিতেছে।

সাধন করিয়াছিলেন, উল্লিখিত ধর্ম্মপ্রচারকগণ আলোকচিত্র-গ্রহণ বিদ্যা প্রভৃতিও জাপানী-দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

জি, এফ, ভার্‌বেক্ নামক জনৈক ধর্ম্মপ্রচারক ৭টি বিভিন্নভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শীও ছিলেন—বিশেষতঃ নৌ-বহর-সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয় ছিল। মিঃ ভার্‌বেক্ জাপানী-দিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশদান নিরর্থক দেখিয়া তাহাদিগকে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতেন। জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়গঠন ব্যাপারে তিনি জাপানীদিগকে সমধিক সাহায্য করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতাতত্ত্বও তিনি জাপানকে সর্ব্বপ্রথম শিখাইয়াছিলেন। প্রতীচ্যদেশের আচার-ব্যবহার এবং নিয়মাবলীর সারভাগও তিনি তাহাদিগের কাছে বিবৃত করেন। পাশ্চাত্য দেশের

শিল্পীরা পুনঃ পুনঃ জাপানদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল। মার্কিণ মিশনারীরা (ধর্ম্মপ্রচারক) জাপানের উদ্বর্ত্তনের সহায় হইয়া-ছিলেন বলিয়া ডাক্তার গ্রিফিস্ অনুমান করেন। উল্লিখিত মার্কিণ ধর্ম্মপ্রচারকগণ প্রাকৃত-বিজ্ঞান ও নানাপ্রকার বিদ্যার অধিকারী ছিলেন। ডাক্তার জে, সি, হেপবরণ নামক জনৈক মিশনারী সর্ব্বপ্রথম একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষধাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার তত্ত্বা-বধানে জাপানীরা অস্ত্রচিকিৎসায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে থাকে। মিঃ এস্, আর, ব্রাউন নামক জনৈক ভাষাতত্ত্ববিদ্, ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিয়া জাপানী ও ইংরাজী ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য

পল্লীগ্রামে জাপানী শ্রমিক পণ্যদ্রব্য বহন করিতেছে

সভ্যতার স্বরূপ জানিবার জন্য তিনি সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবার জন্যও জাপানীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রতীচ্যদেশসমূহে যে সকল দূত প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহারই শিষ্যবর্গের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহুসংখ্যক মার্কিণ পাঠ্যপুস্তকের জাপানী অনুবাদ হয়।

জাপানী বালকবালিকা জাতীয় পতাকা হস্তে দাঁড়াইয়া।

জাপানবাসী বহুসংখ্যক বৈদেশিক জাপানীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাতে জাপানীরা শীঘ্র বৈদেশিক পদ্ধতিতে দক্ষ হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দলে দলে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বৈদেশিকগণ জাপানীদিগের শিক্ষার্থ সমবেত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন বিনা অর্থে আর শিক্ষাদান কার্য্য করিতেন না। জাপানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেজন্য জাপানকে বহু অর্থ প্রতি মাসে ব্যয় করিতে হইত।

উল্লিখিত শিক্ষক সম্প্রদায় জাপানের রেলপথ, আলোকস্তম্ভ, তাড়িতবার্ত্তাবহ, নৌবহর, পোতাশ্রয়, শ্রমশিল্প প্রভৃতির কারখানা ইত্যাদি নির্ম্মাণে সহায়তা করিয়াছিলেন। ডাক্তার গ্রিফিস্ স্বয়ং কারিগরী শিক্ষাগার এবং বৈজ্ঞানিক বিদ্যালয় সর্ব্বপ্রথম জাপানে স্থাপিত করেন।

মিঃ গ্রিফিস্ এক স্থলে লিখিয়াছেন, "জাপানী জাতির উচ্চাশা অত্যধিক ছিল, তাহাদের কর্ম্মক্ষমতাও সবিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা—বৈদেশিকগণ শুধু তাহাদের পরামর্শদাতা, বেতনভুক্ কর্ম্মচারী বা পথিপ্রদর্শক মাত্র ছিলাম। কায তাহারাই করিত, তাহাদের উৎসাহ অতুলনীয়। জাপানীরাই জাপানকে নূতন করিয়া গড়িয়াছে।

জনৈক মার্কিণ মিশনারী (মিঃ জোনাথান্ গবল) জাপানে জিন্‌রিক্‌স বা মানববাহিত গাড়ী অবিষ্কার করেন। এই যান এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুকৃত হইয়াছে।

জাপানে পূর্ব্বে বণিকসম্প্রদায়ের কোন সম্মান বা প্রতিপত্তি ছিল না। জনসমাজে বণিকরা অনাদৃত অবস্থায় কালযাপন করিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জাপান দেশ হইতে ভূস্বামিত্বপ্রথা উঠাইয়া দেয়। তখন হইতে বণিকদিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যবসায় উপলক্ষে যে কেহ দেশদেশান্তরে যাইতে চাহিত, জাপানী সরকার তৎক্ষণাৎ তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিতে লাগিলেন। উৎসাহিত হইয়া নবজাগ্রত বণিকসম্প্রদায় এসিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে বাণিজ্যকেন্দ্র বিস্তৃত করিতে লাগিল।

মিঃ গ্রিফিস্ এই বিষয়ের আলোচনাকালে লিখিয়াছেন;—"টোকিও নগরে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি গুপ্তসভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লববাদী

পদ্মবনে গ্রীষ্মের অপরাহ্ন।
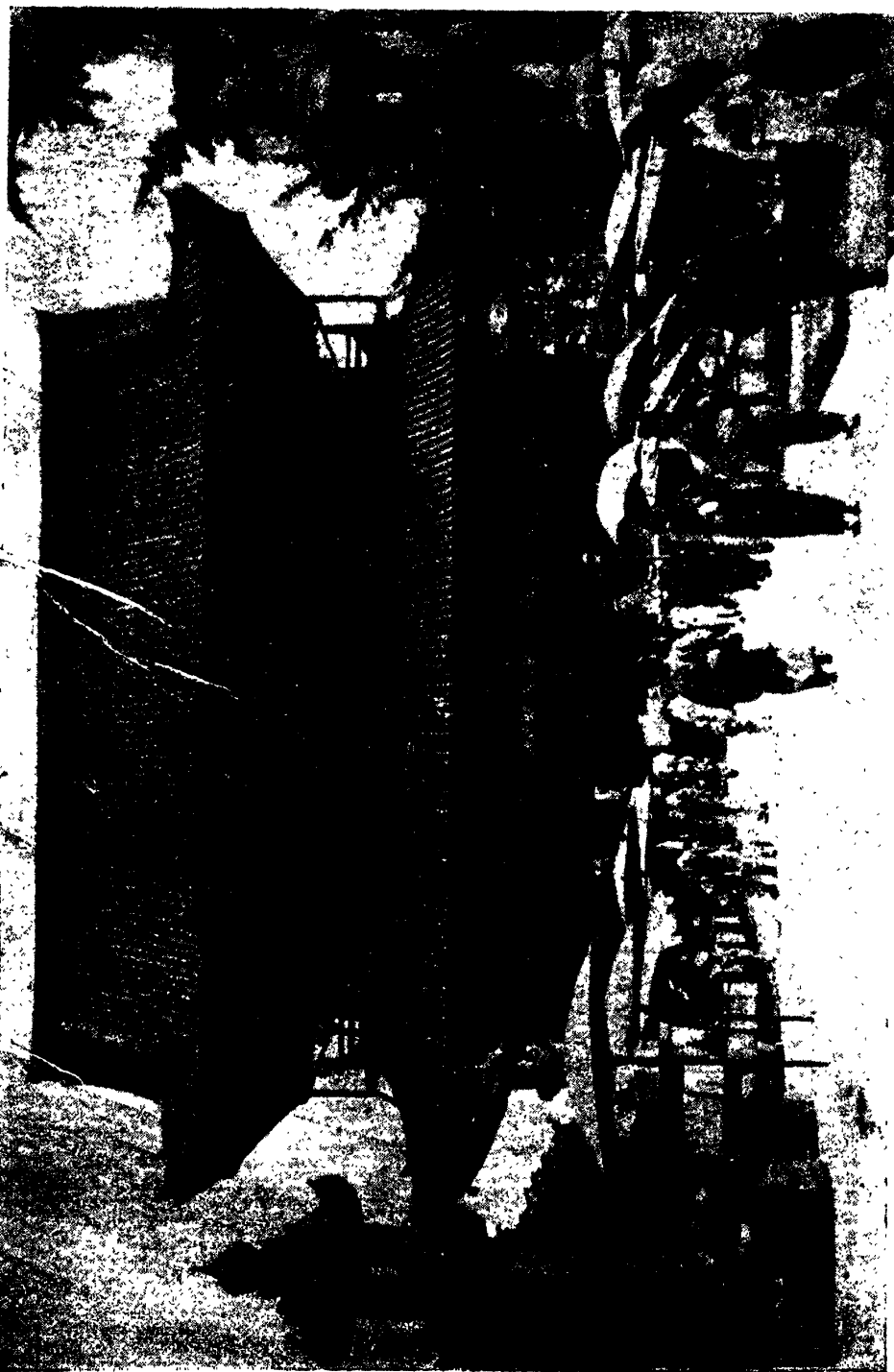
টোকিও আসাকুসা উদ্যানের অন্তর্গত মন্দিরের প্রবেশ-পথ।

নেতৃবর্গ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই সভার সম্বন্ধে জাপান ইতিহাসে কোনও উল্লেখ নাই, সরকারী বিবরণেও এ বিষয়ের কোন বর্ণনাও নাই। ডাক্তার ভার্‌বেক এই সভার কথা আমায় বলিয়াছিলেন। তিনি এই সভায় নিরপেক্ষ বিচারকরূপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। জাপানে তখন একটা বিষম সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া এই সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। সমস্যাটি এই—জাপান কি এখনও সামুরাই নীতি অবলম্বন করিয়া রণকৌশলী সামরিক জাতিরূপেই বিদ্যমান থাকিবে, অথবা তাহারা শ্রমশিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতিরূপে পৃথিবীতে পরিচিত হইবে? ওকুবো, ওকুমা এবং শিবুশাওয়া অধঃপতিত, উপেক্ষিত সম্প্রদায়কে উন্নত করিবার জন্য জীবনপাত করিয়াছেন; এখন সমুদ্রতরঙ্গের শীর্ষভাগে বণিক ও শ্রমশিল্পীরা বিরাজ করিতেছেন।"

বাণিজ্য ও শ্রমশিল্পের দিকে মনোনিবেশ করিয়াও জাপানীরা রাজ্যরক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন হয় নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে নৌবিদ্যা শিখিবার জন্য যুবক শিক্ষার্থীরা হলাণ্ডে প্রেরিত হইতেছিল। তবে বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানেই জাপানের রণতরী সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং জলযুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে বৃটিশ শিক্ষকই জাপানকে সমুন্নত করিয়াছিল। স্থলযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রথমতঃ ফরাসী, পরে জর্ম্মণ রণপণ্ডিতগণ জাপানী সৈন্যের যুদ্ধপ্রণালীর সংস্কারসাধন করেন। জাপান ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা জানেন যে, জাপানের প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি এডমিরাল টোগো দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজের নিকট জলযুদ্ধের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মার্কিণগণ জাপানীদিগকে জাতীয় শিক্ষায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিলেন। রাজস্ব সম্বন্ধে শিক্ষার ভার বেলজিয়ম গ্রহণ করিয়াছিল।

জাপানকে যাঁহারা নূতন গড়িয়াছিলেন (১৮৬৮ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত), তাঁহাদের মধ্যে ৪ জনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ৪ জনের মধ্যে ওকুবোর নাম সর্ব্বপ্রথম। তিনিই নবগঠিত জাপানের আত্মা বলিলেই হয়। কায়ওটো হইতে তিনিই টোকিওতে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করেন। জাপান সম্রাট মিকাডো এ যাবৎ পর্য্যন্ত যেন মেঘলোকেই অদৃশ্য অবস্থায় থাকিতেন।

সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী মন্দির।

ফুজিয়ামা গিরিশীর্ষ হইতে ইয়ামানাকা হ্রদের দৃশ্য।

জনসাধারণ তাঁহার দেখাই পাইত না। ওকুবো জাপান সম্রাটকে মানবরূপে জনসাধারণের নিকট সর্ব্বপ্রথম উপস্থাপিত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় জাপান সম্রাট প্রজার সুখ-দুঃখের অংশভাগী হইতে আরম্ভ করেন। ওকুবোর আর এক প্রধান কীর্ত্তি, তিনি বিনা যুদ্ধে জাপানকে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী করিয়াছিলেন।

কিডো বিরাট রাজনীতিক ছিলেন। তিনি মৌলিক চিন্তার দ্বারা রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিয়া রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে জাপানকে সুদৃঢ় করিতেছিলেন। ইটো তাঁহার চিন্তা-প্রণালীকে কার্য্যে পরিণত করিতেন, অর্থাৎ কিডো কল্পনায় উপায় উদ্ভাবন করিতেন, ইটো তাহা কার্য্যোপযোগী করিতেন।

চতুর্থ ব্যক্তির নাম ইওয়াকুরা। তিনি অত্যন্ত প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। জাপানে যাঁহারা নূতন জীবনের প্রবাহ আনিয়াছিলেন, তাঁহাদের ও সম্রাটের মধ্যে ইওয়াকুরা ছিলেন প্রধান বন্ধন, ইঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় পৌরোহিত্যপ্রধান অত্যাচারপূর্ণ রাজধর্ম্ম নিয়মতান্ত্রিক রাজধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে প্রেরিত দূতনিচয় সমগ্র সভ্যদেশদর্শনের পর জাপানে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, জাপান মন্ত্রণাসভায় ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। নবজাগ্রত জাপানের নেতৃবৃন্দ জাপানকে শুধু দেশজয় ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির জন্য ব্যাপৃত রাখিতে চাহিলেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, জাপানীরা অতঃপর পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেশজাত বাণিজ্যসম্ভার লইয়া গতায়াত করিতে থাকিবে। দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি অবশ্য-প্রয়োজনীয়। মন্ত্রণাসভায় ওকুবোরই জয় হয়।

দেশবাসীকে সুশিক্ষিত করা ও অর্থসমস্যার সমাধান-সাধন ব্যতীত দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। ইহা উদ্‌বুদ্ধ জাপানের মূলমন্ত্র হইয়াছিল। সেজন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা শিবুশাওয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিলেন। ইহাতে সকলেই ভাবিয়াছিল, হয় ত এই জন্য মহাপ্রাণ শিবুশাওয়া কোনও দিন ঘাতুকের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে নিহত হইবেন। (প্রকৃতপক্ষে জাপানের মনীষী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই গুপ্ত ঘাতুকের অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন)। বাস্তবিক যখন শিবুশাওয়া উপেক্ষিত

সাকুরাজিমা আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্ন্যুৎপাত

ও সমাজে ঘৃণিত বণিক সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া বাণিজ্যনীতি প্রস্তুত করিবার আন্দোলন করিতেছিলেন এবং তদুপলক্ষে আধুনিক সভ্যজগতে সমাদৃত হিসাবপ্রণালী জাপানে প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন দেশের মঙ্গলকামী মাত্রেরই এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, এইবার শিবুশাওয়া একদিন অকস্মাৎ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইবেন। যাহা হউক, তাঁহার আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল এবং জাপান সমগ্র পৃথিবীর নিকট অর্থসম্বন্ধে প্রতিপত্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিল।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে জাপান উদাসীন ছিল না। প্রাচীন জাপান স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিল। পুরুষের ন্যায় নারীও সমান শিক্ষার অধিকারিণী, এই আন্দোলন দীর্ঘকাল চলিবার পর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নারী-বিদ্যালয় জাপানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফেন্ জলপ্রপাত।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের মূলমন্ত্র ছিল শিক্ষা। সমগ্র দেশকে সুশিক্ষিত করিতে না পারিলে দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না, এই মন্ত্র জপ করিয়া জাপানীরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আজ জাপানে অশিক্ষিতের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি পল্লীতে বিবিধ প্রকারের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাপানের কর্ম্ম-শক্তির প্রমাণ প্রতিপন্ন করিতেছে। জাপান যে মহাশক্তিশালী চীন ও রুসিয়াকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহার প্রধান হেতুই বিদ্যাশিক্ষার প্রসার। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে জাপানে ২৫ হাজার ৬শত ৪৪টি বিদ্যালয়ের হিসাব পাওয়া যায়। শিক্ষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪ শত ৫০। ছাত্রসংখ্যা ৮৩লক্ষ৬২হাজার ৯শত ৯২। এরূপ সংখ্যাধিক্য প্রতীচ্য দেশের কোথাও দেখিতে পাওয়া যাইবে না;—জাপানের এই উন্নতি অতুলনীয়।

জাপানে একটা সমস্যা বিশেষ প্রবল। প্রাচীনযুগ হইতে এখনও পর্য্যন্ত জাপানীদিগকে গুরু শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। কৃষিকার্য্যের উপযোগী পশুর সংখ্যা জাপানে বড় কম। এজন্য পশুর দ্বারা যে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে, জাপানীদিগকে স্বয়ং তাহা করিতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে নির্ব্বাক্ জীবকে জাপানীরা কষ্ট দিতে চাহিত না। কষ্টটা কাযেই মানুষের ঘাড়ে চাপিত। এজন্য

জাপানে নিহত রণ-অশ্বের স্মৃতি-মন্দির বহুল দেখিতে পাওয়া যাইবে। পশুর প্রতি দয়া করিতে গিয়া মানুষের প্রতি অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছিল। জাপানীরা মানুষকে পশুর মতই দেখিত ও ভাবিত। এখন তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, নবীন জাপান এখন বুঝিতে শিখিয়াছে যে, তাহার দেশের নরনারীকে উন্নত করিতে হইবে, সুতরাং তাহারা যে মানুষ, তাহা ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে সমগ্র জাপান বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। খৃষ্টধর্ম্ম-প্রভাবে জাপানে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যতগুলি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে জাপানের কামাকুরাস্থিত দয়িবৎসু (মহাবুদ্ধ) মূর্ত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই মূর্ত্তি দেখিয়া মানুষ মুগ্ধ—অভিভূত হয়। যিনি প্রবৃত্তিসমূহকে জয় করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধ্যানমৌন প্রশান্ত মূর্ত্তি জাপানী ভাস্কর গড়িয়া তুলিয়াছে।

ভূমিকম্পে কাগোসিমা মালভূমির ফাটলের দৃশ্য।

দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া জাপানীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে মিঃ গ্রিফিস্ পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন্। তিনি বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হেতু জাপানীরা বর্ত্তমান যুগেও স্বল্পভাষী এবং ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্বন্ধে উদাসীন। সহজে তাহাদের মনের গতির পরিচয় পাইবার উপায় নাই। গণ-তন্ত্রের প্রভাব জাপানে দিন দিন বর্দ্ধিত হইলেও গোপনতা ও বাক্‌সংযম জাপানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এই জন্য সকল দেশের লোকই জাপানকে একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে। বাস্তবিক, জাপানের ইতিহাস, জাপানী লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে সর্ব্বত্রই ব্যক্তিত্বের অভাব অনুভূত হইবে। জাপান সাহিত্য, জাপানী গবর্মেণ্ট—কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নাই। তথায় মুখ দেখিয়া অন্তরের ভাব অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন। "Things are not what they seem" যাহা দেখিতেছ, তাহা যথার্থ নহে, এই তত্ত্ব জাপানে সুপ্রকাশ। বিশে-ষতঃ রাজনীতিক্ষেত্রে ইহা আরও সুস্পষ্ট।
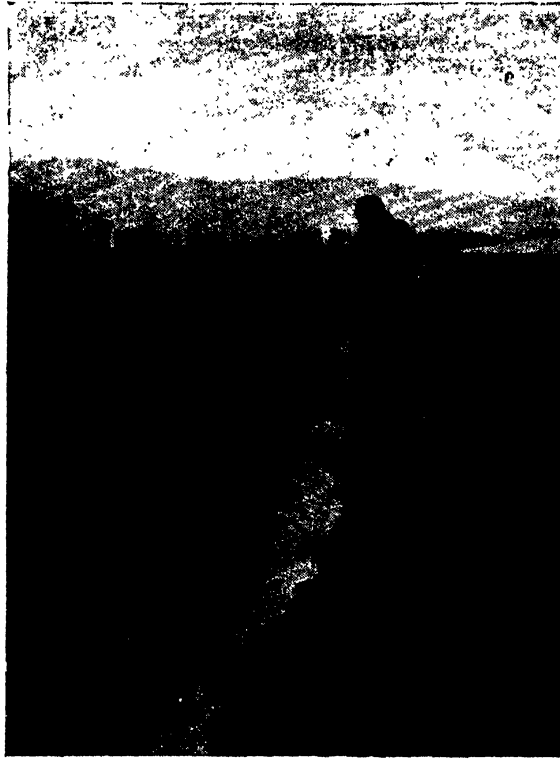
জাপান সম্রাটের প্রজা বলিলে প্রবাসী জাপানী ভ্রমণকারী বা ব্যাঙ্কার বুঝায় না। প্রায় ৫০ লক্ষ বহু ভাষাবিদ এইরূপ ব্যক্তি এখন সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। সমগ্র জাপানের লোক সংখ্যা ৫ কোটিরও অধিক। তাহারা এত দিন পল্লী অঞ্চলে, শস্য-ক্ষেত্রে শস্যরোপণ অথবা সমুদ্র প্রভৃতিতে মৎস্য ধরিয়া জীবন যাপন করিত। অধুনা শ্রমশিল্পের প্রসারতাহেতু তাহারা নব উৎসাহে জাপানে শক্তি ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জাপানে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। আধুনিক হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায়, জাপানে গরুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ, ঘোড়ার সংখ্যা ১৫ লক্ষের কিছু অধিক; ভেড়া ৫ হাজারের অধিক নহে; শূকরের সংখ্যা ৫ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি হাজার ব্যক্তির জন্য ২৪টি গরু, ভেড়া প্রভৃতি এবং ঘোড়া ২৭।

উল্লিখিত কারণে জাপানীকে অধিক পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়। জীবজন্তুর সহায়তায় কৃষি প্রভৃতির কার্য্য অধিকাংশের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং জাপানে বহুলক্ষ গরু ও ঘোড়ার প্রয়োজন। আহার্য্যের জন্য ছাগ-মেষের পরিপুষ্টি ও সংখ্যাধিক্যসাধন জাপানীর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানের কোথাও ঘোড়া কোন প্রকার শ্রমসংক্রান্ত অথবা কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত না। মানুষ শুধু ঘোড়ায় চড়িত। তাহা ছাড়া অন্য কোনও কার্য্যে ঘোড়াকে নিয়োজিত করিত না—সে প্রথাই ছিল না। মানুষ নগ্নপদে স্বয়ং গাড়ী টানিত। ঘোড়াগুলি শুধু পানভোজন করিয়া স্ফূর্ত্তি করিত। অন্য কোন প্রকার শ্রমজনিত কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ঘোড়া তখনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, কোন প্রকারেই কায করিতে চাহিত না। ইংরাজ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্রণ্টন যে সময়ে জাপানে আলোক-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন, তখন তিনি ঘোড়ার দ্বারা কায করাইবার বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। জাপানী অশ্ববৃন্দের স্বভাব এমনই বিগড়াইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা কায করিতে চাহিত না।

জাপানের জমি এমনই উর্ব্বরা যে, বর্ত্তমানে জাপানের লোকসংখ্যার দ্বিগুণ ব্যক্তির উপযোগী শস্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। জাপানীরা ১৫ শতাব্দী ধরিয়া কৃষিকার্য্য করিতেছে। অধুনা কৃষিকার্য্য অপেক্ষা জাপান ব্যবসায় ও শ্রমশিল্পের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়াছে। যদি জাপান কৃষিকার্য্যে অধিকতর মনোযোগী হয়, তবে জীবনধারণের উপযোগী কোনও শস্যের জন্য তাহাকে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না।

জাপানের প্রায় সর্ব্বত্রই এখন বিদ্যুতালোক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সমগ্র জাপানে ৯৫ হাজার ৮ শত ৭৭টি তাড়িত ষ্টেশন ছিল। জাপানের শত শত পল্লী রাত্রিকালে বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হয়।

সমগ্র জাপানে এখন ৭ হাজার মাইল রেলপথ বিস্তৃত। এখনও রেলপথের বিস্তার ঘটিতেছে। ষ্টীমারের সংখ্যাও কম নহে। ৬ হাজার ষ্টীমার ও ৫০ হাজার অর্ণবপোত বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া দেশবিদেশে যাতায়াত করিতেছে।

৫৩ বৎসরের চেষ্টায় আজ জাপান সমগ্র সভ্য সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। মিঃ গ্রিফিস্ সমগ্র জীবনের ৩ ভাগের ২ ভাগ কাল জাপানে যাপন করিয়া এই বিশ্বাস লইয়া দেশে ফিরিয়াছেন যে, জাপানীরা সাহসে দুর্জ্জেয়, অধ্যবসায়ে অতুলনীয়। তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা ও অজেয় অধ্যবসায় তাহাদিগকে উন্নতির চরম শীর্ষে উন্নীত করিবে। ভীষণ ভূমিকম্পে জাপানের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর ধ্বংস হইলেও অচিরে তাহারা সে ক্ষতির পূরণ করিয়া লইবে। তাঁহার মতে জাপান সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার মত শিক্ষা লাভ করিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে জাপানই এক দিন মধ্যবর্ত্তিতা করিবে, ইহাই তাঁহার ধারণা।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

বিরহের অভিশাপ

আগের জন্মে ছিলাম হয় ত বনের কিরাত সখি,
অনেক মিথুন ভাঙিয়া ক্রৌঞ্চ-বধূর হরেছি প্রাণ,
বধেছি হয় ত সদ্যোমিলিত শত শত চখা-চখী,
পুঞ্জিত পাপ হয়ে অভিশাপ প্রতিফল করে দান।

আগের জন্মে ছিলাম হয় ত মালাকর নিষ্ঠুর,
মধুপানরত প্রজাপতিগণে করিয়াছি বঞ্চিত,
নির্ম্মম ক'রে কুসুম তুলেছি মধুপে করিয়া দূর,
আজিকে দহিছে তাহাদের সব অভিশাপ সঞ্চিত।

আগের জনমে ছিলাম হয় ত কাঠুরে' কঠোর ক্রূর,
বল্লীপিহিত বহু বিটপীতে হেনেছি কুঠারখানা।
হারায়েছে বহু লতিকা, শরণ মহীরুহ-বন্ধুর।
তাহাদেরি বুঝি অভিশাপ আজি এ জনমে দেয় হানা।

নতুবা প্রেয়সি, এ হেন বিরহ কেন বা সহিতে হয়,
এ জনমে হেথা কি পাপ করেছি? এ ব্যথা কিসের ফলে'?
বহু বিরহীর মর্ম্মবেদনা আজিকে আমারে দ'য়।
বহু অনাথার অশ্রু-আসার নয়নে তোমার গলে।

শ্রীকালিদাস রায়।

দর্শনে দাম্পত্য

যোগ বা যৌগ দর্শনের নাম 'দর্শনপরিচয়' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। যোগ বা যোগদর্শন বিভাগের অন্তর্গত ন্যায়-দর্শন যে সাংখ্য-লোকায়তের মিলনস্থান, তাহারও সূচনা করিয়াছি। এই যোগ যে দাম্পত্যসম্বন্ধবৎ, তাহার ভাবও জানাইয়াছি। সেই দাম্পত্যের ব্যাখ্যা আজ সংক্ষেপে করিতেছি—

সাংখ্যমতে আত্মা নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন,—আত্মার নামান্তর পুরুষ,—তাঁহাতে কোন ভাবের রেখাপাত হয় না, তিনি কেবল জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান তাঁহার ধর্ম্ম নহে, তিনিই জ্ঞান। এই যে আত্মা, তিনিই আমি। সুখ-দুঃখ, ইচ্ছা-দ্বেষ—ইত্যাদি যাহা কিছু জীবের বিশেষ ধর্ম্ম আছে, তাহা আত্মার নহে,—মনের। মন ও আত্মা এক নহে। অনাদি-অজ্ঞানে জীব আচ্ছন্ন, তাই আত্মা ও মনের ভেদ বুঝিতে পারে না, আত্মা ও দেহের ভেদও বুঝিতে পারে না—মন ও দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মার অনুসন্ধান রাখে না। এই জন্যই জীব আমার সুখ, আমার দুঃখ, আমি কর্ত্তা, আমি সুস্থ, আমি রুগ্ন ইত্যাদি ভাবে আবদ্ধ হয়। নরহত্যা, পরস্বহরণ, পরনির্য্যাতন, মিথ্যাকথা, শঠতা প্রভৃতি যত কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, সমস্তই এই ভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, দান, দয়া, বিবিধ ভাবে পরোপকার-আচরণ, সত্যকথন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠানও এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই ভাব বিলুপ্ত হইলে পাপ বা পুণ্যকর্ম্ম থাকে না। 'আমি' বলিয়া যে পদার্থটি আছে, তাহাকে বুঝিতে পারিলে আর এ সব কার্য্য থাকে না। কেন না, সেই 'আমি'র সহিত কোন কার্য্যেরই সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জীব 'আমি' বলিয়া যাহাকে বুঝে, তাহার সহিত এ সব কার্য্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাই অনবরত জীবের কার্য্যপ্রবাহ চলিয়াছে। 'আমার' সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ নাই, সে কার্য্য আমি কখনই করি না। প্রয়োজন বোধে এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা পাইবার জন্য কার্য্য করিয়া থাকি; আমি যদি পরোপকার করি, তাহাতেও আমার প্রয়োজনসিদ্ধি হয়। যদি পরোপকার করি, সেখানেও আমার প্রয়োজন আছে। হয় সুখ না হয় দুঃখের প্রতীকার আমার সেখানে উদ্দেশ্য। আমি সৎপুরুষ হইলে পরদুঃখমোচনই আমার প্রয়োজন; কেন না, পরদুঃখমোচন করিলে আমার সুখ হয়, না করিতে পারিলে দুঃখ হয়। এই সুখের বা দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে আমি পরোপকার করি। যদি 'আমি' এমন হই যে, আমার প্রয়োজনই থাকিতে পারে না, তবে কার্য্য-প্রবৃত্তি আমার হইবে কেন? সাংখ্য বলিতেছেন, বৎস, তোমার কোনই প্রয়োজন নাই, তুমি যাহাকে 'আমি' ভাবিতেছ, তুমি তাহা নহ, আমি যেমন রামকে শ্যাম ভাবিয়া ডাকিলে শ্যামের উত্তর পাই না, তুমিও সেইরূপ আর এক বস্তুকে আমি মনে করিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিলেও প্রকৃত 'আমি'র সাড়া পাইতেছ না। সে আমি নির্ব্বিকার চিৎস্বরূপ। তাঁহার সুখ-দুঃখ নাই, সুতরাং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন ব্যতীত কার্য্যপ্রবৃত্তি ঘটে না। অতএব সাংখ্যের কথায় যিনি উদ্বুদ্ধ, যিনি 'আমি' পদার্থকে চিনিতে পারিবেন, তিনি আর সংসারের কোন কার্য্যেই লাগিতে পারেন না। মানুষকে এইরূপ কর্ম্মহীন করিবার জন্যই সাংখ্যদর্শন। দর্শন-পরিচয়ে বলিয়াছি—কপিলমত, পাতঞ্জলমত ও শাঙ্করমত এই 'সাংখ্য'-দর্শনের অন্তর্গত। এ দর্শনসেবার মুক্তিই ফল। যে মুক্তির অধিকারী নহে, সাংখ্যদর্শন তাহার পক্ষে নিরর্থক। অথচ মুক্তির অধিকারী নহে, এমন লোকই সংসারে পৌনে ষোল আনা। তাহাদের সাধারণ কার্য্য 'লোকায়ত' মতেই চলিয়াছে। এ 'লোকায়ত' মত পড়িতে হয় না, অনাদি-সংস্কারে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। দেহকে 'আমি' মনে করা শিশুকাল হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সংসারে যত কিছু ব্যবহার চলিয়াছে, তাহার মূলে এই দেহাত্মবাদ নিহিত। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ধনী, আমি রূপবান্—এই সব ধারণা ত দেহাত্মবাদের প্রমাণ বটেই, আমি বিদ্বান্, আমি সুখী, এ সব ধারণাও সাধারণ মধ্যে দেহাবলম্বনেই প্রসিদ্ধ। বিদ্যা, সুখ প্রভৃতিও দেহেরই ধর্ম্ম, এমন জ্ঞানও সাধারণের আছে। দেহাত্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও যাগযজ্ঞ বা উপাসনা প্রভৃতি কার্য্য যে মানবসমাজে বিভিন্ন

সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে, তাহা অনেক স্থলে দৈহিক মঙ্গলের জন্য ; স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ, বন্ধুবান্ধবের কল্যাণও দৈহিক মঙ্গলেরই অন্তর্গত ; কেন না, তাহাও দেহেই সীমাবদ্ধ। অনেক স্থলে সেই সব কার্য্য পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য, এই যে পারলৌকিক মঙ্গলের ইচ্ছা, ইহাতে দেহাত্মবাদ খর্ব্ব হইয়া থাকে, দেহ ব্যতীত আর কিছু না থাকিলে কে সেই মঙ্গল লাভ করিবে? বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ এই স্থলে দেহাত্মবাদের সীমা অতিক্রম করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মানবের হৃদয়ে সেই সেই ধর্ম্মগ্রন্থের প্রভাব অতি অল্প। গতানুগতিকতায় ধর্ম্মকার্য্য হইয়া যায়, এই পর্য্যন্ত। যাহারা ধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বাসী, তাঁহাদেরও উপাসনাদি সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কার্য্যকলাপে দেহাত্মবাদেরই পূর্ণ পরিচয় প্রায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। গতানুগতিকতার ফলে অনধিকারীর সাংখ্যমতানুবর্ত্তন, গতানুগতিকতার ফলে দেহাত্মবাদীর ধর্ম্মানুষ্ঠান—অনেক সময়ে সমাজে ভণ্ডতার প্রসার বৃদ্ধি করিয়া দেয়, তাহার ফলে সমাজে অনিষ্টকারী লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সহজ-সংস্কারজাত লোকায়ত মত দর্শনাকারে প্রচারিত হইয়া এক দিকে যেমন এইরূপ ভণ্ডতার হ্রাস করিয়া দিল—অন্য দিকে তেমনই গুপ্ত পাপের স্রোত বাড়াইয়া দিল। পরকাল না থাকিলে, ঈশ্বর না থাকিলে, গুপ্ত পাপে ত ভয় থাকিতে পারে না, লোকের দৃষ্টিতে যাহা মন্দ কার্য্য, তাহা লোকদৃষ্টির অন্তরালে করিলেই চলিত, এই পর্য্যন্ত। সুতরাং সাংখ্যদর্শন যেমন গিরিগুহাবাসী সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত, লোকায়ত দর্শন সেইরূপ পরলোকে ভীতিশূন্য ভীষণপ্রকৃতি মানব সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত। এক দিকে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, অন্য দিকে লালসাময়ী রমণী ; এক দিকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ, অন্য দিকে সর্ব্বস্ব ভোগ। কোথাও কাহারও মিল নাই। এই অমিল বা অনৈক্য মানবসমাজের সাধারণ মঙ্গলসাধনে অসমর্থ ; প্রত্যুত সাধারণ অমঙ্গলেরই সংসাধক। যোগদর্শনে এই পুরুষ ও সেই রমণীর দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপিত।

জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী 'গৃহস্থ' হইয়া স্বদারনিরত হইলেন, রমণী স্বীয় সর্ব্বগ্রাসিনী ভোগলালসাকে সংযত করিয়া পতিসেবায় তাহা নিয়োজিত করিলেন। সাংখ্যের সুখদুঃখহীন নির্ব্বিকার পুরুষ যোগদর্শনে সুখদুঃখভাগী হইলেন, কর্ত্তা হইলেন, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্ত্তা, এইরূপ জ্ঞান আর মিথ্যা-জ্ঞান বলিয়া উপেক্ষিত হইল না। সুতরাং যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য, শিল্প কেবল অজ্ঞানকল্পিত অহম্ভাবের সহিত বিজড়িত হইল না। যিনি যথার্থ আমি, এ সকল বিষয়ে কর্তৃত্ব তাঁহার উপরেই ন্যস্ত থাকিল, পক্ষান্তরে, লোকায়তের দেহাত্মবাদ এই কর্ত্তার করে আত্মসমর্পণ করিলেন, আমি স্থূল, আমি কৃশ—ইত্যাদি জ্ঞান ভ্রম হইল, এই ভ্রমমূলক প্রেমপ্রীতি উপেক্ষিত হইল বটে, কিন্তু যাহার অধিষ্ঠানে দেহ উজ্জ্বল, তাঁহার প্রতি প্রেমপ্রীতি উপেক্ষিত হইল না, দেহাত্মবাদ আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ছাড়িয়া অনন্ত অপরিমেয় আত্মার সঙ্গে 'গাঁটছড়া বাঁধা' পড়িলেন।

যিনি পরকালের সুখদুঃখভোক্তা, তিনিই ইহকালে সুখদুঃখভোক্তা, মুক্তির অনধিকারী সাধারণ মানব যেমন এই তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া আশ্বস্ত হইল, তেমনই অজ্ঞ মানব পরলোকভয়ে গুপ্ত পাপ হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। যিনি মুক্তির অধিকারী, তিনিও জানিলেন—"বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ" (গৌতমসূত্র) নিষ্কামতা হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। আত্মায় সুখদুঃখ থাকিলেও সে সুখ স্পৃহণীয় নহে, কেন না, সে সকল সুখই ক্ষণভঙ্গুর। যাহা ভঙ্গুর, তাহা স্পৃহণীয় নহে, কেন না, সেই অভীষ্ট বস্তুর বিনাশে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যাহার সহিত দুঃখ এমন ভাবে বিজড়িত, তাহা আপাততঃ সুখ হইলেও দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। এই ভঙ্গুর সুখের প্রতি যে কামনা, তাহা পরিহরণীয়। এই উচ্চ সোপানে যে ব্যক্তি আরোহণ করিয়াছে, তাহার মুক্তিসন্ধান এই যোগদর্শনই প্রদান করিতে পারেন। পাপপুণ্য আমার নহে, সুখ-দুঃখ আমার নহে, আমি কর্ত্তা নহি—যাহা অসৎকার্য্য ঘটিতেছে, তাহা প্রাকৃত, আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—এইরূপ জ্যেষ্ঠতাতত্ত্বপূর্ণ বাক্যের সহিত উচ্ছৃঙ্খলাচরণমূলক যে ভণ্ডতা, তাহা দর্শনের দাম্পত্যে যোগদর্শনে—ন্যায়শাস্ত্রের প্রভাবে তিরোহিত হইল।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ?

এই যে পাপাচরণপ্রবৃত্তি হেতু যুক্তিবাদ, তাহাও বিলুপ্ত হইল।

লোকায়তবাদের দৈহিক কর্তৃত্ব সাংখ্যমতের নির্ব্বিকার আত্মায় গৃহীত হইল—ইহাই পতি কর্ত্তৃক পত্নীর

পাণিগ্রহণ। অকৃতদার অরণ্যচর সাংখ্যপুরুষ ও পুরবাসিনী অনূঢ়া লোকায়ত কামিনী এইরূপ পরিণয়সূত্রে সংবদ্ধ হইয়া সংসারী হইয়াছে, এই যে পবিত্র দাম্পত্য, ইহাই যোগ বা যৌগদর্শনের মূলতত্ত্ব, ইহারই সুসংস্কৃত ও সমৃদ্ধ অবস্থা ন্যায়দর্শনে।

এই জন্য ভগবান্ বাৎস্যায়ন সাংখ্য ও লোকায়তকে ত্যাগ করিয়া এই দম্পতিমিলনকেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে আন্বীক্ষিকী নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতেই সাংখ্য ও লোকায়তকে পরোক্ষভাবে আন্বীক্ষিকী বলা হইয়াছে। ফলতঃ ন্যায়শাস্ত্রই লোকস্থিতিসাধক প্রধান দর্শন। এই দর্শনই সর্ব্বতোমুখী আন্বীক্ষিকী। সেই আন্বীক্ষিকীই—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানাং উপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্———"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

কুমারী কোমলতা ব্যানার্জ্জি

এই প্রতিভাময়ী বিদুষী বঙ্গবালা, প্রতীচ্যের আদর্শের সহিত যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় ভাবপূর্ণ সুললিত সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। য়ুরোপীয়গণের উপভোগ্য করিয়া ঐ সকল সঙ্গীতে স্বয়ং ভারতীয় সুরলয় সংগঠনে পাশ্চাত্যজগতে "প্রাচ্য সঙ্গীতের" প্রচলন করিয়া ইনি অশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতেছেন।

ইনি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান মিঃ এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা এবং সার কে, জি, গুপ্ত মহোদয়ের দৌহিত্রী।

সম্প্রতি ইনি বিশ্ববিদিতা নর্ত্তকী ম্যাডাম প্যাভলোভার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার অভিনব ভারতীয় "সোলো" নৃত্যের উপযোগী প্রাচ্যের হাবভাব ও সুরলয়-সমন্বিত সঙ্গীত রচনা করিতেছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্রে কুমারী ব্যানার্জ্জির অসাধরণ ব্যুৎপত্তি, উৎসাহ ও উদ্যোগের ফলে তাঁহার "প্রাচ্যসঙ্গীতাবলী" য়ুরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া সভ্য জগতের সঙ্গীতসমাজে যোগ্য স্থান অর্জ্জন করিয়াছে। ইহা ভারতবাসীর গৌরবের বিষয়।

চোখ গেল !

ফাগুনে হাওয়া আগুয়ান দেখে সে দিন লাল দীঘির পাড়ে পাখীকুল কলরব ক'রে উঠেছিল ; প্রথমেই আওয়াজ উঠল, পিউ পিউ পিউ, (Pugh)। পাপিয়া ডাকলে কবি শোনেন পিউ পিউ পিউ,সাধারণ বাঙ্গালী শোনে চোখ গেল ! চোখ গেল ! চোখ গেল ! কোকিল কাকের বাসায় ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটিয়ে নেবে, এটি চিরপ্রথা, কিন্তু কাক যদি তার জন্য বাসা ভাড়া আদায় কত্তে চায়, তা হ'লে পাপিয়া কেন চেঁচাবে না চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল ব'লে ? সাহেবরা আলু পটোল পিঁয়াজ রশুন মাছ মাংস ছাড়া প্রায় আর কোন জিনিষই দেশী লোকের দোকান থেকে ক্রয় করেন না ; টাটকা মাছ মাংস কিনেন বটে, কিন্তু তা'র চেয়ে দশগুণ দাম দিয়ে টিনে মোড়া বাসি বিলিতী মাছ মাংস ঝোল ঝাল কিনে থাকেন। এ ছাড়া আর যা কিছু গৃহস্থালী বা ভোগবিলাসের জন্য আবশ্যক হয়, তা বাজারে পেলে আর পয়সা জুটলে বিলাতী দোকান ছাড়া সহজে আর কোথাও থেকে খরিদ করেন না। এক আপদ রয়ে গেছে মাসে মাসে কর্‌করে গোটাকতক নগদ টাকা বাড়ীভাড়া ব'লে দেশী লোককে গুণে দেওয়া। বিলাতী বিদ্যালাভে চাকুরী কত্তে শিখে বাঙ্গালীর হাতুড়ী করাত চরকা তাঁত গজকাঠী দাঁড়ীপাল্লা সব গিয়েছে, আছে কারুর কারুর একটু জোতজমী আর কলিকাতা সহরে কারবার মন্দা যাচ্ছে ব'লে মাড়ওয়ারী মহাজনরা বা য়িহুদীরা যে ক'খানা এখনও কিনে নেন নি, সেই ক'খানা বাড়ী বাঙ্গালীর দখলে। জমীদারের প্রতিশব্দ অত্যাচারী, এ কথা ত ইংরাজরা অনেকদিনই ব'লে থাকেন, আজ বছর কতক থেকে আবার ধুয়া ধরেছেন, বাড়ীওয়ালারা সংসারের একটা উৎপাত। শ্লটার হাউসের সৃষ্টিকর্ত্তা কশাই প্রতিপালক, চশমাবিক্রেতা অর্থমাত্র ইষ্টদেবতা-উপাসনারত সাহেবরা দেশী বাড়ীওয়ালাকে গালি দেন, কশাই চশমখোর অর্থপিশাচ ব'লে ; তাই শুনে পাপিয়া চেঁচান—চোখ গেল রে চোখ গেল !

একশত টাকার মালে ছশো টাকা লাভ দিয়ে বিলাতী দোকান থেকে জুতা কিনেন, কোট কিনেন, নেকটাই কিনেন, ছাতা কিনেন, কৌচ কেদারা আলমারী পিয়ানো গাড়ী মোটার খসবু সাবান এ সব কিনেন, তাতে কথা নেই, বাড়ীওয়ালা তার বাড়ীর বাজারদরের উপর শতকরা পাঁচ টাকা যদি ভাড়া নিলেন, তা হ'লেই সে হ'ল চামার, জোচ্চোর, সাইলক, আরও কত কি। বাড়ীভাড়াগ্রহণরূপ নীতিবিরুদ্ধ কাযের উপর কর্ত্তাদের যখন ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হয়, তখনও কিন্তু জাতিগত পরোপকারবৃত্তিটি বিস্মৃত হন না ; নিজেদের কষ্টের কথার সঙ্গে সঙ্গে "আহা, গৃহস্থ বাঙ্গালীরা এত ভাড়া দেয় কি ক'রে ?" ব'লে মাঝে মাঝে ডুকরে কেঁদে উঠেন। গৃহস্থ বাঙ্গালীর স্ত্রী পুত্র ভাগ্নী ভাগ্নে বাপ মা ঠাকুদ্দা ঠান্‌দী মাসী পিসী প্রভৃতিকে খাওয়াবার চালের দাম যে চতুর্গুণ হয়েছে, রেলের কেরামতিতে রান্নার কয়লার দাম বেড়ে উঠছে, জলো দুধ টাকায় আড়াই সের, মোণ্ডার আকার হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলে দাঁড়াচ্ছে, তাতে কর্ত্তাদের কিছু এসে যায় না, কেবল বুক ফাটে বাঙ্গালীর জন্য বাড়ীভাড়ার সময়।

কষ্টটা বেশী হয়েছে বড় সাহেবদের জন্য ততটা নয়, যতটা দোকানের চাকরে বিলাতী ছোট সাহেবদের জন্য আর ধর্ম্মতলা চুণোগলির মিশ্র বা মিশির সাহেবদের জন্য। কালাপানি পেরিয়ে য়ুরোপে গেলে আমাদের জাত যায় আর সেই কালাপানি পেরিয়ে এ দেশে এলে য়ুরোপীয়রা সব এক জাত হয়ে যায়। সে কালে যেমন লঙ্কায় গেলে সবাই রাক্ষস হ'ত, তেমনই হ্যাটকোট প'রে এ দেশে যিনিই আসেন, তিনি হন সাহেব, তা তিনি বড় লাটের ভাগ্নে সিবিলিয়ানই হন, ক্লাইব ষ্ট্রীটের মারবেলমোড়া আফিসের বড়সাহেবই হন আর ওয়াটের বাড়ীর জুতা পরানো জোন্সই হন।

বই-ও পড়িয়েছ, জাহাজেও চড়িয়েছ, সুতরাং কুলের কথা ত জানতে বাকি নেই, হ্যাশে কে কেমন থাক, তা ত মোরা সব মালুম করেছি, চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে থাকলেই টম সাহেব তোমায় যে আমরা উলিয়াম দি কঙ্কারারের দশ রাত্রির জ্ঞাতি মনে করব, সে দিন গেছে বঁধু বয়ে সে দিন গেছে বয়ে ; এখন এস না বন্ধু ছোট সাহেব শুলু ওস্তাগরের লেনে, নাথের বাগানে, গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে, বিলেতে যে অবস্থায় থাক, তার চেয়ে ঢের ভাল বাড়ী আমরা তোমার সস্তায় ভাড়া ক'রে

দেব। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন বাস করতে পারতেন পাথুরেঘাটায়, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক চোরবাগানে, রাজা দিগম্বর মিত্র ঝামাপুকুরে, রাজা রাজকৃষ্ণ স'বাজারে আর তোমরা এমন কি নবাব খাঁজাহান খাঁ যে, ধর্ম্মতলার মোড় পেরুলেই তোমাদের শ্বাস বন্ধ হবে?

আর ব্যারেগা ডিকষ্টা এম্বে্াজ তোমাদের বলি, ইউ-রেসিয়ান অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান যে কিছু নাম দিয়ে তোমাদের লেজ মোটা ক'রে আমাদের চেয়ে একটু উঁচুতে তুলে দিন না কেন, নিজের পুংক্তিভোজনে খাঁটি সাদারা তোমাদের কথনই পাত পাততে দেবেন না। তোমাদেরই ভিতর দেখ না, এক মা'র পেটের দুই ভাই, এক ভাই যদি একটু ময়লা হ'ল, ফরসা ভাইটি অমনই তাকে তাচ্ছল্য করেন, নেটিভ বলেন। সুতরাং সুবুদ্ধি হও, আমাদের কাছে এসে এক-সঙ্গে মিশে বসবাস কর, হিন্দু-মুসলমানে ত একত্র আছি, তোমরাও না হয় আর এক ঘর হবে; পরস্পরের আপদে বিপদে দেখব, আমোদ-আহ্লাদে মেশামিশি করব, আমার বাড়ী সাহেব ডাক্তার এলে তোমার বাড়ী থেকে চেয়ার চেয়ে আনব, তোমার ঘরে এক দিন কারি তৈরী না থাকলে আমার বাড়ী থেকে মোচার ঘণ্ট চেয়ে নিয়ে যাবে, তোমার আমার সব ছেলেরা একসঙ্গে স্কুলপাঠশালে যাবে, তারাও ভদ্রলোকের মত বাঙ্গালা কথা কইতে শিখবে, আমাদের ছেলেরাও একটু ডানপিটে রকম হয়ে দাঁড়াবে, এ ব্যবস্থা কি মন্দ?

আমাদের বাঙ্গালীদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্, যে দিন এ বি সি শিখেছি, সেই দিন থেকেই জিভের তার ভুলে কানে খেতে অভ্যাস করেছি; যদি সাহেব বলেন, হে রাম, আমরাও বলি রাম রাম। যেই সাহেবরা বল্লেন, বাঙ্গালী মেয়েরা বড় সোনার গহনা ভালবাসে, এটা বড় খারাপ, অমন-ই আমরা ব'লে উঠলাম, খারাপ-ই ত বটে! ওর চেয়ে ফেদার কেনায়, বোয়া কেনায়, গ্লভ্ কেনায় কত সাশ্রয়; ব্লাউজে যা বাহার খোলে, তাবিজ বাজু বালায় কি তা হয়? যেই সাহেব বল্লেন, তুলোর খেলা, বৃষ্টির খেলা কি ইতর জুয়া, এ আইন ক'রে বন্ধ করা উচিত, অমনই আমরা বল্লুম, উচিত-ই ত বটে, উচিত-ই ত বটে, একদম দৌড়োও সব ঘোড়দৌড়ের মাঠে; সেখানে জবাই নয়, একেবারে ঝাড়া কোপ। তেমন-ই যেই সাহেব বল্লেন, রে'ট-এক্ট চাই, বাড়ীওয়ালারা বড় বদমায়েস, সব গৃহস্থ-লোকের সর্ব্বনাশ করছে, অমন-ই আমরা-ও নেচে উঠলাম, আমার বাড়ীওয়ালা শ্যামবাবুকে এবার জব্দ ক'রে দেব, কিন্তু ভাবলুম না যে, যারা আইন কচ্ছে, তারা শ্যামবাবুর ভাই রামবাবু হরিবাবু পাঁচুবাবু আর তাদের পাড়াপড়শী গোয়েস্কা মল চামারিয়া ঝুনঝুনওয়ালা এব্রাহেম কোহেনদের মাথা খাবার জন্যই আইনটি চাচ্ছে কিন্তু হুঁস রেখেছে, যেন চৌরঙ্গীর এসপ্লানেড ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের এণ্ড কোঁদের দুশ আড়াইশ পারসেণ্ট লাভের গায়ে আঁচড়টি না লাগে।

এই হ'ল স্বদেশ-প্রেম। পেট্রিয়টিজম (Patriotism) শব্দটি জোড়কলম, বাংলার পেট—ও ইংরাজীর রাইয়ট (riot) এই দুটি শব্দ লইয়া পেট্রিয়ট কথাটি সৃষ্টি হইয়াছে। পেটে যখন রায়ট অর্থাৎ দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন-ই লোক পেট্রিয়ট হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ইংরাজের পেটের ভিতর যখন ক্ষুধা-দৈত্য প্রবেশ করিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া ছোরাছুরি চালাইতে লাগিল, যখন তুষারাবৃত ক্ষেত্র শস্যপ্রদানে অস্বীকৃত হইলেন, বন যখন আর যথেষ্ট পরিমাণে শূকর শশক সরবরাহ করিতে নারাজ হইল, তখন সমস্ত জাতিটা একেবারে পেট্রিয়ট হইল অর্থাৎ একমত হইয়া সকলে একত্র দলবদ্ধ হইল; সমস্ত জাতি এক দলবদ্ধ হওয়ায় নাম হইল ন্যাশান্যালিটি অর্থাৎ সাদা বাঙ্গালায় নেশা—নোলাটির। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই নোলার নেশার উত্তেজনায় আহারান্বেষণে ইঁহারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন। এই ন্যাশা-ন্যালিটি পিঁপড়ার মধ্যে আছে, মাছির মধ্যে আছে, কাকের মধ্যে আছে, শিয়ালের মধ্যে আছে, নাই কেবল আমাদের মধ্যে, কেন না, এক দিন আমাদের সকলেরই ঘরে দুটি দুটি অন্ন ছিল, মাতা বসুন্ধরা এখানে সদাব্রত খুলে রেখে-ছিলেন, মাঠে ধান, চালায় লাউ, পুকুরে মাছ, গোরুর বাঁটে দুধ, নিজের-ও পেট ভরিত, অভাবগ্রস্ত দ্বারস্থ হইলে একমুঠা দিতে-ও পারিতাম, তাই পেটের ভিতর দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হওয়ায় আমরা পেট্রিয়ট অবস্থায় পৌছিতে পারি নাই, পেট ভরিয়া ভুঁড়ি বাড়িত, আবার সে ভুঁড়িও ভরিত। কিন্তু ইংরাজের পেট রবারের পেট, দেখতে ছিটে বেড়ার ঘর, কিন্তু যত মাল ঠাস, ততই তার পরিধি বাড়িতে

থাকে। এঁদের আপনাদের ভিতর একটা অ-লিখিত ভাগাভাগি চুক্তি আছে। তুমি যদি ভাই ১০টি টাকা রোজগার কর ত আমায় ছুটি টাকা দিতে হবে. আমি না হয় তোমায় আনা ছয়েকের কোন মাল দেব, সে মাল তোমার কাযে লাগতে পারে, একান্ত না লাগে, ফ্যাসান নাম দিয়ে চালিয়ে দিলেও দিতে পার; আর যদি ঐ ছ' আনার মাল নিয়ে আমায় ছুটি টাকা না দাও, তা হ'লে আমি 'কুলের কথা খুলে বলব,' সবাইকে বুঝিয়ে দেব যে, তুমি যে দশ টাকা পাও, সে ভারি অন্যায়; আর নিলে বলব, ভাই, যে ১০ টাকা দিয়ে তোমায় ফাঁকি দিচ্ছে, ২৫ টাকা তোমার পাওয়া উচিত; এই ন্যায়-অন্যায় বোঝাবার জন্য আমরা একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলুম— যার নাম রইল, সংবাদপত্র।

এইখানেই ইংরাজের ন্যাশান্যালিটি, ইউনিটি, পেট্রিয়-টিজিম্; নইলে স্বজাতি-প্রেম-ট্রেম কিছু নেই; ঘোর বিষয়াসক্ত লোকের মধ্যে দেবতার দান নিঃস্বার্থ প্রেম থাকিতে পারে না। সত্য স্বজাতি-প্রেম থাকিলে কুবেরের ভাণ্ডার ইংলণ্ডে আজও এত দারিদ্র্য কেন? কাঞ্চন-বঞ্চিত আমাদের এই দীনদেশে আজও এমন অবস্থা হয় নাই যে, কুকুরের মুখ হইতে মাংসখণ্ড কাড়িয়া লইয়া মানুষ খাইতে চেষ্টা করে; শুশ্রূষার ছলে পিতামাতা পর্য্যায়ক্রমে দুই বেলা উপস্থিত থাকিয়া দুই গাস আহার্য্য পাইবে, এই লোভে আজও ভারতের পিতামাতা নিজের খোকার পৃষ্ঠ স্বহস্তে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহাকে শিশু-হাঁসপাতালে রাখিয়া আসে না। ক্ষুধার জালায় ভিখারী হাত পাতিলে, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সদর দরজার কাছে শুইয়া পড়িলে যাহারা আপনার স্বদেশীয়কে, স্বজাতীয়কে পুলিসের হাতে সমর্পণ করে, তাহারা কোন্ মুখে আবার স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম বলে?

"দিলে নিলে বদল পেলে ফুরিয়ে গেল ভালবাসা," রাজতন্ত্রে, জাতিতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, অনেক সময়ে গার্হস্থ্যতন্ত্রেও এইটি বিলাতী বীজমন্ত্র।

এই সব ভেবে চিন্তে বুঝেছি, পাপিয়া, তোমার পিউ পিউ নয়, আসল কথা তোমার চোখ গেল! চোখ গেল!'

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

ডাক্তার সৌরেন্দ্র মজুমদার

ডাক্তার সৌরেন্দ্র মজুমদার বিগত ১৯১৯খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ম্যাক্লিয়ড্ স্বর্ণ-পদক ও পশুপতিনাথ রৌপ্য-পদক পুরস্কার লাভ করেন। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ বশতঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে কিছুদিন জুনিয়র হাউসসার্জ্জনের কার্য্য করেন, মাড়য়ারী হাঁসপাতা-লেও কিছুদিন রেসিডেণ্ট সার্জ্জনের কাযও করিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতাসঞ্চয়ের জন্য অতঃপর তিনি বিলাতে অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষার জন্য গমন করেন। তত্রত্য প্রধান প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর তিনি উচ্চ প্রশংসার সহিত এফ, আর, সি, এস্ উপাধি লাভ করিয়াছেন। বিলাতের সেণ্ট বার্থলোমিউ হাঁসপাতালের বাৎসরিক উৎসব-সভায় ডাক্তার সৌরেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। শল্য-শাস্ত্রে (surgery) তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সংপ্রতি বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মমতাজের অন্তিম-শয্যা

বেলা কি হ'ল শেষ? বাদশা হৃদয়েশ!
নিকটে এস আরো সরে',
ও কি ও প্রিয়তম? বল কি হ'ল?
কেন, নয়ন জলে গেছে ভরে'।
বেদনা পেয়েছ কি, যেতেছি চ'লে তাই?
টুটিয়া যেতেছে কি হিয়া,
মরণ-দিনে আজ, বাঁধিছ কেন বল,
সজল আঁখি-ডোর দিয়া!
হাতটি এনে মোর বুকের পরে রাখ,—
এমন কেন হ'লে প্রভু,
মুখের পানে চাও! দেবতা, তোমারে ত
এমন দেখি নি গো কভু।
এত কি বেসেছিলে অভাগিনীরে ভাল?
সে কি গো ছিল বুক জুড়ে,
হৃদয়-ধন আজ, শূন্য করি সব,
পলায়ে যেতেছে কি দূরে?
দিবস-শেষে প্রিয়, এ কি গোপন-কথা,
ঢালিলে মোর দুটি কানে,
লুকানো এ কি ছবি, মেলিয়া ধরিলে গো
আঁধার-আঁখি-দুটি পানে।
জীবনে এত সুখ লাগিল না যে ভাল,
আসিয়া গেছে অবসাদ।
মরণে আরো কত নূতন সুখ আছে,
হৃদয়ে জাগিয়াছে সাধ॥
এই কি ছাড়াছাড়ি,—বিদায়ে অবসান,—
এই কি শেষ চ'লে যাওয়া?
দয়িত! এ যে শুধু মরণে জেগে উঠে,
তোমারি আশা-পথ-চাওয়া॥

* * * *

আমি যে হারা'ব না,—লুকায়ে র'ব,
তব বুকের মাঝে ব্যথা হয়ে।
আকাশে চোখ মেলে, নীরব-চাহনিতে,
কত কি কথা যা'ব ক'য়ে॥
ভোরের আলো হয়ে, হাসিয়া যাব নাথ!
দুঃখ-তাপিত ওই মুখে।
কুসুম-সুবাসিত চপল সমীরণে,
পড়িব লুটে তব বুকে॥
সাঁঝের বায়ু হয়ে দোলায়ে যা'ব তব,
বেদনা-গাঢ় আঁখি-জলে,
সারাটি দেহ ভরি,' পরশ দিয়ে যা'ব,
চকিতে এসে কত ছলে।
অলস-দিবসের কিরণ-রেখা হয়ে,
চাহিয়া র'ব ব্যথাহত,
মিনতি-ভরা চোখে আমার কাহিনীটি
শোনাব তোমারে যে কত।
আমার হাসি তুমি দেখিবে, হাতে-গড়া,
বাগান-ভরা ফুলে-ফুলে,
আমার ডাক নাথ! শুনিবে, নিতি-নিতি,
যমুনা-তট-কূলে-কূলে।

* * * *

আর যে চোখে নাহি লাগিছে আলো নাথ!
কোথায় মুখখানি তব,
এই ত বাহু দুটি; যেতে কি নাহি দিবে?
বাঁধনে প'ড়ে কত র'ব।
তবু যে যেতে হবে,—মানিব না যে মানা,
ফেলো না আঁখিজল আর,
বুকের মাঝে মোর, ও ব্যথা-মাখা মুখ
ঢাকিয়ো না কো বার বার।
কেন যে আর কোন কথা ফুটে না মুখে,—
কিছু যে ভাল নাহি লাগে,
বুঝি বা এইবার, দূরের পথ-রেখা
মুদিত আঁখি-প'রে জাগে।
জীবনে—শেষবার, অধরে রাখ মুখ,—
আর যে সাধ কিছু নাই,
মরণে—মোর তরে, হৃদয়-কোণে শুধু,
রাখিও এতটুকু ঠাঁই!

মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী বি-এ।

পাখীর ঘটকালি

অস্‌কার ক্যাম্‌নার্ প্রেমে পড়িয়াছিল, এ সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় ছিল না। শুধু চোখের নেশা নহে —প্রেমের নদীতে সে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার প্রণয়পাত্রী পরমরূপবতী—ভাষায় সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অসম্ভব। অস্কার মাত্র তিনবার সেই যুবতীকে দেখিয়াছিল।

কথাটা মনে করিয়া বেচারা একবার হাসিল—সে হাসি বড় তিক্ত। সুবিধা পাইলে সে নিশ্চয়ই তাহার প্রেমাস্পদার কাছে যাইত ; কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ, কার্য্যে পরিণত করা তেমন অনায়াস-সাধ্য নহে। "কি জাতি, কি নাম ধরে—কোথায় বসতি করে" তাহা ত সে কিছুই জানিত না ! কি পরিতাপ ! তাঁহার সহিত প্রথম দেখা—রঙ্গালয়ে। সেই বরবর্ণিনীর পার্শ্বে এক শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সুন্দরীর পিতা, অথবা তাহা নাও হইতে পারে। অভিনয়শেষে উভয়ে একখানা গাড়ীতে উঠিয়াই অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন !

দ্বিতীয়বার সে তাঁহাকে এক সার্কাসে দেখিয়াছিল। সেখানেও সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাহার পার্শ্বের আসনে বসিয়া ছিলেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য, খানিক পরেই সে আর সেই রূপসীকে দেখিতে পায় নাই। খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ হইতে আসন ছাড়িয়া কখন্ চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

তৃতীয়বার রাজপথে সে তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াছিল। সুন্দর অশ্বযুগলবাহিত এক গাড়ীতে, বৃদ্ধের পার্শ্বে তিনি বসিয়াছিলেন। পবনবেগে গাড়ী তাঁহাদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। কাযেই এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পরিচয় সে জানিতে পারে নাই। শুধু এইটুকু বুঝিয়াছিল যে, এই মর্ত্তধামে দেবকন্যার ন্যায় অপূর্ব্বসুন্দরী এই যুবতী মানবদেহধারিণী, আর সে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে যে তাঁহার আর কোনও পরিচয় পায় নাই, এজন্য তাহার মনস্তাপের সীমা ছিল না।

এমনই দুর্ব্বহ চিন্তাভার-পীড়িত ভগ্নহৃদয় লইয়া সে পথিপার্শ্বস্থ এক সাধারণ প্রমোদোদ্যানে প্রবেশ করিল। অন্ততঃ এইখানে সে আপনা-বিস্মৃতভাবে সেই সুন্দরীর ধ্যানে কিছুকাল যাপন করিতে পারিবে। দীর্ঘকায় ওক্ গাছগুলি তাহার কাতর হৃদয়ের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে সমবেদনা প্রকাশ করিবে না ?

ছায়াচ্ছন্ন উদ্যানপথে সে প্রথমতঃ উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। তার পর অর্দ্ধচন্দ্রাকার বনঝাউশ্রেণীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই কুঞ্জমধ্যে একখানা কাষ্ঠাসন ছিল। একটি পত্রবহুল বাদাম গাছের শাখা সেই আসনখানিকে যেন স্নেহচ্ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। অস্‌কার সেই আসনে বসিবার জন্য অগ্রসর হইল। সে বসিবার উপক্রম করিতেছে, সহসা কাহারও কর্কশ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল —"হয়ে গেছে !"

চমকিতভাবে অস্‌কার চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ; কিন্তু কই, কোথাও ত কেহ নাই ? আসনেও কেহ বসিয়া ছিল না। তবে ?—সে পুনরায় বসিবার উপক্রম করিল, আবার পূর্ব্ববৎ কেহ বলিয়া উঠিল, "হয়ে গেছে !"

যুবক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হইল। সাহস সঞ্চয় করিয়া সে এবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "কে ওখানে—কে কথা কইছ গা ?"

উত্তর আসিল, "দুষ্টু !"

সঙ্গে সঙ্গে কেহ যেন বিদ্রূপভরে হাস্য করিল।

অত্যন্ত বিস্মিতভাবে অস্‌কার মাথার উপরে, পত্রবহুল শাখার ভিতরে—যেখান হইতে শব্দ আসিতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল। অল্প চেষ্টায় সমস্যার সমাধান, রহস্যের উদ্ভেদ হইল। সে দেখিল, পাতার ফাঁক দিয়া এক শ্বেতকায় সুন্দর শুকপক্ষী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। পাখীর চোখ দুইটি যেমন উজ্জ্বল, তেমনই চাতুরী-ভরা !

যেন অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার অভিপ্রায়ে পাখী বলিয়া উঠিল, "নমস্কার ! সুপ্রভাত !"

অস্‌কার সহাস্যে বলিল, "নমস্কার ! নমস্কার ! বড় চমৎকার জীব ত তুমি ! কোথায় ঘর তোমার, বল ত ? নাম কি ?"

আরও একটু নিকটে আসিয়া পাখী বলিল, "জক্‌, জক্‌।"

"বেশ, জক্‌, তুমি আর একটু নেমে এস। তোমার গায় হাত দেবার জন্য আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে, ভাই!"

জক্‌ চীৎকার করিয়া বলিল, "দুষ্টু! দুষ্টু!"

হাসিতে হাসিতে অস্‌কার বলিল, "খুব প্রশংসা বটে!"

জক্‌ এবার যেন বন্ধুভাবে বলিল, "আমার প্রিয়তম!"

"হাঁ, ওহে আমি রাজি আছি। সব সময়ে ভদ্রভাবেই কথা বলা উচিত। কিন্তু সে ত হ'ল, এখন তোমাকে নামিয়ে আনি কি ক'রে? তোমাকে ত এখানে রেখে যেতে পাচ্ছি না। এস, নেমে এস, ভাই।"

সে পাখীর দিকে হাত বাড়াইয়া দিল—সে আরও একটু নিকটে আসিল। তার পর মাথাটা এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সে অস্‌কারের অঙ্গুলি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিল না।

"জক্‌ এস, লক্ষ্মীটি, আমি তোমায় ব্যথা দেব না। শীঘ্র এস।"

কিন্তু জক্‌ সে কথায় ভুলিল না। এক ঘণ্টা ধরিয়া সে অস্‌কারকে ত্যক্ত করিল। অনেক সাধ্যসাধনার পর, পাখী অস্‌কারের প্রসৃত হাতের উপর আসিয়া বসিল। সে তাহাকে গৃহে লইয়া চলিল।

বাসায় পৌঁছিতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বাটী আসিয়াই সে বাড়ীওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বৈকালের কাগজ দিয়ে গেছে?"

"না, মিঃ ক্যাম্‌নার, এখনও আসে নি। বাঃ, চমৎকার পাখীটি ত!"

রমণী হাত বাড়াইয়া দিল, কিন্তু ডানার ঝাপটা দিয়া পাখী বলিয়া উঠিল, "বুড়ী মাগী!"

ক্রুদ্ধা নারী বলিয়া উঠিল, "ভারী বদ্‌ জানোয়ার ত! মিঃ ক্যাম্‌নার, আপনি ওকে ঘরে রাখবেন না কি?"

"নিশ্চয় না। জক্‌ ত আমার নয়। বাগানে আমি ওকে পেয়েছি। সম্ভবতঃ ও পালিয়ে এসেছে। কাগজে বিজ্ঞাপন থাক্‌বার সম্ভাবনা। পাখীর মালিকের সন্ধান পেলে তাঁকে দিয়ে আস্‌তে হবে। কাগজ এলেই আমাকে দিতে ভুল্‌বেন না।"

অস্‌কার নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। জক উড়িয়া একটা আলমারীর উপর গিয়া বসিল।

যেন সে কাহাকে খুঁজিতেছে, এমনই ভাবে চারিদিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ইভা, ইভা, তুমি কোথায় গেলে?"

"ইভা কে? তোমার মনিব?"

পাখী বলিল, "আমার প্রিয়তমা!" সে পুনঃ পুনঃ ইভাকে ডাকিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে রুদ্ধদ্বারে করাঘাতশব্দ হইল।

অস্‌কার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই জক্‌ বলিয়া উঠিল, "ভেতরে এস।" সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীওয়ালী একখানা সংবাদপত্র হস্তে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আরক্তমুখে বাড়ীওয়ালী বলিল, "মিঃ ক্যাম্‌নার, ভারী সুখবর। পাখীটার নাম জক্‌ না?"

অস্‌কারের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই পাখী পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "হাঁ, জক্‌—জক্‌!"

উত্তেজিতভাবে বাড়ীওয়ালী বলিল, "যে পাখী খুঁজে দেবে, তাকে এক মোহর বক্‌শিস্‌ দেবার খবর বেরিয়েছে। তাদের মাথা নিশ্চয় বিগড়ে গেছে। এই ভীষণ পাখীটার জন্য এক মোহর পুরস্কার! রাজহাঁস বা ময়ূর হ'লে বরং শোভা পেত; পাতি-হাঁস হলেও চল্‌ত। কিন্তু—"

বাড়ীওয়ালীর বক্তৃতায় বাধা দিয়া অস্‌কার বলিল, "জক্‌ বড় চমৎকার পাখী। ওর দাম অনেক বেশী। যাক্‌, কাগজখানা আমায় দিন। কই, বিজ্ঞাপনটা দেখি? এই যে, এখানেই আছে।"

বিজ্ঞাপনে এইরূপ লেখা ছিল:—"একটি বৃহৎ শুকপক্ষী হারাইয়াছে। ইহার নাম জক্‌, ভারী বকিয়া থাকে। কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক লিণ্ডেন্‌ রোডে ৬নং আর্নলেভিলায় পৌঁছিয়া দিবেন। পুরস্কার এক মোহর।"

কাগজ রাখিয়া অস্‌কার ভাবিতে লাগিল। লিণ্ডেন্‌ রোড—উহা ত বাগানের কাছেই। আজই গেলে হয় না?

বাড়ীওয়ালী বলিল, "সারারাত ওকে এখানে রাখবেন না। সকালে যদি নিয়ে যান, তবে পাখীর মালিক হয় ত তখন অত টাকা দিতে চাইবেন না। বাস্তবিক এক মোহর! ঐ জানোয়ার—"

পাখী চীৎকার করিয়া বলিল, "বুড়ী মাগী !"

বাড়ীওয়ালী ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

লিণ্ডেন্ রোডে ৬ নং ভবনের সম্মুখে যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। বাহিরের দেওয়ালে ফলকে নাম লেখা ছিল, "ডবলু হেম্পল্, এম, ডি।" অস্কার ঘণ্টাধ্বনি করিল।

জনৈক পরিচারক দ্বার খুলিয়া প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে অস্কারের দিকে চাহিল। পরক্ষণেই বলিল, "ও! আপনি আমাদের জক্‌কে এনেছেন দেখছি। আমি খবর দিচ্ছি।"

অস্কার তাহার নামের কার্ড বা পরিচয়পত্র ভৃত্যের হাতে দিল। কয়েক মিনিট পরে এক আলোকিত কক্ষে সে প্রবিষ্ট হইল। জক্ যেন স্বগৃহে আসিয়া পরম তৃপ্তিবোধ করিতেছিল।

সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ইভা, ইভা, তুমি কোথায় ?"

দ্বার মুক্ত হইতে না হইতেই পাখী ঝাঁপাইয়া যে আসিতেছিল, তাহার স্কন্ধের উপর গিয়া বসিল।

অস্কার দুই পদ অগ্রসর হইল।

"এমন অসময়ে এসেছি, আপনাকে বিরক্ত করতে হ'ল ব'লে আমায় ক্ষমা—"

আর তাহার কথা ফুটিল না। মন্ত্রমুগ্ধবৎ সহসা সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ যে সেই! আজ কয় সপ্তাহ ধরিয়া সে যাঁহার ধ্যানে যাপন করিতেছে, সেই লোকললামভূতা সুন্দরীই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া! আজ এই নারীর রূপ যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল।

সুন্দরী তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। সে ক্ষুদ্র করপল্লব কি কোমল, কি স্নিগ্ধ! কৃতজ্ঞনয়নে যুবতী তাহার দিকে চাহিয়া গাঢ়ভাবে অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অর্দ্ধপথে সুন্দরী থামিয়া গেলেন। অস্কারের নয়নে যে আলোক জ্বলিতেছিল, তাহা বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে জক্ আনন্দধ্বনি সহকারে খালি বকিয়া যাইতেছিল, তাই রক্ষা।

অত্যন্ত প্রীতিভরে পাখী স্বামিনীর স্কন্ধের উপর বসিয়া নাচিতে নাচিতে পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল, "ইভা, আমার প্রিয়তমা ; ইভা, আমার প্রিয়তমা !"

কেমন করিয়া অস্কার পাখীর দেখা পাইয়াছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলে, ইভা হেম্পল্ মনোযোগ সহকারে শুনিতে লাগিলেন।

তার পর ইভা ভাবিলেন, প্রতিশ্রুত পুরস্কার এই ভদ্রলোককে কিরূপে তিনি দিবার প্রস্তাব করিবেন? ব্যাপারটা বড়ই সমস্যাপূর্ণ। অস্কার নিজেই কথাটা তুলিল।

"আপনি পাখীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। আমার অনুরোধ, কোন দরিদ্র পরিবারের উপকারের জন্য টাকাটা দিলেই ভাল হয়। আপনার সম্মুখে অল্পক্ষণের জন্যও যে আমি স্থান পেয়েছি, ইহাই আমার পর্য্যাপ্ত পুরস্কার।"

যুবক নতশীর্ষে অভিবাদন করিল। আবার সেই কোমল করপল্লবের স্পর্শ! সুন্দরী মধুর কণ্ঠে আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরমুহূর্ত্তে অস্কার অন্ধকার রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দাতিশয্যে অভিভূত হইয়া অস্কার দ্রুত গৃহে ফিরিল। অন্যদিনের তুলনায় আজ একটু পূর্ব্বেই সে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল; কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সারারাত্রি সে শয্যায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। প্রভাত হইলে সে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভ্রমণে বাহির হইল। শীতল প্রভাতবায়ুস্পর্শে তাহার উত্তপ্ত ললাট কথঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে কখন্ যে সে লিণ্ডেন্ রোডে উপস্থিত হইল, তাহা তাহার মনেও নাই।

৬ নং ভবনটি অতি সুদৃশ্য। গৃহের প্রাচীর আইভিলতায় সমাচ্ছন্ন, দ্বারপথের পিত্তল-ফলকটি সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

এখন কোথায় তিনি? শয্যার কোমল ক্রোড়ে কি সুখসুপ্ত? তাঁহার শয়নগৃহ রাজপথের দিকে, অথবা উদ্যানের সন্নিহিত?

চুপ! ও কিসের শব্দ? জানালা খোলার শব্দ নয় কি? বাতায়নপথে কনকপ্রভাতের মতই সুন্দর, গোলাপের মতই মনোরম একখানি অনিন্দ্যসুন্দর আনন দেখা দিল। হাঁ, ও মুখ যে তাঁহারই।

একটু বিব্রত হইয়া অস্কার মাথার টুপী তুলিয়া ধরিল। ব্রীড়াসঙ্কুচিতা, হাস্যময়ী সুন্দরীও প্রত্যভিবাদন

করিলেন। অস্কার জীবনে সে শুভ মুহূর্ত্তের কথা ভুলিতে পারিবে না।

পরদিবস 'আর্ণলে ভিলাতে,' অস্কার আবার দেখা দিল, আবার সেই মস্তকের মৃদু সঞ্চালন এবং হাস্যপ্রফুল্ল আনন হইতে 'নমস্কার' শব্দ তাহার কর্ণকুহরকে চরিতার্থ করিল। এমনই ভাবে দুই সপ্তাহ ধরিয়া পরস্পরের ক্ষণিক দেখা-শুনা ঘটিতে লাগিল। তার পর এক দিন প্রভাতে অস্কার ৬ নং ভবনে আসিয়া দেখিল, গৃহের জানালা দরজা সব বন্ধ।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, অস্কার তাহার প্রণয়-পাত্রীর গৃহের সম্মুখে অধীরভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। কিন্তু সে বাড়ীতে যে কোন লোক আছে, তাহার কোন পরিচয় সে পাইল না। পরদিবস সে পুনরায় তথায় আসিল—গৃহ পূর্ব্ববৎ লোকবর্জ্জিত। পুনঃ পুনঃ দুই তিন দিন যখন সে দেখিল, সে গৃহে জনপ্রাণী নাই, তখন নৈরাশ্যে তাহার হৃদয় পীড়িত হইল। নিজের গৃহে ফিরিয়াও আর সুখ নাই—দিনান্তে একবার দেখা মিলিতেছিল, যখন সে সম্ভাবনাও লুপ্ত হইল, তখন পৃথিবী তাহার কাছে অন্ধকার।

তাহার অন্তরতম প্রদেশ হইতে কেহ যেন বলিয়া উঠিল, "না, আর ঘরে থাকা কিছু নয়—বাহির হইয়া পড়!" সেই দিনই সে ট্রঙ্ক গুছাইয়া লইয়া গৃহত্যাগ করিল।

সমুদ্রকূলবর্ত্তী কোনও সাধারণ সহরে, একটি হোটেলে সে কয়েক দিনের জন্য একটা ঘর ভাড়া লইল। যে দিন অস্কার পৌঁছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে, গৃহসংলগ্ন বারান্দায় সে প্রাতরাশ ভোজন করিতেছে, এমন সময় হোটেলের ভৃত্য তাহাকে সংবাদপত্র আনিয়া দিল। আরাম-কেদারায় শুইয়া সে কাগজে মনোনিবেশ করিতে যাইবে, সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠে শ্রুত হইল:—

"নমস্কার, সুপ্রভাত!"

নারীকণ্ঠে প্রত্যভিবাদন করিয়া কেহ যেন বলিল, "সুপ্রভাত, জক্।"

আনন্দে অস্কার লাফাইয়া উঠিল। এ ত তাঁহারই কণ্ঠস্বর—সমগ্র অন্তর দিয়া সে যাঁহার পূজা করে, প্রাণ দিয়া যাঁহাকে ভালবাসে, তাঁহার কণ্ঠস্বর কি ভুলিবার?

বারান্দার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অস্কার পাখীকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিল, "জক্, জক্!"

জক্ মনোযোগ দিয়া সে আহ্বানবাণী শুনিল—এদিক্ ওদিক্ চাহিল। অবশেষে উপরের দিকে চাহিয়া সে অস্কারকে দেখিতে পাইল।

অমনই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "দুষ্টু, বজ্জাত!"

অস্কার শুনিতে পাইল, নারীকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "ছিঃ জক্, খারাপ কথা বল্‌ছিস্ কেন?"

"আমার প্রিয়তমা ইভা, আমার প্রাণপ্রতিমা ইভা!"

"কি হয়েছে, জক্?"

"জকের ক্ষিধে পেয়েছে।"

"ক্ষিধে পেয়েছে? তবে কিছু খাবার দেওয়া যাক্।"

জক্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "চিনি, চিনি, হুর্ রে!"

একখানি তুষারধবল সুডৌল বাহুর কিয়দংশ অস্কারের দৃষ্টিগোচর হইল। একাগ্র দৃষ্টিতে সে তাহার প্রণয়পাত্রীর বাহুর দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি এক টুকরা মিছরি বা চিনির ডেলা জক্‌কে দিলেন।

"এখন আর কিছু বল্‌বার নেই ত, জক্?"

"চিনি, চিনি, হুর্ রে।"

"না জক্, তোমার মত যারা ভদ্রঘরে পোষ মানে, তারা কি ব'লে থাকে?"

"দুষ্টু, বজ্জাত!"

ইভার কলহাস্যধ্বনি অস্কারের কানে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

"না, জক্, তখন বল্‌বে, 'ধন্যবাদ'!"

কিন্তু জক্ কিছুতেই থামিল না। সে পুনঃ পুনঃ "দুষ্টু, বজ্জাত" বলিয়া চলিল। শুধু তাহাই নহে, ঐ কথা বলিবার সময় সে বারবার এমন ভাবে অস্কারের দিকে চাহিতে লাগিল যে, যুবক অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিল।

ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া ইভা রেলিংএর ধারে আসিয়া উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। অস্কারের নয়নে নয়ন মিলিত হইবামাত্র সুন্দরীর আননে লজ্জার অরুণরাগ ফুটিয়া উঠিল।

"মিস্ হেম্পল্, আপনাকে দেখে আমার আনন্দ রাখবার স্থান নাই। আগে ভাবিওনি যে, এমন অতর্কিতভাবে এখানে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এখানে এসেছিলুম; কিন্তু আপনি যে এখানে আস্‌বেন,

তা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। আপনি দেখছেন—এ যেন নিয়তির খেলা!*

যুবতী বলিলেন, "আপনি এখানে কবে এসেছেন?"

"কা'ল সন্ধ্যায়। ও রকম ভাবে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌তে আপনার কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়। আজ সকালে বেড়াতে গিয়েছিলেন কি?"

"না, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?"

"অনুমতি হয় ত সানন্দে যাব।"

"বেশ, মিনিট দশেকের মধ্যে আমি বাইরে আস্‌ছি।"

ইভা চলিয়া গেলেন।

অস্‌কারও ঘরের ভিতর যাইতেছিল; কিন্তু জকের কণ্ঠস্বরে আবার সে আকৃষ্ট হইল। পাখী বলিতেছিল, "যায়গা নেই, যায়গা নেই।"

পাখী আবার কাহার সহিত স্থান লইয়া ঝগড়া বাধাইয়াছে, দেখিবার জন্য অস্‌কার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল। সে দেখিল, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসনে উপবিষ্ট। তাঁহাকে দেখিয়া সে খুসী হইতে পারিল না। ইঁহাকেই সে পূর্ব্বে ইভার সহিত বেড়াইতে দেখিয়াছিল। জনৈক পরিচারক তাঁহার জানুর উপর কম্বল চাপা দিতেছিল।

অস্‌কার ভাবিল, "সম্ভবতঃ ভদ্রলোকটি রুগ্ন—সেটা সৌভাগ্যের লক্ষণ। নহিলে বুড়া হয় ত আমাদের সঙ্গেই বেড়াইতে যাইতে চাহিতেন।" পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে অনুতাপ জন্মিল। এমন কথা সে কেন ভাবিতেছে, হয় ত ইনি ইভারই পিতা।

সেই মুহূর্ত্তেই পাখী বলিয়া উঠিল, "ইভা, কোথায় গেলে গা?"

অস্‌কার আত্মবিস্মৃতভাবে চিন্তা করিতেছিল; এই ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ভাবিল, হয় ত এতক্ষণে ইভা নিম্নে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। সে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—তাহার অনুমান যথার্থ—ইভা জকের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতেছিলেন।

দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া অস্‌কার নীচে নামিয়া আসিল। কয়েক মিনিট পরে সে ইভার পাশে পাশে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে লাগিল।

অস্‌কারের অনুমান যথার্থ। বৃদ্ধ ইভার পিতা। ভ্রমণশেষে বাসায় ফিরিয়া ইভা, পিতার সহিত অস্‌কারের পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহার পর যুবক সকল সময় এই যুবতী ও তাহার পিতার সান্নিধ্যে যাপন করিতে লাগিল। বাতের পীড়া বশতঃ বৃদ্ধ সকল সময় এই প্রণয়িযুগলের সহিত বেড়াইতে যাইতে পারিতেন না; কাছাকাছি হইলে যাইতেন। বহুদূর ভ্রমণকালে উভয়েই চলিয়া যাইত। প্রত্যাবর্ত্তনশেষে তাহারা মিঃ হেম্পলের গৃহে আহার করিত।

এইরূপে এক পক্ষকাল চলিয়া গেল। এক দিন সকালে ভ্রমণশেষে অস্‌কার ও ইভা বাসায় ফিরিয়া তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মিঃ হেম্পল, ভৃত্যসহ সমুদ্রকূলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ঘরে এক কোণে জক্ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে একা রাখিয়া সকলেই চলিয়া গিয়াছে—এ ব্যাপারটা আদৌ তাহার ভাল লাগে নাই। অস্‌কার ও ইভাকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া পাখী যেন একটু উৎসাহ বোধ করিল। সে তাড়াতাড়ি উড়িয়া, ইভার স্কন্ধদেশে বসিল।

অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত সে বার বার উচ্চারণ করিল, "প্রিয়তমা, আমার প্রিয়তমা!"

অস্‌কার জিজ্ঞাসা করিল, "জক্, কে তোমার প্রিয়তমা!"

জক্ চীৎকার করিয়া বলিল, "ইভা—ইভা!"

"তুমিই ভাগ্যবান্, জক্!"

ইভার সুন্দর আনন লজ্জার অরুণ আভায় আরক্ত হইয়া উঠিল। অস্‌কারের নয়নের গাঢ় দৃষ্টি তাঁহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ইভার দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন হইল।

ধীরে ধীরে ইভার করপল্লব গ্রহণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে অস্‌কার বলিল, "জকের কথা কি ঠিক, ইভা; অথবা তোমার অন্তরে আরও এক জনের জন্য স্থান আছে?"

জক্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "হয়ে গেছে, হয়ে গেছে!"

কিন্তু অস্‌কার সে দিকে কর্ণপাত করিল না। ইভার নীল নয়নযুগল চকিতে একবার তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিল। সে অতি সাবধানে ইভাকে আপনার কাছে টানিয়া আনিল এবং তুষারশুভ্র ললাটদেশে মৃদু চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিল।

যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এমনই ভাবে জক্ চীৎকার করিয়া উঠিল, "দুষ্টু, বজ্জাত!"

অঙ্গুলি উন্নত করিয়া ইভা বলিলেন, "চুপ কর, জক্, গালাগালি বন্ধ ক'রে দেও।" তার পর অতি কোমল কণ্ঠে যুবতী

বলিলেন, "আমার প্রিয়তমের নামটি কি বল ত, জক্? আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি, এখন এই ভদ্র লোকটিকে সেই নাম শুনিয়ে দাও ত?"

নিতান্ত অনুগত জনের ন্যায় জক্ বলিয়া উঠিল, "অস্-কার্-র্, অস্কার-র্!"

অস্কারের নয়নে এক অপূর্ব্ব আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার বিস্তৃত বাহুযুগলের মধ্যে ইভার মস্তক ঢলিয়া পড়িয়াছিল। জক্ চমকিতভাবে ইভার স্কন্ধদেশ হইতে উড়িয়া সন্নিহিত এক টেবলের উপর গিয়া বসিল। তথা হইতে সে এই প্রণয়িযুগলকে লক্ষ্য করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল—

"ইভা, অস্কার, চর্ রে!"

সে কণ্ঠস্বরে যেন আনন্দ ও তৃপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছিল। *

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

* ভিক্টর ব্যাও নামক প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ লেখকের জর্ম্মণ গল্পের ইংরাজী হইতে অনূদিত।

আইরিশ কবি ইটস্ (Yeats)

বিখ্যাত নোবেল পারিতোষিকের কথা সকলেরই সুবিদিত। প্রসিদ্ধ বিস্ফোরকাদির আবিষ্কর্ত্তা স্ক্যাণ্ডিভেসীয় ধনী নোবেল মহোদয়ের দান-শৌণ্ডতার ফলেই উহার প্রবর্ত্তন ঘটে। এই নোবেল পারিতোষিক প্রতিবর্ষে বিজ্ঞান, সাহিত্য, শান্তিস্থাপনাদি-কল্পে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়। ভারতবাসীর মধ্যে মাত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে এই পুরস্কারলাভ ঘটে। এবার কাহার ভাগ্যে এই পুরস্কারলাভ ঘটিবে, তাহা লইয়া অনেক গুজব শুনা গিয়াছিল। বঙ্গের জনৈক প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও পঞ্জাবের মুসলমান কবির নামও এই হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এবারের পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে আইরিশ কবি ইট্‌সকে (W. B. Yeats)। জগতের অন্যান্য সাহিত্যিকের তুলনায় আইরিশ কবি ইট্‌স্ এক হিসাবে অনেকের নিকটই অপরিচিত এবং তাঁহার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে অনেকের গাত্রদাহও উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতের ও আমেরিকার অনেক সংবাদপত্রই বলিতেছেন যে, ব্যক্তিগত হিসাবে এ সম্মান কবিবরকে প্রদত্ত হয় নাই; তবে পুনরুদ্দীপিত আইরিশ জাতীয় শক্তির সম্মানার্থেই তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া।

আইরিশ কবি ইটস্।

১৮৬৫ খৃঃ কবিবরের ডবলিন্ সহরে জন্ম হয়। বাল্যে ডবলিনের বিদ্যালয়ে (Dublin High School) শিক্ষালাভ করিয়া মধ্যবয়স হইতে কবিবর লণ্ডন সহরেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতা বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন এবং এই হেতু আমেরিকার সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ঘটে।

কবি ইংলণ্ডে বাস করিলেও ইংরাজীতে পদ্য লিখিলেও যাবজ্জীবন তিনি আইরিশ জাতীয় পুনর্জ্জাগরণ ও জাতীয় শক্তির পুনরুদ্দীপনের কল্পে সততই ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার কবিতাকে ও কাব্যগত ভাবকে অনেকেই জাতীয় পুনরুদ্দীপনের চিহ্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

মুক্তা-উৎপাদন

বহু পুরাকাল হইতে মুক্তা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশিষ্ট আভরণরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মুক্তার সৌন্দর্য্য ও মহার্ঘতার উল্লেখ করা অনাবশ্যক; তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। কিন্তু ইহা বোধ হয় সকলে জানেন না যে, মুক্তাব্যবসায়ে সম্প্রতি একটি নব-যুগ আসিয়াছে। এত দিন পর্য্যন্ত জগতের নানা স্থানে সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তাশুক্তি উত্তোলিত হইত বটে; কিন্তু শুক্তিমধ্যে মুক্তা পাওয়া না পাওয়া অনেকটা দৈবের উপর নির্ভর করিত। শত শত শুক্তি নষ্ট করিয়া দুই চারিটা মুক্তা পাওয়া যাইত। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির সহিত এরূপ নব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে যে, এমন কি, প্রত্যেক মুক্তাশুক্তিতে মুক্তা পাওয়া সম্ভবপর হইয়া দাঁড়াইতেছে। এই প্রণালী সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মুক্তার উৎপত্তি কিরূপে হয়, তাহা জানা আবশ্যক।

প্রাচ্যে প্রতীচ্যে অনেক স্থলে অগভীর সমুদ্র-গর্ভে অথবা জলমগ্ন বালুকা-প্রাচীরের গাত্রে কয়েক জাতীয় শম্বুক বাস করে। ইহাদের খোলার অভ্যন্তরেই মুক্তা পাওয়া যায়। এই প্রকার শম্বুকের মধ্যে Meleagrina margaritifera সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মুক্তাপ্রসবিনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুক্তাশুক্তি সাধারণ ঝিনুকের ন্যায় দুইটি খোলাযুক্ত (Bivalve)। শুক্তির সাধারণ গঠন অনেকেই দেখিয়াছেন। সর্ব্বোপরি কঠিন আবরণ অথবা খোলা, তাহার নিম্নেই একটি পুরু কোমল আবরণ ও তন্মধ্যে প্রকৃত জীব। কোমল আবরণ স্থানে স্থানে কুঞ্চিত ও কয়েকটি পর্দ্দাযুক্ত। মুক্তার উৎপত্তি সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের সাধারণ মত এই যে, পূর্ব্বোক্ত কোমল আবরণের কোন স্থানে কোন প্রকারে বাহ্যবস্তু প্রবিষ্ট হইয়া সংলগ্ন হইয়া গেলে মুক্তা-শম্বুক এক-প্রকার রস নিঃসরণ করিয়া উহা ক্রমশঃ ক্রমশঃ ঢাকিয়া ফেলে। এই কঠিনীভূত রসই মুক্তার উপাদান এবং উক্ত বাহ্যবস্তুই মুক্তা-উৎপত্তির কেন্দ্র। সাধারণতঃ ক্রিমিকীটের কীড়া মুক্তা-শুক্তিতে প্রবেশ করিলে শুক্তি আত্মরক্ষার্থ রস নিঃসরণ করে; কিন্তু কচিৎ হইলেও সামান্য বালুকাকণাও মুক্তার কেন্দ্ররূপে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। কোমল আবরণের ভিতর প্রথমে উৎপাদিত হইলেও মুক্তা ক্রমশঃ ক্রমশঃ সরিয়া গিয়া কঠিন ও কোমল আবরণের মধ্যস্থলে আসে ও উক্ত স্থানে সময়ে সময়ে অসংলগ্নভাবে থাকে। অনেক স্থলে কিন্তু মুক্তা খোলার অন্তর্ভাগের সহিত সংযুক্ত। উৎকৃষ্ট মুক্তা অল্পবিস্তর বৃত্তাকার। যেগুলি খোলার সহিত সংযুক্ত, অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং ভিতরে ফাঁপা, সেগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ও তাহাদিগকে Blister Pearl বলে।

মুক্তা-ব্যবসায়

জগতের কতিপয় স্থলের মুক্তাক্ষেত্র প্রসিদ্ধ। ভারতের নিকট মুক্তা-উত্তোলনের স্থান দুইটি। বর্ত্তমান সময়ে সিংহলের মুক্তা-ক্ষেত্রই প্রাচ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা রাজসরকারের একচেটিয়া। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিলে সরকার কর্ত্তৃক মুক্তা-উত্তোলনের অনুমতি প্রদত্ত হয়। সরকার পূর্ব্ব হইতেই সকলকে জানাইয়া দেন যে, কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে মুক্তা তোলা হইবে। সেই অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কালে শুক্তি তোলার নৌকা সকল মুক্তা-ক্ষেত্রের নিকট উপস্থিত থাকে। সরকারী সঙ্কেত পাইলেই যে যাহার নির্ব্বাচিত স্থান তাড়াতাড়ি গিয়া অধিকার করিয়া লয়। তৎপরে কার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিতে থাকে। ব্রহ্মদেশের মারগুই উপকূলে আর একটি মুক্তা-ক্ষেত্র অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে জাপানী ব্যবসায়িগণেরই প্রাধান্য। উত্তোলনের বন্দোবস্ত মোটামুটি সিংহলের ন্যায়। এতদ্দেশে বোম্বাই সহরই মুক্তাব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। প্রতি বৎসর এই স্থান হইতে অন্যূন তিন কোটি টাকার মুক্তা বিক্রয় হয়। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, মুক্তা-শুক্তির খোলার অন্তর্ভাগও মূল্যবান্ পদার্থ। এই চাকচিক্যশালী আবরণকে 'mother of pearl' বলে; অন্যান্য প্রকার ঝিনুকেও mother of pearl পাওয়া যায়। মাদ্রাজ

উপকূলের ঝিনুক ও শাঁখ প্রায় বঙ্গদেশেই আসে ও তদ্দারা নানাপ্রকার অলঙ্কার, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানেও উৎকৃষ্ট ঝিনুক পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে শুধু mother of pearlএর জন্যই মুক্তা-শুক্তি চাষ হইয়া থাকে—যেমন মার্কিণের কালিফর্ণিয়া উপসাগরে।

কোন কোন সময় একাধিক মুক্তা যুক্তাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উদাহরণ Southern cross নামক বিশ্ব-বিশ্রুত মুক্তারাজি। এই ক্রশাকার মুক্তা দীর্ঘ-দণ্ড সাতটি মুক্তা দ্বারা গ্রথিত ও প্রায় ১।০ দেড় ইঞ্চ লম্বা। দণ্ডের উপরিভাগ হইতে দ্বিতীয় মুক্তাটির দুই দিকে আর দুইটি মুক্তা আছে। সব কয়েকটির আকার প্রায় সমান। এরূপ অদ্ভুত প্রণালীতে মুক্তা-সন্নিবেশ ও এত সমুজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট মুক্তারাজি জগতের মধ্যে বিরল। বস্তুতঃ পশ্চিম-অষ্ট্রেলিয়ায় কেলি নামক যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শুক্তি-গর্ভে এই মুক্তা দেখিতে পান, তিনি উহাতে ক্রশের সাদৃশ্য দেখিয়া এত বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়েন যে, তিনি উহা ঐশ্বরিক শক্তির সাক্ষাৎ বিকাশ মনে করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ফেলেন। প্রায় দেড় বৎসর পরে কেলির প্রভু উহার সন্ধান জানিতে পারিয়া মাটী হইতে মুক্তাটি খুঁড়িয়া বাহির করেন। দুর্দ্দৈবক্রমে নাড়াচাড়া করিতে গিয়া জনৈক ব্যক্তির হস্তচ্যুত হইয়া মুক্তাটি ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু উহা এরূপ কৌশলের সহিত জোড়া হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের মুক্তা-বিশেষজ্ঞরাও মুক্তাটি যে কোন সময় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহা ধরিতে পারেন নাই। মুক্তাব্যবসায়ের ইতিহাস উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর। কয়েকটি ঐতিহাসিক মুক্তার আলোচনা করিলে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্ষিত মুক্তার অপূর্ব্ব আখ্যায়িকার নিকট মুক্তার পুরাতন ইতিহাসও পরাজিত হইয়াছে। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে মুক্তাকীট দ্বারা যে, মুক্তা নিজ ইচ্ছাক্রমে উৎপাদন করাইয়া লইতে পারে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

জাপানী কৃতিত্ব

নব্য জাপান যুদ্ধ-বিদ্যার ন্যায় জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক বিভাগেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চ্চার পরিসর সেই জন্য জাপানে শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সীমা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মিকিমতো নামক জনৈক কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য জাপানী দুইটি খোলাযুক্ত শম্বুক প্রজনন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পরীক্ষায় এতদূর সফলকাম হয়েন যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের তোকিও প্রদর্শনীতে কয়েক জাতীয় সঙ্কর শম্বুক সাধারণকে দেখাইতে পারেন। অনেকেই এই সকল শম্বুক দেখিয়া চমৎকৃত হয়েন এবং অবশেষে এক জন মুক্তাতত্ত্ববিদ্ মিকিমতোকে বলেন যে, তিনি যখন শম্বুকপ্রজননে এতদূর দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তখন মুক্তা উৎপাদনও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। কথাটা মিকিমতোর মর্ম্ম স্পর্শ করে এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি মুক্তা উৎপাদনের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দেন। মুক্তা-শুক্তি দুইটি খোলাবিশিষ্ট হইলেও সাধারণ শম্বুকের সহিত ইহার জীবনপ্রণালীর অনেক পার্থক্য আছে। প্রথম প্রথম পরীক্ষায় অনেক শুক্তি মরিয়া যাইতে লাগিল, বাঁচিলেও তাহাদিগকে দিয়া মুক্তা উৎপাদন করা গেল না। কিন্তু মিকিমতো তাঁহার জাতিসুলভ অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে আবার নূতন পদ্ধতিতে পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। এবার ফল অনেকটা আশাপ্রদ হইল। সাত বৎসর ক্রমাগত পরীক্ষার পর শুধু যে তিনি মুক্তা-শুক্তির জীবনপ্রণালী সম্যক্‌রূপ বুঝিতে পারিলেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহার প্রথম মুক্তা-ফসলও লাভ করিলেন। অবশ্য এই ফসল পূর্ব্বোক্ত blister pearl জাতীয়; অর্দ্ধ-পরিপুষ্ট ও কম মূল্যবান্ মুক্তা। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রথম ফসল হইতেই বুঝিতে পারা গেল যে, মুক্তা-উৎপাদন মানবের সাধ্যায়ত্ত। অর্দ্ধমুক্তাগুলি বিক্রয় হইতে অধিক সময় লাগিল না। দুইটি অর্দ্ধমুক্তা একত্র করিয়া সোনার পাত দিয়া জুড়িয়া পূর্ণ মুক্তারূপেও কতক বিক্রয় হইল।

প্রথমবারের মুক্তাগুলি খোলার সহিত সংযুক্ত ছিল। অতি সন্তর্পণে উহাদিগকে কাটিয়া বাহির করিতে হইত। এক্ষণে মিকিমতো সঙ্কল্প করিলেন যে, এরূপ মুক্তা উৎপাদন করিতে হইবে, যাহা খোলার সহিত জুড়িয়া না যায় ও যাহা পূর্ণ পরিপুষ্ট হইয়া সুগোল হয়। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, পৃথিবীর অন্যান্য স্থলে মুক্তা-উৎপাদনের যে চেষ্টা হইয়াছিল, তাহাতে blister pearl পর্য্যন্তও পাওয়া গিয়াছিল। পূর্ণ সুগোল মুক্তা জন্মাইবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই বিফল হইয়াছিল।

কিন্তু মিকিমতো ভগ্নোদ্যম হইবার লোক নহেন। এই প্রকার পরীক্ষার বিগত নিষ্ফলতা জানিয়াও তিনি দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার শুক্তি উত্তোলিত হইয়া বিশেষ প্রক্রিয়ার পর আবার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিল, বিপুল শ্রমিক-বাহিনী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় হইতে লাগিল—কিন্তু ফল হইল সেই অর্দ্ধ-মুক্তা; যাহা হইতে খরচের এক-চতুর্থাংশও উঠে না। দশ বৎসরের অধিক কাল এই ভাবে অতীত হইল। মিকিমতোর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কায় মুক্তা-উৎপাদন কার্য্যে বাধা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মিকিমতোর দৃঢ়প্রতিজ্ঞা যে, মুক্তা উৎপাদনরহস্য যদি মানব দ্বারা উদ্ঘাটন করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তিনি তাহা করিবেন। অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরীক্ষাকৃত শুক্তিসমূহ পর্য্যবেক্ষণকালে মিকিমতো একটি শুক্তি পাইলেন—উহার ভিতর খোলার সহিত অসংলগ্ন একটি সুগোল সুন্দর মুক্তা! মিকিমতোর আনন্দের সীমা রহিল না। এত দিনের সাধনা আজ সফল হইয়াছে! ইহার পাঁচ বৎসর পরেই কর্ষিত মুক্তা বাজারে আসিতে আরম্ভ করিল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মুক্তার বাজারে ভয়ঙ্কর হৈ চৈ পড়িয়া গেল। স্বভাবজ মুক্তাব্যবসায়িগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাহাতেই বুঝা গেল যে, মিকিমতোর জয় হইয়াছে। কর্ষিত মুক্তা আর বৈজ্ঞানিকের খেলা নয়—ইহা বাস্তবিকই দুষ্প্রাপ্য স্বভাবজ মুক্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে। এখনও পর্য্যন্ত মিকিমতোর অর্দ্ধ মুক্তার কারবারই খুব বড়; তাহার তুলনায় পূর্ণ মুক্তা সামান্য পরিমাণেই উৎপাদিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ এ পর্য্যন্ত যাহা করিতে পারে নাই, মিকিমতো তাহা করিয়াছেন। তাঁহার শ্রম, অর্থব্যয় ও গভীর গবেষণা যে অচিরেই বিপুল ধনাগম দ্বারা সফল হইবে, সে সম্বন্ধে আজকাল আর কেহই সন্দেহ করেন না।

উৎপাদন-প্রণালী

মুক্তা উৎপাদনের মূল ভিত্তি শুক্তিশরীরে কোন প্রকার বাহ্যবস্তুর অবস্থিতি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্বভাবজ মুক্তা প্রায় অধিক সময়ই ক্রিমিকীটকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হয়। মিকিমতোর মুক্তা জন্মাইবার প্রথা অন্যরূপ। শুক্তির কোমল আবরণের সহিত কঠিন আবরণের যতক্ষণ যোগ থাকে, ততক্ষণ কোমল আবরণবাহিত রস সমস্তই কঠিন আবরণের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য ব্যয়িত হয়। কিন্তু যদি কোমল আবরণের সামান্য ক্ষুদ্রাংশ কাটিয়া লইয়া শুক্তি-শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কার্য্যতঃ উহা বাহ্যবস্তুর ন্যায় আচরণ করে অথচ কর্ত্তিত অংশের কোষ সমূহ মরিয়া না যাওয়ায় উহাদের বৃদ্ধিশক্তি অটুট থাকে। স্থূলতঃ মিকিমতোর প্রথা এই যে, তিনি কোমলা-বরণের এক টুকরা কাটিয়া লইয়া, উহার ভিতর এক খণ্ড mother of pearl দিয়া শম্বুকশরীরে নিহিত করেন। mother of pearl খণ্ড মুক্তার ভিত্তিরূপে কার্য্য করে; উহারই চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে মুক্তারস (nacre) জমিতে থাকে।

বর্ণনায় এই কার্য্যটি যত সোজা বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত-পক্ষে তাহা নয়। প্রথমতঃ মুক্তা-শুক্তি তেমন কষ্ট-সহিষ্ণু জীব নয়, এবং দ্বিতীয়তঃ কোমল আবরণখণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্য যে অস্ত্রচালনা আবশ্যক, তাহা কেবল বিশেষ নিপুণ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিই করিতে পারে। শুক্তিগাত্রে দক্ষভাবে অস্ত্র-চালনার জন্য মিকিমতো বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির একটি দল গঠন করিয়াছেন। তাহারাই এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার অস্ত্র-চালনার আর একটি গুরুতর অন্তরায় এই যে, লৌহ অথবা অন্য কোন প্রকার ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র শুক্তিগাত্রে প্রয়োগ করা চলে না। তাহাতে শুক্তি মরিয়া যায়। সেই জন্য অধাতব অস্ত্রের উদ্ভাবনা করা হইয়াছে। এই সমুদয় অস্ত্র বিশেষ সাবধানতার সহিত চালনা করিতে হয়; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, খুব নিপুণ হইলেও এক জনে এক দিনে ৫০টির অধিক শুক্তির উপর অস্ত্রচালনা করিতে পারে না। প্রত্যেক বার অস্ত্রচালনা কার্য্যে একজোড়া শুক্তি দরকার হয়। তন্মধ্যে একটি কোমলাবরণ কাটিয়া লইবার জন্য; উহা মরিয়া যায়। পরে দ্বিতীয় শুক্তিটির খোলা উন্মুক্ত করিয়া উহার গাত্র চিরিয়া mother of pearl খণ্ড সহ কর্ত্তিত কোমলা-বরণটি প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। কোমলাবরণের টুকরাটি থলের ন্যায় আকারের ও উহার মুখ রেশমসূত্র দ্বারা আবদ্ধ। থলেটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঠিক বসাইয়া দিবার

পর একটি কৌশল পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। যাহাতে কর্ত্তিতাংশ খোলার নিকট না আসে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজনীয়। কারণ, তাহা হইলে উক্ত অংশ খোলার সহিত সংলগ্ন হইয়া যাইবে এবং হয় অপকৃষ্ট মুক্তা হইবে কিংবা আদৌ জন্মিবে না। অস্ত্রচালনার পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত জীবাণুনাশক দ্রাবণ দ্বারা ক্ষত ধৌত করাইয়া শুক্তিগুলিকে পিঞ্জরের ভিতর কিছুক্ষণ রাখিয়া পরে জলে নামাইয়া দেওয়া হয়। অস্ত্রচালনা ঠিক হইয়া থাকিলে অল্পদিনেই ক্ষত আরাম হইয়া যায় এবং কর্ত্তিতাংশ শুক্তি-শরীরে নিহিত থাকিয়া mother of pearl গুণকে ভিত্তি করিয়া মুক্তা প্রস্তুতের সহায়তা করিতে থাকে। আমরা বাহুল্যভয়ে এখানে খুব সংক্ষেপতঃ উৎপাদন-প্রণালী বিবৃত করিলাম। কিন্তু উপযুক্ত শুক্তি নির্ব্বাচন, জলবায়ু ও তাপের সাময়িক অবস্থা, শম্বক পালনের স্থাননির্ণয় প্রভৃতি বিষয়ের দিকেও মুক্তা-উৎপাদনকারীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

শুক্তি ক্ষেত্র

সমুদ্রগর্ভে যে সমুদয় ক্ষেত্রে মিকিমতো মুক্তা উৎপাদন করেন, সেগুলি জাপানের আগো উপসাগরের তটে প্রায় ৫০ মাইল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। আগো উপসাগরে ঝড়বৃষ্টি অথবা তুফানের উপদ্রব কম। বহু পুরাকাল হইতে এখানে মুক্তাশুক্তি পাওয়া যায়। ইহার বেলাভূমি অল্লোষ্ণ জল-প্রবাহ দ্বারা ধৌত বলিয়া মুক্তা শুক্তির পরিপুষ্টির পক্ষে ইহা অনুকূল অবস্থাযুক্ত স্থান। মুক্তাক্ষেত্রগুলির মোট বর্গফল ৩০০০০ বিঘার কম হইবে না। ইহা হইতেই মুক্তা-শিল্পের পরিসর সহজে অনুমান করিতে পারা যায়। সমস্ত বৎসর ধরিয়া গড়ে প্রায় ১০০ স্ত্রীলোক এই সমুদয় ক্ষেত্রে কাম করে। সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর মাস মুক্তা-ফসল তুলিবার প্রধান সময়। তখন শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতে দাঁড়ায়। জাপানে এই সমুদয় স্ত্রীলোক শ্রমিককে 'সমুদ্র-বালিকা' বলে। কারণ, সমুদ্রজলে ডুবিয়া শুক্তি উত্তোলনই ইহাদের কাম। ইহাদের পোষাকও একটু বিচিত্র রকমের —গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত নিকার-বোকারের মত এক প্রকার সাদা টাইট্ পরিচ্ছদ, মাথার চুল তালুপ্রদেশে খুব শক্ত ঝুঁটি করিয়া বাঁধা ও মুখে ডুবুরীর মুখোস্। মুখোসের সম্মুখে কাচের ভিতর দিয়া সমুদ্রগর্ভে সকল জিনিষই দেখা যায়। এক একটি ডুবুরী একসঙ্গে জলের নীচে ৮০ সেকেণ্ডের অধিক সময় থাকে না। সংগৃহীত শুক্তি আনিয়া জলের উপর ভাসমান পাত্রে ছাড়িয়া দেয়। মুক্তা-ফসল তুলিবার সময় প্রত্যেক স্ত্রীলোক দিনে প্রায় ৯০ মিনিট জলে ডুবে—কিন্তু একসঙ্গে নয়। উহাদের মোট কার্য্যের সময় ৩০ মিনিট করিয়া তিনটি ভাগে বিভক্ত। শীতকালে ৩০ মিনিটেই কার্য্য শেষ হয়। ছোট বড় হিসাবে ডুবুরী নৌকায় ১০ হইতে ২০ জন স্ত্রীলোক থাকে। অনেক শ্রেণীর শ্রমিক অপেক্ষা 'সমুদ্র-বালিকাগণ' উচ্চহারে বেতন পাইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে উহারাই নিজ নিজ স্বামী প্রতি-পালন করে।

মার্কিণে শুক্তিচাষ।

মার্কিণে এখনও মুক্তা উৎপাদিত হয় নাই; কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে mother of pearl উৎপাদিত হইতেছে। কালি-ফর্ণিয়া উপসাগরই এই চাষের কেন্দ্র। উপসাগরের এক কোণে পাকা প্রাচীর দিয়া একটি হ্রদ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং ইহা স্থলভাগের দিকে একটি আঁকাবাঁকা সিমেণ্ট নির্ম্মিত খালের সহিত সংযুক্ত। খালটি শিশু শুক্তি প্রতি-পালনের জন্য। শুক্তিজননের সময় স্তরে স্তরে কাঠের দেরাজযুক্ত, তারের জালমণ্ডিত বড় বড় বাক্স হ্রদমধ্যে নামা-ইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে নবপ্রসূত শুক্তি সমূহ আশ্রয় পাইয়া বাড়িতে থাকে। ১-২ ইঞ্চ বড় হইলে উহাদিগকে খালে আনয়ন করা হয় ও উহাদের গাত্রসংলগ্ন আবর্জ্জনাদি পরিষ্কার করিয়া ৮।৯ মাস কাল উহাদের বৃদ্ধি ও পরি-পুষ্টির জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। পরে উহাদিগকে আবার বাক্স সমেত হ্রদে নামাইয়া দেওয়া হয়। হ্রদের তল-দেশ পাথর দিয়া বাঁধান এবং বাক্সগুলি উঠাইবার নামাইবার জন্য উপর হইতে নীচু পর্য্যন্ত সিমেণ্টের ঢালু রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। হ্রদগর্ভে তিন বৎসর থাকিলেই ঝিনুক-গুলি পূর্ণ পরিপুষ্ট হয় এবং তৎসমুদয় হইতে প্রাপ্ত mother of pearl বোতাম ও অন্যান্য অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

ভারতে মুক্তা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

ভারতের উপকূলে এমন কতিপয় স্থান আছে, যেখানে চেষ্টা করিলে মুক্তা উৎপাদন অসম্ভব নয়। কিন্তু সে সম্বন্ধে

এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। মুক্তা উৎপাদনের কথা ছাড়িয়া দিলেও মুক্তা-শুক্তি উৎপাদন যে ভারতে অনায়াসে হইতে পারে ও mother of pearl যে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সুন্দরবনের সাগরসন্নিহিত অংশের মধ্যেই এমন অনেক স্থান আছে, যাহা মুক্তা-শুক্তি উৎপাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী। দুঃখের বিষয় যে, এ যাবৎ এ কার্য্যে কেহ নামেন নাই। Chank fisheries সম্বন্ধে ২।১ বার সরকারী অনুসন্ধান হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার কোন ফল হয় নাই। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় মুক্তা-শুক্তি-প্রজনন যখন অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতের ন্যায় বহুসহস্র ক্রোশব্যাপী উপকূলবিশিষ্ট দেশের যে এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

বাণী-বরণ

১

আজি জননী তোমার অমল আভায়
দীপ্ত ধরণী-তল
মূর্চ্ছিত যত সন্তাপ শোক
যন্ত্রণা-হলাহল।
দিকে দিকে আজি আহ্বান-বাণী,
পরশিছে তব চরণ দু'খানি,
তমসার বুকে উষালোক তাই
ফুটিয়াছে নিরমল।

২

এস বাণী এস বেদের জননী
স্বরগের বাস ত্যজি',
মর্ত্ত্যের বুকে নবীন আলোকে
জীবন জাগাও আজি।
মোহগত প্রাণ উঠুক নাচিয়া
মরণ আবার উঠুক বাঁচিয়া,
জ্ঞানের পুণ্য পরশে হউক
ধন্য এ ধরণীতল।

৩

এস মা জননী জাগে এ ধরণী
তোমারি করুণা লাগি';
তৃপ্তিবিহীন সুপ্তি ত্যজিয়া
রহিয়াছি সবে জাগি',
তুমি আসি হেথা বসিবে কখন
তারি লাগি চির-চঞ্চল মন,
পাতিয়া রেখেছি হৃদয়-আসন—
বিকসিত শতদল।

৪

নম নম বাণী নম বীণাপাণি
নমামি তোমারে আজি
অযুত কণ্ঠে মহিমা তোমার
ওই শুন ওঠে বাজি'—
জয় মা ভারতী, দেবী সরস্বতী,
চরণে তোমার শতকোটি নতি,
রহে যেন তাহে বন্ধন-ডোরে
মনঃ প্রাণ অচপল।

শ্রীপ্রভবদেব মুখোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

১

বহু লোকের ধারণা যে, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা এ দেশে এতকাল ধ'রে চ'লে আস্‌ছে যে, আজকের দিনে সে বিরোধকে মিলনে পরিণত করবার কোনও সহজ উপায় নেই। যে বিরোধের মূল অতীতে নিহিত, আর যে বিরোধ যুগ-যুগান্তর ধ'রে ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে, সে বিরোধ শুধু মুখের কথায় কিংবা কাগজের লেখায় দূর করা যাবে না।

যে বিরোধ আজকের দিনে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে, মূলত তা ঐতিহাসিক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভারতবর্ষের যে যুগকে আমরা মুসলমান যুগ বলি, সে যুগের ইতিবৃত্ত আমরা অনেকেই জানিনে। এমন কি, ভারতবর্ষের এই নিকট অতীতের অপেক্ষা তার দূর অতীত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অধিক পরিচিত। যদিচ মুসলমান যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস আছে, হিন্দুযুগের নেই।

এর একটি কারণ এই যে, মুসলমান যুগের কোনও হিন্দু ইতিহাস নেই। ঐতিহাসিক Vincent Smith বলেন যে, এই সাতশ বৎসরের ভিতর এমন একখানিও হিন্দু দলীল লিখিত হয় নি, যার সাহায্যে এ যুগের ইতিহাস গ'ড়ে তোলা যায়। এ যুগের দলীল ফার্সিতে এবং মুসলমানের রচিত।

এ কালের ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দুরা ফার্সি ভাষা জানেন না, এমন কি, সে ভাষার অক্ষরের সঙ্গে পর্য্যন্ত তাঁহাদের পরিচয় নেই। এ যুগ সম্বন্ধে আমাদের মনে যা কিছু অস্পষ্ট ধারণা আছে,সে ধারণা আমরা লাভ করেছি স্কুলপাঠ্য Text bookএর প্রসাদে। বলা বাহুল্য, Text book কেউ পড়ে না, সকলেই তা মুখস্থ করে. আর পরীক্ষা পাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যা আমরা মাথা থেকেই যত শীগ্‌গির পারি, বহিষ্কৃত ক'রে দিই। অতঃপর "ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ" অর্থাৎ তেলের ভাঁড় থেকে তেল ফেলে দিলে তার অভ্যন্তরে যেমন কিঞ্চিৎ তেল লেগে থাকে, সেইরূপ ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের মস্তিষ্কে জড়িয়ে থাকে।

ফলে আমরা যখন ভারতবর্ষের মুসলমান যুগ সম্বন্ধে লেখায় ও বক্তৃতায় স্নেহ প্রকাশ করি,তখন তা"ভাণ্ডানুসারী স্নেহবৎ"ই গাঢ় হয়। এই ত গেল আমাদের হিন্দুদের কথা। আমাদের শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদেরও যে উক্ত যুগ সম্বন্ধে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান আছে, তা বোধ হয় না।

তাঁদের কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁদের বিশ্বাস, ভারতবর্ষের মুসলমানমাত্রই মোগল-পাঠানের বংশধর; যেমন অনেক হিন্দুর বিশ্বাস যে, হিন্দুমাত্রেই মুনিঋষিদের বংশধর। এ উভয় বিশ্বাসই সমান সমূলক; অর্থাৎ অধিকাংশ হিন্দুও যাদৃক্ আর্য্যবংশী, অধিকাংশ মুসলমানও তাদৃক্ রাজবংশী। এ সব অদ্ভুত ধারণা মানুষের মন থেকে দূর করবার চেষ্টা অবশ্য পণ্ডশ্রম, বিশেষতঃ এ যুগে। কেন না, এ যুগে বিশ্বমানবের যুগধর্ম্ম হচ্ছে কুলুজি নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা করা। ইংরাজরা দাবী করেন যে, তাঁরা জর্ম্মণবংশীয় আর ফরাসীরা বলেন যে, তাঁরা ল্যাটিনবংশীয়। এ সব দাবীর একমাত্র সুফল হচ্ছে—পরস্পরের ভিতর আবার নূতন ক'রে মানসিক বিরোধের সৃষ্টি। মানুষের পক্ষে তার Origin খোঁজাটা বড় সুবুদ্ধির কায নয়। কেন না, তাতে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। পূর্ব্বপুরুষের সন্ধানে অতীতের মাটী বেশী খুঁড়লে মানুষ নাকি আবিষ্কার করতে বাধ্য যে, আদিম নর হচ্ছে বানর। অন্ততঃ এই ত বৈজ্ঞানিকদের মত।

২

সে যাই হোক, এ কথার ভুল নেই যে, মুসলমান যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণতঃ এ যুগের শিক্ষিত হিন্দু অজ্ঞ এবং শিক্ষিত মুসলমান বিশেষজ্ঞ নন।

তার পর ঐতিহাসিকদিগের মুখে আর একটি কথা শুনতে পাই যে, মুসলমান যুগে বাঙ্গালার কোনও ইতিহাস নেই। বক্তিয়ার খিল্‌জির আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভারতবর্ষের ইতিহাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ যুদ্ধ মারামারি কাটাকাটিকেই যাঁরা ইতিহাসের একমাত্র সম্বল মনে করেন,তাঁদের মতে বাঙ্গালার নবাবী আমল হচ্ছে ইতিহাসবর্জ্জিত যুগ। ফার্সিনবিশ হ'লেও এ যুগের বিশেষ কোনও বিবরণ জান্‌বার যো নেই। বাঙ্গালার ফার্সি ইতিহাস খুব কমই আছে, আর যে

দু'চারখানি আছে, সে দু'চারখানিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অতএব ঐতিহাসিকদিগের মতে এ সাতশ বৎসর বাঙ্গালীজাত যে বেঁচে ছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের বহুকাল থেকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাত। বাঙ্গালীর এতে কোনও দোষ নেই, কেননা, হিন্দুমাত্রেই আত্মবিস্মৃত জাত। বাঙ্গালার বিশেষত্ব এই যে, প্রায় হাজার বৎসর ধ'রে বাঙ্গালা ভারত-বিস্মৃত দেশ হয়ে পড়েছিল। বক্তিয়ার খিলিজির স্পর্শে এ দেশ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল, আর ইংরাজের স্পর্শে তার আবার জ্ঞান হয়েছে, এই হচ্ছে ঐতিহাসিকদিগের ধারণা।

৩

বাঙ্গালী মুসলমান যুগে বাঙ্গালার ইতিহাস না গড়ুক বাঙ্গালা সাহিত্য গড়েছে, এবং সেই সাহিত্য থেকে বাঙ্গালীর জীবনের ইতিহাস না পাওয়া যাক্‌, তার মনের ইতিহাস কতকটা পাওয়া যায়। যাকে আমরা মানবসমাজের বাহ্য ঘটনা বলি, তার মূলে আছে মানুষের মনোভাব আর বাহ্য ঘটনাও মানুষের মনের উপর তার ছাপ রেখে যায়। সুতরাং মুসলমান যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে সে যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, তাও কতকটা অনুমান করা যায়।

এই দুই জাতি এই সাতশ বৎসর ধ'রে পরস্পর যদি শুধু মারামারি কাটাকাটি করত, তা হ'লে উক্ত যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে তার কতকটা আভাষ নিশ্চয়ই পাওয়া যেত। যদিচ বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দুর রচিত সাহিত্য, তবুও সে সাহিত্যে মুসলমানের প্রতি হিন্দুর তাদৃশ বিদ্বেষভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা হ'তে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, যে কালে বাঙ্গালা সাহিত্য জন্মলাভ করে, অন্ততঃ সে সময় এ দেশে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মোটের উপর মিলে মিশে বাস করতে শিখেছিল, এবং তাহাদের পরস্পরের ভিতর যে সব বিরোধের কারণ ছিল, তার একটা আপোষ মীমাংসা তারা ক'রে নিয়েছিল।

জেতা ও জিতের মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় জন্মানটা স্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে জেতা হচ্ছেন যুগপৎ বিদেশী ও বিধর্ম্মী। সুতরাং সে কালে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর সম্পূর্ণ মনের মিলন যে ঘটেনি, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের ফলে এ দেশে যে একটা বড় গোছের সামাজিক বিপ্লব ঘটেছিল, তার প্রমাণ বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। আমার ধারণা, মুসলমান বাদশারা বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ কোনও হস্তক্ষেপ করেননি। অন্ততঃ তাঁরা যে বাঙ্গালীর মনের উপর বিশেষ কোনও রকম জবরদস্তি করেননি, তার প্রমাণ বাঙ্গালা সাহিত্য, ও সাহিত্য কতক অংশে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরই জের টেনে নিয়ে এসেছে; আর কতক অংশে হিন্দুসমাজে যে সকল নূতন ধর্ম্মমত জন্মলাভ করেছিল, তাঁরই আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, বৈষ্ণবধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্ম, চণ্ডীর উপাখ্যান, মনসার উপাখ্যান এই সবই হচ্ছে বঙ্গসাহিত্যের উপাদান ও অবলম্বন। ইহা থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান যুগে অন্ততঃ বঙ্গদেশে হিন্দু সম্প্রদায় তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে। মুসলমানের ভাষাও বাঙ্গালা ভাষাকে রূপান্তরিত করতে পারেনি। আধা প্রাকৃত ও আধা ফার্সি উর্দ্দু নামক বর্ণসঙ্কর ভাষাও বাঙ্গালাদেশে জন্মলাভ করেনি। তাই মনে হয় যে, বাঙ্গালীর জীবনে ও মনে মুসলমানধর্ম্ম ও মুসলমান রাজশক্তি বিশেষ কোনও শক্তি প্রয়োগ করেনি।

৪

সাধারণতঃ বাঙ্গালীর ধারণা যে, "চণ্ডিদাসই" বঙ্গ-সাহিত্যের আদি কবি, এবং এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার বিশেষ কোনও কারণ নেই। সম্প্রতি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে কতকগুলি বৌদ্ধ দোঁহা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু শূন্যপুরাণ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। শুনতে পাই, এই দোঁহাবলি এবং এই পুরাণই বাঙ্গালাভাষার আদি পদাবলী ও আদি কাব্য। তবে ও দোঁহার ভাষা বাঙ্গালা ভাষা কি না, সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ আছে। আর শূন্যপুরাণ কবে লিখিত হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারেন না। উক্ত পুরাণের এক অংশে মুসলমান কর্ত্তৃক যাজপুরের মন্দিরভঙ্গের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, এ বর্ণনা হিন্দুযুগে লিখিত হয়নি, এবং শূন্যপুরাণের উক্ত অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত ব'লে উড়িয়ে দেবারও যো নেই। কেন না, যে ভাষার উপর ভিত্তি ক'রে উক্ত পুস্তকের প্রাচীনতা নির্ণয় করা হয়, উক্ত বর্ণনাও সেই একই ভাষায় লিখিত। সুতরাং গৌড়ের কোন্ মুসলমান বাদশা যাজপুরের হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেন, যত দিন সে খবর না পাওয়া যায়, তত দিন উক্ত কাব্য যে

চণ্ডিদাসের পূর্ব্বে রচিত, এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

একটি বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই। এ কাব্য হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকের লেখা এবং সেই শ্রেণী ছিল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও ঘোর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী। যদি শূন্যপুরাণের বর্ণিত ঘটনা সত্য ব'লে স্বীকার করা যায়, তা হ'লে স্বীকার করতে হবে যে, সেকালে বাঙ্গালার নীচ জাতিরা মুসলমান কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিনাশ অতিশয় আহ্লাদের বিষয় মনে করত, এক কথায় তারা মুসলমানদের ব্রাহ্মণ-অত্যাচারের হাত থেকে দেশের লোকের উদ্ধারকর্ত্তা মনে করত। উক্ত বর্ণনাটি একটু লম্বা হলেও এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। কেন না, আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে শূন্যপুরাণের পরিচয় নেই। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের অত্যাচারের এইরূপ বর্ণনা আছে :—

দখিন্যা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাহি পায়—
সাঁপ দিআ পুড়ায় ভুবন।
* * * * *
বলিষ্ঠ হইল বড় দস বিস হয়্যা জড়—
সদ্ধর্ম্মিরে করএ বিনাস।
বেদ করে উচ্চারণ বেরাএ অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনা কে করে পরিত্তান॥
এইরূপে দ্বিজগন করে সৃষ্টি সংহারন
ই বড় হইল অবিচার।
* * *
ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরূচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদাই বলিয়া এক নাম॥
* * *
যতেক দেবতাগন হয়্যা সভ্যা একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥

এ স্থলে বলা আবশ্যক, রামাঞি পণ্ডিতের মতে "যতেক দেবতাগণ হয়ে সভ্যা একমন" ইজার পরেছিলেন। উক্ত বর্ণনা থেকে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, বাঙ্গালার বৌদ্ধদের উপর ব্রাহ্মণের বিশেষ অত্যাচার ছিল এবং তারা মুসলমান-দের উক্ত অত্যাচারের হাত থেকে পরিত্রাণকর্ত্তা দেবতার অবতার মনে করত। তবে এ ঘটনা ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক বলা অসম্ভব। এই তারিখবিহীন গ্রন্থ বাদ দিয়ে আমাদের পরিচিত সাহিত্যে আসা যাক্।

৫

চণ্ডিদাসের পদাবলী প'ড়ে তিনি যে মুসলমান যুগে বাস করতেন, তার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর কাব্যে আরবী ফারসী শব্দ এক রকম নেই বল্লেই হয়—যদি দু দশটি থাকে ত সেগুলি খুঁজে বার করতে হয়। সুতরাং চণ্ডিদাসের যুগে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর যে কোনও বিষম গণ্ডগোল ঘটেছিল ব'লে ত মনে হয় না।—অন্ততঃ তাঁর মৌনতা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেকালে হিন্দুদের মুসলমান বাদশায় কোনও অসম্মতি ছিল না, কেন না, তাঁরা হিন্দুর ধর্ম্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতেন না।

চণ্ডিদাসের পর চৈতন্যের আবির্ভাবের কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য নীরব।

চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত নব বৈষ্ণবধর্ম্মের সৃষ্টির সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ধর্ম্ম নিয়ে যে বিবাদ ঘটবে, এ অনুমান সহজেই করা যায়। কেন না, এই নব বৈষ্ণবধর্ম্মে মুসলমানও দীক্ষিত হ'তে পারত, এবং ঐ সূত্রে যে মুসলমান রাজ-পুরুষদের সঙ্গে বৈষ্ণবসমাজের কতকটা বিরোধ ঘটেছিল, তার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিরোধ যে একটা বিষম গণ্ডগোলে দাঁড়ায়নি, তার পরিচয়ও উক্ত সাহিত্যেই পাওয়া যায়।—

চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সে সকল যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে সে সকল ঘটনা যে ঘটেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনই কারণ নেই। ইউরোপে যে সকল দলীলমূলে সে দেশের ইতিহাস রচিত হয়েছে, চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব-দলীলগুলিও সেই জাতীয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থগুলি থেকে সেকালের বাঙ্গালার অবস্থা অনেকটা জানা যায়।

জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে নবদ্বীপে

রাজভয়ের বর্ণনা আছে। সে সময় গৌড়ের বাদশা ছিলেন হুসেন শা, এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর হুসেন শার আক্রোশ ও অনুগ্রহের কথা শুধু চৈতন্যমঙ্গল নয়, চৈতন্য-ভাগবতেও পাওয়া যায়।

কবি জয়ানন্দ বলেন যে, নবদ্বীপের কাছে পিরল্যা নামে এক বিষম গ্রাম ছিল—যেখানকার অধিবাসী ছিল সব মুসলমান। আর যেহেতু, "ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে" সে কারণ পিরল্যাবাসিগণ, "গৌড়েশ্বর বিদ্যমানে" এই "মিথ্যাবাদ দিল" যে :—

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥
এই মিথ্যা কথা রাজার মনেতে লাগিল।
নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল॥

সুতরাং হুসেন শা কর্তৃক নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচারের কারণ political, religious নয়। এ অবস্থায়, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিচারে, সকল যুগের সকল রাজাই, যে সম্প্রদায় থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে, সে সম্প্রদায়কে উচ্ছন্ন দিতে কুণ্ঠিত হন না।

"তোমাকে বধিবে যে
গোকুলে বাড়িছে সে"—

এ কথা শুনে রাজা কংসও কিছু কম জুলুম করেননি।

ব্রাহ্মণদের উপর মুসলমানের অত্যাচারের—জয়ানন্দ যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যায় যে, অশ্বত্থ গাছের উপর ও হিন্দুর বাজনা বাজাবার উপর সেকালের মুসলমান-দেরও রাগ ছিল। উক্ত বর্ণনা থেকে দেখতে পাই যে—

নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥

তার পর—

গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥

অশ্বত্থ গাছের ডালকাটা নিয়ে আজও ভারতবর্ষের অপর প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের মারামারি হয়—কিন্তু কাঁঠাল গাছের উপরেও যে মুসলমানদের চোট ছিল, সে কথা পূর্ব্বে জানতুম না। বেচারা কাঁঠালের যে কি অপরাধ, তা বোঝা গেল না, কেন না, কাঁঠালের পাতা ত হিন্দুর পূজোয় লাগে না; তার ফুল কি ফলও ত কোনও দেবতাকে নিবেদন করা হয় না। সে যাই হোক, নবদ্বীপবাসীদের উপর এ অত্যাচার বেশী দিন চলেনি। হুসেন শা অচিরে এ অত্যাচার থামিয়ে নবদ্বীপের হিন্দুদের স্বধর্ম্ম-পালন করতে অবাধ অধিকার দেন। জয়ানন্দ বলেন যে :—

"গৌড়েন্দ্রের আজ্ঞা নবদ্বীপ সুখে বসু।
রাজকর নাহি সর্ব্বলোক চাষ চসু॥
আজি হৈতে হাট ঘাট বিরোধ যে করে।
রাজকর দণ্ডী হয়ে ত্রিশূল সে পরে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে অশ্বত্থ যে কাটে।
ত্রিশূলে চড়াহ তারে নবদ্বীপের হাটে॥
বৈদ্য ব্রাহ্মণ জত নবদ্বীপে বসে।
নানা মহোৎসব কর মনের হরিষে॥
নাট গীত বাদ্য 'বাজু' প্রতি ঘরে ঘরে।
কলসে পতাকা উড়ু মন্দির উপরে॥
পুষ্পের বাজার পড়ু গন্ধের উভার।
শঙ্খঘণ্টা বাজুক যন্ত্র জয় জয় কার॥
পূর্ব্বে জেমত ছিল নবদ্বীপ রাজধানী।
তার শতগুণ অধিক জেন শুনি॥
নবদ্বীপ সীমাএ জবন জদি দেখ।
আপন উৎসাএ মার; প্রাণে পাছে রাখ॥
দেবপূজা-কর সুখে যজ্ঞ হোম দান।
হাট ঘাট মানা নাহি কর গঙ্গাস্নান॥ (চৈতন্যমঙ্গল)

উক্ত আদেশ অবশ্য religious intolerance ওরফে fanaticismএর পরিচায়ক নহে। আর বৈষ্ণবের দল যে নবদ্বীপে "মনের হরিষে" "নানা মহোৎসব করেছিলেন" ও "নাটগীত বাদ্য" যে শুধু ঘরে ঘরে নয়, পথে ঘাটেও অহর্নিশি হ'ত, তার প্রমাণ ঐ নৃত্যগীতবাদ্যের চোটে যবনের নয়, নবদ্বীপের টোলের ব্রাহ্মণের কান ঝালাপালা ও প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছিল।

৬

হুসেন শার আমলে আর এক ঘটনা ঘটে—যাতে মুসল-মানের ধর্ম্মবিশ্বাসে বিশেষ আঘাত লাগবার কথা। যবন হরিদাস মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার কি ফল হয়, তার দীর্ঘ বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে আছে। আমি সে বর্ণনার কতক অংশ নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—তা থেকেই সেকালে হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর

মনোভাবের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। হরিদাস বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে—

"কাজি গিয়ে মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥'

এ সংবাদ পেয়ে হুসেন্ শা "ধরি আনাইল তানে শীঘ্রগতি।" হরিদাস "আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান" বাদশা তাঁকে "পরম গৌরবে বসিবারে দিল স্থান।"

তার পর ঃ—

'আপনে জিজ্ঞাসে তান মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই! তোমার কিরূপ দেখি মতি।
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত॥
জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমতে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিয়া যা কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা উচ্চার॥"

বাদশার প্রশ্নের উত্তরে হরিদাস ঃ—

বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বোলেন সকল মাত্র নিজ-শাস্ত্র মতে॥
যে ইশ্বর সে পুনি সভার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহান হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহো যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম্ম।
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
মহাশয় তুমি এবে করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার।"
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন।
শুনিঞা সন্তোষ হৈল সকল যবন॥ (চৈতন্যভাগবত।)

হরিদাসের এ বিচার উপন্যাস কি ইতিহাস বলা কঠিন। তবে বাদশার সঙ্গে হরিদাসের এ কথোপকথন কাল্পনিক হলেও, সেকালের হিন্দুর মনোভাবের এই সূত্রে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং—

এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ সেই বসে সভার হৃদয়॥

এ জ্ঞান যার মনে জন্মলাভ করেছে, তার মনে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষ কিছুতেই থাকতে পারে না। সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি tolerance তার পক্ষে স্বাভাবিক। আর হরিদাসের কথা শুনে যে, —"সন্তোষ হইল সকল যবন" বৃন্দাবনদাসের এ ধারণা যে অমূলক, এমন কথাও জোর ক'রে বলা যায় না। সেকালের মুলুকপতি ও তাঁর সম্প্রদায়ের মনে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি যদি তাদৃশ বিদ্বেষ থাকত, তা হ'লে চৈতন্যদেব তাঁর ধর্ম্ম বাঙ্গালায় অবাধে প্রচার করতে পারতেন না। সুতরাং বৃন্দাবনদাস যা বলেছেন,—তা verbally সত্য না হোক, psychologically সত্য।—বঙ্গসাহিত্য থেকে হিন্দু-মুসলমানের এরূপ মনোভাবের দেদার উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং এ সাহিত্য থেকে আমরা নির্ভয়ে এ অনুমান করতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমানের যে ধর্ম্ম-বিরোধের কথা আজ পলিটিক্সের ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে, সে বিরোধ বাঙ্গালী উত্তরাধিকারিত্বস্বত্বে লাভ করেনি। কোনও কোনও ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমান লেখক এই ব'লে হিন্দুদের শাসাচ্ছেন যে, হিন্দুরা যেন মনে রাখে যে, মুসলমানরা fanatic, আমরা কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্য থেকে প্রমাণ পাই যে, মুসলমানযুগে বাঙ্গালার মুসলমান ঘোর fanatic ছিল না। নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস করলেই যে পরধর্ম্ম-বিদ্বেষী হ'তে হবে—ভগবানের এমন কোনও নিয়ম নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

মানুষ-গণনা

নিখিল ভারতের হিসাব

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ভারতের লোকসংখ্যা গণনা করা হইয়াছিল। উহা ভারতের ষষ্ঠ আদমসুমারী। সম্প্রতি উক্ত আদমসুমারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টের লেখক সিভিলিয়ান মিঃ জে, টি, মার্টেন।

বিগত আদমসুমারীর হিসাব অত্যন্ত বিষাদজনক। ইহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই বিস্তীর্ণ দেশের বিশাল জনসঙ্ঘের উপর ধ্বংসের করাল-চ্ছায়া পতিত হইয়াছে। এ দেশের লোক স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। এ কথা সত্য যে, ইংরাজের শাসনপ্রভাবে ভারতে কোন প্রকার লোকক্ষয়কর সংগ্রাম নাই, নাদীর শাহের ন্যায় কোন নরশোণিতপিপাসু বিদেশী বা বৈদেশিক ব্যক্তি ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ আক্রমণ করে নাই; জাপানের ন্যায় কোন আধিদৈবিক উপপ্লবের ফলে অকস্মাৎ লোকসংখ্যা হ্রাস পায় নাই। তবে ভারতের লোকসংখ্যা যথানিয়মে বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন? ইহার কারণ, জনপদ-বিধ্বংসী ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষ। এই দুইটি কারণই উৎকট দারিদ্র্য হইতে উদ্ভূত, অজ্ঞতা অবশ্য ব্যাধিবিস্তারের আংশিক সহায়। সুতরাং দারুণ দারিদ্র্যের ফলে ভারতবাসী যে মরণের পথে যাত্রা করিতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষের ভূমিপরিমাণ ১৮ লক্ষ ৫ হাজার ৩ শত ৩২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৮ শত ৮০। তন্মধ্যে ইংরাজের অধিকৃত স্থানের বিস্তার ১০ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩ শত বর্গমাইল আর দেশীয় রাজ্যগুলির বিস্তার সর্ব্বসাকল্যে ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৩২ বর্গমাইল। নিখিল ভারতবর্ষের মধ্যে ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯ শত ৮১টি সহর ও গ্রাম বিদ্যমান। তন্মধ্যে ২ হাজার ৩ শত ১৬টি সহর এবং ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬ শত ৬৫ খানি পল্লীগ্রাম। ইহার লোকসংখ্যা ৩০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৮ শত ৮০। তন্মধ্যে সহরবাসীর সংখ্যা ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২ শত ৭৬, এবং পল্লীগ্রামবাসীর সংখ্যা ২৮ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ২ শত ৪ জন। ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১৬ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫ শত ৫৪ এবং নারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯ শত ২৬। নারী অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যায় ৯০ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬ শত ২৮ জন অধিক।

মোটের উপর ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ১ শত ৭৭ জন হিসাবে লোক বাস করে। তন্মধ্যে বৃটিশশাসিত ভারতে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২ শত ২৬ জন এবং দেশীয় রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ১ শত ১ জন করিয়া লোকের বাস। য়ুরোপের বহু দেশের তুলনায় ভারতে লোকের বসতি অত্যন্ত বিরল। যথা বেলজিয়মে প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ৬ শত ৫৪ জন; ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে প্রতি বর্গমাইলে ৬ শত ৪৯ জন; নেদারল্যাণ্ডে ৫ শত ৪৪ জন এবং জার্ম্মাণীতে ৩ শত ৩২ জন বাস করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ফ্রান্সে প্রতি বর্গমাইল ভূমিতে গড়ে ১ শত ৮৭; অষ্ট্রিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে ১ শত ৯৯; স্পেনে ১ শত ৭; মার্কিণ মুলুকে ৩২ জন মাত্র বাস করে। এসিয়ার মধ্যে জাপানে প্রতি বর্গমাইল ভূমিতে ২ শত ১৫ জন লোক বাস করিয়া থাকে। ভারতের ন্যায় প্রাচীন দেশের পক্ষে এই লোকবসতি অত্যন্ত ঘন নহে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর হিসাব হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিখিল ভারতে শতকরা ১.২ জন হারে লোক বাড়িয়াছে। ইংরাজশাসনকালে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম আদমসুমারী গৃহীত হয়। সেই সময় ভারতের লোকসংখ্যা ধার্য্য হয় ২০ কোটি ৬১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ শত ৬০ জন। ইহার ৯ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতে দ্বিতীয়বার আদমসুমারী গৃহীত হইয়াছিল। এবার নিখিল ভারতের লোকসংখ্যা হয় ২৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩ শত ৩০ জন। সুতরাং মোটামুটি হিসাবে ঐ দশ বৎসরে শতকরা ২৩.২ জন হারে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া ধার্য্য হয়। ১০ বৎসর পরে মোট ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ লোক বাড়ে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভারতের যে সকল স্থানে আদমসুমারী গৃহীত হইয়াছিল, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থানে আদমসুমারী গৃহীত হইয়াছিল। শেষোক্ত বৎসর যে সকল নূতন স্থানে আদমসুমারী গৃহীত হইয়াছিল, তাহার লোকসংখ্যা হইয়াছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। আর প্রথমবারের লোকগণনার দোষে যত লোক বাদ পড়িয়াছিল, তাহাদের সংখ্যাও হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ। এক্ষণে এই ৪ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বাদ দিলে বুঝা যায় যে, প্রথম ৯ বৎসরে মোট প্রায় ২৮ লক্ষ লোক বাড়িয়াছিল। সুতরাং বুঝা যায় যে, ঐ দশ বৎসরে ভারতে শতকরা ১৫ অর্থাৎ দেড় জন হারে লোক বাড়িয়াছিল কি না সন্দেহ।

তাহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আবার লোকগণনা হয়। সেবার ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ শত ৭১। অর্থাৎ মোটের উপর ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পায়। এবারও কতকটা নূতন স্থানে আদমসুমারীর কায প্রসারিত করা হইয়াছিল। সে জন্য এই ১০ বৎসরে ৫৭ লক্ষ নূতন লোক গণিত হইয়া আদম

সুমারীর হিসাবের মধ্যে প্রবেশ করে। এই বৎসর অধিকতর সাবধান হইয়া গণনার ব্যবস্থা করা হয়, সেই জন্য ৩৫ লক্ষ লোক গণনায় অধিক ধরা পড়ে। ফলে এই যে ৯২ লক্ষ লোক গণনায় নূতন ভুক্তন হইয়াছিল, তাহা প্রকৃত বৃদ্ধিজনিত নহে। কিন্তু তাহা হইলেও এবার গণনায় প্রায় ২ কোটি ৪২ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ঐ ১০ বৎসরে ভারতের লোক শতকরা ৯৬ অর্থাৎ সাড়ে নয় জনেরও অধিক হারে বাড়িয়া গিয়াছিল।

তাহার পর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভারতের চতুর্থ আদমসুমারী হইয়াছিল। ঐ বৎসর লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৫৬ জন। দশ বৎসরে ৭০ লক্ষ ৪৬ হাজার লোকবৃদ্ধি। এবারও কতকগুলি নূতন স্থানের হিসাব আদমসুমারীর লোকসংখ্যার মধ্যে গৃহীত হয়। সেই নূতন স্থানের লোকসংখ্যা ২৭ লক্ষ। আর গণনার পদ্ধতির উন্নতি করা হয় বলিয়াও ২ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পায়। মোটের উপর এই ২৯ অথবা বড় জোর ৩০ লক্ষ লোক বাদ দিলে ঐ ১০ বৎসরে লোক বৃদ্ধি পায় ৪০ অথবা ৪১ লক্ষ। সুতরাং এবার হিসাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় ১০ বৎসরে লোকবৃদ্ধির হার শতকরা ১'৪ অর্থাৎ দেড় জনেরও কম। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ১০ বৎসরে উপর্য্যুপরি ভারতে দুইটি বড় বড় দুর্ভিক্ষ হওয়াতে বহু লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। সেই জন্য এইবার লোক বৃদ্ধি পায় নাই।

তাহার পর লোক গণিত হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে। ঐ বৎসর গণনার দ্বারা ধার্য্য হয় যে, ভারতের লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩ শত ৯৬। সুতরাং এবার ১০ বৎসরে প্রায় ২ কোটি ৫ লক্ষ লোক বাড়ে। তন্মধ্যে এবারও গণনার পরিধিবিস্তারহেতু নূতন ধরা হয় ১৮ লক্ষ লোক। ঐ সংখ্যা মোট সংখ্যা হইতে বিযুক্ত করিলে হয় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ। এইবার ১ কোটি ৮৭ লক্ষ লোকই প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এই ১০ বৎসরে শতকরা ৬'৪ অর্থাৎ সাড়ে ছয় জনের কিছু কম লোক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ইহার পর গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আবার লোকগণনা হইয়াছে। ইহাই হইল ষষ্ঠ লোকগণনা। এবার লোকসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শত ৪০। অর্থাৎ মোটের উপর ৩৮ লক্ষ অধিক। এইবারও ২ হাজার ৬ শত ৭৫ বর্গমাইল স্থানে গণনার এলাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সে জন্য ৮৬ হাজার ৫ শত ৩৩ জন নূতন স্থানের লোককে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। সুতরাং গত বার মোটামুটি ৩৭ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ১'২ বা এক জনের কিছু অধিক হারে লোক বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি গণনার মধ্যেই আনা যাইতে পারে না। ফলে গত অর্দ্ধ-শতাব্দীতে এই ভারতের লোকসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে শতকরা ২০ জনের অতি অল্প অধিক হারে (২০'১) বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় এই লোকবৃদ্ধির হার অতি অল্প।

গত বিশ বৎসরে প্রায় এক কোটি (৯৮ লক্ষ) লোক প্লেগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯০১ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ৬৫ লক্ষ লোক প্লেগে মরে। ইহা ভিন্ন কলেরাতে অত্যন্ত অধিক লোক মরিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ ১০ বৎসরে শতকরা প্রায় সাড়ে ৬ জন হিসাবে লোক বাড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার পরের ১০ বৎসর-মধ্যে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী দেখা দেয়। মিঃ মার্টেন লিখিয়াছেন যে, ঐ রোগে যে কত লোক মরিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। মৃত্যু-রেজিষ্টারীতে রোগের নিদান-নির্ণয়ে গোল ঘটিয়াছিল। তবে তিনি একটা হিসাব ঠিক করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৭১ লক্ষ ইনফ্লুয়েঞ্জায় প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহার পরবৎসরও এই রোগে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ লোক মরিয়া যায়। ফলে দুই বৎসরে প্রায় ৮৫ লক্ষ লোক এই ব্যাধিতে যমালয়ে যায়। মিঃ মার্টেন ইহার পরে হিসাব করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, উল্লিখিত সংখ্যার অতিরিক্ত আরও ৪০ লক্ষ লোক ইন্ফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়াছে। এই অনুমান সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গিয়াছে।

প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়রোগ প্রভৃতি ব্যাধিতে এবং দুর্ভিক্ষের ফলে দরিদ্র লোকই অধিক সংখ্যায় মরিয়া থাকে। ১৯১৮-১৯ খৃষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী কেবল ভারতেই আবির্ভূত হয় নাই, ইংলণ্ডে ও ওয়েলসেও এই রোগ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে তথায় এত অধিক লোক মরে নাই। ১৯১১ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে তথায় গড়ে হাজারকরা ১৪'৩ জন হারে লোক মরিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ঐ সময়ে আয়ার্লণ্ডে গড়ে প্রতি বৎসর হাজারকরা প্রায় ১৭ জন শমনভবনে গমন করে। ইংলণ্ডের দরিদ্রদিগের মধ্যেই এই সংক্রামক ব্যাধিতে অধিক লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের মারাত্মকতা দেখিলেও এই সিদ্ধান্তই স্থির মনে হয় যে, ইহাতে গরীব লোকই অধিক ক্ষয় পায়। প্লেগসম্বন্ধেও এই কথা খাটে। দুর্ভিক্ষের ত কথাই নাই। সুতরাং এই বিড়ম্বনায় ভারতের প্রবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের লক্ষণই প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

মানবের ইতিহাস লইয়া গবেষণা আজ নূতন নহে; বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানের যুগে এই ইতিহাসের অনেক নূতন নূতন উপাদান বাহির হইয়াছে ও হইতেছে। ভূতত্ত্ব, প্রাচীন জীবতত্ত্ব, জান্তব বিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে মানব-ইতিহাসের অনেক নূতন নূতন কথা আমরা জানিতে পারিতেছি। প্রাচীন মানব ও উহা হইতে নব্য মানবজাতির উৎপত্তি লইয়া নৃতত্ত্ব—একটি নূতন বিষয় গঠিত হইয়াছে।

নৃতত্ত্ব ও প্রাচীন জীবতত্ত্বাদির আলোচনার সম্পর্কে আমরা মানবের আদিম অবস্থা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম, প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ের অনেক কথা জানিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আবার মানবের সহচর পশুদেরও অনেক কথা আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। কারণ, সেই যুগে মানবের সঙ্গে ইহাদের বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। উহাদের সাহায্যেই মানব আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় বা জীবন-সংগ্রামের কঠোরতার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায়। মানব সভ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এই সকল গৃহপালিত জন্তুর সাহায্য আজিও ত্যাগ করিতে পারে নাই। আজিও তাহারা মানব-সমাজের অশেষ উপকার-সাধন করিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এইরূপ একটি প্রাচীন পুরাতত্ত্ব লইয়াই আমরা আলোচনা করিব। বর্ত্তমান যুগে অশ্ব প্রায় ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। শিক্ষিত বা গৃহপালিত অশ্ব ভিন্ন ভূমণ্ডলের নানা স্থানে নানাজাতীয় অশ্ব বা অশ্বাকৃতি জীব দেখা যায়। প্রাচীনতম যুগেও হয় ত অশ্ব নানা স্থানেরই অধিবাসী ছিল এবং আদিম মানবের প্রতিবেশী হওয়ায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানব অশ্বকে স্ববশে আনিয়াছে এবং উহাকে শিক্ষিত করিয়া নিজ ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইয়াছে। অতি প্রাচীন প্রস্তরযুগে ইউরোপের নানা স্থানের গুহাবাসিগণ অশ্বের মাংস আহার করিয়া জীবন-ধারণ করিত। প্রস্তরযুগের শেষভাগেও (Neolithic) অশ্ব শীকারের সামগ্রী ছিল। য়ুরোপের নানা স্থানের গুহাচিত্রে অশ্বের প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে ফ্রান্সের লা ম্যাডেলিন (La Madelaine in the department of the Dordogne) গুহায় গৃহের উপর অঙ্কিত অশ্বমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আদিম প্রস্তরযুগে বা শেষ প্রস্তরযুগে (Neolithic) অশ্ব সম্পূর্ণ শিক্ষিত হইয়াছিল কি না, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। তবে ধাতুর ব্যবহারের যুগে পৃথিবীর নানা স্থানে নানা জাতির মধ্যে অশ্বের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। কোন কোন স্থলে দুগ্ধ বা মাংসের জন্য অশ্বকে পোষ মানান হইত। অনেক জাতি যুদ্ধে সুবিধার জন্য ক্ষিপ্রগামী অশ্বের পৃষ্ঠে চড়িয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিত। কোন কোন স্থলে ঘোড়ার মুখে (bit) 'কড়াই' না লাগাইয়া, কেবল গলায় দড়ি বাঁধিয়া অশ্বারোহী ঘোড়া চালাইত। কিন্তু Bronze যুগে অশ্বের মুখে কড়াই লাগাইয়া উহাকে চালিত করা হইত। ফ্রান্সের নানা স্থানে হরিণশৃঙ্গের এইরূপ কড়াইএর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। আবার অন্যান্য স্থানে এইগুলি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত দেখা যায়।

কোথায় সর্ব্বপ্রথম অশ্ব মানুষের বশে আসে, তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। অনেক নৃতত্ত্ববিদের মতে মধ্য-এসিয়ার লোকই প্রথমে অশ্বকে শিক্ষিত ও মানবের কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়। টেলর প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদের এই মত। আবার অন্যান্য জীবতত্ত্ববিদ্ এ কথা মানিতে চাহেন না। কেহ কেহ আরব দেশ বা উত্তর-আফ্রিকাকে অশ্বের প্রথম শিক্ষাভূমি বলিতে চান। এ কথার উত্তর কিছু না বলিয়া এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই অশ্ব এককালে বিদ্যমান ছিল। কোন্ যুগে এবং কোথায় অশ্ব মানবের প্রথম বশে আসে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন।

অশ্বের ব্যবহারে যুদ্ধবিদ্যায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে; দ্রুতগামী অশ্বে আরোহী যোদ্ধা অক্লেশেই শত্রুকে পরাজিত করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে পারিত। এই ব্যাপারটি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। প্রাচীন ইজিপ্ট বা মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্য এই অশ্বারোহী হিক্‌সোস্ দলের হস্তে বিনষ্ট হয়। এসিয়ামাইনরের এক স্থানে হিটাইট্ নামক জাতি যে
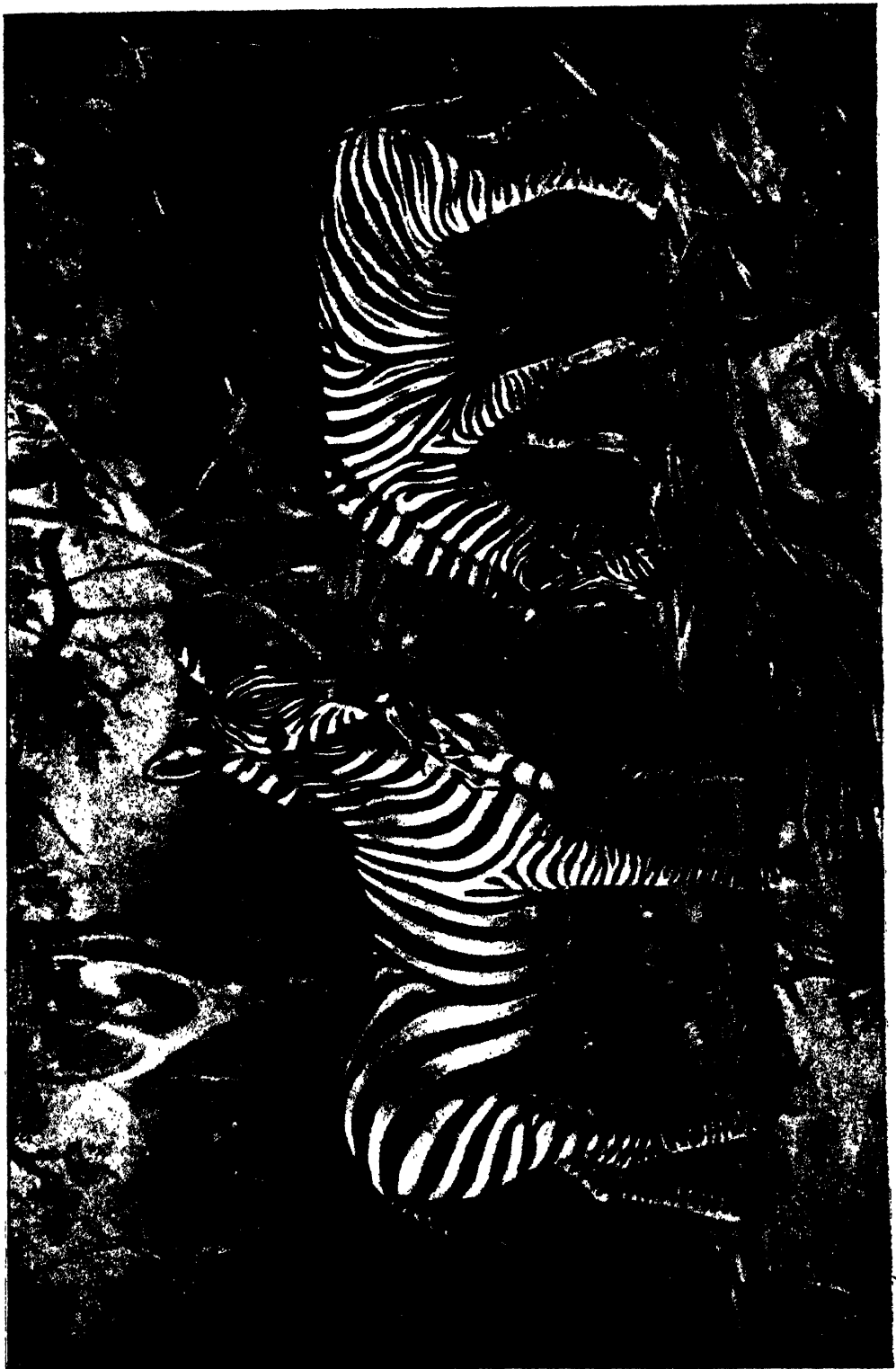
সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়, তাহারাও অশ্বারোহী এবং তাহারাও অশ্বচালনদক্ষ ছিল। অনেকের মতে ঐরূপই রাকের প্রাচীন আকাড়ীয়গণ সিমাইট বিজেতৃগণের হস্তে যে পরাভূত হন, তাহার একটি কারণ এই যে, সিমাইটগণ অশ্বারোহী ও অশ্বযুদ্ধনিপুণ ছিল; কিন্তু আকাড়িয়াবাসিগণ সভ্য হইলেও অশ্বের ব্যবহার জানিত না।

এই সকল জাতি ভিন্ন যে আর্য্যগণ পৃথিবীর নানা স্থানে রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সকল দলই অশ্বের ব্যবহার জানিতেন এবং সুনিপুণ অশ্বারোহী যোদ্ধা ছিলেন। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই কারণেই বোধ হয়—Aryans কথাটি বা উহার অনুরূপ শব্দবিশেষ সকল আর্য্যজাতির ভাষাতেই পাওয়া যায়। অশ্বশব্দের প্রতিরূপ শব্দবিশেষও য়ুরোপের পূর্ব্বখণ্ডের অনেক ভাষাতেই পাওয়া যায়।

আমাদের ভারতে বৈদিকযুগে আর্য্যদের মধ্যে অশ্বের ভূরি ব্যবহার ছিল। তাঁহারা অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতেন বা অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিতেন।

ঐ প্রাচীন যুগে অশ্ব অতি পবিত্র জন্তু বলিয়া সমাদৃত হইত। অনেক যাগযজ্ঞাদির সম্পর্কে অশ্বের বিশেষ প্রয়োজন হইত। বহু যজ্ঞে অশ্ব দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা আছে। আর অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় ফলদায়ক যজ্ঞও আর ছিল না।

আর্য্যদিগের অনেক দেবতাই অশ্বসাদী বলিয়া বর্ণিত। আবার সূর্য্যাদি বহু দেবতা অশ্ববাহিত রথারোহী। দেবতারা অশ্বের সমাদর করিতেন। তাঁহারা ঘোড়দৌড় খেলিতে ভালবাসিতেন এবং এমন কি, কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয় ঘোড়দৌড়ের দ্বারা সমস্যা মিটাইয়া লইতেন। এ সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

প্রাচীনযুগে যাহা ঘটিয়াছিল, মধ্যযুগে ও বর্ত্তমানযুগেও তাহা ঘটিয়াছে। তবে বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে অশ্বের প্রয়োজনীয়তা ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে একমাত্র সীরিয়া ভিন্ন অন্য কুত্রাপি অশ্বারোহীর বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। খাত ও পরিখা কাটার ফলে অশ্বের দ্রুতবেগে যথেচ্ছগমনে বিশেষ বাধা পড়িয়াছে। শত্রুপক্ষের সংবাদগ্রহণের কার্য্য যাহা অশ্বারোহীর প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা এখন বিমান-সৈনিকের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মাল বহন বা গাড়ী টানার কার্য্য অধিকাংশই মোটর বা মোটর লরীর দ্বারা হইতেছে। অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনের ফলে অশ্ব কৃষিকার্য্য, লাঙ্গল টানা প্রভৃতি হইতেও অপসারিত হইতেছে।

এ সমস্ত সত্ত্বেও অশ্বের আজিও বহুল ব্যবহার চলিতেছে ও বোধ হয় বহুকাল ধরিয়া চলিবে।

পৃথিবীর নানাজাতীয় অশ্ব বা অশ্বাকৃতি পশু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পৃথিবীর নানা স্থানে প্রায় সর্ব্বত্রই অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনযুগ হইতেই নানাবিধ অশ্বজাতীয় পশু পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বাস করিত। কালে অবশ্য আমেরিকা প্রভৃতি কোন কোন স্থানে অশ্বের বংশলোপ হইয়াছিল কিন্তু কলম্বসের পরবর্ত্তী উপনিবেশিকগণ আমেরিকায় অশ্ব লইয়া গিয়াছিলেন ও তাহার ফলে উক্ত মহাদেশে আবার বহুজাতীয় পালিত ও বন্য অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভূমণ্ডলের নানা স্থানের অশ্ব দেখিতে ও আকারে একরূপ নহে। শিক্ষিত ও গৃহপালিত অশ্ব বন্য অশ্ব অপেক্ষা আকারে বড়, কার্য্যপটু ও নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত।

শিক্ষাকার্য্যে ও দেশভেদে অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের হ্রাস বৃদ্ধি ও আকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জীবতত্ত্ববিদেরা অশ্ব ও অশ্বাকৃতি জীবের উৎপত্তিতে ক্রমাভিব্যক্তির (Evolution) প্রভাব লক্ষ্য করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা নানা স্থানে প্রাপ্ত অশ্বাকৃতি জীবের যে সমস্ত কঙ্কাল পাইয়াছেন, তৎসমুদয়ের পর্য্যালোচনার ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আমরা যে অশ্ব বা অশ্বাকৃতি জীব দেখিতে পাই, তাহা বহু যুগান্তব্যাপী ক্রমাভিব্যক্তির ফল। তাঁহারা নানা জাতীয় অশ্বকল্প জন্তুর কঙ্কালকে প্রাচীনত্ব হিসাবে সাজাইয়াছেন এবং উহা হইতে বর্ত্তমান অশ্বের উৎপত্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশের আমহার্ষ্ট কলেজের বিজ্ঞানাগারে এইরূপ কয়টি কঙ্কাল সজ্জিত আছে। তাহা হইতে বর্ত্তমান অশ্বজাতির ক্রমবিকাশ বুঝা যায়। পা, খুর ও দন্ত এই কয়েকটি বিষয়ে অশ্বজাতি ভিন্ন জাঙ্গল চতুষ্পদ হইতে পৃথক্। সচরাচর চতুষ্পদ জন্তুর অগ্রপদে (forearm) দুইটি

করিয়া হাড় থাকে। অশ্বের মাত্র একটি হাড়ই দেখা যায়। তবে বিশেষ লক্ষ্য করিলে বোধ হয়, যেন ঘোড়ার পায়ে হাঁটুর নিকট হইতে একটি আঙ্গুলের মত বাহির হইয়াছে এবং তাহারই অগ্রভাগ যেন আঙ্গুলের নখের মত খুরাকার ধারণ করিয়াছে। পশ্চাতের পায়েও ঐরূপ দেখা যায়। মনে হয়, যেন এককালে অন্য অঙ্গুলিও ছিল—তবে ব্যবহারাভাবে ঐগুলি ক্রমে অপরিস্ফুট হইয়া এখন একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বর্ত্তমানযুগের বহুপূর্ব্বে ইওহিপাস্ নামক যে এক জাতীয় জীবের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহারাই ছিল অশ্বের পূর্ব্বপুরুষ। এইগুলির কঙ্কাল দেখিলে বোধ হয়, ইহারা শৃগালাকৃতি জন্তু ছিল। ইহাদের উচ্চতা ছিল মাত্র ১১।১২ ইঞ্চি। ইহাদের সম্মুখের পায়ে ৫টি করিয়া অঙ্গুলি ছিল এবং পশ্চাতের পদে ছিল ৩টি আর একটির অর্দ্ধেক। ইহার ঠিক পরবর্ত্তী যুগেই অশ্বাকৃতি যে পশু দেখা যায়, তাহা একটু উচ্চ এবং তাহাদের পায়ে ছিল ৩টি করিয়া ভূমিস্পর্শী অঙ্গুলি। তৃতীয় কল্পে দেখা যায় যে,পশু আকারে অনেক বড় হইয়াছে আর সম্মুখের আঙ্গুলটি ছাড়া অপর দুইটি আর ভূমিস্পর্শ করে না। ইহার পরবর্ত্তী যুগে আকার আরও বাড়িয়াছে এবং পাশের আঙ্গুল দুইটি একেবারে লোপ পাইয়াছে। পঞ্চম কঙ্কালটি বর্ত্তমানের অশ্বাকৃতি পশুরই।

কালে বন্য অশ্ব মানুষের পালিত হইয়া—শিক্ষায় স্থানভেদে ও সাঙ্কর্য্যের ফলে আকৃতি-প্রকৃতিতেও অনেক বিষয়ে বিভিন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমানের অশ্বজাতীয় প্রাণী

বর্ত্তমানে অশ্বজাতীয় যে সকল প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করিতে পারা যায়।

(১) পৃথিবীর নানা স্থানে কার্য্যোপযোগী শিক্ষিত অশ্ব। স্থানভেদে মিশ্রণ ও কার্য্যভেদে ইহাদের আকার-প্রকারেও ভেদ ঘটিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে।

(২) মধ্য এসিয়ার ও অন্যান্য স্থানের বন্য অশ্ব—তার্পান্ (Tarpan) প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইহাদের শাখাপ্রশাখা অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়।

(৩) জেব্রা—ইহাদের আবার ২।৩ জাতি আছে। ইহারা মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বাস করে। পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও আবিসিনিয়ায়ও একটি শাখা দেখা যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় পর্ব্বতে আর একটি স্বতন্ত্র জেব্রা জাতি দেখা যায়।

(৪) গর্দ্দভ—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে বহু জাতীয়।

কিয়াং ও ওন্যাগার (Kiang and Onager) নামে অভিহিত দুইটি বন্য গর্দ্দভের জাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৫) নানা দেশীয় টাট্টু ঘোড়ার জাতি।

বন্য অশ্বজাতীয় জীব

তারপান্—বন্য অশ্ব এসিয়ার অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তারপান্ বা পেজ্‌ভাল্‌স্কী জাতীয় অশ্ব টাটারী ও মঙ্গোলীয় বিরাট অকর্ষিত প্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়। দলবদ্ধভাবে, কিন্তু সংখ্যায় বেশী নহে, ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে, কদাচিৎ কোন দলে ৫০টি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত অশ্ব অপেক্ষা ইহাদের আকার ক্ষুদ্র। পদচতুষ্টয় শীর্ণতর, মস্তক বৃহৎ, কর্ণযুগল দীর্ঘাকার।

এই জাতীয় পূর্ণবয়স্ক অশ্ব কখনও পোষ মানে না। কিন্তু শৈশবাবস্থায় ধরা পড়িলে ইহারা পোষ মানিয়া থাকে। প্রান্তরের উন্মুক্ত স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য বন্য পশুর ন্যায় ইহারা মানুষের গন্ধ অনুভব করিতে পারে এবং গতির অসম্ভব দ্রুততাহেতু ইহারা মানুষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ। অর্দ্ধবন্য মস্টাংজাতীয় অশ্বের ন্যায় ইহারা অল্প সংখ্যায় এক এক দলে বিচরণ করিয়া থাকে। প্রত্যেক দলে একটি করিয়া পুরুষ অশ্ব থাকে। য়ুরোপের গুহাভ্যন্তরে যে সকল অশ্বজাতীয় জীবের চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে,তারপান্ অশ্বের সহিত তাহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার দ্বারা এই তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বন্য অশ্ব বিদ্যমান ছিল।

জেব্রা—জেব্রাকে অশ্বজাতীয় জীব বলিতে হইবে। আফ্রিকার অরণ্যেই জেব্রার বাস। আবিসিনীয়া ও সোমালিল্যাণ্ডেই জেব্রা অধিক সংখ্যায় বিদ্যমান। ইহাদের নাম গ্রেভি জেব্রা। গ্রেভি জেব্রা অন্যান্য জেব্রা অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। ইহাদের উচ্চতা ১২ হাত। ১০।১২টি জেব্রা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশের

অরণ্য ইহাদিগের মনোমত বিচরণভূমি। এই জাতীয় জেব্রার সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ইহাদের চামড়া ও মাংস অনেকের বড় প্রিয় বলিয়াই উহাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

আর এক জাতীয় জেব্রা আছে, জুলুল্যাণ্ডই তাহাদের বাসভূমি। ইহাদের নাম চ্যাপম্যান্ জেব্রা। ট্যাঙ্গানিকা-প্রদেশে আর এক শ্রেণীর জেব্রা আছে, তাহাদিগকে গ্রাণ্টের জেব্রা বলে। এই উভয় জাতীয় জেব্রার দেহের দাগের পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাণ্টের জেব্রার দাগগুলি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এবং সম্পূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। এই জাতীয় জেব্রা কখনও কখনও দলচ্যুত হইয়া একাকী বিচরণ করিয়া থাকে।

জেব্রা সাধারণতঃ সমতলক্ষেত্রে বাস করিতে ভালবাসে। আফ্রিকার নুজাতীয় মৃগ ও অষ্ট্রীচ পক্ষীর সহিত ইহারা মিলামিশা করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিয়াছেন, মনুষ্য অথবা অন্য হিংস্র পশুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই তিন শ্রেণীর পশু ও পক্ষী সম্মিলিতভাবে থাকে। অষ্ট্রীচ পক্ষীর আকার অত্যন্ত দীর্ঘ, এজন্য তাহারা দূর হইতে শত্রুর আগমন দেখিতে পায়, নু-মৃগ ও জেব্রা ঘ্রাণের দ্বারা শত্রুর আগমনসংবাদ জানিতে পারে। সুতরাং একটি পলায়ন করিলেই অপর দুইটি তাহার অনুগমন করে।

আর এক শ্রেণীর জেব্রা আছে, তাহাদিগকে পার্ব্বত্য জেব্রা বলা হয়। কেপকলোনী প্রদেশে ইহাদিগের বাস। গর্দ্দভের সহিত এই জাতীয় জেব্রার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। গাধার কর্ণ যেরূপ বৃহৎ, এই শ্রেণীর জেব্রার কর্ণও তদনুরূপ। পার্ব্বত্য জেব্রার আকারের উচ্চতা ১২৷৷০ হাত, কেপকলোনীর অন্তর্গত সমগ্র পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহারা বাস করিত। মৃগয়ার প্রাদুর্ভাবে এই শ্রেণীর জেব্রা অধুনা প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। গবর্মেণ্ট সংপ্রতি জেব্রা শীকার রহিত করায় কয়েক দল মাত্র রক্ষা পাইয়াছে।

জেব্রা পোষ মানিতে চাহে না। অনেকে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু জেব্রাদিগের প্রকৃতি এমনই স্বাধীন যে, শত চেষ্টা করিয়াও মানুষ তাহাদিগকে কাযে লাগাইতে পারে নাই। গর্দ্দভ ও জেব্রার সংযোগে এক মিশ্র শ্রেণীর জীবের উদ্ভবচেষ্টা মাঝে হইয়াছিল ; কিন্তু ফলে এই সঙ্কর-জাতীয় জেব্রার বিন্দুমাত্র প্রকৃতিপরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বহু চেষ্টা করিয়া দুই একটি জেব্রাকে গৃহস্থালীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বতর যেরূপ কার্য্যনিপুণ হয়, জেব্রা তাহার শতাংশের একভাগ কাযও করিতে পারে না।

গর্দ্দভ। কায়াং ও ওন্যাগারকে আরণ্য গর্দ্দভজাতীয় জীব বলা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ পর্য্যাপ্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কারণ, ইহারা এসিয়ার বিস্তীর্ণ অরণ্যে বাস করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত এই জাতীয় গর্দ্দভকে পোষ মানান সম্ভবপর হয় নাই। কায়াং গর্দ্দভ তিব্বতের জনহীন উচ্চতর প্রদেশেও বিদ্যমান, ওন্যাগার অপেক্ষা ইহাদের আকার দীর্ঘ এবং বলবান্। উচ্চতায় ইহারা ১৩ হাত।

কায়াং গর্দ্দভ চাংচেনমো প্রান্তরে এবং প্যাংগং হ্রদের সমীপবর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তুষারশীতল জলে অনায়াসে সন্তরণ করিতে পারে। গর্দ্দভের ডাকের সহিত কায়াং এর ডাকের সাদৃশ্য অল্প। বরং অশ্বের হ্রেষা ধ্বনির সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য করিতে পারা যায়। ইহারা মানুষকে ভয় করে না। তাতারগণ অনেক সময় ইহাদিগকে অনায়াসে ধৃত করিয়া থাকে। ইহারা কদাচিৎ পোষ মানিয়া থাকে।

মঙ্গোলিয়ায় এই শ্রেণীর গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের নাম চিগেটাই।

কায়াং ও চিগেটাইএর সহিত ওন্যাগারের সাদৃশ্য আছে। ইহারা এসিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে। চিগেটাইএর আকার যত বৃহৎ, ইহাদের তাহা নহে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহাদের দেহের উচ্চতা ১১ হাত হইতে ১১৷৷০ হাত পর্য্যন্ত হয়। সিন্ধু, কচ্ছ, বেলুচিস্থান, পারস্য ও আফগানিস্থানের মরু অঞ্চলে যে গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকেও ওন্যাগারজাতীয় গর্দ্দভ বলিয়া থাকে।

ওন্যাগার গর্দ্দভ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও লাজুক। ইহাদিগকে সহজে ধৃত করা দূরে থাকুক, গুলী করাও সহজসাধ্য নহে। ইহাদের গতিও দ্রুত। দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া কেহ কখনও ইহাদিগকে ধরিতে পারে নাই।

নিউবিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডে এক শ্রেণীর গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত গর্দ্দভের শরীরের বর্ণের সহিত

ইহাদের দেহের বর্ণের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। এসিয়ার গর্দ্দভ অপেক্ষা আফ্রিকার গর্দ্দভের আকার বড়।

ক্যায়াংজাতীয় গর্দ্দভ যেমন জল ভালবাসে, আফ্রিকার গর্দ্দভের প্রকৃতি ঠিক তাহার বিপরীত। নিউবিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডের গর্দ্দভ উচ্চতায় ১২ হাত পর্য্যন্ত হয়।

আফ্রিকার প্রায় সর্ব্বত্রই গর্দ্দভকে ঠিক অশ্বের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ লোক গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া স্থানান্তরে গতায়াত করিয়া থাকে। সিরীয়ার গর্দ্দভ দ্রুতগতির জন্য প্রসিদ্ধ। ইহারা অল্পে ক্লান্ত হয় না।

উত্তর-আফ্রিকা অঞ্চলেই প্রকৃত আরণ্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবতত্ত্ববিদগণ স্থির করিয়াছেন যে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলপ্রদেশেই সর্ব্বপ্রথম গর্দ্দভকে গৃহপালিতজীবরূপে পরিগণিত করা হয়। তৎপরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে গার্হস্থ্যজীবরূপে গর্দ্দভের প্রচলন হয়।

[ক্রমশঃ

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃটিশ নারী-পুলিস

কলোনে বৃটিশ পুলিস ও সামরিক শান্তিরক্ষক ব্যতীত এক দল নারী পুলিস গঠিত হইয়াছে। ইঁহারা নগরের শান্তিরক্ষাকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন। রাইন নদের বৃটিশ অধিকারভুক্ত স্থানের রক্ষাকল্পে যে সামরিক বাহিনী অবস্থিত, এই নারী পুলিস-প্রহরীরা সেই বাহিনীর অন্তর্গত। নারীপ্রহরীরা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছেন।

নম্বুদরী ব্রাহ্মণ মহিলা।

বঙ্গ-কুসুমে" সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ দেখিতে পান নাই। তেমনই নম্বুদরী দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকন্যা অনাবৃতবক্ষা হইলেও মার্জ্জিত-রুচি বা সুসভ্যা নহেন, এমন কথা বলা যায় না।

শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শ কি ভাবে ভারতের নারী-সমাজের স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা অবগত হইতে হইলে ভারতের সর্ব্বনিম্নস্তরের আদিম অনার্য্য অধিবাসী-দিগের নারীসমাজের রীতিপ্রকৃতি, আচারব্যবহার, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ইত্যাদি তথ্য অবগত হইতে হয়।

দুই শ্রেণীর নারী

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ভারতে দুই শ্রেণীর হিন্দু নারী আছে,—(১) আদিমনিবাসী tribe বা সঙ্ঘবদ্ধ মনুষ্যসমাজভুক্ত, (২) আর্য্য caste বা জাতিবদ্ধ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য-সমাজভুক্ত। এই উভয় শ্রেণীর নারী-কেই গৃহস্থালীর ও অন্যান্য জীবিকার্জ্জনের কায করিতে হয়। অবশ্য সম্ভ্রান্ত ধনী বিলাসীদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। সাধারণ নারীকে গৃহ-স্থালীর ও শিশুপালনের কার্য্য ব্যতীত স্বামি-পুত্রদিগের ক্ষেতের কার্য্যে, পশুপালনের কার্য্যে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্য্যে সহায়তা করিতে হয়। নিম্নশ্রেণীর নারীরা বেতের ঝুড়ি ও মাদুর চেটাই বুনিয়া থাকে; কাপড় ছোবাইতে জানে; তুলার চাষের ফসলের সময় তুলা কুড়াইয়া আনে; খাদ্যশস্যের বীজ ছড়াইতে, ধান কাটিতে, মরাইয়ে ধান গুছাইয়া তুলিতে পুরুষকে সাহায্যদান করে।

এ সকল কার্য্যে ভারতের উভয় শ্রেণীর (বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর এবং আদিম অনার্য্যশ্রেণীর) নারীরই কার্য্যদক্ষতার সমান পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতার সমতার পরি-চয়ের অভাব আছে। সকল সমাজেই বিবাহ-সংস্কারের পরিমাপে সভ্যতার তারতম্য পরি-গণিত হইয়া থাকে। সে হিসাবে Tribe

লর্ড লিটন।

বসুমতী প্রেস] [শিল্পী— শ্রীবিভূতিভূষণ রায়।
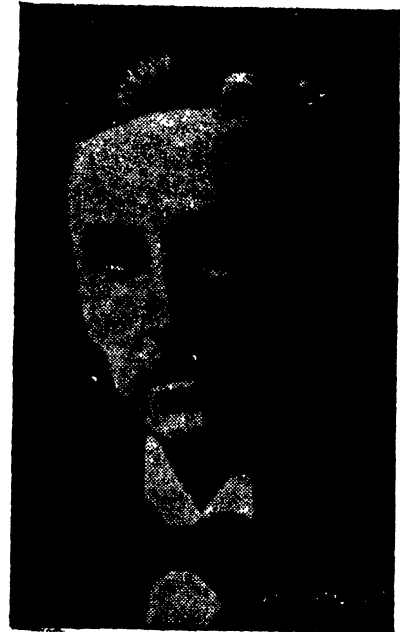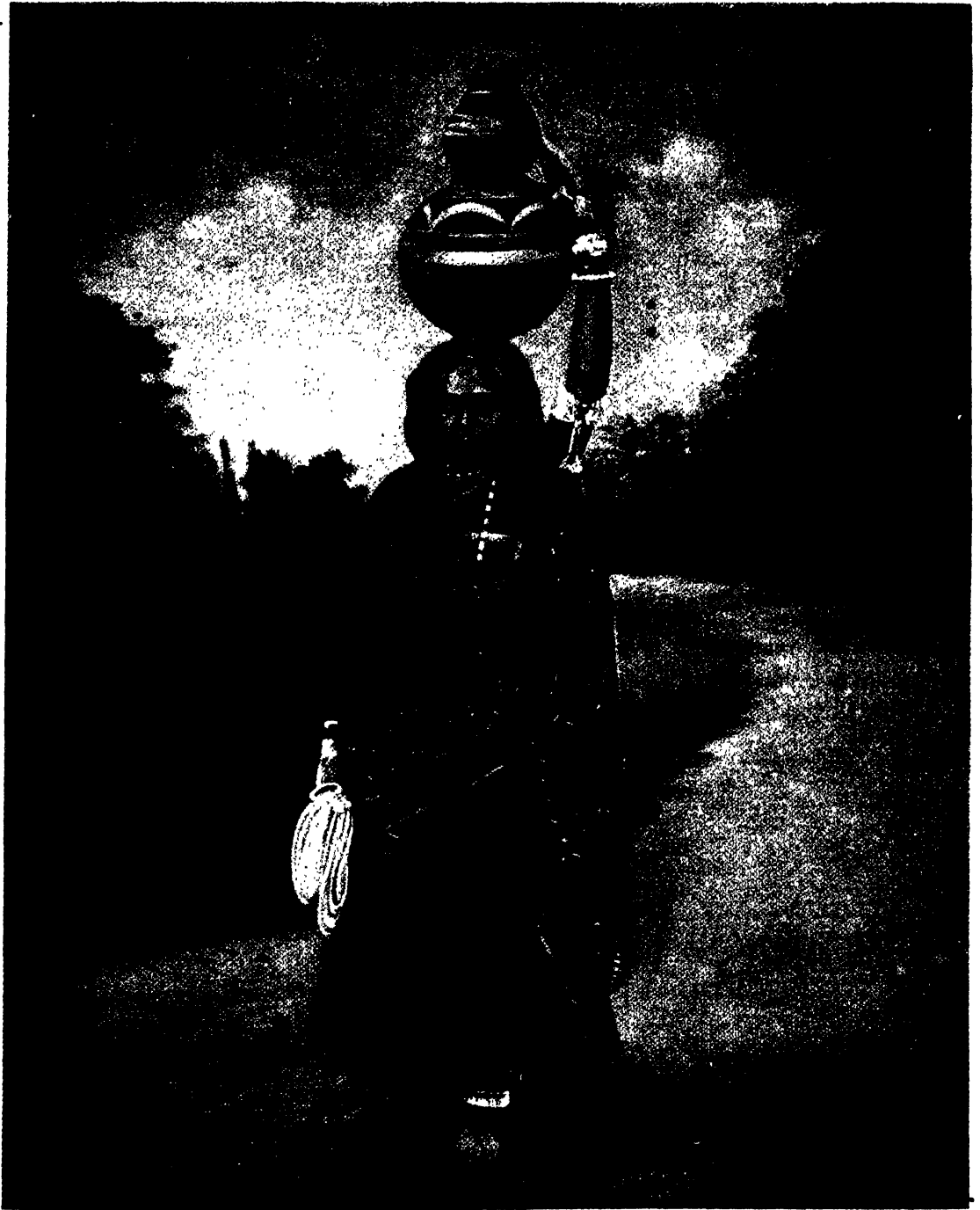
জয়পুরী-সুন্দরী

বা সঙ্ঘবদ্ধ অনার্য্যজাতি যে সভ্যতায় বিশেষ অবনত, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন যুগে সুসভ্য প্রতীচ্য জাতিদেরও মধ্যে 'গ্রেট্‌ণা গ্রীণের' বিবাহ প্রচলিত ছিল। আর্য্যহিন্দুদেরও প্রাচীনযুগে রাক্ষস, পিশাচ ইত্যাদি নানা জঘন্য বিবাহপ্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যত সংযত হইয়াছে, তত বিবাহ সম্বন্ধে কঠিন নিয়মের অধীন হইয়াছে। ভারতের আদিম অনার্য্য জাতিদিগের মধ্যে কিন্তু এখনও বিবাহপ্রথা প্রাচীনযুগেরই মত বর্ব্বরপ্রথার অনুগামী। তাহাদের নারীরা হয় ধৃত হইয়া, না হয় ক্রীত হইয়া বিবাহিত হয়। অথবা বর, কন্যার পিতার গৃহে দাসত্ব করিয়া কন্যাকে প্রাপ্ত হয়। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) ছোটনাগপুরের বিরহর জাতীয় আদিম নিবাসীদের মধ্যে এক কৌতুকপ্রদ বিবাহপ্রথা আছে। বাপ বিবাহযোগ্যা কন্যার দৌড়ের পরীক্ষা করে। অবশ্য এ পরীক্ষা লওয়া হয় বরের সম্মুখে। কন্যা দৌড়াইয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে। বর ক্ষণ পরে তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। বর যে মুহূর্ত্তে চীৎকার করিয়া বলে যে, সে কন্যাকে ধরিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যায়।

(২) আর এক জঙ্গলী অনার্য্যজাতির মধ্যে বীভৎস বিবাহপ্রথা আছে। এক একটা বড় আটচালায় গ্রামের যুবক-যুবতীদিগকে একত্র রাত্রিবাস করিতে দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে যে সকল যুবক যুবতী পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া বহুকাল অনন্যমনা হইয়া সহবাস করে, তাহারা বিবাহিত বলিয়া গণ্য হয়।

(৩) কাশ্মীরে বর, কন্যার পিতৃগৃহে ক্রীতদাসরূপে কায করে। ৭ বৎসর কায করিলে পর সে গৃহের কন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে সমর্থ হয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য

হিন্দুশাস্ত্রে বলে, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ডপ্রয়োজনম্। হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্যই—পুত্রপ্রাপ্তি। প্রাচীন রোমক ও গ্রীকদিগেরও কতকটা এই ভাব যে ছিল না, এমন নহে। গ্রীক পুরাণে পাওয়া যায় :—

(১) দেবদেবীর পূজাপার্ব্বণ চালাইবার জন্য পত্নীর প্রয়োজন।

(২) রাজ্যের ও জাতির প্রতি কর্ত্তব্য। পত্নীর গর্ভে বংশধরের উৎপত্তিসাধন করিয়া জাতির স্থায়িত্বসাধন করা।

(৩) নিজের বংশরক্ষা করা। বংশধররা পিতৃপুরুষের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিবে, এই উদ্দেশ্যে পত্নীগ্রহণ করা।

হিন্দুদেরও কতকটা এই ভাবে পিতৃপুরুষের প্রতি কর্ত্তব্যের মুখ চাহিয়া বিবাহপ্রথা প্রচলিত—পুত্রের দ্বারা পিণ্ডদান পিতৃপুরুষকে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে। আধুনিক প্রতীচ্যের সভ্যতাভিমানী জাতিরা তাই হিন্দু-বিবাহকে গ্রীক বিবাহের পর্য্যায়ে ফেলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন,—এ সমস্ত বিবাহ নারীজাতির প্রতি সম্মান বা মর্য্যাদাবিরহিত devoid of esteem or respect for the sex. মুসলমান বিবাহের সম্পর্কে তাঁহাদের অভিমতের কথা না বলাই ভাল। কেননা, তাঁহাদের মতে with the Mahamedan, the woman has but one end, namely to minister to the pleasure of the husband. এমন জঘন্য ধারণা কেন হয় বুঝা যায় না। অথচ মুসলমান ধর্ম্মে নারীর অধিকার যতটা মান্য, জগতের কোনও ধর্ম্মে তত নহে।

প্রতীচ্যের লেখকরা গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের বিবাহে woman fit companion of man হয়, অর্থাৎ নারী পুরুষের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হয়। দুই একটা শ্রেণীর (যথা মধ্যবিত্ত) কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের সমাজে নারী জাতির কি অবস্থা, তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। কারখানার বা দোকানের চাকুরীয়া নারীদিগের বিবাহিত জীবন কেমন সুখের হয়, নারী পুরুষের কেমন fit companion হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাদের বহু নাটক-নভেলে পাওয়া যায়।

এ দেশে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' শাস্ত্রবচন থাকিলেও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে—যখন প্রতীচ্য অন্ধকার যুগের গর্ভে লুক্কায়িত ছিল—তখন হইতে নারী পুরুষের fit companion ছিল। তাহার দৃষ্টান্ত রামায়ণেই পাওয়া যায় :—

তদেবমেনং ত্বমনুব্রতা সতী পতিব্রতানাং সময়ানুবর্ত্তিনী।
ভব স্বভর্ত্তুঃ সহধর্ম্মচারিণী যশশ্চ ধর্ম্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি॥

অত্রি-পত্নী অনসূয়া সীতাদেবীকে বলিতেছেন,—

"অতএব তুমি এইভাবে পতিপ্রতি অনুরক্তা থাকিয়া পতিব্রতাগণের নিয়মানুসারে পতির সহধর্ম্মচারিণী হও। তাহাতে যশঃ ও ধর্ম্ম উভয়ই প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং পত্নী কেবল child-bearing machine ছিলেন না, সহধর্ম্মচারিণী ছিলেন। সহধর্ম্মচারিণী অর্থে কত কথা বুঝায়, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। উহার মধ্যে fit companion কথাটিও বিলক্ষণ বুঝায়। বেদোক্তমন্ত্রে আছে :—

(১) হে বধূ! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক এবং আমার হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।

(২) হে কন্যে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অবধারণ কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ কর। তুমি এক-মনা হইয়া আমার বাক্যের সেবা কর।

(৩) অন্নরূপ পাশ এবং মণি-তুল্য প্রাণ-সূত্রের দ্বারা ও তথা সত্যরূপ গ্রন্থি দ্বারা, হে বধূ, তোমার মন ও হৃদয়কে আমি বন্ধন করিতেছি।

(৪) হে সপ্তপদ-গমন-কারিণী কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে। আমি তোমার সখ্য প্রাপ্ত হইলাম।

এই সখ্য-প্রাপ্তি ও সখ্য-বন্ধনই কি fit companionship নহে? প্রতীচ্য এ সম্বন্ধে আর্য্য হিন্দুর বিবাহ-প্রথাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তবে অনার্য্য-বিবাহ স্বতন্ত্র কথা।

অনার্য্য জাতি

আসামে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা নদীর তটপ্রান্তস্থ ভূভাগকে যে পর্ব্বতমালা দ্বিধা ভিন্ন করিয়াছে, ঐ পর্ব্বতে কয়েকটি অনার্য্য আদিম জাতি বাস করে। তন্মধ্যে নাগা ও কুকি প্রধান।

কুকিদের কোনও ইতিহাস নাই। কিংবদন্তী, উহারা মহাচীন বা ব্রহ্মদেশ হইতে আসামে আসিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, চীন বা মগ কোন জাতির সভ্যতার সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহারের সৌসাদৃশ্য নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে, ইহারা এবং আসাম প্রান্তের আবর এবং মিরি মিশমিরা জাতিতে মঙ্গোলীয়, আর্য্য নহে। দূরদূরান্তর পর্ব্বতে বা পর্ব্বতসানুদেশে এই সমস্ত জাতি বাস করিয়াছিল, সুতরাং রীতিমত পথঘাটের অভাবে ইহাদের পরস্পর জানাশুনা বা মিলামিশা ছিল না। সুতরাং কি ভাষায়, কি আচার-ব্যবহারে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে তাহারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে এখনও

কুকি কুলী।

বাস করিতেছে, যথা,—খাসি, গারো, নাগা, মিকির, ইত্যাদি। যে পাহাড়ে যে জাতি বাস করে, জাতির নাম সেই পাহাড়ে বর্ত্তাইয়াছে।

এতদঞ্চলে রেলবিস্তারের (আসাম-বেঙ্গল) পূর্ব্বে এই সমস্ত জাতি আপনাদের জাতি ব্যতীত অন্য মানব পৃথিবীতে আছে বলিয়া জানিত কি না সন্দেহ। এই হেতু ইহারা ইহাদের আচার-ব্যবহার পরসংস্পর্শদোষশূন্য রাখিতে যত সমর্থ হইয়াছে, জগতে আর কেহ এত পারিয়াছে কি না সন্দেহ। সেই সকল আচার-ব্যবহার হইতে এই কয়টি বিষয় লক্ষ্য করা যায় :—

(১) ইহাদের স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্য বুঝিবার উপায় নাই। নারীরা পুরুষেরই মত বস্ত্র পরিধান করে, বক্ষ আচ্ছাদন করে না। তবে রেলবিস্তারের পর ক্রমে ইহাদের মধ্যেও সভ্যতাবিস্তার হইয়াছে।

(২) যেমন পুরুষ, তেমন নারী,—কাহারও উদরপূর্ত্তির চিন্তা ব্যতীত অন্য উচ্চ চিন্তার ক্ষমতা নাই।

(৩) উহারা নিজের গণ্ডীর বাহিরের কিছু দেখিলেই ভীত, ত্রস্ত হয়। যখন আসাম-বেঙ্গল রেলের জন্য জমী জরিপ হয়, তখন জরিপ-ওয়ালা দলকে দূর হইতে দেখিয়া এক দল কুকি নারী জঙ্গলের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছিল। উহারা এত সরল যে, প্রথম দর্পণ দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়াছিল। দর্পণে নিজ দেহের প্রতিবিম্ব দেখিয়া এক কুকি যুবতী চীৎকার করিয়া দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। চোখ বুজে ও চোখ খুলে, এমন খেলার পুতুল দেখিতে দূরদূরান্তর হইতে শত শত কুকি নরনারী জরিপ দলের বড় তাম্বুতে প্রত্যহ উপস্থিত হইত।

(৪) ইহাদের বিবাহপ্রথা চমৎকার। বর যে কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পিতামাতাকে প্রথমে উপঢৌকন প্রদান করে। যদি পিতামাতা সম্মত হয়, তাহা হইলে বরকে শ্বশুরের গৃহে বিবাহের পূর্ব্বে ৩ বৎসর এবং পরে ২ বৎসর ক্রীতদাসরূপে কায করিতে হয়—তাহার পর সে নিজের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সস্ত্রীক বাস করিতে পারে।

বিবাহের সময় পুরোহিত বর-কনেকে মাটিতে পাশাপাশি বসাইয়া তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হয় এবং একটা মুরগীর গলা টিপিয়া তাহাদের মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে ঝুলাইয়া রাখে। পরে পুরোহিত মুরগীটাকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে; মুরগীটা যে ভাবে ছটফট করিবে, সেই ভাব বুঝিয়া ভাবী দম্পতির বিবাহিত জীবনের সুখদুঃখ নির্ণীত হইবে। অতঃপর পুরোহিত মুরগীটার দুইখানা ডানা ছিঁড়িয়া একখানা বরের ও অপরখানা কন্যার শিরোদেশে স্থাপন করে। সেই সময় বরের হস্তে এক পাত্র হাঁড়িয়া (চাউল হইতে উৎপন্ন) মদ্য দেওয়া হয়। বর অর্দ্ধেক পান করিয়া অপরার্দ্ধ কন্যাকে পান করিতে দেয়, ইহাতেই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(৫) বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশায় কোনও নিষেধ নাই, নিত্য সহবাসেও কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু বিবাহের পরে নারী কদাচিৎ পুরুষের (স্বামীর) প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়।

(৬) ইহাদের অবরোধপ্রথা নাই। নারীরা পুরুষদিগের সহিত কুলীর কায করে, মাটী কাটে, ঝুড়ি বুনে, কাঠ কাটে, জঙ্গল সাফ করে, চরকা কাটে, তাঁত বুনে, চাষ আবাদ করে, হাটে যায়। নারী অর্দ্ধ মণ ৩০ সের মাল অনায়াসে বহন করিতে পারে। উহারা মাল দড়ী দিয়া বাঁধিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া কপালে দড়ীর বেড় লাগাইয়া অনায়াসে পার্ব্বত্য-বন্ধুর পথে উঠানামা করিতে পারে।

(৭) পুরুষের সাহসপরীক্ষাও ভীষণ। ইহাদের কোনও দলপতির কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে রীতিমত শক্তির পরীক্ষা দিতে হয়। গ্রামের মধ্যে এক কুটীরে এক খণ্ড শূকরের রাং ঝুলাইয়া রাখা হয়। যে পথ দিয়া ঐ কুটীরে প্রবেশ করিতে হইবে, সেই পথের উভয় পার্শ্বে গ্রাম্য নারীরা আঁচল ভরিয়া লোষ্ট্র লইয়া অপেক্ষা করে। প্রার্থী ঘাড়মুড় গুঁজিয়া এক দৌড়ে কুটীরে প্রবেশ করিয়া লোষ্ট্রবৃষ্টি সহ্য করিয়া যদি ঐ শূকরের রাং লইয়া গ্রামের বাহিরে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, তবে তাহার সহিত সর্দ্দারের কন্যার বিবাহ হয়। সে যে মুহূর্ত্তে গ্রামের সীমানা অতিক্রম করে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার সঙ্গীরা সর্দ্দার কন্যাকে ধরিয়া গ্রামের বাহিরে লইয়া যায়, ইহাতে কাহারও আপত্তি করিবার উপায় নাই।

এই সমস্ত আচারব্যবহার কুকি জাতির। নাগাদের এইরূপ :—

(১) ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে নাগারা মানুষের মাথা (scalphunters) শীকার করিয়া বেড়াইত, সুতরাং নাগা
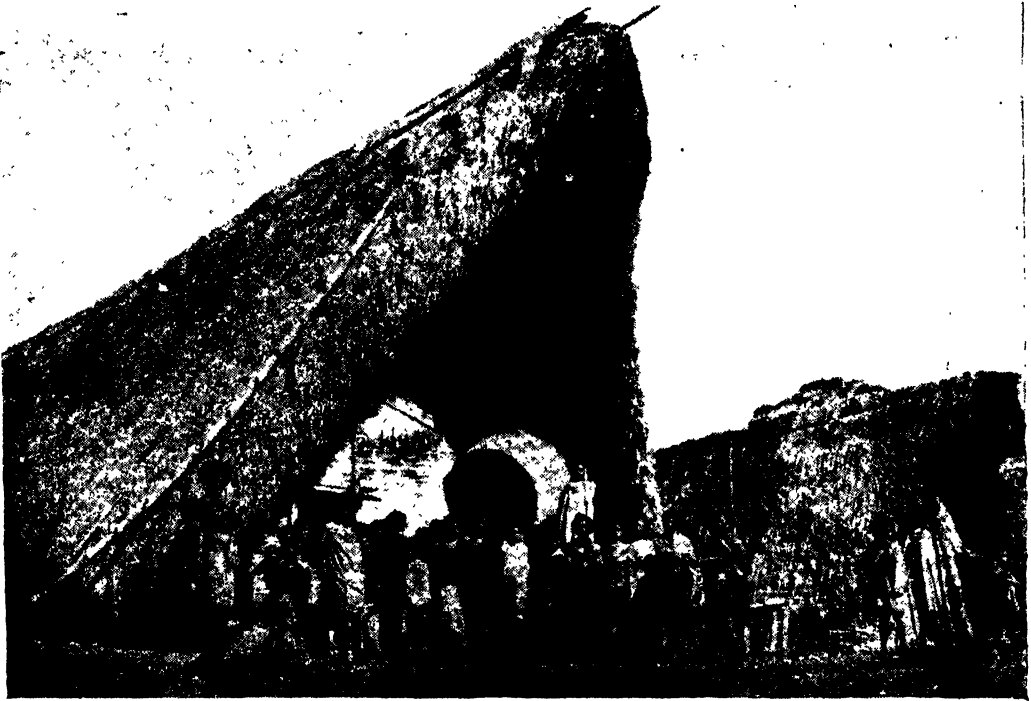
দলপতির প্রাসাদ।

নারী নরহন্তা নাগা ব্যতীত কাপুরুষ নাগাকে বিবাহ করিত না। নাগা যোদ্ধা যতগুলি নরমুণ্ড শীকার করিয়াছে, তত মুণ্ডের কেশ, হারের মত কণ্ঠে কড়ির সহিত গাথিয়া ঝুলাইয়া রাখিত; সেই হার দেখিয়া নাগা সুন্দরী স্বয়ংবরা হইত।

(২) কুকিদের মত নাগাদেরও কুমারী কন্যার পর-পুরুষের সহিত সহবাসে আপত্তি নাই। কিন্তু বিবাহিতা নাগারমণী এ বিষয়ে অপরাধী হইলে পূর্ব্বে তাহার ও তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড হইত, এখন উভয়কে গ্রামের বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

বিবাহপ্রথা নাগাদের এইরূপ :—পুরুষ ও নারী পরস্পর অনুরক্তির ভাব প্রকাশ করিলে পুরুষ কন্যার পিতামাতাকে কন্যার বিনিময়ে অর্থদান করে। তবে যদি পিতামাতার সম্মতির অপেক্ষা না রাখা হয়, তাহা হইলে বরকে কন্যার দাম দিতে হয় না। বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ না করে, তাহা হইলে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়;

(৩) নাগারাও কুকিদের মত সরল। রেলবিস্তারের পূর্ব্বে উহারাও পিয়ানোর বাজনা অথবা ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ শুনিয়া একবারে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিয়াছিল।

ইহাদের সরলতার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন এক উৎসবে নাগাদের নাচ হইতেছে। একটি নাগা বালিকা নাচিতে গিয়া বড়ই অপ্রস্তুত হইতেছে, কেন না, বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে বক্ষের বসন সংযত করিতে পারিতেছে না,—যতবার চেষ্টা করে, ততবার টেনা খুলিয়া পড়িয়া যায় আর নাগারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ফেলে। যে বাঙ্গলোয় নাচ হইতেছিল, তাহার কর্ত্রী (ইংরাজ মহিলা) নাগা বালিকাকে ডাকিয়া নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া বুকের কাপড়ে একটা সেফটিপিন আঁটিয়া দিলেন। বালিকা যখন মস্তকের উপরে হস্তোত্তোলন করিয়া দেখিল, বক্ষের বসন খসিতেছে না, তখন সে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গৃহকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল; বোধ হয় ভাবিল, ইংরাজ মহিলা কোন মন্ত্রতন্ত্র করিয়া ঐরূপ অসম্ভবকেও সম্ভব করিয়াছেন। আর একটা দৃষ্টান্ত এই যে, নাগারা মৃত শিশুকে ঘরেই কবর দেয়। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—

নাগা নারী।

"আহা, একলা আকাশের তলে খোলামাঠে শিশু থাকিবে কিরূপে —উহার ভয় করিবে না?"

সুখী কে?

পৃথিবীর মধ্যে অতি নিকৃষ্ট অসভ্য অনার্য্য দুইটি জাতির নারী-জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র এই স্থলে প্রদান করিলাম। আবার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুসভ্য আর্য্য প্রতীচ্য জাতির নারীজীবনের একটি চিত্র এই স্থানে প্রদান করিতেছি।

কোনও এক স্থানে এক বর্ষীয়সী সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞা নারী এক অল্পবয়স্কা নববিবাহিতা পত্নীকে স্বামী বশ করিবার কৌশল সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন :—

আমি পুরুষকে জানি, বুঝি, তাহাকে বশে রাখিবার কৌশল আমি কখনও ভুলিব না। পুরুষকে জানা যেমন সুখের, তেমনই দুঃখের; তবে জানাতে দুঃখের অপেক্ষা সুখের ভাবটাই প্রবল। পুরুষ বলিতে বোকা গর্দ্দভগুলাকে বুঝিও না, পেট-মোটা ব্যবসাদার শূকরগুলাকে বুঝিও না—পুরুষ বলিতে বুঝিও তাহাদিগকে—যাহারা নর-ব্যাঘ্র, যাহাদের সম্মুখে নারীর মস্তক আপনিই অবনত হইয়া আসে। তাহাদের মন আছে, ক্রোধ আছে, মনে আগুন আছে—যে আগুন পাগলের আগুনের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

ক্ষুদ্র বালিকা-বধূ! শিক্ষা কর। রকম চাই। রকম-ফের হইল নারীর প্রধান অস্ত্র। উহাই পুরুষকে বশে রাখিবার সোনার কাঠি। এই সোনার কাঠি যদি নারীর হস্তে না থাকে, তাহা হইলে পুরুষ পর হইয়া যায়; যদি থাকে, তবে পুরুষ (কামরূপের) ভেড়া বনিয়া যায়। স্ত্রী একরূপে স্ত্রী হইলে চলিবে না, স্ত্রীকে বহুরূপিণী হইতে হইবে। যদি তোমার স্বামীর ভালবাসায় সাধ থাকে, তবে তোমাকে সকল রকমের নারী সাজিতে হইবে। তোমাকে নিত্য নূতন হইতে হইবে; নূতনত্বের টাটকা শিশিরে সর্ব্বদা মণ্ডিত থাকিতে হইবে; কুঁড়ি পুরা ফুটিলেই ঝরিয়া পড়ে, শুকাইয়া যায়,—তাই তোমাকে ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিতে দিও না। তুমি নিজে হইবে যেন এক ফুলের বাগান, যে

বাগানে নিত্য নূতন টাটকা ফুল ফুটে, ফুটিয়া সৌরভ বিলায়, রূপে দিক আমোদ করে। নিত্য নব, নিত্য সরস, নিত্য ভিন্নরূপ,—যেন পুরুষ তোমার বাগানের শেষ সুগন্ধ সরস ফুলটি তুলিয়া লইতে সমর্থ হয় না।

জান কি বালিকা-বধূ! প্রেমের বাগানে এক ভয়ঙ্কর বিষধর সর্প বাস করে, তাহার নাম "সাদা-সিধা," যাহা নূতনত্ব-বর্জ্জিত। তাহার মাথাটা পদদলিত করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেল, নতুবা উহা তোমার সাধের প্রেমের বাগান বিষে জর্জ্জরিত করিয়া ধ্বংস করিবে। মনে রাখ নামটি—সাদাসিধা। কখনও সাদাসিধা, সরলা হইও না—কখনও অতিরিক্ত স্বামিসোহাগিনী হইও না- কখনও আপনার সবটা ধরা দিও না। ঘোমটা দিও, ঘোমটা ছাড়া কখনও থাকিও না। হাজার হাজার রকমের ঘোমটায় আপনাকে আবরিত করিয়া রাখিও। স্বামী এক ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলে আর এক ঘোমটা টানিও, যেন ঘোমটার আবরণ ভেদ করিয়া তোমার ভিতরটা দেখিবার স্পৃহা তাঁহার মুহূর্ত্তকালও অপগত না হয়। কিন্তু কখনও স্বামীকে জানিতে দিও না যে, তোমার ভিন্ন ভিন্ন ঘোমটা আছে। যখনই তিনি ঘোমটা খুলিবেন, তখনই যেন তিনি মনে করেন, তোমার রহস্য-কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অন্তর ও তাহার পিপাসিত মনের মাঝখানে মাত্র ঐ ঘোমটাটুকু ব্যবধান আছে। প্রতিবার ঘোমটা খুলিতে গিয়া তিনি যেন মনে করেন, এইবার শেষ ব্যবধান অতিক্রম করিয়াছি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত যেন মনে করাই সার হয়। তিনি যেন উহাই মনে করেন অথচ কার্য্যে উহা যেন না হয়। হইলেই তোমার প্রেমের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। কেন না, পুরুষের তৃপ্তি হইলেই সে উপভোগের দ্রব্যকে দূরে পরিহার করিবে।

মনে রাখিও বালিকা-বধূ! বিভিন্নতা ও রকমফের মানুষ খুঁজিয়া বেড়ায়, একঘেয়েমিতে তাহার মন স্থির থাকে না। তাই এক হইয়াও বহু হইবে, যাহাতে তোমার স্বামী তোমাতে নিত্য নূতন পাইয়া অন্য নারী কামনা না করে। যাহারা বোকা, তাহারা মনে করে, পুরুষকে প্রথম জয় করাই শেষ জয়। ফলে তাহারা বিবাহের পর গৃহস্থালীতে মন দেয় আর স্থূলকায়া হয়। ক্রমে তাহারা পুরাতন, পচা, মৃতবৎ ও ভগ্নহৃদয় হইয়া অন্তিমগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার মত যাহারা বুদ্ধিমতী, তাহারা বিবাহটাকে প্রথম জয় মনে করে, শেষ জয় মনে করে না। বিবাহের পর প্রতিদিনই তাহারা জয়ের দিন বলিয়া ঠিক করিয়া রাখে, সে জন্য নিত্য নূতন জয়ের অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পুরুষ বশ করিবার কত অস্ত্রই আছে! এমন সময় আসে—যখন পুরুষকে মন্ত্র দ্বারা বশ করিতে হয়। আবার এমন সময় আসে—যখন গীত-মদিরা দিয়া পুরুষকে আপনার করিতে হয়। যাদুর জাল কাহাকে বলে জান? সেই যাদুর জাল ফেলিয়া পুরুষ-মাছকে ধরিতে হয়। অতি সামান্য টোপ দিয়া নারী যেরূপে পুরুষকে জালে গাথে, জেলেরা তাহার অপেক্ষা অনেক বড় বড় টোপ দিয়া মাছ গাথিয়া থাকে।

জান বধূ! এই যে কাপড়চোপড় ধপধপে রাখা, এই যে বিছানাপত্র সেফালীফুলের মত রাখা, এই যে ঘরদুয়ার ঝকঝকে রাখা, এই যে সময়ে খাবারটি, এই যে সময়ে স্নানের জলটি, এই যে সময়ে পোষাকের বোতাম আঁটাটি,- এগুলি পাইলে পুরুষ কিরূপ বশীভূত হয়? পুরুষের অনুপস্থিতিকালে যত নোঙরাই থাক না কেন, যত কদর্য্য গৃহস্থালীই কর না কেন, পুরুষ ঘরে আসিলে সর্ব্বপ্রকারে তাহার চিত্তবিনোদনের উপযোগী বেশভূষা করিয়া হাবভাবকলাকটাক্ষে পুরুষকে ভুলাইবে।

এ সব অস্ত্র নারীর অস্ত্র বটে, কিন্তু নারীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্ত্র পুরুষজয়ের অস্ত্র। পুরুষ ভুলান এক, পুরুষ জয় আর এক কথা। ভালবাসা সেই পাশুপত অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, যাহাই বল। জগতে বুদ্ধিমতী নারী সেই অস্ত্রের বলে জগতে নানাযুগে নানাভাবে পুরুষকে জয় করিয়াছে। শত শত যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়ী বীর বুদ্ধিমতী সুন্দরী নারীর একটি চুম্বনে আত্মবিক্রয় করিয়াছে, প্রমাণ,—মার্ক এণ্টনি। নারীর বিক্রমে সাম্রাজ্য অতলে তলাইয়াছে, প্রমাণ,- ক্লিওপেটরা।"

পাঠক, দুই দিকের দুইটি চিত্রই দেখিলেন। এক দিকে কুকি নাগা, অপর দিকে প্রতীচ্যের নারী। সমাজে এতদুভয়ের স্থান কোথায়? ইহাদের মধ্যে কে সুখী? এ কথার মীমাংসা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হয় না। জগতের নানা দেশের নানা নারীর অবস্থার আলোচনা করিলে পর এ প্রশ্নের উত্তর দিবার সাহস করা যায়, অন্যথা নহে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

আফগানিস্থানের সহিত বিবাদ

বহু দিন পূর্ব্বে ভারতবাসীর অবস্থা দেখিয়া "যমুনা-লহরীর" কবি গান করিয়াছিলেন —

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে।"

এ কথার যাথার্থ্য আমরা পদে পদে অনুভব করি এবং সংপ্রতি আফগানিস্থানের সহিত ভারত সরকারের সম্বন্ধে তাহা বিশেষরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছি। আফগানিস্থানের সহিত ইংরাজের যে কিছু সম্বন্ধ, সে ভারতবর্ষ লইয়া। আফগানিস্থানের দিক্ হইতে পাছে রুসিয়া ভারত আক্রমণ করে, এই ভয়ে ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ সে দেশের রাজা আমীরের সঙ্গে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বন্ধুত্ব ব্যতীত আরও কিছু অর্থাৎ প্রভূত অর্থ "বার্ষিক" দিয়া আমীরের তুষ্টি-বিধান করিয়া আসিয়াছেন। জাপানের সহিত যুদ্ধে রুসিয়ার পরাভবের পর কিছু দিন ইংরাজ মনে করিয়াছিলেন, দুর্ব্বল রুসিয়া আর এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু এখন আবার নূতন ভয়, পাছে বলশেভিকরা ঐ পথে ভারতে তাহাদের মত-প্রচারে সমর্থ হয়।
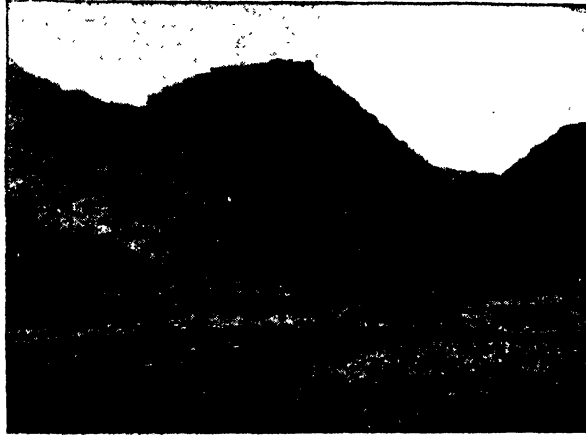
সীমান্তে আলী মসজিদ দুর্গ।

রুসিয়ার আক্রমণ বা প্রভাব বড় কথা। কিন্তু আফগানিস্থানের সহিত ভারতের সম্বন্ধে একটা ছোট কথাও আছে। আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষ ২ দেশের মধ্যস্থলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে কতকগুলি দুর্দ্ধর্ষ জাতির বাস। তাহারা যখন তখন ভারতে—ইংরাজের অধিকারমধ্যে আসিয়া লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া পলায়। ইহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্য ভারতের রাজস্ব হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে এবং এই জন্য সীমান্তপ্রদেশে ইংরাজকে অনেকগুলি দুর্গও রক্ষা করিতে হয়। সীমান্তপ্রদেশে যুদ্ধে লুণ্ডীকোটাল, আলি মসজিদ প্রভৃতির নাম প্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইয়াই ইংরাজ এই বিবাদ ঘটাইয়াছেন—এমন মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এবার যে আফগানিস্থানের সহিত ভারত সরকারের বিবাদ বাধিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর আর সব দেশে সকলে জানিলেও ভারতবর্ষে আমাদের কাছেই সে সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশ্বস্ত ভারত সরকারই জানেন। বিলাত হইতে সংবাদ আসিতেছিল, ভারত সরকার আমীরের সমর সরঞ্জাম ভারতে আটকাইয়াছেন আমীরকে বলিয়াছেন, তিনি দস্যুদিগকে ধরিয়া না দিলে ভারত সরকার যুদ্ধোদ্যম করিবেন—ইত্যাদি। শেষে বিলাতের 'টাইমস' পত্রের প্যারীস্থ সংবাদদাতা ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে জানান—ইংলণ্ডের সহিত আফগানিস্থানের সম্বন্ধ যুরোপবাসীর গোচর করিবার জন্য আফগান সরকার ফরাসী দেশে তাঁহাদের দূতের মারফতে এক বিবরণ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ:-

"সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইংরাজের অধিকারে ইংরাজের প্রজাদিগের উপর যে সব অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তথায় যে ইংরাজের কতিপয় প্রজার প্রাণনাশও হইয়াছে, সেই জন্য ইংরাজ আফগানিস্থানকে দণ্ড দিতে

আমীরের শরীররক্ষী সৈন্ত।

তাহাদের বাসস্থানে বোমা ফেলিবার জন্ত ইংরাজ এরোপ্লেন ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এরোপ্লেনগুলি আফগান রাজ্যসীমা অতিক্রম করে এবং বোমায় কয়জন আফগান প্রজার প্রাণনাশ ঘটে। আফগান সরকার ইহাতে প্রতিবাদ করিয়া বৃটিশ সরকারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ৩ মাস পুর্ব্বে ইংরাজ ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাহা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। নিহত ব্যক্তিদিগের পরিজনের জন্ত আফগান সরকার ক্ষতিপূরণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বৃটিশ সরকার দস্যুদিগকে ধরিয়া দিতে ও দণ্ড দিতে চাহিয়াছেন। প্রকাশ করা হইয়াছে, এ বিষয়ে কাবুলে আফগান সরকারকে পুনঃ পুনঃ জানাইয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই এবং ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কাবুলে ইংরাজ দূত সে সহরের অধিবাসী ইংরাজ মহিলাদিগকে অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

"এই বিবরণ সত্য নহে বলিয়া আমরা য়ুরোপের অধিবাসিবৃন্দকে নিম্নলিখিত ব্যাপার জানাইতেছি—

"ইংরাজদিগের সহিত আফগানদিগের সন্ধি স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের ও আফগানিস্থানের সীমান্তস্থিত আফগান কর্ত্তৃক অধ্যুষিত রাজ্যাংশ ইংরাজের অধিকারভুক্ত করা হয়। এ প্রদেশের লোকরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বাস করে এবং সময় সময় তাহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই সকল অনাচারের অনুষ্ঠাতৃগণকে দণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্তে বলিলে বৃটিশ সরকার তাহা করেন। "সম্প্রতি লুণ্ডীকোটালের সান্নিধ্যে ইংরাজাধিকারে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহা হইয়াছে, সে স্থান ইংরাজ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কাযেই সেজন্য আফগানদিগকে দায়ী করা যায় না। আফগানিস্থান প্রতিবেশী রাজ্য বলিয়া ইংলণ্ডের সহিত বন্ধুভাবে শান্তিতে বাস করিতে চাহে।"

কাবুলের পদাতিক সৈন্ত।

যে সব অনাচারের জন্য এই হাঙ্গামা, সে সব নগণ্য নহে। নিম্নে আমরা তাহার হিসাব সঙ্কলন করিয়া দিলাম—

লুণ্ঠন

স্থান	খৃষ্টাব্দ	কত বার
ডেরা ইস্মাইল খাঁ	১৯১৯-২০	১৯৮
”	১৯২০-২১	৮৪
”	১৯২১ ২২	৫১
”	১৯২২-২৩	৪৯
বান্নু	১৯১৯-২০	১২৬
”	১৯২০ ২১	১৪৯
”	১৯২১ ২২	৭৮
”	১৯২২ ২৩	২৪
কোহাট	১৯১৯ ২০	১৪২
”	১৯২০-২১	১০১
”	১৯২১-২২	৪৪
”	১৯২২-২৩	৩২
পেশাওয়ার	১৯১৯-২০	১৪৫
”	১৯২০-২১	৫৭
”	১৯২১-২২	১৫
”	১৯২২-২৩	২০

নিহত ইংরাজের প্রজা

স্থান	খৃষ্টাব্দ	সংখ্যা
ডেরা ইস্মাইল খাঁ	১৯১৯-২০	৯৯
”	১৯২০-২১	৮৫
”	১৯২১-২২	২৫
”	১৯২২-২৩	২১
বান্নু	১৯১৯-২০	৫০
”	১৯২০-২১	২১
”	১৯২১-২২	২৫
”	১৯২২-২৩	১২
কোহাট	১৯১৯-২০	১১৭
”	১৯২০-২১	৩৩
”	১৯২১-২২	১৬
”	১৯২২-২৩	১০
পেশাওয়ার	১৯১৯-২০	৩২
	১৯২০ ২১	১৬
	১৯২১-২২	১০
	১৯২২-২৩	৪

ইংরাজের প্রজা বন্দীকৃত

স্থান	খৃষ্টাব্দ	সংখ্যা
ডেরা ইস্মাইল খাঁ	১৯১৯-২০	১২৭
”	১৯২০-২১	৩৬
”	১৯২১-২২	১৭
”	১৯২২ ২৩	৩৩
বান্নু	১৯১৯-২০	৭০
”	১৯২০-২১	১৫২
”	১৯২১-২২	৯১
”	১৯২২ ২৩	৯
কোহাট	১৯১৯-২০	১৬১
”	১৯২০ ২১	১০০
”	১৯২১-২২	৩৯
”	১৯২২-২৩	১৮
পেশাওয়ার	১৯১৯-২০	১০৫
”	১৯২০ ২১	২২
”	১৯২১-২২	১
”	১৯২২ ২৩	০

ইংরাজাধিকার হইতে যে সব প্রজাকে পার্ব্বত্য জাতিরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে তাহারা বিনাশুল্কে ফেরৎ দিয়াছে, কতকগুলিকে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিতে হইয়াছে।

লুণ্ঠিত অর্থ ও দ্রব্যাদির মূল্যও বড় অল্প নহে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের লুটের হিসাব না দিয়া আমরা নিম্নে মোট হিসাব দিলাম—

১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ... ২১ লক্ষ ৩০ হাজার ২ শত ৯ টাকা
১৯২০-২১ „ ... ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ২ শত ৮৪ টাকা
১৯২১-২২ „ ... ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬ শত ৭০ টাকা
১৯২২-২৩ „ ... ৭৭ হাজার ৫ শত ৪০ টাকা

মোট বন্দীকৃত ইংরাজ প্রজার সংখ্যা এইরূপ—

১৯১৯-২০	খৃষ্টাব্দে	৪৬৬
১৯২০-২১	"	৩১০
১৯২১-২২	"	১৫৮
১৯২২-২৩	"	৬০
	মোট	৯৮১

ইহাদিগের মধ্যে টাকা দিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে—

১৯১৯-২০	খৃষ্টাব্দে	২৪ জন
১৯২০-২১	"	৫৬ "
১৯২১-২২	"	৩৫ "
১৯২২-২৩	"	১০ "
	মোট	১২৫ জন

এই ৪ বৎসরে বিনা অর্থে মুক্তি পাইয়াছে যথাক্রমে—

৩১৩ জন
১৯৬ "
১০৮ "
৪৩ "

মোট ৬৬০ জন

৪ বৎসরে নিহতের সংখ্যা যথাক্রমে—

২৯৮, ১৫৩, ৮০ ও ৪৭ জন।

আর মোট আহতের সংখ্যা যথাক্রমে—৩৯২, ১৫৭, ৭২ ও ৪৮ জন।

এই সব পার্ব্বত্য জাতির সহিত বহু বার যুদ্ধে ইংরাজের অর্থাৎ ভারত সরকারের ব্যয়ও কম হয় নাই।

এবার বিলাতে পার্লামেণ্টের উদ্বোধনে রাজার বক্তৃতায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইংরাজাধিকারে হত্যার উল্লেখ ছিল এবং শেষে গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনে বড় লাট এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। সে বক্তৃতায় বড় লাট বলিয়াছেন, আফগানিস্থানের সহিত বিবাদ বাধে নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, আফগান সরকারে ও ভারত সরকারে কতকগুলি বিষয়ে বিচারবিবেচনা চলিতেছে। আফগানস্থানবাসী ওয়াজীরীদিগের দ্বারা বৃটিশ অধিকারে অত্যাচারেই তাহার উদ্ভব। তাহারা লুণ্ঠন-শেষে দ্রব্যাদি আফগানিস্থানে সরাইয়া লইয়া যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাচারী দস্যুরা ভারতে বৃটিশ সেনাদল হইতে পলাইয়া যাইয়া আফগানিস্থানে চাকরী লইয়াছে। তাহাদের অনাচারও বড় সাধারণ নহে—অন্যান্য লোকের ত কথাই নাই, ৪জন বৃটিশ সৈনিক কর্ম্মচারী ও ৮১জন সিপাহী ইহাদের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে। ইহার পর লুণ্ডীকোটালের সান্নিধ্যে ২ জন আফগান প্রজা ২ জন নিরস্ত্র ইংরাজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করে। তাহারা পলাইয়া আফগানিস্থানে যাইলে আফগান সরকারের আদেশে ধৃত হয়, কিন্তু পরে পলাইয়া যায়।

তাহার পরে যাহারা মিসেস এলিসকে হত্যা করিয়া তাঁহার দুহিতাকে লইয়া যায়, তাহারা আফগানিস্থানের প্রজা নহে। তবে তাহারাও আফগানিস্থানে পলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আফগান সরকারের সাহায্যে কোহাটের দস্যুদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাতেই যদি এ ব্যাপারে যবনিকাপাত হয়, তবে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। কারণ, আফগানিস্থানের সঙ্গে আবার যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ভারতের পক্ষে তাহা দুর্ভাগ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থাপক সভায় সরকার ওয়াজীরীস্থানে অভিযানের ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইয়াছে বলিয়াছেন :—

১৯২০-২১ খৃষ্টাব্দে—১৪ কোটি টাকারও অধিক।
১৯২১-২২ " —প্রায় ৭ কোটি টাকা।

পেশাওয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি প্রকৃতপক্ষে ভারতের সীমার বাহিরে। আর সেই সব স্থানের জন্য ভারত সরকার যেরূপে অর্থব্যয় করেন, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্থানের ও ভারতের মধ্যে যে সিন্ধু-নদ প্রবহমান, তাহাকে সীমা ধরিলেই এই সব ব্যয় আর করিতে হয় না। সিন্ধুনদের পরপারে যে গিরিশ্রেণী দণ্ডায়মান, পার্ব্বত্য জাতিরা গিরিপথগুলি ব্যতীত আরও নানা স্থানে সেগুলি অতিক্রম করিয়া অনায়াসে ভারতে আসিতে

পারে—তাহাতে তাহাদের আগমন প্রহত হয় না। পেশাওয়ার, কোহাট ও বান্নু উপত্যকার পর কেবলই মরুভূমি ও পর্ব্বত—সে সব স্থান হইতে কোনরূপ রাজস্বলাভের সম্ভাবনা নাই—থাকিতে পারেও না। তবে কি জন্য সে সব স্থানে ভারত সরকার এত অর্থব্যয় করেন? আফগানরা ও সীমান্তের পার্ব্বত্যজাতিরা সন্তরণপটু নহে; তাহারা নৌকায় পারাপারেও অভ্যস্ত নহে। কাজেই সিন্ধুনদকে যদি ভারতের সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়, তবে তাহারা সহজে পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া উৎপাত করিতে পারিবে না।

গত ৫০বৎসর সীমান্তে ভারতের রাজস্ব অকাতরে ব্যয়িত হইয়াছে; অথচ পার্ব্বত্য জাতিসমূহকে বশীভূত করা যায় নাই। এখন সেই ভ্রান্ত নীতি পরিহার করিলেই কি ভারতের মঙ্গল হয় না?

সীমান্তে জামরুদ দুর্গ
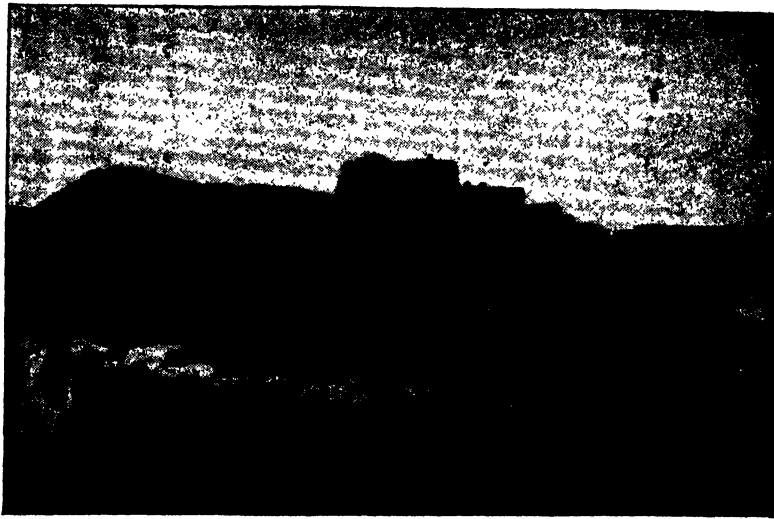
এবারও বড় লাট ব্যবস্থাপক সভায় কতকগুলি রাস্তা-রচনার ফিরিস্তি দিয়াছেন। এই সব রাস্তারচনা অল্পব্যয়-সাধ্য নহে। সামরিক প্রয়োজনেই এই সব রাস্তা-রচনা করিতে হয় এবং সেগুলি রক্ষা করিতেও কম ব্যয় পড়ে না। কেবল তাহাই নহে, কতকগুলি দুর্গও এই প্রদেশ রক্ষার জন্য রাখিতে হয়। যত দিন পার্ব্বত্য-প্রদেশ-সমূহের অধিবাসীরা সর্ব্বতোভাবে পরাভব মানিয়া শান্ত না হইবে, তত দিন ইংরাজের রণসজ্জারও শেষ হইবে না, ভারতের অর্থব্যয়ও শেষ হইবে না। অথচ সেই অর্থব্যয় করিয়া এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ জয় করিয়া কোন লাভ নাই। ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্যই যখন এই অর্থব্যয়, তখন সিন্ধুনদকে ভারতের সীমা নির্দ্ধারিত করিলে সহজেই এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। আর তাহা হইলে আফগানিস্থানের সহিত ভারতের বন্ধুত্বও দৃঢ় হয়। কাবুলের আমীর আবদর রহমান ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দেই ভারত সরকারকে বলিয়াছিলেন, সীমান্তস্থিত জাতিসমূহের সহিত সংঘর্ষ পরিহার করাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। তিনি তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া ক্রমে ইংরাজের বন্ধুতে পরিণত করিবার দায়িত্বও লইতে চাহিয়াছিলেন—I will gradually make them peaceful subjects and good friends of Great Britain. আর ইংরাজ যদি তাহাদিগের দেশ নিজ অধিকারভুক্ত করেন, তবে তাহাতে ইংরাজের কোন উপকার হইবে না, বরং তাহারা কেবলই লুণ্ঠন করিবে আর ইংরাজকে কেবলই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে। এখন গত ৫০ বৎসরের ইতিহাস দেখিয়া ইংরাজ সেই উপদেশ গ্রহণ করিবেন কি?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মধুপের নিবেদন

১

মধুপেরে দিতে হবে মধু পি'তে
কণ্ঠের যদি মাধুরী চাও,
সুষমার মাঝে মধুপসমাজে,
ফুলবনে তারে রহিতে দাও।
তড়াগে ভবনে প্রান্তরে বনে
কুসুমপুঞ্জ ফুটাও তবে।
মধু চাই তার, কেন না মধুর-গুঞ্জন তায় করিতে হবে।

২

মধু নাহি দিলে মধু কোথা পাবে?
সুধাধারা কভু মিলে কি বিষে?
মধুপকণ্ঠ না র'লে সিক্ত
শ্রবণ তোমার জুড়াবে কিসে?
মরুতে, মেরুতে, খনি খাতে কেবা
অলি-গুঞ্জন শুনেছে কবে?
মধু চাই তার, কেন না মধুর গুঞ্জন তায় করিতে হবে।

৩

কি হবে সে ফুলে রঙীন হলেও
মধু নাহি যাহে একটি কণা?
নব পল্লবে যত শোভা থাক্,
মধু তায় কভু মিলিবে ত না।
দ্রোণফুলও ভালো গোলাপেরো চেয়ে
মধু যদি অলি তাহাতে লভে।
মধু চাই তার, কেন না মধুর ঝঙ্কার তায় তুলিতে হবে।

৪

মধু মিলে যদি গহন বনেও
সেই লোভে অলি যাইবে ছুটি'
পরাগে অঙ্গ হোক্ পিশঙ্গ,
হউক অন্ধ নয়ন দু'টি।
রহিবে রুদ্ধ কুসুমের কোষে,
কণ্টক-ক্ষত সকলি স'বে।
মধু চাই তার, কেন না তাহায় কলঝঙ্কার তুলিতে হবে।

৫

মধু ছাড়া আরো রয়েছে ভোগ্য,
বাঁচিতেও পারে তাহাতে প্রাণ;
মধু বিনা সুর হয় না মধুর
মধুপকণ্ঠে ফুটে না গান,
ফুল না ফুটিলে রস না জুটিলে
কলমূর্চ্ছনা নীরব র'বে।
মধু চাই তাই, কেন না মধুর গুঞ্জন তায় করিতে হবে।

৬

তিক্ত কষায় তীক্ষ্ণ করিবে
শুধু ভৃঙ্গের বিষের হুল,
মধুঝঙ্কার চাহ যদি তবে
বিশ্ব ভরিয়া ফোটাও ফুল,
মধুপজীবনে চিরমধুমাস করে' দাও,
মধু যোগাও সবে।
মধু চাই তার, কেন না তাহারে গুঞ্জনে মধু ঢালিতে হবে।

শ্রীকালিদাস রায়

জলস্রোতে পাহাড় ধ্বংস

জলস্রোতের সাহায্যে পাহাড় ধ্বংস।

দক্ষিণ আমেরিকার কোনও সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী নগরের মাঝখানে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়টি ভাঙ্গিয়া সমুদ্র-কূলে নিক্ষেপ করিতে পারিলে নগরের আয়তন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে,ইহা স্থির করিয়া নগরের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহা সরাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। কনট্রাক্টরগণ প্রথমতঃ পাহাড় কাটিয়া, মাটী ও পাথর প্রভৃতি অশ্বতরবাহিত গাড়ীর সাহায্যে সমুদ্রের ধারে নিক্ষেপ করিতেছিল। কিছুকাল কার্য্য করিবার পর দেখা গেল, এই প্রণালীতে কায চলিলে যে ব্যয় পড়িবে, তাহা বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ৮ বৎসরের পূর্ব্বেও সে কার্য্য সমাধা হইবে না। অতঃপর পরামর্শ করিয়া স্থিরীকৃত হয় যে, পাহাড়কে যতটা পারা যায়, জলের স্রোতে ধুইয়া ফেলিতে পারিলে কায সহজ হইবে। তদনুসারে ১২টা প্রবল জলস্রোতকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শক্তিশালী করিয়া তিনটি পম্পের সাহায্যে জলস্রোতোধারা পাহাড়ের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। ইহার ফলে পাহাড় ক্রমে ক্রমে নিম্নে ধ্বসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটি পুরাতন মঠ ছিল। বহুকাল পূর্ব্বে উহা নির্ম্মিত হয়। ইদানীং সে মঠে কেহই বাস করিত না। পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই মঠও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছোট ছোট পাথরগুলি স্রোতের সাহায্যে কূলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে সকল প্রকাণ্ড পাথর সরান দুরূহ, ডিনামাইটের সাহায্যে তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলা হইতেছে। এই পাহাড় হইতে এ পর্য্যন্ত ৭০ লক্ষ বর্গ-গজ মৃত্তিকা উপকূলভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাতে নগরের আয়তন, দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল বাড়িয়াছে। সমগ্র পাহাড়টি সমুদ্রকূলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারিলে, সহরের আয়তন আরও বাড়িয়া যাইবে।

মোটর-চেয়ার

আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক শিল্পী, রুগ্ন ও বার্দ্ধক্য পীড়িতদিগের জন্য বিদ্যুদ্বাহিত তিন চাকার মোটর-চেয়ার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই তিন চাকার মোটর ঘণ্টায় ৬ মাইল হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত ধাবিত হইতে পারে। তিন চাকার পা-গাড়ী (ট্রাই-সাইকেল) চালাইবার যেরূপ হাতল আছে, ইহাতেও সেই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তিন চাকার মোটর-চেয়ার

সম্মুখের চাকাতে সেই হাতল সংযুক্ত; বামদিকে বেগ সংযত করিবার যন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেগ বর্দ্ধিত ও হ্রাস করিবার যে প্রণালী এই গাড়ীতে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে চালকের ভুলভ্রান্তি হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই, সুতরাং চিররুগ্ন অথবা বৃদ্ধ নরনারীরা অনায়াসে এই গাড়ী চালাইতে পারিবে।

ভূগর্ভস্থ শব্দবহ যন্ত্র

বৈজ্ঞানিকগণ সংপ্রতি একপ্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন,
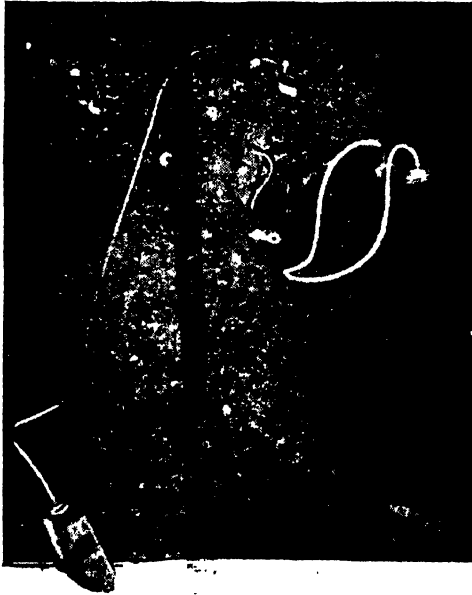
ভূগর্ভস্থ শব্দবহ যন্ত্র।

তাহার সাহায্যে ভূগর্ভস্থ শব্দ স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয় এবং কোন্ স্থান হইতে শব্দ আসিতেছে, তাহা নির্ণীত হয়। খনির ভিতর অনেক সময় নানাপ্রকার আকস্মিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, এই যন্ত্রের সাহায্যে স্থান নিরূপণ করিয়া দুর্ঘটনার স্থানে কেহ বিপন্ন হইলে তাহার সাহায্যে অগ্রসর হইবার সুবিধা ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ কি, তাহাও এই নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপিত হয়। ১ শত ২৫ ফুট নিম্নস্থ স্থান হইতে (পাহাড় অথবা ভূগর্ভ) শব্দ বেশ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। ৩ হাজার ফুট গভীর স্থান হইতেও এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

টেলিফোন যন্ত্রের ক্রমোন্নতি

হস্ত দ্বারা টেলিফোন যন্ত্র কানের কাছে ধরিয়া থাকিতে অসুবিধা হয় বলিয়া সংপ্রতি নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। যন্ত্রের যে অংশ কানের কাছে ধরিতে হয়, তাহা এমনভাবে স্প্রিংযুক্ত করা হইয়াছে যে, ব্যবহারকারী ইচ্ছামতভাবে তাহাকে ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। এখন আর হাত দিয়া কানের কাছে উহা ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। দুই হাতের সাহায্যে অন্য কার্য্য ইচ্ছামত করা যাইতে পারে। কাজ শেষ হইলে যন্ত্রের স্প্রিংযুক্ত অংশটি মুড়িয়া রাখিলেই

নূতন টেলিফোন যন্ত্র।

মূল যন্ত্রের সহিত উহার সংযোগ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। এই টেলিফোন যন্ত্রের তলদেশ এরূপ ভারী যে, নাড়াচাড়া করিতে উহা উল্টাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

গাছের উপর কাঠের বাড়ী

কালিফোর্ণিয়ায় জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মার্কিণ ভদ্রলোক একটি প্রকাণ্ড গাছের উপর একটি কাঠের বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গাছটির শাখাগুলি করাতের সাহায্যে সমানভাবে কাটিয়া ফেলিয়া তাহার উপর এই সুদৃশ্য গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বাসোপযোগী ঘর ব্যতীত, একটি উদ্যানও তথায় রচিত হইয়াছে। দুইটি বড় শয়নগৃহ, রন্ধনাগার এবং একটি বারান্দা আছে। সোপানশ্রেণীর সাহায্যে বৃক্ষশীর্ষস্থ এই
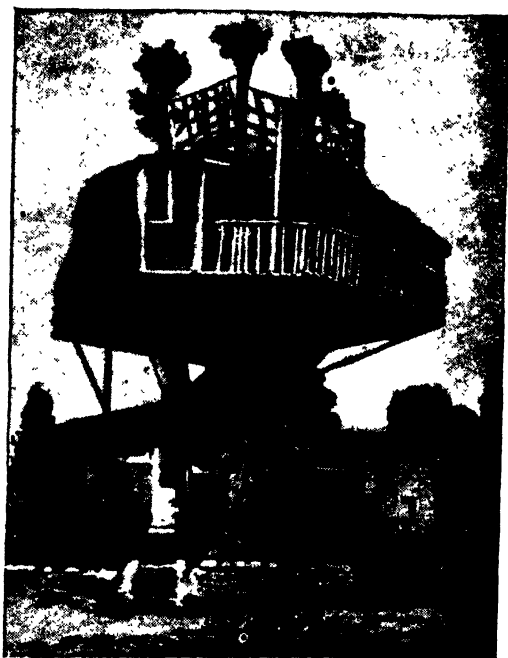
গাছের উপর কাঠের বাড়ী।

রমণীয় বাসভবনে উপনীত হওয়া যায়। গৃহস্থের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী সকল প্রকার ব্যবস্থাই এখানে আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের শ্বেত জাতির পদচিহ্ন

আমেরিকার 'ব্লু-রেঞ্জ' পর্ব্বতমালার দক্ষিণাংশে বিরাট পদচিহ্নসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিরাটাকার এক শ্রেণীর শ্বেত জাতি এই দেশে বাস করিত, উল্লিখিত পদচিহ্ন তাহাদের। যে প্রস্তরের উপর এই পদচিহ্নগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই যুগে পাতরগুলি অপেক্ষাকৃত কোমল ছিল, সেই জন্যই মনুষ্যপদভারে তাহাতে পায়ের ছাপ পড়িবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। মনুষ্যপদের ২৬টি দাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি ছাড়া বাকিগুলি নগ্নপদের চিহ্ন। মাপিয়া দেখা গিয়াছে, পদচিহ্নগুলির একটি দৈর্ঘ্যে ১৭ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৭ ইঞ্চ। এই পদচিহ্নটির পার্শ্বে একটি সুগঠিত করতলের ছাপও আছে। মার্কিণ পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, আমেরিকার 'ইণ্ডিয়ান'গণের মধ্যে একটি বহু পুরাতন জনশ্রুতি আছে। এককালে তথায় এক জাতীয় শ্বেতকায় মানব বাস করিত। ভারতীয় পুরাণে পৌরাণিক মানবের যে বিরাট আকৃতির বর্ণনা পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকগবেষণাকারীরা তাহাকে গল্পিকাসেবীর খেয়াল বলিয়া এখন উড়াইয়া দিতে পারেন কি?

নবনী-নির্ম্মিত গাভী

আমেরিকার কোনও প্রদর্শনীতে সংপ্রতি এক ব্যক্তি সাড়ে ৪ মণ ওজনের এক গাভী আনিয়াছিল। নবনী জমাইয়া এই গাভী নির্ম্মিত হইয়াছে। শিল্পীর দক্ষতা উহাতে সুস্পষ্ট। উত্তাপে মাখন গলিয়া যাইতে পারে বলিয়া, যে আধারে গাভীমূর্ত্তি রক্ষিত, তাহাতে এমন ব্যবস্থা আছে যে, সহসা কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে না। প্রদর্শনীতেও খুব শীতল স্থানের আয়োজন করিয়া তথায় এই গাভীমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে।

নবনী-নির্ম্মিত গাভী

দুগ্ধ-দোহন যন্ত্র

আমেরিকায় সংপ্রতি দুগ্ধ দোহন করিবার এক প্রকার যন্ত্র
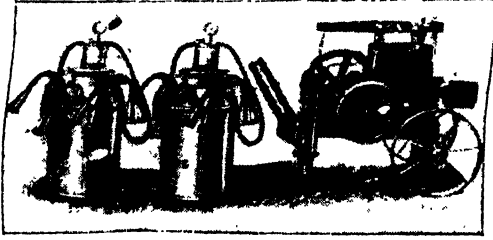
দুগ্ধদোহন যন্ত্র।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ঘণ্টায় ১৮টি গরুর দুগ্ধ দোহন করা যায়। বালক বা নারী অনায়াসে এই যন্ত্রের সাহায্যে দুগ্ধ দোহন করিতে পারে। গোয়ালারা হস্তের সাহায্যে যে ভাবে দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে, তদপেক্ষা অনায়াসগতিতে এই যন্ত্রের দ্বারা সে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে গরুর কোন প্রকার কষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা স্বস্তি অনুভব করিয়া থাকে। যন্ত্রসংলগ্ন একটি ছোট এঞ্জিন আছে। তাহা চালাইয়া দিলে কলে আপনা হইতে দুগ্ধদোহন কার্য্য চলিতে থাকে।

কাগজের চিরুণী।

কাগজের চিরুণী

সংপ্রতি মার্কিণ মুলুকে কাগজের চিরুণী নির্ম্মিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। হোটেল, ক্ষৌরাগার প্রভৃতি সাধারণ স্থানে এই চিরুণী ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয় না। কারণ, এই চিরুণীর মূল্য যৎসামান্য এবং ইচ্ছা করিলে এক জনের ব্যবহারের পর ফেলিয়া দেওয়া চলে। এই কাগজের চিরুণীতে মোমের কোনও পদার্থ মিশ্রিত থাকায়, রবার বা হাড়ের চিরুণীর ন্যায় অনায়াসে কেশরাজির মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া থাকে—কোনওরূপ পার্থক্য বুঝা যায় না। পরিষ্কার করিয়া রাখিতে পারিলে উহা সহজে নষ্টও হয় না। এই চিরুণীর আদর আমেরিকায় দিন দিন বাড়িতেছে। এ দেশের বৈজ্ঞানিক শিল্পীরা কাগজের চিরুণী নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিলে মন্দ হয় না। অনেক বাঙ্গালী ছাত্র মার্কিণে বিদ্যা শিক্ষার্থ যাইয়া থাকেন। স্বল্পব্যয়ে নির্ম্মিত হইতে পারে, এমন প্রয়োজনীয় শর্মশিল্পগুলি শিখিয়া আসিলে অনেক কাযে লাগিতে পারে।

খোলা জুতা

বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ অস্ত্রচিকিৎসক গবেষণার পর এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উচ্চ গোড়ালিযুক্ত, চামড়ায় ঢাকা জুতা অপেক্ষা 'সাণ্ডাল' জাতীয় জুতাই নারীর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত। এই শ্রেণীর স্বল্প গোড়ালিবিশিষ্ট জুতা যেমন আরামপ্রদ, তেমনই শারীরিক পরিপুষ্টির অনুকূল। ইহাতে মেরুদণ্ডসংক্রান্ত ও স্নায়বিক কোন প্রকার পীড়া হইতে পারে না। উচ্চগোড়ালিবিশিষ্ট জুতা পায় দিলে সাধারণতঃ নানাপ্রকার শারীরিক ব্যাধি ঘটে। খোলা চামড়ার সাণ্ডাল জাতীয় জুতা পরিলে তাহার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না। বিলাতী বিলাসিনীরা এই প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ করিবেন কি না জানি না; কিন্তু ভারতীয় মহিলারা—যাহাদের পক্ষে জুতা

স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খোলা চামড়ার জুতা

অপরিহার্য্য,—তাঁহারা এই বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ করিবেন কি ?

অভিনব সিঁড়ি

অধুনা একপ্রকার নূতন সিঁড়ি বা মই নির্ম্মিত হইয়াছে; আরোহী নীচে না নামিয়াই উহা স্থানান্তরিত করিতে পারে। দুইটি সিঁড়ির সংযোগস্থল এমনভাবে সংশ্লিষ্ট যে, দেহের আন্দোলনভারে সমগ্র মইটা অনায়াসে সরিয়া সরিয়া উদ্দিষ্ট স্থানে যায়। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক শিল্পীর এই আবিষ্কারে কায অনেক সহজ হইয়াছে। দেহের আন্দোলনে মই সরাইবার সময় আরোহীর পড়িয়া যাইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

নূতন মই।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাভীর মস্তকের খুলি

আমেরিকার কোনও নদীতে ড্রেজারের দ্বারা মাটী তুলিবার সময় একটি প্রকাণ্ড মাথার খুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষার দ্বারা অনুমান করিয়াছেন যে, ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে গো অথবা মহিষজাতীয় যে জীব পৃথিবীতে বিচরণ করিত, ইহা তাহাদের কাহারও মস্তকের খুলি। এই আবিষ্কৃত খুলিতে এখনও যে শৃঙ্গের অস্থি বিদ্যমান, তাহার গোড়ার পরিধি ২০ ইঞ্চ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গাভীর মস্তকের খুলি।

দুর্ভেদ্য শিরস্ত্রাণ

যাহারা জাহাজ নির্ম্মাণ করে, অথবা খনির মধ্যে কায করে,

শিরোরক্ষার নূতন টুপী।

অনেক সময় গুরুভার দ্রব্য তাহাদের মাথায় পড়িবার সম্ভাবনা। সে জন্য আমেরিকায় সংপ্রতি একপ্রকার নূতন টুপী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা মাথায় থাকিলে সহসা আহত হইতে হয় না। টুপী গুরুভার নহে—বেশ হাল্কা। উহা মাথায় থাকিলে তড়িতের দ্বারা স্পৃষ্ট হইতে হয় না। আগুন ও জলে কোন অনিষ্ট হয় না। জাহাজের কারখানায় জনৈক শ্রমিক এই টুপী মাথায় দিয়া কায করিতেছিল, সহসা একটা ৮ সের ওজনের ষ্টীলের হাতুড়ী ৬ফুট উচ্চ হইতে তাহার মাথার উপর নিক্ষিপ্ত হয়। লোকটা আঘাতের ভারে মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল বটে; কিন্তু তাহার মাথায় কোনও আঘাত লাগে নাই। আর এক জনের মাথায় ৪০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে প্রায় ৫ পোয়া ওজনের একখানা পাতর পড়িয়াছিল, তাহারও মস্তকে কোন আঘাত লাগে নাই; টুপীও ভাঙ্গিয়া যায় নাই। যাহারা স্বল্পালোকিত স্থানে কায করে, এই টুপী তাহাদের মাথা বাঁচাইবার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

শিল্প-কৌশল

জনৈক মার্কিণ মণিকার এক প্রকার ক্ষুদ্র ঘড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার দ্বারা তিনটি কায হয়। অঙ্গুরীয়রূপে অঙ্গুলিতে

অভিনব ঘড়ী, অঙ্গুরীয় ও পদকরূপে ব্যবহার করিতেছে।

ব্যবহার করা চলে, প্রয়োজন হইলে গলায় হারের মত ঝুলান যায়, আবার মণিবন্ধে ঘড়ীর মত ব্যবহার করাও চলে। মণিবন্ধে ঘড়ীর মত ব্যবহারকালে দুই পার্শ্বের গোলাকার খিলানকরা অংশটি ঘড়ীর পশ্চাদ্ভাগে সমতল ও সরলভাবে রাখা যায়। তাহার মধ্য দিয়া ফিতা বাঁধা চলে। আবার সামান্য পরিবর্তন করিয়া সুদৃশ্য ফিতার সাহায্যে গলদেশে বিলম্বিত করাও কঠিন হয় না।

বিচ্ছেদ-বিজ্ঞাপক অঙ্গুরীয়

ইংলণ্ডের বহু নারী স্বামীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরও বিবাহকালীন অঙ্গুরীয় ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের অবসান হইয়াছে, ইহা জানাইবার জন্য সেই অঙ্গুরীয়ের এক স্থানে মণিকারের সাহায্যে একটি গভীর দাগ কাটাইয়া লয়। যাহারা একাধিক বার স্বামিত্যাগ

বিচ্ছেদ-বিজ্ঞাপক অঙ্গুরীয়

করিয়াছে, তাহাদের অঙ্গুরীয়ে ততগুলি কর্তনচিহ্ন থাকিবে। বিলাতের বিলাসিনীদিগের ব্যবহারে কতই না বৈচিত্র্য! ভারতবর্ষে এই বৈচিত্র্যের প্রভাব না ঘটিলেই মঙ্গল।

গাছের ফলরক্ষার নূতন উপায়

গাছের শাখায় টিনের নল।

আমেরিকায় কাঠবিড়ালের উৎপাত অধিক। ফলের বাগানে কাঠবিড়াল গাছে উঠিয়া অপর্য্যাপ্ত ফল নষ্ট করিয়া থাকে। এ জন্য সংপ্রতি একটি সহজ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। সাধারণ টিন গাছের গোড়ার দিকে অথবা শাখার গোড়ায় গোলাকার করিয়া সংলগ্ন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাঠবিড়াল অথবা সেই জাতীয় জীব আর গাছে চড়িতে পারে না। মসৃণ টিনের উপর দিয়া গাছে চড়া তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

নূতন প্রণালীর মোটর গাড়ী

সংপ্রতি য়ুরোপে দুই জন আরোহীর বসিবার উপযোগী একপ্রকার মোটরগাড়ী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড় গাড়ীর পরিবর্তে এইরূপ ছোট মোটর গাড়ী প্রচলনের প্রস্তাবও

নূতন প্রণালীর মোটর গাড়ী।

হইয়াছে। ইহা দামে যেমন সস্তা, ইহাকে চালানও সেইরূপ সহজ। পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা না থাকিলেও যে কেহ গাড়ী চালাইতে পারিবে—নির্ম্মাতা এমন আশ্বাসও জোর করিয়া দিয়াছেন। মোটরবাহিত দ্বিচক্র যানের সঙ্গে যে প্রকার গাড়ী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, এই নবাবিষ্কৃত মোটর গাড়ীর আয়তন ও আকার অনেকটা সেই প্রকার। ছোট একটা ইঞ্জিন ইহাতে সন্নিবিষ্ট; কিন্তু কল ঘুরাইবার চাকা অতি বৃহৎ।—বর্ত্তমান চাকার আকারের দ্বিগুণ। গাড়ীর নিম্নে তিনখানি চক্র সংযুক্ত—সম্মুখে একখানি পশ্চাদ্‌ভাগে দুই খানি, চালক ব্যতীত, ইহাতে দুই জনের বসিবার স্থান আছে। যে সকল পথে গাড়ী ঘোড়ার ভীড় বেশী, এই গাড়ী সেই সকল পথে অন্য মোটর অপেক্ষা দ্রুত গতিতে চলিতে পারিবে—কারণ, আকারে ক্ষুদ্র বলিয়া বড় বড় গাড়ীর পাশ দিয়া ইহারা অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিবে, গতি রুদ্ধ হইবে না।

—

নয়তলা বাড়ী

আমেরিকায় সংপ্রতি এক নয়তলা বাড়ী ১২টি ঘোড়া টানিয়া লইয়া অন্য স্থানে স্থাপিত করিয়াছে। লোহার কড়ি সাজাইয়া তাহার উপর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কড়িগুলির নীচে সুদৃঢ় চাকা থাকায় বাড়ী সরাইবার সময় কোন অসুবিধাই হয় নাই। মাত্র ১২টি ঘোড়া এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা অনায়াসে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই নয়তল অট্টালিকার ওজন ২ লক্ষ ৯৭ হাজার মণেরও অধিক। স্থানান্তরকালে অট্টালিকার প্রাচীর সমূহের কোথাও বিন্দুমাত্র চিড় খায় নাই। পথটি এমন সমতল ছিল যে, ঘোড়াগুলি অনায়াসে এই বিপুলাকার অট্টালিকা টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

বিপুলাকার নয়তল গৃহ।

—

বিরাট ঝাড়

জনৈক মার্কিণ শিল্পী একটি প্রকাণ্ড আলোকাধার বা ঝাড় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাতি জ্বালিবার স্থানের ব্যাস ১২ ফুট এবং সমগ্র ঝাড়টির ওজন ২৭ মণেরও অধিক হইবে। কোনও প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধ্যস্থলে এই ঝাড়টি রক্ষিত

বিরাট ঝাড়।
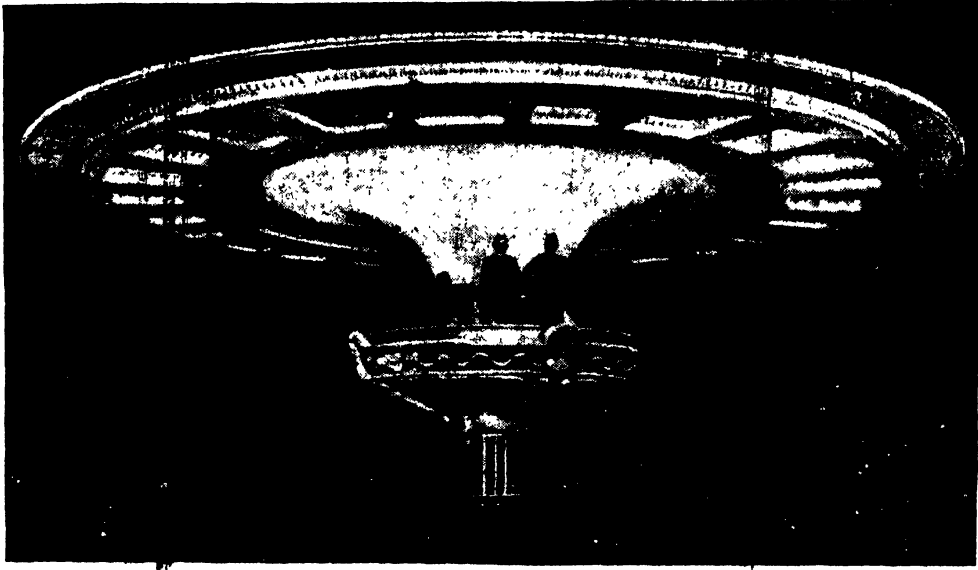
আছে। সংপ্রতি এই ঝাড়ের মধ্যে একটি ভোজ-সভার উৎসব হইবে। ঝাড়ের সর্ব্বনিম্নস্থানে আলোক জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে। বৈদ্যুতিক আলোকধারা নির্গত হইয়া ঝাড়ের উপবিভাগস্থিত চন্দ্রাতপকে আলোকিত করে। সমগ্র ঝাড়টি নানাবিধ কারুকার্য্যময়। ছাত হইতে ঝাড়ে পৌঁছিবার সিঁড়ি আছে। দ্বারপথে উহার মধ্যস্থলে যাওয়া যায়।

মেরুপ্রদেশে সূর্য্যের গতির আলোকচিত্র

উত্তর-মেরুতে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যের গতির এক আলোকচিত্র গৃহীত হইয়াছে। উল্লিখিত দিনটি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্পকালস্থায়ী। আলাস্কীয় কোন উচ্চ পর্ব্বতচূড়ায় আরোহণ করিয়া জনৈক বৈজ্ঞানিক ক্যামেরার সাহায্যে এই আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত মাত্র ২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। প্রতি ১২ মিনিট অন্তর বৈজ্ঞানিক এক একখানি আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। প্রথম চিত্র বেলা ১১টার সময় গৃহীত হয়। সূর্য্য তখন সর্ব্বপ্রথম দিক্-চক্রবালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় সূর্য্যদীপ্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই ২ ঘণ্টার মধ্যে ক্যামেরাকে একবারও সরাইয়া বসাইতে হয় নাই।
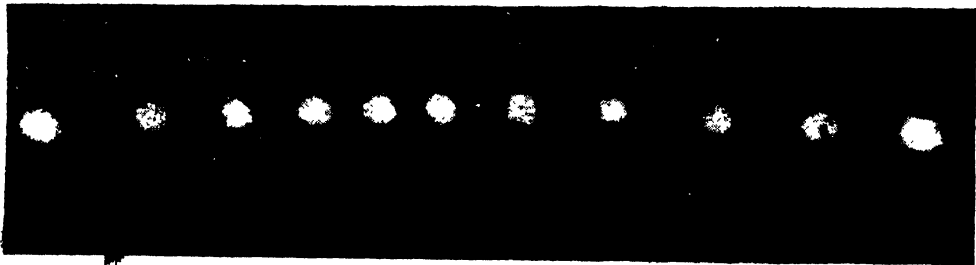
উত্তর-মেরুতে সূর্য্যগতির আলোকচিত্র

স্বারাজ্য ও স্বরাজ-পন্থা

"ততঃ কিং ?"

১

স্বরাজী দল যে পথে স্বারাজ্যলাভের চেষ্টা করিতেছে, সে পথে স্বরাজ পাওয়া যাইবে কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথম স্বরাজ কাহাকে বলে, ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা কি, ইহা ভাল করিয়া ধরা চাই। আর তৃতীয়তঃ, স্বরাজী দল যে পথে চলিয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পরিণাম কি, ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

স্বরাজ বলিতে, মোটামুটি দেশের জনসাধারণ সর্ব্বাদৌ বর্ত্তমান ইংরাজ-রাজের তিরোধান বুঝে। অর্থাৎ আমরা যে দিন স্বরাজ পাইব, সেই দিন ইংরাজ আর আমাদের রাজা থাকিবে না। সাধারণ লোক স্বরাজ বলিতে এইটা বেশ বুঝে। ইংরাজীনবিশদিগের নিকটে এ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উঠে, অর্থাৎ ভারতে স্বারাজ্যলাভ হইলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এই ভারতীয় স্বারাজ্যের কোনও সম্বন্ধ থাকিবে কি না, ভারতবর্ষ তখন ইংরাজের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে, না একেবারে পৃথক্ হইয়া পড়িবে,—এ সকল প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনে উঠে না। তাঁহারা এই সকল জটিল কথা বুঝেন না। তাঁহারা স্বরাজ বলিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়া থাকেন। গত ৩ বৎসর ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বহু লোক স্বরাজ্য বলিতে ইংরাজ-রাজের স্থলে মহাত্মা গন্ধীর "রাজ" বুঝিয়াছে। এই জন্য গন্ধী-মহারাজের শাসনাধীনে তাহারা করভারে প্রপীড়িত হইবে না, প্রচুর ও সুলভ অন্নবস্ত্র পাইবে, এরূপ কল্পনা করিয়া বসিয়াছিল। শিক্ষিত লোকের মধ্যেও যে কেহ কেহ স্বরাজ বলিতে সর্ব্বাদৌ ইংরাজ-রাজের তিরোভাব বুঝেন না, বা বুঝেন নাই, এমন কথাও বলা যায় না।

আর স্বরাজ অর্থ যদি তাহাই হয়, তবে এই স্বরাজ-লাভের, অর্থাৎ ইংরাজ-রাজের বিনাশের একমাত্র পথ আছে—সে পথে সশস্ত্র বিদ্রোহ। যুদ্ধবিগ্রহের পথেই কেবল ইংরাজকে একেবারে তাড়ান সম্ভব, অন্য পথে সম্ভব নহে। তবে, এমন অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নহে, যে অবস্থা উপস্থিত হইলে, ইংরাজ নিজেই এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারে বা বাধ্য হইবে। বিলাতে যদি এমন অবস্থা ঘটে, যাহাতে সে দেশের স্বাধীনতা ও শান্তি রক্ষা করিবার জন্য, ভারতবর্ষে যত সমরক্ষম ইংরাজ আছে, সকলকে নিজেদের দেশে যাইয়া জমায়েত হইতে হয়, তাহা হইলে, ইংরাজ-পল্টন এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতে পারে, এবং তখন ভারতবর্ষের শাসন-সংরক্ষণের ভার ভারতবাসীর উপরে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এরূপ অবস্থা যে উপস্থিত হইবে, এমন কোনও-ই সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, আমরা যে তখন নিজেদের শাসন-সংরক্ষণের ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইতে পারিব, ইহারও কোনও-ই সম্ভাবনা নাই। এ ভাবে যদি ইংরাজ সহসা এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহার ফলে ভারতের স্বারাজ্যলাভের সম্ভাবনা অপেক্ষা দেশব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হইবারই আশঙ্কা বিস্তর বেশী।

সশস্ত্র বিদ্রোহের পথেই যদি ইংরাজকে তাড়াইতে হয়, তাহাতেও আমরা খাঁটি স্বরাজ পাইব কি না সন্দেহ। অথবা সন্দেহই বা বলি কেন, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, পাইব না, ইহাই স্থির-নিশ্চিত। কারণ, সশস্ত্র বিদ্রোহের সাফল্য সমরকুশল সেনা-নায়কের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে। আর যিনি বা যাঁহারা নিজের ক্ষাত্রবীর্য্য-প্রভাবে ইংরাজ-রাজকে পরাভূত করিয়া বর্ত্তমান বৃটিশ প্রভুশক্তির বিনাশসাধন করিবেন, তাঁহারা দেশের শাসন-যন্ত্রের উপরে নিজেদেরই একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহার ফলে আমরা ইংরাজরাজের স্থলে এক জন বা একাধিক ভারতবর্ষীয় সেনা-নায়কের একতন্ত্র বা স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসনেরই প্রতিষ্ঠা দেখিব, প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রশাসন লাভ করিতে পারিব না। এখন ইংরাজরা যেমন নিজেদের খেয়াল

মাফিক বা নিজেদের স্বার্থের সন্ধানে রাজ্যশাসন করিতেছে, তখন ভারতের এই বিজয়ী সেনা-নায়কও সেইরূপই আপনার খেয়ালমত—আপনার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থের প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশশাসন করিবেন। জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী দেশের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে না।

স্বরাজ বলিতে যদি আমরা প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রশাসন-ব্যবস্থা বুঝি, সে শাসনব্যবস্থা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়, সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে পাওয়া অসম্ভব ও অসাধ্য। প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্রশাসনের মূল কথা এই যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে দশের উপরে ন্যস্ত থাকিবে। শাসন-ব্যবস্থার দুই অঙ্গ;—এক বিধানাঙ্গ, অপর কর্ম্মাঙ্গ। ইংরাজীতে এই বিধানাঙ্গকে legislative function (লেজিস্লেটিভ ফাঙ্কষণ) কহে। আমাদের বর্ত্তমান আইন-সভা বা ব্যবস্থাপক সভাগুলি বিধানাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল আইন-সভাতে যে সকল আইনকানুন বিধিবদ্ধ হয়, মোটামুটি তাহারই দ্বারা দেশের বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা পরিচালিত হইয়া থাকে। মোটামুটি বলিতেছি—সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি না, এই জন্য যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাধীনে আইন-সভা সকল যে বিধিব্যবস্থা পাশ করেন, তাহা ছাড়াও, কোনও কোনও অবস্থাধীনে ভারতের বড় লাট বাহাদুরের নিজের নামে সাময়িক আইন-কানুন জারি করিবার অধিকার আছে। ভারতের বড় লাট ইচ্ছা করিলে আইন-সভার সকল নির্দ্ধারণই না-মঞ্জুর করিতে পারেন। আইন-সভাই এই জন্য আমাদের বর্ত্তমান শাসন-যন্ত্রে একমাত্র বিধানাঙ্গ বা legislative organ নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ ও সত্য স্বারাজ্যলাভ হইলে, এই সকল আইন-সভাই একমাত্র বিধানাঙ্গ হইবে। তখন আইন-সভার অমতে কোনও বিধিব্যবস্থা জারি হইতে পারিবে না।

আর এই সকল আইন-সভা প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা গঠিত হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রজামাত্রই আইন-সভার সভ্য মনোনয়নে ভোট দিবার অধিকার পাইবেন। আর ভোটদাতৃগণ যেমন নিজেদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন, সেইরূপ কোনও স্থলে বা কোনও সময়ে বা কোনও বিষয়ে এই সকল নির্ব্বাচিত প্রজাপ্রতিনিধি যদি তাঁহাদের ভোটদাতৃগণের মতের বিরুদ্ধে কোনও কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে, এই সকল ভোটদাতা তাঁহাদিগকে সভ্যপদ হইতে বরতরফ করিয়া, অন্য সভ্য নিয়োগ করিতে পারিবেন। এইরূপে যখন রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের বিধানাঙ্গের উপরে প্রজাসাধারণের অনন্যপ্রতিযোগী আধিপত্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখনই আমরা সত্য স্বরাজের পথে যাইয়া দাঁড়াইব। এই অধিকার লাভ করিলে, আমরা শাসনযন্ত্রের একাঙ্গে স্বারাজ্য লাভ করিব।

এই স্বারাজ্যলাভের জন্য প্রথমে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাকে, জাতিবর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনয়নের অধিকার দিতে হইবে। এখনও আমরা এই অধিকার পাই নাই। ৩০ কোটি লোকের মধ্যে ৬০ লক্ষ লোক মাত্র ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক ৬ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র ব্যবস্থাপক সভা সকলের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। যাহাতে অপর প্রাপ্তবয়স্ক প্রজাও এই অধিকার প্রাপ্ত হয়েন, সর্ব্বাদৌ আমাদিগকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আর যাঁহারা এই অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারাও এখন পর্য্যন্ত ইহার মূল্য এবং মর্য্যাদা বুঝেন নাই। দেশের এই ৬০ লক্ষ ভোটারকে শিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্বারাজ্য-সাধনার প্রথম কথা। ভোটদাতৃগণ যত দিন না স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষালাভ করিতেছেন, যত দিন না তাঁহারা সত্য গণতন্ত্র-শাসনের আদর্শটা ধরিতে পারিতেছেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদের চিত্ত এই আদর্শের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইতেছে এবং এই আদর্শের শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ করিয়া, সর্ব্বপ্রকারের স্বার্থত্যাগ ও সংযমসাধন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, তত দিন আমরা কিছুতেই সত্য স্বারাজ্যলাভ করিতে পারিব না,—এই কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা আপাততঃ ৬০ লক্ষ ভোটার পাইয়াছি। বর্ত্তমান শাসনব্যবস্থাতে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ বস্তু। এই ৬০ লক্ষ ভোটারকে সুশিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে, আমাদের হাতে এমন একটা হাতিয়ার আসিয়া পড়িবে, যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলে, যাহার দ্বারা আমরা বিনা অস্ত্রাঘাতে—বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সঙ্কটসঙ্কুল পথে না যাইয়া, সত্য গণতন্ত্র স্বরাজলাভ করিতে পারিব।

স্বরাজী দল যে পথে চলিয়াছেন, তাহার যথাযথ বিচার

করিতে হইলে, এই গোড়ার কথাগুলি মনে করিয়া রাখা ভাল।

২

স্বরাজী দল অসহযোগী কংগ্রেস হইতে ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের এই নূতন সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা উভয়-সঙ্কটের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহারা বাস্তবিক না খাঁটি অসহযোগী, না সত্য সহযোগী! বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাতে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা এক দিকে অসহযোগ নীতি বর্জ্জন করিয়াছেন। কাউন্সিল-বয়কটনীতি বেশ বুঝা যায়। নিরুপদ্রব অসহযোগের ইহা একটা পদ্ধতি বটে। কিন্তু কাউন্সিলেও যাইব, অথচ অসহযোগ-নীতিরও অনুসরণ করিব, ইহা ভাল করিয়া বুঝা যায় না। পূর্ব্বে ইঁহারা কাউন্সিলের বাহিরে থাকিয়া সরকারের সঙ্গে অসহযোগ করিতেছিলেন। এখন কাউন্সিলের ভিতরে যাইয়া অসহযোগ করিতে চাহেন। এই ইঁহাদের অজুহত। এ অজুহতও বুঝা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক অসহযোগ নহে, নিরস্ত্র-প্রতিরোধ বা passive resistance মাত্র। সংঘর্ষ- আর অসহযোগ একে অন্যের বিরোধী। যাঁহার সঙ্গে সাহচর্য্য করিব না, তাঁহার সঙ্গে কোনও ক্ষেত্রেই এক পংক্তিতে বসিতে পারি না। যাহার সঙ্গে বিরোধ করিতে চাই, ধাক্কাধাক্কি করিতে চাই, তাহার সঙ্গে পাশাপাশি বসিতে বা দাঁড়াইতেই হয়। সুতরাং কাউন্সিলে যাইয়া, অসহযোগ করা যায় না, নিরস্ত্র-প্রতিরোধমাত্র করা সম্ভব। অথচ স্বরাজী দল তাঁহাদের অসহযোগ-কর্ম্ম-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া আছেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় যাইয়াও অসহযোগ নীতির অনুসরণ করিতে চাহেন। এই জন্য তাঁহারা কাকানাড়ায় এই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কোনও কমিটীর সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন না, কোনও প্রস্তাব বা রিজলিউসন উপস্থিত করিবেন না, বা অন্য কোনও প্রকারে সরকারের কার্য্যের সহায়তা করিবেন না। তাঁহারা কেবলই সরকারের বিপক্ষে কোনও প্রস্তাব আসিলে তাহার সমর্থন করিবেন, অন্যথা কেবল কাউন্সিলের ঘরে হাজির হইয়া, নিজেদের আসন দখল করিয়া রাখিবেন।

৩

নাগপুরে স্বরাজী দল দলে ভারী বলিয়া, অন্য নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সরকারপক্ষে যাহা কিছু প্রস্তাব উপস্থিত হইতেছে, তাহাই অগ্রাহ্য করিতেছেন। মধ্যপ্রদেশের লাট বাহাদুর স্বরাজী দলের নায়ক শ্রীযুক্ত মুঞ্জে সাহেবকে মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। ডাক্তার মুঞ্জে তাহাতে রাজী হয়েন না। তখন লাট বাহাদুর শাসনযন্ত্র-পরিচালনের জন্য স্বরাজী দলের বাহিরে যে সকল সভ্য আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ২ জনকে মন্ত্রিপদ অর্পণ করেন। তাঁহারা সে পদ গ্রহণ করেন। তখন স্বরাজী দল এই মন্ত্রীদের উপরে ব্যবস্থাপক সভার আস্থা নাই—এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাব অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। সুতরাং প্রজাতন্ত্র-শাসনের পদ্ধতি অনুসারে মন্ত্রীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিতেই হয়। কিন্তু স্বরাজী দল নিজেরা মন্ত্রী হইতে রাজী নহেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, শাসনযন্ত্র অচল হইয়া পড়ে। শাসনযন্ত্র অচল হইয়া পড়িলে, দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইবেই হইবে। কিন্তু কোনও গভমেণ্ট, স্বদেশীই হউক আর বিদেশীই হউক, এরূপভাবে হাল ছাড়িয়া দিতে পারেন না। যাঁহাদের উপরে দেশের শাসনসংরক্ষণ এবং শান্তিরক্ষার ভার ও দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তাঁহাদিগকে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেই হয়। না করিলে দেশধর্ম্মে তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন। সুতরাং মধ্যপ্রদেশের গভমেণ্টকেও যেরূপেই হউক, শাসনভার বহন করিতেই হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী যদি ইহা অসম্ভব বা অসাধ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই সাহায্য ব্যতিরেকে বর্ত্তমান আইনকে অতিক্রম করিয়াই শাসনকার্য্য চালাইতে হইবে। ইহার আর অন্য পথ নাই।

৪

যখন সত্যই কোনও দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখনও যখন ও যেখানে এবং যে পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি প্রজার শাসনসংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন, সেখানে ও সেই পরিমাণে বিদ্রোহীরা নিজেদের অধীনে ও অধিকারে এই শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যেখানেই বিদ্রোহী পতাকা উড্ডীন হয়, সেখানেই বিদ্রোহী শক্তি দেশের শাসন-ব্যবস্থা নিজের হাতে তুলিয়া লয়। বিদেশী রাজশক্তি যখন কোনও দেশ আক্রমণ করে এবং সেই দেশের রাজশক্তিকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করে, তখনও স্বল্পবিস্তর

এইরূপই ঘটিয়া থাকে। কোথাও একেবারে অরাজকতা উপস্থিত হয় না। যতটুকু হয়, তাহা নূতন শক্তির অক্ষমতা নিবন্ধনই হয়, তাহার অনিচ্ছা নিবন্ধন নহে। কোনও বিদ্রোহী শক্তি প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকে নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত থাকে না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিজের শাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলে। স্বরাজী দল কিন্তু তাহা করিতে চাহেন না, বা করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রকেও অচল করিতে চাহেন, অথচ নিজেরাও ইহার পরিবর্ত্তে কোনও শাসনযন্ত্র গড়িয়া তুলিতে চাহেন না বা পারেন না। এ অবস্থায় ইংরাজরাজ যদি মধ্যপ্রদেশে বা অন্যত্র যেখানে স্বরাজ্য দলের প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে ও তাঁহারা এই ভাঙ্গা-নীতির অনুসরণ করিবেন, সেখানে, বর্ত্তমান কাউন্সিল-গুলিকে ভাঙ্গিয়া নিজেদের স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসন পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেন, তবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। অ.র স্বরাজী দলের এই অদ্ভুত নীতির ফলে নূতন শাসন-ব্যবস্থাই কেবল নষ্ট হইয়া যাইবে, ইংরাজের স্বেচ্ছাতন্ত্রতা কমিবে কি বাড়িবে, ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

৫

এইরূপ প্রতিরোধনীতি যে সকল ক্ষেত্রেই নিষ্ফল হইবে, এমন কথা বলি না। এই নীতি ইতিহাসে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে দেশের অবস্থা অন্যরূপ ছিল। দেশের লোক যদি সত্যই বিদ্রোহের বা বিপ্লবের জন্য উদ্যত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে এই নীতি অবলম্বন করা সঙ্গত হইতে পারিত।

স্বরাজী দল সরকারের সকল কার্য্যে বাধা দিয়া কাউন্সিল গভর্মেণ্টই অসাধ্য করিয়া তুলিতে পারেন। তাঁহারাও এই কথাই কহিতেছেন:—নূতন ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা আমরা অসাধ্য করিয়া তুলিতে চাহি—We want to make this council government impossible—কিন্তু কাউন্সিল গভর্মেণ্ট অসাধ্য করা আর শাসনযন্ত্রকে বিকল করা এক কথা নহে।

৬

ইংরাজরাজ ত বহুদিন এরূপ কাউন্সিল বা ব্যবস্থাপক সভা ব্যতিরেকেও দেশের শাসনকার্য্য চালাইয়াছিলেন। প্রথমে ত কোনও আইন-সভাই এ দেশে ছিল না। তাহার পর যখন প্রথম আইন-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও সে সকল সভাতে প্রজাদের নির্ব্বাচিত কোনও সভ্য ছিলেন না, গভর্মেণ্ট তাঁহাদের পছন্দমত লোক নিযুক্ত করিয়া এই সকল আইন-সভা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ১৮৯০-৯১ খৃঃ পর্য্যন্ত ত এইরূপ ব্যবস্থাই ছিল। কংগ্রেস সর্ব্বপ্রথমে ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃঃ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের প্রধান চেষ্টা ছিল, আইন-সভাগুলিতে প্রজার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেগুলির সংস্কার করা। ১৯৯০ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন-সম্পর্কীয় আইনের দ্বারা সামান্য পরিমাণে, অপরোক্ষভাবে, আইন-সভার সভ্য মনোনয়নে এই নির্ব্বাচনপ্রণালী প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসনসম্পর্কীয় আইনের দ্বারা প্রজাদিগের এই অধিকার আরও কিছু বৃদ্ধি পায়। তাহার পর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসনসংস্কারের দ্বারা আমরা যথারীতি এই অধিকার প্রাপ্ত হই। এই আইনখানি আমাদের মনঃপূত হয় নাই, ইহা সত্য। আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা পাই নাই; দেশের অবস্থা অনুযায়ী যতটা অধিকার প্রজাসাধারণকে দেওয়া প্রয়োজন ছিল, তাহা দেওয়া হয় নাই; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০এ আগষ্ট তারিখে ভারতশাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে আশ্বাসবাণী বলা হইয়াছিল, সে আশা পূর্ণ হয় নাই; এ সকলই সত্য। এই জন্য কংগ্রেস প্রথম হইতেই এই নূতন আইনখানিকে—অনুপযোগী,—inadequate অসন্তোষজনক—unsatisfactory এবং নিরাশাজনক—disappointing বলিয়াছেন। এ সকলই অতি সত্য। কিন্তু যতই অনুপযোগী, অসন্তোষকর ও নিরাশাজনক হউক না কেন, মণ্টেগু-সংস্কার যে মর্লিমিণ্টো-সংস্কার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, এ কথা ত কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বর্ত্তমান ভারতশাসনসম্পর্কীয় আইনে আমরা যেটুকু অধিকার পাইয়াছি, পূর্ব্বতন আইনে তাহা পাই নাই। সুতরাং আরও বেশী পাইবার লোভে এমন কোনও নীতি অবলম্বন করা কখনই সঙ্গত হইবে না, যাহার ফলে আমরা বেশী না পাইয়া, যেটুকু পাইয়াছি, তাহাও হারাইতে পারি। স্বরাজী দলের নেতারা এই কথাটা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিতেছেন কি?

৭

তাঁহারা গভর্মেণ্ট যে সকল আইন পাশ করিতে চাহেন, তাহা অনুমোদন করিবেন না। তাহার ফলে

আইন-সভার দ্বারা কোনও আইন পাশ করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার পর?. গভর্মেণ্টের এ অবস্থায় আইন-সভাকে ডিঙ্গাইয়া আইনকানুন রচনা ও জারি করিবার অধিকার আছে। তাঁহারা সার্টিফিকেট করিয়া নিজেদের ইচ্ছা বা প্রয়োজনমত আইন পাশ করিতে পারেন। সুতরাং আইন-কানুন পাশ করা বন্ধ থাকিবে না, কেবল আইন-সভার কাযই বন্ধ হইয়া যাইবে। স্বরাজদল বজেট পাশ করিবেন না। কিন্তু এখানেও গভর্মেণ্ট সার্টিফিকেটের সাহায্যে ট্যাক্স বসাইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য রাজস্ব আদায় করিতে পারিবেন। সুতরাং স্বরাজী দল যে নীতির অনুসরণ করিতেছেন, তাহার ফলে গভমেণ্ট পঙ্গু বা অচল হইবেন না। পঙ্গু ও অচল হইব আমরাই। এই নীতির দ্বারা সরকারের শাসনযন্ত্র নষ্ট হইবে না, নষ্ট হইবে কেবল প্রজারা যেটুকু অধিকার পাইযাছে, তাহাই। এই কথাটাও ভাবিয়া দেখা উচিত নহে কি?

৮

আইন-সভাতে বজেট পাশ না করিলে কিছু হইবে না। প্রজারা যদি খাজানা না দেয়, তবেই কেবল শাসনযন্ত্র বন্ধ হইতে পারে। আর আইন-সভা কেবল তখনই বজেট অগ্রাহ্য করিতে পারেন, যখন ইহার পরে গভর্মেণ্ট সার্টিফিকেট করিয়া কোনও ট্যাক্স ধার্য্য করিলে, প্রজাসাধারণ সে ট্যাক্স দিতে নারাজ হইবে। দেশের অবস্থা কি এইরূপ হইয়াছে? স্বরাজী দল আইন-সভায় সরকারের রসদ বন্ধ করিলে, তাহার পরে, দেশের লোকও কি খাজানা বন্ধ করিয়া দিবে? যদি তাঁহারা দেশের লোককে এটা করাইতে পারেন, তবেই এই ভাঙ্গা-নীতি সার্থক হইতে পারে। কিন্তু তাহার কোনই সম্ভাবনা আছে কি?

সরকারের রসদ বন্ধ করারও একটা সময় ও অবস্থা আছে। কোনও যুদ্ধের মাঝখানে যখন সরকারের মরণ-বাঁচন অজস্র অর্থসংগ্রহের ও অর্থব্যয়ের উপরে নির্ভর করে। এক দিন যখন টাকা না হইলে চলে না, তখন এই ভয় দেখান যাইতে পারে। কিন্তু তখনও এই ভয় আইন-সভার নহে। প্রজাসাধারণের সম্ভাবিত বিদ্রোহের ভয় মাত্র। বিদ্রোহের মুখে এই নীতি সঙ্গত হয়। সে অবস্থায় এই নীতির ফলে বিদ্রোহের আশঙ্কা দূর হইতে পারে; কারণ, প্রজার বিপক্ষতার ভয়ে তখন গভর্মেণ্ট প্রজাপ্রতিনিধিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, প্রজাদের আত্মস্বাধীনতাবৃদ্ধির উপায় প্রশস্ত করিয়া দিতে পারেন; আর গবর্মেণ্ট যদি তাহা নিজেরা শান্তিতে না করেন, প্রজারা জোর করিয়া তাঁহাদের হাত হইতে নিজের স্বত্ব-স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে পারে। অন্য অবস্থাধীনে এই নীতি নিষ্ফল ও আত্মঘাতী হইবেই হইবে।

৯

দেশের অবস্থা, প্রজাসাধারণের শক্তিসাধ্য, গভর্মেণ্টের প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা, এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্বরাজী দলের বর্ত্তমান ভাঙ্গানীতির বিচার করিলে, কোনও মতেই ইহার সমর্থন করা যায় না।

আমি গন্ধী মহাত্মার অসহযোগ-নীতির সমর্থন করিতে পারি নাই, এখনও সে নীতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু স্বরাজী দলের বর্ত্তমান নীতি অপেক্ষা মহাত্মার নৈষ্ঠিক নন্-কো-অপারেসন নীতি যে সহস্রগুণে অধিক যুক্তিযুক্ত, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব। মহাত্মা ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মনোগতি পরিবর্ত্তিত ও তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া, তাহাদের স্বার্থত্যাগের শক্তির দ্বারা স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজশক্তিকে সংযত ও পরাভূত করিতে চাহিয়াছেন। এই নীতির সাফল্যের সম্ভাবনা মানি আর না-ই মানি, ইহার দ্বারা আশু স্বরাজলাভ হউক আর নাই হউক, এই নীতির অবলম্বনে যে দেশে কতকটা শক্তি জাগিবে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না। এই নীতি ইংরাজকে নষ্ট করুক আর না-ই করুক, আমাদিগকে নষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু স্বরাজী দলের কাউন্সিল নীতিতে ইংরাজকে দুর্ব্বল বা পঙ্গু না করিয়া আমাদিগকেই দুর্ব্বল ও পঙ্গু করিবে, ইহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই জন্যই এই আত্মঘাতী নীতি সমর্থন করিতে পারি না। ইঁহারা যাহা যাহা করিতেছেন, তাহাতেই একটা দুর্দ্দমনীয় প্রশ্ন সর্ব্বদা জাগিয়া উঠে—ততঃ কিং? তাহার পর?

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহাত্মা গন্ধীর মুক্তি

মহাত্মা গন্ধী কারামুক্ত হইয়াছেন। ব্যুরোক্রেশী বিনাসর্ত্তে তাঁহার কারাদণ্ডের অবশিষ্ট কাল মাপ করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

গত ১৩ই জানুয়ারি তারিখে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহার এপেনডিক্সে পূয় হয় ও সঙ্গে সঙ্গে তিনি জ্বর ভোগ করিতেছিলেন। তাই পূর্ব্ব-দিন তাঁহাকে জেল হইতে পুনায় সাসুন হাঁসপাতালে আনিয়া অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। এই সংবাদে সমগ্র ভারতে উৎকণ্ঠার ও বিষাদের ছায়াপাত হয়।

মহাত্মা গন্ধী

এ দিকে দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব উপ-স্থাপিত করিবার কথা ছিল। যে দিন সে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কথা, সেই দিন—৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রভাতে তাঁহাকে মুক্তির সংবাদ প্রদান করা হয়। সরকার বলিয়াছেন, তিনি যেরূপ অসুস্থ, তাহাতে তাঁহাকে স্বাস্থ্য-লাভের জন্য দীর্ঘকাল সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে থাকিতে হইবে, সেই জন্য সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু যদি সেই কথাই যথার্থ হয়, তবে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচারের পর ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনে সে কথার উল্লেখ মাত্র না করিয়া বড় লাট ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার মুক্তির প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার কয় ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে মুক্তির আদেশ প্রচার করিলেন কেন? তাই অনেকে মনে করিতে-ছেন, ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সকল ভারতীয় সদস্যই মুক্তির প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন বুঝিয়া নিশ্চয় পরা-ভব এড়াইবার জন্য বড় লাট এই আদেশ প্রচার করিয়া-ছিলেন।

অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বক্ষণেও মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছিলেন, তিনি অসুস্থ বলিয়া যেন তাঁহার মুক্তির জন্য কোন আন্দোলন করা না হয়। মুক্তির আদেশ প্রচারের পরও তিনি বলিয়াছেন, কোন কয়েদীর অসুস্থতা তাহার মুক্তির কারণ হইতে পারে না।

এখনও তিনি দুর্ব্বল। তিনি বলিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমানে মনোমালিন্যে তিনি ব্যথিত হইয়াছেন এবং সে বিরোধের অবসান না হইলে তাহার জন্য দুশ্চিন্তায় ও উদ্বেগে তাঁহার রোগমুক্তি বিলম্বিত হইবে। ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ-লাভের আশা নাই। ভারতবাসী সকল সম্প্রদায় যেন ঐক্যলাভের জন্য চেষ্টা করেন।

তিনি বলিয়াছেন, চরকাই মুক্তির পথ।
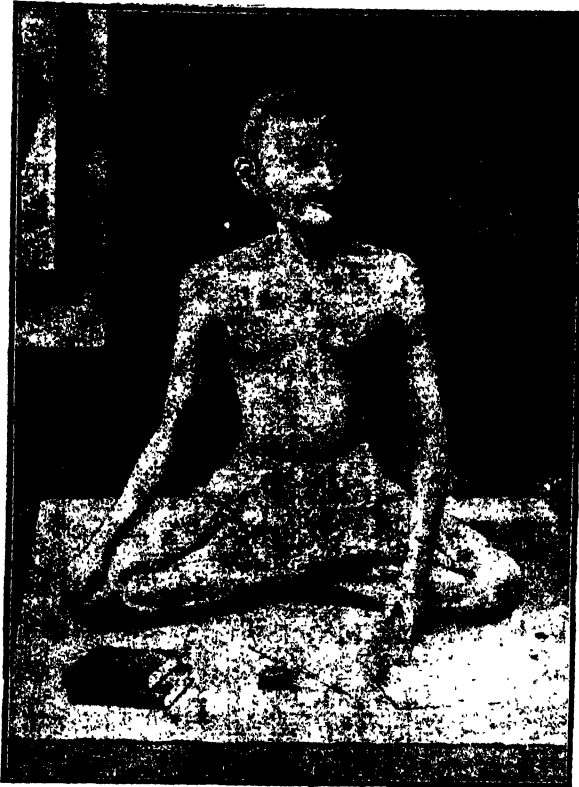
তিনি দেশবাসীকে জানাইয়াছেন, তিনি বারদলীতে গৃহীত গঠন প্রস্তাবেরই সমর্থন করেন এবং সরকারী বিদ্যালয়, আদালত ও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনবিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্তিত হয় নাই। তবে কেন যে দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনের সম্বন্ধে কংগ্রেসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করা কেহ কেহ প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা না করিয়া তিনি সে বিষয়ে কোনও মত প্রকাশ করিবেন না।

তিনি শীঘ্রই নিরাময় হইয়া পুনরায় দেশকে স্বরাজের পথে পরিচালিত করুন, ইহাই তাঁহার দেশবাসীর কামনা।

চাকুরী কমিশন

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে চাকুরী কমিশনের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল।

আজও সে কমিশনের তদন্ত শেষ হয় নাই। তদন্ত শেষ হইলে কোথায় নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করা হইবে, তাহাও স্থির হয় নাই। ভারতীয় সদস্যরা এ দেশেই সে কায শেষ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রথমে কথা হইয়াছিল, দেরাদুনে সে কাযের ব্যবস্থা করা হইবে। এখন শুনা যাইতেছে, তথায় স্থানসঙ্কুলান হইবে না। তাই প্রস্তাব হইয়াছে, আবু পর্ব্বতে বসিয়া সদস্যরা নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষ্যের ভাব দেখিয়া এবং সভাপতি লর্ড লীর কথায় অনেকে সন্দেহ করিতেছেন, নির্দ্ধারণে শ্বেতাঙ্গ সদস্যদিগের সহিত ভারতীয় সদস্যদিগের মতভেদ হইবে। লর্ড লী যেন এ দেশের চাকরীতে বৃটিশের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। সভাপতির পক্ষে তাহা যতই কেন অশোভন হউক না, তিনি যেন সে ভাবটা আর গোপন করিতে পারিতেছেন না।

এ দেশের চাকরীতে যে এ দেশের লোকেরই অধিকার এবং কেবল বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞরূপে বিদেশ হইতে চাকুরীয়া আমদানী করা সমর্থনযোগ্য, এই ভাবটি মনে না রাখিয়া যদি সমিতি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাদের নির্দ্ধারণে ভারতবাসীরা কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। কেবল কমিশনের খরচ বাবদে ভারতের রাজস্বভাণ্ডার হইতে প্রভূত অর্থ ব্যয়িত হইয়া যাইবে। আর তাহা হইলে সে ব্যয় ভারতবাসীর কাছে অপব্যয় পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

বাম হইতে দক্ষিণে—দণ্ডায়মান—মিঃ ষ্টুয়ার্ট (সহযোগী সেক্রেটারী), মিষ্টার সমর্থ, অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড, মিষ্টার হ্লাট (সহযোগী সেক্রেটারী), মিষ্টার হেগ (সংবাদ বিভাগের কর্ম্মচারী), মিষ্টার রাউ (সহযোগী সেক্রেটারী)।
উপবিষ্ট—মিষ্টার পেট্রী, সার মহম্মদ হবিবুল্লা, সার রেজীনাল্ড ক্রাডক, লর্ড লী (সভাপতি), শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সার সিরিল জ্যাকসন, পণ্ডিত হরিকিষণ কৌল।

উডরো উইলসন

মার্কিণের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি উডরো উইলসনের মৃত্যু হইয়াছে। উডরো উইলসন রাজনীতিক সাহিত্যে, বিশেষ রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় সাহিত্যে, সুপণ্ডিত ছিলেন এবং রাষ্ট্রসম্বন্ধে তাঁহার রচিত পুস্তক সে বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি যখন মার্কিণের রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন য়ুরোপের মহাসমরে সমগ্র জগতের রাজনীতিসমুদ্র বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরের মত আন্দোলিত। তাঁহারই নেতৃত্বে মার্কিণ যুদ্ধে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের দলে যোগ দিয়াছিল এবং সেই জন্যই জার্ম্মাণীর পরাভব হয়। বাধ্য হইয়া যুদ্ধে যোগ দিলেও রাষ্ট্রপতি উইলসন যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না; তিনি শান্তিই ভালবাসিতেন। তিনি ১৪টি সর্ত্তে সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং সেই সব সর্ত্ত গৃহীত হইলে, বোধ হয়, য়ুরোপে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইত।

উডরো উইলসন.

একান্ত পরিতাপের বিষয়, জয়ী হইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আর সে সব সর্ত্তে সম্মত হয়েন নাই; পরন্তু যে যাহার স্বার্থেরই সন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই ব্যবহার উইলসনের পক্ষে বেদনার কারণ হইয়াছিল।

যে সময়ে উইলসন মার্কিণের রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ের উৎকণ্ঠা ও চিন্তা তাঁহার স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। তদবধি তিনি আর তাঁহার নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুতে এক জন সুপণ্ডিতের ও দূরদর্শী রাজনীতিকের তিরোভাব ঘটিল। আর তাহাতে সমগ্র সভ্য জগৎ এক জন শান্তিপ্রিয় রাজনীতিকের অভাব অনুভব করিল।

বাণিজ্য-নৌবহর

ভারতে বাণিজ্য-নৌবহর নাই। অন্যান্য দেশে সরকার সাহায্য দিয়া বাণিজ্যের জন্য নৌবহর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। কারণ, বাণিজ্য-নৌবহর ব্যতীত কোন দেশের ব্যবসার প্রসারলাভ ঘটে না; আবার এই সকল পোত যে যুদ্ধের সময় জাতির আত্মরক্ষার অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়, বিগত জার্ম্মাণ যুদ্ধে তাহার প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

এ দেশের সরকার বিলাতের নৌবহরের শ্রীবৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এ দেশে—এ দেশের লোকের দ্বারা বাণিজ্য-নৌবহর সৃষ্টিপুষ্টির কোন রূপ চেষ্টা করেন নাই; পরন্তু তাঁহারা এ দেশের নৌবহরের প্রতি বিরূপ হওয়ায় এ দেশে নৌগঠন শিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছে। অথচ এককালে এ দেশের লোক এ দেশেই প্রস্তুত নৌকায় এ দেশের পণ্য বিদেশে লইয়া যাইত এবং বিনিময়ে প্রভূত অর্থ লইয়া ফিরিত। এ দেশ ইংরাজের অধীন হইবার পর হইতে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া "সে দিনের কথা আজ হয়েছে স্বপন।"

এ দেশে বাণিজ্য-নৌবহর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না এবং সে জন্য সরকারের কিরূপ সাহায্য করা কর্ত্তব্য, তাহারই আলোচনার জন্য সংপ্রতি একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সে সমিতি ভারতের নানা বন্দর ও ব্রহ্ম ঘুরিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে দিল্লীতে সমবেত হইয়া আপনাদের মত লিপিবদ্ধ করিতেছেন। সমিতির সমক্ষে সাক্ষ্যপ্রদানকালে বিদেশী ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিনিধিরা যে ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়—তাঁহারা এ দেশে এ দেশবাসীর দ্বারা বাণিজ্য-নৌবহর সৃষ্টিপুষ্টির বিরোধী এবং সে জন্য তাঁহারা সরকারকেও সহজে সাহায্য দিতে দিবেন না।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
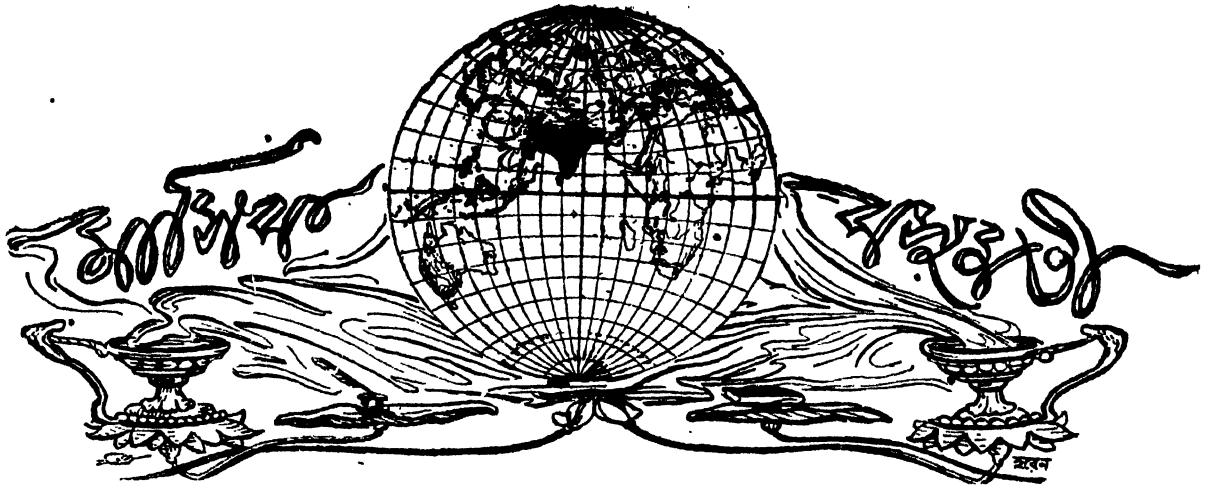
২য় বর্ষ } ২য় ✻ ফাল্গুন, ১৩৩০ ✻ খণ্ড { ৫ম সংখ্যা

বাজাও বাঁশী

ললিত-বিভাস—ঝাঁপতাল

আমার হৃদয়-যমুনার তীরে একবার এসে বাজাও বাঁশী,
একবার বাঁকা হয়ে দাঁড়াও দেখি বংশীবদন ব্রজের শশী।
(আর) হেলিয়ে ময়ূরের পাখা, তেম্নি করে' দাও হে দেখা,
(তোমার) যে রূপ নিরখি সখা, মজিল গোকুলবাসী ॥
(ও যাঁর) চরণেতে ভাগীরথী, নখরে চাঁদেরি পাঁতি,
বক্ষে কমলাক্ষী রমা কমলিনী—এলোকেশী।
(আবার) দশনে মুকতার হাসি, শোভা ঝরে রাশি রাশি,
কণ্ঠে বন-ফুল-মালা, কুলবালার কুল-নাশী ॥
(কিবা) সুললিত ভুরু বাঁকা, তাহে নীল আঁখি আঁকা,
(বুঝি) মুখ-মকরন্দ-লোভে জুটিয়াছে অলি আসি,
(যখন) অধর-বাঁধুলি পরে' মুরলীতে মধু ক্ষরে,
(তখন) কে আছে, যে চরাচরে গৃহ ছাড়ি' না হয় উদাসী ॥
(ও যাঁর) নয়নে বিজলী হাসে, ললাটে ত্রিলোক ভাসে,
কুঞ্চিত কেশেতে পুনঃ সঞ্চিত জলদ-রাশি।
(আবার) ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামে, দাঁড়ায় যখন ব্রজধামে,
(তখন) পদতলে লোঠে আসি' কোটি শশী পরকাশি' ॥
(আমায়) আর কতকাল এম্নি করে' রাখবে সখা ঘুমের ঘোরে,
মায়ামোহ অন্ধকারে আবরিয়া দশদিশি !
(তোমার) পাষাণ গলে যে শ্রীপদে, দাও হে আমার পাষাণ হৃদে,
দিবানিশি ভূষণ কাঁদে, তোমার কি গো সাজে হাসি ॥

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

১০

প্রায় চারি বৎসর হইল, শ্রীশ্রীভবতারিণীর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অব্যভিচারিণী ভক্তি ও কেবলমাত্র আকুল ব্যাকুলতা সহায় করিয়া এই অলৌকিক সাধক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শ্রীমন্দিরের এই অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃন্ময়ী নহেন—চিন্ময়ী! ভক্তের অভীষ্টদাত্রী এই পাষাণ-বিগ্রহ জড় নহে—সচেতন! দর্পণে ইঁহার শ্বাস-চিহ্ন পড়ে, নাসিকার সমক্ষে তূল ধরিলে তূল নড়ে! এই মা-ই জগতের মা! এই দেবীই জীবদেহে চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিতা, গৃহে গৃহে মানবীরূপে—মাতা! ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী, শরীর-যন্ত্রে—যন্ত্রী! অন্তরে ইনি অন্তর্যামী, বাহিরে বিভূ! জীব-জগৎ, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সব মা! জগতে সব চিন্ময়! দেহে দেহে, বিগ্রহে বিগ্রহে মা-ই বহুরূপে বিরাজমানা! ভগবদিচ্ছায় যাঁহার এই অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়, জগৎ-সংসার তাঁহার চক্ষে ভিন্ন ভাব ধারণ করে। তখন তাঁহার পক্ষে মায়ার বন্ধনসকল ছায়ার শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই নয়! ঘৃণা, লজ্জা, ভয় নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়। মন সর্ব্বপ্রকার শারীর চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া যায়। কটি হইতে পরিহিত বসন খসিয়া পড়ে, হুঁস থাকে না। মায়ের ছেলে মায়ের কোলে নির্ভয়ে অবস্থান করে। তাহার যাহা কিছু প্রয়োজন, সব মা জানে। ক্ষুধার সময় মা আপনা হইতে মুখে স্তন্য গুঁজিয়া দেয়। সে কেবল মা-কে জানে, আর কিছুই জানে না। কেবল মায়ের অদর্শন হইলে মা-মা বলিয়া কাঁদে, নহিলে নিশ্চিন্ত।

হলধারী শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গদাধরকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার আচার-ব্যবহার তাঁহার কেমন-কেমন ঠেকিতে লাগিল। হলধারী স্বয়ং সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আচারে তাঁহার ঐকান্তিক আনুরক্তি। ব্রাহ্মণেতর জাতির দেবালয়ে প্রসাদগ্রহণেও তিনি কুণ্ঠিত, সিধা লইয়া স্বপাক আহার করিতেন। মথুর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, আমার ভাই অবশ্য মায়ের প্রসাদ খায় বটে, কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। তার আধ্যাত্মিক অবস্থা অতি উচ্চ। সে এ সব খুঁটি-নাটির পার। আমার সে অবস্থা নয়, নিষ্ঠা ত্যাগ কর্‌লে আমার অনিষ্ট হ'তে পারে। কিন্তু গদাধর সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ধারণা সত্ত্বেও তাহার সকল আচরণ এই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পছন্দ করিতেন না। এ কি! বস্ত্র ফেলিয়া দেয়, পৈতা ফেলিয়া দেয়—ব্রাহ্মণ-সন্তান! কত সুকৃতি-ফলে ব্রাহ্মণ হয়, সেই ব্রহ্মণ্যে তাচ্ছীল্য! হৃদু, তোর কথা শোনে, তুই বুঝাতে পারিস নি? না বুঝে, জোর করবি। ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করলে তাতে পাপ হবে না। হলধারী এইরূপ অনুযোগ করেন। হৃদয় চুপ করিয়া থাকে। মনে ভাবে, এ আবার কি বিভ্রাট উপস্থিত! হলধারী দেশে গিয়া কি গণ্ডগোল তুলিবে! পল্লীগ্রাম—জাতি-চ্যুতি ত কথায় কথায়! বাহিরের লোককে বরং সাম্‌লানো যায়, কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইলে?

ইতিমধ্যে হলধারী এক দিন দেখিলেন, গদাধর কেবল কাঙ্গালীদের এঁটোপাত কুড়াইয়া ক্ষান্ত নহে, নারায়ণের প্রসাদজ্ঞানে তাহাদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেছে! ইহা আর হলধারীর সহ্য হইল না। তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুই করলি কি? ছত্রিশ জাতের এঁটো খেলি! তোর ছেলে-মেয়ের বে হয় কি ক'রে, দেখ্‌ব!

এ উক্তি স্বভাবতঃ শান্ত, ধীর গদাধরকেও উত্যক্ত করিয়া তুলিল। সেও উচ্চতর স্বরে উত্তরিল, তবে রে শালা! তুই না গীতা পড়িস্, বেদান্ত বিচার করিস্? কথায় কথায় বলিস্, জগৎ মিথ্যা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মবুদ্ধি করতে হয়? তোর মত আমি জগৎ মিথ্যা বল্‌ব, আবার ছেলে-মেয়ে হবে? তোর শাস্ত্রজ্ঞানে ধিক্!

উত্তরে হৃদয় খুব সুখী হইল, কিন্তু হলধারী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সত্যই কি ইহার শাস্ত্রবাক্যে এরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে? তবে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আচারে ইহার এত অনাস্থা কেন? যখন পূজার আসনে বসে, তখন ইহাকে দেখিলে সেই শাস্ত্রের কথাই মনে পড়ে—"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ।' হলধারী তখন হৃদয়কে ডাকিয়া কহেন, হৃদু, নিশ্চয় তুই ওর ভিতর কোন অলৌকিক প্রকাশ দেখেছিস, নইলে কি অত যত্ন, এত সেবা করতে পারতিস? গদাধরকে বলেন, গদাই, এইবার তোকে চিনেছি। প্রত্যুত্তরে গদাধর কৌতুক করিয়া কহে, দেখো, আবার যেন গুলিয়ো না।

হলধারী বলেন, নাঃ! আর কি ফাঁকি দিতে পারিস? এবার ঠিক ক'রে ফেলেছি!

কিন্তু শাস্ত্র বিচার করিতে বসিলেই হলধারীর সব ধারণা ওলট্-পালট্ হইয়া যায়! এমনি একদিন শাস্ত্রালোচনাকালে গদাধর আসিয়া বলিল, তুমি শাস্ত্রে যা পড়েছ, মায়ের কৃপায় আমার সে সব উপলব্ধি হয়েছে। সে সব অবস্থা আমি বুঝ্‌তে পারি।

হলধারী প্রথমতঃ কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে গদাধরের প্রতি চাহিলেন। পরে এক টিপ নস্য লইয়া বলিলেন, যা যাঃ, মূর্খ কোথাকার! তুই আবার এ সব বুঝ্‌বি!

হৃদয়।

গদাধর কহিল, সত্যি বল্‌ছি, দাদা, এই শরীরের ভিতর যিনি আছেন, তিনিই আমায় সব বুঝিয়ে দেন।

হলধারী বেশ করিয়া আবার এক টিপ নস্য লইলেন। অতঃপর বলিলেন, হাঃ, তুই গণ্ডমূর্খ—জানিস না! তোর আবার শাস্ত্রজ্ঞান! কলিতে কল্কি ছাড়া আর অবতার হবার কথা নাই।

গদাধর বলিল, দাদা, এই যে সে দিন বল্‌লে, তোকে চিনেছি, আর ভুল হবে না।

হলধারী সে কথা আর কানেই তুলিলেন না। গদাধর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা এমনি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও হলধারীর আন্তরিক অনুরাগ ছিল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দিকে। পাছে কোনরূপ সেবাপরাধ হয়, এই ভয়ে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজিউর পূজায় ব্রতী হইলেন। হৃদয় শক্তিপূজার ভার গ্রহণ করিল। শ্রীশ্রীজগন্মাতার সেবার ঐরূপ বন্দোবস্ত হইবার পর হৃদয় দেখিল, তাহার মাতুল এক নূতন তরঙ্গে গা ভাসাইয়াছেন। সে এক বিচিত্র ব্যাপার! গদাধর যখন যে ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইত, তাহার অনুষ্ঠানের কোনরূপ অঙ্গহানি হইবার যো ছিল না। হৃদয় দেখিল, পরিধেয় বস্ত্রখানি মামা কোমরে জড়াইয়াছেন, তাহার একদিককার অঞ্চল পশ্চাদ্ভাগে লাঙ্গুলের আকারে ঝুলিতেছে। এ কি, মামা! মাতুলের সুগভীর হৃদয়-কন্দর হইতে সুগম্ভীর ধ্বনি উঠিল, জয় রঘুবীর! হৃদয়ের মনে হইল, সে উদাত্ত স্বর যেন জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ব্যোম কম্পিত করিয়া কামার-পুকুরে রঘুবীর-মন্দিরাভিমুখে উধাও হইয়া ছুটিতেছে! কোন দুর্ব্বোধ্য দৈব রহস্যের প্রেরণায় মাতুলের মন যে গৃহদেবতা রঘু-বীরের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছে, হৃদয় তাহা সহজেই বুঝিল। আরও বুঝিল যে, জগন্মাতার এই প্রিয়তম সন্তান আপনাতে মহাবীর হনুমানের ভাবারোপ করিয়া দাস্য-ভক্তির সাধনা করিতেছেন। কিন্তু চরমে না উঠিলে কি ইঁহার মরমের আশা মিটে না? দিবসের অধিকাংশ সময়ই ত গাছের ডালে কাটে! আহার আস্ত ফল, তাও খোসা ছাড়িয়ে নয়। আর নিরবচ্ছিন্ন রাম নামে ত দেবালয়ের ভূতগুলা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! হলধারীই বা ভাবিতেছেন কি?

হলধারী তখন মনে মনে বিচার করিতেছিলেন, ইহা বায়ুরোগ অথবা ব্রহ্মদৈত্যের আবেশ? অনন্তর গদাধর যে দিন বৃক্ষশাখা হইতে প্রস্রাব ত্যাগ করিল, হলধারী পাকা করিলেন—ব্রহ্মদৈত্যের আবেশ। এই ভাবে কিছুদিন কাটিল। গদাধর এক দিন পঞ্চবটীতলে বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আলোকচ্ছটায় দিক্‌সকল উদ্ভাসিত করিয়া তাহার চক্ষুর সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। গদাধর চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, যেখানে যা ছিল, তাই আছে। অদূরে সেই তরঙ্গ-রঙ্গময়ী গঙ্গা; কাছে তাহার স্বহস্তরোপিত নূতন পঞ্চবটী; তাহার পূর্ব্ব-পার্শ্বে তুলসী ও অপরাজিতা-বেষ্টিত ধ্যান করিবার নিভৃত ভূমি। একাধারে অপরূপ সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সম্মিলিত এই সাকার বিষাদ-প্রতিমা যে উত্তপ্ত মস্তিষ্ক-সৃজিত বিকার নহে, গদাধর তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিল। কিন্তু কে ইনি? ইঁহার কথিত হেমকান্তি যেন তপঃপূত হোম-শিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল; মুখমণ্ডল অপূর্ব্ব প্রেম-কারুণ্যে ঢল ঢল, নয়নযুগল যেন নিরুদ্ধ অশ্রুভারে টলটল করিতেছে; অনন্ত ধৈর্য্য যেন ইঁহার প্রতি পদক্ষেপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে! গদাধর নিস্পন্দ নেত্রে দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, কে ইনি?
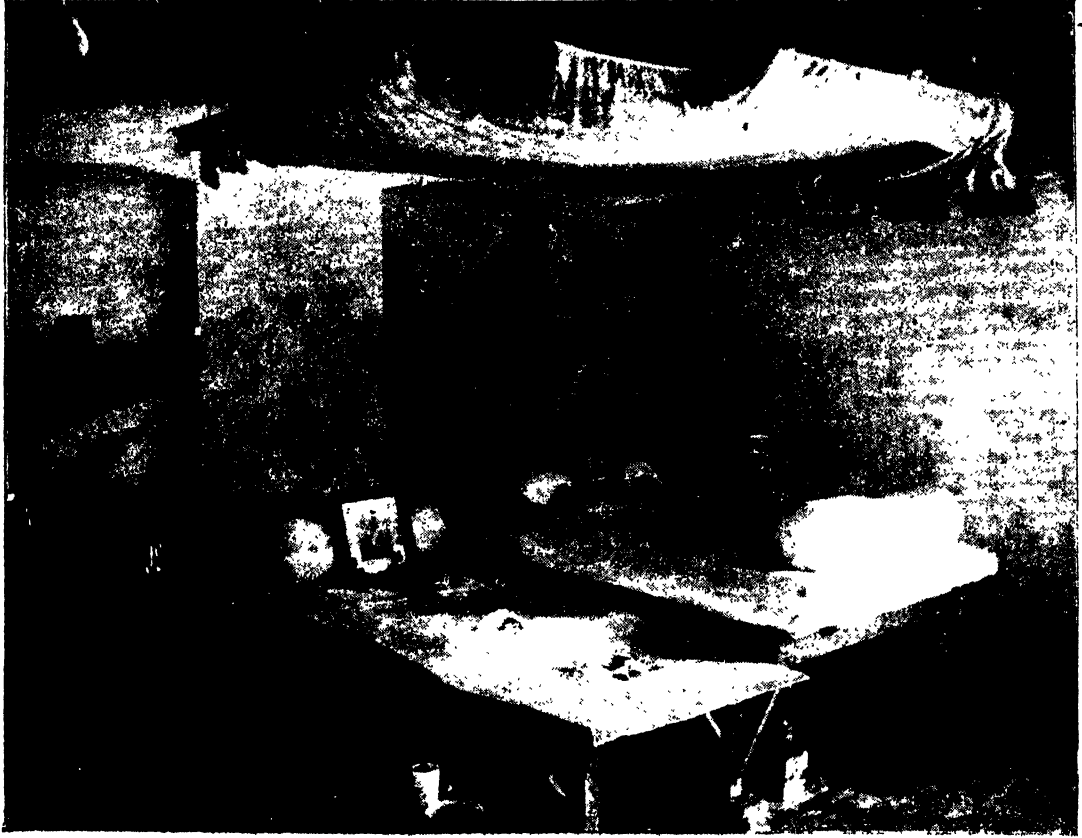
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহ, তাঁহার ব্যবহৃত শয্যা ও আসবাব-পত্র ; দূরে গোপালমূর্ত্তি।

দেবী নয়, কেন না, ত্রিনয়ন নাই। কিন্তু এই অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য কি মানবীতে সম্ভব ? এই সময় কোথা হইতে একটা হনুমান আসিয়া সেই দেবী-মানবীর পদমূলে আশ্রয় লইল। অমনি গদাধরের অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, ইনি সীতা। গদাধর মা-মা বলিয়া সেই পুণ্য-প্রতিমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে না হইতে মূর্ত্তি চপলার ন্যায় চকিতে তাহার অঙ্গে মিলাইয়া গেল। হৃদয় দেখিল, মাতুল পঞ্চবটীতলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন।

দক্ষিণেশ্বর-দেবালয় দিনে দিনে সাধু-সন্ন্যাসিমণ্ডলে বিশিষ্ট খ্যাতিলাভ করিতে লাগিল। একে গঙ্গাতীর, তাহাতে শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব প্রভৃতি সর্ব্বসম্প্রদায়ের সম্মিলন-ক্ষেত্র ; তার উপর রাণী রাসমণির অতুলনীয় অতিথি-সেবা, গঙ্গাসাগর-যাত্রী অথবা শ্রীক্ষেত্রগামী বহু সাধু-সন্ন্যাসী এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়া দিন কয়েক বিশ্রাম করিয়া যাইতেন। এইরূপ এক সাধুর নিকট দীক্ষা লইয়া গদাধর হঠযোগ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল এবং হলধারীও এই সময় এক স্বতন্ত্র সাধনায় ব্রতী হইলেন। পরকীয়া নায়িকার আশ্রয়ে মাধুর্য্যরসোপলব্ধি, বৈষ্ণব সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। হলধারী এই সাধন-মার্গ অবলম্বন করিলে দেবালয়ের কর্ম্মচারিবর্গ সেই কথা লইয়া নানাভাবে কানা-কানি করিতে লাগিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ একে একটু উগ্র-স্বভাব, তার উপর বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া সকলের বিশ্বাস। অভিশাপভয়ে এ কথা তাঁহার কাছে উত্থাপন করিতে কেহ সাহস করিল না। কিন্তু এই আলোচনা মুখে মুখে ক্রমে এমন একটি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল যে, পর-চর্চ্চায় সম্পূর্ণ উদাসীন গদাধরের কাছেও তাহা গুপ্ত রহিল না। গদাধর হলধারীকে সকল কথা জ্ঞাত করিল। শুনিতে শুনিতে হলধারী আগ্নেয়গিরির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া বজ্রনির্ঘোষে বহ্নিপিণ্ড ছুটিল, কনিষ্ঠ হয়ে তুই জ্যেষ্ঠকে অপমান করিস ? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।

এই অভিসম্পাত-প্রদানের কিছু দিন পরে হঠাৎ এক রাত্রে গদাধরের মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হলধারী ছুটিয়া আসিলেন। তাহাকে দেখিবামাত্র গদাধর কাঁদিয়া উঠিল, দাদা গো, শাপ দিয়ে আমার কি অবস্থা করেছ, দেখ! লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে হলধারী কথা কহিতে পারিলেন না, গদাধরের গলা ধরিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই গণ্ডগোলের ভিতর এক প্রবীণ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাঢ় শিম-পাতার রসের মত রক্তের রঙ দেখিয়া তিনি গদাধরকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি হঠযোগ অভ্যাস করতে?

গদাধর স্বীকার করিলে সাধু রক্ত-নির্গমনের স্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, ভয় নেই। হঠযোগের প্রক্রিয়ায় তোমার রক্ত মাথায় উঠ্‌ছিল। তার ফলে তুমি জড়-সমাধিতে অচেতন হয়ে যেতে। সে সমাধি আর ভাঙ্‌ত না। রক্ত মাথায় না উঠে যে বেরিয়ে গেল, ভাল হ'ল। জগদম্বা তোমাকে রক্ষা করেছেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় গদাধর এই দারুণ সঙ্কট এড়াইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার বায়ুরোগের অণুমাত্র উপশম হইল না। মথুর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে সুদীর্ঘ চিকিৎসায় যখন কোন ফলোদয় হইল না, মথুরের চিন্তা তখন অন্যদিকে ছুটিল। তাঁহার ধারণা হইল, বাবার এই ব্যাধি অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও কঠোর ইন্দ্রিয়-সংযমের পরিণাম। অচিরে ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। মোহিনী-কলা-কুশলা যে সকল বারাঙ্গনার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল, তাহাদের অগ্রগণ্যা ছিল লছমী বাঈ। মথুর ইহার কাছে প্রস্তাব করিলেন, গদাধরের ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিতে পারিলে আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিবেন। রূপ-গর্ব্বে লছমী মনে ভাবিল, এ কোন্ বিচিত্র কথা! মুখে বলিল, বেশ ত! মথুর তৎক্ষণাৎ দিন স্থির করিয়া গেলেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে বাবাকে লইয়া লছমীর আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যোগ্যপাত্রেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে! কুলটার কুৎসিত কক্ষে ফুল, আলো, হাসি ও কটাক্ষের আজ কি বিচিত্র সমাবেশ! যোগীর যোগভঙ্গ করিবার যোগ্য আয়োজন বটে! গান শুনিবার অছিলায় এই মোহিনী-আসরে বসাইয়া দিয়া মথুর কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে এক অভাবনীয় ব্যাপার উপস্থিত। মথুরের মনে হইল, যেন কোন্ দিব্যলোক হইতে কিন্নর-কণ্ঠের সঙ্গীত-ধারা ভাসিয়া আসিতেছে।

অতঃপর গদাধরের আত্মহারা মা-মা রবে মথুর ত্রস্তপদে আসিয়া দেখিলেন, বাবা তখন বালকবৎ উলঙ্গ! শ্রীমুখে দিব্যজ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে! লক্ষ্যহীন চক্ষু বাহ্যজগৎ-বিমুখ হইয়া কোন্ অতীন্দ্রিয়লোকে স্থির সন্নিবিষ্ট! দেখিলেন, চাপল্যের প্রতিচ্ছবি ব্যাপিকা বারাঙ্গনাগণ ভয়ে শুষ্ক, লজ্জায় জড়সড়! সাপুড়ের বাঁশীর গানে সর্পীর ন্যায় নত-শির! মথুরকে দেখিয়াই সকলে ধিক্কার দিয়া উঠিল, ছি ছি, এ তুমি কা'কে এনেছ, একে দেখে যে ছেলে ব'লে মনে হয়! মথুর নীরবে বাবাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্যাধির সর্ব্বপ্রকার প্রতীকার যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, জননী চন্দ্রাদেবী এবং মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের উৎকণ্ঠার তখন পরিসীমা রহিল না। গদাই, গদাই! বার্দ্ধক্যের সন্তান, বৃদ্ধার সর্ব্বস্ব ধন, অঞ্চলের নিধি! জন-রসনা শত-মুখে কত কথা কহিতেছে—মায়ের প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। রামেশ্বর তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া কনিষ্ঠকে দেশে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন। শুভদিনে হৃদয় মাতুলকে লইয়া কামারপুকুর যাত্রা করিল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নিবেদন

বারি যদি কর মোরে, করো গঙ্গাজল,
　করো দূর্ব্বা, যদি দাও তৃণের জীবন।
শ্রীপদ-নলিনে রেখো করি' শতদল,
　পুষ্পজন্ম দাও যদি, এই নিবেদন।
বিল্ব বা তুলসী করো, পত্র যদি কর।
　বৃক্ষ যদি কর, তবে করিও চন্দন।
কর যদি জীব, করো ভক্তিনত নর।
　জন্মে জন্মে দিও পদ করিতে বন্দন।

শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

উপমা

১

স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে নিম্নলিখিত আলাপ চলিতেছিল ?—

"তবে এবার কল্‌কাতা থেকে খুব কাণ্ড ক'রে এয়েছে। বুঝেছ ?"

"হাঁ"

"হাঁ কি রকম ?"

"তবে না।"

"দেখ, তোমার এই সব ঠাট্টা আর ফিট্‌কিনি শুনে শুনে আমার হাড় কালি হয়ে গেল। মনে হয় যে, আত্মহত্যা ক'রে জুড়াই।"

"না, দোহাই তোমার, সেটি কোরো না। তা হ'লে তুমিও বাঁচবে না; আমিও মারা পড়্‌ব।"

"আচ্ছা, কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ধারা কর ? আমি কি তোমার শত্রু ? আমি মলেই যদি তুমি বাঁচ, কেন সেবার আমায় অত ক'রে বাঁচালে ? শেষে এমনি ক'রে দগ্ধে দগ্ধে মারবে ব'লে ? আমি যাই বেহায়া, তাই তোমাদের দুই ভাইয়ের ভালোর জন্য কেবল ফেউ ফেউ ক'রে মরি !"

বলিয়া স্ত্রী সারদা রোদন সংবরণ করিবার জন্য ঘরের মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া মুখে অঞ্চল দিলেন।

স্বামী ঘনশ্যাম সংসারযাত্রায় এই ব্যাপারটিকেই সব চেয়ে ভয় করিতেন। কাজেই তিনি তাড়াতাড়ি সুর বদ্‌লাইলেন। বলিলেন—"আঃ, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ সারদা ! একটা চালাকিও কর্‌তে দেবে না ? তুমি যে একেবারে ছেলেবেলাকার সেই কালাচাঁদ গুরুমশায়ের পাঠশালা ক'রে তুলেছ দেখছি !"

মুখের কাপড় কিঞ্চিৎ অপসারণ করিয়া সারদা কহিলেন—"এ কি রকম হাড়জ্বালান ঠাট্টা গা ? মানুষের আঁতে ঘা দিয়ে কথা না কইলে বুঝি তুমি কথা কইতে জান না ! আমি মরি দিন রাত্তির তোমাদের কিসে ভাল হবে, তোমরা কিসে সুখে থাক্‌বে, সেই ভেবে ;—আর তোমাদের এই ব্যাভার।"

ঘনশ্যাম স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন—"তা তোমারই সংসার, তুমি এ সব না দেখলে কে দেখবে বল ! এত বড় সংসারটা তুমিই তো মাথায় ক'রে রেখেছ।"

অন্য দিন হইলে সারদা ইহাতেই খুসী হইয়া যাইতেন। আজ কিন্তু এ প্রশংসা নিষ্ফল হইল। সারদা তাহার লাল-পাড় সাড়ীর প্রান্ত দিয়া বেশ করিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া বলিলেন—"কিসের সংসার আমার গা ? আমি আজ থেকে যদি তোমাদের সংসারে কিছুতে হাত দিই কি তোমাদের দুই ভায়ের কোন কথায় থাকি তো আমার নাম সারদা বাম্‌নী নয়।"

"এত দিনকার তৈরিকরা সুবিখ্যাত নামটার দাবী এত সহজে পরিত্যাগ করাটা ঠিক হ'বে না" গোছের একটা উত্তর ঘনশ্যামের মুখে আসিতেছিল ; কিন্তু বিজ্ঞতাবশতঃ তিনি বলি-লেন—"তুমি শেষটা এমন কর্‌লে আমাদের উপায় কি হ'বে ?"

"তোমাদের আবার উপায়ের ভাবনা কি ? ভাই বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, বিয়ে দিয়ে বৌ নিয়ে এস। এখন আবার আমার দরকার কি ? আমার যা অদেষ্টে ছিল—চিরটাকাল তোমাদের ঝিগিরি রাঁধুনীগিরি ক'রে এইছি। এখন তোমরা বড়লোক হয়েছ, ভাইয়ের বৌ আস্‌বে ধুমধাম ক'রে ; আমাকে তো হেনস্থা করবেই।"

বলিয়া সারদা যেন কল্পনাদৃষ্টিতে দেবরের আসন্ন বিবাহ এবং তাহার সহিত নিজের কোন সম্পর্ক নাই দে'খিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন।

ঘনশ্যাম এতখানির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি হাতের সংবাদপত্রখানি ফেলিয়া শশব্যস্তে স্ত্রীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া স্ত্রীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"ছিঃ, তুমি একটু ঠাট্টা সইতে পার না ? তোমাকে আমরা এখন চাইনে, এমন নিমকহারামি কথা—দেবা কখনও মুখে আন্‌তে পারে ? কি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি দিনরাত তুমি খেটে এসেছ, তা কে না দেখেছে ? আজ যদি সে সব কথা ভুলে যাই তো বসন্ত হয়ে আমাদের দুটো দুটো চারটে চোখ কানা হয়ে যাবে ;—আমার যাবে, দেবারও যাবে।"

সারদা ঐ বসন্ত রোগটাকে অত্যন্ত ভয়ের দৃষ্টিতে দেখিতেন। গ্রামে কোথাও মায়ের অনুগ্রহ হইয়াছে শুনিলে তিনি স্বামীকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেও দেবরকে কিছুতেই বাড়ীর বাহির হইতে দিতেন না। সেই বসন্তে স্বামী ও দেবরের চারিটি চক্ষুরত্ন নষ্ট হইবে শুনিয়া সারদা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন ও বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া হাত দিয়া স্বামীর মুখ বন্ধ করিয়া বলিলেন—"চুপ কর, অমন অলক্ষুণে কথা বোলো না। ক্ষেণে অক্ষেণে কোন্ কথায় কি হয় জান? একে তো কলকাতায় পাঠিয়ে পর্য্যন্ত ছেলেটা রোগা হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তোমার এই কথা।"

বাক্‌চাতুরীর ফল হইয়াছে দেখিয়া ঘনশ্যাম মনে মনে খুসী হইয়া স্ত্রীর হাত সরাইয়া বলিলেন—"আচ্ছা, না হয় দেবার হ'বে না? আমার তো হ'বে। কেনই বা হ'বে না? আমি তোমায় যেমন জানি, দেবা তো তার অর্দ্ধেকও জানে না। মাষ্টারী ছেড়ে যখন ওকালতী সুরু করলাম, তখন প্রথম প্রথম কোন মাসে পাঁচ টাকা কোন মাসে দশ টাকা পেয়েছি। কি ক'রে যে তুমি তখন সংসার চালিয়েছ, তা কি আমি জানিনে? তার পর সে বার যখন টাইফয়েড্ হয়ে মরমর হয়েও বেঁচে উঠলাম, ডাক্তারেরা কি বলেছিলেন, মনে আছে ত? তাঁরা সকলে একবাক্যে বলেছিলেন—এ যাত্রায় স্ত্রীর সেবায় রক্ষে পেলেন। আমি যদি সে কথা ভুলে যাই তো আবার আমার—"

কথাগুলি একটা উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আরম্ভ করিলেও ইহার ভিতর একটুও অসত্য ছিল না; তাই এ সব বলিবার সময় পুরাতন কথা মনে পড়ায় ঘনশ্যামের গলাটা ধরিয়া আসিল। কিন্তু "আবার আমার" পর্য্যন্ত বলিতেই সারদা আর স্বামীকে অগ্রসর হইতে দিলেন না।

"তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ও সব কথা অমন ক'রে বোলো না। তুমি তো বলেই থাক, আমার মাথা খারাপ, কোন্ কথায় কি ব'লে বসি, তার ঠিক নেই। আমার কথায় কি ও রকম দিব্যি করতে আছে?"

বলিয়া সারদা স্বামীর পায়ে হাত দিতে গেলেন।

ঘনশ্যাম স্ত্রীকে বুকের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সোহাগে আনন্দে প্রৌঢ়া নারী খানিকটা অশ্রুবর্ষণ করিয়া শান্ত হইলেন। তখন আসল কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

২

ঘনশ্যাম আসল কথাটা ভুলিয়া গেলেও সারদা ভুলেন নাই। তাই আহারাদির পর শয়নের সময় তিনি স্বামীকে বলিলেন—"দেখ, আমার বড় ভাবনা হয়েছে। তখন তো শুন্‌লে না, এখন শুন্‌বে?"

ভাবনা কাহার জন্য, তাহা ঘনশ্যাম বুঝিয়াছিলেন; কারণ, দেবেনের জন্য কারণে অকারণে উদ্বেগ ও চিন্তা আজ তাঁহার নূতন নহে। তবে কি বিষয়ের জন্য ভাবনা, সেটা তিনি ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুন্‌ব বই কি; বল, কিসের ভাবনা?"

সারদা কৃতজ্ঞভাবে স্বামীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"দেবু কল্‌কাতায় একটা কিছু গোলমালে পড়েছে।"

ঘনশ্যাম ধীরভাবে বলিলেন—"কি গোলমাল?"

সারদা বলিলেন—"তখনই তোমাকে তো বলেছিলাম যে, দেবুকে কল্‌কাতায় পাঠিও না; একটা তো পাশ করেছে, সেই ভাল। তা তখন শুন্‌লে না। এখন কি হ'বে বল দেখি!"

ঘনশ্যাম ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"এই দেখ, আবার আরম্ভ করলে! কি হয়েছে, স্পষ্ট ক'রে বল্‌বে, তবে না তার উত্তর দেব?"

"বাড়ীতে একটামাত্র ছেলে, তারও ভালমন্দ তুমি দেখবে না, আর বল্লে রাগ করবে! যার ভুগতে হয়, সে-ই জানে!"

সারদার চোখ আবার ছল ছল করিয়া আসিল।

ঘনশ্যাম ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"কি বিপদ্! রাগ করতে আবার কখন্ দেখলে? কিন্তু ব্যাপারটা কি, সেটা তো আমার জানা দরকার; তবে না প্রতীকার করব।"

সারদা তখন মাথার বালিসের তলা হইতে একখানি খামের চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন—"এই দেখ, দেবেনের এই চিঠিখানা আজ পিয়ন দিয়ে গিয়েছে। খামখানা প্রায় খোলাই ছিল। ও-মা, চিঠিখানা প'ড়ে দেখি, এ কি গা! আমার তো হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে। দেখ না প'ড়ে!"

ঘনশ্যাম চিঠিখানি পড়িবার জন্য কোনরূপ আগ্রহ

প্রকাশ না করিয়া বলিলেন—"তোমার এ অন্যায় যে সারদা! কেন তুমি তাড়াতাড়ি ওর চিঠি খুলতে গেলে?"

"তুমি বল কি গা! দেবুর চিঠি খুলেছি, তাতে হয়েছে কি? ও তো আমার পেটের ছেলের মত। ছেলের চিঠি লোক পড়ে না? আর চিঠি না পড়লে এ সব জান্‌তাম কি ক'রে গা?"

বলিয়া সারদা বিস্ময়ে স্বামীর পানে চাহিলেন।

ঘনশ্যাম কহিলেন—"আচ্ছা বেশ, তা তুমিই বল না, কি এমন ভয়ানক কথা চিঠিতে লেখা আছে—যার জন্যে তুমি একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছ?"

স্বামী যে শীঘ্র সে চিঠি পড়িতে সম্মত হইবেন না, তাহা সারদা আগে হইতেই জানিতেন। তাই চিঠিখানা আলোর কাছে একটু সরাইয়া আনিয়া পড়িলেন। এক স্থানে লেখা ছিল:—

"উপমার কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুল নাই। এখানে সকলের মুখে সন্ধ্যাকালে উপমার প্রশংসা। উপমার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছে; তবে তোমার মত কাহাকেও নহে। কিন্তু কৈ, উপমার আকর্ষণও তো তোমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে টানিয়া আনিতে পারিতেছে না?"

সারদা এই জায়গাটা পড়িয়া শুনাইতে ঘনশ্যাম পূর্ব্বের মত আর সুস্থির রহিতে পারিলেন না। নিজে চিঠিখানি গ্রহণ করিয়া একবার সেই স্থানটি পড়িলেন; তার পর সব চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিলেন। উপমার প্রসঙ্গ পত্রের আর কোন স্থানে ছিল না। পত্রশেষে লেখা ছিল— "তোমার গিরীন্দ্র।"

পত্র পাঠ করিয়া স্বামীর কিছু চিন্তিত ভাব দেখিয়া সারদার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ গা, গিরীন্দ্র কে?"

"ওর কোন বন্ধুবান্ধব হবে বোধ হয়।"

"তা হ'লে তাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করে তো?"

"তা করে বৈ কি!"

"উপমা তা হ'লে কে, ওর বোন্‌টোন হবে?"

"তা কি ক'রে জান্‌ব?"

"আচ্ছা, এরা কি জাত, ব্রাহ্মণ তো?"

"তাই বা কি ক'রে জান্‌ব এখান থেকে?"

"কায়স্থ হ'তে পারে?"

"পারে বৈ কি।"

"ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে পারে?"

"তাও পারে।"

"তা হ'লে কি হবে? ও যদি ব'লে বসে, আমি ঐ কায়স্থদের বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের বাড়ীতেই বিয়ে কর্‌ব, তখন?"

"করে কর্‌বে; তা আর আমি কি করব?"

"আমার দেবু তা হ'লে এমনি ক'রে পর হয়ে যাবে? ও গো, আমার এই সর্ব্বনাশ করবার জন্যে তুমি বুঝি ওকে কল্‌কাতায় পাঠিয়েছিলে?"

সারদা এইবার গভীর দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ঘনশ্যামকে তখন আবার সুর বদ্‌লাইতে হইল। বলিলেন—"ওই তো তোমার দোষ। কোন কথা তলিয়ে না বুঝে হাঁউ-মাউ সুরু ক'রে দাও। কি হয়েছে দেখা যাক্, তার পর যুক্তি ক'রে উপায় স্থির করা যাবে। এমনও হ'তে পারে, ব্যাপারটা কিছুই নয়।"

চোখ মুছিতে মুছিতে সারদা বলিলেন—"কিছুই নয় কি ক'রে হবে? অমন পষ্ট ক'রে নাম লেখা রয়েছে, তবু তুমি এ কথা বল্‌ছ?"

ঘনশ্যাম বলিলেন—"আরে, আজকালকার খবর তো তুমি কিছু রাখ না, তাই ও রকম ভাবছ। আজকালকার নাম সব দেখনি—নলিনীবাবু, মোহিনীবাবু, অবলাবাবু এই সব শোনা যায়। বাবু কথাটা বাদ দিয়ে যদি শুধু ঐ নামগুলো লেখা থাকে তো তারা পুরুষ কি স্ত্রী, বোঝা বড় শক্ত হয়ে ওঠে।"

"তা তাদের বাপ-মা ও রকম মেয়েলী নাম রাখে কেন?"

"তাঁরা কি রাখেন? তাঁরা নাম দিলেন—নলিনীমোহন, মোহিনীমোহন, অবলাকান্ত ইত্যাদি। ঐ শেষের অংশটুকু বাদ দেওয়ার জন্যেই না এত বিভ্রাট। সেই রকম এও হ'তে পারে, কোন বন্ধুর নাম হয় তো উপমারঞ্জন। শেষের অক্ষর কটা বাদ দিয়ে ঐ রকম দাঁড়িয়েছে।"

"উপমারঞ্জন আবার মানুষের নাম হয় না কি গা?"

"উপমা যদি মেয়েমানুষের নাম হয় তো উপমারঞ্জন পুরুষের নাম হ'তে বাধা কি?"

"এমনও তো হ'তে পারে যে, কোন মেয়ের নামই উপমা, আর তাকেই দেবু ভালবাসে।"

"হ'তে পারে না, তা নয়। সেই জন্যই তো বলছি, এর সন্ধান নিতে হ'বে। তার পর কি কর্ত্তব্য, তখন স্থির করা যা'বে।"

"আচ্ছা, যদি সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরের ভাল মেয়ে হয়, তা হ'লে সম্বন্ধ করতে বাধা কি?"

"তা আর কি বাধা?"

"আর যদি অন্য জাতের মেয়ে হয়?"

"তা হ'লে পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়ী নিয়ে এলেই হবে। কড়া ক'রে ব'লে দেব—ও সব হ'বে না, দেবা। এ দিকে তুমি কাছাকাছির মধ্যে একটা ডাগর দেখে মেয়ের সন্ধান ক'রে ফেল; তা হলেই সব ঠিক হয়ে যা'বে।"

"তুমি তো জলের মত ব'লে গেলে। এখন দেবুকে কল-কাতা থেকে আনতে গেলে কি সে আসবে, বিশেষ যখন ও রকম জায়গায় মন প'ড়ে গেছে।"

"আসবে না আবার! ভাল বলবে আর আসবে। তেমন তেমন দেখি তো কান ধরব আর নিয়ে আসব।"

"কান ধরবে কি গা? অমন উপযুক্ত ভাইয়ের গায়ে হাত তোলে?"

"আরে, গায়ে কোথায় হাত তুলছি? হাত তো উঠছে কানে! ভাই আর উপযুক্ত কোথায় রইল? অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে, তাই না এ সব করতে হচ্ছে!"

"না গো, ও রকম কিছু হঠাৎ ক'রে বোসো না। যে অভিমানী, শেষটা কোন দিকে বিবাগী হয়ে যাক্! খুব সাবধানে চারিদিক ভেবে চিন্তে তবে এর ব্যবস্থা করতে হ'বে।"

"সে ভয় কোরো না তুমি। যে রোগের যে ওষুধ, তারই ব্যবস্থা তো করা চাই। ম্যালেরিয়ার যেমন কুইনিন্ প্রধান ওষুধ, এ সব প্রেম রোগের প্রহারই তেমনই একমাত্র ওষুধ। ওষুধ পড়লে শরীর একেবারে নির্ব্যাধি হয়ে যা'বে।"

"দেখ, তুমি এ সময়ে চালাকি কর না। যাতে সব দিক বজায় থাকে, তারই ব্যবস্থা কর। আগে শীগ্‌গির একবার কলকাতায় যাও, তার পর অন্য কথা।"

তার পর স্বামি-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, দেবু টাকী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার কাছ হইতে অন্ততঃ উপমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা জানিয়া রাখা হইবে; তার পর অনুসন্ধান। সত্য হ'লে যদি অসম্ভব না হয় অর্থাৎ যদি স্বঘরের মেয়ে হয় তো বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যথা অন্য পন্থা।

এই সব কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর স্বামি-স্ত্রী ঘুমাইলেন।

শেষরাত্রির দিকে সারদার ঘুমের ঘোরের কান্নার সুরে ঘনশ্যামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে সারদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

ঘুমের ঘোরে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সারদা অত্যন্ত বিপন্নের মত বলিলেন—"গোবিন্দ! গোবিন্দ! উঃ, কি দুঃস্বপ্নই দেখছিলাম। উপমা যেন এক ব্রহ্মজ্ঞানীর মেয়ে। তুমি তার সঙ্গে বিয়ে হ'বে না বলাতে দেবু মনের দুঃখে সন্ন্যাসী হয়ে চ'লে যাচ্ছে। আমি চীৎকার ক'রে বুক চাপড়ে কাঁদছি, তা সে কানেই করছে না।"

তখনও সারদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল।

ঘনশ্যাম অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—"আঃ, কি বিপদেই পড়া গেল তোমাকে নিয়ে! আজ থেকে আমার আহার-নিদ্রা তুমি বন্ধ ক'রে দেবে দেখ্‌ছি!"

৩

বসিরহাটের যাহারা ঘনশ্যাম উকীলকে চিনিত, সারদা ঠাক-রুণকেও তাহাদের অল্পবিস্তর চিনিতে হইয়াছিল। চারি বৎসরের মাতৃহীন দেবরকে পুত্রস্নেহে মানুষ করিয়া তুলিয়া-ছিলেন বলিয়া এবং অন্যান্য কতকগুলি সদ্‌গুণের জন্য তাঁহার একটু খরজিহ্বা সত্ত্বেও পাড়ার লোক ও ভিন্ন পাড়ার পরিচিত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিত। যে একটু বেশী দিন সারদার সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছে, সে-ই বুঝিয়াছিল যে, ঐ নারীটির কঠিন বহিরাবরণের নীচে অনেকখানি স্নেহ ও অনেকগুলি সদ্‌গুণ লুকান আছে।

বৎসর কয়েক আগে ঘনশ্যাম উকীলের বাড়ী ঝি বা চাকর কেহই বড় একটা দু' দশ দিনের বেশী থাকিত না। একটি কথার জবাব করিয়াছে কি একটা অনাদরের কায করিয়াছে কি সারদা এমন কড়া কড়া কথা তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছেন যে, তাহার ফলে পরদিন আবার অপর লোকের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। তিন বৎসর হইতে একটি ঝি আছে, সেই কেবল দৈবযোগে টিকিয়া গেছে। এই

ঝির একমাত্র ছেলেটির যখন কলেরা হয়, তখন সারদা তাহাকে ১৫ দিনের ছুটী ও চিকিৎসার খরচ দিয়া—গোপনে গোয়ালাপাড়ায় গিয়া—তাহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। ছেলেটি বাঁচিয়া উঠার পর হইতে এই ঝিটি সারদার একেবারে কেনা হইয়া যায়। এখন সারদা যদি তাহাকে ধরিয়া মারেন, তথাপি ঝি তাহার প্রতিবাদ করিবে না।

মাস কয়েক ঘনশ্যাম এক জন রাঁধুনী রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণকুলতিলক এক দিন রন্ধনকালে রন্ধনপাত্র হইতে কোন খাদ্য উচ্ছিষ্ট করিয়া খাইতেছিল, এই অবস্থায় সে সারদার জ্বলন্ত চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া যায়। ইহারই ক্ষণকাল পরে সেই পাচককে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সেই হইতে সারদা পাচকের নাম সহিতে পারিতেন না।

সব চেয়ে বেশী অত্যাচার সহিতে হইত ঘনশ্যামকে। সারদার কখন্ যে কি খেয়াল চাপবে, তাহা বুঝা কঠিন হইয়া পড়িত।

দেবু এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতা পড়িতে যাইবে শুনিয়া সারদা দুই দিন আহার-নিদ্রা বন্ধ করিয়াছিলেন। পরে অনেক কষ্টে বুঝাইয়া সুঝাইয়া, সে মাসে দুইবার বাড়ী আসিবে, এই অঙ্গীকার করিয়া তবে তাঁহাকে শান্ত করা হইয়াছিল। মাসে দুইবার তো দেবু বাড়ী আসিতই, তাহার উপর হঠাৎ সারদা স্বপ্ন দেখিলেন, দেবুর অসুখ, ঘনশ্যামকে ছুটিতে হইল কলিকাতায়—তা সে কোর্ট কামাই-ই যাউক বা অন্য কোন ক্ষতিই হউক। এ রকম দুঃস্বপ্ন সারদা মাসের মধ্যে দুই একবার দেখিতেনই এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতা গিয়া হয় দেবুর কুশলসংবাদ, নয় স্বয়ং দেবুকে সশরীরে আনিয়া হাজির করিতে হইত।

সারদার নিজের কোন সন্তানাদি হয় নাই, সে জন্য তাঁহার এই দেবরস্নেহ বাড়িয়াই চলিয়াছিল এবং এই স্নেহের বেগ সামলাইতে ঘনশ্যামকে অনেক সময় বিব্রত হইতে হইত।

পূজার ছুটীতে দেবেন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিল এবং টাকীতে সারদার বাপের বাড়ীতে সে এক দিনের জন্য গিয়াছিল। ঐ সময়ে চিঠিখানি আসিয়া পড়ায় এই বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। নহিলে উপমার কথা সারদার চোখে এবং কাযেই ঘনশ্যামের কানে উঠিতে পাইত না।

পরদিন দেবেন্দ্র হাতে একটা মাঝারি পুঁটুলি লইয়া বাড়ী পৌছিল।

দেবেন্দ্র ২২ বৎসরের যুবক। তাহার সুন্দর সুগঠিত দেহ, মিষ্ট হাসিযুক্ত কথাবার্ত্তা ও অর্জ্জিত বিদ্যা—সারদার আনন্দ ও গর্ব্বের বিষয় ছিল। দেবেন্দ্র বি. এ. পাশ করিয়া এম্. এ. ও বি. এল্. একসঙ্গে পড়িতেছিল।

দেবেন্দ্র বাড়ী ঢুকিয়া জুতা খুলিয়া বেশ করিয়া পা ধুইয়া রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সারদা তখন কি একটা তরকারী সশব্দে রন্ধন করিতেছিলেন। দেবেন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এই যে এসেছিস্, দেবু, আমিও ভাবছিলাম, এই এলি ব'লে। সেখানে সব খবর ভাল তো?" সারদা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সকলের কুশলবার্ত্তা কহিয়া দেবু জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা কোথায়, বৌমা?"

দেবু ভ্রাতৃজায়াকে "বৌদিদি" না বলিয়া "বৌমা" বলিতে শিখিয়াছিল।

সারদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তিনি ইষ্টিশনে যান নি?"

"কৈ, দেখ্‌লাম না তো। ষ্টেশনে কেন যাবেন?"

"সকালে তাঁকে বল্‌লাম, ৮টার গাড়ীতে আজ দেবু আস্‌তে পারে, একবার ইষ্টিশনের দিকে যাও না। ছেলেমানুষ জিনিষপত্র নিয়ে হয় ত আস্‌ছে, গেলে একটু সুবিধে হ'বে। খাবার খেয়ে যেতে বল্‌লাম, তা বল্‌লেন—ঘুরে এসেই খাব'খন। আমি ভাবলাম, ইষ্টিশনেই বুঝি গেলেন। কোনখানে বোধ হয় খবরের কাগজ নিয়ে ব'সে গেছেন। গল্প বা কাগজ পেলে তো আর কিছু চান না!"

"দাদাকে কেন তুমি মিছিমিছি কষ্ট দিতে গেলে, বৌমা? তুমি আমাকে এখনও সেই রকম খোকা ব'লেই ভাব। এত বয়স হ'ল আমার, এখনও কি মনে কর যে, একা ইষ্টিশন থেকে আসতে গেলে পথ ভুলে যাব বা জিনিষ ফেলে আস্‌ব? তা হ'লে আর কি করব? এই যেতে আস্‌তে এক ক্রোশ পথ কেন তাঁকে হাঁটালে?"

সারদা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তোরা সবাই মিলে আমাকে আর বকিস্‌নে, বাছা। ছুটীর দিনে একটু

হাঁটলেই বা কি এমন ক্ষতি? তা যখন যাননি, তখন তো কোন কথাই নেই।"

দেবেন্দ্র বলিল—"গিয়েছেন ঠিক, হয় ত একটু দেরী হয়েছে। আমি মাঠের রাস্তা দিয়ে এসেছি, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।"

দেবেন্দ্র তখন ও প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বৌমা, একবার বাইরে এসে দেখ না কত মাছ এনেছি।"

"দাঁড়া, দেখি; তরকারীটা হয়ে গেছে, নামিয়ে যাই।"

বলিয়া বার কয়েক ভাল করিয়া নাড়িয়া তরকারীর কড়াটা নামাইয়া হাত ধুইয়া আঁচলে হাত মুছিতে মুছিতে সারদা বাহিরে আসিলেন।

দেবেন্দ্র হাসিয়া কহিল—"ও কি করলে, বৌমা! কাপড়-ময় যে হলুদের রং হয়ে গেল!"

সারদা বলিলেন—"তা হ'ক্ গে, ভাই; কাচ্‌লেই উঠে যা'বে। তোর বৌ যখন আসবে, তখন কাপড়ে একটুও যাতে হলুদের দাগ না লাগে, সে ব্যবস্থা ক'রে দেব। এখন মাছ দেখা।"

দেবেন্দ্র লজ্জানত মুখে মাছের পুঁটুলিটি খুলিতেই সারদা কহিলেন—"ইস্! করিছিস্ কি দেবু! কত মাছ এনেছিস্?"

দেবেন্দ্র বলিল—"তুমি গল্‌দা চিংড়ি ভালবাস, তাই তো বেছে বেছে নিয়ে এলাম।"

মাছের জন্য যত না হউক, তাঁহারই কথা মনে করিয়া যে দেবেন্দ্র মাছ কিনিয়া বহিয়া আনিয়াছে, ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়া সারদা বলিলেন—"তা বেশ করেছিস্। কিন্তু এত মাছ খাবে কে রে?"

দেবেন্দ্র মাছের বোঝাটা উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিল—"এ আর কত কটা মাছ হ'বে, বৌমা! তোমার পাড়া শুদ্ধ লোককে বিলিয়ে তবে না ঘরে থাকবে?"

"ও কথা বলিস্‌নে, দেবু! পাঁচ জনকে দিয়ে তবে ভাল জিনিষ খেতে হয়।"

"তোমাকে দিতে কে বারণ কচ্ছে, বৌমা! তবে দেওয়াটা হিসেব ক'রে তো জিনিষ আন্‌তে হ'বে। আর এর অর্দ্ধেকের বেশী তো ইজের-চাপকানে বাদ যা'বে।"

"মাছের আবার ইজের-চাপকান কি রে?"

একটা মাছ হাতে তুলিয়া লইয়া দেবু বলিল—"এই যে দেখ, বৌমা, এই হচ্ছে এর ওভারকোট, এই হচ্ছে পাজামা, এই হচ্ছে মোজা, আর এই জুতো। এগুলো তো সবই বাদ যা'বে।"

সারদা হাসিতে হাসিতে গালে হাত দিয়া বলিলেন—"ও মা! এত কথা তুই শিখ্‌লি কি ক'রে, দেবু?"

এমন সময়ে ঘনশ্যাম বাড়ী ফিরিলেন। উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমরা তো বেশ হাসিখুসি কচ্ছ; আর আমি সারা প্লাটফরম্ দশবার ক'রে ঘুরে হায়রাণ হয়ে আসছি। কোন্ পথ দিয়ে তুই এলি রে?"

দেবেন্দ্র বলিল—"মাঠের পথ দিয়ে।"

ঘনশ্যাম বলিলেন,—"দেখ, যা ভেবেছি, তাই। কিন্তু তুই কখন্ বেরুলি? আমি যে তোকে সমস্ত প্লাটফরম তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এলাম। পথে কেবল একটিবার গিরীশের বাড়ী ব'সে ১ ছিলিম তামাক খেয়েছি—ব্যাস্, তারি মধ্যে ট্রেন এসে গেছে। ট্রেণ আসার পর বড় জোর ২ মিনিট দেরী হয়েছে, আমিও তাড়াতাড়ি এসে তার ডিঙ্গিয়ে প্লাটফরমে পৌঁছে গেছি।"

সারদা অধর ও ওষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া এক প্রকার নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক শব্দ করিয়া কহিলেন—"তোমার তো গল্পের সময় অসময় নেই। পেলেই হ'ল।"

এমন সময় ঝি স্নান শেষ করিয়া আসিয়া মাছের ভার লইলে সারদা রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

জলযোগ করিতে করিতে দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"আমার কোন চিঠিপত্র আসেনি, বৌমা?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এসেছে। এই দেখ ভুলে গেছি।" বলিয়া সারদা সম্মুখের ঘরের মধ্যে গিয়া চিঠিখানি আনিয়া দেবেনের হাতে দিয়া অন্তরাল হইতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু আঠা দিয়া খামখানি পূর্ব্বেই যুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

খামের উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়াই আগ্রহে বাঁ হাত দিয়া খামখানি খুলিয়া জলখাওয়া বন্ধ রাখিয়াই দেবেন্দ্র পত্রখানি পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখভাব নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

এই আগ্রহ ও প্রফুল্লতা সারদার পূর্ব্বসন্দেহ দৃঢ় করিয়া দিল।

পত্র পড়া শেষ করিয়া দেবেন্দ্র পুনরায় জলখাবারে হাত দিয়াছে, এমন সময় সারদা সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেবু, ও কার চিঠি রে?"

"গিরীনের চিঠি। আমরা একসঙ্গে পড়ি।" মাথা না তুলিয়াই দেবেন্দ্র উত্তর করিল।

"সে বুঝি তোর বন্ধু?"

"হাঁ।"

"কৈ, তাদের কথা তো কিছু বলিস্‌নি এক দিনও। তাদের বাড়ী যাস্ তুই?"

"তা যাই বই কি। তুমি তো কখন জিজ্ঞাসা কর না এ সব, তাই বলিনি।"

একটু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেবেন্দ্র বলিল। বিস্ময়ের কারণ এই যে, তাহার বৌমার এই সব দিকে ইহার পূর্ব্বে কোন দিন বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা যায় নাই।

"তুই সে সব গল্প না করলে আমি আর কি ক'রে জান্‌ব বল্। এই বুঝি তোর সব চেয়ে বড় বন্ধু, দেবু?"

"হ্যাঁ, বৌমা।"

"এঁরা কি জাত?"

"ব্রাহ্মণ। এঁর নাম গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"আমার ইচ্ছে করে, দেবু, তোর সঙ্গে একবার কল্‌কাতা গিয়ে তোদের বাসা, তোদের বন্ধুদের বাড়ীটাড়ি সব দেখে আসি। চিরটাকাল এক যায়গায় প'ড়ে থেকে আর ভাল লাগে না। আচ্ছা, গিরীনদের বাড়ী কে কে আছেন? গিরীনের মা আছেন তো?"

"হ্যাঁ, মা আছেন, বাপও আছেন।"

"আর ভাই বোন্?"

"তার এক ছোট ভাই আছে, আর এক বোন্।"

"বোন্ বুঝি বড়?"

"না, বোন্‌ও ছোট।"

"তাদের সব বয়স কত?"

"গিরীন আমারই বয়সী। তার ভাইয়ের বয়স বছর আষ্টেক হ'বে। বোনের বয়স ১৫ কি ১৬ বছর হ'বে।"

"মেয়েটির কোথায় বিয়ে হয়েছে?"

"বিয়ে এখনও হয়নি।"

"বলিস্ কি, ১৫।১৬ বছরের মেয়ের এখনও বিয়ে হয়নি?"

"আজকাল তো প্রায়ই এমন হচ্ছে। আমাদেরই দেশে দেখা যায়। কল্‌কাতার কথা তো ছেড়েই দাও।"

"তা মিথ্যে নয়। গিরীনের বাপ কি করেন?"

"তিনি আমাদের কলেজেরই প্রফেসর।"

"আচ্ছা, দেবু, তাঁরা আমাদেরই মত মানুষ তো? ঠাকুর-দেবতা পুজো-আচ্ছা করেন তো?"

"আমাদের মত না ত কি, বৌমা? আর ঠাকুর-দেবতা পুজোই বা করবেন না কেন?"

"না, তাই বল্‌ছি। আজকাল কল্‌কাতায় অনেকে আবার ও সব মানেন না কি না; তাই বল্‌ছি।"

"তাঁরা সব অন্য দলের। ইনি খুব ভক্ত; হরিসংকীর্ত্তন খুব ভালবাসেন।"

এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সারদা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। মেয়েটির কথা বলিতে দেবু ঢোক গিলিয়াছিল, তাহা সারদা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, মেয়েটির নাম না জিজ্ঞাসা করিলেও সে-ই যে "উপমা", তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাহারা যে হিন্দু এবং তদুপরি বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর, ইহাতে সারদা কিছু ভরসাও পাইলেন।

এখন বাকি রহিল স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা।

৪

কার্ত্তিকের এক অপরাহ্নে বিডন ষ্ট্রীটের উপর একটি বাসার উপরকার বারান্দায় Scottish Churchএর ইংরাজীর অধ্যাপক একখানি বই হাতে লইয়া পড়িতেছিলেন ও মাঝে মাঝে একবার বারান্দার দিকে চাহিতেছিলেন—যেন কাহারও অপেক্ষায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুস্তকে তিনি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়িলেন, এমন সময় একটি যুবক সেখানে আসিয়া ডাকিল—"বাবা!"

শ্রীকান্ত বাবু পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া, যুবককে একা দেখিয়া বলিলেন—"কৈ গিরীন, দেবেন এল না?"

"ঐ যে—আস্‌ছে। আজ দুপুরে দেবেনের দাদা এসে-ছেন। তাঁকেও ডেকে এসেছি। এলেন ব'লে!"

"তা বেশ করেছ, কিন্তু তাঁর জন্য আর কিছু খাবার ব্যবস্থা কর। কত দেরী তাঁদের হ'বে?"

"এলেন ব'লে! ঐ বোধ হয় সিঁড়িতে উঠেছেন।"

একটু পরেই ঘনশ্যাম ও দেবেন সেখানে আসিলেন। শ্রীকান্ত বাবু উঠিয়া ঘনশ্যাম বাবুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন।

ঘনশ্যাম শ্রীকান্ত বাবুকে নমস্কার করিয়া বসিয়া বলিলেন—

"গিরীন দেবুকে চা খেতে ডাক্‌তে গিয়েছিল। আমি টের পেয়ে বল্‌লাম—আমিই বা কেন বাদ পড়ি।"

শ্রীকান্ত বাবু হাসিয়া বলিলেন—"এই সময়টা আমরা চা খেয়ে একটু পড়াশুনা ও আলোচনা—করি। দেবেন না এলে কোনটাতেই তেমন জোর হয় না। সকালবেলা আমরা একাই থাকি। বিকালে গিরীনের হাত থেকে দেবেন বড় একটা ছাড়া পায় না।"

একটি আট বছরের ছেলে ও একটি বছর ষোল বয়সের মেয়ে ঠিক সেই সময়ে এক হাতে চা ও অপর হাতে একটি ডিস্ করিয়া হালুয়ার মত কিছু খাবার লইয়া ধীরে ধীরে টেবলের উপর রাখিল। ইহারাই গিরীনের ছোট ভাই-বোন্।

শ্রীকান্ত বাবু মৃদু হাসিয়া মেয়েটির পানে চাহিয়া বলিলেন—"উপমা!"

মেয়েটি এখানে এই —চতুর্থ প্রাণী ঘনশ্যাম বাবুর আবির্ভাবের কথা জানিত না। সে বাপের পানে একবার চাহিয়া মৃদু হাসিয়া মাথা নত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল; শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন—"মা, ইনি দেবেনের দাদা।"

বলিতেই মেয়েটি নত হইয়া ঘনশ্যাম বাবুকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

গিরীন ভিতর হইতে ঘনশ্যাম বাবুর জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি বুঝি আপনার ছোট মেয়ে?"

"ছোট বড় ওই সবে একটি মেয়ে।"

"সুন্দর মেয়েটি! দেখলেই মনে হয়, মেয়েটির স্বভাব বড় ভাল।"

"বড় ভাল। দেখ্‌তে যেটুকু ভাল, তার চেয়ে ঢের বেশী গুণে ভাল।"

"বিয়ের এখনও ঠিক কিছু হয়নি বোধ হয়? না কি আরও দেরী ক'রে বিয়ে দেওয়া আপনার মত?"

"না, খুব বেশী বয়সে বিয়ে দেওয়া আমার মত নয়। যে ঘরে পড়বে, সে ঘরে গিয়ে আবার আপনাকে মানিয়ে নিতে পারে, এমন সময় থাকতে বিয়ে দেওয়া উচিত। এই বছরেই বিয়ে দিতে হ'বে।"

"কিছু ঠিকঠাক করেছেন?"

"না, এখনও তো কিছু ঠিক করতে পারিনে। তা একটু মিষ্টিমুখ করুন।"

তখন মিষ্টমুখ চলিতে লাগিল।

চা-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে একটু কাব্যালোচনা হইতে লাগিল। ঘনশ্যাম দেখিলেন, মেয়েটিও দুয়ারের পাশে বসিয়া বেশ মন দিয়া সব কথাবার্ত্তা শুনিতেছে। একবার দেবেনের দিকে আর একবার মেয়েটির দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে আর ঘনশ্যামের বাকি রহিল না। ঘনশ্যাম বুঝিলেন, গিরীন রোজ অপরাহ্নে ডাকিতে না গেলেও দেবেনের এখানে অনুপস্থিতির আশঙ্কা থাকিত না।

শ্রীকান্ত বাবু রাত্রিতে ঘনশ্যামকে আহার না করাইয়া ছাড়িলেন না।

বাড়ী ফিরিয়া ঘনশ্যাম সারদাকে বলিলেন, -"গিরীনের বোনের নামই উপমা বটে; উপমা সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা এবং এ বিবাহে আপত্তির কিছুই নাই।"

কয়েক দিবস পরে এক সন্ধ্যায় চায়ের আসরে দেবেন্দ্র ও গিরীন্দ্র শ্রীকান্ত বাবুর পাশে বসিয়া আছে; দুই ভাই-বোনে চা ইত্যাদি আনিয়া দিতেছে। শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন—"বিনয়, তোমার মা'কে একবার ডেকে আন তো; বল গে একটা কথা আছে।"

গিরীনের ছোট ভাই বিনয় গিয়া মা'কে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া হাসিমুখে স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। গিরীন্দ্র ও দেবেন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন—"তোমরা ব'স, বাবা! তোমাদের সবাইকে আজ একটু মিষ্টিমুখ করাতে হ'বে কি না, তাই একটু মিষ্টিটিষ্টির যোগাড় কচ্ছি। বস্‌লে আবার দেরী হয়ে যা'বে।"

শ্রীকান্ত বাবু বলিলেন—"তবু একটু ব'স; নইলে ওরা তো বস্‌বে না।"

গিরীনের মা তখন স্বামীর পার্শ্বে একখানি আসনে বসিলেন।

শ্রীকান্ত বাবু পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন—"তোমাদের এই পত্রখানি প'ড়ে শোনাচ্ছি। এখানি ঘনশ্যাম বাবু লিখেছেন।"

বলিয়া তিনি পত্রখানি পড়িলেন:—

নমস্কারপূর্ব্বক-নিবেদন,

আপনার মেয়েটিকে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইয়াছে। অমন মেয়ে যে সংসারে পড়িবে, সে সংসারে লক্ষ্মী অচলা রহিবেন। দেবেনের জন্য আপনার মেয়েটিকে আমি প্রার্থনা করিতেছি। আপনার অনুমতি পাইলে সৌভাগ্য জ্ঞান করিব।

অনুগত

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়।

পত্র পড়িয়া শ্রীকান্ত বাবু মুখ তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী মৃদু মৃদু কৌতুকের হাসি হাসিতেছেন; গিরীনের মুখ নিরতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে; দেবেন্দ্রের মুখে আনন্দ ও লজ্জা ফুটিয়াছে; তাঁহার কন্যাটির মুখে সঙ্কোচ ও সুখাবেশের দ্বন্দ্ব পত্রবেষ্টিত ফুলের মত শোভা পাইতেছে।

শ্রীকান্ত বাবু অতি প্রসন্নমুখে বলিলেন—"আমাদের দু'জনের এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে, তা তোমাদের বলাই বাহুল্য। তবে আজকালের হিসাবে তোমাদের মতও একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। তাই বলছি, তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমি আজই এঁকে উত্তর দিই।"

মুহূর্ত্তের জন্য একবার সঙ্কোচ আসিল। পরক্ষণে দেবেন্দ্র উঠিয়া তাহার ভাবি-স্ত্রীর হাত ধরিয়া উভয়ে শ্রীকান্ত বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর চরণে প্রণত হইয়া আনন্দাশ্রু-পূত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল।

৫

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি এক জ্যোৎস্না-রজনীতে বিবাহ হইয়া গেল। দেবেন্দ্র যখন বধূ লইয়া বাড়ী পৌছিল, তখন সারদার মত আনন্দ কাহারও হয় নাই। সেই দেবু—যাহাকে শাশুড়ী এতটুকু বেলায় তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সে আজ বড় হইয়া, লিখাপড়া শিখিয়া, ভালবাসিয়া মনের মত সুন্দরী—বধূ লইয়া আসিয়াছে! ইহার চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? শাশুড়ীর সেই শেষ দিনের কথা মনে করিয়া, আর আজিকার এই আনন্দের কথা ভাবিয়া, সকলের অলক্ষ্যে সারদা কয়েকবার চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া হাস্যমুখে বরবধূ বরণ করিয়া লইলেন।

বৌভাত ইত্যাদির গোলমাল মিটিয়া গেলে সারদা এক দিন নববধূকে বলিলেন—"তোমাকে ভাই আমি জায়ের মত ছোট-বৌ-টৌ বল্‌তে পার্‌ব না। তোমার নাম আমি আগে থেকেই জানি। উপমা ব'লেই আমি তোমাকে ডাক্‌ব।"

বধূ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু ভারী মিষ্ট সে হাসি!

"হাস্‌লে যে বড়?"—সারদা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার নাম তো উপমা নয় দিদি।"

"তবে তোমার নাম কি?"

"সুষমা।"

সেই চিঠিখানি সারদা যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া তিনি সেই চিঠিখানি আনিয়া বধূর হাতে দিয়া বলিলেন—"বল্লেই হ'ল তোমার নাম উপমা নয়! প'ড়ে দেখ দেখি।"

পত্রখানি পড়িয়া বধূ আর একবার মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল—"না, দিদি, আমি উপমা নই।"

"তবে উপমা কে?"

"বাবার এক মাদ্রাজী বন্ধু আছেন। তাঁরা সপরিবারে এসে কখনও কখনও আমাদের বাড়ীতে ওঠেন। তাঁরা এক নতুন রকমের হালুয়া করেন। তাতে চিনির বদলে নুণ, লঙ্কা, পাঁচফোড়ন, এই সব দিতে হয়। তারই নাম উপমা। আমি তাঁদের কাছ থেকে শিখে দাদাদের রোজ চায়ের সঙ্গে উপমা তৈরী ক'রে খাওয়াতুম।"

মাদ্রাজী হালুয়ার নাম "উপমা" শুনিয়া সারদা হাসিয়া অস্থির!

কথাটা সকলের কানে উঠিল। ঘনশ্যাম শুনিয়া বলিলেন—"ও, তাই আমি যে দিন প্রথম বৌমাদের বাড়ী যাই, বৌমা ডিসে ক'রে হালুয়ার মত কি একটা খাবার আর চা আন্‌ছিলেন; বৌমার বাবা হেসে বল্লেন—'উপমা।' তার মানে—উপমা এনেছে! আমি ভাবলাম, মেয়ের নাম ধ'রে বুঝি তিনি ডাক্‌লেন!"

এত প্রমাণপ্রয়োগ সত্ত্বেও সুষমা কিন্তু "উপমা" নাম হইতে পরিত্রাণ পাইল না। সারদা বলিলেন—"সে যাই হোক্, আমি তোমাকে উপমা ব'লেই ডাক্‌ব।"

কাযেই শ্বশুরবাড়ীতে সুষমার নূতন নামকরণ হইল—উপমা।

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য।
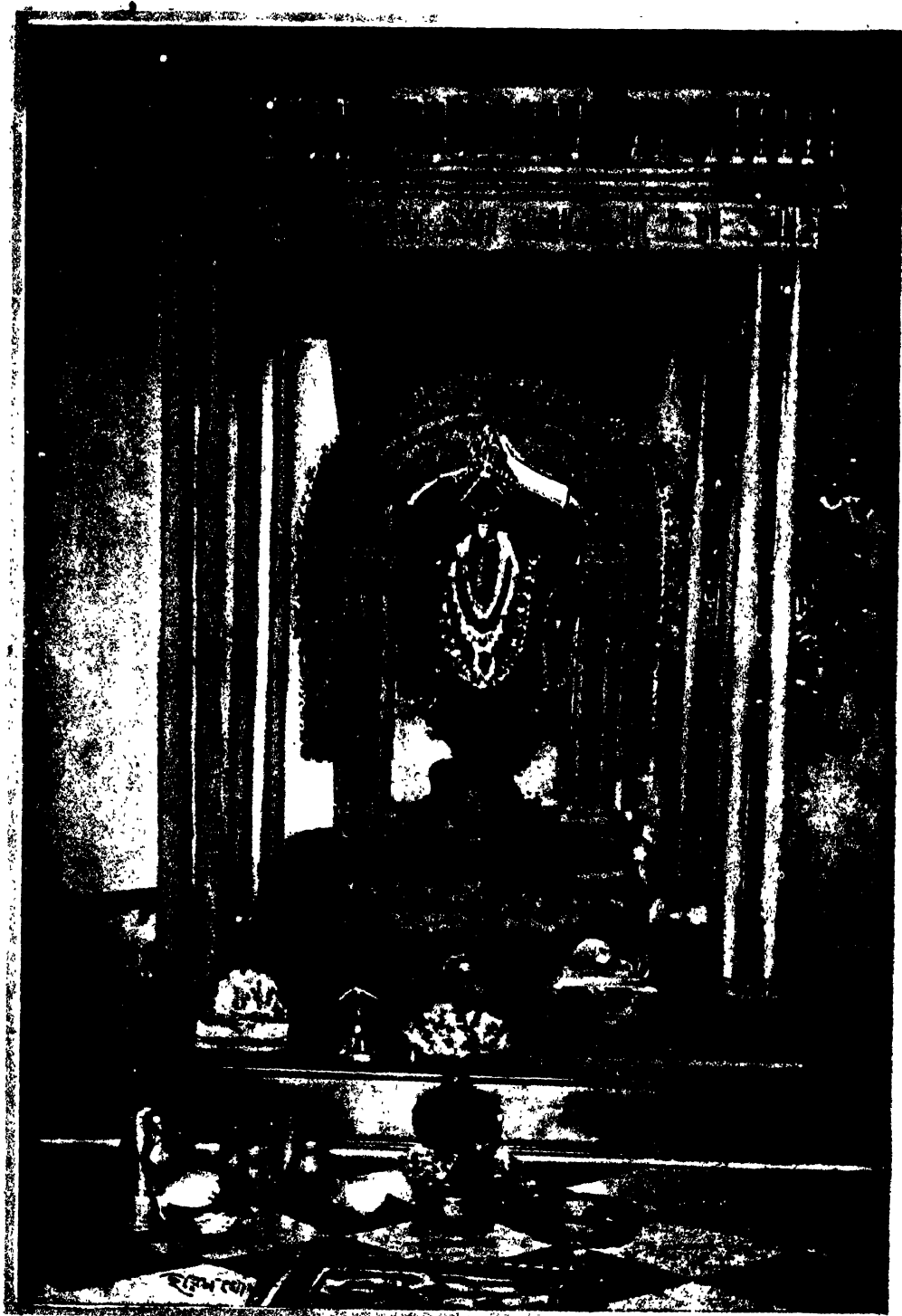
দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীভবতারিণী।

বসুমতী প্রেস]

কংগ্রেস

গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে মাদ্রাজ প্রদেশের কোকনদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এবং সেই জন্যই সে কংগ্রেসের নির্দ্ধারণ জানিবার জন্য সমগ্র দেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিল। যে বিদেশী ব্যুরোক্রেশী এ দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহার শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা আশা করিয়াছিলেন, এবার দলাদলিতে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবে। বন্যায় মাদ্রাজে রেলপথের কতকাংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় নানা স্থান হইতে কোকনদে যাইবারও বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। তবুও তথায় প্রতিনিধিসংখ্যা অল্প হয় নাই। কোকনদে কংগ্রেসের অধিবেশনে উৎসাহেরও অভাব ছিল না। মহাত্মা গন্ধী অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—সরকারের সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বর্জ্জন, ইংরাজের আদালত বর্জ্জন আর ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন। কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনের পর নাগপুরে ও আমেদাবাদে এই ব্যবস্থাই গৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর গয়ায় সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জনের বিরোধী হইলেও বহুমত সেই বর্জ্জনেই কংগ্রেসকে অবিচলিত রাখিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ।

গয়ায় পরাভূত হইয়া চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি কয় জন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে কংগ্রেসের সম্মতিলাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটীতে স্থির হয়, কয় মাসের জন্য একটা রফা বন্দোবস্তে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলন বন্ধ করা হইল। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এই দল দিল্লীতে কংগ্রেসের এক অতিরিক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন এবং তাহাতেই—মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে—স্থির হয়—ধর্ম্ম বা বিবেকগত বাধা না থাকিলে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে কংগ্রেসের আপত্তি নাই।

ইহার পর কোকনদে অধিবেশন। এই অধিবেশনের নির্দ্ধারণ কিরূপ হয়, তাহা জানিবার জন্য লোকের ব্যাকুলতা যে স্বাভাবিক, তাহা বলাই বাহুল্য। এক পক্ষে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী—মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দিষ্ট ত্রিবিধ বর্জ্জনের পক্ষপাতী; অপর পক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহরু ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের বিরোধী।

উভয়ে একযোগে ব্যবস্থা করিয়া যে প্রস্তাব করেন এবং যে প্রস্তাব বহুমতে গৃহীত হয়, তাহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"কলিকাতায়, নাগপুরে, আমেদাবাদে ও দিল্লীতে অসহযোগ সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, এই কংগ্রেস সে সকলের সমর্থন করিতেছে। দিল্লীতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কাহারও মনে এরূপ সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে যে, ত্রিবিধ বর্জ্জনব্যাপারে হয় ত কংগ্রেসের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই জন্য এই কংগ্রেস হইতে ব্যক্ত করা হইতেছে যে, সে বর্জ্জননীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। আরও ব্যক্ত করা হইতেছে যে, সেই বর্জ্জনের নীতি ও পদ্ধতি গঠনকার্য্যের ভিত্তি হইবে এবং দেশকে অনুরোধ করা হইতেছে—

বারদোলীতে স্থিরীকৃত গঠনকার্য্যে সকলে অবহিত হউন ও আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হউন। যাহাতে আমরা শীঘ্র আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি, সেই জন্য এই কংগ্রেস প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ইহার সমর্থন করেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও ব্রহ্মের ভিক্ষু উত্তম প্রভৃতি এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। সে যাহাই হউক, মিলনের আশায় অধিকাংশ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন।

এই প্রস্তাব যে মহাত্মা গন্ধীর অনুপস্থিতিকালে কংগ্রেসের দলভাঙ্গা নিবারণের জন্যই গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নাই। ইহাতে যে অসহযোগের দৌর্ব্বল্য স্পষ্ট হইয়াছে, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তেমনই এ কথাও স্বীকার্য্য যে, ইহার ফলে—যাঁহারা অসহযোগের মূলনীতি মানিয়াও ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে চাহেন—তাঁহারাও কংগ্রেসের মধ্যে থাকিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন—শ্রীযুক্ত কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যখন দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ-প্রস্তাবের যেমনই হউক একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনও শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের বিরোধী, তাঁহারা যখন তথায় প্রবেশ করিয়াছেন, তখন আর সে কথা উত্থাপিত করিয়া বিবাদের উদ্ভব করা সঙ্গত হইবে না।

নানা স্থান হইতে সমাগত প্রতিনিধিদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন :—

ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে ; এখন যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষপাতী এবং যাঁহারা সে সভায় প্রবেশের পক্ষপাতী, সকলেরই পক্ষে একযোগে কংগ্রেস-নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। স্বরাজ্যদল অর্থাৎ যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের বিরোধী, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন ; তথায় যাইয়া তাঁহারা কিরূপ কায করিবেন, তাহা তাঁহারাই সম্মিলিত হইয়া স্থির করিবেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা সঙ্গত কি না, কোন আকারে সে কথা আবার কংগ্রেসে উপস্থিত করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, দিল্লীতে যে অনৈক্যের অবসানচেষ্টা হইয়াছে, এ প্রশ্ন তুলিলে আবার সেই অনৈক্যই প্রকট হইবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়াইবে যে, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্য্য পঙ্গু ও অচল হইয়া পড়িবে। ত্রিবিধ বর্জ্জন (সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জ্জন, ইংরাজের আদালত বর্জ্জন ও ব্যবস্থাপক
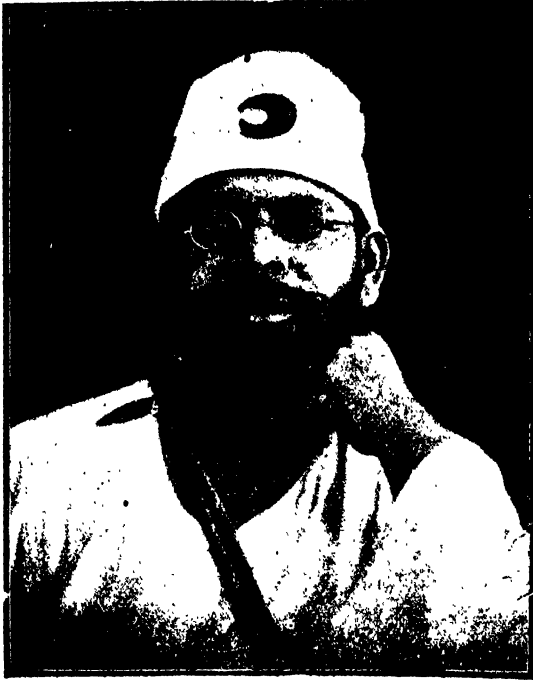
মৌলানা মহম্মদ আলী।

সভা বর্জন) ত্যাগ করিলে অসহযোগই ত্যাগ করা হয়। যখন মহাত্মা গন্ধী (অর্থাৎ এই ত্রিবিধ বর্জ্জনের প্রচারক) এখনও কারাগারে, তখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে ইহা ত্যাগ করিবার কল্পনাকে মনে স্থান দান করা যাইতে পারে না। নেতৃগণ যদি অহিংস অসহযোগে বিশ্বাসবান্ হইয়া জনসাধারণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে নেতাদিগের অনুসরণ করিবার—তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইবার লোকের যে অভাব হইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আশঙ্কা যে সত্যে পরিণত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এবার মৌলানা মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। মৌলানা মহম্মদ আলী ও তাঁহার ভ্রাতা মৌলানা শৌকত আলী সরকার কর্ত্তৃক কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

সভাপতির অভিভাষণ সুদীর্ঘ—সম্ভবতঃ অত্যধিক দীর্ঘ। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানে আবার প্রীতির অভাব লক্ষিত হইতেছে বলিয়াই বোধ হয়, সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসের সহিত মুসলমানদিগের সম্বন্ধের বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। আলীগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমান নেতা সার সৈয়দ আহম্মদ কি কারণে মুসলমানদিগের কংগ্রেসে যোগদানের বিরোধী ছিলেন—তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কি কি কারণে মুসলমানদিগের পক্ষে কংগ্রেসে যোগ দিবার প্রয়োজন প্রতিপন্ন হইয়াছে, তিনি তাহা বিশেষ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত নিজ মতেরও সমালোচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার অভিভাষণের বৈশিষ্ট্য—তাহাতে সর্ব্বত্র আন্তরিকতার প্রমাণ; আর বৈশিষ্ট্য—তাহা মহাত্মার প্রতি অনাবিল ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় ওতঃপ্রোত। আরম্ভে তিনি মহাত্মার কারাদণ্ডের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—যাহারা মনে করিয়াছিলেন, মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করিলে তাঁহার অদম্য মতকেও রুদ্ধ করা যাইবে, তাঁহাদের আশা পূর্ণ হয় নাই—হইতে পারে না। তিনি বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার অভাব আর কেহই পূর্ণ করিতে পারেন না। আর তিনি মহাত্মার কথা বলিয়া তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণ শেষ করিয়াছিলেন।

মৌলানা শৌকত আলী।

সেই সুদীর্ঘ অভিভাষণের সকল অংশের পরিচয় প্রদান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই আমরা তাঁহার কতকগুলি কথা পাঠকদিগকে উপহার দিব।

মৌলানা সাহেব স্বরাজ্যদলের কথায় আপনার মতের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি পূর্ব্ববৎ মনে করেন, দেশের লোকের পক্ষে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইংরাজের আদালত ও ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। দিল্লীতে কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশনেও তিনি সে কথা বলিয়াছিলেন। তবে যে তিনি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে কাযে যাহাদের ধর্ম্ম বা বিবেকগত বাধা নাই, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার কারণ, তিনি মনে করেন—জাতীয় ভাবের ভাবুক কেহই যাহাতে কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য না হয়েন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তিনি লর্ড মর্লির মতাবলম্বী। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যখন এ দেশে আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠে, তখন লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন—মডারেটদিগকে আপনাদের পক্ষে রাখিয়া বলবৃদ্ধি করাই ইংরাজের কর্ত্তব্য। সেইরূপ কংগ্রেসের বলবৃদ্ধির জন্য তিনি স্বরাজ্যদলকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অনুমতিদানের পক্ষপাতী। স্বরাজ্যদলের সহিত মডারেটদিগের বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাঁহারা প্রমার্জ্জিত প্রতীচ্য মনোভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহারা আজও পার্লামেণ্টের অনুকরণে তর্কবিতর্কের মোহে মুগ্ধ। তাঁহারা কেহ কেহ আত্মরক্ষার্থ হিংসা বর্জ্জন করিলেও কথার লড়াইয়ের অসার উত্তেজনার মোহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিশ্বাস, বারদোলীতে মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বে যে কার্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে উত্তেজনার একান্ত অভাব। আবার তাঁহাদের কেহ কেহ চরকার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

আরও একটা কথা আছে—মহাত্মা গন্ধী জাতিকে স্বরাজের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আনিয়া শেষে আইন অমান্যের বলে সেই রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শক্তির প্রাচুর্য্য হেতুই সে কায করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার শক্তির প্রকৃত পরিমাণ পরিমাপ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সে কায পরাভবস্বীকার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। স্বরাজ্যদল সেই অবসাদের অভিব্যক্তি। সে যাহাই হউক, স্বরাজ্যদল গঠিত হইয়াছে। সুতরাং যাহাতে তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য না হয়েন, তাহাই করা কর্ত্তব্য। ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনে তাঁহারা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অনেক স্থানেই ভোটাররা প্রার্থীর গুণ বা যোগ্যতা বিচার করিয়া ভোট দেন নাই—ভোট দিয়াছেন কংগ্রেসকে—মহাত্মা গন্ধীর নামে। তবু আমরা এই দলের লোকদিগকে ত্যাগ করিতে পারি না। অবশ্য স্বরাজ্যদল তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতিতে যেরূপ সাফল্যলাভের আশা করেন, কংগ্রেসের অন্য কর্ম্মীরা তাহার আশা করেন না। তবুও স্বরাজ্যদলের সহিত কংগ্রেসের বিরোধ নাই। কেবল কংগ্রেস দিল্লীর অধিবেশনে স্থির করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিদ রাখিবেন। তবে ব্যবস্থাপক সভায় সে দলের কার্য্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার কংগ্রেস গ্রহণ করিতে পারেন না। স্বরাজ্যদল আপনাদের দায়িত্বে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন; প্রবেশ করিয়া তথায় তাঁহারা যে কায করিবেন, তাহাও তাঁহাদের আপনাদের দায়িত্বে। তাহার সহিত কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধ নাই।

মৌলানা সাহেব মহাত্মা গন্ধীকে খৃষ্টের সহিত তুলিত করিয়াছিলেন।

তিনি ইসলামের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া মুসলমানদিগকে এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে বলিয়াছিলেন।

গোহত্যা সম্বন্ধে মৌলানা যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি আমরা মুসলমানদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, কংগ্রেস অবশ্য কাহাকেও অধিকার ত্যাগ করিতে বলেন না, কিন্তু আমরা পরস্পরের প্রতি প্রীতিবশে ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি—পরস্পরকে বুঝাইয়া ত্যাগে সম্মত করাইতে পারি। একান্ত পরিতাপের বিষয়, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদের অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টায় এমন ভাবে সে সব অধিকারের ব্যবহার করেন যে, তাহাতে অপরের মর্ম্মপীড়া উৎপন্ন হয়। যখন কোন সম্প্রদায় আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত শোভাযাত্রা করিয়া বাহির হয়েন, তখন তাঁহারা পথে অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দেখিলে কেন বিদ্রূপ করিবেন? কেনই বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দেবায়তনের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়—বিশেষ তথায় পূজা বা উপাসনাকালে উচ্চরবে বাদ্যধ্বনি করিবেন?

হিন্দুরা যে সব বৃক্ষ পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, সে সব বৃক্ষের শাখা যদি রাজপথের উপর আসিয়া পড়ে, তবে কি জন্য উল্লাস সহকারে সে শাখা কাটিয়া দেওয়া হইবে? পার্শীর ও শিখদিগের ধূমপান নিষিদ্ধ; কেন অপর লোক তাঁহাদের মুখে বা সান্নিধ্যে চুরুটের ধূম ত্যাগ করিবে? যে জৈনরা জীবহিংসা করেন না, তাঁহাদের নিকটে অন্য-ধর্ম্মাবলম্বীরা কেন জীবহত্যা করিবেন? হত্যার জন্য কেনই বা গবীকে সজ্জিত করিয়া হিন্দু পল্লীর মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে অথবা তথায় কেনই বা গোবধ করা হইবে? আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলে এইরূপ কার্য্য হইতে বিরত থাকিব এবং তাহাতেই সাম্প্রদায়িক বিরোধ বিদূরিত হইবে। গো-হত্যা লইয়া হিন্দুমুসলমানে কত বিরোধ হইয়াছে, কত রক্তপাত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দুরা গবীকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করেন এবং মহাত্মা গন্ধী গোরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে খিলাফৎ আন্দোলনেরও নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, খিলাফৎ মুসলমানের গবী। তিনি তাহার রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন; মুসলমানের ধর্ম্মগ্রন্থে আছে—দয়ার পরিবর্ত্তে দয়াই প্রদত্ত—তাই তিনি মনে করেন, মুসলমানরা হিন্দুর বিবেচনায় পবিত্র গবীর রক্ষায় সচেষ্ট হইবেন। তিনি এরূপ কথা বলিবারও পূর্ব্বে মৌলানা সাহেব ও তাঁহার অগ্রজ গো-হত্যায় বিরত হইয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাদের গৃহে গো-মাংস ভক্ষিত হয় না—সে গৃহে ভৃত্যেরাও গো-মাংস ভক্ষণ করে না। এবং তাঁহারা সকল মুসলমানকে তাহাই করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা কয় বৎসরের লব্ধ অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছেন, স্বরাজলাভের পূর্ব্বেই গোহত্যা কমাইয়া আনা অসম্ভব নহে। সত্য বটে, মাংসভোজী অনেক মুসলমানের পক্ষে গোমাংস ত্যাগ করায় কিছু অসুবিধা হইবে; কিন্তু আমরা যেন ম্যানচেষ্টারের অবাধ প্রতিযোগিতারই আদর না করি—আমরা এ দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারে অভ্যস্ত, তাহাতে পরস্পরের জন্য পরস্পরকে ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। এই বিরাট একান্নবর্ত্তী পরিবারে যদি প্রতিযোগিতাই করিতে হয়, তবে যেন আমরা সহিষ্ণুতার ও স্বার্থত্যাগের প্রতিযোগিতাতেই প্রবৃত্ত হই।

কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে মৌলানা মহম্মদ আলী হিন্দু-মুসলমানকে সহিষ্ণুতার ও ত্যাগের যে সদুপদেশ দিয়াছেন, তাহা মহাত্মার শিষ্যেরই উপযুক্ত। আজ যখন নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান বিরোধে জাতীয়তার পথ বিঘ্নসঙ্কুল হইতেছে, তখন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভারতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এই কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য।

হিন্দুদিগের সংগঠন আন্দোলনে কোন কোন মুসলমান শঙ্কিত হইয়াছেন; তাঁহারা মনে করিয়াছেন, হিন্দুদিগের সংগঠন আয়োজন মুসলমানদিগের সঙ্গে বিরোধে জয়ী হইবার জন্য কল্পিত। মৌলানা সাহেব বলিয়াছিলেন, তিনি কখন সে আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন নাই। তাহা হিন্দুরা করিতেছেন; সে বিষয়ে তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আবশ্যক সামাজিক সংস্কার করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যদি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অন্ত্যজদিগকে সমাজের অঙ্গীভূত করাই সংগঠনের উদ্দেশ্য হয়, তবে মুসলমান ও কংগ্রেসকর্ম্মিরূপে তিনি সে আন্দোলনে আনন্দ প্রকাশ করিবেন। নাগপুরে যখন হিন্দুসমাজকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্কমুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় এবং ধর্ম্মগুরুদিগকে নিম্নস্তরের প্রতি ব্যবহারবিষয়ে পরিবর্ত্তন করিতে বলা হয়, তদবধি কংগ্রেস এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। তবে মালাবারে ও পঞ্জাবে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর নিগ্রহের পর এই অনুষ্ঠান আরব্ধ হওয়ায় মুসলমানরা শঙ্কিত হইয়াছেন। সংগঠনের ফলে যেন হিন্দু মুসলমানে বিরোধ না বাধে। এই আন্দোলনের এক অঙ্গ—শারীরিক শক্তিসঞ্চয়ে সহায়তা। যদি ইহার দ্বারা দৌর্ব্বল্য ও ভীরুতা দূর হয়, তবে ভারতের সকলেরই পক্ষে তাহা আনন্দের কারণ হইবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলিয়াছেন, তিনি আখড়া স্থাপনের সমর্থন করেন—সে সব আখড়ায় সকল ধর্ম্মাবলম্বী যুবকরা শারীরিক শক্তির অনুশীলন করিবে।

মূল কথা এই—হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব ব্যতীত ভারতের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না—যাহাতে সে সদ্ভাব দৃঢ় হয়, সকলকে তাহারই জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

তিনি বলিয়াছিলেন—ধর্ম্মে একাগ্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা বিশেষ প্রশংসনীয়; কিন্তু গোঁড়ামীই বিরোধের কারণ। বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাও বিকৃত; অল্পশিক্ষাই আমাদের কাল হইয়াছে। সেই শিক্ষার ফলে

আমরা ধর্ম্ম ও সমাজগত স্বার্থের ও বিরোধের বশীভূত হইয়াছি। প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাস আমাদিগকে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর সহিত ধর্ম্মদ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত করায় না; কেবল স্বার্থ ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই আমাদিগকে ভ্রাতার সহিত কলহে প্রবৃত্ত করে। মহাত্মা গন্ধীর আবির্ভাবে ও শিক্ষায় সে সকল তুচ্ছ স্বার্থদ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইয়াছিল। মহাত্মা কেবল ভারতে নহে, পরন্তু সমগ্র জগতে এক সম্মিলিত প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে সেই রাজ্যের প্রধান সেবক মনে করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। যত দিন তিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা মুক্ত ছিলেন, তত দিন বিরোধও মাথা তুলিতে পারে নাই।

'অভিভাষণের শেষভাগে মৌলানা সাহেব বলিয়াছিলেন, তিনি যখন সভাপতি, তখন লোক অবশ্যই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এখন কি কায করা কর্ত্তব্য? তিনি বিশেষ বিচার-বিবেচনা করিয়া তাহার উত্তর দিতে পারেন—বারদোলীতে গৃহীত মহাত্মা গন্ধীর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতিই আমাদের অবলম্বনীয়। আমরা যদি সাধনপথে বিঘ্ন দেখিয়া একে একে সব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ত্যাগ করি, তবে সাফল্য কখনই আমাদের অধিগম্য হইবে না। এক্ষণে অনেকে আমাদিগকে বলেন, অসহযোগ আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। সে কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহার কারণ কি? প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহারা বা আমরা বা তাঁহারা ও আমরা আদর্শানুসারে কায করি নাই। কিন্তু মহাত্মা যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা সহজসাধ্য। যখন আমরা পুনরায় ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বা সরকারের সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় ভাল বলিয়া পুত্রদিগকে তথায় প্রেরণ করিতে উদ্যত হই অথবা ইংরাজের আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে যাই, তখন যেন মনে করি, অতি সাধারণ সৈনিককেও কতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়।'

যে ভারতবাসী খদ্দর পরিধানও করে না, তাহার কথা না বলাই ভাল। কিন্তু সে দেশদ্রোহী বা অত্যন্ত স্বার্থপর নহে—কেবল আলস্যহেতু খদ্দর ব্যবহার করে না। সে কায ভারতের মহিলারা যেমন সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন, তেমন আর কেহই পারিবেন না। শেঠ যমুনালাল বাজাজ, শ্রীযুত মগনলাল ভাই ও চগনলাল ভাই গন্ধী প্রমুখ নেতার উপদেশ ও সাহায্য পাইলে তাঁহারা গঠনকার্য্যের এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারিবেন। বাস্তবিক যখন ভারতবর্ষ বস্ত্রবিষয়ে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না, পরন্তু বিদেশেও বস্ত্র যোগাইত, তখন মহিলারা চরকা চালাইতে লজ্জা বোধ করা ত পরের কথা—গর্ব্বানুভব করিতেন। তখন ঘরে ঘরে মহিলারা চরকায় সূতা কাটিতেন।

খদ্দরের পর জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার কথা। এই কাযের জন্য সমগ্র ভারতের প্রয়োজন বুঝিয়া একটি মূল শিক্ষাসঙ্ঘ গঠিত করিতে হইবে—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিক সঙ্ঘ গঠিত করা প্রয়োজন হইবে। যাহাতে আমাদের বালক-বালিকারা জাতীয় শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমাদিগকে জাতির মুক্তির জন্য বারদোলীতে গৃহীত কার্য্যপদ্ধতির সকল অংশ পালন করিতে হইবে। এই সব কাযের জন্য অর্থের প্রয়োজন। যখন দেশের লোক বুঝিতে পারিবে, মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিলে ব্যুরোক্রেশী তাঁহার কারাগারদ্বার মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য হইবেন—কিন্তু অর্থ ব্যতীত সে সব কায সুসম্পন্ন করা যায় না, তখন অর্থের অভাব হইবে না। যাহাতে দরিদ্র ব্যক্তিরাও এই বৃহৎ কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। কর্ম্মীদিগকে আবশ্যক পারিশ্রমিক না দিলে তাঁহারা কেমন করিয়া কায করিবেন? কায করিতে হইলে কর্ম্মীদিগের জন্য আবশ্যক অর্থ দিতে হইবে। সে জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কায করিতে হইবে।

অর্থসংগ্রহ বিষয়েও আমরা দেশের লোককে দোষ দিতে পারি না। যখনই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, জাতির কল্যাণকর কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন, তখনই তাহারা অর্থ দিতে ত্রুটি করে নাই। আমরাই অর্থসংগ্রহের আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।

সরকার গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতিকে ও আকালীদলকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, এ আঘাত সমগ্র শিখজাতিকে—আজ শিখদিগকে যেরূপে আক্রমণ করা হইয়াছে, আগামী কল্য অন্য কোন সম্প্রদায়কে সেইরূপে আক্রমণ করা হইতে পারে।

মৌলানার মতে মহাত্মার গ্রেপ্তারের পর আইন অমান্য করিবার এমন সুযোগ আর ঘটে নাই। এই ব্যাপারের জন্য

প্রাদেশিকভাবে আইন অমান্য আরম্ভ করা যায়। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে আইন অমান্য করা সহজ ব্যাপার নহে। সে জন্য কষ্ট সহ্য করিবার অসাধারণ ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দেও আমরা যেরূপ গঠনকার্য্য করিতে পারিয়াছিলাম, এখন তাহা পারিতেছি না—কাযেই আমাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা কিরূপ, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, আমরা যদি গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করি, তবে আইন অমান্য করা অসম্ভব হইবে না। কেবল স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বরাজলাভের পূর্ব্বে যে আইন অমান্য করিতেই হইবে, এমন নহে। অর্থাৎ আমরা যদি প্রকৃতরূপে ত্যাগস্বীকার করি, সর্ব্ববিধ কষ্ট সহ্য করিতে সত্যসত্যই প্রস্তুত থাকি, তবে হয় ত স্বরাজলাভের পূর্ব্বে আইন অমান্য করিবার প্রয়োজনও হইবে না।

মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন, এই কার্য্যপদ্ধতিতে হয় ত উত্তেজনার অভাব অনুভূত হইবে। কিন্তু মুক্তির জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে হয়, ধৈর্য্য ধরিতে হয়। মুক্তির জন্য যদি কেহ পথ-সংক্ষেপ করিতে চাহেন—তাঁহাকে একটি পথের সন্ধান দেওয়া যাইতে পারে—প্রয়োজন হইলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া।

আজ যদি দেশের লোক প্রয়োজন হইলে মুক্তির জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত হয়েন, তবে এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ করা যাইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যদি সেই দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তবে এক মাসের মধ্যে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্বরাজলাভের উপায়—দেশের লোকের করতলগত। সকলে যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হইলে প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়েন, তবে আজই স্বরাজ লাভ করা যায়।

তাহা না করিয়া দেশের লোক যদি উত্তেজনার অভাব বলিয়া বারদোলীতে গৃহীত কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিতে অসম্মত হয়েন, তবে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়া কোন ফল হইবে না—সবই বৃথা হইবে।

তাই মৌলানা সাহেব দেশবাসীকে কায করিতে উপদেশ দিয়াছেন—কায করিতে আহ্বান করিয়াছেন। এক বৎসর কায করিলে যদি ঈপ্সিত ফললাভ না হয়, তখন তিনিও ভারতের গণতন্ত্রের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। তখন—তিনি বৃটেনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বলা হইয়াছিল—এক বৎসরে স্বরাজ লাভ করা যাইবে। এক বৎসর ধরিয়া দেশের লোক নির্দ্দিষ্ট কায করিলে ব্যুরোক্রেশী এ দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু হায়—দেশের লোক তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালন করে নাই। কাযেই তাহাদের অসম্পন্ন কর্ত্তব্য-বিনিময়ে তাহারা স্বরাজলাভের আশাও করিতে পারে না।

তাই মৌলানা সাহেবের উপদেশ—নাগপুরে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ফিরিয়া চল—অসম্পন্ন কায্য সম্পূর্ণ কর—মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর।

তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলিয়াছেন—

"আমরা যদি মহাত্মার অযোগ্য (শিষ্য) না হই তবে আমরা আমাদের অধিকারচ্যুত মুক্তি ফিরিয়া পাইব। আর তাহা হইলে, তখন—জয়ের জন্য প্রার্থনাস্বরূপে নহে, পরন্তু জয়ঘোষণারূপে আমরা আমাদের সেই পুরাতন জয়ধ্বনি করিতে পারিব—

"মহাত্মা গন্ধী কি জয়"

এবার কোকনদে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রস্তাবের বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবার কংগ্রেসে লাভ—২ দলে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনবিষয়ে মতভেদেও কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায় নাই। সুরাটে মডারেটরা যে অসহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করায় কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, কোকনদে কংগ্রেসকর্ম্মীরা তাহা বর্জ্জন করায়—ভিন্নমতাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা দেখানয় কংগ্রেসকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

এই প্রধান লাভের সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইয়াছে—হিন্দু-মুসলমানে বিরোধবর্জ্জনে সকল পক্ষের আন্তরিক চেষ্টা।

২ দলে বিরোধের অবসানে উভয় দল যদি একযোগে গঠনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের অবসান হয়, তবে দেশের বিশেষ উপকার হইবে,—স্বরাজলাভের পথ পরিস্কৃত হইবে—আমাদের সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইবে।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভারতের তৃণ-তৈল

ঘাস বলিতে গেলেই সাধারণ লোকে অতি নগণ্য, অব্যবহার্য্য উদ্ভিদ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু সেটা নিতান্তই অমূলক ধারণা। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঘাসের জন্যই সমস্ত প্রাণিজগৎ বাঁচিয়া আছে। উদ্ভিদ-শাস্ত্রে যাবতীয় ঘাসজাতীয় উদ্ভিদকে Gramineaeবর্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়। উদ্ভিদ-রাজ্যের মধ্যে ইহা একটি সুবিশাল বর্গ; ইহার গোষ্ঠীর সংখ্যা যেমন অধিক, আকার-অবয়বের বৈচিত্র্যও তেমনিই বিস্ময়কর। মৃত্তিকা-লুণ্ঠিত দূর্ব্বাদল ও মলয়দ্বীপের অতিকায়, ৮০ হস্ত-উচ্চ Dendrocalamus giganteus নামক বাঁশের পার্থক্য কত! ঘাসসমূহের গুণাবলীও বহুবিধ। ধান, যব, গম, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্য-শস্য যে মানবের প্রধান অবলম্বন, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহাই ঘাসের একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োগ নয়। নানা জাতীয় তৃণ হইতে শ্বেতসার, শর্করা, পশুখাদ্য, তন্তু, ঔষধ ও আসব, গৃহনির্ম্মাণ ও সজ্জার দ্রব্য এবং তৈল প্রস্তুত হইতেছে। শেষোক্ত দ্রব্যটিই এ স্থলে আলোচনার বিষয়।

তৈলোৎপাদক তৃণ

খুব সাধারণ না হইলেও, বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে সুগন্ধি ঘাস জন্মিয়া থাকে। যাঁহাদের গাছপালার সখ আছে, তাঁহারা বোধ হয় গন্ধবেণা দেখিয়াছেন; খসখসের সহিতও অনেকে পরিচিত। একের পত্র ও অন্যের মূল সদ্গন্ধের আধার। এই প্রকার কয়েক জাতীয় ঘাস প্রচুর পরিমাণে ভারতে জন্মিয়া থাকে। কাহারও পত্রে, কাহারও মূলে এবং কাহারও সমস্ত গাছে অল্পবিস্তর সদ্গন্ধ-যুক্ত বায়ী-তৈল (Essential oil) আছে। বহু পুরাকাল হইতে এই সমুদয় তৃণ প্রসাধনের উপকরণ ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান এটোয়া সহরের নিকট প্রাপ্ত তাম্রফলকে দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কনৌজের রাজারা খসখসের উপর শুল্ক বসাইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে কতিপয় সুগন্ধি ঘাসের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা হইতে জাতি নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, আপাততঃ গন্ধোৎপাদক যে সমস্ত ঘাস ভারতে জন্মায়, তন্মধ্যে পাঁচটি প্রধান বলিয়া ধরিতে পারা যায়। ইহাদিগের নাম—রসা, গন্ধবেণা, করঙ্কুশ, খস্‌খস্ ও মানা ঘাস। ভারতের নানা স্থানে এই সমুদয় তৃণ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়। কিন্তু প্রত্যেক জাতীয় ঘাসের অথবা মোট কি পরিমাণ তৈল প্রতি বৎসর দেশে উৎপাদিত হয়, তাহার কোন সঠিক হিসাব সরকারী বিবরণী প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। রপ্তানীর পরিমাণ সম্বন্ধে বরং কতকটা আন্দাজ করিতে পারা যায়। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে চন্দনতৈল বাদে মোট ১৮,১০,৮৮৮৲ টাকার বায়ী-তৈল বিদেশে চালান যায়। তাহার ৩/৪ অংশেরও অধিক তৃণ-তৈল বলিয়া ধরিলে আদৌ অসঙ্গত হইবে না। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ১০,১৯,০২৫৲ টাকার গন্ধবেণা তৈল রপ্তানী হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে অপরাপর ভারতীয় কাঁচা মালের ন্যায় তৃণ-তৈলেরও রপ্তানী যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি তৃণ-তৈলের বাজার আবার জাগিয়া উঠিতেছে।

রসা ঘাস

পূর্ব্বোক্ত কয়েক জাতীয় তৈলোৎপাদক তৃণের মধ্যে রসা ঘাস প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। উহার উৎপাদনের মাত্রা যেমন অধিক, গন্ধও তেমনই মনোমুগ্ধকর। রসা ঘাসের বৈজ্ঞানিক নাম Cymbopogon martinii এবং ইহার তৈল ইংরাজীতে palma-rosa, East Indian geranium প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে উন্মুক্ত পর্ব্বতগাত্র, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইর খান্দেশ জিলাই রসা ঘাসের প্রকৃত জন্মভূমি। এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্রও ইহার চাষ হইতেছে। রসার বিশেষত্ব এই যে, ইহা অনেক স্থলে একত্রে বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কোন কোন অরণ্যের তরুতল রসা

ঘাসে পরিপূর্ণ। অবশ্য, এইরূপ ভাবে জন্মিলেই সংগ্রহ ও চোলাইর সুবিধা হয়। সেই জন্য তৈল-চোলাইকারীরা যে স্থানে অল্প দূরত্বের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় ঘাস পাওয়া যায়, সেইরূপ স্থানই তৈল প্রস্তুতের জন্য নির্ব্বাচন করে। সেই হিসাবে রসা-তৈল উৎপাদনের কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য :—মধ্যপ্রদেশের মধ্যে বেতুল, হোসাঙ্গাবাদ, মান্দলা, সিউনি, নিমার ও ইলিচপুর; বেরার এবং খান্দেশের অন্তর্গত পিম্পলনের, নানদরবার, সাগদা ও তালোদা।

রসা-ঘাসের দুইটি উপজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। কাণ্ডগাত্রে পত্রবিন্যাসের প্রণালী দুই উপজাতিতে বিভিন্ন রকমের। উৎকৃষ্ট উপজাতিকে মোতিয়া বলে; ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। পক্ষান্তরে, সোফিয়া নামক নিকৃষ্ট জাতির ফুল নীলাভ হরিৎ রঙ্গের। উভয় উপজাতির কার্ত্তিক—অগ্রহায়ণে ফুল হয় এবং ফুল ফুটিবার অনতিপূর্ব্বে ঘাস কাটিয়া লইলে তাহা হইতেই সমধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যায়। চোলাইর কাজ প্রায় অধিকাংশ সময়ই জঙ্গলের ঠিকাদারগণ কর্ত্তৃক সাধিত হয়। ইহারা বন-বিভাগের নিকট ঘাস ক্রয় করে এবং যে স্থানে সহজে জল ও জ্বালানীকাঠ পাওয়া যায়, সেইরূপ স্থানেই চোলাই যন্ত্র বসায়। অস্থায়ী কারখানা নির্ম্মিত হইলে তথায় চতুর্দ্দিক হইতে বোঝা বোঝা ঘাস কাটিয়া আনিয়া প্রকাণ্ড লৌহ-কটাহে সিদ্ধ করা হয়। চোলাইপ্রথা অবশ্য নিতান্ত সেকেলে ধরণের। কাজেই অপচয়ের মাত্রাও অত্যধিক। এক এক বোঝা ঘাস ছয় ঘণ্টা ব্যাপিয়া সিদ্ধ হয়। এই-রূপ চারিবার সিদ্ধ করিবার ফলে ৭ মণ কাঁচা ঘাস হইতে মোটে ১ সের তৈল পাওয়া যায়। পুরা মরসুম কায করিলে একটি চোলাই যন্ত্র প্রায় দেড় মণ তৈল প্রস্তুত করিতে পারে। জঙ্গলের বাহিরে যে ঘাস পাওয়া যায়, তাহা সময়ে সময়ে গ্রামবাসিগণ নিজেরাই চোলাই করে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভীলজাতীয় লোকরা তাহা-দের ঘাস মুসলমান চোলাইকারিগণকে বিক্রয় করে।

রসা-তৈলের অনুপম গোলাপসদৃশ গন্ধ ইহার প্রধান উপাদান geraniol নামক পদার্থ-জনিত। ভারতীয় তৈলে geraniolএর মাত্রা শতকরা ৯০ ভাগ,—যদিও অপকৃষ্ট প্রথায় চোলাইর জন্য তাহা সব সময় পাওয়া যায় না। তুর্কীতে প্রভূত পরিমাণে রসা-তৈল চালান যায় এবং তথায় উহা প্রধানতঃ গোলাপের আতরে ভেজাল দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার রসা-তৈলেও গন্ধবিহীন কেরোসিন ও তার্পিণ ভেজাল থাকে। আজকাল যবদ্বীপে যথেষ্ট পরি-মাণে রসা-ঘাস চাষ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন আলজিরিয়া ও রিইউনিয়নে কম রসাতৈল উৎপাদিত হয় না। কিন্তু উৎকর্ষতার উপর দৃষ্টি রাখিলে ভারতীয় তৈল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্য দেশের তৈলের নিকট পরাজিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আপাততঃ রসাতৈল আধ মণের পাত্রে রপ্তানী হয় এবং বিলাতী বাজারে ইহার সের গড়ে ৩০৲ টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে মিসর, তুর্কী ও ফ্রান্স যেরূপ ভারতীয় তৈলের প্রধান খরিদ্দার ছিল, এখনও তাহাই আছে, কেবল জর্ম্মণীর স্থান সুইজরলণ্ড দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

গন্ধবেণা

ভারতের গন্ধবেণা (Lemon grass oil) তৈল আজ-কাল জগতে সুপরিচিত। ব্যবসায়ের জন্য এই তৈল প্রথমে কেবল ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে প্রস্তুত হইত। প্রধানতঃ বন্যঘাসেরই ব্যবহার ছিল। আজকাল তৈল কাটতির প্রসারের সহিত গন্ধবেণার পূর্ব্বতন উৎপত্তিস্থানের অর্থাৎ ত্রিবাঙ্কুরের আঞ্জনগো অঞ্চল হইতে উত্তরে কোচিন পর্য্যন্ত ভূখণ্ডের বন্য ফসলে আর কুলায় না। এখন চাষের সীমা দক্ষিণ-মালাবার পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গন্ধবেণা-তৈল ঠিক কোন্ জাতীয় ঘাস হইতে উৎপাদিত হয়, সে সম্বন্ধে আগে অনেক সন্দেহ ছিল। এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে, দ্রবণীয় তৈল মালাবার ও কোচিনের Cymbopogon flexuosus এবং অদ্রবণীয় তৈল ত্রিবাঙ্কুরের Cymbopogon citratus হইতে প্রস্তুত হয়। চাষ করিতে হইলে পৌষ-মাঘ মাসে পর্ব্বতগাত্রে ঘাসের জঙ্গল পোড়াইয়া দিতে হয়। পরে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে নূতন ঘাস জন্মিয়া থাকে। উহা হইতেই আশ্বিন কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তৈল চোলাই কার্য্য চলে। গন্ধবেণার বৎসরে একটি-মাত্র ফসল পাওয়া গেলেও, উপযুক্ত ব্যবস্থায় প্রায় ছয়মাস-কাল ক্রমান্বয়ে ঘাস পাওয়া যাইতে পারে।

চোলাইর দোষে ও ভেজাল দেওয়ার প্রথায় ভারতীয় গন্ধবেণা তৈলে ইহার প্রধান সুগন্ধিকর উপাদান citral

শতকরা ৫০ ভাগের অধিক মাত্রায় পাওয়া যায় না; কিন্তু উত্তমরূপে চোলাই করিলে তৈলে শতকরা ৮০ ভাগ citral পাওয়া যাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, কয়েক বৎসর হইতে ত্রিবাঙ্কুররাজ্যে প্রধান গন্ধবেণা-তৈলের ডিপো, আলেপ্পীতে পরিশোধন করিবার যে একটি নূতন ও সুলভ প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে শুধু যে citralএর মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহা নহে, অবিশুদ্ধ তৈলের অনুপাতে শোধিত তৈলের মূল্যও দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। গন্ধবেণা-তৈল প্রতি বাক্স গড়ে ২১৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। প্রত্যেক বাক্সে ১২ আউন্সের ১২টি বোতল থাকে। মধ্য-ত্রিবাঙ্কুরে দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত এই পরিমাণ তৈলের মোট দাম ৯৲ টাকা মাত্র। সুতরাং শোধিত করিতে পারিলে লাভের মাত্রা যে অনেক বাড়িয়া যায়, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে বিলাতের বাজারে প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত গন্ধবেণা-তৈলের ব্যবহারের পরিসর যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুগন্ধ সাবান, কৃত্রিম গন্ধ, বিশেষতঃ বণাফ্সার গন্ধ (ionone) ও অডিকলম প্রস্তুতে এবং স্বভাবজ ভাবিণা তৈলে ভেজাল দেওয়ার জন্য বহু পরিমাণে গন্ধবেণার তৈল আবশ্যক হইতেছে। ইহার রপ্তানীর প্রায় অর্দ্ধেকাংশ ইংলণ্ডে যায়। অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের খরিদ্দার ইংলণ্ড, মার্কিণ ও সুইজরলণ্ড। কিন্তু শুধু ভারতীয় তৈলে বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের অভাব মোচন হয় না। তাঁহারা সিঙ্গাপুর, টন্‌কিন্, পর্ত্তুগীজ,পশ্চিম আফ্রিকা,ব্রেজিল ও মণ্টসিরাট হইতেও যথেষ্ট গন্ধবেণা তৈল আমদানী করেন। বিলাতী বাজারে গন্ধবেণা-তৈলের দাম গড়ে ।৶০ আনা আউন্স। কুইলন্ ও কোচিন বন্দর হইতেই বেশীর ভাগ গন্ধবেণা-তৈল রপ্তানী হয়।

করঙ্কুশ

করঙ্কুশ ঘাসকে পঞ্জাবে খাভি বলিয়া থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—Cymbopogon schœnanthus; ইহার একটি উপজাতি আছে, তাহার নাম Cymbopogon schœnanthus, var. Iwarancusa। ইহার মত কষ্টসহিষ্ণু ঘাস কমই দেখা যায়। পৃথিবীর অন্যতম প্রায়-বারিবিহীন মণ্ডল, যাহা মরক্কো হইতে পঞ্চনদ দিয়া সু-উচ্চ তিব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই অঞ্চলেই ইহা জন্মিয়া থাকে। কালকা হইতে সিমলা যাইবার রাস্তায় বৃক্ষবিরল পর্ব্বতগাত্রে এই ঘাস জন্মাইতে বোধ হয় কেহ কেহ দেখিয়াছেন। ইহার হ্রস্ব মূল ও রক্তাভ পত্রগুচ্ছ একটি সুদৃঢ় অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে বহির্গত হয়। অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে ইহার সহজে কোন ক্ষতি হয় না। রসা ও গন্ধবেণার তুলনায় করঙ্কুশের এখনও তেমন সদ্ব্যবহার নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে স্থানে এই জাতীয় ঘাস স্বভাবতঃ জন্মায়, সেখানে জল ও জ্বালানী কাঠের বিশেষ অসদ্ভাব। সেই জন্য চোলাই করা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। তথাপি ইহার তৈলের Ginger grass oil যথেষ্ট চাহিদা আছে। ঘাসে তৈলের মাত্রাও নিতান্ত কম নয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ২৮ সের ঘাস হইতে আধ সেরের উপর তৈল পাওয়া যায়। বিদেশীয় বাজারে তৈলের দাম প্রতি সের প্রায় ২৮৲ টাকা। খাভি ঘাস যেরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পঞ্চনদে ও তদূর্দ্ধস্থ পর্ব্বতাঞ্চলে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহার সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

খস্‌খস

খস্‌খসের মূল অনেক সহরবাসীই দেখিয়াছেন। গাথাঘথার মসলায় ইহা ব্যবহৃত হয় এবং গ্রীষ্মকালে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে খস্‌খসের টাটি লাগান হয়। প্রখর রৌদ্রের সময় খস্‌খসের টাটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত আর্দ্র সুরভিত সমীরণ সেবন করিয়া, এমন কি, শ্বেতাঙ্গরাই নিজেদিগকে ধন্য মনে করেন। খস্‌খসের গাছ, Vetiveria zizanoides, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মায়; কিন্তু কোরোমণ্ডল উপকূল, মহীশূর, সামন্তবাড়ী (পুনা), চাণ্ডা (মধ্যপ্রদেশ), বঙ্গদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের হিসার জিলাতেই ইহার অধিক প্রাধান্য। খস্‌খসের পক্ষে শৈত্য বিশেষ দরকার; সেই জন্য অনেক সময়ে ইহাকে শুষ্ক নদীগর্ভে ও জলের ধারে জন্মিতে দেখা যায়। মূলগুলি ভারি শক্ত ও বক্র বলিয়া তুলিতে অধিক মজুরী লাগে। দেশীয় চোলাই-প্রথা অপেক্ষা বাষ্পসহযোগে চোলাই করিলে খস্‌খসের তৈল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়—হন্দর প্রতি প্রায় ১০ আউন্স। যবদ্বীপ ও রিইউনিয়নে উৎপন্ন ঘাসের মূলে তৈলের মাত্রা শতকরা ০·৪—০·৯ ভাগ। খস্‌খসের তৈল (vetivert oil) বহুমূল্য

বলিয়া ইহা কেবলমাত্র বিশিষ্ট গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। ইহার দাম প্রতি সের প্রায় ৭৬৲ টাকা। কলিকাতা হইতে কতক পরিমাণে খস্‌খসের তৈল রপ্তানী হয়; কিন্তু মাদ্রাজের বন্দরসমূহ হইতেই ইহার রপ্তানী সমধিক।

তৃণ-তৈলের ভবিষ্যৎ

মানা ঘাস (Cymbopogon Nardus) কতক পরিমাণে দক্ষিণ-ভারতে উৎপাদিত হইলেও সিংহলই ইহার প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র। বস্তুতঃ ইহার তৈল—যাহাকে ইংরাজীতে Citronella oil বলে, তাহা সিংহলেরই অন্যতম রপ্তানীর দ্রব্য। ইহা সহজেই ভারতের নানা স্থানে প্রবর্ত্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু মানা ঘাসের কথা ছাড়িয়া দিলেও পূর্ব্বোক্ত কয়েক জাতীয় ঘাস উৎপাদনেও যে ভারত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তৃণ-তৈল ক্রমশঃ ক্রমশঃ নানাবিধ কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া ব্যবসায়ের একটি শ্রেষ্ঠ দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ই এই শ্রেণীর উদ্ভিদের চাষ প্রসারের শুভ মুহূর্ত্ত। কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, শুধু ঘাস উৎপাদন নহে, বিশুদ্ধ তৈলও যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। তাহার উপরেই ভারতের তৃণ-তৈলের ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

—

কলার ব্যবসায়

বাঙ্গালা দেশে নানাজাতীয় কদলী আছে। কলার চাষ সম্বন্ধে এ দেশের অনেকেই অভিজ্ঞ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিব না। এই কদলীর ব্যবসায়ে আমাদের দেশের লোক কিরূপ লাভবান্ হইতে পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

পক্করম্ভা যেমন সহজপাচ্য, তেমনই পুষ্টিকর। শুধু ভারতবাসী কেন, পৃথিবীর যাবতীয় শ্বেত, অশ্বেত সকল জাতিই কদলীর পরম ভক্ত। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ত কদলী পাইলে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। য়ুরোপে পক্করম্ভা দুষ্প্রাপ্য এবং পাওয়া গেলেও রাজারাজড়া—ধনবান্ ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা এক প্রকার অসম্ভবই। অথচ রসনাতৃপ্তিকর, উপাদেয় এই কদলী ভক্ষণ করিতে পাইলে য়ুরোপীয়মাত্রই চরিতার্থ হইতে পারে।

জর্ম্মণী হইতে প্রকাশিত পর্য্যটনসংক্রান্ত কোনও সাময়িক পত্রে ভারতীয় কদলী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক কদলীর ব্যবসায়ে ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কদলী রপ্তানী করিতে পারিলে, যে যে দেশে উহার চাষ আবাদ নাই, সেই সেই দেশে যে উহার প্রচুর প্রসার ঘটিবে এবং কদলীর ব্যবসায়ে ভারতবাসীরা লাভবান হইতে পারিবে; সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রবন্ধলেখক উহার আলোচনা করিয়াছেন।

বাস্তবিক, পরিপক্ক রম্ভা রসনাতৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট ফল হইলেও উহা দূরবর্ত্তী প্রদেশে অবিকৃত অবস্থায় রপ্তানী করা অসম্ভব। এ জন্য কাঁচা অবস্থায় উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইতালী, স্পেন ও পর্ত্তুগাল হইতে সংগৃহীত হইয়া কদলী মধ্যয়ুরোপ এবং য়ুরোপের উত্তর প্রদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সুইডেন, নরওয়ে এবং ফিন্‌ল্যাণ্ডে কলা দুষ্প্রাপ্য। তত্রত্য বিলাসিনী নারী ও সৌখীন পুরুষমহলে উহার বিশেষ সমাদর। আমেরিকার কোন কোন প্রদেশ হইতে কদলী উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরিত হইয়া থাকে। দক্ষিণ চীন ও ভারতবর্ষজাত কদলী এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোনও প্রদেশে প্রেরিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ, দূরত্ব এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার অবস্থা। কদলী কাঁচা অবস্থায় সংগৃহীত হইলেও বহু দূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইবার পূর্ব্বে পচিয়া যায়, তদ্ব্যতীত দক্ষিণ চীন ও ভারতবর্ষ এ সম্বন্ধে কখনও চেষ্টা করে নাই। লেখক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কদলী রপ্তানী বিষয়ে ভারতবাসীরা শুধু উদাসীন নহে, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাহারা এ পর্য্যন্ত এমন কোনও প্রণালী অবলম্বন করে নাই যাহাতে বিদেশে কদলী লোকের উপভোগ্য হইতে পারে।"

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, কদলীকে শুকাইয়া লইতে পারিলে রপ্তানীর বিশেষ সুবিধা হইবে। এই প্রক্রিয়ায় কলার ওজন অৰ্দ্ধেক কমিয়া যাইবে। খোসা ছাড়াইয়া শুকাইয়া লইতে পারিলে আকারও বহু পরিমাণে হ্রাস পাইবে। তখন শুষ্ক কদলীকে পাত্রে ভরিয়া বহু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করা খুবই সহজসাধ্য হইবে। কলার খোসা ছাড়াইয়া

শুকাইয়া লইতে পারিলে উহার জলীয় ভাগ থাকিবে না। তখন উত্তর-রুসিয়া, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও আমেরিকায় বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা খুবই সহজ হইবে।

কিন্তু একটা কথা আছে। কদলী শুষ্ক করিয়া লইতে গেলে, তাহার স্বাদ ও বাহ্য আকার অবিকৃত রাখা অত্যাবশ্যক। লেখক বলিতেছেন, "ইদানীং প্রতীচ্য দেশের বাজারে যে শ্রেণীর কদলী দেখা যায়, তাহাতে উহা ভোজনের প্রবৃত্তি আদৌ থাকে না। শুষ্ক কদলীর কুঞ্চিত আকার এবং কালো বা পাঁশুটে বর্ণ দেখিলে মন অভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। উপাদেয় খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, বভুক্ষু ব্যক্তিও উহাকে খাদ্যরূপে জঠরানলে আহুতি দিতে সম্মত হইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, য়ুরোপীয়রা বিশেষতঃ য়ুরোপের নারীসমাজ প্রত্যেক জিনিষের বহিঃসৌন্দর্য্য ও আহার্য্যদ্রব্যের স্বাদ সম্বন্ধে অত্যন্ত অবহিত। সুতরাং এতদঞ্চলের জন্য কোনও জিনিষ রপ্তানী করিতে হইলে তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী ও সুদৃশ্য না করিলে চলিবে না।" সুতরাং খোলা যায়গায়—বাতাসে ও রৌদ্রে কলা শুকাইবার চেষ্টা করা ভ্রান্তিপূর্ণ হইবে। আলু বা আপেলের খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলে তাহার রং যেমন পরিবর্ত্তিত হয়, কলার খোসা ছাড়াইয়া ফেলিলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই, ফলের অভ্যন্তরে লৌহের যে সারভাগ থাকে, বায়ুর সংস্পর্শে তাহার রূপান্তর ঘটে—অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অম্লজানের স্পর্শে ফলের মধ্যস্থ লৌহের সারভাগ রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়। ফলের রসে যে লৌহভাগ থাকে, মানবের শরীরপুষ্টির পক্ষে তাহার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই কারণেই যে সকল নরনারীর দেহে রক্তের ভাগ অল্প—অর্থাৎ যাহারা রক্তশূন্যতা রোগে পীড়িত, তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে ফল খাইতে দিবার ব্যবস্থা আছে। অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যে লৌহের অংশ যে পরিমাণ বিদ্যমান থাকে, ফলে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে লৌহ আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, কদলী শুষ্ক করিবার সময় যাহাতে উহা বায়ুর সংস্পর্শ-দুষ্ট হইতে না পারে, তাহা করা প্রয়োজন। এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অম্লজান কোনরূপে কদলীর অঙ্গ স্পর্শ না করে, অথচ কলার আকার কমাইবে এবং বর্ণ সাদা থাকিবে। যে সকল পদার্থের সংযোগে কদলীর সাদাভাব বজায় রাখিতে পারা যায়, তন্মধ্যে সলফিউরস্ এসিড প্রশস্ত এবং দামেও সস্তা। বাতাস অথবা অম্লজানে গন্ধক পুড়াইলেই এই এসিড প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইদানীং যাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্যদ্রব্যাদির ব্যবসা করিতেছে, তাহারা এই এসিড প্রচুরপরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। কারণ, ইহার সংস্পর্শে আসিয়া খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইতে পায় না, আরও সুবিধা এই যে, আপনার কার্য্য করিবার পর সলফিউরস্ এসিড সম্পূর্ণরূপে বাষ্পাকারে তিরোহিত হয়। সকলেই জানেন, এই এসিড যাবতীয় বীজাণু ধ্বংস করিয়া ফেলে; সুতরাং উহার সংস্পর্শে আসিয়া যে কোন খাদ্যদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে দোষবিমুক্ত হইয়া থাকে।

এইবার কদলী শুষ্ক করিবার প্রণালীর উল্লেখ করা যাউক। ব্যাপারটি আদৌ জটিল নহে—খুবই সহজ। লৌহপাতনির্ম্মিত একটি দীর্ঘাকার বাক্স, লোহার শিকযুক্ত একটি বড় উনানের উপর বসাইতে হইবে। উনানে কাঠের কয়লার অগ্নি মৃদুভাবে জলিবে। উল্লিখিত লোহার বাক্সটির উপরের মুখ খোলা থাকিবে। তাহার উপর পাতলা কাঠের তক্তা শ্রেণীবদ্ধভাবে বসাইতে হইবে। তক্তাগুলি এমন ভাবে বসিবে যে, পরস্পরের ব্যবধান প্রায় থাকিবে না। উল্লিখিত তক্তাগুলিতে পেরেক মারা থাকিবে। তার পর কলার খোসা ছাড়াইয়া তাহার বোঁটাতে সূতা বাঁধিয়া বাক্সের অভ্যন্তরে পেরেকে ঝুলাইয়া দিতে হইবে। কলাগুলি দ্রুত ছাড়াইয়া তখনই বাক্সের মধ্যে ঝুলাইয়া দেওয়া দরকার। কারণ, বাতাসে অধিকক্ষণ থাকিলে কলার শ্বেত বর্ণ বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। এইরূপে শ্রেণীবদ্ধভাবে কলাগুলি বাক্সের মধ্যে রাখিবার পর আর কোন কার্য্য নাই। এ দিকে বাক্সের এক পার্শ্বে একটি নল সংলগ্ন আছে। সেই ছিদ্রপথে অতি ধীরভাবে মৃদু বায়ুপ্রবাহ প্রবেশ করিতে থাকে। এই বায়ুপ্রবাহ পূর্ব্বেই প্রজ্বলিত গন্ধকের মধ্য দিয়া আসিতেছিল, অর্থাৎ এক স্থলে গন্ধক স্তূপীকৃত করিয়া রাখিয়া দিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে হইয়াছে। সেই ধূমময় বায়ু নলের মধ্য দিয়া লোহার বাক্সে প্রবেশ করে। বায়ুর অম্লজান, গন্ধকের সহিত মিশিয়া গেলে নাইট্রোজেন ও সলফিউরস্ এসিড বাকি থাকে। এই মিশ্রিত নাইট্রোজেন ও সলফিউরস্ এসিড কলার গায় লাগিয়া বাক্সের উপরিস্থিত ঘনসন্নিবিষ্ট তক্তাগুলির অতি সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়া নির্গত হইয়া যায়।

বাক্সটির অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ ৮০ ডিগ্রির অধিক হইতে দেওয়া উচিত নহে। ৬০ ডিগ্রি উত্তাপ থাকিলেই যথেষ্ট। উপরে যে প্রণালীর উল্লেখ করা গেল, তাহা কলা শুকাইবার পক্ষে যথেষ্ট। এই প্রণালীর আরও একটা উন্নততর অবস্থা আছে। প্রজ্বলিত গন্ধকের সহিত বায়ুপ্রবাহ মিলিত হইবার পূর্ব্বে যদি এই প্রবাহকে চূণপূর্ণ একটি আধারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করান যায়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। চূণের সংস্পর্শে আসিয়া বাতাসের আর্দ্রতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। ইহার ফলে কলার মধ্যে যে জলীয় ভাগ থাকে, তাহা আরও সহজে অন্তর্হিত হয়। শেষোক্ত প্রণালীতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কলা শুকাইয়া যায়। লোহার বাক্সের মধ্যস্থ উত্তপ্ত বায়ুর স্পর্শে কলার দেহ কুঞ্চিত হইয়া যায় বটে; কিন্তু বর্ণ-পরিবর্ত্তন ঘটে না। তাহা ছাড়া কোন প্রকার জীবাণুও তাহাতে থাকিতে পায় না। একটা বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। বায়ুর সমগ্র অম্লজান গন্ধকের সংস্পর্শে আসা চাই। কলার আকার অনুসারে শুষ্ক করিবার প্রণালীর স্থায়িত্বকাল নির্ণীত হয়। যাহা হউক, দুই হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণতঃ কার্য্য শেষ হইয়া থাকে।

তার পর বাক্স হইতে কলাগুলি তুলিয়া লইয়া অতি সূক্ষ্ম শর্করার স্তূপের ভিতর ফেলিতে হয়। চিনি মাখাইবার পর কলা ঠাণ্ডা হইলে এক একটিকে পাতলা কাগজে (tissue paper) জড়াইতে হইবে। তার পর বাক্স বা টিনের কৌটা অথবা যে কোন আধারে ভরিয়া যে কোন দেশে রপ্তানী করা চলিবে। এই অবস্থায় কলা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকে এবং যত দূরবর্ত্তী স্থানই হউক না কেন, সর্ব্বত্রই বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা যাইতে পারিবে।

জর্ম্মণ লেখক বলিতেছেন, "ভারতবর্ষ যদি কলার ব্যবসায় করে, তবে শীঘ্রই তাহাদের এই উপায়ে বিপুল অর্থাগমের সম্ভাবনা। ব্যাপারটি আদৌ কঠিন নহে, অতি সহজেই ভারতবাসীরা এই ব্যবসায় করিতে পারে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কেহই এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করে নাই। অথচ এমন একটা লাভজনক ব্যবসায়ে অনায়াসে অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ করিতে পারে।" আসাম, বাঙ্গালা দেশ এবং মাদ্রাজ অঞ্চলে পর্য্যন্ত কলার চাষ হয়। বাঙ্গালী দাসত্বের মায়া কাটাইয়া এই সহজসাধ্য ব্যবসায়ে মস্তিষ্কচালনা করিবে কি? জর্ম্মণ লেখক সুদূর জর্ম্মণীতে বসিয়া এ দেশবাসীর অর্থাগমের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছেন। বাঙ্গালী পথের রেখা দেখিতে পাইয়া সেই পথে ভাগ্যপরীক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখুন না। আমাদের দেশের অনেক বি, এস্, সি, এম্, এস্, সি প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রি লইয়া বাহির হইতেছেন। এই স্বল্পায়াসসাধ্য ব্যবসায়ে তাঁহাদের কেহ কেহ আত্মনিয়োগ করিলে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের দ্বার তাঁহাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইতে পারে।

কলা শুকাইয়া তাহার চূর্ণও বিদেশে রপ্তানী করা চলে। প্রক্রিয়া একই প্রকারের; শুষ্ক কদলীচূর্ণও পৃথিবীর অন্যত্র দুর্লভ। একা ভারতবর্ষ এই কদলীচূর্ণ (banana flour) সমগ্র য়ুরোপের বাজারে একচেটিয়া করিয়া ফেলিতে পারে।

যদি কোন বাঙ্গালী এই কার্য্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়েন, তবে তাঁহার অর্থাগম ত হইবেই, দেশবাসীরও তিনি মহৎ উপকার সাধান করিবেন।

ছয় হাত উচ্চ তুলসী।

ছয় হাত উচ্চ তুলসী

উপরে যে তুলসীগাছ দেখা যাইতেছে, উহা সাধারণ তুলসী মাত্র। উহার বৈজ্ঞানিক নাম (Ocimum Santum)।

উক্ত তুলসীগাছটির বিশেষত্ব কিছু নাই; কিন্তু ঔদ্যানিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অত বড় হইয়াছে। উক্ত বৃক্ষটি ১৩২৯ সালে আষাঢ় মাসে জন্মিয়াছে, এবং বর্ত্তমান বর্ষের ২০শে আশ্বিন তারিখে উহার ছায়াচিত্র গৃহীত হইয়াছে। অতএব তখন উহার বয়ঃক্রম ষোড়শ মাস মাত্র।

ঔদ্যানিক প্রক্রিয়ানুসারে প্রথমাবধি হইতেই নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ১৬ মাসের মধ্যে গাছটি পূরা ৯ ফুট—অর্থাৎ ৬ হাত দীর্ঘ হইয়াছে,—এই কারণে উহার বিশেষত্ব। তুলসীটির প্রকৃত উচ্চতাপ্রদর্শনের জন্য নবদ্বীপের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ৮।৯ বৎসরের কন্যাকে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত বালিকাটির গায়ে তুলসীর শাখা আসিয়া পড়ায় ছবিখানি বড়ই প্রীতিজনক হইয়াছে—ইহা যে কবিত্বব্যঞ্জক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত তুলসী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। উহা স্বরোপিতভাবে জন্মিয়া যখন আধ হাত উচ্চ হইয়াছিল, তখন হইতে উহার প্রতি আমার দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং তখন হইতে উহাকে যত্ন করিতে থাকি। উহা একটি-মাত্র কাণ্ডবিশিষ্ট উদ্ভিদ। চেষ্টা করিলে উহাকে আরও উচ্চ করিতে পারা যাইত; কিন্তু ভূমি হইতে আর নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় না থাকায় নিয়ন্ত্রণকার্য্যে বিরত হই। কিন্তু মঞ্জরী থাকিতে দেওয়া হইত না। আমার নবদ্বীপের বাসা-বাড়ীতে উক্ত তুলসী জন্মিয়াছিল, নানা কারণে উক্ত বাসা ছাড়িয়া দিবার সঙ্কল্প হইলে, স্থানীয় চিত্রকর দ্বারা উক্ত তুলসীর ছায়াচিত্র লই। ছায়াচিত্র গৃহীত হইবার পর হইতে বহু ব্যক্তি উক্ত কৌতূকোদ্দীপক গাছটি দেখিয়া যাইতেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে।

নিদ্রা

এস, ওগো শান্তিময়ি!
এস, সুপ্তিরাণি!
আজ শ্রান্ত দেহভার
বহিতে পারি না আর,
প্রসারিয়া স্নেহ-কর
লহ বক্ষে টানি'।

নিবিড় মধুর বেশে
শিয়রে দাঁড়াও এসে,
আঁচল-বাতাসে গ্লানি
দূর করি' দাও;
তোমার মায়ার ডোরে
হে মোহিনি! বাঁধ মোরে,
স্বপন-তুলিকা মম
নয়নে বুলাও।

তোমার বীণার তানে
কহ মোর কানে কানে,
কোথা সে সুপ্তির ঠাঁই
সুখ-দুঃখ-পার;
তাহার সন্ধান পেলে,
এ আলোকে—এ গরলে,
চাহি না, জননি! আমি
জাগিতে আবার।

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর।

চীনদেশে নারীর জাগরণ

সাংহাই হইতে প্রকাশিত 'নর্থ চায়না হেরাল্ড' নামক পত্রে চীনদেশের নারীজাগরণ-সংক্রান্ত অনেকগুলি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীনযুগে সমাজে চীন-নারীর স্থান যেরূপ ছিল, তাহাতে কাহারও ঈর্ষা জন্মে না। চীন নীতিশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, "চরকায় সুতাকাটা, সাটিনের কাপড় বয়ন করা, সূচসূতার কায করাই নারীর পক্ষে প্রশস্ত। অন্যের সোনা, রূপা, হীরা, মুক্তা দেখিয়া লোভ করায় কোন ফল নাই। হাতে মোজা, জুতা এবং অন্যান্য পোষাক তৈয়ার কর,—তাহার বিনিময়ে অর্থ ও শস্য গৃহে আসিবে। আপনার কাযে মন দাও; তাহা হইলে অলীক কল্পনার ধ্যান করিয়া অনর্থক কষ্ট পাইতে হইবে না।"

শাস্ত্রবচনের প্রভাবেই হউক, অথবা সামাজিক শাসনের জন্যই হউক, চীন-রমণীরা এই ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তথাপি রত্নালঙ্কার, হীরা, মণি, মুক্তার প্রলোভনকে জয় করিতে পারে নাই। সেটা বোধ হয় সনাতন বৃত্তি। যাহা হউক, এখন সে যুগ আর নাই। চারিদিকেই এখন নূতন জীবনস্পন্দন অনুভূত হইতেছে। চীনদেশেও সে স্পন্দনবেগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জাগরণের বার্ত্তা পৃথিবীর সমস্ত স্থানের নর-নারীকেই অল্পাধিক পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

মাঞ্চুরাজবংশের প্রভাব বিলুপ্ত হইবার সময়ের চীনদেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, তথায় সে যুগে চৈনিকদিগের স্থাপিত বালিকা-বিদ্যালয় পর্য্যন্ত ছিল না। শুধু খৃষ্টান পাদরীরা কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন মাত্র। চীনের ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ আদেশ ছিল পিতামাতা বালিকাদিগকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতেন মাত্র। সেই শিক্ষাই তাঁহারা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতেন।

চৈনিক যুবতী—ইঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চীনদেশে দেখা দিয়াছিল। সেই সময় হইতে নারী-সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটিতেছে। বর্ত্তমানে চীন গবর্মেণ্টের দ্বারা পরিচালিত ৩ হাজার ৩ শত ৬৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭ শত ১৯টি ছাত্রী পড়িতেছে। ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের ছাত্রীসংখ্যা ১ হাজার ১ শত ৩৮। ৬১টি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৮শত ৭৩টি ছাত্রী পড়িতেছে। চীনদেশে অধুনা ১১টি কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় আছে; এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীসংখ্যা ১ হাজার ৭ শত ৫৭। তথায় সূচিকর্ম্ম, পোষাক তৈয়ারী, রেশমের সূতা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। যাহাতে নারীরা পরিণামে শ্রমশিল্পের সাহায্যে আপনার জীবনযাত্রা আপনি নির্ব্বাহ করিতে পারে, এমন নানাপ্রকার শিক্ষা এই সকল বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়া থাকে।

ক্রীড়ারতা চৈনিক সুন্দরী।

নারীশিক্ষার প্রসার তথায় এমনই ঘটিয়াছে যে, অচিরে চীনদেশে নারীদিগের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সম্ভাবনা। সমগ্র চীনদেশে আপাততঃ নানা বিদ্যালয়ে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ছাত্রী পড়িতেছে।

চীনদেশে নারী-শিক্ষার প্রসার হওয়ায় একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বহু-সংখ্যক সুশিক্ষিতা যুবতী আজকাল বিদেশে গিয়া তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য লালায়িত। দিন দিনই তাহারা বর্দ্ধিত সংখ্যায় বিদেশে যাইতেছে। প্রবাসে গিয়া তাহারা সাফল্যলাভও করিতেছে। শিক্ষিতা মহিলারা পুরুষের ন্যায় সকল বিষয়ে সমান অধিকার লাভের জন্যও ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। চীনের নারীসমাজ যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আশা অদূরভবিষ্যতে সফল হইতেও পারে।

এই বিষয় উপলক্ষ করিয়া 'নর্থ চায়না হেরাল্ড' বলিতেছেন, "নারী যদি আত্মনির্ভরশীলা হয়, তবে তাহা সুখের কথা; কিন্তু পুরুষের সহিত নারীর যে সম্বন্ধ, তাহা ত বিলুপ্ত হইবার নহে। চীনদেশে যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহাতে চীন নারীর উপর স্বামীর অপ্রতিহত প্রভাব। পুরুষের বহু বিবাহ এবং উপপত্নী রাখা প্রভৃতি যে সকল প্রথা প্রচলিত আছে, তাহার উচ্ছেদসাধন না ঘটিলে স্ত্রীর সম্মান গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার নহে।"

তবে চীন এখন সমাজসংস্কারেও মন দিয়াছে। শিক্ষিত পুরুষরা নৈতিক চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যখন আত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ হইবে, জাতীয়তার স্বরূপ, নর-নারীর সম্পর্ক বুঝিতে শিখিবে, তখন সমাজের অনেক ক্লেদ, অনেক ক্ষত আপনিই প্রত্যক্ষ হইবে। চীনের সমাজ-হিতৈষীরা সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

মার্কিণ কলেজে মিস্ ওয়ং বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কুসঙ্গ

দেও আধি-ব্যাধি দেও দরিদ্রতা,
প্রফুল্ল বয়ান হবে না ম্লান।
সাপের নিশ্বাস কুসঙ্গ-বাতাস
নাহি দহে যেন আমার প্রাণ।

শ্রীবিভুচরণ বটব্যাল

শ্রীনাথদ্বারযাত্রা

২

দেপালসর হইতে বলদরথারোহণে ফতেপুর যাত্রারম্ভের কথা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে। আমরা যখন রথে চড়িলাম, তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে; নবোদিত সূর্য্যের কিরণজালে বিশাল মরুপ্রান্তর এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ভাগ্য-বশতঃ সে দিন পবনদেবের বেগ তেমন না থাকায় ধূলিজাল উত্থিত হইতেছিল না। চারি দিকেই উন্মুক্ত আকাশ, কোন দিকেই দৃষ্টি প্রতিহত হইতেছিল না। পূর্ব্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যত দূর দেখিতেপাওয়া যায়, কেবল বালুকাময় প্রান্তর। বৃক্ষহীন, গ্রামহীন, নিঃশব্দ, পীতাভ, বিশাল মরুভূমির এই বিরাট দৃশ্য বিস্ময়বিকাশিতনেত্রে দেখিতে দেখিতে আমরা রথারোহণে নাতিদ্রুতগতিতে পূর্ব্বোত্তরকোণে অবস্থিত ফতেপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে দুই ক্রোশ তিন ক্রোশ ব্যবধানে এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, পত্রহীন খাড়া বিরল বাবলাবন ছাড়া আর কিছুই বালু-ছাড়া দেখিবার বিষয় নাই। যে পথ দিয়া আমরা যাইতে ছিলাম, তাহার দুই পার্শ্বেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক ময়ূর দেখা গেল। গ্রামের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, সম্পন্ন গৃহস্থের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; কোন গ্রামেই একখানিও দোকান বা হাটের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মাঝে মাঝে দুই তিন মাইলব্যাপী সমুচ্চ বালুকা-পর্ব্বত; অনেক স্থলে তাহারই উপর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বালুকাময় পর্ব্বতের উপর উঠিবার সময় আমাদের রথের গতি নিতান্ত বিরক্তিকর মন্দভাব ধারণ করিতেছিল। উপরে উঠিয়া চারি দিকের সমতল বালুকাময় প্রান্তর ও দূরবর্ত্তী এক আধখানি গ্রাম দেখিতে দেখিতে একটা শুষ্কতা-ময় বিশালতর নীরস অথচ অপূর্ব্ব অনুভূতি কি যেন এক শূন্যভাব হৃদয়ের মধ্যে জাগাইতেছিল, তাহা আস্বাদ্য বা পরিহার্য্য, তাহা নির্ণয় করিবার সামর্থ্য তখন ছিল না বলি-লেও চলে। যাউক্ সেই একঘেয়ে বালুকাময় দৃশ্যের কথা। পথে যাইতে যাইতে এক বিস্ময়াবহ দৃশ্য এই দেখা গেল যে, সারি সারি উষ্ট্রের শ্রেণী যাইতেছে যেমন, আসিতেছেও তেমনই। মাড়োয়ারের অধিবাসী কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই উটের উপর চড়িতে খুব মজবুত। বৃদ্ধা হইতে বালিকা পর্য্যন্ত সকল স্ত্রীই দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া, নিজেই লাগাম ধরিয়া, অক্লান্তভাবে উট চালাইতেছে। বর ও বধূর জন্য তাঞ্জাম বা পাল্কী ব্যবহৃত হয় না, এক উটই উভয়ের কার্য্য চালাইতেছে। এরূপ যে কত দেখা গেল, তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নহে। বড় বড় লোহার কড়ি, প্রস্তরনির্ম্মিত মাঝারি গোছের স্তম্ভ, পাতরের টালি, ইট, সুরকী ও চূণ প্রভৃতি গৃহনির্ম্মাণের উপকরণসমূহ ঐ উটের পিঠে চাপাইয়া দূরবর্ত্তী সমৃদ্ধ গ্রামসমূহে প্রেরিত হইতেছে। নিজ গ্রামে পাকা বাটী নির্ম্মাণ করা সমৃদ্ধ মাড়োয়ারী বণিকের জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ইহা শুনিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু ঐ পৈতৃক ভিটার সমৃদ্ধিসাধনের জন্য তাহারা যে এত যত্ন ও এমন অকাতরে জলের মত অর্থব্যয় করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বুঝি নাই।

এইরূপে ছয় ঘণ্টা অতিক্রমণ করিয়া আমরা রামগড় নামক নগরের নিকটে পৌঁছিলাম। দূর হইতে নগরের সমুচ্চ প্রাকার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। প্রস্তরনির্ম্মিত এই প্রাকারের এখন ভগ্নদশা, কিন্তু ইহার গাঁথুনী দেখিয়া বোধ হইল, এক সময় ইহা এই নগরের রক্ষার জন্য নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। নগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি নাতিবৃহৎ দুর্গ দেখিলাম। দুর্গের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, ইহা অনেক কাল মুসলমানগণের অধীন ছিল; কারণ, দুর্গের বাহির হইতেই দেখিতে পাইলাম, তাহার মধ্যে সমুন্নত গম্বুজত্রয়শোভিত একটি বড় মসজিদ মাথা তুলিয়া এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অধিকাংশ গৃহই মুসলমানী রীতিতে নির্ম্মিত। শুনিলাম, দেপাল সিংহ নামে এক জন পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় নৃপতি প্রথমে এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন; রামগড় নগরও নাকি তাঁহারই সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল, পরে ইহা মুসলমানগণের অধিকারে আইসে। এক্ষণে ইহা জয়পুররাজ্যের সামন্ত নরপতি সীকর-রাজের অধিকারে রহিয়াছে। নগরের প্রাচীর মধ্যে মধ্যে

ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহারই এক এক ভগ্নাংশের মধ্য দিয়া আমাদের রথ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। নগরের মধ্যে কোন পথই বাঁধান নহে, সব পথই বালুকাময়। বড় বড় বাড়ী অনেকগুলি দেখিলাম; অধিকাংশই নূতন ও সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। দোকান বড় বেশী নাই, কেমন একটা নিঝুম ও শান্তভাব নগরের উপর যেন আধিপত্য করিতেছে। পথে লোকের চলাচলও অল্প। সকলেই শান্তভাবে কার্য্য করিতেছে; নিরর্থক বাক্‌কলহ ও হুজ্জুতপ্রিয়তার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া গেল না।

রামগড়ে প্রবেশ করিবার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই হইয়াছিল,—যোধপুররাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যখন আমরা সীকররাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী একটি চুঙ্গি আফিসের নিকটে পৌঁছিলাম, তখন ঐ আফিসের কর্ম্মচারীর সহিত হঠাৎ জানি না, কি কারণে আমাদের রথচালকের একটু বচসা হইয়া গেল। মাড়োয়ারের ভাষা বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়া সেই বচসার মর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের শকটচালক ক্রোধে ঐ কর্ম্মচারীর চৌদ্দপুরুষান্ত ঘোষণা করিতে করিতে রথ অতি দ্রুতবেগে চালাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ চলিয়া আসিবার পর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম, আমাদের দুই ধারে রথের পশ্চাতে মোট লইয়া যে উষ্ট্র আসিতেছিল, তাহার অদর্শন হইয়াছে। ব্যাপারটা কি, বুঝিবার জন্য শকটচালককে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল, তাহা হইতে এই সার সংগ্রহ হইল যে, চুঙ্গির অফিসার সেই উষ্ট্রকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। তাহার পিঠের উপর আমাদের যে মালপত্র ও পেঁটরা প্রভৃতি ছিল, তাহার মধ্যে কোন বহুমূল্য বা প্রতিবিদ্ধ দ্রব্য আছে কি না, তাহা পরীক্ষা না করিয়া সে উট ছাড়িবে না। পরীক্ষা করিবে কিরূপে? পেঁটরার চাবি ত আমারই কাছে রহিয়াছে; সুতরাং রথ ফিরাইয়া আমাদিগকে চুঙ্গি আফিসে যাইতে হইবে। আমার এই প্রকার সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমার শকটচালক ত একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "ও বেটা ভারী বজ্জাত, উহার বজ্জাতির উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে। ও কি না শেঠজীর লোকের মালপত্র পরীক্ষা করিতে চাহে, এত বড় বেটার স্পর্দ্ধা! আপনার মালপত্র পড়িয়া থাক্, আমি ফতেপুরে যাইয়া শেঠজীর দ্বারা ঐ বেটার এমন শাস্তি দেওয়াইব যে, ও তাহা এ জন্মে আর ভুলিবে না।" আমি দেখিলাম, এ ত বড় গণ্ডগোল, আমি ফতেপুরে যাইব, মালপত্র চুঙ্গি আফিসে পড়িয়া থাকিবে! ধরিয়া লইলাম, শেঠজীর প্রতাপে তাহা দুই দিন পরে আবার আমার অধিকারেও আসিবে, কিন্তু ফতেপুরে যাইয়া আপাততঃ যে নিষ্কর্ম্মা হইতে হইবে, তাহার উপায় কি? পরিবার কাপড়, শয়নের বিছানা, সন্ধ্যাহ্নিক পূজা করিবার উপকরণ সবই ত চুঙ্গিঘরে আবদ্ধ রহিল! আমি ফতেপুরে যাইয়া করিব কি? ইহা ভাবিয়া শকটচালককে আমি গাড়ী ফিরাইতে আদেশ করিলাম। সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে গাড়ী ফিরাইয়া আবার চুঙ্গি আফিসের দিকে যাইতে আরম্ভ করিল। আমাদের চুঙ্গি আফিস পর্য্যন্ত যাইতে হইল না; আমাদের গাড়ী ফিরিতেছে দেখিয়া উক্ত কর্ম্মচারীই আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লোকটি হিন্দী বুঝে ও বলিতে পারে। আমি অতি কষ্টে তাহাকে বুঝাইলাম যে, তাহাদের ব্যক্তিগত কলহের পরিণাম এক জন নিমন্ত্রিত বৈদেশিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নিরর্থক ক্লেশ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে বলিল, "আপনি আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি এখনই আপনার জিনিষপত্র ছাড়িয়া দিতেছি, কিন্তু এই দুষ্ট গোঁয়ার শকটচালককে আপনি নিষেধ করুন, আপনি এ দেশের ভাষা বুঝেন না, ও এখনও আমাকে অকথ্যভাষায় গালি দিতেছে। বড় মানুষের চাকর বলিয়া উহার স্পর্দ্ধা বড়ই বাড়িয়াছে। আপনি যদি পারেন, তাহা হইলে ইহার প্রতিবিধান করিবেন। আমি আর কিছু বলিতে চাহি না।" আমি তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া মালপত্র ছাড়াইয়া আবার ফতেপুর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, ব্যাপারটি বুঝি এইরূপে সহজে মিটিল, আর গড়াইবে না, ফতেপুরে পৌঁছিয়া পরদিন শুনিলাম, শেঠজীর মাল এইরূপ অন্যায়ভাবে আটক হইয়াছিল বলিয়া উক্ত কর্ম্মচারী সসপেণ্ড হইয়াছে এবং শেঠজীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার জন্য ফতেপুরে আসিয়াছে। দোষ কাহার ছিল, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, এই সামান্য ব্যাপারে শেঠজীর সীকরদরবারে সম্মান ও ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল, দেশীয় রাজদরবার এই সকল কার্য্যে যে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সঙ্গে বিচার করিতে সমর্থ, তাহা দেখিয়া আনন্দলাভ করিলাম।

বেলা ১টার সময় আমরা ফতেপুরে উপস্থিত হইলাম। এখানে শেঠজীর ঐশ্বর্য্য ও আতিথেয়তা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। থাকিবার জন্য উৎকৃষ্ট বাড়ী—বিশ্রামের জন্য মূল্যবান্ নূতন শয্যাদি পরিচ্ছদ, আদেশ প্রতিপালন জন্য বহু ভৃত্য, আহারের জন্য সকল প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য, স্নানের ও শৌচের জন্য সর্ব্বদা উষ্ণ জল ও অত্যধিক আদর-আপ্যায়ন কিছুরই ত্রুটি ছিল না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সম্মান ও সৎকারে শেঠজী যে উদারহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় বলিলে বোধ হয় অণুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না।

রায় বাহাদুর রামপ্রতাপ চমরিয়া

সে দিন স্নানসন্ধ্যাপূজন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। ক্ষুধা বিলক্ষণ পাইয়াছিল, সায়ংসন্ধ্যা সমাপনান্তেই আহার করিতে বসিয়া গেলাম। নিশিকান্ত বাবাজীর রন্ধনের পারিপাট্যের বাহাদুরী বটে, কত প্রকার ব্যঞ্জন কেমন সুস্বাদু! এত অল্পকালের মধ্যে বাবাজী সব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা কি বলিব? 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' বলিলে বোধ হয় কিছু বলা হইতে পারে। আহারের পর বিশ্রামের অভিলাষে শেঠজী প্রেরিত উৎকৃষ্ট শয্যায় গিয়া বসিয়াছি, এমন সময় দেখি, রায় বাহাদুর রাম প্রতাপ চমরিয়া পুরোহিত ও পাত্রমিত্রাদি সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত। কুশলপ্রশ্নে, পথের শ্রমের প্রশ্নে এবং ভোজনাদি প্রশ্নে আপ্যায়ন করিবার পর শেঠজী অতি বিনীতভাবে তাঁহার যজ্ঞশালা দেখিবার অনুরোধ করিলেন। আমাদের বাসার অতি নিকটেই যজ্ঞশালা বিরচিত হইয়াছিল। শেঠজীর অনুরোধে সমস্ত দিনের পরিশ্রমবিনিবারক তেমন সুখময় কোমল শয্যা অগত্যা ছাড়িতে হইল; তাঁহার সঙ্গে যজ্ঞশালায় চলিলাম। তাঁহার প্রধান গৃহসংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিশাল যজ্ঞশালা রচিত হইয়াছে। সমুচ্চ তৃণাচ্ছাদিত সুপ্রশস্ত যজ্ঞমণ্ডপ, চারিদিকে ফলপুষ্পপত্রে ও মাল্যে অলঙ্কৃত বিচিত্র পতাকা-বিরাজিত সুশোভন স্তম্ভরাজি, মণ্ডপের মধ্যে বিশাল অগ্নিকুণ্ড বিধি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে। উপর হইতে বিলম্বিত প্রকাণ্ড তাম্রময় ঘটের স্বল্পায়তন ছিদ্র হইতে গব্যঘৃত দিবারাত্রি ক্ষরিত হইয়া হোমাগ্নিকে সতত প্রদীপ্ত রাখিতেছে। চারিদিকে প্রধান অগ্নিকুণ্ড অপেক্ষা অর্দ্ধপরিমাণ চারিটি অগ্নিকুণ্ডেও ঐ ভাবে হোমাগ্নি উদ্দীপিত রহিয়াছে; যথাবিহিত স্থানে ঋত্বিক্, হোতা, ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি বসিয়া আছেন। উদ্গাতৃগণ সকলে মিলিত হইয়া সায়ন্তন আহুতির পর সামগান করিতেছেন, সংস্কৃত অগ্নিতে সংস্কৃত গব্য হবির আহুতি জনিত দিব্য সৌরভে দিঙ্মণ্ডল সর্ব্বদা

সাবিত্রী যজ্ঞশালা

পরিপূরিত। এখানে আসিয়া এই মধুর পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত অবসাদ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল, বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলাম, বৈদিক ব্রাহ্মণযুগের সরস্বতী-সৈকতে আর্য্যমহর্ষিগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের স্বপ্নময় শান্ত ও পবিত্র দৃশ্যরাজি মানসচক্ষুতে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। এমন সুন্দর পুণ্যময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাচীন ভারতের কত কাহিনী উদ্বেল কল্পনাবারিধির উত্তাল তরঙ্গাবলীর ন্যায় সংস্কারময় বেলাভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে লাগিল! 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্' এই মন্ত্রময়ী দেবতা যেন রূপপরিগ্রহ করিয়া মধুর হাসির জ্যোৎস্নায় অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত সংশয় ও অবিশ্বাসের তিমিরাবলী সরাইয়া দিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল এইরূপে কাটিয়া গেল, সামগান বিরত হইল, আমরা যজ্ঞভূমি হইতে বিদায় লইয়া বাসায় ফিরিলাম। পথশ্রমের আতিশয্যবশতঃ শয্যায় পড়িবামাত্র সুনিদ্রার গভীর শান্তিময় ক্রোড়ে নিমগ্ন হইবার পর সে রাত্রি ক্ষণের ন্যায় অতর্কিতভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া শৌচাদি সম্পাদন করিয়া উষ্ণ জলে স্নানাদি সমাপনান্তে আহ্নিককৃত্যে বসিলাম; বসিয়া দেখি, নিশিকান্ত বাবাজী যেমন করিয়া পূজার সামগ্রী সাজাইয়াছেন, তাহাতে নাস্তিকেরও পূজা করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। দিব্যধূপের গন্ধে পূজাগৃহ আমোদিত, গোলাপ, করবীর, অপরাজিতা ও বকপুষ্পের মিলিত দিব্য-সৌরভে যেন অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত সুবাসিত হইতেছে। এ মরু-দেশে এত প্রত্যুষে এইরূপ নন্দনের কুসুমরাজি আসিল কোথা হইতে? নিশিকান্ত বাবাজী বলিলেন, ইহা শেঠজীর আতিথ্যের প্রভাব; অতি প্রত্যুষেই তাঁহার বাগান হইতে মালী আসিয়া পূজার জন্য এই সকল পুষ্প, তুলসী ও বিল্বপত্র দিয়া গিয়াছে। আমি পূজায় বসিলাম, নিশিকান্তের সন্ধ্যা ও পূজা পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল, কারণ, রাত্রি ৩টার সময় উঠাই তাহার অভ্যাস। এককোণে বসিয়া সে যখন তাহার প্রাত্যহিক দেবীমাহাত্ম্য পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন বড়ই আনন্দ হইতে লাগিল। এমন মধুর কণ্ঠে এরূপ বিশুদ্ধ স্বরে চণ্ডীপাঠ আর কখনও পূর্ব্বে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রবাসে এই প্রকার সেবা-পরায়ণ আস্তিক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছাত্রের সঙ্গ যে কি মধুর, তাহা ভুক্তভোগী যে, সে-ই বুঝে, অপরকে বুঝান যায় না।

বেলা ৯টার সময় পূজা শেষ করিয়া বেদানা, কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, আপেল, কদলী প্রভৃতি ফল ও ক্ষীরের নানা-বিধ মিষ্টান্ন সামর্থ্যানুসারে উপভোগ করিয়া শেঠজীর প্রেরিত পুরোহিতের সঙ্গে আমরা পূর্ণাহুতি দেখিবার জন্য আবার যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইলাম। এই পূর্ণাহুতি ব্যাপার এমনই বিরাট যে, তাহা বর্ণন করিতে যাইলে পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি অপরিহার্য্য হইবে, এই আশঙ্কায় আমি দুই একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই বিরত হইতেছি।

এই কার্য্যের যিনি প্রধান আচার্য্য, অগ্রে তাঁহারই একটু পরিচয় দিব। কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতপ্রবর দেবকীনন্দন শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানেই এই মহাসাবিত্রীযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। পণ্ডিত দেবকীনন্দন শাস্ত্রী মাড়োয়ারী গৌড় ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন, কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ টেকমানী সংস্কৃত কলেজের ইনি অধ্যক্ষ, ইনি কাশীধামে পণ্ডিতকুল-রাজ পুণ্যচরিত মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রধান ও প্রিয় ছাত্র। এমন সুপণ্ডিত, মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ভদ্র ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান সময়ে একান্ত দুর্লভ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারই উপদেশানুসারে এই মহাসাবিত্রীযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছিল। কাশী হইতে প্রায় পঞ্চাশ জন ক্রিয়াকাণ্ডদক্ষ মহারাষ্ট্র, দ্রবিড়, ত্রৈলঙ্গ, সরযূপারী, গৌড় ও কান্যকুব্জ বৈদিক ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞের জন্য শেঠজী কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া ঋত্বিকের কার্য্য করিতে-ছিলেন। পূর্ণাহুতির সময় বিনীতবেশ যজমান ও তৎপত্নী যজ্ঞমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মিলিতভাবে যখন প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতিপ্রদান করিতেছিলেন, তখন সত্যই বোধ হইতে লাগিল, যেন বিধির সহিত শ্রদ্ধা মিলিত হইয়া যজ্ঞ-মণ্ডপের অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিতেছিলেন।

দক্ষিণান্তের পর যজমান পত্নী ও মৃতপিতৃক একমাত্র শিশু পৌত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামপূর্ব্বক যজ্ঞের সাফল্যপ্রার্থনা করিলেন। চারি বেদের শ্রুতিসুখদ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। অতি প্রাচীনকালের যজ্ঞমহোৎসব যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ঐ দিন বৈকালে শেঠজীর আর একটি জনহিতকর

অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। মাড়োয়ারী ব্রাহ্মণবালকগণের সংস্কৃতবিদ্যা শিক্ষার জন্য ফতেপুরে একটি সংস্কৃত কালেজ সেই দিনে প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার জন্য দুই লক্ষ টাকা শেঠজী দান করিয়াছেন। ইহার সুদ হইতে অধ্যাপকগণের বেতন ও ছাত্রদিগের বৃত্তি প্রদান করা হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রদিগের বাসস্থানের জন্য তিনি আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। নিজ জন্মস্থানের উন্নতিকল্পে সনাতনধর্ম্মের মূলনিদান সংস্কৃতবিদ্যার অভ্যুদয় ও প্রসারের জন্য শেঠজীর এই বিপুল দানের কথা যখনই মনে হয়, তখনই মনে পড়ে আমাদের জন্মভূমির কথা! নদীয়া, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর ও বরিশালের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব দিন দিন হ্রাস হইতেছে, পাশ্চাত্য পরিণামভয়ঙ্কর বিলাসিতা-মদিরার তীব্র আবেগে উন্মত্ত হইয়া বঙ্গের ধনিবৃন্দ কলিকাতার তৈলচিক্কণ রাজপথে মোটর হাঁকাইয়া জীবনের চরিতার্থতাসম্পাদনে ব্যস্ত, গ্রামের চতুষ্পাঠী পৈতৃক চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গোৎসব বিস্মৃতির অগাধসলিলে ডুবিয়া যাইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। গ্রামের পিতৃপুরুষগণস্থাপিত দেবমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে—পুষ্করিণী শুকাইতেছে—জলনিকাশের অভাবে ম্যালেরিয়াগ্রাসে পড়িয়া গ্রাম জনশূন্য হইতে বসিয়াছে—সে কথা বাবুর কর্ণে প্রবেশ করিবার অবসর পায় না। সমাজ গেল, অথচ সামাজিক সংস্কারের জন্য কলিকাতার বড় বড় বৈদ্যুতিকালোকোদ্ভাসিত সভামণ্ডপে ঘন ঘন করতালিমুখরিত-দীর্ঘজ্জল বক্তৃতার বিরাম নাই—ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই অথচ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসংস্থাপনের বিরাট বাগাড়ম্বর দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের এই বর্ত্তমান অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, আর তাহার সঙ্গে মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের জন্মভূমির অভ্যুদয়ের এই প্রকার পূত চেষ্টা ও তাহার সাফল্যের নয়নমনোহর পুণ্য-সমুজ্জ্বল চিত্র স্বয়ং দেখিয়া মনের মধ্যে যে আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহা কি বলিয়া বুঝাইব, কাহাকেই বা বুঝাইব? মাড়োয়ার শুনিয়াছিলাম মরুদেশ, দেখিলামও তাহা মরুভূমি; কিন্তু এই প্রখর রবিকিরণশুষ্ক, নীরস, নিঃসৌন্দর্য্য দেশের অধিবাসিবৃন্দ কোথা হইতে পাইল হৃদয়ের এই কোমলতা, এই সরসতা, এই সৌন্দর্য্য? যে হৃদয়ে জন্মভূমির সৌষ্ঠব-বিধানের জন্য এত যত্ন, এত অনুরাগ ও এত ব্যাকুলতা, সে হৃদয়ের ন্যায় কোমল, সরস ও সুন্দর আর কিছু যে হইতে পারে, তাহা ভাবিয়াও পাই না।
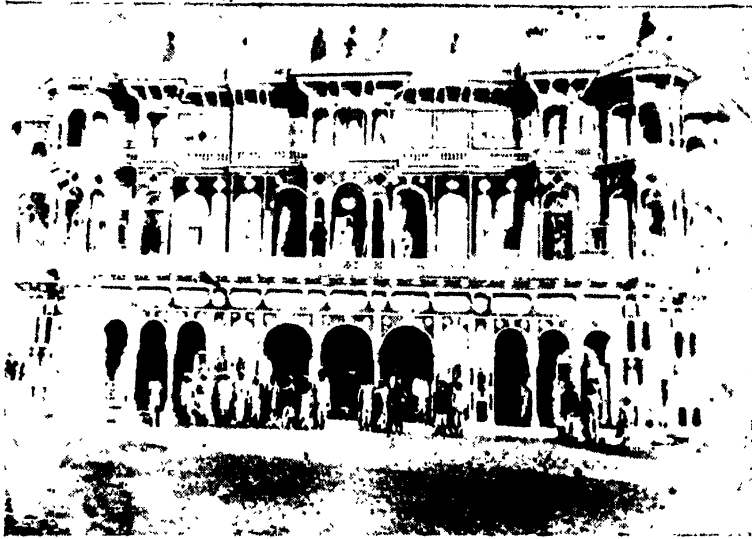
শেঠজীর বাড়ী

কেহ যেন না ভাবেন, ইহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। সত্যই তাহা নহে, কলিকাতার দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণের বড়বাজারে, হ্যারিসন রোডে বড় বড় ইন্দ্রভবনতুল্য প্রাসাদাবলী দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু সে বিস্ময় সহস্রগুণে বাড়ে—যখন আমরা তাঁহাদের জন্মভূমিতে আসিয়া তাঁহাদের বাসভবনগুলি দেখিবার অবসর পাই। এক ফতেপুরের কথা বলিতেছি, ইহা দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে চারিদিকে এক ক্রোশের অধিক নহে। ইহা বাণিজ্যের স্থান নহে, জনসংখ্যা বোধ হয়, দশ হাজারের অধিক হইবে না; কিন্তু এখানে বড় বড় বৃহৎ প্রাসাদের সংখ্যা দুই শতের কম নহে; মাঝারী ও ছোট ছোট সুন্দর বাড়ীগুলির

কথা ধরিতেছি না। ইহা বলিলে বোধ হয় অণুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না যে, ঐ দুই শত বাড়ীর মধ্যে অধিকাংশ বাড়ীর সহিত তুলনা করিলে কলিকাতায় মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের বৃহদায়তন বিলাসভবননিচয়ও হীনপ্রভ ও ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত হয়। কলিকাতায় বাড়ী করিতে যাহা ব্যয় হয়, এখানে বাড়ী করিতে তাহা অপেক্ষা ব্যয় যে দ্বিগুণ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সকল বাটী নির্ম্মাণের উপকরণ কলিকাতা, বোম্বাই বা দিল্লী প্রভৃতি দূরদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া রেলের সাহায্যে এখানে আনিতে হয়। এই বাড়ী সকল ভাড়া দিয়া বৎসরে এক পয়সাও লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন করিয়া দৃষ্টলাভহীন প্রাসাদাবলী নির্ম্মাণের জন্য জলের ন্যায় এত অর্থ ব্যয় করিয়া মাড়োয়ারী বণিক্‌গণ জন্মভূমির প্রতি যে অনন্যসাধারণ প্রীতির পরিচয় দিতেছেন, তাহার শতাংশের একাংশও আমাদিগের থাকিলে বঙ্গজননীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পল্লীগ্রামনিচয় এমন করিয়া জীর্ণারণ্যে পরিণত হইত না।

এই প্রসঙ্গে জন্মভূমির শ্রীসম্পাদনের জন্য মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণের অজস্র অর্থব্যয়ের আর একটি বিস্ময়াবহ উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই—পূর্ণাহুতির পরদিন শেঠজীর অনুরোধে আমরা ফতেপুরের প্রান্তভাগে অবস্থিত একটি দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন বৃক্ষবাটিকা দেখিতে গিয়াছিলাম।

এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীনারায়ণের চতুর্ভুজমূর্ত্তিটি ও তৎপার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীদেবীর সৌন্দর্য্যপ্রতিমা বড়ই সুন্দর বোধ হইল। গৃহস্বামী রামানুজ সম্প্রদায়ের শিষ্য। এই সম্প্রদায় দক্ষিণদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত, সুতরাং রাজপুতানায় এই সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকাণ্ডজ্ঞ পুরোহিত দুর্লভ। তাই দক্ষিণদেশ হইতে উপযুক্ত পুরোহিত ও পূজারী আনাইয়া প্রচুর পরিমাণে মাসিক বৃত্তি দিয়া তাঁহাদিগকে এই মন্দিররক্ষার্থ ও দেবসেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। শুনিলাম, ইহার জন্য গৃহস্বামী প্রতি বৎসরে ৩ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। মন্দিরের চত্বর, প্রাঙ্গণ ও মেঝে সবই শ্বেতপ্রস্তরে বিরচিত। বিশাল মণ্ডপ ও মন্দির, পাকশালা, অতিথিশালা, ছাত্রগণের বাসভবন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে বোধ হয় ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা বড় অসাধারণ নহে। কারণ, শুনিলাম, এরূপ অনেক মন্দির মাড়োয়ারের অনেক গ্রামে ও নগরে প্রচুরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এই মন্দিরসংলগ্ন উপবনটি দেখিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। প্রায় ৩০ বিঘা জমী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, উচ্চ প্রাচীর না দিলে বায়ুযোগে প্রক্ষিপ্ত বালুকারাশির দ্বারা ভূমি আবৃত হইয়া যায় এবং সেই বালুকাবৃত ভূমিতে ফুল ও ফলের গাছ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বালির উপর কোন ভাল ফুলের বা ফলের বৃক্ষ জীবিত থাকিতে পারে না বলিয়া বহুদূর হইতে উটের পিঠে করিয়া উৎকৃষ্ট মাটী আনাইয়া ঐ ৩০ বিঘা জমীর উপর ৩ হাত গভীর করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এই বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সর্ব্বদা জলসিক্ত করিয়া রাখিবার জন্য প্রচুর জলের প্রয়োজন, তাহার জন্য দুইটি বৃহৎ অতিগভীর কূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বদা ইচ্ছামত জল উঠাইবার জন্য, একটি বড় বয়লার ও এঞ্জিন বসান হইয়াছে; ইহাকে চালাইবার রীতিমত ইঞ্জিনিয়ার ও খালাসী প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যাপৃত রহিয়াছে। এঞ্জিন চালাইবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা উটের পিঠে করিয়া ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী দেপালসর ষ্টেশন হইতে আনিতে হয়। যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কয়লার অভাবে এ পর্য্যন্ত কোন দিন এঞ্জিন বন্ধ হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্তও নাই। এই মরুর মধ্যে বিরাজমান নন্দনকাননে দেখিলাম, আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেয়ারা, বেল, কদলী প্রভৃতি ভারতের সকল প্রদেশের সর্ব্ববিধ ফলবৃক্ষ হৃষ্টপুষ্টভাবে জীবিত রহিয়াছে। গোলাব, মল্লিকা, যূথিকা জবা, করবীর, চাঁপা প্রভৃতি সকল প্রকার ফুলের গাছ সেই উদ্যানের পরম শোভাবিধান করিতেছে। গোলাপ সে সময় এত ফুটিয়াছিল যে, তাহার গন্ধে সমুদয় ক্ষেত্রটি সুরভিত হইতেছিল। মধ্যে একটি নাতিবৃহৎ জলপূর্ণ সরোবর; তাহাতে শ্বেত ও রক্ত পদ্মের কি অপূর্ব্ব শ্রী! মানুষের ভালবাসায় মরুভূমিতে নন্দনকাননের সৃষ্টি হইয়া থাকে; বালির রাজ্যে যে কমলিনী বিকসিত হয়, ইহা কবির কল্পনা নহে, ইহা খাঁটি ধ্রুব সত্য, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে করিতে বিস্ময়বিহ্বল হৃদয়ে আমরা সেই বিচিত্র উদ্যান দেখিয়া রায় বাহাদুরের সঙ্গে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ভোজনসাধন

মনে করিয়াছিলাম, আহারে অসংযমের কথা আর তুলিব না, এইবার রোগের বর্ণনাপত্র দাখিল করিব; পাঠকবর্গকে গত বারে সেই ভাবে প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলাম। কিন্তু পূর্ব্ব-প্রবন্ধে সাধারণ-ভাবে ভোজনবিলাসের যেরূপ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে রোগের মূল-কারণ-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে না। সেই জন্য বাল্যাবধি এ বিষয়ে কোন্ পথে চলিয়াছি, কি ভাবে ভোজনসাধন করিয়াছি, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকবর্গ অবশ্য বুঝিতেছেন যে, ফলারে' ব্রাহ্মণের মনটা যেমন লুচি-মোণ্ডার পাতের চারিদিকে ঘুর ঘুর করে, বর্ত্তমানের ভোগ্য-ভোজ্য-অবর্ত্তমানে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশায় মন-প্রাণ ভরপূর থাকে, এ পক্ষও তেমনি এখনকার এই বেকার অবস্থায় সারাজীবনের ভূরিভোজনের সুখময় স্মৃতি-সহায়ে জীবনধারণ করিতেছেন। এ সকল কথার পুনঃ পুনঃ (ad nauseam) আলোচনায় পাঠকবর্গের বিরক্তির আশঙ্কা আছে (তবে চাই কি, তাঁহাদিগের মধ্যেও তুল্য রাশির লোক সমজদার মিলিতে পারে)—কিন্তু লেখকের বর্ত্তমান দশায় ভোজনসুখের স্মৃতিই যে একমাত্র সম্বল ও অবলম্বন। শাস্ত্রে 'গোব্রাহ্মণ' এক পর্য্যায়ভুক্ত; 'ব্রাহ্মণ-হিতায় চ' ভগবান্ গোজাতির মত রোমন্থনের * ব্যবস্থা করেন নাই বটে, কিন্তু স্মৃতিসাগর মন্থন করিয়া পূর্ব্বানুভূত সুখরূপ বিষামৃত উত্তোলন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনন্ত করুণার, অহৈতুকী মানবপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে কি?

যাক্, আবার আহার-কাহিনী আরম্ভ (কেঁচে গণ্ডূষ') করি। আমার এই ভোজনবিলাস—জন্মলগ্নে যে সব গ্রহনক্ষত্র বিরাজ করিতেছিলেন, অবশ্য তাঁহাদেরই প্রসাদে। কোষ্ঠীখানি খোয়া গিয়াছে (সে কথা আর এক দিন বলিব), নতুবা নিশ্চিত তাহাতেই লিখিত দেখিতাম.—'উদরভরণ-তুষ্টঃ।' তবে সাধারণ লোকে স্থূল দেখে, সূক্ষ্ম দেখে না, সুতরাং তাহারা ওসব আধিদৈবিক কারণ বুঝিবে না, মানিবে না, (আমার মত ঠেকিয়া না শিখিলে) ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করিবে না; অগত্যা লোক-প্রতীতির জন্য আধিভৌতিক কারণই নির্দ্দেশ করি। দর্শনশাস্ত্রের এই পারিভাষিক শব্দটিও হয় তো অনেকের বোধগম্য হইবে না (লেখকেরও শুনিয়া শেখা-মাত্র); অতএব নব্যবিজ্ঞান-সম্মত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল—('environment' অর্থাৎ) 'পারিপার্শ্বিক অবস্থা'। ইহারই প্রভাবে এ অধম বাল্যাবধি খাদ্যবাগীশ; দশচক্রে যেমন 'ভগবান্ ভূত' হইয়াছিলেন, তেমনি ঘটনাচক্রে আমারও এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা। যখন আত্মকাহিনী বলিতে বসিয়াছি, তখন সকল কথাই খুলিয়া বলিতেছি। পাঠক মহাশয় ধৈর্য্যধারণ করিয়া (ফুল হাতে লইয়া) শ্রবণ করুন, এই-মাত্র প্রার্থনা।

ভাগ্যহীন লেখক ৯ মাস বয়সেই মাতৃহীন শিশু। শুনিয়াছি,মাতৃদেবীকে নিদ্রিতাবস্থায় সাপে কামড়াইয়াছিল; আমি সেই একই শয্যায় তাঁহার পার্শ্বে নিদ্রিত ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সাপে আমাকে ছোবলায় নাই। ছোবলায় নাই বটে, শরীরে দংশনচিহ্ন রাখিয়া যায় নাই বটে, কিন্তু (আমার মনে হয়) ভিতরে ভিতরে বিষ সঞ্চারিত করিয়াছিল, হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে দাঁত বসাইয়াছিল, তাহাতেই আমার আশৈশব সমগ্র জীবন বিষময় বিষাদময় হইয়াছে। কেবল অনন্ত দুঃখভোগের জন্যই 'চিরজীবী করিল গোঁসাই।' ইংরেজ কবির ভাষায়, "Hope never comes That comes to all; but torture without end Still urges"—*

* ইংরেজী 'ruminate' শব্দের literal ও metaphorical, শব্দার্থ ও লক্ষ্যার্থ, দুই প্রকার অর্থই আছে। বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্য যে, 'রোমন্থন' শব্দের শুধু (literal) শব্দার্থটাই আভিধানিকেরা ধরেন। ইংরেজী ভাষার দুইটি অর্থ কি অনুকূলের—মরপুরুষের—ভাষা বলিয়া ঘটিয়াছে?—ইতি ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টিপ্পনী।

* মাতৃভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াও রাজভাষায় রচিত পুস্তক ভুলিতে পারি না। সর্পাঘাতের প্রসঙ্গে ইংরেজী ভাষায় মার্কিণ লেখকের রচিত একখানি নভেলের (Breakfast Tableএর খ্যাতনামা লেখক Holmesএর "Elsie Venner"এর) নাম মনে পড়িল। নায়িকা যখন মাতৃগর্ভে, তখন বিষধর-সর্প-দংশনে মাতার মৃত্যু হয়। এই বিষ জ্রণের রক্তে সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যতে কি প্রভাব বি[illegible] করিয়াছিল, উল্লিখিত পুস্তকে তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বৃত্তান্ত আছে। ইংরেজীনবীশ পাঠককে বক্ষ্যমাণ নীরস বিবরণ পর উক্ত উপাদেয় পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ রহিল।

নাঃ, আর এ করুণ সুরে সহৃদয় পাঠককে বিব্রত করিব না। পিতামহী ঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছি, আমার জন্মবর্ষে গ্রামে 'ছেলের জাহাজ' আসিয়াছিল, অন্ততঃ ৫।৬ ঘরে ভাগ্যবতী জননীরা পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। সুতরাং গ্রামে দুগ্ধবতী নারীর অভাব ছিল না; কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর মুহূর্ত্ত হইতেই আমি কোনও মাতৃস্থানীয়ার স্তনে মুখ দিই নাই—স্তন্যসুধাপান তো দূরের কথা; কৃষ্ণকায় শিশু সকল দুগ্ধবতী নারীকেই পুতনা-বোধে বর্জ্জন করিয়াছিল কিনা, বলিতে পারি না।

এ অবস্থায় গোদুগ্ধই সম্বল। মাতামহদেব সে অনুষ্ঠানেরও ত্রুটি রাখেন নাই। দুহিতা দেহরক্ষা করিলে দৌহিত্রের প্রাণরক্ষার জন্য সবৎসা গাভী দান করিয়াছিলেন। (মেলিন্‌স্ ফুড্ বা গোয়ালিনী-মার্কা গাঢ় দুগ্ধ তখনও এ দেশে ব্যবহারে আসে নাই।) শুধু গোদুগ্ধের উপর নির্ভর না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র শিশুকে ডাল-ভাত ধরান কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বংশের প্রথম সন্তান, তাহাতে আবার মা-হারা, এ জন্য 'ঠাকু-মা'র পরম-আদরের ধন; সুতরাং শিশুকে ভুলাইবার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র ডালভাতের নহে, এমন কি, মুড়কী-মোয়ারও নহে, একেবারে গোল্লা-মোণ্ডার ব্যবস্থা হইল। (তখনকার দিনে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে, বিস্কুট লজেঞ্জুস্ প্রভৃতি বিষময় খাদ্যের যোগান হয় নাই।) সন্দেশ হাতে পাইয়া শিশু বোধ হয় মাতৃবিয়োগ-দুঃখও ভুলিল। ফলতঃ অবস্থার গতিকে অথবা অভিভাবক-অভিভাবিকার বিবেচনার অভাবে (?) ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের উপদিষ্ট 'শৈশবে সংযমে'র নিয়ম অনুষ্ঠিত হইল না। ইহার ফল শিশুর ভবিষ্যৎজীবনে কিরূপ ফলিয়াছে, পাঠক তাহার পরিচয় পূর্ব্ব প্রবন্ধেই পাইয়াছেন। শুনিয়াছি, শৈশবে রাত্রে শয়নকালে শিয়রে সংক্রান্তি—শ্রীবিষ্ণুঃ—সন্দেশ অর্থাৎ যোড়ামোণ্ডা রাখা দেখিয়া মন ঠাণ্ডা হইলে তবে নিদ্রা যাইতাম; এবং প্রভাতে শয্যাত্যাগ না করিয়া সেই মোণ্ডা যোড়াটির দর্শন-স্পর্শন-ভক্ষণ-ব্রহ্মণ-সুখ উপভোগ করিয়া তবে প্রাতঃকৃত্যে অবহিত হইতাম।

লালনের বয়স পার হইয়া যখন বিদ্যালাভে ব্রতী হইলাম, মাতৃভাষার বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করিলাম, তখন স্বগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অপর একটি গ্রামে পিতৃদেব (তথায় ইংরেজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) পাঠের সুবিধার জন্য আমাকে লইয়া গেলেন; তথাকার জমিদার-গৃহে পরিবারস্থ বালকের ন্যায় আশ্রয় পাইলাম। কিন্তু সেই গ্রামে বিলাতী সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ইংরেজী স্কুল থাকিলেও সন্দেশের দোকান তেমন সুবিধামত ছিল না এবং দোকানে যে সন্দেশ প্রস্তুত হইত, তাহা ধর্ম্মদা-মুড়াগাছার কাঁচাগোল্লা দেদোমোণ্ডা-খেগো মুখে রুচিত না। তাই যাহাতে প্রবাসে মন বসে, সেই জন্য পুত্রবৎসল পিতৃদেব মা-মরা ছেলের মুখ চাহিয়া উচিতমত ব্যবস্থাও করিলেন। যখন মাতৃস্থানীয়া 'ঠাকু-মা'কে ছাড়িয়া যাওয়ার সব ঠিকঠাক হইল, তখন সহর্ষে দেখিলাম, দুই জন বাহক নিযুক্ত হইয়াছে, একের স্কন্ধে বিদ্যার্থী প্রবাসগামী বালক, অপরের স্কন্ধে যোড়ামোণ্ডার 'তোলো' হাঁড়ী! গোবৎসকে যেমন ঘাসের বা বিচালীর আঁটি দেখাইয়া সহজেই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, এই ব্রাহ্মণ-বটুকে সেইরূপ সহজেই সন্দেশের হাঁড়ী দেখাইয়া প্রবাসে লইয়া যাওয়া গেল। সাধে কি শাস্ত্রকারেরা গোব্রাহ্মণ একপর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন? দীর্ঘপথে বাহকদ্বয় মধ্যে মধ্যে ভার বদল করিয়া লইত (একটানা মিষ্টান্নের ভার-বহনও যে তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়); জীব-বিশেষ যেমন চিনির ভার বহন করিয়াই জীবন সার্থক করে, তাহারাও তেমনি মিষ্টান্নের ভার বহন করিতে পাইয়া নিজ নিজ অদৃষ্টের বহুমান করিয়াছিল সন্দেহ নাই, ভারের অদলবদল করাতে কেহ কাহাকে হিংসা-দ্বেষও করে নাই! (প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাহকদ্বয়ের কেহই জল-আচরণীয় জাতির ছিল না, আর অধিক ভাঙ্গিলাম না—তবে অনুপনীত বালকের পক্ষে এরূপ অনাচারে বোধ হয় দোষ নাই।)

প্রবাসেও সেইরূপ শিয়রে সন্দেশ সঞ্চিত থাকিত ও যথা-নিয়মে 'বাল্যভোগ' সমাধা হইত। * মোণ্ডাও কি ছাই

* ইংরেজীতে বার্দ্ধক্যকে দ্বিতীয় শৈশব ('Second Childhood') বলে। আমার অকালবার্দ্ধক্যে দেখিতেছি, সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। গত বর্ষে আমাশয়-উদরাময় প্রভৃতির উপশমান্তে সহৃদবিবেচক কবিরাজ মহাশয় সেই বাল্যের ন্যায় দিনান্তে এক যোড়া করিয়া সন্দেশ বরাদ্দ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। (প্রভেদের মধ্যে এই যে, জীবনপ্রভাতে প্রাতে সন্দেশ জীবনসন্ধ্যায় অপরাহ্ণে সন্দেশ।) বর্ত্তমান বর্ষেও সদাশয় ডাক্তারবাবু তাহাই বাহাল রাখিয়াছিলেন, তবে নানা রোগের (bacillus) জীবাণুর ভয়ে বাজারের সন্দেশ নিষেধ করিয়া ছোয়ে (whey) বা ছানার জলের অবশিষ্ট ছানা

তখনকার দিনে অসম্ভব সস্তা ছিল, চারি আনা সের—অবশ্য 'রাশি' সন্দেশ তথা কাঁচি সের। এই সস্তার গুণেই গরিব স্কুল-মাষ্টার অক্লেশে পুত্রটির জন্ম যোড়ামোণ্ডার রোজ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনেক ইংরেজীনবিশ একটি সুবিদিত সংস্কৃত শ্লোকের অন্তিমচরণ ধরিয়া মিষ্টান্নকে 'ইতর' লোকের * খাদ্য বলিয়া ঘৃণা করেন। † কিন্তু ইংরেজীনবিশ পিতার ইংরেজীনবিশ পুত্র হইয়াও এই অধম ঘোর কলিকালে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে; বরং আশৈশব সন্দেশভোজনের অভ্যাসবশতঃ লেখকের সন্দেশ-প্রীতি সারাজীবন ধরিয়া ('হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব') বাড়িয়াই গিয়াছে। তবে আর এখন সে অগ্নির তেজ, সে পরিপাকশক্তি নাই; এইখানেই যত গোল ('There's the rub')। যাহারা মৎস্য-মাংসে আসক্ত, তাহারা নাকি মিষ্টান্নে রাজী নহে, এইরূপ একটা কথা শুনিতে পাই; কিন্তু আমি যৌবনকাল হইতে মৎস্য-মাংস বনাম পায়সপিষ্টক সন্দেশমিঠাই উভয় পক্ষের প্রতি (মিষ্টান্নের উপর বংশগত ঝোঁক থাকিলেও) অপক্ষপাতে

হইতে গৃহে প্রস্তুত সন্দেশ আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর ততটা সাবধানতার আবশ্যকতা নাই। তাই দোকান হইতেই সন্দেশ সরবরাহ হইতেছে। 'বামুনে কপাল'-সত্ত্বেও অদৃষ্ট-দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন, দূরের গঙ্গা কাছে আনিয়াছেন মুড়াগাছার দুইটি দোকান আমাদের গলির কাছেই মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে স্থাপিত হইয়াছে। মালও ভাল, দরেও সস্তা (কলিকাতার বাজারদরের তুলনায়)। তবে শৈশবের সে চারি আনা সের এখন কবিকল্পনায় দাঁড়াইয়াছে, এক শিকিতে দূরে থাকুক, এখন পাঁচশিকায়ও এক সের পাওয়া যায় না (দেড় টাকার কম সের মিলে না)।

* বলা বাহুল্য, 'ইতর' শব্দের ওরূপ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। তথাপি পাছে পাঠক লেখকের বিদ্যার দৌড়-সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়া বসেন, তাই এটুকু বলিয়া রাখিলাম। মাষ্টারের ভুল ধরিতে পারিলে যে অনেকে মহা খুসী।

† এই জন্যই কলিকাতায় দেখিতে পাই, 'যজ্ঞিবাড়ী' সন্দেশ খুবই কম খরচ হয়—আমাদের পল্লীগ্রামের খরচের তুলনায়। যে সময়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'এর পালা, সে সময়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-অজীর্ণ-অম্বলের অজুহতে, আমাদের মত সদ্‌ব্রাহ্মণ ২।৪ জন ছাড়া, সকলেই হাত তোলেন, নিতান্ত উপরোধে পড়িলে আম-সন্দেশ বা তালশাঁস নখে খুঁটিয়া একরত্তি মুখে দিয়াই ইতি করেন। একবার এমন দৃশ্যও দেখিয়াছিলাম যে, লুচী-ছকা, ডাল-ডালনা, পোলাও-কালিয়া, কোর্ম্মা-কোপ্তা, চপ্-কটলেট, কচুরী-পাঁপর, হালুয়া-চাটনী ও দধির পর যেই সন্দেশ পরিবেষণ সুরু হইল, অমনি সকলে একযোগে হাত না তুলিয়া একেবারে পা তুলিলেন; অভাগা এ পক্ষ কেবল হংসমধ্যে বকো যথা' হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রহিলেন। (এতেতেও কিন্তু ভীম নাগের এবং 'ভক্ত আতা'র—অর্জ্জুনের!—সন্দেশের দর সমানই চড়া, ১৬০৲ টাকা মণও নাকি 'লগনসায়' হয় শুনি)।

সুবিচার করিয়াছি, * এ কথা হলফ করিয়া বলিতে পারি—শ্রীবিষ্ণুঃ—'সৃষ্টা সখে দিব্যমহং করোমি যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্।' স্বীকার করি, ইদানীং মাংসভক্ষণে ততটা আগ্রহ নাই; তবে সেটা বয়সের দোষে রুচিপরিবর্ত্তনে বা প্রবৃত্তিনিবৃত্তির কারণে ('প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা') যতটা না হউক, স্খলিত ও শিথিল দন্তের দরুণই ঘটিয়াছে।

এই মিষ্টান্নপ্রিয়তা বোধ হয় ঠিক আমার নিজস্ব বৃত্তি বা প্রবৃত্তি নহে। শুনিয়াছি, জনৈক পূর্ব্বপুরুষ এতদূর সন্দেশখোর ছিলেন যে, ময়রার দেনাশোধ করিতে শেষটা সমস্ত 'ব্রহ্মোত্তর' সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি এই মায়াময় সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মোত্তর বিষয়ের মায়া কাটাইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে ব্রহ্মলোক ('মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা' ব্রহ্মপদে প্রবেশ) লাভ করিয়াছেন কি ইহলোকে গোল্লাগ্রাস করিবার পর কালগ্রাসে পতিত হইয়া পরলোকে গোলোকধামে গমন করিয়াছেন, তাহার সঠিক সংবাদ রাখি না। (এ ক্ষেত্রে যদি কেহ বলেন যে, তিনি গোল্লা গিলিয়া গোল্লায় গিয়াছেন, তবে তাঁহাকে পাল্টা জবাবে বলি, গাঁজাগুলি, মদ্‌ভাঙ খাইয়া ও তদানুষঙ্গিক উপসর্গে জমিদারি বা মজুত টাকা উড়ানর চেয়ে ইহা লাখো গুণে ভাল নহে কি?) কয়েক পুরুষ পরে আমার প্রকৃতিতে এই দোষ (?) অর্শান বৈজ্ঞানিকের atavismএর সুন্দর দৃষ্টান্ত। পূজ্যপাদ পিতৃদেব যতটা পরমান্নভক্ত, ততটা মিষ্টান্নভক্ত নহেন। শুধু পিতৃদেব কেন, বংশের বোধ হয় সকলেই পরমান্নের পরম ভক্ত। আমার মনে হয়, অন্তিম অবস্থায় যে সময়ে নাড়ী পাওয়া যায় না, সে সময়ে মৃগনাভি-মকরধ্বজ-সূচিকাভরণ সেবন না করাইয়া যদি কেহ পায়সের পূর্ণপাত্র হাতে দেয়, তাহা হইলে আবার নাড়ীর সঞ্চার হয়। ইদানীং ইংরেজী বিদ্যা পেটে পড়াতে বংশের কাহারও কাহারও পেটে পায়স সহে না। আমি ইংরেজী বিদ্যা উদরস্থ করিলেও বাপের কুপুত্র

* তবে ৺অন্নপূর্ণা যদি এক হস্তে পায়স-সন্দেশ ও অপর হস্তে মৎস্য-মাংস লইয়া শুধু এক হস্তে স্থিত আগাথা নির্ব্বাচন করিতে বলেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক প্রকৃতিই জয়লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের গর্দ্দভরত্নের মত দোনো পাল্লা ভারী বলিয়া অস্থিতপঞ্চকে পড়িয়া মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া উপবাসী থাকিব না, এ ভরসা আছে।

নহি। বরং উভয় ধারাই বজায় রাখিয়াছি অর্থাৎ গডাচর চণ্ডে্র 'ডুডও খাই টামাকও খাই'এর মত রেকাবীভরা সন্দেশও সানন্দে শেষ করি, বাটিভরা পরমান্নও পরমানন্দে পার করি। সৌভাগ্যক্রমে, মা-সরস্বতী ও মা-লক্ষ্মী উভয় সপত্নীতে 'আপোষ' করিয়া এই অধীনের প্রতি যেটুকু কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন, তাহার প্রভাবে দেউলিয়া হইতে হয় নাই, এ জন্য তাঁহাদিগের চরণে বার বার প্রণাম করি।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। আবার বাল্যলীলার কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মথুরা হইতে বৃন্দাবনে নীত হইয়া ক্ষীর-সর-নবনীত দধি-ছানা-মাখন খাইয়া * দিন দিন শশিকলার ন্যায় ('কালো শশী') বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ স্বগ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নীত হইয়া, প্রাতে যোড়ামোণ্ডার মুখপাত এবং দুই বেলা চাষের মোটা চাউলের ভাত, খোসাসমেত কাঁচা কলাইএর ডা'ল, খাঁটি বল্কা দুধ ও টাটকা-তৈয়ারি ঘী খাইয়া 'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা'—মসী-লেখাই বটে—নবনীলনীরদমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলাম। 'শব্দুপাঠে'র নীলীভাণ্ডপতিত শৃগালের মহারণ্যে সিংহাসনে সমাসীন রাজরাজেশ্বর-মূর্ত্তিও তাহার কাছে হারি মানিল।

আমকাঁঠালের সময় এই শাদামাটা আহারের বিলক্ষণ বৈচিত্র্য সংসাধিত হইত, আর জমিদারবাড়ীতে 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণে' আহারের প্রকৃষ্ট প্রকার পারিপাট্য ঘটিত। চৈত্রসংক্রান্তিতে দধিগুড় দিয়া ছাতু মাখিয়া খাইয়া নিয়ম-রক্ষা করার পর জমিদার মহাশয়ের দরাজ হাতের আঁজুল আঁজুল নালী ক্ষীর ও ধর্ম্মদার বাজার হইতে আমদানী ভাল ভাল কাঁচাগোল্লায় উদরপূর্ত্তির কথা এখনও আবছায়ার মত মনে পড়ে।

আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবাস-জীবনের বিবরণ শেষ করিব। উপনয়নের পর এক বৎসর একাদশী করিতে হইয়াছিল; তথায় তাহার বিধিব্যবস্থা বড় সুন্দর ছিল। যাঁতায় ভাঙ্গা ঘরের ময়দার (অর্থাৎ আটার) গরম গরম রুটি (তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে শ্রাদ্ধাহে ও বিবাহের রাত্রিতে ছাড়া লুচির চল ছিল না), তরকারীর মধ্যে আলু-ভাজা বা পটোলভাজা বা বেগুনভাজা থাকিত; এখনকার মত শাকভাজা ছকা ডাল ডালনা প্রভৃতির বিধি ছিল না; কিন্তু এ সবের অভাব পূরণ করিত সদ্যঃপ্রস্তুত তরল ও ঈষদুষ্ণ ঘৃত—ডালের মত বাটিতে করিয়া দেওয়া হইত, তাহাতেই রুটি ডুবাইয়া ডুবাইয়া খাওয়ার নিয়ম ছিল। এখন মনে করিলেও বোধ হয় পেট গড়গড় করে, কিন্তু সে বয়সে অবলীলাক্রমে উহা হজম করিতাম। দুই বেলা ঘরের গরুর খাঁটি দুধের অবশ্য ব্যবস্থা ছিল, মিষ্টান্ন ও ফলেরও ত্রুটি ছিল না—বিশেষতঃ গৃহপার্শ্বস্থ বাগানের সুপক্ক মর্ত্তমান রম্ভার।

এই ভাবে প্রবাস-জীবন যাপন করিয়া মাইনার পাশ করিয়া স্বগ্রামে আসিয়া বসিলাম এবং গ্রাম হইতে মাইল খানেক দূরবর্ত্তী গ্রামান্তরের এন্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন আর বাল্যভোগের প্রয়োজন ছিল না, সকাল সকাল স্কুলের ভাত খাইয়া গ্রামের এক ডজন ছেলে দল বাঁধিয়া রওনা হইতাম। তখনকার দিনে ড্রিলশিক্ষা দেওয়া হইত না, তাহা হইলে সৈন্যের ন্যায় মার্চ্চ করিতে পারা যাইত। ধানের ভুঁইএর আ'লে আ'লে সারি বাঁধিয়া ভুজগগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে হইত। বৈকালে ফিরিয়া (এবং ছুটির দিনে স্নানান্তে) মুড়ি ও কাঁচাগোল্লা ধ্বংস করা যাইত; সময় সময় মুড়ির সহিত অনুপান শশা বা মূলা (বা কচিৎ ঝুনা নারিকেল) থাকিত; কখনও বা আখের বা খেজুরের ঝোলা গুড় অথবা চাকের টাটকা-ভাঙ্গা মধু মাখিয়াও মুড়ি খাওয়া হইত! ফুটী ফাটিলে গুড়-মুড়ির বদলে ফুটী-গুড় গিলিয়া মুখ বদলান যাইত। আম-কাঁঠাল পাকিলে আহারের ঘুৎটা খুবই হইত। দেবভাষায় অমৃত-ফল নামে অভিহিত হইলেও আম আমার সে সময়ে তত প্রিয় ছিল না, কিন্তু স্নেহময়ী ঠাকুরমাতার প্রদত্ত ক্ষীর ও খাজা কাঁঠাল বৈকালে প্রচুর-পরিমাণে উদরসাৎ করিতাম; রাত্রে আবার ভাতের পাতে ঘন দুধের সহিত কাঁঠালের রসের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিত। (পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতামহদেবের কৃপায়—'মাতা মনু'র মত মাতা মহাদেব পড়িবেন না—ঘরে মা ভগবতী বাঁধা ছিলেন।) বয়সের ও পল্লীগ্রামের জলহাওয়ার গুণে এই দুষ্পাচ্য দ্রব্যের

---

* বৃন্দাবনে গয়লা ছিল, কিন্তু ময়রা বোধ হয় ছিল না; সুতরাং গোপালজী যোড়ামোণ্ডার মুখ বোধ হয় দেখিতে পান নাই, বড় জোর ক্ষীরের লাড্ডু খাইয়া লাড্ডুগোপাল সাজিয়াছিলেন।

পেটের কোন গোলযোগ ঘটাইত না। ইহা ছাড়া বাগানে বাগানে কালো জাম গোল্লাপজাম জামরুল লিচু খাওয়ার অভ্যাসও ছিল; সময়ের ফল ডাঁশা পেয়ারা ও টোপা কুল, এমন কি, বিলাতী আমড়ারও সদ্গতি করা যাইত; একবার ডাঁশা বিলাতী আমড়া এক কুড়ি সাবাড় করিয়াছিলাম বেশ মনে আছে; তবু গাছে উঠিতে জানিতাম না, শুধু তলার কুড়াইয়াই কায সারিতে হইয়াছিল। এখন আধখানি চিবাইলে দাঁত টকিয়া যায়, গিলিলে পেট কামড়ায় ও উদরভঙ্গ হয়। হায় রে সে দিন!

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে স্বগৃহে ও পরগৃহে চিড়ার ফলারটা বেশ জমিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লুচির ব্যাপার শ্রাদ্ধাহে বা বিবাহ-রাত্রিতে ভিন্ন ছিল না। সে ক্ষেত্রেও তখনকার দিনে লুচির পাতে এক (অলবণ) বিলাতী কুমড়া-মটর-আলুর 'ঘাঁট' ছাড়া অন্য তরকারীর রেওয়াজ ছিল না, ক্ষীর বঁদে বা ক্ষীরগোল্লার সহিত মাখিয়া দিস্তা দিস্তা লুচি (যেন যাদুমন্ত্রবলে) উড়িত। এখনকার পাঠকের—বিশেষতঃ সহুরে অম্লরোগীর—বোধ হয় শুনিয়াই হৃৎকম্প হইবে। ঘীয়ে চর্ব্বির ভেজালের কথা প্রথম যখন রাষ্ট্র হয়, তখন পল্লীগ্রামের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-সমাজে ধর্ম্মরক্ষার জন্য লুচির 'পাকা' ফলার বরতরফ হইয়া সাবেক চিড়ের 'কাঁচা' ফলার বাহাল হইয়াছিল, সরু চিড়ে জলে ধুইয়া ফেলিয়া দুধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে 'শুকো' দৈ অথবা 'নালী' ক্ষীর মাখিয়া কাঁচাগোল্লা দিয়া ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে যে কি উপাদেয়, তাহা সহরবাসী চপ্-কট্‌লেট্-অম্‌লেট্ ডেভিল্-ভোজী ইয়ং বেঙ্গলকে বুঝান অসম্ভব।

পূজার সময় গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণে আহারের চর্চ্চাটা সুচারুরূপেই হইত। তবে সে সময়ে ছানা দুর্ম্মূল্য বলিয়া মিষ্টান্নের ব্যবস্থা—(নারিকেলের) রসকরা ও (বেসমের) 'পক্কান্ন' অর্থাৎ কলিকাতার উড়িয়া-দোকানের কট্‌কটে! ইহাই সকলে পাল্লা দিয়া গণ্ডায় গণ্ডায় গলাধঃকরণ করা যাইত! প্রবীণেরা স্নানান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপবাসী (?) থাকিতেন; নিমন্ত্রণ যদিও মধ্যাহ্ন-ভোজনের—কিন্তু ভোজ আরম্ভ হইত অপরাহ্ণে, দুইঘণ্টাব্যাপী আহারান্তে আচমনের সময়ে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা হইত! এ অবস্থায় প্রবীণেরা প্রবল ক্ষুধার তাড়নায় ভাতের রাশি—ডাল তরকারী মাছ মাংস দিয়া চাঁচিয়া পুঁছিয়া খাইয়া * দধি-পায়স হাঁড়ী হাঁড়ী ও রসকরা-পকান্ন থালা থালা উদরস্থ করিতেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। একেবারে রেক্তার গাঁথনি, তাহার উপর পঙ্খের কায! আমরা বালকের দল দুপুরে রওনা হইবার আগে চুপি চুপি চারিটি ভাত (আধপেটা করিয়া) খাইয়া লইতাম, নিমন্ত্রণ-গৃহে গিয়া ভাত-তরকারী 'নমো নমঃ' করিয়া সারিয়া শেষ-রক্ষাটা দস্তুরমত ভাল করিয়াই করিতাম।

জন্মাষ্টমী বা শিবরাত্রির পারণ-উপলক্ষে 'জল' খাইতে নিমন্ত্রিত হইয়া সন্দেশ-রসগোল্লা সেরকে-সের উজাড় করা গিয়াছে, পৌষপার্ব্বণ-উপলক্ষে রাশীকৃত ভাজা-পুলি সরু-চাকুলি (আস্কে-পিঠে ভাপা-পুলির দিকে বড় ঝোঁক ছিল না) নূতন গুড়ের বাটিতে ডুবাইয়া পাচাড় করা গিয়াছে। পল্লীসুলভ সুখাদ্যের মধ্যে কেবল তালের বড়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারি নাই। (ফাঁকতালে একটা কথা বলিয়া রাখি, রসিক পিতার রসিক পুত্র ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী আমার এই অপ্রবৃত্তি-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন 'বেতালা লোক যে, তাই তালে ফাঁক যায়!') পালে-পার্ব্বণে, 'বচ্ছরকার দিনে,' মনসাপূজার আটভাজা (বিশেষ করিয়া তিলভাজা কাঁঠালবীচি ভাজা) ও চা'ল-ভাজার ফলার (সোঁদা গন্ধ-টুকুতে প্রাণ কাড়িয়া লইত), অরন্ধনের দিন 'বাসিপান্তা' 'টক্-টক্ ব্যঞ্জন', সরস্বতী-পূজার দিন খিচুড়ীভোগ, শীতলা ষষ্ঠীতে 'গোটা'-সিদ্ধ শিম-বেগুন-সিদ্ধ (খাঁটি সর্ষপ-তৈল ও লবণ-লঙ্কা-যোগে,) দোলের সময় ফুটকড়াই-মুড়কী মঠ ও তেলে-ভাজা ছোট ছোট জেলাপী (পয়সা যোড়া), চৈত্র-সংক্রান্তিতে দধিছাতু প্রভৃতি 'যখনকার যা তখনকার তা' সুবোধ বালক গোপালের মত নির্ব্বিচারে নির্ব্বিকারে উদরস্থ করা গিয়াছে। ফলতঃ পাঠক যেন বুঝিয়া না বসেন যে, কবিরা যেমন শুধু চাঁদের আলো ও 'মলয়া হাওয়া', কোকিলের কুহুস্বর ও ফুলের মধু খাইয়াই বাঁচিয়া থাকেন, তেমনি লেখক শুধু গোল্লামোণ্ডা খাইয়াই প্রাণধারণ করিতেন। বস্তুতঃ উদারচিত্তে উদরগর্ত্তে ভালমন্দ সকল খাদ্যই সাদরে

* মাংস নাম-মাত্র, তবে মহাপ্রসাদের 'কণিকা'ই ভক্তের পক্ষে যথেষ্ট। মাছের বেলায় তেমনি পোষাইয়া লওয়া হইত। শুধু মুখে (ভাতের গ্রাসের সঙ্গে নহে) দশ-বিশ খানা রুইমাছ অনেককে পার করিতে দেখিয়াছি।

গৃহীত হইত এবং বিনা-আয়াসে জীর্ণও হইত। আর আজ!—

দৈনন্দিন আহারে আবার এ সব বাহুল্যও ছিল না—মাংস-* ভোজন তো কেবল দুর্গাপূজার তিন দিন ও কালীপূজার রাত্রে ঘটিত, গৃহস্থ-ঘরে মৎস্যেরও ঢালাও বন্দোবস্ত থাকে না। আর সে সময়ে কাঁটার ভয়ে ওদিকে বড় ঘেঁসিতাম না (অবশ্য গলদা চিংড়ি বাদে)। ভরশা ছিল ডাল ভাত ভাতেপোড়া ভাজা ও হাব্‌জা-গোবজা তরকারী—আর অবশ্য দুধ দই ও ভাতের পাতে ঘী। তরকারী তখনকার কালে পছন্দ করিতাম না, ভাজা ও ডা'ল দিয়াই ঠাসা এক থালা ভাত উঠিত। ভাজার মধ্যে প্রিয় ছিল বিলাতী কুমড়া-ভাজা—† ২০।২৫ খানা। অর্দ্ধাঙ্গিনীর মুখে শুনি,এক দিন নাকি গোটা একটা বিলাতী কুমড়া শেষ করিয়াছিলাম। বোধ হয়, কুমড়াটাও ছোট ছিল এবং কথাটাও একটু বাড়ান। ডা'লটা খাইতাম অতিরিক্ত, বড় বাটির ভরা এক বাটি। (প্রোটিডের পক্ষপাতিগণ কথাটা লক্ষ্য করিবেন।) এখনও ডা'লে অনুরাগ অটুট আছে, তবে বয়সের (inverse ratio) বিপরীত-অনুপাতে একসেরা বাটির বদলে পোয়াভর পেয়ালার চল হইয়াছে। রোগমুক্তির প্রথম অবস্থায় ডাক্তার বাবু সামান্য পরিমাণ ডালের যুষ ব্যবস্থা করায় মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। যাক্, এখন আর সে নিক্তির ওজন ও 'জলবৎ তরলম্' নাই। ডালের মধ্যে বিউলি, ভাজা-কলাই ও ভাজা অরহর অতি প্রিয় ছিল। প্রথমটির 'সহযোগেন অন্নং চলতি পঙ্কবৎ'; দ্বিতীয়টিতে মূলা ও তৃতীয়টিতে কাঁঠালবীচি পড়িলে আরও মজিত। সোনামুগের অঞ্চলের লোক হইলেও বহুকাল মুগের ডালে অরুচি ছিল। পাঠক হয় তো বলিয়া বসিবেন—সোনামুগ ফেলিয়া কালো কলাইএর প্রতি টান সবর্ণপ্রীতির প্রমাণ। কিন্তু প্রকৃত কারণটি তাহা অপেক্ষাও হাস্যকর। যখন ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগিতাম, তখন ঔষধের ব্যবস্থা হইত—ক্যাষ্টর অয়েল ও কুইনিন, আর পথ্যের ব্যবস্থা হইত সাগু মিছরি ও ফুলকো রুটি, পলতামুক্ত, মুগের ডালের যুষ। ঔষধপথ্য সব কয়টিকেই এক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছিলাম, তাই অভ্যাস-দোষে মুগের ডাল রুটি মিছরিতেও পল্‌তা কুইনিন ক্যাষ্টর অয়েলের স্বাদ-গন্ধ পাইতাম—ফলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ তিনটি খাদ্য দেখিলেই বিতৃষ্ণা জন্মিত; এখন অবশ্য সোনামুগের সুস্বাদের তারিফ করি এবং বৎসর বৎসর দেশ হইতে আমদানী করি; কিন্তু এখনও রুটির উপর সমান নারাজ আছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত, ম্যালেরিয়ার মর্ম্ম না বুঝিলেও, রুটির উপর হাড়ে চটা। ইহা কি (heredity) বংশানুক্রমের দরুণ?

ছাত্রজীবন তখনও শেষ হয় নাই, যৌবনেরও আরম্ভ হয় নাই, এমন সময়ে বিদ্যালাভের জন্য আবার প্রবাস-যাত্রা করিতে হইল; এই প্রবাসকাহিনী বারান্তরে বলিব—পাঠক একটু হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচুন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* সেই 'দুল ভং স্বল্পং ছাগমাংসং' পরিমাণে বাড়াইবার জন্য তাহার সহিত ছোলা-ভিজা দেওয়া হইত। আমার অনেক দিন পর্য্যন্ত ধারণা ছিল, ছাগশিশু বলিদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ছোলা-ভিজা খাইয়াছিল, তাহাই অবিকৃত ছিল, মাংসের সঙ্গে রান্না হইয়াছে।

† বিলাতী কুমড়ার প্রতি এতটা প্রীতি বোধ হয় ইহার মিষ্টতার জন্য। (বরিশালে এই জন্য ইহাকে 'মিঠা কুমার' বলে।) যেমন মধুর অনুকল্প গুড়, তেমনি নিত্য আহারে সন্দেশের অনুকল্প এই কুমড়া-ভাজা ছিল।

স্মৃতি

গান হয় শেষ তবু কানে বাজে সুর,
মলিন কুসুম দেয় ঘ্রাণ সুমধুর।
গোলাপ পাপড়িগুলি শুকালে গোলাপ
প্রিয়জন-পাশে থাকি' শোনে প্রেমালাপ
যদিও গিয়াছ প্রিয়ে কোলে মরণের
স্মৃতিটুকু রবে গাঁথা চির-জীবনের।
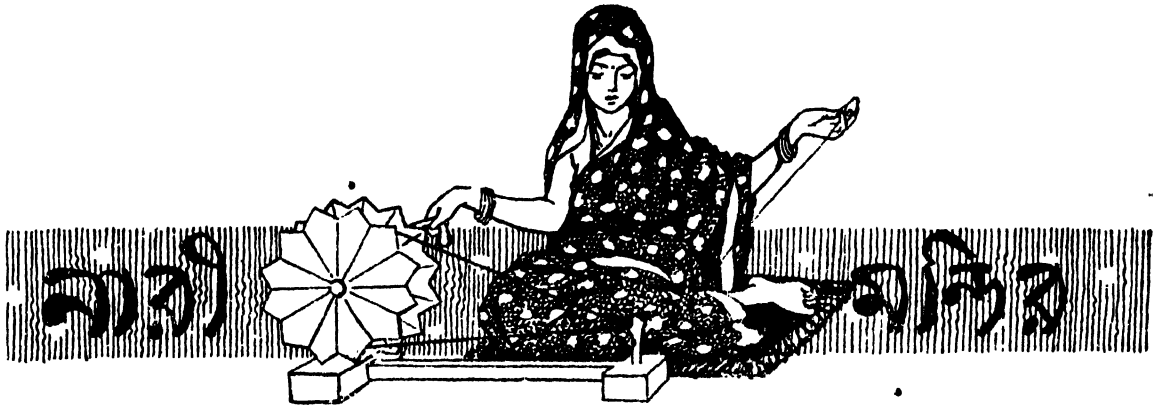
সমাজে নারীর স্থান

২

সকল দেশের সকল সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার পরিমাপ সমান নহে, হইতে পারে না। স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে বিভিন্নতা দেখা যাইবেই, এ কথা সকলেই জানে।

ফরাসী দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত 'স্যালিক ল' বিদ্যমান ছিল। ঐ আইন অনুসারে ফরাসী দেশে নারী কখনও সিংহাসনের অধিকারিণী হইতে পারিত না। কিন্তু এ দেশে আর্য্যনারীদের ত কথাই নাই, পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাব হইলে সিকিমের মত অনার্য্য দেশেও নারী বহুকাল হইতে সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-ভারতে নেয়ার, তায়ার ও নম্বুরী-দের মধ্যে নারীরা বহু বিবাহ করে এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। পুরুষ এই শ্রেণীর নারীকে বিবাহ করিয়া পত্নীর পরিবারে আশ্রয় লাভ করে। আবার মুসলমান নারীরা সম্পত্তির সমান অংশীদার হইয়া থাকেন।

তবেই বলা যাইতে পারে, সিকিমের নারী, দাক্ষিণাত্যের নেয়ার নারী অথবা মুসলমান নারী, ফরাসী নারীর অপেক্ষা অধিক অধিকার উপভোগ করিয়া থাকে; অতএব ফরাসী নারী অপেক্ষা ইঁহাদের সমাজে স্থান অনেক উচ্চে। কিন্তু এ কথা প্রতীচ্য ত স্বীকার করিবেনই না, পরন্তু এ দেশের শিক্ষিতরাও মানিবেন না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। সিকিমের রাণীর মস্তকের মূল্যবান্ মুকুট মুক্তা দিয়া নির্ম্মিত। তাঁহার কর্ণে মহামূল্যবান্ মণিময় কুণ্ডল; কণ্ঠহার মূল্যবান্ হীরক-জহরতে এবং স্বর্ণ ও কাচ-পলায় প্রস্তুত। তাঁহার বস্ত্র স্বর্ণখচিত। তাঁহার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইবে, তাঁহার মনে কোনও অসন্তোষ নাই, কোনও আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত নাই। ঠিক এই ভাবের সন্তোষ ও অধিকারের গর্ব্ব চিত্রের উত্তরপশ্চিম

সিকিমের রাণী

প্রদেশীয়া সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার মুখেও ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারও অঙ্গে মণিমুক্তাখচিত মহামূল্য অলঙ্কার ও বসন-ভূষণ। তাঁহার বাঁদীর মুখেও প্রভুপত্নীর অহঙ্কারের রেখা আংশিক বিকসিত হইয়াছে। আবার এই চিত্রাঙ্কিত মাড়োয়ারী মহিলার বহুমূল্য অলঙ্কার বোধ হয় কোনও রাজারাজড়ার কোষাগারে আছে কি না সন্দেহ। যুবতী এই অলঙ্কারভারে বিন্দুমাত্রও অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই, বরং ইহাতে পরম তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন।

সোনার পিঞ্জরে আবদ্ধা শারীর মত ইঁহারা চানা-জল পাইয়া যেমন সন্তোষ অনুভব করিতেছেন, ঐ যে কুলীরমণী এক মণ মাল পিঠে লইয়া সানন্দে পথাতিক্রম করিতেছে, সেও তদপেক্ষা যে অল্প সন্তোষ বা অল্প তৃপ্তি অনুভব করিতেছে, এমন কথা মনে করিবার কারণ নাই। অথবা ঐ যে দ্রাবিড়ী নেয়ার দাসীরা জলের পাত্র লইয়া দণ্ডায়মান আছে, উহারাও অনাবৃতগাত্রা ও নিরাভরণা হইয়াও সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কুলীরমণী

মাতৃমঙ্গল

অন্ত্যজ ও পারিয়া নারী-দের যত স্বাধীনতা আছে, তথাকথিতা উচ্চজাতীয়াদের তত নাই—বিশেষতঃ যেখানে দারিদ্র্য, সেইখানেই স্বাধীনতা স্বাভাবিক। ভারতের পর্দ্দানশীনা অবস্থাপন্না না হইলে ঠিক পর্দ্দার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন না। ভিক্ষা বা কর্জ্জের আবশ্যক হইলে, যোগেযাগে গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন হইলে অথবা তীর্থ-ভ্রমণে বা রামায়ণ-ভাগবত-কথাদি শ্রবণ করিতে হইলে পর্দ্দার বাহিরে আসিতে হয়। সুতরাং পর্দ্দানশীনাদিগকেই যখন দারিদ্র্যের জন্য পর্দ্দার বাহিরে আসিতে হয়, তখন দরিদ্র দিনমজুর কুলী পারিয়া রমণীদিগকে যে নিয়ত পর্দ্দার বাহিরে থাকিতে হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। দারিদ্র্য, কুলী পারিয়া রমণীদের আরও এক অধিকার আনিয়া দেয়। দারিদ্র্য হেতু তাহাদের স্বামীরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে না, তাহারা গৃহকলহ হইতে সুতরাং রক্ষা পায়। এ বিষয়েও পর্দ্দানশীনাদের অপেক্ষা তাহাদের অধিকার অধিক।

কিন্তু তাহা বলিয়া অক্ষর-জ্ঞানসম্পন্না মার্জ্জিতরুচি সভ্যনামধেয়া পর্দ্দানশীনাদের স্থান সমাজে তাহাদের অপেক্ষা হীন নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। পারিয়াদের জীবনে বিবাহ ও মৃত্যু অথবা সাময়িক পূজা ব্যতীত উপভোগ্য ঘটনা বিরল—তাহাদের জীবনের একটানা স্রোতে ইহা ব্যতীত জোয়ারভাটা নাই। কিন্তু মার্জ্জিতরুচি পর্দ্দানশীনা অথবা স্বাধীনাদের জীবন-স্রোত এমন গতানুগতিক ভাবে প্রবাহিত হয় না, তাহাতে জোয়ার-ভাটা আছে। কুলী, পারিয়া বা অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর নারীর পক্ষে প্রতীচ্যের সভ্যতার আক্রমণ বিফল হইয়াছে; উচ্চ শ্রেণীর পক্ষে তাহা হয় নাই। তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা এই প্রতীচ্য সংস্পর্শে কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে এবং তাহার ফলে সমাজে তাঁহারা কোন্ স্থান অধিকার করিতেছেন, তাহা এখন আলোচ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন দেশে নানা নূতন ভাব আসিয়াছে ও আসিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে অনেক জিনিষ আমদানী হইয়াছে। সর্ব্বশেষ আমদানী বোধ হয় (১) Sex

যুক্তপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলা ও বাঁদী

কিন্তু ১০।২০ বৎসর পূর্ব্বে এ সমস্ত পরিবর্ত্তনের কেন কোনও প্রয়োজন হয় নাই, তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? বিলাতী ও মার্কিণী sex problemএর নভেলগুলার অনুকরণে এ দেশে যে সব art for art's sake নভেল প্রচারিত হইতেছে, তাহাদের বিপক্ষে কেহ কিছু বলিতে গেলে যেমন এক শ্রেণীর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তেমনই হয় ত উক্ত পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে সেই শ্রেণীর পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে।

কিন্তু উহা সত্ত্বেও কথাটি বিশদরূপে বুঝাইবার সময় আসিয়াছে। যেমন Liberty অর্থে License বুঝিলে সমাজ বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই শিক্ষা অর্থে বাবুয়ানা, বিলাসিতা অথবা অলসতা, অকর্ম্মণ্যতা বুঝিলে সমাজের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। পাঠক Twilight sleepএর নাম শুনিয়াছেন কি? আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপ্রসবের এক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম Twilight sleep. যেমন Injection আজকাল এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের সকল রোগের ব্রহ্মাস্ত্র, তেমনই **প্রসব রোগেও** Injection ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই Injection দ্বারা গর্ভিণীকে আলো-আঁধারের (Twilight) মাঝখানে ফেলা

Problem, (২) Maternity ও (৩) Infant Welfare. Sex Problem সম্পর্কে 'মাসিক বসুমতী'তে অনেক আভাস দেওয়া হইয়াছে, কতক আলোচনাও হইয়াছে। Maternity বা মাতৃমঙ্গল এবং Infant Welfare বা শিশুমঙ্গল সম্পর্কে কিছু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজকাল সহরে Maternity Home প্রতিষ্ঠা হইতেছে, পুস্তিকা ছাপাইয়া ও বিলাইয়া, শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী খুলিয়া নানাভাবে নানারূপে মাতৃত্বের, মাতৃস্তন্যের এবং শিশুপালনের কথা দেশের মাতৃজাতিকে ও তথা তাঁহাদের অভিভাবকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে। দেশে শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু এবং প্রসূতির অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ, রুগ্ন দুর্ব্বল শিশুর উৎপত্তি ইত্যাদি জাতির পক্ষে পরম অমঙ্গলকর ঘটনা নিত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ধ্বংসোন্মুখ জাতির ধ্বংস নিবারণের উদ্দেশ্যে, জাতির মঙ্গলবিধানের উদ্দেশ্যে এই ভাবের প্রদর্শনী ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

মুসলমান মহিলা

হয়। ইহাতে গর্ভিণী সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহারা হয় না, আধা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে এবং সেই অবস্থায় কষ্টের অনুভূতি প্রাপ্ত না হইয়া সন্তান প্রসব করে।

অবশ্য যাহারা পল্লীমফঃস্বলের হাটে মাঠে মাল কেনা-বেচা করিতে ৩।৪ ক্রোশ পথ হাঁটে, যাহারা ধান ভানে, ঘর নিকায়, ধান সিদ্ধ করে, গোয়ালে জাব দেয়, যাহারা বুকে পিঠে ছেলে লইয়া সংসারের রাঁধাবাড়া ঘরকন্না করে, —ভারতের সেই পনেরো আনা নারীর জন্য এই সব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না, হইবেও না, ইহা বলাই বাহুল্য। যাঁহারা —যে মুষ্টিমেয় বিলাস ও বাবুয়ানায় লালিতপালিত শিক্ষিত নামধেয়া নারীরা সহরে বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত আজ না হউক, দুদিন পরে প্রসবের কষ্টও সহ্য করিতে চাহিবেন না। রসরসিক নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় বহু পূর্ব্বে তাঁহার 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনে এই ভাবের সভ্যতার উন্নতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার প্রহসনের কথা বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। যে প্রতীচ্যের অনুকরণে Maternity Home এবং Child-Welfare Exhibition হইতেছে, সেই প্রতীচ্যে Twilight sleep চিকিৎসা চলিয়াছে। এ দেশেও দুই দিন পরে হইবে, চিন্তা নাই।

যাঁহারা art লইয়া মাথা ঘামাইয়া থাকেন, তাঁহারা যতটা artificialityএর মধ্য দিয়া চলেন, ততটা আমাদের পল্লীমফঃস্বলের ১৫ আনা ভারতবাসী এখনও চলিতে শিখে নাই। এখনও অন্ধ পল্লীগ্রামে আদাড়ীর মা, সত্যর পিসী বা কনে ঠানদি গর্ভিণীকে সুপ্রসব করাইয়া থাকেন। অবশ্য দুই একটা ঘটনায় যে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এমন অকৃতকার্য্যতা পাশকরা ডাক্তার ও ধাত্রীতেও দেখা গিয়াছে। সহরের শিক্ষিত সমাজের অনেকে হয় ত 'হরিলুটের' আঁতুড়ের কথা কানেই শুনেন নাই। এই প্রথায় তুলসী-তলায় হরিলুট দিয়া প্রসূতি ও শিশুকে শুদ্ধ করিয়া ঘরে তুলিয়া লওয়া হয়, কোনওরূপ সেক-তাপ দেওয়া বা ঝাল-পাঁচন খাওয়ান হয় না, ব্রাণ্ডি stimulantও দিতে হয় না।

অথচ এমন ব্যবস্থাতেও লক্ষ লক্ষ প্রসূতি ও শিশু সুস্থ ও সবল হইয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। পল্লীগ্রামে সূতিকাগারের অবস্থা শোচনীয়, – অথচ সেখানেও পূর্ব্বে প্রসূতির স্বাস্থ্য-ভঙ্গ বা শিশুমৃত্যু অধিক হইতে শুনা যায় নাই। অধুনা যদি অধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার মূল কারণ দারিদ্র্য, পুষ্টিকর গোদুগ্ধ ও খাদ্যের অভাব এবং ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সাধারণ স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ও সহনক্ষমতার হ্রাস।

মাড়োয়ারী মহিলা

আমাদের কোনও আত্মীয় বেহারে ত্রিহুত রেলে কায করিতেন। তিনি দেখিয়াছেন, এক দরিদ্র গাঁওয়ারা গর্ভিণী নারী পথ চলিতে চলিতে তাঁহার বাসার নিকটস্থ আম্রকুঞ্জের মধ্যে খানিকটা স্থান পরিষ্কৃত করিয়া লইয়া অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সন্তান প্রসব করিয়াছিল। তিনি তাহাকে ২।১ খানা ছিন্নবস্ত্র দিয়াছিলেন। উহার সাহায্যে সে শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ৬ ঘণ্টা পরে সদ্যোজাত শিশুকে বক্ষে লইয়া গন্তব্যস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর নানা উপরোধেও সে বিশ্রাম

লইতে চাহে নাই। কেবল কিছু দুগ্ধ লইতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

এই নারীর জন্য Twilight sleepএর আবশ্যক হয় না। ইহার জন্য Maternity Homeএরও প্রয়োজন নাই। সম্ভবতঃ তাহার শিশুর জন্য তাহাকে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী দর্শন করিতে হইবে না। পূর্ব্বে যেমন দেখাইয়াছি, মাড়োয়ারী নারী স্বর্ণ-পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও অলঙ্কার-সম্পদে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট, আবার কুলী রমণীও মুক্ত বাতাসে মুক্ত আকাশতলে ১ মণ মোট বহিয়া তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট,—তেমনই এই পল্লীর নিরক্ষর অশিক্ষিত নারী গাছতলায় সন্তান প্রসব করিয়াও সহরের শিক্ষিত সুসভ্য ভদ্রমহিলার Maternity Homeএ প্রসবের সুখ হইতে অল্প সুখের অধিকারিণী নহে, তাহার শিশুসন্তান জীবনে কখনও child welfare exhibition না দেখিয়াও বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ পুরুষে পরিণত হইতে পারিবে।

মেথার মহলা

মানসিক বৃত্তি

আসল কথা,মনের অবস্থা। সমাজবদ্ধ জীব যতই সভ্যতার আবরণে আপনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া ফেলে, ততই তাহার অভাব ও আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি করে। মুক্ত বাতাসে মুক্ত আকাশতলে স্বাধীনতার রসাস্বাদে পরম সুখী পাহাড়িয়া কুলীমজুর প্রকৃতির জলহাওয়ায় এমন ভাবে শরীরকে গড়িয়া তুলে যে, তাহাকে ক্বচিৎ কদাচিৎ ডাক্তার-কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহারা প্রতীচ্যের শিক্ষিতাভিমানিনী নারী অপেক্ষা সমাজের বন্ধন হইতে কম মুক্ত নহে, তাহারাও তাঁহাদের মত স্বাধীনা, স্বাবলম্বিনী। কিন্তু তাহারা তাঁহাদের মত সুসভ্য নহে। তাঁহাদের মত শিক্ষার অনুশীলনে তাহাদের মানসিক বৃত্তির স্ফুরণ হয় না, তাহারা শিক্ষার ফলাস্বাদ করিয়া প্রকৃতির উপরে মানুষের কর্তৃত্ব-বিকাশের প্রয়াস পায় না, বরং প্রকৃতির নিয়মানুগ হইয়া চলে। এই হেতু তাহাদের Twilight sleepএর প্রয়োজন হয় না।

আপনার অবস্থায় সন্তোষ—চিত্তপ্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের প্রথম ও প্রধান সোপান, এ কথা সকলেই জানে। অভাবের সৃষ্টির ফলে অভাব পূর্ণ না হইলে আকাঙ্ক্ষাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ ও অপ্রফুল্লতা উপস্থিত হয়। উহা হইতে অস্বাস্থ্য ও অসুখের উদ্ভব। আমাদের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার যুগে গর্ভিণীকে সুসন্তান প্রসব করিবার জন্য প্রফুল্ল রাখিবার নানা উপায়বিধান করা হইত। সভ্য ও শিক্ষিত হইলেই যে প্রকৃতির নিয়মানুগ হইয়া নিয়ম পালন করিতে নাই অথবা সমাজে উচ্চ স্থান পাইলেই যে নিয়ত অভাবের সৃষ্টি করিয়া চিত্ত অপ্রফুল্ল রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুরাও সভ্যতায় কাহারও ন্যূন ছিল না। কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে শান্ত, সংযত, ত্যাগী, কর্ম্মী ও প্রকৃতির নিয়মানুগ করিবার নিমিত্ত রীতিমত অভ্যাস করিত। সে জন্য তাহারা নানারূপ বাঁধাধরা আইন-কানুন করিয়াছিল। সে সকল আইন তাহারা ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছিল। সেগুলি নিত্যনৈমিত্তিকের মত পালিত হইত। গর্ভিণী যাহাতে সুপ্রসব করে—সেই জন্য তাহার চিত্ত প্রফুল্ল রাখিবার ধরাবাঁধা আইনকানুন ছিল। পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত, সাধভক্ষণ, ইত্যাদি সংস্কারের কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

প্রসবান্তে শিশুর জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কত কি বাঁধাধরা আইনকানুন রহিয়াছে। এখন সে সব কথা অনেকে ভুলিয়া গিয়াছে। একটা সোজা কথা,—শিশুকে আলুই অথবা তিক্ত খাওয়ান হইত, তেলেজলে রাখা হইত, কাজল পরান হইত। এখনকার শিক্ষিতাভিমানিনীরা হয় ত আলুইয়ের কথা কানেও শুনেন নাই। যতক্ষণ সুপ্রসবের অথবা সন্তানপালনের কথা চিন্তা করিতে হইবে, ততক্ষণ sex problemএর দুই একটা বড় বড় সমস্যার কথা আলোচনা করিলে কায দেখিবে!·সে ভারটা ভাড়াটিয়া নার্সের উপর দিয়া Twilight sleepএর injection লইলেই দায় হইতে খালাস পাওয়া যাইবে!

নেয়ার মহিলার দাসী

কুসংস্কার দায়ী কি ?

অজ্ঞতা ও কুসংস্কার প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর যতটা কারণ, শ্রমবিমুখতা ও পরের উপর নির্ভরশীলতা তদপেক্ষা অধিক কারণ। শিক্ষিতাভিমানিনী প্রায়শঃ শ্রমবিমুখ হইয়া থাকেন। তদুপরি তাঁহারা অত্যন্ত পরনির্ভরশীলা। নার্স ও ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত তাঁহারা এক পা চলিতে পারেন না। সুতরাং বেচারী কুসংস্কারের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইয়া এ দেশে Maternity Home 'এবং Child welfare exhibitionএর প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করিলে চলিবে কেন? এই দরিদ্র দেশে লোক যত আত্মনির্ভরশীল হয়, ততই মঙ্গল। আত্মনির্ভরশীল হইতে হইলে শ্রমবিমুখতা ত্যাগ করিতে হইবে, artificiality ত্যাগ করিতে হইবে, যতটা সম্ভব Natureকে মানিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়মানুগ পুংসবনাদি সংস্কারগুলিকে কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণায় ঠেলিয়া রাখিলে চলিবে না। ঠানদিদের আলুই, কাজল, তেলজলকে আবার বরণ করিয়া ঘরে তুলিতে হইবে—অন্ততঃ একবার trial দিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

অবশ্য আমি এমন কথা বলি না যে, বর্ত্তমানের Maternity Home বা Child welfare exhibition তুলিয়া দেওয়া হউক। বর্ত্তমানের কালোপযোগী সংস্কারের স্রোত রোধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। এখন সহরে সমাজের যে অবস্থা হইয়াছে এবং সহরের সমাজে নারীর যেরূপ স্থান হইয়াছে, তাহাতে এ সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের এখন হোটেল না হইলে চলে না, হেয়ারকাটার না হইলে চুল ছাঁটা হয় না, পথে পান চুরুট কিনিয়া না খাইলে পথ চলা যায় না, হাঁসপাতালে না গেলে সেবা-চিকিৎসা হয় না। কালধর্ম্মে আমরা পদে পদে পরনির্ভরশীল হইতেছি। সে প্রাচীন একান্নবর্ত্তী পরিবারের সমাজবন্ধন নাই; সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল না হইলেও চলে না। যে কায পূর্ব্বে সংসারের 'পাঁচ জনে' করিত, এখন 'দেবা ও দেবী'কে তাহা করিতে হয়, কাযেই পরের সাহায্য প্রয়োজন হয়।

গৃহস্বামিনীর অথবা গৃহস্বামীর অসুখ হইলে অথবা উড়িয়া-পাচক দেশে গেলে খোট্টা ময়রার জলখাবার ভরসা অথবা হোটেলের খানা সম্বল। রোগ হইলে হাঁসপাতালে bed ভাড়া করা ভিন্ন উপায় নাই। গৃহে পান সাজিবার লোকের অভাব, চা তৈয়ার করিবার লোকের অভাব, কাযেই পথে পান চা কিনিতে হয়। এইরূপ এখন বস্তুতঃই Maternity Homeএর প্রয়োজন হইয়াছে, Child welfare exhibition দেখাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

হউক, তাহার আর উপায় নাই। কিন্তু যাহাতে এই পরনির্ভরতার বিষ আমাদের পল্লীমফঃস্বলে বিসর্পিত না হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে। যাহাতে পল্লীর নারী চিরদিনই শ্রমসহিষ্ণু, আত্মনির্ভরশীলা ও সংসারপালয়িত্রী থাকেন, তাহাই করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক, গ্রামে গ্রামে নারীরা শিক্ষিতা হউন, ইহা ত পরম বাঞ্ছনীয়, পরম গৌরবের কথা। মাতৃজাতি শিক্ষিতা না হইলে জাতির উন্নতি সম্ভবপর নহে, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু সেই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে তাঁহাদের যে উচ্চস্থান ছিল, তাহাই তাঁহারা অধিকার করিয়া থাকুন, পরের অনুকরণে 'বড়' হইবার প্রয়াস করিয়া কে কোথায় বড় হইয়াছে? তাঁহারা সুসন্তানপ্রসবিনী হউন। রামায়ণে কুলগুরু বশিষ্ঠ সীতাদেবীকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—বীরপ্রসবিনী হও। আর্য্য-সভ্যতার যুগে ইহার বড় আশীর্ব্বাদ নারীকে করিবার ছিল না।

এ প্রবন্ধে এক দিক দিয়া নারীর সমাজে স্থান সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অশিক্ষিত সমাজে অসভ্য কুলী মজুর নারীও শিক্ষিত সমাজের সভ্য নারীর মত স্বাধীনতা উপভোগ করে, এ বিষয়ে উভয়ের অধিকার এক। কিন্তু শিক্ষিত সভ্য নারী প্রকৃতির নিয়মানুগ না হইয়া যে পথে চলিয়া থাকেন, সে পথে মনের সুখ ও স্বাস্থ্য যে করায়ত্ত হয়, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু অশিক্ষিত অসভ্য নারীদের পক্ষে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এক দিকে অসভ্য অশিক্ষিত নারীর placid contentment যেমন শিক্ষিত সভ্যনারীর বাঞ্ছনীয়, অপর দিকে সভ্য শিক্ষিত নারী মানসিক বৃত্তির অনুশীলনে যে সুখ উপভোগ করেন, tree of knowledge-এর ফল উপভোগ করিয়া যে মনের তৃপ্তিলাভ করেন, অসভ্য অশিক্ষিত নারীর পক্ষে তাহা করায়ত্ত করা অসম্ভব। এতদুভয়ের সামঞ্জস্যবিধান যে দিন মানুষ করিতে পারিবে, সেই দিন প্রকৃতই জগতে সত্যযুগের উদয় হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

তুরস্কে নারীর অভ্যুদয়

তুরস্কের শিক্ষা-বিভাগে অধুনা একজন মহিলা মন্ত্রিত্ব করিতেছেন। এই বিদুষী মহিলার নাম ম্যাদাম্ হালিদী এদিব্ হানুম। শুদ্ধান্তঃপুরে যাঁহাদের স্থান, সূর্য্যালোকও যাঁহাদের দেখা পাইত না, আজ,—এই জাগরণের যুগে তাঁহারা দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল সরাইয়া দিয়া তাঁহারা এখন কর্ম্মক্ষেত্রে আবির্ভূতা। পার্শ্বের চিত্রে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-পরিহিতা মহিলাই শিক্ষা-সচিব। নবীন তুরস্কের অন্যান্য পুরুষ ও নারীকর্ম্মী তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। তুরস্কের নারীসম্প্রদায়ের ইনিই নেতৃত্ব করিতেছেন।

বাঙ্গালার গীতিকাব্য—বৈষ্ণবকাব্য

প্রক্ষিপ্ত পদাবলী

বাঙ্গালা ভাষায় চণ্ডীদাস যেমন আদি কবি, তেমনই তিনি সহজ ও শ্রেষ্ঠ কবি, অপর কবির রচনা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত না হয়,সে বিষয়ে একটু সতর্ক থাকা আবশ্যক। চণ্ডীদাস যে বহু গ্রন্থ বা বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এমন প্রবাদ নাই, চণ্ডীদাসের কবিতা চৈতন্যদেবের কালে অথবা তাহার কিছু পরে সংগ্রহ করিতেও কোন ক্লেশ করিবার প্রয়োজন হইত না। বিদ্যাপতির পদাবলীর স্বতন্ত্র কথা। কেন না, তিনি নিজের নাম ছাড়া নানা উপাধি ও রাজার উপাধি অনেক পদের শেষে দিতেন। সে কথা লোক ভুলিয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত বিদ্যাপতির কবিতা মিথিলায়ও পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে রকম কোন গোল নাই। তাঁহার পদের পাঠ স্থির করিতে অথবা ভাষার অর্থ করিতে কোন কষ্ট হয় না, তাঁহার পদাবলী চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে, চৈতন্যদেবের কালে ও চৈতন্যদেবের পরে বরাবর গীত হইয়া অসিয়াছে। সুতরাং বৈষ্ণবভক্ত ও কবিগণ সংগ্রহকালে যে চণ্ডীদাসের সমস্ত পদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ নাই। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর শেষে লিখিয়াছেন যে, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান গান করিয়া তাঁহার লোভ জন্মিল। তাহার পর—

নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥

এরূপ সঙ্কলনকার যে চণ্ডীদাসের রচিত অনেক পদ পান নাই, এমন কথা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। চণ্ডীদাসের রচনা অনুকরণ করা কঠিন নয়, তাঁহার পর অপর অনেকে পদ রচনা করিয়া ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম যোগ করিয়া দেওয়াও বিচিত্র নয়। যদি কেহ কোথাও প্রাচীন, কিন্তু সম্প্রতি প্রাপ্ত সঙ্কলনাদিতে চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত কবিতা প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে সেই সকল পদ বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া তাঁহার রচিত বলিয়া মানিয়া লইয়া তাঁহার পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিলে অনেক সময় কবির সমাদর না করিয়া তাহার উল্টা করা হয়, কারণ, এই সকল নূতন পদ চণ্ডীদাসের রচনা হইতে নিকৃষ্ট হইলে, তাঁহার রচিত বলিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলে কবির অবমাননা হয় এবং তাঁহার প্রতিভাকে কলঙ্কিত করা হয়। এইরূপ পদ পাইলে প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং কোথায় কিরূপে পাওয়া গিয়াছে, বিশদরূপে লিখিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতেও দোষ নাই। কিন্তু কোন প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ পাইলেই যে সেই সকল পদ তাঁহার রচিত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ভণিতায় নাম থাকিলেই যে রচয়িতার অকাট্য প্রমাণ হয় না, বিদ্যাপতির পদাবলীতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি বাঙ্গালী ছিলেন না বলিয়া বাঙ্গালা কবিতায় তাঁহার নাম থাকিলে সহজেই প্রমাদ ধরা পড়ে; কিন্তু চণ্ডীদাস বাঙ্গালায় লিখিতেন বলিয়া কি তাঁহার রচনায় ও তাঁহার অনুকরণে রচিত অপর কোন কবির রচনায় কোন প্রভেদ নাই? তাহা হইলে ত যে কেহ পয়ার ত্রিপদী রচনা করিত ও চণ্ডীদাসের মত সোজা ভাষা ব্যবহার করিত, সেই চণ্ডীদাস হইত। ভণিতা ত খুব অল্প দিনের রেওয়াজ। প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্যে কাব্যে ছিল না। গীতিকাব্যে জয়দেবে দেখিতে পাওয়া যায়। অপর দেশে অপর ভাষায় ভণিতার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। কবির স্বাক্ষর তাঁহার রচনায় সর্ব্বত্র, ভণিতায় ভুল হইতে পারে, কিন্তু রচনার প্রমাণ অভ্রান্ত।

চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া যে সকল নূতন পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি প্রাচীন পুঁথিতে চতুর্দ্দশটি পদ আছে। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই পদগুলি প্রকাশিত হয়। সব পদগুলিই রজকিনী রামী সংক্রান্ত। কয়েকটি পদে একটি নূতন শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে। শব্দটি 'আসক'।

এই সে আসক করিএ থুবে।
আম্রকে মরিলে আসক পাবে॥

• • • • •

তুমার সহিত আসক আসঅ
নিসচয় আছয়ে মোর।

* * * * *

চণ্ডীদাসে কএ মনে হেন লএ
বলিব কি আর তোরে।
আসক দিঞা সে শুন রজকিনি
রহিনুঁ চরণ তলে॥

এই রকম প্রায় বিশবার এই 'আসক' শব্দের ছড়াছড়ি। টীকাসমেত চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কোন সটীক সংস্করণে এই শব্দের অর্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক জন টীকাকার পাঠকের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া টীকা করিয়াছেন যে, 'নিসচঅ' শব্দের অর্থ 'নিশ্চয়', কিন্তু আসক শব্দ যে পাঠকের পক্ষে দুর্বোধ হইতে পারে, এ কথা তিনি একবারও মনে করেন নাই। অথচ 'সনাএ সোহাগা' এই দুইটি শব্দের প্রথম শব্দের অর্থ সোনা, ইহা তিনি টীকা করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে টীকাকার 'নিসচঅ' অর্থে 'নিশ্চয়' লেখেন ও 'সনার' অর্থ 'সোনা' লেখেন, তাঁহার পক্ষে আসক শব্দের অর্থ করা অসম্ভব। কারণ, ঐ শব্দ চণ্ডীদাসের পদাবলীতে অথবা অপর কোন বৈষ্ণব মহাজনের পদে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না, বিদ্যাপতিও কুত্রাপি ব্যবহার করেন নাই। 'আসক' শব্দ সংস্কৃত নয়, বাঙ্গালা নয়, মৈথিল নয়, ব্রজবুলি—যদি ব্রজবুলি একটা ভাষা মানা যায়—নয় হিন্দী, নয় একেবারে খাঁটি নিছক পারসী শব্দ। পদকল্পতরুতে চার জন মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদ আছে, ইঁহারাও এই শব্দ একবারও ব্যবহার করেন নাই। আসক পারসী ইশ্‌ক্ শব্দ হইতে, অর্থ প্রেম, পিরীতি। এই শব্দের তিন রূপ,—ইশ্‌ক্, আশিক এবং মাশুক। ইশ্‌ক্ প্রেম, আশিক যে প্রেমে মুগ্ধ, মাশুক যাহার প্রেমে মুগ্ধ। যে পদখণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে এই শব্দ দুই আকারে পাওয়া যায়।

তুমার সহিত আসক আসঅ নিসচয় আছয়ে মোর।

এখানে আসক অর্থে ইশ্‌ক্, প্রেম, তোমার সহিত প্রেমের আশা আমার নিশ্চয় আছে। আর এক পদে—,

তাহাতে আসক নাবক রসিক,

এ স্থলে আসক শব্দের অর্থ আশিক, রসিক নায়ক তাহাতে প্রেমমুগ্ধ, আসক্ত।

চণ্ডীদাসের লেখায় আগাগোড়াই খাঁটি বাঙ্গালা, স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির অনুকরণে মিথিলা শব্দ প্রয়োগ ও মিথিলা ব্যাকরণের প্রয়োগ আছে, কিন্তু উর্দ্দু অথবা পারসী কথা একটিও নাই। ইশক্ অথবা আশিক শব্দ যে কোন বাঙ্গালী কবি কখনও ব্যবহার করিয়াছেন, এরূপ স্মরণ হয় না, টীকাকাররাও এই শব্দের অর্থ জানেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। চণ্ডীদাস যে হঠাৎ পিরীতি শব্দ ছাড়িয়া এই দুর্বোধ্য পারসী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? ঠিক যেমন তাঁহার পূর্ব্ব পদসমূহে চণ্ডীদাস পিরীতি শব্দ বারবার ব্যবহার করিয়াছেন, সেইরূপ এই আশক শব্দ অনবরত চক্ষে পড়ে। বাঙ্গালা কথা ছাড়িয়া তিনি পারসী শব্দ ব্যবহার করিতে যাইবেন কেন? পদগুলির ভাব ও ভাষা বিচার করিয়া দেখিলে চণ্ডীদাসের রচিত কি না, তাহাতে বিশেষ সংশয় হয়।

প্রাচীন কবির পদ নির্ব্বাচন করিয়া সংগ্রহ করা সঙ্কলনকারের কাম এবং নূতন পদ হইলে সংশয়যুক্ত কি না, বিবেচনা করাও তাঁহার কর্ত্তব্য। যে কয়টি টীকার নমুনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা হইতে কোন্ কোন্ সঙ্কলনকারের কিরূপ অভিজ্ঞতা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সংস্করণে 'হেদে লো সুন্দরী প্রেমের আগরি' এই চরণে আগরি শব্দের অর্থ করা হইয়াছে আগার, গৃহ, প্রকৃত অর্থ অগ্রগণ্যা। 'মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে' চরণে বুলে শব্দের অর্থ টীকাকার করিয়াছেন গুন্ গুন্ শব্দ করে; বুলনা এখনও চলিত হিন্দী শব্দ, অর্থ, অনির্দ্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো। 'কর যোড় করি করিছে গোহারী' চরণে গোহারী শব্দের অর্থ হইয়াছে বিলম্ব করা। গোহারীও চলিত হিন্দী শব্দ, অর্থ, উচ্চস্বরে ডাকা অথবা দোহাই দেওয়া। বিদ্যাপতিতে আছে, 'অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি', রাজার অনুচিত কর্ম্মে কিছুমাত্র চীৎকার করিয়া কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করা যায় না। এইরূপ অদ্ভুত ভ্রমপূর্ণ টীকা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটি উত্তম সংস্করণের এখন পর্য্যন্ত বিশেষ অভাব।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ প্রচলিত ধারণা আছে, (১) দুই কবি সমসাময়িক, (২) দুই জনে

রচনা বিনিময় হইত, (৩) দুই জনে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই তিনটি প্রবাদ একে একে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। দুই জনে যে সমসাময়িক, তাহার ঐতিহাসিক কিছু প্রমাণ আছে কি না, সন্ধান করিয়া দেখা উচিত। যাঁহারা চণ্ডীদাসের জীবনী লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই আক্ষেপ করিয়াছেন যে, কবির জীবনবৃত্তান্ত কিছু জানিতে পারা যায় না। অগত্যা কবি ও রজকী রামমণির সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ও অসম্ভব লোকপ্রবাদ আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছেন। জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও এরূপ জনশ্রুতি আছে। এরূপ প্রবাদে ঐতিহাসিক কোন তথ্য নির্ণয়ের কিছুমাত্র আনুকূল্য হয় না।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক মানিয়া লইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের জন্মকাল নিরূপণ করিতে হয়। চণ্ডীদাস কোন্ বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা একেবারে নিঃসংশয়ে জানিতে না পারিলেও কতক নির্ণীত হইয়াছে যে, তিনি ১৩২৫ শকে (১৪০১ খৃষ্টাব্দ) আবির্ভূত হযেন। আর এক মতে তাঁহার ১৩৩৯ শকে (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে) জন্ম হয়। আর এক অনুমান ১৩২৫ শকে চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলী সংগ্রহ করেন,

১ ৩ ২ ৫
বিধুর নিকটে নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নির্জ্জা।
চণ্ডীদাস রস কৌতুক কির্জ্জা॥

শেষের এই অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নাই, চণ্ডীদাস কত বয়সে স্বরচিত পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারও কোথাও কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার জন্ম ১৩২৫ শকে ধরিয়া লইলে অসঙ্গত বিবেচনা হয় না।

বিদ্যাপতির কোন্ বৎসরে জন্ম, তাহাও নির্দ্ধারিত হয় না, কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বিদ্যাপতির স্বহস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের কাল ৩০৯ ল সং (লক্ষ্মণসেন অব্দ), অর্থাৎ ১৩৭০ শক, ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ। পদাবলী ইহার পূর্ব্বে রচিত, কারণ, ইহার অনেক পূর্ব্বে শিবসিংহের মৃত্যু হয়। শিবসিংহের সিংহাসন আরোহণের কাল বিদ্যাপতির নিজের পদেই আছে,—

৩ ৯ ২
অনল রন্ধ্র কর লক্খন নরচন্দ্র
৪ ২ ৩ ১
সক সমুদ্দ কর অগিনি সসী।

লক্ষ্মণসেন সংবৎ ২৯৩, ১৩২৪ শক, খৃষ্টাব্দ ১৪০২ সালে শিবসিংহ মিথিলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিদ্যাপতির আদেশে লিখিত একখানি তালপাতার পুঁথি আছে, তাহার কাল ২৯১ ল সং, ১৪০০ খৃষ্টাব্দ। লিখনাবলী নামে বিদ্যাপতির বিরচিত একখানি পত্রলিখনপ্রণালী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। সেখানি রাজা পুরাদিত্যের আদেশে ২৯৯ লক্ষ্মণাব্দে লিখিত। বিদ্যাপতির বিরচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

বিদ্যাপতি ও রাজা শিবসিংহ প্রায় সমবয়স্ক, বিদ্যাপতি দুই বৎসরের বড় ছিলেন। শিবসিংহ পঞ্চাশ বর্ষ বয়সে সিংহাসনারোহণ করেন ও তাহার পর চার বৎসর পূর্ণ না হইতেই যুদ্ধে নিহত হয়েন। বিদ্যাপতির পদে শিবসিংহের পিতৃব্য দেবসিংহেরও নাম আছে। যে পর্য্যন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যখন চণ্ডীদাসের জন্ম হয়, তখন বিদ্যাপতির বয়স পঞ্চাশের উপর, যশস্বী কবি, শিবসিংহের রাজপণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায়, বিসপী গ্রামের স্বত্বাধিকারী। কত বয়সে চণ্ডীদাস কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু যদি পঁচিশ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে সে সময় বিদ্যাপতির বয়স পঁচাত্তর হইবে। অতএব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক বলিলে এমন বুঝাইবে না যে, তাঁহারা সমবয়স্ক ছিলেন অথবা দুই পাঁচ বৎসরের ছোট বড় ছিলেন। চণ্ডীদাসের যখন জন্ম হয়, সে সময় বিদ্যাপতি প্রৌঢ়, চণ্ডীদাস যখন কিশোর, তখন বিদ্যাপতি বৃদ্ধ, চণ্ডীদাস যখন তরুণ, তখন বিদ্যাপতি স্থবির। চণ্ডীদাস যখন তাঁহার পদাবলী রচনা করেন, তখন বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গদেশ ছাইয়া পড়িয়াছে এবং চণ্ডীদাস প্রতিভাশালী মৌলিক কবি হইলেও বিদ্যাপতির ভাব ও বিদ্যাপতির ভাষা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, দুই তাঁহার রচনার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই ইহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

দুই কবিতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহারা পরস্পরে রচনা বিনিময় করিতেন, এই ধারণার মূলে পদকল্পতরুর তিনটি পদ। এই কয়টি পদ পদকল্পতরু-সঙ্কলনকার বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদাসের রচনা। বৈষ্ণবদাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবি, শ্রীচৈতন্যের অনেক পরে। চৈতন্যদেবকে দেখিতে পায়েন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বে কোন কবি অথবা ভক্ত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরস্পর সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেন নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে সাক্ষাৎ হওয়া অথবা তাঁহাদের রচনা বিনিময় করা যে একটা অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার, তাহা নহে। বিদ্যাপতির গৃহে স্বয়ং শিব উগনা নাম ধরিয়া ভৃত্যের কার্য্য করিতেন এবং বিদ্যাপতির পত্নী যষ্টি হস্তে তাঁহাকে প্রহার করিতে ধাবিতা হইতেন, অথবা চণ্ডীদাস লোকসমক্ষে অন্নের থালা হস্তে রজকীকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া চতুর্ভুজ হইলেন, এরূপ ঘটনা অপেক্ষা দুই কবিতে চাক্ষুষ দেখা হওয়া কিংবা পত্রব্যবহার হওয়া অধিক বিচিত্র নয়। কিন্তু বৈষ্ণবদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা কি কবিকল্পনা, এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

কিছু কল্পনা, কিছু প্রেম, কিছু ভক্তি এই তিন মিশাইয়া বৈষ্ণবদাস এই কয়টি পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই কতক কল্পিত, কতক ভ্রান্ত কথা আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, বৈষ্ণবদাসের কালে এ দেশের লোক বিদ্যাপতির প্রকৃত পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসে বিদ্যাপতিতে কি কথা হইয়াছিল, বৈষ্ণবদাস তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কথোপকথন যে সম্পূর্ণ কল্পিত, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। বৈষ্ণবদাস কল্পনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস দুজনেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বিদ্যাপতি বংশাবলীক্রমে শৈব, তিনি কোন কালে বৈষ্ণব হয়েন নাই। চণ্ডীদাস কালীবিগ্রহ বিশালাক্ষী দেবীর পূজারী, তাহার পূর্ব্বে বামাচারী শাক্ত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। এই বিশালাক্ষী অথবা বাশুলী দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার পদাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করেন, প্রবাদ এইরূপ। বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি নিজের নিজের গীত পরস্পরকে লিখিয়া পাঠাইতেন, তাহাতে দুই জনের সাক্ষাৎ দর্শনের অনুরাগ হইল।—

নিজ নিজ গীত　　লেখি বহু ভেজল
　　তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধা কানুক　　প্রেম রস কৌতুক
　　তাহে মগন ভৈ গেল ॥

*　　*　　*　　*

চণ্ডীদাস শুনি　　বিদ্যাপতি গুণ
　　দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব　　চণ্ডীদাস গুণ
　　দরশনে ভেল অনুরাগ ॥
　　দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল
　　বিদ্যাপতি চলি গেল ॥

বৈষ্ণবদাস অনুমান করিয়াছিলেন, রূপনারায়ণ নামে কোন ব্যক্তি বিদ্যাপতির অনুচর অথবা সহচর ছিলেন। রূপনারায়ণ রাজা শিবসিংহের উপাধি মাত্র, উঁহাদের বংশে ঐরূপ উপাধির পদ্ধতি ছিল। রাজা শিবসিংহের পিতৃব্য রাজা দেবসিংহের উপাধি ছিল গরুড়নারায়ণ। কেবল রূপনারায়ণ বলিতে বুঝায়, বিদ্যাপতির সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল না। বৈষ্ণবদাস মনে করিতেন, রাজা শিবসিংহ ও রূপনারায়ণ দুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে যে কাল্পনিক কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার ভাব ও ভাষা চণ্ডীদাসের রাগাত্মিক পদের অনুরূপ।

কবি বৈষ্ণবদাস বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের অপেক্ষা যে কত বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাহা বোধ হয় জানিতেন না। বিদ্যাপতি যে কখনও বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, মিথিলায় এরূপ প্রবাদ নাই। বিদ্যাপতি জোনপুরে গিয়াছিলেন, এ কথা তাঁহার রচিত কীর্ত্তিলতা গ্রন্থে লিখিত আছে। প্রবাদ আছে যে, দিল্লীতে গিয়া বিদ্যাপতি নানা বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের জন্য দশাবধান উপাধি পাইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কালে মিথিলা প্রসিদ্ধ বিদ্যাগার, বঙ্গদেশ হইতে অনেকে মিথিলায় সংস্কৃত বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাইতেন। বঙ্গদেশে প্রতিভাবান্ কবি জয়দেব, তাঁহার প্রতিষ্ঠা যেমন বাঙ্গালায়, তেমনই মিথিলায়। চণ্ডীদাসের যশ যে মিথিলা পর্য্যন্ত

গ্রথিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। মিথিলার লোক চণ্ডীদাসের নাম জানে না।

যদি দুই কবিতে রচনা আদান-প্রদানের ব্যবহার থাকিত, তাহা হইলে যেমন চণ্ডীদাসের রচনায় বিদ্যাপতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বিদ্যাপতির রচনায় চণ্ডীদাসের প্রভাবের প্রমাণ থাকিত, কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি শব্দেও তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস যখন রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন বিদ্যাপতি অতি বৃদ্ধ, তাঁহার রচনাশক্তি প্রায় শেষ হইয়াছে। বিদ্যাপতি যে বাঙ্গালা জানিতেন কিংবা বুঝিতে পারিতেন, এরূপও মনে হয় না। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির উপমা, ভাব ও ভাষা স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।—

নব ঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পশারল আশে।
বারিক কারণ বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে॥

ইহা অবিকল বিদ্যাপতির রচনার অনুরূপ। আর এক পদের আরম্ভে আছে—

আজুক শয়নে ননদিনী সনে
শুতিয়া আছিনু সই।

"বারিক" এবং "আজুক" এই দুই শব্দে "ক" অক্ষর ষষ্ঠী বিভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে, বাঙ্গালায় বারির, আজির। ইহা সম্পূর্ণ মিথিলা ভাষার ব্যাকরণের অনুযায়ী। বিদ্যাপতিতে আছে,—

হাতক দরপন মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥

এই প্রয়োগ প্রাচীন মিথিলা ভাষায় শুধু নহে, এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত। মিথিলা প্রদেশের বর্ণনায় মিথিলার আধুনিক কবি চণ্ডা ঝা লিখিয়াছেন,—

গঙ্গা বহথি জনিক দক্ষিণ দিশি পূর্ব্ব কৌশিকী ধারা।

গঙ্গা যাহার দক্ষিণে বহিতেছে, পূর্ব্বদিকে কৌশিকী নদীর ধারা।

বিদ্যাপতির রচনা ও তাঁহার যশ চণ্ডীদাসের কালে বাঙ্গালায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির পদাবলী উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছিলেন ও নিজের রচনায় মিথিলার কবির ভাষা ভাব ও উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। বিদ্যাপতি যে বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন কিংবা চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তাঁহাদের মিলনের প্রবাদও অসম্ভব। কারণ, চণ্ডীদাস যখন গীত রচনা করিয়া যশস্বী হয়েন, তখন হয় বিদ্যাপতির মৃত্যু হইয়াছে, না হয় তিনি এত বৃদ্ধ যে পথপর্য্যটন করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। বৈষ্ণবদাস যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় কবি ও প্রেমিক ভক্তের কল্পনা, ইতিহাস-রচয়িতার কঠোর সত্য নহে।

বৈষ্ণবদাসের পদ তিনটিতে উল্লেখযোগ্য আর দুইটি কথা আছে, একটি সত্য, অপরটি মিথ্যা। বৈষ্ণবদাস দুই স্থানে বিদ্যাপতির নাম না করিয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন বলিয়াছেন। কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির উপাধি ছিল, ইহা সত্য কথা। এই ভণিতাযুক্ত যত পদ আছে, সমস্ত বিদ্যাপতির রচিত। এ সময়কার সংগ্রহকার ও পাঠক সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা, বৈষ্ণবদাস অপর কয়েক জন কবির ন্যায় মনে করিতেন যে, যেমন চণ্ডীদাসের সহিত রজক-ঝিয়ারি রামিণীর কামগন্ধশূন্য বা অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ ছিল, বিদ্যাপতির সহিত রাণী লছিমারও সেইরূপ ছিল। বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন,—

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহিঁ রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান॥

বৈষ্ণব কবি নরহরি দাস আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

লখিমা গুণহি উপজে বহু রঙ্গ।
বিলসয়ে রূপ নারায়ণ সঙ্গ॥

পদান্তরে,—

লছিমারূপিণী রাধা ইষ্ট বস্তু যার।
যারে দেখি কবিতা স্ফুরয়ে শত ধার॥

ইহা মিথ্যা কথা। নরহরি দাসের কালেই এ দেশের লোক বিদ্যাপতির যথার্থ পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিল। রূপনারায়ণ যে লখিমার পতি ও রাণী লখিমা বিদ্যাপতির রাধা অথবা ইষ্ট বস্তু ছিলেন না এবং বিদ্যাপতির কবিতা-স্ফুরণের সহিত

লখিমার কোন সম্বন্ধ ছিল না, নরহরি তাহা জানিতেন না। বৈষ্ণবদাস তাঁহার অনেক পরের লোক, তিনি কেমন করিয়া জানিবেন? এরূপ প্রবাদ হইতে যে, আর একটা প্রবাদ উঠিবে যে, রাজা শিবসিংহ রাণীর প্রতি বিদ্যাপতির মনোভাব জানিতে পারিয়া কবিকে শূলে দিয়াছিলেন, ইহাতে বিচিত্র কি? যাঁহারা এরূপ লোকাপবাদকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা একবার বিচার করেন নাই যে, লখিমার নাম বিদ্যাপতি প্রকাশ্যভাবে পদের ভণিতায় দিতেন। তাহা ছাড়া কোন পদে একা লখিমার নাম নাই। সর্ব্বত্র রাজা শিবসিংহ লখিমা দেবীর বল্লভ এইরূপ আছে। অন্য রাণীদেরও নাম আছে। এক পদে শিবসিংহের খুল্লতাত নরপতি দেবসিংহ ও তাঁহার মহিষী হাসিনী দেবীর নাম আছে। এক পদের ভণিতায় আছে মতি মহেশ রেণুক দেবি কন্ত, মন্ত্রী মহেশ রেণুকা দেবীর কান্ত। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজকবি, গীতে রাজারাণী অথবা কোন প্রধান ব্যক্তির নামসংযোগ শিষ্টাচার। তানসেনের একটি গানে আছে,—

তানসেন-প্রভু ইত নো মাঙ্গত তুমপৈ,
সুখ সম্পদ বিদ্যা দে কাশ্মীর-রাণী।

অর্থ তানসেন প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে, কাশ্মীর রাণীকে সুখসম্পদ বিদ্যা দাও।

কাশ্মীর-রাণীর জন্য তানসেনের সুখ সম্পদ বিদ্যা প্রার্থনা শুধু শিষ্টাচার, আর কিছু নয়।

বিদ্যাপতিকে শিবসিংহ যে শূলে দেন নাই, তাহার প্রমাণ শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি বত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন ও প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে বাজিতপুরে গঙ্গাতীরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

খদ্দরের গান

সাত পুরুষের মাটীর 'পরে নিজের ঘরে যে ধন পাই,
সাত সাগরের ও-পারে তা' কিসের দুঃখে ভিক্ষা চাই?
মা-বোন্ আপন হাতের দানে ঘুচাতে চান দেহের লাজ,—
সোনার মুকুট ধুলায় ফেলে' কোথায় খোঁজ' রাং-এর সাজ!
হোক্ না মোটা, হোক্ না খাটো, এ যে আমার
দেশের দান—
খদ্দরে দে ভদ্দর-ইতর মাথায় তুলে
রাজার মান। ধ্রু॥

দেশের ভুঁইয়ে কাপাস থুয়ে' করিস্ কোকো-চায়ের চাষ,—
সন্ধ্যা-দেওয়ার সল্‌তাটুকু তা-ও না নিজের ঘরে পাস্!
এই দেশেরই বউ-ঝিয়ারি কাট্‌ত সূতা মস্‌লিনের,
আজ্ কেন সে বিবির বেশে পুতুল হ'য়ে রয় চীনের?

চর্‌কা ছেড়ে' খড়-পাকাটির ব্যব্‌সা চলে কোথায় আর,—
গলায় দড়ির কোঁটা পেতে' দৃষ্টিহীনের চেষ্টা কার্?
কোন্ দেশে কার্ পত্নী মরে লাজ না-ঘোচার আপ্‌শোষে?
অন্নহীনের শব-ঢাকারও চীর জোটে না কার দোষে?

কোন্ পুরুষের আঙুল কাটা,—দূর হ'ল না জুজুর ভয়,—
দেড়শো বছর তুলোর মত তাই স'য়ে কার গোষ্ঠী রয়?
কোথায় পুরুষ, কোথায় নারী, ঘর জুড়ে' দে চর্‌কা-তাঁত,
তিরিশ কোটির লাগা রে ভিড়, গড়্‌ক' জোলা-তাঁতীর জাত!

এক ক'রে দে গরীব ধনী,—ঘুচুক বিলাস-ভূষার মান,—
ধর্ম্মে-কর্ম্মে মনে-মর্ম্মে মিলুক্ হিন্দু-মুসলমান;
সখ্যে মিলুক্ মজুর-রাজা, ঐক্যে করুক্ দ্বন্দ্ব ক্ষয়;
বাক্যে সফল নির্ভয়ে বল্—'গান্ধী-মহারাজার জয়!'

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত।

জল্লাদ

(Honor'e de Balzac)

ক্ষুদ্র নগর মেন্দার ঘড়ি-অট্টচূড়া হইতে এইমাত্র দ্বিপ্রহর রাত্রি ধ্বনিত হইল। দুর্গ-প্রাসাদ-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের শেষ প্রান্তে যে একটি দীর্ঘ অলিন্দ ছিল, সেই অলিন্দের প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া একটি তরুণ ফরাসী সেনা-নায়ক যেন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—যে ব্যক্তি বে-পরোয়া সৈনিকের জীবন যাপন করিতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তা বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়।

মাথার উপর, স্পেনের নির্মেঘ গগনের নীল গম্বুজ; নীচের সুন্দর উপত্যকা, অনিশ্চিত নক্ষত্রালোকে ও চন্দ্রমার কোমল রশ্মিতে আলোকিত হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে—সৈনিক তাহাই দেখিতেছিল। ফুটন্ত নারাঙ্গী গাছের গায়ে ঠেস দিয়া সে আরও দেখিতে পাইতেছিল, মেন্দা নগর—১০০ ফুট নীচে। দুর্গপ্রাসাদটি যে শৈলের উপর গঠিত, সেই শৈলের পাদদেশে,—উত্তর-বায়ু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য এই মেন্দা নগরটি আশ্রয় লইয়া বেশ আরামে আছে। সৈনিক মুখ ফিরাইল—মুখ ফিরাইবামাত্র সমুদ্র নজরে পড়িল। কৌমুদীদীপ্ত তরঙ্গরাজি, ভূদৃশ্যের যেন একটা চওড়া রূপার ফ্রেম বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

দুর্গ-প্রাসাদের জান্‌লাগুলায় দীপের আলো। বল্‌-নৃত্যের আমোদ-উল্লাস ও নৃত্যগীত, বেহালার ধ্বনি, নৃত্যকারী ও নৃত্যকারিণীদের হাস্য বায়ুতরঙ্গে বাহিত হইয়া তাহার দিকে আসিতেছিল এবং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল—দূরাগত সাগর-তরঙ্গের মৃদু কলধ্বনি। সৈনিক দিবসের তাপে ক্লান্ত হইয়াছিল, শীতল রাত্রি তার শরীরকে একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিল। উদ্যানের কুসুমরাশির তীব্র মধুর সৌরভে ও সুগন্ধী গাছপালার গন্ধে সুরভিত বায়ুতে সে অবগাহন করিল।

মেন্দার দুর্গপ্রাসাদের মালিক ছিলেন এক জন স্পেনীয় ওমরা। তিনি সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। সমস্ত সায়াহ্নকালটা বাড়ীর জ্যেষ্ঠ দুহিতা সেই সৈনিক পুরুষকে এমন একটা সতৃষ্ণ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছিল যে, সেই স্পেনীয় মহিলার করুণাব্যঞ্জক দৃষ্টি ঐ 'ফরাসী সৈনিকের মনে একটা স্বপ্ন-কল্পনা জাগাইয়া তুলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ক্লারা ছিল রূপসী। তার তিন ভাই ও এক ভগিনী থাকিলেও মার্কিস্‌-লেগান্দের ভূসম্পত্তি এত বৃহৎ যে, সেই ফরাসী সেনানায়ক মার্‌সাঁর বিশ্বাস যে, ক্লারা খুব একটা জাঁকালো রকমের যৌতুক পাবে। কিন্তু কি সাহসে সে কল্পনা করিবে,—আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ শোণিত স্বকীয় শরীরে প্রবাহিত বলিয়া, যাহার অন্ধ বিশ্বাস, সে কি না এক প্যারিসের মুদীর ছেলেকে নিজের দুহিতা দান করিবে? তা ছাড়া, ফরাসীদিগের উপর তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ ছিল। সপ্তম ফার্দিনান্দের অনুকূলে দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার জন্য মার্কিস একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায়, এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সেনাপতি জি— মার্কিসের আজ্ঞাধীন পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া দখলে রাখিবার জন্য, এই ক্ষুদ্র "মেন্দা" নগরে ভিক্টর মার্‌সাঁর পল্টনকে মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। মার্শাল মের সরকারী পত্রেও জানা গিয়াছিল, ইংরাজেরা স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিতে পারে—কেন না, লণ্ডনের মন্ত্রি-পরিষদের সহিত মার্কিসের পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল।

তাই, ভিক্টর মার্‌সাঁ ও তাঁহার সৈন্যদল, স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেও, সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক থাকিত। প্রদেশগুলি যখন তাঁহার জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়, তখন তিনি অলিন্দের দিকে গিয়া, নগরটি একবার নজর করিয়া, তাহার পর মনে মনে ভাবিলেন,—মার্কিস যে তাঁহার প্রতি বরাবর বন্ধুত্ব দেখাইয়া আসিতেছেন, সে বন্ধুত্বকে কি ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং দেশের বাহ্য প্রতীয়মান শান্তির সহিত, সেনাপতির চিত্তচাঞ্চল্যের সমন্বয় কি করিয়া করা যাইতে পারে? কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সাবধানতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও

বৈধ কৌতূহল, এই সকল চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত করিল। তিনি লক্ষ্য করিলেন, নীচেকার সহরে কতকগুলা আলো জ্বলিতেছে। সেণ্ট জেমসের পর্ব্বদিন হইলেও, তিনি প্রাতঃকালেই হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সামরিক আইন অনুসারে সহরের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিতে হইবে। কেবল দুর্গ-প্রাসাদটাই এই হুকুমের ব্যতিক্রমস্থল ছিল। বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, যেখানে তাঁহার নিজের লোক তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন ছিল, সেখানে সঙ্গীন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কিন্তু সহরের মধ্যে একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল; স্পেনীয়েরা উৎসব উপলক্ষে সুরাপানে যে মত্ত হইয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। নগরের অধিবাসিগণ তাঁহার হুকুম তালিম করে নাই কেন, এই বিষয়ের একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতে তিনি বৃথা চেষ্টা করিলেন। এই রহস্যটা তাঁহার নিকট আরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হইল, কেন না, তিনি সেই রাত্রিতেই পুলিশের কাজ করিবার জন্য ও শহরে রোঁদ দিবার জন্য তাঁর সৈনিকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

সহরের নিকটতম প্রবেশ-পথের নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র রক্ষি-গৃহে একটা অ-চেনা পথ দিয়া শীঘ্র পৌঁছিবার উদ্দেশে, যৌবন-সুলভ প্রচণ্ড আবেগ সহকারে প্রাকারের একটা ফাঁক দিয়া লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন—লাফাইয়া পড়িয়া মনে করিয়াছিলেন, আঁচড়-পাঁচড় কাটিয়া কোন প্রকারে শৈল বাহিয়া তিনি নীচে নামিবেন। এমন সময়ে একটা ক্ষীণ মৃদু শব্দ তাঁহার গতিরোধ করিল। তাঁহার মনে হইল, যেন উদ্যানের কঙ্করময় পথে এক জন স্ত্রীলোকের মৃদু পদশব্দ শোনা যাইতেছে। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য সমুদ্রের আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতায় তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গেল; তাহার পরেই একটা অলক্ষণে জিনিস দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—মনে করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়-বিভ্রম হইতেছে। শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত; অনেক দূরে অবস্থিত হইলেও, সেই আলোকে সমুদ্রের জাহাজ তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল। তিনি আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, সাগর-তরঙ্গের উপর পতিত জ্যোৎস্নালোক একটা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে। কিন্তু এই সময়ে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সেনা-নায়ক প্রাকারের ফাঁকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক জন গ্রিনেডিয়ার সৈনিক সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে মাথা বাড়াইতেছে। বুঝিলেন, সেই সৈনিক যাহাকে তিনি দুর্গ-প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিয়াছিলেন।

"নায়ক মহাশয়, আপনি নাকি?" তরুণ সেনা-নায়ক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন:—(একটা ভাবী ঘটনা-জ্ঞান তাঁহাকে যেন সাবধান করিয়া দিয়াছিল।)

"হাঁ, ব্যাপারখানা কি?"

"নীচে ঐ হতভাগারা গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে এবং আপনার অনুমতিক্রমে যত শীঘ্র পারি, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি।"

ভিক্টর মার্‌শাঁ উত্তর করিলেন:—"ব'লে যাও—তার পর?"

"এক জন লোক লণ্ঠন হাতে ক'রে এই দিক দিয়ে আসছিল, আমি এইমাত্র তার অনুসরণ করছিলাম। লণ্ঠন হাতে—খুবই সন্দেহ হয়। এই গভীর রাত্রে সেই ভদ্রলোকের আলো জ্বালা আবশ্যক ছিল বলে মনে হয় না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—ওদের ইচ্ছে—'আমাদের একেবারে গিলে ফেলে!' আমি তাই ওর পিছু পিছু চল্লাম; আর দেখ্‌তে পেলাম, এখান থেকে দুই তিন পা দূরে, কতকগুলা জ্বালানী কাঠ রয়েছে।"

হঠাৎ নীচে সহরের ভিতর দিয়া একটা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল—লোকটা কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সেনা-নায়কের মুখের উপর একটা আলোকের ঝলক আসিয়া পড়িল; সেই গ্রিনেডিয়ার সৈনিক বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ১০ পা দূরে একটা উৎসব-বহ্নি হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। নৃত্যশালায় গানবাদ্য ও হাসির শব্দ একেবারে থামিয়া গেল। উৎসবের আমোদ উল্লাসের পরিবর্ত্তে, মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল—মধ্যে কেবল, আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। তাহার পর, শুভ্র সাগর-তরঙ্গের উপর দিয়া কামানের গর্জ্জন শ্রুত হইল।

সেনা-নায়কের ললাটে শীতল স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার অসি পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি

বুঝিয়াছিলেন, তাঁর লোকেরা নিহত হইয়াছে এবং ইংরাজরা উপকূলে অবতরণ করিতে সমুদ্যত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে অপমানিত হইতে হইবে। তাঁহাকে কোর্ট-মার্শালের বিচারে আহ্বান করা হইবে। এক মুহূর্ত্ত নজর করিয়া দেখিলেন,—উপত্যকা কতটা গভীর। তাহার পরেই নীচে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত—এমন সময়ে ক্লারা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

ক্লারা বলিল :—"পালাও! আমার পিছনে, আমার ভাইরা আস্‌ছে তোমাকে হত্যা করতে। ঐ নীচে শৈলের পাদদেশে জুয়ানিতোর ঘোড়া আছে, দেখ্‌তে পাবে। যাও!"

ক্লারা সেনানায়ককে ঠেলিয়া দিল। তরুণ সেনা-নায়ক বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু যে আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি মহা বীরপুরুষকেও কখনও পরিত্যাগ করে না, সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেনা-নায়ক শৈল হইতে শৈলান্তরে লাফাইয়া পড়িয়া, অচেনা পথ দিয়া সেই নির্দ্দেশিত স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি হত্যাকারীদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার কানের পাশ দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া গুলীর আওয়াজ হইতেছিল। অবশেষে তিনি শৈলের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিয়া পলাইলেন।

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ তরুণ সেনা-নায়ক সেনাপতি "জী"র আবাসস্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। সেনাপতি তখন স্বকীয় সহকারিবর্গের সহিত আহারে বসিয়াছিলেন। কোটরে-ঢোকা চোখ শ্রান্তক্লান্ত মেন্দার সেনা-নায়ক বলিয়া উঠিলেন :—"আপনার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ করলাম!"

সেনা-নায়ক একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং এই ভীষণ ঘটনার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। ভীতি-প্রদ নিস্তব্ধতা সহকারে ইহা গৃহীত হইল।

ভীষণ সেনাপতি অবশেষে বলিলেন :—"আমার মনে হয়, তোমার ততটা অপরাধ নেই—বরং এ স্থলে তুমি দয়ার পাত্র। স্পেনীয়দের অপরাধের জন্য তুমি দায়ী নও, মার্শাল যদি অন্য নিষ্পত্তি না করেন, আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।"

কিন্তু এই কথাগুলিতে হতভাগ্য সেনা-নায়ক তেমন সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—"যখন সম্রাট্ এই কথা শুনিবেন!" সেনাপতি বলিলেন :—"তোমাকে গুলী করাই তাঁহার অভিমত হবে; তবে দেখা যাক, আমরা এ বিষয়ে কি করতে পারি।"

তার পর কঠোরভাবে বলিলেন :—"এখন এ বিষয় সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বল্‌ব না। এখন কেবল এমন একটা প্রতিশোধের মৎলব ঠাওরাতে হবে, যাতে ক'রে এই দেশে একটা স্বাস্থ্যকর আতঙ্ক উৎপন্ন হ'তে পারে; যেখানকার লোকরা অসভ্য বুনোর মত যুদ্ধ করে, সেখানে ঐ রকমের একটা কিছু উপায় অবলম্বন করা দরকার।"

এক ঘণ্টা পরে, সমস্ত রেজিমেণ্ট, অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বিচ্ছিন্ন দল, এবং তোপের একটা শকটশ্রেণী রাস্তায় বাহির হইল। সৈন্যশ্রেণীর অগ্রভাগে চলিলেন সেনাপতি ও সেনা-নায়ক মার্শাঁ। তাঁহাদের সাথীদিগের দশা কি হইয়াছে, সৈনিকদিগকে পূর্ব্বেই জানানো হইয়াছিল। তাই তাহাদের ক্রোধের সীমা ছিল না। সৈনাধ্যক্ষের আড্ডা ও মেন্দা সহর—ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরত্বের ব্যবধান অলৌকিক দ্রুতবেগে লঙ্ঘিত হইল। সব গ্রামগুলাই অস্ত্রধারণ করায় উহাদিগকে ঘেরাও করিয়া, উহাদের অধিবাসীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়।

ঘটনাক্রমে ইংরাজের জাহাজগুলা তখনও বার-দরিয়ায় ছিল, তখনও উপকূলের নিকটে আসে নাই। ইংরাজের জাহাজ আসিতেছে দেখিয়া মেন্দার অধিবাসীরা সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। এখন তাহারা নিরাশ হইল। একটা আঘাত করিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই ফরাসী সৈন্য উহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ইহাতে উহাদের মধ্যে এমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, উহারা ইচ্ছা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

দেশসেবার আবেগে, একটা ঝোঁকের মাথায়, ফরাসীদের হত্যাকারীরাও (স্পেনের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে) আপনা হইতে আসিয়া ধরা দিল। এইরূপে উহারা মনে করিয়াছিল, মেন্দা নগরটিকে বাঁচাইবে; কেন না, নিষ্ঠুরতার জন্য সেনাপতির যেরূপ খ্যাতি ছিল, তাহাতে উহাদের মনে হইয়াছিল, উহারা আত্মসমর্পণ না করিলে, সেনাপতি সমস্ত নগরটিকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিবে এবং সমস্ত অধিবাসীদিগকে অসির দ্বারা নিহত

করিবে। সেনাপতি জী—উঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। আরও এই করার করাইয়া লইলেন যে, নিম্নতম ভৃত্য হইতে মার্কিস পর্য্যন্ত দুর্গপ্রাসাদে সমস্ত লোককেই আত্মসমর্পণের জন্য তাঁহার নিকট আনিয়া হাজির করিতে হইবে। উঁহারা এই সকল সর্ত্তে রাজি হইলে,—সেনাপতি অঙ্গীকার করিলেন—অবশিষ্ট নগরবাসীর আর প্রাণদণ্ড করিবেন না এবং নগর লুণ্ঠন বা নগরদাহ করিতে সৈন্যদিগকে নিষেধ করিবেন। একটা বেশী রকমের অর্থদণ্ড নির্দ্ধারিত হইল, এবং সেই অর্থ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে আদায় হয়, এইজন্য কতকগুলি মাতব্বর ধনী লোককে জামিন রাখা হইল।

যাহাতে সৈন্যেরা নিরাপদে থাকে, এই জন্য সেনাপতি প্রয়োজনমত সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, সেই স্থানের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিলেন, এবং নগরের গৃহে গৃহে তাঁহার সৈনিকদিগকে বাস করিতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন। সমস্ত স্থানের উপর সৈন্য-প্রহরী বসাইয়া তাহার পর সেনাপতি দুর্গপ্রাসাদে গিয়া বিজয়ীর মত প্রবেশ করিলেন। মার্কিস-লেগানিসের সমস্ত পরিবারমণ্ডলী ও ভৃত্যবর্গের মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া মুখ বন্ধ করা হইল এবং বৃহৎ নৃত্যশালার মধ্যে বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর খুব সতর্কভাবে পাহারা দেওয়া হইতে লাগিল। সহরের উর্দ্ধদেশে যে দীর্ঘ অলিন্দ প্রসারিত ছিল, সেই সমস্ত অলিন্দ জানলা হইতে সহজেই দেখা যাইতেছিল।

পাশের বারান্দায় সেনাপতির সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইংরাজদিগের অবতরণ নিবারণ পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সেনাপতি উঁহাদিগকে লইয়া একটা সভা বসাইলেন।

মার্সালের নিকট সেনাপতির এক জন পার্শ্বচরকে পাঠান হইল; সমস্ত উপকূলের ধারে তোপ বসাইতে হুকুম দেওয়া হইল; তাহার পর সেনাপতি ও তাঁহার সহকারিবর্গ কয়েদীদের সম্বন্ধে মনঃসংযোগ করিলেন। নগরবাসীরা যে ২০০ স্পেনীয়কে পাঠাইয়াছিল, তাহাদিগকে সেই অলিন্দের উপরে তখনই গুলী করা হইল। এই সামরিক প্রাণদণ্ডবিধানের পর নৃত্যশালায় যে সব বন্দী ছিল, সেই বন্দীদের জন্য ঐ স্থানেই ফাঁসি-কাষ্ঠ উঠাইতে বলা হইল এবং নগরের বাহির হইতে এক জন জল্লাদকে ডাকিতে পাঠান হইল। আহারের পূর্ব্বে যে একটু অবসর-সময় ছিল, সেই সময়ের সুযোগ লইয়া সেনানায়ক ভিক্টর-মার্শা কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে গেলেন। তাহার পর শীঘ্রই সেনাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবং আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন:—"আমি তাড়াতাড়ি এলাম, একটা অনুগ্রহের ভিখারী হ'য়ে।"

সেনাপতি তিক্ত বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিলেন:—"কি! তুমি?"

ভিক্টর উত্তর করিলেন:—"হাঁ, একটা অনুগ্রহ চাইতেই এসেছি। মার্কিস্ হাড়কাঠ উঠানো হচ্চে দেখেছেন—তিনি চান, তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে প্রাণদণ্ডটার পরিবর্ত্তে আর কোন লঘু দণ্ড হয়; শুধু আমীর-ওমরাওদের প্রাণদণ্ড করা হোক। তিনি এই অনুনয় করছেন।"

সেনাপতি বলিলেন:—"প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেম।"

"তাঁহার আর একটা প্রার্থনা এই যে, তাঁহার পরিবারবর্গকে ধর্ম্মের সান্ত্বনা হ'তে বঞ্চিত করা না হয় এবং তা'দের অবিলম্বে কারামুক্ত করা হয়। তাহারা কথা দিচ্ছে, তাহারা পালাবার চেষ্টা করবে না।"

"আচ্ছা, তাও স্বীকার। কিন্তু এর জন্য জবাবদিহি তোমার।"

"বৃদ্ধ মার্কিস্ আরও বলছেন, যদি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনি ক্ষমা করেন, তা হ'লে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে তিনি দান করবেন।"

সেনাপতি বলিলেন:—"বটে! রাজা জোসেফের তহবিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ত আগেই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।" একটু থামিলেন। একটু অবজ্ঞার ভাবে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার পর আবার বলিলেন:—"তারা যা চাচ্ছে, তার চেয়েও একটা ভাল কায আমি করব। তাঁর শেষ প্রার্থনার অর্থ আমি বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ। ভাবী বংশপরম্পরাক্রমে তাঁর নাম চল্‌বে। কিন্তু যেখানেই এই নামের উল্লেখ হবে, সমস্ত স্পেন তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাহার দণ্ডের কথা স্মরণ করবে। মার্কিসের ছেলেদের মধ্যে যে-কোন ছেলে জল্লাদের কায করবে, আমি তাকেই তাঁর সম্পত্তি ও তার প্রাণ দান করব। * * * এই শেষ কথা, আর তাদের সম্বন্ধে আমাকে আর কিছু বোলো না।"

ডিনার প্রস্তুত ছিল। ক্ষুধিত সামরিক কর্ম্মচারীরা

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহারে বসিল। উহাদের মধ্যে কেবল এক জন অনুপস্থিত ছিল—সে ভিক্টর মার্শ। অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া তিনি নৃত্যশালায় গেলেন এবং সেখানে গিয়া গৌর-বান্বিত লেগান্‌-বংশের গর্ব্বিত বংশধরদিগের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইলেন। তিনি বিষণ্ণচিত্তে এই দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে দেখিলেন। সবে গত রাত্রে এই নাট্যশালাতেই কতকগুলি বালিকার মুখ তিনি দেখিয়াছিলেন, যাহারা নাচিতে নাচিতে তাঁহার পাশদিয়া চলিয়া গিয়াছিল; এবং তিন তরুণ ভ্রাতাদিগের অল্পসময়ের মধ্যেই আজ ঐ তরুণীদেরও সুন্দর মস্তক জল্লাদের খড়্গাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইবে মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ঐ ওখানে পিতা, মাতা এবং তাহাদের তিন পুত্র ও দুই কন্যা বসিয়া আছে—একেবারে নিশ্চল,—তাহাদের গিল্টিকরা-চৌকীতে শৃঙ্খলবদ্ধ। হাত-বাঁধা চার জন পরিচারক তাহাদের পিছনে দণ্ডায়মান। এই ১৫ জন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে—গম্ভীরভাবে উহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতেছে। উহাদের চোখ্ দেখিয়া উহাদের মনের কথা বুঝা যায় না; কিন্তু উহাদের উত্তম চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে, এই ভাবনা-জনিত একটা হাল-ছাড়িয়া-দিবার ভাব, একটা গভীর নৈরাশ্যের ভাব উহাদের অনেকেরই ললাটে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নির্ব্বিকারচিত্ত যে সকল সৈনিক পাহারা দিতেছিল, তাহারাও তাহাদের দারুণ শত্রুদিগের কষ্ট সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। যখন ভিক্টর প্রবেশ করিল, তখন একটা কৌতূহলের রশ্মিচ্ছটায় সকলের মুখ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বন্দীদিগের বন্ধন মোচন করিতে হুকুম দিলেন এবং ক্লারার বন্ধনটা স্বয়ং মোচন করিলেন। ক্লারা তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু বিষণ্ণভাবে হাসিল। তরুণীর বাহু একটু লঘুভাবে স্পর্শ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তরুণীর কালো চুল ও সরু মাজা মনে মনে তারিফ্ করিতে লাগিলেন। তরুণী স্পেনেরই প্রকৃত দুহিতা ছিল—মুখের রং স্পেনবাসীর মত, চোখ স্পেনবাসীর মত, কাকের চেয়েও কালো, চোখের পক্ষ্মরাজি দীর্ঘ ও ঈষৎ বঙ্কিম। তরুণী একটু বিষাদের হাসি হাসিল—সেই হাসিতে তখনও পর্য্যন্ত বালিকাসুলভ একটা মাধুর্য্য ছিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল:—"আপনার চেষ্টা কি সফল হয়েছে?"

ভিক্টর মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা শব্দ বাহির হইল। তিনি ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া, ক্লারার মুখের দিকে চাহিলেন—আবার সেই তিন তরুণ স্পেনীয়ের মুখের পানে তাকাইলেন। যে ভাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাহার বয়স ৩০; সে বেঁটে, শরীরের গঠনও তেমন সুঠাম নহে। তাহাকে দেখিতে উদ্ধত ও গর্ব্বিত, কিন্তু তাহার ধরণধারণে একটু আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য যে ছিল না, এরূপ নহে। বেশ মনে হয়, প্রাচীন স্পেনের ক্ষাত্রসমাজে যে একটা সুকুমার ধরণের অনুভূতি ছিল, সেই অনুভূতি এই যুবকের অপরিচিত ছিল না। ইহার নাম—জুয়ানিতো। মধ্যম ভ্রাতা ২০ বৎসরের। সে তাহার ভগিনী ক্লারার মত; এবং সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স ৮ বৎসর। সবাইকে এক নজরে দেখিয়া লইয়া, ভিক্টর হতাশ হইয়া পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে কোন একজন সেনাপতির প্রস্তাবটা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে! তবু, তিনি এই কাযের ভারটা ক্লারার হাতে সমর্পণ করিলেন। সেই স্পেনীয় বালিকার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, তাহার পিতার সম্মুখে নতজানু হইল। সে বলিল:—"বাবা, জুয়ানিতোকে শপথ করিয়ে লও,—তুমি যে হুকুম দেবে, সে তাই পালন করবে। তা হলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

মার্কিস-পত্নী আশার আবেগে কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু যখন স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া ক্লারার ভীষণ গুপ্তকথাটা জানিতে পারিলেন, তখনই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জুয়ানিতো সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল, সে পিঞ্জর-বদ্ধ সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। মার্কিসের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বশ্যতার করার লইয়া, ভিক্টর আপনার ঝুঁকিতে সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

ভৃত্যরা জল্লাদের সমীপে নীত হইল। যখন ভিক্টর ঘরের ভিতর পাহারা দিতেছিলেন, সেই সময় মার্কিস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন:—"জুয়ানিতো!"

ইহার উত্তরে জুয়ানিতো শুধু এমনভাবে মাথা নত করিয়া রহিল—যাহার অর্থ—অসম্মতি। জুয়ানিতো একটা চৌকীতে বসিয়া পড়িয়া, নিরশ্রুনয়নে তাহার পিতামাতার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

ক্লারা তাহার কাছে গিয়া তাহার কোলে বসিল এবং হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার নেত্রপল্লব চুম্বন করিতে লাগিল—তার পর হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল :—"ভাই জুয়ানিতো, তুমি শুধু যদি জান্‌তে, তোমার হাতে আমার মৃত্যু কত মধুর হবে! জল্লাদদের জঘন্য আঙ্গুলের স্পর্শ ঘাড় পেতে নিতে আমাকে তা হ'লে বাধ্য হ'তে হবে না। ভাবী অমঙ্গল অত্যাচার হতেও তুমি আমাকে ছিনিয়ে আন্‌তে পারবে—আর, ... প্রাণের ভাই আমার—জুয়ানিতো! আমি যে আর কারও হব—এ কথা মনে করতেও তোমার পক্ষে অসহ্য হবে—তা হ'লে?"

ক্লারার মখমলকোমল নেত্রদ্বয় ভিক্টরের উপর একটা অগ্নিময় জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনে হইল, যেন সে জুয়ানিতোর হৃদয়ে ফরাসী-বিদ্বেষ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহার ভাই ফিলিপ বলিল :—"সাহস কর ভাই—নৈলে আমাদের রাজবংশ লুপ্তপ্রায় হবে।"

হঠাৎ ক্লারা উঠিয়া দাঁড়াইল। জুয়ানিতোকে ঘিরিয়া যে কয়জন ছিল, তাহারা পিছাইয়া গেল। তখন, অসম্মত হইবার যাহার সঙ্গত কারণ ছিল, সেই পুত্র তাহার বৃদ্ধ পিতার সম্মুখীন হইল। মার্কিস গুরুগম্ভীরভাবে বলিলেন :—

"জুয়ানিতো, তোমার উপর আমার এই আদেশ!"

যুবক "হাঁ" "না" কিছুই বলিল না। কোন প্রকার ইসারা-ইঙ্গিতও করিল না। তখন তাহার পিতা তার সম্মুখে নতজানু হইলেন। অনুনয়ের ভাবে হাত বাড়াইয়া দিয়া, ক্লারা, মানুয়েল ও ফিলিপ—উহারাও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ঐ ভাই-ই উহাদের বংশকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবে—উহারা এই কথা বলিয়া যেন পিতার কথারই প্রতিধ্বনি করিল।

"বৎস, স্পেনবাসীর ধৈর্য্যবীর্য্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি তোমাতে কি নাই? তুমি কি আমাকে এইরূপ নতজানু করেই রাখবে? নিজের প্রাণের কথা, নিজের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা ভাববার তোমার কি-অধিকার আছে?"—তাহার পর স্বীয় পত্নীর দিকে ফিরিয়া বৃদ্ধ মার্কিস বলিলেন :—"রাণি! এ কি আমার পুত্র?" মনের যন্ত্রণায়, রাণী বলিয়া উঠিলেন :—

"ও সম্মতি দেবে।" তিনি জুয়ানিতোর ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হইতে দেখিয়াছিলেন—এই ইঙ্গিতের অর্থ কেবল তার মা-ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মধ্যম কন্যা মার্কিটা তা'র সরু বাহুতে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া, নতজানু হইয়া বসিল। তাহার চোখ দিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিতেছিল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার ভাই মানুয়েল তাহাকে ধমক দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, দুর্গ-প্রাসাদের পাদ্রী প্রবেশ করিলেন; সমস্ত পরিবার তাঁহাকে ঘিরিয়া জুয়ানিতোর সম্মুখে তাঁহাকে লইয়া গেল। ভিক্টরের এই দৃশ্য আর সহ্য হইল না, ক্লারাকে একটা ইসারা করিয়া আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সেনাপতি খুব চেঁচামেচি বকাবকি করিবার মেজাজে আছেন। সৈনিক কর্ম্মচারীরা সকলে মিলিয়া তখনও পানাহারে ব্যাপৃত ছিল। সুরাপানে তাহাদের মুখ খুলিয়া গিয়াছিল—তাহারা বক্তার হইয়া পড়িয়াছিল।

এক ঘণ্টা পরে "লেগানে" বংশীয়দের প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য, সেনাপতির আদেশ-অনুসারে মেন্দার ১০০ জন অধিবাসীকে অলিন্দে উপস্থিত হইতে তলব্ করা হইয়াছিল। স্পেনীয় নাগরিকদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্যকেও মোতায়েন রাখা হইয়াছিল। মার্কিসের ভৃত্যদিগের যেখানে ফাঁসি হইবে, সেই ফাঁসি-কাঠের নীচে নাগরিকদিগকে জমা করা হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডার্হ ধর্ম্মবীরদিগের পদ-প্রান্ত প্রায় নাগরিকদিগের মস্তক স্পর্শ করিতেছিল। ৩০ পা দূরে ছিল হাড়িকাঠ। তাহার উপর একটা খাঁড়ার ফলা ঝিকমিক করিতেছিল। জুয়ানিতো যদি শেষ মুহূর্ত্তে অস্বীকার করে, এই জন্য সেই হাড়ি-কাঠের পাশে সরকারী জল্লাদ দাঁড়াইয়া ছিল।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে বহুলোকের পদশব্দ, এক দল সৈন্যের তালে তালে পা-ফেলার শব্দ, এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল—যে আহার-টেবলে সৈনিক কর্ম্মচারীরা আহার করিতেছিল, সেই স্থান হইতে তাহাদের উচ্চ বাক্যালাপ ও হাসির গর্‌রা আসিতেছিল।

দুর্গ-প্রাসাদের দিকে সকলে চোখ ফিরাইল। দেখিল, মার্কিসের সমস্ত পরিবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য

শান্তভাবে বাহির হইতেছে। সকলেরই প্রশান্ত ললাট। কেবল উহাদের মধ্যে এক জন—কোটর-গত-চক্ষু ও চিন্তাভিভূত—পুরোহিতের বাহুতে ভর দিয়া আছে; পুরোহিত ধর্ম্মের যত রকম সান্ত্বনা আছে, সমস্তই সেই ব্যক্তিকে শুনাইয়েছে; একমাত্র সেই বাঁচিয়া থাকার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

তার পর, দর্শকদিগের ন্যায় সরকারী জল্লাদও জানিত—এক দিনের জন্য জুয়ানিতো জল্লাদের কায করিতে রাজি হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কিস ও তাঁহার পত্নী, ক্লারা ও মার্কিটা, এবং তাহাদের দুই ভাই, সেই বধ্যভূমি হইতে কয়েক পা দূরে নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। পুরোহিত জুয়ানিতোকে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিল। জুয়ানিতো যখন হাড়ি-কাঠের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, জল্লাদ তাহার আস্তিন ধরিয়া টানিল এবং বোধ হয় কিছু উপদেশ দিবার জন্য তাহাকে একান্তে লইয়া গেল। পাদ্রী বধ্যদিগকে এমন ভাবে রাখিয়াছিলেন যে, প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা তাহাদের নেত্রগোচর না হয়। কিন্তু সকলেই স্পেনবাসীর ন্যায় নির্ভীকভাবে খাড়া হইয়া ছিল।

সকলের আগে ক্লারা তাহার ভায়ের পাশে ছুটিয়া গেল এবং তাহাকে বলিল,—"জুয়ানিতো, আমার তেমন সাহস নাই—আমাকে ক্ষমা কর। সবার আগে আমাকে নেও।"

যখন ক্লারা এই কথা বলিতেছিল,—এক জন লোকের ছুটিয়া আসিবার পদধ্বনি প্রাচীরের দিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ভিক্টর বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ক্লারা হাড়ি-কাঠের সম্মুখে নতজানু হইয়াছিল;—যেন সে তাহার শুভ্র স্কন্ধের উপর নিপতিত হইবার জন্য খাঁড়াটাকে আহ্বান করিতেছিল। সেনা-নায়ক মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; কিন্তু আপনাকে একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া ক্লারার সমীপে ছুটিয়া গেলেন এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সেনাপতি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিবেন।"

স্পেনীয় বালিকা, সেনা-নায়কের দিকে চাহিয়া একটা সগর্ব্ব অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ হানিল। সে গভীর-স্বরে বলিল:—"এইবার, জুয়ানিতো!"

ভিক্টরের পাদমূলে তাহার মস্তক গড়াইয়া পড়িল। লেগানের রাণীর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা অদম্য কাঁপুনী চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন মুখে প্রকাশ করিলেন না।

কনিষ্ঠ ভাই মানুয়েল, জুয়ানিতোকে জিজ্ঞাসা করিল:—"ভাই জুয়ানিতো, এই কি আমার যায়গা? সব ঠিক ত?"

জুয়ানিতোর ভগিনী মার্কিটা যখন আসিল, তখন জুয়ানিতো বলিল:—"ও! মার্কিটা, তুমি যে কাঁদছ!"

বালিকা বলিল:—"আহা! ভাই জুয়ানিতো, তোমার কথাই আমি ভাব্‌ছি; আমরা সবাই চ'লে গেলে তুমি কি অসুখীই হবে!"

তাহার পর মার্কিসের দীর্ঘ মূর্ত্তি অগ্রসর হইল। যে স্থান তার ছেলেদের রক্তে ধৌত হইয়াছে, সেই হাড়-কাঠের দিকে একবার তিনি তাকাইয়া দেখিলেন, এবং জুয়ানিতোর দিকে হাত বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—

"স্পেনীয়গণ! আমি আমার পুত্রকে পিতার আশীর্ব্বাদ দিতেছি। 'নির্ভয় ও নিষ্কলঙ্ক' মার্কিসের এই গৌরবান্বিত উপাধির সম্মান রেখে তুমি নির্ভয়ে ও অকলঙ্কিত হয়ে এইবার আঘাত কর।"

কিন্তু যখন তাহার মা পুরোহিতের বাহু অবলম্বন করিয়া নিকটে আসিল, জুয়ানিতো বলিয়া উঠিল:—"আমি যে ওঁর স্তনপান ক'রে মানুষ হয়েছি।" জুয়ানিতো এমন স্বরে এই কথাগুলি বলিয়াছিল যে, জনতার মধ্য হইতে একটা বিভীষিকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ভীষণ ধ্বনির সম্মুখে, সেনাধ্যক্ষদিগের সুরা-জনিত হাস্যপরিহাসের কোলাহল নিবিয়া গেল। রাণী বুঝিয়াছিলেন, জুয়ানিতোর সাহসে আর কুলাইতেছে না। তিনি এক লম্ফে গরাদে ঘেরা স্থানে উঠিয়া পড়িলেন এবং সেইখান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। নীচেকার শৈলখণ্ডগুলায় লাগিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী হইতে একটা বাহবা-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। জুয়ানিতো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই সময়ের মধ্যে এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী আধা-মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল; মার্শ্যাঁ এই প্রাণদণ্ডের সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌ছিল; "আমি বাজি রাখতে পারি, এই প্রাণদণ্ড আপনার হুকুমে হয়নি—"

সেনাপতি বলিলেন:—"তোমরা কি ভুলে যাচ্চ, এক মাসের মধ্যে ফ্রান্সের ৫০০ পরিবার শোকসাগরে ভাসবে

এবং আমরা এখনও স্পেনের ভিতরেই আছি। তোমরা কি চাও, আমাদের অস্থিগুলা এইখানে রেখে যাই?"

এই বক্তৃতার পর, টেবলের এক জন লোকও—সুরা-পাত্রস্থ সুরা নিঃশেষ করিতে সাহস পাইল না।

লেগানের মার্কিসকে সকলেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত এবং স্পেনের রাজা আভিজাত্যের সনন্দের হিসাবে "মহাজল্লাদ" এই উপাধিতে মার্কিসকে ভূষিত করিয়াছিলেন—ইহা সত্বেও, একটা তীব্র যাতনা তাঁহার হৃদয়কে কুরিয়া খাইতেছিল। তিনি এখন সংসার হইতে অবসর লইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছেন;—লোকালয়ে প্রায়ই বাহির হন না। তাঁহার বীরোচিত মহা-অপরাধের গুরু-ভার তাঁহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে—এবং মনে হয় যেন, তিনি আর এক পুত্রের জন্মকালের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন; আর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, এবং যে যমলোক তাঁহাকে অবিরাম ভয় দেখাই-তেছে, তখন তিনি সেই যম-লোকে নির্ভয়ে যাইতে পারিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিরসঙ্গী

তুমি ভুবন ভরিয়া আমারে ঘিরিয়া
সতত যে দাও দেখা,
মোর অবোধ হৃদয় বুঝিতে না পারে,
ভাবে শুধু 'আমি একা'।

যবে বিজন সন্ধ্যায় রহে গো হৃদয়
বিষাদে আঁধার পারা,
তুমি মলয় হইয়া অলকে আসিয়া
দাও সোহাগের নাড়া।

আমি তটিনীর জলে অবগাহি যবে
মরম-জ্বালায় বড়,
তুমি লহরী হইয়া শত বাহু দিয়া
আমারে আবরি' ধর।

আমি ভুলা'তে আপন অধীর মনেরে
যবে ব'সে মালা গাঁথি,
তুমি সম্মুখে আসিয়া হও গো আমার
বনফুল নানা জাতি।

আমি বিরহ-শয়নে তৃষিত নয়নে
যবে ব'সে নিশা যাপি,
তুমি বাতায়ন দিয়া জ্যোছনা হইয়া
আমারে রহ গো ব্যাপি'।

আমি ব্যাকুল পরাণ তুষিবার তরে
যবে ব'সে গাহি গান,
তুমি রাগিণীর মাঝে এসে ওঠ বেজে
ভরে দাও মম প্রাণ।

আমি যবে নিশিশেষে স্বপন ভাঙ্গিয়া
রহি গো হতাশ বুকে,
তুমি সোনার বরণে উষার কিরণে
আসি' চুমা দাও মুখে।

আমি পাসরিতে যবে মনের বেদনা
কবিতা রচিতে যাই,
তুমি ভাব-মাঝে আসি' হও গো উদয়
ভাবি ব'সে শুধু তাই।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা কর।

নন্দন-বন্দর

আরব দেশের মরুসমুদ্রের তটপ্রান্তে মুসলমানের ধর্ম্মনগর জেড্ডা অবস্থিত। এই বন্দরটি ৩০ কোটি মুসলমানের নিকট পরম পবিত্র, কারণ, মক্কাতীর্থে যাইতে হইলে এই বন্দরে অবতীর্ণ হইতে হয়। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট এই বন্দর নন্দন উদ্যানে প্রবেশের পথ বলিয়া পরিচিত।

জেড্ডার বিস্তৃত বিবরণ অন্যান্য ভাষায় পাওয়া গেলেও, বাঙ্গালা ভাষায় ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। সুতরাং মক্কাতীর্থে যাইবার এই বন্দর সম্বন্ধে আলোচনা করায় লাভ আছে।

লোহিত সমুদ্রের ধারে এই মরুবন্দরটি অবস্থিত। সহরটি যে বিশেষ পরিচ্ছন্ন অথবা বৃহৎ, তাহা ঠিক বলা যায় না। মার্কিণ ও য়ুরোপীয় পর্য্যটকগণ এই বন্দর সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, জেড্ডাবন্দরে কোনও পান্থনিবাস বা হোটেল নাই। টমাস্ কুক্ কোম্পানী পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আপিস খুলিয়াছেন, অথবা ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার জন্য প্রত্যেক প্রসিদ্ধ নগরে প্রতিনিধি রাখিয়াছেন; কিন্তু জেড্ডা সহরে তাঁহাদের কোন কার্য্যকারক এ পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন নাই। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এখানে প্রত্যক্ষ করা যাইবে—প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নগরের রাজপথ অথবা সঙ্কীর্ণ গলিরাস্তা দিয়া আনাগোনা করিলেও কখন কোথাও চিত্রপূর্ণ পোষ্টকার্ড একখানিও দেখিতে পাওয়া যাইবে না। রঙ্গালয়, প্রমোদোদ্যান, প্রশস্ত রাজপথ অথবা নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুকের চিহ্ন পর্য্যন্ত সেখানে নাই। কোনও বিদেশী সেখানে গমন করিলে আপনাকে যেন বন্দী বলিয়া মনে করিবে, কারণ, তাহার চারিদিকে শুধু উন্নতশীর্ষ পাষাণ-প্রাচীর—যেন তাহার বাহিরে বিনা আদেশে তাহার যাইবার উপায় নাই।

যুবরাজ আমীর আলি—বর্ত্তমান মক্কার অধিপতি রাজা হুসেনের জ্যেষ্ঠপুত্র

নগরের শোভা সম্বন্ধে প্রশংসনীয় কিছু না থাকিলেও জেড্ডায় যত অধিকসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়া থাকে, এরূপ খুব কম স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। বহু দূর—দেশান্তর হইতে প্রতি বৎসর শত শত অর্ণবপোত যাত্রিপূর্ণ হইয়া এই বন্দরে গতায়াত করিয়া থাকে। সেই সকল পোতে সহস্র সহস্র নরনারী, বালক-বালিকা তীর্থ দর্শন করিতে আইসে। মরু-সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী এই বন্দরে আসিবার জন্য ৩০ কোটি নর-নারীর হৃদয় সর্ব্বদাই উন্মুখ। সারাজীবন ধরিয়া তাহাঁরা এই স্বপ্নকে সার্থক করিতে চাহে। জেড্ডায় না আসিলে আল্লার পবিত্র মন্দির মক্কায় যাওয়া যায় না, তাই মুসলমানের নিকট জেড্ডা স্বর্গোদ্যানে প্রবেশের পথ বা বন্দর বলিয়া পরিগণিত।

প্রকাণ্ড তোরণপথে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে যে পথটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিসর্পিত হইয়া বাজারে গিয়া মিশিয়াছে। সঙ্কীর্ণ পথগুলিতে প্রবেশ করিলেই প্রাচীর জীবনস্পন্দন অনুভূত হয়। পরিপুষ্ট-ওষ্ঠ মসৃণ-কৃষ্ণ কাফ্রী ক্রীতদাস, ফেজ টুপীওয়ালা তুর্কী, ছিন্নবাস পথচারী দরবেশ এবং কুষ্ঠরোগী ভিক্ষুকের দল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,

শীর্ণকায় সারমেয়দল তাহাদের সঙ্গী। পাগড়ীধারী ভারতীয়-গণও তথায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। কোথাও বা গাধার পৃষ্ঠে নগ্নকায় বালকের দল যাই-তেছে। কৃষ্ণ বসনে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া নগ্নপদে রমণীরাও পথ চলিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাদের মুখের উপর অবগুণ্ঠন, তাহাতে বিভিন্ন আকা-রের রৌপ্য, স্বর্ণ ও পিত্তলের মুদ্রা সমূহ দোদুল্যমান। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে রমণীদিগের কৌতূহলদীপ্ত নয়ন দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য বিষয় বেদুইন। মরুভূমিবাসী বেদুইন নরনারী দলে দলে উষ্ট্রসহ নগরমধ্যে আশ্রয় লইয়া থাকে। উষ্ট্রারোহী বেদুইন পুরুষদিগের রৌদ্রপক্ক মূর্ত্তি দেখিলে মনে ত্রাস জন্মে। তাহাদের গা ঘেঁসিয়া গেলেই বিপদ। অমনই তাহারা তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। তাহাদের প্রত্যেকেরই কোমরবন্ধে

অবগুণ্ঠনাবৃত জেড্ডার নারী।

অর্দ্ধচন্দ্রাকার তরবারি অথবা ছোরা দোদুল্যমান। দেখিলেই মনে হইবে, যেন তখনই তাহারা অস্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত। কেতাবে আমরা যে সকল দীর্ঘা-কার আরবের ছবি দেখিতে পাই, উহাদের আকৃতি তেমন দীর্ঘ নহে। ইহারা দেখিতে খর্ব্ব এবং ইহাদের আননের শ্মশ্রুর ভাগও অত্যল্প। পেশীবহুল বেদুইনদিগের আননে শ্মশ্রুর প্রাচুর্য্য নাই বলিলেই চলে।

বাজারে মক্কাযাত্রীর সংখ্যাই অধিক। স্থানীয় অধিবাসীরা তীর্থ-যাত্রীদিগকে পাইয়া বসে এবং সাধারণতঃ নানা উপায়ে তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া লয়। এড়োয়ার্ড সলিস্‌বরি নামক জনৈক মার্কিণ পর্য্যটক জেড্ডায় গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর এক স্থলে লিখিয়াছেন, "আমরা যখন নগরে প্রবেশ করিলাম, তখন মক্কাযাত্রীর সংখ্যা তথায় অত্যন্ত অধিক। দেখিলাম, দেশীয়গণ তীর্থযাত্রী-দিগকে ঠিক নেকড়ে-বাঘ ও শৃগালের মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। শীকার পাইলে ব্যাঘ্র ও শৃগালের দল যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলে, ইহারাও তেমনই ভাবে মক্কাযাত্রীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আর কোনও য়ুরো-পীয়কে সেখানে দেখি-লাম না। আমি ও আমার কতিপয়

জেড্ডার আরব—কফি ও ধূমপান করিতেছে।

বেদুইন যোদ্ধা।

সহযাত্রী মাত্র সেই বিরাট মনুষ্য-অরণ্যমধ্যে শ্বেতকায় ছিলাম। পার্শ্বের এক অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া আমরা চলিলাম। কফিখানায় আরবগণ বসিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছিল। তাহারা গম্ভীরভাবে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। পথের দুই ধারে ছোট ছোট দোকানঘর। কোথাও কারিকরগণ তরবারি প্রস্তুত করিতেছে, কোথাও বা আলবোলার নল তৈয়ার হইতেছে। কোনও দোকানে স্বীতোদর বণিকগণ পীতবর্ণ জাফাজাত কমলানেবু, ছোরা, পোষাক অথবা শত প্রকারের কানের দুল লইয়া বসিয়া আছে।”

আদি জননীর সমাধি।

বাজার পার হইয়া গেলে বসতির আরম্ভ। প্রকাণ্ড চারিতল, পাঁচতল, এমন কি, ছয়তল অট্টালিকা যেন গগন ভেদ
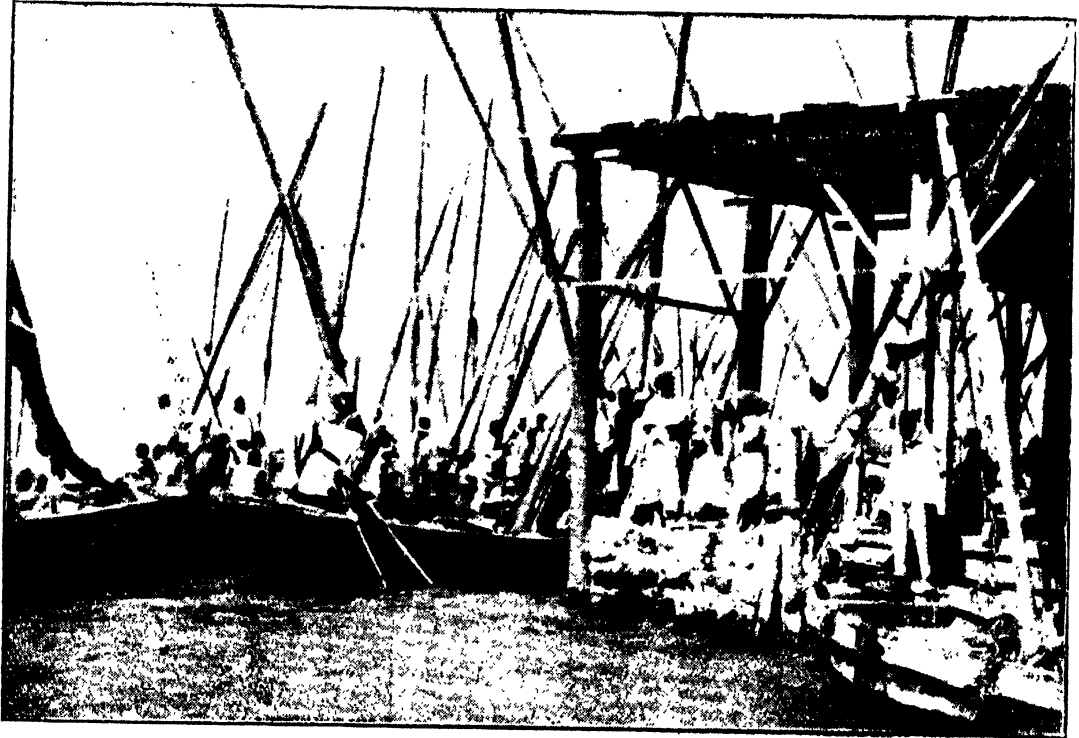
সমুদ্রপথে নৌকাযোগে মক্কাযাত্রীরা জেড্ডার বন্দরে অবতীর্ণ হইতেছে।

করিয়া উঠিয়াছে। প্রবাল, মৃত্তিকা এবং কাষ্ঠ এই তিন পদার্থের সমবায়ে শ্বেতকায় অট্টালিকাগুলি নির্ম্মিত। একটি অট্টালিকাও ঋজুভাবে নির্ম্মিত নহে। প্রত্যেক কোণ যেন বক্র। দেখিলেই মনে হইবে, যেন তাসের ঘর—একবার ঠেলা মারিলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

নগরমধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও হলাণ্ডের পতাকা উড্ডীয়মান। বিভিন্ন রাজশক্তির পতাকাধারী অট্টালিকাসমূহ নগরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। জেড্ডার শাসনকর্ত্তাকে 'কারমাকাম্' বলে।

জেড্ডার পাঁচতল ও ছয়তল অট্টালিকা।

মক্কা হইতে জেড্ডা পর্য্যন্ত টেলিফোন আছে। জেড্ডার শাসনকর্ত্তা প্রয়োজন হইলে শব্দবহ যন্ত্রের সাহায্যে মক্কার অধিপতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

জেড্ডায় বৈদেশিক ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু কোরাণে সুদ লইবার আদেশ নাই বলিয়া মক্কার অধিপতি স্বয়ং কোনও সরকারী ব্যাঙ্ক চালাইবার অনুমোদন করেন নাই। জেড্ডা মরুভূমির প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া এখানে গ্রীষ্ম অত্যন্ত বলবতী। মানুষ সাধারণতঃ এ সকল স্থানে শ্রমবিমুখ হয়। মাত্র ৬ জন য়ুরোপীয় এখানে স্থায়িভাবে আছেন।

জেড্ডার তোরণ—এই পথে যাত্রীরা মক্কায় গমন করে।

রাজা হুসেন মক্কার অধিপতি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর আলি যুবরাজ। রাজা হুসেন এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। আমীর আলি কর্ম্মঠ ও চতুর। তিনি পিতার ন্যায় দক্ষতা দেখাইতে পারিলে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করিতে পারিবেন। রাজা হুসেন হজরত মহম্মদের সাক্ষাৎ বংশধর বলিয়া মুসলমানগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি মক্কার 'সেরিফ্' 'কাবা'র রক্ষক। ধর্ম্মজগতে তাঁহার প্রতিপত্তি অসাধারণ হইলেও, তুরস্কের সুলতান ধর্ম্মস্থান মক্কার প্রকৃত শাসক। এ জন্য তথায় তুরস্কের জনৈক শাসনকর্ত্তা এক দল ফৌজ লইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমরে তুরস্কের সুলতান রাজা হুসেনকে স্বপক্ষে যোগদান করিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সে যুদ্ধে যোগদান করেন নাই; বরং মিত্রশক্তির পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

যুদ্ধের সময় রাজা হুসেন ও যুবরাজ আমীর আলি এবং অন্যান্য পুত্র আরবদিগের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া তুরস্কের মিত্রশক্তির সহায়তা করিয়াছিলেন। জার্ম্মাণ ও তুরস্ক সেই যুদ্ধে সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। রাজা হুসেন ভাবিয়াছিলেন, মিত্রশক্তিকে সহায়তা করার ফলে আরবদেশকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হইবে এবং তিনি আরবদেশের স্বাধীন নরপতিরূপে পরিগণিত হইতে পারিবেন। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন সর্ত্তে রাজা হুসেনের সহিত বৃটিশপক্ষের কোন সন্ধি হইয়া থাকিবে। কিন্তু পরিশেষে মিত্রশক্তি তাঁহাকে শুধু হেদাজের রাজা বলিয়াই ঘোষণা করেন। ইহাতে রাজা হুসেনের মনের ক্ষোভ দূরীভূত হয় নাই। তাঁহার মধ্যম পুত্র আমীর আবদুল্লাকে 'ট্রান্স জর্ডানিয়া'র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করাতেও সে ক্ষোভ নিবারিত হয় নাই। সিরিয়ার সিংহাসন হইতে রাজা হুসেনের অন্যতম পুত্র আমীর ফৈজুলকে বিতাড়িত করায় সে ক্ষোভ বাড়িয়াছিল। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ফৈজুলকে মেসোপটেমিয়ার সিংহাসনে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি তথায় নামে রাজা। সুতরাং রাজা হুসেনের মনের ক্ষোভ ও দুঃখ তাহাতে নিবারিত হয় নাই। মার্কিণ লেখক মিঃ সলিস্‌বরি এই ঘটনার আলোচনাকালে বলিয়াছেন, "রাজা হুসেনের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা তিনি কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সিরিয়া তাঁহার হস্তচ্যুত হইবার পর হইতে তিনি ইংরাজ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিয়া থাকেন, ইংরাজের জবান ঠিক থাকে না। তাঁহারা নাকি শপথ ভঙ্গ করিয়া থাকেন (Violators of sacred pledges.)"

রাজা হুসেন ও তাঁহার পুত্রগণ, সকলেই আরবের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। তাঁহারা সমগ্র আরবদেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহেন। আরবের স্বাধীনতা তাঁহাদের কাম্য। যুদ্ধ দ্বারা সিরিয়াকে ফরাসীর অধিকার হইতে কাড়িয়া লওয়া এখন তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে, তবে তাঁহারা এমন আশা করেন, ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে, যখন য়ুরোপ প্রাচ্যদেশ, প্রাচ্যদেশবাসীর কাছে ফিরাইয়া দিবে। মার্কিণ পর্য্যটকগণের অনেকেই নানা স্থানে নানা ভাবে লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক আরবের মনে এমনই একটা আশা জন্মিয়াছে যে, অদূর-ভবিষ্যতে তাহারা স্বদেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে মার্কিণ পর্য্যটক মিঃ এডোয়ার্ড সলিসবরির উক্তির সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা যুবরাজ আমীর আলি হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি আরবের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিয়াছেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে আরবদেশ আরববাসীদিগের অধিকারেই ফিরিয়া আসিবে। সেখ, সৈনিক, বণিক সকলেই এ সম্বন্ধে একমত দেখিলাম। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইংলণ্ড এক দিন ভারতের শাসনদণ্ড ত্যাগ করিবেন। আফ্রিকা ও আরব দেশ হইতেও তাঁহাদের শাসনপ্রভাব তিরোহিত হইবে। ফরাসী এবং ওলান্দাজগণও তাঁহাদের অধিকৃত স্থানে তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইসলামের পতাকা এক দিন সমগ্র মুসলমান জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহার ছত্রতলে সমবেত করিতে পারিবে। ইহা স্বপ্ন নহে, এক দিন সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবেই।"

জেড্ডা নগরের প্রাচীরের বাহিরে মরু-প্রান্তরের মধ্যে মানবের আদি-জননীর সমাধি বিদ্যমান। এক সমাধিক্ষেত্রের ঠিক মধ্যস্থলেই উহা স্থাপিত। কবরটি কয়েক শত ফুট দীর্ঘ। তিনটি গম্বুজ তাহাতে বিদ্যমান। একটি মাথার কাছে, অপরটি মধ্যস্থলে এবং তৃতীয়টি চরণের নিকট। মুসলমানগণ এ সমাধিটির প্রতি তত্তটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন না বলিয়া শ্বেতাঙ্গ ভ্রমণকারীরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমাধিক্ষেত্রে রমণী ব্যতীত কোনও পুরুষ রক্ষক নাই।

পথচারী ভিক্ষুক।

জুলাই মাসে ধর্ম্মোৎসব হইলেও ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এখানে তীর্থযাত্রীরা আসিতে আরম্ভ করিয়া থাকে। বড় বড় নৌকায় চড়িয়া যাত্রীরা তীরে অবতীর্ণ হয়। সে দৃশ্য দেখিতে অতি চমৎকার।

জেড্ডা হইতে মক্কা ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। মরুভূমির মধ্য দিয়া পথ। পথিমধ্যে নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও প্রবল। এজন্য স্থানে স্থানে রক্ষিনিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজার সেনাদল পথ রক্ষা করিয়া থাকে। বেদুইন দস্যুগণ তথাপি ডাকাতি করিতে বিরত হয় না। তাহারা কোনও যাত্রীকে সুবিধায় পাইলে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলে। তার পর যাহা কিছু পায়, লুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করে। কোন কোন স্থানে বেদুইন দলপতিরা সমগ্র পান্থবাহকে আটক করিয়া কর আদায় করিয়া থাকে।

সম্প্রতি রাজা হুসেনের শাসনকালে এই দস্যুদল তেমন লুণ্ঠন করিতে পায় না। জনরব, রাজা হুসেন বেদুইন দস্যুদিগকে সময়ে সময়ে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

মক্কাযাত্রীদিগের বেশভূষা সম্বন্ধে কড়া নিয়ম আছে। মাথায় টুপী অথবা জুতা পায় দিয়া তীর্থস্থলে অগ্রসর হইবার আদেশ নাই। এমন, কি সান্দাল জুতা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। মাত্র দুইখানি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া প্রত্যেক তীর্থযাত্রীকে মক্কায় যাইতে হইবে। একখানি বস্ত্র কটিদেশে জড়াইতে হইবে, অপরখানির দ্বারা স্কন্ধদেশ আবৃত থাকে। ভগবানের কাছে ধনী, দরিদ্র, ছোট বড় নাই; তাই এই ব্যবস্থা।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিশ্বাস যে, প্রত্যেক মুসলমানকে মক্কায় যাইতেই হইবে; কিন্তু কোরাণের আদেশবাণী ঠিক তাহা নহে। হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন, যিনি আপনাকে তীর্থযাত্রার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, তিনিই মক্কায় যাইবেন। কিন্তু মক্কায় যাইবার জন্য ধনী দরিদ্র প্রত্যেক মুসলমানের প্রবল স্পৃহা দেখিতে পাওয়া যায়। গতায়াতের খরচ যোগাড় করিতে পারিলেই দরিদ্রও মক্কার অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকেন। ভারতীয় মুসলমানগণ দরিদ্র মক্কাযাত্রীর সাহায্যার্থ একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন।

জেড্ডানগরের প্রাচীরের বাহিরে একটি গ্রাম আছে। ছিন্নবস্ত্র ও কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে এই গ্রামের বাসভবনগুলি নির্ম্মিত। এই সকল বস্ত্রাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে কাফ্রীরা বসবাস করে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আফ্রিকার পশ্চিম প্রান্ত হইতে তীর্থ করিতে মক্কায় আইসে। কিন্তু আর ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ইদানীং তাহারা এ দেশেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানজাতির কিরূপ প্রবল আকর্ষণ, এই ঘটনা তাহার অন্যতম উদাহরণ।

চিত্রিত গর্দ্দভ ও আরব বালক।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

কালাজ্বর

আজকাল কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাবের বিষয় শুনা যায়। বাঙ্গালা দেশে স্থানে স্থানে উহা দ্বারা অনেক লোকক্ষয় হইতেছে। ইহা অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি; আক্রান্ত রোগী-দিগের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০টি, কোন কোন স্থানে উহা অপেক্ষা অধিক অচিকিৎসিত থাকিলে মারা যায়।

লক্ষণ:—পূর্ব্বে এই ব্যাধি পুরাতন ম্যালেরিয়া নামে অভিহিত হইত। এই জ্বরকে "কালা" বলার কারণ বোধ হয় এই যে—ইহার কোনও অবস্থায় কোনও কোনও রোগীর শরীর অল্লাধিক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই জ্বর ম্যালেরিয়ার ন্যায় অধিক শীত বা কম্পের সহিত আক্রমণ করে না, বা ত্যাগের সময় অধিক ঘর্ম্ম হয় না,—এইরূপই সাধারণতঃ দেখা যায়। আবার কখনও কখনও জ্বর অতিশয় প্রবল হয় এবং ত্যাগের সময় ঘর্ম্ম দেখা যায়। এইরূপ জ্বর অধিক দিন চলিতে থাকে। কোন সময় বা ১, ২, ৩ সপ্তাহ বা ততোধিক কাল অজ্বরাবস্থা থাকে; বোধ হয়, জ্বর আরোগ্য হইয়াছে। কাহারও ৩, ৪, ৫ মাস, কাহারও ৬, ৭, ৮, ৯ মাস, কাহারও বা তিন বৎসরাধিক কাল ভোগের পর তাহাকে চিকিৎসার্থ অগ্রসর হইতে দেখা যায়। তখন তাহার শরীর অতিশয় শীর্ণ হইয়া যায় ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে; প্লীহা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়া পার্শ্বে উদরের মধ্য-রেখার বাহিরে ও নাভি-রেখার নীচে নামিয়া আসে; ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র প্লীহাও থাকে। যকৃৎ সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায় না। বক্ষের ও উদরের উপর-কার ধমনীগুলি বিস্তৃত হয় এবং উদর, বিবৃদ্ধ প্লীহা-হেতু শীর্ণ শরীরের তুলনায় অতিশয় স্ফীত দেখায়। চক্ষুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে রক্তাল্পতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন রোগীর পদ, মুখ বা হস্ত স্ফীত ও রসযুক্ত দেখায়।

কালাজ্বরের স্থান:—অনেক জিলাতেই এই মারাত্মক ব্যাধি দৃষ্ট হয়। যশোহর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, মৈমনসিংহ, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলায় ইহার প্রকোপ দেখা গিয়াছে। কোন স্থানে অধিক, কোন স্থানে অল্প। ২৪ পরগণায় স্থানে স্থানে অনেক দেখা যায়। আসামেই এই ব্যাধির জীবাণু প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং তথায় ইহার বহুব্যাপকতাও দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কোন কোন গ্রাম এই ব্যাধি দ্বারা ধ্বংসমুখে নীত হইয়াছে।

ব্যাধি পরীক্ষা:—(১) এই ব্যাধির স্বরূপ স্থির করিবার জন্য আজকাল "ফরমল" নামক রাসায়নিক পদার্থ অধিক ব্যবহৃত হয়। রোগ ১½ মাসের অনধিক হইলেও "ফরমল" দ্বারা উহার রক্তের জলীয়াংশ পরীক্ষায় ঐ ব্যাধির স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত স্থলেই ১½ মাসের রোগীর বা ততোধিক সময়ের রোগীর রক্তের দ্বারা রোগ ঠিক ধরিতে পারা যায় না। তাহার কারণ, উহার রক্তে অন্য কোন ব্যাধির ঐরূপ "ফরমল" প্রতিক্রিয়া প্রতিষেধকারী জীবাণু বা রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এরূপ অবস্থায় রোগীর অন্যান্য বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণাদি—যেমন বিবৃদ্ধ প্লীহা, শীর্ণতা, জ্বরের প্রকৃতি, বক্ষের ও উদরের ধমনীর পুষ্টি, মস্তকে কেশের বিরলতা, উদরের স্ফীতি ইত্যাদিও—ব্যাধির স্বরূপনির্ণয়ে সহায়তা করে।

(২) এই ব্যাধির স্বরূপনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট উপায়—প্লীহা হইতে শক্ত সূচির সহায়তায় রক্ত লইয়া উহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় ঐ ব্যাধির "লিসম্যান-ডনোভান" নামক জীবাণু প্রত্যক্ষ করা। এই জীবাণু প্রথম বিলাতে ডাক্তার লিসম্যান ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। কলিকাতার নিকট দমদমায় এই ব্যাধিগ্রস্ত কোন ইউরোপীয় মৃত সৈনিকের প্লীহা হইতে রক্ত লইয়া এই পরীক্ষা সম্পাদিত হয়। পরে ডাক্তার বেণ্ট্‌লি ও রোজার্স আসামে দেশীয় রোগীর প্লীহাতেও এই জীবাণু প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু প্লীহা হইতে রক্ত লইয়া পরীক্ষা করা সর্ব্বদা সহজ নহে বলিয়া "ফরমল" পরীক্ষাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহাতে রক্তের জলীয়াংশে কিঞ্চিৎ (২ ফোঁটা) "ফরমল" যোগ করিয়া একটু ঝাঁকিয়া "টেষ্ট্ টিউবে" রাখিয়া দিলে রক্তের ঐ জলীয়াংশ ২—৩—১০—৩০ মিনিট হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমিয়া সাদা হয়। এইরূপ সম্পূর্ণ জমাকে "+ + +"

সঙ্কেত দ্বারা লেখা হয়। ইহা দ্বারা অধিকাংশ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ রক্ত "কালাজ্বর"রোগীর।

(৩) অঙ্গুলি হইতে রক্ত লইয়া উহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষায় রক্তের "শ্বেত কনীনিকার" অত্যধিক হ্রাস দেখা যায়। আমরা উহার সহিত "ক্ষুদ্র এক নিউক্লিয়াসযুক্ত শ্বেত কনীনিকার" অত্যধিক বৃদ্ধি (শতকরা ৮০ বা ততোধিক, যাঁহা স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ২০-২৫ মাত্র) দেখিয়াছি; ইহা অপেক্ষা অল্পও দেখা যায়। "কালাজ্বরের" জীবাণু—প্লীহা, যকৃৎ,অস্থি, মজ্জা এবং স্বল্পপরিমাণে শরীরের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, দেড় মাসের রোগীর রক্তের জলীয় অংশের দ্বারা "ফরমল" পরীক্ষায় "+ + +" অর্থাৎ সম্পূর্ণ "ফরমল" প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়াছে; ঐ "+ + +" চিহ্নের অর্থ এই যে, সম্পূর্ণরূপ নিঃসন্দিগ্ধ ফল। সন্দেহযুক্ত "ফরমল" প্রতিক্রিয়া "+ +", "+ + +" ইত্যাদিরূপে লিখিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কালাজ্বর ভিন্ন ম্যালেরিয়া জ্বরেও ঐ "ফরমল" প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। রোগীর যে জ্বর অবস্থায় ঐ "ফরমল প্রতিক্রিয়া" পাওয়া যায়, ঐ জ্বরের প্রকৃতি তখন ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে বিশেষরূপে পৃথক বিবেচনা করা যায় না; পরে ঐ জ্বর ক্রমশঃ "কালাজ্বরের" জ্বর-প্রকৃতি সম্পূর্ণ অবলম্বন করে এবং ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকৃতি একেবারে ত্যাগ করে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর একই ব্যক্তিতে একই সময় থাকে। অথবা কালাজ্বর আরোগ্য হইয়া গেলেও ম্যালেরিয়া আক্রমণ করে; উহা উপযুক্ত চিকিৎসায় অনায়াসে আরোগ্য হয়। ইহা দেখা গিয়াছে, ৩।৪ মাস কালাজ্বর আরোগ্য হইয়াছে, তখনও উহার রক্তে, "ফরমল" প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। কালাজ্বরের রক্তে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, জ্বর আরোগ্য হইয়া গেলেও কিছুকাল যাবৎ ঐ পরিবর্ত্তন দূর হয় না।

এই ব্যাধি আসামেই প্রথম দেখা গিয়াছিল—বাঙ্গালায় [illegible]হে; এ জন্য কোন কোন ডাক্তারের মতে আসামই উহার [illegible]াদি বাসস্থান। এখন বাঙ্গালা দেশেও ইহার প্রাবল্য [illegible]ক্ষিত হয়। কালাজ্বর বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যে ছিল না, ইহা [illegible]ক নহে। বর্ত্তমান লেখক দেখিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ বাহ্য আভ্যন্তরিক লক্ষণাক্রান্ত রোগীকে পুরাতন ম্যালেরিয়া [illegible]লিত। তখন "লিসম্যান-ডনোভান" জীবাণু বা "ফরমল" পরীক্ষা ইহার পৃথক স্বরূপ নির্ণয়ার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, ইহার প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অচিকিৎসিত অবস্থায় ইহার মৃত্যুসংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০-৯০এর উপর উঠিতে পারে। বাঙ্গালা দেশে গভর্ণমেণ্ট-লিখিত বিবরণীতে এ রোগীর সংখ্যা দেখিয়া কেহ কেহ বলেন, উহার পরিমাণ ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে ৬ জনের অধিক নহে। কিন্তু এখন কাহার কাহার মতে ঐ রোগীর সংখ্যা উহা অপেক্ষা অধিক। গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালায় উহার সংখ্যা ৩০০,০০০এর অদ্ধ স্বীকার করিতে পারেন। যাহা হউক, প্রত্যেক জিলায় এখন উহার বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। তদভাবে উহার সম্পূর্ণ বিস্তৃতি ও রোগীর সংখ্যা বিশেষরূপে নির্ণয় করা অসম্ভব। ১০।১৫ বৎসর-মধ্যে যদিও কিছু কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে; কিন্তু উহা যথেষ্ট নহে। গভর্ণমেণ্ট ও স্বেচ্ছাসেবকগণ উহার অনুসন্ধান ও চিকিৎসার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বলেন, ১৫০টি চিকিৎসা-কেন্দ্র বাঙ্গালায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক অনেকগুলি স্থাপিত হইয়াছে। জিলাবোর্ড কোথাও কোথাও এই মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার্থ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন ও ঔষধ সরবরাহ করিতেছেন। জিলাবোর্ড ও দূরস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ স্থানীয় চিকিৎসকগণকে এই ব্যাধির ও উহার চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া স্থানীয় লোকদিগের চিকিৎসার্থে উপযোগী করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট কোথাও কোথাও স্বেচ্ছাসেবকগণকে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু স্থানবিশেষে ঐ সাহায্যের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়া উচিত ও আবশ্যক। যেমন ম্যালেরিয়া-নিবারণে, তেমনই এই ব্যাধিনিবারণে—জিলাবোর্ডের সাহায্যে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া স্থানীয় লোকদিগকে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা করুন। বহু স্বেচ্ছাসেবক সমিতি ও সেবকের আবশ্যক,—বহু স্থানে তাহাদের কার্য্য আবশ্যক হইবে। ডাঃ. জি. চাটার্জ্জির কালাজ্বরচিকিৎসা সমিতি, বাঙ্গালা স্বাস্থ্যসমিতি প্রভৃতি কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার্থ বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেছেন ও সাফল্যলাভ করিয়াছেন। দোগাছিয়াতে সপ্তাহে ২ দিনে প্রায় ৮।৯ শত রোগী বিশেষ আগ্রহের সহিত সমাগত হইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা পাইয়া যথোপযুক্ত ফল লাভ করিতেছে। যাহাদের জীবনের আশা

ছিল না, তাহারা জীবন পাইতেছে দেখিয়া, প্রায় ১০ ক্রোশ দূর হইতে রোগী সমাগত হইয়া জীবনদায়ক ঔষধ ও চিকিৎসা লাভার্থ সহিষ্ণু ও প্রফুল্ল অন্তরে অপেক্ষা করে। চিকিৎসা-স্থলে রোগীর উপযুক্ত খাদ্যাদির বাজার বসে। এই ব্যাধির এইরূপ চিকিৎসায় বিশেষ ফল পাওয়া যাইতেছে। এরূপ চিকিৎসাকেন্দ্র আরও স্থানে স্থানে স্থাপন করা আবশ্যক। সাধারণেরও এ বিষয়ে যত্ন, চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ইহা সাধারণতঃ গরীবের ব্যাধি বটে, কিন্তু বড়-মানুষও ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন, অনেক স্থলে এইরূপ দেখা যায়। অর্থশালী ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্য এ ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষণীয় এবং এরূপ ব্যক্তিদিগের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকাও আবশ্যক।

সংক্রামকতা :—এই ব্যাধি অতিশয় সংক্রামক। এক বাটীর এক ব্যক্তি হইতে অন্যে ইহা সংক্রামিত হয়। এরূপ দেখা গিয়াছে, কোন কোন বাটীর অধিকাংশ ব্যক্তির ইহা দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়াছে।

কিরূপে এই ব্যাধি সংক্রামিত হয়, তাহা জানা যায় নাই, এবং কোন্ পথেই বা সংক্রামিত হয়, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় নাই। কেহ বলেন, "ছারপোকার" ভিতর দিয়া ঐ জীবাণু মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। ঐ কীটের শরীরে এই জীবাণু বৃদ্ধি পায়; পরে উহার দংশনসময়ে মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেমন মশকদংশনসময়ে ম্যালেরিয়া-জীবাণু মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির মীমাংসা কিছু হয় নাই।

এক বাড়ীতে এই ব্যাধিগ্রস্ত একের অধিক রোগী হইলে ঐ বাড়ী ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এটি গরীবের পক্ষেও আবশ্যক। গরীব সামান্য কুটীর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন ধারণ ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। একের অধিক রোগী সত্ত্বেও ঐ বাড়ী ত্যাগ না করিলে স্থান-বিশেষে ক্রমে ঐ বাড়ীর নিকটস্থ অন্য বাড়ীর ও ক্রমে গ্রামের লোক ঐ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে, এরূপ দেখা গিয়াছে। যে স্থানে এ রোগ বহু ব্যাপক হয়, সেই স্থানেই এরূপ অধিক দেখা গিয়াছে। পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। বাড়ীর আশ-পাশ—খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, বেঞ্চ, টুল, টেবল, বিছানা, পরিধেয়াদি—সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি প্রত্যহ গরম জলে ধৌত ও সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। রোগীর সহিত নীরোগ ব্যক্তির সর্ব্বদা শয়ন ও উপবেশন করা কর্ত্তব্য নহে। বিষাক্ত জীবাণু ও রোগবীজবাহী জীবাণুর ধ্বংসকারী রাসায়নিক পদার্থ—যেমন "লাইসল" প্রভৃতি আবশ্যকমত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীকে একটি পৃথক ঘরে পরিষ্কৃত অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য, এবং তাহাকে ঐ মারাত্মক ব্যাধির নিরাময় সম্বন্ধে যথেষ্ট আশা-ভরসা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্যাধির সংক্রামকতা ও মারাত্মকতা হেতু রোগীকে বিশেষ সুবন্দোবস্তে রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যথোপ-যুক্তরূপে ও পরিমাণে উহার চিকিৎসা না করিলে ত্বরায় শত করা ন্যূনাধিক ৭০।৮০ জন ঐ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেশে মহামারী উপস্থিত করিতে পারে। এরূপে স্থানে স্থানে "পুষ্করা" উপস্থিত হয়; যেমন জলপাইগুড়িতে হইয়াছিল। এই রোগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় বলিয়া সাধারণে ইহার (শতকরা ৯০টির মৃত্যু সত্ত্বেও) ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়করী ক্ষমতা বুঝিতে না পারিয়া ইহার শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় বিশেষ যত্ন বা সতর্কতা অবলম্বন করেন না। ইহা অতিশয় অকর্ত্তব্য। নিকটবর্ত্তী উপযুক্ত ডাক্তার দ্বারা সন্দেহস্থলে রোগী পরীক্ষা করাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করান ও সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা :—ইহার চিকিৎসায় কুইনিন, আর্সে-নিক, সোয়ামিন, স্যালভারসান প্রভৃতি কার্য্যকারী নহে। ইদানীং দেখা যাইতেছে—য়্যাণ্টিমনি ধাতুর দুইটি যৌগিক পদার্থ—(১) সোডিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট ও (২) পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট সাধারণতঃ ব্যবহৃত হই-তেছে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ক্যারোনিয়া ও অন্য একটি ডাক্তার ইতালী দেশে "টার্টার এমিটিক্" নামক য়্যাণ্টিমনি-ঘটিত সাধারণ ঔষধ দ্বারা ঐ ব্যাধিগ্রস্ত কতকগুলি বালকের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফললাভ করেন। তদবধি এ দেশে রোজার্স প্রভৃতি ডাক্তারগণ ঐ ঔষধ ব্যবহার করেন এবং পরে "সোডিয়ম্ য়্যাণ্টিমনি টার্টারেটও" এ দেশে ব্যবহৃত হই-তেছে। কেহ ঐ দুই যৌগিকের শতকরা ২, কেহ বা ৪ ভাগ পরিস্রুত লবণ-জলে উত্তাপ দ্বারা মিশ্রিত করিয়া ঐ দ্রব শুদ্ধ করিয়া লয়েন, এবং এই লবণজলে মিশ্রিত য়্যাণ্টিমনি যৌগিক ½, ¾, ⅞, ১½, ১, ১¼, ১¾, ২ প্রভৃতি সি. সি. (১ সি. সি. = ১৭ মিনিম বা ফোঁটা) আবশ্যক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ফললাভ করিয়াছেন। এইরূপ ১ মাত্রা

সপ্তাহে ২।৩ দিন অন্তর ক্ষুদ্র পিচকারী দ্বারা রোগীর বাহুর ধমনীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়,—ইহাকেই "ইনজেক্সন" কহে। কেবল "সোডিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট" দ্বারা সুফল না হইলে, "পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট" উহার সহিত অল্পাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। এইরূপে একত্র ব্যবহৃত সোডিয়ম ও পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট দ্বারা, অথবা একক সোডিয়ম বা পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট দ্বারা ফল পাওয়া না গেলে, রক্তে শ্বেতকনীনিকার অপ্রাচুর্য্য বুঝিয়া, টারপিন, কর্পূর, ক্রিয়োজোট, বাদামতৈল একত্রে মিশ্রিত ও শুদ্ধ করিয়া লইয়া ক্ষুদ্র পিচকারী দ্বারা উপযুক্ত মাত্রায় (১০ ফোঁটা পূর্ণ মাত্রা) কটির নীচে—দক্ষিণে বা বামে—মাংসপেশীবহুল স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়, এবং উহা দ্বারা উৎপাদিত স্থানীয় প্রদাহ প্রশমিত হইলে, পুনরায় সোডিয়ম বা পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট ব্যবহার করিতে হয়। টারপিন ইত্যাদি দ্বারা রোগের জীবাণুনাশক রক্তের শ্বেত কনীনিকা বৃদ্ধি হয়; তাহাতে অন্য ঔষধের কার্য্যের সহায়তা হয় বলিয়াই স্থলবিশেষে ইহাদের প্রয়োগ আবশ্যক হয়।

কোন চিকিৎসক বা য়্যাণ্টিমনির সহিত "বেবিরিন্" ব্যবহার করেন। "ইউরিয়াষ্টিবামিন" যৌগিক ব্যবহারে কেহ বা স্বল্পসময়ে ফল লাভ করিয়াছেন। "ইউরিয়াষ্টিবামিন" যৌগিক প্রস্তুত জন্য গভর্ণমেণ্ট ডাঃ ব্রহ্মচারীর পরামর্শে উপযুক্ত রাসায়নিক নিযুক্ত করিয়াছেন। উঁহারা ঐ যৌগিক অনেক প্রস্তুত করিয়াছেন এবং উহা কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরেও স্থানে স্থানে প্রেরিত ও ব্যবহৃত হইয়া বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তুত যৌগিকের পরিমাণ এখনও যথেষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন—দেখা যাইতেছে। উপরের লিখিত "সোডিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেটের" ৩০টি ইন্‌জেক্‌সন দ্বারা সাধারণতঃ ফল পাওয়া যায়—কাহারও কাহারও এইরূপ অভিজ্ঞতা। কেহ কেহ বা সাধারণ সোডিয়ম ও পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি দ্বারা সাধারণতঃ ৩০টি ইন্‌জেক্‌সন অপেক্ষা অল্পেই অল্পদিনের রোগীতে ফল পাইয়াছেন। ৩০টি অপেক্ষা অধিক ইন্‌জেক্‌সন—৩৫, ৪০, ৪৫, ৫০ এরও অধিক আবশ্যক হয়। কিন্তু জ্বর বন্ধ হইলেই ইন্‌জেক্‌সন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, জ্বর পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। জ্বর বন্ধের পরেও ইন্‌জেক্‌সন, ১—৩ সপ্তাহ বা আবশ্যকমত ততোধিক দিন পরেও ব্যাধি নিঃশেষে দূরীকরণার্থ দেওয়া আবশ্যক হয়। মাঝে মাঝে রোগীর আমাশয়, ভেদ, কাসি, শোথ, মুখে ক্ষত প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তখন ঔষধ বন্ধ রাখিতে হয়। যদি ঐ সমস্ত ব্যাধি আপনা হইতে আরোগ্য না হয়, তবে তজ্জন্য ঔষধ আবশ্যক হইবে; এবং ঔষধ দ্বারা ঐগুলি আশু নিবারণ করিয়া জ্বরের প্রশমনার্থ পুনরায় "য়্যাণ্টিমনি"-ঘটিত ঔষধ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রয়োগ আবশ্যক। চিকিৎসার প্রারম্ভে রোগী অতিশয় দুর্ব্বল এবং আমাশয়,ভেদ, কাসি-যুক্ত থাকিলে ঐ ব্যাধিগুলির চিকিৎসা করিয়া পরে "য়্যাণ্টিমনি" ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রক্তহীনতা জন্য লৌহঘটিত ঔষধ, পরিপাকশক্তি স্থির রাখিতে তদুপযুক্ত ঔষধ ও শরীরের বলরক্ষার্থে সময়োপযোগী ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। ইন্‌জেক্‌সন দিলে মধ্যে মধ্যে রোগীর শরীর শোথযুক্ত, দন্তমূল শিথিল ও বেদনাযুক্ত হয়; বাতের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ "ধরিয়া" জ্বর হ্রাস না পাইয়া অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন ঔষধ কিছু দিন বন্ধ রাখিলে জ্বর ও অন্যান্য লক্ষণাদি সম্বন্ধে বেশ ফল পাওয়া যায়। আবশ্যক ও পরিপাকানুযায়ী উৎকৃষ্ট বলকর পথ্য—অন্নাদি ব্যবহার আবশ্যক। কোন কোন রোগীতে "সোডিয়ম্ বা পটাসিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট" ধমনীতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, ফুসফুসের ব্যাধি থাকে। এরূপ স্থলে ঐ ঔষধ ধমনীর মধ্য দিয়া প্রয়োগে তাহাদের অতিশয় কাসি ও বমন হয়। যাহাদের "নাড়ী" দুর্ব্বল, "রক্তচাপ" ক্ষীণ; অতিশয় বালক—যাহাদিগের ধমনী অতি ক্ষুদ্র, তাহাদিগের মাংসপেশীর অভ্যন্তরে কটির নীচে মাংসবহুল স্থানে "য়্যাণ্টিমনি-যৌগিক" প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, য়্যাণ্টিমনি-যৌগিক নির্ম্মল হইলে উহার দ্রব ব্যবহারে বিশেষ বেদনা বা অসুবিধা হয় না। "ইন্‌জেক্‌সন"স্থানে মাঝে মাঝে "ফোমেণ্ট" করিলে ঐ বেদনা প্রায়ই ভাল হইয়া যায়।

কেহ কেহ য়্যাণ্টিমনিকে য়্যালবোলিন নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২—২ সি সি মাত্রায় মাংসপেশীর অভ্যন্তরে ইন্‌জেক্‌সন দ্বারা ব্যবহার করেন; প্রতি সপ্তাহে, বা সপ্তাহে ২ দিন ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া যায়। ২ সি. সি. অপেক্ষা অধিক মাত্রা দিতে হইলে শতকরা ১ ধাতুর দ্রব ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মাংসপেশী-অভ্যন্তরে প্রয়োগে

এইরূপ মিশ্রণ দ্বারা অধিক ফল পাওয়া যায়; ধমনী-অভ্যন্তরে প্রয়োগে ইহার ফল তত সুবিধাজনক হয় না। ৫ সি. সি. পর্য্যন্ত মাত্রা দেওয়া যাইতে পারে।

ধাতু য়্যাণ্টিমনি চিনির সহিত ¼ গ্রেণ মাত্রায় সপ্তাহে ২ দিন সেবন করিয়া কেহ কেহ কালাজ্বর ও উহার বিবৃদ্ধ প্লীহায় বেশ ফল পাইয়াছেন। ইহার মাত্রা ১ গ্রেণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা যায় এবং দিনে তিনবার সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। অল্পবয়স্ক (৭।৮।৯ বৎসর) বালক-বালিকাদের পক্ষে এইরূপ ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ য়্যাণ্টিমনি যৌগিক মলমরূপে ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিয়াছেন। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের পক্ষে এইরূপ ব্যবহার উপযোগী।

একটী রোগী চিকিৎসার বিবরণ

হাজের আলি, মুসলমান, বয়স ১৬ বৎসর, বি, সি, আর, দোগাছিয়া হইতে চারি মাইল পূর্ব্বে কোমরপুরনিবাসী। প্রায় সাত মাস যাবৎ জ্বর। উহা কিছু কমে, কিছু ঘর্ম্ম হয়, কিন্তু একেবারে জ্বর ছাড়ে না। প্লীহা বৃদ্ধি পাইয়া উদরের মধ্যরেখা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ; কিছু কৃষ্ণবর্ণ; পদে ক্ষত। জ্বর প্রত্যহ আসে। শরীর শোথ-যুক্ত, বিশেষতঃ পদদ্বয়।

এই রোগীকে "কালাজ্বর" বিবেচনায় নিম্নলিখিতরূপে "সোডিয়ম য়্যাণ্টিমনি টার্টারেট" ইন্‌জেক্‌সন দেওয়ায় রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়াছে এবং পায়ের ক্ষত আরাম হইয়াছে।

ইন্‌জেক্‌সন দিবার তারিখ।	ঔষধ।	মাত্রা।
৬—৯—২৩	সো. য়া. টা.	½ সি. সি.
৯—৯—২৩	ঐ	ঐ "
১৩—৯—২৩	ঐ	¾ "
১৬—৯—২৩	ঐ	১ "
২১—৯—২৩	ঐ	¾ "
২৮—৯—২৩	ঐ	ঐ "
৩০—৯—২৩	ঐ	১ "
৪—১০—২৩	ঐ	১¼
৭—১০—২৩	ঐ	১½ "
১৪—১০—২৩	ঐ	১¾ "
২১—১০—২৩	ঐ	২ "
২৮—১০—২৩	ঐ	ঐ "
১—১১—২৩	ঐ	১·৭৫ "
১১—১১—২৩	ঐ	ঐ "
১৮—১১—২৩	ঐ	ঐ "

রোগীর জ্বর ত্যাগ পাইয়াছে ও পায়ের ক্ষত আরাম হইয়াছে। রোগীর শীর্ণতা দূর হয় নাই বা প্লীহা বিশেষ হ্রাস হয় নাই। চিকিৎসা চলিতেছে।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার।

বিচ্ছেদ-গাথা

(আমি) নিশিদিন কত স'ব অবিরত
র'ব আশাপথ চাহিয়ে তার;
পলে পলে পলে ফোঁটা ফোঁটা জলে
কাঁদিয়ে সুধিব এ প্রেমধার।

(যবে) কুসুম-বাসরে, অধরে অধরে
বলেছিল ভালবাসি,
(আজি) বিমুখ সজনী, সে সুখ-রজনী,
কুসুম হয়েছে বাসি,—

অনাদরে হাসি অধরে লুকাল
শুকাল সাধেরি প্রণয়হার।

(সখি) সে দিনও যেমনি, আজিও তেমনি,
কুহরে পিক পাপিয়া,
বিহরে মলয়, শিহরে হৃদয়
কিশলয় সম কাঁপিয়া

(সই) সবই সেই আছে, সে-ই নাই কাছে,
সে বিনে এ বীণা বাজে না আর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

গ্রন্থসমালোচনা

"মা"

* মহামতি ইমারসন এক স্থানে লিখিয়াছেন, কোন গ্রন্থ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না, তাহা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে, উহা কত জল ভাঙ্গে। প্রসিদ্ধ সমালোচক ম্যাথিউ আরনল্ড প্রাচীন গ্রীক মনীষী আরিষ্টটলের মতানুসরণ করিয়া বলেন, "high seriousness" স্থায়ী কাব্যসাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। কাব্যের কার্য্য হইতেছে "appeal to emotions" অর্থাৎ পাঠকের মনে রসের সঞ্চার করা। সেই রস নানা শ্রেণীর; তাহার কোনটা হালকা, কোনটা গম্ভীর, কোনটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী কোনটা পাঠকের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য দাগ কাটিয়া দেয়। যে কাব্য যত অধিক গম্ভীর ও যত অধিককালস্থায়ী রসের উদ্রেক করিতে পারে, তাহার গৌরব তত বেশী। এই সকল গ্রন্থই কালক্রমে ভাষার স্থায়ী সম্পদ (classics) বলিয়া গণ্য হয়।

আজকাল বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গদ্য-পদ্য কাব্য রচিত হইতেছে। তাহার কয়খানা এইরূপ উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য? উপন্যাসের কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে, তাহার অনেকগুলিতে রচনার পারিপাট্য আছে, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ আছে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির উত্তেজক মাদকতা আছে, কিন্তু নাই কেবল গম্ভীর স্থায়ী রসের অবতারনা। আধুনিক অনেক উপন্যাস বিলাতী প্রেমরসে ভরপুর, সেই জন্য তাহা জাতীয় হৃদয়কে স্পর্শ করে না এবং পাঠক-পাঠিকার মনে ক্ষণস্থায়ী কৌতুক উৎপাদন করিয়াই শূন্যে মিলাইয়া যায়। ম্যাথিউ আরনল্ডের ভাষায় এই সকল উপন্যাস সম্বন্ধে বলা যায়, "They bear to life the relation which inns bear to home" এক জন পথিক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে হোটেলে, সরাইয়ে বা চটিতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে পারেন এবং সেই হোটেল, সরাই বা চটির সৌন্দর্য্য দেখিয়া ক্ষণিক আমোদ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু সেই সরাই বা চটি তাঁহার স্থায়ী বাসভবন নহে, উহা তাঁহাকে গৃহে পৌঁছিয়া দেওয়ার সহায়ক মাত্র। তিনি যতক্ষণ স্বগৃহে পৌঁছিতে না পারিবেন, ততক্ষণ স্ত্রীপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পারিবেন না। তুমি চৌরঙ্গীর Whiteaway Laidlawএর প্রকাণ্ড দোকানে সুসজ্জিত বিলাতী জিনিষের চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পার, কিন্তু সেই দোকানকে দোকান বলিয়াই বুঝিতে হইবে, তাহা তোমার গৃহ নহে। বিলাতী প্রেমের অবলম্বনে রচিত উপন্যাসও আমাদের নিকট সেই পথের চটি অথবা চৌরঙ্গীর বিলাতী জিনিষের দোকান। উহা আমাদের ঘরের জিনিষ নহে, আমাদের ঘরের জিনিষের ন্যায় আমাদিগের মনে স্থায়ী সুখ-দুঃখ উৎপাদন করিতে পারে না। এই শ্রেণীর উপন্যাস সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদিগকে সম্বোধন করিয়া ম্যাথিউ আরনল্ডের ভাষায় বলা যায়,—"You have our object, which is this; to get home, to do your duty to your family, friends, and fellow-countrymen to attain inward freedom, serinity, happiness, contentment।" † অর্থাৎ, কতক্ষণ তুমি এই দোকানে বসিয়া থাকিবে? তুমি বাড়ী চল। সেখানে তোমার স্ত্রীপুত্র-পরিবার ও দেশের লোকের প্রতি কত কর্তব্য রহিয়াছে। তোমাকে এই সকল বিলাতী জিনিষের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দিন কাটাইলে চলিবে না, তোমাকে অন্তরের স্বাধীনতা, সুখসন্তোষ, শান্তি লাভ করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এই অন্তরের সুখসন্তোষশান্তি গভীররূপে অনুভূত হইলে তাহার নাম হয় "high seriousness."

কিন্তু আমাদিগকে প্রকৃত ঘর চিনাইয়া দেয়, এরূপ উপন্যাস কোথায়? আজকাল পাঠক-পাঠিকাগণের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। এখন তাঁহারা আর ঘরের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন না। তাঁহাদিগকে বিলাতী প্রেমের নেশা ধরিয়াছে। তাই উপন্যাস-লেখকগণও অঘটন-ঘটনপটীয়সী কল্পনার সাহায্য লইয়া দেশীয় সমাজের মধ্যেই বিলাতী-প্রেমের কারচুপি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সমাজের দুর্নীতিও অবাধে সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিয়া, সাহিত্য ও সমাজকে কলুষিত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় যদি কোন গ্রন্থকার বাঙ্গালীজীবনের খাঁটী ঘরের কথা অবলম্বনে, বাঙ্গালী জীবনের উচ্চতম আদর্শ দেখাইবার জন্য উচ্চাঙ্গের উপন্যাস রচনা করেন, তবে তাঁহার নিতান্ত দুঃসাহস বলিতে হইবে। কারণ, তিনি "old fashioned" (সেকেলে) বলিয়া উপহসিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা, আবার তাঁহার সেই গ্রন্থও "moral textbook" (নীতিশিক্ষার পুস্তক) বলিয়া গণ্য হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, বঙ্গের অন্যতম মহিলা-কবি শ্রীমতী অনুরূপা দেবী সেই দুঃসাহস দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত "মা", একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস, এই উপন্যাস সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানিতে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও রসসৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার আখ্যায়িকা অতি সাধারণ, কিন্তু লেখিকার রচনাকৌশলে ইহার মধ্যে অজস্র করুণরসের ফোয়ারা ছুটিয়াছে। হাবড়ানিবাসী অরবিন্দ বসু উচ্চশিক্ষিত ধনি-সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় বসু একটি আস্ত ডাকাত। তিনি ভাগলপুরের এক জন প্রসিদ্ধ উকীল, তাঁহার "লাথি খাইয়াও বন্যার বেগে ঘরে টাকা আইসে—গালি খাইয়াও মক্কেলের শ্রদ্ধা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।" "ওকালতী কার্য্যে মক্কেলের নিকট কষিয়া টাকা আদায় করা তাঁহার নিত্যকার্য্য এবং সেই টাকার তেজারতিতে সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করা তাঁহার একমাত্র আনন্দ।" এ হেন অর্থপিশাচের পুত্র অরবিন্দ তাহার এক সহপাঠী নিতাইচরণ ঘোষের সহিত অপর এক বন্ধুর বিবাহের জন্য পাত্রী দেখিতে গিয়া বর্দ্ধমানের এক নির্জ্জন পল্লীবাসী দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্তবংশীয় দীননাথ ঘোষের কন্যা "কিশোরী মনোরমার চম্পকগৌরকান্তি এবং অতুলনীয় মুখশোভা তরুণবক্ষে আঁকিয়া" লইয়া আসিল এবং নিতাইয়ের ঘটকালিতে উভয় পক্ষের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অরবিন্দের সহিত মনোরমার বিবাহ হইয়া গেল। দীননাথ মিত্র অনেক কষ্টে বরপণ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুত অলঙ্কারের মধ্যে ভরি পনের ষোল সোনা দিতে পারিলেন না। সেই অপরাধে পাকস্পর্শে বর্দ্ধমানের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রব্যক্তির নিমন্ত্রণ হইল, দীনু মিত্রের হয় নাই। পূজায় তত্ত্ব অপমানিত হইয়া ফিরিয়া গেল। জামাইয়ের চাকর জামাইয়ের জন্য প্রেরিত ধুতি-চাদরটা কুটুম্বগৃহের দাসীদিগের সাক্ষাতেই বকসিস পাইল। দীনু মিত্রের মেয়েকে আর কখনও পিতৃগৃহে পাঠান হইবে না, এরূপ হুকুম জারি হইল।

কিন্তু মায়ের প্রাণ ত মানে না। পত্নীর ক্রন্দন অসহ্য হওয়ায় দীননাথ মেয়েকে ঘরে আনার জন্য অনেকবার আসা-যাওয়া করিলেন,

---

* প্রকাণ্ড উপন্যাস। মূল্য ৩৲ টাকা। 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দির' প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ১ম ভাগে সন্নিবেশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

† Essays in criticism, second series, p. 145.

কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। দুর্দ্দৈবক্রমে দুর্গাসুন্দরীর এই সময়ে কঠিন পীড়া হইল, তিনি মৃত্যুশয্যায় প'ড়িয়া একটিবারের জন্য তাঁহার মনোরমার মুখখানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দীননাথকে আবার ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। দীননাথ মৃত্যুঞ্জয় বসুর হুকুমমতে অনেক কষ্টেসৃষ্টে গহনার বাবদ বাকী দুই শত টাকা এবং কার্ট ক্লাস রিজার্ভের হিসাবমত টাকা সংগ্রহ করিয়া বৈবাহিকের দরবারে হাজির করিলেন। তখন সেই ধনগর্ব্বিত পাপিষ্ঠ তাঁহাকে ও তাঁহার চৌদ্দ পুরুষকে "জোচ্চোর" বলিয়া গালি দিলে, নিতান্ত অসহ্য বোধে দীননাথও লজ্জা-ঘৃণা-অপমানে মিশ্রিত ক্রোধের সহিত ইহার উত্তর দিলেন। অমনি বারুদস্তূপে অগ্নিস্পর্শের ন্যায় সেই ডাকাত শতগুণে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রবধূকে চিরদিনের জন্য তাহার পিতার সহিত বিদায় করিয়া দিলেন এবং পুত্রের উপর আদেশ হইল, "যদি তুমি আমার পুত্র হও, তবে তোমার স্ত্রীর সহিত নিজ সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইবে; যদি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কর, তবে তুমিও আমার ত্যজ্যপুত্র হইবে।"

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোরের উকীল, মৃত্যুঞ্জয়ের সহপাঠী মোক্ষদা দত্ত বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করিয়া ভবানীপুরের বাড়ীতে আসিয়া, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাহার কন্যা ব্রজরাণীর—দশ হাজার টাকার গহনা ও নগদ ৩৫ হাজার টাকার প্রলোভন দেখাইয়া, অরবিন্দের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় যখন মনোরমাকে আর কখনও গৃহে আনিবে না, এইরূপ অঙ্গীকার করিল, তখন হউক না কেন দোজবরে, ব্রজরাণী ত অতুল ঐশ্বর্য্যভোগ করিতে পারিবে, ইহা মনে করিয়া সেই গৃধ্র অরবিন্দের হস্তে কন্যাসম্প্রদান করিল। পিতৃ-আজ্ঞা অবিচারে পালন করা অরবিন্দের স্বভাব ছিল। দীননাথ রোগশয্যায় পড়িয়া এই সংবাদ পাইয়া অচিরাৎ ভবলীলা সংবরণ করিলেন। দুর্গাসুন্দরী কিন্তু মরেন নাই, তিনি আজীবন কষ্টভোগ করিবার জন্য কর্ত্তার মুখ দেখিয়া বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। মনোরমা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পিতৃগৃহে আসিয়াছিল, কালক্রমে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। কিন্তু পাপিষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে বংশধর বলিয়া স্বীকার করিল না; কারণ, অরবিন্দের পাঠের ব্যাঘাত না হয়, এ জন্য তাহার আদেশ ছিল, পুত্র ও পুত্রবধূ পৃথক ঘরে শুইবে এবং তাহার বিশ্বাস, অন্তঃপুরে তাহার আদেশ অমান্য করে, এরূপ কাহার ঘাড়ে কটা মাথা? দুঃখিনী মনোরমার অঞ্চলের নিধি অজিত সাত বৎসর মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, কিন্তু তাহার পিতাকে একটিবারও সে দেখিতে পায় নাই। এইরূপ সময়ে মৃত্যুঞ্জয়কে বার লক্ষ টাকার অধিকারী হইয়াও মৃত্যুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। এখান হইতে আখ্যায়িকার আরম্ভ।

এই আখ্যায়িকার নায়ক অরবিন্দ। কিন্তু গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অরবিন্দ হিমালয়ের ন্যায় অচল ও অটলভাবে দণ্ডায়মান, সীতা-প্রবাসনকারী "অযোধ্যাপতি রঘুনাথ" শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় তাহার মানসিক বিকারের বাহিরে কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। কেবল শেষের দিকে তাহার বহুকালব্যাপী স্তরে স্তরে নির্ম্মিত সংযমের বাঁধ হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বন্যার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। ঘটনাপরম্পরার মধ্য দিয়া অন্যান্য পাত্র ও পাত্রীর সংস্পর্শে ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা যাহার চরিত্র গড়িয়া উঠে, তাহাকে যদি উপন্যাস অথবা নাটকের নায়ক বলা যায়, তবে এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক অজিত এবং ইহার নায়িকা তাহার বিমাতা ব্রজরাণী। পিতার দ্বারা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত অজিত সেই পিতাকে দেখিবার ও পাইবার এক দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা (mania) দ্বারা প্রেতগৃহীতবৎ পরিচালিত হইয়া, কখনও পিতার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায়, আবার কখনও দুর্জ্জয় অভিমানে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে; এবং অবশেষে নিজের উন্নতিশীল জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা নিঃশেষ করিয়া পিতৃচরণে ঢালিয়া দিয়াছে।

ওদিকে সপত্নী-বিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত ব্রজরাণী এক দিন যে সপত্নীপুত্রের স্পর্শ কালসর্পের ন্যায় ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সেই অজিতই তাহার বন্ধ্যাজীবনে মাতৃভাব জাগাইয়া দিল, এবং সেই ব্যাঘ্রী তাহার হিংস্রস্বভাব অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিয়া মনোরমার মৃত্যুশয্যায় তাহাকে দিদি বলিয়া সম্বোধন করিল এবং অজিতের "মা" হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। লেখিকা যে অতুলনীয় তুলিকা স্পর্শে এই সকল ভাবের ক্রমবিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা সমস্ত গ্রন্থখানি পড়িয়া দেখিয়া উপভোগ করিতে হইবে, আমি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দ্বারা তাহার রসভঙ্গ করিতে চাই না। আমি কেবল নমুনা স্বরূপ কয়েকটি চিত্র উদ্ধৃত করিব, আর এই গ্রন্থের "high serious" কোথায়, তাহা দেখাইব।

মৃত্যুঞ্জয় বসু মহাশয় ঘোর ডাকাত হইলেও, তাঁহার গৃহিণী অত্যন্ত স্নেহশীলা ও সহৃদয়া। কর্ত্তার মৃত্যুর পর বড়বৌ ও পৌত্রকে ঘরে আনিবার জন্য তিনি পুত্রকে আদেশ করিলেন। তদুত্তরে অরবিন্দ বলিল,—

"মা, বাবা এই ক'দিন গেছেন—আজ আমায় তুমি শুদ্ধ বিদ্রোহী হ'তে বল্‌চো? বাবা বেঁচে থাকতে এক দিনের জন্য যা' ব'লতে পারোনি, আজ তিনি সাম্‌নে নেই ব'লে কি হিসেবে সেই কাজ আমায় করতে বলো?"

"তিনি ঝোঁকের মাথায় একটা অনুচিত কাজ ক'রে গেছেন। তুমি যোগ্য সন্তান, তাঁর ভুল থাকলে, তোমার তা শুধরে নেওয়াই উচিত। তাতে তাঁর পরলোকের পক্ষে ভালই হবে অরু। আমার মন এই কথা চিরদিনই ব'লে এসেচে—শুধু ভয়ে কখন দু ঠোঁট এক করিনি।"

"তবে আজও করো না মা। যা তাঁর সামনে করতে পারিনি, তুমিও সাহস ক'রে বলোনি,—আজও তুমি তা আমায় বোলো না। আমিও পারবো না। আমায় এই দুটো দিন পরে তাঁর কায করতে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান করে তৃপ্ত করতে হবে। তাঁর এত বড় অপ্রিয়সাধন ক'রে কোন্ মুখে তাঁর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াব মা? আমার হাতের জল ঘৃণা ক'রে যদি তিনি না নিয়েই ফিরে যান।—না, মা, না, কায নেই।"

গৃহিণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শরৎশশীর ইঙ্গিতে আবার বলিলেন, "এক জনের দোষে আর এক জনকে শাস্তি দেওয়া, এই কি ধর্ম্মসঙ্গত বাবা? আচ্ছা, তা'ও যদি হলো, এখন আমিই ত তোর গুরু, আমি বলছি, আমার আদেশ মেনেও তুমি তাদের নিয়ে এসো। এতে যে পাপ অর্শায়, আমায় অর্শাবে। সতীলক্ষ্মীর চোখের জল চিরদিন ধ'রে ঈশ্বর বরদাস্ত করতে পারবেন কেন অরু?"

ইহার পরে অরবিন্দ বলিল, মৃত্যুকালেও তাহার পিতা বড়বৌকে আনবার অনুমতি দিয়ে যান নাই, "কারণ, ছোট বৌয়ের বাপের কাছে তা' হ'লে জোচ্চোর হ'তে হ'বে।" সুতরাং গৃহিণী দুঃখ করিয়া নিরস্ত হইলেন।

এ দিকে বর্দ্ধমানে দীনু মিত্রের বাড়ীতে সকলেই আশা করিয়া আছেন, অরবিন্দ যখন এখন স্বয়ং কর্ত্তা হইয়াছে, তখন সে অবশ্যই বাপের ভুল সংশোধন করিবে। "বিশ্বাস ভক্তিতে প্রাণটি তাহার (মনোরমার) নিটোল শুভ্র মুক্তাটির মতই আপন গৌরব-নির্ম্মলতায় আপনি টল টল করিতেছে।" তাহার বাল্যসখী রাধেয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অজুর বাবা এসেছিলেন?" "না ভাই, এখনও আসেন নি, বোধ করি, কাবের ভিড়ে আসতে পারেন নি।" "চিঠিপত্র লিখেছেন তো?" "ন—না।" এবার রাধেয়ার মুখ গম্ভীর হইল। কিন্তু সরলা মনোরমা তাহা বুঝিল না। সে মনে করিল, রাধেয়া তাহার আসন্ন-বিরহে বিমর্ষ হইতেছে। সে জন্য তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

এই করুণ দৃশ্যের পর অজিত যখন স্কুল হইতে আসিয়া, তাহার পিতার সহিত মিলনসম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন চোখের জল রাখা যায় না। রাবেয়া বলিল—"তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবে না ত অজুমণি?" "না—আমি আপনাদের কক্ষণো ভুলবো না—দেখবেন, রোজ একটা ক'রে চিঠি লিখবো'খন।" অজিত উৎসাহভরে লাফাইতে লাফাইতে তাহার মাতামহীর উদ্দেশ্যে ছুটিল। আহার করিবার জন্য আহূত হইয়া কহিল—"এখন ও থাক, আগে আমার জিনিষপত্তরগুলো গুছিয়ে নেই। দিদিমণি। তুমি আমার বাক্সটা'ক্স সাজিয়ে দেবে?"—আবার না খাইয়াই অজিত পাড়ার সকলকে সংবাদ দিতে ছুটিল। বাড়ীর চাকর রাখুকে দেখিয়া বলিল—"রাখুদা,—রাখুদা—আমি ভাগলপুর যাব।" "যাবি দাদা! পত্তর এয়েছে?" "উঁহুঃ—বাবা নিজে যে আসবেন!" মঙ্গলী গাভীকে দেখিয়া বলিল—"মুঙলি মণি! বুঝি-ছিস ভাই, বাবা আসবেন যে! আমি বাবার সঙ্গে এখান থেকে চ'লে যাব, তুই বোকা মানুষ, কিছুই জানিস্ নে রে!" সেই দিন বর্দ্ধমানের ঐ পাড়াটিতে এমন কোন মানুষ, এমন কোন জীব ছিল না, অজিতের পিতা আসার বার্ত্তা যাহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় অজিত যখন বাড়ীতে ফিরিতেছিল, তখন তাহাদের বহির্দ্বারে চাঁপা গাছের মধ্যে লুক্কায়িত একটা কোকিলের রব শুনিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ওরে কু-কু কু, আমার বাবা আসবেন রে বাবা আসবেন। আমরা যখন চ'লে যাব, তখন তুই কাকে ক-ক-ক ক'রে ডাকবি, তাই বল দেখি রে কালো ভূত?"

দিনের পর দিন গত হইল, কিন্তু কই বাবা ত আসিলেন না। মনোরমা অজিতকে নানা কথা বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিল। অবশেষে অরবিন্দের সেই বহু প্রত্যাশিত আগমন যখন ঘটিল, তখন সে কেবল লৌকিকতা রক্ষার জন্য "ভাগ্যহীন অরবিন্দ বসু" এক সন্ধ্যার আঁধারে জপনিরত শাশুড়ীকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণের বাঁধাগৎ আওড়াইয়া গেল; সেই বারান্দায় উপবিষ্ট মনোরমা ও অজিতের দিকে একবারমাত্র তাকাইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু এই অরবিন্দই যখন নিমন্ত্রণ শেষ করিয়া সেই দিন গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া গেল, তখন মনোরমা একটা নীচের ঘরে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া হা-হুতাশ করিতে করিতে রাত্রি কাটাইল। এই চিত্রটি পড়িয়া সেই ভবভূতির রামচন্দ্রের কথা মনে পড়ে—"পুটপাক-প্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ।"

অরবিন্দের এই প্রকার মনের ভাব তাহার দ্বিতীয়া পত্নী ব্রজরাণীর অজ্ঞাত ছিল না। ব্রজরাণী উচ্চশিক্ষিতা, রূপবতী, পিতার ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা এবং বাপমায়ের সোহাগিনী। তাহার ধনলোলুপ পিতা ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে দোজবরের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া সে স্বামীর নিকট ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য ভালবাসা ষোল আনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে ছাড়িবে কেন? তাই সে মনোরমার প্রসঙ্গ উঠিতেই ঈর্ষ্যায়, ক্রোধে ও অভিমানে আত্মহারা হইয়া পড়ে। সে সর্ব্বদা স্বামীকে চোখে চোখে রাখিতে চায় এবং এমন কি, স্বামীর মনের উপর চৌকীদারের মত পাহারা দেয়। তাই অরবিন্দের বর্দ্ধমান যাওয়ার সংবাদে ব্রজরাণী স্বামীর সহিত এক তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া দিল। ব্রজরাণী বলিল—"মনের সমস্তটাই তোমার সে যে আজ পর্য্যন্ত জুড়ে ব'সে আছে। আমার কি আর এতটুকু একটু স্থান আছে কোথাও।" অরবিন্দ সংযতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি তোমার অযত্ন করেছি কখন?" "যত্ন আর ভালবাসা দুই কি এক?"......"তুমি যখন আমায় সত্যি ক'রে ভাল-বাসতে পারবে না, তখন তুমি কেন আমায় বিয়ে করেছিলে? মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ আর এক জনকে ধ্যান ক'রে, বাইরে এই যে একটা টেনে এনে ঘরকরণা করা, এটা কি মস্ত বড় ছলনা নয়? এতে কি পাপ নেই?"......

......"রাণি, তুমি বাড়ালে! সেই এক জনকে ভিখারীর অধম করেও কি তোমরা তৃপ্ত হও নি? এই যে মনের খোঁটা চব্বিশ ঘণ্টাই দিচ্ছ, তারই বা তুমি কি প্রমাণ পেয়েছ, তাই বলো তো? এক বিন্দু মনুষ্যত্ব এ মন থেকে কোন দিন ক্ষরে পড়তে দেখেছ কি?" "তুমি তার কি বুঝবে?—এই যে কথাগুলো বললে, ওইগুলোই যে তোমার বুকের রক্তে স্নেহের রসে মাখা।" "তবে নাচার!"

ব্রজরাণীর এই ত হইল স্বামীর প্রতি ব্যবহার। তাহার সতীন-পুত্র অজিতকে সে কিরূপ ভাবে দেখে, তাহার একটু নমুনা দিতেছি। অরবিন্দের দুইটি ভগিনী, তাহার বড়টি শরৎশশী মনোরমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, আর ছোটটি উমা ব্রজরাণীর ভক্ত। শরতের মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সে নিজে বর্দ্ধমানে গিয়া মনোরমাকে আনিতে চেষ্টা করিল। শরতের বাসনা ছিল, যদি এই সুযোগে অরবিন্দের সহিত মনোরমার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু মনোরমা কিছুতেই আসিল না। সে বলিল,—"কেন দিদি, শুধু শুধু তাঁহাকে দুঃখ দিতে যাবো? চোখে আমি একবার দেখতে পেতুম বটে, কিন্তু তার জন্য হয় ত তাঁহার জীবনের একটা বছর ক্ষয় ক'রে দিয়ে আসতে হ'তো।...এ হতভাগীকে তিনি যে আজও ভুলতে পারেন নি, সে ত আমার জানা আছে।" মনোরমা আসিল না, কিন্তু অজিতকে পাঠাইল। অজিতের বয়স এখন এগার বৎসর, সে খুব বুদ্ধিমান্, পড়াশুনায় ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সে এযাবৎকাল মায়ের পক্ষপুটের তলে মানুষ হইয়াছে, বাবাকে কখনও দেখে নাই। কিন্তু বাবাকে দেখিবার জন্য তাহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। শরৎ তাহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে কলিকাতার নানা দৃশ্য দেখিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। বিবাহের পূর্ব্বদিন গায় হলুদ। ব্রজরাণীও আসিয়াছে। অজিত সে দিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে আনন্দোৎফুল্ল-মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার পূর্ব্ব স্বভাবানুসারে, স্থানকাল-পাত্র বিস্মৃত হইয়া ব্রজরাণীকে তাহার পিসীমা বলিয়া ভুল করিয়া একেবারে তাহার কোলের কাছটিতে আসিয়া পড়িল এবং আনন্দের উচ্ছ্বাসভরে বলিল—"পিসীমা, পিসীমা! বায়স্কোপ জিনিষটা ভারি মজার! আর তেমনি হাসির! কিন্তু ভারি বিশ্রী! কেবল যত দুষ্টু ছেলের কাণ্ড!"——"সেই বসন্তকালের নবীন পত্রপল্লবাচ্ছন্ন কচি চারা গাছটির মত চক্‌চকে ঝলমলে সেই মুখখানির দিকে চাহিবামাত্র ব্রজরাণীর মনে হইল, তাহার তারা দুইটা যেন সুধাসাগরে ডুব দিয়া শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল।...তাহার শুষ্ক, রুক্ষ বন্ধ্যাজীবনের মধ্যে আজ আকস্মিক মা জাগিয়া উঠিলেন।"—অজিত তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া অতি সঙ্কোচের সহিত দুই একটি কথার উত্তর দিয়া প্রশ্নকর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি কুণ্ঠার হাসি হাসিল। ব্রজরাণী "সেই হাসির আলোয় ছোপান পাতলা টুকটুকে রাঙ্গা ঠোঁট দুখানির মধুর" প্রতি দুর্দ্দমনীয় লোভ কষ্টে সংযত করিল। এই সময়ে সে হঠাৎ জানিতে পারিল, এই প্রিয়দর্শ শিশুটি কেবল যে বর্দ্ধমান হইতে আসিয়াছে, তাহা নয়, এটি তাহার সতীনপুত্র অজিত! অমনি "ব্রজরাণীর হাতের আঙ্গুল কয়টা জ্বলন্ত আগুনে ঠেকা ঝলসান হাতের মত একটা প্রবলতর শিহরণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ছোট হাতখানির উপর শিথিল হইয়া থামিয়া পড়িল।" সেই রাত্রেই ব্রজরাণী কলিকের বেদনার ছলে শরতের সহিত ঝগড়া করিয়া অসময়ে বাড়ী ফিরিয়া গেল, এবং বর্দ্ধমান হইতে কেবল অজিত আসে নাই, তাহার মাও আসিয়াছে, অরবিন্দের ইহাতে যোগা-যোগ আছে, এবং অরবিন্দ তাহাদিগকে লইয়া বায়স্কোপ দেখাইয়া

আমোদ করিয়া বেড়াইতেছে ইত্যাদি নানাপ্রকার সন্দেহবিষে জর্জ্জরিত হইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরদিন অরবিন্দ যখন শরতের বাড়ীতে বিবাহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অরবিন্দ পশ্চাৎ হইতে "দ্রাবকময় বোমার মত ফাটিয়া পড়িতে শুনিল—'ওখানে আজ যদি যাও তো তোমার ছেলের দিব্যি রইল'!" এইরূপে অজিত তাহার পিতাকে এবারও দেখিতে পাইল না।

কিন্তু পিতার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও অজিত মোটরের উপর শরতের বাড়ী হইতে আনন্দিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে কলিকাতার অনেক নূতন জিনিষ ও নূতন দৃশ্য দেখিয়াছে. সে তাহার পিসীমা ও ঠাকুরমার আদর পাইয়াছে। তাঁহারা তাহাকে এক প্রকাণ্ড বাক্সে বোঝাই করিয়া কত নূতন কাপড়,জামা, জুতা দিয়াছেন। সেগুলি সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত উৎসাহভরে "মামণি"কে দেখাইতে লাগিল। এই সকল দেখিতে দেখিতে মনোরমার চোখ জলভারে ছল ছল করিয়া আসিল। বাড়ীর সরকার, দরওয়ান পর্য্যন্ত অজিতকে কাপড় ও টাকা দিয়া মুখ দেখিয়াছে। কিন্তু মনোরমার সেই "জাগ্রত দেবতা," তিনি কি দিয়াছেন? "পরিত্যক্তা মনোরমাকেই তাঁহার চাহিয়া দেখিবার অধিকার নাই, এবং তার জন্য মনোরমা কি কোন দিন পাওনা আদায়ের নালিশ করিতে গিয়াছে? পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তিনি যদি তাহাকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সে নিজেই কি আর এমন দেবতার আদর্শে তাঁহাকে বুকের মাঝখানে আসন পাতিয়া বসাইয়া রাখিতে পারিত?......কিন্তু ভগবান্ রামচন্দ্রও তো নিজ সন্তানের অবমাননা করিতে পারেন নাই? দুষ্মন্তও পরিত্যক্তা শকুন্তলার গর্ভজাত শত্রুদমনকে দূর হইতে দেখিয়া বাৎসল্যাবেগে আত্মহারা হইয়াছিলেন?" পরে কথায় কথায় অজিত যখন বলিল, সে তাহার পিতাকে বিবাহবাড়ীতে দেখে নাই, এমন কি, বিবাহসভায়ও তিনি আসেন নাই, তখন মনোরমার মুখের কালি অধিকতর কালো হইয়া গেল; পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তাহার কাঁপিয়া স্থির হইয়া গেল। অজিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি ভালো আছেন তো?" পরে অজিত যখন বলিল, "তাঁহার অসুখ করে নাই, তাঁহাকে নাকি হঠাৎ কোন মোকদ্দমার জন্য ভাগলপুর যাইতে হইয়াছিল, সেই জন্য আসিতে পারেন নাই,"—তখন মনোরমা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শরৎ তাহার স্বামী জগদিন্দ্রকে মনোরমার কথা বলিলে, জগদিন্দ্র বলিয়াছিল—"নাঃ—এ চমৎকার! একেবারে সত্যি সত্যি সীতাদেবী!" শরৎ যথার্থই বলিয়াছিল, "ও গো, না না—সীতাদেবীর মনেও এতটুকু একটু অভিমান ছিল,—এর যে তা'ও নেই গো!"

অজিত কিন্তু বিবাহবাড়ীতে তাহার সঙ্গী ছেলেদের কানাঘুসোতে বুঝিয়াছিল, অরবিন্দের ভাগলপুর যাওয়ার অজুহাতে বিবাহে না আসা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সে জন্য তাহার মনে একটা সন্দেহের বীজ থাকিয়া গেল। ইহার পরে তাহার পিসীমার মৃত্যু হইলে, তাঁহারা যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন সেও তাহার মা এবং দিদিমণির সহিত কাশীতে গিয়া কয়েক দিন ঠাকুরমার সঙ্গে কাটাইয়াছিল। এক দিন সে তাহার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"আচ্ছা, ঠাকুমা! আমার বাবা কি সত্য সত্যই আমাদের ত্যাগ করেছেন?" এই কথার কোন উত্তর না দিয়া, তাহার ঠাকুরমা—"দাদা আমার, মাণিক আমার, সৃষ্টিধর আমার রে!" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অজিতের মনের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। কাশী হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া অজিত অনেক সময়ে বই খুলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া থাকিত। মনোরমা এক দিন তাহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া, প্রশ্ন করিতে করিতে তাহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিল। তখন অজিতের হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত মেঘ অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া মায়ের বুক ভাসাইয়া দিল। মনোরমা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল—"আমি বলছি, তিনি আমাদের ত্যাগ করেন নি। বাপের আদেশ পালন করবার জন্য শুধু দূরে রেখেছেন। এ কথা তোমার বিশ্বাস হয়?" এই কথা শুনিয়া "অজিতের শোণিতার্দ্র কাতর চিত্ত একটি মুহূর্ত্তেই জুড়াইয়া স্নিগ্ধ হইয়া গেল।"

অজিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া পিতাকে চিঠি লিখিয়া সে সংবাদ জানাইল। সে চিঠি অরবিন্দের টেবলের স্তূপীকৃত কাগজপত্র গুছাইতে গুছাইতে ব্রজরাণীর হাতে পড়িল। ব্রজরাণীর হৃদয় তখন মা হইবার জন্য খা খা করিতেছে। সে অরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিল—"তার চিঠিটার জবাব দিয়াছ?" অরবিন্দ তাহার উদ্বেগিত মুখের দিকে বারেক চকিত কটাক্ষে চাহিয়া পুনশ্চ আহারে মনে নিবেশ করিল। ব্রজরাণী মুহূর্ত্তে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"বলি, পরও ত পরকে একখানা চিঠি লিখলে তার জবাব দেয়—এটুকুও কি মনে করলে পারতে না? না, আমিই তাতে দম্ ফেটে ম'রে যেতুম।" দুইজনে কথা কাটাকাটির পর ব্রজরাণী বলিল—"সংসারে সংসারে অনেক কুকীর্ত্তিই ক'রে থাকে,—সে এমন বিচিত্র নয়; কিন্তু সৎবাপ যেমন অজিতের দেখছি, এমন আর কোথাও কারও দেখিনি" ...ইহার পরে ব্রজরাণী নিজেই অজিতকে তাহার নিরতিশয় আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া চিঠি লিখিল। এই চিঠি পড়িয়া অজিতের মন, তাহার বিমাতার পূর্ব্ব-ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিতৃষ্ণায় বিকল হইয়া গেল, আর তাহার পিতার প্রতি অভিমানে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

লেখিকা এইরূপে রসপ্রবাহের (emotions) ঘাতপ্রতিঘাত প্রদর্শন করিয়া তাঁহার আর্টের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইহার চরম বিকাশ (climax) হইয়াছে, যেখানে অজিতের মর্ম্মের কথাগুলি একটা কবিতার আকার ধারণ করিয়া অরবিন্দের হৃদয়ের অন্তস্তলে আঘাত করিয়া তাহার চিরসঞ্চিত সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার চৈতন্য লোপ করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, এখানেই কবির "high seriousness" দেদীপ্যমান হইয়াছে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অজিত কলিকাতায় পড়িতে গেল। সে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইল হিন্দু হোষ্টেলে বাসা করিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এফ্‌ এ পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার মাতামহীর সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে সে অভিভূত হইয়া পড়িল, এবং পরীক্ষার ফল নিতান্ত খারাপ করিয়া ফেলিল। যে ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিল, সে তৃতীয় বিভাগে এফ্‌ এ পাশ করিল। তাহার মাতামহীরও মৃত্যু হইল, আবার সংসারের দৈন্যও অত্যন্ত প্রকট হইয়া পড়িল। এরূপ অবস্থায় অজিত কি তাহার মহাধনী পিতার সাহায্য প্রার্থনা করিবে? কখনই না। সে তিনটা টিউসনী জুটাইয়া লইয়া হোষ্টেলে থাকিয়া আবার পড়া আরম্ভ করিল। তাহাদের হোষ্টেলে ছেলেদের একটা সাহিত্য-সভা ছিল। তাহার বাৎসরিক উৎসবের দিন কোন এক জন গণ্যমান্য সাহিত্যরথী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ছেলেদের আবৃত্তি শুনিতেন এবং পুরস্কার বিতরণ করিতেন। জজ গুরুদাসবাবু এবার আসিতে না পারিয়া তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে এক জন প্রবীণ সাহিত্যিক আদিত্যবাবুও আসিয়াছেন। তাঁহারা ছেলেদের আবৃত্তি শুনিতে লাগিলেন। অজিত তাহার নিজের রচিত এই—"মা"—শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিল—

> "ঋষিশাপে সিন্ধুতলে আছ নিমজ্জিতা,
> দুর্জ্জন অপবাদে পতিত্যক্তা সীতা,—
> তবু চির-পতিপ্রাণা, কায়মনঃপ্রাণ,
> পতি-দেবতায় পদে করিয়াছ দান।

নদী কভু নারে. ফিরাতে সে জলধারা
দে'ছে যা' সিন্ধুরে।
আজি মাতা তুমি,
পাসরিলে যত ব্যথা সন্তানেরে চুমি,
হেরি পলে পলে,
ধ্যেয় দেবতার রূপ এ মুখমণ্ডলে।
তাই বুঝি চাও অনিমিষে।
আপনার বক্ষনীড়ে? তৃপ্ত হাসি হেসে,
ঢেলে দাও অন্তরের সুধা সিন্ধু স'র
অতুলা মায়ের স্নেহ, জননী আমার।
সুপবিত্র সতীপ্রেম গলিয়া ক্ষরিয়া
মাতৃস্তন্য সুধা মাথে পড়েছে ঝরিয়া,
অবোধ শিশুর পানে। ত্রিদিব-বন্দিতা!
অয়ি, মম স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা।"

সভাপতি এই আবৃত্তি শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়া অজিতের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। কবিতা-পাঠ সমাপ্ত করিয়া অজিত যখন এক পাশে সরিয়া পড়িল, তখনও তাঁহার দুই চোখের ব্যগ্রদৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিল। পরে তাহার হাতে মেডেল দেওয়ার সময় যখন জানিতে পারিলেন, এই বালকটির নাম অজিতকুমার বসু—অমনি তাঁহার হাত হইতে মেডেলটা মাটিতে পড়িয়া গেল। এই সময়ে সভাপতির সহকারী আদিত্যবাবু সভাপতিকেই "অরবিন্দ" বলিয়া সম্বোধন করিতেই, অজিত বাঁশীর তানে উৎকর্ণ কুরঙ্গের ন্যায় অরবিন্দের পানে চাহিল এবং যুগপৎ আনন্দোচ্ছ্বাস ও অভিমানজড়িত সন্দেহের তীব্রতাপে তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। (সে পূর্ব্বেই জানিত, তাহার পিতা এক জন গণ্যমান্য সাহিত্যিক।) তখন সে চমকাইয়া উঠিয়া অরবিন্দের সম্মুখে বিস্তৃত নিজের হাত টানিয়া লইল। ও দিকে অরবিন্দও নদীবিতাড়িত বেতসের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ধপ করিয়া তাহার আসনে বসিয়া পড়িল এবং তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

আদিত্যবাবু বালকদিগের সাহায্যে অরবিন্দকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। কয়েকদিন সংজ্ঞাহীন থাকিয়া অরবিন্দ বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া আসিল না। ব্রজরাণী নিজেকে পতিতঘাতিনী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল এবং অজিতকে পাইবার জন্য তাহার বুভুক্ষিত মাতৃহৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। অজিত কিন্তু কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিল না। তাহার অভিমানের বেগ কমিলে, পিতাকে দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহাকে পাইয়া বসিল এবং পুনঃ পুনঃ রাত্রিকালে হোষ্টেলে অনুপস্থিতির জন্য সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া উন্মাদের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পরে কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হাঁসপাতালে নীত হইল এবং কোনক্রমে প্রাণে বাঁচিয়া বাহির হইল। অবশেষে সে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে মৃত্যুশয্যায় দেখিল। মনোরমার মৃত্যুকালে ব্রজরাণীও আসিয়া জুটিল এবং মনোরমার নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিয়া অজিতের "মা" হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া ঘরে লইয়া গেল। দুঃখিনী মনোরমার জীবন এইরূপে চিরদিন দুঃখভোগেই শেষ হইল। গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপে আখ্যায়িকাকে একখানা ট্রাজিডিতে পরিণত করিয়াছেন। অরবিন্দ এবার রোগাক্রান্ত হইয়া এক প্রকার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া ব্রজরাণীকে যে মর্ম্মকথা শুনাইয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে অশ্রুসংবরণ করা কঠিন।

"না না, না, ব্যস্ত হয়ো না। শীগ্রই হয় ত সকল কষ্টের অবসান হবে। আরও কি তুমি আমায় সইতে বলো? আরও? অজিত,—আমার নিষ্পাপ, পবিত্র, সোনার অজিত—তাকে আজ আমি—এই লক্ষপতি অরবিন্দ বসু—তাকে আজ আমি পথের ভিখারীর সাজে দেখেছি। তুমি জানো না, রাণি, কি সহ্য আমি করেছি। মৃত্যুঞ্জয় বসুর একমাত্র বংশধর আজ পিতার পাপে অকলঙ্কে কলঙ্কিত, ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত। আর সে কেন, তা কি তুমি জানো? এই ঘরের মধ্যে এক দুর্য্যোগ রাত্রে চোর আসে। তোমার মনে পড়ে? সে চোরও নয়, সে স্বপ্নও নয়, সে আমার সর্ব্বস্বধন অজিত।"

* * *

"তোমার কি অপরাধ? তোমায় আমি অবজ্ঞা করতে চাইনি, দুঃখ দেবো মনে ক'রে দিই নি। এ তুমি বিশ্বাস করো। কিন্তু তবু হয় ত অদৃষ্টদোষে দিয়ে ফেলেছি, হয় ত বলছি কেন? তুমি যদি একাই আমার হতে, আর যদি কারু আগুনের লেখা স্মৃতির দহন তোমার মাঝখানে অনির্ব্বাণ হয়ে না থাকতো, তা'হলে নিশ্চয়ই—তা'হলে আমি তোমায় এর চাইতে বেশী সুখী দেখতে পেতুম। বলবে, এমন অবস্থায় তোমায় বিয়ে করা আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তা নয়—তোমায় বিয়ে—আমি তাকে কোন দিন ভুলতে পারবো না জেনেই করেছিলুম। তা না করলেও আমার আর এক রকমে নিষ্কৃতি ছিল না। বিয়ে না করলে এমনি কষ্ট আমায় দিতে হ'তো—আমার বাপের মনে। আমার ভাগ্যলিপিই যে ঐ।"

মনোরমাও তাহার কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া নিজের মনে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল। সে শরৎশশীকে বলিতেছে—"বাবা যখন আমায় ত্যাগ করেছেন ও তাঁকে দিয়ে করিয়েছেন—তখন এই একটা জন্ম আমার এই রকম করেই কাটিয়ে দিতে হবে। তা হোক, এ আমার কর্ম্মফল। দোষ আমি কারুকে দিইনে। জন্মান্তরে নিশ্চয় আমি রাণীকে মর্ম্মান্তিক ক'রে থাকবো—তাই এ জন্মের পাওনাটা আমায় শোধ করে দিতেই হবে।"

কর্ম্মফল ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী হিন্দু নরনারীর জীবনের ইহাই ত সান্ত্বনা। কিন্তু গৃহকর্ত্রী ত শুধু হিন্দু পাঠক-পাঠিকার জন্য পুস্তক রচনা করেন নাই। অন্য সম্প্রদায়ের পাঠক-পাঠিকা, বিশেষতঃ যাঁহারা নব্যতন্ত্রের লোক, তাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কি? পিতৃসত্যপালনকারী ও প্রজারঞ্জনার্থ সীতা-বর্জ্জনকারী ত্রেতাযুগাবতার শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে কল্পিত অরবিন্দকে এই বিংশ শতাব্দীতে সকলে আদর্শ-চরিত্র বলিয়া গ্রহণ করিবে কি? রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিতে গিয়া কেবল নিজের প্রতিই অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ পিতার মনস্তুষ্টির জন্য শুধু নিজের প্রতি নাহ, তাহার ধর্ম্মপত্নী মনোরমা ও তাহার নিষ্কলঙ্ক শিশু, একমাত্র বংশধর অজিতের প্রতি ঘোরতর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। তাহার পাষণ্ড পিতার ধর্ম্ম-বিগর্হিত আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে গিয়া অরবিন্দের মনুষ্যত্ব পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে কি? হয় ত অনেকে বলিবেন, হয় নাই। তাঁহাদের মতে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত যুবক অরবিন্দের পক্ষে এরূপ প্রাচীন আদর্শ চক্ষু বুজিয়া অনুসরণ করা স্বাভাবিক হইবে কি না সন্দেহ। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমার মনে হয়, অরবিন্দকে পিতৃসত্যপালনে হিমাচলের ন্যায় অচল অটল না করিয়া, তাহার মধ্যে একটু দুর্ব্বলতা রাখিলে, এই চরিত্রটি অধিকতর স্বাভাবিক ও মনোজ্ঞ হইত। গ্রন্থকর্ত্রী বোধ হয় মনোরমাকে সীতাদেবী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর আদর্শ-পত্নী করিতে যাইয়া অরবিন্দকে কতকটা অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মতে চিরদুঃখিনী মনোরমা ও তাহার পুত্রের প্রতি কিঞ্চিৎ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার করিলে অরবিন্দের চরিত্রে কোন দোষ স্পর্শ করিত না, বরং তাহা স্বাভাবিক বলিয়া সুশোভন হইত। এক জন পতিব্রতা রমণী যেমন নিজের জীবন দিয়াও স্বামীর জীবন রক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়েন, একটি যথার্থ প্রেমিক

পতিরও স্ত্রীর জীবন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহাতে যদি অন্য দিক দিয়া তাহার কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হওয়ার জন্য ক্ষতি স্বীকার করা আবশ্যক হয়, তাহাও করা উচিত। মনোরমার যখন মাতার মৃত্যুর পরে অন্নবস্ত্রের অভাবে জীবন রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িল, অরবিন্দ তখন কোন্ প্রাণে তাহার নূতন অট্টালিকায় সুখে স্বচ্ছন্দে বিষয় ভোগ করিতেছিল? তাহার কি দারিদ্র্যনিপীড়িত ধর্ম্মপত্নীর ভরণপোষণের কোন বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল না? অরবিন্দ অনেক গরীব ছাত্রের পড়ার খরচ দিয়া সাহায্য করিত, কিন্তু তাহার নিজের একমাত্র বংশধর অজিত যে বহুকষ্টে তিনটা টিউসনী করিয়া শরীর ক্ষয় করিতেছিল, ইহাও কি তাহার খোঁজ করা উচিত ছিল না? শুধু মনে মনে ভালবাসাই সংসারে যথেষ্ট নহে। শেষের দিকে অরবিন্দের অজিত ও মনোরমার প্রতি কথঞ্চিৎ কর্ত্তব্যপালনের একটা সুযোগও ঘটিয়াছিল, কিন্তু লেখিকা তাহার সদ্ব্যবহার করেন নাই। অজিত যখন সেই দুর্য্যোগের রাত্রে নিদ্রিত পিতার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া অরবিন্দের চরণ অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়া চোরের মত পলাইয়া গেল, তখন সেই নিদ্রিত দরোয়ান অজিতের পাদস্পর্শে সচেতন হওয়া যদি তাহাকে ধরিয়া ব্রজরাণীর নিকট লইয়া যাইত, ব্রজরাণী যদি অজিতকে চিনিতে পারিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সাতবৎসরব্যাপী মা হওয়ার প্রবল পিপাসা মিটাইত এবং স্বামীর নিকট তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার কোলে অজিতকে বসাইয়া দিত, যদি ব্রজরাণী মনোরমার মৃত্যুকালে তাহাকে দেখিতে না গিয়া এই সময়ে অজিতকে লইয়া গিয়া তাহাকে লইয়া আসিত, তাহা হইলে অরবিন্দ পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিলেও শেষ জীবনে মনোরমা অজিত সুখী হইতে পারিত। অজিতকে যে ভাবে ব্রজরাণী ও অরবিন্দের সহিত মিলন ঘটান হইয়াছে, তাহাতে অজিত জীবনে কখনও সুখী হইতে পারিবে না। যাহার মাতা চিরজীবন দুঃখে কাটাইয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সে বিমাতার স্নেহ পাইয়া এবং পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও কি প্রকারে সুখী হইতে পারে? গ্রন্থকর্ত্রী এই কাব্যকে ট্র্যাজেডি করিবার অভিপ্রায়েই এরূপ করিয়াছেন। কাব্য হিসাবে ট্র্যাজেডির effect অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী সন্দেহ নাই, এবং high seriousness" বোধ হয় ট্র্যাজেডিতেই অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

লেখিকার ভাষা বেশী অলঙ্কারভারাক্রান্ত ও পাণ্ডিত্যপ্রকাশক (pedantic), এরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষা অধিকাংশ স্থানেই খুব প্রাঞ্জল ও স্বাভাবিক প্রবাহবিশিষ্ট। তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান একটুও নাই, আমি ইহা বিশেষরূপে জানি, সুতরাং অযথা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের চেষ্টা হইতে পারে না। তবে তাঁহার কল্পনাশক্তি অত্যন্ত প্রখর বলিয়া বর্ণনার বেগে তাঁহার মনে উপমার পর উপমা, ছবির পর ছবি আসিয়া পড়ে; তিনি অনেক সময় সেগুলি দমন (control) করিতে পারেন না। এইরূপ অলঙ্কারভারাক্রান্ত লেখা যাঁহারা পছন্দ করেন না, তাঁহারা ইহাকে একটা দোষ বলিয়া গণ্য করেন। ম্যাথিউ আর্নল্ড এরূপ styleকে 'Asiatic style" বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'Asiatic style"অপেক্ষা Classic style" অধিকতর প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে Asiatic style"ই কাব্যের গুণ। তবে সকলমত সংগৃহীত, এ কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

হোলী

বঁধু—এস এস খেলি হোলী মানস-দোলে,
আজি—দখিণ পবনে হৃদি-দুয়ার খোলে।
মধুর সায়ংকাল,
কুমকুমে লালে লাল,
তার— অপরূপ রূপ হেরি নয়ন ভোলে॥

ঐ—ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে
হের—নাচে রে চাঁচরে আজ চরাচর রঙ্গে,
প্রেম অনুরাগভরে
মম মন-অন্তরে
যত—ছন্দেরা গেয়ে ঘুরে মধুর বোলে॥

আহা—চারিদিকে ভ'রে উঠে অগুরুর গন্ধ
তায়—তাথই তাথই নাচে অথই আনন্দ,
ফাগে ফাগে জ্বল' জ্বল'
ফাগুন আগুন হলো,
ঘন—ঝম্প ডম্ফ রব মৃদঙ্গ তোলে॥

আজি—উৎসবময় কর নবীন বসন্ত,
তায়—উৎসারো উল্লাস উৎস অনন্ত,
জড়িমা মগন কর'
মধুর লগনে ভরো
শুধু— "হোলী হায় হোলী হায়" সঘন রোলে॥

শ্রীকালিদাস রায়

পার্লামেণ্টের কথা

বিলাতে শ্রমিক-সম্প্রদায় শাসনদণ্ড পরিচালিত করিবার অধিকার পাইয়াছেন। তাঁহারা শাসনযন্ত্র পরিচালনার অধিকার পাইলেও সর্ব্ববিষয়ে আপনাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে কার্য্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন নাই। তাহার কারণ, তাঁহারা সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করিলেও সংখ্যায় তাঁহারা ইউনিয়নিষ্টদিগের অপেক্ষা ৬৫ জন কম। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা উদারনীতিকদিগের সাহায্যে যে ইউনিয়নিষ্টদিগকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই ইউনিয়নিষ্টরা যে সহজে তাঁহাদিগের হস্তে শাসননীতি পরিচালিত করিবার ক্ষমতা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তাহা মনে হয় না। ইহার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইউনিয়নিষ্ট বা রক্ষণশীল দল আপনাদের দলের সুব্যবস্থা করিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ বলডুইনই রক্ষণশীল দলের নেতা রহিয়াছেন। যেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে রক্ষণশীল দল শ্রমিক শাসকদিগের নীতির কঠোর সমালোচনা করিবেন বলিয়াই মনে হইতেছে। এ দিকে শ্রমিক দলের নায়ক মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডও নিশ্চিন্ত নাই। তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এবার তিনি নিরঙ্কুশভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না। সেই জন্য এই সুযোগে তিনি তাঁহার স্বপক্ষে লোকমত টানিয়া আনিবার জন্য বিশেষ কতকগুলি ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যাহাতে গরীবদিগের প্রাতরাশ সুলভ হয়, সেই জন্য তিনি চা, চিনি প্রভৃতির উপর আমদানী শুল্কের হার হ্রাস করিয়া দিবেন এবং মন্ত্রীদিগের বেতনও যথাসম্ভব কমাইয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। এ দিকে উদারনীতিকরাও নিশ্চিন্ত নাই। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মিঃ আস্কুইথও তাঁহার দলকে সংহত করিবার চেষ্টায় আছেন। ফলে বিলাতে এবার যে ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব।

আমরা প্রথমেই কমন্স সভার যে সকল কার্য্য-ফলে শ্রমিক-সম্প্রদায় শাসনতরণীর কাণ্ডারিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার কথা বলিব।

এবার কমন্স সভা মিঃ জে, এইচ, হুইটলেকে স্পীকার নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সকল দলই একবাক্যে ইঁহার নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন। ইনি উদারনীতিক মতাবলম্বী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল তারিখে ইনি প্রথমে কমন্স সভার স্পীকারের সম্মানজনক পদে নির্ব্বাচিত হয়েন। তাহার পর ১৯২২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইঁহাকে কমন্স সভা পুনরায় ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবারও কমন্স সভা একবাক্যে তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই কার্য্যে ইঁহার যোগ্যতাও অনন্যসাধারণ। পার্লামেণ্টের পরিচালনসম্পর্কিত নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান আছে বলিয়া ইনি ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কমন্স সভার ডেপুটী স্পীকারের এবং কমিটীর প্রেসিডেণ্টের পদ প্রাপ্ত হয়েন। স্পীকারের পদে উন্নীত হইবার পূর্ব্ব-সময় পর্য্যন্ত ইনি সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বিগত ১৫ই জানুয়ারী সম্রাটের অভিভাষণ হইয়াছিল। সেই অভিভাষণে এই কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছিল যে, ইংলণ্ডের আমদানী রপ্তানী শুল্ক নির্দ্ধারণ ব্যাপারে রক্ষানীতি অবলম্বিত হইবে না, কিন্তু সাম্রাজ্যের মধ্যে পক্ষপাতী শুল্কনীতি (principles of imperial preference) অবলম্বিত হইবে ; কারণ, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্য-পরিষদে ঐ নীতি পরিগৃহীত এবং ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে উহা দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছে। সম্রাটের অভিভাষণে এইরূপ নানা কথাই ছিল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কথাপ্রসঙ্গে সম্রাট্ বলিয়াছিলেন যে, ঐ অঞ্চলে কতকগুলি হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়াছে ; হত্যাকারীদিগকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া এবং ঐ অঞ্চলে সন্তোষজনক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড সর্ব্বপ্রথমে সম্রাটের অভিভাষণের সমালোচনা করেন। তাহাতে দলাদলির আড়াআড়ি বেশ পরিস্ফুট ছিল। তিনি বলেন যে, সাম্রাজ্য-পরিষদে যে সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইবে, পার্লামেণ্ট যে তাহাই অবিসংবাদে গ্রাহ্য করিয়া লইবেন, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কারণ, তাহাতে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে।

সাম্রাজ্যপরিষদে মন্ত্রীরা যে প্রতিশ্রুতি করিবেন, তাহাই কমন্স সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। তাহা গ্রাহ্য করা হইবে কি অগ্রাহ্য করা হইবে, সে বিচার করিবেন কমন্স সভা। তাহার পরই মিঃ জে, আর, ক্লাইনিস শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সম্রাটের অভিভাষণের উপর সংশোধক প্রস্তাব এবং রক্ষণশীল মন্ত্রিবর্গের উপর আস্থাহীনতার ভোট উপস্থিত করেন। ইহার পূর্ব্বেই ভাব দেখিয়া বুঝা গিয়াছিল যে, উদারনীতিক দল শ্রমিক দলের সহিত সম্মিলিত হইয়াই ঐ আস্থাহীনতার প্রস্তাবে ভোট দিবেন। উদারনীতিক দলের প্রধান নায়ক মিঃ আস্কুইথ বলিয়াই দিয়াছিলেন যে, উদারনীতিকমাত্রেরই শ্রমিকদিগের সহিত একযোগে ভোট দেওয়া প্রয়োজন। রক্ষণশীলদিগের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা তখন বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব ছিল না। কয় দিন তর্কের পর ২১শে জানুয়ারী সোমবার এই বিষয়ে ভোট গৃহীত হয়। ভোটে দেখা গেল যে, ঐ আস্থাহীনতার ভোটের পক্ষে ৩ শত ২৮টি এবং বিপক্ষে ২ শত ৫৬টি ভোট হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে ৭২টি ভোট অধিক। সর্ব্বসমেত ৫ শত ৮৪টি ভোট সংগৃহীত হইয়াছিল। ৯ জন উদারনীতিক আস্কুইথের অনুরোধ না মানিয়া রক্ষণশীলদিগের পক্ষে, অর্থাৎ শ্রমিকদিগের উপস্থাপিত আস্থাহীনতা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। তাহার কারণ, শ্রমিক-শাসনে তাঁহাদের একেবারেই আস্থা নাই। অগত্যা মিঃ বলডুইনকে বাধ্য হইয়া মন্ত্রিত্ব ছাড়িতে হইল।

এই উপলক্ষে মিঃ আস্কুইথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনীষার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলিতেছেন, এমন সুন্দর বক্তৃতা পার্লামেণ্টে বহু দিন শুনা যায় নাই। এখন মিঃ আস্কুইথের মতলব যে কি, তাহা বলা বড়ই কঠিন। তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা যদি তাঁহার ঐকান্তিক কথা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি কেবল শ্রমিকদিগকে রাজনীতিক তরণীর কাণ্ডারিপদেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না,—উহাদিগকে বরাবর ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য চেষ্টাও করিবেন। তাঁহাকে উহাদের বহু কার্য্যের ও নীতির সমর্থন করিতে হইবে। মিঃ আস্কুইথের হয় ত ঐরূপ অভিপ্রায় থাকিতে পারে, কিন্তু সকল উদারনীতিকের যে ঐরূপ মত হইবে, এমন কোন কথাই বলা যায় না। কারণ, অনেক শ্রমিক নির্ব্বাচনকালে বলিয়াছিলেন,—"রক্ষণশীল ও উদারনীতিক দুই পক্ষই দেশের সমান শত্রু।" উদারনীতিক দলও নির্ব্বাচনের সময় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রমিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইবেন না। তবে তাঁহারা রক্ষণশীলদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার সময় শ্রমিকদিগের সহিত সম্মিলিত কেন হইলেন, তাহাও বুঝা কঠিন। মিঃ অষ্টিন চেম্বারলেন সেই জন্য সম্রাটের অভিভাষণের আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন যে, মিঃ আস্কুইথ এবং তাঁহার বন্ধুগণ শেষে আপনারাই হাতে ক্ষমতা লইবেন, এই গূঢ় অভিপ্রায়েই সর্ব্বসমক্ষে শ্রমিকদিগকে অবিশ্বাসী করিবার জন্য এই কায করিয়াছেন। য়ুরোপীয়দিগের রাজনীতির কুটিলা গতি বুঝা অত্যন্ত কঠিন। মিঃ আস্কুইথের ঐরূপ গূঢ় অভিপ্রায় থাকা একেবারে অসম্ভব নহে; আবার মিঃ চেম্বারলেনও শ্রমিক এবং উদারনীতিকদিগের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ বপন করিবার জন্য ঐ কথা বলিতে পারেন। তবে অনেকে মনে করিতেছেন যে, উদারনীতিক দল একটু কৌশল করিলেই একরূপ বিনা বাধায় এবার মন্ত্রিত্ব পাইতেন। সুতরাং এখন তাঁহাদের এই কৌশল না করিলেও চলিত। যাহা হউক, ব্যাপারটা আর একটু অগ্রসর না হইলে কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

মিঃ বলডুইন এবং তাঁহার সহযোগিবর্গই এবার সম্রাটের অভিভাষণের খসড়া লিখিয়াছিলেন। অভিভাষণটি ভালই হইয়াছিল। ইহাতে যে স্বরাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করা হইবে বলিয়া আভাষ করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন পক্ষেরই আপত্তির কোন প্রকৃত কারণ ছিল না। সেই জন্য রক্ষণশীল সদস্য সালঙ্কার ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, উদারনীতিক, এমন কি শ্রমিক সদস্যরা, সরকারের (রক্ষণশীল) প্রস্তাবে এমন কি দোষ পাইয়াছেন? যদি তাঁহারা উহাতে কোন দোষই না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা রক্ষণশীলদিগের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছেন কেন? ইহার উত্তরে এই কথাই বলা হয় যে, রক্ষণশীল দল মুখে যাহা বলেন, কাযে তাহার কিছুই করেন না। সুতরাং তাঁহাদের কথায় বা অনুসৃত নীতিতে কোন দোষ না থাকিলেও তাঁহাদের উপর অন্য দুই দলের কোন আস্থাই নাই। মিঃ

ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছিলেন যে, রক্ষণশীল জননায়কগণ যে কর্ম্মতালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা শ্রমিক সরকার দ্বারাই সংসাধিত হইবে, ইহা মিঃ বলডুইনের দলের লোক দেখিতে পাইবেন। শ্রমিকরা অবশ্য অনেক কায করিবেন বলিয়া আশা দিয়াছেন; তাঁহারা যতটা বলিতেছেন,—ততটা যদিও কার্য্যে পরিণত না করিতে পারেন, অন্ততঃ বলডুইন সম্রাটের অভিভাষণে যতটা কায করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও আভাস দিয়াছেন, যদি ততটা মাত্র কাযও করিতে পারেন,—তাহা হইলেই শ্রমিক দল অন্য সকল দল অপেক্ষা ভাল কায করিয়াছেন বলিয়া সাধারণের এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের প্রশংসা পাইবেন।

শ্রমিক দল শাসনতরণী পরিচালিত করিবেন শুনিয়া বিলাতের যাঁহারা আতঙ্কে প্রায় মূর্চ্ছিত হইবার মত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এখন আর বিশেষ কোন উচ্চবাচ্য করিতেছেন না; ইহাও একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন কি, বিলাতের 'টাইমস্' পর্য্যন্ত এখন শ্রমিক-সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? ইহা কি উদীয়মান ভাস্করের পূজা? এখন য়ুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে, ঘরে এবং পরে, এমন অনেকগুলি কুটিলা সমস্যা উদ্ভূত হইয়া আছে,—রক্ষণশীল দল নানা কারণে যাহার কোনটারই সমাধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সমস্যার মধ্যে ইংলণ্ডের ঘরে অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রবিভাগে বেকার সমস্যা, গৃহনির্ম্মাণ সমস্যা, জাতীয় ঋণসমস্যা, ধর্ম্মঘট সমস্যা প্রভৃতি। ইহার প্রত্যেক সমস্যাই গুরু। পরে, অর্থাৎ পররাষ্ট্রবিভাগে, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সমস্যা, বাণিজ্য-সমস্যা, মার্কিণী সমস্যা প্রভৃতি বহু সমস্যা এমন জটিলভাব ধরিয়া আছে যে, সত্বর উহাদের সমাধান না করিলেই ইংলণ্ডের পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইবে। রক্ষণশীল দল বিশেষ তেজস্বিতার সহিত উহার কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন নাই। পাছে ফ্রান্সের সহিত বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, পাছে ফরাসীরা মধ্য-য়ুরোপে যে দল বাঁধিতেছিল, সেই দল প্রবল হইয়া পরিণামে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি হীন করিয়া দেয়, এই সকল সমস্যার অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বলডুইন, কার্জ্জন প্রভৃতি "কাযে কুড়ে বচনে কড়া" এই অখ্যাতির কলঙ্কিত তিলক ললাটে ধারণে বাধ্য হইয়াছেন। কাযেই তাঁহাদের উপর জনসাধারণের আর শ্রদ্ধা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে এই নূতন দলের মারফতে রাজনীতিক সতরঞ্চ খেলায় নূতন চা'ল দেওয়াও যে কোন কোন গম্ভীর রাজনীতিকের অভিপ্রেত নহে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ হইবার পরই মিঃ বলডুইন পদত্যাগ করিবার জন্য সম্রাটের নিকট গমন করেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার সঙ্কল্পের পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি পদত্যাগ করিলেন না। তিনি যদি পদত্যাগ করিতেন,—আর সম্রাটকে যদি এই পরামর্শ দিয়া আসিতেন যে, মিঃ আস্কুইথকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করা হউক,—তাহা হইলে উদারনীতিক দলপতিই মন্ত্রিত্ব পাইতেন,—শ্রমিকদল 'কোণ-ঠাসা' হইয়াই থাকিতেন। দ্বিতীয়তঃ সম্রাট যদি উদারনীতিক অপেক্ষা শ্রমিকদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলপতি মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে সেই সময়ে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিতেন, তাহা হইলে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকেই সম্রাটের অভিভাষণ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত লিখিতে হইত। সেই অভিভাষণের আলোচনাকালে যদি রক্ষণশীল ও উদারনীতিক উভয়ে একযোগে শ্রমিকদিগের উপর আস্থাহীনতার ভোট দিতেন, তাহা হইলেই শ্রমিক দলকে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিত্ব ছাড়িতে হইত। রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলের হাতে ক্ষমতা যাইবার ভয়ে যেরূপ আতঙ্কিত হইয়াছিলেন,—তাহাতে তাঁহাদের ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। বরং উদারনীতিকরা শ্রমিকদিগের সহায়তা করিয়াই তাঁহাদের হস্তে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন।

ইহার ফল আপাততঃ মন্দ হয় নাই। শ্রমিক দল ক্ষমতা পাইয়াই পররাষ্ট্রবিভাগে বেশ একটু কার্য্যকারিতার পরিচয় দিয়াছেন। রুসিয়ার সহিত তাঁহারা বাণিজ্য-সম্বন্ধ পাতাইতেছেন, জার্ম্মাণীকে জাতিসমবায়ের সদস্য করিয়া লইবার আয়োজন করিতেছেন এবং রূঢ়ের সমস্যাসমাধানের জন্য একটু বিশেষভাবে ফরাসীদিগের উপর চাপ দিতেছেন। স্বরাষ্ট্রবিভাগেও তাঁহারা বেকার-সমস্যা সমাধানে এবং কৃষির উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। অল্প ভাড়ায় বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হইতেছে। ফলে শ্রমিক দলপতি মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বিশেষ সাবধানতার সহিত তাঁহার সহযোগী মন্ত্রিগণকে বাছিয়া লইয়াছেন। লর্ড হালডেন, লর্ড পারমুর, লর্ড

চেমসফোর্ড, জেনারল টমসন, মিঃ নোয়েল বাক্সটন, সার সিডনি ওলিভিয়ার প্রভৃতি অন্যান্য বারের মন্ত্রী অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহেন।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের রচিত মন্ত্রিপরিষদে নিম্নলিখিত মন্ত্রীরা স্থান পাইয়াছেন।

১। প্রধান সচিব ও পররাষ্ট্রসচিব—মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড।
২। উপনিবেশ-সচিব—মিঃ জে, এইচ, টমাস।
৩। ভারত-সচিব—সার সিডনী ওলিভিয়ার।
৪। ফাষ্ট´ লর্ড অব এডমিরাল্টি—লর্ড চেমসফোর্ড।
৫। সমর-সচিব—মিঃ ষ্টিফেন ওয়ালস্।
৬। লর্ড চান্সলার—লর্ড হালডেন।
৭। চান্সলার অব এক্সচেকার—মিঃ ফিলিপ স্নোডন।
৮। লর্ড প্রিভীসীল এবং কমন্সসভার সহযোগী নায়ক—মিঃ জে, আর, ক্লাইন্স।
৯। লর্ড প্রেসিডেণ্ট অব কাউন্সিল—লর্ড পারমুর।
১০। স্বরাষ্ট্র সচিব—মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন।
১১। শ্রমিক বিভাগের সচিব—মিঃ টমাস শঃ।
১২। পোষ্ট মাষ্টার জেনারল—মিঃ ভার্ণন হাটশর্ণ।
১৩। চান্সলার অব দি ডাচি অব ল্যাঙ্কাষ্টার—কর্ণেল জোসিয়া ওয়েজ উড।
১৪। ফাষ্ট´ কমিশনার অব ওয়ার্কস্—মিঃ এফ, ই, ডবলিউ, জোয়াট।
১৫। এয়ার মিনিষ্টার—ব্রিগেডিয়ার জেনারাল ও, বি, টমসন।
১৬। বাণিজ্য সমিতির সভাপতি—মিঃ সিডনি ওয়েব।
১৭। স্বাস্থ্য-সচিব—মিঃ জন হুইটলে।
১৮। স্কটল্যাণ্ড সচিব—মিঃ উইলিয়ম আডামসন।
১৯। কৃষি-সচিব—মিঃ নোয়েল বাক্‌সটন্।
২০। শিক্ষা-সচিব মিঃ সি, পি, ট্রেভেলিয়ান।

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মন্ত্রিসভায় ১৯ জন সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ বলডুইন প্রধান সচিব এবং ফাষ্ট´ লর্ড অব ট্রেজারী ছিলেন। প্রধান সচিবের পদের কোন বেতন নাই, সেইজন্য ইনি ফাষ্ট´ লর্ড অব ট্রেজারীর কায করিয়া বার্ষিক ৫ হাজার পাউণ্ড বেতন লইতেন। প্রধান মন্ত্রীরা সাধারণতঃ বেতনের জন্য এই পদই লইয়া থাকেন। মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড তাহা না করিয়া বেতনের জন্য পররাষ্ট্রসচিবের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, চান্সলার অব দি ডাচি অব ল্যাঙ্কাষ্টার এবং ফাষ্ট´ কমিশনার অব ওয়ার্কস এই ২ পদের মন্ত্রীরা গত বার মন্ত্রি-সভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা ক্যাবিনেটের বহি-র্ভূত মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহাদের পদের বেতন প্রত্যেকের বার্ষিক ২ হাজার পাউণ্ড করিয়া। এবার ফাষ্ট´ লর্ড অব ট্রেজারীর পদটি মন্ত্রিসভার মধ্যে দেখিতেছি না। পক্ষান্তরে, পররাষ্ট্রসচিবের পদটি স্বতন্ত্র ছিল,—উহারও বার্ষিক ৫ হাজার পাউণ্ড। মিঃ বালফুরের পর লর্ড কার্জ্জনই ঐ পদে কায করিয়া আসিতেছিল। কাযটি দায়িত্বপূর্ণ এবং বিপদ-সঙ্কুল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিবেচনার এবং বিচক্ষণতার সহিত ঐ পদে কার্য্য না করিলে বিষম গণ্ডগোল ঘটিতে পারে। সেই জন্য মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড অন্য কাহাকেও ঐ পদ প্রদান করেন নাই। ইনি যে পূর্ব্বতন পররাষ্ট্রসচিব হইতে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করিবেন, তাহা মনে হয় না। তবে ইঁহার গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে, ইনি খুব সাবধানে চলিবেন। কিন্তু প্রধান সচিবের এবং পররাষ্ট্র সচিবের পদে এক জনের কার্য্য করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। যখন পররাষ্ট্রের সহিত কোনরূপ গোল না থাকে, তখন পররাষ্ট্র বিভাগে কায করা বিশেষ কষ্টকর ও শ্রমসাধ্য হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পররাষ্ট্র বিভাগে অনেক গোল আছে। সেই জন্যও ইহার কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ হইয়া আছে। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রথম হইতে যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নেতৃত্বাধীনে হঠ-কারিতার সহিত কোন কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে না বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু অতি সাবধানের কাযে বিশেষ তেজস্বিতা থাকে না।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক গতি দেখিয়া ইনি কতকটা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। সেই জন্য তিনি ভারতের চরমপন্থীদিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন কর্ণেল ওয়েজ উড বা বেনস্পুরকে ভারত সচিবের পদ না দিয়া অভিজ্ঞ এবং শাসনকার্য্যে লব্ধবিদ্য সার সিডনি ওলিভিয়ারকে ভারত-সচিবের পদ এবং অধ্যাপক রবার্টস রিচার্ডসকে সহকারী ভারত-সচিবের পদ দিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই শ্রমজীবী হইলেও সুপণ্ডিত ও শিক্ষিত।

— ক্যাবিনেট বা সচিব-পরিষদের বাহিরের কয়েকটি পদও সচিবের পদ বলিয়া গণ্য। সেইপদে যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথা (১) পেন্সন-সচিব—মিঃ এফ, রবার্টস,(২) এটর্ণি জেনারল—মিঃ প্যাট্রিক হেষ্টিংস, কে সি, (৩) সলিসিটার জেনারল মিঃ এইচ সেশার, (৪) খাজনাখানার আর্থিক সচিব—মিঃ উইলিয়ম গ্রাহাম, (৫) সমর অফিসের অর্থসচিব—মিঃ জন জেমস লসন, (৬) খাজনাখানার পার্লামেণ্টারী দেওয়ান এবং প্রধান হুইপ—মিঃ বেনস্পুর। ইহার মধ্যে এটর্ণি জেনারল এবং সলিসিটার জেনারল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন এবং তদতিরিক্ত ফিস পাইয়া থাকেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ পাইয়াছেন,—মেজর সি,আর, এটলি (সমর), মিঃ সিডনী আর্ণল্ড (উপনিবেশ), আর্থার পন্সনবী (পররাষ্ট্র), মিঃ রাইস (স্বরাষ্ট্র), মিঃ জন ডেভিজ (স্কটিশ) এবং মিঃ জেমস ষ্টুয়ার্ট (স্বাস্থ্য)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টের নিম্নলিখিত বিভাগে সেক্রেটারী বা কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন, (১) মিঃ সি, জি,.এমন—নৌবিভাগের কার্য্যপরিচালন সমিতির, (২) মিঃ ওয়াল্টার স্মিথ—কৃষি ; (৩) মিঃ, এ, ভি, আলেকজাণ্ডার—বাণিজ্যসমিতির, (৪) মিঃ মর্গান জোন্স—শিক্ষা, (৫) মিঃ আর্থার গ্রীণউড—স্বাস্থ্য, (৬) মিসেস মার্গারেট বনফিল্ড—শ্রমিক, (৭) মিঃ শিমওয়েল—খনি, এবং (৮) মিঃ উইলিয়ম লান—বৈদেশিক বাণিজ্য।

ইঁহারা সকলেই প্রায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের লোক। তবে অনেকের মত অত্যন্ত সংযত। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, মেসার্স সেশার ও আর্ণল্ড ব্যতীত আর . সকলেই রক্ষণশীল দলের লোক। সে কথা সত্য নহে। কেবল বোর্ড অব ট্রেডের বা বাণিজ্যসমিতির সেক্রেটারী মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার কো-অপারেটিভ দলের এবং জন ডেভিজ ন্যাসানাল লিবারল দলের লোক।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড যে ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি স্কটল্যাণ্ডের লসিমাউথ নামক গণ্ডগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গলফ খেলার জন্য এই গ্রামটির কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার পিতা কৃষকের খামারে কার্য্য করিতেন। ইঁহার মাতামহবংশ পূর্ব্বে মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু ইদানীং দারিদ্র্য-নিবন্ধন প্রায় শ্রমিক সম্প্রদায়ের সন্নিহিত হইয়াছিলেন। মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। জননীর নিকট হইতেই তিনি বিদ্যানুরাগ লাভ করেন। ইনি প্রথমে ড্রেন্স বোর্ড স্কুলে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া ক্রমে শ্রমিকের কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ তাঁহাকে শ্রমিকের কার্য্যে অধিক দিন স্থায়ী রাখে নাই। জননীর উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় তিনি একেবারে সাহিত্যচর্চ্চার সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারেন নাই।

মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড।

কিন্তু শ্রমিকের জীবনে বিরলপ্রাপ্ত অবসরে সম্যক্‌রূপে সাহিত্য-চর্চ্চার সুবিধা হইত না বলিয়া মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড শ্রমিকের কার্য্য ছাড়িয়া সংবাদপত্রলেখকের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চার কতকটা সুবিধা ঘটিয়াছিল। এই সময় বিলাতে শ্রমিক আন্দোলন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। দৈন্য নিবন্ধন স্বীয় পিতৃবংশের ও মাতৃবংশের কষ্টের অনুভূতি তাঁহাকে সেই আন্দোলনে যোগদানে উৎসাহিত করিয়াছিল। এই দারিদ্র্যসমস্যার সমাধানকল্পে তিনি অর্থনীতির আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিছু দিন ইনি 'সোস্যালিষ্ট রিভিউ' নামক পত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন।

ম্যাকডোনাল্ডের জন্মকুটীর।

কিন্তু গৃহিণী নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যাই এখন সংসারের ব্যবস্থা-কর্ত্রী। আজ সেই স্বয়ংসিদ্ধ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরিচালক।

পররাষ্ট্র-সচিবের পর উপনিবেশ-সচিবের পদই অধিক দায়িত্বপূর্ণ। এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ জে, এইচ, টমাস। ইনি ৯ বৎসর বয়সেই লিখাপড়া ছাড়িয়া শ্রমিকের কার্য্যে ব্রতী হয়েন। পরে ইনি কিছুদিন জি, ডবলিউ, রেলের ইঞ্জিনচালকের কার্য্য করিয়াছিলেন। রেলকর্ম্মচারিগণের জাতীয় সমিতির সম্পাদকতা করিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ইনি উহার সভাপতিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রিভী কাউন্সিলার হয়েন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন বিলাতে রেলকর্ম্মচারীদিগের বিশাল ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, তখন ইনি ঐ ধর্ম্মঘট করিতে আপত্তি করিয়াছিলেন। সে বার ইঁহারই চেষ্টার ফলে সেই ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছিল। এবারও শ্রমিক সরকার মন্ত্রিত্ব পাইবার পরই যে রেলওয়ে ধর্ম্মঘট হয়, তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য ইঁহার চেষ্টা অল্প হয় নাই। এই ধর্ম্মঘটের মীমাংসাসাধনও শ্রমিক মন্ত্রীদলের অন্যতম কৃতিত্বলক্ষণ। মার্কিণে যাইয়া ইনি ইংলণ্ডের অনেক সুবিধাজনক কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইনি পার্লা-মেণ্টারী শ্রমজীবী সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। আজ গণতন্ত্রবাদের প্রভাবে ইনি ইংলণ্ডের উপনিবেশ-সচিবের

ইনি সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। তাহাতে ইঁহার অর্থনীতি সম্পর্কিত বিস্তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি লেবর রেপ্রি-জেণ্টেশন কমিটীর সম্পাদকতা করেন; ১৯০৬ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিবারল পার্টির সভাপতি ছিলেন। ১৯১১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার নেতৃত্বেই শ্রমিক সম্প্রদায় পরিচালিত হইত। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতেই ইনি পার্লামেণ্টের সদস্য। ইনি সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় হঠকারী নহেন, অনেকটা সংযত। ইস্‌লিংটন চাকুরী কমি-শনের সদস্য হইয়া ইনি ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। সেই কমিশনে তিনি তাঁহার শ্রমিক মত সংযত রাখিয়া অন্যান্য সদস্যের সহিত মতের সমতানতা রক্ষা পূর্ব্বক কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই জন্য সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হয়েন। ইঁহার পত্নী ছিলেন ডাক্তার গ্লাডষ্টোনের দুহিতা। তিনিও বিলক্ষণ বিদুষী ছিলেন। নারী-শ্রমিক সম্পর্কে তাঁহার উক্তি বহু লোকের নিকট প্রামাণ্য বলিয়া সম্মানিত। তাঁহার প্রভাবও মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাহিত্যিক জীবনের উপর বিশেষভাবে পতিত হইয়াছিল। গৃহিণীর প্রভাবেই তাঁহার লসি-মাউথের সামান্য গৃহ যেন সমুজ্জল হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পাহাড়ের পার্শ্বে তাঁহার সেই গৃহ আছে।

ম্যাকডোনাল্ডের বাস-ভবন।

মিঃ জে, এইচ, টমাস।

পদে অধিষ্ঠিত। ইনি উপ নিবেশ-সচিবের পদ পাইয়া যে দিন প্রথম উপ নিবেশ আফিসে গমন করেন, তখন আফিসের দ্বারবান্ ইঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইনি উত্তর করেন, —"আমিই নূতন উপনিবেশ-সচিব হইয়াছি।" সেই কথা শুনিয়া দ্বারবান্ অন্য আর এক জন দ্বারবান্‌কে বলে—"এই ব্যক্তি বোমাবিদারণফলে পাগল হইয়া গিয়াছে।" কেনিয়া-সমস্যার সমাধানে ইনি কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব রহিয়াছি। তবে ইহার মধ্যে যতটুকু আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আমাদের আশার কথা শুনা যায় নাই।

সার সিডনী ওলিভিয়ার ভারত-সচিবের পদ পাইয়া লর্ড সভায় উন্নীত হইয়াছেন। লর্ড সভায় ভারতবর্ষের পক্ষীয় লোক থাকা প্রয়োজন বলিয়াই ইঁহাকে আভিজাত্য প্রদানপূর্ব্বক লর্ড সভায় উন্নীত করা হইয়াছে। ইনি রেভারেণ্ড এইচ, এ, ওলিভিয়ার নামক জনৈক ধর্ম্মযাজকের পুত্র। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে উইঞ্চফিল্ড নামক বিলাতের এক গণ্ডগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি লসেনে কাইনটন স্কুলে, টনব্রিজ স্কুলে, কর্পাস ক্রিষ্টি কলেজে, অক্সফোর্ডে এবং জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উপনিবেশ আফিসে চাকুরী লয়েন। ১৮৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে ইনি বৃটিশ হণ্ডুরাসের ভারপ্রাপ্ত উপনিবেশ-সচিব এবং ১৮৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে লীওয়ার্ড দ্বীপপুঞ্জের অডিটার জেনারল হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি ফেবিয়ান সমিতির সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এই সমিতির সহিত সম্পর্কের দ্বারাই ইঁহার মতের ও মনোভাবের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমিতিটি মধ্যবর্ত্তী সমাজতন্ত্রবাদীদিগের মত প্রচারার্থ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির মূলমত এই যে, ভূমি এবং শ্রমশিল্প কার্য্যে বিনিযুক্ত মূলধন কোন ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের সম্পত্তি হওয়া উচিত নহে। উহা তাঁহাদের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া সাধারণের হিতার্থ সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করা কর্ত্তব্য। এই মতপ্রচারের জন্য উক্ত সমিতি অনেক সন্দর্ভ ও পুস্তিকা প্রচার করিয়া থাকেন। সার সিডনী ওলিভিয়ার এই সমিতির পক্ষ হইয়া অনেক সন্দর্ভ ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন। ইঁহার রচিত White Capital and Coloured Labour নামক গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ভিন্ন ইনি Dictionary of Oxford, Poems and Parodies নামক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আর্ল অব সেলবোর্ণের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি জামেকা দ্বীপের উপনিবেশ-সচিব হয়েন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ

লর্ড সিডনী ওলিভিয়ার।

পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ইনি উক্ত দ্বীপের শাসনকর্ত্তার কাযও করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি জামেকা দ্বীপের পাকা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর ইনি কৃষি ও মৎস্য বিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ফলে শাসন-কার্য্যে এবং উপনিবেশ আফিসের কার্য্যে ইঁহার কতকটা অভিজ্ঞতা আছে।

অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড মন্ত্রিত্ব পাইলে কর্ণেল ওয়েজউড ভারত-সচিবের পদ পাইবেন। কিন্তু কর্ণেল ওয়েজউড ভারতের রাজনীতিক সম্প্রদায়বিশেষের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ পদ দেওয়া হয় নাই। পক্ষান্তরে, সার (অধুনা লর্ড) সিডনি ওলিভিয়ার পররাজ্য-শাসনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাকে ঐ পদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এ দেশের কতকগুলি লোকের আশাভঙ্গ হইয়াছে।

লর্ড হালডেন

যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রমিক সম্প্রদায় বিলাতে রাজনীতিক তরণীর কাণ্ডারিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতের পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে, তাঁহারা মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বাণী পড়িয়া কতকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। বিলাত হইতে শাস্ত নেহাল সিংহ মাদ্রাজের 'হিন্দু'পত্রে মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। উহাতে প্রকাশ, শ্রমিক সম্প্রদায়ের নায়ক এবং বিলাতের বর্ত্তমান প্রধান-সচিব বিধি-নির্দ্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ দ্বারা রাজনীতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের পক্ষপাতী। তাঁহার কথা এই ;—

"আমি সময়ে সময়ে ভারতীয় ঘটনাবলীর গতি উদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমার সমস্ত রাজনীতিক জীবনে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসই পোষণ করিয়া আসিতেছি যে, উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে হইলে বৈধ ব্যবস্থার অনুসরণপূর্ব্বক তাহা করা প্রয়োজন। আমাদের সময়ে আমরা অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া পরিচালিত অনেক বিপ্লবাত্মক আন্দোলন দেখিলাম,—উহা যেন সফল হইল বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু ঐরূপ বিপ্লবপন্থীরা অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া এবং অনেক প্রকার ক্রোধ, বিদ্বেষ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া পরিশেষে সেই বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ পুনরায় সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের উপেক্ষিত মূলনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে দেখিলাম।

"ভারতবর্ষ যদি নিয়মনিষ্ঠ দলের ও বিপ্লববাদী দলের সমরক্ষেত্রে পরিণত হয়, তাহা হইলে আমি উহার পক্ষে কোন আশাই দেখি না। ভয়প্রদর্শন করিলে বা শাসনযন্ত্রকে অচল করিলে বিলাতের কোন দলই ভয় পাইবে না।

মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন।

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড

মিঃ জে. আর, ক্লাইন্স।

যদি ভারতের কোন সম্প্রদায়ের লোকের মনে এইরূপ ধারণা থাকে যে, তাহা হইবে না, তাহা হইলে ঘটনাক্রমে তাঁহাকে ভগ্নমনোরথ হইতে হইবে। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত বন্ধু, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন আমাদের নিকট হইতে দূরে না যাইয়া, আমাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন পূর্ব্বক আমাদের যুক্তি এবং শুভ ইচ্ছা জানিতে চেষ্টা করেন।

"এখানেও (বিলাতে) এক দল লোক যে নীতি অবলম্বন করিতেছে, তাহাতে তাহারা পিছাইয়া পড়িয়া থাকিবে; ইহার লক্ষণ দেখিয়া আমি দুঃখিত। কিন্তু কাহারও কার্য্য ও কারণ সম্বন্ধে ভুল বুঝা উচিত নহে। যখনই কোন বিপ্লবমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিবার চেষ্টা হয়, সে পদ্ধতি ক্রিয়াশীল ব্যাপারই হউক অথবা নিষ্ক্রিয় ব্যাপারই হউক—তাহার ফলে ঠিক বিপরীত দিকে উহার একটা প্রতিক্রিয়া হইয়াই থাকে, তাহার অন্যথা হয় না; সেই প্রতিক্রিয়া বা বিপরীত ভাব উপস্থিত হইলে যে সকল লোক বা যে দল ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারা রঙ্গমঞ্চ হইতে বিতাড়িত হয়েন, এবং প্রতিক্রিয়ার ফলে দুইটি বিপরীত ভাবের লোকরা— অর্থাৎ মূলদলের ডাইনের ও বামের লোকরা, পরস্পর আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করিতে থাকে, শেষে তাহাদের উভয়পক্ষের বিফলতাই নগ্নমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

"উভয় পক্ষেরই এই ঘনিষ্ঠতা এবং শুভ ইচ্ছা দেখান উচিত, ইহা আমি জানি। সেই জন্য আমি এই কথাগুলি কেবল ভারতবাসীদিগকে বলিতেছি না, বিলাতের ভোটদাতাদিগকেও আমি উহা বলিতেছি।"

বৃটিশ শাসননীতির পরিচালক মিঃ রামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, বিলাতে যে পক্ষের হস্তেই শাসনতরণী পরিচালনার ভার থাকুক না কেন, তাহার দ্বারা আমাদের দেশের শাসননীতি বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইবে না। ভারতসচিব লর্ড ওলিভিয়ার বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও কার্য্যতঃ মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের উক্তিই সমর্থিত হইয়াছে। তবে ভারতবাসী সুদূর ভবিষ্যতে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন পাইবে বলিয়া তিনি আশা দিয়াছেন। "পরের হাতে ধন—পেতে অনেক ক্ষণ।"

মিঃ হুইকেন ওয়ালশ

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্যদল

বিশ্বের প্রতি জনপদে আজ স্বাধীনতার সংগ্রাম বাধিয়াছে। সকলেই নিজের জাতিকে জগতের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষেও তাহার স্রোত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিদেশীর করস্পর্শে তাহারা যে মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তাহাদের সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ তাহারা মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিয়াছে—আজ তাহারা বলিতে শিখিয়াছে—

Freedom is our birth right—স্বরাজ আমরা চাই! বিশ্বের প্রত্যেক জাতির নিজস্ব এমনই একটা শক্তির প্রভাব আছে—যাহার দ্বারা সে নিজেকে সভ্যজগতে উপযুক্ত প্রতিপন্ন করিতে পারে; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভারতবাসীর এখন তাহা নাই। আমাদিগকে দেশে সেই শক্তির প্রভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া মুক্তির সংগ্রামে যোগ দিতে হইবে। সে দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনাদলের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন—

ষ্টাফ অফিসারগণ

দণ্ডায়মান :—(১) ষ্টাফ্ সাঃ মেজর লরি। (২) কোঃ সা. ক্লেক্। (৩) ষ্টাফ সাঃ হেনরী

উপবিষ্ট :—(১) লেঃ অজিত ঘোষ। (২) কাপ্তেন হাইড্। (৩) লেঃ বিকাশ ঘোষ। (৪) লেঃ সুশীত চৌধুরী।

স্বাধীনতা আমাদিগকে আনিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদিগকে এমন একটি জাতি গঠন করিতে হইবে—যাহা আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিবে। জাতি গঠন করিতে গেলে তিনটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—(১) স্বাস্থ্য—(২) ধন—এবং (৩) বুদ্ধি। এই তিনটি জিনিষের যত দিন না আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়, তত দিন জাতিগঠনও হইবে না,—এবং স্বাধীনতার কথা শুধু

লেফটেনাণ্ট সুশীত চৌধুরী এম্. এস্-সি।

রাখিতে অনুরোধ করিলেন। বাঙ্গালীর অনেক দিনের সুপ্ত হৃদয় আভিজাত্যের গৌরব বজায় রাখিতে হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিল। বাঙ্গালী রাজার মান, রাজার সম্ভ্রম বজায় রাখিতে সমরক্ষেত্রে ছুটিয়া চলিল। বহুদিন সামরিক অধিকারে বঞ্চিত জাতি হইলেও সে দিন তাহারা প্রফুল্লচিত্তে রাজভক্তি দেখাইতে পশ্চাৎ-পদ হয় নাই। তাই স্বদেশনেত্রী মহামান্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী লাহোরে বাঙ্গালী সৈন্যদলকে সংবর্দ্ধনা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—

"দেখেছি অনেক গোরখা মারাঠা
নানা প্রদেশের বীর,
এমন মোহন মুরতি কখনো
দেখিনিক কোনটির।"

তাহার পর যে দিন লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল সুরেশচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রভূত চেষ্টার ফলে কয়েক জন তরুণ যুবক "বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোরে" যোগ দিয়া কর্ণেল নটের অধীনে মেসোপোটেমিয়ার সুদূর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাফল্যের বিজয়কেতন উড়াইয়া দিল, সে দিন সৌধস্থাপন ছাড়া আর কিছুই নহে। মেজর ষ্টুয়ার্টও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন।

আজ দেবতার দানরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে আমরা সমরবিভাগে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আজ বাঙ্গালীর নির্জ্জীবদেহে নবজীবনসঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে—অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীকে সমর বিভাগে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। যে দিন সমস্ত য়ুরোপের বক্ষের উপর দিয়া প্রলয়-নাদে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, সে দিন সমস্ত জগদ্‌বাসীর মুখে বিষাদের কালিমা ফুটিয়া উঠিল। সকলের মন ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পরে কয়েক বৎসর অতীত হইলে যখন দেখা গেল যে, য়ুরোপের এই মহাযুদ্ধে অনেক বীর তাহাদের হৃদয়-শোণিত দিয়া মাতৃভূমির তর্পণ করিয়াছে, তখন ইংরাজ আবার সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। বাঙ্গালীকে বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের মান ইজ্জত বজায়

সৈনিকবেশে বিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী

বাঙ্গালীর হৃদয় আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। যে দিন তাহারা বিশ্বের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

"আমরা বাঙ্গালী সৈন্যদল
মরণের ভয় করি না কখনো
কাঁপে না বক্ষতল।"

সে দিন ইংরাজ বাহাদুরের অনেক দিনের নিমীলিত চক্ষু আবার উন্মীলিত হইল। ইংরাজ সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন,ইহাদিগকে সমর-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতে পারিলে ইহাদের দ্বারা তাঁহাদের অনেক উপকার হইতে পারে। জাহ্নবী-পূতধারা দ্বারা সগরসন্তানদিগের যেমন উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, "বেঙ্গল এম্বুলেন্স কোর"ও তেমনই নিজেদের কার্য্যাবলীর দ্বারা বাঙ্গালীকে সমর-বিভাগে প্রবেশাধিকার দিয়া নূতন পথ দেখাইয়া দিল। দেবতার আশীর্ব্বাদের ন্যায় "৪৯নং বাঙ্গালী সৈন্যদলে"র প্রতিষ্ঠা হইল।

কোয়ার্টার গার্ডস

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্ররা যাহাতে সমরবিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠে এবং প্রয়োজন হইলে সেনা-বিভাগে প্রবেশ করিয়া উচ্চ কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতে পারে, তাহার জন্য Indian Defence Forceএর প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য "ইসার কমিটী" নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। লেফটেনাণ্ট-জেনারেল সার সিডনী লফোর্ড তাহার প্রতিনিধি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেনাদলকে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় তাহারা এমন সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইল যে, সার সিডনী মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং উচ্চকণ্ঠে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

বাঙ্গালীর জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যে আলোকবর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা বেশী দিন স্থায়ী হইল না। গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতিক অবস্থার ফলে Indian Defence Forceটি উঠিয়া গেল। বাঙ্গালী ছাত্ররা আবার তাহাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। তাহার পরে অনেক প্রচেষ্টার ফলে গত ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Indian Territorial Foree Act অনুসারে আবার দুইটি সৈন্যদল গঠিত হইল। প্রথমটি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সৈন্যদল এবং দ্বিতীয়টি ১১।১৯ হায়দ্রাবাদ রেজিমেণ্ট নামে অভিহিত হইল।

বাঙ্গালার যুবকগণ দেশের সেবা করিবার জন্য আবার এক অপূর্ব্ব সুযোগ পাইল। যে বঙ্গদেশ বাঙ্গালী পল্টনে ৫ হাজার বীরপুত্রকে রাজার মান বজায় রাখিতে সাগরপারে মরণকে বরণ করিতে পাঠাইয়াছিল, তাহাদের আন্তরিকতা ব্যর্থ হইবার নহে; তাই বাঙ্গালার গৌরবরক্ষাকল্পে বাঙ্গালীর মুখে আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈন্যদলের উদ্দেশ্য হইল, পররাজ্য আক্রমণ নহে—কেবল আত্মরক্ষা। বহিঃশক্রর আক্রমণ কিম্বা অরাজকতা হইতে আমাদের গৃহ, আমাদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট স্বরাজ্যের দাবী করিতেছি, কিন্তু আমরা যদি আত্মরক্ষাই করিতে না পারি, তবে কিরূপে স্বরাজ্যলাভের উপযুক্ত হইব? স্বদেশরক্ষা মানবের শ্রেষ্ঠ অধিকার; সেই অধিকার হইতে আমরা এত দিন বঞ্চিত ছিলাম, আজ তাহা পাইবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। এই সেনাদলকে প্রকৃতই আমাদের জাতীয় সেনাদল বলা যাইতে পারে; কারণ, ইহা ভারতবাসীর দ্বারা ভারতরক্ষার জন্য সৃষ্ট এবং ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। সমরবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতবাসীর দ্বারা ইহার অনেকগুলি উচ্চ পদ পূর্ণ। এই কোরের কমিসনপ্রাপ্ত অফিসারগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

কমাণ্ডিং অফিসার ঃ—মেজর জি, সি, র‍্যান্‌কিন্ (ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি)।

এড্‌জুট্যাণ্ট ঃ—কাপ্তেন জি, এল, হাইড।

লেফ্‌টেনাণ্ট—(১) শ্রীসুনীত চৌধুরী এম্. এস্.সি (ইনি টেরিটোরিয়াল কোস হইতে প্রথম বাঙ্গালী King's Commission প্রাপ্ত হয়েন)। (২) শ্রীঅজিৎকুমার ঘোষ এম-এ, বি-এল (ইনি সাউথ সুবার্ব্বন কলেজের অধ্যাপক) (৩) শ্রীবিকাশচন্দ্র ঘোষ বি-এ। সুখের বিষয় এইটুকু যে, আমাদের কোর হইতে তিন জন লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন—তিন জনই বাঙ্গালী, ইঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। প্রীতির আবেষ্টন দিয়া ইঁহারা সভ্যদিগকে এমনই ভাবে বন্ধন করিয়াছেন যে, সে বন্ধন ছিন্ন করিতে হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হয়। কোরের বর্ত্তমান এড্‌জুট্যাণ্ট কাপ্তেন হাইড কোরের সাফল্যের জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা এবং সুবন্দোবস্তের জন্য কোরের প্রত্যেক মেম্বরের নিকট ইনি প্রিয়। হাইকোর্টের বিচারপতি মেজর

শিবিরের দৃশ্য।

র‍্যান্‌কিন্‌কে Commanding Officer পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি—যদিও তিনি রাজকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত, তথাপি কোর সম্বন্ধে তিনি উদাসীন নহেন।

পড়াশুনার ক্ষতি না করিয়া ছেলেরা যাহাতে প্যারেডে আসিতে পারে, তাহারও সুবন্দোবস্ত আছে। প্রতি দিন বৈকালে ৪-৩০ মিনিট হইতে ৫-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত প্যারেড্ করিবার নিয়ম আছে। রবিবারে ছুটী বলিয়া সকালে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত প্যারেড্ করিতে হয়। প্রত্যেক মেম্বরকে লইয়া বৎসরে একবার করিয়া শিবিরস্থাপনা হয়। শিবির ১৫ দিন থাকে। এ বৎসর শিবির কাঁচড়াপাড়ায় স্থাপিত হইয়াছিল। সেই কাননকুন্তলা শস্যশ্যামলা ভূমির উপর ছাত্র-মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়া কি আনন্দেই যে সকলের সময় কাটিয়া গিয়াছিল, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লিখিয়া বুঝান যায় না। শিবিরে Squad Drill রাইফেল ড্রিল, বেয়োনেট্ ফাইটিং, shooting, কৃত্রিম যুদ্ধ (military manoeuvres) প্রভৃতি সামরিক নিয়মাবলীর

"গার্ডস্ অফ অনার"

বন্দোবস্ত ত ছিলই, তাহা ছাড়া শারীরিক ব্যায়াম, ফুটবল, ক্রিকেট্, হকি প্রভৃতি ক্রীড়া, গানবাজনা, হাস্য কৌতুক প্রভৃতিরও ব্যবস্থা ছিল। ইহার পূর্ব্বের বৎসর কলিকাতা গড়ের মাঠের শিবিরেও ঠিক এই ভাবের আনন্দোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। সময়ে সময়ে নাটকাদি অভিনয়েরও আয়োজন হয়।
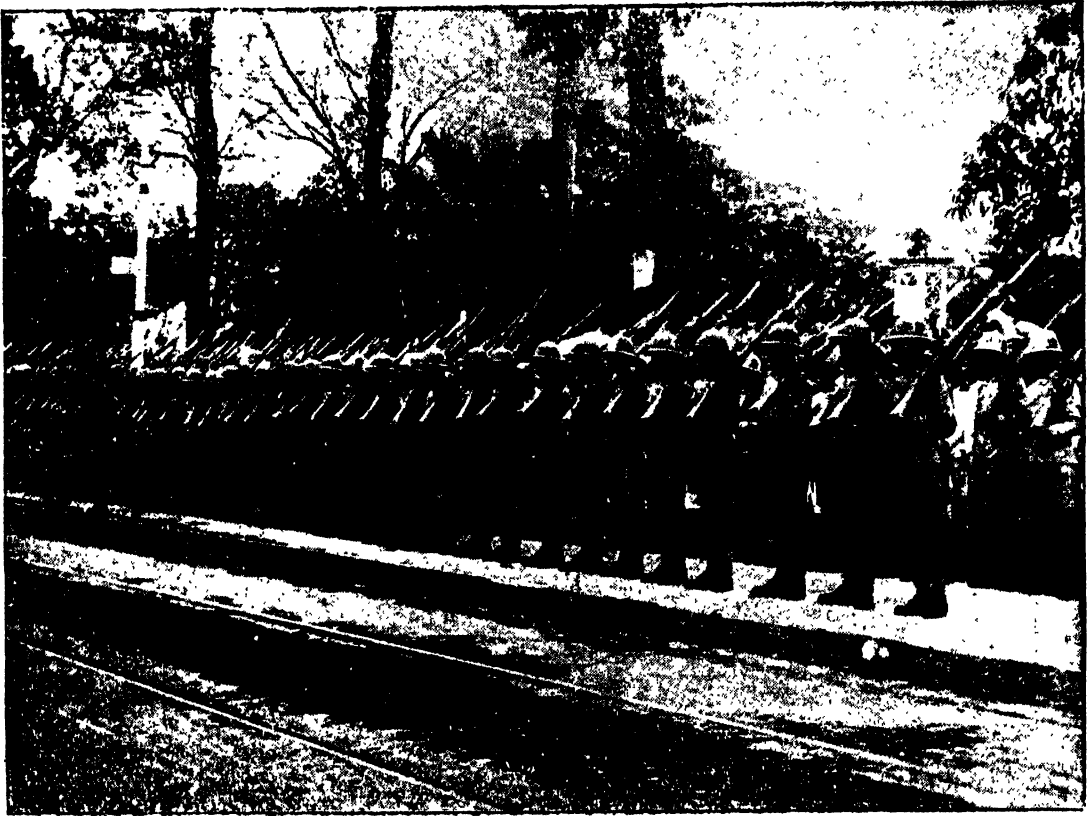
সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্যারেডে আসিতে হয়, ইচ্ছা করিলে সব দিনও আসা যায়। যাহারা Recruit, তাহাদের তিন দিন আসিতে হয়। এইরূপে সমস্ত বৎসর ধরিয়া সকালে এবং সন্ধ্যায় পর্য্যায়ক্রমে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

সমরক্ষেত্রে কি করিয়া খাইতে, শুইতে, যুদ্ধ করিতে হয়, তাহার মোটামুটি একটা জ্ঞান জন্মাইবার জন্য মেম্বরদিগকে

গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অনেকবার এই

দলকে পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ভাগ্যবিধাতা লর্ড লিটন, জেনারেল হাডসন্, মেজর-জেনারেল কিউবিট্, কর্ণেল উইলসন এবং কর্ণেল ফ্রিল্যাণ্ড প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ পরিদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এমন উচ্চ প্রশংসার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন—যাহা প্রাপ্তি অনেক য়ুরোপীয় সৈন্য-দলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। লর্ড লিটনের বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী উদ্বোধন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেসন উপলক্ষে লেফটেনাণ্ট সুশীত চৌধুরী এম্. এস্-সি মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া দলের কয়বার "গার্ড-অফ্-অনার্" দিবার সৌভাগ্যও হইয়াছে। সেই সকল ব্যাপার উপলক্ষে মেম্বররা তাহাদের বাঙ্গালী অফিসারের অধীনে থাকিয়া এমন সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইয়াছে যে, লর্ড লিটন তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। কোরের গর্ব্ব করিবার এইটুকু আছে যে, এই কর্ম্মঠ তরুণ যুবকরা, যাঁহারা সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া নিজেদের কর্ম্মকুশলতার জন্য প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন, তাঁহারা লিখাপড়ায় কখনও অবহেলা করেন না। আমাদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা আছে যে, সামরিক বিভাগে যোগদান করিলে তাহাদিগের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে। কিন্তু ইহা কখনই সত্য নহে। ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, অনেকেই সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া উচ্চ পদ ত পাইয়াছেনই, তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতেও সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আমাদের লেফটেনাণ্ট শ্রীসুশীত চৌধুরী মহাশয়, ইণ্ডিয়ান্ টেরিটোরিয়াল ফোর্স হইতে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম King's-Commision প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তিনি এম্. এস্-সি পরীক্ষায় রসায়ন শাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মনের শক্তি বাড়াইতে গেলে শরীরের শক্তি না বাড়াইলে চলে না। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া ভাইকাউণ্ট চেমসফোর্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেসন্ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সেনাদলকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

In the members of the University Training Corps these student soldiers we find fresh proof of the very old and tried saying "mens sana in corpore sano—(sound mind in a sound body)." These arduous military duties have not in any way stood in the way of the performance of their duties as students but on the other hand have helped them considerably

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আমাদিগকে শুধু লিখাপড়া করিলে চলিবে না; শারীরিক বলও সঞ্চয় করিতে হইবে।

পরিশেষে কয়েক জন মহাপ্রাণ লোকের নাম করিয়া আমার এই প্রবন্ধটি শেষ করিব। লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল হবস্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি কোরের মেম্বরদের যাহাতে নৈতিক এবং শারীরিক উন্নতি হয়, তাহার জন্য বিশেষ করিয়া চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইনি একটি মূল্যবান্ সিল্ড দান করিয়াছেন। কোরের মেম্বরদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল গুলী ছুড়িতে পারিবেন, তিনিই তাহা পাইবেন। মিষ্টার বেরী ব্রাউন, কাপ্তেন জে, এন, ব্যানার্জ্জি এবং মেজর কে, কে, চাটার্জ্জি এই কোরকে অতিশয় স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে যে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার জন্য বাঙ্গালী জাতি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। এখানে আর এক জন লোকের নাম না করিলে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। তিনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব এডজুট্যাণ্ট, কাপ্তেন গ্রে। তিনিই বাঙ্গালী পল্টনের শিক্ষার্থীদিগকে আত্মার সন্ধান দিয়া তাহাদের নয়নে দেশাত্মবোধের অঞ্জন পরাইয়াছিলেন; তিনিই আমাদিগকে দাসত্বের মোহান্ধকার কিরূপে দূর করিতে হয়, তাহা শিখাইয়াছেন। সামরিক শিক্ষার উপকারিতা এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া তিনি এ দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যদিও তিনি এখন বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া বিলাতে গিয়াছেন, তথাপি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোরকে এখনও ভুলিতে পারেন নাই, বিলাত হইতে এখনও তিনি আশীর্ব্বাদের বার্ত্তা প্রেরণ করিয়া সভ্যদিগের মনে তাঁহার কথা নূতন করিয়া জাগাইয়া দেন; কেহ বাঙ্গালা দেশে আসিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদিগকে তাঁহার "সেলাম" দিতে বলেন।

উপসংহারে এইটুকু বলিতে চাহি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ জননীর পূজামন্দিরে যে হোমানল জ্বালাইয়াছে, তাহা যেন সার্থক হয়।

শ্রীবিভাসচন্দ্র রায় চৌধুরী।

গৃহস্থ-দর্শন

(আভাস)

"কৃতদারো গৃহে বসেৎ"— পরিণয়ান্তে গৃহস্থ হইবে।

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ।
তস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥"

মনু।

বায়ুকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রাণীই যেমন জীবনধারণ করে, সেইরূপ সকল আশ্রমই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে।

অতএব ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতি—সন্ন্যাসী এই ত্রিবিধ আশ্রমই গৃহস্থের অন্নদান ও জ্ঞানদানে সঞ্জীবিত। এ কারণে গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ আশ্রমী।

লোকায়ত-রমণী-পাণিগৃহীতী সাংখ্য-পুরুষ যখন ন্যায়-দর্শনে পরিণত, তখন তিনি গৃহস্থ। সকলকে অন্নদান ও জ্ঞানদান গৃহস্থের আছে; সকলকে অন্নদান ও জ্ঞানদান ন্যায়দর্শনের কার্য্য।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ। ব্রহ্মাচারীর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর—মোক্ষ; গৃহস্থের—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও ত্রিবর্গসিদ্ধ গৃহস্থের—মোক্ষ; বানপ্রস্থের—নিবৃত্তি-অভ্যাস এবং অভ্যাসসিদ্ধ বানপ্রস্থের মোক্ষ এবং সন্ন্যাসীর—নিবৃত্তি, ও জ্ঞান এবং জ্ঞানসিদ্ধ সন্ন্যাসীর—মোক্ষ। নিবৃত্তি ও জ্ঞান, ধর্ম্মেরই মূর্ত্তি। ধর্ম্ম সর্ব্বত্রই আলোক তুল্য; গৃহস্থের পক্ষে এই আলোক বিশেষ উপযোগী, কারণ, অন্ধকারময় কান্তার পথেও গৃহস্থের গমন করিতে হয়। অর্থ-কাম-মার্গই গৃহস্থের অন্ধকারময় কান্তার। সেখানে ধর্ম্মের আলোক ব্যতীত একপদ অগ্রসর হইতে নাই, অগ্রসর হইলেই বিপদ। অর্থ-কাম-মার্গ ধর্ম্মের আলোকে দেখিতে হয় এবং দেখিয়া ও বাছিয়া অর্থ কাম চয়ন করিতে হয়। কোন্ অর্থকামে পাপের বিষ জড়াইয়া আছে, কোন্ অর্থকামে-রাগ-দ্বেষের কণ্টকবেধের সম্ভাবনা অধিক, কোন্ অর্থকাম আহরণ করিতে হইলে ভীষণ শ্বাপদ সম মহাপাপের গ্রাসে পতিত হইতে হইবে, কোন্ অর্থকামের সেবা করিলে বিবরস্থ সুপ্ত বিষধরবৎ দুষ্প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা হয়, ধর্ম্মের আলোকে গৃহস্থ এই সব দেখিয়া থাকেন, ইহা দেখিয়াই তিনি আলোক যে নির্ব্বাপিত করেন, তাহাও নহে; সে আলোক উজ্জ্বল-ই থাকে। মোক্ষের যে পথ এই কান্তারের অপর প্রান্তে অবস্থিত, তাহা অন্ধকারময় না হইলেও কণ্টকাকীর্ণ বা শ্বাপদসঙ্কুল না হইলেও দুরারোহ। ধর্ম্ম সেখানে গৃহস্থের যষ্টির ন্যায়-সহায়; অর্থ কাম সেখানে সেই পথে উপযুক্ত পাদুকা।

সে ধর্ম্ম কি?—সত্যই সেই ধর্ম্ম। কেবল বাচিক সত্যই সে সত্য নহে, কেবল ব্যাবহারিক সত্য সে সত্য নহে, কেবল মানসিক সত্যও সেই সত্য নহে;—কিন্তু যাহা বাচিক, যাহা ব্যাবহারিক, যাহা মানসিক, সেই সত্য, সেই পূর্ণ সত্যই প্রকৃত সত্য, সেই পূর্ণ সত্যই ধর্ম্ম।

এক সত্যবাদী পুরুষ তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নাই, কিন্তু জানিয়া শুনিয়া অসত্য ব্যবহার করেন, তিনি শাস্ত্র মানেন না—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীকার করেন না অথচ ব্রাহ্মণচিহ্ন যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন—ইহা এক প্রকার অসত্য ব্যবহার। যিনি যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়াছেন, পৈতা ফেলিয়াছেন, তিনিও কিন্তু তাঁহার সেই পিতামাতার পুত্র, যাঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানিতেন, মিথ্যার উপাসক ছিলেন; তাঁহারা স্বমতে মিথ্যার উপাসক না হইলেও আলোকপ্রাপ্ত পুত্রের মতে ত মিথ্যার উপাসক; মিথ্যা উপাসক মনে জ্ঞানে জানিয়াও তাহার প্রতি সেই পুত্রের ভক্তি ব্যাবহারিক অসত্যেরই অন্তর্গত। কেবল এইটুকুই নহে, মুখে আত্মার স্বরূপ—ঈশ্বরের স্বরূপ একাত্মবাদের তত্ত্ব আলোচনা অথচ হৃদয়ে জাতিবিদ্বেষ বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিদ্বেষ প্রচুর—এই যে ব্যবহার—ইহা পরস্পর-বিরুদ্ধ, অতএব অসত্য। মানসিক অসত্যের ত অন্ত নাই, কেবল কল্পনা—এ কল্পনা প্রায়শঃই বিদ্বেষে প্রতিষ্ঠিত! বর্ত্তমান রাজনীতি বিদ্বেষের অভিব্যক্ত মূর্ত্তি। বিদ্বেষের সহিত

ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা 'ব্রাহ্ম' বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের বাক্যে, কার্য্যে বা কল্পনায় বিদ্বেষের ছায়া থাকিলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার বাক্যও সত্য নহে, তাঁহার 'ব্রাহ্ম' পরিচয় মিথ্যা; 'ব্রাহ্ম' সংজ্ঞা বড় উচ্চ, সে উচ্চভাবের অধিকার না থাকিলেও সেই সংজ্ঞা ব্যবহারে ব্যাবহারিক অসত্য ত আছেই, মানসভাবের সহিত সেই সংজ্ঞার অসামঞ্জস্য হেতু মানস অসত্যও আছে। যেমন ব্রাহ্ম, তেমনই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, বর্ত্তমানের ব্রাহ্মণ যিনি সন্ধ্যাহ্নিকপূত, তাঁহারও অনেক স্থলে সত্যচ্যুতি আছে, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্যক্ পালন না করিলেও অনেকের মধ্যে সদ্‌ব্রাহ্মণ্যের দাবি আছে, বৃত্তির জন্য অনেকের আচার হইলেও আচারফলে গর্ব্ব আছে, এইরূপ যে ভাব, তাহার মূলে অসত্য নিহিত। সে অসত্য বাক্যে, ব্যবহারে ও মনে থাকে। সুতরাং যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, যাহা পূর্ণ সত্য, তাহা,—শাস্ত্রবিশ্বাস, বিশ্বাসসঙ্গত ব্যবহার এবং সেই বিশ্বাসানুরূপ চিন্তা ও কথা যাঁহার আছে, তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

ন্যায়দর্শন সেই সত্য দেখাইয়াছেন। সাংখ্যবিভাগস্থ (দর্শন পরিচয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) শাঙ্কর মতে শাস্ত্র 'অবিদ্যাবদ্-বিষয়।' অর্থাৎ শাস্ত্রও অজ্ঞানীর জন্য। জ্ঞানে সত্য, অজ্ঞানে অসত্য, দিগ্‌ভ্রম থাকিলে মানুষ পূর্ব্বদিককে পশ্চিম বা ঐরূপ আর একটা দিক মনে করে এবং তদনুসারে ব্যবহার করে, এই যে বাক্য, মন ও ব্যবহার, ইহা অসত্যের আশ্রয়, মূল তাহার অজ্ঞান; শাস্ত্রও যদি অজ্ঞানাশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাও অসত্যের পোষক। অবশ্য শ্রীশ্রীশঙ্করা-চার্য্য পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এইরূপ সত্যাসত্যের বিভাগ করিয়াছেন, কিন্তু সে বিভাগেও শাস্ত্রকে পরমার্থ সত্যের বাহিরে ফেলিতে হয়ই। তাহাতে বস্তুতঃ হানি না হইলেও অল্পজ্ঞ অথচ প্রাজ্ঞম্মন্য আধুনিক মানবের তাহা হইতেই বিশ্বাসভঙ্গ, তাহা হইতেই যথেচ্ছাচার, তাহা হইতেই মৌখিক 'সোঽহম্।'

ন্যায়দর্শন, শাস্ত্রীয় সেই সত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত—যাহা কোন প্রকার সত্যেরই বহির্ভূত নহে। নব্যন্যায় সেই সত্যমঞ্জুষার কুঞ্চিকা হস্তে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া-ছেন। গৃহস্থন্যায় সেই সত্য মঞ্জুষা উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহা হইতে সত্য অন্ন ও সত্য জ্ঞান বিতরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী যিনি দর্শনমণ্ডলে বা শাস্ত্রসমাজে যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি ন্যায়শাস্ত্রের অন্নে ও জ্ঞানে বাহ্য ও অন্তরে সঞ্জীবিত। শাস্ত্রীয় সাংখ্যের তিন স্তর;—পতঞ্জলিমত, কপিলমত ও ব্যাসমত। শাঙ্করমত এই ব্যাস-মতেরই একবিধ ব্যাখ্যা। বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শন সাংখ্যের অন্তর্গত হইলেও তাহা শাস্ত্রীয় সাংখ্য নহে; বর্ণাশ্রমিসমাজ চিন্তাদ-যুক্ত দর্শনের যে ত্রিবিধ মত স্বীকার করিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রীয় সাংখ্যে সন্নিবিষ্ট। পাতঞ্জল—ব্রহ্মচর্য্য, কপিলমত—বানপ্রস্থ, ব্যাসমতের শাঙ্কর শাখা—সন্ন্যাস। পাতঞ্জলে কর্ম্মশিক্ষা আছে, এই জন্য তাহা ব্রহ্মচর্য্য; কপিলমতে নিবৃত্তি ও অভ্যাসার্থ মনন; তাই কপিলমত বানপ্রস্থ; শাঙ্কর মতে কেবল 'নেতি' 'নেতি', কেবল বিষয়-নিষেধ; কেবল নির্ব্বিষয় জ্ঞান, তাই সন্ন্যাস আখ্যা দিয়াছি।

এই মতত্রয়ের অন্ন, ভাষাশুদ্ধি—নিয়ন্ত্রিত বিচারপ্রণালী। এই অন্নই ঐ মতত্রয়ের শরীর রক্ষা করিতেছে, সে অন্নদান গৃহস্থ ন্যায়দর্শনই করিয়া থাকেন। সেই মতত্রয়ের যে জ্ঞান, বিচারফলে যে সিদ্ধান্তনিচয়, তাহাও ন্যায়শাস্ত্রপ্রদত্ত।

কেমন করিয়া,তাহা বলিতেছি,—অন্নের কথা প্রথম;—(১) প্রতিজ্ঞা (২) হেতু (৩) উদাহরণ (৪) উপনয় ও (৫) নিগমন, এই পাঁচটি অবয়বে ন্যায়বাক্য হয়।

(১) প্রতিজ্ঞা—যে বিষয়টি সিদ্ধ করিবার জন্য তোমার প্রয়াস, তাহার নির্দ্দেশই প্রতিজ্ঞা। যথা—'এতদ্দেশবাসী দুঃখী,' ইহা প্রতিজ্ঞা।

(২) হেতু—প্রতিজ্ঞা বিষয়ের সমর্থক বাক্যই হেতু, এতদ্দেশবাসী যে দুঃখী, তাহার সাধক কি?—'পরাধীনত্বাৎ,' যে হেতু, এ দেশবাসী পরাধীন, এই হেতু দুঃখী।

(৩) উদাহরণ—তোমার হেতু প্রয়োগ যে নির্দ্দোষ, তাহা যে দৃষ্টান্তঘটিত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহা উদাহরণ;—'যো যঃ পরাধীনঃ স দুঃখী, যথা—কারাগারস্থঃ পুরুষঃ,' যে পরাধীন, সে-ই দুঃখী, যেমন কারাগারস্থ বন্দী।

(৪) উপনয়—সেই নির্দ্দোষ হেতু অভীষ্ট স্থানে আছে, এইরূপ বোধ যে বাক্য দ্বারা হয়, তাহা উপনয়,—'দুঃখিত্ব-ব্যাপ্য পরাধীনত্ববান্ এতদ্দেশবাসী' অর্থাৎ যে পরাধীনতা থাকিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, সেই পরাধীনতা এতদ্দেশবাসীর আছে—এই বাক্যের নাম উপনয়।

(৫) নিগমন—নির্দ্দোষ হেতু প্রয়োগসহ সেই প্রতিজ্ঞাত

বিষয়ের যে পুনঃ প্রয়োগ, তাহার নাম নিগমন। ইহাকে উপসংহার বলিতে পারি,'তস্মাৎ দুঃখী' অতএব এতদ্দেশবাসী দুঃখী, ইহা নিগমন। এই ন্যায়বাক্যে প্রতিজ্ঞা এবং হেতুই প্রধান, অপর অবয়বগুলি এই দুয়ের অধীন; এতদুভয়ের মধ্যে হেতু প্রধান; হেতু বুঝিয়া প্রতিজ্ঞার বিন্যাস করা যায়।

প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া হেতু উপন্যাস করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে নির্হেতুক প্রতিজ্ঞা প্রয়োক্তার বিশেষ ন্যূনতা হয়।

যে কোন দর্শনশাস্ত্রের বিচারপদ্ধতির ভাষা—এই ন্যায়বাক্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; সুতরাং অন্ন যেমন জীবদেহ-স্থিতির হেতু, ন্যায়বাক্যবিন্যাস সেইরূপ শাস্ত্রদেহস্থিতির হেতু। এই ন্যায় বাক্য-বিন্যাস-শিক্ষা ন্যায়শাস্ত্র-প্রদত্ত সকল দর্শনেই এই ভাবের বাক্য সংক্ষেপে বা বিস্তারে আছে। সংক্ষেপ স্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতু, অথবা কেবল হেতু প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই জন্য গৃহস্থ ন্যায়শাস্ত্রকে অন্য দর্শন-শাস্ত্রের অন্নদাতা বলিয়াছি।

জ্ঞানের কথা এখন বলিতেছি; এই কথিত বিচারে যে হেতু নির্দ্দেশ হইয়াছে, তাহা যে প্রকারে নির্দ্দোষ হয়, সে জ্ঞান ন্যায়শাস্ত্রই প্রদান করিয়াছেন। যথা—পরাধীনতা যে দুঃখের হেতু, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় কিরূপে? পুত্র পিতার অধীন, ছাত্র শিক্ষকের অধীন, পত্নী স্বামীর অধীন, ব্যক্তি সমাজের অধীন, এরূপ অধীনতা না থাকিলে যে মানব-সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না, শান্তি থাকে না, সুখ থাকে না; এখানে এই সব যে পরাধীনতা, ইহা সত্ত্বেও যখন দুঃখ হয় না, প্রত্যুত সুখশান্তি হয়, তখন দুঃখ নির্ণয়ে পরাধীনতা—নির্দ্দোষ হেতু হইতে পারে না। পরাধীনমাত্রই যদি দুঃখ ভোগ করিত, তাহা হইলে পরাধীনতাকে দুঃখের নির্দ্দোষ হেতু বলা যাইত—এই আপত্তি হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, 'পর' ও 'অধীনতা' দুইটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করিলেই প্রদর্শিত আপত্তির খণ্ডন হয়। যাহার সহিত স্নেহবন্ধন নাই, তোমার সুখে সুখ,-তোমার দুঃখে দুঃখ যে ব্যক্তি বোধ না করে, সে-ই 'পর,' আর সেই পর স্বার্থবশে যদি অন্যের উপযুক্ত ইচ্ছার ব্যাঘাত করিয়া তাহার প্রতি প্রভুত্ব স্থাপন করে, তাহা হইলেই তাহার প্রকৃত অধীনতা হয়। পিতা, শিক্ষক, পতি বা সমাজ, সেরূপ পর নহেন; পুত্রের, ছাত্রের, পত্নীর ও ব্যক্তির—সুখে তাঁহারা সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী। পুত্র প্রভৃতির উপযুক্ত ইচ্ছার ব্যাঘাতক প্রভুত্ব পিতা প্রভৃতি করেন না। উপযুক্ত ইচ্ছা অর্থে—যে ইচ্ছা হইতে তাহার বাস্তবিক অকল্যাণ হইবে না, সেইরূপ ইচ্ছা। আমি প্রবল রাজা, আমার স্থাপিত উচ্চকরের বিরুদ্ধে আমার প্রজা আপত্তি করিলে আমি যদি তাহাকে রাজদ্রোহ বলিয়া দণ্ড প্রদান করি, সে স্থলে সেই আপত্তির ইচ্ছা অকল্যাণকর বলিয়া ঘোষিত হইলেও বাস্তবিক অকল্যাণ-কর নহে, কল্পিত অকল্যাণকর। অতএব পরাধীনতা শব্দের অর্থজ্ঞান ও তন্মূলক সিদ্ধান্তজ্ঞানের ন্যায় নির্দ্দোষ হেতু জ্ঞান ও তন্মূলক সিদ্ধান্তজ্ঞান অন্য দর্শনকে ন্যায়শাস্ত্রই প্রদান করিয়াছেন—এই জন্য ন্যায়দর্শন জ্ঞানদাতা।

যে সত্যকে ধর্ম্মের স্বরূপ বলিয়াছি,চার আশ্রমেই যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দেদীপ্যমান, সেই সত্য অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—ন্যায়শাস্ত্র হইতেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সত্য নির্ণয়ের জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের প্রমাণ পরিচ্ছেদ প্রথম এবং নব্যন্যায়ে এই প্রমাণ পরিচ্ছেদই সুবিচারিত। প্রমাণেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। যাহা অপ্রমাণ, তাহা হইতে অসত্যের উদ্ভব হয়। প্রমাণ যে অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে,তাহা ন্যায়শাস্ত্র দেখাইয়াছেন। যাহা প্রমাণ, তাহা সত্যের প্রসূতি; প্রমা সত্যজ্ঞান, এই সত্যজ্ঞান বা অভ্রান্ত জ্ঞান, যাহা হইতে হয়, তাহাই প্রমাণ। এমন যে প্রমাণ, তাহা অসত্যের হেতু হয় না। এই প্রমাণ চতুর্ব্বিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রত্যক্ষ প্রথম প্রমাণ হইলেও তাহা প্রসিদ্ধ, সে জন্য তাহার আলোচনা পরে করিব।

অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই তিন প্রমাণের মধ্যে শব্দ-প্রমাণ ধর্ম্মের পক্ষে প্রধান আশ্রয়। কিন্তু শব্দ-প্রমাণের প্রামাণ্য-সংস্থাপন অনুমান সাহায্যে হয়, শিষ্যের পক্ষে উপদেষ্টার তাৎপর্য্য-জ্ঞান অনুমান-সাপেক্ষ, এই জন্য—বিশেষতঃ অর্থ-কাম-চয়নে শক্তিজ্ঞানে অনুমানের তথা উপমানের প্রয়োজন অধিক; অর্থ-কামে লোকের প্রবৃত্তিও অধিক, এই জন্য—অনুমান ও উপমানের নির্দ্দেশের পর শব্দপ্রমাণ উপদিষ্ট। অনুমান করিয়াই লোকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এ কার্য্যের ফল এইরূপ; এ অনুমান অগ্রে না করিয়া কেহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, যাঁহার যেরূপ ফল আকাঙ্ক্ষিত, সে তদনুকূল কার্য্যে প্রবৃত্ত। এই যে অনুমানমূলক ফলনিশ্চয়, ইহা কখন সত্য, কখন মিথ্যা

হয়। যদি অনুমানপ্রণালী বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে অনুমানফল কখনই মিথ্যা হয় না। অনুমানপ্রণালী বিশুদ্ধ করিবার জন্যই ন্যায়শাস্ত্রের অনুমান খণ্ড বা অনুমান পরিচ্ছেদ।

উপমান প্রমাণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে "গবয় পদের শক্তিজ্ঞান উপমানের ফল" এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু ইহার বিস্তৃত ক্ষেত্রের ইঙ্গিত বাৎস্যায়ন ভাষ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাৎস্যায়ন উদাহরণ-বাক্যে উপমানের সমাবেশ করিয়াছেন, ইহাই ইঙ্গিত; অনুমানের মূলেও উপমান আছে, তাহা হইতে ইহা বুঝা যায়; তাহা হইলেও তাহাতে উপমানকে প্রমাণান্তর বলিবার কারণ ঘটে না। যে জ্ঞেয় অন্য প্রমাণসিদ্ধ হয় না, তাহার জন্যই নূতন প্রমাণ মানিতে হয়। যাহা অপ্রত্যক্ষ, সেই বিষয় নিশ্চয় করিবার জন্যই অনুমান প্রভৃতি অপর প্রমাণত্রয়ের প্রয়োজন, যাহা অদ্যাপি অনন্যুমেয়, তাহার জন্যই উপমান—যাহা অপ্রত্যক্ষ অননুমেয় এবং অনুপমেয়, তাহা বুঝিবার জন্যই শব্দপ্রমাণ মানিতে হয়। এইরূপ উপমানের প্রামাণ্যস্থাপন শক্তি-জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। গ্রামবাসীর গবয়দর্শন ঘটে না, গবয় অর্থে নীলগাই—অরণ্যচর এক প্রকার জন্তু, গো-মাতার ন্যায় তাহার আকার। কোন পশুশালায় এই আরণ্য গবয় দর্শন করিয়া কেহ গ্রামে আসিয়া প্রকাশ করিল, "গবয়" দেখিতে গো-মাতার ন্যায়। গবয় দর্শনে বঞ্চিত গ্রামবাসী কৌতূহলের সহিত কথাটা স্মরণ রাখিল, কিছুকাল পরে সেই গ্রামবাসীর যখন পশুশালায় গমন ও গবয়দর্শন হইল, তখন তাহাকে 'এই পশু গবয়,' এ কথা কেহ না বলিয়া দিলেও তাহার বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ ও পূর্ব্বস্মৃতি পাশাপাশি থাকিয়া বুঝাইয়া দিল—গবয় শব্দ এইরূপ পশুরই বাচক, গবয়নামক পশু গবয়পদের অর্থ। অর্থের সহিত পদের যে সহজ সম্বন্ধ থাকে, তাহার নাম শক্তি। গবয় পদের সেই শক্তি গবয় পশুতে বর্ত্তমান। এই প্রকার শক্তি-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া—শব্দের প্রামাণ্য হইয়া থাকে। প্রথম গবয়দর্শনে যে গো-মাতার সাদৃশ্য গ্রামবাসীর অনুভূত, সেই সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমান, তৎক্ষণাৎ গবয়দর্শীর পূর্ব্ব-কথিত বাক্য স্মরণ, তৎপরেই গবয় পদের শক্তিজ্ঞান হয়। অনুমানের সম্ভাবনা এখানে না থাকিলেও যে শক্তিজ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ নহে, শক্তি অপ্রত্যক্ষ, শক্তিবাচক শব্দও তৎকালে কেহ প্রয়োগ করে নাই; তথাপি যে শক্তিজ্ঞান, তাহা উপমানেরই কার্য্য। এ শক্তি সত্য, উপমান প্রমাণও সত্যের অনুগামী। অন্য প্রমাণ মধ্যে উপমানকে গ্রহণ করিবার পক্ষে এ যুক্তি উত্তম; কিন্তু উপমান অনুমান প্রণালী শোধনে বিশেষ সমর্থ বলিয়াও আদরণীয়। যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির হয় নাই, তাহার পরীক্ষাসময়ে তুলনা বা উপমানমূলক অনুসন্ধান বিশেষ উপযোগী। পশুশরীরে বিষ-সঞ্চার-ফল প্রত্যক্ষ করিয়া সেই তুলনায় মানুষের পক্ষে তাহার ফল স্থির করা হয়, ইহা অনুমান বটে, কিন্তু ইহার মূলে উপমান আছে, এ উপমান প্রমাণ হউক বা না হউক, অনুমানপ্রামাণ্যে ইহার ক্ষমতা কার্য্যকরী।

এই উপমানের পরেই শব্দ, শব্দ হইতে সত্য-জ্ঞান জন্মে বলিয়া শব্দ প্রমাণ। শব্দ উচ্চারণ করিলে, সেই শব্দ ও তাহার অর্থের যে শক্তিসম্বন্ধ, তাহা প্রতিভাত হয়, তাহাতেই অর্থজ্ঞান হয়। (এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করিব) সেই শব্দ দ্বিবিধ—লৌকিক ও অলৌকিক অথবা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যে শব্দ ব্যবহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, যথা পিতা মাতা অন্ন জল, আনয়ন কর, বন্ধন কর ইত্যাদি, তাহাই লৌকিক বা দৃষ্ট শব্দ। আর 'যজেত' 'শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ' যাগ করিবে, শ্রাদ্ধ করিবে, এই সকল শব্দ অলৌকিক বা অদৃষ্ট। যাগবিধি বা শ্রাদ্ধবিধির সহিত যে অদৃষ্ট—অপূর্ব্ব—পুণ্যের সম্বন্ধ আছে, তাহা অলৌকিক বা অদৃষ্ট। এই জন্য তদ্বোধক শব্দও অলৌকিক বা অদৃষ্ট নামে কথিত। দৃষ্ট শব্দ সর্ব্বত্র প্রমাণ নহে,—প্রতারক বাক্য অপ্রমাণ, কিন্তু অদৃষ্ট শব্দ প্রমাণই, কখনই অপ্রমাণ নহে, শাস্ত্র সেই অদৃষ্ট শব্দে গ্রথিত। অতএব শাস্ত্র কখনই অপ্রমাণ নহে। বিশুদ্ধ অনুমান, অভ্রান্ত উপমান এবং অদৃষ্ট শব্দ বা শাস্ত্র হইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা সত্য। যদি অনুমান-জনিত নিশ্চয় শাস্ত্রসিদ্ধান্তের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে অনুমান দুষ্ট, তাহা বিশুদ্ধ নহে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়; এই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান ভ্রমও হয়, প্রমাও হয়। দোষযুক্ত ইন্দ্রিয় হইলেই তজ্জনিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ভ্রম। কামলারোগীর চক্ষে শঙ্খও হরিদ্রাবর্ণ

বোধ হয়। বৃক্ষচ্ছায়ায় ভূতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম এ সব ভ্রমের সহিত কোথাও চক্ষুর, কোথাও বা মনের দোষ বিজড়িত।

কুশিক্ষায় এখন দেশে মনের দোষ সুবিস্তৃত, সুতরাং দুষ্ট মনে স্থিরীকৃত বিষয়ের সহিত শাস্ত্রীয় সত্যের সামঞ্জস্য হয় না। গৃহস্থ ন্যায়দর্শন বলিতেছেন, বৎস, সাবধান,প্রতারকের ছলনায় ভুলিও না, ভ্রান্তের আশ্বাসে বিশ্বাস করিও না—যাহাতে দোষের আশঙ্কা নাই, সেই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সত্য, সেই সত্যভ্রষ্ট হইও না। সেই সত্যই ধর্ম্ম। গৃহস্থ দর্শন—কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা, কাহারও গুরু, কাহারও পালক ; তিনি স্নেহময়,প্রেমময়, জ্ঞানময় ও করুণাময় ; গৃহস্থ দর্শন—কর্ম্মী, ভক্ত, ভাবুক ও জ্ঞানী ; গৃহস্থ দর্শন 'সোহহং' অভিমানে স্ফীত নহেন। গৃহস্থ দর্শন যুক্তকরে একাগ্রমনে অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতেছেন—

কারংকারমলৌকিকাদ্ভুতময়ং মায়াবশাৎ সংহরন্
হারংহারমপীন্দ্রজালমিব যঃ কুর্ব্বন্ জগৎ ক্রীড়তি।
তং দেবং নিরবগ্রহস্ফুরদভিধ্যানানুভাবং ভবং
বিশ্বাসৈকভুবং শিবংপ্রতি নমন্ ভূয়াসমন্তেষপি॥

লোকচিন্তা অগোচর অদভুত চরাচর
মায়া বশে রচিয়ে আবার।
সংহারে মিলায়ে তায় কিবা ইন্দ্রজাল প্রায়
এই ক্রীড়া যাঁর বার বার।
সত্য ধ্যান সত্য জ্ঞান বিশ্বাসের এক স্থান
দেব শিব ভুবনভাবন।
অন্তিমেও যেন তাঁর শ্রীচরণে নতি সার
করি এই মম আকিঞ্চন।

হে ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ দর্শন, আমি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি,আপনার শ্রীচরণে এই বর প্রার্থনা করি, আপনার পবিত্র চরিত্র-কথা যেন মুক্তকণ্ঠে জনসমাজে প্রচার করিতে সমর্থ হই,অদ্য আপনার পূত আচরণের আভাস মাত্র প্রদান করিলাম।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

অমরনাথ সেন

শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেন, রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ৺উপেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র। কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময় অমরনাথ Boy Scout দলে প্রবিষ্ট হয়েন। তখনও বাঙ্গালী 'বয় স্কাউট' দল গঠিত হয় নাই। ইংরাজ বয় স্কাউটের দলে কাযেই তাঁহাকে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া King's Scout সম্মান লাভ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালী Boy Scoutএর দল গঠিত হইলে অমরনাথ সহকারী Scout master পদে উন্নীত হয়েন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় কর্ম্মদক্ষতার গুণে তিনি ইংরাজ নৌবাহিনীতে প্রবেশ লাভ করেন। কোন রণতরীতে তিনি নৌ-সামরিক কর্ম্মচারীর পদও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী এরূপ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। সংপ্রতি তিনি আমেরিকার ওয়াসিংটন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত বাণিজ্যশাস্ত্রে উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিলাভের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

শালিক

নৈসর্গিক আবেষ্টনের মধ্যে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। এক দিন সে যাযাবর ছিল; বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তাহার নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার জীবনের ইতিহাসে রেখাপাত করিয়াছে। যখন সে কৃষিজীবী হইয়া গ্রামে গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিল, তখনও পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়া গেল। তাহার ভালমন্দের সহিত মেষগোছাগাদি পশুর বা বায়স-সারিকাদি বিহঙ্গের অথবা মক্ষিকা-মশকাদি কীটপতঙ্গের জীবনলীলা পূর্ব্বের মত আজও বিচিত্র সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত,—এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। জীববিদ্যার দিক হইতে কোথাও কোথাও ছোট বড় অনেক প্রাণীর নানা প্রকার আলোচনা হইয়াছে; ক্রমশঃ যতই আমাদের জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রাণিজগৎকে আমরা নানাদিক হইতে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। পশুর সহিত পশুর সম্পর্ক, পশুর সহিত বিহঙ্গের সম্পর্ক, পশু-পক্ষীর সহিত কীটকীটাণুর সম্পর্ক,—আবার মানুষের সহিত ইহাদের সকলের সম্পর্ক —বিপুল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জীবনতরঙ্গের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। মানুষকে প্রাণিজগতের কেন্দ্রস্থ মনে করিয়া তাহার স্বার্থ, তাহার ভালমন্দ, তাহার ইষ্টানিষ্ট কতটা তাহার পারিপার্শ্বিক চেতন পরিবেষ্টনের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার পরিমাপ করিবার চেষ্টা হইতেছে। কে আমাদের কতটুকু উপকারে আসিল, কাহার দ্বারা কি অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার হিসাবনিকাশ করিতে বসিয়া সুধীগণ মোটামুটি কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। কৃষিতত্ত্ববিৎ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন; স্বাস্থ্যরক্ষার দিক হইতে ভিষক্‌ও পোকামাকড়পাখী সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে বিরত হয়েন না। স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক হইতে এইরূপ আলোচনা সভ্যজগতে সর্ব্বত্রই আরব্ধ হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে কাকচরিত্র প্রসঙ্গে কোনও কোনও দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধির জন্য বায়সের দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি অন্যত্র কয়েকটি কথা বলিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, ইংলণ্ডে পক্ষিতত্ত্ববিৎ পাইক্রাফ্‌ট (W. P. Pycraft) গৃহপালিত পশুদিগের দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য বিহঙ্গবিশেষ দায়ী কি না, এই প্রশ্ন লইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রশ্নটি এখন বিশেষ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছে, কারণ, অল্পদিনের মধ্যে বৃটিশ দ্বীপে ও য়ুরোপের অন্যত্র বহুসংখ্যক পালিত পশু উৎকট "ক্ষুরে" ব্যাধি (Foot and mouth diseases) কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইল। সোজাসুজি এমন কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না, যদ্দ্বারা এই ব্যাধিসমস্যার জটিলতা নিরাকৃত হইতে পারে। দোষ পড়িল, বায়সাদি কয়েকটা পাখীর উপর,—শালিকের জ্ঞাতিসম্পর্কীয় Starling তাহাদের অন্যতম। কিন্তু মিঃ পাইক্রাফ্‌ট বলেন যে, এই সকল পাখীর দোষ সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ না দিয়া শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া ইহাদিগকে হনন করিলে কোনও শুভ ফল পাওয়া যাইবে না।

আমাদের দেশেও যে এ কথাটা একেবারে নূতন ও অপরিজ্ঞাত তাহা নহে। বাঙ্গালার অনেক স্থানে বর্ষাকালে গবাদি বহু পালিত পশু সহসা এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ব্যাধির জন্য কোন্ পাখীর কতটা দায়িত্ব আছে অথবা কোনও পাখীর কিছুমাত্র দায়িত্ব আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে দেশকালপাত্র বিবেচনা করিয়া আমরা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসঙ্কোচে পাখীকে পশুবিশেষের ব্যাধির জন্য সম্পূর্ণরূপে

দায়ী করিতে পারি। গত পৌষমাসে আলিপুরের চিড়িয়াখানার মাসিক বিবরণী পাঠে জানা গেল যে, কয়েকটি গয়াল (আসামের পার্ব্বত্য মহিষবিশেষ) এই foot and mouth ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মাঝে মাঝে এই প্রকার মৃত্যুসংবাদ চিড়িয়াখানার কমিটীর সভ্যগণ পাইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে আমি সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া বায়সকে দোষী সাব্যস্ত করিতে একটুও ইতস্ততঃ করি নাই। কিন্তু শালিক কিংবা তাহার Starling জাতিবর্গকে আমরা এত দিন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি নাই। বরঞ্চ শালিক আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে কতকটা মানুষের উপকারী বন্ধু বলিয়াই স্থির করিয়া লইয়াছিলাম।

এই শালিক পাখীর বিশেষ করিয়া কিছু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন; কারণ, তাহা হইলে কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে, তাহাকে মিত্র বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে কি না। খাঁচার পাখী হিসাবে সে আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই পরিচিত; —সে সহজে পোষ মানে; কতকটা মানুষের বুলি অনুকরণ করিতে পারে; আহার বিষয়ে তাহার বাছবিচার বড় দেখা যায় না; এবং তাহাকে ভীরুস্বভাব বলা যায় না। স্বাধীন অবস্থায় সে গ্রামে, নগরে, কাননে, কান্তারে, সমুদ্রতীরে, পাহাড়ে, অধিত্যকায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। ভারতবর্ষের বাহিরে যেখানেই তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে (অর্থাৎ কীটাদির উচ্ছেদার্থেই হউক অথবা অভিনব পাখী হিসাবেই হউক, যেখানেই ইহাকে মানুষ লইয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ দিয়াছে)—অষ্ট্রেলিয়ায়, মরিশস্‌দ্বীপে, নিউজিলাণ্ডে, আণ্ডামানে—সেই স্থানেই বিহঙ্গজগতের মধ্যে নিজের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহাকে এমন সচেষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে যে, অল্পকালের মধ্যে অন্যান্য বহু বিহঙ্গকে বিতাড়িত করিয়া সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই তেজস্বিতালক্ষণাক্রান্ত বিহঙ্গকে ইউরোপীয়েরা "bird of character" বা চরিত্রবান্ বিহঙ্গ বলিয়া থাকেন। এত দিন তাঁহাদের মধ্যে এ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই যে, এই 'চরিত্রবান্' পাখীটি মানুষের অনিষ্টসাধন করিতে পারে।

শালিক শস্যও খায়, কীটও খায়; সুপক্ক ফলেও তাহার অভিরুচি আছে। যে স্থানে তাহার বংশবিস্তার বশতঃ সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, সেই স্থানেই বহুলপরিমাণে শস্যের ও বৃক্ষফলের অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে; কারণ, যে সকল কীট, পতঙ্গ ইহার ভক্ষ্য, সেগুলা দ্রুত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার ঋতুভেদে, জলবায়ুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই সমস্ত ভক্ষ্য কীট পতঙ্গের সংখ্যার তারতম্য হয়; কতকটা সেই জন্যও সময়ে সময়ে প্রচুর কীটপতঙ্গের অভাবে সে শস্যাদি অধিক পরিমাণে উদরসাৎ করিতে বাধ্য হয়। মানুষের এই খাদ্যদ্রব্য সঙ্কোচের সম্ভাবনা যে কোনও দেশে যে কোনও সময় হইতে পারে, যদি এই শালিকের সংখ্যা অপরিমিতরূপে বৃদ্ধি পায়। ইহার মধ্যে একটু রহস্য আছে। যে কীটগুলাকে শালিক উদরসাৎ করিল, সেগুলা যদি শস্যের পক্ষে হানিকর হয়, তাহা হইলে এক হিসাবে শালিক মানুষের খানিকটা উপকার সংসাধিত করিল। হয় ত এই দুষ্ট কীটধ্বংসের ফলে উৎপন্ন শস্যের অধিকাংশই রক্ষা প্রাপ্ত হইল; কিন্তু কীটের মুখ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও তাহার কতটা শালিক পাখীর উদরস্থ হয়, তাহা বিচারসাপেক্ষ। এ দেশে শীতকালে ধান কাটা শেষ হইলে পৌষ মাঘে যখন ক্ষেতের উপরে শস্য স্তূপীকৃত থাকে, তখন দলে দলে শালিক পাখী সেই ধান্যস্তূপের দিকে আকৃষ্ট হয়। দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করাই ইহাদের প্রকৃতিগত অভ্যাস। ইহাদিগের জাতিবর্গীয় অনেক পাখীও ইহাদের সহিত মিশিয়া থাকে। শালিক কতকটা যেন সর্ব্বভুক্, ইহা তাহার খাদ্যপ্রকৃতি দেখিলেই মনে হয়। সে যে শুধু ধান, যব, গম, ভুট্টা, কড়াই, মটর প্রভৃতি শস্য ভক্ষণ করে, তাহা নহে; বন্য ফলও সে বাদ দেয় না; এমন কি, শিমুলফুলের রস হইতেও সে নিজেকে বঞ্চিত করে না; গৃহস্থ-নিক্ষিপ্ত অন্নব্যঞ্জনের ভুক্তাবশেষের উপরেও সে পতিত হয়; গৃহপালিত পশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে বাছিয়া বাছিয়া কীটগুলাকে উদরসাৎ করে; আবার সুদূর সমুদ্রতটে ছোট ছোট কর্কটশাবক গলাধঃকরণ করিতেও তাহাকে দেখিয়াছি। শালিক দলবদ্ধ হইয়া শষ্পাচ্ছাদিত ভূমিতে বিচরণ করিতে ভালবাসে, বিশেষতঃ সেই ঘাসের ভিতর হইতে ফড়িং ধরিতে এত ভালবাসে যে, ল্যাটিন ভাষায় ইহার নাম হইয়াছে "ফড়িং ধরা" পাখী—Acridotheres.

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, শালিক জাতীয় পাখী কোনও উৎকট ব্যাধিবিশেষের জনয়িতা কি না। কাকের এ সম্বন্ধে যে দুর্নাম আছে, তাহা কতকটা লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু

গবাদি পশুর ক্ষত অথবা ব্রণের উপর শালিকজাতীয় বিহঙ্গকে চঞ্চুর আঘাত করিতে দেখা যায় না। শালিক গোমেষাদির অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ষিত ক্ষেত্রের অথবা তৃণাচ্ছাদিত মাঠের উপর দিয়া চলে বটে; কিন্তু তাহার প্রধান লক্ষ্য থাকে ঐ সকল ফড়িং পোকামাকড়,—যাহারা উক্ত পশুদের পদসঞ্চালনে ইতস্ততঃ সঞ্চরমান হয়। তবে ব্যাধিগ্রস্ত পশুদিগের পদস্পৃষ্ট ভূমিতে রোগের বীজাণু সংক্রামিত হয় কি না, এবং এই বীজাণু শালিক কর্ত্তৃক স্থানান্তরিত হইয়া একটা সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয়। ইহা ঠিক যে, সে প্রধানতঃ ভূচর, অর্থাৎ ভূমিতে বিচরণ করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে। সুতরাং তাহার পায়ে দূষিত মৃত্তিকা লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে। এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ মৃত্তিকাখণ্ডে বাস্তবিক কোনও ব্যাধিজনক বীজাণু আছে কি না এবং যদি থাকে, কি পরিমাণে আছে। তাই সম্প্রতি স্বনামখ্যাত বিহঙ্গবন্ধু মিঃ পাইক্রাফট্ শালিকজাতীয় পাখীর এই অপবাদে ব্যথিত হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিতেছেন যে, এখনও কোনও বীজাণুবিৎ পণ্ডিত (Bacteriologist) অনুসন্ধান করিয়া এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। কোনও উদ্ভিদ্‌তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও এই মৃত্তিকানিহিত কোনও দূষিত উদ্ভিজ্জের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তবে কেমন করিয়া এ ক্ষেত্রে শালিককে দোষী সাব্যস্ত করা যায়? য়ুরোপে শালিকের জাতিবর্গ যাযাবর; ঋতুভেদে ইতস্ততঃ যাতায়াত করে। হয় ত এমন দেশ হইতে তাহারা উড়িয়া আসিল যে, আশঙ্কা হইতে পারে, সে স্থান হইতে রাশি রাশি রোগের বীজাণু লইয়া আসিয়াছে; নহিলে হঠাৎ ইংলণ্ডে পালিত পশুগুলার মধ্যে এই উৎকট ব্যাধির লক্ষণ দেখা গেল কেন? অকস্মাৎ এতগুলা পশু মৃত্যুমুখে পতিত হইল কেন? গভর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ দেখিলেন যে, ইহার একটা কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন, কারণ, জনসাধারণ বিচলিত হইয়াছে। গবেষণায় ফল দাঁড়াইল যে, যত দোষ ঐ Starling পাখীর।

শুধু বিলাতের কথা নহে। আমাদের দেশেও পালিত পশুর মড়ক উপস্থিত হইলে, সহসা কোনও বিহঙ্গবিশেষের উপর দোষ চাপাইবার পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, সেইরূপ অপবাদের কোনও ভিত্তি আছে কি না। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞ, উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ববিৎ ও বীজাণুবিৎ যত দিন না এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তত দিন এই সমস্যাসমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।

যে শালিকের কলকূজনে বাঙ্গালার পল্লীজীবন মুখরিত হয়; সময়ে অসময়ে গোঠে মাঠে তড়াগে নদীতীরে যে কৃষকের অত্যন্ত পরিচিত সহচর, তাহার কর্ষিত ক্ষেতের উপর দিয়া মন্থর পদক্ষেপে যে তাহার পালিত গোমেষাদির অনুসরণ করে; ঋতুবিশেষে যে তাহার দলবল লইয়া স্তূপীকৃত ধান্যের ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে থাকে; যে স্বীয় ক্ষমতাবলে প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য বিহগকে দূরে তাড়াইয়া দিয়া নিজের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা করে;—সেই শালিক তাহার সমস্ত ভালমন্দ লইয়া, তাহার অব্যক্ত মধুর কাকলীতে ক্ষেত্র ও গৃহপ্রাঙ্গণ ধ্বনিত করিতে থাকুক। মানুষের বা চতুষ্পদের ব্যাধির জন্য তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বে যেন প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া সত্যনির্দ্ধারণের চেষ্টা করা হয়।

শ্রীসত্যচরণ লাহা।

সামুদ্রিক মৎস্য

পুরাতন পঞ্জিকা

১
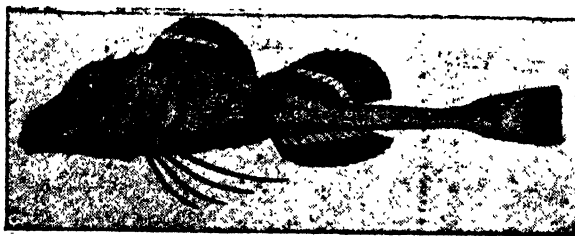
ইংরাজগঠিত বাঙ্গালী যে কোন কার্য্য করেন, সব-ই পরোপকারের জন্য। সাহিত্যের অভাবপূরণ ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য-ই বাঙ্গালী লেখক লেখনী পরিচালন করেন, কেহ কথাটা হজম করিয়া রাখেন, কেহ কথাটা প্রকাশ করেন; বিশেষ সাময়িক ও সংবাদপত্রসম্পাদকগণ।

বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাবপূরণের প্রয়াস বাল্যকাল হইতেই আমার মানসে বিকসিত হয়, কিন্তু স্বভাবে দীর্ঘসূত্রীর ভাব ও আত্মবিশ্বাসের অভাব এত দিন আমায় সাহিত্যের সে অভাব পূরণ করিতে দেয় নাই।

বাল্যকালে প্রতি চৈত্রশেষে বাড়ীতে পাঁজি কেনা হ'লে-ই দেখতেম উপরে লেখা আছে "নূতন পঞ্জিকা।" এক দিন পিতামহকে জিজ্ঞাসা করলেম, "দাদা, এ ত নূতন পঞ্জিকা, পুরাতন পঞ্জিকা কোথায়?" তিনি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে ঘরের একটা তাক দেখিয়ে দিলেন। একটা রবিবারে দাদা গঙ্গাস্নানে গেলে দুপুরবেলা সেই তাকে উপরি উপরি সাজান পাঁজি পেড়ে ধুলো ঝেড়ে এক এক-খানি ক'রে দেখলেম, প্রত্যেক পাঁজির উপরেই লেখা আছে নূতন পঞ্জিকা; অপরাহ্ণে নিদ্রোত্থিত পিতামহকে জিজ্ঞেস করলেম, "দাদা, পাঁজিগুলি ত পেড়ে প'ড়ে দেখলেম, সব-ই দেখি ত নূতন পঞ্জিকা।" দাদা বললেন, ঐগুলো-ই এখন পুরানো হয়ে গেছে; আমি বললেম, "এ ত পুরোনো পাঁজি, কিন্তু আদত 'পুরাতন পঞ্জিকা' কোথায়?" আমি তখন 'বোধোদয়' পর্য্যন্ত পড়েছি, কিন্তু দাদার বিদ্যা কাশীরাম দাস; সুতরাং আমার প্রশ্নের সন্তোষ-জনক মীমাংসা ক'রে দিতে পারলেন না। সেই অবধি গোঁপ উঠলে যে সব বড় বড় কাম করব মনে ক'রে কল্পনার ফলকে মোট ক'রে রেখেছিলাম, তার সঙ্গে পুরাতন পঞ্জিকা প্রণয়নটাও এড্ ক'রে দিলুম।

অগ্রেই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, পঞ্জিকাখানি নীরস হইবে; কেন না, ইহাতে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনামাত্রই লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব। যে ফলিত জ্যোতিষের অজ্ঞতা ও উপন্যাস রচনায় অক্ষমতা এত দিন আমাকে ইতিহাস বা জীবনচরিতলেখক হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করতে দেয়নি, সেই হীনতা এখন আমার সরস পঞ্জিকা প্রণয়নের বিঘ্ন। বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি আরনল্ডের রোমের ইতিবৃত্তে বর্ণিত চিতোরের রাণাগণের আদিপুরুষ বাপ্পারাওয়ের সহিত বঙ্গের শেষ but নাবালক সেরাজ-উদ্দৌলা নবাব আলিবর্দ্দী যুদ্ধঘটনা অবলম্বন করিয়া এক-খানি ঐতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই, কিন্তু তখন আমার যৌবনযুক্ত জীবনের বাসন্তী হাওয়া ইতিহাসকে ভাসাইয়া প্রণয়কাননের পথ বাহিয়া পৌরাণিকে পরিণত হওয়ার গতি প্রাপ্ত হইতেছে বুঝিয়া লিখিত পত্রাবলী নাট্য-সাহিত্যের পিতৃপুরুষের তিলতর্পণে প্রয়োগ করিয়া ফেলি-লাম। তার পর হইতে ইতিহাস ও জীবনচরিত প'ড়ে প'ড়ে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, ঐ দুইখানি প্রতিমার হস্তপদ বদনের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাতে ডাকের সাজ না পরালে কখনই তা লোকপূজ্য হ'তে পারে না।

এই পুরাতন পঞ্জিকার আর একটা দোষ থেকে যাবে, তা আমি আগে থাকতেই ব'লে রাখছি। সাধারণ হিন্দু বাঙ্গালী পঞ্জিকা পূজা করেন, পঞ্জিকাশ্রবণ পুণ্যকর্ম্ম ব'লে মনে করেন, সুতরাং এখনকার নূতন পঞ্জিকাগুলিতে "কেমিক্যাল সোনার গহনা," "দাস ব্রাদার্শের চটি জুতা," "প্রমেহ-প্রলেপ," "শত-সতীগতিকারি-পতিপ্রস্তুত-পটু-বটিকা" প্রভৃতি পবিত্র কথা বিজ্ঞাপিত না হ'লে পুণ্য পঞ্জিকা সম্পূর্ণ হয় না; চরিত্রহীন নট আমি, অত পবিত্র কথা আমার মুখে শোভা পাবে না।

* * * * *

ষাট বৎসর পূর্ব্বে সালে বর্ষসংখ্যা গণনায় প্রথাটা সাধারণের মধ্যে অনেকটা প্রচলিত ছিল ব'লে সন ১২৭১ সাল বল্লেম, নইলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ বলাই শিক্ষিতসমাজসম্মত হ'ত; সেই ৭১ সালের কল্‌কেতা আর এখনকার কল্‌কেতায় অনেক তফাৎ। তখনকার কল্‌কেতা অনেকটা বাঙ্গালা কল্‌কেতা ছিল। চিৎপুর রোডের নাম ছিল তখন বড় রাস্তা,

শ্যামবাজার অঞ্চলের লোক কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটকে বল্‌তো নূতন রাস্তা, আর সারকুলার রোডটাকে চৌরঙ্গীর চেয়ে কম চওড়া ব'লে মনে হ'ত না। আর চৌরঙ্গী পার হয়ে বড় গির্জ্জেটা পেরুলেই গোলপাতার ঘর আর খাঁপরার চাল বুঝিয়ে দিত যে, সহরের শেষ হয়ে উপকণ্ঠ আরম্ভ হ'ল। কোথায় ছিল তখন হ্যারিসন রোড, গ্রে ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, সেন্‌ট্রাল এভিনিউ। আজকাল যেখানে প্রকাণ্ড দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, শ্যাম-বাজারের বড় পার্ক আর তার এপাশে ওপাশে মোটররথী-দের গর্ব্বোন্নত হর্ম্ম্য, তখন সেখানে বনবাদাড়ের মাঝে দীন-দুঃখীর চালা বা কাছি পাকাবার কারখানা—এই সব ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, তাতে মনে হয় যে, শ্যামবাজারের মোহনলাল মিত্রের বাড়ীর সামনে থেকে গড়পারের মোড় পর্য্যন্ত তো মহারাট্টাডিচ্ দেখেছি। লালদীঘির ধার তখন সবে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পরিবর্ত্তে ড্যালহৌসী স্কোয়ার নাম গ্রহণ করেছে। ষ্ট্রাণ্ড রোডের ধার দিয়েই তখন গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন, প্রমাণ মা আনন্দময়ীর তলার পশ্চিমে নিমতলা ঘাটের পুরাতন চাঁদনী। য়ুরোপীয়েরা যখন বাঙ্গালায় প্রথম আসেন, তখন এ দেশের লোকরাই ছিলেন মানুষ আর ওঁরা ছিলেন গেঁড়িগুগ্‌লি; তাই মা গঙ্গার মহিমা না বুঝতে পেরে কলি-কাতার প্রান্তপ্রবাহিণীকে হুগলী নাম দিয়েছেন, আবার সেই হুগলীর কতকাংশ জঞ্জাল ফেলে ভরাট ক'রে রাস্তা তৈরী করছেন ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্ক। আমরা চিরকাল-ই বাস্তুপ্রিয়, সেই জন্য জমী পেলেই বাড়ী তৈরী করি, আপনারা বাস করি আধার পাঁচ জনকে ডেকে ডুকে এনে বসবাস করাই; আর ইংরাজরা চিরদিন-ই ভবঘুরে, তাই সুবিধে পেলেই বাস্তু ভেঙ্গে রাস্তা তৈয়ার করেন। যার যেমন প্রবৃত্তি। এক সময় একটি সরায়ের সামনে এক জন সেনা-নায়ক আর এক জন ডাক্তার ব'সে গল্প কচ্ছিলেন, সেই সময় একটি লোক তাঁদের সামনে দিয়ে চ'লে গেল। তাকে দেখে নায়ক বল্লেন, "বাঃ, কি বলিষ্ঠ দেহ, সুগঠিত-পেশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একে যদি আমি আমার সৈন্যদলে পাই!"

ডাক্তার বল্লেন, "হ'তে পারে, জীবিত দেহ তোমার কাযে লাগতে পারে, কিন্তু ও ম'লে যদি কেউ ওর শবটি আমায় যোগাড় ক'রে দেয়, তা হ'লে একবার মনের সাধে ব্যবচ্ছেদ ক'রে আমার শরীর-তত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষা করার সার্থকতা করি।"

হিঁদুর ছেলে গঙ্গা দেখলে-ই তার মা গঙ্গা ব'লে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুব দিতে ইচ্ছে করে, ঐ মধুর পবিত্র সলিল নিজে পান ক'রে পরিতৃপ্তির আনন্দে অঞ্জলি অঞ্জলি জল তুলে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্ত্যর্থে উদ্দেশে তর্পণ কর্ত্তে ইচ্ছে করে, আর ভাবে, যখন এক দিন মরতে-ই হবে, তখন ঐ জলে অর্দ্ধাঙ্গ ডুবিয়ে শেষ শ্বাস পরিত্যাগ-ই এ জীবনে চরম সুখ। আর সাহেবের ছেলে আবার সেই গঙ্গা দেখে-ই ভাবে যে, এই স্রোতে ডিঙ্গা ভাসিয়ে মাল আমদানী করার-ও যেমন সুবিধা, আর এর একটা তীর বেঁধে দিয়ে মাশুল রোজগারের-ও তেমন-ই সুবিধা। কল্‌কেতা যখন বাঙ্গালীর সহর ছিল, তখন বাগ-বাজার থেকে বাবুঘাট পর্য্যন্ত স্নানের ঘাটের-ই বাড়াবাড়ি ছিল। স্নানের ঘাট বাঁধিয়ে দেওয়া, ঘাটের ওপর চাঁদনী তৈয়ার করা তখনকার বড়লোকদের একটা বাই ছিল, কর্ত্তব্য ছিল, ধর্ম্ম ছিল। সেকালে কল্‌কেতায় রাজা বল্লেই শোভা-বাজারের রাজাদের-ই বোঝাত,—সমস্ত সুতানুটাটা-ই তাঁদের জমীদারী। কুমারটুলী থেকে আরম্ভ ক'রে বাগবাজারের শেষ পর্য্যন্ত ঐ রাজাদের-ই অনেকগুলি ঘাট ছিল। এ ছাড়া রাণী রাসমণির বাবুঘাট (এখন সাহেবঘাট,—তবু কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান নিত্যস্নান ক'রে পূর্ব্বনামের মাহাত্ম্য বজায় রেখেছেন), বাগবাজারের রসিক নিয়োগীর ঘাট,—আহা, কি সুন্দর ঘাট-ই সে ছিল, এখনও পইঠে ক'টি পোর্ট কমিশনার বাহাদুররা কৃপা ক'রে বজায় রেখেছেন; কিন্তু কোথায় গেছে সেই সুন্দর অট্টালিকা, নীচে প্রশস্ত চাঁদনী, পাশে গঙ্গাযাত্রীর ঘর, দোতালায় প্রকাণ্ড বৈঠকখানা, যেখানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী প্রথম প্রকাশ্য নাট্যালয় "ন্যাশানাল থিয়েটার" স্থাপনের উদ্যোগে "নীলদর্পণ" "নবীন তপস্বিনী" "কৃষ্ণকুমারী" "পুরুবিক্রম" "ভারত-মাতা" প্রভৃ-তির রিহার্শাল হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বন্দরে তখন পালতোলা জাহাজের বেশী আমদানী, ষ্টীমারের সংখ্যা অতি সামান্যই ছিল; বিলাতী, ফরাসী, জার্ম্মন, ইটালিয়ান, স্পেনিস, মার্কিণ প্রভৃতি নানা জাতীয় সেলার তখন কলিকাতায় আমদানী হ'ত। ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয়, অল্পদিন পূর্ব্বে স্থানান্তরিত হয়েছিল, কিন্তু সেলার হোমটি ছিল আগে ঠিক লালবাজারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, যেখানে ইদানীং পুলিসের হাজত-ঘর ছিল। আর লালবাজারের পূর্ব্বদিকে যে বহুবাজার ষ্ট্রীট গিয়েছে, ওকে সাহেবরা বলত তখন ফ্ল্যাগ ষ্ট্রীট; কারণ, বেণ্টিক

ষ্ট্রীটের খানিকটা আর ঐ ফ্ল্যাগ ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত দুধার-ই প্রায় ছিল কেবল মদের দোকান। ইংরাজ শুঁড়ী, ফরাসী শুঁড়ী, মার্কিণ শুঁড়ী, ইটালিয়ান শুঁড়ী, স্প্যানিস শুঁড়ী সব দোকান সাজিয়ে মদ বেচত, সাইনবোর্ড অনেক-গুলিই প্রকৃত সাইনবোর্ড-ই ছিল, যথা:—হোয়াইট হর্শ, ব্লু বটল, রেড লায়ন এই রকম; আর ফি দোকানের সামনে তাদের নিজের নিজের দেশের ফ্ল্যাগ লাঠীর আগায় উড়ত। বাঙ্গালীর কথা ছেড়ে দিন, ফিরিঙ্গীও তথৈবচ, মাতাল সেলারের দৌরাত্ম্যে বড় বড় জাঁদরেল সাহেবরা-ও ঐ রাস্তা দিয়ে যখন-তখন যেতে আসতে শঙ্কিত হতেন। এখনও বেশ মনে পড়ে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঐ লাল-বাজারের কোণে সেলার হোমের একতালা ছাতের আলসের উপর সেলাররা বাঁদরের মত পা ঝুলিয়ে ব'সে থাকত, উঠছে, বসছে, দৌড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে, টেলিগ্রাফের থাম্বা বেয়ে উঁচুতে উঠছে, মোড়ের উপর আপনা আপনি ঘুসি লড়ালড়ি কচ্ছে, সন্ধ্যের ওক্তে অফিসফেরত বাবুদের চাপকানের পকেটে হাত পুরছে, ছাতা-চাদর কেড়ে নিচ্ছে, একটা দুর্দ্দান্ত সেলারকে ৪।৫টা গোরা সার্জ্জনে ধ'রে গারদে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব দুর্দ্দান্ত শাসনের জন্যই কলকাতায় গোরা পাহারাওলার সৃষ্টি, আজ-ও যে তাঁরা কেন আছেন এবং তাঁদের সস্ত্রীক বসবাসের জন্য বাড়ী তৈরীর খরচা কেন যে আমাদের দিতে হচ্ছে, তা বুঝতে পারি না।

এই সেলাররা এক সময় কলিকাতার একটি বিদঘুটে উৎপাত ও বিচিত্র দৃশ্য ছিল; ভাল মন্দ দুই গুণ-ই তাদের ছিল। যে সময়ের কথা বলছি, তখন কলকাতায় উলুর চালা, গোলপাতার ঘর প্রায় উঠে গেলে-ও একেবারে নিঃশেষ হয়নি, তা ছাড়া খোলার ঘর ও মাঠগুদাম ঢের বেশী ছিল। হাটখোলায় যে সব ধনী মহাজন এখন জমীদার হয়ে বড় বড় কোঠা তুলেছেন, তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ-গণের মধ্যে অনেকের-ই তখন দোতালা খোলার ঘর অর্থাৎ মাঠগুদাম কি না নীচে মালের গুদাম ও উপরে বাসের ঘর এই ছিল, সুতরাং অগ্নিকাণ্ড তখন কলিকাতার ভিতর খুব বেশী-ই ঘটিত, বিশেষ—ফাল্গুন চৈত্র মাসে। ষ্টীম দমকল, মোটর দমকল ত তখন ছিল না, ভবানীপুরে, লালবাজারে এই রকম মাঝে মাঝে টংয়ের উপর এক জন লোক ব'সে থাকত, ধোঁয়া দেখলে সে খবর দিত আর হাত দমকল আগুন নিবাতে দৌড়ুত, সেই সময় সেলাররা বড় কায করত। তখন জলের কল হয়নি, বাড়ী বাড়ী পাতকুয়া ছিল—পুকুরও অনেক ছিল, আর চিৎপুর রোডে ওরিয়েণ্টেল সেমিনেরীর একটু উত্তর পর্য্যন্ত ইট দিয়ে লহর গাঁথা ছিল। লাট সাহেবের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে এখন-ও সেই লহরের শেষ চিহ্ন দেখা যায়। চাঁদ-পাল ঘাট থেকে পম্প করা জল ঐ লহরের ভিতর দিয়ে গরাণহাটা পর্য্যন্ত এসে পৌছুত; সেই জল আগুন নেবাবার সময় কাযে লাগত, আর ভিস্তীরা তাই থেকে জল তুলে ইংরেজটোলায় দু'বেলা, আর বাঙ্গালীরা বাপ্ রে গেলুম রে ধুলোয় মলুম রে ক'রে উঠলে কখন-ও কখন-ও এ পাড়ার কোন কোন রাস্তায় ছিটুত। ঐ আগুন লাগার সময় দমকলের সঙ্গে সেলাররা এসে অকুতোভয়ে আগুনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে লোকের ধন-প্রাণ রক্ষার সাহায্য করত, তবে মদের দামটা বলে-ই হোক আর না বলে-ই হোক আদায় ক'রে নিতে ছাড়ত না। সেলাররা টাকা জমাতে জানত না, পেলেই খরচ; টিয়ে পাখী কিনচে, বাঁদর কিনচে, পায়ে জুতো নেই, একখানা সিল্কের স্কার্প কিনে-ই গলায় জড়ালে, গাড়ী ভাড়া করছে, গাড়ীর ভিতরে, পিছনে, ছাতে, কোচবক্সে, ঘোড়ার পিঠে পর্য্যন্ত চ'ড়ে বসছে,—আর মদ ত হরদম, এই জন্যই বোধ হয়, সেঁলারীকাণ্ড, কাপ্তেন বাবু প্রভৃতি কথার সৃষ্টি। আবার বাঙ্গালী বড়মানুষরা বা স্কুল-বয়রা-ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় যে যার পক্ষ বলবান্ করবার জন্য সেলার ভাড়া করে-ও আন্‌তেন, তারা যেমন মারতে পারত, তার চেয়ে মার খেয়ে বেশী বরদাস্ত করতে পারত।

কিন্তু যাদের পূর্ব্বপুরুষরা মানুষ-খেগো বাঘ তাড়িয়ে সাপ সরিয়ে এই দেশে বাস করেছিলেন, সেই বাঙ্গালীর মধ্যে-ও কতকগুলি লোক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের কাছে এই ব্যাঘ্রপ্রকৃতি সেলাররা-ও টুঁ-ফাঁ করতে পারত না, করতে গেলে মুষ্ট্যাঘাতে পপাত ধরণীতলে। এক শ্রেণী ছিলেন জনকতক বলিষ্ঠ ভদ্রসন্তান, তাঁদের কাকে-ও কাকে-ও আমি নিজে-ও জানতুম। আর এক ছিলেন, রাধাবাজারের শুঁড়ী বাবুরা। রাধাবাজারে যেখানে -খন সব সারি সারি ঘড়ির দোকান দেখেন, ঐখানে ছিল সব গায়ে গায়ে বিলাতী মদের দোকান; গেলাস

বিক্রী, বোতল বিক্রী-ও ছিল, কিন্তু তাঁদের বড় কারবার ছিল হোলসেল। কলিকাতার ও মফঃস্বলের ছোট দোকানদাররা তাঁদের-ই কাছ থেকে পাইকারী মাল কিনে নিতেন। হোটেল, মেস, ক্লাব, কেল্লাতে-ও তাঁদের সরবরাহ করবার কনট্রাক্ট ছিল। গ্লাস বিক্রীর বেশী খদ্দের ছিল ঐ সেলাররা, তারা দোকানে মদ খেতো, গাইতো, নাচতো, শুয়ে পড়তো, মারামারি করতো, কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলেই সা-মশাইদের পায়ের কেল্লার জুতোর ঠোকর আর লোহার হাতের ঘুসি। হায় রে, আজকের ফুটবল চ্যাম্পিয়ান বাবু! দেখতে যদি তুমি আজ অবিনাশ সেন, সেলার যদু, অখিলচন্দ্রকে—অতি ভাল মানুষ, সাত চড়ে রা নেই, দরকার হ'লে তোমার জুতো মাথায় করবে। কিন্তু তোমার উপর গোরা কি সেলার যদি উৎপাত করে ত দু'শো লোকের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঘুসিয়ে তার মাথা ভেঙ্গে দেবে। শিমলা শুঁড়ী-পাড়ায় কি জোয়ান-ই সব ছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের সংস্রবে আমার বন্ধু রমানাথ আস্ত ঝুনো নারিকেল হাতে নিয়ে নিজের মাথায় ভেঙ্গে ফেলতে পারতো—লোহার চেয়ে শক্ত তার মাথাটা; কেল্লার গোরা, লাল-বাজারের সেলার এদের দেখলে কেঁচো হয়ে থাকত। অর্ম্মস্ এ্যাক্ট ত আছে-ই, দেড়গজা লাঠি পর্য্যন্ত হাতে নিয়ে বেরুতে পুলিস কমিশনারের মানা; কিন্তু এই সব বাঙ্গালী আজ বেঁচে থাকলে আইন করতে হ'ত যে, বাঙ্গালী যখন রাস্তায় বেরুবে, তখন হাত দুখানা ও মাথাটা যেন বাড়ীতে রেখে আসে।

আর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী ছিল, হিঁদু মুসলমান—দুই-ই—বিশেষ ভদ্রঘরের নয়—যাদের লোকে বলত গোরার দালাল। তাদের ধুতি চাদর কামিজের বাহারের বিশেষ পারিপাট্য ছিল, ঘাড়-কামান চুলে কেতাদোরস্ত টেরি, মদ খেয়ে হজম করবার খুব ক্ষমতা, ছাতিতে ও কব্জিতে গোরা-দমন-শক্তি। এরা কেল্লার গোরা লাল-বাজারের সেলার নিয়ে চাঁদনীতে বাজার ক'রে দিত, মদের দোকানের হিসাব মিটিয়ে দিত, মনুমেণ্টে নিয়ে গিয়ে চড়াত, সোসাইটী কি না মিউজিয়ম, জলটুনী দেখাত, সাত-পুকুরে বেড়াতে নিয়ে যেত, দমদমা ঘুরিয়ে আনত, আর চমৎকার হাস্যরসোদ্দীপক ইংরাজী বলত; নমুনা চান? "ইউ ডগ্‌ ড্যাম গোটে হেল মাষ্টার টমি, ডোন্ গো উয়োম্যান হাউস, সো মেনি মনি সঙ্গে, দে নো যাদু মন্তর, টেক্ অল্, গিভ ইউ ফক্কা; কিপ্ টু রুপি, রিমে ণ্ডার অল গিভ মাই জিম্মে;—আন্‌ডারষ্ট্যাণ্ড জ্যাক—এই রকম আর কি। এরা এক জন দালাল কেল্লার ৫।৭টা গোরা বা সেলারকে কানে ধ'রে উঠাতে বসাতে পারত, মাঝে মাঝে ঘুসিটে ঘাসাটা খেত বটে; কিন্তু সুদসমেত শোধ দিত।

১২৭১ সালের আশ্বিন মাস পড়েছে; তখন এক রকম ভাদ্রের গোড়া থেকেই কলকাতায় পূজোর বাজার ব'সে যেত, রেল তখন এতদূর ছড়িয়ে পড়েনি, বঙ্গের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, সব দিক থেকেই বাঙ্গালী পূজোর বাজার করতে কলকাতায় আসত। পাইকার, গৃহস্থ, জমীদারের গোমস্তা, পূজাবাড়ীর লোক, সব আসত এখানে সওদা করতে। যদি এক জন আসত বাজার করতে, তার সঙ্গে ১০ জন আসত কলকাতা দেখতে, গঙ্গাস্নান করতে, কালীঘাটে পূজো দিতে। সেই সময় কলকাতার রাস্তায় বেরুলে-ই মফঃস্বলের লোকের ভিড় সবার চোখের উপর পড়ত। বাজারের প্রথম কেন্দ্র ছিল বড়বাজার, দ্বিতীয় চাঁদনী। তখন বড়বাজারে ঢুকলে মনে হ'ত না যে, কাশীর লক্ষ্মী-চৌতারায় এসে পৌঁছেছি; হয় হিঁদু, নয় মুসলমান, কিন্তু সব-ই বাঙ্গালীর দোকান। বাঙ্গালী কাপড়ওয়ালা, বাঙ্গালী জুতাওয়ালা, বাঙ্গালী ছুরি-কাঁচি বিক্রী করছে, হাতাবেড়ী, চাটু-কড়া, ঘড়া-গাড়ু, থালা-বাটী, মাদুর-পাটী, গালচে-দুলচে, সতরঞ্চি, পিঁড়ে-আসন, ঘি-চিনি, মিছরি-মোণ্ডা, ফল-পাকড়, সব-ই বাঙ্গালীতে বেচছে। খোট্টার দোকান যে ছিল না, এমন নয়, কিন্তু খুব অল্প; তারা হিন্দুস্থানী প্যাটেনের জামা, পা-জামা, ফতুয়া, টুপী, রুমাল, আতর, গোলাপ, চাটনী, মোরব্বা, বেণারসী কাপড় এই সব-ই অধিক বেচত, আর হিন্দুস্থানীদের বিশেষ কারবার ছিল হালুইকরের। লেডি ক্যানিং মিষ্টান্নের আবিষ্কারকর্ত্তা কম্বুলেটোলার পরাণে ময়রার হাতের তৈরী কচুরী গজার মতন ঐ দুটি জিনিষ এ জন্মে আর কোথাও খাবার আশা নেই। কিন্তু ঐ রকম নামজাদা দুই এক জন বাঙ্গালী ময়রার বিশেষ বিশেষ জিনিষ ছাড়া কচুরি সিঙ্গাড়া প্রভৃতি ভাজী

আর ছানা ছাড়া অন্যরকম মিঠাই সামগ্রী হিন্দুস্থানীরা যেমন প্রস্তুত করে, এমন আমরা পারি না। ক্ষীরে আমরা বেশী মজবুদ, ওরা রাবড়ীতে, দইয়ে আমরা পরস্পর টক্করা-টক্করি দিতে পারি; মোরব্বায় বীরভূম আর আচারে বসাক তাঁতিরা, হিন্দুস্থানীর কাছে হার মানে না। আর আজ, হায় রে বড়বাজার না বড়ীবাজার! আর শুধু বড়-বাজার কেন, বাঙ্গালী আজ আপনার ঘরে আপনি কাঙ্গালী। লঙ্গা শির আজ নতশির; খালি কলমবীর আর বাক্যবীর। যে দিকে চাও, প্যাগড়ী পাগড়ী আর ভাটিয়ার টুপী। কোথায় গেল সেই স' বাজারের যুগীপটি ছাতাপটি কাঁসারিপটি কাপুড়েপটি—একেবারে সব উপে গেছে! মান রেখেছেন যা দু' এক জন বাঙ্গালী "এণ্ড কোং,"·তা-ও প্রায়, দণ্ডে দণ্ডে দেখি সাইনবোর্ড বদলাচ্চে।

পূজোর গন্ধ ভাদ্রমাস থেকেই বড়বাজার থেকে ফুটে বেরিয়ে যেমন দোকানে দোকানে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমন-ই কুমারটুলীকে-ও ভরপূর মজগুল ক'রে রেখেছে। চিৎপুর রোডের মোড় থেকে-ই কুমোরটুলীর ভিতর দু-ধারে-ই প্রতিমার সাজের দোকান খুলে গেছে। মা'র মটুক আঁচলা চৌদানী কানবালা শতেশ্বরী হার বাজু বালা তাবিজ পঁইছে নথ সব জল্ জল্ করছে। তার পর প্রতিমা। কারিগররা সাজা তামাক ঢেলে রেখে প্রতিমা-গঠনে ব্যস্ত, কোথাও একমেটে, কোথাও দোমেটে, কেউ কাঠামোয় খড় জড়াচ্ছে, কেউ খড়ে মাটী লেপছে, কেউ ছাঁচে মুণ্ড গড়ছে, গামলা সরা পেতে পেতে সব রং গুলতে ব'সে গেছে, গো-বাগানের গলিতে এত প্রতিমার ঠেলাঠেলি যে, পা বাড়াবার পথ পাওয়া যায় না। **ভাবুন সহৃদয় পাঠক! যে দেশে এক দিন এত প্রতিমা-পূজা হইত, সেই দেশ বর্ব্বরতার কি কুসংস্কারে-ই না আচ্ছন্ন ছিল!**

বাঁচা গেছে, আর সে প্রতিমার ঠেলাঠেলি নেই, পূজার সেই কুরুচ্যানন্দ আর নেই। এখন কলকাতায় যাঁরা পূজো করেন—হয় পূর্ব্বপুরুষের উইলের দায়ে আর না হয় অষ্টমী পূজোর দিন সাহেবদের শ্যাম্পেন খাইয়ে সং দেখাতে—আর নয়, পূজো করে নতুন পয়সাকরা কলওয়ালারা, বাবুরা যাদের ইতর জাতি বলেন, তারা।

সেকালে কলকাতায় তিনবার তোপ পড়ত; একবার ভোরে, একবার মধ্যাহ্নে আর একবার রাত্রি ৯টায়; ৯টার তোপ পড়লে মেয়েরা বলতেন, এই ছঘড়ির তোপ পড়ল, আর হিন্দুস্থানী দরওয়ানরা, 'ব্যোমকালী কল্‌কত্তাওয়ালী' ব'লে জয়োল্লাস ক'রে উঠত। অকৃতজ্ঞ বলে, অবিবেচক আমাদিগের রাজনীতিক নেতারা কেবল বলেন, গভর্ণমেণ্ট ব্যয়-সঙ্কোচ করে না, ব্যয়সঙ্কোচ করে না, কিন্তু একবার চশমা খুলে চেয়ে দেখেন না যে, সদাশয় মিতব্যয়ী গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কলিকাতার ভোরের তোপ, পরে রেতের তোপ ও অবশেষে মধ্যাহ্নের তোপটি পর্য্যন্ত তুলে দিয়ে ভারতমাতার স্কন্ধ হ'তে কি গুরুতর ব্যয়ভার-ই না নাবিয়ে নিয়েছেন!

কিন্তু ১২৭১ সালে ভোট-ও ছিল না, ইলেকসন-ও ছিল না, কাউন্সিল-ও ছিল না, রিফরম-ও ছিল না, পলিটিক্স-ও ছিল না, লিডার-ও ছিল না; তখন অপারেশন করতেন ডাক্তাররা, কো-অপারেশন থাকত কাপি-বইয়ে, অন্ন পরশন কত্তেন সোনার বাউটি হাতে মেয়েরা নিজে, আর গবর্ণমেণ্টেরও তখন এত সুবুদ্ধি হয়নি, তাই ঐ ৭১রের শারদীয়া চতুর্থী রাত্রি শেষ হতেই ভোরের তোপ গুড়ুম ক'রে পড়ল। আমি রাস্তার ধারে ঘরে ঘুমুতে ঘুমুতে সবে নতুন শান্তিপুরে গুল-বাহার উড়ুনিখানি দ্বারা মাথায় একটি পগ্‌গ বেঁধে তাতে কলসের স্বরূপ অপরাহ্নে প্রাপ্ত আচীন চীনাম্যানের টিকিট মারা ফিতেওয়ালা চকচকে জুতো জোড়াটির একখানি পাটি গুঁজতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কেল্লার তোপ আমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়ে দিলে। "দিতে পারিস্ নি ঘাড়টা ধ'রে সেইখানে ঘসড়ে"; গঙ্গার স্নানার্থী কাচিৎ কুল-গৃহিণীকণ্ঠোচ্চারিত মহিম্নঃস্তবের এই প্রথম চরণ নিদ্রা-ভঙ্গের পরে-ই আমার বাল-কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তার পর বীজমন্ত্রের ন্যায় সমবেত অস্পষ্ট স্বর অস্ফুট উচ্চারণ গুজ্ গুজ্ গুজ্ গুজ্;—"আ মরণ, থাক্‌চেন্ থাক্‌চেন্—পেছিয়ে পড়চেন।" "ও গতরখাগী মেজ-বৌ ছুঁড়ীর কথা আর বলিস্ নে বোন্।" "যাবে না, যাবে না, মরবে না, অত দপ্প বিধেতাপুরুষ সইবে কেন?" গুজ্ গুজ্ গুজ্ গুজ্:—"আমায় আবার নেম ভঙ্গের দিন ডাল রাঁধবার ফরমাস ক'রে নেমন্তন্ন করা হয়েছে, গলায় দড়ি—গলায় দড়ি।" সঙ্গে সঙ্গে খল খল হাস্য। এইরূপ পুণ্যাকাঙ্ক্ষিণীদিগের মুখ হইতে স্তবলহরী উদ্গারিত হ'তে হ'তে কানে ঢুকল একটা অশ্লীল

কথা,"শিব ধন্য কাশী,শিব ধন্য কাশী,শিব ধন্য কাশী।" পার্শ্বের শয্যায় পিতামহ শয়ন করেছিলেন, ডেকে বল্লেম, "দাদা, শিব ধন্য কাশী ফিরচে, তা হ'লে আর ফরসা হ'তে দেরী নেই, আজ যাবার সময় টের পাইনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।" এই প্রাচীন বয়স্ক "শিব ধন্য কাশী" ছিলেন, শ্যামবাজার-বাসী একজন ভদ্র কায়স্থ; ইঁহার অবশ্য একটা কিছু নাম ছিল, আমার পূর্ণ যৌবনকাল পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন, তাঁহার পুত্রের সহিত-ও আমার পরিচয় ছিল, কিন্তু তাঁর মুখে-ও "শিব ধন্য কাশী" ভিন্ন তাঁহার পিতার অন্য নাম ব্যক্ত হইতে শুনি নাই। স্মৃতি যত অল্পবয়স পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাইতে পারে, তখন হইতে, আর তাঁর তিরোধানের সংবাদপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতাম যে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, ঝড়-বৃষ্টি যাই হৌক, রাত্রি ৪টা বাজিলেই প্রত্যহ শুনিব যে, সেই লোক গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন "শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী," আর ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিতেছেন "শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী।" কাশীপতি বিশ্বনাথ যদি "শিব ধন্য কাশী"র" অন্তিমকালে কাশী-মিত্রের ঘাটে আসিয়া তাঁহার কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম না দিয়া গিয়া থাকেন,তবে তাঁহার কাশী-ও মিথ্যা,মণিকর্ণিকা-ও মিথ্যা আর তিনি-ও মিথ্যা!

কু—উ—উ—উ—ও ও ও র—ঘ—টি—তো —ও—ও —লা—আ—আ—আ—আ। "ও দাদা, ঘটিতোলা বেরিয়েছে, তবে এখনও ফরসা হোল না কেন?" এই কূয়ার ঘটিতোলাটি তখন কলিকাতার প্রত্যেক গৃহস্থের এক জন অতি পরিচিত ও প্রার্থিত অতিথি ছিল। যখন পতিত-পাবনী সুরধুনী পলতার বালুকাকুণ্ডে স্নান করত অমলা হইয়া কল-নল-বাহিনীরূপে কলিকাতাবাসীর গৃহে গৃহে প্রবেশলাভ করেন নাই, তখন সকল বাড়ীতেই এক, দুই বা ততোঽধিক কূপ ছিল। কূপজলেই গৃহস্থালীর সকল কার্য্য-ই নির্ব্বাহিত হইত; স্নান করাবার জন্য মা বাড়ীতে আসতেন না, তবে কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে দিব্যি ক'রে গা ধুইয়ে দিতেন; আর উড়ে ভারীরা পানের জল বাড়ীতে এনে বিক্রী ক'রে যেত। বাবুরা বিক্রী শুনে ভয় পাবেন না, "কত ক'রে গ্যালন রে বাপু!" এক ভারে দু কলসী জল গঙ্গার তীর থেকে কম্বুলেটোলার মোড় পর্য্যন্ত সাধারণতঃ এক পয়সা, কখনও কখনও দুই পয়সা, বড় জোর তিন পয়সা, আর নয়। আজকাল পূজাপার্ব্বণে দরজার পাশে যে পূর্ণকলস বসান, সেই মাপের কলসীর অন্ততঃ ৫।৬ কলসী জল উড়ে ভারীর এক এক কলসীতে ধরত। সকল গৃহস্থবাড়ীতে-ই সঙ্গতি বুঝে ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তনের এক একটি জলের ঘর ছিল। বড় বড় মাটীর জালা সব সেই ঘরে বসান থাকত, তাইতে খাবার জল জমা হ'ত; বাইরে রান্নাঘরের কাছে একটা মাঝারি বা ছোট জালা থাকত, তাহা নিত্যকার ব্যবহারের জন্য। পানীয় জল সঞ্চয় করবার প্রশস্ত সময় ছিল, মাঘ মাস। ঐ সময় গঙ্গার জল অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদু হয়; এখানকার গঙ্গার জল প্রায় চৈত্র মাসের শেষ হইতে-ই আষাঢ়ের বর্ষা নামিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লবণাক্ত হ'ত, তার পর আবার শ্রাবণের ঢল নামিলে বড় মলিন হ'ত, সেই জন্য ঐ মাঘ মাসে জলসংগ্রহ। কিন্তু সকল ঋতুতেই দশমী তিথিতে গঙ্গাজল কোনরূপে লবণাক্ত থাকে না। সেই জন্য বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দশমীর দিন গৃহস্থরা খালি জালা আবার পূর্ণ করিয়া নিতেন। কেরাণীর যেমন 'মেল ডে,' যাজক ব্রাহ্মণের লক্ষ্মী-পূজার বার, ভারীর-ও পক্ষে তেমন-ই দশমী তিথি ছিল, ভারীর মেজাজ সে দিন জোর ভারী। তিন পয়সা পর্য্যন্ত ভারের দর উঠে পড়ত। এই জল বৎসরাবধি থাকলেও কোনরূপ নষ্ট হ'ত না,—একটা পোকাও দেখা দিত না, ফিল্টার করা কলের জল ৪৮ ঘণ্টা কুঁজোয় থাকলে জীবাণু ভূমিলতায় পরিণতা হয়। বাড়ীর মেয়েরা এবং ঝিয়েরা একটা রাসায়নিক Germecide জানত, তার নাম ফট্‌কিরি, একটু গুঁড়িয়ে জলের ভিতর ফেলে দিলে অথবা বেণের দোকান থেকে এক পয়সার নির্ম্মালি ফল কিনে এনে ঘসে জলের ভিতর দিলে জলের সব কাদা কেটে তলায় জমে যেত; সে কাদাটুকু-ও কেউ ফেলতেন না, পেট ফাঁপলে বা প্রস্রাব বন্ধ হ'লে জালার তলার পাঁক একটু তলপেটে লাগিয়ে দিলে অল্পক্ষণেই উপশম হ'ত; এখনও বাড়ীতে যদি কারুর ও রকম অবস্থা হয়, তা হ'লে যতক্ষণ না ডাক্তারখানা থেকে ইন্‌জেক্‌শন এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ ঐ রিজেক্‌সনটুকু ব্যবহার ক'রে দেখবেন দেখি।

দুঃখের জ্বালায় দেশের বাস্তু কুঁড়ে থেকে ছটকে বেরিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে কেউ কল্‌কাতায় এলে নিঃসম্বলে জীবিকা অর্জ্জনের প্রথম সুন্দর সোপান ছিল ঐ কূয়ার ঘটি-তোলার কায। কোমরে একখানি আট হাতি ধুতি, কাঁধে একখানি আড়াই হাত গামছা, এই হ'ল ক্যাপিটাল। ভোর না হ'তেই পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বেলা ১০।১১টা পর্য্যন্ত "কূয়োর ঘটি তোলা" ডেকে বেড়াত। দড়ী ছিঁড়ে জলতোলা ঘটি, মেয়েদের আঁচলে রিংএ বাঁধা চাবি-গোছা, ছেলেদের পিতলের খেলনা, এই রকম একটা না একটা জিনিষ, আজ আমার বাড়ী, কা'ল তোমার বাড়ী, পরশু ওঁর বাড়ী প্রায়-ই না প্রায় পাতকূয়ার ভিতর প'ড়ে যেত, আর বাড়ীর লোকরা কূয়োর ঘটিতোলার ডাক শুনবার জন্য কানখাড়া ক'রে থাকতেন। ঘটিতোলা বাড়ী ঢুকে-ই পরণের কাপড়খানি রেখে কাঁধের গামছাখানি কোমরে জড়িয়ে বাঁ হাতের চেটোখানি কোষ ক'রে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াত, মেয়েরা হাতে এক পলা তেল ঢেলে দিতেন, ঘটিতোলা ডানহাতের আঙ্গুলে ক'রে দুই নাকে আর কানের ভিতর দিয়ে বাঁহাতের চেটোটা ব্রহ্মতেলোয় বুলিয়ে নিয়ে পাড় বেয়ে বেয়ে পাতকূয়ার নীচে গিয়ে মারত এক ডুব, আর আমরা ছেলেরা কূয়ার পাড়ের চারি ধারে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, মিনিটখানেক না যেতে যেতে সেই ঘটিতোলা ঘটি বা চাবির গোছা হাতে ক'রে ভুস্ ক'রে ভেসে উঠত, আমরা একেবারে হাঁক ছেড়ে আহ্লাদে আটখানা, মজুরী ছিল ঘটি পিছু এক পয়সা, চাবির গোছা দু'পয়সা। বর্ষায় জল কাণায় কাণায় হ'লে বা পাতকূয়ার ভিতর বেশী পাঁক জমে থাকলে তিন পয়সা, চার পয়সা বা আরও কিছু বেশী দিতে হোত; বিশেষ দরকারী চাবি, সোনার আংটী, চরণচুটকি এই রকম সব দামী জিনিষ উদ্ধার করতে পারলে বার আনা থেকে এক টাকা পর্য্যন্ত বক্‌সিসের বন্দোবস্ত হোত। কুলজ্ঞ ঠাকুররা নির্ব্বংশ হয়েছেন, নইলে বর্ত্তমান অনেক রায় চৌধুরী রায় বাহাদুরের ঘটিতোলা পূর্ব্বপুরুষ বা'র হয়ে পড়ত; কত নীচু থেকে কত উঁচুতে উঠা গেছে, একটা গর্ব্বের পরিচয়, মনুষ্যত্বের কথা; কিন্তু এখন রাস্তায় রাস্তায় উকীল মোক্তার খরচা জমা দিলেই ডিফারমেশনের শমন। আমাদের পাড়ার ঘটিতোলা গুরুচরণ এই মনুষ্যত্বের—এই গৌরবের অধিকারী হয়েছিল কি না, এই পাঁজির পাতা উল্টাতে উল্টাতে যদি আবার তার সাক্ষাৎ পাই, তবে অনুসন্ধান নেব।

আমাদের গুরুচরণ বললেম; ঘটিটা আসটা পাতকূয়ার ভিতর প'ড়ে গেলে সে বাড়ীতে ঢুকত, পাঁচ মিনিটে কায সেরে চ'লে যেত, কথায় কথায় কি রকমে তার নামটা কানে ঢুকেছিল এইমাত্র পরিচয়, বাড়ীর সামনে দিয়ে নিত্য আওয়াজ দিয়ে যায়, তবু সে আমাদের ঘটিতোলা গুরুচরণ। তখন আমরা বাঙ্গালীরা ছোট ছিলুম, বড় হয়নি, ভারত-প্রাণ হয়নি, পল্লী-প্রাণ ছিলুম, তাই পাড়ার মুদী ছিল আমাদের মুদী, পাড়ার মুড়িওয়ালা আমাদের মুড়িওয়ালা, পাড়ার কাঠওয়ালা সোনাউল্লা আমাদের সোনাউল্লা, পাড়ার পাল্কী-বেহারা উড়ে আমাদের ভাগবৎ সর্দ্দার; নিত্য যে দাড়ীওয়ালা লোকটি চানাচুর হেঁকে যেত, সে আমাদের চানাচুরওয়ালা, জয় রাধাকৃষ্ণ ব'লে বাটি হাতে যে স্ত্রীলোকগুলি ভিক্ষা করতে বাড়ী আসতেন, তাঁরা আমাদের বৈষ্ণবী, বসন্তকাটা মুখ একটি দীর্ঘাকৃতি অন্ধ লাঠিহাতে বেলা ৮টার সময় আমাদের দোরের সামনে দিয়ে "হে দীননাথ, হে মধুসূদন," ব'লে ভিক্ষা করতে করতে চ'লে যেত, দুদিন তাকে না দেখলে জিজ্ঞাসা করতেম, "দাদা, দীননাথের কি ব্যামো হয়েছে, দুদিন তাকে দেখিনি কেন?" এইরূপ পল্লীর ভিতর বা বাড়ীতে প্রায় নিত্য যাদের দেখতেম, কি ইতর কি ভদ্র, তারা ছিল আমাদের আপনার লোক। হা রে ক্ষুদ্র মন! 'লঙ্কাতে রাবণ ম'ল, বেউলা কেঁদে ব্যাকুল হ'ল' ভারত-ভক্তির এ বীজমন্ত্র আমি কি ঠাকুরদাদা কেহ-ই শিক্ষা করিনি।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

খুড়ার কাণ্ড

১

বিপিন মিত্তিরের ছেলে অনুকূল মিত্তির দুইটা পাশ করিয়া যখন দেশে আসিয়া বসিল, তখন গ্রামের অনেকেই আশা করিল, এই দুইটা পাশ-করা যুবকটির দ্বারা দেশের এত উন্নতি সাধিত হইবে, যেরূপ উন্নতি কেহ কখন আশা করে নাই। এই আশাতীত উন্নতিদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গ্রামের লোক যখন উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তখন বুড়া নবীন চৌধুরী তাহাদের আকাঙ্ক্ষা-ব্যাকুল চিত্তকে সহসা নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন করিয়া দিয়া প্রচার করিলেন যে, অনুকূল মিত্তিরের দিকে চাহিয়া তাহারা যে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছে, তাহা অলীক অশ্বডিম্ববৎ কখনও কাহারও প্রত্যক্ষীভূত হইবে না, ইহা চৌধুরী মহাশয় শপথপূর্ব্বক বলিতে পারেন।

চৌধুরী মহাশয় অকারণ এরূপ শপথবাণী প্রচার করেন নাই। অনুকূল মিত্তিরের বিদ্যাবত্তার খ্যাতিশ্রবণে এক দিন তিনি কয়েকখানা জটিল দলীল ও মোকদ্দমার কাগজপত্র লইয়া অনুকূলের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেগুলা বুঝাইয়া দিবার জন্য অনুকূলকে অনুরোধ করিলেন। অনুকূল সে সকল দলীল বা মোকদ্দমার কাগজের মর্ম্ম চৌধুরী মহাশয়কে বুঝাইয়া দিতে ত পারিলই না, অধিকন্তু সে মামলা-মোকদ্দমা বা বিবাদ-বিসংবাদের বিরুদ্ধে এমন সকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল, যাহা শুনিয়া মামলাবাজ চৌধুরী মহাশয় হাস্যসংবরণে অসমর্থ হইলেন। হরি হরি, লোকে এই ছেলের বিদ্যার বড়াই করে! তুচ্ছ একটা দলীল, সামান্য মুন্সেফের এমন সোজা রায় বুঝাইয়া দিতে পারে না; ইহার উপর মামলা-মোকদ্দমা যার-পর-নাই নিন্দিত কার্য্য বলিয়া বিজ্ঞতা দেখাইতে চায়? মামলা করিয়া চৌধুরী মহাশয় মাথার চুল পাকাইলেন, এবং এই মামলার জোরে মাঠের প্রায় অর্দ্ধেক জমী নিষ্কর করিয়া লইলেন; তাঁহাকে আজ কি না এই বাইশ বছরের ছোকরা মামলা-মোকদ্দমা গর্হিত কায বলিয়া বুঝাইয়া দিতে সাহসী হয়? মূর্খ—মূর্খ, গণ্ডমূর্খ! ইহার বিদ্যাশিক্ষা মিথ্যা, পাশ মিথ্যা, পাশের গৌরব মিথ্যা! বিনোদ মিত্তির ভাইপোকে পাশ করাইবার জন্য এত টাকা খরচ করিয়া টাকাগুলা জলে ফেলিয়া দিয়াছে!

চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্যশ্রবণে লোকে যার-পর-নাই বিস্ময় অনুভব করিল, অথচ এই প্রবীণ লোকটির কথায় সহসা অবিশ্বাস করিতেও পারিল না। যাহারা গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সার্টিফিকেটের দোহাই দিয়া অবিশ্বাস প্রকাশ করিল, চৌধুরী মহাশয় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, ঘুষ দিলে এমন দুই পাঁচ শত সার্টিফিকেট তিনি আনিয়া দিতে পারেন।

ঘুষ দিলে পাশের সার্টিফিকেট পাওয়া যায় কি না, সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ থাকিলেও অনুকূলের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ উপস্থিত হইল। কেন না, চৌধুরী মহাশয় ছাড়া অধ্যাপক রামধন শিরোমণিও মতপ্রকাশ করিলেন যে, অনুকূল মিত্তিরের মত মূর্খ চরাতে আর একটিও নাই; তাহার কিছুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলে সে কি শাস্ত্রবাক্যের উপর কথা কহিতে পারে?

বাস্তবিকই অনুকূল শাস্ত্রবাক্যের উপর নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া মূর্খতার পরিচয় দিয়াছিল। গোপাল ঘোষ দুই বৎসরকাল ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া হঠাৎ এক দিন মারা গেলে তাহার বিধবা স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যখন স্বজাতিদের দ্বারে কাঁদিয়া পড়িল, তখন স্বজাতিরা বিনাপ্রায়শ্চিত্তে গোপাল ঘোষের শব স্পর্শ করিতে সাহসী হইল না। কেন না, অনেক দিন আগে গোপাল ঘোষ নবীন চৌধুরীর অনাথা ভ্রাতৃবধূকে স্বগৃহে স্থানদান করিয়াছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভ্রাতৃবধূ সম্পত্তির অংশ পাইবার দাবী করিলে নবীন চৌধুরী তাহাকে কুলটা অপবাদ দিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। গোপাল ঘোষ সেই অনাথা রমণীকে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়া সে যাহাতে স্বীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে ত্রুটী করে নাই। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হয় নাই, এবং সেই বিধবাও অগত্যা কলিকাতায় গিয়া এক ভদ্র কায়স্থের গৃহে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সে চলিয়া গেলেও

গোপাল ঘোষের উপর কিন্তু চৌধুরী মহাশয়ের রাগ যায় নাই; তিনি মামলা-মোকদ্দমা করিয়া গোপাল ঘোষের যে দুই চারি বিঘা জমী ছিল, তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই। সেই রাগের বশে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এক্ষণে মত প্রকাশ করিলেন যে, কুলটার সংস্রবে গোপাল ঘোষ পতিত হইয়াছে; সুতরাং যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করিলে কেহ তাহার শব স্পর্শ করিতে পারিবে না।

তখন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জানিবার জন্য সকলে রামধন শিরোমণির শরণাপন্ন হইল। শিরোমণি মহাশয় পুঁথি ঘাঁটিয়া, শাস্ত্রীয় বচনের আবৃত্তি করিয়া প্রায়শ্চিত্তের যে ব্যবস্থা দিলেন, গোপাল ঘোষের ঘটী বাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেও প্রায়শ্চিত্তের কড়ির সঙ্কুলান হইবে না। অগত্যা গোপাল ঘোষের বিধবা পত্নী উঠানের ধূলায় পড়িয়া করুণ আর্ত্তনাদে প্রতিবেশীদের দয়া আকর্ষণ করিতে চেষ্টিত হইল। প্রতিবেশীরা তাহার এই নিষ্ফল চীৎকারে বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহ অর্গলবদ্ধ করিল।

বিধবার কান্না শুনিয়া অনুকূল তথায় উপস্থিত হইল, এবং শাস্ত্রবাক্য না মানিয়া, খুড়া বিনোদ মিস্তিরের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, পাড়ার জনকয়েক ছোঁড়াকে লইয়া গোপাল ঘোষের দাহকার্য্য সম্পন্ন করিল। তাহার এই শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যে সমাজ গর্জ্জিয়া উঠিল, গ্রামের লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল. শিরোমণি মহাশয় অধর্ম্মের পূর্ণ অভ্যুত্থানদর্শনে দুর্গা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অনুকূলের মা-বাপ ছিল না, খুড়া বিনোদ মিস্তিরই তাহাকে মানুষ করিয়াছিলেন, এবং লিখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ভ্রাতুষ্পুত্রের এই শাস্ত্র ও সমাজবিগর্হিত কার্য্যে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেও সে বিরক্তিটুকু প্রকাশ করিতে পারিলেন না; চৌধুরী মহাশয়কে বহু স্তবস্তুতি করিয়া, পাঁচ জনের নিকট ক্ষমা চাহিয়া তিনি এ যাত্রা অনুকূলকে সমাজের কোপাগ্নি হইতে রক্ষা করিলেন।

সমাজের কোপ হইতে অনুকূল অব্যাহতি লাভ করিল বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞানবুদ্ধি যে কিছুমাত্র নাই, লোকের মন হইতে এ সন্দেহ কিছুতেই তিরোহিত হইল না। লোকের সন্দেহ অবগত হইয়া বিনোদ মিস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। অনেক আশা করিয়া তিনি ভাইপোকে মানুষ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুকূল যে লিখাপড়া শিখিয়া এমন মূর্খ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা কে জানিত। সকলই অদৃষ্ট!

২

"হাঁ রে অনু!"

"কেন গা খুড়ীমা?"

"তুই নাকি বিয়ে করবি না বলেছিস্?"

"তা বলেছি বটে।"

"কেন বিয়ে করবি না, বল্ দেখি?"

"বিয়ে ক'রে কি হবে?"

অনুকূলের কথায় যেন খুব বিস্ময় অনুভব করিয়া খুড়ীমা বলিলেন, "শোন একবার ছেলের কথা! বিয়ে করলে ছেলেপিলে হবে, সংসারী হবি।"

সহাস্যে অনুকূল বলিল, "তা হ'লে এখন কি সন্ন্যাসী আছি খুড়ীমা?"

গম্ভীরমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "সন্ন্যাসী থাকতে যাবি কেন? বালাই! তবে চিরকাল কি এই রকম আইবুড়ো থাক্‌বি?"

"থাকলে দোষ কি তাতে?"

"দোষ নাই আবার? লোকে নিন্দে করবে, বাপ পিতামোর নাম ডুবে যাবে। আমাদেরি বা লোকে বলবে কি? বলবে ছেলেটার মা-বাপ নাই ব'লে তার বিয়ে দিলে না।"

"আমি সকলকে বুঝিয়ে বলবো যে, তোমাদের কোন দোষ নাই, আমি নিজেই বিয়ে কচ্চি না।"

সস্নেহ তিরস্কারের স্বরে খুড়ীমা বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তোমাকে এত বুঝিয়ে বলতে হবে না।"

"তবে কি করবো?"

"কি করবি আবার, বিয়ে করবি।"

অনুকূল নীরবে মৃদুহাস্য করিল। খুড়ীমা বলিলেন, "আচ্ছা, সত্যি ক'রে বল্ দেখি, কেন বিয়ে করবি না। মেয়ে পছন্দ হয় না?"

সলজ্জ হাস্যসহকারে অনুকূল উত্তর দিল, "না।"

খুড়ীমা বলিলেন, "কেন, উনি তো বলেন, মেয়ে খুব চমৎকার সুন্দরী।"

নতমুখে ঘাড় দোলাইয়া অনুকূল বলিল, "সুন্দরী ব'লেই পছন্দ হয় না।"

ভারীমুখে খুড়ীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কালো কুচ্ছিত হ'লেই পছন্দ হয় নাকি?"

মৃদুহাস্যসহকারে অনুকূল বলিল, "তা হয়।"

খুড়ীমাও একটু হাসিলেন; বলিলেন, "ভাল, তাই না হয় কালো কুচ্ছিত মেয়েই দেখতে বলবো।"

"তাই ব'লো, আমি এখন আসি।"

"কোথায় যাবি আবার?"

"কায আছে।"

"কায তো তোর রাতদিনই রয়েছে। হাঁ রে অনু, এত সব বাজে কায নিয়ে ঘুরে বেড়াস্ কেন বল্ তো?"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করিল, কোন্‌গুলো বাজে কায খুড়ীমা?"

খুড়ীমা বলিলেন, "তোর সব কাযই বাজে কায! কোথায় কুড়ুল ঘাড়ে ক'রে বন-বাদাড় কাটচিস্, পচা পুকুরে নেমে পানা তুলতে আরম্ভ করেছিস্, কাদের ঘরাঘরি ঝগড়া বেধেছে, সে ঝগড়া মিটিয়ে দিতে তুই মোড়লী কচ্ছিস্।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল বলিল, "এ সকল কায কি বাজে কায খুড়ীমা?"

ভারীমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "বাজে কায নয় তো কি? এ সব কাযে তোর লাভটা কি শুনি।"

অনু। লাভ আছে বৈ কি। তুমি এই বাড়ীখানাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখ কেন খুড়ীমা?"

খুড়ী। এই বাড়ীতে বাস কত্তে হবে, একে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবো না?

অনু। আমিও তেমনি এই দেশে বাস কত্তে হবে ব'লে দেশটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কচ্চি।

খুড়ী। তুই কি এই সারা দেশটাতেই বাস করবি?

অনু। তুমি কি এই সমস্ত বাড়ীখানাতেই বাস কর? শুধু থাকবার ঘরটি পরিষ্কার করলেই তো পার। সমস্ত বাড়ীখানা, যায় বাড়ীর পিছন পর্য্যন্ত পরিষ্কার কত্তে যাও কেন?

ঝঙ্কার দিয়া খুড়ীমা বলিলেন, "আমি তোর সঙ্গে তর্ক কত্তে পারবো না। তা তুই একা এই গাঁয়ে বাস করবি, না দেশের আরও সব লোক গাঁয়ে বাস করে? তারা তো কৈ এ রকম বাজে কায নিয়ে ঘোরে না?"

অনুকূল বলিল, "দেশটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে যে বাস কত্তে হয়, এ কথা তারা বোঝে না।"

কৃত্রিম ক্রোধগম্ভীর স্বরে খুড়ীমা বলিলেন, "কেউ কিচ্ছু বোঝে না, বুঝিস্ যা কিছু তুই নিজে। সবাই চিরকাল এই গাঁয়ে বাস ক'রে আসছে, তুই তাকে পরিষ্কার না করলে বাস কত্তে পারবি না।"

ঈষৎ হাসিয়া অনুকূল বলিল, "সকলের রুচি সমান নয় খুড়ীমা। সে দিন নদী থেকে নেয়ে আসতে বাগ্দীদের ঘর দেখে তুমি নাক সেঁট্‌কালে কেন বল দেখি?"

খুড়ীমা বলিলেন, "সাধে নাক সেঁট্‌কাই! তাদের ঘর-দোরের যে ছিরি!"

অনু। তুমি সে ঘরে বাস কত্তে পার?

খুড়ী। রামঃ রামঃ, তেমন নোংরা ঘরে মানুষে বাস কত্তে পারে?

অনু। তা হ'লে বাগ্দীরা কি মানুষ নয়? তারা তো স্বচ্ছন্দে সে ঘরে বাস করে। তারা যখন বাস কত্তে পারে, তখন তুমি পারবে না কেন?

মুখ মচ্‌কাইয়া খুড়ীমা বলিলেন, "কে জানে বাছা, তারা সব কি ক'রে তেমন ঘরে বাস করে। আমি তো সেখানে এক দণ্ডও থাকতে পারবো না।"

হাসিতে হাসিতে অনুকূল বলিল, "তবেই বোঝ খুড়ীমা, দেশের আর সব লোক এই জঙ্গলভরা, পানাপুকুরে ঘেরা গাঁয়ে বাস ক'রে ম্যালেরিয়ায় ভুগ্‌বে ব'লে আমাকেও যে তাদের সঙ্গে ভুগ্‌তে হবে, এমন কোন কথা আছে কি?"

তর্কে পরাস্ত হইয়া খুড়ীমা বলিলেন, "কে জানে বাছা, তুই যা ভাল বুঝিস্, তাই করবি। তবে উনি দুঃখু করেন, অনু লিখাপড়া শিখে যদি এই সব বাজে কায নিয়ে বেড়ায়, তা হ'লে সংসার চলবে কিসে?"

অনুকূল বলিল, "কাকা যদি শুধু পয়সা উপায়ের তরে আমাকে লিখাপড়া শিখিয়ে থাকেন, তা হ'লে তিনি আমার পেছনে যে পয়সা খরচ করেছেন, সেগুলো বাজে খরচ হয়ে গিয়েছে। আর যদি আমাকে মানুষ করবার জন্য লিখাপড়া শিখিয়ে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে বলো, আমি

মানুষের মত কায ক'রে তাঁর পয়সাগুলো যে জলে যায়নি, তা দেখিয়ে দিব।"

অনুকূল চলিয়া গেল। খুড়ীমা অনুকূলের ব্যবহারে বিরক্ত স্বামীকে কিরূপে বুঝাইয়া প্রসন্ন করিবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন।

৩

বাস্তবিক অনুকূল এমন কতকগুলা কায লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহাকে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বাজে কায ছাড়া আর কিছু বলিতে পারে না এবং তাহার এই সকল কাযের জন্য শুধু কাকা বিনোদ মিত্তির নহে, গ্রামের বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ভাবী উন্নতিসম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল।

গ্রামে বনজঙ্গল চিরকালই আছে, চিরকালই পুকুরে পানা জমিয়া থাকে, এবং পানা-পুকুরের জল পান করিয়াই আগেকার লোকরা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখন কলির প্রাদুর্ভাবে মানব স্বল্পায়ুঃ স্বল্পভোগী হইয়াছে, কাযেই ম্যালেরিয়া আসিয়া দেখা দিয়াছে, বছর বছর মহামারী আসিয়া গ্রাম উজাড় করিয়া দিতেছে, লোক চল্লিশ বৎসর বয়সেই ইহলীলা শেষ করিয়া সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে। বিধাতার এই অলঙ্ঘ্য বিধানের প্রতিরোধ কে করিবে? অনুকূল কিন্তু দেশে আসিয়াই প্রচার করিল, এই বিধাতৃ-বিহিত বিধানের প্রতিরোধ করিতে হইবে;—গ্রামের বন-জঙ্গল কাটিয়া, পুকুর-ডোবার পানা তুলিয়া দিয়া, পানীয় জলের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া, ম্যালেরিয়াকে দূরীভূত করিতে হইবে, বিধাতার কলমের উপর কলম চালাইতে হইবে। আরে পাগল, রোগ-ব্যাধি কি মানুষের হাত! জীবন-মরণ কি মানুষের চেষ্টার উপরে নির্ভর করে? "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" এই ভগবদুক্তির অন্যথাচরণ কে করিতে পারে? অনুকূলকে এই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট নিশ্চিত মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া নবীন চৌধুরীপ্রমুখ প্রবীণগণ হাসিয়াই আকুল হইলেন, অনেকে তাহাকে পাগল আখ্যা দিলেন, রামধন শিরোমণি ইংরাজী শিক্ষার দোষ দেখাইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অনুকূল কিন্তু কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; অনেক উপদেশেও গ্রামের লোক যখন তাহার মতে মত দিল না, বা তাহার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না, তখন সে নিজেই পাড়ার জন কয়েক ছোকরাকে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। নিজে কুড়ুল ধরিয়া বন-জঙ্গল কাটিতে আরম্ভ করিল, পুকুরে নামিয়া পানা-জঙ্গল পরিষ্কার করিতে লাগিল, গ্রামের দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা নিঃস্ব লোকদিগের বিপদে সাহায্যের ব্যবস্থা করিল।

এই সকল কায কিন্তু নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইল না। বাড়ীর পাশের জঙ্গল কাটিতে গেলে কেহ কেহ জঙ্গল কাটিতে দিবে না বলিয়া প্রতিবাদ করিল, পুকুরের পানা তুলিতে গেলে অনেকে আপত্তি দেখাইয়া বলিল, পুকুর পরিষ্কার থাকিলে অপরে মাছ ধরিয়া লইতে পারে। চাষীরা গ্রামের বাহিরে খালে পাট পচাইতে যাইবার কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত হইল না। অনুকূল কাহাকেও মিনতি করিয়া, কাহাকেও বা আইনের ভয় দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে লাগিল।

কিন্তু এমন দুই এক জন ছিল, যাহারা আইনের ভয় করে না এবং কাকুতি-মিনতিও শোনে না। তাহাদিগকে বাধ্য করা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া উঠিল। গ্রামে নবীন চৌধুরীর পুকুর ও বাগান-বাগিচা বিস্তর এবং তাহাদের অধিকাংশই জঙ্গলে ভরা। অনুকূল তাহাদের জঙ্গল পরিষ্কারে উদ্যত হইলে চৌধুরী মহাশয় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার বিনা হুকুমে যে আমার বাগানে ঢুকবে বা পুকুরে নামবে, তার মাথা আস্ত রাখবো না।"

অনুকূল বলিল, "আমরা আপনার বাগানে ঢুকতে চাই না, আপনি নিজেই বাগান সাফ ক'রে দিন।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "আমি যখন দরকার বুঝবো, তখন সাফ করবো, তোমার হুকুমে কায কত্তে পারবো না।"

অনুকূল বুঝিল, আইনের সাহায্যগ্রহণ ব্যতীত এ স্থলে কার্য্যোদ্ধার সম্ভবপর নহে।

আইনের সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছা থাকিলেও তখন সে সাহায্য লওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামের মাঝখানে একটা বড় পুকুর ছিল। পুকুরটা চৌধুরী মহাশয়ের এবং তাহার জল গ্রামের অধিকাংশ লোকই পান করিত। লোক শুধু পানার্থেই তাহার জল ব্যবহার

করিত না, জলকে দূষিত করিবার যত প্রকার উপায় থাকিতে পারে, সেই সকল উপায় প্রয়োগেই সেই পুষ্করিণীর জলকে দূষিতও করিত। অনুকূল পানীয় জলকে এরূপে দূষিত করিবার ভয়াবহ পরিণাম সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেও কেহই তাহার উপদেশমত কার্য্য করিল না। জল নারায়ণ, তাহা কি কখনও দূষিত হইতে পারে? সুতরাং সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে জলরূপী নারায়ণকে নানা প্রকারে দূষিত করিতে লাগিল। দেখিয়া অনুকূল চিন্তিত হইল।

পরিশেষে বাধ্য হইয়া অনুকূলকে আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল; সে বহু কষ্টে কয়েক জন অধিবাসীর সহি লইয়া পানীয় জলের নির্দ্দিষ্ট পুষ্করিণীর (রিজার্ভ ট্যাঙ্কের) জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিল।

৪

বিনোদ মিত্তির গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুনেছ গা, তোমার অনুকূল কি কাণ্ডটা বাধিয়ে বসেছে।"

শঙ্কিতভাবে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গো, সে কি করেছে আবার?"

ক্রুদ্ধভাবে বিনোদ বলিলেন, "করেছে আমার শ্রাদ্ধ। নবীন চৌধুরীর বড় পুকুরটাকে কোম্পানীর হাতে তুলে দেবার জন্য মেজেষ্টরের কাছে দরখাস্ত করেছে।"

গৃহিণী কিছু বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হবে কি?"

বিনোদ বলিলেন, "তাতে পুকুরটা কোম্পানীর হাওলে থাকবে। কেউ ও পুকুরে নাম্‌তে পারবে না, ওর জল ছুঁতে পারবে না, ছুঁলেই তাকে ধ'রে নিয়ে যাবে।

গৃহি। কে ধ'রে নিয়ে যাবে?

বিনো। পুলিশের লোক।

ভয়ে শিহরিয়া গৃহিণী বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! কেন এমন কায করলে গো?"

বিনোদ বলিলেন, "বলে, এতে দেশের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।"

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, দেশ দেশ ক'রেই হতভাগা পাগল হ'লো।"

চিন্তাগম্ভীর মুখে বিনোদ বলিলেন, "পাগল হ'লে ত কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যে ফ্যাসাদ বাধিয়ে তুলেছে, —নবীন চৌধুরী কি সহজে ছাড়বে মনে কর।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কি ছাড়ে?"

গম্ভীরভাবে মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক বিনোদ বলিলেন, "আমি কিন্তু এ সব ফ্যাসাদে মাথা দিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি। নবীন চৌধুরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করা আমার কর্ম্ম নয়। আর এরকম অন্যায় ঝগড়া কত্তেই বা যাব কেন? তাতে তুমি আমাকে ভালই বল আর মন্দই বল।"

চিন্তিতভাবে গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু তুমি চুপ ক'রে থাকৃতে পারবে কি?"

দৃঢ়স্বরে বিনোদ বলিলেন, "কেন পারবো না? না পারলে নবীন চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পথে বসবো না কি? দেখলে না, ওর সঙ্গে মামলা ক'রে গোপাল ঘোষকে সর্ব্বস্বান্ত হ'তে হ'লো। আমাকেও কি তাই হ'তে বল?"

গৃহিণী বলিলেন, "তাই কি আমি বল্‌ছি। তবে ভালই করুক, আর মন্দই করুক, তোমার ভায়ের ছেলে—ভাইপো; ও বিপদে পড়লে তুমি কক্ষনো নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না।"

মুখভঙ্গী করিয়া বিনোদ বলিলেন, "নাঃ, ভাইপো ব'লে ওর সঙ্গে আমাকে ফাঁসী যেতে হবে! আমার গুরুঠাকুর কি না। পেটের খোরাক বেচে দু'টো পাশ করালুম, ভেবেছিলাম, দু'পয়সা ঘরে আনবে। তা নয়, পাশ ক'রে গাঁয়ের মশা তাড়াতে এলো। কি বলবো, বড় গিন্নী মরবার সময় কাঁদতে কাঁদতে দু'টো হাতে ধ'রে স'পে দিয়ে গিয়েছিল, তা নইলে বুঝিয়ে দিতাম, আমি কেমন খুড়ো, আর ও কেমন ভাইপো।"

রাগে মুখখানাকে অন্ধকার করিয়া বিনোদ হুঁকা-কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে বসিলেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনুকে যে দেখ্‌তে আসবার কথা ছিল, তার কি হ'লো?"

গম্ভীরমুখে বিনোদ বলিলেন, "হবে আবার কি? তারা ত সোমবারে দেখতে আসবে। শুধু দেখতে আসা নয়, একেবারে আশীর্ব্বাদ—বিয়ের দিন স্থির ক'রে যাবে। আমি কি নিশ্চিন্ত আছি মনে কর? এই মাসের মধ্যেই যাতে বিয়েটা হয়ে যায়, তার চেষ্টায় আছি।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন ?"

গৃহিণীর মুখের উপর তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিনোদ বলিলেন, "কেন, তা বুঝতে পাচ্চো না ? সংসারের কোন ভাবনা-চিন্তাই নাই, ছাড়া গরুর মত দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্চে, এখন ঘাড়ে একবার বোঝা চাপাতে পারলে হয়, তখন দেখবো, বাছাধন কি ক'রে মশা তাড়িয়ে বেড়ায়।"

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন, "একটা মেয়েমানুষ এতই ভারী বোঝা না কি ?"

ঈষৎ হাসিয়া বিনোদ উত্তর করিলেন, "ভারী কি হাল্‌কা, যার ঘাড়ে এ বোঝা পড়েছে, সেই বুঝেছে। অনুকূল বাবাজিকেও এবার সেটা বুঝিয়ে দেব। তবে তাড়াতাড়িতে হ'লো কি জান, বানী তেমন পোষাল না, মোটে দেড় হাজার। তা হোক, বৌ কিন্তু মনের মত হবে, হাজারে একটি সুন্দরী।"

গৃহি। তুমি ত সুন্দরী দেখে বৌ পছন্দ করচো, অনু কিন্তু সুন্দরী মেয়ে বিয়ে কত্তে চায় না যে।

বিনো। তবে কি কালো কুচ্ছিত ওর পছন্দ ?

গৃহি। তাই তো বলে।

বিনো। তা বলবে বৈ কি। গোপাল ঘোষের মেয়েটা কালো কুচ্ছিত কি না।

গৃহি। সে কালো কুচ্ছিত হ'লো, তাতে ওর কি ?

গৃহিণীর এই অজ্ঞতায় বিরক্ত হইয়া বিনোদ বলিলেন, "তাতে ওর মাথা, আর আমার মুণ্ডু! বুঝতে পাচ্চো না, গোপাল ঘোষের সেই মেয়েটার বিয়ে তো কিছুতেই হচ্ছে না, একে পয়সা নাই, তার মেয়ের ঐ চেহারা, তার উপর সমাজ বাদী। অনুকূল ঐ মেয়েটাকে বিয়ে ক'রে অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার কত্তে চায়।"

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "বল কি ?"

বিনোদ বলিলেন, "ভিতরে ভিতরে সব ঠিক ক'রে ফেলেছে। আমাকে না জানিয়েই হঠাৎ এক দিন লুকিয়ে বিয়ে ক'রে ফেলবে, তার পর বলবে, যে কাষ হয়ে গিয়েছে, তার তো চারা নাই। আর বাস্তবিক, বিয়ে একবার হয়ে গেলে আর ত ফিরবে না। কিন্তু আমিও বিনোদ মিত্তির, ওর কাকা, কি ক'রে বিয়ে করে, তাই দেখবো।"

কলিকার আগুনে ফুঁ দিতে দিতে বিনোদ বাহিরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে তিনি অনুকূলকে বুঝাইয়া এই বিবাহ হইতে নিরস্ত করিবেন।

৫

বাস্তবিকই অনুকূল গোপাল ঘোষের অরক্ষণীয়া মেয়েটাকে বিবাহ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিল। সে যখন দেখিল, অর্থাভাবে, মেয়েটার রূপের অভাবে, এবং সমাজের অহেতুক বিরুদ্ধাচরণে মৃত গোপাল ঘোষের চৌদ্দ বছরের মেয়েটাকে কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেছে না, তখন সে নিজেই তাহাকে গ্রহণ করিয়া অনাথা বিধবাকে ভীষণ কন্যাদায়ের দুশ্চিন্তা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু এ সঙ্কল্প যে সহজে সিদ্ধ হইবে না, ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। খুড়া কখনই এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না, পাড়াপ্রতিবাসীরাও জানিতে পারিলে বাধা দিবার চেষ্টা করিবে। খুড়ার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীদিগের বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া বিবাহ করা সহজসাধ্য নহে। সুতরাং সে স্থির করিল, সকলের অজ্ঞাতসারেই বিবাহ করিতে হইবে। তার পর খুড়া ক্ষমা করেন, ভালই; না করেন, তখন যাহা হয় হইবে। বিবাহ হইয়া গেলে তাহা ত আর ফিরিবে না।

তবে খুড়া-খুড়ীর মনঃকষ্ট ;—কিন্তু কোনরূপ অধর্ম্মাচরণ করিয়া ত সে খুড়া-খুড়ীর মনঃকষ্টের কারণ হইতেছে না। যে বিষম কন্যাদায়ে সমাজের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, কত নিঃস্ব পিতামাতার অশ্রুধারায়, কত অরক্ষণীয়া কন্যার নীরব মর্ম্মযাতনায় ভগবানের আসন পর্য্যন্ত বিচলিত হইতেছে, সেই ভীষণ কন্যাদায় হইতে সে যদি এক জনকেও উদ্ধার করিতে পারে, তাহা হইলেও তাহার জীবন সার্থক। এই সার্থকতালাভের জন্য সে স্নেহপরায়ণ খুড়া-খুড়ীর অভিশাপ পর্য্যন্ত মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত।

কিন্তু প্রাপ্তির আশা কিছুই নাই, মেয়েটিরও রূপের অভাব। ছাই রূপ, ছাই অর্থ। এই অর্থ ও রূপের লালসাতেই ত কন্যাদায় দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং অনুকূল নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে এই মেয়েটিকে গ্রহণ করিয়া রূপ ও অর্থের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিবে।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া লইয়া অনুকূল

মৃত গোপাল ঘোষের অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইল।

উদ্যোগ-আয়োজনের কিছুই আবশ্যক ছিল না। গোপনে বিবাহ, শুধু পুরোহিত আসিয়া মন্ত্র কয়টা পড়াইয়া দিবে।

গোপনে গোপনে পরামর্শ স্থির হইলেও এই গুপ্ত পরামর্শ কিরূপে যে খুড়া বিনোদ মিত্রের কর্ণগোচর হইল, তাহা অনুকূল বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং খুড়ীমা হঠাৎ যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে অনু, তুই নাকি গোপাল ঘোষের মেয়েকে লুকিয়ে বিয়ে করবি?" তখন অনুকূল বিস্ময়ে চমকিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "কে তোমাকে এ সংবাদ দিলে খুড়ীমা?"

খুড়ীমা বলিলেন, "যেই সংবাদ দিক্, কথাটা সত্যি কি মিছে, তাই আমি তোকে জিজ্ঞেস্ কচ্চি।"

ঈষৎ হাস্যসহকারে অনুকূল বলিল, তোমাদের লুকিয়ে বিয়ে করবো, এ কথায় তুমি বিশ্বাস কর খুড়ীমা?"

খুড়ীমাও একটু হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি আমি বিশ্বাস করি বাছা? আমি কিন্তু শুনেই বুঝেছি যে, কথাটা মিছে।"

অনুকূল মুখখানাকে একটু গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা খুড়ীমা, সত্যিই যদি হয়?"

খুড়ীমা বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনুকূল বলিল, "মনে কর, সত্যিই যদি গোপাল ঘোষের মেয়েটাকে বিয়ে করি?"

গম্ভীরমুখে খুড়ীমা বলিলেন, "না না, তাকে তুই বিয়ে কত্তে চাবি কেন?"

অনু। নইলে তার বিয়ে হবে না।

খুড়ী। তুই বিয়ে না করলে বিয়ে হবে না, এও কি কথা?

অনু। কি ক'রে বিয়ে হবে বল, ওদের যে পয়সা নাই।

খুড়ী। পয়সা না থাকলেই বুঝি বিয়ে হয় না?

অনুকূল তখন এমন সকরুণ ভাষায় কন্যাদায়ের ভীষণতা ও বর্তমান সমাজের অত্যাচার বিবৃত করিল যে, তচ্ছ্রবণে খুড়ীমা অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আর্দ্রকণ্ঠে সম্মতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "এখন যদি হয় অনু, তা হ'লে তুই এই অনাথাকে কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার ক'রে দে।"

অনুকূল বলিল, "কিন্তু কাকা কি মত দেবেন?"

খুড়ীমা বলিলেন, "সে ভার আমার। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবো।"

অনুকূল হৃষ্টচিত্তে খুড়ীমার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল।

বিনোদ কিন্তু বুঝিলেন না। তিনি গৃহিণীর অনুরোধে হাঁ না কিছুই না বলিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়েটা তা হ'লে হচ্চে কবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কবে হবে,তার ঠিক নাই, তবে দু'চার দিনের ভিতর হ'তে পারে।"

"আচ্ছা" বলিয়া বিনোদ পরামর্শ স্থির করিবার জন্য নবীন চৌধুরীর নিকট উপস্থিত হইল।

৬

সে দিন বিবাহের ভাল লগ্ন ছিল। অনুকূল পুরোহিতের সহিত গুপ্ত বিবাহের কথাবার্তা স্থির করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন এক ব্যক্তি তাহাকে সংবাদ দিল, আজ শিবে ধোপা একরাশ ক্ষার-কাপড় লইয়া চৌধুরীদের বড় পুকুরে কাচিয়া আসিয়াছে। বার বার নিষেধ সত্ত্বেও গ্রামের পানীয় জলের পুষ্করিণীতে ক্ষার-কাপড় কাচিয়াছে শুনিয়া অনুকূল রাগে অধীর হইয়া উঠিল; সে তাহার সঙ্গী কয়েকজন যুবককে ডাকিয়া লইয়া শিবে ধোপার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, এবং শিবে তাহার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বড় পুকুরে কেন কাপড় কাচিয়াছে,তাহার কৈফিয়ৎ চাহিল। শিবু কিন্তু খুব চড়া মেজাজেই তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল; বলিল, "খুব করেছি, কাপড় কেচেছি, পুকুর তো তোমার বাবার নয়।"

ছোটলোকের এতটা স্পর্দ্ধা অনুকূলের সহ্য হইল না; সে শিবের গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। মার খাইয়াও শিবু দমিল না; সে একটা বাঁশ লইয়া অনুকূলকে মারিতে উদ্যত হইল। তখন অনুকূলের সঙ্গী যুবকদল শিবুকে রীতিমত প্রহার দিয়া চলিয়া আসিল। শিবু আর্ত্ত চীৎকারে পাড়া মাথায় করিতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনুকূল গোপাল ঘোষের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, এমন সময় পুলিশ আসিয়া শিবু ধোপাকে অবৈধভাবে প্রহার করা এবং তাহার বাড়ী লুঠতরাজ করা অপরাধে অনুকূলকে গ্রেপ্তার করিল।

এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে অনুকূল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজের জন্য তেমন চিন্তিত হইল না, কিন্তু গোপাল ঘোষের মেয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। আজিকার রাত্রিটা যদি সে মুক্তি পায়,—অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া কা'ল সকালে সে হাসিতে হাসিতে জেলে যাইতে পারে। অনুকূল রাত্রিটার মত জামীনে মুক্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু গ্রামের কেহই তাহার জামীন হইল না। এমন কি, খুড়া বিনোদ মিত্তির পর্য্যন্ত জামীন হইতে অস্বীকৃত হইল। কাযেই পুলিশ তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়া দিল।

পরদিন সকালে বিনোদ থানায় উপস্থিত হইয়া অনুকূলকে বুঝাইয়া বলিলেন, যদি সে গ্রামের হিতাহিতের চেষ্টায় না থাকে, বা গোপাল ঘোষের মেয়েকে বিবাহ না করে, তাহা হইলে তিনি জামীন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন; তার পর মারপিটের কথা অস্বীকার করিলেই মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, কেন না, নবীন চৌধুরী নিষেধ করিলে একটি প্রাণীও শিবুর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিবে না। অনুকূল কিন্তু খুড়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না; বলিল,"মিথ্যা বলতে পারবো না, তাতে আমি জেলে যেতে প্রস্তুত।"

বিনোদ নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ, ছেলেটা জেলে যাইতে প্রস্তুত! অনুকূলের একগুঁয়েমিতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইলেও ছেলেটার পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সে ক্রোধ সংবরণ করিতে হইল। পরিশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, অনুকূল যদি মারপিটের কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে গোপাল ঘোষের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন। অনুকূল কিন্তু এই প্রলোভনেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইল না। অগত্যা তিনি বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "সে নিজে যখন জেলে যেতে রাজি, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

গৃহিণীকে তিরস্কার করিয়া বিনোদ বলিলেন, "বল কি গো. অনুকূল জেলে যাবে, আর আমি তাই ব'সে দেখবো? লোকই বা বলবে কি?"

রাগতভাবে গৃহিণী উত্তর করিলেন, "লোক বলবে, ভাইপোর বিয়ে দিয়ে পয়সা পাবে না ব'লে খুড়ো ষড়যন্ত্র ক'রে তাকে জেলে দিলে।"

আক্ষেপ সহকারে বিনোদ বলিলেন, "ওগো, ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে, তা যদি জানতাম, তা হ'লে কি কখন নবে চৌধুরীর কাছে পরামর্শ নিতে যাই? ঐ লোকটাই ত যুক্তি দিয়ে এমন কাণ্ড বাধিয়ে তুললে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কাণ্ড যখন বাধিয়ে তুলেছে, তখন আর উপায় কি?"

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার স্বরে বিনোদ বলিলেন, "উপায় আমি করবোই করবো,—সর্ব্বস্বান্ত হব, ঘর-ভিটে বেচবো, তবু অনুকূলকে জেলে যেতে দেব না।"

গৃহিণী বলিলেন, "যতই চেষ্টা কর তুমি, অনুকূল জেলে না গিয়ে ছাড়বে না। কেন না, সে বুঝতে পেরেছে, এই চক্রান্তের মূল তার খুড়ো নিজে।"

বিনোদ আপনার অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

৭

নবীন চৌধুরী কিন্তু অনুকূলকে জেলে দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। কেন না, অনুকূলের মত যুবক দেশে থাকিতে দেশের কোন ভদ্রলোকেরই ভদ্রস্থতা নাই। এই হতভাগারা দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আপনাদিগকে মহাপণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে, এবং সেই গর্ব্বে মানী লোকের সম্মান নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং এই হতভাগ্যেরা যতই সমাজের বাহিরে থাকে, ততই দেশের ও সমাজের মঙ্গল।

সমাজের মঙ্গলার্থে নবীন চৌধুরী ভিতরে থাকিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। বিনোদও অনুকূলের পক্ষে বড় বড় উকীল-মোক্তার নিযুক্ত করিলেন। মারপিট প্রমাণিত হইল, লুঠতরাজের কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। হাকিম মারপিটের অপরাধে আসামীকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় বিনোদ হাকিমে ার আচরণ তাঁহাকে
কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হুজু তাঁহার অশান্ত আত্মা
আর নবীন চৌধুরীকে দণ্ড দিন ইয়াছিল। তখন বাসন্তী
প্রধান উদ্যোগী আমরাই।" তৃমাতৃহীনা বালিকা মামার

বলিয়া বিনোদ হাকিমের , তাহার মামা হরিনাথ বাবু
দিয়া বড় পুকুরে কাপড় কাচ। কিন্তু বাসন্তীর মামীমা
বাঁধাইবার জন্য তাহাকে পারিতেন না। দুর্ভাগ্যের
কথাই প্রকাশ করিলেন। নিজের অক্লান্ত চেষ্টাতেও সে
আসামীকে বে-কসুর খালতে পারে নাই। সে বালিকা
বিনোদ তখন অনুকূল। নিজের দুর্ভাগ্য জানিয়া সে
থাকিত, সে নিজকে যত সাব-
ার বিপদ ঘনীভূত হইত।
সারের সমস্ত কাযই একা
াহার মামীমা তিরস্কার ব্যতীত
তেন না।

রিলেও বাসন্তীর রূপ অসাধা-
কৃষ্ণ কেশরাশি জানুর নিম্নে
স্থায় এবং তাহার মুখ-
তাহাকে সহসা দেখিলে
এবং আপনা হইতেই
এত রূপরাশি লইয়া
স্ত হইতে অব্যাহতি

সিলে দত্তগৃহিণী
সঙ্গে তাঁহার
ার পশ্চাতে
র ক্ষীণ
ভীত
র

হস্ত দিয়া বলিলেন, "বাসী, তুই এত রাত্তিরে এখানে কেন?"

সে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "মামীমা তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

দত্তগৃহিণী বাসন্তীর মামীমার আচরণ জানিতেন, আর এই পিতৃমাতৃহীনা বাসন্তীকে যে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং ইহাতে তিনি কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "কেন, তুই কি করেছিলি?"

"আমি কিছুই করিনি, ভুতো একখানা থালা ভেঙ্গে ফেলেছে, তিনি তা বিশ্বাস কল্লেন না। আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন, আমি এত রাতে কোথায় যাই ঠানদিদি?" এই বলিয়া সে আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল।

দত্তগৃহিণী তাহাকে বহুক্ষণ পরে শান্ত করিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস নে মা, আমি তোকে নিয়ে যাই চল্।"

হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি বাসন্তীর পরিধেয় বসনের দিকে আকৃষ্ট হইল, তিনি তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং উৎকণ্ঠিত-ভাবে কহিলেন, "এ কি? তোর কাপড়ে কি এ? এত রক্ত কেন? ও মা, কাপড়খানা ভিজে গেছে যে, ছি, ছি, কি রাক্ষসী গো! এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে মেয়েটাকে বসিয়ে রেখে নিজে ঘরে শুয়ে আছে, চল মা, তুই আমার সঙ্গে চল। কি ক'রে লাগলো? মেরেছে বুঝি?" এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজ অঞ্চল দিয়া বাসন্তীর কপালের রক্ত মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন, "কি ক'রে মাল্লে রে?"

বাসন্তী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি নিজে প'ড়ে গিয়ে কপালে লেগে কেটে গেছে, মামীমা কিছু বলেন নি। আর —আর—আমি যাব না, মামীমা তা হ'লে আরও—বক—"

তাহার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া দত্তগৃহিণী বলিলেন, "তবে তুই এত রাত্তিরে এখানে একা থাকবি? তা কি হয়, তোর য় নাই, আমার সঙ্গে চল।" এই বলিয়া তিনি বাসন্তীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে তিনি বাসন্তীর প্রশংসা লাগিলেন। বুদ্ধিমতী দত্তগৃহিণী বুঝিতে পারিলেন
বিগত চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গার স্নান-বাটের জন্যই বাসন্তীর কপাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু
ব বুদ্ধি দেখিয়া তিনি আর কিছু বলিলেন
অনাথিনী পিতৃমাতৃহীনা ভাগিনেয়ীর সংবাদ

সেই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে অনুকূল গোপাল ঘোষের বাড়ীতে যাইবার জন্য বাহির হইতেছিল, এমন সময় পুলিশ আসিয়া শিবু ধোপাকে অবৈধভাবে প্রহার করা এবং তাহার বাড়ী লুঠতরাজ করা অপরাধে অনুকূলকে গ্রেপ্তার করিল।

এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে অনুকূল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে নিজের জন্য তেমন চিন্তিত হইল না, কিন্তু গোপাল ঘোষের মেয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া কাতর হইয়া পড়িল। আজিকার রাত্রিটা যদি সে মুক্তি পায়,—অনাথা বিধবাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া কা'ল সকালে সে হাসিতে হাসিতে জেলে যাইতে পারে। অনুকূল রাত্রিটার মত জামীনে মুক্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু গ্রামের কেহই তাহার জামীন হইল না। এমন কি, খুড়া বিনোদ মিত্তির পর্য্যন্ত জামীন হইতে অস্বীকৃত হইল। কাযেই পুলিশ তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া হাজতে রাখিয়া দিল।

পরদিন সকালে বিনোদ থানায় উপস্থিত হইয়া অনুকূলকে বুঝাইয়া বলিলেন, যদি সে গ্রামের হিতাহিতের চেষ্টায় না থাকে, বা গোপাল ঘোষের মেয়েকে বিবাহ না করে, তাহা হইলে তিনি জামীন হইয়া তাহাকে মুক্ত করিতে পারেন; তার পর মারপিটের কথা অস্বীকার করিলেই মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, কেন না, নবীন চৌধুরী নিষেধ করিলে একটি প্রাণীও শিবুর পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিবে না। অনুকূল কিন্তু খুড়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল না; বলিল,"মিথ্যা বল্‌তে পারবো না, তাতে আমি জেলে যেতে প্রস্তুত।"

বিনোদ নিতান্তই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ, ছেলেটা জেলে যাইতে প্রস্তুত! অনুকূলের একগুঁয়েমিতে তাঁহার ক্রোধের উদয় হইলেও ছেলেটার পরিণাম চিন্তা করিয়া তাঁহাকে সে ক্রোধ সংবরণ করিতে হইল। পরিশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, অনুকূল যদি মারপিটের কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে গোপাল ঘোষের মেয়ের সঙ্গে তাহার বিবাহে সম্মতি দিতে পারেন। অনুকূল কিন্তু এই প্রলোভনেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইল না। অ'
তিনি বিষণ্নচিত্তে ফিরিয়া আসিলেন। ়, তিনি

গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, "সে নিজে যখন রে করিলেন, রাজি, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?" য়া গেল,গৃহের

গৃহিণীকে তিরস্কার ক
গো. অনুকূল জেলে যাবে, ব
লোকই বা বলবে কি?"

রাগতভাবে গৃহিণী উত্ত
ভাইপোর বিয়ে দিয়ে পয়সা পা
ক'রে তাকে জেলে দিলে।"

আক্ষেপ সহকারে বিনোদ
যে এতদূর গড়াবে, তা যদি জান
নবে চৌধুরীর কাছে পরামর্শ নি
ত যুক্তি দিয়ে এহন কাণ্ড বাধিয়ে

গৃহিণী বলিলেন, "কাণ্ড যখন
আর উপায় কি?"

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার স্বরে বিনোদ
করবোই করবো,—সর্ব্বস্বান্ত হব,
অনুকূলকে জেলে যেতে দেব না।

গৃহিণী বলিলেন, "যতই চেষ্ট
না গিয়ে ছাড়বে না। কেন ন
চক্রান্তের মূল তার খুড়ো নিজে

বিনোদ আপনার অবি
দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

র কপালের খানিকটা কাটিয়া
, অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার মুখ
—"
নিয়া মামীমা ক্রোধকম্পিত
র কেন, তাকে ত অনেক
পড়তে না পড়তেই বাপকে
ট পুরেতে এসেছ। ঐটুকু
ঠে, বেরো তুই আমার
। ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়বো।
আবার পরের দোষ? দূর
রা। এখনও উঠলি না?
ছে। ভাল কথায় বলছি,
কে মেরে ফেলবো।" এই
াকর্ষণ করিয়া তাহার ঘাড়
বাহির করিয়া দিয়া নিজে

ণ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে. তখন
ছে। অন্ধকার আসিয়া চারিদিক
গং ধূসরবর্ণ যবনিকায় আবৃত হইয়া
নবীন চৌধুরী কিন্তু অন্ধকারপ্রায় পথে বাসন্তী একাকিনী
পড়িয়া লাগিয়াছিলে। তাহার ললাট হইতে তখনও ক্ষীণ
দেশে থাকিতে দে পড়িতেছিল। সে মাঝে মাঝে অঞ্চল দিয়া
এই হতভাগার র রক্ত মুছিয়া ফেলিতেছিল। দূরে গ্রামপ্রান্তে
মহাপণ্ডিত চীৎকারধ্বনি করিয়া নীরব গ্রামখানিকে প্রতি-
লোকের করিয়া তুলিতেছিল। ভয়াতুরা বালিকা ভাবিতেছে,
হতভ অন্ধকারে সে কোথায় যাইবে? মামাবাবু দুই-তিন দিনের
ও আবাদে গিয়াছেন, কে তাহাকে গৃহে লইয়া যাইবে? মামীমা হয় ত গৃহে ঢুকিতে দিবেন না, এইরূপ কত চিন্তাই তাহার ক্ষুদ্র মন আলোড়িত করিতেছিল।

বাসন্তী অতি অল্পবয়সে পিতৃ-মাতৃহীনা হইয়া মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার জন্মের দশ দিন পরেই পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। এক মাসের কন্যা লইয়া নিঃসম্বলা অভিভাবকহীনা বিধবা ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ

করিয়াছিল। ভ্রাতৃজায়ার কঠোর আচরণ তাঁহাকে অধিক দিন সহ্য করিতে হয় নাই। তাঁহার অশান্ত আত্মা শীঘ্রই শান্তিময়ের চরণে আশ্রয় পাইয়াছিল। তখন বাসন্তী মাত্র চারি বৎসরের। এই পিতৃমাতৃহীনা বালিকা মামার অশেষ যত্নে পালিত হইয়াছিল, তাহার মামা হরিনাথ বাবু তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। কিন্তু বাসন্তীর মামীমা তাহাকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। দুর্ভাগ্যের ক্রোড়ে আজন্ম লালিত হইয়া নিজের অক্লান্ত চেষ্টাতেও সে মামীমার স্নেহ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। সে বালিকা হইলেও বড় বুদ্ধিমতী ছিল। নিজের দুর্ভাগ্য জানিয়া সে সর্ব্বদাই সাবধানে ও নীরবে থাকিত, সে নিজকে যত সাবধানে রাখিত, ততই তাহার বিপদ ঘনীভূত হইত। একাদশবর্ষীয়া বালিকা সংসারের সমস্ত কাযই একা করিত। কিন্তু তথাপি তাহার মামীমা তিরস্কার ব্যতীত কখনও তাহাকে মিষ্ট কথা বলিতেন না।

দরিদ্রার গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও বাসন্তীর রূপ অসাধারণ ছিল। তাহার মস্তকের কৃষ্ণ কেশরাশি জানুর নিম্নে লুটাইয়া পড়িত, বর্ণ চম্পকের ন্যায় এবং তাহার মুখখানিও ততোধিক সুন্দর ছিল। তাহাকে সহসা দেখিলে দেবকন্যা বলিয়া ভ্রম জন্মিত এবং আপনা হইতেই তাহার প্রতি স্নেহের উদয় হইত। এত রূপরাশি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও সে দুর্ভাগ্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিলে দত্তগৃহিণী বন্ধুদের বাড়ী হইতে গৃহে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে তাঁহার চাকর রাম হারিকেন লণ্ঠন হস্তে করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল। তিনি দূর হইতে লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোকে শ্বেতবস্ত্রাবৃত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে ভীত হইয়াছিলেন, পরে সাহসে ভর করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কে এক জন প্রাচীর অবলম্বন করিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। বার্দ্ধক্যের ক্ষীণদৃষ্টিতে তিনি তাহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাসন্তীর ক্রন্দনের বেগ আরও বর্দ্ধিত হইল, তিনি লণ্ঠন লইয়া মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া তবে চিনিতে পারিলেন। দত্তগৃহিণী তখন তাহার গাত্রে হস্ত দিয়া বলিলেন, "বাসী, তুই এত রাত্তিরে এখানে কেন?"

সে বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "মামীমা তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

দত্তগৃহিণী বাসন্তীর মামীমার আচরণ জানিতেন, আর এই পিতৃমাতৃহীনা বাসন্তীকে যে তিনি কঠোর শাস্তি দিতেন, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং ইহাতে তিনি কিছুই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন না। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "কেন, তুই কি করেছিলি?"

"আমি কিছুই করিনি, ভূতো একখানা থালা ভেঙ্গে ফেলেছে, তিনি তা বিশ্বাস কল্লেন না। আমাকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন, আমি এত রাতে কোথায় যাই ঠানদিদি?" এই বলিয়া সে আরও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল।

দত্তগৃহিণী তাহাকে বহুক্ষণ পরে শান্ত করিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস নে মা, আমি তোকে নিয়ে যাই চল্।"

হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি বাসন্তীর পরিধেয় বসনের দিকে আকৃষ্ট হইল, তিনি তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং উৎকণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "এ কি? তোর কাপড়ে কি এ? এত রক্ত কেন? ও মা, কাপড়খানা ভিজে গেছে যে, ছি, ছি, কি রাক্ষসী গো! এই বৃষ্টির মধ্যে অন্ধকারে মেয়েটাকে বসিয়ে রেখে নিজে ঘরে শুয়ে আছে, চল মা, তুই আমার সঙ্গে চল। কি ক'রে লাগলো? মেরেছে বুঝি?" এই বলিয়া তিনি তাঁহার নিজ অঞ্চল দিয়া বাসন্তীর কপালের রক্ত মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন, "কি ক'রে মাল্লে রে?"

বাসন্তী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি নিজে প'ড়ে গিয়ে কপালে লেগে কেটে গেছে, মামীমা কিছু বলেন নি। আর—আর—আমি যাব না, মামীমা তা হ'লে আরও—বক—"

তাহার কথা অসমাপ্ত রাখিয়া দত্তগৃহিণী বলিলেন, "তবে তুই এত রাত্তিরে এখানে একা থাকবি? তা কি হয়, তোর ভয় নাই, আমার সঙ্গে চল।" এই বলিয়া তিনি বাসন্তীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে তিনি বাসন্তীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী দত্তগৃহিণী বুঝিতে পারিলেন যে, প্রহারের জন্যই বাসন্তীর কপাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এতটুকু মেয়ের বুদ্ধি দেখিয়া তিনি আর কিছু বলিলেন না। রাত্রিকালে অনাথিনী পিতৃমাতৃহীনা ভাগিনেয়ীর সংবাদ

লওয়া মামীমা দরকার বিবেচনা করিলেন না, তিনি নিজে আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া দত্তগৃহিণী গৃহদ্বারের নিকটস্থ হইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "ওরে বিশু, শীগ্‌গীর একবার শুনে যা ত।"

তাঁহার আহ্বান শুনিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে একটি সুদর্শন যুবক বাহিরে আসিয়া কহিল, "কেন মা ডাকছিলে, কি হয়েছে?"

পুত্রকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেখ দেখি, এক রত্তি মেয়েটাকে রাক্কুসী মাগী একেবারে মেরে ফেলেছে, বাছার কপাল কেটে একেবারে রক্তারক্তি হচ্ছে, তুই একটু ওষুধ দে দেখি।"

এমন সময় বহির্দ্বারে একটা গোলমাল শুনিয়া তিনি মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিলেন এবং পুত্রকে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিলেন, ক্ষণ পরে একটি প্রবীণ ভদ্র লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দত্তগৃহিণী তাঁহাকে দেখিয়া ঈষৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তাঁহার পুত্র মাতার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মা, এক জন ভদ্র লোক রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির জন্য আমাদের বাড়ীতে একটু যায়গা চাইছেন।"

গৃহিণী ইঙ্গিতে পুত্রকে সম্মতি দিলেন, তখন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "মা, আমার কাছে আপনি লজ্জা করবেন না, আমি শিশুকালে মাতৃহীন হইয়াছি, মায়ের স্নেহ কেমন, তাহা জানি না, আজ থেকে আপনি আমার মা।" তাহার পর তিনি তাঁহার পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বালিকাটি কে?" বিশু তখন সংক্ষেপে বাসন্তীর পরিচয় দিল। বাসন্তীর অতুলনীয় রূপরাশি দেখিয়া নবাগত মনে মনে বলিলেন, "মেয়েটি তো বেশ সুরূপা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সিরাজগঞ্জের জমীদার রাধামাধব বাবুর পুত্র সন্তোষকুমার কলিকাতার বাটীতে থাকিয়া মেডিকেল কলেজে পড়িত। পাঠ্যাবস্থায় এক কলেজে পড়ার জন্য ব্যারিষ্টার অনাদি বাবুর পুত্রের সহিত সন্তোষকুমারের খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। সে কলেজ হইতে ফিরিবার পথে প্রায়ই অনাদি বাবুর গৃহে যাইত, কারণ, অনিল তাহাকে কিছুতেই ছাড়িত না। ক্রমে উহাদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। অনাদি বাবুর স্ত্রী মনোরমা সন্তোষকুমারকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, কারণ, তিনি তাঁহার পুত্রের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, সন্তোষ মাতৃহীন। সেই অবধি তিনি মায়ের অধিক যত্নে সন্তোষকে স্নেহ যত্ন করিতেন। সন্তোষও তাঁহাকে মাতৃ তুল্য দেখিত।

অনাদি বাবু এখন অনেক পয়সা উপায় করেন। সংসারে স্ত্রী, পুত্র এবং একটিমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই। কন্যা সুষমা এক্ষণে বেথুন কলেজে পড়িতেছে। বৎসরখানেকের মধ্যেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে।

সুষমা পিতা-মাতার অত্যন্ত আদরের দুহিতা ছিল। সে যখন যাহা আবদার ধরিত, সাধ্যপক্ষে অনাদি বাবু তাহার আবদার রক্ষা করিতেন। সেই জন্য সময় সময় তাঁহার স্ত্রী অনাদি বাবুকে বলিতেন, "তুমি দেখছি মেয়েটির দফা একেবারে রফা করবে।"

তিনি তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন, "না গো, সুষী যখন বড় হবে, তখন কি আর এমনি থাকবে? তখন তুমিই আবার উল্টা গাইবে।" এইরূপ স্বামিস্ত্রীতে সুষমাকে লইয়া প্রায়ই মিথ্যা মান-অভিমান চলিত।

সন্তোষ প্রথম দিন উহাদের বাড়ীতে আহারে বসিয়া বড় অপ্রস্তুত হইয়াছিল, কারণ, সে প্রথমে ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বেই জুতা জোড়াটি বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া সুষমা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর জলখাবার খাইয়া হাত ধুইবার জন্য বাহিরের দুয়ারে দাঁড়াইতেই সুষমা বলিল, "সন্তোষ বাবু, বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন কেন?"

সে বলিল, "হাত ধোব।"

ইহা শুনিয়া সুষমা পুনরায় হাসিয়া উঠিল। সুষমার হাস্যধ্বনি শুনিয়া অনাদি বাবু বলিলেন, "কি হয়েছে রে সুষী, এত হাসছিস কেন?"

"দেখুন না বাবা, সন্তোষ বাবু হাতে জল দিবার জন্যে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।"

তখন অনাদি বাবু বলিলেন, "এই যে বাবা, বয় বাটিতে জল দিয়ে গেছে, এখানেই হাত ধুয়ে নাও।"

সন্তোষ তখন বলিল, "আমাদের ছোট বেলা হ'তে ওই অভ্যাস কি না, তাই কেমন ভুল হয়ে যায়।"

এক দিন কলেজ হইতে অনিল সন্তোষকে নিজেদের গৃহে ধরিয়া লইয়া গেল। জলযোগ শেষ করিয়া অনিল কহিল, "চল্, একটু বিলিয়ার্ড খেলা যাক্।"

সন্তোষ বলিল, "আজ আমার এক যায়গায় যেতে হবে ভাই, আজ আর সময় হবে কি?"

অনিল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কটার সময়?"

"ছটার সময় যেতে হবে।"

"তুই আয়, এখন ঢের দেরী আছে।" এই বলিয়া সে তাহাকে বিলিয়ার্ড রুমে ধরিয়া লইয়া গিয়া উভয়ে খেলিতে বসিল। বহুক্ষণ হার-জিতের পর উভয়ে খুব জেদের সহিত খেলিতেছিল।

এমন সময় সুষমা আসিয়া বলিল, "দাদা, তোমাকে বাবা ডাকছেন।"

অনিল মুখ না তুলিয়া বলিল, "কেন রে সুষী?"

সুষমা বলিল, "তা আমি জানি না।"

অনিল তখন অগত্যা উঠিতে বাধ্য হইল, সে সুষমার দিকে চাহিয়া কহিল, "তবে তুই আমার হয়ে একবার খেল, আমি শুনে আসি।" সুষমা সম্মত হইল। বহুক্ষণ পরে অনিল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং সে নীরবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতে লাগিল। ক্রমে খেলা শেষ হইয়া গেল, সেবার সুষমা হারিয়া গেল।

অনিল সুষমাকে রাগাইবার জন্য বলিল, "ছি, ছি, সুষী, তুই হেরে গেলি?"

সুষমা অভিমানমিশ্রিত স্বরে কহিল, "তুমিই তো আমায় এই অপমানটা করালে, এবার নিজে থাকলে নিশ্চয়ই হেরে যেতে। আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও, এইবার আমার খেলাটা দেখ।"

অনিল তাহাতে রাজী হইল। পুনরায় সন্তোষ ও সুষমা উভয়ে খেলা আরম্ভ করিল। উভয়েই ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলিতেছিল; এ খেলায় নিয়মই এই। সেবার আর সন্তোষ ভাল করিয়া খেলিতে পারিল না, ক্রমাগতই সে ভুল করিতে লাগিল, একাগ্রচিত্তে সুষমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে খেয়ালে তাহার প্রায়ই ভুল হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে সে হারিয়া গেল।

তখন অনিল বলিল, "সত্যিই তো সুষী, আমারই খেলার দোষে তুই হেরে গেছলি।"

সুষমা মৃদু হাস্যের সহিত কহিল, "দেখলে তো দাদা, আমি কি মিথ্যে বলেছিলাম।" এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। নয়নান্তরালবর্ত্তিনী সুষমার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অনিল দেখিল, সন্তোষ তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। অনিলের সহিত চক্ষুর দৃষ্টি মিলিতেই সন্তোষ লজ্জিতভাবে নিজের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

অনিল কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "সন্তোষ, এস ভাই, আর একবার খেলা যাক।"

সন্তোষ বলিল, "না দাদা, আমায় মাপ কর, আজ আর ভাল লাগছে না, বড় ক্লান্ত বোধ হচ্ছে।"

অনিল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তবে চল, বাইরে যাওয়া যাক্, এখানে বড় গরম।"

এই বলিয়া উভয়ে গৃহের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, অনাদি বাবু ও তাহার স্ত্রী, সুষমা সকলেই সেইখানে বসিয়া রহিয়াছেন। সন্তোষ ও অনিলকে দেখিয়া অনাদি বাবু কহিলেন, "এস বাবা, এখানে ব'স।"

দুই বন্ধু বসিল। অনেকক্ষণ নানা রকম কথাবার্ত্তার পরে অনাদি বাবু সন্তোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত আর এক বছর বাকী আছে, কোথায় প্র্যাকটিশ করবে ঠিক করেছ?"

সন্তোষ অবনতমুখে কহিল, "তা এখনও কিছু ঠিক করি নাই, বাবা যা বলবেন।"

তিনি কহিলেন, "সে অবশ্য ঠিক কথা। তিনি যা হুকুম করেন, তাই করাই উচিত। কিন্তু আমার মতে দেশে প্র্যাক-টিশ্ করাই ভাল, কারণ, সহরে এখন ডাক্তারের কোন অভাব নাই। কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামের অবস্থা এখন বড় শোচনীয়, অনেক গরীব-দুঃখী চিকিৎসা অভাবে মারা যায়। সুতরাং এখন তাদের অভাব যাহাতে দূর হয়, সেই চেষ্টাই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়টা এখন আর ছেলেরা ভাবে না, অধিকাংশ স্থলে পিতৃপিতামহের ভিটা ছাড়িয়া এই সহরটাই তাহারা বেশী পছন্দ করে। কেমন, ঠিক কি না?"

"সন্তোষ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, আপনি যা বলছেন, কতকটা সত্য বটে, এখন পল্লীগ্রামের চেয়ে সহরটাই

আমরা বেশী পছন্দ করি। তবে বাবা আমার এই সহর দেশটা একেবারে দেখিতে পারেন না। তিনি বোধ হয় সিরাজগঞ্জেই প্র্যাকটিস্ কর্ত্তে বলবেন।"

হঠাৎ হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সন্তোষ দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "আজ আমায় ছটার সময় এক যায়গায় যেতে হবে, ছটা প্রায় বাজে, আজ তবে আসি।"

অনিল সন্তোষের সহিত গেট অবধি সঙ্গে গেল। ইতি-পূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রী আসায় সুষমা পড়িতে গিয়াছিল। সন্তোষ চলিয়া যাইবার পর অনাদি বাবু কহিলেন, "দেখ, যদি জামাই করতে হয়, তবে সন্তোষের মত ছেলেই দরকার। ছেলেটি যেমন বিনয়ী, তেমনই সচ্চরিত্র, যেন হীরার টুকরো।"

গৃহিণী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "আমাদের কি এমন ভাগ্য হবে? অনিলের মুখে শুনিয়াছি, ওর বাবা নাকি একজন গোঁড়া হিন্দু, তা যদি হয়, তা হ'লে কি আর আমাদের ঘরের মেয়ে তিনি নেবেন? এ আমা-দের নিতান্ত দুরাশা। ছেলেটিকে কিন্তু দেখে অবধি আমার কেমন একটা মায়া হয়ে গেছে, তা আর তোমায় কি বলবো? আহা, বেচারা মাতৃহীন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। যমুনা বা (ব্রহ্মপুত্র) কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, দক্ষিণদিক হইতে শীতল বায়ু যমুনার তরঙ্গস্পর্শে শীতলতর হইয়া জগৎ স্নিগ্ধ করিতেছে। সিরাজগঞ্জের নিম্নে যমুনার দুর্দ্দান্ত জলরাশি ব্রহ্মপুত্রবক্ষে পতিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালার সৃষ্টি করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে চারিদিক তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, দিগ্দিগন্ত অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। নদীর প্রশান্ত বক্ষে ভাসমান পাট-বোঝাই নৌকা সমূহ অন্ধকার আসন্ন দেখিয়া ধীরে ধীরে কূলের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিল। অদূরে দশ বিশখানি পাট-বোঝাই নৌকা তীরে নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক নীরব, নিস্তব্ধ, কচিৎ দুই একজন কৃষক মাঠের কার্য্য শেষ করিয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল।

নদী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জমীদার রাধামাধব বসুর বিশাল অট্টালিকা বিরাজ করিতেছে। প্রাসাদের উজ্জ্বল আলোকে রাজপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। জমীদার রাধামাধব বাবু তখন সন্ধ্যাভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া দ্বারবানের দল গেটের সম্মুখে বসিয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিয়াছে। কেহ বা সিদ্ধি খাইতেছে, কেহ বা তুলসী দাসের দোঁহা আবৃত্তি করিতেছে। এমন সময় সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি মনুষ্যমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফটকের দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

হঠাৎ মাধুসিং সর্দ্দারের দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল, সে হাঁকিল, "কোন্ হ্যায়?"

আগন্তুক অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কর্ত্তা বাবু কি ভিতরে আছেন?"

হিন্দুস্থানীর দল তাঁহার ভাষা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর ত দিলই না, উপরন্তু তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি তখন তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের আশায় বোধ হয় মনে মনে দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন, তাই বিপদনাশিনী অচিরেই তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলেন। দূরে তেজস্বী অশ্বযুগলবাহিত বৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ী ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, দূর হইতে ফটকের সম্মুখে গোলযোগ দেখিয়া বসু মহাশয় ঐখানেই গাড়ী রাখিতে বলিয়াছিলেন। গাড়ী দেখিয়া দ্বারবানের দল সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। তিনি তখন আগন্তুকের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, "এ কি! বিপিন বাবু যে, কবে এলে? এসো, এসো, ভিতরে চল। তার পর সব ভাল ত?"

বিপিন বাবু তখন দ্বারবানদিগের হস্ত হইতে নিজকে মুক্ত দেখিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, "হাঁ, সব ভাল। তুমি আর একটু না এলেই তোমার বাঁদরের দল আমাকে ছিঁড়ে কুটে খেয়ে ফেলেছিল আর কি। জীবনটা আজ এইখানেই থেকে যেত বোধ হয়। ওরা না বোঝে আমার কথা, না বোঝে আমার ইসারা। অবধূতের দল আর কি।"

বসু মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ওগুলো সব প্রায়ই নূতন লোক কি না, এখনও আমাদের বাঙ্গালা কথা ভাল বোঝে না।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বসিবার গৃহে লইয়া গেলেন। দোবে-চোবের দল তখন শীকার হাতছাড়া হইয়া গেল দেখিয়া ক্ষুণ্ণ মনে আরব্ধ কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

বিপিন বাবু পাটের দালাল। কলিকাতায় বাস করেন, সম্প্রতি পাট খরিদ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। বসু মহাশয় বিপিন বাবুর বাল্যবন্ধু। কলিকাতায় যাতায়াতকালে তিনি প্রায়ই বিপিন বাবুর বাটীতে অবস্থান করেন।

রাত্রিতে আহার সমাধা করিয়া বৈঠকখানার সম্মুখে খোলা বারান্দায় দুইখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া উভয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। শীতল নিশীথ সমীরণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতেছিল। পার্শ্বের কক্ষে দুইখানি পালঙ্কে উভয়ের শয্যা রচনা করা হইয়াছে। পত্নী-বিয়োগের পর হইতেই বসু মহাশয় আর অন্দরে শয়ন করিতেন না। দুই বেলা ভোজনের সময় ও আবশ্যকীয় কার্য্য ব্যতীত তিনি অন্তঃপুরে গমন করিতেন না। কথাপ্রসঙ্গে বিপিন বাবু কহিলেন,"তুমি ত ভায়া আমাদের মায়া একেবারেই কাটিয়ে ফেলেছ, আগে আগে তবু দুই একবার কলিকাতায় পায়ের ধূলো পড়তো, আজ প্রায় চার বচ্ছর হলো ওদিকে আর যাও নি।"

"কি করি ভাই, একলা মানুষ, গেলে পরে এক মিনিটও চলে না, ছেলেটাও এখানে নাই, কি ক'রে যাই বল?"

"হাঁ, ভাল কথা মনে পড়েছে, সতীশ আমার ছেলে, সে সে দিন বলছিলো, সে নাকি কার কাছে শুনেছে, সন্তোষ এক বিলাতফেরত বারিষ্টারের মেয়েকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করেছে, তাদের বাড়ীতেও নাকি সর্ব্বদা যাতায়াত করে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে ব্রহ্মসমাজেও নাকি যায়, তুমি কি—"

বসু মহাশয় তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "সে কি? এ কথা কি সত্যি?"

"সত্যি মিথ্যা জানি না ভাই, তবে গুজব এই রকম শুনলুম।"

বসু মহাশয় মুখে কোন কথা প্রকাশ না করিয়া মনে মনে বলিলেন, বৈষ্ণববংশের সন্তান হইয়া সে কি এমন করিয়া অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইয়াছে? পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ও নাম সে কি ডুবাইয়া দিতে চাহে? তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার সমাজ হইতে তাঁহার একমাত্র সন্তান কি এতদূর সরিয়া গিয়াছে? অসম্ভব, তাহা কখনই হইতে পারে না। তাঁহার সেই সন্তোষ—যে কখনও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই, সম্ভ সম্বোধন ভিন্ন যে কখনও সম্মুখে আসিতে সাহস করে নাই, সে কি আজ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া এখন অমানুষ হইয়াছে? বৃদ্ধ পিতার মুখে অন্তিমকালে জলবিন্দু দানের অধিকার হইতে সে কি বঞ্চিত হইতে চাহে? তিনি বহুদর্পে অতিশয় গর্ব্বে সন্তানকে বিশ্বাস করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এমন করিয়া সন্তোষ তাহার সমস্ত দর্প অহঙ্কার শেষ করিয়া দিল? সমাজ তাঁহাকে দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে, জ্ঞাতি-বর্গ উচ্চ হাস্যে টিটকারী দিবে, ইহাই তাঁহাকে সহ্য করিতে হইবে? না, তা কখনই হইবে না, যেমন করিয়া হউক, তাহাকে ফিরাইতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "ভায়া, কথায় কথায় অনেক রাত্রি হয়ে গেল, পথের কষ্টে ক্লান্ত হয়েছ, এখন একটু বিশ্রাম কর। কা'ল সকালে যা হয় পরামর্শ করা যাবে, কি বল?"

"দেখ, শাসন কল্লে বা ভয় দেখালে কোন ফল হবে না। ভাল কথায় যাতে হয়, তারই চেষ্টা করবে।"

এই বলিয়া উভয়েই ঘরের ভিতর গিয়া শয়ন করিলেন। সে রাত্রিতে বসু মহাশয় আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। নানাবিধ দুশ্চিন্তায় তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। ভবিষ্যতের যে মধুময় স্মৃতি তিনি তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা যেন কে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। অতীতের সুখস্মৃতি আসিয়া তাহা দেখিয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। নিদ্রা অসম্ভব।

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া বসু মহাশয় কাছারীঘরে আসিয়া বসিলেন। একটি বালক চাকর কতকগুলি ডাকের কাগজ ও চিঠিপত্র ইত্যাদি তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বে বিপিন বাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়া বসিয়া ছিলেন। দেওয়ান সদাশিব তখনও পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় কাগজপত্র লইয়া উপস্থিত হন নাই, তিনি একে একে পত্রগুলি সমস্ত পাঠ করিয়া, অবশেষে একখানি পত্র হাতে করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিমাকার ধারণ করিল। পত্রখানি তাঁহার কোন প্রভুভক্ত আমলা লিখিতেছে। সে পত্রখানি এই—

মহামান্য শ্রীল যুক্ত রাধামাধব বসু জমিদার বাহাদুর

মহামহিমার্ণবেষু—

হুজুরের অধিনের দীন হিনের নিবেদন এই যে, তাঁবেদার

হুজুরের অন্নে প্রতিপালিত, এবং হুজুর তাহার অন্নদাতা, তয় ত্রাতা বীধায় অধিন, করতব্য বোধ করিতেছে যে, হুজুরের সাংসারিক ব্যাপারে দাসানুদাস হুজুরের দরবারে এই সকল খবর পেশ করে। সংবাদ এই যে, হুজুর বাহাদুরের যুবরাজ খোঁকা বাবু কয়েকমাস যাবত এক বেম্মর বাড়ী বহুৎ যাতায়াত করিতেছেন এবং সেই বেম্মর একটি কন্নে খেমটাওয়ালী মত সাজ করিয়া থাকা বীধায় খোঁকা বাবু বিশেষ বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। হুজুর অন্নদাতা বীধায় দাসানুদাস তদারক করিয়া জানিয়াছে যে, উক্ত খেমটাওয়ালী কন্নের সহিত খোঁকা বাবুর বিশেষ প্রেম জনমাইয়াছে, এবং তেঁহ উহাদের ভোচকানীতে ভুলিয়া বেম্ম মতে বিবাহ পর্য্যন্ত করতে রাজী। এমত করন্ন হইকে হুজুরের মানহানী বীধায় দাসানুদাস হুজুরকে জ্ঞাত করিল। হুজুরের শ্রীচরণকমলে শত কোটী প্রণাম ইতি সেবকস্য—শ্রীগদাধর পাল।"

বন্ধু মহাশয় পত্রখানি পাঠ করিয়া বিপিন বাবুর হস্তে দিলেন, তিনি পাঠ করিবার পর উভয়েই বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে পরামর্শ করিয়া চাকরকে বিছানা বাক্স ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। অন্তঃপুরে ভ্রাতৃজায়াকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আজ রাত্রের গাড়ীতেই তিনি কলিকাতা যাইবেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী।

বোম্বাই হাইকোর্টে প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার
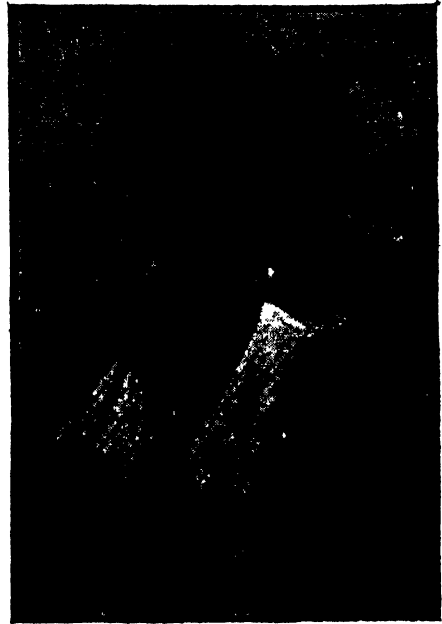
বোম্বাই হাইকোর্টে মিস্ এম্, এ, টাটা প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার হইলেন। ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনার লইয়া বি, এ পাশ করেন। অতঃপর বিলাতে গিয়া প্রথমতঃ লণ্ডনের 'School of Economics' শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে এম্, এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'লিঙ্কনস্ ইন'এ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হয়েন। বিগত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বোম্বাইএ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মিস্ জিন আলউইন

প্রসিদ্ধ গায়িকা ও অভিনেত্রী মিস্ জিন্ আলউইন রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। ওয়েসলিয়ান্ মিশনারীদিগের প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রমে তিনি কুষ্ঠরোগীদিগের পরিচর্য্যা করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প। ত্যাগ ও সেবার এমনই মহিমা যে, কর্ম্মের বেণুরব শুনিলে বিলাসমুগ্ধ আত্মা অনেক সময় জাগ্রত হইয়া উঠে এবং প্রকৃত পথের সন্ধান পায়। মিস্ আলউইন সেই সকল প্রবুদ্ধ নর-নারীর অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরলোকগত লেনিন সম্বন্ধে মার্কিণের অভিমত

রুসিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা, বলশেভিকবাদের পরমভক্ত ও প্রচারক নিকোলাই লেনিন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মত সমগ্র সভ্যজগতে প্রচারিত। বলশেভিক নীতির দ্বারা পরিচালিত রুস গবর্ণমেণ্টের কার্য্যাবলীর সম্যক্ পরিচয় এখনও কেহ ভাল করিয়া পায় নাই, বহু মনীষী প্রতীচ্য পণ্ডিতের এইরূপ ধারণা। আমেরিকা হইতে প্রচারিত Literary Digest পত্রে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। উক্ত সাপ্তাহিক পত্রের মারফতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, লেনিনের মৃত্যুর পরই "চারিদিক্ হইতে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এত দিন অনেকেই তাঁহাকে 'জীবধ্বংসের অগ্রদূত', 'ভীষণ সমাজদ্রোহী', 'রুস রাষ্ট্রবিপ্লবের জুডাস্', 'ভগবানের অভিশপ্ত জীব' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শত শত কণ্ঠে তাঁহার জয়গান সমুত্থিত হইয়াছে। তাঁহার মহত্ত্বকে উদ্দেশ করিয়া অনেকেই তাঁহাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছেন।"

লেনিন।

লেনিনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবার পর জনৈক সংবাদদাতা মস্কো হইতে পত্রান্তরে লিখিয়াছিলেন, "সোভিয়েট কংগ্রেসের বিরাট প্রাঙ্গণে এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সমবেত ব্যক্তিমাত্রেরই নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল।" রুসীয় পঞ্জিকাতে ২১শে জানুয়ারী তারিখ অতঃপর শোকপ্রকাশের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিবে, এমন প্রস্তাবও রুসিয়ায় হইয়াছে। 'Literary Digest' পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন, "সমস্ত রুসিয়ায় লেনিন ভীষণ বিপর্য্যয় ঘটাইলেও, যে রেলপথে গাড়ী করিয়া তাঁহার মৃতদেহ বাহিত হইয়াছিল, সেই দীর্ঘ ২০ মাইল পথের দুই ধারে অসংখ্য লোক শীতের মধ্যে নগ্নশীর্ষে দাঁড়াইয়াছিল।"

যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্ট মহাযুদ্ধের পর ইণ্ডিয়ানার গবর্ণর জেমস্ পি গুড্রিচকে রুসিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগে লেনিন শ্রেষ্ঠ চরিত্রের পুরুষ।" 'Hearst's International Magazine'এর সম্পাদক নরম্যান্ হপ্‌গুড বলেন, "রাষ্ট্রবিপ্লবের পর রুসরাজ্যে লেনিনের প্রভাব সুফল প্রসব করিয়াছে।" নিউইয়র্কের 'কমিউনিটি চার্চ্চের' রেভারেণ্ড ডাক্তার জন্ হেনেস্ হোল্‌ম্‌স্‌এর মতে "যুদ্ধের ফলে লেনিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।" নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'আমেরিকান্' পত্রে আর্থার ব্রিস্‌বেন লিখিয়াছেন, 'ইতিহাসে তিনি চিরপ্রসিদ্ধ থাকিবেন, তিনি যেমন মহৎ, তেমনই অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি।"

মিঃ ব্রিস্‌বেন এই বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "লেনিনের সাফল্য অপূর্ব্ব, পৃথিবীতে এত বড় সাফল্য আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। দীর্ঘকাল স্বপ্নঘোরে কাটাইয়া স্বীয় মস্তকে আর কে তাঁহার মত কার্য্যকারী করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীতে অনেকে বড় বড় বিষয়ের স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু একমাত্র লেনিনই তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। লেনিন আপনার ধারণা সম্বন্ধে অভ্রান্ত ছিলেন। কায়মনোবাক্যে তিনি আপনার মতকে কার্য্যে পরিণত করিতেন। রুসিয়ার ১২ কোটি লোক তাঁহার বিয়োগে কাতর।

তাহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের সে বিশ্বাস কখনও চূর্ণ হইত না।”

ব্রুক্লিন্ হইতে প্রকাশিত ‘সিটিজেন্’ পত্রে লেনিন সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, “লেনিন অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ। তাঁহার চালচলন এবং রুচি অতি সাধারণ—তাহাতে দোষের সংস্পর্শমাত্র ছিল না। রুসিয়ার জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে তাঁহার অকৃত্রিম চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল। কিন্তু তথাপি তিনি শুধু ভাবুক ও কল্পনারাজ্যেরই লোক ছিলেন। এমন লোকের হস্তে ক্ষমতা অর্পিত হইলে সে দেশের পক্ষে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।”

‘নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্’ লিখিয়াছেন, “যে আন্দোলন রুসিয়ায় লেনিন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত নেতাই তিনি। তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতবাদের পরিণাম কি হইবে, সে সম্বন্ধে যাঁহারা সহসা মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাঁহাদিগকে কখনই সুবিবেচক বলা চলে না। ভবিষ্যৎ যুগের ঐতিহাসিকগণ লেনিনের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।”

আমেরিকায় অনেকগুলি সংবাদপত্র যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, আবার অনেকে তেমনই অপ্রশংসাও করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অতি ভীষণ-চরিত্রের লোক বলিয়া বর্ণনাও করিয়াছেন। নিউইয়র্ক হইতে প্রচারিত ‘ইভনিং পোষ্ট’ পত্রই লেনিন সম্বন্ধে গুরু অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লেনিন শক্তিশালী পুরুষ বটে; কিন্তু এই শক্তিই রুসিয়ার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে।

‘নিউইয়র্ক ওয়ার্লড্’ পত্রে লেনিনের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা এইরূপ :—

“লেনিনের প্রকৃত নাম, ভ্লাডিমির ইলিচ্ উলিয়ানফ্। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে এপ্রিল রুসিয়ার অন্তর্গত সিম্‌ব্রিস্ক নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি প্রত্যেক ক্লাশেই শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। ১৭ বৎসর বয়সে উচ্চ প্রশংসার সহিত তিনি গ্রাজুয়েট হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রুসসম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েন। রুসসম্রাট তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। লেনিন ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। পরে রুসসম্রাটের কয়েকজন কর্ম্মচারী কতিপয় খনির শ্রমিকদিগকে হত্যা করায় লেনিনের হৃদয় রাজশক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েন। নিকোলাই লেনিন্ এই ছদ্মনামে তিনি ধারাবাহিকরূপে প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। তদবধি সেই নামেই তিনি পরিচিত।

পেট্রোগ্রাডে কলেজে পাঠকালে বিপ্লবপন্থিদলের সহিত লেনিনের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ২৫ বৎসর বয়সে তিনি সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত হয়েন। তাঁহার অপরাধ-শ্রমিকদিগের দুঃখের অবসানের জন্য তিনি এক শ্রমিকসংঘ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে মুক্তি পাইয়া তিনি মিউনিক্, লণ্ডন ও পরে জেনেভায় যাপন করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে, সেই সময় লেনিন পেট্রোগ্রাডে ছিলেন। তথা হইতে পলায়ন করিয়া তিনি ফিন্‌ল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী নগরীতে যাত্রা করেন। তথা হইতে গ্যালিসিয়ায় গিয়া বল্‌শেভিক অভ্যুত্থানের কর্ণধাররূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি ক্রাকোর্ডে ছিলেন। অষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে সে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুসসম্রাটের পতনের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন রুসিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জার্ম্মাণী তাঁহাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিল। কারেন্‌স্কি তখন রুসিয়ার কর্ণধার।” লেনিন তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেবার সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। পেট্রোগ্রাড হইতে পলায়ন করিয়া তিনি বহু কষ্টে ফিন্‌ল্যাণ্ডে গমন করেন। ট্রট্‌স্কির সাহায্যে কয়েক মাস পরে আবার পেট্রোগ্রাডে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। কারেন্‌স্কির প্রতিষ্ঠিত শাসনপদ্ধতি চূর্ণ হইয়া গেলে লেনিন রুসিয়ার কর্ণধার হইলেন। লেনিন যুদ্ধনিবৃত্তির পক্ষে ছিলেন। য়ুরোপের মহাসমর মিটিয়া গেল, তখন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের তিনি প্রেসিডেণ্ট হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর। তিনি বলিষ্ঠ, কিন্তু খর্ব্বকায়। তাঁহার তীক্ষ্ণ নীল নয়নযুগল বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক।

সমগ্র রুসিয়ার কার্য্যভার এমনই গুরু যে, তাঁহার অনিদ্রারোগ জন্মিয়াছিল। চিকিৎসকদিগের নিষেধ না মানিয়া তিনি সর্ব্বদাই কার্য্যরত থাকিতেন। ইহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অকালে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

অহমদাবাদ

অহমদাবাদের মসজিদগুলি যেমন নূতন ধরণের, কবরগুলোও সেই রকমের। কবর বলিতে আমরা সমাধির উপরে যে বেদী নির্ম্মাণ করা হয়, তাহাও বুঝি, আবার সেই বেদীর উপরে নির্ম্মিত গৃহও বুঝি। মৌলবী সাহেবরা বলেন যে, অহমদাবাদ নগরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বা সুলতান প্রথম অহমদশাহের কবর। যে সমাধিগৃহে কবর আছে, তাহা অহমদাবাদের জুম্মা মস্‌জিদ ও মাণিকচকের রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। নিজ সমাধিমন্দিরের চারিদিকে অনেক
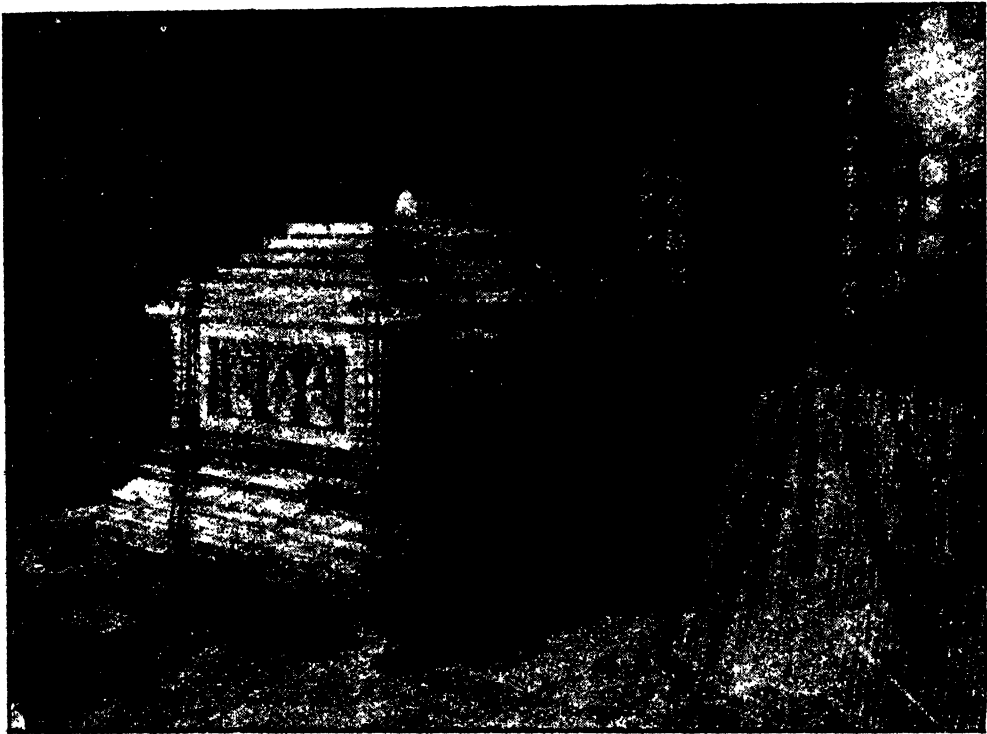
সুলতান প্রথম অহমদশাহের কবর।

সমাহিত শবের উপরে মৃত্তিকা, ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত বেদিকার নাম কবর এবং কবরের উপরে নির্ম্মিত গৃহের নাম মক্‌বরা। গুজরাটের মুসলমান রাজারা যেমন হিন্দু কারিগর দ্বারা মসজিদ গড়িতে গিয়া একটা নূতন আদর্শে মসজিদ তৈয়ার করিয়াছিলেন, সেইরূপ কবর ও মক্‌বরাতেও রকমফের দেখাইয়াছিলেন। গুজরাটের মুসলমান বাদশাহদের কবর দূর হইতে দেখিতে ঠিক হিন্দু বা জৈন মন্দিরের বেদী বা মূর্ত্তির পাদপীঠের মত। এই জাতীয় সর্ব্বপ্রাচীন কবর ছোট বড় বাড়ী তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। সমাধিমন্দিরের যে চিত্র প্রকাশিত হইল, তাহা দক্ষিণদিক হইতে তোলা।

এই সমাধিমন্দিরের চারিদিকের বারান্দা পাতরের জালি দিয়া ঘেরা। এই পাতরের জালি অহমদাবাদের শিল্পীদের একটা বিশেষত্ব। যেখানেই যান, পুরাতন কবরমাত্রেই এই রকম জালির ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। সহরের চারিদিকে পাতরের জালি দেওয়া ছোট বড় অনেক সমাধি-মন্দির আছে। কোনটাতে ছুতারের দোকান, কোনটাতে

পাতরের গুদাম দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কোনটা গোশালায় পরিণত হইয়াছে। এই রকম পাতরের জালি দেওয়া যদি একটা সমাধিগৃহও ভারতবর্ষের উত্তরভাগে কোন যায়গায় থাকিত, তাহা হইলে তাহার শোভার কথা লিখিয়া, প্রাচীন ভারতের শিল্পচাতুরীর বিষয় গলাবাজী করিয়া অনেক লোক বড় হইয়া যাইত। অহমদাবাদের লোক এখনও এই সকল জিনিষের কদর করিতে শিখে নাই।

দেখিলে মনে হয় যে, কোন শিল্পী কবর না গড়িয়া একটি ছোটখাটো হিন্দু বা জৈন মন্দির গড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে খোদাই করা জালির কথা বলিয়াছি, তাহার সব চেয়ে ভাল নিদর্শন সিদী সৈয়দের মসজিদে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ জালি আমাদের দেশের কাচের সার্শির মত, কেবল সার্শির ফ্রেমটা কাঠের বদলে পাতরের এবং কাচের বদলে ছোট ছোট পাতরের জালি বসান আছে। সিদী সৈয়দের মসজিদে পিছনের দিকের দেওয়ালে পাঁচটা খিলান
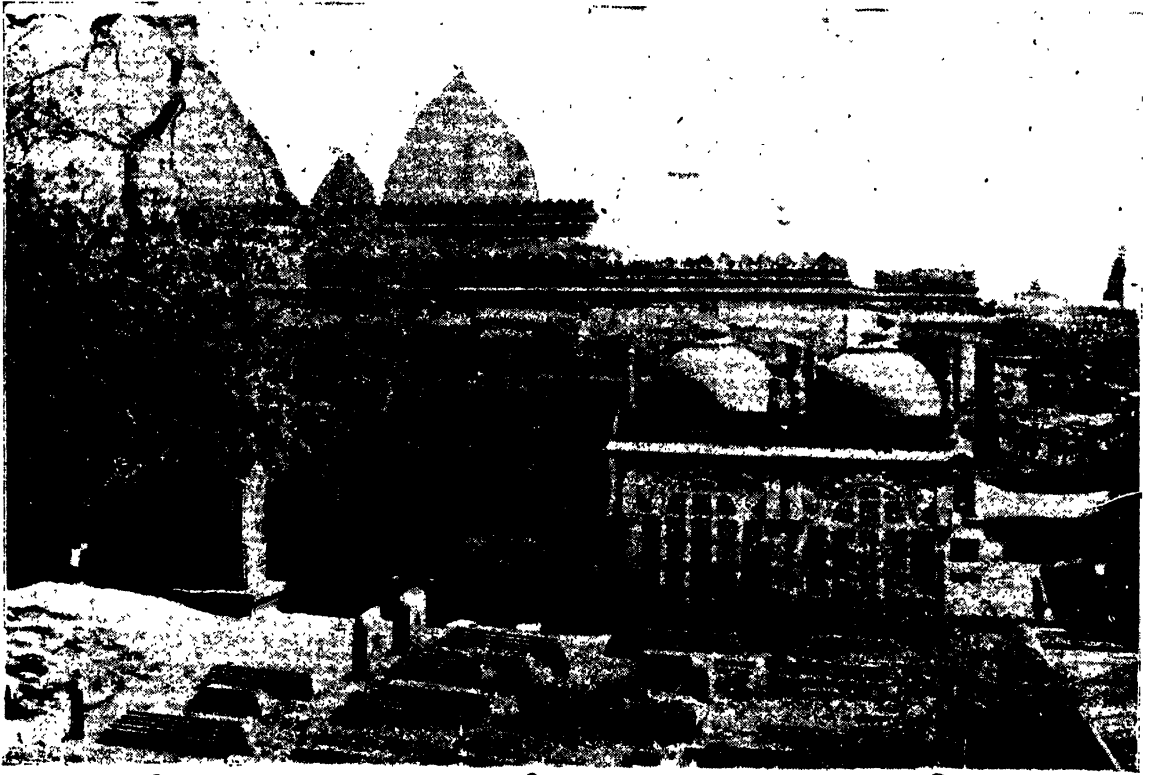
সুলতান প্রথম অহমদশাহের সমাধিমন্দির—মাণিকচক, অহমদাবাদ।

অহমদশাহের কবর শাদা পাতরের তৈয়ারী। ইহার উপরের—"তাবিজ" না থাকিলে হয় ত এই কবরটিকে আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরের শ্বেত পাতরের বেদী বলিয়া ভ্রম হইত। কবরের চারি কোণে চারিটি হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ এবং এই স্তম্ভের মধ্যে আবু পাহাড়ের জৈন মন্দিরের মণ্ডপে যেমন শাদা পাতরের সারি সারি তোরণ আছে, সেইরূপ; কিন্তু ছোট তোরণ খোদা আছে। প্রত্যেক তোরণের কোণ হইতে একটি ছোট দীপাধার ঝুলিতেছে। তোরণগুলি দূর হইতে

আছে। তাহার মধ্যে একটা একেবারে ভরাট আর দুইটিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের জালি আছে। অবশিষ্ট দুইটি খিলানে যে রকম জালি আছে, তাহা অন্য কোথাও নাই। বড় বড় পাতর কাটিয়া তাহা হইতে বড় গাছ, লতা, পাতা, তালগাছ প্রভৃতি কোদিয়া বাহির করা হইয়াছে। এবং এই জালি দেখিতে দেশবিদেশ হইতে লোক অহমদাবাদে আসে।

প্রথম অহমদ শাহের রাণী বা বেগমদিগের সমাধিতে এক রকমের নূতন জালি দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি ঠিক

জালি নহে। কারণ, ইহার ভিতর দিয়া আলো বাতাস আসিতে পায় না। এগুলি perforated নহে, কেবল উপরে খোদাই করা। নিকটে গিয়া না দেখিলে এগুলি যে পূরা জালি নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ইহাতে কাচের সার্শির মত ফ্রেম আছে এবং ফ্রেমের ভিতরে চারি কোণা ছোট ছোট খোদাই করা পাতর বসান আছে অথচ আলো বাতাস আসিবার উপায় নাই।

সিদী সৈয়দের মসজিদের বড় জালি।

অহমদাবাদ সহরের ভিতরে সমস্ত মকবরা বা সমাধিগৃহের

সিদী সৈয়দের মসজিদের বড় জালি
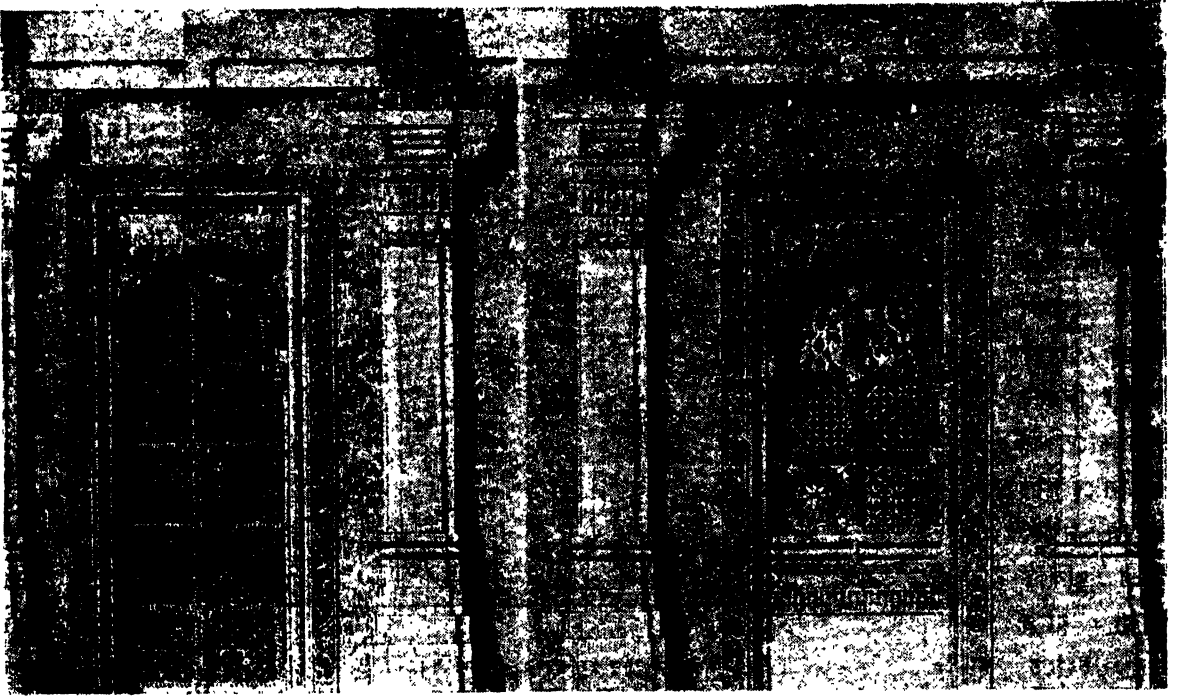
মাণিকচকের বেগমদিগের সমাধি মন্দিরের জালি।

মধ্যে অষ্টোডিয়া দরওয়াজার নিকটে রাণী সিপ্রি বা সিপারীর সমাধিমন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এই মহিলা কে ছিলেন, তাহা এখন আর বলিতে পারা যায় না। লোক বলে যে, ইনি হিন্দুর কন্যা এবং প্রথম মহমুদ শাহের স্ত্রী। এ কথা সত্য কি না, তাহা স্থির করিবার কোনই উপায় নাই। রাণী সিপ্রির সমাধিমন্দিরটি এখন অহমদাবাদের যে পাড়ায় অবস্থিত, সেই পাড়ায় এখন ছিপারা বাস করে। ছিপা বলিতে যাহারা কাপড় রং করে, তাহাদিগকে বুঝায়। এখন পাড়ার ছিপারা প্রবল হইয়া রাণী সিপ্রির সমাধিমন্দির ও মসজিদ অধিকার করিয়াছে। মসজিদটি তাহারা নমাজের জন্য ব্যবহার করে এবং ইহার ভিতরে পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল বসে। সমাধিগৃহের মধ্যে সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিষপত্র রাখা আছে। এই সমাধিগৃহটি ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর। যদি এই সমাধিগৃহ অহমদাবাদে না থাকিয়া অন্যস্থানে থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক লোকের মুখে ইহার নাম শুনিতে পাওয়া যাইত। ইহা তাজমহলের ন্যায় শ্বেত মর্ম্মরে তৈয়ারী নহে বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে ইহা নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগ এতমাদ্দৌলার সমাধি অপেক্ষা হীন নহে। পাশ্চাত্য লেখকরা তাজমহল সম্বন্ধে বলিতেন যে, ইহা মর্ম্মরনির্ম্মিত স্বপ্ন (A dream in Marble) রাণী সিপ্রির সমাধি সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায় যে, it is a dream in yellow stone. সমাধিগৃহ ও নিকটের ছোট মসজিদটি একটি উচ্চ চাতাল বা মঞ্চের উপরে নির্ম্মিত। সমাধি-গৃহের ন্যায় মসজিদটিও ছোট এবং এই মসজিদের ছোট ছোট মিনারগুলি অতি সুন্দর।

নিজ অহমদাবাদ সহরের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য মক্‌বরা আর কাহারও নাই। সহরতলীতে অনেক সুন্দর সুন্দর সমাধি-গৃহ ও কবর আছে এবং এই সকলের মধ্যে আসার্ব্বার বাজী হরীরের, সমাধি রাখিয়ালের মালিক শাবানের সমাধি, এবং প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু সেখ শাহ আলমের সমাধি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সমাধির মধ্যে রসিয়া বীবীর সমাধি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। বাজী হরীরের সমাধি সহরের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। এই স্থানে বাজী হরীরের স্মৃতিবিজড়িত তিনটি সৌধ আছে। এই সৌধত্রয় অহমদাবাদ হইতে অহমদনগর-ইদর বা প্রান্তিজ যাইবার যে ছোট রেলপথ

আছে (Ahamadabad Prantij Railway)। এই রেলপথে অহমদাবাদের পরে প্রথম ষ্টেশন আসার্ব্বা। এই ষ্টেশনের বাহিরে বাঈ হরীর নির্ম্মিত সমাধিত্রয় অবস্থিত।

বাঈ হরীর বহু অর্থব্যয় করিয়া এই স্থানে একটি কূপ খনন করাইয়াছিলেন এবং এই কূপের উপরে প্রথম সৌধটি নির্ম্মিত হইয়াছে। কূপের উপরে প্রাচীন গুজরাটে কি প্রকার সৌধ নির্ম্মিত হইত, তাহা উত্তর-ভারতবর্ষের লোকের নিকটে এখনও অজ্ঞাত। গুজরাটে আশী বা একশত হাত নীচে জল পাওয়া যায়। জল তুলিবার জন্য মশক ব্যবহৃত হয় এবং দুই জোড়া বা চারি জোড়া বলদ এই মশক টানিয়া তোলে। গুজরাটের এক একটি কূপ এক একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ বলিলেও চলে। বড় বড় কূপগুলি এত বৃহৎ যে, তাহার ভিতরে দুই তিনটি হস্তী একসঙ্গে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী পাটনে চালুক্যবংশের এক রাণী এই জাতীয় একটি প্রকাণ্ড কূপ খনন করাইয়াছিলেন। পাটনের প্রাচীন নাম অনহিল পাটক বা অনহিলবারা পাটন। এই নগর এখন বরোদার গায়কবাড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, পাটনে যাইতে হইলে অহমদাবাদ হইতে আজমীর যাইবার রেলপথে মেশানা ষ্টেশনে নামিয়া শাখা রেলপথ অবলম্বন করিয়া পাটন নগরে পৌছান যায়। পাটন নগরে চালুক্যবংশের রাণীর কূপের মধ্যে একটি ত্রিতল প্রাসাদ আছে। প্রাসাদটি প্রস্তরনির্ম্মিত এবং কূপের জল তুলিবার পথের চারি পার্শ্বে এই প্রাসাদটি নির্ম্মিত। প্রাসাদের এক দিক্ মুক্ত এবং উপর হইতে জলে পৌছিবার জন্য এই মুক্ত স্থানে এক প্রকাণ্ড সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। এই সোপানশ্রেণীর উপরে সমান্তরালে একতল, দ্বিতল বা ত্রিতল প্রমোদগৃহ আছে। গ্রীষ্মকালে উৎসবের সময়ে নাগরিকগণ এই সমস্ত প্রমোদ-গৃহ ব্যবহার করিত। অহমদাবাদের উত্তরে প্রায় বার ক্রোশ দূরে আদালজ নামক স্থানে এই জাতীয় আর একটি বৃহৎ কূপ আছে। পাটন, আদালজ ও অহমদাবাদের বাঈ হরীরের কূপ পাষাণনির্ম্মিত। অহমদাবাদের দক্ষিণে মাহী নদীর তীরে মহমুদাবাদ নগরে আর একটি বৃহৎ কূপের
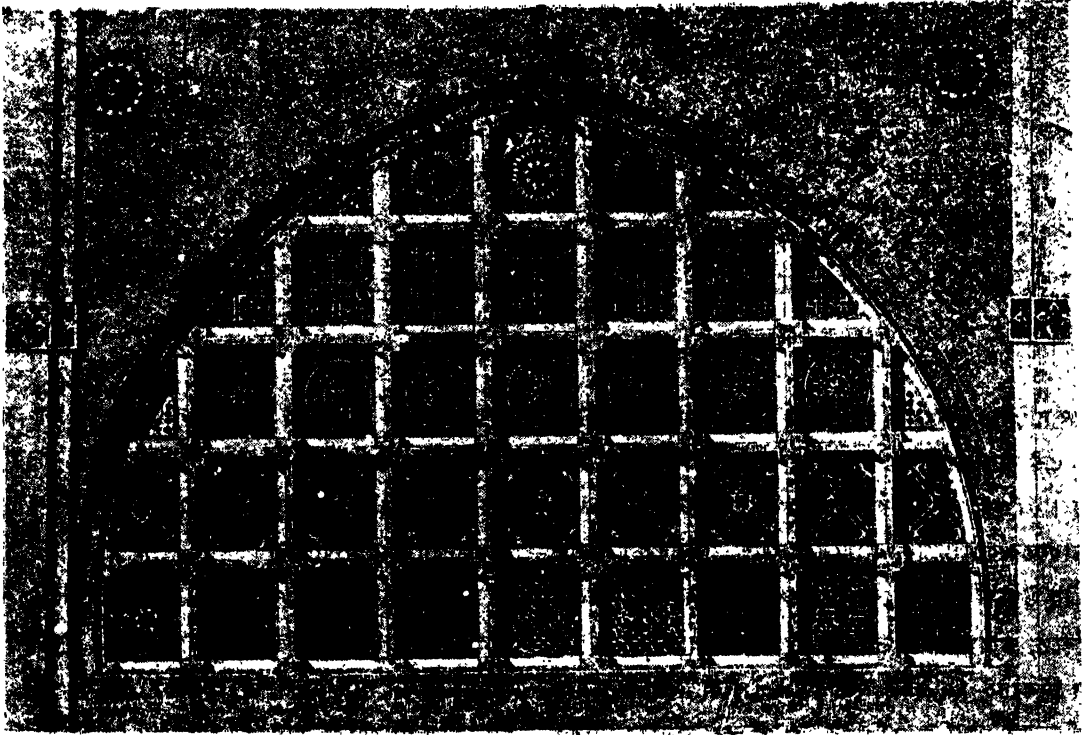
সিদী সৈয়দের মস্‌জিদের ছোট জালি

চারিদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ ও সোপানশ্রেণী আছে। মহমুদাবাদের এই কূপের নাম ভমরিয়া বাব বা ভ্রামরিক কূপ। রাজপুতানী ও গুজরাটী ভাষায় কূপের নাম বাব বা বাঙ্গী।

বাঈ হরীরের কূপ সুন্দর, সুদৃশ্য, হরিদ্রাবর্ণের পাষাণ-নির্ম্মিত। ইহাতেও তিনটি তল আছে। সুদীর্ঘ সোপান-শ্রেণীর উপরে তিন চা'রটি প্রমোদগৃহ আছে। প্রাসাদ ও কূপ হরিদ্রাবর্ণের পাষাণনির্ম্মিত। কূপের পার্শ্বেই বাঈ হরীরের সমাধিগৃহ ও মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। মস্‌জিদটি ক্ষুদ্র এবং চারিটি দুয়ারবিশিষ্ট। ইহার মধ্যস্থলে একটি কক্ষ আছে এবং কবর সেই কক্ষের মধ্যে অবস্থিত। কক্ষের চারিদিকে খোলা বারান্দা আছে এবং এই বারান্দার চারি কোণে চারিটি বসিবার বেঞ্চ আছে। বেঞ্চ চারিটির পশ্চাদ্ভাগ গুজরাট, মালব ও মধ্যভারতের মণ্ডপের আসনের ন্যায় খোদিত। বেঞ্চ চারিটির উপরে দুটিতে যে ইটের দেওয়াল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। সমাধি-গৃহের নিকটেই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত। পূর্ব্বে সম্রান্ত মুসলমানের দেহ সমাহিত করিবার পূর্ব্বে যে জনাজা নামক মন্ত্র পাঠ করা হইত, সেই স্থানে একটি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইত। দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর নগরে মহম্মদ আদিল শাহের গোল গুম্বজ নামক সমাধিগৃহের নিকটে, দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের সমাধিগৃহের নিকটে এবং আগ্রার তাজমহলের নিকটে এইরূপ মস্‌জিদ আছে।

বাঈ হরীরের সমাধির মস্‌জিদ নূতন ধরণের, ইহার সম্মুখে তিনটি খিলান আছে এবং এই সমস্ত খিলানের মধ্যে দুইটি ছোট পাতরের জানালা আছে, জানালা দুইটি হিন্দুমন্দিরের জানালার বা গবাক্ষের অনুকরণে নির্ম্মিত। মস্‌জিদের মধ্যের ছাত গুম্বজাকৃতি এবং অতি উচ্চ। এই মন্দিরের পাতরের খোদাইর কাজ অতীব সুন্দর এবং ভারতের শিল্প ইতিহাসে ইহার স্থান রাণী সিপ্রির সমাধি-মন্দির ও মস্‌জিদের নিম্নে। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে এত অধিক মিহি ও সুন্দর খোদাইয়ের কাজ ভারতবর্ষে অধিক স্থানে দেখা যায় না।

সিদী সৈয়দের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ

অহমদাবাদ সহরের পূর্ব্বদিকে সহরতলীর মধ্যে মালিক শাবানের সমাধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অহমদাবাদের রেলের ষ্টেশন পার হইয়া কাঁচা রাস্তা ধরিয়া এক ক্রোশ পথ গেলে রাখিয়াল গ্রাম পাওয়া যায়। রাখিয়াল গ্রাম ক্রমশঃ বড় বড় বাড়ীতে ভরিয়া যাইতেছে। অহমদাবাদ

নগরের উন্নতির সহিত হিন্দু ও মুসলমান ধনীরা সহর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া বাস করিতেছেন। রাখিয়াল গ্রামে সমাধি-মন্দির ও মসজিদগুলি ক্রমশঃ বেদখল হইবার উপক্রম হইয়াছে। মালিক শাবানের সমাধি-গৃহের অনতিদূরে এক জন ধনী গুজরাটী হিন্দু একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই প্রাসাদের উদ্যান মালিক শাবানের সমাধির উদ্যানের পার্শ্বে আসিয়া লাগিয়াছে। মালিক শাবানের সমাধির বর্ত্তমান অধিকারী এক জন দরিদ্র মুসলমান, সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই সুন্দর সমাধি-গৃহ হিন্দুর উদ্যানের শোভা বর্দ্ধন করিবে। কারণ, অন্নাভাবে অহমদাবাদের সুন্নি মুসলমানেরা সমাধি-গৃহ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন্। মালিক শাবানের সমাধি আকারে ও প্রকারে বাঈ হরীরের সমাধির ন্যায়; কিন্তু ইহা তুলনায় অতি বৃহৎ। একটি বৃহৎ কক্ষের চারি পার্শ্বে চারিটি বারান্দা আছে। কক্ষের মধ্যে মালিক শাবানের কবর অবস্থিত এবং এই কক্ষে দুইটিমাত্র দুয়ার আছে। একটী দুয়ার পশ্চিমদিকে এবং অপরটি দক্ষিণদিকে। পশ্চিম দিকের দুয়ারের দুই পার্শ্বে দুইটি শ্বেত পাতরের কুলুঙ্গী আছে এবং প্রত্যেক কুলুঙ্গীতে এক একটি আরবী শিলালিপি আছে। এই শিলালিপি দুইটি একইরূপ এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, গুজরাটের স্বাধীন রাজা দ্বিতীয় অহমদ শাহের রাজ্যকালে জমাদী-উল্-আউওয়ল্ মাসের দ্বিতীয় তারিখে ৮৫৩ হিজিরাব্দে অর্থাৎ ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে মালিক শাবানের মৃত্যু হইয়াছিল এবং এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মালিক শাবানের সমাধি-গৃহ একটি বিস্তৃত উদ্যান-মধ্যে অবস্থিত এবং এই উদ্যানসমূহের জলপ্রণালী ও ফোয়ারা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং এই বেষ্টনীর চারি কোণে চারিটি গুম্বজ আছে। গুম্বজগুলি অতি সুন্দর এবং স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। সমাধি উদ্যানের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশদ্বার আছে। উত্তরদিকের প্রবেশদ্বারে ষোলটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি মণ্ডপ বা গৃহ আছে। এই গৃহের স্তম্ভগুলি কোনও হিন্দু বা জৈন মন্দির হইতে সংগৃহীত। সমাধিক্ষেত্র বা উদ্যানের বাহিরে প্রাচীরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটি সোপানশ্রেণীসমন্বিত কূপ বা বাব আছে, এই কূপের উপরে যে সমস্ত প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার গঠনপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এককালে এই কূপের জল উঠাইয়া সমাধি-মন্দিরের চারি পার্শ্বের উদ্যানে, পয়ঃপ্রণালীতে এবং ফোয়ারায় ব্যবহার করা হইত।

দরিয়া খাঁর সমাধি অহমদাবাদ সহরের প্রাচীরবেষ্টনীর দিল্লীর দরোয়াজা হইতে যে আধুনিক পথ সাড়ি বা উদ্যান-প্রাসাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছে, তাহার পশ্চিমদিকে আজমীর রেল লাইনের নিকটে অবস্থিত। এত বড় সমাধি-মন্দির অহমদাবাদ সহরে আর নাই। এই সমাধি-গৃহটি ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং ইষ্টকনির্ম্মিত সমাধি বা মসজিদ অহমদাবাদ সহরে বা সহরতলীতে অত্যন্ত বিরল। এই সমাধিতে মধ্যস্থলের কক্ষে কবর আছে এবং কক্ষের চারি পার্শ্বে চারিটি বারান্দা আছে। এই কক্ষ এবং বারান্দাগুলি সমস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত। নির্ম্মাণের বিশেষত্ব এই যে, এই সমাধি-মন্দিরের কোন স্থানে কাষ্ঠের বা প্রস্তরের কড়ি বা বরগা ব্যবহৃত হয় নাই। সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত খিলান এবং তাহার উপরে নির্ম্মিত গুম্বজ। এই দরিয়া খাঁ কে ছিলেন এবং কোন্ সময়ে তাহার সমাধি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। এই সমাধি-মন্দিরের নিকট একটি ক্ষুদ্র জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহা এককালে সমাধিমন্দিরের উদ্যানের অন্তর্গত ছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান

২

গৌড়ের বাদসা হুসেন সার বিচারসভায় যবন হরিদাস কেন যে মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ ক'রেছেন, সে বিষয়ে হরিদাসের কৈফিয়ৎ শুনে সভাস্থ সকল মুসলমান সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের কথা যদি সত্য ব'লে মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে—

"হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য বচন
শুনিয়া সন্তোষ হইল সকল যবন।"

সম্ভবতঃ—হরিদাসের এই কথাটাই সকলের কাছে সুসত্য ব'লে মনে হয়ঃ—

"শুন বাপ! সভারই একই ঈশ্বর।
নাম মাত্রে ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥"

আজকের দিনে এ কথা ভরসা ক'রে বলা যায় যে, প্রায় সকল ধর্ম্মেরই ঐ হচ্ছে মূল কথা। সুতরাং একটি তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, ধর্ম্মমতের সঙ্গে ধর্ম্মমতের মূলত কোনও প্রভেদ নেই। অথচ এক ধর্ম্মাবলম্বীদের সঙ্গে আর এক ধর্ম্মাবলম্বীদের অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘোর বিরোধ আছে। তার কারণ, সকল ধর্ম্মের ভিতর যা সামান্য তা নিয়ে সকল ধার্ম্মিকদের মধ্যে সদ্ভাব ঘটে না, কিন্তু প্রতি ধর্ম্মের ভিতর যে বিশিষ্টতা আছে, তাই নিয়েই ধার্ম্মিকে ধার্ম্মিকে পরস্পর মারামারি করে। এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এ জ্ঞান যাঁর মনে উদয় হয়েছে, তিনি আর ধার্ম্মিক থাকেন না, তিনি হন দার্শনিক।

যবন হরিদাসের মুখে ধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনে সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ব'লে তিনি যে এ বিচারে বে-কসুর খালাস পেয়েছিলেন, তা নয়; ধর্ম্মের সঙ্গে সব দেশেই সামাজিক আচার ব্যবহার জড়িত থাকে, আর এ কালে উপরন্তু তার সঙ্গে মানুষের পলিটিকাল স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের যে বিরোধ ঘটেছিল, তা হচ্ছে মূলত আচারগত; আর এ বিরোধ অনেকটা পুষ্ট হয়েছিল, পলিটিকাল কারণে। সে কালে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথমতঃ অব্রাহ্মণের ধর্ম্ম ছিল, তার পর সে ধর্ম্ম তুরস্ক যবন প্রভৃতি বরণ ক'রে নিয়েছিল। অশোক ছিলেন শূদ্র, কানিষ্ক ছিলেন তুরস্ক ও মিনিন্দ ছিলেন যবন অর্থাৎ গ্রীক। রাজার ধর্ম্মের সঙ্গে রাজনীতির যে সম্বন্ধ থাকবে সে কথা বলাই বাহুল্য। যবন হরিদাসকে রাজশাসনে যথেষ্ট শাস্তিভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে গৌড়ের বাদসার কাছে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা' থেকেই দেখা যায় যে, ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করাটাই তাঁর প্রধান অপরাধ ব'লে গণ্য হয় নি। সে অভিযোগটি যে কি, তা একবার স্মরণ করা যাক্। বৃন্দাবনদাস বলেন যে—

"কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিলেন তাহান সকল বিবরণে॥
যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারি আনি করহ বিচার॥"

হরিদাসের বিরুদ্ধে এ নালিস কাজি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিম্বা হিন্দুদের প্ররোচনায় করেছিলেন, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। চৈতন্য ভাগবতের কোন কোন পুঁথিতে উপরের চারি পংক্তির এইরূপ পাঠ আছেঃ—

পাষণ্ডীর গণ দেখি মরয়ে জ্বলিয়া।
দশে পাঁচে যুক্তি করে একত্রে মিলিয়া॥
যবন হইয়া করে হিন্দুয় আচার।
কোনখানে না দেখি এমত অবিচার॥
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি স্থানে।
কহিব যে ইহার সব বিবরণে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
ভালমতে আনি শাস্তি করুক উহারে॥
এমত যুকতি করে পাষণ্ডীর গণ।
যবন রাজার স্থানে কৈল নিবেদন॥

উপরি-উক্ত কথাগুলি যদি সত্য হয়,তা হ'লে হরিদাসের উপর অত্যাচারের দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপান যায় না। কারণ, যে সকল ব্রাহ্মণ চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, বৃন্দাবন দাস তাঁদেরই পাষণ্ড নামে অভিহিত করেন।

যদি কেউ যবন হয়ে হিন্দুর আচার করে, তবে হিন্দুর আপত্তি কি? হিন্দুর আপত্তি এই জন্যে যে, হিন্দু অপর কারও আচার নিজে অবলম্বন করতে চায় না, আর অপর কাউকেও নিজের আচার অবলম্বন করতে দিতে চায় না। এ ছাড়া বৈষ্ণবদের একটি আচারের প্রতি সেকালের ব্রাহ্মণ-সমাজের ভয়ঙ্কর আক্রোশ ছিল। হরিদাসের আচার ছিল এই যে, তিনি,—

গঙ্গাস্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব-স্থান॥

কে কোন্ নদীতে স্নান করবে, সে সম্বন্ধে আশা করি বাঙ্গালার নবাবী আমলেও কোনরূপ বিধি-নিষেধ ছিল না। সুতরাং ধ'রে নিচ্ছি যে, গঙ্গাস্নানের অপরাধে তিনি রাজ-দরবারে অভিযুক্ত হন নি। তিনি যে "হরিনাম উচ্চ করি লইয়া বুলেন," এইটেই বোধ হয় সেকালের ব্রাহ্মণদের মতে মহা অনাচার ব'লে গণ্য হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা যে উচ্চস্বরে নামকীর্ত্তন করা ভালবাসতেন না, তার অসংখ্য উল্লেখ চৈতন্য-ভাগবতে আছে। নিম্নে তার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি:—

হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি, ক্রোধে বোলয়ে বচন॥
"অয়ে হরিদাস! এ কি ব্যাভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা, এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই পণ্ডিত সভা বোলহ ইহাতে॥

উত্তরে হরিদাস বক্ষ্যমাণ শ্লোক আবৃত্তি করলেন:—

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ॥"

এবং তৎপরে তার ভাষায় ব্যাখ্যা করলেন। সে ব্যাখ্যার ফল হ'ল এই,—

"সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন॥
'দরশনকর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদপথ হয় দেখি নাশ॥
যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিব বাখানে।
এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে॥
এইরূপে আপনারা প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস বুলিয়া॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কান কাটি ফেলি আগে'॥"

অবশ্য এরূপ উচ্চ মনোভাব কোনও ব্রাহ্মণসন্তানের যে হ'তে পারে, আজকের দিনে আমরা তা কল্পনাও করতে পারিনে। এ যুগে আমরা সেই সব যবনকেই বেদ-বেদান্তের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু ব'লে মান্য করি, যাঁদের জন্মভূমি হচ্ছে কালাপানির ওপারে। তবে আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য যে, শুধু যবন হরিদাসের বিরুদ্ধে নয়, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের উপর অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদেরও সমান আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনদাস বলেছেন যে:—

"কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সভাই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণ নাম দিয়া করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডে পাষণ্ডে মেলি বলগিয়াই মরে॥
এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হইতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামন-গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক-কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥
গোসাঞীর শয়ন হয় বর্ষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞী।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাঞি॥

কেহ বোলে, যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥".

এর থেকেই অনুমান করা যায় যে, খুব সম্ভবত—"মুলুকের অধিপতি স্থানে" যবন-হরিদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ "পাষণ্ডীরাই" আনেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা হরিদাসকে রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত ক'রে তাঁদের বৈষ্ণব-হিংসা চরিতার্থ করেন। বিশেষতঃ যখন তাঁদের ভয় ছিল যে, উচ্চস্বরে নামকীর্ত্তন করলে দেশে দুর্ভিক্ষ হবে। ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে যখন ঐহিক স্বার্থের রাসায়নিক যোগ হয়, তখন তা অতি মারাত্মক বস্তু হয়ে ওঠে। তা সে স্বার্থজ্ঞান পলিটিকালই হোক্ আর ইকনমিকই হোক্।—কোনও ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অবশ্য তাঁরা আন্‌তে পারতেন না। "ব্রাহ্মণ হইয়া করে হিন্দুর আচার"—এ আরজি কাজীতেও পত্রপাঠ ডিসমিস করতেন এবং সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে ফরিয়াদীকেও পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিতেন। যবন হরিদাসের মুখে তাঁর ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যান শুনে, যদিচ সভাস্থ সকল যবন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, তবুও যে তিনি নিস্তার পাননি, তার কারণ :—

সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা, "শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট, আরো দুষ্ট করিব অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেকে উহার শাস্তি কর ভাল মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে॥"

কাজী সাহেবের কাছে এ কথা শুনে,—

পুন বলে মুলুকের পতি, আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব কাজীগণে।
বলিবাও পাছে আর লঘু হৈবা কেনে॥

উত্তরে হরিদাস বলেন যে,—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তভো আমি বদনে না ছাড়ি হরি নাম॥

তার পর—

শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি॥"

কাজী বোলে, বাইশ বাজারে নিঞা মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥

* * * *

পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জ করি কহে।
"এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেন হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তারে॥"
পাপীর বচনে সেহ পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥

কাজী কাকে বলে, তা আমি ঠিক জানি নে। কিন্তু হরিদাসের বিচারে বৃন্দাবন দাসের রিপোর্ট প'ড়ে মনে হয় যে, কাজী হচ্চেন সেই জাতীয় জীব—আজকাল আমরা যাঁকে বুরোক্রাট বলি।—কারণ, বুরোক্রাটের সকল লক্ষণই এই কাজীর দেহে স্পষ্ট দেখা যায়। হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর প্রধান অভিযোগ এই যে, হরিদাস "যবনকুলের অমহিমা আনিবেক—" ভাষান্তরে রাজার জাতের prestige নষ্ট করবে। দ্বিতীয় কথা হরিদাসের শাস্তি preventive হিসাবেই হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, "এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিব অনেক।" তার পর কাজীর মতে শাস্তিটে exemplary হওয়া চাই; তার নিজের কথা এই "এতেকে উহার শাস্তি কর ভাল মতে।" তার পর কাজী রায় দিলেন যে, হরিদাসকে "বাইশ বাজারে নিঞা মারি—" অর্থাৎ প্রকাশ্যে তার শাস্তিবিধান করতে হবে, যাতে ক'রে তার শাস্তি দেখে আর কেউ প্রাণের ভয়ে "যবনকুলের অমহিমা" না আনতে পারে।

"বাইশ বাজারে মারাটা" একটা নূতন শাস্তি বটে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, সাত ঘাটে জল খাওয়ানই যথেষ্ট শাস্তি। তার উপর আবার বাইশ বাজারে মার খাওয়ান একটু বেশী হয়। তবে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, মারের মাত্রাটা তেমন মারাত্মক ছিল না, কেন না, মারের মত মার দিলে, এক বাজারেই হরিদাসকে পটল তুলতে হয়। এ অনুমান যে সঙ্গত, তার প্রমাণ বাইশ বাজারে মার খেয়েও হরিদাসের প্রাণ-বিয়োগ হয় নি, শেষটা তিনি শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। হরিদাসের সমসাময়িক কোন ব্যক্তি যদি য়ুরোপে তার ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করত, তা হ'লে তাকে জ্যান্তে পুড়িয়ে মারা হ'ত।

কাজী যে বুরোক্রাট, তার প্রধান প্রমাণ এই যে, হুসেন সা কাজীদের কথা শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন—যদিচ হরিদাসকে শাস্তি দিতে মোটেই তাঁর ইচ্ছে ছিল না। আজকের দিনেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বুরোক্রাটদের কথা ঠেলে ভারতবর্ষের সেক্রেটারীদের কিছু করবার শক্তি নেই। ক্ষমতা যে নেই, তা তিনিই জানেন, যিনি লর্ড মর্লির জীবনস্মৃতি পড়েছেন।

পূর্ব্বোক্ত দলীলের বলেই প্রমাণ হয় যে, মুসলমান আমলে religious কারণে হিন্দুদের উপর তাদৃশ পীড়ন হ'ত না, হ'ত সুধু political কারণে। আজকাল কোনও কোনও ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমান নিজেদের যেরূপ ঘোর fanatic ব'লে প্রচার করছেন, নবাবী আমলে তাঁদের জাতভাইরা যে তদ্রূপ ঘোর fanatic ছিলেন, তার প্রমাণ মুসলমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে পাওয়া যায় না। যে কারণে সেকালের ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণবদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই কারণে কাজীরা হরিদাসের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন,—প্রভুত্ব নষ্ট হবার ভয়ে।

পাঠান বাদশাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালার কোন স্থলে যে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুর নিগ্রহ হয়নি, এমন কথা অবশ্য আমি বলতে চাইনে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে, হিন্দুর উপর মুসলমান কাজীর দৌরাত্ম্যের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থ সম্রাট হুসেন সাহের কালে রচিত হয়। বিজয় গুপ্ত বাথরগঞ্জের লোক। তাঁর বর্ণিত ঘটনা যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বীকার করতে হয়, হুসেন সাহের আমলেও হিন্দুধর্ম্মের উপর অত্যাচার করবার প্রবৃত্তি কোন কোন কাজী সাহেবের ছিল। বিজয় গুপ্ত বলেন যে, হোসেনহাটি গ্রামের নিকট হাসন হোসন দুই ভাই মুসলমান ছিল।

কাজিয়ানী করে তারা, জানে বিপরীত।
তাদের সম্মুখে নাই হিন্দুয়ানী রীত॥

হোসেন-কাজীর "দুলা" নামক একটি শ্যালক ছিল। সে নাকি :—

যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাৎ॥
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা॥
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তার কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥

এ সকল কথা সত্য হলেও হ'তে পারে। কেন না, প্রজার উপর রাজ-শ্যালকের অত্যহিত অত্যাচার হিন্দু যুগেও যে ছিল, তার প্রমাণ মৃচ্ছকটিক নাটক। আর হোসেন-শ্যালকের অত্যাচার চড়-চাপড়ের উপরে ত ওঠেনি। স্বয়ং কাজী সাহেবও হিন্দুদের উপর মারপিট করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাগের যথেষ্ট কারণ ছিল। কাজী সাহেবের মোল্লাকে কতকগুলো গয়লার ছেলে মিলে অযথা প্রহার দেয়। মোল্লা তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কাজীর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে—

"হের দেখ দাড়ী নাহি মুখে রক্ত পড়ে।
দন্ত ভাঙ্গিয়াছে মোর চোপড়চাপড়ে॥
পরিধান ইজার আমার দেখ সব ভাঙ্গা।
ছাগলের রক্তে দেখ মুখ মোর রাঙ্গা॥"

মোল্লার কথা—

শুনিয়া কোপিল কাজী, চারিদিকে চায়॥
হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছোমরা।
এড়ারুটি খাওয়াইয়া করিব জাতিমারা॥

মুসলমানী-যুগের যে সকল বাঙ্গালা রচনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তার মধ্যে অপর কোনও গ্রন্থে হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষের এতাদৃশ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ক্ষেত্রে কাজী-সাহেব অসাধারণ fanaticismএর প্রমাণ দেন নি। আজকের দিনেও যদি ছোকরার দল, কোনও খৃষ্টান-পাদ্রীকে ও ভাবে নিগ্রহ করে, তা হ'লে এ কালের শাসনকর্ত্তাদের হাতে তাদের সমান নিগৃহীত হ'তে হয়। তার পর কাজী হচ্ছেন magistrate, সুতরাং ন্যায়তঃ তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে ছোকরাদের ও রকম বে-আইনী কাযের জন্য শাস্তি দেওয়া। আর এক কথা, এ ক্ষেত্রে হোসেন-কাজী মুখে যা বলেছিলেন, কার্য্যতঃ তা করেন নি।

কাজীর মাতা ছিলেন হিন্দুর কন্যা; এবং তাঁর কথামতই হাসন হোসেন দুভাই হিন্দুদের মারপিট না ক'রে নিজেরা বয়েদ লেখা তাবিজ ধারণ করেন।

এ ঘটনা সম্ভবতঃ বিজয় গুপ্তের সম্পূর্ণ মনগড়া। দ্বিজ বংশীবদনের মনসা-মঙ্গলে, ঐ একই ঘটনার একই রকম বর্ণনা আছে, যদিচ দ্বিজ বংশীবদন, বিজয় গুপ্তের দু'শ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বহুকাল পাশাপাশি বাস করবার ফলে, হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কি মনোভাব জন্মেছিল, তার পরিচয় দ্বিজ বংশীবদন জনৈক মুসলমানের প্রমুখাৎ দিয়েছেন,—

"তার মধ্যে এক জন জাতি মুসলমান।
সে বলে উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান॥
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু-মুসলমানে।
যার তার কর্ম্ম সেই করে ধর্ম্মজ্ঞানে॥
সকলের কুলাচার সৃজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য্য নাই॥"

আমি এ পর্য্যন্ত পাঠান যুগের বঙ্গসাহিত্য থেকে সে যুগের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর সম্বন্ধের সন্ধান নিতে চেষ্টা করেছি। বারান্তরে মোগলযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অশ্বিনীকুমার স্মৃতি-ভাণ্ডার

বরিশালের মাতৃপূজার পুরোহিত—আত্ম-নিবেদিতপ্রাণ, স্বনামধন্য, নেতা স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি স্মৃতি-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতির পক্ষ হইতে দেশমান্য নেতৃবৃন্দ সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিম্নের আবেদনপত্রখানি প্রচার করিতেছেন :—

আবেদন

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি স্থায়িভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় উপযুক্ত লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশিমবাজারের মহারাজা, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সতীশরঞ্জন দাশ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সার কৈলাসচন্দ্র বসু, সার নীলরতন সরকার, ময়মনসিংহের মহারাজা, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার চন্দ, কিশোরীমোহন চৌধুরী, রাজা রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, মাননীয় মৌলভী এ, কে, ফজলল হক প্রমুখ জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বঙ্গের নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী ও প্রধানগণকে লইয়া একটি স্মৃতি-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবশ্যক ও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাঁহার চিতাস্থানের উপরে একটি বিশ্রামাগার, (২) তাঁহার জন্মভূমি ও কর্ম্মকেন্দ্র বরিশালে একটি টাউন হল, (৩) বঙ্গের দুঃস্থ ও যোগ্য ছাত্রগণের সাহায্যার্থ একটি ছাত্রভাণ্ডার এবং (৪) একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

এই মহদুদ্দেশ্যসাধনার্থ আমরা সাগ্রহে দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনীগণের নিকটে তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। পত্রাদি সম্পাদকের নামে (শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, ৪১, সুকীয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা প্রেরিতব্য)।

(স্বাঃ) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় (সভাপতি, অশ্বিনীকুমার স্মৃতি-সমিতি,
৯২, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা)
" মদনমোহন মালব্য
" লাজপত রায়
" মতিলাল নেহরু
" সরোজিনী নাইডু
" ভি প্যাটেল
" এন সি কেলকার
" আজমল খাঁ

অশ্বিনীকুমারের সাধনাপ্রভাবে সুপ্ত বাঙ্গালায় প্রাণস্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল—জাতীয় যজ্ঞে তাঁহার আত্মত্যাগাহুতির সুরভিতে সমগ্রদেশ সৌরভিত গৌরবান্বিত হইয়াছিল—তাঁহার মিলনমন্ত্রের প্রতিধ্বনিতে বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত করিয়াছিল। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নাই, সাধনোচিত ধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু সেই আদর্শ মহাপুরুষের পুণ্য-স্মৃতি রক্ষাকল্পে যৎসামান্য সাহায্য করিয়া সে অপরিশোধনীয় ঋণভারের কথঞ্চিৎ লাঘব করা কি আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? আশা করি, বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার্থ যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

শুক্তির গোলাপ

সমুদ্র-শুক্তি, শঙ্খ প্রভৃতি হইতে এমন কৃত্রিম গোলাপ ফুল প্রস্তুত হয় যে, প্রকৃতির বক্ষোজাত উদ্যানের তাজা গোলাপও তাহার বহিঃ-সৌন্দর্য্যের নিকট হার মানিয়া যায়। ফ্রান্সে ইদানীং এইরূপ কৃত্রিম গোলাপ নির্ম্মাণের স্পৃহা শিল্পীদিগের খেয়ালের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম গোলাপের ক্ষুদ্রতম পাপড়িগুলি আসল গোলাপের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে না। অত্যন্ত নিকটে আনিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেও বর্ণের পার্থক্য ধরিতে পারা অসম্ভব।

শুক্তি, শঙ্খ প্রভৃতি হইতে নির্ম্মিত কৃত্রিম গোলাপ।

শিল্পীর কৌশল

মার্কিণ শিল্পী নূতনত্বের ভক্ত। সকল বিষয়েই কোন না কোন নূতনত্ব সৃষ্টি করার দিকেই তাঁহার ঝোঁক। সম্প্রতি শয্যাকে চেয়ারে পরিণত করিবার কৌশল মার্কিণ শিল্পীই আবিষ্কার করিয়াছেন। গদির নীচে এমন ভাবে স্প্রিং ও কব্জা বসান হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেই গদির একাংশ চেয়ারের পশ্চাদ্‌ভাগের মত উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন তাহাতে হেলান দিয়া বসা চলিবে। যে কোনও দিকে এ ব্যবস্থা করা যায়। গদির নিম্নে যে ফাঁকা স্থান বিদ্যমান, তাহাতে অতিরিক্ত বালিস রাখিতে পারা যায়।

টেবল ও খাট

জনৈক মার্কিণ শিল্পী এক প্রকার টেবল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, প্রয়োজনকালে তাহাকে খাটের মত ব্যবহার করা যায়।

গদি তুলিয়া শয্যাকে চেয়ারে পরিণত করা হইয়াছে।

টেবল ও খাট।

টেবলের টানা বিস্তৃত করিলে তন্মধ্যে স্প্রিংযুক্ত খাট বাহির হইয়া আসিবে। তাহাতে গদি ও লেপ পাতিয়া স্বচ্ছন্দ শয়ন করা চলে। সাধারণতঃ খাট যত বড় দীর্ঘ হয়, ইহা তদপেক্ষা আরও ৪ ইঞ্চি লম্বা। ইস্পাতের পায়া তাহাতে সংযুক্ত।

শাকসব্জী কুটিবার যন্ত্র

আমাদের দেশে বঁটির সাহায্যে কুটনা বা তরকারী কাটা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে বঁটি নাই। ছুরী প্রভৃতির সাহায্যে 'কুটনা কুটা' হইয়া থাকে। সংপ্রতি আমেরিকার জনৈক বৈজ্ঞানিক সহজ উপায়ে ও দ্রুত কায করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে অতি সত্বর শাকসব্জী কাটা হয়। কর্ত্তিতাংশগুলি সমান আকারের হইয়া থাকে।

শাকসব্জী কুটিবার যন্ত্র।

সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষ

ফরমোজা দ্বীপে একটি বৃক্ষ আছে, উহার উচ্চতা ৩ শত ফুট। এত বড় গাছ সমগ্র য়ুরোপে ও এসিয়ায় আর নাই। এই বৃক্ষের বাঙ্গালা নাম জানা নাই, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ্‌গণ' ইহার নাম রাখিয়াছেন Taiwania; Cryptomerioides.

এসিয়া ও য়ুরোপের সর্ব্বোচ্চ বৃক্ষ।

নারীর আধিক্য

জনৈক মার্কিণ সম্প্রতি পৃথিবীর নরনারীর হিসাব লইয়া বলিয়াছেন যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ অধিক। সমগ্র পৃথিবীতে ৪৭ কোটি ৫০ লক্ষ নরনারী বিদ্যমান। তন্মধ্যে নারীর সংখ্যা ২৫ কোটি।

মোমের মূর্ত্তি

য়ুরোপীয় মূর্ত্তিনির্ম্মাতৃগণ অধুনা মর্ম্মরপ্রস্তর বা মাটীর সাহায্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অপেক্ষা মোমের মূর্ত্তি গঠনে মন দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, মোমের মূর্ত্তি অত্যন্ত নিখুঁত
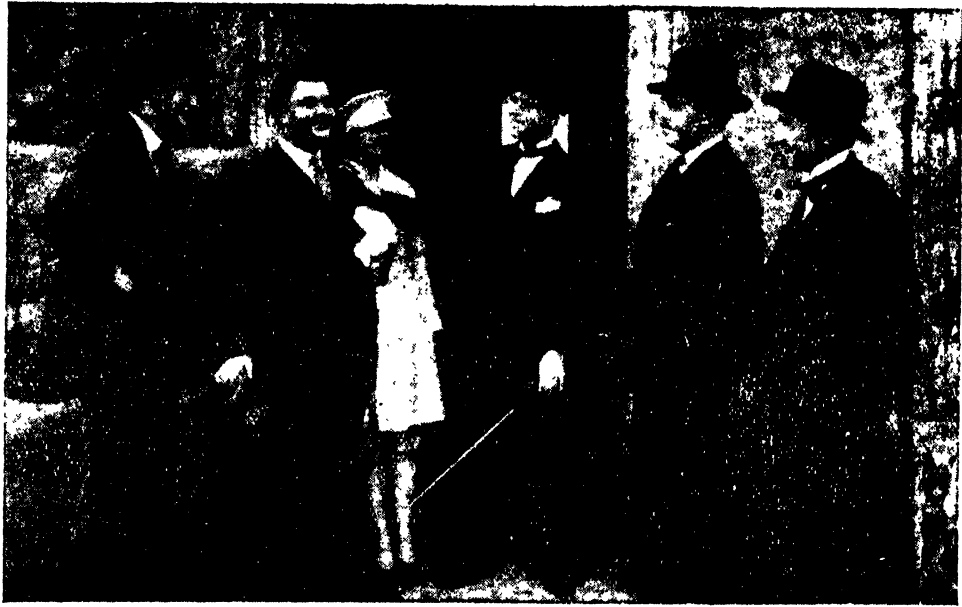
মোমের মূর্ত্তি

হয়। ইহাতে আসলের সহিত নকলের পার্থক্য মানুষ সহসা ধরিতে পারিবে না। মোমের মূর্ত্তিতে স্বাভাবিকতা অধিক পরিমাণে রক্ষা করা যায়। মুখমণ্ডলের প্রত্যেক রেখাটি মোমের মূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলা যায়। ইদানীং শিল্পীরা মোমের মূর্ত্তি গড়িয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিতেছেন।

ত্রিপাদ যষ্টি

সম্প্রতি কোনও ইংরাজ শিল্পী সাধারণ বেত্র-যষ্টির আকারে ক্যামেরার ব্যবহারের উপযোগী ত্রিপাদ যষ্টি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ত্রিপাদ যষ্টি ভ্রমণ-যষ্টির ন্যায় ব্যবহার করা যায়। ইহার ওজন মাত্র ১৫ আউন্স। যষ্টির শিরোদেশে যে বর্ত্তুলটি অবস্থিত, তাহা ঘুরাইবামাত্র ত্রিপাদ যষ্টি আপনা হইতেই ক্যামেরা ধারণের উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সে জন্য ফটোগ্রাফারকে কোনও প্রকার পরিশ্রম করিতে হয় না। ক্যামেরা তুলিয়া লইলেই আবার উহা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নির্ম্মিত ত্রিপাদ যষ্টি।

৬ ফুট দীর্ঘ যুদ্ধজাহাজ
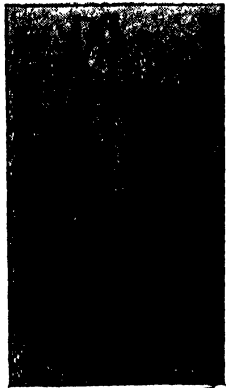
আদর্শ ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ।

নিউজারসীর কোন বৈজ্ঞানিক শিল্পী একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই জাহাজের ওজন ৫ শত পাউণ্ড বা ৬ মণের কিছু বেশী। ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। এই ক্ষুদ্র জাহাজ অনায়াসে জলের উপর ভাসিয়া থাকিয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ। লিভারের সাহায্যে জাহাজ চালিত হয়

এবং যখন ইচ্ছা ইহার গতিকে স্থগিত করিতে পারা যায়। জাহাজে কামান স্থাপিত আছে, লিভারের সাহায্যে কামান-গুলিকে যে কোনও অবস্থায় রাখিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে পারা যায়। জাহাজের প্রত্যেক দিকে একটি করিয়া কলের কামান ও বিমানপোত-ধ্বংসকারী দুইটি করিয়া হাউইটজার কামান স্থাপিত আছে। প্রতি মিনিটে এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র হইতে ১২০ বার গোলা ছোড়া যায়।
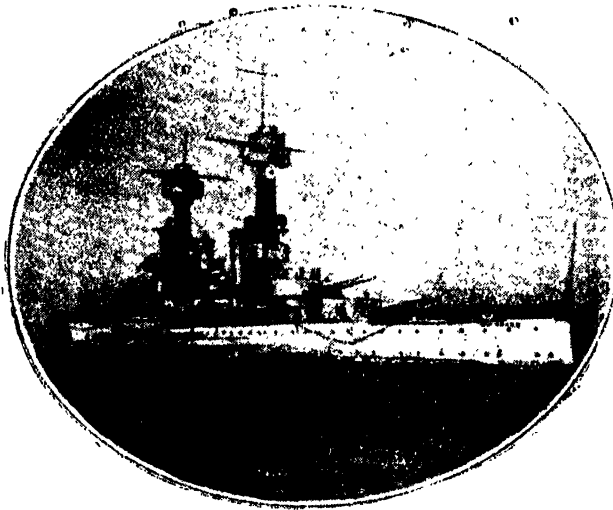
মার্কিণের প্রসিদ্ধ রণপোত 'ফোলোরাডো'।

মার্কিণের প্রসিদ্ধ রণপোত

মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সুবৃহৎ রণপোত "ফোলোরাডো" সম্প্রতি ইংলণ্ডের পোর্টস্ মাউথ বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এত বড় কোনও বৈদেশিক রণপোত কখনও ইংলণ্ডের প্রান্তসীমায় উপনীত হয় নাই। এই যুদ্ধজাহাজে ১৮ ইঞ্চি কামান সংস্থাপিত আছে।

পকেট বর্ণচিত্রের সাহায্যে রক্তপরীক্ষা

ইদানীং চিকিৎসকগণ মানুষের শরীরের রক্ত পরীক্ষার জন্য এক প্রকার বর্ণচিত্র ব্যবহার কারতে আরম্ভ করিয়াছেন। রক্তে কি প্রকার বীজাণু থাকিলে শোণিতের কি প্রকার অবস্থা হইবে, এই চিত্রে তাহা বর্ণের সাহায্যে চিত্রিত আছে। চিকিৎসক ঐ চিত্র আপনার পকেটে রাখিয়া থাকেন। কোনও রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিতে হইলে অগ্নি দ্বারা শোধিত তীক্ষমুখ সূচ্যগ্রভাগের সাহায্যে অঙ্গুলি হইতে এক বিন্দু রক্ত লইয়া শাদা কাগজে ফেলিতে হইবে। পরে পকেট হইতে বর্ণ-চিত্র লইয়া তাহার সহিত রোগীর রক্ত মিশাইলেই বুঝা যাইবে, রোগীর শরীরস্থ শোণিতে কি-পরিমাণ লোহিত বীজাণু বিদ্যমান।
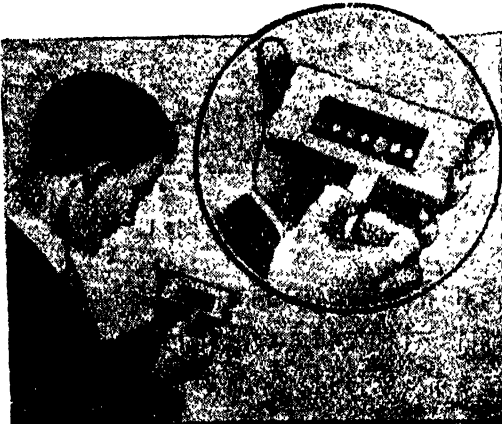
ভ্রাম্যমাণ গির্জ্জা

সুদূর ও দুর্গম পল্লী অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে ও সহজে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার মিশনারী সম্প্রদায় ভ্রমণশীল গির্জ্জার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোটরগাড়ীর সমতল স্থানের উপর ক্ষুদ্র ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাতে

পকেট বর্ণচিত্র।
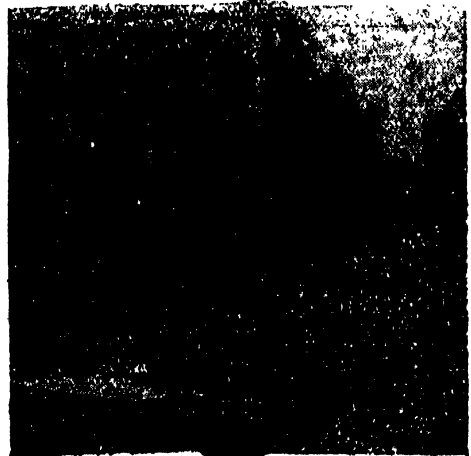
ভ্রাম্যমাণ ধর্ম্মমন্দির।

প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদার্থ রাখিয়া প্রচারকগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপ্রচারক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া যাহাতে বক্তৃতা করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা আছে। এই মঞ্চটি প্রয়োজন হইলে গুটাইয়া রাখিতে পারা যায়। তারহীন যন্ত্রও (রেডিও) এই ধর্ম্মমন্দিরে সংশ্লিষ্ট আছে। শ্রোতৃবর্গের চিত্তবিনোদনের নানাবিধ ব্যবস্থাও এই ভ্রাম্যমাণ ধর্ম্মমন্দিরে বিদ্যমান। বৈদ্যুতিক আলোক উৎপাদক ব্যাটারিও আছে। তাহার সাহায্যে রাত্রিকালে অত্যুজ্জ্বল আলোক উৎপাদিত হইয়া থাকে।
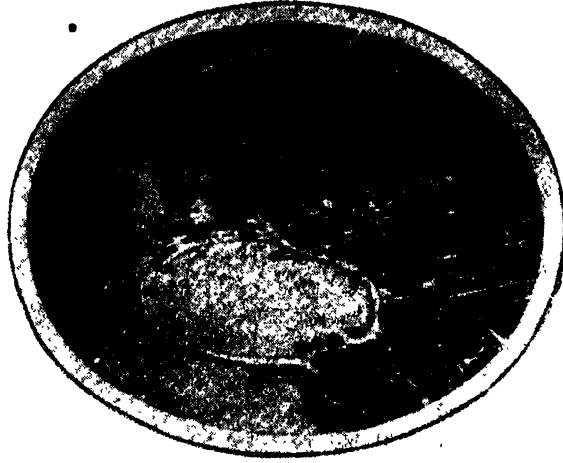
জলের উপর প্রমোদ-পার্ক।

জলের উপর প্রমোদ-পার্ক

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোতে সমুদ্রসলিলে প্রমোদ-পার্ক রচিত হইতেছে। জলক্রীড়ায় নরনারীরা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে যোগদান করিতে পারিবেন বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থার আয়োজন হইয়াছে। সমুদ্রের যে স্থানটিতে এই পার্ক রচিত হইবে, তাহার পরিধি ১ হাজার ৫ শত ফুট, জলের গভীরতা ৩০ ফুটের অধিক নহে। এই গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া সমুদ্রসৈকতে মিশিয়া যাইবে। দুই পাশ হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে প্রস্তর নির্ম্মিত স্তম্ভ বিস্তৃত হইবে। স্তম্ভের বাহিরের দিকে বিশ্রামাগার নির্ম্মিত হইবে ও আলোকের ব্যবস্থা থাকিবে। এই বিস্তীর্ণ জল ভাগের উপর নৌকাবিহার প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ নির্ব্বিঘ্নে চলিবে। জলবিহারের পর ক্রীড়াশীল নরনারীরা বিশ্রামাগারে যাইয়া শ্রমাপনোদন করিতে পারেন, তাহার সুব্যবস্থাও হইবে। তথায় চিত্তবিনোদন কারী নানাবিধ দ্রব্যের সমাবেশ থাকিবে।

ফুল তুলিবার যাঁতিকল

সাধারণ কাঁচির সাহায্যে কোনও গাছের ডাল অথবা ফুলসমেত ডাল কাটিতে পারা যায়; কিন্তু কোন উচ্চ ডাল হইতে ফুল পাড়িতে হইলে অনেক সময় কর্ত্তিত ডাল সমেত ফুল ভূমিতলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সংপ্রতি আমেরিকায় এক প্রকার যাঁতিকল নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহার সাহায্যে ফুল সমেত ডাল কাটিয়া লইলে কখনই তাহা কল হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে না। এই যাঁতিকলের নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার। উচ্চ ডাল হইতে ফুলসমেত ডাল কাটা হইয়া গেল, অমনই স্প্রীংএর সাহায্যে ডালটি কলে সংলগ্ন হইয়া রহিল। তার পর কল হইতে ফুলটি যতক্ষণ তুলিয়া না লওয়া হইবে, উহা তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এইরূপে কলের সাহায্যে ফুল তুলিলে যে অনেক অপচয় নিবারিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

ফুল তুলিবার যাঁতিকল।

কুম্ভ মেলা

বর্ত্তমান বর্ষে প্রয়াগ তীর্থে অর্দ্ধ কুম্ভ মেলার অধিবেশন হইয়াছিল। মেলাদর্শনার্থী যাত্রিগণ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে এই মেলায় সমাগত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই মেলার নাম "কুম্ভ মেলা" কেন হইল এবং কি উপলক্ষে এই মেলা হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, যাত্রীদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই জ্ঞাত আছেন। ইহা বোধ হয়, অনেকেই জানেন যে, পূর্ণ কুম্ভমেলার দ্বাদশ বর্ষ অন্তর অধিবেশন হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষের এলাহাবাদস্থ মেলা পূর্ণ কুম্ভমেলা নহে, ইহা আংশিক কুম্ভমেলা। পূর্ণ কুম্ভমেলা কাহাকে বলে ও অর্দ্ধ কুম্ভমেলাই বা কখন হয়, তাহা বোধ হয় সকলে অবগত নহেন।

বৃহস্পতি গ্রহ এক বৎসর কাল এক রাশিতে থাকেন ও দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি একবার কুম্ভ রাশিতে আসেন। প্রাচীনকাল হইতে বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে আসিলে, কনখলে বা হরিদ্বারে এই মেলার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে, সেই জন্য ইহাকে কুম্ভমেলা বলে। পূর্ব্বে ১২ বৎসর অন্তর হিমালয় পর্ব্বতসন্নিধানে কনখলে এই মেলার অধিবেশন হইত, কিন্তু পরে ৬ বৎসর ও ৩ বৎসর অন্তরও অন্য অন্য স্থানে ইহার অধিবেশন হইতে লাগিল। ইহাদিগকে অর্দ্ধকুম্ভ বা আংশিক কুম্ভ বলিয়া থাকে।

কি কারণে বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে আসিলে এই মেলার অধিবেশন হইত, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কতকগুলি পুরাণের রহস্য ভেদ করিতে হয়। পুরাণে অনেক স্থলে প্রকৃত বিষয় সাধারণের নিকট গোপন রাখিয়া সাধারণের বোধার্থ এক একটি গল্প রচনা করা হইয়াছে। সকলেই পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞের কথা অবগত আছেন, কিন্তু ইহার মধ্যে জ্যোতিষের একটি গূঢ়তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দক্ষযজ্ঞ নামক বৃহস্পতিযজ্ঞ কনখলে হইয়াছিল। প্রথমে দেখিতে হইবে দক্ষ কে? পুরাণ বলিবেন, দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র ও শিবের শ্বশুর এবং তিনি একজন প্রজাপতি। অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র ইঁহার কন্যা, চন্দ্র ও সোমদেব ইঁহার জামাতা। সুতরাং এ দক্ষ মনুষ্য বা দেবদেহধারী হস্তপদাদিবিশিষ্ট কোন ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না। ঋক্‌বেদের কতকগুলি সূক্তের প্রকৃত অর্থ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, অতি প্রাচীন কালে রাশিচক্রের নাম দক্ষ ছিল।

ঋক্‌বেদের ১০।৭২ সূক্তে সম্পত্তি ঋষি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এই অর্থই প্রতিপাদিত হয়। এই দক্ষের কন্যা অদিতি। আবার কোন কোন স্থলে দক্ষকে অদিতিপুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এ সমস্ত বিষয় এখানে আলোচ্য নহে। এখন দক্ষ যদি রাশিচক্র হইল, তবে দক্ষযজ্ঞের অর্থ কি? ২৭টি নক্ষত্র ও তারা-রাজি দক্ষের কন্যা, সোম অর্থাৎ চন্দ্র ও সোমদেব অর্থাৎ মহাদেব দক্ষের জামাতা। সমগ্র আকাশমণ্ডলই দক্ষ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে, ৩য় শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বলিতেছেন :—

"ইষ্টা চ বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ।
বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্‌॥"

দক্ষ বাজপেয় নামক যজ্ঞ সমাধান করিয়া বৃহস্পতি নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই বৃহস্পতি যজ্ঞের প্রকৃত অর্থ কি? বঙ্গদেশে সৌর বর্ষ প্রচলিত আছে, কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই চান্দ্রবর্ষ ও চান্দ্র মাস প্রচলিত আছে। আর্য্যভট্টের সৌর বর্ষ উদ্ভাবনের পর পণ্ডিতমণ্ডলী সৌর বর্ষ অবগত হইয়াছিলেন, কিন্তু জনসাধারণ মধ্যে চান্দ্রবর্ষই চলিয়া আসিতেছে। কেবল বঙ্গদেশেই সৌরবর্ষ প্রচলিত হইয়াছে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এখনও চান্দ্রবর্ষ ও চান্দ্রমাসই প্রচলিত আছে। ইহা একটি বাঙ্গালীর গৌরবের কথা। সৌরবর্ষ বৈশাখ মাসে আরম্ভ হয়, কিন্তু চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাস আশ্বিন। বর্ত্তমান চান্দ্রবর্ষের ১৩৩১ সাল চলিতেছে, এই সাল আশ্বিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। চান্দ্রবর্ষ ৩৬৫ দিন অপেক্ষা অনেক কম, সেই জন্য প্রাচীন কালে পঞ্জিকাদি গণনা বিষয়ে চান্দ্রবর্ষে অনেক অসুবিধা হইত। সৌরবর্ষ অবগত হওয়ার পর হইতে আর বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা কম। চান্দ্রবর্ষ ৩৬৫ দিন অপেক্ষা কম বলিয়া পণ্ডিতগণ ৩ বৎসর অন্তর এক মাস বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ ১৩ মাসে এক বৎসর করেন। এই বেশী মাসটিকে মলমাস বা intercalary month বলে।

অতি প্রাচীনকালে জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষিগণ চান্দ্রবর্ষের এই দোষ দর্শন করিয়া বার্হস্পত্য বর্ষ প্রচলন করাই ভাল বিবেচনা করিলেন। বৃহস্পতি এক রাশিতে এক বৎসর থাকেন, সুতরাং বৃহস্পতি বর্ষ প্রচলিত হইলে গণনা সহজ হইবে এই ভাবিয়া, বৃহস্পতি বর্ষ প্রচলন জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষিগণ সমবেত হইলেন। প্রাচীনকালে ঋষিগণই সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা এই বৃহস্পতি বর্ষস্থাপনের জন্য কনখলে সমবেত হইলেন। এই মহাসভা রাশিচক্রের যজ্ঞ। দক্ষ রাশিচক্রের নাম, সুতরাং এই মহাসভার নাম দক্ষযজ্ঞ। পূর্ব্বে যখন চান্দ্রবর্ষ প্রচলিত ছিল, তখন চৈত্রমাসে বর্ষারম্ভ হইত। সেইজন্য চৈত্র মাসে দেবী পূজা হইত। ভগবতীই বর্ষারম্ভের আরাধ্যা দেবী ছিলেন। কিন্তু এ যজ্ঞ বৃহস্পতি যজ্ঞ। ইহাতে দেবীর কিংবা সোমদেবের আহ্বানের প্রয়োজন ছিল না। সেই জন্য পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞে সতীর ও মহাদেবের নিমন্ত্রণ হইল না। ইহাতে চান্দ্রবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দেহত্যাগ হইল। আর একটি পরিবর্ত্তন এই বৃহস্পতি বর্ষ প্রচলন জন্য করা হইল। পূর্ব্বে অভিজিৎ নক্ষত্রসহ ২৮টি নক্ষত্র ছিল, কিন্তু বার্হস্পত্য বর্ষ গণনায় ২৭টি নক্ষত্র ধরিলে, সুবিধা হয় দেখিয়া অভিজিৎ নক্ষত্রকে পরিত্যাগ করা হইল। এই সকল পরিবর্ত্তন জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে নানা স্থানে সাময়িক মানমন্দির স্থাপন করিয়া আকাশমণ্ডল পরিদর্শন করা হইল ও ঐ সকল স্থান মহাপীঠ নামে অভিহিত হইল। সতীদেহ ও অভিজিৎ দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া তথায় পতিত হইল। কিন্তু এ বার্হস্পত্য বর্ষ জনসাধারণ গ্রহণ করিতে পারিল না ও কিছু কাল পরে পণ্ডিতরাও বুঝিলেন যে এ বর্ষ প্রচলিত থাকিলে পঞ্জিকা-গণনা সম্বন্ধে বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। সুতরাং বৃহস্পতি বর্ষ পরিত্যক্ত হইল। বৃহস্পতি যজ্ঞ নষ্ট হইল। রাশিচক্র নির্ণয়ে বিভ্রাট উপস্থিত হইল। দক্ষ নিহত হইলেন। পুনরায় পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া চান্দ্রবর্ষ স্থাপন করিলেন। বিষ্ণু আসিয়া দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন ও দক্ষযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। চান্দ্রবর্ষ পুনঃ প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে চৈত্রমাসে বর্ষারম্ভ হইত, কিন্তু চান্দ্রবর্ষ পুনঃ প্রচলনের পর আশ্বিন মাস বর্ষের প্রথম মাস হইল। পুনরায় বর্ষারম্ভে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে দেবী পূজা হইতে লাগিল। এবার দেবী দক্ষকন্যা রহিলেন না। হিমালয়সান্নিধ্য মহাসভায় তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তিনি এবার হিমালয়ের কন্যা হইলেন। আশ্বিন মাসে দেবী পূজার এই প্রকৃত কারণ। পূর্ব্বে চৈত্রমাসে হইত, কিন্তু আশ্বিনমাস বর্ষের প্রথম মাস হইল বলিয়া আশ্বিনমাসে দেবী পূজা হইতে লাগিল। ইহা বর্ষারম্ভের পূজা। রামচন্দ্রের বিজয়োৎসব আশ্বিনমাসে হইয়াছিল, কিন্তু আশ্বিনমাসে রামচন্দ্রের দেবী পূজার কথা বাল্মীকি রামায়ণে নাই, জৈমিনীকৃত রামায়ণে পাওয়া যায়। অতএব আশ্বিনে দেবীপূজা বর্ষারম্ভের পূজা হওয়াই সম্ভব। চান্দ্র আশ্বিনের শুক্ল সপ্তমীতে এই পূজা আরম্ভ হয়, কিন্তু যে বৎসর ১৩ মাসে হয়, সে বৎসরে চান্দ্র আশ্বিন সৌর আশ্বিনের পশ্চাতে গিয়া পড়ে, সেইজন্য তিন বৎসর অন্তর সৌর আশ্বিনের শেষে কিংবা কার্ত্তিকের প্রথমে দেবীপূজা হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে কুম্ভমেলা জ্যোতির্ব্বিদ্ ঋষিগণের ও পণ্ডিতগণের মহাসভা ছিল। ইহা ছত্রভোজী সাধুগণের ভোজনোৎসব জন্য বা পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় জন্য ছিল না। এখন আর এ মেলায় জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা হয় না।

শ্রীউমেশচন্দ্র ঘোষ।
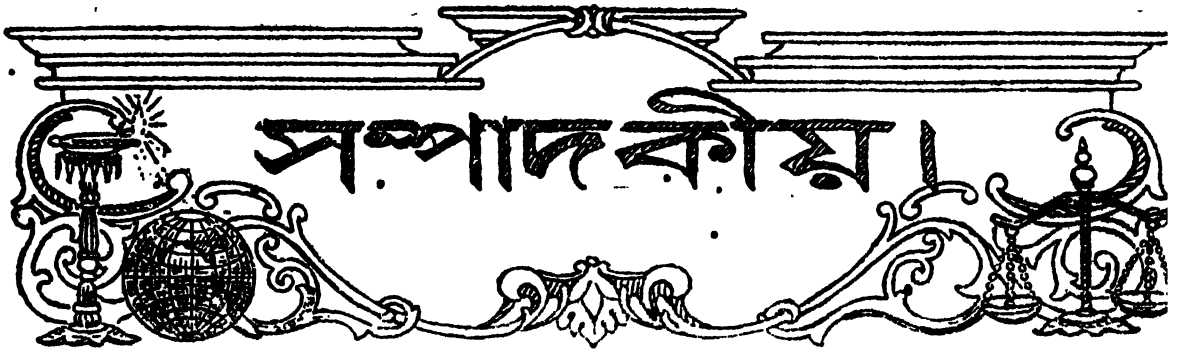
চৌরঙ্গীর হত্যাকাণ্ড

বাঙ্গালার স্বদেশী যুগে মজঃফরপুরে কেনেডি নাম্নী দুইটি শ্বেতকামিনীর হত্যাকাণ্ডের পর গত ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, ২৭শে পৌষ শনিবার প্রাতে কলিকাতার চৌরঙ্গী পল্লীতে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার তুলনা ভারতের ইংরাজশাসনের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে শাঁখারীটোলার পোষ্টমাষ্টার খুন হইয়াছিলেন। তখনও সহরে হুলস্থূল পড়িয়াছিল; কিন্তু তুলনায় চৌরঙ্গীর হত্যাকাণ্ড আরও চিত্তচমকপ্রদ, আরও কৌতূহলোদ্দীপক।

ঘটনার দিন প্রাতে কিলবার্ণ কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ ডে প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলেন। হল এণ্ড এণ্ডার্সনের দোকানের সম্মুখবর্ত্তী হইলে একটি বাঙ্গালী যুবক হঠাৎ তাঁহার উপর আপতিত হয় এবং রিভলভার হস্তে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়ে। মিঃ ডে পড়িয়া গেলে সে তাঁহার দেহের দুই পার্শ্বে দুই পদ রক্ষা করিয়া উপর্য্যুপরি ৭টি গুলী ছুড়ে। ফলে মিঃ ডে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েন। তিনি নির্দ্দোষ, আততায়ীর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে কোনও পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। হাঁসপাতালে নীত হইয়া তিনি অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমায় কেন মারিল? আমি ত উহার কোনও অনিষ্ট করি নাই!"

মিঃ ডে আহত হইলে সেই স্থানে একটা বিষম হৈ-চৈ পড়িয়া যায়। হত্যাকারী ২১।২২ বৎসর বয়স্ক একটি বাঙ্গালী যুবক। সে এই সময়ে পলায়ন করিতে থাকে। পথে অনেকে তাহার অনুসরণ করে। ফলে যুবকের গুলীতে কয় জন আহত হয়। ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে যুবক ধৃত হয়। আসামীকে ধৃত করার ব্যাপারে য়ুরোপীয়ান ও ভারতীয় উভয় সম্প্রদায়ের লোকই প্রাণের মায়া না রাখিয়া শান্তিরক্ষায় সাহায্যদান করিয়াছিল।

ধৃত যুবকের নাম গোপীনাথ সাহা। সে শ্রীরামপুর ক্ষেত্রমোহন সাহা ষ্ট্রীটে অবস্থান করিত। তাহার বিধবা মাতা ও ৩টি ভ্রাতা আছেন। সে শ্রীরামপুরের ইংরাজী স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিল।

এই সময়ে পুলিস ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস রব তুলিলেন যে, এই ঘটনা রাজনীতিক বিপ্লববাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কিন্তু গোপীনাথ স্বয়ং প্রথমে নিম্ন আদালতে ও পরে হাইকোর্টের দায়রায় যে একরারনামা দিয়াছে, তাহাতে এ কথা সপ্রমাণ হয় না।

আসামীর একরারনামা

কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গোপীনাথ জেরার মুখে বলিয়াছে,—"নৃপেন নামক কোন লোকের সহিত আমার পরিচয় নাই। কোন বিপ্লবদলের সম্বন্ধেও আমি কিছু জানি না।"

গোপীনাথ একরারে স্পষ্টস্বরে বলিয়াছিল,—"আমি নির্দ্দোষ মিঃ ডেকে হত্যা করিয়া দুঃখিত। আমি তাঁহার আত্মার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। ইংরাজ বলিয়া কোনও ইংরাজের উপর আমার হিংসা বা ক্রোধ নাই।"

ইহার পর আসামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হাই-কোর্টের দায়রায় বলিয়াছে,—"মায়ের ডাকে আমি বাড়ী ছাড়িয়াছি। মায়ের কাযে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছি। পুলিস কমিশনার মিঃ টেগার্ট ভারতের মুক্তির চেষ্টায় বাধা দিয়াছে এবং দিতেছে। আমি মায়ের ডাক শুনিতে পাইলাম, মা যেন বলিতেছেন, উহাকে অনুসরণ কর। সেই সময় হইতে আমি মিঃ টেগার্টের বিষয়ে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। ফলে জানিলাম,

স্বদেশী যুগে সে ডেপুটী কমিশনাররূপে মায়ের সেবকদিগের উপর নানা অত্যাচার করিয়াছে। বালেশ্বরের হাঙ্গামার সম্পর্কেও সে জড়িত ছিল। সে আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী হইয়াও আয়ার্ল্যাণ্ডের শক্রতা করিয়াছে। আমি শুনিতাম, মা যেন ডাকিয়া বলিতেছেন, উহাকে পৃথিবী হইতে অপসৃত কর। আমি বহুস্থানে মিঃ টেগার্টকে দেখি। অনেকবার উহাকে হত্যার চেষ্টা করিয়াছি। হত্যাকাণ্ডের দিন আমি ময়দানে বেড়াইতেছিলাম। ঐ সময়ে মিঃ ডে'কে দেখিতে পাই। মনে হইল, এই মিঃ টেগার্ট। তাই আমি তাহাকে গুলী করি। পাছে বাঁচিয়া যায়, এই জন্য বহুবার গুলী করিয়াছি। যাহা করিয়াছি, ভালই করিয়াছি।

মিষ্টার ডে।

হত্যার পর

যখন আমাকে পুলিস কমিশনারের কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়, তখন আমার ধারণা ছিল, আমি মিঃ টেগার্টকেই হত্যা করিয়াছি। কিন্তু কক্ষে মিঃ টেগার্টকে দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাই। আমি মিঃ টেগার্টের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছি—তোমাকেই খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, ভগবানের অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছ।"

গোপীনাথের বিচার শেষ

গোপীনাথের আত্মীয়স্বজন তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু গোপীনাথ একবারও নিজের অপরাধ অস্বীকার করে নাই অথবা দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে নাই। সে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত নির্ভীক, অটল অচলভাবে নিজের স্কন্ধে সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

১৬ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের সেসনে বিচারপতি মিঃ পিয়ার্সনের দায়রা বিচারে গোপীনাথের ফাঁসীর হুকুম হইয়া গেল। ভারতীয় জুরীরাওএকবাক্যে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। রায় শুনিয়াই গোপীনাথ স্পষ্টস্বরে বলিয়া উঠে,—"আমি চলিলাম। আমার রক্তের প্রতি বিন্দু যেন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে। যত দিন পর্য্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগ ও চাঁদপুরের মত ঘটনা ঘটিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার কাণ্ড ঘটিবেই। এমন এক দিন আসিবে, যে দিন সরকারকে ইহার ফলাফল ভোগ করিতে হইবে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, যত দিন পর্য্যন্ত দমননীতি চলিবে, তত দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার ব্যাপারের অবসান হইতে পারে না।

গোপীনাথ সাহা।

শেষ মুহূর্ত্ত

১লা মার্চ্চ ১৮ই ফাল্গুন শনিবার প্রাতে গোপীনাথের ফাঁসীর সময় নির্দ্দিষ্ট হইল। গোপীনাথের বিধবা জননী গভর্ণরের নিকট দয়া-ভিক্ষা করিয়াছিলেন। গভর্ণর সে দয়া প্রদর্শন করেন নাই।

গ্রেপ্তারের পর হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোপীনাথ নির্ভীক ও প্রফুল্লচিত্ত ছিল। আলীপুর জেলের মধ্যে ফাঁসীর ব্যবস্থা হইয়াছিল; কানাই দত্তের ফাঁসীর পর জনসঙ্ঘ শ্মশানে যে উত্তেজনা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহারই ফলে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কয়েক জন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া জেলদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত হয়েন নাই। কেবল গোপীনাথের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মদনমোহন আর ৩ জন আত্মীয়কে লইয়া গোপীনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসম্পাদনার্থ জেলে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

ফাঁসীর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে গোপীনাথ অকাতরে নিদ্রা গিয়াছিল। জেলে থাকিতে তাহার দেহের ওজন ৫ পাউণ্ড বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে গান গাহিয়া সময় কাটাইয়াছিল। ফাঁসীর দিন প্রাতে তাহাকে ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিতে হইয়াছিল। গোপীনাথ শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হাসিমুখে অকম্পিতচিত্তে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করিয়াছিল। ফাঁসীর সময়েও সে হাসি তাহার মুখে বিদ্যমান ছিল। কোনও য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নাকি ফাঁসীর পর বলিয়াছিলেন,—"এইমাত্র হাসিতেছিল, কোথায় চলিয়া গেল!"

শুনা যায়, গোপীনাথ শেষ পত্রে মাতাকে লিখিয়াছিল, "ভারতের প্রত্যেক জননী যাহাতে আমার মত পুত্র গর্ভে ধারণ করেন এবং ভারতের প্রত্যেক গৃহে যেন আপনার মত জননীর আবির্ভাব হয়, এমনই প্রার্থনা করুন।"

ভ্রান্ত পথ

গোপীনাথ বিচারকালে সাহসে ও সত্যবাদিতায় আদর্শস্থানীয় হইলেও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সে পাপের পথে পরিচালিত হইয়া এক নির্দ্দোষ মানুষের হত্যাকাণ্ড সমাহিত করে, সে হিংসার রক্তমাখা পথে মুক্তির সন্ধান করিতে গিয়াছিল। দেশে অনাচার অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সহজে ভাবপ্রবণ তরুণ হৃদয় বিচলিত করিয়া তুলে। কিন্তু যদি সেই হৃদয়ের ভাবপ্রবাহ সংযত করিতে কোন শক্তি নিয়োজিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা দেশের পক্ষে পরম মঙ্গলকর খাতে পরিচালিত হইতে পারে। যুগাবতার মহাত্মা গন্ধী দেশকে অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। আজ যদি অভাগা গোপীনাথ সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইত, তাহা হইলে বাঙ্গালার এই দেশপ্রেমিক যুবককে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত না।

গোপীনাথের এই আত্মদানই যেন ভবিষ্যতে রক্তমাখা আন্দোলনের পথ চিরতরে বন্ধ করিয়া দেয়, ইহাই কামনা।

—

ভারত সরকারের সালতামামি

চিরাচরিত প্রথানুসারে এবারও মার্চ্চ মাসে ভারত সরকারের সালতামামি হিসাব বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হইয়াছে। রাজস্ব-সচিব সার বেসিল ব্লাকেট হিসাবের ভেলকীবাজীতে এবারকার বাজেটকে উদ্বৃত্তিসূচক বাজেট আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার এ কথার মূলে কোনও ভিত্তি আছে কি না, তাঁহারই প্রদত্ত হিসাব আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে।

যাহা নিতান্ত দরিদ্র প্রজারও একান্ত আবশ্যক নিত্য ব্যবহার্য্য পদার্থ, তাহার উপর করের পরিমাণ যদি লাঘব করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বাজেটকে উদ্বৃত্তিসূচক বাজেট বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বাজেটে পোষ্টকার্ডের মূল্য, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ অথবা রেলের মাশুল কমাইবার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। দরিদ্র প্রজা এই সকল নিত্য ব্যবহার্য্য বিষয়ে কোনও রূপ করের রেহাই প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্বোপরি যে লবণ দরিদ্রের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, রাজস্বসচিব সেই লবণ শুল্কের হার মণকরা ২৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকায় নামাইয়া কোনরূপে পিত্তরক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রজার যথার্থ মঙ্গলকর ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে না। দরিদ্রের 'ভাতের নুণে' এখনও যখন হাত পড়িবে, তখন বর্ত্তমান বাজেটকে কিরূপে সমৃদ্ধির বাজেট বলা যাইতে পারে?

রাজস্বসচিব এবার শক্রতরীর হেপাজতি বাবদে সরকারের সঞ্চিত লাভের পরিমাণ দেখাইয়াছেন ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। স্ফূর্ত্তিখেলায় অথবা ঘোড়দৌড়ের বাজী মারিয়া লোক যেরূপ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, অর্থসচিব সার বেসিল সেইরূপ এই 'পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনার' লাভ দেখাইয়া আনন্দে অধীর হইয়াছেন, সগর্ব্বে বলিয়াছেন,—"এবার আমরা সমৃদ্ধির বাজেট দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি।" কিন্তু এটা স্বাভাবিক আয় নহে। যদি এই

অস্বাভাবিক অবস্থা উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে সার বেসিল বোধ হয় চক্ষুতে চারিদিকে সর্ষপফুল দেখিতেন।

যাহা হউক, ভারত সরকারের সৌভাগ্যে এবার কিছু টাকা পড়িয়া পাওয়া হিসাবে ভারত সরকারের শূন্য তহবিল পূর্ণ করিয়াছে। তাই সার বেসিল ব্লাকেট ভারত সরকারের মহানুভবতা প্রদর্শন করিয়া প্রজার উপর একটু নেকনজর করিয়াছেন। কিন্তু যে ভাবে এই নেকনজর করা হইয়াছে, তাহাতে প্রজা এই দানশৌণ্ডতা হজম করিতে পারিলে হয়।

গত বৎসর যখন বড় লাট এসেম্ব্লীর পূর্ণ প্রতিবাদ সত্ত্বেও নিজের সার্টিফিকেট ক্ষমতাবলে লবণ-শুল্ক ১া০ মণ হইতে ২৷৷০ টাকা মণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তখন একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই, দরিদ্রের নিত্যব্যবহার্য্য পদার্থে এই শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া তিনি ভারতবাসীর কত বড় সর্ব্বনাশ করিলেন। তখন তাঁহাকে রাজস্বসচিব হিসাব করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এই শুল্কবৃদ্ধির ফলে ভারত সরকার মোট ৬ কোটি টাকা অধিক পাইবেন; তবে সাড়ে ৪ কোটি হইলেই তাঁহার ফাজিল ঘুচিতে পারে বলিয়া উহা সাড় ৪ কোটিতেই ধার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা কি ফলবতী হইয়াছিল? ভারতের প্রজা এত দরিদ্র যে, লবণের শুল্কবৃদ্ধির ফলে লবণের মূল্যবৃদ্ধি হইলে লবণাভাব সহ্য করিয়া শুধু ভাত খাইয়াছিল! ফলে আশানুরূপ আয় হয় নাই। এই লবণাভাবে পুষ্টির অভাব যে হইয়াছিল এবং প্রজা যে সে জন্য জীবনীশক্তি হারাইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে আমলাতন্ত্র সরকারের যন্ত্রবৎ শাসনের কি আইসে যায়? সে দিন লর্ড অলিভিয়ার বিলাতী লর্ড-সভায় বক্তৃতাকালে এই লবণশুল্ককে যে আখ্যা দিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, ভারত সরকারের হায়া থাকিলে মনঃপীড়া দিতে পারিত। লর্ড অলিভিয়ার লবণশুল্ককে ফরাসী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সার বেসিল ব্লাকেট।

সুতরাং এবার আশা করা গিয়াছিল যে, যখন ভারত সরকার এবার 'সমৃদ্ধি বাজেট' পেশ করিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই এবার এই অন্যায় প্রজাশোষক লবণশুল্ক কমাইয়া পূর্ব্বাবস্থায় (১া০ মণ) আনা হইবে।

কিন্তু ব্যুরোক্রেশী সে ধাতুতে গড়া নহে। সামরিক ব্যয় কমাইলে লর্ড রলিনসন বলিবেন,—"ও দিকে হাত দিও না; ইঞ্চকেপ কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ধীরে ধীরে ব্যয়সঙ্কোচ করা হইতেছে, ইহার অধিক কমাইলে আমি ভারতরক্ষায় দায়ী থাকিব না।" সেনার চলাচল ও বিদেশী বণিকের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে রেলের ব্যয়ও কমান যায় না। ধনীর বিলাসের উপকরণ মোটর স্পিরিটের উপর শুল্কও কমিতে পারে; কিন্তু লবণশুল্ক ২৷৷০ টাকা হইতে ২৲ টাকার নিম্নে নামান যায় না। ইহাই ব্যুরোক্রেশীর সমৃদ্ধ বাজেটের চরম দয়াবর্ষণ!

রাজস্বসচিব ব্যবস্থাপক সভাকে লোভ দেখাইয়াছেন যে, যদি তাঁহার কথামত লবণশুল্ক ২৷৷০ টাকা স্থলে ২৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রাদেশিক সরকার সমূহের রাজস্বের মাত্রা কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে; পরন্তু সরকারী তহবিলে ১ কোটি টাকায় কিছু বেশী উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু যদি ঐ শুল্ক সাবেক ১া০ সিকা হারেই নামান হয়, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত ত' থাকিবেই না, বরং প্রাদেশিক রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারা যাইবে না। এইরূপে ঝুনা ব্যুরোক্রাটের রাজনীতিক চালবাজীতে ব্যবস্থাপক সভাকে বিষম সমস্যায় ফেলা হইয়াছে। এক দিকে যদি তাঁহারা সার বেসিলের টোপ গলাধঃকরণ করেন, তাহা হইলে দেশের দরিদ্র প্রজার 'ভাতের নুণেও' হাত পড়িবে, তাহারা তাঁহাদিগকে

দেশের শত্রু বলিয়া মনে করিবে। অপর দিকে যদি তাঁহারা লবণশুল্ক হ্রাস করিয়া দেন, তাহা হইলে প্রাদেশিক সরকার সমূহের তহবিলে টান ধরিবে, ফলে প্রত্যেক প্রদেশে জাতি-গঠনমূলক কার্য্যে বাধা পড়িবে। সার বেসিল এইরূপে তাঁহাদিগকে 'মারীচ-কুরঙ্গের' অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে না। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সালিশী বৈঠক পরামর্শের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় এবং লর্ড অলিভিয়ার সোজা কথায় গোল টেবল ও রয়্যাল কমিশনের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি প্রস্তাব নামঞ্জুর হইয়াছে। সুতরাং অবস্থা সঙ্কটসঙ্কুল। সার বেসিল যে টোপ ফেলিয়া মাছ গাঁথিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা এই স্রোতে ভাসিয়া যাইবে।

আগামী (১৯২৪-২৫ খৃঃ) বৎসরে ভারত সরকারের আনুমানিক ১ শত ৭ কোটি টাকা আয়, ১ শত ৪ কোটি টাকা ব্যয় এবং ৩ কোটির উপর টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। আয়ের কিঞ্চিন্ন্যূন ৫৯ কোটি টাকা সমর বিভাগেই ব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ ভারত সরকারের আয়ের একার্দ্ধেরও অধিক টাকা সমর বিভাগ গ্রাস করিবেন। এই ভাবে শাসন-কার্য্য চলিলে যে জাতিগঠন কার্য্য দ্রুতগতি চলিবে না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হাইকোর্টের নূতন জজ

১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সুবিচার-নৈপুণ্যের জন্য উচ্চসম্মান লাভ করিয়া—সাড়ে ৫৯ বৎসর বয়সে স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় হাইকোর্টের বিচার-পতির পদ হইতে ১লা জানুয়ারী অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের আপীল বিভাগের অনেক মামলাই মন্মথবাবু পরিচালনা করিতেন—এ পদগ্রহণে তাঁহাকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইল।

বিচারপতি মিঃ র‍্যাঙ্কিণ অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার
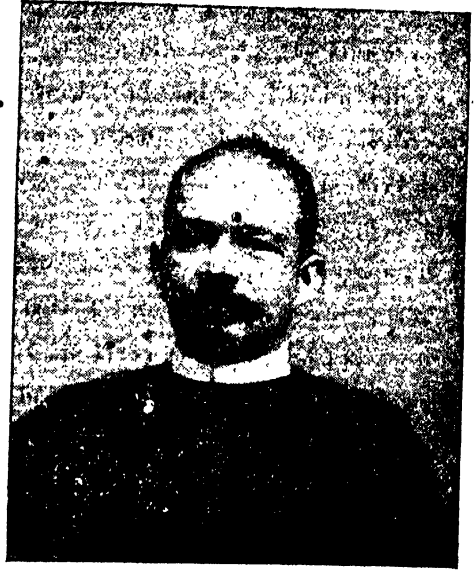
শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্থানে উকীল-সরকার রায় শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী বাহাদুর বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ নিয়োগ যোগ্যতমেরই জয় বলিতে হইবে!

শ্রীযুত দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী

পূর্ণচন্দ্রের অষ্টমবার কারাদণ্ড

ফরিদপুরের কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়কে সরকার আবার ৮ই মাঘ শনিবার দিনাজপুর জিলা সম্মিলনীতে বক্তৃতার সময় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তিনি মাত্র ২ মাস কারামুক্ত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সহযোগী সম্পাদকের কার্য্যভার লইয়াছিলেন। এইবার লইয়া সরকারের অনুগ্রহে ৮ বার তাঁহার জেলে শুভপদার্পণ সম্ভব হইল। প্রথম বার, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অস্ত্র-আইনানুসারে গ্রেপ্তার হইয়া দোষী সাব্যস্ত না হওয়ায় তিনি মুক্ত হয়েন। দ্বিতীয় বার ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্র মামলায় বন্ধুগণ সহ গ্রেপ্তার হয়েন; কিন্তু প্রমাণাভাবে সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়েন। তৃতীয় বার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এককালীন ৭।৮টি সঙ্গীন অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েন—যাহার প্রত্যেকটিতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস পর্য্যন্ত সম্ভব হইতে পারিত; কিন্তু এত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া তিনি বেকসুর খালাস পায়েন। প্রকাশ্য আদালতের বিচারে তাঁহাকে দোষী প্রমাণিত করা সম্ভব নহে দেখিয়া সে নীতি পরিহার করিয়া চতুর্থবার ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে আটক করেন। তিনি বাঙ্গালার প্রথম আটক আসামী। ১০ মাস আটক আসামীরূপে নানাস্থানে ঘুরাইয়া রাজবন্দিরূপে তাঁহাকে জেলে রাখা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে পূর্ণবাবু পুনরায় আটক হয়েন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর করাচীর প্রস্তাবের সমর্থন ও নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে যোগদানের জন্য সরকার তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং কৈফিয়ৎ না পাইয়া ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। পরে ফৌজদারী সংশোধিত আইনানুসারে আরও ২ বৎসর কারাদণ্ড বৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তিনি মুক্তিলাভ করেন। ২ মাস অতীত হইতেই তাঁহাকে আবার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন—সমগ্র ভারত একটা বিরাট কারাগার; আমরা সকলেই কারাগারে। সুতরাং এই মাতৃপূজার একনিষ্ঠ সাধকের বারংবার কারাবরণে দুঃখপ্রকাশ করিবার কোন কারণই দেখি না।
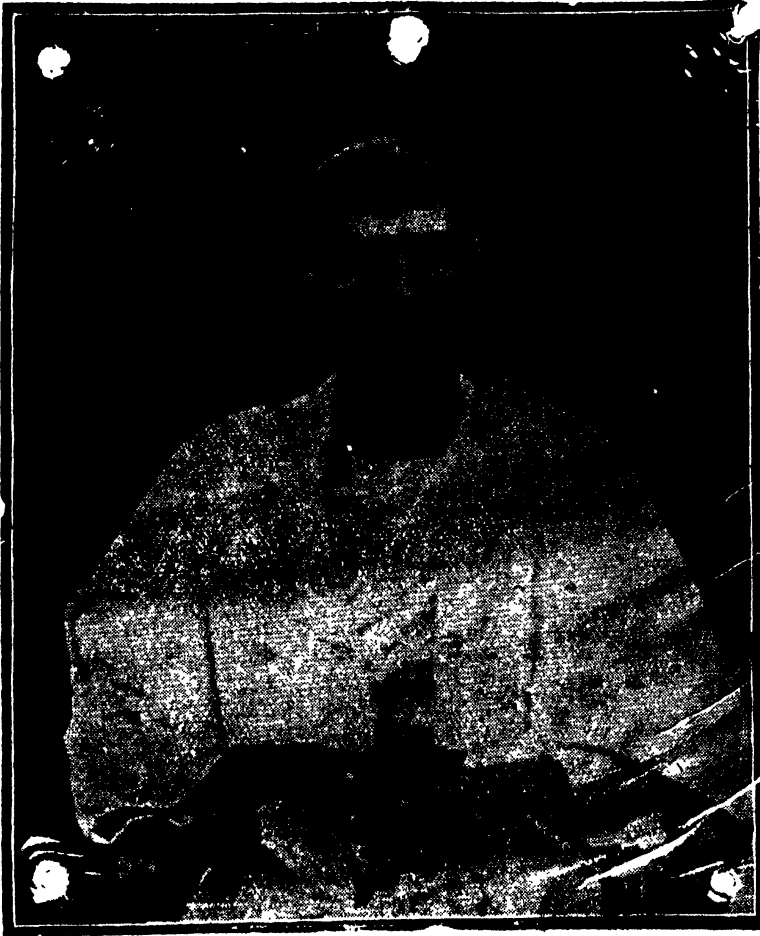
শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দাস।

দ্রষ্টব্য:—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য, শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পুত্রের অসুখের জন্য, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ভ্রাতার নিউমোনিয়ার জন্য 'মাসিক বসুমতীতে' উপন্যাস লিখিতে পারেন নাই।

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবন-মোহিনী উর্ব্বশি !"

—রবীন্দ্রনাথ
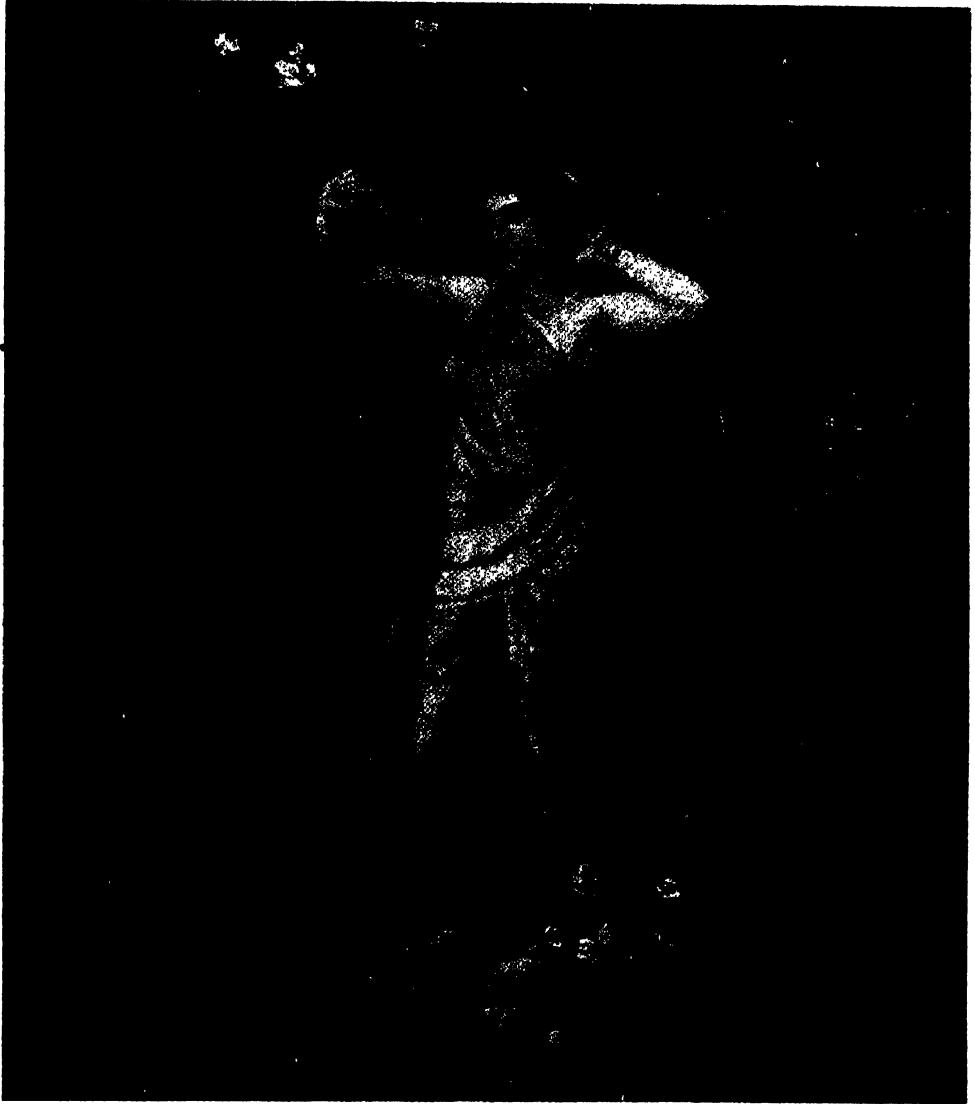
বসুমতী প্রেস] [শিল্পী—শ্রীহরেন্দ্রনাথ সাহা।
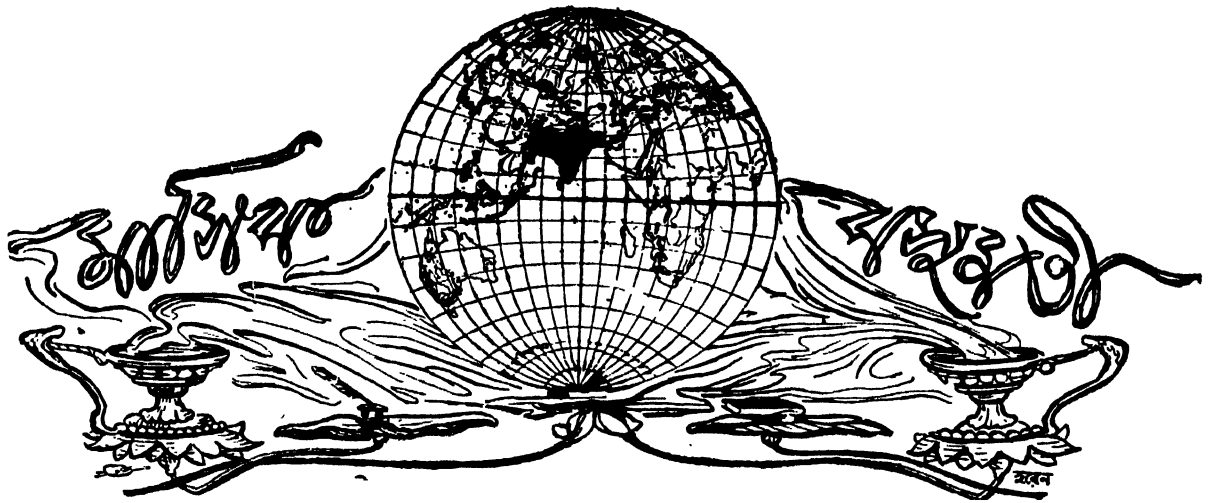
২য় বর্ষ } ২য় * চৈত্র, ১৩৩০ * খণ্ড { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দোল

নিখিলের চিত্তচোর এস তব ব্রজবাসে।
ব্যাকুল বসন্তবায়ু বিকচ-বকুল-বাসে ;
তোমার আবির-রাগে
অশোকে শোণিমা জাগে,
দেগেছ কুঙ্কুম দাগে পলাশে এ মধু মাসে ;
প্রফুল্ল প্রকৃতিশোভা তরুণ-করুণ-হাসে।

লবঙ্গলতিকা-অঙ্গে ধরে না যৌবন আর—
বিপুল পুলক পৃথু গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলভার ;
মাধবীর কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটে ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জে মধুপ প্রণয় তা'র ;
ঝরা ফুলে ভরা তৃণ— আসম বিছান কা'র !

কেশর কুসুম মাঝে গুঞ্জরিছে অলিদল—
বেলাবালু মাঝে যেন কালিন্দীর কল কল ;
মুক্তাতরু শ্যাম শাখে
কোকিল কুহরি' ডাকে—
বাজে কি তোমার বাঁশী মোহি ব্রজে জল স্থল ?—
ঊর্দ্ধমুখে চাহে ধেনু তেয়াগিয়া শষ্প জল।

যমুনার পরপারে সুনীল গগনতলে,
মেঘেরা নেমেছে বুঝি শ্যামল বনানীছলে !
ময়ূর ময়ূরী সঙ্গে
বিচরিছে প্রেমরঙ্গে,
কুরঙ্গ কুরঙ্গী-অঙ্গে হেরে কি লাবণ্য ঝলে ;
গগন আপন রূপ হেরিছে যমুনা-জলে।

ব্রজবনবিলাসিনী প্রণয়প্লাবিত প্রাণে—
চলে বনে অভিসারে চাহে তব পথ পানে।
যে তোমার প্রেমে বাঁধা
সে কি মানে কোন বাধা?
তোমার বাঁশরীস্বর বাজে সদা তা'র কানে—
ব্রজপ্রেম তুমি ছাড়া আর কি কাহারে জানে,

ব্রজের হৃদয় দোলে এস তুমি ব্রজেশ্বর—
তৃষিত তাপিত বুকে নবশ্যাম জলধর;
মেঘে সৌদামিনী ছলে
পীত ধড়া অঙ্গে ঝলে—
শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে ইন্দ্রধনু মনোহর,
দাঁড়ায়ে বঙ্কিম ঠাটে দ্বিভুজ মুরলীধর।

নিখিলের চিত লয়ে এস আজি খেল দোল;
বহুক বসন্তবায়ু আনন্দের কলরোল।
হৃদয়-নিকুঞ্জ-কোলে
প্রেমের হিন্দোলা দোলে,
দিবে দোল ব্রজগোপী প্রেমসুখে উতরোল—
মিশাবে নূপুররবে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-বোল—

চঞ্চল অঞ্চল উড়ে—কিশোরীর কেশরাশি
নবীন-নীরদ-শোভা পবনে আসিবে ভাসি';
বনমালা দুলি' গলে
রাধারে পরশছলে
দেখা'বে কি অপরূপ প্রেমরূপ পরকাশি'!
মিশিবে হৃদয়ব্রজে ভক্তি সহ মুক্তি আসি'।

আজি বিশ্ব প্রেমে ভরা, বসন্ত উৎসব আজি—
প্রকৃতি এনেছে ফুল ভরিয়া লতার সাজি;
আনন্দের গন্ধবারি
ছুটে আজি পিচকারী
নবীন পল্লবে আজ সাজিয়াছে বনরাজি,
প্রকৃতি মোহিনী বেশে আজি আসিয়াছে সাজি;

অনুরাগ-ফাগে লহ হৃদয় রঞ্জিত করি'—
প্রেমলীলা ব্রজে আজি—প্রণয় পড়িছে ঝরি'!
প্রেম-যমুনার কূলে
শান্তি-তমালের মূলে
অতিমুক্তাকুঞ্জে আজি কি মাধুরী পড়ে ক্ষরি'!
হৃদয়ের মোহ 'হরি' হৃদয়ে খেলিবে হরি।

এস ব্রজপ্রেমরূপ, এস হৃদি-বৃন্দাবনে;
প্রেমানন্দে হোলি আজ খেলিব তোমার সনে।
তোমার বাঁশরীরবে
যমুনা উজান ব'বে
নীল জল রাঙ্গা হ'বে ব্রজপ্রেমবরষণে—
কালো সে যে আলো হয় তব প্রেম পরশনে;—

প্রেমে তব লাজ পেয়ে দূরে যায় লাজ—ভয়,
চপলা অচলা যেন ভক্তি পদে বাঁধা রয়;
চিদাকাশে তুমি যা'র,
কোথা তা'র অন্ধকার?
অন্তর বাহির তা'র প্রেমালোকে আলোময়।
তুচ্ছ খেলা তা'র কাছে লাজ ভয় মোহ জয়।

এস হৃদে, খেল দোল—আর কিছু নাহি চাই—
প্রেমের যমুনা মোর ও চরণে চলে ধাই';
প্রেম সহ ভক্তি মাখি'
অনুরাগে দিব ঢাকি',
রাতুল চরণ, সেথা মাগিয়া লইব ঠাঁই—
লভিব অভয়-পদে যে প্রেমে বিচ্ছেদ নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ভোজন-সাধন

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্কুলে দুই বৎসর পাঠের পর এনট্রেন্স পরীক্ষার বৎসর পিতৃদেব আমাকে গৃহবাস-সুখে বঞ্চিত করিয়া, পাঠের সুবিধার উদ্দেশ্যে জেলার সদরে, গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে চালান করিলেন। শান্তিময় পল্লীজীবন হইতে, খাদ্যসুখময় গৃহস্থ-ঘরে বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সহরে ছাত্রাবাসে বাস করিতে সুরু করিলাম। সৌভাগ্যক্রমে তথায় এক জন আত্মীয় বাস করিতেন, সুতরাং একেবারে নির্ব্বান্ধব পুরীতে নির্ব্বাসিত হই নাই। আত্মীয়টি (এক্ষণে পরলোকগত) অভিভাবক-স্থানীয় হইলেন। তিনিও ছাত্র ছিলেন, তবে সম্পর্কে না হইলেও বয়সে বড় ছিলেন এবং দুই ক্লাস্ উপরেও পড়িতেন—অর্থাৎ আমি সেবার এনট্রেন্স দিব, আর তিনি এফ্.এ দিবেন। শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার ও তাঁহার ২।১ জন সহপাঠীর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলাম, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

লেখকের পিতৃদেব শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কিন্তু গৃহবাস ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের ক্ষেত্রে লাভবান্ হইলেও ভোজনের ক্ষেত্রে খুবই লোকসান হইল। প্রথম পর্ব্বে বলিয়াছি, আমার অভ্যস্ত খাদ্য ছিল ডাল আর ভাজা; মেসে ভাজার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না, যাহা ছিল, তাহাও তৈলের কেফায়ত (বা আত্মসাৎ) করিবার দরুণ 'ঠাকুর' রুখু রুখু রাখিত, কাঁচাটে গন্ধ ছাড়িত; আর ডালে না কুলাইবার আশঙ্কায় অজস্র জল বা ফেন ঢালিত ('যতই ঢালিবে জল তত যা'বে বেড়ে' !), সুতরাং নিতান্ত বিস্বাদ লাগিত। তরকারী খাওয়া অভ্যাস ছিল না (প্রথম পর্ব্বেই বলিয়াছি), এখন তো 'ঠাকুরে'র রান্না ঘাঁট একেবারে মুখে করা যাইত না। (তবু বাঁকুড়ার ব্রাহ্মণ, উৎকল বা হিন্দুস্থানী 'মহারাজ' তখনও বিরাজ করেন নাই।) দায়ে পড়িয়া তাহাই কাযচলা-গোছ অভ্যস্ত হইল। গৃহে থাকিতে ঠাকুর-মার সিদ্ধ হস্তের পাক নিরামিষ ব্যঞ্জনের অপমান করিতাম, এক দিকে ঠেলিয়া রাখিতাম, সে অপরাধের শাস্তি খুবই হইল।

যাহা হউক, এই পরিবর্ত্তনে একটা সুফল ফলিল। (ভগবান্ যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন।) ছুটীতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিলে মুখ বদলানর আশায় আগ্রহ করিয়া শাক সুক্ত ঘণ্ট ছেঁচকি চর্চ্চড়ী খাইতে আরম্ভ করিলাম; ক্রমে মধ্যবিত্ত সংসারের, সস্তায় অথচ নৈপুণ্যের সহিত প্রস্তুত, কচুর শাক, পালংশাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, লাউএর ঘণ্ট প্রভৃতি 'বাজে তরকারী'র স্বাদ গ্রহণ করিতে শিখিলাম। সে অপূর্ব্ব আস্বাদন আর কখনও ভুলিতে পারি নাই। মৎস্যপ্রিয় হইলেও, সেই অবধি বিধবার খাদ্যেরও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি। এখন তো পরিণত বয়সে উচ্ছে-চর্চ্চড়ী, উচ্ছের ঝোল, পল্তার ঝোল, পল্তা-বেগুন (পল্তার বড়ার তো কথাই নাই), এমন কি, নিম-বেগুন, নিম-ছেঁচকি, নিমঝোল প্রভৃতি তিক্তস্বাদ তরকারী অমৃতবোধে

আহার করি। যে দিন ডাঁটা না চিবাই (তা' সজ্‌না নাজ্‌না পুঁই লাউ কুমড়া পালংগোড়া নটেশাকের গোড়া এবং সবার সেরা কাটোয়ার ডেঙ্গোডাঁটা, যে কোনটাই হউক না কেন?) সে দিন তো মনে হয়, খাওয়াই হইল না; রোমের পরহিতব্রত সম্রাটের মত বলিতে ইচ্ছা হয়, ('I have lost a day'). 'একটা দিনই মাটী হইল': 'তদ্দিনং দুর্দ্দিনং ব্রূহি (ব্রূমো) মেথাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।' এমন এক সময় ছিল, যখন মাছের ঝোলে বা ঝালের ঝোলে লাউডগা বা সজ্‌না-খাড়া দিলে চটিয়া যাইতাম, গৃহিণীকে টিট্‌কারী দিতাম, আর এখন বাজার হইতে চাকরে আনিতে ভুলিলে স্বহস্তে এই দুই মহাদ্রব্য বহিয়া আনি, এ দৃশ্য হয় তো পাঠকদিগের কাহারও না কাহারও নজরে পড়িয়াছে। (যে দিন সন্দেশের ঠোঙ্গা আনি, সে দিন কিন্তু কাহারও নজরে পড়ে না!)

সেই নিরামিষ ব্যঞ্জনে নব অনুরাগের দিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠকবর্গ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। একবার এইরূপ ছুটীতে গ্রামে গিয়া নিমন্ত্রণের আসরে কচুর শাক রুচিকর হওয়াতে এত খাইয়া ফেলিয়াছিলাম যে, শেষে মাছ-মাংস পায়েস সন্দেশ ছুঁইতে পারিলাম না, বর্দ্ধমান হইতে আমদানী মিহিদানার একটি দানাও দাঁতে কাটিলাম না। 'What a paradise lost was here!' (ছাঁদা বাধার কাযটাও ইংরেজী শিখিয়া চক্ষুলজ্জায় করিতে পারি নাই।)

যাক্, কি বলিতে বলিতে কি বলিতেছি, আবার সেই মেসের জীবনের কথাই বলি। বিস্বাদ ডাল-তরকারীতে ও সহর যায়গার গয়লার রোজের আধসের দুধে (?) উদরপূর্ত্তি হইত না, সুতরাং খালিপেট ভর্ত্তি করিবার জন্য জলখাবারের উপর দিয়া ক্ষতিপূরণের ইচ্ছা হইত। কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ পূর্ণ হওয়া কঠিন; পিতৃদেব সামান্য বেতন হইতে সাধ্যমত যৎকিঞ্চিৎ দিতেন, তাহাতে বাহুল্য-খরচ চলিত না। ভাগ্যে তখনকার দিনে ৫৸৶ টাকাতেই মেস্‌-খরচ কুলাইয়া যাইত, সেই রক্ষা। এ অবস্থায় জলখাবারের 'খাতে' বেশী পয়সা ফেলা সম্ভব ছিল না; অভিভাবক মহাশয় এক আনা রেট্ বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। চারি পয়সায় মুড়িমুড়কি এক কোঁচোড় হয়, তাহাতে পেটও ভরে, কিন্তু নূতন নূতন সহরবাসী হইয়া মুড়ি চিবান অসভ্যতা মনে করিতাম; অথচ সন্দেশেও পড়তা পড়ে অনেক; অগত্যা বাধ্য হইয়া রফা করিলাম—জিলাপী ও জিবেগজা জলখাবারে। ('জ'কারের জয়-জয়কার!) শুভাদৃষ্টবশতঃ মেসের সাম্‌নেই রাখাল ময়রার দোকান; অপরাহ্ণ চারিটা ছিল মৌতাতের সময়; সেই মাহেন্দ্রক্ষণে যেই রসের খোলায় গরম গরম জিবেগজা বা জিলাপী ফেলা দেখিতাম, অমনি তামার চারিটি চাক্তী লইয়া (আনির তখনও জন্ম হয় নাই) একছুটে ও এক 'ছিটে' দোকানে হাজির হইতাম ও সেখানে বসিয়াই জঠরাগ্নির সৎকার করিয়া বাসায় আসিয়া জল খাইতাম।

২

বৎসর না ঘুরিতেই ভাগ্যদেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মা-সরস্বতীর কৃপায় পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইলাম। (এখনকার মত তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বিভাগে পাশের সদাব্রত খোলেন নাই, সুতরাং) মা-লক্ষ্মীরও দয়া হইল, পরীক্ষায় বৃত্তি পাইলাম। অর্থকৃচ্ছ্রতা ঘুচিল, পিতৃদেবের কষ্টার্জ্জিত অল্প আয়ের উপর আর শিক্ষাকর (Education cess) বসাইবার প্রয়োজন হইল না। উক্ত সহরেই এফ্‌ এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম। স্কুল হইতে কলেজে উন্নীত হইলাম, মেস্ হইতেও কলেজ হোষ্টেলে উন্নীত হইলাম। সেখানেও চার্জ্জ (থাকা ও খাওয়ার খরচা) বেশী নহে, নীচে-তালায় ৫৲, উপর-তালায় ৬৲; মেসে ছিলাম একতালায়, এখানে দোতালা বাড়ী পাইয়া দোতালায় প্রোমোশান লইলাম, কলেজের পড়া—একতালায় চলিবে কেন? জলখাবারের হারও সমানুপাতে বাড়িয়া গেল—'কোম্পানী'র পয়সায় আবার দরদ কি? বিশেষ, কলেজের পড়া কি চারি পয়সার খোরাকে চলে? চারি পয়সার যায়গায় অনেক দিনই লোভে পড়িয়া, অথবা পাল্লা দেওয়ার ঝোঁকে, চারি আনা পড়িয়া যাইত। একেবারে চতুর্গুণ বা ডবল প্রোমোশান! তা', বৃত্তির ডাক-নাম যখন জলপানি, তখন টাকাটা জলখাবারে খরচ করাই ইহার ন্যায্য ব্যবহার (legitimate use) এবং চরম সার্থকতা নহে কি? *

* 'খাবারে' খরচ না করিয়া (Scholarship) অর্থাৎ বিদ্যার বহর বাড়াইবার জন্য স্কলারশিপের টাকা কতকগুলা বাজে বই কিনিয়া অপব্যয় করা টাকাটা জলে ফেলা নহে কি? 'কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল!'

দুই জন খাবারওয়ালা (caterer) হোষ্টেলে খাবার সরবরাহ করিত। এক জন হালুইকর ব্রাহ্মণ—চেহারায় চাণক্যের দোয়ার, কিন্তু তাহার প্রস্তুত বড় বড় কচুরি, আলুর দম, মোহনভোগ 'অমৃত-সমান' ছিল,—কাশীদাসী মহাভারতও তাহার কাছে লাগে না। সেগুলির বর্ণ—বিক্রেতার (তথা ক্রেতার) বর্ণেরই এ পিঠ ও পিঠ, কিন্তু স্বাদ অতি সুন্দর ছিল। কালো যে ভালো হইতে পারে, তাহার প্রমাণ এই প্রথম পাইলাম। তাহার পর, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ অনেকের প্রস্তুত, অন্যে পরে কা কথা, ব্রাহ্মণীর শ্রীহস্তে প্রস্তুত উক্ত খাদ্যত্রয় খাইয়াছি—কিন্তু তেমন সু-তার পাই নাই। জানি না, সেই বয়ঃসন্ধিকালের ক্ষুধার চোটে সুধাসম লাগিত, কি প্রকৃতই যদু ঠাকুরের হাতের বা হাতার গুণ ছিল।

দ্বিতীয় খাবারওয়ালাটি ছিল জাতে ময়রা, নামে রসময়, শুধু নামে কেন, কাযেও তাই। লাল-কবির কবিতার 'বিমল সৌন্দর্য্যও এই মোদক-নন্দনের ধবধবে রসগোল্লা ও বাদামে' গোল্লার নিকট নিষ্প্রভ, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিব; তাহাতে বন্ধুবর রাগই করুন আর দুঃখই করুন। আর সেই নিটোল রসগোল্লার তীব্র মাধুর্য্য 'গীতগোবিন্দে'র কবিরও গর্ব্ব খর্ব্ব করিত! ('সাধ্বী মাধ্বীকচিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি' ইত্যাদি শ্লোক স্মর্ত্তব্য।') * অতি আগ্রহে, অতি আরামে, টপাটপ একটির পর একটি মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতাম; পাল্লার পাল্লায় পড়িয়া প্রায় প্রতিদিনই বেচারার (?) বড় বারকোষখানি খালি হইত। শেষে এমন হইল, রসদদার আর রোজ রোজ এই হাতীর খোরাক যোগান দিয়া উঠিতে পারিল না, ফৌত হইল। (ফৌত হওয়ার অবান্তর কোনও কারণ ছিল কি না, তৎ-সম্বন্ধে গবেষণা করি নাই।)

আম-কাঁঠালের সময় ছুটী থাকিত, তবে তখনকার গ্রীষ্মের ছুটী (Summer Vacation) শুধু মাসব্যাপী ছিল, এখনকার মত অফুরন্ত (আষাঢ়ান্ত † দিনের ন্যায়) ছিল না, আবার শীতকালেও বড়দিন-উপলক্ষে মাসব্যাপী ছুটী (Winter Vacation) হইত। শীতের ছুটীটা বেশ কাযে লাগিত; পল্লীগৃহে গিয়া খেজুর-রস, নলেন গুড়, 'তাত-রসা' দিয়া চালতার অম্বল ও পায়স, এবং খেজুর-গুড় অনুপান-সহ পৌষ-পার্ব্বণের পিঠেপুলিতে পেট ভরাইবার সুযোগ-সুবিধা ঘটিত। একাসনে বসিয়া আঠারোখানি সরুচাকুলি উদরসাৎ করিয়াছি, বেশ মনে পড়ে; অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য 'জায়'ও ছিল। এখন 'স্বপনের মত বোধ হয়' 'অত্যাচার যত।' বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে হরদম আম-কাঁঠাল চলিত; তবে কাঁঠালের মরসুম না ফুরাইতেই ছুটী ফুরাইত (তখনকার গ্রীষ্মের ছুটী-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছত্রটি প্রযুজ্য—'কোনও সুখ ফুরাই নি যা'র তা'র কেন জীবন ফুরায়?') এই যা' একটু খুঁতে মনটা খুঁত খুঁত করিত। যাহা হউক, জনার্দ্দন সে খুঁতটুকুও ঘুচাইয়া জীবনটা নিখুঁত করিয়াছিলেন। কলেজে পাঠের সময় নবাগত সতীর্থ ও সুহৃদ্ পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী (কর্ম্মজীবনে রীপণ কলেজ-স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছিলেন—এক্ষণে পরলোকগত,) যে বাসায় থাকিতেন, সেখানে একটি কাঁঠাল-গাছ ছিল, তাহাতে বিস্তর রসাল কাঁঠাল ফলিত; (আহা, পাকা কাঁঠালের কথা মনে পড়িলেই তাঁহার জন্য শোক নবীভূত হয়।) আমার পনস-প্রিয়তার * কথা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে ফ্রী সীজন্-টিকিট দিলেন অর্থাৎ সমস্ত মরসুমের সময়টা পাকা কাঁঠাল-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন। যে দিনই কাঁঠাল পাকিত, সেই দিনই কলেজে আসিয়া তিনি সুসমাচার দিতেন; আমিও কলেজের পরে হোষ্টেলে না ফিরিয়া বরাবর তথায় গিয়া বন্ধুর মান তথা নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা সুচারুরূপে রক্ষা করিতাম। 'সুচারু-রূপে' বলিলাম, জানি না, ইহাতে অত্যুক্তি হইল কি না—কেন না, কোনও দিনই আধখানার বেশী গোটা একটা কাঁঠাল খাইয়া উঠিতে পারি নাই।

দুঃখের বিষয়, চাকরী-জীবনে কলিকাতা-বাসের আরম্ভ-কালে (তখনও অগ্নির তেজ যথেষ্ট ছিল) কাঁঠালে হঠাৎ

* 'গীতগোবিন্দে'র বাঙ্গালা পয়ারছন্দে অনুবাদক বলিয়া ৺ রসময় দাসের নাম শুনা যায়। ইনিই কি জন্মান্তরে হালের কবি রসময়ের কায়গ্রহণ করিয়াছেন এবং ক্রমবিকাশবশতঃ অনুবাদের উপর এক ধাপ উঠিয়া সুমিষ্ট মৌলিক কবিতা লিখিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন?

† আষাঢ়ান্তই বা বলি কেন? আজকাল গ্রীষ্মাবকাশ শ্রাবণান্ত হইতেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বৎসর বৎসর যেরূপ অযথা বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহাতে শীঘ্রই বাধ্য হইয়া 'ভাদ্রান্ত' করিতে হইবে, এরূপ ভরসা হয়।

* লেখকের কাঁঠাল-প্রীতির ফলেই কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, এক জন সুরসিক বন্ধুর এইরূপ অনুমান!

বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল—বোধ হয়,সহরের বাতাস লাগিয়া; অথচ তখন গ্রীষ্মের লম্বা ছুটী দেশের বাটীতেই কাটাইতাম। এখন সে বৈরাগ্যের ভাব কাটিয়াছে, কিন্তু দেশে যাওয়ার 'পাট' উঠিয়াছে। কলিকাতায় মূল্যও বেজায়, আবার দেশ হইতে আনাইলে রেলভাড়া, মুটেভাড়া দিয়া খরচা পোষায় না, 'ঢাকের কড়িতে মনসা বিকাইয়া যায়'; সুতরাং এখন যে আর পেটে সহে না, সেটা 'শাপে বর,' 'blessing in disguise,' 'অনুকূলং খলু গলহস্তঃ' বলিতে হইবে। (God tempers the wind to the shorn lamb !')

৩

তাহার পর, এফ্ এ পরীক্ষায় (আমার মত দরিদ্র-সন্তানের পক্ষে) মবলগ টাকা স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতায় বি এ পড়িতে আসিলাম; ব্যয় বাড়িল বটে, কিন্তু আয়ও তেমনি বাড়িল, সুতরাং 'হরে দরে হাঁটু জল' দাঁড়াইল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি না হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্ত্তি হইলাম—তাহাতে খরচার বেশ একটু স্বাশ্রয় হইল। ওদিকে খরচা কমাতে জলখাবারের 'খাতে' বজেট্ বাড়াইতেও সমর্থ হইলাম।

কৃষ্ণনগরে দুই জন বাঁধা খাবারওয়ালা (caterer) খাবার যোগাইত, এখানে অবস্থার উন্নতির সহিত আরও এক জন বাড়িল। প্রথম ব্যক্তি রাঢ়ের লোক, জাতে আগুরী, জোয়ান পুরুষ, মসীকৃষ্ণবর্ণ, লোকটি সংবৎসর 'খাবার' বেচিয়া 'দেশে' দুর্গোৎসব করিত, শুনিয়াছি। দ্বিতীয়টি বৃদ্ধ, যশোর জেলায় বাড়ী, মাথায় টাক (ক্ষীরমোহনের থালা বহিয়া বহিয়া ?), যোড়াসাঁকোর ক্ষীরমোহন বেচিত। ইহাই এখানে রসময়ের রসগোল্লার স্থান অধিকার করিয়াছিল। এক গণ্ডা তো রোজই উঠিত, যে দিন পাল্লা চলিত, সে দিন 'গণ্ডা চ গণ্ডা' উড়িত। কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যেও এই অতিরিক্ত মিষ্ট-ভক্ষণে অম্ল-উদ্গার যে কি বস্তু, তাহা কোনও দিন জানিতে পারি নাই। এখনকার কালে দুই আনার, এমন কি, চারি আনার 'রাজভোগ' চলিয়াছে, কিন্তু এ সব সেই এক আনা দামের ক্ষীরমোহনের কাছে লাগে না, ইহা জোর গলায় বলিতে পারি।

তৃতীয় জন হিন্দুস্থানী, পৈতাধারী (সেই ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুস্থানী বাঙ্গালায় ছুঁচ হইয়া ঢুকিয়াছে)। লোকটি আজও বাঁচিয়া আছে, সম্প্রতি পাশের বাড়ীতে খাবার যোগায় এবং এই পুরাতন মুরুব্বির আর সে উদারতা ও উদরপরায়ণতার পরিচয় পায় না বলিয়া মদীয় গৃহিণী ও পুত্রকন্যাদিগের নিকট আক্ষেপ করে।

প্রকৃত বিষয়ী লোক যেমন বাঁধা মাহিয়ানায় সন্তুষ্ট থাকে না, কিঞ্চিৎ 'উপরি'র চেষ্টা করে, তেমনি আমরাও বাঁধা খাবারওয়ালার রোজকার খরিদদার হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি নাই, মধ্যে মধ্যে দোকান হইতেও 'খাবার' আনাইতাম। হাড়কাটা গলির * (এখন এই অংশের নাম হইয়াছে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট্) ক্ষীরের ছোট ছোট বরফী বড়ই উপাদেয় লাগিত। তখন তো আর কাশীর কালাকাঁদের স্বাদ পাই নাই। সুতরাং ইহাকেই বরফীর সেরা ভাবিতাম। 'ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।'

বরফীর কথায় কুলপী-বরফের কথা মনে পড়িল। এই প্রাণঠাণ্ডা করা জিনিষটি যোগাইত মহেন্দ্র দত্ত, জাতিতে কায়স্থ, নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। তাহার হাতের তৈয়ারী মালাই, কমলালেবু ও আনারসের কুলপী খাইয়া সাহেব-লোক পর্য্যন্ত তারিফ করিত। মিষ্টান্নপ্রিয় আমরা রকমারির জন্য রসগোল্লা ও পানতোয়ার কুলপী পর্য্যন্ত করাইয়া খাইয়াছি। মহেন্দ্র এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, জানি না, আজও মেসে হোষ্টেলে যোগান দেয় কি না। কলিকাতায় চাকরীর জীবনেও কিছুদিন তাহার সহিত পূর্ব্ব খাতির ঝালাইয়াছিলাম, কিন্তু শেষটা দেখিলাম, ব্যাপার কিছু ঘন, পুত্রকন্যা সকলের তৃপ্তিসাধন করিতে হইলে বিস্তর ব্যয় পড়ে। সুতরাং বেশী দিন খাতির রাখা চলিল না। শাস্ত্রেও আছে, 'ত্যাগাৎ পরতরং নহি।'

আমরা যে মেসে থাকিতাম, তথায় সকলেই নদীয়া জেলার লোক, এবং দু'এক জন ছাড়া সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রিয়দর্শন উদারচরিত সহপাঠী বন্ধুবর লালগোপাল চক্রবর্ত্তী, ডাকনাম ছিল 'লালগোলাপ' বা শুধু 'গোলাপ',

* আমাদের বাসা ছিল এই গলির পার্শ্বস্থিত গলিতে; তখন সেই গলির নাম ছিল পঞ্চাননতলা লেন। পরে তাহার নাম (বা ভোল) বদলাইয়া হইয়াছিল ক্যাথিড্রাল মিশান লেন। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে ইহাই সম্ভব; শুধু মানুষ কেন, মানুষের আবাসপল্লীও খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়! অধুনা ইহার নাম হইয়াছে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। জানি না, ইহা এই পরাধীন জাতির স্বরাজলাভের সূচনা কি না ? এখনও মামুলি অভ্যাসবশে এই গলিতে পূর্ব্বাবাসগৃহের আশে-পাশে প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইবার ঝোঁক আছে।

(কর্ম্মজীবনে খ্যাতনামা প্রোফেসার,—এক্ষণে পরলোকগত।) বলিতেন, 'উহাদিগকে আমরা ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছি।' মেসের নাম রাখা হইয়াছিল –'নদীয়া ব্রাহ্মণিক্যাল ক্লাব'। মেসের রান্না মন্দ ছিল না; মন্দ না হইবারই কথা, কারণ, বামুন ঠাকুর না রাখিয়া বামন ঠাকরুণ রাখা হইয়াছিল। প্রবীণবয়স্কা পতিগৃহবঞ্চিতা কুলীনপত্নী সধবা 'সুরেনের মা' আমাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে খাওয়াইত। তথাপি 'বামনী' যে দিন শরীরগতিকে আসিতে অশক্ত হইত, সে দিন রান্না বন্ধ থাকিত না, বরং আহারের বেশ একটু ঘটা হইত, কেন না, বন্ধুবর লালগোপাল ও অপর এক জন * (তিনিও এক্ষণে পরলোকগত) রন্ধনপটু ছিলেন, পরম উৎসাহে মৎস্য-মাংসাদি পাক করিতেন, অন্য সকলে 'যোগাড়' দিত। আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও অপটু ছিলাম, তাই আমার উপর কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যের ভার পড়িত না। আমি ছিলাম চাখনদার (Taster) নুণ-ঝাল সমান হইয়াছে কি না, চাখিয়া দেখিয়া রিপোর্ট দিতাম। অবশ্য মূলা-ষষ্ঠীর 'কথা'র দাসীর মত চাখিতে চাখিতেই হাঁড়ী-কড়া সাবাড় করিতাম না। তবে এক রাত্রে (বন্ধুবরের অনুপস্থিতিতে) অপর ভদ্রলোকটি (তিনি রন্ধন ও ভোজন উভয় কার্য্যেই বৃকোদর-সদৃশ ছিলেন) ও তাঁহার এই সহকারী উভয়ের সমবেত চেষ্টায় ইলিশমাছ-ভাজা চাখিতে চাখিতে থালাকে থালা পার হইয়াছিল —শেষে বিড়ালের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া সাফাই দেওয়া গেল।

এই তো গেল রন্ধনশালার লীলা! আবার শয়ন-মন্দিরেও একটি অদ্ভুত কাণ্ড করা গিয়াছিল। পরীক্ষার সমসম-কালে সমপাঠী সুহৃদ্ লালগোপালের সহিত রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস চালাইয়া উভয়েরই উৎকট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল—মস্তিষ্ক-চালনার ফলে বালাম চা'লের ভাত বেমালুম হজম হইয়া গিয়াছিল। অথচ ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্য এক কণাও সঞ্চিত ছিল না। উপায় কি? উপস্থিতবুদ্ধি বন্ধুবর উপস্থিত অন্য কিছু না পাইয়া বিশ্রব্ধভাবে নিদ্রিত অপর একটি সমপাঠী সুহৃদের (শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, কর্ম্মজীবনে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন, সম্প্রতি পেন্‌শান লইয়াছেন) মল্ট এক্‌স্‌ট্র্যাক্টের পূরা শিশিটি উত্তর-সাধকের সাহায্যে (একে রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব সহায়!) খালি করিলেন—ভাগ্যে তাহার সহিত কড্‌লিভার অয়েল্ মিশ্রিত ছিল না! শাস্ত্রে বলে 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ'—আমরা তাহার অনুবৃত্তি করিলাম, 'গুড়াভাবে মল্টম্ অদ্যাৎ'! তাড়াতাড়ি বা কাড়াকাড়ি বা আগ্রহের বাড়াবাড়িতে শেষটা শিশি ভাঙ্গিয়া গেল; ভালই হইল, এবারও বিড়ালের উপর দোষ চাপান গেল * এবং 'বিড়ালের ভাগ্যে (শিকা ছিঁড়িয়াছে নহে) শিশি ভাঙ্গিয়াছে' বলিয়া পরদিন প্রাতে শিশির মালিকের কোপবহ্নি তরল হাসির তরঙ্গে নির্ব্বাপিত করা গেল। পাঠকবর্গ অবশ্যই এই যুগলরত্নের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করিবেন।

এইবার, বন্ধুবরের সঙ্গে একটি সতীর্থের গৃহে নিমন্ত্রণ খাওয়ার কথা বলিয়া বি এ পড়ার ইতিহাস শেষ করি। (ইনিও এক্ষণে পরলোকগত।) সতীর্থটি খাস কল্‌কাত্তাই, সন্ধ্যার পর আম খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকে গণ্ডা দুই তিন আম খাইয়া ব্যালাষ্ট্ বোঝাই দেওয়া গেল (বোম্বাই, লেঙ্গড়া প্রভৃতি মহার্ঘ্য আম অবশ্য আর অধিক আশা করা যায় না)। তাহার পর খানকতক ফুলকা লুচি ও পটোল-ভাজার এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নের আয়োজন ছিল। (ফল খাইয়া জল খাইতে নাই—অনুপ্রাসের খাতিরেও নহে।) কিন্তু কলিকাতাবাসী সতীর্থের এষ্টিমেটের চতুর্গুণ চক্ষের নিমেষে নিঃশেষ করাতে পরিবারস্থ সকলের রাত্রের খোরাক যে ময়দা মাখা ছিল, তাহা সবই ফুরাইল। আবার নূতন করিয়া ময়দা মাখিতে

* এই ভদ্রলোকটি যৌবনেই বিলক্ষণ স্থূলকায় ছিলেন; মধ্যে মধ্যে ধনিগৃহিণী পিস্‌শাশুড়ীর বাড়ী হইতে জামাই-আদরে আহারাদি সমাধা করিয়া সপ্তাহান্তে মেসে ফিরিলে ধোপাবাড়ীর ফেরত জামা গায়ে আঁটিত না, বলিতেন, 'ধোপা জামা বদলাইয়া দিয়াছে।' কি ভাগ্যে (Dumas এর "Chicot the Jester" নভেলে Father Gorenflot এর ন্যায়) বাসাবাড়ীর সিঁড়ি সরু হইয়াছে বলেন নাই।

* বারে বারে বিড়ালের উপর পাপ চাপাইয়া (scape-goat নহে, scape-cat!) অপরাধী হইয়াছি। এজন্য অপরাধ-ক্ষমাপণ-স্তোত্র-পাঠের প্রয়োজন। তিন বৎসরের দৌহিত্রী তিন মাসের একটি বিড়ালছানা আঁস্তাকুড় হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল। সেইটিকে এই ছয় বৎসর সযত্নে মাছ দুধ খাওয়াইয়া পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। মাছের বদলে মাছ, আর মল্টের বদলে দুধ—তা' মল্ট তো দুধ দিয়াই যায়, (Cowper) কুপারের মত কবিত্বশক্তি নাই, তাই কবিতা লিখিয়া ইহার গুণগান করিতে পারিলাম না। বিড়ালটির নাম ভুতো, ভুতী ব্যাকরণসম্মত, যেহেতু, এটি মেনি-বিড়াল) কিন্তু ঠিক কৃষ্ণবর্ণ নহে, বাঘের মত চিত্রবিচিত্র, দেখিলেই 'বাঘের মাসী' বলিয়া চেনা যায়!

(বাজার হইতে আনিতে ?) হইল। মুখ কামাই দিলে নিমন্ত্রয়িতা অপ্রস্তুত হইবেন বলিয়া ড্রিলের marking timeএর মত শেষের সংস্থান সন্দেশ-রসগোল্লা কয়টা ধীরে-সুস্থে মুখে গুঁজিতে লাগিলাম। তিনি কিন্তু সে জন্য কৃতজ্ঞ না হইয়া আর কখনও আমাদিগকে খাইতে বলেন নাই।

৪

যথাসময়ে উভয় বন্ধুতে সম্মানের সহিত বি এ পাশ হইলাম। এবারও মোটা টাকা জলপানি পাওয়াতে সাবেক চা'ল বজায় রহিল। 'সব ভাল যার শেষ ভাল' এই প্রবাদবাক্যের উপর ভর করিয়া শেষ পরীক্ষার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজে, (premier) সেরা কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। এম্ এ পড়ার শেষ বৎসর সুহৃদ্‌ভেদ (অবশ্য মর্ম্মান্তিক বা চিরস্থায়ী নহে) এবং মিত্রলাভ উভয়ই ঘটিল। পুরাতন বন্ধু (লাল) গোপালকে ছাড়িয়া নূতন বন্ধু (কালো) রাখালের সহিত মিলিলাম। বর্ণে বর্ণে সমতা হইল ! (পুরা নাম রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়। ইনি আমার পর বৎসরে কৃষ্ণনগর কলেজের তথা প্রেসিডেন্সী কলেজের যশস্বী ছাত্র ছিলেন, পরে কর্ম্মজীবনে ক্রমোন্নতিতে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন, এক্ষণে পরলোকগত।) ইঁহাদের মেস্ ছিল বহুবাজারে ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীটে—আড্ডির পুস্তকের দোকানের ঠিক সামনাসামনি। এখানেও সকলে না হইলেও, বোধ হয়, অধিকাংশই নদীয়া জেলার লোক ছিলেন। এই সময়কার ভোজন-বিলাসের বিবরণ দিয়া আর ভিজা কম্বল ভারী করিব না, কেবল দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

৺রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম ঘটনা। উক্ত বন্ধুর বিবাহে (হায় ! আজ সে বন্ধু কোথায় ?) মুঙ্গেরে বরযাত্রী গিয়া কয়েক জন বন্ধুতে মিলিয়া খুব একটা কীর্ত্তি রাখিয়া আসা গিয়াছিল। স্নানান্তে জলযোগের জন্য মজুত 'খাবার', স্নানের পূর্ব্বেই, চেঙ্গারীকে চেঙ্গারী উজাড় হইয়া গেল।* ইহাকেই বলে রন্ধনের চাউল চর্ব্বণে ফুরান ! তাহার পর 'কষ্টহারিণী'র ঘাটে আরামে স্নান করিয়া ফিরিয়া জলযোগে গোলযোগ ঘটিল, কেন না, শূন্য ভাণ্ডার ; আবার বাদসাহী মেজাজে খাবারের চেঙ্গারীর জন্য জোর তলব করা গেল। আমাদের এই ব্যবহারে কন্যাপক্ষীয়েরা বিষম বিব্রত। একে বরযাত্রীর দল, তাহাতে উদর-সমুদ্রে যৌবনের বাড়বানল, তাহার উপর মুঙ্গেরের আবহাওয়া, আবার সীতাকুণ্ডের জল ও তাহা হইতে প্রস্তুত সোডা-লেমনেড খাওয়া—'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্ !' এখন মনে করিতে লজ্জা ও কষ্ট হয়, ভদ্রলোকদিগের সহিত কতই বেয়াদবি করা গিয়াছে। যদি বর্ত্তমান অকিঞ্চিৎকর বিবরণ তাঁহাদিগের কাহারও চোখে পড়ে, এই আশায় তাঁহাদিগের নিকট যৌবনের অপরাধের জন্য সবিনয়ে মার্জ্জনা চাহিতেছি। ভরসা করি, দেনার দায়ের ন্যায়, ক্ষমাভিক্ষা কখনও মিয়াদী সময় ফুরাইলে তামাদি হয় না।

দ্বিতীয় ঘটনা। একবার পাড়ার এক জন বড় লোকের বাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তা কি একটা বিভ্রাটে পড়িয়া ব্রাহ্মণ না পাইয়া, 'যজ্ঞি' পণ্ড যাহাতে না হয়, সেই জন্য আমাদের দ্বারস্থ হয়েন ; আমরা যৌবনোচিত উদারতা দেখাইয়া সাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং ভোজনকালে নিজেদের মুখের জোরে তাঁহার মুখ রাখিয়াছিলাম। আমাদের পল্টনের রসগোল্লা খাওয়া দেখিয়া (এখনকার অখাদ্য স্পঞ্জ রসগোল্লা নহে, আদি ও অকৃত্রিম) খাস কলিকাতার বাসিন্দা অম্লরোগী ভদ্রলোকগণ তটস্থ হইয়াছিলেন। তবু এ পক্ষ উচিত-মত হাত দেখাইতে পারেন নাই, তাহার

* তখন অবশ্য অস্নাত আহার-রূপ অনাচারে ইতস্ততঃ ছিল না। কিন্তু এখন দুপুর গড়াইয়া গেলেও স্নান না করিলে আহারে রুচি হয় না, খাদ্য গলা দিয়া নামে না ! (অসুস্থ অবস্থার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।) তবে প্রাতঃকৃত্য-সমাপনান্তে শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইবার জন্য চারিখানি চিনির বাতাসা ও একঢোক জল খাইয়া পিত্ত রক্ষা করি। বাতাসা চারিখানি বোধ হয়, বাল্যের অভ্যস্ত ঘোড়া মোণ্ডার সস্তা সংস্করণ।

লেখক

কারণটা একটু অদ্ভুত রকমের। নিমন্ত্রণক্ষেত্রে আমাদের পংক্তির অদূরে এক ব্যক্তি আহারে বসিয়াছিলেন—দেখিতে অবিকল আমার কৃষ্ণনগরে পড়ার সময়কার হেড মাষ্টার মহাশয়ের মত। এই হেড মাষ্টার মহাশয়কে আমি যমের মত—অথবা গুরুমশায়ের মত—ভয় করিতাম, যদিও তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। (এক্ষণে তিনি পরলোকগত।) * তাঁহাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া (সম্ভবতঃ ইহা রজ্জুতে সর্পভ্রম) আমার হরিষে বিষাদ ঘটিয়াছিল, সমস্ত স্ফূর্ত্তি একদম মাটী হইয়াছিল। সেই রাত্রের স্ফূর্ত্তিহীনতার সুরের সহিত বর্ত্তমান রোগজীর্ণ অবস্থার সুর মিলাইয়া এবারকার মত পালা সাঙ্গ করিলাম। পাঠকও বোধ হয় এতক্ষণে 'পালাই পালাই' করিতেছেন। বারান্তরে চাকরী-জীবনের ভোজন-লীলার কাহিনী বিবৃত করিব।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* 'Nothing but songs of death!' এই বিবরণ লিখিতে বসিয়া কতগুলি মৃত্যু-সংবাদ দিলাম, ইহা একটা ভাবিবার বিষয়। হেড মাষ্টার মহাশয় বার্দ্ধক্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু অপর সকলেরই অকালমৃত্যু। লেখক একলা শ্মশান-জাগরণ করিতেছেন। 'আমিই শুধু রইনু বাকি।'

ফাগুনের ফুল-বাদল

শিশির ঋতুর অবসানে অকালে কি বর্ষা এলো?
নানান্ রঙের জলদজালে কাননভূমি ভরল যে লো।
ঐ না লো সই গগনসীমায়
ইন্দ্রধনু তায় দেখা যায়?
অদূরে না ময়ূর নাচে? মেঘের সাড়া কোথায় পেল?

ঝরো ঝরো ঝর্‌ছে বাদল ঠোঁটে পড়ে' মিষ্টি লাগে,
বাসব আজি ভুল ক'রে কি পশ্‌ল গিয়ে রতির বাগে?
দামিনী কি নাচতে নেমে
ব্যাপার দেখে রইল থেমে?
চম্‌কে গিয়ে অশোকপলাশ শিমুলবনে থম্‌কে গেল?

মেঘেরা সব মন্দ্র ভুলে কর্‌ছে কূজন-কানাকানি,
সমীরণের চঞ্চলতায় হবেই সবি জানাজানি।
বাদল ঝরে কুঞ্জবনে,
শব্দ তার ঐ গুঞ্জরণে,
দোলের আগে কামনবাগে ঝুলন ডেকে আন্‌লে কে লো?

শ্রীকালিদাস রায়।

প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ

এ বৎসর প্রয়াগের অর্দ্ধকুম্ভ-মেলায় বিশেষ জনতা দেখিলাম না। মকরসংক্রান্তির স্নান হইতে এই মেলার আরম্ভ; সেই দিন স্নানের ব্যবস্থা ভাল হয় নাই, তাহার কারণ, একটি নৈসর্গিক অর্থাৎ এ বৎসর গঙ্গার স্রোতঃ বিশেষ প্রবল, সুতরাং সঙ্গমস্থানে অবারিতভাবে এককালে বহু লোকের স্নানের অসুবিধা। দ্বিতীয় কারণ, কর্ত্তৃপক্ষের আমাদিগকে ডুবিয়া মরিবার হস্ত হইতে নিস্কৃতি দিবার জন্য অতিমাত্রায় সতর্কতা। এই দুইটি কারণের মিলনে পুলিসের সহিত জননায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির বাদানুবাদ ও সত্যাগ্রহের সংবাদ, সংবাদপত্রসমূহে যথাসময়েই প্রচারিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরালোচনা নিস্প্রয়োজন।

গত ৯ই মাঘ আমি কাশীধাম হইতে যাত্রা করিয়া ঐ দিনেই বেলা তিনটার সময় প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনই বেলা ৪টায় মেলাস্থানে পৌছিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতেই মনে হইল, যেন মেলা প্রাণহীন, কুম্ভমেলার প্রধান দ্রষ্টব্য ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু-মোহান্ত এবং সন্ন্যাসিগণের বিরাট সম্মিলন, এ বৎসর স্নানের সুবিধা হইবে না, এই সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সকল প্রান্তে লোকমুখে এবং সংবাদপত্রসমূহে প্রচারিত হইয়াছিল; শুনিলাম, সেই জন্যই সাধু-মোহান্ত ও সন্ন্যাসীর দল এই অর্দ্ধকুম্ভে অর্দ্ধেকেরও কম আসিয়াছেন। যাঁহাদের লইয়া মেলা, তাঁহাদেরই সংখ্যা অল্প; সুতরাং দর্শকের সংখ্যা যে সেই অনুপাতে অল্পই হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মেলায় যাইবার প্রথম অসুবিধা হইল—কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে সঙ্গমের প্রায় দুই মাইল দূর হইতেই ভাড়াটিয়া গাড়ী বা একা হইতে বাধ্য হইয়া অবতরণ করা, অর্থাৎ পদব্রজে প্রায় এক ক্রোশ পথ না হাঁটিলে জনসাধারণ কি স্ত্রী, কি পুরুষ কাহারও সঙ্গমস্থানে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। চারিদিকে চাহিয়া বোধ হইল, ভালভাবে বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলে, অনায়াসেই মেলাস্থানের সীমাস্বরূপ উচ্চ পাড়ের নীচে পর্য্যন্ত গাড়ী যাতায়াতের বেশ সুব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু যাত্রিগণের অদৃষ্টবশতঃ কর্ত্তৃপক্ষের সেরূপ বুদ্ধি হইয়া উঠে নাই, সুতরাং আমাদিগকে গাড়ী ছাড়িয়া মেলাস্থানে পৌছিতে প্রায় এক ক্রোশ হাঁটিতেই হইল।

গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমের সম্মুখে আকবর বাদশাহের বিশাল দুর্গের উত্তরদিকে উচ্চ বাঁধ হইতে মেলার দৃশ্য বড়ই সুন্দর বোধ হইল। বাঁধ হইতে প্রশস্ত পথ পূর্ব্বাভিমুখে সোজাসুজি ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, সমতল সৈকতভূমিতে পতিত হইয়া ঐ পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; একটি দক্ষিণদিকে সঙ্গমের দিকে গিয়াছে, আর একটি পূর্ব্বে গঙ্গার দিকে গিয়াছে। গঙ্গার দিকে যে পথটি গিয়াছে, তাহারই দুই পার্শ্বে সাধুগণের আখড়া সারি সারি ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে; দক্ষিণদিকের আখড়াগুলির ঠিক মাঝখানে পুলিসের চৌকী বসিয়াছে। আখড়াগুলির সাজসজ্জা দেখিবার যোগ্য, মধ্যে খড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত খুব বড় আটচালা, তাহার চারিদিকে ছোট ছোট খড়ের কুটীর-শ্রেণী, তাহারই মাঝে মাঝে বড় বড় তাম্বু খাটান হইয়াছে। এই সকল খড়ের কুটীরে বা তাম্বুতে সাধু-সন্ন্যাসিগণ বাস করিতেছেন। মাঝখানের আটচালার মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর সুন্দর বহুমূল্য আবরণ-বস্ত্র, তাহার উপর কোথাও রজত-সিংহাসন, কোথাও বা স্বর্ণখচিত সিংহাসন, আবার কোথাও বিচিত্র কারুকার্য্যভূষিত ধাতুময় বা কাষ্ঠময় সিংহাসন; তাহার উপর কোনটিতে গুরু-পাদুকা, কোনটিতে গ্রন্থসাহেব, কোনটিতে বা শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি বিরাজমান। এক পার্শ্বে মোহান্তের বসিবার জন্য কিংখাপ বা মখমলের উচ্চ গদি। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গুরু-পাদুকা প্রভৃতির আরতি খুব ধুমধামের সহিত সম্পাদিত হয়, মধুর নহবতের সহিত কাংস্য, ঘণ্টা ও ঘড়ির শব্দ মিলিত হইয়া প্রত্যেক আখড়াকে প্রতিধ্বনিত করিয়া থাকে, ধূপ, ধুনা ও অগুরুর গন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইয়া উঠে, ভক্ত যাত্রিগণের জনতাও সেই সময় বেশ জমিয়া যায়, সমগ্র সৈকতভূমি যেন সনাতনধর্ম্মের একতাময় জীবন্ত ছবির প্রতিচ্ছায়ায় পরিপূরিত হইয়া যায়; সত্য সত্যই যেন ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের একটা

প্রাণের স্পন্দন সমবেত জনতার সমষ্টি হৃদয়-সিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। ত্রিবেণী-সঙ্গমে বিশাল ভাগীরথী-সৈকতে এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মময় দৃশ্য দেখিয়া কোন্ হিন্দুর প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত না হইয়া থাকিতে পারে?

এই কুম্ভমেলা নিখিল ভারতের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের আন্দোলনহীন বিরাট কংগ্রেস। কেমন করিয়া ইহা আরম্ভ হইয়াছে ও কি ভাবে চলিয়াছে আর কেনই বা চলিয়াছে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সে দিন সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। বাসা মেলার মধ্যেই পাইয়াছিলাম, মেলায় কলের জল সরবরাহ করিবার জন্য পূর্ব্বকথিত গঙ্গার পাড়ের নিম্নে গভর্ণমেণ্ট একটি নাতিবৃহৎ বস্ত্রাবাস স্থাপন করিয়াছেন; তাহারই সংলগ্ন কয়েকখানি খড়ের কুটীরে প্রয়াগবাসী বাঙ্গালী কয়েকটি ভদ্র গৃহস্থ একসঙ্গে কল্পবাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার শিষ্যা শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যালের মাতা ছিলেন, তাঁহারই একান্ত আগ্রহে আমাকে সেই বাসাতেই থাকিতে হইল। বাসার সংলগ্ন একটি নাতিবৃহৎ তাঁবুর মধ্যে একটি ভাল কুঠারী আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম; শীত বেশ বোধ হইতে লাগিল। শচীন্দ্রনাথের মাতার সুব্যবস্থার গুণে কোন ক্লেশ পাইতে হইল না। সন্ধ্যাবন্দনাদির পর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শয়ন করিলাম, এক ঘুমেই রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি মুণ্ডনাদি করিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানাদি বৈধকার্য্য শেষ করিয়া বেলা ১১টার পর বাসায় ফিরিলাম, যত শীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ করিয়া লইলাম, আহারান্তে অল্প বিশ্রামের পর কুম্ভমেলার প্রকৃত ইতিহাস সাধু-সন্ন্যাসিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য বাসা হইতে নির্গত হইলাম; মোহান্তগণের আখড়ায় আখড়ায় ঘুরিয়া ঐ বিষয়ে সন্ধান করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, তাহারই কিঞ্চিৎ "মাসিক বসুমতীর" পাঠকবর্গের উপহারের জন্য নিম্নে লিখিত হইতেছে। বলিয়া রাখা ভাল, আমি চারি দিন এই ভাবে সাধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। এই অনুসন্ধানব্যাপারে আমার প্রধান সহায় ছিলেন—কাশীধামে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের রণবীর পাঠশালার সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত পদ্মনাভ শাস্ত্রী। ইঁহার সঙ্গে অনেক বড় বড় মোহান্তগণের বিশেষ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। পণ্ডিতজীর সাহায্য না পাইলে আমি এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতাম কি না সন্দেহ, এই কারণে আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কুম্ভমেলার পৌরাণিক মূল

এই মেলার বা মেলার হেতু যোগবিশেষের উল্লেখ কেবল স্কন্দপুরাণের পুষ্করখণ্ডেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে ভাবে বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার তাদৃশ প্রসিদ্ধি যে ছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, স্মৃতিচন্দ্রিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কালসার বা গদাধর-পদ্ধতি পর্য্যন্ত কোন স্মৃতি-নিবন্ধেই এত বড় মহাযোগের বিষয়ে কোন কথাই বলা হয় নাই। স্মৃতিচন্দ্রিকার সময় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী আর গদাধর-পদ্ধতি নামে উৎকলদেশের শেষ প্রসিদ্ধ স্মৃতি-নিবন্ধের রচনাকাল ৩ শত বৎসরের অধিক নহে। এইরূপ সময়ে বা ইহারও কিছু পরে আরও অনেক স্মৃতি-নিবন্ধ বিরচিত হইয়াছে; যেমন নির্ণয়সিন্ধু বা ধর্ম্মসিন্ধু প্রভৃতি। কিন্তু কোন স্মৃতি-নিবন্ধেই এই কুম্ভমেলার স্নানসম্বন্ধে কোন প্রকার প্রমাণ-বচন বা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্কন্দপুরাণের পুষ্করখণ্ডে এইরূপ একটি বচন দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে,—

"মকরস্থো যদা ভানুস্তদা দেবগুরুর্যদি।
পূর্ণিমায়াং ভানুবারে গঙ্গা পুষ্কর ঈরিতঃ॥
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ।
সিংহসংস্থে দিনকরে তথা জীবেন সংযুতে॥
পূর্ণিমায়াং গুরোর্বারে গোদাবর্য্যাং তু পুষ্করঃ।
মেষসংস্থে দিবানাথে দেবানাঞ্চ পুরোহিতে॥
সোমবারে সিতাষ্টম্যাং কাবেরী পুষ্করো মতঃ।
কর্কটস্থে দিবানাথে জীবে চেন্দুদিনে তথা।
অমায়াং পূর্ণিমায়াং বা কৃষ্ণা পুষ্কর ঈরিতঃ॥"

বিশ্বকোষে কুম্ভমেলার প্রমাণ বলিয়া এই কয়টি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

এক্ষণে যে স্কন্দপুরাণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই বচন কয়টি আমি খুঁজিয়া পাই নাই। তাহার পর ইহাও দ্রষ্টব্য—সাধুসন্ন্যাসিগণ যাঁহারা এই

মেলায় আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এই বচনের প্রতি আস্থাসম্পন্ন নহেন এবং এক্ষণে যে ভাবে ও যে যে তীর্থে এই মেলার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহার সহিত এই কয়টি বচনের সামঞ্জস্যও ঘটিয়া উঠে না, কারণ, বর্ত্তমান সময়ে কুম্ভমেলা বা পূর্ণকুম্ভ ও অর্দ্ধকুম্ভ হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক বা গোদাবরী এবং উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, উক্ত বচনে কিন্তু হরিদ্বার, প্রয়াগ, গোদাবরী, কাবেরী ও কৃষ্ণা এই পাঁচটি তীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে মকরস্থ সূর্য্য অর্থাৎ মাঘমাসে কেবল প্রয়াগেই কুম্ভমেলার অনুষ্ঠান হয়, হরিদ্বারে বা গঙ্গাদ্বারে বৈশাখমাসেই কুম্ভমেলা হয়। কিন্তু এই বচনে মাঘমাসেই হরিদ্বারে গঙ্গাপুষ্করযোগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলার কোন উল্লেখও এই বচনে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্য আমার মনে হয়, বিশ্বকোষধৃত এই কয়টি বচনকে প্রামাণিক বলিয়া মানিয়া লইলেও ইহা যে বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত কুম্ভমেলার প্রমাণভূত পৌরাণিক বচন নহে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাধু, মোহান্ত ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের সহিত এই কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমি আলাপ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত এই যে, কুম্ভমেলার আরম্ভ আচার্য্য শঙ্করের পর হইতে হইয়াছে, কত কাল পরে যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্তোষকর উত্তর আমি কাহারও নিকটে পাই নাই। তবে তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, আচার্য্য শঙ্কর ধর্ম্মসংস্থাপন ও ধর্ম্মরক্ষণার্থ শৃঙ্গেরী, পুরী, দ্বারকা ও বদরিকাশ্রমে যে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতে মুসলমানগণের প্রভাববৃদ্ধির সময় ঐ সকল মঠপতিগণ নানাপ্রকারে ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়েন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হইয়া বাস করা নিবন্ধন ঐ চারি মঠের অধিপতিগণ গৃহস্থগণের সহিতই বেশী মেশামিশি করিতে থাকেন, ফলে তাঁহাদের নিকট গৃহস্থধর্ম্মের উপদেশ যেরূপ পাওয়া যাইত এবং গৃহস্থগণের উপর তাঁহাদের যেরূপ প্রভুতা ছিল, সেইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নব নব সমুদ্ভূত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য বিষয়ে তাঁহাদের নিকট উপদেশ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না এবং সেই সকল সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের অধিকারও নিতান্ত অল্পই ছিল, এই কারণে নব নব প্রবর্ত্তিত সাধু-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় সমূহের সময় বিশেষ মিলন ও কর্ত্তব্য নিরূপণের জ[ন্য] এইরূপ একটি ভারতের সকল কেন্দ্রস্বরূপ তীর্থস্থানে মেলার আবশ্যকতা বহুকাল হইতে উপলব্ধ হইয়া আসিতেছিল। নব নব উদীয়মান সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের এই প্রকার পরস্পরের সম্মেলনাকাঙ্ক্ষাই এই মেলাসৃষ্টির মূল, ইহার মূলস্বরূপ কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা পুরাণের বিধি আছে বলিয়া মনে হয় না—ইহাই হইল অভিজ্ঞ ও প্রাচীন মোহান্ত ও সাধুগণের এই মেলার উৎপত্তি বিষয়ে ধারণা। এই কুম্ভমেলা সন্ন্যাসীদিগেরই মেলা—কি ভাবে এই মেলা পরিচালিত হয়, তাহা বলিবার পূর্ব্বে এবারে এই মেলায় কোন্ কোন্ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় আসিয়াছিলেন, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

১। গোঁসাই বা দশনামী, ২। নানকপন্থী, ৩। বৈরাগী, ৪। কবীরপন্থী, ৫। দাদূপন্থী, ৬। রামসনেহী, ৭। কবীরদাসী, ৮। খুল্লে সাধু, ৯। নাথসম্প্রদায়, ১০। জঙ্গমসম্প্রদায়।

এই দশ প্রকার সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে লইয়া মুখ্যভাবে এই মেলা জমিয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেক অবান্তরভেদও আছে, তাহার কতিপয় আবশ্যক ভেদ নিম্নে লিখিত হইতেছে—

১। গোঁসাই বা গোস্বামি-সম্প্রদায়।

গোঁসাই বা গোস্বামী বলিলে আমাদের দেশে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই প্রতীত হইয়া থাকে; কিন্তু এই গোঁসাইগণ প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব নহেন। ইঁহারা সকলেই অদ্বৈতমতাবলম্বী; সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট। এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ গিরি, পুরী, ভারতী, সরস্বতী, তীর্থ, বন, অরণ্য, পর্ব্বত, আশ্রম ও এই শাঙ্কর সম্প্রদায়ের দশ প্রকার উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন; শিখাসূত্র রাখেন না, কৌপীন ও কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসদীক্ষাকালে উপবীত পরিত্যাগ ও বিরজাহোম প্রভৃতি করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেবল যে ব্রাহ্মণই প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহা নহে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকল বর্ণেরই সন্ন্যাসী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের মতে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন বর্ণের সন্ন্যাসাধিকার নাই—ইঁহারা কিন্তু সেই নিষেধ মানেন না; অথচ

ইঁহারা সকলেই অদ্বৈতভাবনাই করিয়া থাকেন। ইঁহাদের আখড়া তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—জুনা, নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী। এই তিন আখড়ার সন্ন্যাসিদল আবার দুই ভাগে বিভক্ত। যথা—নাগা ও পরমহংস। নাগারা একেবারে বিবস্ত্র বা উলঙ্গ থাকেন, পরমহংসগণ কৌপীন ও গেরুয়ারঞ্জিত বহির্ব্বাস ধারণ করিয়া থাকেন, পরমহংসের মধ্যে কেহ বা দণ্ড ভাসাইয়া দেন, কেহ বা দণ্ড ধারণও করিয়া থাকেন।

কুম্ভমেলায় ইঁহাদের স্নানের ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। স্নানের সময় ইঁহারা দলবদ্ধ হইয়া স্নান করিতে যান, সেই সময় হাতী, ঘোড়া ও উট সাজান হয়, তাঁহারা অগ্রে অগ্রে গমন করেন, হাতীর উপর বিচিত্র কারুকার্য্যসমন্বিত রৌপ্যময় হাওদা সন্নিবেশিত হয়, তাহার উপরে আখড়ার যিনি বড় মোহান্ত বা মণ্ডলীশ, তিনি উপবেশন করেন। পশ্চাতে দুই জন সন্ন্যাসী উপবেশন করেন, এক জনের হস্তে বিচিত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত স্বর্ণখচিত রৌপ্যদণ্ডবিভূষিত বহুমূল্য কিংখাপের ছত্র, অপরের হস্তে নানাবিধ কারুকার্য্যশোভিত বিচিত্র রৌপ্য বা স্বুবর্ণদণ্ডখচিত বৃহৎ চামর। মণ্ডলীশের পশ্চাতে সাজান অশ্ব বা উটের উপরও বড় বড় সন্ন্যাসিগণ বিরাজমান; সকলের অগ্রে সানাই ও ইংরাজী বাজনা প্রভৃতি বাজাইতে বাজাইতে বাদকের দল চলিতে থাকে, তাহার পর এক দীর্ঘ ভালা বা ভল্ল ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী অনুগমন করেন, তাঁহার পশ্চাৎ কেহ বা অশ্বের উপর, কেহ বা উষ্ট্রের উপর চড়িয়া মণ্ডলীশের অনুগমন করিয়া থাকেন; তাহার পশ্চাতে নাগা ও পরমহংসগণ দল বাঁধিয়া সংযতভাবে গমন করেন। ইঁহাদের স্নানের পূর্ব্বে পূর্ব্বকথিত বৃহৎ ভালা বা ভল্লের স্নান হইয়া থাকে; তৎপরে যথাপ্রধান সন্ন্যাসিগণ স্নান করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই গোঁসাই দলের তিনটি আখড়া আছে—জুনা, নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী; এই তিন আখড়ার মধ্যে কোন্ আখড়ার সন্ন্যাসি-দল অগ্রে স্নান করিবেন, তাহা লইয়া পূর্ব্বে বহু বিবাদ ও মারামারি এবং পরিশেষে আদালতে দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। শেষে মোকদ্দমা দ্বারাই ইহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে, সেই নিষ্পত্তি অনুসারে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, প্রয়াগের কুম্ভমেলায় নির্ব্বাণী আখড়ার সন্ন্যাসিগণ অগ্রে স্নান করিয়া থাকেন, হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় নিরঞ্জনী আখড়ার সন্ন্যাসিগণের অগ্রে স্নান হইয়া থাকে; নাসিক ত্র্যম্বকে জুনা আখড়ার সন্ন্যাসিগণের প্রথম স্নানাধিকার; উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় কিন্তু এই অগ্রপশ্চাদ্ভাব নাই; সেখানে এই তিন্ আখড়ার সন্ন্যাসিগণ সকলে একসঙ্গে মিলিত হইয়া মিছিল বাহির করেন এবং একযোগেই স্নান করিয়া থাকেন। এই সন্ন্যাসিদলের স্নানের পূর্ব্বে ভালার স্নান কবে কি কারণে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্তোষকর উত্তর আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই, মোটের উপর যাহা পাইয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য এই ত্যক্ত-সর্ব্বস্ব সন্ন্যাসিগণ অস্ত্রগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই কারণে আচার্য্য শঙ্করের মতে ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইলেও ইঁহারা ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অস্ত্রব্যবসায়নিরত জাতিগণকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়া নিজ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আপৎকালে সন্ন্যাসীর পক্ষে যোগচর্য্যা, ধ্যান, সমাধি ও আত্মচিন্তন পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র-ব্যবহারের আবশ্যকতা আছে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা রীতিমত অস্ত্রব্যবহার ও যুদ্ধাদি কার্য্যে পরাঙ্মুখ হয়েন না, ইহাই সাধারণ জনগণকে দেখাইয়া শিখাইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে ভালা নামক অস্ত্রের স্নান করাইয়া থাকেন।

ইঁহারা অস্ত্রব্যবহারের সাহায্যে অনেকবার এই প্রাথমিক স্নানাধিকার রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাহার পরিচয় ইতিহাসের সাহায্যে যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে, একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। পঞ্জাবে যখন পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের অখণ্ডপ্রতাপ—সেই সময় কোন কুম্ভের মেলায় পঞ্জাবী নানকপন্থী সম্প্রদায়ের উদাসী সন্ন্যাসিগণ বলপূর্ব্বক গোঁসাই সম্প্রদায়কে হটাইয়া হরিদ্বারে প্রথমে স্নান করিয়াছিলেন, ইহাতে গোঁসাই সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগকে বড়ই অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হয়েন নাই। দ্বাদশ বৎসর পরে যখন হরিদ্বারে আবার পূর্ণকুম্ভের মেলা হইল, সেই সময় রণজিৎসিংহের মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পঞ্জাব তখনও বৃটিশ-সিংহের কুক্ষিগত হয় নাই। এই পূর্ণকুম্ভের মেলার পূর্ব্ববর্ত্তী কুম্ভমেলায় গায়ের জোরে লব্ধপ্রথম স্নানাধিকার রক্ষা করিবার জন্য নানকপন্থী সন্ন্যাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন;

এমন কি, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য শিখ-দরবার সশস্ত্র সৈন্য-সাহায্য করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। স্নানের মিছিল রক্ষার জন্য সশস্ত্র শিখ সৈন্যগণও যোগ দিয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে হস্তিপৃষ্ঠে বিচিত্র স্বর্ণময় কারুকার্য্যসমন্বিত হাওদার উপর 'গ্রন্থসাহেব'কে বসাইয়া নানাপ্রকার বাদ্যে দিঙ্মণ্ডল-প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে নানকপন্থী সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বপ্রথমে স্নান করিবার জন্য যেমন ব্রহ্মকুণ্ডে আসিয়া পড়িলেন, এমন সময় হঠাৎ এই গোঁসাই সম্প্রদায়ের নাগাগণ অতর্কিতভাবে তাঁহাদিগকে তীব্রভাবে এমন আক্রমণ করিলেন যে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া নানকপন্থী সন্ন্যাসিগণ অগত্যা সমরে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এই খণ্ডযুদ্ধে দুই পক্ষে বহু লোক হতাহত হইয়াছিল, ফলে গোঁসাইগণ বিজয়ী হইয়া প্রথমেই স্নান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্নান-যুদ্ধের সময়ে বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী স্বামী মহোদয় হরিদ্বারে স্নানার্থ বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারই মুখে আমি প্রথমে এই সন্ন্যাসি-যুদ্ধের বিবরণ বহু দিন পূর্ব্বে আমার পাঠ্যাবস্থায় শুনিয়াছিলাম। [ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

কামালপত্নী

তুরস্ক সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি মুস্তাফা কামাল পাশাকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। মুস্তাফা কামাল পাশা স্মার্ণায় কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার জন্য বিগত জানুয়ারী মাসে আঙ্গোরা পরিত্যাগ করেন। জাতীয় সমিতির প্রেসিডেণ্ট ফেতি বের হস্তে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি অবসর যাপন করিতে গিয়াছিলেন। গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে এক ব্যক্তি স্মার্ণায় গিয়া মুস্তাফা কামাল পাশার ভবনে উপস্থিত হয়। সে বলে যে,কোনও জরুরী পত্র লইয়া সে প্রেসিডেণ্টের নিকট আসিয়াছে। তাঁহার সহিত তাহার দেখা হওয়া চাই। কামালপত্নী এই অপরিচিত ব্যক্তির হাবভাব দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠেন,এবং তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলেন। তার পর তিনি স্বামীর কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিলে মুস্তাফা কামাল যেমন

বামে লতিফা হানুম দাঁড়াইয়া, ইনিও বিশ্ববিশ্রুত মুস্তাফা কামাল পাশার পত্নী। ফেতি বের পত্নী গালিবে হানুম্ তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট।

দ্বারপথে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, অমনই লোকটা তাঁহার অভিমুখে একটা বোমা নিক্ষেপ করিল। কামাল-পত্নীর সতর্ক দৃষ্টি ছিল বলিয়া বোমাটি কামাল পাশার দেহে পতিত হয় নাই; কিন্তু স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি স্বয়ং আহত হয়েন। এই বীরহৃদয়া বিদুষী মহিলা স্মার্ণার বণিক মহরম্ উষাকী বের কন্যা। এই বণিককে গ্রীকগণ স্মার্ণায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। তুর্কীরা নগর অধিকার করার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। গত বৎসর মুস্তাফা কামাল ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তখন এই মহিলার বয়স ১৯ বৎসর ছিল। ফ্রান্স ও চিসেল হয়স্টএর টিউডরহল স্কুলে তিনি শিক্ষা করেন। কামাল-পত্নী ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। আধুনিক তুর্ক মহিলাদের ন্যায় তিনি অবগুণ্ঠনের অন্তরাল পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আহ্বান

১

"আপনারা সব বেরিয়ে পড়ুন,"—দেশ-নেতার এই আহ্বান শুনিয়া যে দিন মথুরামোহন কলেজ হইতে সতীর্থগণের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল, সে দিন অনেক পড়ুয়া তাহার সেই বিরাট ত্যাগের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং বাহবা দিয়া তাহাকে দধীচি-হরিশ্চন্দ্রের আসনে বসাইয়া দিল। কেহ কেহ ভবিষ্যবাণী করিয়া রাখিল, মথুরামোহন কালে মাটসিনী, গ্যারিবল্ডী—যা' হয় একটা কিছু হইবেই।

জন ১০।১২ ছেলে সঙ্গে লইয়া মথুরামোহন গর্ব্বস্ফীত-বক্ষে ছোট গোলদীঘিতে গিয়া যখন জলদগম্ভীরনাদে বক্তৃতা করিতে লাগিল,—"এস স্কুলের ছেলে, কলেজের ছেলে, যে যেখানে আছ, সবাই বেরিয়ে পড়; গোলামখানায় গোলামী ক'রে কোনও জাতি কোনও কালে মুক্তি পায়নি। এস, ঐ দেখ, দীনা কাঙ্গালিনী দেশমাতৃকা সজল-নয়নে ব্যথিতহৃদয়ে বাহুপ্রসারণ ক'রে তোমাদের আহ্বান করছেন। তোমরা কি মায়ের কোলে ফিরে যাবে না?" তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল, ঘরে ফিরিবার সময় লোকে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, এমন বক্তৃতা বাঙ্গালায় এক শরৎ ঘোষ ছাড়া আর কেহ কখনও করিতে পারে নাই। ছেলেমহলে মথুরামোহন অচিরে এক জন 'লীডার' হইয়া পড়িল।

তাহার পর মথুরামোহন ছেলের দল লইয়া সিনেট হাউ-সের সোপানের সম্মুখে যখন শুইয়া পড়িয়া পরীক্ষার্থীদিগকে বলিল, "আপনারা আমাদের দেহ মাড়িয়ে পরীক্ষা দিতে যান," তখন দর্শকদের মধ্যে অনেকে বাহবা দিয়া বলিল, শিবপুরের দলে 'ব্রজ-বিলাপ' পালায় শ্রীমতী রাধাও "রাখ, রাখ, রথ" বলিয়া রথের তলায় পড়িয়া এমন অভিনয় করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ দেখিতে দেখিতে মথুরামোহন একটা মস্ত পেট্রিয়ট হইয়া পড়িল।

কিন্তু দুষ্ট ছেলেগুলা কানাঘুষা করিত যে, মথুরামোহন নাকি 'প্রক্সি' দিয়া গোপনে কলেজের পার্সেণ্টেজ রক্ষা করিত। এক দিন নাকি একটা দুষ্ট ছেলে তাহাকে লুকাইয়া আফিস-ঘরে গিয়া কলেজের ফীজ দিতে দেখিয়াছিল। কোনও কলেজ-ছাড়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে সে নাকি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল,—"দু'চারটা দিন এটেণ্ড করলে যদি পার্সেণ্টেজটা থেকে যায়, তা'তে আর ক্ষতি কি? আমি ত আর গোলামখানায় পড়তে যাচ্ছি না।" ফীজ জমা দেওয়ার কথা পাড়িলে সে মৃদু হাসিয়া বলিত,—"আরে ফীজটা দিলেই কি জাত গেল? আমি ত আর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি না।"

যখন কলিকাতায় এইরূপ তুমুল কাণ্ড চলিতেছে, তখন এক দিন মথুরামোহন বড় গোলদীঘিতে বক্তৃতা করিয়া সন্ধ্যার পর মেসে ফিরিয়া দেখে, ডাক-বাক্সের মধ্যে কেবল তাহারই একখানা চিঠি পড়িয়া আছে, আর সবাই যে যাহার চিঠি লইয়া গিয়াছে। মথুরামোহন ঘরে আলো জ্বালিয়া পত্র পড়িতে বসিল,—সে একাকী একটা ছোট এক সিটের কামরায় থাকিত। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল।

পত্রে লেখা ছিল:—

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্।

কল্যাণবরেষু,

পরমশুভাশীর্ব্বাদবিজ্ঞাপনঞ্চাগে। পরে, বাবাজীউ, তোমার মঙ্গল নিয়ত ঈশ্বরস্থানে প্রার্থনা করিতেছি। অধুনা মহাবিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তোমার শরণ লইতেছি। দেখিও, এই দরিদ্র বৃদ্ধকে দয়া করিয়া এই ঘোর দায় হইতে পরিত্রাণ করিও। তুমি ছেলেবেলা হইতে কুমুকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছ, আজ সেই কুমুর জন্য বুঝি আমি জাতিচ্যুত হই, আমার ধোপা-নাপিত বুঝি বন্ধ হয়। একে কুমু ১৫ বৎসর ছাড়াইয়া চলিল, অর্থাভাবে পাত্রস্থা হইল না, তাহার উপর সে এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে। বাবুদের কাছারীর বুড়া নায়েব রামলোচন কি জানি কোন্ দিন কুমুকে ভিজা কাপড়ে পুকুরঘাট হইতে কলসী কাঁকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াছে। সেই অবধি বুড়া একবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে—এমন দিন নাই, যে দিন তা'র লোক

আমার বাড়ী হাঁটাহাঁটি করে না; বলে, কুমুকে বিয়ে করবে। ৫০ পারের বুড়া—এক পাল নাতিনাতকুড়ো—ছেলে সব জোয়ান মরদ—তা'র হাতে আমার কুমুকে দেব? তা'র চেয়ে তা'কে গলা টিপে মেরে ফেলি না কেন! কুমু এই কথা শুনে প্রথমে হেসেছিল, কিন্তু শেষে শুনেছি, এক দিন নাকি রাগ সামলাতে না পেরে সমবয়সীদের সামনে ব'লে ফেলেছিল,—"ঘাটের মড়া, তা'র আবার বিয়ের সাধ! মুখে আগুন!" এই আর যায় কোথা। কথাটা রামলোচনের কানে উঠিয়াছে। এখন সে একবারে হন্যে হইয়া উঠিয়াছে; গাঁয়ের মোড়লদের নিয়ে ঘোঁট পাকাইতেছে, আমায় একঘরে করিবে। বলিয়া বেড়াইতেছে. ধেড়ে মেয়ে, ওর হাতের জল শুদ্ধ নয়, কেউ ওদের বাড়ী খাবে না। এ দিকে আমাদের পক্ষে কাছারীর পুকুর বন্ধ হইয়াছে। রামলোচন গ্রামে আমার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছে, ধোপা-নাপিতও বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কাছারীর নায়েবের বিপক্ষে দাঁড়াইবে, এখানে এমন কেউ নাই, কেবল তোমরা আছ। তোমার বাপ ইচ্ছা করিলে রামলোচনের এ সব অত্যাচার বন্ধ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ আছেন। তুমি ছেলেবেলা হইতে আমাদের ভালবাস, আমার কুমুকে তুমি ছোট বোনের মত দেখ, তুমি কি আমার এই বিপদে রক্ষা করিবে না? যদি আমাদের উপর তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে পত্রপাঠ এখানে চলিয়া আসিবে। তুমি আমার মনোনীত আশীর্ব্বাদ জানিবে। আশা করি, কুশলে আছ। ইতি—

ফুলবাড়ী, নিত্য-আশীর্ব্বাদক
জিলা নদীয়া। শ্রীনরহরি ঘোষ।

মথুরামোহনের মাথার মধ্যে দপ্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা, একটা পাড়াগেঁয়ে নায়েব—গলিত-অঙ্গ গলিত-মুণ্ড বৃদ্ধ, সে কুমুর উপর কু-নজর দেয়! ছেলেবেলা হইতে সে তাহাকে দাদা বলিয়া কত খেলা করিয়া আসিয়াছে, গাছ-কোমর বাঁধিয়া এলোচুলে কত ছুটোছুটি করিয়াছে, যাহার জন্য সে গাছে চড়িয়া কত জামরুল লিচু পাড়িয়া দিয়াছে, যাহাদের বাড়ীতে সে কত দিন আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়াছে, যাহার বাপমাকে সে চিরদিন খুড়াখুড়ী বলিয়া কত আবদার-অভিমান করিয়া আসিয়াছে,—সেই কুমুর উপর দৈত্য-দানার লোভ! স্বর্গের যজ্ঞভোজ্যে কুক্কুরের সাধ! খুড়া লিখিয়াছেন, এর চেয়ে কুমুর মৃত্যু ভাল! কেন? তাহার চেয়ে বুড়া রামলোচনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া নালতের জলে ভাসাইয়া দিলে হয় না?

মথুরামোহন আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, বড় গলায় ডাকিল, "গোপালদা, গোপালদা!"

পার্শ্বের কামরা হইতে এক জন সাড়া দিল, "কি রে মথুরা, ডাক্‌ছিস?"

পরক্ষণেই খড়মের খট খট আওয়াজ করিয়া গোপালদা ঘরে হাজির। গলার পৈতাগাছটা হাতে মাজিতে মাজিতে হাসিমুখে গোপালদা বলিল, "কি রে, আজ কি বক্তৃতা দিয়ে এলি, শোনাবি না কি?"

মথুরামোহনের মেজাজ একেই বিগড়াইয়া ছিল, সুতরাং সে বিরক্তির স্বরে বলিল, "আরে, কেবল ঐ এক কথা—বক্তৃতা আর বক্তৃতা—"

গোপালদার মুখ গম্ভীর হইল। সে ছোট তক্তপোষের এক পাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তবে কি রে? আমি ত জানি, এখন তুই বক্তৃতা খাস, বক্তৃতার স্বপ্ন দেখিস। কি, হয়েছে কি? পেট্রিয়টের আবার অন্য কথা আছে না কি?"

তখন মথুরামোহন বুকখানা দুই হাত ফুলাইয়া চোখে-মুখে আগুন ছুটাইয়া বলিতে লাগিল, "গোপালদা, বড্ড যে বামনাই ফলাও কথায় কথায়, দেখ দেখি, কত বড় অত্যাচার এই তোমাদের বামনাইয়ের অন্ধ কুসংস্কারের দোহাইয়ে দেশে দিনে রেতে ঘটছে।"

গোপালদা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বামনাইয়ের অত্যাচার? সে কি? তোর উপর কোন্ বামুনে অত্যাচার করলে?"

মথুরামোহন হাতের আস্তিন গুটাইয়া বলিল, "বামুনের অত্যাচার নয় ত কি? কচি মেয়ের সঙ্গে ঘাটের মড়ার বিবাহ, এ ত তোমাদের বামুনের শাস্তরের বিধান, কিন্তু মেয়েটার যদি বছর না ফিরতেই সীঁতের সিঁদুর ঘুচলো, তা হলেই একাদশীর ব্যবস্থা। সাধে কি দেশ উচ্ছন্ন যাচ্ছে।"

গোপালদা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ওঃ, এই কথা।

তা আর কিছু কায আছে? তোর ও সব লেকচার ত ঢের শুনেছি।”

মথুরামোহন বাধা দিয়া বলিল, “অমনই তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করা হ’ল? দেখ গোপালদা, সত্যি কথা বলতে কি, এই মেসের মধ্যে এক তোমাকেই বুদ্ধিমান্ বুঝদার লোক ব’লে মনে করি। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, এর উপায় কি করি? ব্যাপারটা এই,—দেশে আমাদের এক ঘর প্রতিবেশী আছে, ছেলেবেলা থেকে তাদের সঙ্গে আমাদের খুব মাখামাখি। তারা গরীব, তাদের কুঁড়ে ঘর। বাড়ীর একটি মেয়ে, পয়সার অভাবে বিয়ে হচ্ছে না। এখন তার উপর কাছারীর নায়েব বুড়োর নজর পড়েছে; বলে, বিয়ে করবে। তাতে তারা রাজী হয় নি ব’লে তাদের একঘরে করেছে, পুকুর বন্ধ করেছে, গাঁয়ে বাস করা তাদের দায় হয়ে পড়েছে। বিপদে প’ড়ে কুমুর বাপ আমায় এই চিঠি লিখেছে, কি করি বল দেখি?”

গোপালদা চিঠিখানা পড়িয়া বলিল, “তা তোরাও ত শুনেছি গাঁয়ের নেহাৎ কেওকেটা ন’স। তোর বাপ ত এর একটা উপায় করতে পারেন।”

মথুরা ম্লানমুখে বলিল, “তা পারেন। কিন্তু যেখানে সমাজের ঘোঁট পাচাল, বাবাই কি আর কাকাই কি, ও সবাই সেকেলে, গাঁয়ের মোড়লদের রায়ে রায় দিয়ে যাবে। যদি বলতে যাই, তখনই বলবে, তা মেয়েটা নায়েবকে বিয়ে করুক না, হিন্দুর ঘরে এমন বিয়ে ত আকছার হয়।”

বলিতে বলিতে হঠাৎ মথুরা উত্তেজিত হইয়া হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, “এই সব কুসংস্কারের গণ্ডীর উপর গণ্ডী দিয়ে জাতটা মরতে বসেছে। আমায় তামাসা কর আর যাই কর, বল দেখি, এ সব কি অত্যাচার নয়? আমি যদি বুড়োর হাতে মেয়ে না দিই, তা ব’লে আমার সমাজ বন্ধ করবে, পুকুরে জল সরতে দেবে না, জাতে ঠেলবে? তোমাদের বামনাইয়ের ছুঁৎমার্গে আর এই জাতে ঠেলাতে কত হিঁদু যে মোছলমান খৃষ্টান হয়ে গেল, তা গুণে ঠিক করা যায় না। দেশটা কি সাধে হাজার হাজার বছর পরের গোলামী করছে!”

গোপালদা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, “তোর ঐ কুমুর বাপরা ঘোষ না? তা হ’লে ওরাও ত কায়েত। তবে তুই মেয়েটাকে বিয়ে কর না, সব গোল চুকে যাবে।”

মথুরা কথাটা শুনিয়া প্রথমে চমকিত হইল—কুমু, তার ছেলেবেলার খেলার সাথী কুমু, তার ছোট বোনটির মত কুমু, তার সঙ্গে বিবাহ? ছিঃ ছিঃ, তাও কখনও হয়? আজ ৩ বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই, দুই এক দিন অবকাশমত যখন দেশে গিয়াছে, কচিৎ কখনও নিমেষের জন্য দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু সে এত ব্যস্ত যে, ভাল করিয়া দেখিবার কখনও অবসর পায় নাই, কুমুদও দেখা হইলে হাসিয়া পলাইয়াছে। সে এখন বড় হইয়াছে, বুঝিতে শিখিয়াছে—দাদার সহিত বিয়ের কথা শুনিলে সে হয় ত লজ্জায় মরিয়া যাইবে। কিন্তু—কিন্তু—যদি সম্ভব হয়, তবে তাহার মত সৌভাগ্যবান্ কে? কুমুর মত রূপে গুণে তাহাদের ঐ অঞ্চলে কয়টা মেয়ে আছে? সে হঠাৎ অতিরিক্ত আনন্দে গোপালদার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “ঠিক বলেছ গোপালদা, আমিই বিয়ে করি না কেন। তারাও কায়েত, আমরাও কায়েত—তবে কেন বিয়ে হবে না? সে ত আমার মা’র পেটের বোন না। বেশ বলেছ গোপালদা, এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে, কুমুরও বিয়ে হয়ে যাবে, আর নায়েব বেটাও জব্দ হবে। সাধে কি তোমায় সব কথা জিজ্ঞাসা ক’রে করি, গোপালদা।”

মথুরা কথাটা বলিয়া মহান্ হর্ষে গোপালদার পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। গোপালদাও নিজের কথাটা খাটিল দেখিয়া খুব একটা স্বস্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল, “দেখলি, তুই যখন তখন বামুনের নিন্দে করিস, অথচ এই বামুনের পরামর্শ না নিয়ে ত এক পাও চলতে পারিস নি। নে, এখন গোছগাছ ক’রে নে, আজই রাতের গাড়ীতে দেশে রওনা হ। বাপ-মাকে রাজী করতে পারবি ত?”

মথুরা মহা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তার জন্যে ভেবো না, সে সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঃ, গোপালদা, আজ আমার কি চোখই ফুটিয়ে দিলে! কুমুকে দেখ নি। তার লজ্জানম্র মায়ামাখা মুখখানি একবার দেখলে ভুলতে পারবে না।”

গোপালদা উঠিয়া যাইবার সময়ে হাসিতে হাসিতে বলিল, “তার আর কি, বিয়ের সময় দেশে নিয়ে যাস, মুখখানি দেখাও হবে, লুচি-মোণ্ডাও পেটে পড়বে।”

২

শিয়ালদহের ষ্টেশনে যাত্রাকালে মথুরামোহন কত কি ভাবিতেছিল। তাহার নিঃস্বার্থ পরহিতের কথা যতই মনে পড়িতেছিল, ততই তাহার বুকখানা অতিরিক্ত আনন্দে গর্ব্বে দশ হাত হইয়া উঠিতেছিল। সে ধনবান্ পল্লী-গৃহস্থের সন্তান, যখন সে নিজে উপযাচক হইয়া কুমুর বাপের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করিবে, তখন কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র পিতামাতার মুখে কি অপূর্ব্ব আনন্দ-রেখাই না ফুটিয়া উঠিবে! আর কুমু? সে ত হাতে স্বর্গ পাইবে। আজ সে দেশমাতৃকার আহ্বানে আত্মনিবেদন করিতে যাইতেছে, তাহার মত সৌভাগ্যবান্ কে আছে? ষ্টেশনে পৌছিয়াও সে এই সুখ-স্বপ্নের নেশার হাত এড়াইতে পারে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিতে যাইবার সময়ে তাহার নিরবচ্ছিন্ন ভাবনার একটানা স্রোতে বাধা পড়িল, একটা লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল, সে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল। বিষম ক্রোধে সে লোকটাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র তাহার প্রহারোদ্যত হস্ত আপনিই নামিয়া পড়িল—লোকটা আর কেহ নহে, একটা গোরা। দেশমাতৃকার আহ্বানে এই গর্ব্বোদ্ধত গোরার সমুচিত দণ্ডবিধান করাই তাহার কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু সে ইতস্ততঃ করিতেই গোরাটা টিকিট কাটিয়া প্লাটফরমে প্রবেশ করিল, তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। মথুরামোহন ভাবিল, গোরাটা কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন পশু, উহার সহিত দাঙ্গা-ফেঁসাদ করিলে কি জানি যদি দেশে যাওয়া স্থগিত হয়! দেশমাতৃকার আহ্বানে সাড়া দিতে না পারিয়া মথুরামোহন একটু মুসড়াইয়া পড়িল, কিন্তু উপায় নাই, আগে কায, না আগে দাঙ্গা-ফেঁসাদ? মথুরামোহন কিল খাইয়া কিল হজম করিয়া ম্লানমুখে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। কেহ ত দেখিতে পায় নাই!

প্রাতে বাড়ী পৌঁছিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও পরিবারস্থ-আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে দ্রুতপদে ঘোষের বাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। তাহার বুক গুরু গুরু করিয়া কাঁপিতেছিল, কুমুকে দেখিবার, তাহার সহিত কথা কহিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয়টা পূর্ণ [illegible]। [illegible] একটা কথায় তাহার হৃদয়ে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কত দিন সে কুমুকে দেখে নাই, সে এখন কত বড়টি হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে। দেখা হইলে সে তাহাকে মনের কপাট খুলিয়া কত কথাই বলিবে!

যখন সে ঘোষেদের বাড়ীর সদরের কপাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন কুমুদ আঙ্গিনায় ভরা কলসী রাখিয়া আর্দ্রবস্ত্রে কেশ নিঙড়াইতেছিল। মথুরামোহন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, কুমুদও দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মথুরা ক্ষণেকের তরে মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, কুমুর 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া' যাইতেছিল। সূর্য্য-প্রণামের সময়ে দ্বারপথে দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ব্যাধভয়ভীতা চকিতা কুরঙ্গীর মত সে ছুটিয়া ঘরে পলাইল। মথুরা হাসিয়া দাওয়ার উপর উঠিয়া বলিল, "কি রে কুমু, এত লজ্জা কিসের? আমায় দেখে পালালি?"

কুমু কপাটের আড়াল হইতে মৃদুস্বরে বলিল, "না, পালাব কেন? ভিজে কাপড়খানা ছাড়তে এসেছিলুম। আপনি কখন্ এলেন?"

মথুরা অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, "আপনি! আপনি কে রে? আমি কি দুদিনে পর হয়ে গেলুম? কাকী কোথায়, নরখুড়ো কোথায়, তাঁকে দেখছি না যে।"

এইবার কুমুদ দাওয়ায় আসিয়া জবাব দিল, "মা ঘাটে, বাবার কা'ল সন্ধ্যে হ'তে জ্বর হয়েছে, উত্তরের পোতায় শুয়ে আছেন।"

এই সময়ে "কে রে কুমি?" বলিয়া গায়ে কাঁথা জড়াইয়া নরহরি ঘোষ দাওয়ায় আসিয়া খুঁটীতে ঠেস দিয়া বসিলেন এবং মথুরামোহনকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "এই যে বাবাজী এসেছ। তোমার কাকী বলছিল, বড়লোক তোমরা, গরীবের বিপদে আসবে না। আমি তখনই বলেছিলুম, মথুর আমাদের তেমন ছেলে নয়, চিঠি পেয়েই ছুটে আসবে। তার পর, বাবা, ক'দিন থাকা হবে? এ গরীবের একটা যা হয় বিহিত ক'রে দিয়ে যাও।"

মথুরা বলিল, "সেই জন্যই ত এসেছি। তা; জ্বর আজ ছাড়ে নি?"

নরহরি বলিলেন, "না, ও জ্বর লেগেই আছে, এ পোড়া পাড়াগাঁয়ে যমে যে দিন টানবে, সেই দিন একেবারে জ্বর ছাড়বে। কুমি, যা দেখি, চট ক'রে তোর গর্ভধারিণীকে

ডেকে নিয়ে আয়। আর দেখ, তোর দাদাকে এই দাওয়ায় একখানা পীড়ি দিয়ে যা।"

কুমু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মথুরা অপ্রসন্ন হইল, ঘরের সমস্ত আলোটুকু লইয়া কুমু চলিয়া গেল, আঁধার ভাল লাগিবে কেন!

কুমু চলিয়া গেলে নরহরি মনের সাধ মিটাইয়া মথুরা-মোহনকে প্রাণের কথা বলিতে লাগিলেন, মনের আবেগে তখন তাঁহার জ্বরের অবসাদ দূরে পলাইয়াছিল; পাছে কেহ আসিয়া পড়ে, আর সব কথাটা শেষ না হয়, তাই তিনি এক নিশ্বাসে ঝড়ের বেগে বলিতে লাগিলেন, "কা'ল বিকেলে তোমাদেরই বাঁধা বকুলতলায় ঘোঁট বসে-ছিল। রামলুচুনে শালাই ফন্দিবাজ, নিজে ধরি মাছ না ছুঁই পানি ক'রে তোমার বাপের উপর দিয়ে এই ঘোঁটটা চালিয়ে নিলে। ওরে বাপ! তোমার বাপ—যাকে আমি বিশুদা বলি, দাদার মত মান্য করি, তু ব'লে ডাকলে দৌড়ে যাই—সেই তোমার বাপ বিশ্বম্ভর বোস বলে কি না, আমার জাত গিয়েছে! মেয়েটা জ্যেঠা জ্যেঠা ক'রে ছেলে-বেলা কত কোলে পিঠে চড়েছে, কত দিন একপাতে খেয়েছে, আজ তারে বলে কি না ওর হাতের জল অশুদ্ধ! বাব', তুমিই বিচার কর, কি দোষে দোষী আমরা। এর চাইতে চাল কেটে বাস তুলে দিলেই হ'ত!"

টস টস করিয়া নরহরির চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, মথুরা ব্যথিত হৃদয়ে বলিল, "কিছু ভেবো না নর-খুড়ো, ও সব নায়েবী বুজরুকি আমি ঠিক ক'রে দেব।"

নরহরি চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, "যত সহজ ভাবছ, বাবা, তত সহজ নয়। তোমার বাবাও যে গোঁ ধরেছে, তা হ'তে ফেরানো মুস্কিল। জান ত, বিশুদা কি রকম এক-গুঁয়ে; ঘোঁটে ডেকে কা'ল বলে কি না, হয় মেয়েকে রামলুচুনের হাতে দাও, না-হয় এক মাসের মধ্যে পাত্র সন্ধান ক'রে ওর হাতের জল শুদ্ধ কর, এ দুয়ের এক না হ'লে সত্যি সত্যিই আমার সমাজ বন্ধ, পুকুর বন্ধ, ধোপা-নাপিত বন্ধ; অর্থাৎ হয় এক মাসের মধ্যে কাণা, খোঁড়া, হাবা, বুড়ি বা হয় একটা ধ'রে এনে আমার কুমুকে সঁপে দাও, না হয় গাঁয়ের বাস উঠিয়ে বনবাসে যাও। এমন ধারা জুলুম মগের মুল্লুকেও চলে কি না জানি না।"

মথুরা অত্যন্ত উত্তেজিতস্বরে আশ্বাস দিয়া বলিল, "বলেছি ত নরখুড়ো, কোনও ভয় নেই। এখন মহাত্মাজীর স্বরাজের রাজত্ব, এখানে ওসব পাড়াগেঁয়ে সেকেলে ঘোঁট-পাচালি চলবে না। আমরা ছেলেরা থাকতে এ সব জুলুম হ'তে দেব না, আমরা ও সব একঘরেটেরে মানি নি।"

নরহরি বলিলেন, "তুমি ত মান না বাবা, কিন্তু তোমার বাবা?"

মথুরা জবাব দিল, "আমি শক্ত হ'লে বাবা কি আর অবুঝ হবেন? যাক্, কুমুর বিয়ে দেবে? আমি এক পাত্র ঠিক করেছি।"

নরহরি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, সাগ্রহে বলিল, "পাত্র? কৈ, কোথায় বাবা?"

মথুরা বলিল, "এই কাছেই আছে, আমাদের স্বজাতি কায়স্থ, আমাদেরই বয়সী, লেখাপড়া করে, বাপের বিষয়-সম্পত্তিও আছে।"

নরহরি হঠাৎ ম্লানমুখে বলিলেন, "ছিঃ বাবা, এ সব মরণ-বাঁচনের কথা নিয়ে কি তামাসা করতে আছে? এই গরীবের—যার ঘরে খুদ-কুঁড়োটুকু নেই, চালে খড় নেই, তার মেয়ের নাকি এমন সুপাত্র জোটে!"

মথুরা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, তামাসা নয়, সত্যি। তুমি গরীব? নরখুড়ো, যার কুমুর মত মেয়ে আছে, সে গরীব? তোমরা মেয়ের বাপরা যে একটু শক্ত হ'তে পার না? হ'লে সাধ্য কি, ছেলের পক্ষের কসাই বেটারা এমন ক'রে ছুরি শাণাতে সাহস পায়?"

নরহরি স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি ত শক্তই ছিলুম, মেয়েকে এই ঘোঁটপাচালের পাড়াগাঁয়ে ১৫ বছর বিয়ে দিই নি—পাছে মেয়ে আমার অপাত্রে পড়ে। কিন্তু সমাজ কি করলে? আমার সেই সৎসাহসের কি পুরস্কার পেলুম? জুলুম—হয় ঘাটের মড়ার হাতে মেয়েকে দিতে হবে, না হয় গাঁয়ের বাস উঠিয়ে অজানা অচেনা মুল্লুকে যেতে হবে। হাঃ তোর সমাজ! হাঃ তোর বিচার! তোমরা দু'চার জন কলেজের ছোকরা এ সব মান্ধাতার আমল থেকে জমাট আঁস্তাকুড়ের ময়লা সাফ করতে ঝাঁটা হাতে এগুলে কি হবে, বাবা?"

মথুরামোহন ধীরগম্ভীরস্বরে বলিল, "যদি হয়, ওতেই হবে। আমরা আজ ছোকরা, কা'ল সংসারের কর্তা হব। যে পাত্রের কথা বলছিলুম, সে তোমার খুবই পরিচিত।"

নরহরি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার পরিচিত ?"

মথুরা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "হাঁ, তোমার পরিচিত—সে তোমাদের এই মথুর। যদি অপাত্র ব'লে মনে না কর, তা হ'লে কুমুকে আমার হাতে দাও,আমি তাকে সুখে রাখবো।"

নরহরির সর্ব্বশরীর এক বিষম উত্তেজনাবশে কাঁপিতেছিল। তিনি যে মনের আবেগে উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া একখানা পা মথুরামোহনের কোলে চাপাইয়া দিয়াছিলেন, সে কথা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মথুরের মাথায় একখানা হাত রাখিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "দীর্ঘজীবী হও বাবা—এমন না হ'লে এত লেখাপড়া শেখার ফল কি? তা—তা বাবা, পারবে, সাহস হবে?—তোমার বাপমা?"

মথুরা মনে করিল, নরহরি তাহাদের উভয়ের আর্থিক অবস্থার তুলনা করিয়া এই সংশয়ের কথা তুলিয়াছেন, তাই সে উৎফুল্লমুখে বলিল, "সে ভয় নেই। আমরা ও সব মানি নি—দেশের কাযে ও সব মানুষের গড়া গণ্ডী আমরা মানি নি—"

কাথাটা শেষ হইল না, ঠিক সেই সময়ে কুমু তাহার মায়ের সঙ্গে এক ডাঁই মাজা বাসন এবং কাচা কাপড়-চোপড় লইয়া ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কুমুর মা অঙ্গনে পা দিয়াই বলিলেন, "দেশের কাযের কথা কি বল্‌ছিলে, বাবা মথুর? দেশের কায, দেশের কায! গরীব-দুঃখীদের ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রে দেশের কি কায হয়, বাবা?"

নরহরি অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,"আঃ, কি যে বল গিন্নি—মথুর তার কি জানে—ওরা কলেজে পড়ে, ও সব পাড়াগেঁয়ে ঘোঁটপাচালের ধার ধারে না।"

কুমু পশ্চিমের পোতায় উঠিয়া বাসনগুলি সাজাইয়া রাখিতেছিল, তাহার মা কাচা কাপড়গুলা উঠান হইতে তাহার হাতে তুলিয়া দিতে দিতে জবাব দিলেন, "তা জানি গো জানি—তা আর শেখাতে হবে না। হাড় জ্বালাতন হয়ে উঠেছে—ঘরে সমত্ত আইবুড়ো মেয়ে—তার উপর সমাজ বন্ধ, ধোপা-নাপিত বন্ধ! বাবা মথুর, বল ত বাবা, মাথার ঠিক থাকে কেমন ক'রে? পোড়া মাথায় আগুন জ্বলছে,—এদ্দিন পরে বাড়ী এলি বাবা, কোথায় দুটো মিষ্টি কথা বলবো, না আপনার কাসুন্দী আপনি ঘেঁটে মরছি।"

গৃহিণী এই কথা বলিয়া চোখে আঁচল দিয়া অশ্রুবর্ষণ করিলেন। মথুরা মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিল, "ছি, খুড়ীমা, সকালবেলায় চোখের জল ফেলতে আছে? যাও, চট ক'রে দুটো গরম মুড়ি ভেজে দাও দিকি। একঘরে করে! দেখি না কার কত মুরদ!"

নরহরিও হাসিয়া বলিলেন,"হাঁ, হাঁ, যাও, বাবাজীর জন্যে খাবার জোগাড় কর গিয়ে। আবার বাবাজী,যখন দয়া ক'রে শীগ্‌গিরই ঘরের ছেলেরও বাড়া সম্পর্ক পাতাচ্ছে—"

মথুরার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে একবার চকিতনেত্রে পশ্চিমের দাওয়ায় কুমুর দিকে চাহিয়া নরহরির কথায় বাধা দিয়া একলম্ফে আঙ্গিনায় নামিয়া বলিল, "খাবার জোগাড় কর খুড়ীমা, দাঁতনটা সেরে আসছি।"

কুমু তখন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতাটির মত গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি কায লইয়া ব্যস্ত ছিল।

নিমিষের মধ্যে মথুরামোহন বাড়ীর বাহির হইয়া গেল, তাহার খুড়ীমা অবাক্ হইয়া মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল।

৩

যখন মথুরামোহনের অন্তরে শরতের শান্ত প্রকৃতি তৃপ্তির ও আত্মপ্রসাদের মধুর হাসি হাসিতেছিল, তখন বাহিরে বিরাট বিশ্বে ভীষণ ঝটিকা গর্জ্জন করিতেছিল। নিজকে দান করিয়া পরের একটা প্রকাণ্ড উপকারসাধন করিব,—এই আত্মপ্রসাদে তাহার সমস্ত হৃদয়টা ভরিয়া গিয়াছিল। সে যখন কলিকাতায় গিয়া বন্ধুমহলে তাহার এই দধীচির অস্থিদানের কথা প্রচার করিবে, তখন চারিদিকে কি ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া সে একবারে অস্থির হইয়া পড়িল। কিন্তু সেই অস্থিদানের পথে যে দানাদৈত্যের প্রকাণ্ড বাধা দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, সে কথাটা সে একবারও মনে স্থান দিল না। কিন্তু শীঘ্রই তাহার সেই স্বস্তির সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর যে জাগরণ হইল, তাহা হইতে সে এক তিলও শান্তি পাইল না।

বাড়ীতে যখন সে প্রথমে তাহার গর্ভধারিণীর কাছে তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা বলিল, তখন তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, 'সে কি রে, তুই কি ক্ষেপেছিস না কি? ওরা যে বাঙ্গাল কায়েত, ওদের ঘরে কি তোদের বিয়ে হয়? বড় ছেলে, কুল করতে হবে। আমি

বাপু কর্ত্তাকে ও সব কথা বলতে পারবো না। যা নয় তাই।'

মথুরামোহনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ত বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে—কুমুরা কায়েত। তা.কায়েতের আবার বাঙ্গাল কায়েত আছে না কি? তা থাকুক, কিন্তু সে নাছোড়বান্দা—সে কিছুতেই সঙ্কল্প ছাড়িবে না। যখন একবার সে কুমুর বাপকে কথা দিয়াছে, তখন আর কথার খেলাপি করিতে পারিবে না—তা, ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক। আসল কথা, কুমুর সেই ঈষদুদ্ভিন্নযৌবনা কমনীয়া কিশোরী মূর্ত্তিখানি তখন তাহার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিয়াছিল—সে কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারিতেছিল না।

কিন্তু পিতার সহিত যখন তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার গম্ভীর ও কঠোর মূর্ত্তিখানা দেখিয়া তাহার প্রাণের সঙ্কল্প কোথায় উড়িয়া গেল। সে সযত্নে অতি গোপনে হৃদয়মাঝারে যে সুখের চণ্ডীমণ্ডপখানি গড়িয়া তুলিতেছিল, যেন ভীষণা পদ্মার বিশাল গ্রাসে সেখানি অতলে তলাইয়া গেল। বড় সাহসে বুক বাঁধিয়া সে পিতার সহিত সমাজ-সংস্কারের তর্ক করিবে বলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বর্ষার বারিভরা জলদগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মিল, বেম্বাম কোথায় অন্তর্ধান করিল।

তর্ক আর হইল না, কেন না, এক পক্ষই কথা কহিয়া যাইতে লাগিল,অপর পক্ষ নীরব শ্রোতা হইয়া বসিয়া রহিল। মথুরার পিতা খুব কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া উপসংহারে বলিলেন,—"ও সব পাগলামি ছেড়ে দাও। দক্ষিণ-রাঢ়ীতে বঙ্গজ কায়স্থে বিবাহ হয় না—হ'তে পারে না। যাও; এম, এ, পরীক্ষা আসছে, কল্‌কাতায় গিয়ে ভাল ক'রে পড়াশুনা করো গে। বিয়ের জন্য ব্যস্ত কেন, কত লোক মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে।"

মথুরামোহনের একবার মনে হইল, বলে, 'বঙ্গজ রাঢ়ী ত মানুষেই ভাগ ক'রে নিয়েছে,আবার মানুষে চেষ্টা করলেই ত যোগ দিয়ে দিতে পারে,' কিন্তু কথাটা মুখেই রহিয়া গেল। সে মস্ত বড় বক্তৃতাবাগীশ—কত চীৎকার করিয়া গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিয়াছে—এ সব সঙ্কীর্ণ জীর্ণ সমাজের অন্যায় বাঁধন ভেঙ্গে দাও, কিন্তু এ সময়ে তাহার মুখে বাক্য সরিল না। অতিরিক্ত পিতৃভক্তিই যে তাহার এই নীরবতার কারণ নহে, তাহা সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছিল। সে যে ব্রজেশ্বরের মত স্ত্রীকে তাড়াইবার সময়ে 'পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ' শ্লোক আওড়াইয়া আদর্শ-পুত্র সাজিবে,—এমন ধাতুতে সে আদৌ গঠিত ছিল না। তবে কেন যে সে চোটপাট জবাব দিবে বলিয়া সঙ্কল্প আঁটিয়া আসিয়া নীরবে বাপের কাটা কাটা বুলী শুনিয়া যাইতে লাগিল, তাহা সে-ই জানে।

সন্ধ্যার পর সে যখন চুপি চুপি কুমুদের বাড়ী গেল, তখন নরহরি উৎসাহে শয্যার উপর বসিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হ'ল, মত করতে পারলে বাবাজী?"

মথুরা ম্লানমুখে বলিল, "না, তা পারিনি। তবে আমার সঙ্কল্প স্থির, এখন তুমি সাহস করলেই হয়।"

নরহরি হতাশ হইয়া বলিলেন, "তাই ত, তাই ত, বাপের অমতে—"

কুমুর মা পাকশালা হইতে বাহির হইয়া ঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, নরহরির কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "তাতে তোমার মাথাব্যথা কেন? ও যখন রাজী হয়েছে, তখন তোমার আবার ভিটকিলিমি কেন? ডোম-ডোকলার হাতে মেয়েটাকে ফেলে দেওয়ার চেয়ে এটা ভাল ত?"

নরহরি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না, না, তা বলছি নে, তবে, তবে বিশ্বম্ভর বোসের অমতে তার ছেলের এ গাঁয়ে কি ক'রে বিয়ে হবে, তা ত ভেবে পাচ্ছি নে।"

মথুরা সাহসে বুক ফুলাইয়া (তখন সে পিতার সম্মুখে ছিল না) বলিল, "তার জন্যে ভেবো না—সে ব্যবস্থা আমি ঠিক করব। এখন কথা হচ্ছে, তোমাদের এই জাতের ঘোঁটের ভয় নেই ত?"

নরহরি বলিলেন, "না, তা নেই। দক্ষিণ-রাঢ়ী বা উত্তর-রাঢ়ীর সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হ'লে জাত যাবে, এ বিশ্বাস আমার নেই। তবে—"

কুমুর মা মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, "তবে আবার কি? তুমি চুপ কর, আমি বলছি সব। দেখ বাবা মথুর, আমাদের তিন কুলে কেউ নেই, কেবল ঐ এক ফোঁটা মেয়ে। তোমার মত সৎপাত্রে মেয়েকে দিয়ে যদি আমাদের জাত যায়, তা যাক্‌, আমরা ভিটে ছেড়ে বুড়োবুড়ীতে কাশীবাস

করব, মেয়ে আমার সুখে থাকবে। এখন তুমি ঠিক থাকলেই হয়। কি বল?"

মথুরা সোৎসাহে বলিল, "আমি? আমি ঠিক আছি। আমি ও সব গণ্ডীর মধ্যে গণ্ডী দেওয়া মানি নি। ও সব যখন দরকার হয়েছিল, তখন মানুষে গড়েছিল, এখন ভাঙ্গবার সময় হয়েছে, আমরাই ভাঙ্গব। তোমরা উদ্যুগ কর, এ বিয়ে হবেই। বাপ-মা যখন মুখ ফিরুলেন, তখন নিজেই ব্যবস্থা করতে হবে।"

তাহার পর বহুক্ষণ তিনজনে চুপি চুপি অনেক পরামর্শ হইল। মথুরামোহন প্রাতে কলিকাতা রওনা হইবে, তাই তখনকার মত শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। সে যখন উঠি উঠি করিয়া একবার কাহার আশায় এদিক ওদিক চাহিয়া উঠানে নামিল, তখন কুমুর মা ডাকিলেন, "হাঁ রে কুমু, মথুর চ'লে যাচ্ছে, দুটো পান দিয়েও গেলি নে?"

কুমু পাকশালায় লুকাইয়া ছিল। মায়ের আহ্বানে পান লইয়া উঠানে নামিল বটে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও লজ্জানম্র আঁখি দুটি কিছুতেই মথুর দাদার মুখের দিকে তুলিতে পারিল না। মথুর পান লইয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "কুমু, আমি এসে অবধি পালিয়ে বেড়াচ্ছিস কেন—আমি কি বাঘ যে খেয়ে ফেলবো?"

ততক্ষণ কুমু ছুটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। মথুরামোহনের মুখখানা অপ্রসন্ন হইল। সে মনে মনে কুমুর অসঙ্গত লজ্জার নিন্দা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

৪

ইহার কয়েক দিন পরে ফুলবাড়ীর গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল, ঘোষেদের বাড়ী তালাবন্ধ, বাড়ীতে কেহ নাই। কানাঘুষায় জানা গেল, গফুর গাড়োয়ান রাত থাকিতে গাড়ীতে গরু জুতিয়া ঘোষেদের বাড়ী হাজির হইয়াছিল এবং কর্ত্তা, গিন্নী ও কুমুকে ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিয়াছিল—এ জন্য সে ভাড়ার উপর বকশিসও পাইয়াছে। তাহারা কোথায় গিয়াছে, সে বলিতে পারে না। শীকার হাতছাড়া হইল দেখিয়া নায়েব রামলোচন একবারে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল, গাঁয়ের মোড়লরা এক সহায়সম্পত্তিহীন দুর্ব্বল গ্রামবাসীর উপর পঞ্চায়েতী বিচার ফলাইতে না পারিয়া বড় আশায় নিরাশ হইল। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারুক, মথুরামোহনের পিতামাতা বুঝিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদের পুত্রের কারসাজি নিশ্চিতই আছে। বিশেষতঃ এব মথুরা কলিকাতাযাত্রাকালে মায়ের নিকট নানা অছিল স্বাভাবিক প্রয়োজনের অনেক অধিক টাকা সংগ্রহ করি লইয়া গিয়াছে, ইহার কারণ ঠিক করিতে মথুরার পিত বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না।

আসল কথা, বৃদ্ধ নরহরি মথুরার কলিকাতাযাত্রা দুই চারি দিন পরে এক পত্র পাইল। পত্রে মথুরা লিখি য়াছে, সে কলিকাতায় বিবাহের সমস্ত আয়োজন সম্প করিয়াছে। বিবাহ তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয় হইবে। নরহরি স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে কলি কাতা রওনা হইবে, শিয়ালদহ ষ্টেশনে মথুরা তাহাদিগকে আনিতে যাইবে। মথুরা এ জন্য নরহরিকে খরচের উপ যোগী টাকাও পাঠাইয়া দিয়াছিল।

যথাসময়ে বন্ধুগৃহে মথুরামোহনের সহিত কুমুদমণির বিবাহ হইয়া গেল। মথুরার বন্ধুবর্গ পরম পরিতোষ সহকারে 'মিষ্টান্নের' সদ্ব্যবহার করিল। গোপালদা পৈতা কচলাইতে কচলাইতে 'কাযটা ভাল হ'ল না' বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিল বটে; কিন্তু বিবাহরাত্রিতে গরম লুচি পাতে পড়িলে মুখে তুলিতে কোনও আপত্তি করিল না। কুমুকে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল, বেড়ে বউ, খাসা বউ। মথুরার বুকখানা দশ হাত হইয়া উঠিল।

মথুরার বন্ধু কুমুদের জন্য নিজের বাড়ীতে ২ খানা ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে মথুরাকে বলিয়াছিল, যত দিন ইচ্ছা মথুরা সেই ঘর ব্যবহার করিতে পারে। কুমুর বিবাহের পরে কুমুর বাপ-মা কাশীযাত্রার জন্য বড়ই জিদ ধরিল, কিন্তু মথুরা বহু কষ্টে তাহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিল। সে বলিল, আপাততঃ তাঁহারা চলিয়া গেলে সে কাহার আশ্রয়ে কুমুকে রাখিবে? এখন তাহার বাপ-মা কুমুকে কখনই ঘরে লইবেন না, মাসেক ছমাস পরে ঘোঁটপাচাল থামিয়া গেলে সব যখন ঠিক হইয়া যাইবে—যখন তাহার বাপ-মা তাহাকে বা তাহার পত্নীকে ঠেলিতে পারিবেন না, তখন তাঁহাদের কাশীযাত্রার কোন বাধা থাকিবে না। আপাততঃ দুই চারি দিন কলিকাতায় থাকিবার পর সে সকলকে লইয়া দেশে যাইবে এবং যাহাতে তাহারা নিরাপদে গ্রামে বাস করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিবে।

তাহাই স্থির হইল। যে কয় দিন কুমুরা মথুরার বন্ধু-গৃহে বাস করিল, সে কয় দিন মথুরার যেন স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। বোধ হয়, জীবনে সে এমন সুখে কখনও কালাতিপাত করিতে পারে নাই। কুমুর সলজ্জ মধুর প্রেমপূর্ণ ব্যবহার তাহার সমস্ত জীবনটাকে ছাইয়া ফেলিল। সে যখন নিজের হাতে তাহাকে ও তাহার বন্ধুদিগকে নানা-প্রকার চর্ব্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিত, তখন যথার্থই সে স্বর্গসুখ উপভোগ করিত। তাহার বন্ধুদের মুখে কুমুর সুখ্যাতি আর ধরিত না। তাহার সর্ব্বদা মনে হইত, দেশমাতৃকার আহ্বানে তাহার এই স্বার্থত্যাগ সার্থক হইয়াছে!

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সে দেশে গিয়া পত্নী ও শ্বশুর শাশুড়ীকে স্থিতভিত করিয়া দিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনে শান্তি পাইল না। সে থানার দারোগাকে সকল কথা জানাইয়া উহাদের রক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া আসিল। সেই অনুরোধের সঙ্গে কলিকাতা হইতে সে মস্ত সুপারিশ লইয়া গিয়াছিল—কেবল শুষ্ক সুপারিশ নহে, সেই সুপারিশ সে স্নেহসিক্ত করিয়া দিয়াছিল। নায়েব রামলোচনকে সে শাসাইয়া আসিল যে, এখন হইতে কুমুর উপর বা কুমুর বাপ-মার উপর যদি সে ঘুণাক্ষরে কোন অত্যাচারের কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে সেই অত্যাচার সে নিজের বলিয়া মানিয়া লইবে এবং তাহার প্রতীকারে পশ্চাৎপদ হইবে না। কুমু এখন কেবল ঘোষেদের মেয়ে নহে, বোসেদেরও বউ,—এটা যেন তাহার স্মরণ থাকে। ইহা ছাড়া সে গফুর গাড়োয়ানকে কুমুদের বারবাড়ীর দোচালায় রাত্রি-কালে শুইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া আসিল।

সব হইল, কিন্তু সে নিজের বাড়ীতে কাহারও আদর পাইল না। অবশ্য বাড়ীতে তাহার প্রবেশ নিষেধ ছিল না, অথবা আহার ও শয়নেও বাধা ছিল না; কিন্তু তাহার পিতামাতা তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এক দিন কৃত কার্য্যের জন্য জননীর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলে মা সজলনয়নে বলিয়াছিলেন, 'আমি কি করব বাছা, যা বলতে হয়, কর্ত্তাকে বল।' কর্ত্তার কাছে অগ্রসর হইতে মথুরার সাহস হয় নাই। তবে সে তাহার খুল্লতাতের দ্বারা পিতাকে অনুরোধ করাইলে পিতা জবাব দিয়াছিলেন, সে যখন নিজের মতলবে বিবাহ করিতে পারে, তখন নিজেই পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করিতে পারে—এ বাড়ীতে ঘোষেদের মেয়ের স্থান নেই।

মথুরামোহন হতাশ হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। যাত্রাকালে সে যখন নববিবাহিতা পত্নীকে বক্ষে ধারণ করিয়া বিদায় লইয়াছিল, তখন লজ্জাবতী কুমুদমণি অতি অস্ফুটস্বরে কম্পিতকণ্ঠে একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'কবে আসবে?' বলিয়াই সে তাহার বুকে লজ্জারক্ত মুখ-খানি লুকাইয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিয়া মথুরামোহনের কেবল সেই কথা দুটি অনুক্ষণ স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। কবে আসবে—তাই ত, কবে সে আসিতে সমর্থ হইবে, কবে সে পৃথিবীর আর সব মানুষের মত আপনার পত্নীকে তাহার ন্যায্য অধিকার দিতে সমর্থ হইবে!

কলিকাতায় ফিরিয়াও সে এক তিল মনে শান্তি পাইল না। সে যে দেশে গিয়া পিতামাতার নিকট এইরূপ অভ্যর্থনা পাইবে, তাহা বিলক্ষণই জানিত; কিন্তু তথাপি তাহার মনের কোণে সামান্য একটু আশার মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল—যদি সন্তান বলিয়া বাপ-মার মন কিছু ফিরে; কিন্তু অনাদরের ও অবজ্ঞার প্রবল ঝড়ে সে মেঘ কোথায় উড়িয়া গেল। তবে নিরাশার মধ্যেও তাহার একটা প্রবল সান্ত্বনা ছিল—আত্মপ্রসাদ। যখন মেসের ছেলেরা তাহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া তাহার অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগের কথা শতমুখে ঘোষণা করিত, তখন সে বাপমায়ের অনাদরের কথা ভুলিয়া যাইত, হৃদয়ে পরম শান্তি, পরম তৃপ্তি অনুভব করিত।

এই সময়ে তাহার যথার্থ পরীক্ষার কাল সম্মুখে উপস্থিত হইল। হাতে এত দিন রেস্ত ছিল, মায়ের দেওয়া মোটা টাকায় এ কয় দিন বেশ কাটিয়াছে, কিন্তু এইবার ক্রমে কলসীর জল ঢালিতে ঢালিতে কলসী শূন্য হইয়া আসি-য়াছে, টাকা চাই। এ সংসারে সব না হইলে চলে, কেবল টাকা না হইলে এক দিনও চলে না। সে পিতাকে খরচের টাকা চাহিয়া পত্র লিখিল।

সে পত্রের যে জবাব আসিল, তাহা অতীব ভয়ানক। বাপ ছেলেকে এমন পত্র লিখিতে পারে, মথুরামোহনের এ বিশ্বাস ছিল না। পত্রে এতটুকু স্নেহের নিদর্শন নাই, এক বিন্দু দয়ামায়ার কথা নাই, যেন সরকারী কি সদাগরী

আফিসের লেফাফাদোরস্ত মামুলী কাযের চিঠি! পত্রখানি এই:—

"তুমি আমায় টাকার জন্য লিখিয়াছ। বোধ হয়, বিবাহের পর বুঝিয়াছ, তোমায় আমায় ঐ সময় হইতে টাকারই সম্বন্ধ হইয়াছে। যদি তাহাই বুঝিয়া থাক, তবে আমায় আর ভবিষ্যতে টাকার জন্য তাগীদ করিও না। তুমি যখন নিজে জানিয়া শুনিয়া চোখকান মেলিয়া এই বিবাহে নামিয়াছ, তখন নিশ্চিতই তোমার নিজের বুঝিবার ও জানিবার যথেষ্ট শক্তি হইয়াছে। আমিও স্থির করিয়াছি, আমার মুরারিমোহন (মথুরার কনিষ্ঠ) ভিন্ন অন্য পুত্র নাই; সুতরাং মুরারিমোহন ব্যতীত অপর কাহারও সুখ-দুঃখের জন্য আমি দায়ী নহি। ভবিষ্যতে ইহা বুঝিয়া কার্য্য করিও। আমার আদেশে অতঃপর তোমার সকল পত্রই না খুলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে, ইতি।—শ্রীবিশ্বম্ভর বসু।"

সর্ব্বনাশ! হাতে যাহা কিছু ছিল, বিবাহে ও অন্য বাবদে সব খরচ হইয়া গিয়াছে, এখনও মেসের দুই মাসের পাওনা বাকি। কি হইবে! চাকুরী? প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে, চাকুরী করিবে না। তবে? মথুরামোহন ভাবনার অকূলপাথারে পড়িল। চিঠির উপব চিঠি দিলে বাড়ীর কেহ জবাব দেয় না। শেষে ৪।৫ খানা চিঠির পর মা একখানা জবাব দিলেন,—"তুমি মিথ্যা চিঠি লিখিতেছ। কর্ত্তার হুকুম, তোমার চিঠি কেহ পড়িবে না, অথবা তোমার চিঠির কেহ জবাব দিবে না। এই চিঠি তাঁহার হুকুমমত লিখিতেছি। আমাদের শেষ কথা, যদি তুমি ঘোষেদের মেয়েকে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে পার, তাহা হইলে আবার যেমন ছিল, তেমনই হয়। আর যদি তাহা না পার, তাহা হইলে তুমি তোমার যে পথ বাছিয়া লইয়াছ, সেই পথে চল, আমরাও আমাদের কর্ত্তব্যপথে চলিয়া যাইব, এই দুই পথের মধ্যপথ নাই। শেষ পথই যদি তোমার গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে মুরারিমোহনই কর্ত্তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির মালিক হইবে বলিয়া জানিবে, সুতরাং তাহাকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া এক পয়সাও কর্ত্তা তোমাকে দিতে চাহেন না।"

এই কি মা! বাপ অনেকের নিষ্ঠুর হইতে পারে, কিন্তু মা? ক্ষোভে, রোষে, অভিমানে মথুরামোহনের সমস্ত হৃদয়টা আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু ব্যর্থ রোষ! ব্যর্থ ক্ষোভ! —বরং পর্ব্বতে মাথা ঠুকিয়া ফল আছে, কিন্তু নিষ্ফ রোষে ক্ষোভে ফল কি? সে হৃদয়কে দৃঢ় করিবার সঙ্ক আঁটিল। যদি সহস্র বাধা দেখা দেয়, তাহা হইলেও (সঙ্কল্পচ্যুত হইবে না। সে পুরুষমানুষ, বাপের মুখ চাহি পেটের অন্ন সংগ্রহ করিবে—পত্নীর ভরণপোষণের জ পরের হাত তোলার প্রত্যাশা করিবে?—ছিঃ ছিঃ!

পরামর্শ করিবার মত এক জন লোক আছে, (গোপালদা। মথুরা এই বিপদে গোপালদার সহায়তা প্রার্থ করিল। গোপালদা হাসিয়া ইংরাজী বুলী আওড়াই as he has made his bed, ইত্যাদি, অর্থাৎ আগুন খাই য়াছ, এখন আঙ্গরা বমন কর! সর্ব্বনাশ! ইহা কি বন্ধুর উপযুক্ত পরামর্শ? গোপালদা 'পরামর্শ' ত খুব ভাল দিল, অধিকন্তু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া মেসের পাও শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দিবার দাবী করিল।

মথুরামোহন চারিদিক্ আঁধার দেখিল। যাহারা সম্পদে দিনে তাহার সহায়তা করিয়াছিল, বাহবা দিয়াছিল, এক একে সকলেরই দ্বারস্থ হইল, কিন্তু বিপদের দিনে কোথা মুখের শুষ্ক সহানুভূতি ব্যতীত কিছুই পাইল না।

মথুরামোহন কোনও দিকে কোনও সুবিধা করিতে ন পারিয়া শেষে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃ হইয়া চাকুরীর সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কি চাকুরীর বাজারও গরম—সেখানে আগুন লাগিয়াছিল ঘুরিয়া ঘুরিয়া পায়ের সূতা ছিঁড়িয়া গেল, সারাদিন বিফ পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন ও ক্লান্ত হইয়া পড়িল। সে অবস্থ পন্ন পিতার সন্তান, চিরদিন আরামে কাটাইয়া আসি য়াছে, আজ তাহার আরামের সুযোগ ত রহিলই না, শেষে দুবেলা দুমুঠা ভাতের জন্যও বুঝি তাহাকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া পথে বাহির হইতে হয়। মথুরামোহ দুর্ভাবনায়, অনাদরে, অযত্নে ক্রমে রোগশয্যা গ্রহণ করিল।

এই সময়ে কুমুর বাপের একখানা পত্র আসিল উহাতে বৃদ্ধ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপর আবার নির্য্যাত আরম্ভ হইয়াছে, এ সময়ে দেশে তাহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। পত্রখানা পাঠ করিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। যাহার নিজের খাইবার কাণাকড়ি নাই— যে একখানা ডাকটিকিট কিনিবার পয়সা যোগাড় করিতে পারে না—তাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা! এ কি তাহাদে

ও তাহার অদৃষ্টকে উপহাস করা নহে? কষ্টে ভিক্ষা করিয়া একখানা ডাকটিকিট সংগ্রহ করিয়া সে শ্বশুরকে জবাব দিল,—"তাহার সহিত তাহাদের আর কোনও সম্বন্ধ নাই—যে নিজে কাঙ্গাল, পরের অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহার আবার পত্নী কি, শ্বশুর-শাশুড়ী কি?—কিছুই নাই। তাহারা নিজের পথ দেখিতে পারে। তাহার যত কষ্টের মূল ত তাহারাই।"

এক দিন মেসে তাহার খুল্লতাত আসিয়া উপস্থিত। তিনি গোপালদার পত্রে তাহার অবস্থার কথা জানিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে আসিয়াছেন, আপাততঃ তাহাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্ক ভুলিয়া যাইতে হইবে, পরে সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

মথুরামোহনের সকল কষ্ট দূর হইল, সে যেন হাতে স্বর্গ ফিরিয়া পাইল। সে পরম আনন্দে খুল্লতাতের সহিত দেশে গেল। দেশের বাড়ীতে রোগশয্যায় তাহার খুব আদর-যত্ন হইল। সেই আদরের মহাসাগরে ডুবিয়া থাকিয়া কচিৎ কখনও ক্ষণিক চপলাচমকের মত—স্বপ্নদৃষ্ট সুখভোগের মত কুমুর সেই কম্পিত কণ্ঠস্বর "কবে আসবে" তাহার মনে পড়িত কি?—কে জানে!

মথুরামোহন নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার পর এক দিন পিতাপুত্রে নির্জ্জনে অনেক কথা হইল। সেই দিন ফুলবাড়ী গ্রামে চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, মথুরামোহন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার দারপরিগ্রহ করিবে। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা এইরূপ—মথুরাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গোময় ভক্ষণ করিয়া, ব্রাহ্মণকে গো, ভূমি ও সুবর্ণ দান করিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে তাহাকে তাহার পূর্ব্ব-পরিণীতা অশাস্ত্রীয় বিধানে গৃহীতা পত্নীর কুশ-পুত্তল দাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। বিনিময়ে সে ভিন্ন গ্রামের জমিদারের কন্যা ও ১০ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইবে। মথুরামোহনের বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরম আনন্দ, আপনার আদর-যত্ন ও সুখ-স্বস্তি, ভৃত্য-পরিজনগণের উৎসাহ,—এ সকলের দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত থাকিয়া মথুরামোহনের বুকের মাঝে কখনও কি বিবেকের তাড়া হাতুড়ীর ঘা দিয়া বলিত, অগ্নি সাক্ষী করিয়া যাহাকে গ্রহণ করিয়াছ, সে তোমার এই সুখরাজ্যের কোন্ পাশে স্থান পাইবে?—কে জানে!

যখন গ্রামে এই সমস্ত ব্যাপার লইয়া তোলপাড় হইতেছে, সেই সময়ে মথুরামোহন একখানি পত্র পাইল। পত্রখানি ছোট—কেবল এই কয়টি কথা লেখা ছিল:—

"যদি মোবিয়া লোককে ভয় থাকে, যদি ধর্ম্মে ভয় থাকে, তবে অতি অবশ্য আজ সন্ধ্যার পর—আর যদি পাপ মনে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভয় করে—তবে অপরাহ্নে আমার কুঁড়ে ঘরে দেখা করিবে। কোনও অনিষ্টের ভয় নাই, কেবল দুটো কথা, আর কেউ কিছু বল্‌বে না। ইতি,—

নরহরি।"

পত্রখানা পাঠ করিয়াই মথুরার মনে অতীতের অনেক সুপ্তকথা বিদ্যুতের মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—উহার তাপে অন্তরের ভিতরটা জ্বালা করিতে লাগিল। নরহরি বলিয়া একটা মানুষ আছে—কুমুদমণি বলিয়া তাহার একটা কন্যাও আছে বটে—নূতন করিয়া পাতান তাহার সুখের সংসারের তাহারা কে—তাহাদের সহিত সে সুখ-জীবনের সম্পর্ক কি?

মথুরা সারা দিন ভাবিল—দেখা করি কি না, ভাবিয়া কিন্তু ভাবনার কূল-কিনারা পাইল না। দূর হউক, ভাবিয়া কি হইবে? পিতা যে পরামর্শ দিয়াছেন, সেই পরামর্শ-মত লোক মারফৎ একখানা পত্র দিলেই হইবে। সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সে ছটফট করিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৫

সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে, কুমু সাঁঝের প্রদীপ জ্বালিয়া অঙ্গনের তুলসীমঞ্চের সম্মুখে রাখিয়া গললগ্নীকৃত-বাসে প্রণাম করিতেছে, নরহরি দাওয়ার দেওয়ালে পিঁড়ি ঠেস দিয়া তাহাতে এলাইয়া পড়িয়া বলিতেছে, "সন্ধ্যাটা দিয়ে একবার তোর গর্ভধারিণীকে দেখ, সারা দিন জ্বরে বেহুঁস হয়ে আছে,"—এমন সময়ে বাহিরে গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, —"নরখুড়ো বাড়ী আছ?"

সে চিরপরিচিত স্বর কানে পশিবামাত্র কুমুর মুখখানিতে রক্তের স্রোত বহিয়া গেল, বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল, সে ত্রস্তে দ্রুতপাদবিক্ষেপে পাকশালায় পশিল। নরহরিও

চমকিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল, "হাঁ, এস।"

বিবাহের তিন মাস পরে আজ মথুরা এই প্রথম শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল। সে তিন মাস, না তিন যুগ? সব যেন তাহার নূতন ও অপরিচিত ঠেকিতেছিল, সেই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অপরিচিতের অস্বাস্তি অনুভব করিতেছিল তাহার মন।

মথুরা ধীরে ধীরে দাওয়ায় উঠিয়া নরহরির পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। ক্ষণকাল উভয়ের মধ্যে গভীর গাঢ় নীরবতা বিরাজ করিল—সে নীরবতা কঠোর, অসহনীয়। প্রথমে সেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মথুরা বলিল, "আমায় ডেকেছো?"

নরহরি বলিল, "হাঁ।"

মথুরা সাহস পাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল,"দেখ, সাক্ষাতে কথাটা হয়ে গেল, ভালই হ'ল। বাবা বল্‌ছিলেন, চিঠিতে জবাব দিতে।"

"দিলে না কেন?"

"না, তা পারলুম না। হাজার হোক, ন্যায়ই হোক আর অন্যায়ই হোক, একটা সম্পর্ক হয়েছিল ত!"

"ওঃ, এত অনুগ্রহ? তার পর?"

"দেখ নরখুড়ো, যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই। ভেবে দেখলুম, সমাজের চোখে আমাদের এ বিয়ে সিদ্ধ হয় নি। কাযেই যা শাস্তরবিরুদ্ধ, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো—"

"শাস্তরবিরুদ্ধ ব'লে বুঝি ১০ হাজার টাকার তোড়া আর জমিদারের মেয়ে বউ ক'রে এনে ঘরে তুলছো?" নরহরির মুখে চোখে ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

মথুরা ভয় পাইল, মিনতির স্বরে বলিল, "আমায় ক্ষমা কর নরখুড়ো, আমি না বুঝে এই ছেলেমানুষি ক'রে ফেলেছি—"

"ছেলেমানুষি? আমার কুমুর সঙ্গে বিয়েটা কি তবে ছেলেমানুষি?"

"বলেইছি ত, তার আর চারা নেই। এখন দেখতে হবে, কি ক'রে এর একটা বিহিত করা যায়। বাবা বলছিলেন, তোমায় নগড়ায় ২শ বিঘে ভিটে শুদ্ধ জমি দেবেন আর নগদ ৫ হাজার টাকা দেবেন, তুমি সেখানে গিয়ে বাস কর।"

নরহরি কেবল গম্ভীরভাবে বলিল, "হুঁ।"

"আর আমিও আমার নিজের থেকে ৫ হাজার টাকা দেব। তা হ'লে তোমাদের বেশ চ'লে যাবে।"

নরহরি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, "কোন্ টাকা, তোমার নতুন বিয়ের যৌতুকের টাকা? তা বেশ। তা আর কেউ কিছু দেবে না? তোমার নতুন শ্বশুর, তোমার নতুন স্ত্রী?"

'স্ত্রী' কথাটা নরহরির মুখ দিয়া ঠিক উচ্চারিত হইল না, সাপের গজরানির মত একটা 'হিস হিস' শব্দ বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ নরহরি মুখখানা আঁধার করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর আমার মেয়ে,—কুমু? তার কি হবে? তার ব্যবস্থা তোমরা বাপবেটায় কিছু কর নি?"

মথুরা হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "কুমু?"

নরহরি চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, কুমু, কুমু, আমার মেয়ে কুমু, তোমার স্ত্রী কুমু। আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হবে কি? তোমরা চামার হ'তে পার, কসাই হ'তে পার, আমি ত পারি নি—আমার মেয়ের কথা আমার ভাবতে হবে ত?"

মথুরা ভাবিয়াছিল, চির-দরিদ্র নরহরিকে অর্থলোভ দেখাইলেই সে কৃতার্থ হইয়া যাইবে; কিন্তু এখন তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

নরহরি আবার মথুরার মুখের উপর দারুণ ঘৃণার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল,—"তোমরা কি? মানুষ, না আর কিছু? মানুষের চামড়া ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, তা তোমাদের গায়ে আছে ত? ভণ্ড, পিশাচ! তুমি না মহাত্মার দোহাই দিয়ে দেশের কায কর? এই তোমার দেশের কায? আমার মেয়ের জাতকুল খেয়ে এখন সমাজের ভয়ে—সমাজের ভয়ে কেন, টাকার লোভে, স্বার্থের খাতিরে—টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে পথে বসাতে চাও? তুমি কি ভাব, সবাই তোমার মত নারকী লোভী? তোদের ঐ বড়মানুষের টাকায়—যাও, দূর হয়ে যাও, মনে করব, মেয়ে বিধবা হয়েছে।"

নরহরি হাঁপাইতে লাগিল।

মথুরা কাতরে দুই হাতে নরহরির পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "নরখুড়ো—"

নরহরি ঘৃণায় পা ছিনাইয়া লইয়া বলিল, "তুমি

দূর হও। যদি এখন পায়ে ধ'রে সাধ, আমার মেয়েকে ঘরে নিতে, তা হলেও এমন পিশাচ পশুর হাতে মেয়ে দেব না। তার চেয়ে মেয়েকে বিষ খাইয়ে মারব। জান কি, কেন এত হিঁদু খৃষ্টান-মুসলমান হয়ে যাচ্ছে? এই তোমাদের মত পিশাচ পশু-সমাজের মোড়লের অত্যাচারে। তুমি দূর হও, আমি খৃষ্টান হবো, আবার মেয়ের বিয়ে দেব, তুমি দূর হও।" এই বলিয়া নরহরি উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া চালের বাতা হইতে একখানা তামাককাটা কাটারী বাহির করিল।

মথুরা তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া এক লম্ফে অঙ্গনে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। যাইবার সময় পাক-শালার দ্বারে এক ষোড়শী সুন্দরীর ভাসাভাসা টানা চোখে সে সজল করুণ চাহনী দেখিয়া গিয়াছিল কি?—কে জানে!

৬

জমিদারের ঘরে মথুরামোহনের বিবাহের রাত্রিতে ঘোষেদের বাড়ীতে কান্নার রোল উঠিল। নরহরির পত্নী জ্বররোগে ভুগিতেছিল। তাহার উপর যখন সে শুনিল, তাহার বড় আদরের মেয়ে সেই দিন অপরাহ্ণে খিড়কির ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া জল হইতে আর উঠে নাই, তখন তাহার কান্নার রোলে গগনমেদিনী ভরিয়া গেল। এ যন্ত্রণা তাহাকে বেশী দিন ভোগ করিতে হইল না, ইহাই তাহার সুখ। আর নরহরি? নরহরিকে কয় দিন গ্রামে উন্মত্তের মত লোকে ঘুরিতে দেখিয়াছিল। তাহার মুখে এক বুলী,—"সব জল খেইছিস মা, বুড়ো বাপের জন্য এক ফোঁটাও রাখিস নি?" তাহার পর নরহরিকে আর কেহ গ্রামে দেখিতে পায় নাই।

মথুরামোহন ধনীর ঘরে বিবাহ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। কেবল মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইলে সে দুইটি জিনিষ ভুলিতে পারিত না,—বিদায়কালে কুমুদমণির সজল করুণ দৃষ্টি আর নরহরির আর্ত্তনাদ "সব জল খেয়েছিস মা?" গ্রামের লোক অধিক রাত্রিতে ঘোষেদের পুকুরপাড়ে ঐ রব কখনও কখনও শুনিতে পাইত। মথুরা অতঃপর অর্থ-বান্ হইয়া দেশমাতৃকার আহ্বানে ঘন ঘন সাড়া দিতে লাগিল, তাহার নাম দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

পড়াশুনায় বিঘ্ন
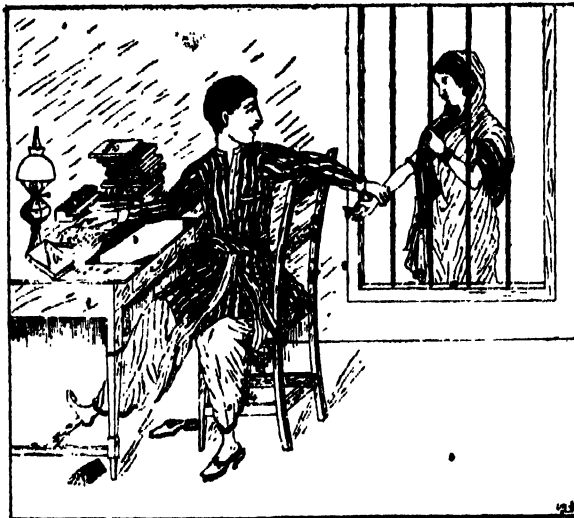
ফুল ও ফলের বৈচিত্র্যসাধন

গাছ-পালায় যাহাদের সখ আছে, কি করিলে ফুল বা ফল বড় হয়, অসময়ে কিরূপে তাহাদের উৎপন্ন করা বা রাখা যায়, এক গাছে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফুল ফুটাইবার কি প্রণালী, এই সব জানিতে বা জানিয়া পরীক্ষা করিতে তাহাদের বেশ আনন্দলাভ হইয়া থাকে।

শসাগাছের গোড়ার সহিত লাউগাছের ডগার কলম বাঁধিয়া শসার ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট লাউ ফলাইতে পারা যায়। একটি পাকা কাঁঠালের ভুতি অর্থাৎ বোঁটাটা টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মধ্যে একটি সুপক্ক আমের আঁটি দিয়া ঐ কাঁঠালটি সর্ব্বসমেত রোপণ করিলে যে গাছ হয়, তাহাতে আম-কাঁঠাল উভয়ই ফলিয়া থাকে। দেশী ও নারিকেল কুলের গাছ এক-সঙ্গে কলম বাঁধিয়া একসঙ্গে এক গাছে উভয়বিধ কুল ফলাইতে পারা যায়। এ সব বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু কি করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বাভাবিক সময়ের অনেক পূর্ব্বে ফলকে পরিপক্ক করা যায়, কি করিয়া ফলের গায়ে কতকটা স্বাভাবিকভাবে চিত্রবিচিত্র করা যায় বা কোন্ প্রক্রিয়ার দ্বারা গোলাপের কুঁড়ি বহুদিন রাখিয়া আবশ্যকমত ফুটাইতে পারা যায়, এ সব বোধ হয় অনেকের জানা নাই। এ সম্বন্ধে কয়েকটি সহজ উপায় এখানে বিবৃত করিব।

কৃত্রিম উপায়ে কোন গাছের ফলকে সময়ের পূর্ব্বে পাকাইতে পারিলে ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভ অনেক এবং সখের বাগানকারীদেরও আনন্দ কম নয়। এ উপায় অতি সহজ। পেয়ারা, কুল, আপেল বা অন্য ঐরূপ কোন ফলের গাছেই ইহার পরীক্ষা প্রশস্ত। এ জন্য প্রথম একটি বেশ ফল-বিশিষ্ট শাখা বাছিয়া লইয়া উহার নিম্নাংশে এক-খানি তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা অল্পপরিমাণ স্থানে গাছের ডাঁটার উপরিস্থ চতুর্দ্দিকের ছাল তুলিয়া ফেলিতে হয়। ইহার ফলে ডালের উপরিস্থিত রস আর নিম্নে ফিরিয়া আসার পক্ষে অনেকটা বাধা পাওয়ায়, ঐ শাখা বিশেষ তেজস্কর হয় এবং সেই কারণে উহার ফলগুলি ভাল হয় এবং যথেষ্ট পূর্ব্বেই পাকিয়া থাকে। ইহাতে গাছের কোন অনিষ্ট হয় না, পরবৎসর ঐ ছাল পুনরায় পূরিয়া ঠিক হইয়া যায়।

ডালের ছাল উঠাইয়া শীঘ্র ফল পাকাইবার ব্যবস্থা।

কোন গাছের ফলকে কৃত্রিম উপায়ে অযথা আকারে বড় করিতে হইলে তাহার প্রক্রিয়াও আদৌ কঠিন নহে। এ জন্য যে সকল ফল খুব রসাল, তাহা লইয়া পরীক্ষা করিলে বেশ কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

কয়েকটি অগভীর জলপূর্ণ পাত্র কোন উপায়ে বৃক্ষ-স্থিত ফলের ঠিক নীচে সংরক্ষিত করিয়া গাছের শাখাটি এমন ভাবে টানিয়া বাঁধা দরকার, যাহাতে ফলের নিম্নাগ্রভাগ পাত্রস্থিত জলের সহিত সংস্পর্শে থাকিতে পারে। পাত্র-গুলি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত জলপূর্ণ থাকে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গুজবেরী (Gooseberrie) ফলকে

ফলের আকারবৃদ্ধির ব্যবস্থা।

এই উপায়ে স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা দুই বা তিন গুণ বড় করিতে পারা যায়।

লাউ এবং তরমুজকে এই ভাবে বড় করিতে পারা যায়। অনেক ফলের বোঁটা সামান্য চিরিয়া উহার মধ্যে কাপড়ের একটি ফালি প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহার অপর মুখ পাত্রস্থিত জলে ডুবাইয়া রাখে। পেয়ারা, আতা, গোলাপজাম প্রভৃতি ফলে চট্ বা কাপড় জড়াইয়া দিলেও ফল বেশ বড় হইয়া থাকে।
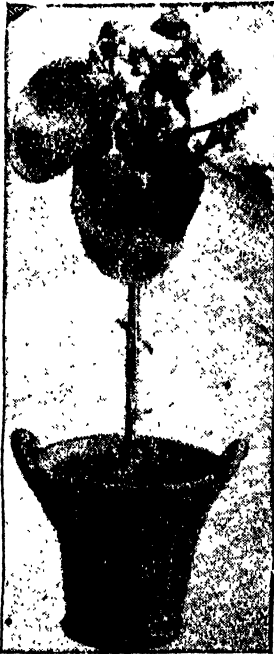
ভায়লেট-ফুলের ও গাছের উন্নতি।

ফুলের আকার বড় করিতে হইলে অনেক সময় ডালের অগ্রভাগে একটিমাত্র কোরক রাখিয়া অবশিষ্টগুলি কাটিয়া দিলে ফুল বেশ বড় হইয়া থাকে। এই উপায়ে চন্দ্রমল্লিকা ফুলকে খুব বড় করা যায়। গোলাপ বা অন্য যে কোন ফুলে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রাকৃতি ভায়লেট্ নামক বিলাতী মরশুমি ফুলকে এইরূপে বড় করা যায় এবং একটিমাত্র পল্লব রাখিয়া বাকিগুলি যদি ছাঁটিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে গাছের গঠনও সুন্দর এবং নবীনত্ব প্রাপ্ত হয়।

কলম বাঁধিয়া এক গাছে বিভিন্ন প্রকার গোলাপ বা অন্য ফুল ফোটান গেলেও ঐ প্রণালীর দ্বারা এক বৃন্তে দুই প্রকার ফুল ফোটান যায় না। হায়াসিন্থ (Hyacinth) নামক গেঁড়বিশিষ্ট গাছে ইহার পরীক্ষা সহজ। এক সময়ে প্রস্ফুটিত হয়, এমন দুইটি বিভিন্ন রংয়ের এই ফুল-গাছের গেঁড় বা মূল সংগ্রহ করিয়া উহা উপর হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরির দ্বারা কাটিয়া ফেলিয়া, ঐ কাটা দিক একত্র করিয়া চিত্রে যেরূপ দেখান হইয়াছে, ঐরূপ একত্রে বাঁধিয়া যথানিয়মে রোপণ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়। কাটিবার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার—যাহাতে মূলমধ্যস্থিত কোমল মধ্যপল্লবটি কাটিয়া নষ্ট হইয়া না যায়। এ জন্য দুই খণ্ড কিছু ছোট বড় করিয়া কাটা উচিত এবং উভয় বৃহৎ খণ্ড একত্রে বাঁধা আবশ্যক। যদি এই কার্য্য ঠিকমত হয়, তাহা হইলে ঐ যুগ্ম মূল হইতে যথাসময়ে একটিমাত্র শীষ উঠিয়া উহাতে নীল, লাল বা যেরূপ থাকিবে, সেইমত ফুল হইবে।
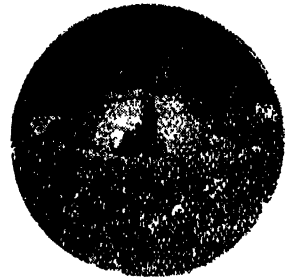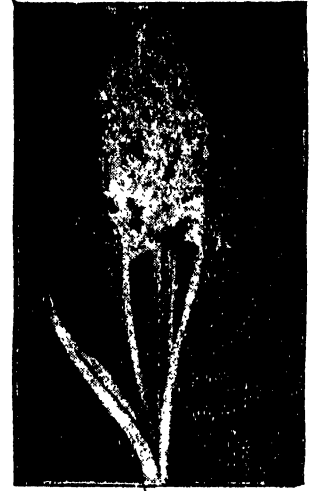
এক গাছে দুই প্রকার ফুল।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতিনিয়ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক ফুলের রেণু অপরের বীজকোষে দিয়া বা অন্য উপায়ে ফুলের বর্ণ, গঠন ও অবয়বের পরিবর্ত্তন দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে যে নূতন নূতন ফুলের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সে কায শিক্ষা ও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু গাছ হইতে তোলা ফুলের বর্ণ পরিবর্ত্তন করা অতি

লাল কালীর শিশিতে বোঁটা ডুবাইয়া ফুলের বর্ণ-পরিবর্ত্তন।

সহজ। রসাল কোমলশাখাবিশিষ্ট সাদা ফুল বা অর্দ্ধ-পরিস্ফুট ফুল হইলেই ভাল হয়। হংসরাজ, রজনীগন্ধা, লিলি অব দি ভ্যালি, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল বোঁটা সমেত তুলিয়া এক ঘণ্টাকাল লাল বা সবুজ কালির দোয়াতে বোঁটাগুলি ডুবাইয়া রাখিলেই ফুলগুলি সুন্দর লাল বা সবুজ রং ধারণ করিবে। অন্য কোন রংও এই জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইচ্ছা করিলে সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। গন্ধকের ধূমে লাল জবাফুল ধরিলে উহা সাদা হইয়া যায়।

গোলাপের অপ্রস্ফুটিত কোরককে তুলিয়া রাখিয়া আবশ্যকমত ফোটাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা কঠিন নহে। যদি এ দেশে উহা করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যায়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ অনেক উপকার হয়।

ইহা করিতে হইলে প্রথম বেশ তাজা প্রস্ফুটোন্মুখ গোলাপের কুঁড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া, কর্ত্তিত দিক্‌টা গলা মোমে বেশ করিয়া ডুবাইয়া লইতে হয়। তৎপরে ঠিক কুঁড়িগুলি পাতলা টিশু কাগজে (Tissue papar) ভাল করিয়া মুড়িয়া সমস্তগুলি কোন ছিদ্রাদিশূন্য বাক্সমধ্যে পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া বাক্সটি ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলে কয়েক মাস ঠিক ভাবে থাকে। যখন পুনরায় কুঁড়িগুলি ফুটন্ত অবস্থায় পাওয়া দরকার হইবে, তখন মোমলাগা বোঁটার অংশ কাটিয়া ফেলিয়া ঈষদুষ্ণ জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে স্বাভাবিক ফোটা ফুলের আকার ধারণ করিয়া থাকে।

ফুলকে দুই পাঁচ দিন স্থায়ী করিতে হইলে, কেহ কেহ বলেন, লবণাক্ত জলে ফুলের বোঁটা ডুবাইয়া রাখিলে উহা ঠিকমত থাকে।

সুপক্ব ফলকে দীর্ঘকাল কতকটা অবিকৃত রাখিবার প্রধান উপায়—উহাকে বায়ুশূন্য কৌটায় আবদ্ধ করিয়া রাখা। মধু, গাঢ় চিনির রস বা সরিষার তৈলে নিমজ্জিত করিয়াও কিছুদিন রাখিতে পারা যায়। কুমড়া, বেল, তেঁতুল প্রভৃতি ফল আপনা হইতেই বহুদিন ঠিক অবস্থায় থাকে। আলু, কচু প্রভৃতি মূলও বহুদিন ভাল অবস্থায় থাকে। আলুর অঙ্কুরোদ্গমের সূচনা হইলে দীর্ঘকাল রাখা যায়। একটি গাছ সমেত বড় মূলার ভিতরটা এক-খানি ছুরি দ্বারা সাবধানে কুরিয়া বাহির করিয়া উহা জল-পূর্ণ করিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে ঐ গাছ বাড়িতে থাকে এবং অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে ও ফুল হইতে দেখা যায়।

বহু পরগাছা (orchid) ও কোন কোন থার্গ মৃত্তিকা-সম্পর্কশূন্য অবস্থায় কেবল খোয়া, ঝামা বা কাঠের গায়ে বাঁধিয়া থাকিতে অনেকেই দেখিয়াছেন। অনেক ফুলের গাছ আছে—যাহা মৃত্তিকা ব্যতিরেকেও যে কোন স্যাঁত-সেঁতে স্থানে বাঁচিয়া থাকে এবং কখন কখন ফুলও হয়।

কেবলমাত্র জলে অনেক ক্রোটন বা ঐ জাতীয় গাছকে বাঁচিয়া থাকিতেও দেখা যায়। একটি জলপূর্ণ বোতল বা বড় শিশিতে ছিপির মধ্যে ছিদ্র করিয়া উহার ভিতর ক্রোটনের একটি ছোট শাখার নিম্নাংশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া শিশিটি বেশ করিয়া আবদ্ধ করিয়া দিলে উহা দীর্ঘ-কাল বাঁচিয়া থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কলমীশাক এবং বড় বড় পানা প্রভৃতিও কেবল জলে বাঁচিয়া থাকে।

গোলাপ ফুল অধিক দিন রক্ষা করা।

বীজ, মূল ও শাখা হইতে গাছ উৎপন্ন হওয়ার কথাই সকলে
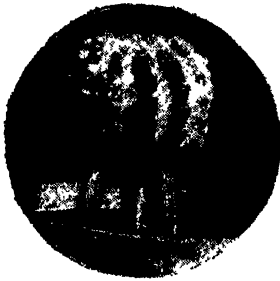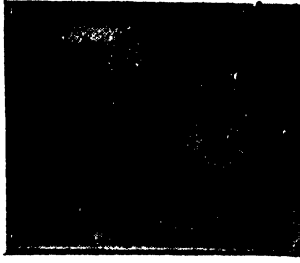
মনসা গাছের কলম।

জানেন, কিন্তু কেবলমাত্র পাতা হইতেও কোন কোন গাছ হইয়া থাকে। এক প্রকার পাতাবাহার গাছ এবং অন্য কোন কোন পাতা মৃত্তিকায় পড়িয়া থাকিয়া শিকড় নির্গত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতেও দেখিয়াছি। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা যে, একগাছি দড়ি—যাহাতে সর্ব্বদা মাছি বসিয়া কাল হইয়া গিয়াছে, উহা সামান্য মাটী চাপা দিয়া রাখিলে, উহা হইতে পুদিনা গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কখন পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। ময়রার দোকান হইতে ঐরূপ একগাছি দড়ি সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা কঠিন নয়।

কণ্টকময় মনসাজাতীয় বহু প্রকার উদ্ভিদ দেখা যায়, উহার ইংরাজী নাম ব্যাক্‌টাস্। অতি সহজে ইহাঁর কলম বাঁধা যায় এবং তদ্দারা ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করা যায়। বৃত্ত-মধ্যস্থিত চিত্রের নিম্নাংশের তিনটি স্বতন্ত্র ব্যাক্‌টাসের সহিত উপরের অংশ কলম করা হইয়াছে। এ কার্য্যের জন্য সদ্য কর্ত্তিত অংশ যোড় দেওয়া ভিন্ন আর কিছু করিতে হয় না। সুবিধা মনে হইলে প্রথম বাঁধিয়া দেওয়া ভাল।

নীল রংয়ের টগর বা লাল রংয়ের গন্ধরাজ কিংবা রজনী-গন্ধা ফুল দেখিলে নূতনত্বের জন্য যেমন একটা আনন্দ পাওয়া যায়, একটা আম বা একটা আপেলের গায়ে ছবি বা কিছু লেখা দেখিলে, তাহাপেক্ষা আনন্দিত ও আশ্চর্য্যা-ন্বিতও হইতে হয়।

এই বিষয়টির জন্য কোন বর্ণবিশিষ্ট ফলেই পরীক্ষা ভাল হয়। সুতরাং আপেলই এই পরীক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। এই জন্য প্রথম একটি পরিপুষ্ট নিটোল অপরিপক্ক ফল, যাহার উপর অধিকাংশ সময় আলো ও রৌদ্রপাত হইয়া থাকে, তাহা বাছিয়া লওয়া দরকার। যে চিত্র বা লেখা ইচ্ছা, যেরূপে মার্কা দিবার জন্য টিনফলক কাটিয়া লয়, সেইরূপ একখানি পাতলা কাগজে কাটিয়া, ঐ কাগজখানি ফলটির উপর দিকে অর্থাৎ আলোর দিকে পরিষ্কার করিয়া বিশুদ্ধ আঠা বা লেই দ্বারা আঁটিয়া দিয়া, অপর সকল দিক ঢাকিয়া দিতে হয়। ফলটির রং ধরিবার পূর্ব্বেই ঐ কাগজ আবৃত করা উচিত। কিছু দিনের পর আপেলটি যখন পাকিয়া লাল হইয়া যাইবে, তখন উহা পাড়িয়া কাগজ উঠাইয়া লইলে, যে চিত্র বা লেখা কাগজে ছিল, তাহা ফলটির উপরে বেশ সুন্দর ও স্থায়িভাবে অঙ্কিত হইয়াছে দেখা যাইবে। যদি বৃষ্টিতে বা কোন কারণে কাগজখানি উঠিয়া যায়, তবে ঠিক সেইমত আর একখানি কাগজ ঠিক পূর্ব্বস্থানে বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। যাহাদের নিকট এই প্রক্রিয়া অজ্ঞাত, তাহাদের চক্ষে ফলটি যে নিশ্চয়ই বিশেষরূপে বিস্ময় উৎপাদন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখানে আপেল জন্মে না, বোধ হয়, সিঁদুরে আমের উপর এই পরীক্ষা করিয়া দেখি-লেও কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

প্রবন্ধটির উপাদান কতকগুলি বহুদিন হইতে জানা ছিল, অবশিষ্টগুলি এক্ষণে সংগ্রহ করিয়া লিখিত হইল।
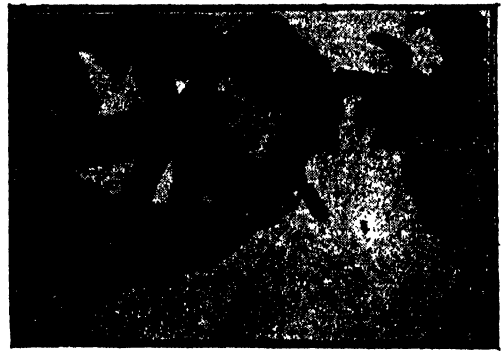
আপেলের উপর চিত্র-বিচিত্র করা।

শ্রীহরিহর শেঠ

শিল্প-বাণিজ্যের গতিবিধি

১

সোভিয়েট রুসিয়ার বাণিজ্য ধীরে ধীরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আগামী বৎসরের জন্য এখন হইতেই মুদ্রাব্যাপারে নূতন ব্যবস্থা করা হইতেছে। স্বর্ণ রুবলের হিসাবে নূতন নোট প্রচার করিবার কথা উঠিয়াছে। এমন কি, কিছু কিছু ধাতব মুদ্রাও টাকশাল হইতে বাহির করা হইবে।

বিগত মে মাসে এক কোটি ষাট লাক সোনার রুবলের মাল রুসিয়ায় আমদানী হইয়াছে। রুসিয়া হইতে রপ্তানী হইয়াছে এক কোটি দশ লাক রুবলের মালপত্র। (একটি সোনার রুবল আমাদের প্রায় দেড় টাকার সমান।)

পেট্রোগ্রাডের বন্দরে জাহাজের যাতায়াত বাড়িয়াছে। জুন মাসে ৭৩টা মালের জাহাজ পেট্রোগ্রাডে আসিয়াছিল। তাহার ভিতর রুস জাহাজ ছিল মাত্র ৯ খানি, জার্ম্মাণ জাহাজ ছিল তিন ভাগের এক ভাগ। অবশিষ্টগুলি সুইডেন, ডেনমার্ক ও ইংলণ্ডের জাহাজ।

বিলাতী জাহাজে আসিয়াছে প্রধানতঃ কয়লা; জার্ম্মাণরা আনিয়াছে যন্ত্রাদি, তুলা, চামড়া, রং ইত্যাদি। ১১টা রেলওয়ে এঞ্জিনও আসিয়াছে জার্ম্মানী হইতে। রুসিয়ার বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গত ১৯২৩ অব্দে অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার তুলনায় রুস-মুদ্রার মূল্য অনেকটা চড়িতে পারিয়াছিল।

২

শিল্পের ব্যাপারে রুসিয়ার ক্রমিক উন্নতি বেশ লক্ষ্য করা যায়। জুন মাসে ২৬টা তড়িতের কারখানা চলিয়াছিল। এগুলিতে মজুরের সংখ্যা ১৪ হাজারের উপর। কারখানাগুলি মাত্র চারিটি বড় মহাজনসঙ্ঘ বা ট্রাষ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

কারখানার কায চালাইবার জন্য রুসিয়াকে বিদেশ হইতে কয়লা আমদানী করিতে হয়। ১৯২১ অব্দে রুসিয়া মাত্র ২৩৩০০০ কয়লা কিনিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ১৯২২ এবং ১৯২৩ অব্দের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ৬৫০০০০ টন কয়লা কিনিয়াছে। ইহা হইতে রুসিয়ার আর্থিক উন্নতির তথা ব্যবসাবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ককেসাস পাহাড়ের আজর বৈজান প্রদেশের তৈলের খনিগুলি জগতে প্রসিদ্ধ। সেখানকার বাকুনগর তেলের বন্দরবিশেষ। এই বন্দরের যন্ত্রাদির গুদামের জন্য ভিয়েনায় ও বার্লিনে বায়না দেওয়া হইয়াছে।

৩

ফরাসী রমণীরা ফিতা তৈয়ার করিতে সিদ্ধহস্ত। ওৎ-লোয়ার জিলা এই হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রায় ৮০ হাজার লোক এই কাযের দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

কিছু কাল হইতে এই শিল্পের অবনতি দেখা দিয়াছে। ফরাসীরা নাকি হাতের তৈয়ার কায আর তেমন পছন্দ করে না। কাযেই ঐ অঞ্চলের পল্লী-রমণীরা একে একে কুটীর-শিল্প ছাড়িয়া দিতেছে। উহারা এখন সহরে আসিয়া কারখানায় চাকরী করিতেছে।

ফ্রান্সের এই কুটীর-শিল্প নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ফরাসী প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং এই শিল্পের বড় বড় কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ফরাসী সমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। শিল্পটিকে বাঁচাইবার জন্য আইন করিবার কথা উঠিয়াছে। কোনও দোনদার যাহাতে বিদেশী ফিতা না কিনিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। শিল্প-নায়কগণ বলিতেছেন,—"মেয়েরা কৃষি-কার্য্যের অবসরে বা অন্য অবকাশে ঘরে বসিয়া এই সকল সুকুমার শিল্প—কারুকার্য্যযুক্ত ফিতা তৈয়ার করিতে অভ্যস্ত। অধিকন্তু শীতকালে যখন চাষ-আবাদ চলে না, তখন মেয়েদের পক্ষে হস্তশিল্পই প্রধান কায। এই শিল্পটা ফ্রান্স হইতে বিলুপ্ত হইলে দেশের মেয়েদের অর্থার্জ্জনের একটা বড় উপায় নষ্ট হইবে। অধিকন্তু তাহারা দলে দলে সহরের কল-কারখানায় প্রবেশ করিতে থাকিলে সমাজে দুর্নীতি বাড়িয়া যাইবে।

এই জন্য কুটীর-শিল্পের নিমিত্ত স্কুলের ব্যবস্থা হইতেছে। এই পুরাতন হস্তশিল্পটিকে আধুনিকরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও চলিতেছে। ভারতে যাঁহারা চরকা চালাইবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে ফরাসী রাষ্ট্রবীরেরা সম্মান করিবেন।

৪

হাঙ্গেরী দেশের লোকরাও বিদেশী জিনিষপত্র ক্রয় করিতে নারাজ। হাঙ্গেরিয়াম গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, বিদেশে যাহাতে হাঙ্গেরীয় জিনিষপত্রের কাটতী বাড়ে, তাহারও ব্যবস্থা করা

হইতেছে। অধিকন্তু বিদেশী মালের আমদানীর উপর কড়া হারে মাশুল বসান হইয়াছে।

তুলার সূতা আজকাল হাঙ্গেরীর কারখানায় যে পরিমাণে তৈয়ার হইতেছে, তাহাতে দেশের লোকের অভাব আধাআধি মিটিতেছে। অপর অর্দ্ধের জন্য হাঙ্গেরীকে বিদেশী সূতা আমদানী করিতে হয়।

এখানে রাসায়নিক কারখানারও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এ বৎসর ৬ হাজার নূতন মজুর এই সকল কারখানায় কায পাইয়াছে। ধাতুর কাযের জন্য ২৫টা নূতন কারখানা তৈয়ার হইয়াছে। পুরাতন কারখানাগুলিরও আকার বাড়িয়াছে। আগামী বৎসর বিদেশী ধাতুর মালের আমদানী অনেক কমিয়া যাইবে।

অন্যান্য শিল্পেরও নূতন নূতন কারখানা খুলা হইতেছে। চামড়ার কারখানা ২২টা, খাদ্যদ্রব্যের ৪টা, চীনে মাটীর বাসনের ৩টা নূতন কারখানা এ বৎসর নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সকল দিক দিয়াই স্বদেশী আন্দোলনের সার্থকতা সম্পাদিত হইতেছে।

৫

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের সার্ভিয়া দেশ এখন অনেক বর্দ্ধিতায়তন ধারণ করিয়াছে। তাহার নাম এখন জুগোশ্লাভিয়া। এখানে ৩ জাতির বাস ;—সার্ভ, ক্রোট ও শ্লোভেন।

ইটালীর সহিত জুগোশ্লাভিয়ার বিরোধ আদ্রিয়াতিকের উপকূল লইয়া। এ দিকে জুগোশ্লাভিয়ার সহিত রুম্যানিয়া ও চেকো-শ্লোভাকিয়া এক "আঁতাত" পাতাইয়াছে। সেই আঁতাতকে বলে ছোট আঁতাত। এই সূত্র ছাড়া জুগোশ্লাভিয়ার নাম বড় একটা আর শুনা যায় না।

কিন্তু শিল্পের সরঞ্জাম এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আছে। শ্লোভেনিয়া জিলার খনিগুলি অনেক দিন হইতেই বিখ্যাত। সংপ্রতি আরও অনেক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিদেশী মহাজনরা এই সকল খনির দিকে ক্রমেই অধিক অগ্রসর হইতেছেন।

কয়লার খনিগুলিই প্রধান। কিন্তু অধিকাংশই ব্রাউন কোল বা নরম কয়লা। সীসা, লোহা, গন্ধক, মাঙ্গানীজ, আলুমিনিয়ম, পারদ, দস্তা ইত্যাদি অন্যান্য ধাতুর খনিও অনেক। এই খনিগুলির কৃপায় নূতন নূতন নগর গড়িয়া উঠিতেছে।

৬

পুরাতন রুসিয়ার একটা জিলা আজকাল লেটল্যাণ্ড বা লাটাভিয়া নামে স্বাধীন দেশ। এই দেশের দেয়াশালাইয়ের কারখানা জগতে প্রসিদ্ধ। হল্যাণ্ড, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রায় সকল দেশেই লেটল্যাণ্ডের দেয়াশালাই প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

একটা বড় দেয়াশালাইয়ের কারখানার নাম ভালকান। ফরাসীরা এই কোম্পানীকে ২৫ কোটি বাক্সের বায়না দিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এগুলি সরবরাহ করিতে হইবে।

লাটাভিয়ার প্রধান সহর বা বন্দরের নাম রিগা। দেয়াশালাইয়ের কারখানা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে ভারতসন্তানকে এখানে আসিতে হইবে।

৭

জুগোশ্লাভিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এখানেও আজকাল কারখানার প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছে। চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশের মত এই বল্কান অঞ্চলেও সবে মাত্র বাষ্প ও তড়িৎ-পরিচালিত শিল্পের প্রতিপত্তি বাড়িতেছে।

জুগোশ্লাভিয়ার কয়লার খনি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাও এখানে ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। এখন বিশ বাইশটা ছোট বড় লোহার কারখানার কায চলিতেছে। কিন্তু কোন কারখানায় তিন চার হাজারের অধিক শ্রমিক কায করে না।

কয়লার খনির মত লোহার কারখানাও শ্লোভেনিয়া জনপদেই অধিক। ল্যুবলানা ও য়েসেনিসে—এই ২ সহরকে জুগোশ্লাভিয়ার জামশেদপুর বলা যাইতে পারে। য়েসেনিসে কারখানার লোহার কাঁটা, পেরেক ইত্যাদি কিছু পরিমাণে আমাদের দেশেও রপ্তানী হইয়া থাকে।

এখানকার শিল্পনায়করা লৌহ ও ইস্পাতের শিল্পে নিজেদের দেশবাসীকে পরমুখাপেক্ষী রাখিতে চাহে না। কিন্তু তাহাদের এই স্বদেশী আন্দোলন সাফল্য লাভ করিতে অনেক দেরী হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহাদের কারখানার বড় বড় যন্ত্র সব বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

এমন কি, চাষ-আবাদের যন্ত্রও বিদেশ হইতে আনিতে হয়। আজকাল দেশে ছোটখাট বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈয়ার হইতেছে। ইহা ছাড়া ক্রানুজ সহরের বন্দুক-পিস্তলের কারখানা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শিল্পীরা সেখানকার লোহার জিনিষ পছন্দ করে।

৮

কয়লা ও লোহার কথা আজকাল পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কগণের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য ইটালী জুগোশ্লাভিয়াকে তাহার আয়ত্তাধীন রাখিতে চাহে। আর, সেই জন্যই ইটালীর গবর্ণমেণ্ট অষ্ট্রিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যসন্ধি রক্ষা করিয়া চলিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত।

জার্ম্মাণ মন্ত্রী ষ্ট্রেস্‌ম্যান ফ্রান্সের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রুরের কয়লা ও লোরেনের লোহা যদি কোন জার্ম্মাণ-ফরাসী কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে য়ুরোপের বাজারে সে কোম্পানী সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া পড়িবে। তাহাতে ইটালীর লোহার কারখানা কোণঠাসা হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য ফ্রান্স-জার্ম্মাণীর বন্ধুত্ব ইটালীর পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তাই ফ্রান্স-জার্ম্মাণীর কথাবার্ত্তাগুলায় ইটালীর শিল্প-নায়করা নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

৯

য়ুরোপের নূতন স্বাধীন দেশগুলিতে বিদেশী মহাজনরা তাঁহাদের নিজেদের টাকা খাটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। পোলাণ্ড বিদেশী মূলধনের প্রভাবেই দাঁড়াইয়া আছে বলা যাইতে পারে।

ওয়ারসা সহরের কমার্শ্যাল ব্যাঙ্ক বেলজিয়মের ব্রাসেলস্ ব্যাঙ্কেরই এক শাখাস্বরূপ। বেলজিয়মের আর একটা ব্যাঙ্ক ওয়ারসার অন্য এক বাণিজ্য-ব্যাঙ্কের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কে রুস ধনীদের টাকাও খাটিতেছে।

অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর দুইটা বড় ব্যাঙ্ক পোলাণ্ডের মালো-পোলস্‌কি ব্যাঙ্কের প্রাণস্বরূপ। আমেরিকার টাকা একটা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে খাটিতেছে। চেকোশ্লোভিয়ার টাকায় চলিতেছে লেম্বার্গ কৃষি-ব্যাঙ্ক।

এগুলি পুরাতন ব্যাঙ্ক। পোলাণ্ড স্বাধীন হইবার পর এ দেশে কতকগুলি নূতন ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার ভিতর লজ সহরের দুইটা ব্যাঙ্কে বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের শিল্প-নায়কগণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়ারসার একটা ব্যাঙ্কে ইংরাজের এবং আর একটাতে ফ্রান্সের মূলধন খাটিতেছে। পোলাণ্ডে সুইডেনের টাকাও খাটিতেছে।

বিদেশী মূলধনের সাহায্য না লইয়া স্বাধীনভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য চালান সম্ভব কি না, ভারতবাসী আজকাল তাহা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই জন্য পোলাণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের শিশু-স্বরাজগুলির কথা ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণের কাযে লাগিতে পারে।

১০

পোলাণ্ডকে সাধারণতঃ ফরাসী-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রভাবও এ দেশে যথেষ্ট।

মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে আমেরিকার ব্যাঙ্কাররা পোলাণ্ডকে সরকারী ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। অষ্ট্রি-য়ায় যেরূপ বিদেশী মহাজনদের কর্ত্তৃত্ব চলিতেছে, সেই ধরণের কর্ত্তৃত্বই মার্কিণ মহাজনরা পোলাণ্ডে ভোগ করিবে।

জার্ম্মাণরা রুসিয়ায় রেলগাড়ী বিক্রয় করে। পোলাণ্ড জার্ম্মাণীর প্রতিবেশী হইলেও জার্ম্মাণীতে রেলগাড়ী না কিনিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বায়না দিয়াছে। ১০ হাজার ক্রয় করা হইবে, তাহার সাড়ে ৫ হাজার আসিবে আমে-রিকা হইতে।

পোলাণ্ডের চিনির কারখানাগুলি য়ুরোপে প্রসিদ্ধ। সবগুলি জার্ম্মাণ জিলাতে অবস্থিত,—প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণ কারখানা। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর এই জার্ম্মাণ কারখানা-গুলি পোলাণ্ডের সম্পত্তি হইয়াছে। কারখানার মালিক-দের টাকার অভাব। বিলাতী মহাজনরা ইহাদিগকে সাড়ে ১২ লক্ষ পর্য্যন্ত ধার দিয়াছে। ১৯২৩-২৪ খৃষ্টাব্দে যত চিনি হইবে, তাহার অর্দ্ধেক এই ঋণের জন্য বন্ধকী থাকিবে।

১১

সংপ্রতি রুমেনিয়ায় ছোট আঁতাতের একটি বৈঠক বসিয়া-ছিল। হাঙ্গেরীর সহিত চেকোশ্লাভিয়া, রুমেনিয়া ও জুগোশ্লাভিয়ার সম্বন্ধ ঐ বৈঠকে আলোচিত হয়। এই শেষোক্ত দেশ তিনটি হাঙ্গেরীকে শত্রুরূপে দেখিয়া থাকে।

বিগত মহাযুদ্ধের সন্ধির ফলে হাঙ্গেরীকে আর্থিক হিসাবে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছে। হাঙ্গেরী যাহাতে কোন বিদেশী ঋণ না পায়, সন্ধিতে তাহার ব্যবস্থা আছে। অথচ, ঋণ না পাইলে হাঙ্গেরী কোনরূপেই মাথা তুলিতে পারিবে না।

হাঙ্গেরীর বিদেশী ঋণ পাওয়া ছোট আঁতাতের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। ফ্রান্সের প্রভাবে ছোট আঁতাত এখনও হাঙ্গেরীকে সুনজরে দেখিতে চাহে না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কিন্তু ছোট আঁতাতকে হাঙ্গেরীর অনুকূল পরামর্শই দিতেছেন।

চেকোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব সংপ্রতি বিলাতে গিয়াছিলেন। সেই অবসরে লর্ড কর্জ্জন তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ ফ্রান্সের প্রতিকূল মত গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১২

লণ্ডনের 'এঞ্জিনীয়ার' পত্রের সম্পাদক লিখিতেছেন, "য়ুরোপীয় মুদ্রার তুলনায় বিলাতী পাউণ্ডের দাম যত দিন বেশী থাকিবে, তত দিন য়ুরোপে বিলাতী মালের কাটতি বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন। এই কারণে পাউণ্ডের মূল্যহ্রাস ঘটান বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত।"

রুমেনিয়া, পোলাণ্ড, চেকোশ্লাভিয়া, রুসিয়া ইত্যাদি দেশে বহু পরিমাণ নানা প্রকারের যন্ত্র প্রয়োজন। সেগুলির জন্য ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং জার্ম্মাণী প্রধানতঃ এই চারি দেশে বায়না দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিলাতী পাউণ্ডের দর এত চড়া যে, এই সকল বাজারে ইংরাজের মাল চলা বিশেষ কঠিন। জার্ম্মাণ মুদ্রার মূল্য কম। এই জন্য জার্ম্মাণী য়ুরোপের বাজারে ইংলণ্ডকে পরাস্ত করিতে পারে।

এই সব ভাবিয়া ইংরাজ রাষ্ট্রনায়করা জার্ম্মাণ মার্কের মূল্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় আছেন। ফ্রান্স ও বেলজিয়মের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যে মাঝে মাঝে মত প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূল কারণই এই। ইংলণ্ডের জার্ম্মাণ-প্রেমের উদ্দেশ্য—য়ুরোপের ব্যবসার বাজারে জার্ম্মাণীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

কেরোসিন

বর্ত্তমান শ্রম-শিল্পের যুগে খনিজ তৈল একটি প্রধান পণ্য। পারস্য ও মেসোপোটেমিয়ার তৈলখনিসমূহের উপর অনেক শ্বেতাঙ্গ শক্তির লোলুপ নয়ন থাকিবার জন্যই যে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সময়ে সময়ে ঘটিতেছে ও ঘটিবে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। সকল শক্তিই প্রধান প্রধান খনিজ তৈল-ক্ষেত্রগুলির উপর প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, ইহা না হইলে অনেক কলকব্জা ও কোন কোন শ্রেণীর জাহাজ চালান দুষ্কর হইয়া পড়ে। কিন্তু আজকাল এত আবশ্যক ও মূল্যবান্ হইলেও অনেক স্থলে খনিজ তৈল অর্থাৎ Petroleum আধুনিক বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার নহে। মার্কিণ, রুসিয়া, পারস্য, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি যে সমুদায় স্থান হইতে এখন জগতের খনিজ তৈল সরবরাহ হইতেছে, সে সমুদায় দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই স্থানীয় অধিবাসীরা উক্ত তৈলের ব্যবহার অবগত ছিল এবং অপরিষ্কৃত অবস্থায় অল্পবিস্তর পরিমাণে কার্য্যে প্রয়োগ করিত। উপযুক্ত জ্ঞানের ও যন্ত্রাদির অভাবে পূর্ব্বে খনি হইতে সামান্য মাত্রায়ই তৈল পাওয়া যাইত এবং তাহাও পরিষ্কৃত হইত না। এক্ষণে উৎপাদনের মাত্রা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই পেট্রোলিয়ম হইতে কেরোসিন, তরল ইন্ধন, মোম, কল মসৃণ করিবার তৈল ইত্যাদি নানাবিধ ব্যবহারিক দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সাধারণভাবে পেট্রোলিয়ম কেরোসিন নামে অভিহিত হইয়াছে।

ভারতে কেরোসিন

কেরোসিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু লবণের সহিত ইহার কোন প্রকার সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর বলিয়া অনেকে মনে করেন। কারণ, অধিকাংশ কেরোসিন-খনির সান্নিধ্যে লবণ অথবা লবণাক্ত জল প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কর্দ্দমস্তরক্রোড়ে বালুকাপ্রস্তর (Sandstone) অথবা অন্য কোন আল্‌গা পাতরের মধ্যে কেরোসিন সঞ্চিত হয়। কর্দ্দমস্তর উহার বহির্গমনের পথ প্রতিরোধ করে। ঘটনাক্রমে কর্দ্দমস্তরের কোন অংশ ফাটিয়া গেলে উক্ত ছিদ্রপথ দিয়া তৈল চোঁয়াইয়া উপরে আইসে।

উহাকে স্বাভাবিক তৈল-ঝরণা বলে। কখন কখন গহ্বরে বাষ্পের মাত্রা এত অধিক হয় যে, তাহার চাপে তৈল ফোয়ারার ন্যায় উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু সাধারণতঃ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া নল চালাইয়া কেরোসিন পাম্প করিয়া উপরে তুলা হয়।

প্রাচ্যে কেরোসিনের খনিসমূহ হিমালয় পর্ব্বতমালাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকে বিস্তৃত। পূর্ব্বে আসাম, আরাকান, ব্রহ্মদেশ দিয়া খনিশ্রেণী সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বোর্নিও পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং পশ্চিমে পঞ্চনদ ও বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পারস্য পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। প্রকৃত ভারতখণ্ডে তেমন বড় কেরোসিন-উৎপাদন কেন্দ্র নাই" বলিলেও চলে। কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যে ব্রহ্মদেশ কেরোসিনের একটি প্রধান আকর। ভারতের মধ্যে যে সমুদায় স্থানে আজ পর্য্যন্ত কেরোসিন দৃষ্ট হইয়াছে,তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলি বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়:—পঞ্চনদে সাপুর, ঝিলম, বন্নু ও কোহাট জিলা; উত্তরপশ্চিম সীমান্তে হাজারা; যুক্তপ্রদেশে কুমাউন; বেলুচিস্থান, খোটান ও মোগলকোট এবং আসামে দিহিং ও দিশাঙ্গের নিকটবর্ত্তী অংশ। ব্রহ্মদেশের খনিসমূহের উৎপাদনের অনুপাতে এই সমুদায় খনির তৈল নিতান্তই সামান্য; তাহা নিম্ন-প্রদত্ত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ভারত সাম্রাজ্যে উৎপন্ন কেরোসিনের হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে: -

	তৈলের পরিমাণ মণ হিঃ	মূল্য টাকা হিঃ
ব্রহ্মদেশ	৩,৩৩,৫৪,৩১৯	১,৬২,১৬,৯২০৲
আসাম	১৩,৭৪,৯৫৬	৬,৮৬,৫০৫৲
পঞ্চনদ	৯৩,৮৫১	৭৫,১৩৫৲
মোট	৩,৫৮,২৩,১২৬	১,৬৯,৭৮,৫৬০৲

১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্রহ্মদেশে তৈল উৎপাদনের মাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু আসামে ও পঞ্চনদে নানা কারণবশতঃ সেরূপ কিছুই হয় নাই। আসামে চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতে পারে; সে কথা কিন্তু পঞ্চনদ ও বেলুচিস্থানের পক্ষে খাটে না। এতদুভয় প্রদেশে খনিসমূহের অবস্থান ও প্রকৃতিই অধিক তৈল উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়।

ব্রহ্মদেশের তৈলক্ষেত্র

পেট্রোলিয়মকে স্থানে স্থানে সাধারণ ভাষায় মেটেতৈল বলে। ব্রহ্মদেশে মেটেতৈল বহুকাল হইতে পরিচিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ব্রহ্মবাসীরা মেটেতৈল সংগ্রহ করিত। ত্বিগ্গাজাতি এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষ; এবং এ পর্য্যন্তও তাহারা সামান্য কপিকল ও বাল্তীর সাহায্যে তৈল উত্তোলন করে। কিন্তু এখন তাহারা উক্ত তৈল লইয়া নিজেরা ব্যবসায় না করিয়া শোধনকারী কোম্পানীগণকে বিক্রয় করে। ব্রহ্মের তৈলক্ষেত্র প্রধানতঃ ৮টি; তন্মধ্যে যেনঙ্গ ক্ষেত্রই উৎপাদনের হিসাবে শ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি সিঙ্গুক্ষেত্রেও ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে তৈল উৎপাদিত হইতেছে। যেনঙ্গের বন্দর নংঘলা ইরাবতীর তটেই অবস্থিত এবং এই স্থানেই প্রসিদ্ধ বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর (B. O. C.) আফিস ও তৈল উত্তোলনের কল-কারখানাদি রহিয়াছে। নংঘলা হইতে প্রায় ২ শত মাইল নলপথ দিয়া উত্তোলিত অপরিষ্কৃত তৈল রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়া সিরিয়ম নামক স্থানে সঞ্চিত হয়। তথায় নানা প্রণালীতে পরিষ্কৃত ও শোধিত হইয়া উহা কেরোসিন, পেট্রোল, বাতি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। নংঘলা হইতে কিছু দূর উপরে উঠিলেই চারিদিকে মৃত্তিকা-খননের ও তৈল উত্তোলনের নানা প্রকার কল-কব্জা নয়নগোচর হয়। তন্মধ্যে Dewick নামক সু-উচ্চ যন্ত্রই বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খনিজ তৈলশিল্পে বহু কোটি টাকা মূলধন নিযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে ভারতবাসীর টাকা নিতান্ত কম। বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীই এ ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন British Burma Petroleum, Rangoon Oil Co. Twinga Oil Co. প্রভৃতিও কতকগুলি ক্ষেত্রের অধিকারী। তৈল উৎপাদনের অনেক যন্ত্রই মার্কিণ হইতে আমদানী হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে মার্কিণী মজুরও (driller) অনেক আসিয়াছে। এই বিশাল তৈলশিল্পের তত্ত্বাবধানের জন্য ব্রহ্ম সরকারের তরফ হইতে এক জন কর্ম্মচারী যেনঙ্গে থাকেন। তাঁহার পদবী Warden। তাঁহার নিকটই তৈলক্ষেত্রসম্বন্ধীয় যাবতীয় মামলার বিচার হয়।

খনিজ তৈলের ব্যবহার

মেটেতৈলে নানা প্রকার উপাদান আছে; সেগুলির

অধিকাংশই হাইড্রো কার্ব্বন (Hydro carbon) শ্রেণীর। কিন্তু সব খনির তৈল সমান নহে। প্রথম উত্তোলিত তৈলের রং রক্ত, পীত, ধূসর, কৃষ্ণ অথবা শ্বেত হইতে পারে। অপরিষ্কৃত মেটেতৈল কেবলমাত্র গ্যাস প্রস্তুতে, নিকৃষ্ট জ্বালানীরূপে অথবা কীটনাশক মিশ্রণে ব্যবহৃত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অন্যরূপে ব্যবহার করিতে গেলেই ইহাকে পরিষ্কৃত করা প্রয়োজন। চোলাই দ্বারা তৈল পরিষ্কৃত হয়, কিন্তু শোধিত হয় না। শোধন করিবার জন্য গন্ধকাম্ল, সোডা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত তৈল চোলাই করিলে তাপের পরিমাণ অনুসারে নানা শ্রেণীর দ্রব্য বাহির হইয়া আইসে। যে তাপে কেরোসিন চোলাই হয়, তদপেক্ষা কম তাপে যে শ্রেণীর দ্রব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে বেনজিন্ (Benzene) অন্যতম। চর্ব্বি, উদ্ভিজ্জ তৈল, বার্নিস, রং ইত্যাদি গলাইতে এবং গ্যাস ও মোটর-এঞ্জিন প্রভৃতি চালাইতে এই সমুদায় দ্রব্য প্রয়োজন হয়। উচ্চ তাপে প্রাপ্ত পদার্থ প্রধানতঃ কল মসৃণ করিতে লাগে এবং সর্ব্বোচ্চ তাপে যে সমুদায় জিনিষ পাওয়া যায়, সেগুলিকে আবার কঠিন করিয়া ভ্যাসেলিন (Vaseline), প্যারাফিন্ (Paraffin) প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বস্তুতঃ খনি হইতে প্রাপ্ত মেটেতৈল হইতে কেরোসিন বাদে অন্যূন ১০ প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে ও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য, এত প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে সেইরূপ সাজসরঞ্জাম থাকা প্রয়োজন এবং তাহাতে বিপুল মূলধন নিয়োগও দরকার। আপাততঃ এতদ্দেশে যে কয়েকটি কোম্পানী খনিজ তৈলের কাযে লিপ্ত আছেন, তন্মধ্যে কেবল বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর সুবৃহৎ কারখানায় উক্ত কয়েক শ্রেণীর দ্রব্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে।

কেরোসিন ব্যবসায়

কেরোসিনের ব্যবহার অতি অল্পসময়ের মধ্যে যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, অন্য কোন দ্রব্য সম্বন্ধে সেরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণ ইহার নাম জানিত না। ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক বড়লোকের বাড়ীতে নারিকেল অথবা রেড়ীর তৈলের আলো জ্বলিত। এখন কিন্তু সুদূর পল্লীগ্রামেও প্রদীপ ও উদ্ভিজ্জ তৈলের চলন একরকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। কেরোসিন জ্বালাইবার উপযোগী নানা প্রকার সুলভ তৈলাধার বাজারে সহজে পাওয়া যায় বলিয়াও কেরোসিনের প্রসার অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতে যে পরিমাণ কেরোসিন উৎপাদিত হয়, তাহা পৃথিবীর উৎপাদনের তুলনায় শতকরা তিন ভাগও নহে। সুতরাং দেশীয় তৈলে দেশের অভাবমোচন হয় না। বিদেশ হইতেও বহু পরিমাণে তৈল আমদানী হয়। আমরা পূর্ব্বে ভারতোৎপাদিত তৈলের একটি হিসাব দিয়াছি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত উৎপাদনের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃদ্ধির হার সামান্য। পূর্ব্বোক্ত হিসাবের সহিত নিম্নোদ্ধৃত ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের খনিজ তৈল আমদানী-রপ্তানীর হিসাব তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশে যত টাকার কেরোসিন উৎপাদিত হয়, তাহার তিন গুণেরও অধিক মূল্যের তৈল বিদেশ হইতে আইসে ;—

আমদানী

আলোকের তৈল	৩,৩৭,৯০,১৬৬৲
ইন্ধনতৈল	১,৩৩,৯১,৪৫৪৲
অন্যান্য প্রকার তৈল	১,৯৭,৪১,৩৫৭৲
মোট	৬,৬৯,২২,৯৭৭৲

রপ্তানী

বেনজিন, পেট্রোল ইঃ	২,২২,৬২,৮৮২৲
অন্যান্য প্রকার	১,৮৮,৫৯৩৲
মোট	২,২৪,৫১,৪৭৫৲

এ স্থলে দুইটি বিষয় বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য :—প্রথম, বিদেশীয় কেরোসিনের আমদানী বাঙ্গালায়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ; তন্নিম্নে বোম্বাই। অন্যান্য প্রদেশে কেরোসিনের কাটতি অপেক্ষাকৃত কম। দ্বিতীয়, ভারত হইতে কেরোসিন রপ্তানী হয় না ; কিন্তু অন্যান্য প্রকারের খনিজ তৈলের রপ্তানী নিতান্ত সামান্য নহে। অবশ্য, পেট্রোল শ্রেণীর দ্রব্যই রপ্তানীর প্রধান মাল এবং বৃটেনের যুক্তরাজ্যই উহার প্রধান গন্তব্য স্থল। অধিকাংশ রপ্তানীর মাল রেঙ্গুন বন্দর হইতে চালান যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতোৎপাদিত অথবা বিদেশ হইতে আমদানী, উভয় প্রকার মোটর-চালান তৈলের (Motor spirit) উপর গ্যালন প্রতি ।৶০ আনা হিসাবে শুল্ক বসান হইয়াছে।

পেট্রোলিয়ম-জাত দ্রব্যাদির মধ্যে কেরোসিনই প্রধান; এবং কেরোসিনের প্রধান ব্যবহার গৃহ প্রভৃতি আলোকিত করায়। কিন্তু কেরোসিন যেরূপ উদ্ভিজ্জ তৈলাদির স্থান অধিকার করিয়াছে, সেইরূপ ইহার স্থানও ক্রমশঃ বৈদ্যুতিক ও গ্যাসের আলোক দ্বারা অধিকৃত হইতেছে। গৃহাদি আলোকিত করিবার জন্য কেরোসিনের ব্যবহার যতই কমিয়া আসুক না কেন, তাহাতে পেট্রোলিয়ম ব্যবসায়ের যে কোন ক্ষতি হইবে না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ইন্ধন-তৈলের (Fuel oil) চাহিদা মোটর-গাড়ী, সমুদ্রপোত, বহুবিধ শিল্পের কল প্রভৃতির বৃদ্ধির সহিত দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। অনেক স্থলেই ইহার বিশেষ গুণাবলীর জন্য ইহা কয়লার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতেছে এবং অধুনা তরল ইন্ধন ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকার বিশেষ শ্রেণীর এঞ্জিনও প্রস্তুত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে ইহা সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, জগতে পেট্রোলিয়ম ব্যবসায়ের উন্নতি ভিন্ন কখনও অবনতি হইবে না। ভারত-সাম্রাজ্যের পেট্রোলিয়ম খনিসমূহের সদ্ব্যবহারের বর্ত্তমানের ন্যায় শুভ অবসর বোধ হয় আর কখনও হইবে না। এই সময়ে দেশীয় ধনী ও অভিজ্ঞগণ সমবেত হইয়া যদি মেটে-তৈল সমধিক পরিমাণে উৎপাদনের প্রয়াস করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই যে শুধু লাভবান্ হইবেন, তাহা নহে, পরন্তু দেশে তদ্দারা অনেক প্রকার নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার পথও সুগম হইবে।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সংস্কৃত কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক স্বর্গীয় পণ্ডিত তারানাথ তর্ক-বাচস্পতি মহাশয়ের দৌহিত্র
ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ এফ, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)
ইনি কাশ্মীর-মহারাজ কর্ত্তৃক তদীয় রাজসভার রাজজ্যোতিষী নিযুক্ত হইয়াছেন।

এড়িনবরো ও নৌবহর

২

এডিনবরোয় আমরা দ্বিতীয় দিন প্রাতে উঠিয়া দেখি-লাম, আকাশ মেঘশূন্য—কুজ্ঝটিকাও নাই। দেখিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িবার আয়োজন করিলাম। প্রাতরাশ শেষ করিয়া আমি যখন বাহিরে যাইতেছি, তখন মিষ্টার ক্লেটন বলিয়া দিলেন, "শীঘ্র ফিরিবেন—বেলা ৯টার সময় লর্ড প্রোভোষ্ট (কর্পোরেশনের কর্ত্তা) আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।"

প্রিন্সেস ষ্ট্রীট।

আমি বাহির হইয়া প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে পড়িলাম। এডিন-বরো সহরটি মনোরম; য়ুরোপের নানাদেশের রাজধানীর মধ্যে যে সব সহরের সৌন্দর্য্যখ্যাতি আছে—এডিনবরো সে সকলের অন্যতম। এ সহরের গৃহাদির সৌন্দর্য্যও সর্ব্বজন-বিদিত। সহরের রাজপথের মধ্যে কাষ্ঠাচ্ছাদিত প্রিন্সেস ষ্ট্রীট সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। রাস্তার ধারে বড় বড় দোকান আছে; আর এই রাস্তারই এক স্থানে উদ্যানমধ্যে স্কটের স্মৃতি-মন্দির। আমি প্রথমেই সেই মন্দিরে যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক স্কটের মর্ম্মর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। ঐতি-হাসিক উপন্যাসে আজও কেহ স্কটের আসনসান্নিধ্যে গমন করিতে পারেন নাই। তিনি যেন তাঁহার উপন্যাসে স্কট-লণ্ডের ইতিহাসের শুষ্কঅস্থি জীবনে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিতায় যে স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পরিস্ফুট, তাহাও অসাধারণ। এডিনবরো তাঁহার স্মৃতিপূত—তাঁহার রচনার সাহিত্যসৌরভে আমোদিত। এডিনবরোয় অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। বার্ণস, ডেভিড হিউম, ডগলাস ষ্টুয়ার্ট, পিট প্রভৃতির স্মৃতি এডিনবরোয় রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহাতে সহরের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এডিনবরোর লোক বলে, প্রিন্সেস ষ্ট্রীটের শোভা—সজীব কুসুমে অর্থাৎ এডিনবরোর সুন্দরীসমাগমে। এডিনবরোর আবহাওয়ায় বর্ণের কমনীয়তা সুরক্ষিত থাকে; সহরে সুন্দরীরও অভাব নাই। যুবতীরা সুবেশে সজ্জিত হইয়া এই রাজপথে ভ্রমণে বাহির হয়। বলা বাহুল্য, তখন পথে লোকেরও অভাব হয় না। কেহ আইসে রূপ দেখাইতে—কেহ সমাগত হয় রূপ দেখিতে।

প্রিন্সেস ষ্ট্রীটে খানিকটা ঘুরিয়া ৯টার পূর্ব্বেই হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। হোটেলে ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় সম্মুখে রাজপথে কলরব শুনিতে পাইলাম; চাহিয়া দেখিলাম, লর্ড প্রোভোষ্ট গাড়ী হইতে নামিতেছেন—সঙ্গে কয় জন "সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট" ও প্রহরী। আমরা সকলে আসিয়া হোটেলের বসিবার ঘরে সমবেত হইলাম। আমাদের সঙ্গে লর্ড প্রোভোষ্টের ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। লর্ড প্রোভোষ্ট আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফটো তুলিলেন এবং বলিয়া গেলেন, আমাদিগকে সহর দেখাইয়া আনিবার সব ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন। আমরা ফিরিয়া আসিলে তিনি আসিয়া আমাদের সহিত এক সঙ্গে আহার করিবেন। তখনই আমরা জানিতে পারিলাম, তিনি আমাদের পক্ষ হইতে সেই দিন অপরাহ্নে আমাদের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে চা পানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। কথায় কথায় লর্ড প্রোভোষ্ট আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা ইংরাজী দ্রুত কহিতে পারি কেন? আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমরা মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করি।" তাহার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত বয়সে আপনি স্কটের উপন্যাস ও কবিতা সব পাঠ করিয়াছিলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "তখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে।"

লর্ড প্রোভোষ্ট ও ভারতীয় সম্পাদকগণ।

আমি বলিলাম, "তাহার অনেক পূর্ব্বে আমি সে সব পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।"—বলিয়া আমি স্কটের কয়টি কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলাম, "এই সব পড়িতে পড়িতে বাল্য-কালে যে স্কটলণ্ডের স্বপ্ন দেখিতাম—আজ সেই স্কটলণ্ডে আসিয়াছি।"

লর্ড প্রোভোষ্ট চলিয়া গেলে আমরা কর্পোরেশনের মোটর-যানে সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

সহরের নানা রাস্তা—বিদ্যালয় প্রভৃতি দেখিয়া আমরা দেখিয়া যুদ্ধার্থ সমবেত হইত। কাসলের পরিদর্শক সার্জেণ্ট মেকেঞ্জী আমাদিগকে কাসল দেখাইলেন।

কাসল হইতে আমরা হলিরুড প্রাসাদ দেখিতে গমন করিলাম। এই অতি পুরাতন প্রাসাদ স্কটলণ্ডের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে একটি ভজনালয় নির্ম্মিত হয়। তাহার পর চতুর্থ ও পঞ্চম জেমস এই স্থানে প্রাসাদ রচনা করেন। এই প্রাসাদ যেমন স্কটলণ্ডের রাজারাণীর স্মৃতি বক্ষে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তেমনই

কাসল হইতে সহরের দৃশ্য

কাসলে উপনীত হইলাম। এই গৃহ স্বাধীন স্কটলণ্ডের নৃপতিদিগের স্মৃতিমণ্ডিত এবং ইহারই একটি কক্ষে ষষ্ঠ জেমস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই পরে প্রথম জেমস-রূপে ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কাসলের ছাতের আলিসায় মশাল বসাইবার ছিদ্র আছে। বিপদ ঘটিলে সেই সব স্থানে নিশাকালে প্রজ্বলিত মশাল বসাইয়া দেওয়া হইত—দূর দূরান্তর হইতে লোক সেই আলো

আবার ইহার ভূমি নিহত ব্যক্তির রক্তে রঞ্জিত এবং ইহার অঙ্গে ইংরাজের অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। রবার্ট ব্রুস ও এডওয়ার্ড বেলিয়ল উভয়েই এই প্রাসাদে পার্লামেণ্টের অধিবেশন করাইয়াছিলেন। পঞ্চম জেমস যে নূতন গৃহ নির্ম্মিত করেন, তাহা তাঁহার দুহিতার অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী তাঁহার পুত্রের জন্ম বালিকা মেরীর কর প্রার্থনা করিয়া

স্কটলণ্ডে সৈন্য পাঠাইলে যে যুদ্ধ হয়, তাহার পর এই প্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়। ২২ বৎসর পরে এই প্রাসাদের ভজনালয়ে মেরী বিধবার বেশে লর্ড ডার্ণলীকে বিবাহ করেন এবং আপনার দুর্ভাগ্য যেন ডাকিয়া আনেন। ইংরাজরা একাধিকবার এই প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং ক্রমওয়েলের শাসনকালে অগ্নিযোগে ইহার একাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। ইংলণ্ডের হতভাগ্য রাজা প্রথম চার্লস প্রজার দ্বারা নিহত হইবার পূর্ব্বে আসিয়া এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াও তাঁহার স্বামীর সহিত আসিয়া কয়বার এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন।

এডিনবরোয় বাস অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়া বহু ভারতীয় ছাত্র— বিশেষ চিকিৎসাবিদ্যার্থীরা—এই সহরে বাস করে। আমার অনুরোধে আমাদিগকে এডিনবরোর সর্ব্বাপেক্ষা বড় চিকিৎসাবিদ্যালয়টি দেখাইয়া আনা হইল।

আমি সন্ধান লইয়া জানিলাম, যুদ্ধের পূর্ব্বে এক জন ছাত্র একটু কষ্ট স্বীকার করিলে মাসিক ৭৫ টাকা ব্যয়ে এডিনবরোয় থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন-ব্যবস্থা করিতে পারিত। লণ্ডনে ব্যয় ইহার প্রায় দ্বিগুণ;—তাহাতেও কুলায় না।

হলিরুড প্রাসাদের সিংহদ্বার।

হোটেলে আসিয়া আমরা আহারের জন্য প্রস্তুত হইলাম। লর্ড প্রোভোষ্ট ও সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট কয়জন যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হইলে আমরা একটি স্বতন্ত্র ভোজনাগারে আহার করিতে বসিলাম। আহারের পর লর্ড প্রোভোষ্ট উঠিয়া আমাদের সংবর্দ্ধনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তখন ইংরাজের মুখে ভারতবাসীর প্রশংসা আর ধরে না; এডিনবরোর লর্ড প্রোভোষ্ট তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন—যুদ্ধের সময় ভারতবাসীরা ইংলণ্ডকে কত সাহায্য করিয়াছে, তাহা বলিলেন।

এই বক্তৃতার উত্তর দিতে উঠিয়া আমি, এডিনবরোর অতিথিসৎকারের প্রশংসা করিলাম এবং সেই সুযোগে স্কটলণ্ডের পূর্ব্বকথার উত্থাপন করিয়া স্কটের কবিতা হইতে নানা বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম। বাস্তবিক, স্কটলণ্ডের সৌন্দর্য্য স্কট যেমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তেমন বুঝি আর কেহ করিতে পারেন নাই। সে সব বর্ণনা বাল্যকালে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিগত হইয়া ছিল। উপসংহারে আমি বলিলাম, লর্ড প্রোভোষ্ট বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে সর্ব্বপ্রযত্নে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু আজ কি ভারতবাসী এমন আশা করিতে পারে না যে, যুদ্ধের পর সে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়া—আপনার ললাট হইতে দাসত্বের কলঙ্কচিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যে অন্যান্য অধিবাসীর সহিত তুল্যাধিকারে অধিকারী হইবে? স্কটের সাহিত্য-প্রতিভার লীলাভূমি এডিনবরোয় দাঁড়াইয়া আজ স্বদেশ সম্বন্ধে স্কটের উক্তি আমার মনে পড়িতেছে:—
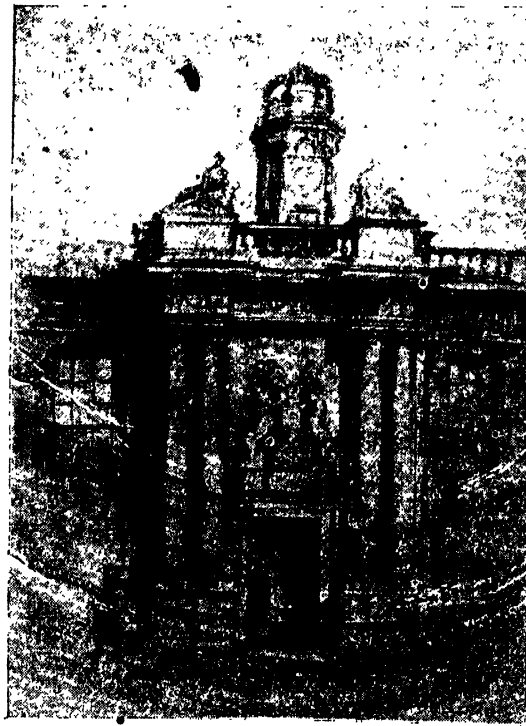
"Breathes there a man
with soul so dead,
Who never to himself
hath said,
This is my own,
my native land!"

[আছে কি অবনীমাঝে হেন কোন নর
কভু নাহি ভাবিয়াছে যাহার অন্তর—
এই মোর মাতৃভূমি—আমার স্বদেশ ?]

পরাধীন জাতি মাতৃভূমিকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেও পারে না। যাহাতে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে স্বদেশ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি, যুদ্ধে জয়ী হইবার পর সে বিষয়ে স্কটলণ্ড কি আমাদিগকে সাহায্য করিবেন?

বক্তৃতার পর লর্ড প্রোভোষ্ট আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার সকালের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন ভাল।"—তিনি স্কটের রচনা হইতে উদ্ধৃত অংশগুলির কথা বলিলেন। তাহার পর তিনি ভারতের রাজনীতিক কথার আলোচনা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমরা অতি অল্প উপকার পাইলেই কৃতজ্ঞ—ডেভিড হেয়ার আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, এলেন অক্টেভিয়ান হিউম আমাদের জাতীয় মহাসমিতির সংস্থাপক—আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা উভয়কেই একান্ত আপনার জন মনে করিয়া শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। কিন্তু অধিকাংশ ইংরাজই উদ্ধত ব্যবহার করেন এবং দেশের লোককে দেশশাসনের ভার দিতে অসম্মত। কাযেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বিবর্দ্ধিত হইতেছে। তথাপি জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় দেশের লোক ইংরাজকে যে সাহায্য করিয়াছে তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, দেশবাসী ইংরাজের সহিত সদ্ভাবে থাকিতে চাহে। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশসমূহে ভারতবাসী যেরূপ লাঞ্ছিত হয়, তাহাতে আর কত দিন ভারতবাসী মনে সেরূপ ভাব পোষণ করিতে পারিবে, তাহা বলা দুষ্কর।

এইরূপ আলোচনার পর লর্ড প্রোভোষ্ট বিদায় লইলেন। তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমরা মোটরে ৪০ মাইল ঘুরিয়া ও পথে "লিনলিথগো কাসল" নামক লর্ড হোপটাউনের গৃহ দেখিয়া ভারতীয় ছাত্রদিগের সম্মিলনে যাইব। তথায় আমরা চা পান করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিব এবং তাহার পর সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার সময় ট্রেণে গ্লাসগো যাত্রা করিব। কাযেই লর্ড প্রোভোষ্টের সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি এডিনবরো কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে আমাদিগকে পুনরায় অভিনন্দিত করিয়া সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত চলিয়া গেলেন।

আমরাও যাত্রার আয়োজন করিলাম।

আমাদিগকে লইয়া কর্পোরেশনের মোটর যানগুলি সহরের নানা স্থানের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া লিনলিথগো কাসলের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

লিনলিথগো কাসল দেখিয়া বিলাতের ধনীদিগের বিলাসবাসের ধারণা করা যায়। গৃহটি বিরাট—সুসজ্জিত; কিন্তু তদপেক্ষাও বিশাল ইহার প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বলিলে, বোধ হয়, কথাটা সুপ্রযুক্ত হয় না। বরং গৃহসংলগ্ন ভূমি বলিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। এই ভূমিতে ছোট ছোট গ্রাম আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সে সব গৃহসংলগ্ন বলিয়া পরিগণিত। শীকারের পাখী আসিয়া বাসা বান্ধিবে বলিয়া এই ভূমিখণ্ডে বাগানও রাখা হয়। সেই বাগানে গৃহস্বামী বন্ধুবান্ধব সহ আসিয়া সময় সময় ফেজাণ্ট প্রভৃতি পাখী শীকার করেন। প্রজাদিগের জন্য বিদ্যালয়াদির ব্যবস্থাও থাকে; অনেক স্থলে স্বতন্ত্র একটি গির্জ্জাও দেখা যায়। গৃহস্বামী এই বিরাট সম্পত্তি উপভোগ করেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "প্রতি ইঞ্চ সম্ভোগ করা" তাহাই করেন। অর্থাৎ ইহার প্রতি সূচ্যগ্র ভূমি তাঁহাদের বিলাসভোগের উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ জাতি

হলিরুড প্রাসাদ।

যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে জানে, তেমনই অর্থ ব্যয় করিয়া জীবনে আরাম উপভোগ করিতে জানে। আমরা বলি, ইহকালটা কিছুই নহে—তাই সে দিকে বড় মনোযোগদান করি না। কিন্তু তাহারই ফলে যে আমরা ইহকালে পদে পদে পরাভূত হই না, তাহা কে বলিবে?

ওমর খৈয়াম বলিয়াছেন—

"নগদ যা' কিছু পাও তাই সুখে লয়ে যাও
ধারে কাম বৃথা ব'লে গণি।"

ইহকাল পরকালের তুলনায় সমালোচনা করিয়া আপনি বিব্রত হইতে ও পাঠককে বিব্রত করিতে চাহি না। কিন্তু এ জগতে বাস করিতে হইলে এবং ইহাতে ব্যক্তি হিসাবে বা জাতি হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে ইহকালকে উড়াইয়া দেওয়া যে যায় না, তাহা আমরা পদে পদে হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। তবে হয় ত একেবারে ইহ-কাল-সর্ব্বস্ব হওয়াও যেমন—একেবারে পরকাল-সর্ব্বস্ব হওয়াও তেমনই অনেক স্থানে অসুবিধার জনক হয়—উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারিলে কল্যাণ সাধিত হয়।

লিনলিথগো কাসল দেখিয়া আমরা ভারতীয় ছাত্র-দিগের মজলিসে উপস্থিত হইলাম। বিদেশে এক স্থানে এত স্বদেশীয় সমাগমে মনে বড় আনন্দ অনুভব করিলাম। তাঁহারা সাদরে আমাদিগকে কক্ষমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় তাঁহাদিগের কয় জন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমরা আসন গ্রহণ করিবার পরই "বন্দে মাতরম্" গীত হইল। আমরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতৃনামকীর্ত্তন শ্রবণ করিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের এই গান আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। দেখিয়া পুলকিত হইলাম, ভারতের সকল প্রদেশের ছাত্ররা সাগ্রহে সঙ্গীতে যোগ দিলেন। মনে পড়িল, বহুদিন পূর্ব্বে—তখনও "বন্দে মাতরম" ভারতের সর্ব্বত্র এমন সুপরিচিত হয় নাই—কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে এই সঙ্গীত শুনিয়া এক জন প্রৌঢ় মদ্রদেশবাসীর চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিয়াছিল।

গান শেষ হইলে ছাত্রদিগের পক্ষে এক জন আমাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, তাহাতে ভারতে নবভাব প্রকাশের কথা উক্ত হইল এবং বলা হইল, ভারতবর্ষ যাহাতে শীঘ্র স্বরাজ লাভ করে, সে জন্য চেষ্টা করা ভারতবাসী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

তাহার পর আমরা উত্তর দিব। সর্ব্বপ্রথমে আয়াঙ্গার মহাশয় বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন, স্বরাজে আমাদের জন্মগত অধিকার; তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহার বক্তৃতায় ছাত্ররা পুনঃ পুনঃ করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, য়ুরোপীয় অধ্যাপক-দ্বয়ও তাঁহাদের সেই ভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। আয়াঙ্গার মহাশয় উপবেশন করিলে মৌলবী সাহেব উঠিয়া কেবল মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে ছাত্রদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তাহার পর দেবধর বক্তৃতা করিলেন। তিনি পাকা মডারেট—তাঁহার বিশ্বাস, ভারতবর্ষ এখনও স্বরাজলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করে নাই—এখন আমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। তিনি সেই ভাবের কথা বলিতেই ছাত্রদিগের মধ্যে বিরক্তির চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। তবে ভদ্রতার অনুরোধে কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না। সর্ব্বশেষে আমার বক্তৃতার পালা। আমি প্রথমেই বলিলাম, ভারতে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে—ভারতে যে নানা ধর্ম্ম আছে, এই নূতন ধর্ম্ম সে সকল অপেক্ষাও প্রবল—সেই নূতন ধর্ম্ম মাতৃসেবার ধর্ম্ম—দেশ-সেবার ধর্ম্ম। আমরা হিন্দু, মুসলমান, জৈন, অগ্নির উপাসক—সকলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা সেই ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি—আমরা স্বরাজলাভের জন্য চেষ্টা করিব। আমাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে না। ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে—সে যুগ মুক্তির যুগ।

ভারতীয় ছাত্ররা এই উক্তিতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। উপসংহারে আমি যখন বলিলাম, আমাদের জয়যাত্রায় কেহ বাধা দিতে পারিবে না—আমরা মাতৃ-নামে হৃদয়ে নূতন শক্তি লাভ করিব—"বন্দে মাতরম্।" তখন ঘন ঘন "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে সম্মিলনকক্ষ মুখরিত হইল।

তাহার পর মিষ্টার ক্রেটন ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার প্রস্তাব করিলে ছাত্ররা বলিলেন, "এই সম্মিলনে সে সঙ্গীত গাহিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।" ক্রেটন বলিলেন, "আপনারা আমাকে আপনাদের জাতীয় সঙ্গীত পান করাইয়াছেন। ভারতীয় সম্পাদকরা রাজার অতিথি

আমরা রাজার কর্ম্মচারী, সকলেই রাজার প্রজা—এ অবস্থায় ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীত—'রাজারে তার গো, চিরায়ু কর গো'—গাহিতে আপত্তি কি?" এক জন ছাত্র উত্তর করিলেন, "আপত্তি না থাকিলেই যে কোন কায করিতেই হয়, এমন নহে। আমাদের এ সভায় কোন দিন ইংরাজের জাতীয় সঙ্গীত গীত হয় নাই; সুতরাং আমরাও তাহা গাহিব না। আপনারা অতিথিমাত্র—অতিথিরা কখন গৃহস্থকে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ করিতে পারেন না।" ক্রেটন প্রভৃতির মুখ গম্ভীর হইল। এক জন ছাত্র আমাকে বলিলেন, "এই জন্যই গত রাত্রিতে বলিয়া আসিয়াছিলাম, ইঁহাদের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইব।"

চা-পানের পর আমরা বিদায় লইলাম। ছাত্ররা আমাদিগকে মোটর যানে তুলিয়া দিয়া পুনরায় "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিলেন—আমরাও তাহাতে যোগ দিলাম।

তথা হইতে হোটেলে ফিরিয়া সাড়ে ৬টার সময় আমরা এডিনবরো ত্যাগ করিয়া গ্লাসগো যাত্রা করিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

যৌবন-প্রশস্তি

বিশ্বের যত মাধুরী আহরি' করি তায় সুধাবৃষ্টি,
যৌবন, তোমা রচিল বিধাতা, তুমি তাঁর সেরা সৃষ্টি।
কুৎসিতে তুমি কর অপরূপ, কর্কশে কর কান্ত,
তব আতিথ্যে 'পাথেয়বস্ত' মানসসরের পান্থ।
তোমা লাগি ফুটে নীলাকাশে তারা, কাননে কুসুমপুঞ্জ,
ঝুলন দোলায় রভসলীলায় তব রসে ভরে কুঞ্জ।
তুমি আছ বলি' বিশ্ব পুলকি' এত রূপ, রস, গন্ধ,
গৃহে গৃহে ছুটে তোমার লাগিয়া উৎসবে প্রেমানন্দ।
তুমি ভোগী, সুখসম্পদে ভরা ধরণী তোমার ভোগ্য,
ষোড়শোপচারে বিশ্ব রচিত হইতে তোমারি যোগ্য।
ভাবরস ধরে মোহনমূর্ত্তি তোমার ধ্যেয়ান নেত্রে,
রূপলক্ষ্মী কমলাত্মিকা তোমার মানস ক্ষেত্রে।
"আপন মনের মাধুরী মিলায়ে" করেছ সৃষ্টি-রম্য
প্রেমদ্যুলোকের অ-লোক সুষমা তোমারি দৃষ্টিগম্য।
কল্পনা তব জলধনুময়ী অপরূপ সাত বর্ণে,
অঙ্গুলি তব মৃৎপ্রস্তরে পরিণত করে স্বর্ণে।
রাগিণীরা রচে মুখর কুলায় তোমার ললিত কণ্ঠে,
সুরবর্ষিণী তুলিকা তোমার রঞ্জনসুধা বণ্টে।

তুমি বীর, দেশমাতার লাগিয়া কর প্রাণ উৎসর্গ,
রক্তসিন্ধু সন্তরি' তুমি লাভ কর অপবর্গ,
তব মুখে প্রাণ-মারুতে ধ্বনিত যুগে যুগে জয়শঙ্খ,
সপ্তরথীতে বেষ্টিত ব্যূহে পশ' তুমি নিঃশঙ্ক।
তুমি ত্যাগী, তুমি অর্পিতে পারো হৃদয়ের তাজা রক্ত,
বরণ করেছ জনকের জরা, সম্ভোগে অনাসক্ত।
পালিয়াছ ব্রত চিরকৌমার, ত্যেজেছ যৌবরাজ্য,
পিতৃসত্য পালিতে তোমার বনবাস পরিগ্রাহ্য।
দেছ আপনারে গরুড়ের মুখে ক্ষুদ্র নাগের জন্য,
জীবহিত লাগি তব তপস্যা ত্রিলোকে ধন্য ধন্য।
সোঽহং মন্ত্র প্রচারিতে তুমি ধরিয়াছ চীরদণ্ড,
হরিপ্রেমে তুমি সার করিয়াছ শুধু অধোবাসখণ্ড।
কবি তুমি, তব সকল উক্তি ঝঙ্কৃত হয় ছন্দে,
নবীন মহিমা বিতরেছ তুমি রসে, রূপে, রবে, গন্ধে।
কল্পলোকের দেবদূত তুমি বার্ত্তা বহিছ নিত্য,
অসীমের পানে অমৃতের টানে ছুটে চলে তব চিত্ত।
তুমি বিধাতার সৃষ্টিধর্ম্ম লভিয়াছ, তুমি স্রষ্টা,
অমৃতের তুমি সন্ধান জান' নমি হে ত্রিলোকদ্রষ্টা।

শ্রীকালিদাস রায়।

ক্ষমা

"Non-violence."

(কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট গৃহে পঠিত)

"To Err is human, to forgive divine."—Pope.

গৌতম, অত্রি, বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাকার মহর্ষিগণ—ব্রাহ্মণের আটটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—যথা,

"শৌচমঙ্গলানায়াসা অনসূয়াহস্পৃহা দমঃ।
লক্ষণানি চ বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ॥

শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অনসূয়া, অস্পৃহা, দম বা ক্ষমা,—দান ও দয়া—এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। এই গুণগুলি কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও,—বর্ণাশ্রম-সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিমাত্রেরই এইগুলি যে অনুকরণীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই আটটির মধ্যে দম বা ক্ষমা অন্যতম। তাহার লক্ষণ বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে বাপি দুঃখে চোৎপাদিতেহপরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা॥

অত্রি ঐ লক্ষণটি যথাযথ রাখিয়া—"দম ইত্যভিধীয়তে" বলিয়াছেন। সুতরাং দম ও ক্ষমা সমানপর্য্যায় হইতেছে। উক্ত লক্ষণের অর্থ যথা—অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উৎপাদিত হইলে, যে বুদ্ধিবশতঃ ঐরূপ দুঃখদায়ক দ্রোহ বা অনিষ্টকারী ব্যক্তির উপর কোপ বা প্রতিহিংসার চেষ্টা হয় না—তাহাই দম বা ক্ষমা নামে অভিহিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও ক্ষমার অনুরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

"আক্রুষ্টোঽভিহতো বাপি নাক্রোশেৎ যো ন হন্তি বা।
বাঙ্মনঃকর্ম্মভিঃ ক্ষান্তিস্তিতিক্ষৈষা ক্ষমা স্মৃতা॥"

কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রোশ পূর্ব্বক উক্ত বা আহত হইয়া ক্রোধ বা হননেচ্ছা না করা এবং বাক্, কর্ম্ম ও মনের ক্ষান্তি—ইহাই তিতিক্ষা বা ক্ষমা নামে প্রসিদ্ধ। মহাভারতে (বনপর্ব্ব ২০৬ অধ্যায়ে) ধর্ম্মব্যাধ—তদীয় উপদেশপ্রার্থী ব্রাহ্মণ-তনয়কে বলিতেছেন—"ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ"—কেহ তোমার প্রতি পাপাচরণ বা অনিষ্টসাধন করিলে, তুমি তাহার প্রতীকারকল্পে প্রতিহিংসা করিও না। ইহাই প্রকৃত ক্ষমা। আরও মহর্ষি মার্কণ্ডের উদাহৃত পতিব্রতার উপাখ্যানে দ্বিজ কৌশিকের প্রতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দেশ-প্রসঙ্গে পতিব্রতা কহিতেছেন—(বন পঃ ২০৫ অঃ ৩৩ শ্লোক)—"হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।" প্রকৃত ব্রাহ্মণ অপর কর্ত্তৃক হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না।

মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত Non-violent non-co-operationএর দিনে দম বা ক্ষমা কি—তাহা কাহাকেও বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। প্রতিপক্ষ যখন নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন গান্ধীর মতানুবর্ত্তিগণ যে সহাস্যবদনে ঐ সকল উৎপীড়ন আলিঙ্গন করিয়া লইতেছেন,—দম বা ক্ষমার ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহাত্মা যীশুও তাঁহার শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, "Unto him that smiteth thee on the one cheek—offer also the other" (Luke. VI)—"যখন কেহ তোমার এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিবে, তখন তুমি অপর গণ্ড পাতিয়া দিও।" আমাদের পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সহিত যীশুর এই উপদেশের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। দুঃখের বিষয়—যে মহাত্মা যেশাস্ শত্রুগণের নির্দ্দম অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং উৎপীড়ক শত্রুগণকে ক্ষমা করিবার জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—আজ তাঁহারই মতাবলম্বিগণ তাঁহার শিক্ষা ও মহনীয় দৃষ্টান্ত বিস্মৃত হইয়া উৎকট গর্হিত আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থ দিব্য ক্ষমার দিক্ দিয়া না গিয়া প্রতিহিংসার নিকৃষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বিগত য়ুরোপীয় মহাসমর—যাহাতে নিখিল জগতের শান্তি নির্ব্বাসিত ও বিলুপ্ত,—তাহা বর্ত্তমান খৃষ্টীয় জগতের দারুণ প্রতিহিংসাবৃত্তির ফল। আবার যে সমরানল পুনরায় প্রধূমিত,—তাহার মূলেও খৃষ্টীয় জাতিগণের পরস্পর প্রতিহিংসা ও ক্ষমার অভাব। ভারতের বর্ত্তমান অশান্তির মূলেও ঐ একই কারণ নিহিত বলিয়া মনে হয়।

অপর দিকে শ্রীমদ্ গান্ধী ও তাঁহার শিষ্যগণ শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ক্ষমা আশ্রয় করিয়া আছেন এবং সকলকেই উহা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। যেহেতু, শাস্ত্ররূপ দৃঢ় সত্যের উপর এই নীতি সু-প্রতিষ্ঠিত, তখন ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী। যদি ইহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল হইতে সম্ভূত বা মনগড়া হইত,—তাহা হইলে এরূপ বলা চলিত না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, "বোবার শত্রু নাই।" যদি বিনা বাক্যব্যয়ে সহাস্যবদনে অত্যাচার—উৎপীড়ন সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে উৎপীড়নকারী যে আপনা হইতেই নিরস্ত হইবে। সুতরাং শ্রীমদ্ গান্ধীর অনুসৃত দম বা ক্ষমার জয় না হইয়া যায় না। শাস্ত্রের প্রতি আস্থাবান্ ব্যক্তিমাত্রেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে যে—দুর্বৃত্ত জগাই মাধাই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নির্ম্মম আঘাত করত রক্তপাত করিয়া দিলেও,—পতিতপাবন নিত্যানন্দপ্রভু ক্ষমা অবলম্বন পূর্ব্বক প্রেম প্রদর্শন করত বলিয়াছিলেন—

"তুমি মেরেছ কলসীর কাণা
তা' ব'লে কি প্রেম দিব না?"

আমাদের পৌরাণিক ও লৌকিক আদর্শ-চরিত্রমাত্রই ক্ষমাগুণে মণ্ডিত। আমরা এই সকল দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ প্রদর্শন করিব।

(১) গীতায় ক্ষমা

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্—কিরূপ গুণবিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার প্রিয়—তাহা বলিতেছেন—(১২ অঃ ১৩।১৪ শ্লোঃ)—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ 'ক্ষমী'॥"

* * * *

"ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

যে ভক্ত সর্ব্বজীবে বিদ্বেষবুদ্ধিরহিত,—যে সকলের মিত্র,—সর্ব্বভূতে অভয়দাতা,—সংসারে মমতাশূন্য, অহঙ্কারবর্জ্জিত, সুখদুঃখে সমজ্ঞান,—'ক্ষমাশীল' * * একমাত্র আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে—সেই ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয়।

পুনশ্চ ষোড়শ অধ্যায়ে—ষড়বিংশ দৈবীসম্পদের মধ্যে ক্ষমা একতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—(১৬ অঃ ১-৩ শ্লোঃ)

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি * * * * * *"

* * * * *

"তেজঃ 'ক্ষমা' ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।"

হে ভারত! যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময়ী দৈবীবাসনাবীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহাদের অভয়, চিত্তের প্রসন্নতা, * * * তেজঃ, 'ক্ষমা,' ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণসমূহ স্বতই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার মনীষিগণ 'ক্ষমা' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—'ক্ষমা' শব্দটি 'ক্ষমু সহনে' এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হওয়ায়—ইহার অর্থ সহগুণ। নীলকণ্ঠ ও শঙ্কর বলিতেছেন,—"ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বাস্তর্ব্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ।" অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট বা আক্রোশপূর্ব্বক তাড়িত হইয়াও যে অন্তঃকরণে কোনওরূপ বিকারের উৎপত্তি না হওয়া—তাহাই ক্ষমা। রামানুজ বলিতেছেন—"ক্ষমা পরনিমিত্তপীড়ানুভবেঽপি তং প্রতি চিত্তবিকাররাহিত্যম্।" অপর কর্ত্তৃক পীড়া বা দুঃখ অনুভব সত্ত্বেও উহার প্রতি চিত্তের কোনওরূপ বিকৃতির যে অভাব—তাহাই ক্ষমা। হনুমান কহিতেছেন—"ক্রোধ কারণেষু সৎস্ব চিত্তস্যাবিক্রিয়া।" ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিতেও চিত্তের যে অবিকৃতি, তাহাই ক্ষমা। শ্রীধর বলিতেছেন—"ক্ষমা পরিভবাদিষূৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ"—অপরকৃত পরিভব ও অপমানাদি উৎপন্ন হইলেও যে ক্রোধের দমন—তাহাই ক্ষমা। বলদেব বলিয়াছেন, "সত্যপি সামর্থ্যে পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ" প্রতীকারের সামর্থ্য বা শক্তি থাকিতেও—পরিভবকারীর প্রতি চিত্তে কোপের উদ্রেক না হওয়ার নামই ক্ষমা। এই উদ্ধৃত লক্ষণসমূহের মূল কথা একই। ইতঃপূর্ব্বে সংহিতাকার মহর্ষিগণ-প্রদত্ত লক্ষণ দেখিয়াছেন। এতগুলি দিগ্‌বিজয়ী মনীষী—পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের মত অবলম্বনপূর্ব্বক একবাক্যে যে ক্ষমার পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলেন,—সেই ক্ষমা কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি—এ সম্বন্ধে আর কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের শাস্ত্রপ্রতিপাদিত ক্ষমা এবং শ্রীমদ্ গান্ধিপ্রচারিত Non-violence—একই দাঁড়াইল।

(২) বুদ্ধদেব ও ক্ষমা

অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের বচনামৃতভাণ্ড 'ধম্মপদ' গ্রন্থে ক্ষমার অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থের 'যমক-বগ্‌গো' নামক প্রথম অধ্যায়ের উপদেশ যথা—

'অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
যে চ তং উপনয্‌হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি।'

অপরে আমার প্রতি আক্রোশ করিল, আমাকে প্রহার করিল,—আমায় পরাভূত করিল, আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল—এই চিন্তা যাহারা অহরহ মনে পোষণ করে—তাহাদের বৈরভাব কখনই উপশমিত হয় না।

"অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে।
তে তং ন উপনয্‌হন্তি বেরং তেসূপ সম্মতি।"

আমাকে তিরস্কার করিল, প্রহার করিল, পরাস্ত করিল ইত্যাদি চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না, তাহাদের বৈরভাব থাকিতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বোক্ত সংহিতাকারগণ-প্রদত্ত ক্ষমার লক্ষণের অনুরূপ।

'বুদ্ধবগ্‌গো' অধ্যায়ে মহাত্মা বুদ্ধ কহিতেছেন—"খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা"—ক্ষান্তি নামক তিতিক্ষাই পরম তপস্যা।

'সুখবগ্‌গো' অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটি এই—

"সুসুখং বত জীবাম বেরিণেসু অবেরিণো।
বেরিণেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিণো।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, বিদ্বেষকারী বৈরিগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য অবৈরি-ভাবে থাকিতে পারিলেই সুখলাভ হয়।

কোধবগ্‌গো অধ্যায়ে ভগবান্ বুদ্ধ বলিতেছেন—

"অক্কোধেন জিনে কোধং"—ক্রোধকে অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা জয় করিবে।—

নাগবগ্‌গো অধ্যায়ে নাগ বা হস্তীর মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার কথা বলিতেছেন—

"অহং নাগো ব সংগামে চাপতো পতিতং সরং
অতিবাক্যং তিতিক্খিস্সং।"

সংগ্রামে যেমন করিবর ধনুঃনিঃসৃত শরনিকর সহ্য করে, সেইরূপ আমিও দুর্জ্জনদিগের পরুষ বাক্য সহিষ্ণুতাসহকারে সহ্য করিব।

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ শব্দের লক্ষণ নির্দ্দেশপ্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্‌ঠো যো তিতিক্খতি।
খন্তিবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।"

যে বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বধ ও বন্ধনের প্রতি অসূয়া ত্যাগ করিয়া উহা সহ্য করেন,—ক্ষমান্বিত ও দশবলবিশিষ্ট সেই ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ * বলি। আরও বলিতেছেন—

"অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং।
* * * তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।"

বৈরীদিগের মধ্যে যিনি নির্বৈর ও দণ্ডবিধানকারীর মধ্যে যিনি নির্বৃত বা শান্ত—তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি। বুদ্ধদেবের এই ব্রাহ্মণ-লক্ষণের সহিত মহাভারতের পতিব্রতা-কথিত—"হিংসিতশ্চ ন হিংসেত তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ"—এই লক্ষণের পূর্ণ সাদৃশ্য দেখুন।

বৈরিগণের মধ্যে নির্বৈর থাকিবার উপদেশই শ্রীমৎ গান্ধী এ দেশে প্রচার করিতেছেন। দেশবাসী ইহা পালন করিয়া ধন্য হউন।

(৩) মহর্ষি কাশ্যপের ক্ষমাবিষয়ক গাথা।

শত্রুনিরাকরণার্থ উত্তেজিত দ্রৌপদীকে প্রবোধ দিবার জন্য যুধিষ্ঠির মহর্ষি কাশ্যপের নিম্নোক্ত ক্ষমাবিষয়ক গাথা উদ্ধৃত করিতেছেন—

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেব জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ১ ॥
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥ ২ ॥
অতিযজ্ঞবিদাং লোকান্ ক্ষমিণঃ প্রাপ্নুবন্তি চ।
অতিব্রহ্মবিদাং লোকানতি চাপি তপস্বিনাম্ ॥ ৩ ॥
অন্যে বৈ যজুষাং লোকাঃ কর্ম্মিণামপরে তথা।
ক্ষমাবতাং ব্রহ্মলোকে লোকাঃ পরমপূজিতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ ॥ ৫ ॥
ক্ষন্তব্যমেব সততং পুরুষেণ বিজানতা।
যদা হি ক্ষমতে সর্ব্বং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৬ ॥
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
ইহ সম্মানমর্হন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥ ৭ ॥
যেষাং মন্যুঃ মনুষ্যাণাং ক্ষময়াভিহতঃ সদা।
তেষাং পরতরে লোকাস্তস্মাৎ ক্ষান্তিঃ পরা মতা ॥ ৮ ॥
ইতি গীতাঃ কাশ্যপেন গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাম্।

অর্থাৎ ক্ষমাই ধর্ম্ম, যজ্ঞ, বেদ ও শাস্ত্র; ক্ষমাহীন ব্যক্তির ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বিফল—ইহা যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিতে পারেন। ১। ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমাই তপস্যা ও শৌচ, ক্ষমাই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ২। অতিযাজ্ঞিক অতি

* বৌদ্ধসাহিত্যে 'শ্রমণ' ও 'ব্রাহ্মণ' এই শব্দ দুইটি সর্ব্বত্রই একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধসাহিত্যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের তুল্য পদবী। অনেক স্থলে অর্হৎ শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মজ্ঞ ও অতি তপস্বী ব্যক্তিরা যে সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন, ক্ষমাশীল ব্যক্তি সেই সকল লোকে গমন করেন। ৩। যজুর্ব্বেদী বা ত্রেতাগ্নিসাধ্য যাজ্ঞিকগণ ও বাপীকূপাদি পুণ্যকর্ম্মকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকে যে সকল পরমপূজিত লোক আছে, ক্ষমাবান্ ব্যক্তিরা সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৪। ক্ষমাই তেজস্বিগণের তেজ, তপস্বিগণের ব্রহ্ম এবং সত্যপরায়ণগণের সত্য, ক্ষমাই শান্তি। ৫। জ্ঞানী পুরুষের সর্ব্বদা ক্ষমা করা উচিত। কারণ, পুরুষ যখনই সকল বিষয়ে ক্ষমা করেন, তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ৬। ক্ষমাশীল পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইয়া থাকে, ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উত্তমগতি লাভ হয়। ৭। যে ব্যক্তির ক্রোধ ক্ষমা দ্বারা সর্ব্বদা বাধিত হয়, তাহাদিগের উৎকৃষ্টতর লোকপ্রাপ্তি হয়, সুতরাং ক্ষমাই উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৮।

সাহিত্যে ক্ষমা

(ক্ষমা-প্রশংসা)

—"জিতরোষরয়া মহাধিয়ঃ, সপদি ক্রোধজিতো লঘুর্জনঃ।"—ভারবি।

কবি গাহিয়াছেন,—

"ক্ষমা-শস্ত্রং করে যস্য দুর্জনঃ কি করিষ্যতি।
অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ স্বয়মেবোপশাম্যতি॥"

যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ শস্ত্র ধারণ করেন, দুর্জন তাহার কি করিতে পারে? তৃণ বা দাহ্য বস্তুর অভাবে বহ্নি আপনিই উপশমিত হয়।

পুনশ্চ

"নরস্যাভরণং রূপং রূপস্যাভরণং গুণঃ।
গুণস্যাভরণং জ্ঞানং জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা॥"

রূপ মনুষ্যের আভরণ, রূপের আভরণ গুণ, গুণের আভরণ জ্ঞান, জ্ঞানের আভরণ ক্ষমা। আরও

"ক্ষমা বলমশক্তানাং শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।
ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি॥"

ক্ষমা অশক্ত বা দুর্ব্বলের বল, ক্ষমা শক্ত বা সবলেরও বল, ক্ষমা একটি বশীকরণবিশেষ, ক্ষমা দ্বারা কি না সিদ্ধ হয়?

সজ্জনপ্রশংসাস্থলে উক্ত হইয়াছে,—

"উপকারিষু যঃ সাধুঃ সাধুত্বে তস্য কো গুণঃ।
অপকারিষু যঃ সাধুঃ স সাধুঃ সদ্ভিরুচ্যতে॥" *

উপকারী ব্যক্তির প্রতি প্রত্যুপকারাদি সাধু ব্যবহারে কিছুই কৃতিত্ব নাই, কেন না, সাধারণ ব্যক্তিই এইরূপ করিয়া থাকে, কিন্তু অপকারীর প্রতি যে সাধু আচরণ করে, সেই প্রকৃত সাধু বলিয়া সজ্জনসমাজে অভিহিত হইয়া থাকে।

"হৃদয়ানি সতামেব কঠিনানীতি মে মতিঃ।
খলবাগ্‌বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈর্ভিদ্যন্তে ন মনাগ্‌যতঃ॥"

সাধুগণের হৃদয় কঠিন বলিয়া মনে হয়, কেন না, খলগণের তীক্ষ্ণ বচনরূপ বাণ দ্বারা উহা বিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সাধুগণ খলের পরুষ কর্কশ বচনে ধৈর্য্যচ্যুত হন না। আরও—

"দুর্জনবচনাঙ্গারৈর্দগ্ধোঽপি ন বিপ্রিয়ং বদত্যার্য্যঃ।
অগুরুরপি দহ্যমানঃ স্বভাবগন্ধং পরিত্যজতি কিং নু?"

দুর্জনগণের বচনরূপ অঙ্গার দ্বারা দগ্ধ হইলেও সাধুব্যক্তি কখন অপ্রিয় বাক্য বলেন না। অগুরু দগ্ধ হইলেও স্বাভাবিক গন্ধ কি কখন পরিত্যাগ করে? আবার দেখুন,—

"গৌরীপতের্গরীয়ো গরলং গত্বা গলে জীর্ণম্।
জীর্য্যতি কর্ণে মহতাং দুর্ব্বাদো নান্তরমপি বিশতি॥"

বিষমকালকূট গৌরীপতি শিবের গলেই জীর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ সাধুচরিত্র মহদ্‌গণের কর্ণে অপরের কটুবাক্য বা নিন্দা পৌঁছিয়াই বাহিরেই জীর্ণ হয়, এতটুকুও অন্তরে প্রবেশ করে না। অর্থাৎ মহদ্‌গণ খলের কটুবাক্য শুনিয়াও মানসিক ক্ষোভ প্রাপ্ত হন না, পরন্তু তাহাকে ক্ষমা করেন। আরও,—

"দুর্জন বদন-বিনির্গত-বচন-ভুজঙ্গেন সজ্জনো দষ্টঃ।
তদ্বিষবিনাশনিমিত্তং সাধুঃ সন্তোষমৌষধং পিবতি॥"

দুর্জ্জনের বদন হইতে নির্গত বচনরূপ ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে, সাধুচরিত্র সজ্জনও তাহার বিষপ্রশমনের জন্য সন্তোষরূপ ঔষধ পান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ দুর্জ্জনের নির্ম্মমকটু বাক্যে জর্জ্জরিত হইলেও সাধুব্যক্তি সন্তোষই অবলম্বন করেন, অসন্তোষ বা অন্যরূপ মানসিক বিকৃতি প্রাপ্ত হন না। ভারবি বলিয়াছেন,—

"বচনৈরসতাং মহীয়সো ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ।
কিমপৈতি রজোভিরৌর্ব্বরৈরবকীর্ণস্য মণের্মহার্ঘতা॥"

অসৎ ব্যক্তির কঠোর বাক্যে মহদ্‌ব্যক্তির গুরুত্ব বা গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হয় না, পার্থিব ধূলিদ্বারা ঘৃষ্ট বহুমূল্য মণির কি মহার্ঘতা বিনষ্ট হয়? অপিচ—

(১) "বিপ্রিয়মপ্যাকর্ণ্য ব্রূতে প্রিয়মেব সর্ব্বদা সুজনঃ।
ক্ষারং পিবতি পয়োধের্ব্বর্ষত্যম্ভোধরো মধুরমম্ভঃ॥

(২) ক্ষারং জলং বারিমুচঃ পিবন্তি তদেব কৃত্বা মধুরং বমন্তি।
সন্তস্তথা দুর্জনদুর্বচাংসি পীত্বা চ সূক্তানি সমুদ্গিরন্তি॥"

এই শ্লোক দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধৃত হইলেও উভয়ই সমানার্থক। যেরূপ মেঘ সমুদ্রের লবণাক্ত জল পান করিয়া উহা মধুর বৃষ্টিরূপে মোচন করে, সেইরূপ সজ্জনও অপরের অপ্রিয় দুর্ব্বচন শুনিয়াও প্রিয়বাক্যরূপ মুক্তাই বর্ষণ করিয়া থাকেন।

এতাবৎ আমরা দুর্ব্বচন সহ্য করত ক্ষমাপ্রকাশ যে সাধুগণের চরিত্রের একটা লক্ষণ, তাহা আলোচনা করিলাম। এক্ষণে অপরাপর অত্যাচার স্থলেও ক্ষমার প্রশংসা শ্রবণ করুন।

"বিগৃহীতঃ পদাক্রান্তো ভূয়ো ভূয়শ্চ খণ্ডিতঃ।
মাধুর্য্যমেবাবহতি ইক্ষুরেক ইব সজ্জনঃ॥"

পুনঃপুনঃ অপর কর্ত্তৃক নিগৃহীত, পদাহত বা খণ্ডিত হইলেও সজ্জন স্বকীয় মাধুর্য্য পরিত্যাগ করেন না। অপ্রাসঙ্গিক বা অনাবশ্যক বোধে উপমাভাগ পরিত্যক্ত হইল। আরও—

"সুজনো ন যাতি বৈরং পরহিতনিরতো বিনাশকালেঽপি।
ছেদেঽপি চন্দনতরুঃ সুরভয়তি মুখং কুঠারস্য॥"

পরহিতব্রত সুজন আপনার বিনাশেও বিনাশকারীর প্রতি বৈরিতাচরণ করেন না। চন্দনতরু ছেদনকালে কুঠারের মুখই সুরভিত করিয়া থাকে। অপিচ—

"ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং পুনরপি পুনশ্চন্দনং চারুগন্ধং।
ছিন্নং ছিন্নং পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষুকাণ্ডম্।
দগ্ধং দগ্ধং পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনং কান্তবর্ণং
ন প্রাণান্তে প্রকৃতিবিকৃতির্জায়তে চোত্তমানাম্॥"

চন্দন যতই ঘর্ষণ করা যায়, ততই তাহার মধুর গন্ধ বিকীর্ণ হয়; ইক্ষু যতই চর্ব্বণ করা যায়, ততই স্বাদুরস নির্গত হয়; কাঞ্চন যতই দগ্ধ করা যায়, ততই তাহার কান্তি ফুটিয়া উঠে। এইরূপ সৎপুরুষগণ অপর কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া প্রাণান্তদশা প্রাপ্ত হইলেও স্বাভাবিক মাধুর্য্য পরিত্যাগ করেন না।

---

* খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে ঠিক অনুরূপ উপদেশ মহাত্মা যীশাস্ শিষ্যবর্গকে বলিতেছেন, If ye do good to them which do good to you what thank have ye? for sinners also do even the same......But love ye your enemies, & do good hoping for nothing again" St. Luke VI 33-35.

—"ন নিন্দতি পরান্ সোহ ভাষতে নিষ্ঠুরং
প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ং চ সহতে ক্রোধং চ নালম্বতে।
শ্রেষ্ঠং সতাং লক্ষণম্"

সাধু ব্যক্তি কাহারও নিন্দা করেন না,—নিষ্ঠুর বাক্য কহেন না, কেহ অপ্রিয় বাক্য বলিলে তাহা সহ্য করেন,—ইহার পরিবর্ত্তে ক্রোধ অবলম্বন করেন না—সজ্জনগণের ইহাই লক্ষণ।

মৃদু, ক্ষমাশীল ব্যক্তির গুণ কবি বল্লভদেব বলিয়াছেন—

"তত্তৎ শক্তো যাদৃশ ভবতি মৃদুঃ—ন্নার তাদৃশস্তীক্ষ্ণঃ।
অতিমৃদু জলমপি নিপতদ্ ভিনত্তি শৈলং ক্ষুরং ন বজ্রেম।"

মৃদু ব্যক্তি শত্রুর বিনাশে যেরূপ সমর্থ, তীক্ষ্ণ বা কোপনস্বভাব ব্যক্তি সেরূপ নহে।—দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন যে, অতি মৃদু জল পতিত হইয়া দৃঢ় ও কঠিন পর্ব্বতগাত্র ভেদ করে,—কিন্তু তীক্ষ্ণ ক্ষুর বজ্রসহকারেও তাহা পারে না।

ইংরাজী কবি স্যামুয়েল বটলার (S. Butler)—ক্ষমা সম্বন্ধে গাহিয়াছেন :—

"Laws that are inanimate
And feel no sense of love or hate,
That have no passion of their own,
Nor pity to be wrought upon,
Are only proper to inflict
Revenge on criminals as strict.
But to have power to forgive
Is Empire and prerogative,
And 'tis in crowns a nobler gem
To grant a pardon than condemn."

প্রাণহীন শাসন-নীতি,—যাহার দয়া, মায়া, স্নেহ, ঘৃণা প্রভৃতি কোনও মানসিক বৃত্তি নাই, তাহা পাপীর দণ্ডবিধানে যোগ্য অস্ত্ররূপে কল্পিত হইতে পারে,—কিন্তু ক্ষমা করিবার শক্তি থাকাই প্রকৃত সাম্রাজ্য এবং যথার্থ রাজধর্ম্ম। দুষ্টের বা পাপীর দণ্ডবিধান অপেক্ষা ক্ষমা-ধর্ম্মই রাজমুকুটের সমুজ্জ্বল রত্নভূষণ।

ক্ষমার অপর নাম দয়া; এ সম্বন্ধে Dr. Guthrieর বাক্য অতীব মনোজ্ঞ :—

"Mercy is the forgiveness of an injury,
Mercy is the pardon of a sinner.
On her wings, man rises to his loftiest elevation
And makes his nearest approach and
similitude to God"

অনিষ্টকারীর প্রতি ক্ষমাই দয়া, পাপীর প্রতি মার্জ্জনাই দয়া। ইহার পক্ষপুটে আশ্রয় লইলে মানুষ সমুচ্চস্তরে উন্নীত হয় এবং শ্রীভগবানের সামীপ্য ও সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে।

এই ক্ষমা বা দয়ার মধুরিমা মহাকবি সেক্সপীয়র গাহিয়াছেন :—

"No ceremony that to great ones 'longs.
Not the king's crown, nor the deputed sword
The marshal's truncheon, nor the Judge's robe,
Become them with one half so good a grace
as mercy does."

ধনীর উৎসব, রাজার মুকুট বা রাজদণ্ড, বিচারকের বহুমূল্য পরিচ্ছদ, এই সমুদয় বাহ্যশোভা ও গৌরবকর বস্তু—তাঁহাদিগের তেমন সৌন্দর্য্যবিধায়ক নহে, যেমন দয়া হইয়া থাকে।

Mr. Burroughs নামক প্রখ্যাত লেখক Aristippus ও Æschiness নামক পরস্পর বিবদমান দুই প্রাচীন দার্শনিকের অপূর্ব্ব ক্ষমার উল্লেখ করিয়াছেন :—

There is a mention made of two great philosophers falling, at variance,—Aristippus and Æschines. Aristippus comes to Æschines and says—"shall we be friends?" "yes, with all my heart"—answered Æschines. "Remember" said Aristippus "that though I am your elder, yet I sought for peace." "True" replied Æschines, "and for this I will always acknowledge you to be the more worthy man, for I began the strife and you the peace." উক্ত দুই বিবদমান দার্শনিকের মধ্যে Aristippus তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী Æschinesএর নিকট গিয়া সৌহার্দ্দ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন, ইহাতে Æschines সাদরে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন, যেহেতু তুমি শান্তিস্থাপনার্থ উদ্যত হইয়াছ, এই হেতু তোমাকে উৎকৃষ্টতর বলিয়া জ্ঞান করি। বিবাদ বিস্মৃত হইয়া যে বন্ধুত্বের জন্য হস্ত প্রসারণ, ইহাই প্রকৃষ্ট ক্ষমা।

ক্ষমার অপর নাম দোষের সম্যক্ বিস্মৃতি। আপাততঃ ক্ষমা করিয়া আবার সময়ান্তরে সেই দোষের জের টানিয়া দণ্ড বা প্রতিহিংসার ব্যবস্থা অতীব গর্হিত, এ সম্বন্ধে কবিবর H. W. Bucher বলিয়াছেন,—

"I can forgive but I can not forget"
Is only another way of saying
"I will not forgive" A forgiveness
Ought to be like a cancelled note,
Torn in two and burned up, so that
It never can be shown against the man.

"আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারি না" ইহার অপর নাম ক্ষমার অভাব। ছিন্ন, দগ্ধ, পরিত্যক্ত বা বাতিল অঙ্গীকার-পত্রের মত দোষের সম্যক্ বিস্মৃতিই ক্ষমা। একবার ক্ষমা করিলে পুনরায় সেই দোষের অজুহাতে দোষকারী ব্যক্তিকে শাসান ঠিক নহে।

খৃষ্টধর্ম্ম ও ক্ষমাগুণ

* "Mercy is an essential perfection of the deity. Hence, in Scripture language, He is spoken of as being "plenteous in mercy," "great in mercy" and "rich in mercy." Dryden even affirms that "sweet mercy" is His "darling attribute." And in truth, it would appear so; for in the 136th. Psalm, "His mercy" is said to be the grand motive of all his varied goodness to man. Six-and-twenty times, this precious fact is asserted there in! And does not human experience, world-wide most emphatically confirm it? As a mighty river, His loving kindness is ever flowing towards us. And it is as free as it is exhaustless. Like the air, which penetrates every

* এই উদ্ধৃত অংশে Mercy বা দয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারই অপর নাম ক্ষমা। Dr. Guthrie বলিতেছেন, "Mercy is the forgiveness of injury, Mercy is the pardon of a sinner." সুতরাং ঐ শব্দ দুটি এক পর্য্যায়ের।

dwelling independent of the status of its habitant, it comes to all without fee or reward.—

The earth is full of the mercy of the "Lord"— Dr. Davies.

উদ্ধৃত অংশে ভক্ত লেখক বলিতেছেন, "দয়া বা ক্ষমাই ভগবানের প্রধান লক্ষণ। ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেলে' বহুবার তাঁহাকে দয়া বা ক্ষমার নিধান বলা হইয়াছে এবং তথায় ইহার বহু নিদর্শনও প্রদত্ত হইয়াছে। মনুষ্যের অশেষ কল্যাণের মূল হইল তাঁহার ঐ দয়াবৃত্তি। কেবল ইহা গ্রন্থের কথা নহে। পরন্তু মনুষ্যের প্রাত্যহিক জীবনে ভগবানের এই দিব্য স্নেহসিক্ত দয়া নিত্য অনুভূত। এই দয়া বিশাল নদী-স্রোতের মত আমাদিগের প্রতি প্রবাহিত। এই প্রবাহ—উন্মুক্ত ও অনন্ত। বায়ু যেমন অবাধ গতিতে ধনীর সৌধ ও নির্ধনের কুটীর নির্বিশেষে সকলেরই গৃহে প্রবেশ করে,—সেইরূপ ঐ দিব্য দয়ার পুণ্যপ্রবাহও প্রতিদানের প্রত্যাশা না করিয়াই সর্বজীবকে স্বীয় পুণ্যস্পর্শে ধন্য করে। অধিক কি, এই জগৎ সেই পরম পুরুষের দয়াতে পরিপূর্ণ।"—ডাক্তার ডেভিসের এই উক্তির সত্যতা আমরা মূল খৃষ্টীয় ধর্ম-পুস্তকে বিশেষরূপেই উপলব্ধি করি। কেন না, উহাতে শ্রীভগবানের ক্ষমাবৃত্তির কথা নানা ছন্দে উদ্ঘোষিত হইয়াছে।

ডেনিয়াল তাঁহার আত্মনিবেদনে (Daniel's confession) বলিতেছেন,—(Daniel. IX. 9) :—"To Lord our God, belong mercies and forgivenesses, though we have rebelled against him" আমরা শ্রীভগবানের নীতির বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিলেও দয়া বা ক্ষমা তাঁহার সহচর। অর্থাৎ আমরা বিবিধ পাপ করিলেও, ভগবান্ আমাদিগকে ক্ষমা বা দয়া করিয়া উদ্ধার করেন।

আবার Psalm 86. 5 অধ্যায়ে দেখিতে পাই, ভক্ত বলিতেছেন: "Thou, O Lord, art good and ready to forgive and plenteous in mercy unto all them that call upon thee" "হে ভগবন্, যে তোমায় প্রাণ ভ'রে ডাকে, তাহার প্রতি তুমি অনন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া থাক এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাক।"

Jeremiah 32 অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে:—"I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more" Thus said the Lord which giveth the Sun for a light by day and the ordinances of the moon and the stars for a light by night."

চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রের নিয়ামক ভগবান বলিলেন, আমি তাহাদিগের পাপ ক্ষমা করিব এবং উহা বিস্মৃত হইব।

খৃষ্টমতে মূল ভগবানের ক্ষমার পরিচয় পাইলেন। এক্ষণে উক্ত মতের প্রবর্তক স্বয়ং মহাত্মা যেশাসের ক্ষমানীতির পরিচয় লউন। আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ইঙ্গিতে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

নিউটেষ্টামেণ্টের Luke VI. 27 29 অধ্যায়ে যেশাস্ তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন:—

"I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you."

হে শ্রোতৃবৃন্দ ভক্তগণ! আমার উপদেশ এই যে, শত্রুদিগের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিও, যে তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদিগের অনিষ্ট না করিয়া ইষ্টসাধনই করিও।

তিনি আরও বলিলেন,—

"Bless them that curse you and pray for them which despitefully use you." যাহারা তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করে বা তোমাদের অনিষ্ট আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগকে শুভাশিষ দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিও এবং যাহারা তোমাদিগের প্রতি ঘৃণাপূর্ণ ব্যবহার করে, তাহাদের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করিও।

"And unto him that smiteth thee on one cheek, offer also the other and him that taketh away thy cloke, forbid not to take thy coat also."

কেহ তোমার এক গণ্ডস্থলে আঘাত করিলে তুমি তাহাকে অপর গণ্ড পাতিয়া দিও, কেহ তোমার গাত্রাবরণ-বস্ত্র উন্মোচন করিলে, তোমার জামার উন্মোচনেও বাধা দিও না।"

এইরূপ নিরীহতাচরণের ফল কি? এই আশংসার উত্তরে বলিতেছেন,—

"Your reward shall be great and Ye shall be the Children of the highest (Luke VI. 35) এই ক্ষমা বা শত্রুর প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনের ফলে তোমাদের পরম লাভ হইবে, তোমরা সেই মহীয়ানের সন্তানরূপে পরিগণিত হইবে।

St. Mathew VI. (14, 15) অধ্যায়ে মহাত্মা যেশাস্ তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রতি উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন:

"If Ye forgive men their trespasses, your heavenly father will also forgive you. But if Ye forgive not men their trespasses, neither will your father forgive. Your trespasses."

যদি তোমরা অপরের প্রমাদ বা পাপ ক্ষমা কর, তবে পিতা ভগবান্ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। যদি তোমরা অপরের পাপাদি ক্ষমা না কর, তবে শ্রীভগবান্ও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন না।

এই কথাই Mark XI (২৫-২৬) অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা,—

"When, Ye stand praying, forgive if Ye have aught against any: that your father also which is in heaven may forgive you your trespasses, But if Ye do not forgive neither will Your father which is in heaven, forgive your trespasses."

ইহার অর্থ পূর্ব্ববৎ।

এই সকল ক্ষমানীতির উপদেশ ব্যতীত, ক্ষমার আদর্শ দৃষ্টান্তও 'বাইবেল' গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

জোশেফের ক্ষমা

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের 'জেনেসিস্' অধ্যায়ে জেকব বা ইস্রেইলের পুত্র মহাত্মা জোশেফের মহনীয় চরিত্র সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত আছে। জেকবের তিন পত্নীতে দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জোশেফ তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত। জোশেফ শিশুকালেই মাতৃহীন হন। পিতা জেকব এই মাতৃহীন পুত্রটির উপর বিশেষ স্নেহপ্রবণ ছিলেন। জোশেফের এক জন মাত্র সহোদর ভ্রাতা ছিল। অপর দশ জন তাঁহার বিমাতৃনন্দন—তাঁহার প্রতি বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। তাঁহার প্রতি পিতার স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহাদের বিদ্বেষ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিদ্বিষ্ট বিমাতৃপুত্রগণ তাহাকে হত্যা করিবার মন্ত্রণা করে (They conspired against him to slay him) কিন্তু মতদ্বৈধ হওয়ায় হত্যা না করিয়া নির্জন প্রদেশবর্তী একটা অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে (They cast him into a pit in the wilderness and the pit was empty), এবং পরিশেষে বিংশ রজত মুদ্রায় মূল্যে

তাঁহাকে মিশরগামী এক সার্থবাহ সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রয় করে। (They drew and lifted up Joseph out of the pit and sold him to the Ishmeelites for 20 pieces of silver)—Genesis XXXVII.18 28.

মনুষ্যের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্গতি কি হইতে পারে? তরুণ বয়সে একই পিতার ঔরসজাত ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রথমে হত্যার উদ্যম—পরে তাঁহাদিগের কর্তৃক কূপে নিক্ষেপ ও অবশেষে বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায়ের নিকট বিক্রীত হইয়া স্নেহময় বৃদ্ধ পিতার অঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাসে প্রয়াণ। ইহা অপেক্ষা নৃশংস অত্যাচার আর কি কল্পনা করা যাইতে পারে?

বহু দিন বিগত হইলে ভগবৎপ্রসাদে ও কালের অচিন্তনীয় প্রভাবে নানা দুর্বিবহ বিপৎ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া জোশেফ—মিশর-রাজ ফেরোর অনুকম্পায়—ঐ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্তৃপদ প্রাপ্ত হইলেন (Pharoah made him ruler over all the land of Egypt and said unto Joseph—without thee, shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt—Gen 41-40-45)

মিশরের সর্ব্বময় কর্তৃপদে বৃত থাকিয়া জোশেফ সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষ অতিক্রম করিলেন। ঐ সময় তিনি শ্রীভগবদ্দত্ত দূরদৃষ্টির বলে নগরে নগরে শস্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে প্রচুর শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। ইহার পরই সারা পৃথিবীব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রাদুর্ভূত হইল (The famine was over all the face of the earth) বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ মিশরে শস্যসংগ্রহার্থ গমন করিতে লাগিল।

জোশেফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণও শস্যক্রয়ার্থ মিশরে আসিল। জোশেফই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা, শস্য বিক্রয়ের ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং ভ্রাতৃগণ আসিয়া তাঁহার নিকটই শস্যার্থ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না—চিনিবেই বা কিরূপে? যে জোশেফকে তাহারা নগণ্যমূল্যে বিদেশীয় বণিকের হস্তে বিক্রয় করিয়াছিল—সেই জোশেফই যে আজ কালচক্রে মিশর রাজ্যের দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা ও নিগ্রহানুগ্রহক্ষম প্রভু; আজ যে তাহারা তাঁহার অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়া তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান, তাহা বুঝিবে কিরূপে? জোশেফকে ভ্রাতৃগণের কেহ চিনিতে না পারিলেও, জোশেফ তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়াই তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইল,—তিনি তাহাদিগের জন্য নিভৃতে অশ্রু মোচন করিলেন (He entered into his chamber and wept there. Gen. 44-30) জোশেফ ভ্রাতৃগণকে প্রথমতঃ আত্মপরিচয় না দিয়াই বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত করত, নানারূপ অন্নাদি দ্বারা আপ্যায়িত ও সৎকৃত করিলেন (৪৩ অধ্যায়) এবং পরিশেষে স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন (He maketh himself known to his brethern) তিনি বলিলেন—

4. Come near to me, I pray you, I am Joseph your brother—whom ye sold into Egypt,

5. Now therefore be not grieved that ye sold me hither.

8. It was not you that sent me higher but God. (chap 45)

৪। অর্থাৎ হে ভ্রাতৃগণ,—আমার নিকটে আইস, আমিই জোশেফ—তোমাদের ভ্রাতা, যাহাকে তোমরা মিশরগামী বণিক-দলের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলে।

৫। তোমরা আমাকে বিদেশে বিক্রয় করিয়াছিলে বলিয়া দুঃখিত হইও না।

৮। বস্তুতঃ আমাকে এই দেশে প্রেরণের পক্ষে তোমরা উপলক্ষ মাত্র। ভগবান্‌ই জগতের মঙ্গলার্থ ও দুর্ভিক্ষ হইতে অসংখ্য মানবের জীবনরক্ষার্থই আমাকে এ স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন।

সমৃদ্ধির সমুচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াও উৎপীড়নকারী বিদ্বিষ্ট ভ্রাতৃগণের উপর কোনওরূপ প্রতিহিংসা না করিয়া যে বিনয়-মধুর ব্যবহার করিলেন—তাহা অপূর্ব্ব,—ইহাই তাঁহাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিল।

ভ্রাতৃগণকে কেবলমাত্র একবার সৎকার ও পূর্ব্বোক্তরূপ মিষ্টবাক্য দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি তাহাদিগকে বৃদ্ধ পিতা, পুত্র ও পরিজনবর্গসহ তাঁহারই সকাশে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ("Haste Ye and go up to my father and say unto him" saith Joseph "God hath made me lord of all Egypt; Come down to me, Thou shalt dwell in the land of Goshen, thou shalt be near unto me, thou, thy children and thy children's children and thy flocks and thy herds and all that thou hast. 45 Chap. 9-10).

তিনি ভ্রাতৃগণকে বিদায় দিবার কালে প্রত্যেককে চুম্বন করিলেন এবং অজস্র স্নেহাশ্রু মোচন করিলেন (Moreover he kissed all his brethren and wept upon them) জোশেফের অনুরোধমত বৃদ্ধ পিতা ও পুত্রকন্যাদি পরিজনসহ তাঁহার ভ্রাতৃগণ মিশরে আসিয়া বসতি করিলেন। ইহার সপ্তদশ বৎসর পরে বৃদ্ধ জেকব দেহত্যাগ করিলেন; জোশেফের ভ্রাতৃগণ চিন্তা করিলেন যে, এইবার পিতার মৃত্যুর পর হয়ত জোশেফ তাঁহাদিগের পূর্ব্ব অনিষ্টাচরণের প্রতিহিংসা করিবে। তাঁহারা দূতমুখে মৃত পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিল। পিতার আদেশ যথা:—"Forgive, I pray thee now, the trespass of thy brethren and their sin, for they did unto thee evil and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father "(50 Chap. 17).

জোশেফ এই বাক্যে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতৃগণকে অভয়প্রদান করিয়া বলিলেন, "Fear not; Ye thought evil against me; but God meant it unto good. Now therefore fear Ye not, I will nourish you and your little ones."

And he comforted them and spake kindly unto them. (50 chap 19-21)

তোমরা আমার অনিষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, কিন্তু ভগবান্ তাহা দ্বারা জগতের কল্যাণবিধান করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ভীত হইও না,—আমি তোমাদিগকে ও তোমাদিগের পুত্র-কন্যাদিগকে যথোচিত ভরণ পোষণ করিব। এই বলিয়া তিনি ভ্রাতৃগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বে জোশেফের প্রতি ভ্রাতৃগণের নিষ্ঠুর ও কঠোর ব্যবহার এবং এক্ষণে তাহাদের প্রতি তাঁহার স্নিগ্ধমধুর ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে,—তাঁহার চরিত্র অনুতোপম ক্ষমার মধুরোজ্জ্বল প্রভায় বিচ্ছুরিত বলিয়াই প্রতিভাত হয়। সমগ্র খৃষ্টীয় শাস্ত্রে মহাত্মা জোশেফের ন্যায় এমন ক্ষমার নিদর্শন অল্পই পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ।

গরীবের মেয়ে

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

নীলিমার এইবারে কপাল ফিরিল।

মিসেস শুঁই তাহাকে শুভদৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিতেই মিস হর্ণ, মিস বিল্, মাদাম পিরী সকলেরই নিকট হইতে অল্পবিস্তর কৃপা তাহার প্রতি অযাচিতভাবেই ক্ষরিত হইতে লাগিল। মিস হর্ণেরই এ বিষয়ে উত্তম ও অধ্যবসায় পূর্ব্বাপর অধিক ছিল; এখন তাহা মাত্রাতিক্রমেরই উপক্রম করিল। মিসেস শুঁইএর মুখে কি সমাচার লাভ করিয়াই তিনি সে দিন প্রায় শ্বাসরুদ্ধাবস্থায় রক্তবর্ণ মুখে ছুটিয়া আসিলেন। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়া উঠিলেন—

"নেল্! ইহা কি সুসমাচার! তুমি যীশস্ ক্রাইষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হইয়াছ? ইহা কি সত্য?"

নীলিমা বাইবেলের পৃষ্ঠা হইতে দৃষ্টি না তুলিয়া তেমনই নতমুখে মাথা হেলাইয়া নিজের এ বিষয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

"ইজ নট্ ইট গ্লোরিয়াস্!" (ইহা প্রশংসার্হ)

"তুমি এখন যীশস্ ক্রাইষ্টের পবিত্র নামে বাপ্তাইজ হইতে সম্মত আছ, আশা করি?"

নীলিমার শরীরের প্রতি শিরা, প্রত্যেক লোমকূপ যেন এই প্রস্তাবমাত্রেই একটা অননুভূতপূর্ব্ব আতঙ্কের শিহরণে শিহরিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বক্ষশোণিতের সবল ধারা যেন অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত স্রোতহত নদীবক্ষের মতই স্তব্ধ ও অচল হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষুতে দৃষ্টি স্থির রহিল, অথচ সে যেন তাহা দিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী বিদেশিনী প্রলোভিকার শুভ্র মূর্ত্তি সুস্পষ্টভাবে আর দেখিতে পাইল না। ঠোঁট খুলিয়া সে কি যেন একটা সম্মতিসূচক বাক্য বলিতে গেল, কিন্তু ভিতর হইতে তাঁহার সর্ব্বদেহমনের নিদারুণ দৌর্ব্বল্য তাহার জিহ্বা তালু ওষ্ঠাধর সকলকেই এমনই অবশ ও অ-বল করিয়া রাখিল, যাহাতে করিয়া একটুকু শব্দও তাহারা বাহিরে আনিতে আত্মাকে সহায়তা করিল না। রক্তচিহ্নহীন পাংশু ওষ্ঠ থরথর কাঁপিয়া কম্পিত হইয়াই থামিয়া গেল।

মিস হর্ণ পুলকিতচিত্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শীকার-করা পাখীর মত তাহার বিবর্ণ শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন; একটু বুঝি মায়া হইল। কাছে আসিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া, মাথায় হাত দিয়া স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "মাই গার্ল! নিজেকে অশান্ত করিও না, কিছু দিন সময় লও। যীশস্ ক্রাইষ্টকে মনে মনে পূজা কর, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, যেমন একটি ভেড়ার ছানা। আমি তোমায় অন্তরের সঙ্গেই এ বিষয়ে সাহায্য করিব। কয়েক দিনের মধ্যেই তুমি নিজে বুঝিতে পারিবে যে, 'বিলিভার' হইয়া তুমি এ সংসারেই কত উন্নতি করিতে পারিবে। অন্য জগতের কথা ত দূরের, এ জগতেই বা তুমি আন্‌বিলিভার থাকিয়া কি পাইয়াছ?"

নীলিমার রক্তহীন, বর্ণলেশশূন্য শুভ্র মুখ ত্বরিত শোণিতোচ্ছ্বাসে সিন্দুর-রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার অবসাদ-অবসন্ন সমুদায় স্নায়ুপেশী যেন নবীন জীবনীশক্তির পুনরভ্যুদয়ে জীবন্ত ও সতেজ হইয়া উঠিল। তাহার সংসার-সুখভোগে অপরিতৃপ্ত, তৃষিত মনপ্রাণ যেন ওই তীব্র প্রলোভনবাক্যের যাদুযষ্টিস্পর্শে ক্ষণেকের মধ্যেই নিজের সমুদায় অতীতটাকে সুখহীন, স্নেহহীন, আশাহীন ও নিরানন্দবোধে উহাকে পরিত্যক্ত পুরাতন সর্পনির্ম্মোকের মতই বিদায় দিয়া নব নব আশাজালে বিজড়িত ও নবীন সুখোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ নূতন জীবনকে, সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে সাগ্রহে স্বাগত জানাইতে চাহিল। ঐ কয়টি বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া তাহার উৎপীড়িত অভিমানী চিত্ত বিদ্রোহ করিয়া জবাব দিল—সত্যই ত, পরলোকের কথা ত অনেক দূরের—ইহলোকেই বা সে কি পাইয়াছে, কি পাইতেছে? কি পাইলে সে তাহার গৌরবে, তাহার বন্ধনে, তাহার আশ্বাসে ইহাদের দান তাহার চিরজীবনের সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য্য গৌরব, পূর্ব্বজীবনের অটুট শান্তি সব ত্যাগ করিতে পারে? মায়ের বুকে তাহার জন্য স্নেহের সঞ্চয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই নিরুপায় ব্যর্থ স্নেহ, যাহা

স্নেহপাত্রকে অকথ্য অপমান হইতেও এতটুকুও রক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহা থাকিলেই বা লাভ কি, আর না থাকিলেই বা ক্ষতি কতটুকু? তাহার পর বাপ? তাঁহার কথা মনে পড়িতেই নীলিমার দর্ব্বশরীরে যেন একটা টান ধরিল; বুকে একটা প্রবল চাপ বোধ হইল। ঐ পিতার কন্তা হইয়া থাকার চেয়ে তাহার আর সব কিছু হওয়াই ভাল। ঐ পিতার আশ্রয়ে অতীত ও বর্ত্তমানে যাহাই হউক, ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে আরও যে কি আছে, তাহার ঠিকানাই বা কি? তাহার মা যে জীবন চিরদিন ধরিয়া বহন করিতেছেন, অমন নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্পভাবে বহন করিতেছেন, সে জীবনের স্মৃতিতেই যে নীলিমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। পিতার নির্ব্বাচনে একান্ত শস্তার দরে, খুব সম্ভব ঐ দরেই, কেহ নীলিমাকে ক্রয় করিয়া লইবে, তাহাদের শ্রোত্রীয় শ্রেণীর চক্রবর্ত্তীর ঘরে পয়সা লইয়া মেয়ে বেচারও ত প্রথা আছে। অতএব ভবিষ্যতের দড়ী-কলসীর চাইতে এদের আশ্রয় কি শ্রেয়ঃ নয়? মরণের চাইতেও কি খৃষ্টান বেশী পর? তাহার বুকে রক্ত-জমাট বাঁধিয়া ওঠা রক্ত ফেনাইয়া ফেনিল হইয়া উঠিল। সে অস্থির অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিল, "বাপ্টাইজ আমি হ'বো; কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি ভাল ক'রে শিখতে চাই। আমায় ইংরেজী বাইবেল ভাল ক'রে পড়াতে হ'বে, আমার শিক্ষার যাতে, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয়, তার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হ'বে। তার পর আমি বাপ্টাইজ হবো।"

এত কথা ও এমন কথা সে যে কেমন করিয়া এত সহজে বলিয়া গেল, সে যেন তাহার পক্ষে একটা ইন্দ্রজাল বা স্বপ্ন! কিন্তু বলিতে পারিয়াই সে বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গেই অপরিসীম তুষ্ট ও তৃপ্ত হইল। তাহার এ কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং বলিতে পারার শক্তিসঞ্চয়ের জন্তই যে সে তাহার এই ক্ষীণ দুর্ব্বল নিরুপায় জীবনের সমস্তটাকে বদল করিতে চায়। সে নিজের ইচ্ছামাত্রেই যে এই আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য তাহার মধ্যে দেখা দিয়াছে, ইহাতে সে ভবিষ্যৎকে খুবই উজ্জল ও সুন্দর বলিয়া কল্পনা করিল।

মিস হর্ণ যে তাহার প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, তাহা বলাই বাহুল্য এবং এই শুভসন্দেশ সঙ্গিনীদের বাঁটিয়া দিবার জন্ত ক্ষিপ্রচরণে প্রায় ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারাও একে একে, বা একত্র হইয়া আসিয়া কেহ নীলিমাকে এক গোছা ভায়োলেট ফুল, কেহ একবাক্স চকোলেট, কেহ বা একখানা লাইফ অফ আওয়ার লর্ড (Life of our Lord) এখনই কিছু না কিছু উপহারের সঙ্গে তাহাকে অজস্র আদর-বর্ষণে মুগ্ধ ও আপ্যায়িত করিয়া গেলেন। অতঃপর মিসেস গুঁইএর উপর কড়া হুকুম চড়িল, যেন নীলিমাকে তিনি খুব সস্নেহ ব্যবহার করেন৭ তা মিসেস গুঁই নিজেও সে বিষয়ে যত্ন লইয়াছিলেন। কেবল স্বভাব মানুষ মরিলেও সংশোধিত হয় না। তবে ইহার পর হইতে মিসেস গুঁই-এর ক্লাশে নীলিমাকে বড় বেশীক্ষণ থাকিতে হইত না। মিস হর্ণ তাহার ইংরেজীর, মিস বীল্ তাহার ছবি আঁকার ও সেলাইয়ের শিক্ষাভার লইলেন; এমন কি, মাদাস পিরীও কখন কখন কয়েকটা ফ্রেঞ্চ শব্দ শিখাইয়া তাহাকে স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। মায়ের সংযত উচ্ছ্বাসহীন মাপাজোঁকা আদরের স্থানে সমুৎসাহিত সোচ্ছ্বাস স্নেহের বন্তা পরিপ্লাবনে তাহাকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম হইল। মিসেস গুঁই নিত্য তাহাকে উঠিতে বসিতে বুঝাইতে লাগিলেন যে, খৃষ্টান হইলে তাহার সুখের সীমা থাকিবে না। তিনি বলিলেন, "এই দেখ্ না কম বয়সে বিধবা হয়ে ভাসুরের সংসারে খেটেখেটে মরছিলুম, একাদশী ক'রে প্রাণটা বার হইবার যোগাড় হ'ত, লোভে জিভ খসে গেলেও এক টুকরো মাছ নিজের পাতে নেবার যোটি ছিল না; ভাগ্যে ভাগ্যে না এরা আমায় ভজন-ভাজন দিয়ে বার ক'রে আন্‌লে, তাই না আজ আবার আমার একবার ছেড়ে দু'দু'বার বিয়ে হলো, মাছ ছেড়ে বেকন ফাউল পর্য্যন্ত অনায়াসেই চ'লে যাচ্চে। হাত পুড়িয়ে রেঁধে মরবার বদলে খানসামার তোফা রেঁধে খাওয়াচ্চে, নিজে যেখানে খুসী যাচ্চি আস্‌চি, একটা কৈফিয়ৎ কাটবারও কেউ কোথাও নেই তো। তোরও খুব সুখ হ'বে দেখবি কি না। তোর তো এমন খাসা চেহারা রয়েছে; ভাল খেতে পরতে পেলে এক জন লেডী বনে যাবি, চাই কি কোন সিভিলিয়ান কি ব্যারিষ্টার ফিরিঙ্গী সাহেবের নজরে লেগে যাবে। আমি দেখতে তেমন ভাল নই ব'লে আমার ও সাধটি আর পূরো হলো না। দু'বারই আনক্লিন নেটিভ হজ্‌ব্যাণ্ড (নোংরা দেশী স্বামী) জুটলো।"

গভীর ঘৃণায় আবার নীলিমার বুক ভরিয়া উঠিল, ফিরিঙ্গী সাহেবকে বিবাহ করিতে নাকি আবার বাঙ্গালীর মেয়ের কখন পারে? তা হউক সে সিবিলিয়ান, হউক

সে ব্যারিষ্টার, হউক সে লাট সাহেব। তার চেয়ে গরীব হিন্দু—নীলিমার মনটা গুটাইয়া আসিতে লাগিল। হিন্দু? হিন্দুকে বিবাহ করিলে যা হয়, সে ত সে চিরজীবন ধরিয়াই দেখিতেছে! সে যদি খৃষ্টান হয়, বিবাহ সে তাহার মত দেশীয় খৃষ্টানকেই করিবে; তাহাদের মধ্যে কি কোন উপযুক্ত রূপ-গুণবান্ পাত্র নাই? আর সে বিবাহ ত আর কাহারও স্বেচ্ছাচারের জবরদস্তিতে হইবে না, সে স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়াই ত পতি বাছিয়া লইতে পারিবে। তবে আর তাহার এত ভয়ভাবনা কি? নীলিমা হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল।

নীলিমার মা মেয়ের মনের এত বড় পরিবর্ত্তনটা ধারণা করিতে না পারিলেও তাহার বাহ্যিক একটা বিশেষ বদল হওয়া লক্ষ্য করিলেন। সে যেন পূর্ব্বের মত তাঁহার কাছে মন খুলিয়া আর কথা কহে না, চুপচাপ গম্ভীর হইয়া থাকে। পূর্ব্বে তাঁহার গৃহকার্য্যের যেটুকু সাহায্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই করিত, এমন কি, কত সময় তাঁহার নিষেধ পর্য্যন্ত মানিত না, এখন সে সবই সে পরিত্যাগ করিয়াছে; এমন কি, কত সময় বিশেষ প্রয়োজনে ডাকিয়াও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না, এমনই গভীর অন্যমনস্কতায় সে ডুবিয়া থাকে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে, বই লইয়াই কোন একটা কোণের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া থাকে; স্কুলের সময় আসিলে ছুটাছুটি আসিয়া নাকে মুখে দু'টি ভাত গুঁজিয়া ছুট দেয়। স্বর্ণলতা মেয়ের সামনে নিঃশব্দে থাকেন, আড়ালে তাঁহার বুক ঠেলিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া আসে। মেয়ের মনে যে একটা বিরাট চিন্তা ও বেদনা দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল এবং সেটা যে তাঁহাদের প্রতি অভিমানপ্রসূত, এটুকু তিনি বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু বুঝিলেই বা তাঁহার উপায় কি? চিরদিনের অত্যাচার-পীড়নে তাঁহার সকল মনোবৃত্তিই যে মূর্চ্ছাবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! তাঁহার পক্ষে তাই এটুকুও যে একান্ত অপ্রতিবিধেয়। তাঁহার জীবনের শেষ শান্তি ঐ মেয়ের সহানুভূতিটুকু; তা' সেটুকুও যে তিনি এবার হারাইতে বসিয়াছেন, সে ক্ষতি তাঁহার মনে বিষম হইয়া বাজিলেও বাহিরে তাহা লইয়া তাঁহার কোনই অভিযোগ উপস্থিত করিবার আগ্রহ বা অস্থিরতা দেখা দিল না। দিন শুধু গতানুগতি করিতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সেবারে গ্রীষ্মের বন্ধে বেলা ১১টার মেলে নামিয়া দুইটি সুদর্শন তরুণ পুরুষ একটা ভাড়া গাড়ী করিয়া অনুকূলচন্দ্রের জীর্ণ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এক জন দীর্ঘায়তশরীর, বলিষ্ঠ, উজ্জ্বলতর গৌরাঙ্গ ও স্বভাবচঞ্চল। সে ছেলে গাড়ীখানা আসিবার পূর্ব্বক্ষণেই লম্ফ দিয়া নামিয়া পড়িল ও তাহার সঙ্গী দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই ছুটাছুটি গিয়া রুদ্ধ দ্বারের কড়া ধরিয়া সজোরে নাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সবল হস্তের আকর্ষণে মরিচাধরা পুরাতন কব্জা যখন খসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক তেমনই সময় ভিতর হইতে কে এক জন অতি সঙ্কুচিত ধীর হস্তে দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে ভিতরের দিকেই সরিয়া দাঁড়াইল। ততক্ষণে দ্বিতীয় আরোহীও গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছে এবং ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সহচরের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয়কে লক্ষ্য করিয়া "এস হে সুশীল!" —বলিয়াই মুক্ত দ্বারের মধ্যে পা বাড়াইয়া দ্বারের পার্শ্বে সঙ্কুচিতা নীলিমাকে পলায়নোদ্যতা দেখিয়া সোৎসাহ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "হাঃ, নীলিমণি যে! থিন অ্যাণ্ড র‍্যাগেড্ অ্যাজ এভার! (সেই রকমই শুঁটকি এবং ন্যাকড়া-পরা!)"

কথার স্বরে নীলিমা তাহার দাদাকে চিনিয়া সকৌতুকে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিতমূর্ত্তি জ্যেষ্ঠের প্রতি চাহিতেই বিস্ময়ের আতিশয্যে তাহার মুখ দিয়া আর একটিও বাক্যস্ফূরণ হইল না। শুভেন্দুর হিম-গৌরবর্ণ সহরের বদ্ধ জল-বায়ুতে ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আতিশয্যে এবং সযত্নপরিমার্জ্জনে শতগুণ ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দৃঢ় মাংসপেশীযুক্ত দেহে কোমলতা স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। তাহার উপর অসাধারণ বিলাসিতাপূর্ণ সাজসজ্জায় তাহাকে পূর্ব্বের সেই খাটো ও ময়লা ধুতী পরা গা-খোলা গরীবের ছেলে বলিয়া চিনে, কাহার সাধ্য। ময়ূরছাড়া কার্ত্তিকটির মতই তাহাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল।

বিস্ময়ের প্রথম বেগ একটুখানি প্রশমিত হইয়া আসিলে

"কে ? দাদা ?" বলিয়া নীলিমা উহার পায়ের কাছে প্রণাম করিতে উদ্যত হইতেই দ্বারের বাহিরে আর একটা জুতা-পরা পায়ের শব্দ হইল এবং আরও এক জন কেহ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারা গেল। তাহার মুখটার সবখানি দেখিতে না পাওয়া গেলেও সে-ও যে তাহার দাদার মতই এক জন তরুণ পুরুষ এবং সাজপোষাকে ও রূপেও প্রায় তাহার সমকক্ষ, সেটুকু সেই চকিতের দৃষ্টিতেই নীলিমা দেখিয়া লইয়াছিল। তাহার উদ্যত প্রণাম-নিবেদন মধ্যপথেই বাধিয়া গেল এবং সে এই অপরিচিত নবীনের আকস্মিক অভ্যুদয়ে থাকিবে কি পলাইয়া যাইবে, তাহা কোন মতেই স্থির করিতে না পারিয়া মনে মনে অশান্ত ও চঞ্চল হইয়াও স্রোতোজলবদ্ধ শৈবালখণ্ডের মতই আটকাইয়া রহিল।"

ততক্ষণে শুভেন্দু বন্ধুর দিকে ফিরিয়া ডাকিয়া উঠিল, "এস না, সুশীল, নীলুটিকে আবার তোমায় সমীহ করতে হবে না কি ? উঃ রে ! ওঃ, লগেজগুলো ? তাই ত, তাই ত হে ! কে নিয়ে যাবে ? এই নীলি ! তোদের চাকর-টাকর কেউ আছে, বলতে পারিস ? এই ট্রাঙ্কট্রাঙ্কগুলো বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যায় কে, বল ত ?"

দাদার কথা শুনিয়া ও তাহার বিপন্ন মুখচ্ছবি দেখিয়া নীলিমার মনের মধ্যে সকৌতুক হাসির সঙ্গে মায়াও হইল। শুধু দাদা থাকিলে সে হয় ত বলিয়া ফেলিত, "চাকরবাকরের মধ্যে এক আমিই আছি, চল আমিই না হয় নিয়ে যাই—" এবং সাধ্যানুযায়ী সেগুলা বহিবার সাহায্যও সে দাদাকে অবিলম্বে করিতে আসিত; কিন্তু দাদার সমভিব্যাহারী দ্বিতীয় লোকটিকে স্মরণ করিয়া সে তাহার কিছুই না করিয়া শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, চাকরটাকর কেহ এ বাড়ীতে নাই। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বহু দিনের পরে সদ্যসমাগত ভাইএর প্রতি তীব্র বিরক্তিতে তাহার মনটা পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া উঠিল—বাড়ীর সব হালচাল জানিয়া শুনিয়াও দাদা শুধু শুধু এ কি ছেলেমানুষী করিয়াছে।—এই বাড়ীতে আবার কোন ভদ্রলোককে কেহ ডাকিয়া আনে! এ দিকে শুভেন্দু আগাগোড়া যে ভয় করিয়া বৎসরের পর বৎসর প্রত্যেক ছুটীটায় সুশীলকে ঠেকাইয়া আসিতেছিল, নিজ গৃহের যে দৈন্য-দুর্দ্দশা, কার্পণ্য-সে প্রাণান্তেও তাহাকে দেখাইতে এক বিন্দু ইচ্ছুক ছিল না, তাহার সে সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া এবার এই পথ দিয়া সপরিবার নাইনিতাল হইতে ফিরিবার সময় এই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই ভুবনবাবু যখন তাহাদের দুজনকেই এখানে নামিতে আদেশ দিলেন, তখন দু'একটা দুর্ব্বল আপত্তি করিতে থাকিলেও জোর করিয়া ট্রেণে চাপিয়া থাকিয়া সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে শুভেন্দুর মত দুঃসাহসিকেরও সম্পূর্ণ সাহসে কুলায় নাই। ইহার উপর তাহার মনের মধ্যে আর একটা যে বিষম উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে, সেটার সিদ্ধিলাভার্থ তাহার এখন ঐ লোকটিকে ষোল আনার উপর সন্তুষ্ট রাখাই প্রয়োজন। এই সকল স্বার্থচিন্তা স্মরণে আনিয়া মনের উষ্মা মনেই মারিয়া আরক্তগম্ভীর মুখে প্রতিপালকের আদেশে সে পিতৃমাতৃদর্শনে প্রস্তুত হইয়া নামিয়াই পড়িল। তাহার পর সুশীলকেও যখন তাহার সঙ্গে নামার আদেশ হইল, তখন তাহার মাথায় যেন কে মুগুর মারিয়াছে, এম্‌নই ভাবে চমকাইয়া সে প্রবল প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল। দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যক্রমে বলা যায় না, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তীক্ষ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়া পঞ্জাব মেলের হুইশেল গর্জ্জিয়া উঠিয়াই তাহাতে গতিবেগ প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুট কেস দুইটা দড়াম করিয়া প্লাটফর্ম্মে ফেলিয়া সুশীল একলাফে নামিয়া পড়িল। ঠিক এই সময়টিতেই চলন্ত গাড়ীর জানালা দিয়া ভাইয়ের অ্যাটাচীকেস বাহির করিয়া দিবার সময় বিনতার অপ্রসন্ন দৃষ্টি শুভেন্দুর ক্রোধক্ষুব্ধ নেত্রের উপর অজস্র করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আসিল। নিজের আঁচলে পিনে আঁটা হলদে গোলাপটাকে পিন খুলিয়া সে এমন ভাবে প্লাটফরমে ফেলিয়া দিল, যেন সেটা নিজে নিজেই খসিয়া পড়িয়াছে। অনেকখানি ছুটিয়া আসিয়া সেটা সুশীল কুড়াইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় শুভেন্দুর কোন একটা কথা মাথায় ঢুকিয়া পড়াতে সে এক-লম্ফে আসিয়া সেটা তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়াই চাহিয়া দেখিল যে, বিসর্পিতগতি চলন্ত ট্রেণের কোন একটি জানালার মধ্য হইতে একটি অস্পষ্টপ্রায় মুখচ্ছবি এখনও সেই দিকেই স্থির হইয়া চাহিয়া আছে। শুভেন্দু মনে মনে বলিল, "আরি বেঁচে গেছি রে!"

যাহাই হউক, লগেজগুলাকে নিজেরাই ধরাধরি করিয়া কোনমতে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। স্বর্ণলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিতেই শুভেন্দু তাড়াতাড়ি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া

বলিয়া উঠিল, "হাউডু ইউডু মাদার—ওঃ আই মীন্ (I mean) মা ! ভাল আছ ত ?"

স্বর্ণলতার অতি বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখে বহুকাল পরে একটা আনন্দের স্মিতরশ্মি ক্রীড়া করিতেছিল পশ্চিমাকাশের ; শেষ রক্তিমা সান্ধ্যধূসরতা ভেদ করিয়াও যেমন আত্মপ্রকাশ করে, তাঁহার বহু দিন পরে পাওয়া এই সন্তান-মিলনের আনন্দ এতই প্রচুরভাবে তাঁহার চিরসংযত চিরসমাহিতবৎ চিত্ত-ক্ষেত্র ব্যাপিয়া উঠিয়াছিল যে,তাহা ভাঁটাপড়া মরা নদীর বুকে আকস্মিক বন্যার প্লাবনের মতই যেন কুলুকুলু রবে ভরিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সানন্দচিত্তে তিনি তাঁহার প্রায়-অপরিচিত ছেলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেক কষ্টে সুখের অশ্রু সংবরণ করিয়া লইলেন। পরক্ষণেই শুভেন্দুর পার্শ্ববর্ত্তী তাঁহারই পদধূলি লইতে অবনততনু আর একটি শোভন-মূর্ত্তি তরুণের প্রতি তাঁহাকে মন দিতে হইল। মাতার বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টির নীরব প্রশ্নোত্তরে শুভেন্দু উত্তর দিল, "ও সুশীল, ভুবনবাবুর ছেলে ; তোমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছে," তাহার পর এ দিক ও দিক চাহিয়া ঘোর বিরক্তির সহিত সহসা বলিয়া উঠিল, "এ পাঁচ বছরে তোমাদের বাড়ীর পুরণো রূপ সমস্তই ত দেখছি ঠিক আছে ! দেখ, সুশীলকে যদি এককাপ চা-টা ক'রে দিতে পেরে ওঠো। আমাকেও দেবে অবশ্য সেই সঙ্গে দুএক কাপ, সেটা বলাই বাহুল্য।"

স্বর্ণলতার শুষ্ক মুখে যে সজীবতাটুকু দেখা দিয়াছিল—সেটুকু মরুসলিলবৎ নিমিষে নিঃশেষ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "এখন তোমরা নাওয়া খাওয়া ক'রে নিলে হ'ত না ? বিকেলে তখন চা খেতে—"

শুভেন্দু অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "উহুঁঃ,—সে হ'বে না। সে ভা-রী দেরী হবে। এক কাপ চা এখনই না খেলে শরীরের 'ম্যাজম্যাজানি' কিছুতে ঘুচবে না। যাও, দেখি, চট্ করে, নীলিকেও বরং ডেকে নিয়ে যাও, শীগ্‌গির যাতে হয়, তাই করো। ওঃ, মাদার, বি এ গুড্ গার্ল !"

স্বর্ণলতা বিপন্ন ভাবে থাকিয়া পরিশেষে মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "চা ত বাড়ীতে নেই, শুভু। বাজার থেকে ওবেলা আনিয়ে রাখবখন ; তাই বলছিলুম, দুপুর বেলা এখন নাই বা চা খেলি, চান ক'রে নিয়ে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাঁহার মনে পড়িল, হাঁড়িতে তাঁহার নিজের ভাগের কয়টি মোটা চাউলের ভাত আছে, আধখানা আলুভাতে ও একটুখানি ভাজাকলাইএর দালের সঙ্গে কয়েক খণ্ড পেঁপে সিদ্ধ মাত্র তরকারীর স্থানীয় হইয়া আছে। সেই জিনিষ এই দুই বহুমূল্য সিল্কের পাঞ্জাবী ও চকচকে পাম্পসু পরা সুন্দরকান্তি যুবাপুরুষের—তা' হউক সে নিজেরও ছেলে—কোলের সাম্‌নে ধরিয়া দিবার কথা মনে হইতেই স্বর্ণলতার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। জীবনে হয় ত এই প্রথম বারের জন্যই স্বর্ণলতার মন সম্পূর্ণভাবে নিজের কর্ম্মকে তারস্বরে ধিক্কার দিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল, মেয়েমানুষ হইয়া যদি তাঁহার জন্ম না হইত, ছেলে যদি তাঁহার না জন্মিত, সে ছেলে যদি ধনী বন্ধুর সঙ্গে না আসিত ! পরক্ষণেই আসন্ন বিপদের যথাসাধ্য প্রতিবিধানচেষ্টাও যে এই মুহূর্ত্তে করা অবশ্য প্রয়োজন, তাহা স্মরণে আশায় ত্রস্ত হইয়া "তোমরা ওই ঘরে কাপড়-চোপড় ছাড়, বাবা, আমি রান্না চাপিয়ে দিইগে।" বলিতে বলিতে যথাসাধ্য দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন।

শুভেন্দু পশ্চাৎ হইতে চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "ড্যাম্ ইওর রান্না ! রাঁধবে যা ছাই তা আমার জানাই আছে ! চা যে দিতে পারবে না, সে আমি আগাগোড়াই জানতুম, এমন জায়গায়ও মানুষ মরতে আসে। কাকাবাবুর যেমন কাণ্ড !—"

প্রায়-হতবুদ্ধি ও সঙ্কুচিত সুশীলের দিকে চাহিয়া সে বলিল, "তোমাকে শুদ্ধু আবার জোটালেন ! আমার বলে 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে,' তাই হয়েছে ! বাড়ীই যদি আমার বাড়ীর মত হ'বে, তবে আর এতকাল ধরে আমি পরের দুয়োরে ধন্না দিয়ে প'ড়ে আছি কেন ?"

সুশীল এতক্ষণ নির্ব্বাক বিস্ময়ে ও তাহার সহিত সমপরিমাণে মিশ্রিত ঘোর লজ্জাভিভূতভাবে মাতাপুত্রের মিলনকথা শুনিতেছিল এবং নিজেকেই ইহাদের এই বিপদ-বিড়ম্বনার হেতুভূত দেখিয়া অত্যন্তই লজ্জাকুল হইতেছিল। এখন স্বর্ণলতাকে প্রস্থিত হইতে দেখিয়া সে একটুখানি যেন শান্তিবোধ করিল এবং শুভেন্দুর একটুখানি কাছাকাছি সরিয়া আসিয়া বিব্রত স্বরে চুপি চুপি কহিয়া উঠিল, "কি

করছো, শুভূদা! কাকীমাকে কেন অত ব্যস্ত করচো? আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি, এমন সময় কোথায় কি ব্যবস্থা ক'রে তুলবেন? একটা বেলা চা না হয় না-ই খেলে। চুপ ক'রে যাও। এস কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলে একটু ঠাণ্ডা হওয়া যাক!"

বিরক্তি অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে শুভেন্দু সুশীলের এই কথার প্রত্যুত্তরে জবাব দিল, "যে বাড়ীতে মাথা গলিয়েছ, ঠাণ্ডা এখানে হতেই হবে। গায়ের সবখানি রক্ত জমিয়ে বরফ ক'রে না ফিরতে হয়, এখন!—"

উপেক্ষার চাপাসুরে অসন্তোষের সহিত সুশীল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কি কর, শুভূদা! কাকীমার মনে কত কষ্ট হবে এ সব শুন্‌লে, তা তুমি ভেবে দেখচো না?"

শুভেন্দু তার অষ্ট্রেলিয়ান হাল্কা রেশমের টানা দেওয়া পাতলা পাঞ্জাবীতে লাগান চুণি বসান সোনার বোতাম খুলিতে খুলিতে ভুরু কুঁচকাইয়া তীব্র করিয়াই উত্তর দিল,—"দেখ, সোজা ও সত্য কথাই বল্‌বো, তা'তে কা'র মনের মধ্যে গিয়ে কি হুল ফোটাবে না ফোটাবে, তা'র জন্যে প্যাঁচ লাগিয়ে কথা কওয়া আমার কোষ্ঠীতে লিখিত নয়; তার জন্যে তোমরা কবি মানুষরা আছ, কথার কাব্যি বানিয়ে হয়কে নয়, রাতকে দিন তৈরি ক'রে তোল। এই মিলী! একটু গরম জল এনে দে' দেখি, দাড়ীটা কামিয়ে নিই।"

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী।

অতীত

শুধু, গৌরবময় অতীত কাহিনী
স্মরণে কিছুই হবে না,
আজ, সম্মুখে তব বেড়ে ওঠে কায
নাহি যদি কর সূচনা।

অতীতে তোমার সব ছিল ভাল,
বেদ ও পুরাণ সভ্যতা আলো।
গৌরবে তা'রি কাটাইবে কাল
এই কি তোমার ধারণা?—
শুধু, গৌরবময় অতীত কাহিনী
স্মরণে কিছুই হবে না।

কর্ম্মের ভার নিয়েছ মাথায়,
ফিরিয়া কি যাবে প্রথম বাধায়,
ভগ্ন হৃদয়ে শুধু নিরাশায়
পাসরি' সকল কামনা?
শুধু, গৌরবময় অতীত কাহিনী
স্মরণে কিছুই হবে না।

তুমি পড়ে' রবে, তা'রা যাবে চ'লে,
তর্কে কি ফল বড় ছিলে ব'লে,
স্বপ্নে যদি না কর্ম্মের মাঝে
দাও গো নবীন চেতনা?
শুধু, গৌরবময় অতীত কাহিনী
স্মরণে কিছুই হবে না।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

সরখেজ
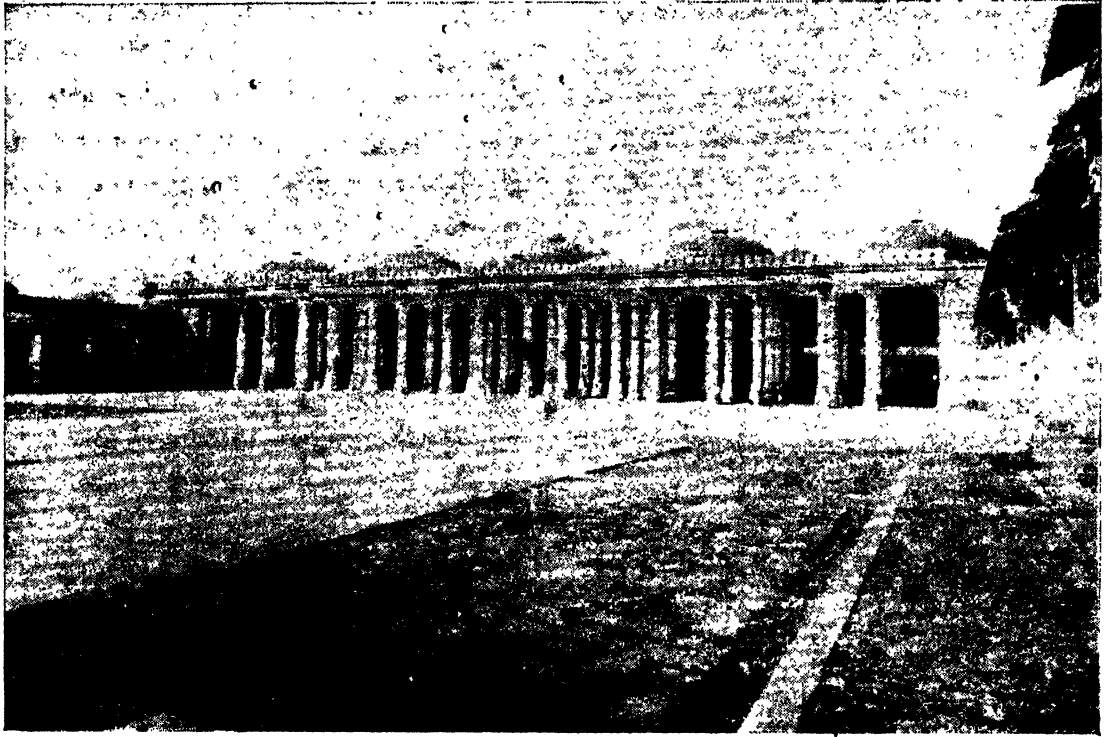
সরখেজের মসজিদ।

অহমদাবাদের চারিদিকে দূরে এবং নিকটে অনেকগুলি ছোট বড় নগর ও উপনগর আছে, তাহাদের মধ্যে সরখেজ, ঢোল্‌কা ও চম্পানের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চম্পানের কিছু দিনের জন্য গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদের রাজধানী হইয়াছিল। ঢোল্‌কা এবং সরখেজ অহমদাবাদের উপনগর বলিলেও চলে। কারণ, কলিকাতা হইতে বালি বা বারাসত যত দূরে অবস্থিত, এই দুইটি নগরও তত দূরে অবস্থিত। সরখেজ অহমদাবাদের দক্ষিণপশ্চিমে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অহমদাবাদ হইতে সরখেজ পর্য্যন্ত বেশ ভাল রাস্তা আছে এবং ঢোল্‌কা পর্য্যন্ত যে ছোট রেলপথ গিয়াছে, সরখেজ তাহারই একটি ষ্টেশন। রেলপথে অহমদাবাদ হইতে সরখেজে যাইতে হইলে সাবরমতী নদী পার হইয়া অহমদাবাদের পরপারে অবস্থিত এলিস্ ব্রিজ ষ্টেশনে রেলে উঠিতে হয়। অহমদাবাদের সরকারী বাগানের পাশ দিয়া সাবরমতী নদী পার হইবার একটি সেতু আছে, সেই সেতু অবলম্বন করিয়া এলিস্ ব্রিজ ষ্টেশনে যাইতে হয়।

এলিস্ ব্রিজ ষ্টেশন হইতে সরখেজ গ্রামটি প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গ্রামে হিন্দুর বাস অতি অল্প। গ্রামটিও এখন অত্যন্ত ক্ষুদ্র। গ্রামে যে সমস্ত মুসলমান অধিবাসী আছে, তাহারা অধিকাংশই বোম্বাইতে বা অহমদাবাদে কারবার করে। এই গ্রামে প্রাচীন আমলের যে সমস্ত দেখিবার জিনিব আছে, তাহাদের মধ্যে শেখ অহমদ খট্টু, গঞ্জবখ্‌শের সমাধি ও মসজিদ সর্ব্বপ্রধান। এই সমাধির নিকটেই গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজাদের একটি বিশাল দীঘি ও জলবিহারের প্রাসাদ আছে।

মখদুম শেখ অহমদ খট্টু, দিল্লীর সুলতান ফরোজ

তোগলকের রাজ্যকালের আমীর মালিক ইখতিয়ারুদ্দীনের পুত্র। ৭৩৮ হিজরায় অর্থাৎ ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহার সঞ্চিত অর্থ নানা উপায়ে নষ্ট করিয়া অবশেষে ফকিরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোধপুর রাজ্যে নাগোর নগরের নিকটে তাঁহার গুরু শেখ বাবা ইশ্‌হাক-ই-মগ্রিবীর বাস ছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে অহমদ বজিহ-উদ্দীন অহমদ-মগ্রিবী উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী অণহিলবারা পাটনে আসিয়াছিলেন। গুজরাটের স্বাধীন মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মজফ্‌ফর ও তাঁহার পুত্র প্রথম অহমদ শাহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। গুজরাটে তিনি শেখ তাঁহার রাজত্বকালে শেখ অহমদের সমাধির দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান হইয়াছিল। এই দীঘিটি ৮৩৯ ফুট লম্বা এবং ৭০০ ফুট চওড়া। ইহার চারিদিকে পাতরের সোপানশ্রেণী আছে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ বা মহম্মদ বিগাড়ার সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-মন্দিরটি শেখ অহমদের সমাধির এবং দীর্ঘিকার মধ্যে নির্ম্মিত, মহম্মদ শাহের সমাধির মধ্যে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পত্নীর সমাধি আছে। এই সমাধি হইতে জলে নামিয়া যাইবার স্বতন্ত্র সোপানাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। মহম্মদ শাহের সমাধি ৭৫ ফুট দীর্ঘ এবং ৭১ ফুট চওড়া। এই সমাধি-গৃহে দুইটি প্রধান কক্ষ এবং ইহাদের চারিদিকে বারান্দা আছে।
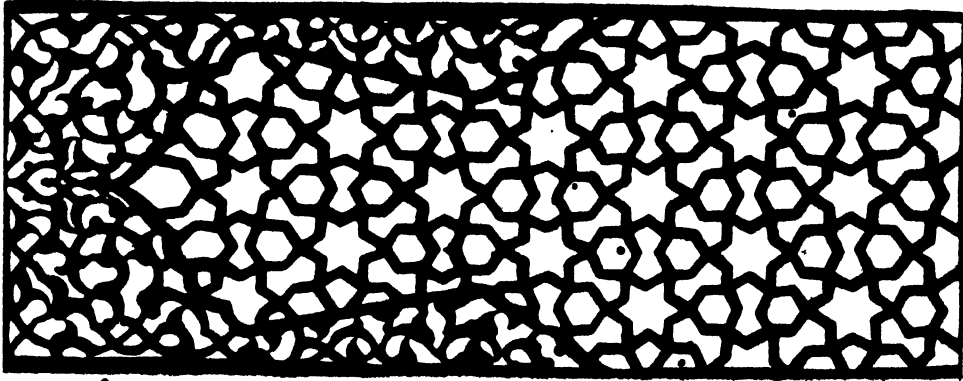
অহমদ খট্টু্র গঞ্জবখ্‌শের সমাধির জালি।

মখদুম অহমদ খট্টু্ গঞ্জবখ্‌শ নামে পরিচিত। শেখজী অহমদাবাদ নগর নির্ম্মাণকালে প্রথম অহমদ শাহের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে অহমদাবাদে বাস না করিয়া সর্‌খেজ গ্রামে আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন; অহমদাবাদ নগর ১৪১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল এবং এই ঘটনার ৪৫ বৎসর পরে ১১১ চান্দ্র বৎসর বয়সে শেখ অহমদের মৃত্যু হইয়াছিল।

গুজরাটের সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে এই মুসলমান সাধুর সমাধি নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সমাধির চারিদিকের মস্‌জিদ, সমাধি ও প্রাসাদগুলির নির্ম্মাণ মহম্মদ শাহের পুত্র কুতুবউদ্দীন ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে শেষ করিয়াছিলেন। গুজরাটের প্রসিদ্ধ সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ সর্‌খেজ অত্যন্ত পছন্দ করিতেন। সমাধিকক্ষ দুইটির মাঝখানেও একটি লম্বা বারান্দা আছে।

সুলতান মহম্মদ শাহের সমাধির দক্ষিণদিকে বিস্তৃত উঠানের মাঝখানে শেখ অহমদ খট্টু্ গঞ্জবখ্‌শের সমাধি-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত গুজরাটে এত বড় সমাধি-মন্দির আর কোথাও নাই। ইহা আকারে সমচতুষ্কোণ এবং ইহার এক দিক ১০৪ ফুট লম্বা। সমাধি-মন্দিরের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ কক্ষের মধ্যে সাধু সমাহিত আছেন। এই কক্ষের চারিদিকে স্তম্ভের অন্তরালে পাতরের জালি আছে। সাধুর কবর শ্বেত মর্ম্মরনির্ম্মিত এবং তাহার উপরে চন্দনকাষ্ঠের চারিটি স্তম্ভের মাথায় শুক্তি ও মুক্তা-খচিত চন্দনকাষ্ঠের চন্দ্রাতপ আছে। সমাধি-কক্ষের বাহিরের চারিদিকের বারান্দা কবরে পরিপূর্ণ।

এই সমাধি-মন্দিরের চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ এবং এই প্রাঙ্গণের দক্ষিণপশ্চিম কোণে মুসলমান মহিলা-দিগের বিশ্রামাগার এবং দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে সাধারণ রন্ধনশালা আছে। উৎসবের দিনে দলে দলে অহমদাবাদের মুসলমান নর-নারী রেলযোগে বা গো-শকটে সরখেজে আইসে এবং এক দিন বা দুই দিন অতিবাহিত করিয়া যায়। এই সময়ে এবং অন্যান্য পর্ব্ব উপলক্ষে সরখেজে মেলা বসে এবং মুসলমান মহিলারা স্থানাভাবে অনেক সময়ে শেখ অহমদাবাদের সমাধিমধ্যে বাস করেন। সরখেজের এই সমাধি দরগাহ্ নামে পরিচিত এবং এককালে এই দরগাহের

এই প্রাঙ্গণের তিন দিকে খোলা বারান্দা আছে এবং পশ্চিম-দিকে মসজিদটি অবস্থিত। নিজ মসজিদটি ১৫০ ফুট লম্বা এবং ৬৬ ফুট চওড়া। অহমদাবাদের অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এই মসজিদের পশ্চিমের দেওয়ালে ৫টি খিলান বা মিহরাব আছে। এই ৫টি মিহরাবের সম্মুখে ৫টি বড় বড় গুম্বজ এবং তাহা ছাড়া মসজিদের ছাতে আরও ৪০টি ছোট গুম্বজ আছে। মিহরাব ৫টিতে পাতরের খোদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মসজিদের অন্যত্র এবং অসংখ্য থামগুলিতে কারুকার্য্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। কারুকার্য্যবিহীন এমন সুন্দর মসজিদ ভারতবর্ষে

দীঘির পয়ঃপ্রণালী।
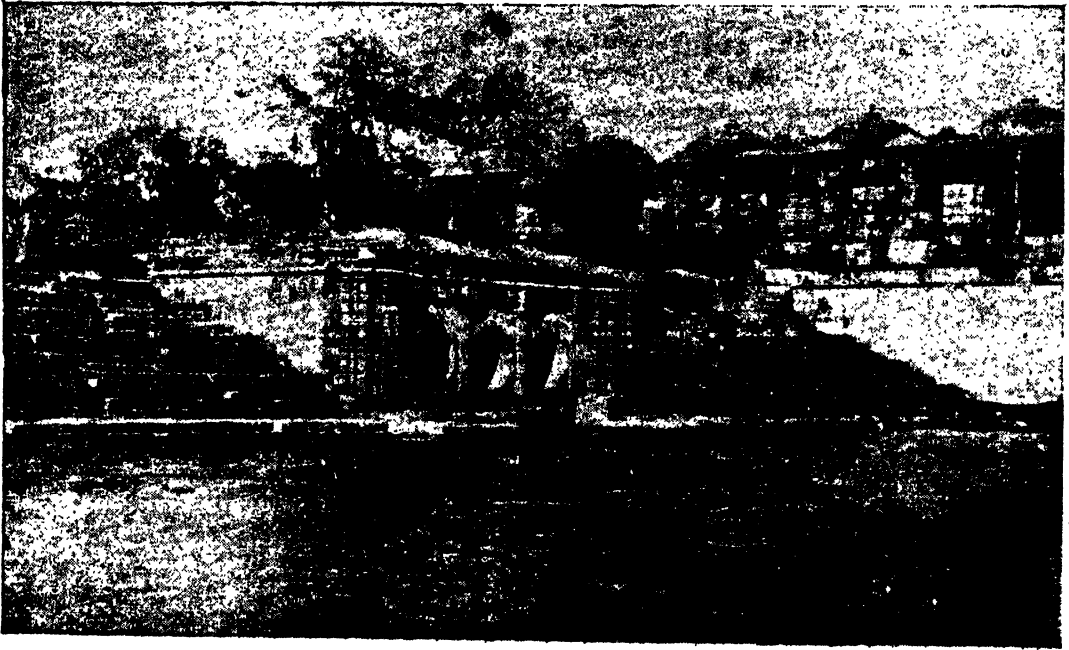
ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিস্তৃত ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। এখন তাহার সামান্য অংশ অবশিষ্ট আছে। এই সম্পত্তির ব্যবস্থার জন্য ইংরাজ সরকার একটি সমিতি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন। সেই সমিতির নাম সরখেজ ওআক্ফ কমিটী।

শেখ অহমদ খট্টু, গঞ্জবখশের সমাধি-মন্দিরের উঠানের পশ্চিমদিকে আর একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে এবং এই প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্তে একটি প্রকাণ্ড মসজিদ আছে। মসজিদের প্রাঙ্গণটি ১৭১ ফুট লম্বা এবং ১৫০ ফুট চওড়া।

আর একটি আছে, তাহা শাহজহান কর্ত্তৃক আগ্রার দুর্গমধ্যে নির্ম্মিত শুভ্র মর্ম্মরের মতি মসজিদ।

মসজিদের পশ্চাতে দীঘির উত্তর পাড়ে দীঘিতে জল আনিবার পয়ঃপ্রণালী আছে; এই পয়ঃপ্রণালীর ৩টি গোল নালার মুখে যে পাতরের খোদাইয়ের কায আছে, সে রকম খোদাইয়ের কায কেবল অহমদাবাদেই দেখিতে পাওয়া যায়, অহমদাবাদ সহরের বাহিরে দক্ষিণদিকে কঙ্করীয়া দীঘিতে এইরূপ পাতরের তৈয়ারী নালা আছে। এককালে এই ৩টি পাতরের নালা বন্ধ করিবার
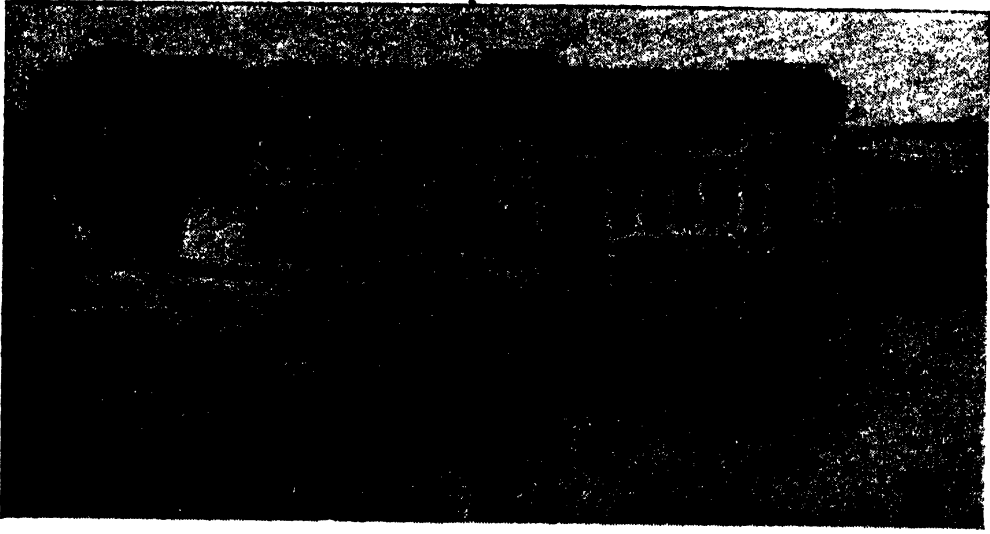
দীঘির তীরে মহম্মদ বিগাড়ার জলকেলির প্রাসাদ।

উপায় ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। বর্ষাকালে দীঘি জলে ভরিয়া যায় এবং সেই জল পরে চাষের জন্ত নহর দিয়া ক্ষেতে লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু দীঘির পঙ্কোদ্ধারের বা মেরামতের কোনই বন্দোবস্ত করা হয় না।

এই দীঘির পশ্চিম পাড়ে গুজরাটের সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ জলবিহারের জন্ত অনেকগুলি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে একটি দ্বিতল প্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদটি দীঘির সোপানাবলীর উপর হইতে উঠিয়াছে এবং ইহার সম্মুখে দুইটি বারান্দা আছে। বারান্দা দুইটি পাতরের থামের বারান্দার সম্মুখে স্থাপিত। পাতরের থামের বারান্দার ন্তায় এই ছোট বারান্দা দুইটি (Balcony) দ্বিতল। সন্ধ্যার সময়ে বাদশাহ এবং বেগমগণ প্রাঙ্গণের এই বারান্দার উপর বসিয়া জলক্রীড়া দেখিতেন। পাতরের বারান্দার পশ্চাতে সুলতানের বাসের জন্ত একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদ আছে। এতদ্ব্যতীত দীঘির দক্ষিণ পাড়ে আর একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। দীঘির পূর্ব্ব এবং পশ্চিম পাড়ে জলে হাতী নামাইবার জন্ত প্রশস্ত পাতর দিয়া বাঁধান পথ আছে। ঢোল্‌কার খান দীঘিতে এবং বীরমগ্রামের প্রাচীন দীঘিতেও এইরূপ হস্তী নামাইবার পথ দেখিতে পাওয়া যায়।

দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে এবং শেখ অহমদের সমাধি-মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক প্রকারের সুন্দর বাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়, আগ্রা, দিল্লী ও লক্ষ্ণৌতে এই রকমের বাড়ীর নাম বারদ্বারী, শেখ অহমদের সমাধির প্রাঙ্গণে যে বারদ্বারীটি আছে, তাহা সম-চতুষ্কোণ এবং ইহার প্রত্যেক দিকে ৩টি দুয়ার আছে। ১৬টি পাতরের থামের উপরে এই বার-দ্বারীর ছাত নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই ছাতে সমান আকারের ৯টি গুম্বজ আছে। ছাতের প্রত্যেক কোণে এক একটি মকরের মুখ আছে, মকরগুলি শুণ্ড তুলিয়া আছে এবং দেখিতে অতি সুন্দর। সর্‌খেজের দীঘির চারি-ধারে অধিকাংশ বাড়ীই পাতরের তৈয়ারী। পাতরের উপরে এক প্রকারের লেপ আছে, তাহা দেখিতে শাদা। যখন এই লেপ নূতন ছিল, তখন সর্‌খেজের সমস্ত মস্‌জিদ ও সমাধিগৃহ শুভ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইত।

অহমদাবাদে অনেকেই যায়েন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন সর্‌খেজে যায়েন? সর্‌খেজের ঘরবাড়ীগুলি এত সুন্দর এবং দীঘির তীরের স্থানটি এত রমণীয় যে, তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমাদের বাঙ্গালা দেশে কলিকাতার মত বড় সহরের নিকটে যদি এমন সুন্দর স্থান থাকিত, তাহা হইলে তাহা বোধ হয়, পিক্‌নিক্ পার্টিতে ভরিয়া যাইত। অহমদাবাদে অনেক বড় বড় হিন্দু ও জৈন ধনী আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অনেক হিন্দু ও জৈন ধনী সারাজীবন অহমদা-

মহম্মদ বিগাড়ার সমাধির নিকটে বারদ্বারী।
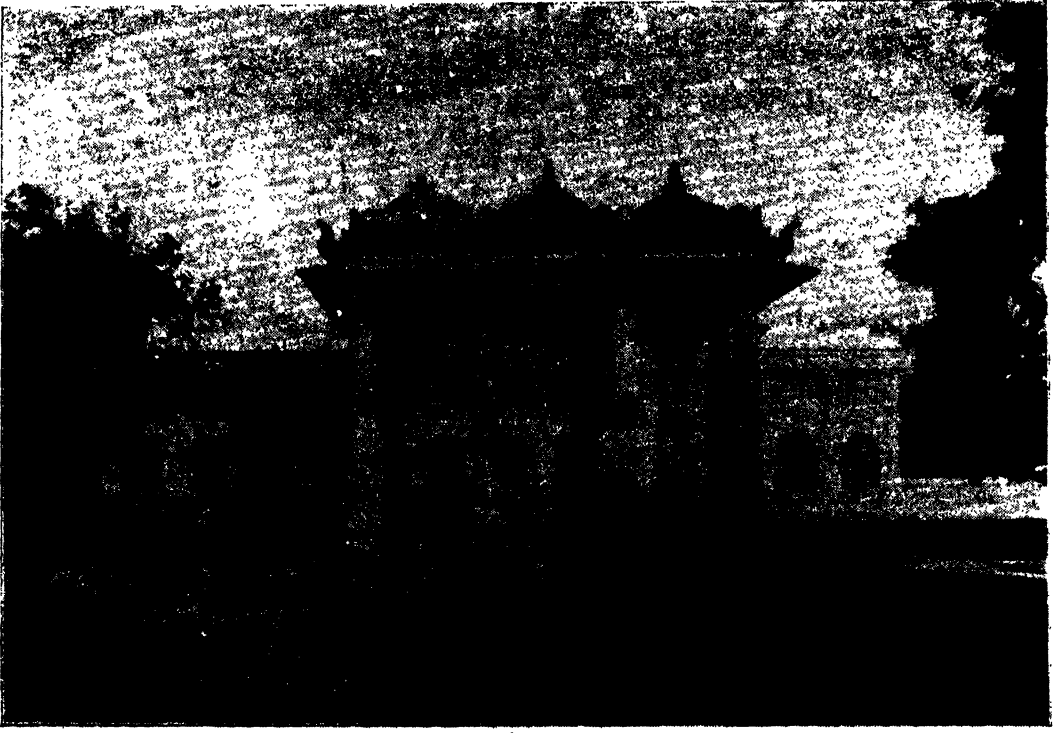
হিন্দু ও জৈনরা বড়ই মুসলমানবিদ্বেষী। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকগুলি দল আছে। বোম্বাইয়ের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে গুজরাটের বোহরা সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনশালী; কিন্তু তাঁহারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া সুন্নীর সমাধিগৃহ বা মস্‌জিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। দুই এক জন শিক্ষিত বোহরা উদারনৈতিক মতের অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গগত বদরউদ্দীন তায়েবজীর পুত্র শ্রীযুক্ত সলমান তায়েবজী যখন অহমদাবাদ জিলার একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তখন তাঁহার চেষ্টায় অহমদাবাদ জিলার অনেকগুলি প্রাচীন সৌধ ইংরাজ সরকারের খরচে মেরামত হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাম-দলন

অসংযত কামভোগ মহাহলাহল,—
জীবত্বের অভিশাপ শিবত্বের বাধা,
ভোগমায়া খেলে লয়ে কত অন্তরাধা,
ভ্রান্ত জীব পায় পদে সর্ব্বকামফল।

শ্মশানে মশানে যারা বিভূতি সাধনে
যোগমায়া মহামায়া কোকনদ-পদে
দেয় যারা আত্মবলি—পরমসম্পদে
পূর্ণ হয় আত্মা তার আত্ম-জাগরণে।

ছিন্নমস্তা-পদে যারা রতিসুখাতুর,
তারা কি চরণাশ্রিত,—লভিছে অভয়?
কামবিমর্দ্দন পদ ভক্তের আশ্রয়
প্রবৃত্তিদলন যজ্ঞ-নাশিতে অসুর।

নিত্য পশুত্বের দর্প করিতে সংহার,
রূপরূপান্তরে খেলা চলে অনিবার।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বঙ্গ-বিভাগ প্রত্যাহার জন্য আন্দোলন।

পূর্ব্বেই লিখেছি, বাহিরের উত্তেজনা ব্যতীত কি রকম ক'রে বিপ্লববাদের কায মিইয়ে যেত। বঙ্গ-বিভাগ ব্যবস্থা রদ করবার জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল, তার আগেও ঠিক তাই ঘটেছিল। দু'এক বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন ক'রে ফেলব, আর আমরা দেশ-উদ্ধারকারী ব'লে পূজা ইত্যাদি পা'ব, এ রকমের জল্পনা-কল্পনায় আমাদের আর একটুও বিশ্বাস ছিল না। 'ক'-বাবু যদিও বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে চ'লে গেছলেন, অন্যান্য নেতাদের চেষ্টায় কলিকাতায় আর 'অ'-বাবু ও সত্যেনের চেষ্টায় মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতির অস্তিত্ব মরে হেজে যা হ'ক এক রকম ক'রে বজায় ছিল।

বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কিন্তু ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ থেকেই উক্ত আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়। আর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রুস-জাপান যুদ্ধ সুরু হয়েছিল, এর প্রভাবও ঐ সালের শেষ ভাগে আমাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে অনুভূত হয়েছিল। প্রবলপরাক্রান্ত ভীষণকায় রুস জাতির উপর ক্ষুদ্রকায় জাপানীদের এই চূড়ান্ত বিজয় মরণোন্মুখ এসিয়াবাসীর পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী রসায়নের কায করেছিল। জাপানীদের শৌর্য্য-বীর্য্য ও অচিন্তনীয় শক্তি শুধু আমাদিগকে নয়, সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করেছিল। কালা আদমির দ্বারা গোরালোকের চির-পরাজয় সম্বন্ধে যে সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল, তা আবার তখনকার মত একটু অপসারিত হয়ে আমাদের মনকে নতুন আশায় পুনরুদ্দীপিত করেছিল। জাপানীরা আমাদের এসিয়াবাসী, আমাদের বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বী, আমাদের মতই ভাত খায়, আমাদের মতই ছোট-খাট, রোগাপট্‌কা ইত্যাদি ইত্যাদি। আজকাল অবশ্য তা'রা কালা ব'লে আর গৃহীত হয় না, স্বতন্ত্র এক পীতজাতি ব'লে স্বীকৃত। তখন কিন্তু তা'দিগকে শুধু আমাদের মত ব'লে নয়, আমাদের চেয়ে অসভ্য জাতি ব'লেই মনে করতাম।

এই সময় থেকে আমাদের মধ্যে অনেকে জাপানী জাতির প্রতি এক অদমনীয় প্রাণের টান অনুভব করেছিলেন, কিন্তু নেতাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকবার জন্য অন্য রকম মত প্রকাশ করতেন, এখনও অনেকে করেন। তাঁ'রা সকল বিষয় নিজেদিগকে বড় মনে করলেও জাপানীরা যা করেছে, তার শত ভাগের এক ভাগও করবার মুরোদ তাঁদের নাই ব'লে ক্ষোভ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করা ত দূরের কথা, দুনিয়ার সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে এই ব'লে সাফাই গাইতেন যে, "নিজস্ব হারিয়ে জাপান পাশ্চাত্যের অনুকরণ করেছে মাত্র। পরের নিয়ে কেউ বড় হ'তে পারে না, এই দেখ না পতন হ'ল ব'লে।" বড়ই মজার কথা এই যে, জাপান নিজস্ব পূর্ব্বধর্ম্ম ছেড়ে আমাদের (?) বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সভ্যতা কবে নিয়েছিল ব'লে আমরা তাকে দোষও দিই না, অধিকন্তু তার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের ও গৌরবের কথা ব'লে মনে করি। এ রকম অনেক বিষয়ে আমরা নিজে যে কাযকে ভাল মনে করি, অন্যের পক্ষে তা অনুচিত ব'লে ঘৃণা ক'রে থাকি। অবশ্য বচনে না হ'তে পারে, কিন্তু কাযে আমরা বিদেশীর যে রকম নিত্য একটু একটু ক'রে বেহুঁসে অনুকরণ করছি, জাপান অন্যের কাছে হুঁসে সে রকম অনুকরণ নয়, প্রচণ্ড বেগে শিক্ষা করছে, অথচ আমরা তা'কে অনুকরণ ব'লে ঘৃণা করছি! শিক্ষা ত অনেক দূরের কথা, সে রকম অনুকরণ করবারও শক্তি নাই বলেই না, আমাদের প্রভুরা দ্রাক্ষাফল টক, সে সপ্রতিভ জীবটি বলেছিল, তারই অনুকরণ করছেন।

সে যাই হৌক, য়ুরোপের এক অত বড় শক্তির উপর জাপানের জয়লাভ একটি অতীব গুরু ঐতিহাসিক ঘটনা।

আর জাপান যে পথ দেখিয়েছে, সে পথ অনুসরণ করা ছাড়া কোন পতিত জাতির নিস্তার নাই। আমরা মুখে যাই বলি না কেন, জাপানের অনুসরণ করতে না পারলেও কাযে কিন্তু বেহুঁসে অনুকরণ করছি। আমাদের দেশের সেই সময়কার রাজনীতিক আন্দোলনের উপর জাপানের এই ঘটনাটির প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল।

জাপানের এই ঘটনাটি বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের সমসাময়িক না হ'লে এবং যেমনই হোক পূর্ব্ব হ'তে বিপ্লববাদের বীজ ছড়ান হয়ে না থাকলে, চিরন্তন অভ্যাসানুযায়ী আমাদের এই আন্দোলন যথারীতি বোষ্টমী মতে কালীপূজারই মত হয়ে থেকে যেত।

বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব নাকচ করবার তীব্র আন্দোলন সত্ত্বেও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ঐ প্রস্তাব মঞ্জুর হ'ল। ঐ সালের ১৬ই অক্টোবর ঐ হুকুম কাযে পরিণত হ'ল। তার পরেও আবেদন-নিবেদনের চূড়ান্ত ক'রে যখন কোন ফল ফল্‌ল না, তখন প্রতিশোধস্বরূপ বিদেশী দ্রব্য বয়কট্ অর্থাৎ বর্জ্জন আর স্বদেশ-জাত দ্রব্য প্রচলনের চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। এই ব্যাপারটি "স্বদেশী আন্দোলন" নামে অভিহিত।

ইংরাজের কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমেরিকার যুক্তরাজ্যবাসীরা যখন যুদ্ধঘোষণা করেছিল, তখন বৃটিশ পণ্যবর্জ্জন ব্যাপারটিকে বয়কট্ নামে অভিহিত করা হয়। বয়কট নামক এক জন আইরিশ ক্যাপ্টেনকে প্রথমে একঘরে করা হয়েছিল, তাঁরই নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হয়ে গেছে। যাই হোক, তখন সেখানে বয়কটের সঙ্গে সঙ্গে ছিল অস্ত্রশস্ত্র, অর্থাৎ কি না যুদ্ধ। আর আমরা যুদ্ধব্যাপারটি বাদ দিয়ে, নিরাপদ বয়কট ব্যাপারটুকুর নিছক অনুকরণ করলাম।

অনুতাপের বিষয় এই যে, কে যে এ বয়কটের মতলব এখানে প্রথম দিয়েছিলেন, তাঁর নাম জানি না; তাই উল্লেখ করতে পারলাম না। বয়কটের সময় "বন্দে মাতরম্" কথাটিও প্রথম ব্যবহৃত হয়। কে যে এটি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরও নাম জানি না ব'লে আরও দুঃখিত হচ্ছি। আমাদের এই বিপ্লববাদে বঙ্কিমচন্দ্রের দান বিস্তর। তাঁ'র মধ্যে অনেক মন্দ জিনিষ আমরা পেয়েছি, কিন্তু ভালর মধ্যে ভাবে ও প্রভাবে "বন্দে মাতরমের" তুলনা নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকারের জাতীয় জয়োল্লাসব্যঞ্জক শব্দ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে আমার মনে হয়, কোনটাই ভাবে ও নাদের মাধুর্য্যে, আর অনুপ্রাণিত করবার শক্তির প্রভাবে এমন মহিমান্বিত নয়। সুদূর-ভবিষ্যতে যে দিন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লিখিত হ'বে, সে দিন বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' অনুকরণে অনুষ্ঠিত এই বিপ্লবচেষ্টা উল্লেখ-যোগ্য না-ও হ'তে পারে, অথবা যদি হয়, তবে সামান্য দু'চার কথায় নিতান্ত হাস্যজনক ব'লে বর্ণিত হ'তে পারে; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই "বন্দে মাতরম্" কথাটি উজ্জ্বলতম অক্ষরে তা'তে প্রতিভাত হ'তে থাকবেই।

তার পর বয়কট ও দেশজাত দ্রব্য প্রচলন চেষ্টার দ্বারা যখন ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া লাগ্‌ল না, অধিকন্তু গুঁতোটা আশটা লাভ হ'তে লাগল, তখন প্রতিশোধ নেবার প্রবৃত্তি আরও বেড়ে গেল। তা' চরিতার্থ করবার জন্য ক্রমে বোমা, রিভলবার প্রভৃতি জোগাড়ের চেষ্টা অনিবার্য্য হয়ে উঠল।

নিজ প্রাণ দিয়েও নিজ দেশবাসীর প্রতি আচরিত অন্যায়ের প্রতিশোধ দেওয়ার প্রবৃত্তি, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে নিতান্ত অভিনব, এর পরোক্ষ কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আপাত কারণ যে দু'টি, আগেই আমরা তা উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছি যে, গোড়াতে ইংরাজ সরকারের উপর সাধারণ লোকের যে ভয় ও ভক্তি ছিল, তা ক্রমশঃ কি ক'রে সন্দেহে, তা'র পর বিদ্বেষে পরিণত হয়ে আসছিল। সেই জন্য বিধবাবিবাহ বিল, সহবাস-সম্মতি বিল প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনও ক্রমে প্রবল আকার ধ'রে আসছিল। এই সকল আন্দোলন ব্যর্থ করাতে ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণতাও ক্রমে বেড়ে উঠছিল। সেই অনুপাতে বঙ্গবিচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তার ব্যর্থতাজনিত প্রতিহিংসাপরায়ণতা যতটুকু বাড়ার সম্ভাবনা ছিল, উপরি-উক্ত কারণ দুটির যোগাযোগে তার চেয়ে এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, যদিও, নিজেদের হাত ইংরাজের গায়ে তুলবার দুঃসাহস তখনও কারও গজায়নি, তথাপি অন্য কেহ ইংরাজের গায়ে হাত তুললে, বোধ হয়, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকে আশীর্ব্বাদ কেহ না ক'রে পারত না। বিপ্লববাদ আরম্ভের পূর্ব্বে

আমরা এই ক্রম মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলাম; তা'তে আমরা এই ভুল বুঝেছিলাম যে, দেশ ভীষণ বিপ্লবের জন্ম প্রস্তুত হয়েছে; সুরু ক'রে দিলেই সমস্ত দেশ বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়্বে। এ ভুল শুধু আমরাই করিনি, য়ুরোপের, বিশেষতঃ হতভাগ্য জার্ম্মাণীর ধুরন্ধর রাজনীতিজ্ঞরাও করেছিলেন ব'লে শুনেছি। স্বদেশী আন্দোলনের বক্তৃতা ও লেখার ভঙ্গী থেকে তাঁ'রা বোধ হয়, বুঝে নিয়েছিলেন যে, ভারতবাসী এমনই বিপ্লবোন্মুখ হয়ে আছে যে, উপলক্ষ মাত্র পেলেই, অর্থাৎ ইংরাজের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী যুদ্ধঘোষণা করলেই ইংরাজের রক্তে এ দেশ ভাসিয়ে দেবে। পরে এই ভুল বশতঃই আমরা এক্‌সন (action) সুরু করবার জন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেম, বিপ্লববাদের মারামারি কাটাকাটি অর্থাৎ ইংরাজ-বধ, ডাকাতী ও লুঠ ইত্যাদিকে তখন এক কথায় এক্‌সন্ (action) বলা হ'ত। এই এক্‌সনের বিফল চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি থেকে। তা আমরা পরের পরিচ্ছেদে লিখব। ঠিক এই সময় থেকে দেশে যে সকল উদ্যোগ-আয়োজন চল্‌ছিল, তাই লিখে পরিচ্ছেদ শেষ করব।

প্রথমে আমাদের কায হয়েছিল, এই আন্দোলনকে বিপ্লববাদ প্রচারের কাযে লাগান। প্রতিবাদ মিটিংএর আয়োজন ক'রে, তাতে আমাদের মতাবলম্বী বক্তা যোগাড় করা আর রুসো-জাপানিজ যুদ্ধের খবর টীকাটিপ্পনী দিয়ে এমন ক'রে বাড়িয়ে সাড়িয়ে বলা—যেন জাপানের মত প্রাণপণ যুদ্ধ ক'রে ইংরাজের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করা লোক অবশ্যকর্ত্তব্য ও সহজসাধ্য ব'লে মনে করে।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে আমরা যাঁ'কে দত্ত মহাশয় ব'লে উল্লেখ করেছি, তিনি হচ্ছেন, ভূতপূর্ব্ব 'যুগান্তর'-সম্পাদক স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তিনি কোন এক মাসিক পত্রিকাতে নিজে বিপ্লববাদের কথা লিখছেন, কাযেই তাঁ'র নাম আর হেঁয়ালিতে বলবার প্রয়োজন নাই ব'লে মনে করি। তখন তিনি বিপ্লববাদের প্রধান প্রচারক ছিলেন। তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। দেবব্রত বাবুর নিজের কোন দল ছিল না বটে, কিন্তু তিনি সকল দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এঁদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং আরও দু'এক জনের নেতৃত্বে কলিকাতার সমিতিগুলির মৃতপ্রায় উত্তম ও বিপ্লববাদে বিশ্বাস আবার সজীব হয়ে উঠল।

মেদিনীপুরে অ-বাবু ও সত্যেনের চেষ্টা তীব্রবেগে চল্‌ছিল। এখানকার স্কুলকলেজের অনেকগুলি ছেলে নিয়ে সত্যেন যে গুপ্ত সমিতির কর্ম্মীর দল গঠন করেছিল, তাতে এই সময় প্রসিদ্ধ ক্ষুদিরাম প্রবেশ করে। তার বিবরণ বিশেষ ক'রে পরে দেবার চেষ্টা করব।

মেদিনীপুরের পাড়াগাঁয়ে ম্যাজিক ল্যাণ্টারণ দেখিয়ে বিপ্লববাদ প্রচার আর সমিতির তরফ থেকে কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা খুলে প্রচারকদের আড্ডার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সময় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তীকে (এখন তিনি ডাঃ, সি, কে, চক্রবর্ত্তী) আমরা প্রথমে স্বদেশী মিটিংএ বক্তৃতা দেবার জন্তে পেয়েছিলাম। ক্রমে তিনি আমাদের সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক জন শক্তিশালী প্রচারকের কায করছিলেন। নদীয়ার নিরাপদ রায় ওরফে নির্ম্মল ও শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ সরকার এই সময় এখানকার বিপ্লবসমিতিতে গৃহীত হয়েছিল। নিরাপদ বোধ হয় ইহলোকে নাই। বিপ্লবসমিতির যোগ্য কর্ম্মী হ'তে হ'লে যে সকল গুণ প্রয়োজন, তাঁ'র সে সকল গুণ যে পরিমাণে ছিল, তেমন আর কারোও ছিল কি না সন্দেহ।

তাঁতশালা নাম দিয়ে এই সময় মেদিনীপুরে একটি গুপ্তসমিতির আড্ডা খোলা হয়েছিল। বাপ-মা, বাড়ীঘরদোর ছেড়ে যে সকল ছেলেরা গুপ্তসমিতির কাযে আত্মসমর্পণ করত, তাঁরা এই আড্ডায় ঘরে থাক্‌ত। এই আড্ডায় একটি তাঁত ছিল। বিভূতি ছিল তাঁতগুরু।

জামালপুরে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুপ্রতিমা ভাঙ্গা ও হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, বোধ হয়, এই সময়ের কিছু পরে ঘটেছিল। এই ঘটনা থেকে ঢাকা অনুশীলন-সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী নাকি পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। মুসলমানের অত্যাচার থেকে হিন্দুকে রক্ষা করবার জন্ত শক্তির অনুশীলনই হয়েছিল প্রকাশ্য উদ্দেশ্য। এই অনুশীলন শব্দটি বঙ্কিমবাবুর 'অনুশীলনতত্ত্ব' থেকে গৃহীত ব'লে আমার মনে হয়।

এই আন্দোলনের সুযোগে, ক্রমে বাঙ্গালা দেশে প্রায় সর্ব্বত্র স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের ও বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনের বিরাট আয়োজন চল্‌তে লাগল, সেই সঙ্গে স্থানে স্থানে স্কুলকলেজের বালক ও যুবকদের নিয়ে, তাঁতশালা, ছাত্রভাণ্ডার, আখড়া ইত্যাদি নানা প্রকার নামের, স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় ও

প্রস্তুতের সমিতি, দোকান ও কারখানা, এবং বিলাতী দ্রব্য প্রচলনে বাধা দেওয়ার জন্য অনুষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল; কত মাল বোঝাই গাড়ী লুঠ হ'ল, বিলাতী দ্রব্যের কত দোকান পুড়ে ছাই হ'ল, মারামারি, মাথা ফাটাফাটি চল্‌ল, প্রচণ্ড বেগে পুলিসের শাসনদণ্ড স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠল, গ্রেপ্তার এবং কারাবাসও অনেকের ভাগ্যে জুটল। পিটুনী পুলিস অনেক স্থানে বস্‌ল, এই প্রকারে বাঙ্গালাদেশে হুলস্থুল প'ড়ে গেল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাঙ্গালার অনুকরণে স্বদেশী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে লাগল।

বিপ্লববাদীদের চেষ্টায় কলকাতায় ছাত্রভাণ্ডার নামে স্বদেশী দ্রব্যের একটি দোকান খোলা হয়েছিল। তার শাখারূপে মেদিনীপুরেও ছাত্রভাণ্ডার খোলা হ'ল, প্রত্যেক জিলায় স্বদেশী অনুষ্ঠানগুলি বিপ্লববাদীদের অধীনে এনে অথবা তা'র চালকদিগকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে সেগুলিকে গুপ্তসমিতির কেন্দ্রে পরিণত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই প্রকার চেষ্টার ফলে কয়েকটি জিলায় কেন্দ্রও স্থাপিত হ'ল।

স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের দৈনিক 'সন্ধ্যা' জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হয়েছিল। ইংরাজের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য, ঘৃণা-বিদ্রূপ প্রভৃতির ভাব প্রচারে 'সন্ধ্যা' ছিল অদ্বিতীয়; কিন্তু 'সন্ধ্যা' বিপ্লব-বাদীদের নিজেদের কাগজ ছিল না। দেশীয় লোকদের দ্বারা চালিত অন্য অনেক সংবাদপত্রের তখন সুর বদলে গেছল।

স্বর্গীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' এই সময় প্রকাশিত হয়েছিল। সখারাম বাবুর নিজের কোন বিশেষ দল না থাকলেও ইনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিপ্লববাদ প্রচারের সাহিত্য কেবল সখারাম বাবুই এই সময় লিখেছিলেন, তাঁহার সাহিত্যের মধ্যে দেশাত্মবোধ (sense of nationality) জাগাবার মত যুক্তিও বেশী কিছুই ছিল না, তথাপি তাঁর 'দেশের কথা' বইখানা একবার যাঁ'রা পড়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ঘোর ইংরাজবিদ্বেষী না হয়ে পারেন নি। অকাট্য প্রমাণ সহ ইংরাজের অনাচারের বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত এমন সব জলন্ত নজীরের বই, বোধ হয়, আর নেই, আর হবেও না।

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য এ ছাড়া যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী ও অন্যান্য কয়েকখানা বইর নাম পূর্ব্বে করেছি, সেগুলি আরও বেশী ক'রে পঠিত হ'তে লাগল। আমরা যত পেয়েছি, এ সব বই বেচেছি, অনেক স্থলে বিনামূল্যে দিয়েছি।

কোন আদর্শ বা ভাবপ্রচারের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। সে সময় বিপ্লববাদ প্রচারের জন্য যে সকল সাহিত্য প্রকাশিত হয়েছিল, অথবা যে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত সাহিত্য পুনঃ প্রচারিত হয়েছিল, তার কোনখানিতে দেশের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়, দেশ কাকে বলে, দেশের স্বাধীনতাতে দেশবাসী সাধারণ লোকের কি স্বার্থ, তাদের সমষ্টিগত স্বার্থের (national interest) জন্য কেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে, এ সকল তথ্য বিশেষরূপে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম করাবার জন্য সহজে বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন কিছু তখনও লিখিত হয়নি; এমন কিছু এখনও লিখিত হয়েছে কি না, জানি না, লিখবার প্রয়াস কখনও কখনও দেখতে পাই, কিন্তু তা এক প্রকারের প্রলাপ ব'লে মনে হয়। তার কারণ, তা অনেক স্থলে লোকে বুঝতে পারে না, আর বুঝলেও তা মনের উপর বিশেষ কোন কায করে না।

সেকালের সাহিত্যে এবং বিপ্লববাদ প্রচারকালে বচনে স্বাধীনতার আবশ্যকতা যা প্রতিপন্ন করা হ'ত, মোটামুটি তা ছিল এই—হিন্দু রাজত্বের আমলে দেশে দারিদ্র্য একেবারে ছিল না, এমন কি, মুসলমান রাজত্বকালেও এমন দারিদ্র্য ছিল না, এখন ইংরাজের অধীনতার ফলে তা যেমন তীব্রবেগে বেড়ে চলেছে। দারিদ্র্যই সকল অকল্যাণের কারণ; ইংরাজের অধীনতা থেকে দেশ উদ্ধার করতে পারলেই দেশের সকল কল্যাণ আবার ফিরে আসবে। এত খাজনা দিতে হবে না, নুণের টেক্স, চৌকীদারী টেক্স, পণ্য দ্রব্যের টেক্স প্রভৃতি কিছুই দিতে হবে না। ধান, চাল, মাছ, দুধ, কাপড়চোপড় আদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দাম একবারে কমে যাবে; লোকে প্রাণ ভ'রে খাবে, আর সাধ মিটিয়ে পরতে পাবে, তা হলেই আর রোগ, শোক প্রভৃতি অকল্যাণ কিছু থাকবে না। বিদেশী চালচলন অনুকরণ ক'রে, এমন কি, বিদেশী শিক্ষাপ্রণালীর ভিতর দিয়ে বিদেশী জ্ঞান লাভ ক'রে, আমরা আমাদের সনাতন সভ্যতা আর ধর্ম্ম হারাতে বসেছি। ধর্ম্মানুমোদিত নীতি ভুলে বিদেশীর অনুকরণে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠছি; বিদেশীর চাকরী

ক'রে স্বদেশীরা আত্মসম্মান হারিয়েছি ইত্যাদি। এ রকম মিথ্যা দিয়ে কোন কায সিদ্ধ হয় না অথবা সে কাযে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। সে মিথ্যার উদ্দেশ্য সৎ (Pious fraud) ব'লে নেতারা দাবী করতে পারেন এবং তা সম্ভ দেখতে শুনতে মঙ্গলজনক ব'লে মনে হ'তে পারে, কিন্তু তার পরিণাম কখনও মঙ্গলজনক হ'তে পারে না।

এই সকল কথা যে কতদূর অসত্য ও ভ্রান্তিমূলক, তা আমরা ত জানতাম না, অনেক নেতাও জান্‌তেন কি না সন্দেহ। কারণ, সকল নেতাই এই সকল তথ্য সত্য ব'লেই সমর্থন ক'রে এসেছেন, কখনও এর প্রতিবাদ বা এর বিপরীত মত প্রকাশ করেননি। এখনও তাই।

অন্য অনেক দেশবাসীর তুলনায় এ দেশের লোক নিশ্চয় নেহাত দরিদ্র, অথবা এ দেশবাসী যদি উন্নতচরিত্র হয়ে সর্ব্বসাধারণের হিতকরী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করতে পারত, তবে নিশ্চয় দেশবাসীর দারিদ্র্য তখন অনেক লাঘব করতে পারত। এই ভবিষ্য অবস্থার তুলনায় এখন আমরা দরিদ্র ব'লে দুঃখ করতে পারি, কিন্তু বর্ত্তমান দারিদ্র্য অপেক্ষা সেকালের দারিদ্র্য যে কি রকম নিদারুণ ছিল, তার বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইমাত্র বলা যেতে পারে যে, হিন্দু কিংবা মুসলমান আমলে দারিদ্র্যের চরম ছিল, কিন্তু সে দারিদ্র্য-জনিত ক্লেশ-বোধ একেবারে কিছুই ছিল না। তখন প্রায় সবই অভাব ছিল, কিন্তু সে অভাবের বোধ একটুকুও ছিল না; এ প্রকারের অবস্থাকে নেতারা দেশবাসী জনসাধারণের বড় সম্পদের বা প্রাচুর্য্যের অবস্থা ব'লে ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয় পূর্ব্বেও আলোচিত হয়েছে।

অভাব-বোধের অভাব অথবা দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভূতির অভাবই আমাদের সকল অকল্যাণের আদি কারণ। নইলে যাদের আমরা অসভ্য আদিম নিবাসী ব'লে ঘৃণা করি, তাদের ঐ দুটি জিনিষ নাই ব'লেই ত তারা ভারতবাসীর বাঞ্ছিত তথাকথিত শান্তিতে ও সুখে, কোন ট্যেক্স বা খাজনার ধার না ধেরে, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে তাদের অত্যল্পব্যয়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ ক'রে অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্থ দেহে হাজার হাজার বছর এক ভাবে কাটাচ্ছে। দেশ স্বাধীন ক'রে দেশবাসীকে কি নেতারা এই রকমের সুখ ও শান্তি দিতে চেয়েছিলেন বা এখনও দিতে চান ?

তার পর এ অকল্যাণের কারণ যতটা ইংরাজের অধীনতা বা বিদেশীয় অনুকরণ, তার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল কারণ যে আমাদের সনাতনধর্ম্ম, তাও পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে দেখান হয়েছে। যে লোকমত দ্বারা মানুষ সর্ব্ববিষয়ে চালিত হ'তে বাধ্য হয়, আমাদের দেশের সেই লোকমত এই ধর্ম্মের দ্বারা অনুশাসিত, কাযেই সমাজের শাসকসম্প্রদায় অর্থাৎ ভদ্রশ্রেণীর স্বার্থের ইহা পোষক। শূদ্র নামে অভিহিত, সমাজের পনর আনা অংশকে চিরদাসে পরিণত ক'রে রাখাই হচ্ছে ভদ্রশ্রেণীর আপাত স্বার্থ, সাহিত্য-সৃষ্টির কায এই ভদ্রশ্রেণীর হাতে, অথবা যাঁরা সাহিত্যিকের আসন পরিগ্রহ করেন, তাঁরা নিজেরা ভদ্রশ্রেণীভুক্ত ব'লেই অনুভব করেন, তাঁদের কারোও মধ্যে শূদ্রের বা ইতরসাধারণের অবস্থার অনুভূতি সম্ভব হয় না। কাযেই জনসাধারণের মধ্যে একটুখানিও স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিলে না জানি কি ভীষণ অঘটন ঘটবে, এই ভেবে তাঁরা শিউরে উঠেন। স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'রবার অর্থাৎ নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা সাব্যস্ত সত্যকে যাতে গ্রহণীয় ক'রে জনসাধারণ নিতে পারে, সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা তাই আমাদের সাহিত্যের মধ্যে স্থান পায় না। তাই বলছিলাম, যাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার পথ বন্ধ, তাদের পক্ষে রাজনীতিক কেন, কোন রকম স্বাধীনতা লাভ করা বন্ধ্যার সন্তানলাভের মত অসম্ভব। এ হেন বিরাট অসম্ভব ব্যাপার সাধনের জন্য বিপ্লববাদ প্রচারের উপায়স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত নগণ্য সাহিত্যকেই নেতারা যথেষ্ট মনে করেছিলেন।

ঐ সময় অসংখ্য স্বদেশী গান রচিত হয়েছিল। পূর্ব্বে যে সকল গান বহুকাল হ'তে চ'লে আসছিল, প্রায় সকল রকমের গায়করা তার বদলে অনেক স্থলে স্বদেশী গান গাহিতে সুরু করেছিলেন।

ঐ সময়ের অনেক পূর্ব্বে কয়েকটি স্বদেশী সঙ্গীত রচিত হয়েছিল এবং বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। গোবিন্দ রায়ের—"কত কাল পরে বল ভারত রে দুঃখসাগর সাঁতারি পার হবে," হেমচন্দ্রের—"বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়,"

বোধ হয়, কাব্যবিশারদের—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান" এবং আরও দু'একটি গানের সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রচিত গানগুলির তুলনা হয় না। যে গানগুলি তখন রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় সব স্বদেশের সৌন্দর্য্য আর মহত্ব বর্ণন অথবা বৃথা গৌরবসূচক, বাকী বিদেশীর অন্যায় অত্যাচারের কীর্ত্তন। তাতে ক'রে ভারতে জন্মেছি ব'লে গৌরব অনুভব করা যেত, বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হ'তে পারতাম, আর তাতে বেশ এক প্রকার তৃপ্তির অনুভূতি হ'ত। তাই ভারতের জনসাধারণ চিরক্রীতদাস ব'লে, অথবা যখন জগতে প্রায় সকল জাতি এত উন্নত, তখন আমরা এত অবনত অবস্থায় প'ড়ে আছি ব'লে, লজ্জা-ঘৃণাদির জ্বালা অর্থাৎ দুঃখানুভূতি আমাদের মনে আসতে দিত না। আমাদের মাতৃভূমির মত সুন্দর, উর্ব্বর, রত্নপ্রসবিনী, পুণ্যদা এবং জ্ঞানদা দেশ আর কোথাও নাই, তাই আমরা দেশকে ভালবেসে ধন্য; আর যাকে ভালবাসি, তার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ বা প্রাণ দিয়েও ধন্য হব, এই মুখ্য বা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্যে বোধ হয় গান রচিত হয়েছিল।

কিন্তু আমাদের মাতৃভূমি যদি সর্ব্ববিষয়ে সুন্দর ও অন্য দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হয়, তা হ'লে কি আমরা তাকে ভালবাসব না? তবে কি স্বদেশের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? অতীত গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার মত কোন কিছু যদি এ দেশে না থাকত, তবে কি আমরা আমাদের দেশকে ভালবাসতে পারতাম না? যে দেশে এই রকম অতীত গৌরবের কিছুই নাই, সে রকম দেশবাসী উন্নত হ'তে পারেনি ব'লে কি ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়? বরং যে দেশবাসী অতীত গৌরবে যত দিন গৌরব অনুভূতির তৃপ্তি উপভোগ করে, তত দিন যে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকে, তা কি ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না? পৃথিবীর অন্য সকল দেশের তুলনায় কোন্ বিষয়ে আমাদের দেশ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? আমাদের দেশের তুলনায় কোন্ উন্নত দেশে এত রকম ঘৃণিত মারাত্মক ব্যাধি নিত্য বিরাজমান? এত রকমারী দৈব-দুর্বিপাক নিরত কোন্ উন্নত দেশে ঘটে? এমন দারিদ্র্য কোন্ সভ্যদেশে এত অধিক? এমন অজ্ঞানতা, পাপপরায়ণতা আর ধর্ম্মের নামে মানুষের উপর মানুষের এমন অত্যাচার আর কোন্ দেশে আছে? এক কথায় এমন মনুষ্যত্বহীনতা, বোধ হয়, নেহাৎ অসভ্য জংলীদের দেশ ছাড়া আর কোথাও নাই। যারা চোখ থাকতে অন্ধ অর্থাৎ নিজ প্রত্যক্ষ অস্বীকার ক'রে প্রবঞ্চকের বর্ণিত অবোধ্য কল্পনাকে যারা সত্য ব'লে গ্রহণ করে, তারা ভিন্ন অন্য কেহ কি এ সকল তথ্য অস্বীকার করতে পারে? যদি না পারে, তবে কি মনুষ্যত্বহীন আমরা আমাদের এই দেশমাতাকে ভালভাসব না? মা, সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে, আর প্রাণজুড়ান রূপকথা শুনিয়ে আমাদের ঘুম পাড়ান ব'লেই কি আমরা মাকে ভক্তি করব, অথবা মা'র প্রতি কর্ত্তব্যপালন করব? আর মা রোগগ্রস্তা দরিদ্রা হ'লে তখন মা'র প্রতি কি আমাদের কোন কর্ত্তব্য থাকবে না? উক্ত স্বদেশী গানগুলির রচয়িতাদের সকলে না হোন, অনেকে এ সকল কথা জানেন, ভাবেন, অতি ভয়ে ভয়ে হেঁয়ালীর ভাবে গানে ও সাহিত্যে তা প্রকাশ করেন। কিন্তু লোকমতের যাঁরা কর্ণধার, সেই তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর নিকট তাঁদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত popularity হারাবার ভয়েই স্পষ্ট কথা বলতে পারেন নি।

এই কারণে ঐ সকল গান ও সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যারা বিপ্লববাদের কাযে ঝাঁপিয়ে এসেছিল, যত দিন এ কাযে যশ, মান, আদর, গৌরব ছিল বা এ সকলের আশা ছিল, তত দিন তাদের মধ্যে স্বদেশহিতৈষণার খুব বহর দেখতে পাওয়া যেত। তার পর যখনই বিপদ এসেছে বা দুঃখভোগের পালা আরম্ভ হয়েছে, তখনই দেখেছি, এপ্রুভার (approver), ইনফরমার (informer) হওয়ার জন্য সাধাসাধি, আর রাতারাতি মতটি বদলে যাওয়ার হুড়াহুড়ি প'ড়ে গিয়েছে।

সে সময়কার স্বদেশসঙ্গীতে অনেক স্থলে ভাবের উন্মাদনা ছিল, কিন্তু কর্ম্মের প্রেরণা বড় একটা ছিল না। তাই আমাদের মধ্যে ভাবপ্রবণতার এত বাড়াবাড়ি আর কাযের বেলায় ঠুঁটো জগন্নাথ। কথা জোড়াতাড়া দিয়ে ভাবের পাঁয়তাড়া দিলে স্বাধীনতা, স্বরাজ অথবা ভগবান্‌লাভের নামে পরমবাঞ্ছিত লোকপূজা (popularity) যদি লভ্য হয়, তবে লোকচক্ষুর আড়ালে কষ্ট-দায়ক কঠোর কর্ম্মের জাঁতায় আর কে পিষ্ট হ'তে চায়? তাই ত এ দেশে কেবল বচনে স্বদেশ উদ্ধার করবার জন্য লোকের অভাব নাই।

থাই হোক, অন্ততঃ একটি গান উক্ত প্রকারের স্বদেশ-সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল-না ব'লে আমি জানি। যখন আমরা আলিপুর জেলে "কুঠরীবদ্ধ" ছিলাম, তখন এক দিন একটা কুঠরী থেকে বদলি হয়ে আর একটাতে ঢুকে দেখি, মেজেতে এই গানের কয়েক-লাইন খোদকারী ক'রে লেখা রয়েছে। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত সেই নাকটেপার দলে এ গান কে লিখতে গেল, তাই ভেবে তখন আকুল হয়েছিলাম। পরে কিন্তু সে রত্নকে চিন্‌তে পেরেছিলাম। সেটি গান কি কবিতা, বুঝতে পারিনি। খুঁজে পেতে যতটুকু তার পেলাম, তা এই :—

তুমি যদি হতে ব্যর্থ মরুভূ উষর,
অথবা বিকট রুক্ষ কঠিন কঙ্কর,
হতে যদি আলোহীন তুহিনের দেশ,
নাহি যেথা শ্যাম-শোভা গীত গন্ধ লেশ,
হতে যদি বর্ব্বরের বিহারের ভূমি,
তবু এই জীবনের তীর্থ হতে তুমি।
আফ্রিকার মরুভূমি সুইস পাষাণ
হতে যদি তবে মাতঃ তোমার সন্তান
হইত না এইরূপ ক্ষীণ কলেবর
হইত না এইরূপ নারী

* * * *

এইমত ভক্তিভরে প্রদোষ প্রভাতে
তোমার চরণ-ধুলি লইতাম মাথে।
তোমার অতীত মোরে করেনি পাগল,
ভাবী আশা করিছে না আমারে চঞ্চল,
জন্মক্ষণে শিশু চিনে যেমন মাতায়,
আমিও তেমনি মা গো, চিনেছি তোমায়,
আমি জানি ভাগ্য মোর তব সনে গাঁথা
জন্মজন্মান্তর হতে, অয়ি চির-মাতা।

[ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগোই।

বর্ত্তমান

উজ্জ্বলতর, কল্যাণকর
এসেছে বর্ত্তমান ;
অন্ধ তিমির বক্ষ ভেদিয়া
সম্মুখে আগুয়ান।

এসেছে বর্ত্তমান,
সাথে লয়ে তা'র উদ্দাম আশা
চির-চঞ্চল প্রাণ।
অবিরামগতি নিরত সে ধায়,
সুদূরের মাঝে মিলাইতে চায়—
অমরার বুঝি আলোক ছুয়ায়
ভাজিয়া ডেকেছে বাণ ;
পুলক-পরশ অঙ্গে লেগেছে
মরণে জেগেছে প্রাণ—
সম্মুখে আগুয়ান।

এসেছে বর্ত্তমান,
আজিও যা' তা'র হয়নি পূর্ণ
করিতে তা' সমাধান।
তপ্ত তাহার বক্ষের লোর
বিশ্বাস তা'র বজ্র-কঠোর,
যক্ষের মত লক্ষ্য তাহার
গাহে মোক্ষের গান ;
বিশ্ব প্রণত চরণ-যুগলে
রক্ষিতে অরি-মান,—
সম্মুখে আগুয়ান।

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

সমাজে নারীর স্থান

৩
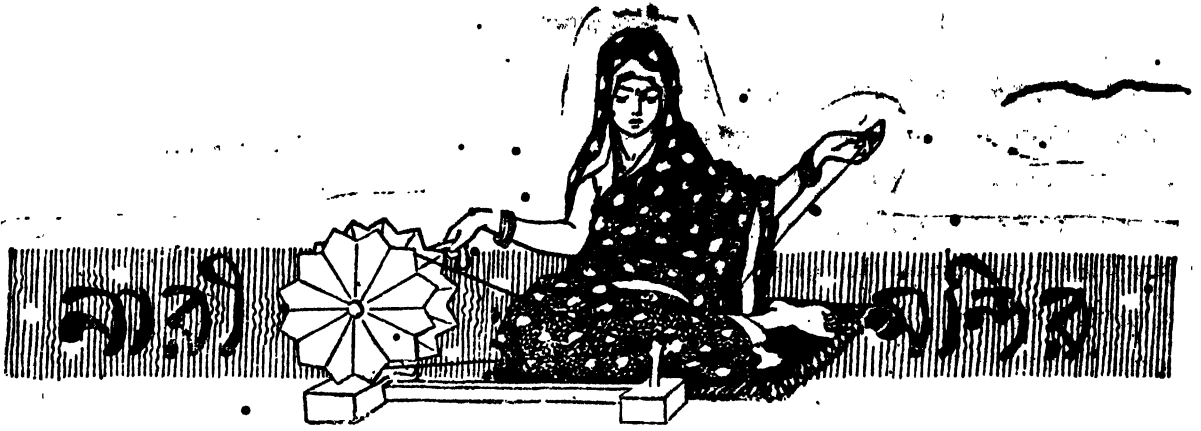
সমাজে নরনারী বিধিনিষেধ মানিয়া চলিয়া থাকে, না মানিলে সমাজে শৃঙ্খলা থাকে না। মানুষসৃষ্টির আদিকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অভাব যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই পরিমানে বিধিনিষেধের বন্ধনও ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মানুষের স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী ও স্বাধীনতাপ্রিয় প্রকৃতি অভ্যাস ও সংযমের অনুবর্ত্তী হইয়া নিয়মানুগ পথে চলিয়া থাকে বটে, কিন্তু মনোবৃত্তির সম্যক্ স্ফুরণে বাধা প্রাপ্ত হইলে সমাজের নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধের গণ্ডী অতিক্রম করিতে চাহে,—সময়ে সময়ে সেই বিদ্রোহ সামাজিক আচারব্যবহারের বিরুদ্ধে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

আমাদের দেশে নানা কারণে নানা দিকে এখন বিদ্রোহের ধ্বজা উত্থিত হইয়াছে। যাহাকে অধুনা 'শিক্ষিত সমাজ' বলা যায়, তাহার অধিকাংশ লোকই সনাতন বিধিনিষেধের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। এ বিদ্রোহ কার্য্যে পরিস্ফুট না হইলেও কথায় ও মনের ভাবে বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এ দেশে প্রাচীন যুগে সাবিত্রীর পিতা যুবতী কন্যাকে নিজের বর স্থির করিয়া লইতে আদেশ করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু আধুনিক যুগে সে প্রথা নাই, এখন পিতা, মাতা বা অন্যান্য অভিভাবকই বর-কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিয়া থাকেন। আধুনিক শিক্ষিত মহলে এই বিধিনিষেধের বিপক্ষে ঘোর মানসিক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কালধর্ম্মে এখন প্রতীচ্যের মত এ দেশের যুবক-যুবতী মনোমত জীবনসঙ্গী খুঁজিয়া লইতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। সমাজবন্ধনের বিধিনিষেধ না থাকিলে হয় ত মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছে, কার্য্যে তাহা পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না।

পক্ষান্তরে, প্রতীচ্যের অবাধ মনোনয়নপ্রথার বিপক্ষেও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে পিতা, মাতা বা অন্যান্য অভিভাবক বর-কন্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেন না, বর-কন্যা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গী বাছিয়া লয়। প্রথম যৌবনের গোলাপী নেশায় যাহাকে কাম্য বলিয়া মনে হয়, অনেক সময়ে দেখা যায়, সে জীবনে সুখশান্তি আনয়ন করিতে পারে না—ফলে অনেক সময় দম্পতীর জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়, অনেক সময় বিবাহবিচ্ছেদে 'প্রেমের বিবাহের' অবসান হয়, নারীকে জীবনসংগ্রামে একাকী যুদ্ধ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়। ইংরাজের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপিয়ার বৃথায় লিখিয়া যান নাই, Men are April when they woo and December when they wed. পুরুষ যখন নারীর প্রেমপ্রার্থনা করে (পূর্ব্বরাগের সময়ে), তখন একবারে বসন্তের মত সুন্দর হাস্যময় শ্রী ধারণ করে, আর বিবাহ হইয়া গেলে যখন প্রণয়িনীর নূতনত্ব থাকে না, তখন একবারে কুজ্ঝটিকাময় বৃদ্ধ জরাজীর্ণ শীতের আকার ধারণ করে। বিলাতে বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাই প্রতীচ্যের নারীকেও মনোনয়ন প্রথাবলম্বনে বিবাহ-বন্ধনের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইতে দেখা যায়।

শ্রীমতী মড ডাইভার বিলাতের বিখ্যাত উপন্যাস-লেখিকা। তাঁহার স্বামী বহুদিন ভারতে কাজ করিয়াছিলেন, তাই তিনি স্বামীর সঙ্গে এ দেশে বহুদিন বসবাস করিয়া এ দেশের আচারব্যবহারের বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার ইংরাজীভাষায় লিখিত উপন্যাস 'লীলামণি' এই অভিজ্ঞতার ফল। তিনি এই গ্রন্থে নায়িকা উচ্চহিন্দুবংশসম্ভূতা লীলামণিকে প্রতীচ্যে লইয়া

গিয়াছেন এবং প্রাচ্যের সমাজ, ধর্ম্ম ও দেশাচারের বন্ধন মোচন করাইয়া উচ্চবংশোদ্ভূত ইংরাজ নায়কের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। তাঁহার নায়িকা লীলামণির সহিত ইংরাজদুহিতা কুমারী অজ্রে হ্যামণ্ডের এক স্থানে বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে।

লীলা।—আপনার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিবার নিমিত্ত আপনার পিতা-মাতা নাই কি?

অজ্রে।—না, নাই। থাকিলেও তাঁহারা আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে পারেন না।

লীলা। কেন?

অজ্রে। আমরা ইংরাজ জাতি বিবাহে বিশ্বাস করি বটে, কিন্তু বিবাহ অপেক্ষাও আমরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অধিক আস্থা স্থাপন করি। এই হেতু আমাদের নারীজাতি আপনার ভাগ্য আপনি নির্ণয় করিয়া লয়। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি আমাদেরও মধ্যে আপনাদের মত পিতা-মাতা বা অন্য গুরুজনের উপর কন্যাদানের বাধ্যতামূলক ভার ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার হইত। ইংরাজ পিতাকে যদি কন্যার ভাগ্য নির্ণয় করিতে বাধ্য হইতে হইত, তাহা হইলে দেশে Woman Question নারীসমস্যা এত সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া উঠিত না।

লীলা। নারীসমস্যা? সে কি?

অজ্রে। বোকা! তাও জান না? এটা আধুনিক সভ্যতার একটা রোগ।

অবশ্য একটি ইংরাজ উপন্যাস-লেখিকার এইরূপ অভিমত বলিয়া সমগ্র ইংরাজ নারীসমাজের যে এইরূপ অভিমত, এমন কথা বলিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য, প্রতীচ্যে 'সভ্য ও স্বাধীন' জেনানাদের মধ্যেও যে সকলে সমাজের বিধিনিষেধে সন্তুষ্ট নহে, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া। স্বাধীন-ভাবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজের মনোমত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও সকল স্বাধীন জেনানা আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারাও ভারতের প্রাচীন-পন্থীদের মত গুরুজনের নির্ব্বাচিত বিবাহ সম্বন্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন—বিনিময়ে স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা উদরপূর্ত্তির দায় এড়াইতে চাহেন।

ব্রহ্মদেশীয়া বালিকা।

প্রতীচ্যের শিক্ষিতা বিদুষী নারীও যে সংসারসংগ্রামে পরনির্ভরশীলা হইয়া থাকিতে চাহেন, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সুতরাং স্বাধীনা নারীই যে প্রতীচ্যের একমাত্র আদর্শ, তাহা নহে। জগতে বোধ হয়, ব্রহ্মের নারীর অপেক্ষা স্বাধীনা নারী কোথাও নাই। কোনও ভূপর্য্যটক তাঁহার কেতাবে লিখিয়া গিয়াছেন,—There is probably no country in the world where married women are given so much freedom as in Burma, বিবাহিতা নারী ব্রহ্মে যতটা স্বাধীনতা উপভোগ করে, জগতের অন্য কোথাও এতটা করিতে পায় না।

কথাটা খুবই সত্য। ব্রহ্মের নরনারীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের আলোচনা করিলেই কথাটা সম্যক্ বুঝা যাইবে।

ব্রহ্মে বহু পূর্ব্বকাল হইতে নারী স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া আসিতেছে। বহু নারী সেখানে পুরুষের মত শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মে পুরুষের ন্যায় নারী-ভিক্ষুর মঠ আছে। এই [illegible]

ব্রহ্মনারীরা চাউল গুঁড়া করিতেছে।

বালিকাদিগকে শিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন শিক্ষার সুবিধা থাকিলেও স্বাধীনা ব্রহ্মবাসিনী-দের মধ্যে শতকরা মাত্র ৬ জন লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা-লাভ করে, অবশিষ্ট অসংখ্য ব্রহ্মনারী স্বেচ্ছায় অশিক্ষিত জীবন যাপন করে। ইহা ব্রহ্মের আদমসুমারীর হিসাবে জানা যায়।

ব্রহ্মের পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩৯ জন লিখিতে পড়িতে জানে। তুলনায় এইরূপে ব্রহ্মের নারী পুরুষ অপেক্ষা বহু-গুণে অল্পশিক্ষিতা হইলেও জীবনসংগ্রামে পুরুষ অপেক্ষা বহুগুণে কর্ম্মক্ষম। নারীরা অল্পশিক্ষিতা হইলেও তাহাদের হিসাবনিকাশ করিবার শক্তি অসাধারণ। তাহারা মুখে মুখে যে সব কঠিন হিসাব করিতে পারে, স্কুলকলেজের শিক্ষিত পুরুষ তাহা তত অল্পসময়ের মধ্যে কখনই পারে না। এই জন্য ব্রহ্মের ছোটখাটো সকল ব্যবসায়ই ব্রহ্মনারীদের হস্তগত। ব্রহ্মের ৮ বৎসরের একটি ক্ষুদ্র বালিকাও দোকানে ২০।২৫ রকম পণ্যের দাম মনে রাখিয়া খরিদদারকে টাকা আনা পাই কসিয়া মাল সরবরাহ করিতে পারে।

সুতরাং বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মবাসিনীদের ক্ষমতা থাকিলেও শিক্ষার অবসর অথবা ইচ্ছা নাই। তাহারা স্বাধীনা, তাহারা বুদ্ধিমতী, অথচ তাহারা শিক্ষিত ও মার্জ্জিতরুচি হইবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। ব্রহ্মে ৭৫ হাজার ফুঙ্গী ভিক্ষু আছে, কিন্তু নারী-ভিক্ষুণীর সংখ্যা মাত্র ৫ হাজার। কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, ব্রহ্মের নারীর পুরুষের সমান স্বাধীনতার অধিকার থাকিলেও তাহারা স্বাধীনতা-কেই জীবনের সার্থকতা বলিয়া মনে করে না—গৃহে ও সংসারেই নারীজীবনের সার্থকতা সম্পন্ন হয়, ইহাই সম্ভবতঃ তাহাদের ধারণা।

ব্রহ্মের বালিকা

ব্রহ্মের বালক যখন মঠে বিদ্যাশিক্ষা করিতে যায়, সে সময়ে বালিকা সংসারের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। সে

ছোট ভাইভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করে, রন্ধনকার্য্যে, চরকা ও তাঁতের কার্য্যে 'বড়দের' সাহায্য করে, মায়ের সঙ্গে হাটবাজার করে, পল্লীগ্রামে গৃহপালিত পশুপক্ষী-দিগকে পালন করে অথবা কৃষিকার্য্যে সহায়তা করে একটু বড় হইলে সে কলসী মস্তকে লইয়া নদনদী অথবা গ্রাম্য কূপ হইতে সংসারের নিত্য ব্যবহার্য্য জল আহরণ করিতে যায়, স্নানাশৌচ সম্পন্ন করে এবং সেখানে সমবয়স্কা বালিকাদের সহিত আলাপ করে, অথবা পরিচিত বালক ও যুবকগণের সহিত রঙ্গরহস্যে আনন্দলাভ করে।

বিবাহকাল

বিবাহের বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহার পিতামাতা তাহার বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়। বালক ও যুবকরা তখন তাহার সহিত সম্মানের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। তবে ব্রহ্মে নরনারী কলহকালে এমন অশ্লীল ও অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করে যে, শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়; কিন্তু মজা এই, সামান্য অশিষ্টাচারে ব্রহ্মবাসীরা ক্ষেপিয়া উঠে। একবার এক স্কচ জাহাজের কাপ্তেন ৮।৯ বৎসরের এক বালিকার মাথার উপর আদর করিয়া হাত বুলাইয়াছিল, ইহাতে যাত্রীদের মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এই ব্যবহারকে ঘোর অশিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল।
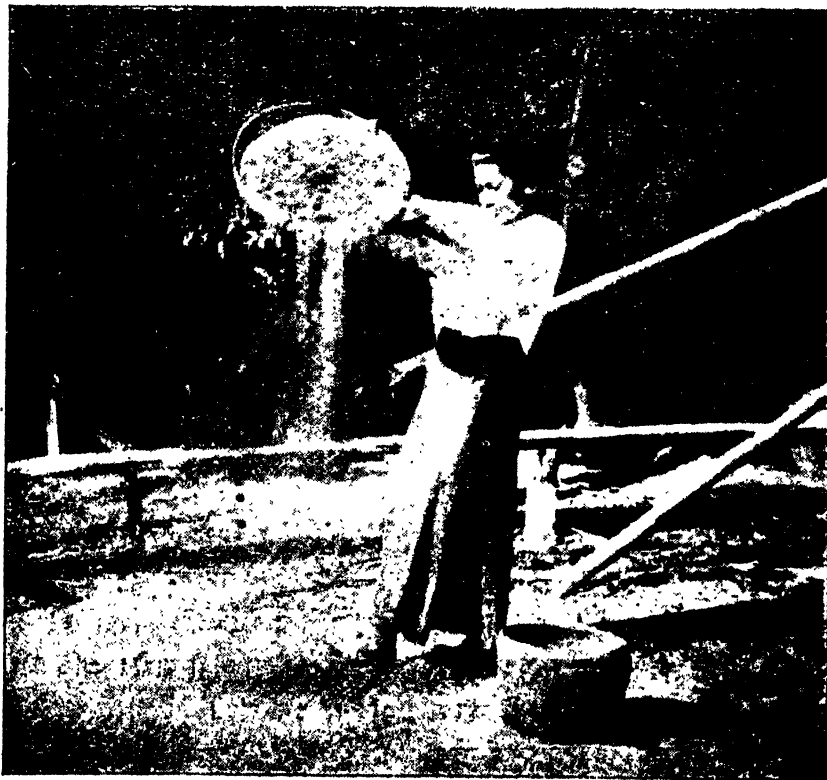
ব্রহ্মের বালিকা বা যুবতীর কলহকালে মুখে অর্গল থাকে না—এমন কি, কলহকালে জুতামারামারি পর্য্যন্ত হইয়া যায়। কিশোরী ও যুবতীরা অবাধে যুবকগণের সহিত রহস্যালাপ করিবে, কিন্তু ব্যবহারে পরস্পর বিশেষ সম্মান প্রদর্শন না করিলে ব্যাপার আদালত পর্য্যন্ত গড়াইতে পারে। এক যুবক একদা রহস্য করিয়া খেলা করিতে করিতে একটি বালিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল; ইহাতে ব্রহ্মদেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ মাস কারাদণ্ড দিয়াছিলেন। আর এক যুবক চুম্বনের অপরাধে ৬ মাস কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল—অথচ ঐ যুবকের সহিত বালিকার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। এক ব্রহ্মবাসী বৃদ্ধ নির্জ্জনে স্ত্রীর সহিত আলাপ করিতেছিল। সেই সময়ে এক দাসী লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। বৃদ্ধ জানিতে পারিয়া তাহাকে তাড়া করিয়া হাত ধরিয়া ফেলে। ব্রহ্মবাসী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ঐ বৃদ্ধের দাসীর করস্পর্শ হেতু ৩ মাস কারাদণ্ড হয়। অবশ্য আপীলে ইংরাজ জজ উহাকে মুক্তি দেন বটে, কিন্তু ইহা হইতেই

ব্রহ্মনারী ধান্যের তুষ উড়াইয়া দিতেছে।

ব্রহ্মনারীরা ধান ভানিতেছে।

জানা যায়, ব্রহ্মবাসীরা নরনারীর ব্যবহারে কিরূপ শ্লীলতার আদর্শ মানিয়া চলে।

বিবাহ

এ সকল কথা লিখিবার একটা উদ্দেশ্য আছে। যে ব্রহ্মবাসীর সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের ব্যবহারের সম্পর্কে এত কড়াকড়ি আইন, সেই সমাজে বিবাহের প্রথা আমাদের দৃষ্টিতে কিরূপ বিসদৃশ, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে জানা যাইবে।

ব্রহ্মের সমাজে নরনারী ঠিক কোন্ সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, বলা কঠিন। নরনারী একত্র বসবাস করিবে, স্বামিস্ত্রীর মত থাকিবে, এইটুকু হইলেই যথেষ্ট, বিবাহের কোনও সামাজিক আচার বা উৎসব নাই। তবে বরকে অথবা বরপক্ষের কোনও আত্মীয়কে কন্যার অভিভাবকের একটা নামমাত্র সম্মতি গ্রহণ করিতে হয় বটে। অভিভাবক (পিতামাতা প্রভৃতি) কতকগুলি আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া চা পান করিতে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গান বাজনা বা নাচ-তামাসাও যে সব সময়ে হয় না, এমন নহে।

ব্রহ্মের বিবাহের অভিনবত্বের একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। এক ব্রহ্মবাসী পুরুষ একটি নারীর সহিত একত্র বসবাস করিল। বসবাসকালে উভয়ের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহার পর পুরুষ সন্তানের জননীকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার বহু বৎসর পরে ঐ পুরুষ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রী ও সন্তানকে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিল। অথচ উভয়ের বিবাহ কোন কালেই হয় নাই, উভয়ের অভিভাবকরাও বিবাহের কথা জানে নাই, উভয়ে লুকাইয়া বসবাস করিত মাত্র।

সুতরাং ব্রহ্মের বিবাহ আমাদের দৃষ্টিতে ধর্ম্মহীন ও নীতিহীন বলিয়া মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ব্রহ্মের এইভাবে বিবাহিতা নারী স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইয়া থাকে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের বিবাহিতা নারী স্বামীর প্রতি কচিৎ অবিশ্বাসিনী হয়, এইরূপই শুনা যায়।

নারীর স্থান

ব্রহ্মে সাধারণতঃ কন্যাকে নিজের বর বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়। নারী নিজের মনোমত পুরুষ নির্ব্বাচন

করিয়া থাকে, নারী পুরুষের মত স্বাধীনতা উপভোগ করে, পরন্তু বিবাহিতা নারী বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় বা স্বয়ং উপার্জ্জন করে, তাহার উপর তাঁহার পূর্ণ অধিকার থাকে। প্রায়ই তাহারা স্বামীর ব্যবসায়ের অংশভাগিনী, এই হেতু তাহারা ব্যবসাদার কোম্পানীর তরফে স্বামীর মত নিজের নামও ব্যবহার করিতে পারে। এমন কি, ব্যবসায় ব্যতীত অন্যান্য সাংসারিক বিষয়ে পুরুষ নারীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। কোনও ব্রহ্মবাসীকে পত্র লিখিতে হইলে অনেক সময়ে ঠিকানায় তাহার পত্নীর নামও উল্লেখ করিতে হয়। পুরুষ যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, তাহা হইলে নারী দেশের আইন অনুসারে তাহার সহিত বিবাহবিচ্ছেদ করিতে পারে না বটে, তবে বহুবিবাহ ব্রহ্মসমাজে নিন্দনীয়।

পত্নীকে কোন কোন বিষয়ে স্বামীর আজ্ঞাধীন হইয়া থাকিতে হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে স্বামীর সহিত তাহার সমান অধিকার—সেও স্বামীর মত, কারণ থাকিলে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে। ব্রহ্মের কোন কোন স্থানে স্ত্রী অনেক স্বামীকে কিছু টাকা দিয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে।

ব্রহ্মবাসীর আইনে নারী পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া গণ্য, কিন্তু সেই আইনেই আবার নারী নিজের সম্পত্তি নিজে তত্ত্বাবধান করিতে সম্পূর্ণ অধিকারী। এক জন ইংরাজ নারী সখেদে বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের নারী অশিক্ষিতা, অমার্জ্জিতরুচি ও স্বামীর দাসীরূপে পরিগণিত হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে (সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ইত্যাদিতে) আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ—the Burmese wife manages her own property, which we have learnt to do only in the last few years !"

এইখানেই গোল। নারীজীবনের কোন্‌টা আদর্শ, তাহা
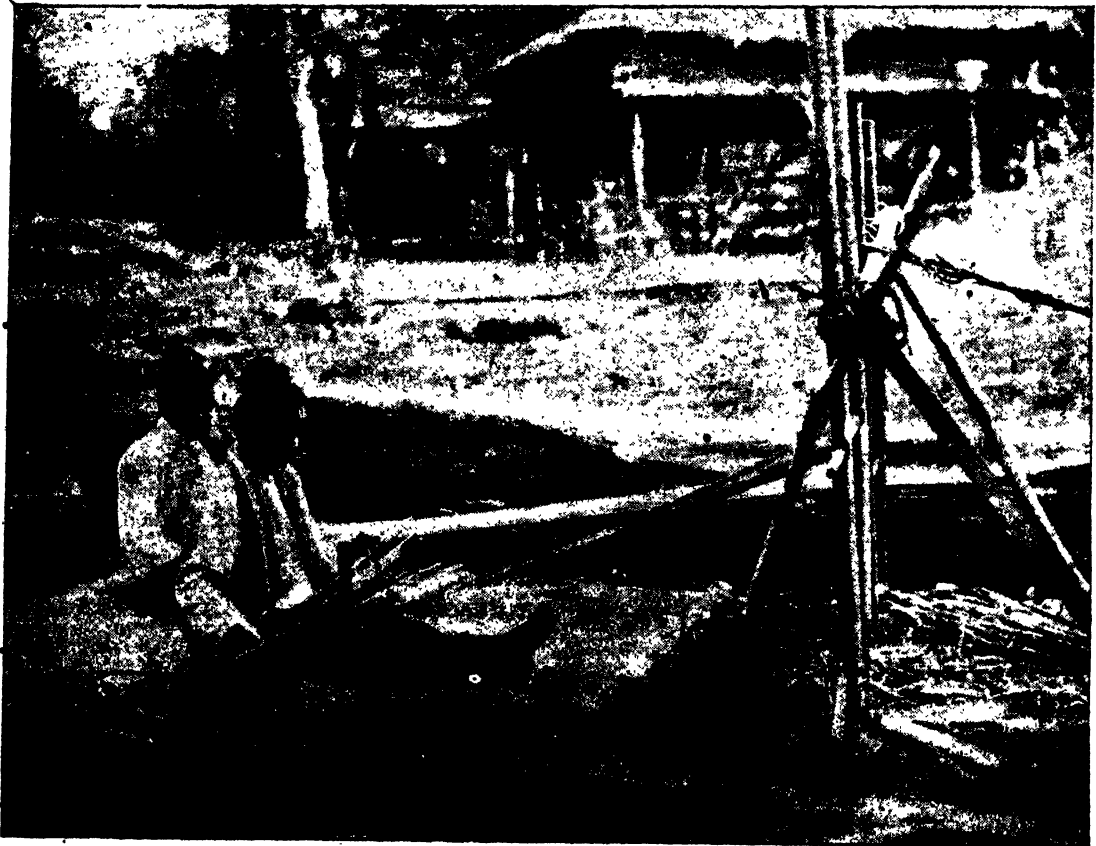
ব্রহ্মনারীরা বস্ত্রবয়ন করিতেছে।

ব্রহ্মনারীরা চুরুট প্রস্তুত করিতেছে।

নির্ণয় করা কঠিন। ব্রহ্মের নারী সংসারে দাসীর কার্য্য করে. তাহাদের বিবাহে সাধারণে প্রচলিত ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শের বন্ধন নাই, তাহারা মার্জ্জিতরুচি অথবা শিক্ষিতা নহে, অথচ তাহাদের স্বাধীনতা, সম্মান ও সম্পত্তির মালিকানি অধিকারের বহর দেখিয়া প্রতীচ্যের শিক্ষিতা স্বরুচিসম্পন্না নারীর হিংসা সঞ্জাত হয়। এই পরস্পরবিরোধী মতান্তরের সামঞ্জস্যবিধান করে কে?

সে দিন বোম্বাইয়ের 'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া' পত্রে কুমারী এলিজাবেথ কাইট নাম্নী কোনও মার্কিণ মহিলার এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রখানি কুমারী কাইট সাবরমতী আশ্রমে শ্রীমতী কস্তুরীবাই গন্ধীকে লিখিয়াছেন। ঐ পত্রে তিনি মহাত্মাজীর যুগবাণী ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে পত্রের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন,—Our civilisation of the West, as the Mahatmaji has seen, had nearly run its course of possible material prosperity. It must be vitalised by a spiritual rebirth, ... There is much that we may learn from India by way of preparation.

সভ্যতাভিমানী প্রতীচ্যের অন্তরের অন্তস্তল হইতে এই আকুল আকাঙ্ক্ষার বাণী নির্গত হয় কেন? প্রতীচ্যের নারী শিক্ষা ও সভ্যতায় প্রাচ্যনারী অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত, এ কথা প্রায়ই শুনা যায়। পর্দ্দানশীন ভারতের নারীর সাহায্য প্রার্থনায় তাঁহারা পশ্চাৎপদ নহেন। খৃষ্টান মিশনারীরা এ দেশের নারীর দুঃখে বিগলিতপ্রাণ হইয়া তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনয়নের জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ নিয়োজিত করিতে কাতর নহেন। কিন্তু সেই খৃষ্টান দেশের শিক্ষিতা বিদুষী মার্কিণ মহিলাই শ্রীমতী কস্তুরীবাই গন্ধীকে লিখিয়াছেন, -particularly from her (India's) women do we need to learn.

কেন? স্বাধীনতাই যদি নারী-জীবনের সার্থকতা হইত, তাহা হইলে জগতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীনা জেনানা মার্কিণ
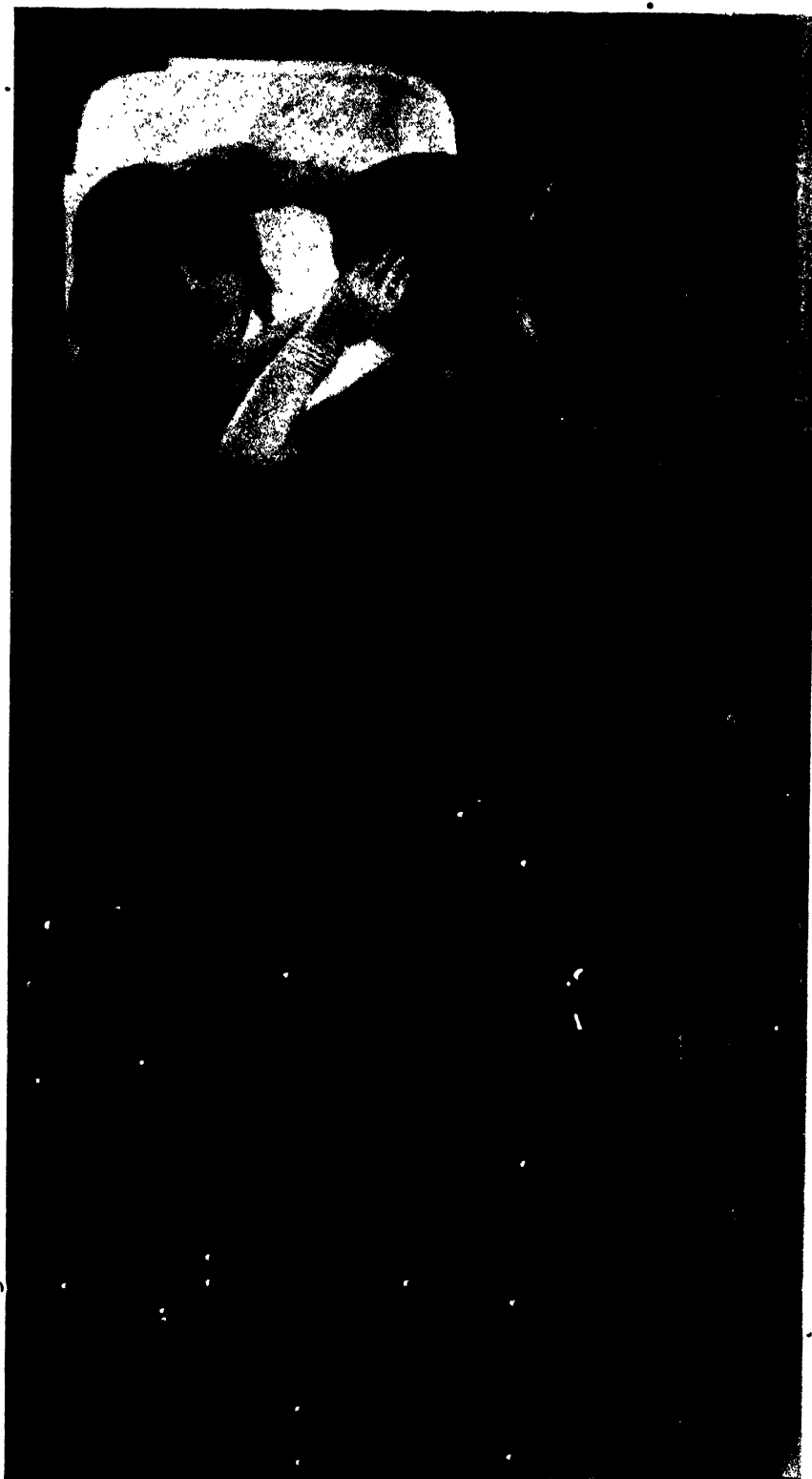
দর্পণে

বসুমতী প্রেস]　　[শিল্পী—শ্রীশিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মনারীগণের বিচিত্র নৃত্য।

মহিলার কণ্ঠে শান্তির জন্য—সুখের জন্য হাহাকার রব উঠিত না। কুমারী এলিজাবেথ কাইট শ্রীমতী কস্তুরীবাই গন্ধীকে পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"নারীর পতন হইলেই জাতির পতন অনিবার্য্য হয়। আমাদের এই মার্কিণ দেশে আমরা মার্কিণ মহিলারা সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীতার প্রায় চরম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, almost run the gamut of social and political emancipation, কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারি নাই; অনিয়ন্ত্রিত আত্মবিকাশে প্রকৃত সুখশান্তি পাওয়া যায় না, অথবা নিয়ন্ত্রিত দমননীতির অধীনেও পাওয়া যায় না। এই দু'য়ের মধ্যবর্ত্তী পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সুখ ও শান্তি প্রাপ্ত হইব।"

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রহ্মের নারীর অবাধ স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে যে, নারী পুরুষের মত পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিলেও উহার মধ্য দিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন করিতে পারে না। মার্কিণ মহিলার মত উচ্চশিক্ষিতা স্বাধীন মহিলার মনের আকুলি-বিকুলি দেখিয়াও মনে হয়, ও পথেও নারীজীবনের সার্থকতা নাই। আবার ভারতের পর্দ্দাঘেরা অশিক্ষিতা অন্ধসংস্কারাচ্ছন্না নারীর জীবন দেখিয়াও মনে হয়, উহাতেও নারী-জীবনের সার্থকতা নাই। যে সমাজের যেমন অবস্থা, সে সমাজে নারীর স্থান তদ্রূপ। সুতরাং আদর্শ নারী-জীবনের সার্থকতা কিসে সম্পন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই হেতু জগতের ভিন্ন ভিন্ন সমাজে নারীর স্থান আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, সিদ্ধান্ত তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সকালবেলাই ধূলাপায়ে হরিনাথ বাবু দত্তবাড়ীর বাহির দরজা হইতে ডাকিলেন, "ওরে বিশু!"

বিশু তখন বাহিরে একটি ঘরে বসিয়া রাধামাধব বাবুর সহিত কথা বলিতেছিল। এমন সময়ে পরিচিত স্বরে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আসুন হরিদা, আমি এখানে!" এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া হরিনাথকে সঙ্গে লইয়া রাধামাধব বাবুর নিকট গিয়া বলিল, "বসু মশাই, ইনিই বাসীর মামা হরিনাথ মিত্র।"

রাধামাধব বাবু তখন শুইয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন, এবং হরিনাথ বাবুকে বসিতে বলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিশু বলিল, "এত সকালে কোথা থেকে দাদা?"

হরিনাথ বাবু বলিলেন, "একটু কাযে কা'ল সকালে ঘোষপুরে গেছলাম, তিন চারি দিন দেরী হবে ভেবেছিলাম, তা কাযও শেষ হলো, আর ঘোষপুরের এক ভদ্রলোক বাসীকে কা'ল দেখতে আসবে বল্‌লেন, তাই তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম। বাড়ীতে এসে শুনলুম, বাসী খুড়ীমার কাছে আছে, তাই এই ধূলোপায়েই তাকে নিতে এসেছি।"

রাধামাধব বাবু তখন বলিলেন, "মশায়ের কি অবিবাহিতা কন্যা আছে?"

"আজ্ঞে, কন্যা নাই, একটি ভাগ্নী আছে, তারই বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়েছি।"

"পাত্র কি স্থির করেছেন?"

হরি। না, মশাই, এখনও কিছু ঠিক করিনি, পাঁচ যায়গায় কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এখন ভবিতব্য।

রাধা। আপনার ভগ্নীপতি কি করেন?

হরি। সে দুঃখের কথা আর বলবেন না। আজ যদি বাসী-মা'র মা-বাপ থাকতো, তা হ'লে কি সে আজ আমার বাড়ী আসতো, না, আমাকে এ সব ঝঞ্ঝাটে পড়তে হতো। বাসী-মা যখন ছমাসের, তখন আমার ভগ্নীপতী মারা যান, তার পর জ্ঞাতিগোত্র মিলে যা কিছু সামান্য বিষয়-আশয় ছিল, তা সব ফাঁকি দিয়ে নিলে; তার পর দিদি আমার এই দুঃখের সংসারে এসেছিলেন, তাও বাসী-মা যখন চার বছরের, তখন তিনিও মারা যান। সেই থেকে দিনরাত্রি বুকে ক'রে ওকে মানুষ করেছি; এখন—"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না, পূর্ব্বকথা স্মরণপথে আসায় তাঁহার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

পুনরায় রাধামাধব বাবু বলিলেন, "আচ্ছা হরিনাথ বাবু, মেয়েটিকে একবার দেখাতে পারেন?"

হরিনাথ বাবুর উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ বলিয়া উঠিল, "বসু মশাই, বাসন্তীকে ত আপনি কা'ল রাত্রে দেখেছেন।"

তখন তিনি বলিলেন, "ওইটি হরিনাথ বাবুর ভাগ্নী? খাসা মেয়ে। মেয়েটির জন্মতারিখ কি কুষ্ঠী কিছু আছে?"

হরিনাথ বাবু বলিলেন, "না মশাই, সে সব কই কিছুই দেখি না, তবে চেষ্টা কল্লে কি মাসে, কোন্ তারিখে বাসী-মা হয়েছে, সেটা বলতে পারি। কিন্তু সময় ঠিক ক'রে বলতে পারি না।"

"আপনার ভগ্নীপতির কি পদবী ছিল?"

"তিনি দত্ত ছিলেন।"

কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া হরিনাথ বাবু বলিলেন, "মহাশয়ের নিবাস কোথায়? এখানে কি বেড়াতে এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে না, একটু কায ছিল, আর কা'ল ঝড়বৃষ্টি এবং রাত্রি হওয়ায় চোর-ডাকাতের ভয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি।"

"আজকের আহারটা আমার ওখানে যদি করেন—"

বসু মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি আজ এখুনি যাব, নচেৎ আপনার ওখানে খাওয়ার কোন বাধা

ছিল না। যাই হোক, আপনি মনে কষ্ট করবেন না, আমি প্রায়ই এ পথে এসে থাকি; এবার এলে নিশ্চয়ই আপনার ওখানে উঠবো।"

এই কথা শুনিয়া বিশ্বনাথ বলিয়া উঠিল, "মা ভোরে উঠে আপনার খাওয়ার সমস্ত যোগাড় করেছেন, রান্নাও হয়ে গেছে, আপনি স্নান ক'রে নিন, দু'টি না খেয়ে গেলে মা বড্ড দুঃখ করবেন।"

বসু মশাই বিশ্বনাথের কথা শুনিয়া বলিলেন, "বাবা, মা কেন এত ভোরে উঠে আমার জন্যে কষ্ট কচ্ছেন? আমি বেলা দুটা তিনটার সময় আহার করি, সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে তবে খাই, আবার ও সব ফ্যাসাদ।"

বিশ্বনাথ কহিল, "কিছু ফ্যাসাদ হবে না। এর জন্যে আপনি এত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আমি এক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক ক'রে দেব।"

বিশ্বনাথের কথা শেষ হইলে হরিনাথ বাবু রাধামাধব বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তবে এখন আসি মশাই। বিশু, বাসীমাকে তা হ'লে এখানে নিয়ে আয়, বোস মশাই একবার দেখবেন।"

বিশ্বনাথ অন্দরে চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে বাসন্তীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল। বসু মহাশয় বাসন্তীর হস্ত ধরিয়া নিজের নিকটে বসাইলেন এবং সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে বাসন্তীর ম্লান মুখখানির দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিলেন। তখন হরিনাথ বাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাসন্তীকে কহিলেন, "বাসীমা, এঁকে নমস্কার কর।"

বাসন্তী ভূমিতে মাথা নত করিয়া বসু মহাশয়কে প্রণাম করিল, তিনি তাহার মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর ভাগ্নীকে লইয়া হরিনাথ বাবু দত্তবাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দুপুরবেলা দত্ত-গৃহিণী হরিনাথ বাবুর বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিকটে কাহাকেও না দেখিয়া বলিলেন, "ওরে বাসী, তোরা কোথা গেলি? হরিনাথ কোথায়?"

বাসন্তী তখন রান্নাঘর হইতে এক গোছা বাসন লইয়া বাহিরে আসিতেছিল, সে ঠানদিদিকে দেখিয়া বলিল, "ঠানদিদি, মামাবাবু ঘুমুচ্ছেন, আমি ডেকে দিচ্ছি, আপনি বসুন না ঠানদি।" এই বলিয়া সে বাসনগুলি নামাইয়া ঘটীর জলে হাত ধুইয়া তাড়াতাড়ি একখানি ছিন্ন তৈলসিক্ত মাদুর বিছাইয়া দিয়া দত্ত-গৃহিণীকে বসিতে বলিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। ক্ষণপরে দত্ত-গৃহিণী শুনিতে পাইলেন, ঘরের মধ্য হইতে বাসন্তীর মামী-মা উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, "ভ্যালা আপদ্! দিলে এই দুপুরবেলা মাথাটা ধরিয়ে, মামাবাবু, মামাবাবু! মামাবাবু তোর করবে কি? আপদ্ বিদেয় হ'লে বাঁচি।"

বাহির হইতে দত্ত-গৃহিণী কহিলেন, "বিদেয়ের ব্যবস্থা কর্ত্তেই এসেছি বৌমা, হরিনাথকে একবার ডেকে দাও।"

দত্ত-গৃহিণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া হরিনাথ বাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "খুড়ীমা, এমন সময়ে যে, ব্যাপার কি?"

"ব্যাপার ভালই; একটা কথা বলতে এসেছি।" এমন সময় বাসন্তী ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া বাসনগুলি লইতে যাইতেছে, এমন সময় দত্ত-গৃহিণী বলিলেন, "বাসী, তুই এখন ওগুলো রাখ, আমি ক্ষেন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে এসে মেজে দেবে। তুই আমার এখানে এসে বোস।"

মামী-মা অবশ্য ইহাতে খুবই চটিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু দত্ত-গৃহিণীর নিকট প্রকাশ্যে কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন হরিবাবু বলিলেন, "কি কথা খুড়ীমা?"

"কথা আর কি, তুই সকালে যে সেই বোস মশাইকে দেখে এসেছিলি না, তিনি আর একবার বাসীকে দেখতে চান, ও বেলায় তিনি খাননি। তাই বিশু আমায় তোকে বলতে পাঠিয়ে দিলে, আর বৌমা ত জানে না, বাসীকে একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখুক, তিনি একটু পরে আসছেন।"

"তা খুড়ীমা, একটু জলখাবারের ব্যবস্থা না কল্লে ত ভাল দেখায় না।"

ঠানদিদি বলিলেন, "তা একটু কর্ত্তে হয় বৈ কি, সে না হয় বৌমা একটু ক'রে দেবে এখন। তুই কেবল বাজার থেকে কিছু ফল আর কালাচাঁদ ময়রার দোকান থেকে ভাল কস্তুরো সন্দেশ কিছু এনে দে, বাকী যা কিছু বাড়ীতেই হবে এখন।"

হরিবাবুর স্ত্রী তখন খুড়ীমার সহিত যে একটা গুরুজন-সম্পর্ক আছে, সামনে যে কথা বলেন না, সেটা ক্রোধের বশে ভুলিয়া গেলেন। তিনি একেই রাগিয়াছিলেন, তাহার

উপর এই কথা শুনিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "আমি ও সব আপদ-বালাইয়ের জন্ত খাটতে পারি না, আমি বলে মাথা ধ'রে মরছি, আমায় কে দেখে, তার ঠিকানা নেই, এখন এই দুপুর রোদে আগুনের কাছে ব'সে সাতপুরুষের কুটুমের জন্যে খাবার কর্ত্তে বসি, আমার এত দায় নেই, যাদের দায়, তারা করুক।"

হরিবাবু তখন রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "দায় খুড়ীমারই, উনিই সব করবেন, তোমার—"

তাঁহার কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে গৃহিণী কহিলেন, "আমি ত চিরকালই মন্দ আছি, যারা ভাল, তারা করুক; আমি যদি না পারি। তোমার যদি এত ভার বোঝা আমি হই, আমায় না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

হরিবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, দত্ত-গৃহিণী তাঁহার মুখে হাত দিয়া বলিলেন, "বৌমা, হরিনাথ, তোরা একটু চুপ কর, ভদ্দরলোক যদি আসে, কি বলবে বল দেখি, কেউ না পারে, আমি একলাই সব কচ্ছি, এখনও এই বুড়ো হাড়ে সাতটা যজ্ঞি ঠেলতে পারি। হরিনাথ, তোকে যা বললুম, তুই এখন তাই কর্। আর যাবার পথে বিশুকে ব'লে যাস, ক্ষেন্তি ঝিকে নিয়ে বৌমা যেন এখুনি তোর বাড়ী আসে, দেরী যেন না করে।"

ক্ষণপরে একটি কিশোরী ক্ষেন্তি ঝির সহিত হরিনাথ বাবুর বাড়ী প্রবেশ করিয়া দত্ত-গৃহিণীর নিকটে গিয়া বলিল, "মা, আমায় ডেকেছেন?"

তিনি পুত্রবধূকে দেখিয়া বলিলেন, "বৌমা, এসেছ? তুমি মা চট্ ক'রে বাসীর চুলটা বেঁধে দাও তো।" পরে ক্ষেন্তির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ক্ষেন্তি, তুই বাসনগুলো মেজে নিয়ে আয় তো মা।" এই বলিয়া তিনি রান্নাঘরে ঢুকিয়া উনানে আগুন দিতে গেলেন। তখন বাসন্তীর মামী তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত লইয়া নিজেই সব করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে রাধামাধব বাবু বাসন্তীকে দেখিয়া গেলেন। মেয়েটি দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই পছন্দ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বলিয়া গেলেন যে, দেশে ফিরিয়া মতামত জানাইবেন। বিপিন বাবুর সহিত কলিকাতাযাত্রার পূর্ব্বে তিনি হরিনাথ বাবুকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি দুই এক দিনের মধ্যে বাসন্তীকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মানুষ যখন জেদের বশবর্ত্তী হইয়া একটা কার্য্য করিয়া বসে, তখন ভবিষ্যতের ঘনীভূত বিপদের দিকে চাহিবার শক্তি তাহার থাকে না। পুত্রের জীবনের গতি ফিরাইতে গিয়া রাধামাধব যে একটা মস্ত ভুল করিলেন, সে কথা তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রিয়পাত্রকে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই তাহাদিগের গন্তব্যপথে বাধা দিতে হয়, সে বেদনার ব্যথা তাহারা যতটা বুঝিতে না পারে, কিন্তু যিনি বাধা দেন, তিনি ততোধিক বেদনা পাইয়া থাকেন। তথাপি প্রিয়পাত্রের মঙ্গলকামনায় অনেক সময় তাহার কার্য্যে বাধা দিতে হয়, ইহাই চিরপ্রথা। ভবিষ্যতের অন্তরালে কি বিপদ লুকায়িত থাকে, তাহা দৃষ্টিশক্তিহীন মানবের বুঝিবার সাধ্য কোথায়?

মানুষ ভাবে এক, হইয়া দাঁড়ায় আর। সন্তোষের জীবনেও তাহাই হইয়াছিল। সে যখন ভবিষ্যতের সুখের ছবি আঁকিয়া মিলনদিনের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, তখন বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের স্তায় সে এক দিন শুনিল, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। তাঁহার পিতা কলিকাতায় আসিয়াছেন, এখন তাহাকে তাঁহার সহিত দেশে ফিরিতে হইবে। সে একবার ভাবিল, পিতাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলে, পরক্ষণেই তাহার মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা হইল, ছিঃ! পিতা কি মনে করিবেন, দেখা যাক, কতদূর কি হয়, তখন যা হয় হবে।

মাতৃহীন সন্তোষ পিতার ঐকান্তিক স্নেহে ও যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিল। তাঁহার অত্যধিক স্নেহে সে কোনও দিন মায়ের অভাব বোধ করে নাই। তিনি একাধারে পিতামাতা ছিলেন। সে কোনও দিন পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায করে নাই, আজও পারিল না। যদিও সব সময়ে তাহার পিতার সহিত সমস্ত বিষয়ে মনের মিল হইত না, তথাপি সে কোনও দিন নিজের কোনও মত প্রকাশ করে নাই। প্রথমতঃ পিতার ধর্ম্মমত সে একেবারেই পছন্দ করিত না। সে যতক্ষণ পিতার সম্মুখে থাকিত, ততক্ষণ তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইত বটে, কিন্তু সেটা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। তাহার নব্য রুচির সহিত পিতার সেকালের রুচি মোটেই মিলিত না।

তথাপি পিতার বিরক্তি উৎপাদনের ভয়ে তাঁহার সাক্ষাতে কোনও অন্যায় কার্য্য করিত না।

পিতার সহিত দেশে আসিয়া সে যখন নিজের বিবাহের কথা শুনিল, তখন ক্রোধে ক্ষোভে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কোন কথাই বলিল না। আর কেহ কিছু না বুঝিলেও, জ্যেঠাইমা কিন্তু সন্তোষের পরিবর্ত্তন কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই এক দিন তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া নিজেই উপযাচিকা হইয়া তাহার ম্লান গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সন্ত, তোর কি বিয়েতে ইচ্ছে নাই বাবা?"

সে জ্যেঠাইমার উদ্বেগব্যাকুল জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সহিত নিজের দৃষ্টি মিলাইয়া কহিল, "আমার ইচ্ছে অনিচ্ছেয় কি আসে যায়? যাঁর ইচ্ছেয় হচ্ছে, তিনিই এর পরে বুঝবেন।"

জ্যেঠাইমা ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, "ছিঃ ছিঃ, ও কথা বল্‌তে নেই, শুনছি, মেয়েটি খুব সুন্দরী, আর তার কেউ নেই, সে নাকি বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল, তাই—"

তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া সন্তোষ বলিল, "সে কষ্ট পাচ্ছিল, তাতে আমাদের কি? আমি ছাড়া দুনিয়ায় কি আর পাত্র ছিল না? আমার ঘাড়ে ও সব আপদ চাপলো কেন?"

"ও মা! তুই কি হলি রে? তোর ত এমন মতিবুদ্ধি ছিল না; এ সব কি কথা? বাপে বিয়ে দিচ্ছে, যা দেবে, তাই নিবি, এ সমস্ত কথা শুন্‌লে তিনি যে কষ্ট পাবেন। আর কখনও কারুর কাছে এমন কথা বলিসনি।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সন্তোষ বলিল, "দরকার বিবেচনা কর ত তাঁকে বলো—তাঁর জানা দরকার যে, এ বিয়েতে আমার ইচ্ছে নেই। তবে আমি তাঁর সুমুখে কোন দিন কোন কথা বলিনি; আজও বল্‌তে ইচ্ছে করি না। তুমি জিজ্ঞাসা কল্লে, তাই বল্লাম, রেখে দিও, এর পর তোমাদেরই কাঁদতে হবে, আমার বাড়ী আসা এই শেষ।"

জ্যেঠাইমা তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিলেন, "ষাট্, ষাট্, অমন কথা বলিস্ না সন্ত, ও সব কথা কি বল্‌তে আছে? তুই কি ক্ষেপ্‌লি নাকি? কল্‌কাতায় গিয়ে তুই একেবারে গোল্লায় গেছিস্। আমরা আর কদিন, তোর জিনিষ তোরই থাক্‌বে। আমার সুমুখে আর কোনও দিন অমন কথা বলিস্ না বাবা।" এই বলিয়া তিনি নিজ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

সন্তোষ একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে।" এই বলিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। জ্যেঠাইমা সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। তিনি কিন্তু এ সমস্ত কথা দেবরকে বলিলেন না, কারণ, তিনি দেবরের জেদ এবং ক্রোধের পরিমাণ বিলক্ষণ জানিতেন।

গৃহ বিবাহের কলরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এলাহাবাদ হইতে বসু মহাশয়ের ভগিনী ও তাঁহার পুত্রকন্যাদ্বয় আসিয়াছে। তাঁহার পুত্র সন্তোষেরই সমবয়সী, সন্তোষের চেয়ে সে মাত্র এক বৎসরের ছোট। বসু মশায়ের ভগিনীপতি রমাকান্ত বাবু আসিতে পারেন নাই।

যাহার বিবাহে গৃহে আনন্দের প্রবাহ বহিতেছে, তাহার মন কাহার একখানি ক্ষুদ্র মুখের নিকট ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। সে ভাবিতেছে, পিতা যখন জানিয়া শুনিয়াই তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিলেন, তখন তাহার ব্যবস্থা তিনি নিজেই করিবেন, আমার সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকিবে না। দরিদ্রা কন্যার অন্নাভাব হইয়াছিল, এখন ত আর সে সব চিন্তা থাকিবে না, ইহাতেই সে সুখী হইবে। পিতা-পুত্রে প্রকাশ্যে কোন কথাই হইল না, কিন্তু নিরুপায় ক্রোধের সমস্তটাই গিয়া পড়িল নিরপরাধা বাসন্তীর উপর।

মনের অসহ্য যন্ত্রণাটাকে একটুখানি সান্ত্বনা করিয়া সন্তোষ ভাবিল, পিতার যদি বিলাতপ্রত্যাগতের কন্যার সহিত বিবাহ দিতে আপত্তি ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া বলিলেন না কেন? তাহা হইলে সে আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের ও দশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। কিন্তু তিনি এ কি করিলেন, শুধু ত তাহার সর্ব্বনাশ করিলেন না, সেই সঙ্গে যে আর একটি নির্দোষ বালিকারও সর্ব্বনাশ করিলেন।

তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া হঠাৎ তাহার পিসীমার ছেলে বিনয় আসিয়া বলিল, "দাদা, এত চুপচাপ ব'সে কি ভাবছেন, চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তোষ বলিল, "কোথায় আর যাব ভাই!"

সে সন্তোষের ম্লান গম্ভীর মুখ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরে সে কহিল, "দাদা, যদি রাগ না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি জিজ্ঞাসা করবি, কর্ না ভাই, রাগ এখন আমায় ত্যাগ ক'রে গেছে।"

"আপনার কি বিয়েতে মত নেই ?"

সন্তোষ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "অভিভাবকের ইচ্ছানুযায়ী কাযই হয়ে থাকে, আমার মতামতে কিছু আসে যায় কি ?"

তাহার এই কথা শুনিয়া বিনয় প্রথমে চমকিয়া উঠিল, সে সে ভাবটা দমন করিয়া বলিল, "কেন দাদা, এমন কথা বল্ছেন কেন ?"

সন্তোষ বিস্মিতভাবে বলিল, "কি কথা ?"

"ওই সব কতকগুলো বাজে কথা।"

"এ সব বাজে কথা নয় ভাই, এই ঠিক কথা। আমার এখন বিয়ে কর্ত্তে একেবারেই ইচ্ছা নাই।"

এই সময়ে দীনু চাকর আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আপনাকে পিসীমা ডাক্ছেন।"

সন্তোষ কহিল, "তাঁকে বল, আমি যাচ্ছি।" সে চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।"

রুসীয় লাল-পল্টন

বলশেভিক সৈন্যদলভুক্ত রুস-যুবকগণ শরৎকালে ব্যায়াম দ্বারা শক্তিসঞ্চয় করিতেছে

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইনের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এই ভূখণ্ডের পরিসর খুব বৃহৎ নহে। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১শত ৪০ মাইল এবং প্রস্থে ৫০ মাইলের অধিক নহে। প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে মরুপ্রান্তর, উত্তরে অদ্রিমালা এবং পশ্চিম প্রান্তে ভূমধ্যসাগরের নীল সলিলবিস্তার। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও প্যালেষ্টাইনের কথা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। বিংশ শতাব্দীতে প্যালেষ্টাইনের মূল্য ব্যবসায়ীর নিকট খুব অধিক নহে, কারণ, শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যভাণ্ডারের আকর্ষণ এখানে নাই, কিন্তু এ দেশের কৃষক প্যালেষ্টাইনের অনুরক্ত ভক্ত, কারণ, উর্ব্বরা ভূমিতে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়, দ্রাক্ষাকুঞ্জে থরে থরে দ্রাক্ষা দুলিতে থাকে, তৃণশ্যামল পুষ্পবহুল উপত্যকাভূমিতে রাখাল মেষপাল চরাইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের কাছে প্যালেষ্টাইন পরম রমণীয় ও চমৎকার স্থান। তিনটি মহাদেশের প্রান্তভাগে প্যালেষ্টাইন অবস্থিত।

অট্টালিকাশোভিত প্যালেষ্টাইনের সংকীর্ণ রাজপথ।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে যুগ যুগ ধরিয়া কত যুদ্ধবিগ্রহই না সংঘটিত হইয়াছিল! প্রাচীনকালে অসংখ্য বীরের পদশব্দে প্যালেষ্টাইনের রণক্ষেত্র কতবার নিনাদিত হইয়া উঠিয়াছে, অশ্বের হ্রেষা, রণতুরীর প্রচণ্ড আরাব, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শত শতবার প্যালেষ্টাইনের কাননপ্রান্তরের শান্ত নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। প্রাচীনযুগের যে রাজশক্তি যখন প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে, এইখানে তাহার সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিশর, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, পারস্য, বাইজান্‌টিয়াম্‌, রোম—প্রত্যেকেই প্যালেষ্টাইনে একটা প্রধান সেনাবল সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে এত যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিল কেন? ইতিহাসপাঠককে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন, এই প্যালেষ্টাইনে—বেথ্‌লেম্‌এ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে প্রায় প্রতিযুগে এখানে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠে। নানা ধর্ম্মাবলম্বীর বাহিনী এখানে বলপরীক্ষা করিয়া গিয়াছে। কখনও ইহুদী সামরিক শক্তি খৃষ্টানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও খৃষ্টানগণ সারাসানগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে,

ওমর মস্জেদের অভ্যন্তরভাগ।

মসজেদ গর্ব্বোন্নত শিরে দণ্ডায়মান। কালিফ্ ওমর কর্তৃক জেরুসালেম্ অধিকারের অনতিকালমধ্যেই ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এই মসজেদ বিনির্ম্মিত হয়। একটি পাহাড়ের উপর ওমরের মসজেদ অবস্থিত। খৃষ্টান ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নরনারী এই পর্ব্বতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কারণ, যীশু ও মহম্মদের নামের সহিত এই পর্ব্বতের স্মৃতি বিজড়িত।

প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন অংশে সঙ্কীর্ণ, সোপানাবলী-সংবলিত রাজপথসমূহ এখনও বিদ্যমান। পথের স্থানে স্থানে বড় বড় গম্বুজ দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সকল অংশে বিচরণকালে দর্শকের মনে যীশুখৃষ্টের যুগের চিত্র আপনা হইতে পড়িবার সম্ভাবনা। কারণ, সে যুগে রাজপথ ও অট্টালিকার যেরূপ বিবরণ জানিতে পারা যায়, প্যালেষ্টাইনের প্রাচীন অংশে ঠিক তেমনই রাজপথ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আবার এক খৃষ্টান শক্তি অপর খৃষ্টান শক্তির সহিত বল-পরীক্ষা করিয়াছে। বাস্তবিক পৃথিবীর কুত্রাপি এমন আর দেখা যায় নাই।

সত্য বটে, মিশরীয়, গ্রীক ও রোমক শাসন দীর্ঘকাল ধরিয়া প্যালেষ্টাইনে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, সভ্যতা সম্বন্ধে এই স্থানে এসিয়ার প্রভাবই অধিক-মাত্রায় বিরাজিত। যুরোপীয় প্রভাব প্যালেষ্টাইনে দীর্ঘকাল থাকা সত্ত্বেও আচারে, ব্যবহারে, জীবনযাত্রার প্রণালীতে এসিয়া দেশের সভ্যতাই এখানে পরিস্ফুট।

প্যালেষ্টাইনে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির অবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। সলোমনের মন্দিরের পার্শ্বে ওমরের

ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্যালেষ্টাইনের কোন খ্যাতি নাই। কৃষিজাত পদার্থই এখানকার প্রধান সম্পদ্। অত্রত্য অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষের কিছু কম। ইহাদের অধি-কাংশই কৃষিজীবী। আরবদিগের মধ্যে যাহারা খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বী, তাহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়েই অগ্রণী। পুরাতনকে অন্ধভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া না থাকিয়া তাহারা উন্নতির প্রয়াসী। ইহুদীরা যেমন প্যালেষ্টাইনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহে, খৃষ্টান আরবগণের মনের ভাব সেইরূপ। ইহুদীদিগের সংখ্যা প্যালেষ্টাইনে খুবই কম, আরবদিগের সংখ্যা অনেক বেশী।

জর্দ্দান নদ এই পবিত্র ভূমিকে প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। পূতসলিল গঙ্গা ও নীল নদ যেমন পবিত্র বলিয়া সর্ব্বত্র বিদিত, জর্দ্দানও ঠিক তদনুরূপ। গঙ্গাবারিস্পর্শে হিন্দুরা যেমন আপনাকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন, জর্দ্দানের সলিলকেও খৃষ্টানগণ তেমনই পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। গঙ্গাবারির ন্যায় জর্দ্দন নদের বারি খৃষ্টানের দেহকে পবিত্র করিয়া দেয় এবং উহা স্পর্শে স্বর্গরাজ্যলাভের সম্ভাবনায় কোন বিঘ্ন ঘটে না। যাঁহারা হিন্দুকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে দেখিয়া কুসংস্কার বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন, জর্দ্দানের বারিস্পর্শকারী খৃষ্টানকে তাঁহারা কি বলিবেন?
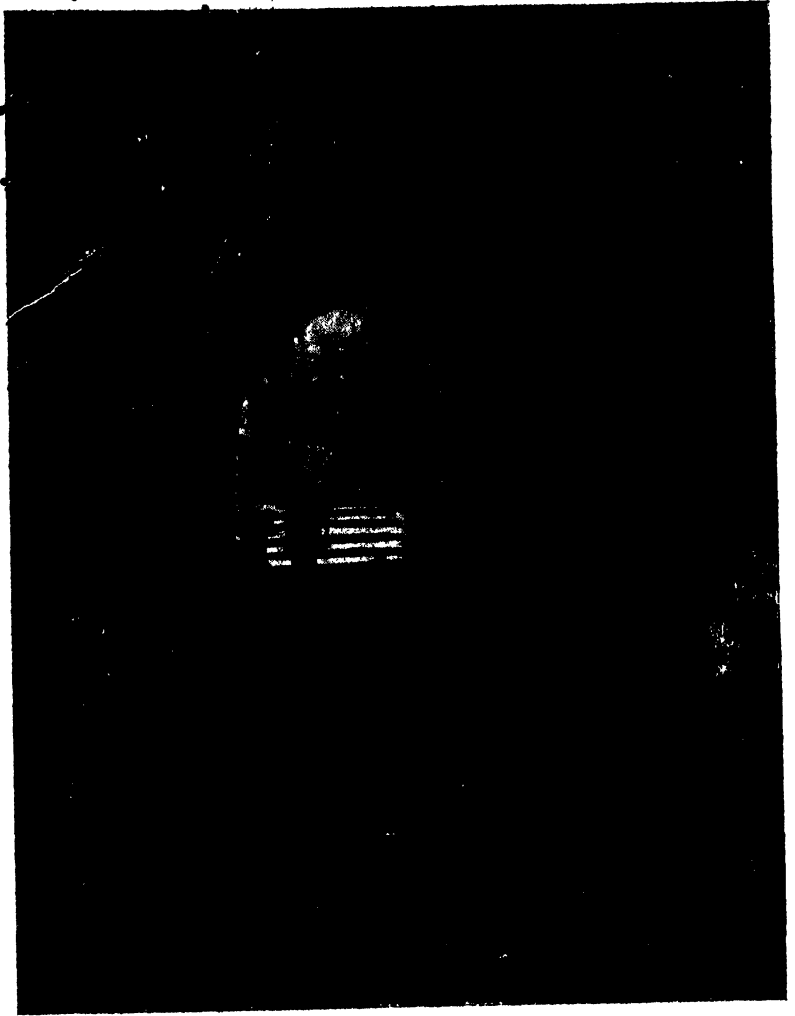
প্রাচীন নগরগুলি সাধারণতঃ প্রাচীরবেষ্টিত। জেরুসালেমও তদ্রূপ। প্রাচীর ও প্রাকারগুলিকে অধুনা সুরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খৃষ্টানের এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রটির যাবতীয় প্রাচীন স্মৃতিসৌধ নূতন করিয়া সুদৃঢ় করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ইংরাজের শাসনাধীন অবস্থাতেই এই উন্নতি ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। রাজপথসমূহ অনেক স্থলে প্রশস্ত হইয়াছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে।

জেরুসালেমে সোপানাবলী-সংবলিত রাজপথ।

যীশুখৃষ্ট যে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বেথ্‌লেমের রাজপথে এখন জনতা দেখিলেই সহসা মনে হইবে, বাইবেলবর্ণিত যুগের নরনারীরা এই বিংশ শতাব্দীতেও যেন ঠিক তেমনই ভাবে চলাফেরা করিতেছে। তাহাদের রীতিনীতি, বেশভূষার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ক্ষুদ্র নগরের সর্ব্বত্রই যেন সেই প্রাচীন যুগের ছাপ অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে লাগিয়া রহিয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে তুর্কপ্রভাব দীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যমান ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জেনারেল আলেন্‌বি উহা তুর্কীর কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইহুদীজাতি প্যালেষ্টাইনে বহুদিন হইতে বিদ্যমান, উহার সহিত ইহুদীদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব। ইহুদীরা যাহাতে প্যালেষ্টাইনে জাতীয় অধিকার লাভ করিতে পারে, য়ুরোপের মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এমন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কীর বিরুদ্ধে অভিযানকালে গ্রেট বৃটেন আরবদিগের নিকট এমন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহারা সামরিক সাহায্য করিলে গ্রেট বৃটেন আরবদিগকে জাতীয়

খৃষ্টান-আরবমহিলা।

বলিলে যেমন ইংরাজ জাতিকে বুঝিবে, প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধে তেমন কোন বিশিষ্ট ধারণা থাকিবে না। অর্থাৎ প্যালেষ্টাইন বলিলে যে ইহুদী জাতিকেই বুঝাইবে, এমন আশা ইহুদীরা করিতে পারেন না।

প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনার সার হার্কার্ট স্যামুয়েল ইহুদী ও আরব উভয়ের প্রতি সমান ব্যবহার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরস্পরের মধ্যে যাহাতে প্রীতিবন্ধন সুদৃঢ় হয়, তাহার জন্যও তিনি না কি অনেক উপায় উদ্ভাবনও করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকাশ যে, মুসলমানগণ সার স্যামুয়েলের সে প্রচেষ্টায় আস্থাস্থাপন করিতে পারে নাই। প্যালেষ্টাইনের সমগ্র অধিবাসীর দুই-তৃতীয়াংশই মুসলমান। তাহাদের মনে এই সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, ইহুদীদিগের প্রতি ইংরাজের যেরূপ সহানুভূতি আছে, তাহাতে হয় ত ইহুদী স্বার্থের কাছে আরবদিগের জাতিগত স্বার্থ উপেক্ষিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা আরবদিগের চিত্তে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহারা সার স্যামুয়েলের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত হয় নাই।

বিলাতে গিয়া আরব প্রধানগণ এ বিষয়ে রীতিমত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। তৎপরে জাতীয় দলভুক্ত আরবগণ প্যালেষ্টাইনে রাজনীতিক অসহযোগ পন্থার অনুসরণ করেন। এই দলভুক্ত লোক সংখ্যাপ্রাচুর্য্য হেতু অসহযোগ আন্দোলন এমন ভাবে চালাইতেছেন যে, বর্ত্তমান শাসনপরিষদের সদস্যনির্ব্বাচন অত্যন্ত কঠিন

স্বাধীনতালাভে সাহায্য করিবেন এবং প্যালেষ্টাইন স্বাধীন আরবদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

ইংরাজ আরবদিগের নিকট উল্লিখিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবার ফলে ইহুদী ও আরবজাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সংঘর্ষ ও মনোমালিন্য প্রবল আকার ধারণ করায় বৃটিশ সরকার আবার মধ্যস্থতা করেন, এবং জাতিসঙ্ঘ ইংরাজের মধ্যস্থতা মঞ্জুর করিলে আরব ও ইহুদীদিগের মধ্যে একটা চুক্তি ঘটে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ব্যালফোর ইহুদীদিগের পক্ষে যে ঘোষণা করেন, ইদানীং তাহার নূতন ব্যাখ্যার কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। তাহার ভাবার্থ এই যে, ইংলণ্ড

হইয়া উঠিয়াছে। আরবগণ সদস্যনির্ব্বাচন ব্যাপারটিকে 'বয়কট' করিয়াছেন। হাই কমিশনার উপায়ান্তর না দেখিয়া কাৰ্য চালাইবার জন্য Advisory Council গঠন করিয়াছেন। প্যালেষ্টাইনের প্রায় ১০ লক্ষ অধিবাসী দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছে যে, তাহারা স্ব স্ব জাতীয় ও ধর্ম্মানুগত্য মত বজায় রাখিয়া চলিবে, কোনও প্রকারে স্বধর্ম্ম বা জাতীয়তাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। তাহাদের এই সঙ্গত দাবীকে উপেক্ষা করিবার উপায়ও নাই।

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে প্যালেষ্টাইন নানাভাবে প্রপীড়িত। অনেক বিষয় তাহাকে এখন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্যালেষ্টাইনের গবর্ণমেণ্ট সে সংস্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা সহজসাধ্য নহে। আরব ও ইহুদী এই দুই জাতির মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত যে বিরোধ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সহজে কোনও উন্নতিজনক কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার নহে। অবশ্য এখন এই তীর্থক্ষেত্রে ইংরাজ সেনাদলের অবস্থান হেতু দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান হইয়াছে, চারিদিকে তথাকথিত শান্তি বিদ্যমান; কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষবহ্নি প্রধূমিত হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত না হইলে প্রকৃত শান্তি সংঘটিত হইবে না।

তবে একটা সুখের কথা এই যে, চারিদিকে অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও শাসন, বাণিজ্য ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে ধীরে ধীরে সংস্কারের কার্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে তুর্কী কর-সংগ্রাহক কৃষকবর্গের নিকট হইতে কর সংগ্রহকালে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। এখন তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সমূহ দিকে দিকে নির্ম্মিত হইতেছে। তথায় মোটর চড়িয়া অনায়াসে এখন ভ্রমণ করা চলে। অগ্রে উষ্ট্র ব্যতিরেকে এক স্থান হইতে অন্যত্র গমনের আর কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এখন আর সে অবস্থা নাই। চারিদিকেই মোটরযোগে গতায়াত করিতে পারা যাইবে। রেলপথের বিস্তারও আরম্ভ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্দরও নির্ম্মিত হইতেছে।

পূর্ব্বে জেরুসালেম ও অন্যত্র পুষ্করিণী ও কূপ ব্যতীত অন্য কোনও প্রথায় জল সরবরাহ হইত না। এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কলের জলের ব্যবস্থা হওয়াতে

জর্দ্দান নদ

প্রাকারশোভিত রাজপথ
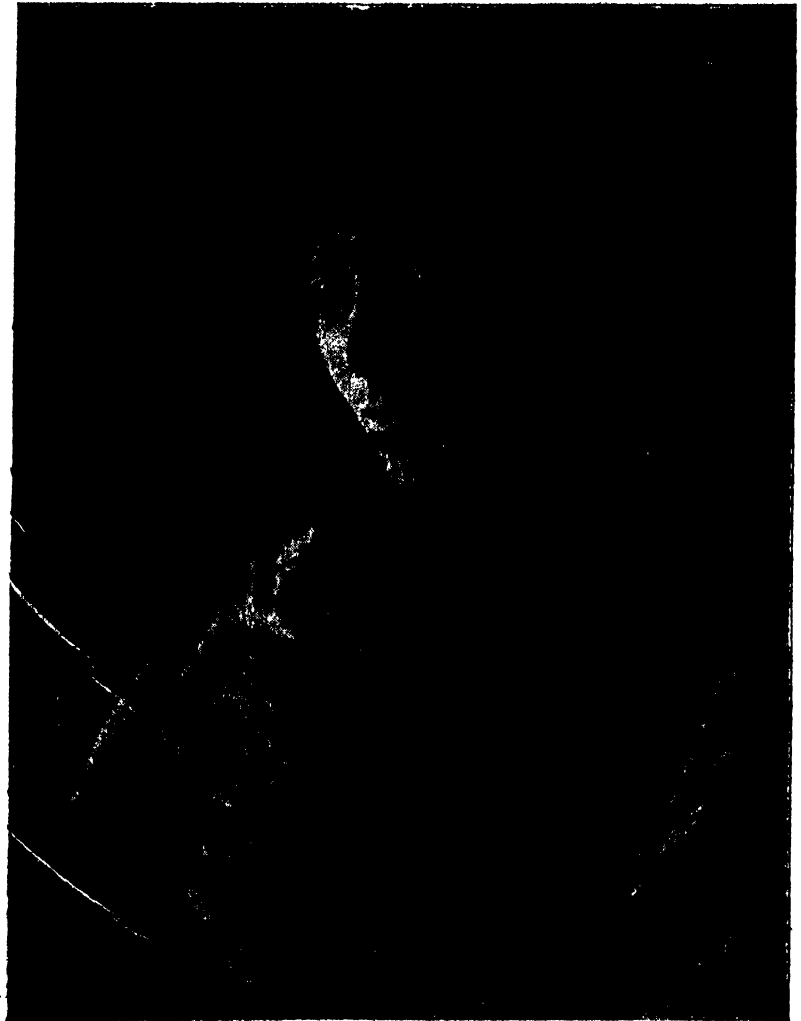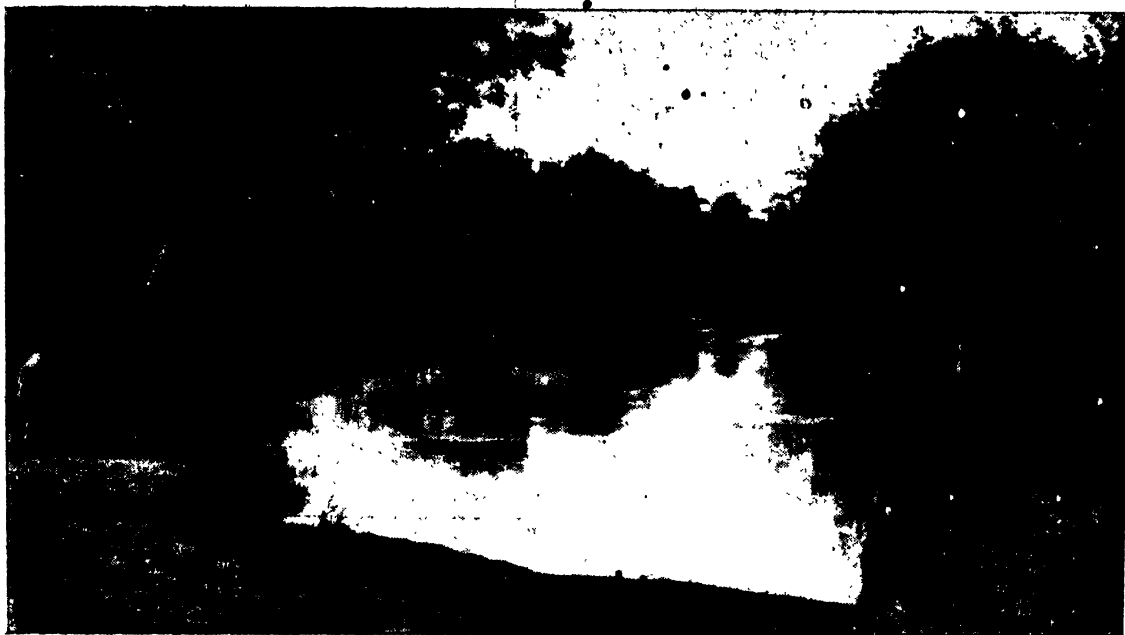
সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিতেছে। প্যালেষ্টাইনে পূর্ব্বে অত্যন্ত জলকষ্ট ছিল, সুপেয় জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি জনসাধারণকে উৎপীড়িত করিত। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সে অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলোকে নগরগুলিকে আলোকিত করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। সমগ্র প্রদেশটি যাহাতে নূতন ভাবে সংস্কৃত হইয়া উঠে, এ সম্বন্ধে অনেকেই বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রাজনীতিক্ষেত্রে ইহুদীদিগের যে স্থান ও প্রভাব ছিল, বর্ত্তমানে প্যালেষ্টাইনে তাহাদিগের সে প্রভাব আর নাই। প্যালেষ্টাইনে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। বহুর সহিত প্রতিযোগিতায় অল্পসংখ্যক কখনও জয়লাভ করিতে পারে না। আরবগণ এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমগ্র আরব দেশকে স্বাধীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। প্যালেষ্টাইনে তাহারা ইহুদী বা অন্যের প্রভাব থাকিতে দিবে না। তাহারা যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহাতে এক দিন যে তাহাদের স্বপ্ন সার্থকতা লাভ করিবে, এ বিষয়ে বহু ইউরোপীয় ও মার্কিণ রাজনীতিক নিঃসন্দিগ্ধ। রাজা হুসেনও সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন। কে বলিতে পারে, কালে তাঁহার সে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইবে না।

যীশুর জন্মস্থান বেথলেহেম নগরে রাজপথ।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মহাত্মা গন্ধী ও জাতিভেদ

মহাত্মা গন্ধী।

মহাত্মা গন্ধী অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন। সেই জন্য আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক মনে করিয়া থাকেন যে, তিনি জাতিভেদের ঘোর বিরোধী। তাঁহার ন্যায় এক জন অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ জননায়ক যে ভারতের চিরন্তন জাতিভেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারেন, ইহা আমরা সহসা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত হইলেও পাশ্চাত্য মতের মোহে মুগ্ধ হয়েন নাই। তাঁহার ন্যায় এক জন প্রতিভাশালী লোক একটু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলেই জাতিভেদের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদের বরাবরই ছিল। বাস্তবিকই মহাত্মা জাতিভেদের বিরোধী নহেন,—বরং উহার বিশেষ পক্ষপাতী। কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশের এক শ্রেণীর লোক মহাত্মা জাতিভেদের বিরোধী মনে করিয়া তাঁহার উপর মনে মনে কতকটা অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন,—আর এক শ্রেণীর লোক ঠিক ঐরূপ মনে করিয়া সমাজের মধ্যে ঘোর বিপ্লবের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জাতিভেদ সম্বন্ধে মহাত্মার মত কি, তাহার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়া আমি নিম্নে তাঁহার উক্তি হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করিলাম। প্রথমে কিরূপ অবস্থায় মহাত্মা জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমি তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিব ও তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব।

বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে মহাত্মা গন্ধী এক বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি

মাদ্রাজের, তথা দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন। ইহাতে মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ জাতীয় দল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, মহাত্মা ঐ প্রসঙ্গ উপস্থিত না করিলেই ভাল করিতেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, দ্রাবিড়ী সভ্যতার, ধর্ম্মের, সাধনার এবং বর্ত্তমান অব্রাহ্মণ আন্দোলনের সম্বন্ধে মহাত্মা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মহাত্মা গন্ধী তাঁহার বক্তৃতায় ব্রাহ্মণদিগকে প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণ ভারতের সভ্যতার ও ধর্ম্মের সৌধ-রচনায় ভারতের অনেক কল্যাণসাধন করিয়াছেন। ইহাতেই অব্রাহ্মণগণ বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং বলেন যে, মহাত্মা গন্ধী অব্রাহ্মণ জাতির গ্লানি করিয়াছেন, কারণ, অব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণও দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ তাঁহাদের ন্যায় সাহিত্যের, ধর্ম্মের এবং দর্শনের সমুন্নত সৌধ রচিয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নবেম্বর তারিখে মহাত্মা গন্ধী এই ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ প্রসঙ্গ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-সমস্যার বনিয়াদ সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজের বিরুদ্ধে সমস্ত অব্রাহ্মণসমাজের অভিযোগ নহে, উহা জাতীয় দলের বিরুদ্ধে শিক্ষিত অব্রাহ্মণদলের অভিযোগ বা বিদ্বেষ মাত্র। জাতীয় দলের অধিকাংশ লোকই ব্রাহ্মণ, সেইজন্য ব্রাহ্মণজাতিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি শিক্ষিত অব্রাহ্মণ জাতি এই কলরবের সৃষ্টি করিয়াছেন। শিক্ষিত অব্রাহ্মণ জাতির এই মনোভাব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় নাই। এই সম্বন্ধে মহাত্মা আরও একটা বিশেষ কথা বলিয়াছেন যে, অব্রাহ্মণজাতির মধ্যে লিঙ্গায়েৎ, মারহাট্টা, জৈন এবং "অস্পৃশ্য" এই কয় শ্রেণী আছেন। অস্পৃশ্য জাতিদিগের আর একটা বিশেষ অভিযোগ এই আছে যে, অন্যান্য অব্রাহ্মণ-জাতিরাও ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় তাহাদিগকে 'ঠেলিয়া' রাখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ-সমস্যা উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা অব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অনেক অধিক হইলেও ব্রাহ্মণদিগের যে রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, শিক্ষিত অব্রাহ্মণগণের তাহা নাই। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল মন্দির লিঙ্গায়েৎগণ তাঁহাদের নিজের বলিয়া দাবী করেন, কতকগুলি ব্রাহ্মণ লিঙ্গায়েৎদিগকে সেই সকল মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিতে দেন না; ঐ ব্রাহ্মণদিগের মিথ্যা (লিঙ্গায়েৎদিগের মতে) দাবী সাধারণ ব্রাহ্মণগণই সমর্থন করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ, এখন ইংরাজরা সকল ভারতবাসীর সহিত ঠিক যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ সকল অব্রাহ্মণদিগকে শূদ্র বলিয়া তাহাদের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। মহাত্মা গন্ধীর মতে এই কয়েকটিই হইতেছে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-সমস্যার প্রকৃত ব্যাপার। এই কথা বলিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম বা সমাজ সম্পর্কে ন্যায্য ক্ষমতার অভাব জন্য এই আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই; পরন্তু ব্রাহ্মণরা আপনাদের প্রজ্ঞাবলে যে রাজনৈতিক প্রাধান্য উপভোগ করিতেছেন, তাঁহাই হইতেছে এই আন্দোলনের তীব্রতার কারণ।" (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৪২৬ পৃষ্ঠা)। যে মহাত্মার সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্বতো-বিসারী, তিনি তথ্যের অনুসন্ধান এবং বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদের অবসর থাকিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পাঠক মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ-সমস্যার প্রকৃত রহস্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন। ঐ অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ আপনাদের যোগ্যতাজনিত অধিকার (right of merit) ফলে যে সুবিধা উপভোগ করিতেছেন, তাহার জন্যই অব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা আসল কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সেইজন্য বহুকালপ্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজবিষয়ক প্রতিষ্ঠানকে অবলম্বন পূর্ব্বক মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের অবলম্বিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের যে অভিযোগ, তাহার বিচার করা কঠিন হইয়াছে। কারণ, যাহা আসল বিষয়, তাহা চাপিয়া রাখিয়া যদি অবান্তর বিষয় লইয়া স্বার্থ সিদ্ধ করিবার প্রয়াস করা হয়, তাহা হইলে ঐ অবান্তর বিষয়ের অসুবিধাগুলিই অতিরঞ্জিত করিয়াই ব্যক্ত করা হয়। অব্রাহ্মণগণ যদি সরল ও নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, প্রজ্ঞাবলে ব্রাহ্মণদিগের সমকক্ষতা লাভ করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা সে পথ না ধরিয়া উৎপথ ধরিয়া যত গোল বাধাইতেছেন।

ইহার পর ঐ বৎসরের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মহাত্মা গন্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে জাতিভেদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে তিনি জাতিভেদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য লোক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনেক গালিগালাজ করিয়া পত্র লেখেন। ইঁহাদের চিঠিগুলিতে তীব্র তিরস্কার ছিল; যে সকল পত্রে ভৎ'সনা ছিল না, তাহাতেও যুক্তি ছিল না। গালাগালি যুক্তি নহে। তবে তিনি সংক্ষেপে ঐ পত্রগুলির এই মর্ম্ম প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, "জাতিভেদ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া ভারতের এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; ইহার ফলেই ভারত দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে।" ইহার উত্তরে মহাত্মা এই কথা বলিয়াছেন—"আমার মতে জাতিভেদের ফলে আমাদের এই দুর্দশা ঘটে নাই। আমাদের লোভ এবং আবশ্যক সদ্‌গুণের অভাবই আমাদিগকে দাসত্বে বদ্ধ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, জাতিভেদ আছে বলিয়াই হিন্দুধর্ম্ম বিধ্বস্ত হইয়া যায় নাই।" (I believe that caste has saved Hinduism from disintiegration. 'Young India' page 480) তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যাইতেছে যে,মহাত্মা জাতিভেদ সংরক্ষণেরই পক্ষপাতী। তিনি উহার উচ্ছেদের পক্ষপাতী নহেন। জাতিভেদের প্রভাবে হিন্দুজাতির মনীষা, প্রতিভা, প্রজ্ঞা প্রভৃতি বিলুপ্ত হয় নাই, এ কথা অনেক মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন। সুতরাং হঠকারিতার সহিত এই জাতিগত রক্ষাকবচ উচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এখন জন্মগত জাতিভেদ বিলুপ্ত করিয়া গুণগত জাতিভেদেরই প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ কৌলিক শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া এখন য়ুরোপের আদর্শে শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা করাই বিধেয়। প্রখরবুদ্ধিশালী মহাত্মা সে মতের পক্ষপাতী নহেন। তিনি এই ভাবের কথার উত্তরে বলিয়াছেন—"আমার ইহাই মনে হয় যে, বীজশক্তির নিয়ম সনাতন বিধি; সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইয়া পূর্ব্বেও যেমন ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এখনও উহার অপহ্নব করিতে যাইলে উহার ফলে সেইরূপ অতি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। এক জন ব্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত জীবনে ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিলে তাহাতে বিশেষ ফল আছে, ইহা আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি। যদি কোন ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় আচরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি স্বতই প্রকৃত ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সম্মানলাভে বঞ্চিত হইবেন। যদি কেহ দণ্ডমুণ্ডদানের বা উন্নতি-অবনতি বিধানের জন্য কোন আদালতের সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে যে নানা অসুবিধার ও দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। হিন্দুরা পুনর্জ্জন্মে এবং মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস করিয়াই থাকে। যদি তাহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে, তাহা হইলে তাহারা ইহাও নিশ্চয় জানে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইহজন্মে কদাচারী হয়, তাহা হইলে প্রকৃতিদেবী তাহাকে নিম্নজাতিতে জন্মদান পূর্ব্বক তাহার সেই দোষের শাস্তি দিবেন এবং যদি কোন (নিম্নজাতীয়) লোক ইহজন্মে ব্রাহ্মণের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও প্রকৃতিদেবী পরজন্মে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া সেই গুণের পুরস্কার দিবেন; প্রকৃতির এই কার্য্যে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই।" ('ইয়ং ইণ্ডিয়া' ৪৮১ পৃষ্ঠা)। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মহাত্মা গন্ধী জন্মগত জাতিভেদেরই পক্ষপাতী এবং কৌলিক শক্তি (Heredity)তে দৃঢ় বিশ্বাসী। ইদানীং য়ুরোপীয় মনীষিগণ কৌলিক শক্তির প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণা পূর্ব্বক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও দেখিয়াছেন যে, কোন মহদ্বংশের লোক কুশিক্ষায় এবং সঙ্গদোষের প্রভাবে বা মদ্যপানে চরিত্রহীন, এবং কুকর্ম্মপরায়ণ হইলেও তাহার বংশে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় সদ্‌গুণশালী লোক জন্মিয়া থাকে। তাহার সেই কৌলিক শক্তি সুপ্ত হইলেও সহজে লুপ্ত হয় না। পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সমাজতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ মহাত্মা সেই সকল পর্য্যালোচনা করিয়াই জন্মগত জাতিভেদ রক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন্।

কেহ কেহ মনে করেন যে, জাতিভেদ প্রজাতন্ত্রমূলক সাম্যবাদের বিরোধী। মহাত্মা বলেন, "সে কথা সত্য নহে। জাতিভেদ বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ইহার সহিত হীনতার কোন সম্বন্ধই নাই, মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে এবং অন্যান্য যে সকল স্থানে হীনতার কথা উঠিতেছে, তথায় সেই ভাবটি নিবারিত করিতে হইবে। এই পদ্ধতির বা ব্যবস্থার অপব্যবহার হইতেছে বলিয়াই যে উহা উঠাইয়া দিতে হইবে,

তাহার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। ইহার সংস্কার অনায়াসেই সাধিত হইতে পারে। ভারতে যে সাম্যবাদ প্রচারিত হইতেছে, তাহার ফলেই এই ব্যবস্থার সহিত যে প্রাধান্যের ও হীনতার ভাব গজাইয়া উঠিয়াছে, তাহা ঘুচিয়া যাইবে।" শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ যদি স্বীয় ব্রাহ্মণ্যের অহঙ্কার করেন এবং সে জন্য দম্ভ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ্যের হানি হয়। সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ কখনই দম্ভ করিতে পারেন না।

জাতিভেদের সহিত ডেমোক্রেশীর সামঞ্জস্যসাধন করা যায় না, এই কথা যাঁহারা বলিয়া থাকেন, মহাত্মা গন্ধী তাঁহাদের কথার অতি সুন্দর জবাব দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ডেমোক্রেশীর (জনসাম্যবাদ) অন্তর্নিহিত ভাব একটা কৃত্রিম ব্যাপার নহে যে,বাহ্য আকারের বিলোপ-সাধন দ্বারা উহাকে সমন্বিত করিয়া লইতে হইবে। চিত্তের পরিবর্ত্তনই ইহার প্রধান প্রয়োজন। জাতিভেদ হইতে যদি এই ভাবসংক্রমণে বাধা জন্মে, তাহা হইলে ত ভারতে হিন্দু-ধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম, জোরেষ্ট্রিয়ানধর্ম্ম এবং ইহুদী-ধর্ম্ম এই যে পাঁচটি ধর্ম্ম রহিয়াছে, তাহাও ঐ ভাবসংক্রমণের বাধক হইতে পারে। হৃদয়মধ্যে ভ্রাতৃভাবটি অনুপ্রবিষ্ট করাই ডেমোক্রেশীর অন্তর্নিহিত ভাব জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক; আমরা আমাদের সহোদর ভ্রাতাকে যেরূপ আত্মীয় মনে করি, কোন খৃষ্টান বা মুসলমানকে আমাদের ঠিক সেইরূপ সহোদর ভ্রাতা মনে করা আমার কিছুমাত্র কঠিন মনে হয় না; অধিকন্তু যে হিন্দুধর্ম্ম জাতি-ভেদসম্পর্কিত মত প্রচারিত করিয়াছে, সেই হিন্দুধর্ম্মই কেবলমাত্র মানুষের সহিত মানুষের নহে, সমস্ত জীবের পরস্পরের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য ভ্রাতৃভাব রহিয়াছে, এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছে।" কুশিক্ষার প্রভাবে এখন লোক হিন্দুধর্ম্মের এই উদারতা উপলব্ধি করিতে পারে না, সেই জন্য তাহারা সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছে। কাযেই আমাদের মধ্যে দলাদলি আড়াআড়ির ভাবটিই প্রবল হইয়াছে। যাঁহারা এ দেশে ভেদ-নীতির প্রচার করিতেছেন, আমরা কেবল তাঁহাদেরই হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলি সাজিয়া নাচিতেছি। মহাত্মা নিজে অত্যন্ত উদারচরিত্র, সুতরাং তাঁহার পক্ষে "বসুধৈব কুটুম্বকম্" মনে করা কঠিন নহে, বরং অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। কিন্তু কুশিক্ষার প্রভাবে যাহাদের সেই উদারতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দাসভাবজনিত শিক্ষায় যাহাদের হৃদয় অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে সেই উদারতা-প্রদর্শন নিতান্ত সহজ নহে। হৃদয়কে সেইরূপ উদারভাবে গঠিত করিতে না পারিলে জাতীয় মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইবে না। যাঁহারা মহাত্মার উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই সকল কথা বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

অনেকে বলিয়া ও মনে মনে বিশ্বাসও করিয়া থাকেন যে, পরস্পর একসঙ্গে পান, ভোজন এবং পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধের সংস্থাপন না করিলে ডেমোক্রেশীর ভাব জাগরিত করা হয় না। মহাত্মা অন্যত্র বলিয়াছেন যে, জাতীয় ভাবের স্ফুরণের জন্য একসঙ্গে ভোজন এবং পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধের সংস্থাপন আবশ্যক, এই মতটি প্রতীচ্য দেশের কুসংস্কার হইতেই গৃহীত; জীবনের অন্যান্য স্বাস্থ্য-জনক আবশ্যক কার্য্যের ন্যায় ভোজনব্যাপারও জীবনীশক্তির পোষক অপরিহার্য্য কার্য্য। মানবজাতি যদি ভোজনব্যাপারকে অতিশয় অনুরাগের এবং উপভোগের ব্যাপারে পরিণত করিয়া আপনাদের অনিষ্ট না করিত, তাহা হইলে আমরা যেমন জীবনের অনেক আবশ্যক কার্য্য গোপনে সম্পাদন করিয়া থাকি, সেইরূপ ভোজনও গোপনে করিতাম। হিন্দুধর্ম্মের উচ্চতম শিক্ষা ভোজনব্যাপারকে ঐ ভাবে দেখিয়া থাকে এবং হিন্দু সমাজে এখনও সহস্র সহস্র লোক আছেন, যাঁহারা অন্যের সমক্ষে ভোজন করেন না। ('ইয়ং ইণ্ডিয়া' ৩৯৭ পৃষ্ঠা)। জাতিভেদ প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "ডেমোক্রেশীর ভাব সন্ধুক্ষণের জন্য একত্র পান-ভোজন বা অসবর্ণ বিবাহ প্রয়োজনীয় নহে, ইহাই আমার মত। অত্যন্ত সাম্যবাদের ব্যবস্থাতেও পান-ভোজন ও বিবাহ-সম্বন্ধীয় আচার ও রীতি যে সার্ব্বজনীন হইবে, ইহা আমি অনুধাবন করিতে পারি না। আমাদিগকে বৈষম্যের মধ্যেই সাম্যের সন্ধান করিতে হইবে, সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি অন্যের বা সকলের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে অসম্মত হয়েন, তাহা হইলে তিনি যে একটা পাপাচরণ করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতেই পারি না। হিন্দুধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে ভ্রাতাদিগের সন্তানগণ পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে না। এই নিষেধ আছে বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে হৃদ্যতাসংবর্দ্ধনে বাধা জন্মে না, বরং ঐ

নিষেধের ফলে অনাবিল সম্বন্ধই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমি বৈষ্ণবের বাড়ীতে দেখিয়াছি যে, জননীরা সাধারণের রন্ধনশালায় ভোজন করেন না, সকলে যে পাত্রে জল পান করেন, সে পাত্রে জল পান করেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা সকলকে বর্জ্জন করিয়া স্বতন্ত্র থাকেন না, দাম্ভিক বা অপেক্ষাকৃত স্নেহহীন হয়েন না। ইহা নৈষ্ঠিক সংযম; উহা স্বভাবতঃ মন্দ নহে।" বাঙ্গালা দেশেও নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ ভোজনে বসিলে যদি তাঁহার পিতা বা মাতা তাঁহাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তিনি আর ভোজন করেন না। পংক্তিভোজনেও সদাচারী ব্রাহ্মণগণ যদি ভোজনকালে পরস্পরকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আর খাওয়া হয় না। অনেক স্থানে বিধবারা তাঁহাদের কন্যা, পুত্রবধূ ও পুত্রদিগের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলে স্নান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে তাঁহাদের সন্তান ও পুত্রবধূদিগকে অনাদর বা উপেক্ষা করেন, তাহা নহে। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, একসঙ্গে ভোজন করিলে বা ভোজনকালে পরস্পরের সংস্পর্শ ঘটিলে পরস্পরের পাপ পরস্পরে সংক্রমিত হয়। সেই জন্য এক পরিবারস্থ সকলের একসঙ্গে ভোজন করাও হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। আহ্নিক আচারতত্ত্বে ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

'অপ্যেকপংক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।

কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥'

ইহার অর্থ—"আপনার আত্মীয়স্বজন দ্বারা পরিবৃত হইয়া এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিবে না; কারণ, কাহার দেহে কি মহৎ পাপ প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে, তাহা কে জানে?" হিন্দু পরিবারের সকলে একসঙ্গে বসিয়া ভোজন করেন না; বরং ব্রাহ্মণ পরিবারে সকলে কতকটা স্বতন্ত্রভাবে ভোজন করেন, আর ইউরোপীয় পরিবারের সকলে একসঙ্গে এক টেবলে বসিয়া ভোজন করেন, সেজন্য হিন্দু পরিবার অপেক্ষা ইউরোপীয় পরিবারের মধ্যে স্নেহ-ভক্তি-প্রীতির বন্ধন যদি অধিক না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সহভোজনই যে সৌহার্দ্দবৃদ্ধির সহায়ক, ইহা কি করিয়া স্বীকার করা যায়? মহাত্মা ঠিকই বলিয়াছেন যে, ঐ একটা কুসংস্কার আমরা ইউরোপ হইতে আমদানী করিয়াছি।

তবে মহাত্মা অবশ্য এ কথা বলিয়াছেন যে, "এই বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। বিশেষতঃ ঔদ্ধত্য সহকারে আপনাদের প্রাধান্যখ্যাপনই যদি এইরূপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক কারণ হয়, তাহা হইলে সেই বাড়াবাড়ি ক্ষতির কারণ হইতে পারে। কিন্তু কালের প্রভাবে নূতন প্রয়োজনীয়তা এবং নূতন হেতুর আবির্ভাব হইতেছে, সেই জন্য একসঙ্গে পান-ভোজনের ও পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদানের ব্যবস্থার সাবধানে পরিবর্ত্তিত বা পুনর্ব্বিন্যস্ত করিবার প্রয়োজন হইবে।" কিরূপভাবে এই পরিবর্ত্তন ও পুনর্ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলেন নাই।

মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছেন যে, তিনি মূল চারি বর্ণ উচ্ছেদের বিরোধী। তবে এক একটি মূল জাতির ভিতর যে অসংখ্য উপজাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাতে কতকটা সুবিধা হইলেও নানা বিঘ্ন ঘটিতেছে। ঐ সকল উপজাতিগুলি যত শীঘ্র মিলিত হয়, ততই মঙ্গল। তিনি জোর করিয়া ঐ মিলনকার্য্য সম্পাদনের পক্ষপাতী নহেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের পক্ষে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহা দ্বারা সমাজের কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই, পরন্তু উহাতে বহুসংখ্যক লোকের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়াছে।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

তৃষা

সাগরের তীরে বসি তৃষ্ণায় কাতর,
শূন্য পানে ক্ষণে ক্ষণে চাহি নিরন্তর।
কাঁদি আমি ফুকারিয়া কাঁদে মোর হিয়া,
চাতকীর তৃষা এবে মিটিবে কি দিয়া?
তৃষিতের তৃষা যদি না করিলে দূর,
বৃথাই জলদ তব নাম সুমধুর!

শ্রীঅমলা দেবী।

ভারতে নৌ-শিল্প

সংপ্রতি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুসারে ভারতে বাণিজ্য নৌবহর রচনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্ত ভারত সরকার যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার কার্য্য শেষ হইয়াছে।

ইংরাজী সাহিত্যের ফরাসী ঐতিহাসিক টেন বলিয়াছেন, জাতির উপর ত্রিবিধ প্রভাব বিশেষরূপ অনুভূত হয়—জাতিগত, সমসাময়িক ও পরিবেষ্টনাত্মক। পরিবেষ্টনাত্মক প্রভাবের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে ভারতে নৌ-বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইবার বিশেষ কারণ ছিল। যে দেশের বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন—"নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল" যাহার বরাঙ্গে গঙ্গা, যমুনা, কৃষ্ণা, রেবা প্রভৃতি নদী কাঞ্চীরূপে শোভা পায়, সে দেশে নৌ-শিল্পের উন্নতি একান্ত স্বাভাবিক।

এ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, এ দেশের লোক দেশজ জলযানে সমুদ্রপথে যাত্রা করিত এবং সাগরতরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া যাইয়া স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। এক সময় এই বঙ্গদেশের তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমানে তমলুক) বন্দর হইতে জলযানসমূহ চীনে ও অন্যান্য দেশে যাইত। *

এ দেশে ইংরাজ শাসনের আরম্ভসময়েও এ দেশের বাণিজ্যপোত পণ্য লইয়া বিদেশে গতায়াত করিত। বাষ্প ও বিদ্যুৎ কলকজা চালনে প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সকল দেশকেই বস্ত্রবিষয়ে স্বাবলম্বী হইতে হইত। ভারতবর্ষে যে বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহাতে ভারতবাসীর অভাব পূর্ণ করিয়াও কতক পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা অসম্ভব ছিল না। সেই পণ্য যে সব জাহাজে বিদেশে প্রেরিত হইত, সে সকল এই দেশেই নির্ম্মিত হইত এবং এই দেশের লোকই সে সব জাহাজে নাবিকের কায করিত। ডিগবী লিখিয়াছেন, শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে নৌ শিল্পের এরূপ উৎকর্ষ ছিল যে, ভারতে যে সব জাহাজ নির্ম্মিত হইতে পারিত ও হইত, সে সব বৃটিশ যুদ্ধতরীর আশ্রয়ে বিলাতে নির্ম্মিত জাহাজের সঙ্গে টেমস নদীতে (লণ্ডনে) যাইত।

কিন্তু বিলাতের ব্যবসায়ীরা ও রাজনীতিকরা ইহাতে শঙ্কিত হইয়া ভারতীয় জাহাজ বিলাতে গমন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। টেলার লিখিত ভারতের ইতিহাসে দেখিতে পাই—

লণ্ডন বন্দরে ভারতীয় জাহাজে ভারতীয় পণ্য পৌছিলে তথায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীরা যেরূপ বিচলিত হইয়াছিলেন, বোধ হয়, তথায় শত্রুর নৌবহর দেখিলেও তাঁহারা তত বিচলিত হইতেন না। লণ্ডন বন্দরের নৌ-নির্ম্মাতারা ভীতিপ্রকাশে অগ্রণী হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহাদের ব্যবসার শেষদশা সমুপস্থিত এবং বিলাতের নৌ-নির্ম্মাতৃগণের পরিজনগণ অন্নহীন হইবে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসক লর্ড ওয়েলেসলী বিলাতের বন্দরে ভারতীয় জাহাজের ও সেই সব জাহাজে বাহিত পণ্যের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই এবং সে জন্ত পরে তাঁহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বিলাতের সহিত ভারতের বাণিজ্যব্যাপারে ভারতীয় জাহাজ ব্যবহারে আপত্তি করেন। তাঁহারা এ সম্বন্ধে অতি অদ্ভুত যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। উপসংহারে তাঁহারা বলেন :—

সাধারণভাবে প্রযোজ্য আপত্তির কারণসমূহ ব্যতীত ভারত হইতে আগন্ত জাহাজ সম্বন্ধে আপত্তির একটি বিশেষ কারণ এই যে, সেগুলি সাধারণতঃ ভারতীয় নাবিক বা লস্কর দ্বারা চালিত হইবে। সে দেশের লোকের দেহ শীতপ্রধান দেশের চঞ্চল সমুদ্রে নৌ-চালনের উপযোগী নহে। উষ্ণপ্রধান দেশে মরসুমী বাতাসের বিচরণক্ষেত্রে স্বল্পদূরস্থানে সহজসাধ্য নৌ-চালনায় তাহাদের স্বভাব ও অভ্যাস গঠিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে আসিতে হইলে সাধারণতঃ, বিশেষ উত্তর-সাগরে শীতবাত্যার সময় যে নানা অবস্থায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়, তাহাতে কষ্ট সহ্য করিবার মত শারীরিক বা মানসিক শক্তি ভারতীয়দিগের নাই। তাহাদিগকে এ দেশে (বিলাতে) আসিতে দিবার পক্ষে আরও আপত্তি আছে। ভারতীয় নাবিকরা বিলাতে আসিলেই যে সব দৃশ্য দেখে, তাহাতে স্বদেশে তাহারা

* Martin—Eastern India

য়ুরোপীয়দিগের সম্বন্ধে যে সম্ভ্রম হৃদয়ে পোষণ করে, তাহা অচিরে লুপ্ত হইয়া যায়। আবার তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া য়ুরোপীয়দিগের সম্বন্ধে সে অশ্রদ্ধেয় বিবরণ বিবৃত করে, তাহাতে ইংরাজের এসিয়াবাসী প্রজাবৃন্দের মনে সুপ্রভাব প্রসারিত হয় না এবং ইংরাজের চরিত্র সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা প্রাচীতে ইংরাজের প্রভুত্বরক্ষার কারণ, তাহাও ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। ইহাতে সুফল ফলিবে না। কাযেই শারীরিক, নৈতিক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়িক দিক্ হইতে দেখিলে বিলাতে ভারতীয় নাবিকদিগকে আসিতে দেওয়ার কুফলও ভারতীয় নাবিকচালিত জাহাজ বিলাতে আসিতে দিবার প্রস্তাবে আপত্তির অন্যতম কারণ বলা যায়।

এই স্বার্থপ্রণোদিত যুক্তির বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। পাছে বিলাতের নৌশিল্পীদিগের ব্যবসা নষ্ট হয় এবং পাছে বিলাতের লোকের আচার-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলে ভারতীয়রা ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়, এই ভয়ে বিলাতের লোক একান্ত অন্যায় করিয়া বিলাতের বন্দরে ভারতীয় জাহাজের প্রবেশপথ রুদ্ধ করে। অর্থাৎ ইংরাজের একান্ত স্বার্থপরতা যেমন এ দেশে কার্পাসবস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশের কারণ, তেমনই সেই স্বার্থপরতাই এ দেশে নৌ-শিল্পের বিনাশসাধন করিয়াছিল। ইংরাজ ঐতিহাসিক উইলসন ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্বনাশের কথায় বলিয়াছেন—বিদেশী শিল্পীরা সঙ্গতভাবে প্রতিযোগিতা করিলে যে (ভারতীয়) প্রতিযোগীকে পরাভূত করিতে পারিত না, রাজনীতিক অন্যায়ের দ্বারা তাহাকে পরাভূত ও পরিশেষে সংহার করে। এ দেশের নৌ-শিল্প সম্বন্ধেও যে সেই কথা বলা যাইতে পারে, উপরে উদ্ধৃত প্রমাণেই তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

এ দেশে ইংরাজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পরও যে এ দেশে নৌ-শিল্পের অবস্থা উন্নতই ছিল এবং ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্যও এ দেশের পোতাশ্রয়ে জাহাজ নির্ম্মিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বোম্বাই ডকের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের আলোচনা করিলে সেরূপ প্রমাণের অভাব হইবে না।

বোম্বাই সহরে পোত নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য ডকের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে ইহার প্রতিষ্ঠা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ইংরাজের রণতরীসমূহও এই বন্দরে থাকিতে পাওয়ায় প্রাচীতে ইংরাজের সাম্রাজ্যবিস্তারের সুযোগ ঘটে। এই ডকপ্রতিষ্ঠাব্যাপারে ভারতবাসী পার্শী লাউজী ওয়াদিয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ পর্য্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, পার্শীরা বহু দিন হইতেই নৌ-শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম ডকপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সুরাটে জাহাজ নির্ম্মিত ও সংস্কৃত হইত। বোম্বাইয়ে আসিবার পরে ইংরাজরা এই স্থানে বন্দর ও ডক করিবার সুবিধা বুঝিয়াছিলেন। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দেই বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টাররা ও ভারতে গভর্ণর অঞ্জিয়ার বোম্বাইয়ে ডক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পরস্পরকে জানাইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই সুরাটের কৌন্সিল বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টারসকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

আমরা নানা কারণে এ দেশে (ভারতে) জাহাজ নির্ম্মাণ করিবার পক্ষপাতী। এ দেশে কাষ্ঠ, লৌহের কায, সূত্রধর প্রভৃতি সুলভ এবং এ দেশে নির্ম্মিত জাহাজ বিলাতের জাহাজ অপেক্ষা যেমন অধিক দৃঢ়, তেমনই স্থানোপযোগী।

সঙ্গে সঙ্গে সুরাটের ইংরাজ কর্ত্তারা এ দেশে ২খানি জাহাজ নির্ম্মাণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন।

এই প্রস্তাবের ফলে ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ডক প্রতিষ্ঠা করিয়া ২খানি জাহাজ নির্ম্মাণের জন্য বিলাত হইতে নৌ-শিল্পী ওয়ারউইক পেটকে পাঠান হয়। তখন এই কাযের জন্য বিলাত হইতেই উপকরণ প্রেরিত হয় এবং পরবৎসর জাহাজ নির্ম্মাণের উপদেশ দেওয়া হয়। ইহার পর হইতেই ইংরাজ কোম্পানীর জাহাজগুলি সুরাট হইতে সরাইয়া বোম্বাইয়ে আনীত হয় এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহা "বম্বে মেরীন" নামেই পরিচিত ছিল।

ইহার ২ বৎসর পরে বোম্বাইয়ের কর্ত্তারা এ দেশে ১খানি রণতরী (Frigate) নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন, এবং খুরসেদ নামক পার্শী শিল্পীকে তাহা নির্ম্মাণের ভার দেওয়া হয়।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার ডকের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া ডক নির্ম্মাণের প্রস্তাব করিলে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কর্ত্তারা সে অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু নানা কারণে তখন সে কায হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, সে প্রস্তাব দীর্ঘকাল পরে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে পুনরুত্থাপিত হইলেও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে সুরাটের নৌনির্ম্মাতা ধনজীভয়ের সহিত 'কুইন' নামক জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্ত বোম্বাই হইতে "মাষ্টার এটেণ্ড্যাণ্ট" মিষ্টার ডাডলীকে প্রেরণ করা হয়। তথায় ডাডলী লাউজী নাসেরবানজী ওয়াদিয়া নামক এক যুবকের কার্য্যকুশলতা দেখিয়া প্রীত হয়েন। যুবক তখন প্রধান শিল্পীর অধীনে "ফোরম্যানের" কায করিতেছিল। এই অজ্ঞাতনামা দরিদ্র যুবক উত্তরকালে বোম্বাইয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল। ওয়াদিয়া পরে বোম্বাই ডকে প্রধান শিল্পী বা "মাষ্টার বিল্ডার" হইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে ডকপ্রতিষ্ঠা বোম্বাই সরকারের অভিপ্রেত জানিয়া ডাডলী ওয়াদিয়াকে তথায় কায লইতে অনুরোধ করেন। লাউজী তাঁহার উপরিস্থিত শিল্পীর অনুমতি ব্যতীত সে প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না, বলেন এবং বিশেষ চেষ্টায় শেষে ডাডলী সফলপ্রযত্ন হয়েন। লাউজী কয় জন শিল্পীকে সঙ্গে লইয়া বোম্বাইয়ে আগমন করেন এবং তথায় বর্ত্তমান শুল্কগৃহ (Customs House) ও আপোলা বন্দরের মধ্যবর্ত্তী স্থান ডকপ্রতিষ্ঠার জন্ত নির্ব্বাচন করেন। কিন্তু ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ডক নির্ম্মাণ আরব্ধ হয় না। তখন কাঠের ব্যবসা ছিল না। কাযেই বোম্বাই সরকার নৌনির্ম্মাণের জন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের সহিত কাষ্ঠ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে লাউজীকে উত্তর ভাগে পাঠান। প্রত্যাবর্ত্তনের পর হইতে লাউজী বোম্বাই সরকারের জন্ত জাহাজ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। তাঁহার গঠিত প্রথম জাহাজ Schooner "ড্রেক" ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রে ভাসান হয়।

মাণেকজী লাউজী।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে লাউজী বোম্বাই সরকারের কাছে দরখাস্ত করেন, তিনি একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করাইতেছেন—তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্ত তাঁহাকে ১ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হউক।* বোম্বাই কাউন্সিল তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় প্রীতি প্রকাশ করিয়া ৭।৮ মাসে পরিশোধ করিতে হইবে, এই সর্ত্তে সে টাকা মঞ্জুর করেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার ডক নির্ম্মাণের জন্ত অনধিক ৫ হাজার টাকা ঋণ করিবেন স্থির করেন এবং ডক নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয়। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ডক নির্ম্মাণ শেষ হয় এবং পরবৎসর তাহা পরিবর্দ্ধিত করা হয়। ডক নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ের ব্যবসা এমন বাড়িয়া যায়

* এই গৃহ পার্শীবাজার ষ্ট্রীটে বর্ত্তমান ইন্‌কম্ টেক্স আফিসের পার্শ্বে গ্রেহাম বিল্ডিংসের সম্মুখে অবস্থিত।

সোয়ালো জাহাজ।

যে, ৪ বৎসর পরে আর একটি ডক নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইলে লাউজীর সাহায্যে ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তাহার (Middle Old Bombay Dock) নির্ম্মাণ শেষ হয়। ৩ বৎসরমধ্যেই তৃতীয় ডক নির্ম্মাণ করা হয়। বিদেশী লেখকরা এই সব ডকের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল ডকে প্রধান শিল্পী (Master Builder) থাকিয়া লাউজী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য ২০খানি জাহাজ ও তদ্ব্যতীত ১৪খানি বাণিজ্যতরী নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। এই সময় আবার ৫বার বোম্বাই ডক হইতে রণতরীর বহর সুসজ্জিত করিয়া দিতে হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাউজীর কার্য্যে প্রীত হইয়া ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে একবার ও ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার তাঁহাকে রৌপ্যনির্ম্মিত রুল উপহার দেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া লাউজী তাঁহার পুত্র মাণেকজীকে ও বোমানজীকে এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত করেন এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দুই পৌত্রও সাধারণ সূত্রধররূপে কায শিখিবার জন্য মাসিক ১২ টাকা বেতনে ডকে চাকরী গ্রহণ করেন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে লাউজীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রদ্বয় তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টারস মাণেকজীর জন্য একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত রুল ও বোমানজীর জন্য একখানি শাল উপহার পাঠাইয়া দেন ও তাঁহাদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয়েন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৩০খানি জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৩ খানি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য নির্ম্মিত। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় ডক নির্ম্মিত হয় নাই। সেই জন্য আলোচ্য সময়ে বোম্বাইয়েই বাঙ্গালা সরকারের জন্য জাহাজ নির্ম্মিত হইত। "সোয়ালো" জাহাজই বাঙ্গালা সরকারের জন্য বোম্বাইয়ে নির্ম্মিত প্রথম পোত। "সোয়ালো" জাহাজখানি এমন সুনির্ম্মিত ও এত দৃঢ় ছিল যে, কয়বার বিলাতে ও ভারতে গতায়াতের পর তাহা বোম্বাই নৌবহর ভুক্ত করা হয়। আবার বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইবার পর ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বা সেইরূপ সময়ে তাহা ডেনদিগের নিকট বিক্রীত হয় এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার পর আবার বিলাতী সরকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া "সিলী" নামে অভিহিত হয়। প্রবল ঝড়ে আহত হইয়াও তাহা ব্যবহারোপযোগী ছিল। শেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে জাহাজখানি কলিকাতার নিম্নবাহী গঙ্গার মোহানায় চোরাবালীতে ঠেকিয়া নষ্ট হয়।

ফ্রান্সের সহিত বিবাদ বাধায় ইংরাজের যুদ্ধজাহাজের

ক্রামজী মাণেকজী।

খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল মাণেকজীর মৃত্যু হয়। বোমানজীর পুত্র ক্রামজী মাণেকজী ও মাণেকজীর পুত্র জামসেদজী বোমানজী যথাক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী-দিগের স্থান গ্রহণ করেন।

দ্বাদশ বৎসর কায করিবার পর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ক্রামজী মাণেকজীর মৃত্যু হয়। তিনি বৃটিশ সামরিক নৌবিভাগের ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া কোর্ট অব ডিরেক্টারস তাঁহাকে ১টি রৌপ্যনির্ম্মিত ফ্রুট রুল উপহার দিয়াছিলেন।

জামসেদজী বোমানজীর প্রতিভা যে অসাধারণ ছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন সাধারণ সূত্রধরের কাযে ডকে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স ষোড়শ বৎসর মাত্র। স্বীয় প্রতিভাবলে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি শিল্পীর (Builder) পদে উন্নীত হয়েন। তখন যুদ্ধহেতু সর্ব্বত্রই জাহাজ নির্ম্মাণের কায দ্রুত চলিতেছিল। বোম্বাই বন্দরে বহু রণতরী ও বাণিজ্য-জাহাজ সংস্কৃত হইয়াছিল। তখন বোম্বাই ডকের প্রশংসা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। জেমস ফরবেস লিখিয়াছিলেন, বোম্বাই ডকে বড় জাহাজ হইতে ছোট "গ্রাব" তরণী পর্য্যন্ত যে কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত, তাহা ওক অপেক্ষাও দীর্ঘকালস্থায়ী। তিনি লিখিয়াছিলেন, পার্শী নৌশিল্পীরা অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ এবং য়ুরোপে নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট তরীর আদর্শ অনায়াসে অনুকরণ করিতে পারে। বিখ্যাত পর্য্যটক পার্শনস এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বোম্বাইয়ে নির্ম্মিত তরীসমূহ দৃঢ়তায় ও সৌন্দর্য্যে য়ুরোপের কোন দেশে নির্ম্মিত তরী অপেক্ষা হীন নহে।

নায়ক সার এডওয়ার্ড হিউয়েস নৌবহর লইয়া ভারতে আইসেন। তিনিই হায়দার আলীর নৌবল নষ্ট করিয়া দেন। সার এডওয়ার্ড পার্শী নৌশিল্পিযুগলের কার্য্যে এতই প্রীত হয়েন যে, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য বোম্বাই সরকারকে ও বিলাতে কর্ত্তাদের কাছে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ অনুসারে পারেলে ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনামূল্যে জমী দান করা হয়। সার এডওয়ার্ড স্বয়ং ইঁহাদিগের প্রত্যেককে "জাতির জন্য কায করায়" ১টি সুবর্ণ-পদক উপহার দেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল বোমানজীর ও ১৭৯২

ক্রাফলীন ও রেনেল—উভয়েই বোম্বাইয়ের নৌশিল্পী-দিগের ও তাঁহাদিগের কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মানসিক শোধ

১

চৈত্রমাসে গাজনের ঢাকের শব্দে বুড়া শিবের মন্দির-প্রাঙ্গণ যখন সারা বৎসরের স্তব্ধতাকে দূর করিয়া দিয়া উৎসব-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন রূপোর মা ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে রূপো, বাবার কাছে দণ্ডীসেবা মানসিক আছে; এবার মানসিক শোধ কত্তে হবে।"

রূপো মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "এ বছর থাক্।"

শঙ্কিতস্বরে মা বলিল, "এ বছর থাক্ কি রে? ঠাকুরের মানসিক কি ফেলে রাখতে আছে?"

গম্ভীর মুখে রূপো উত্তর করিল, "ফেলে রাখতে নাই, তা তো জানি। কিন্তু পয়সা কোথায়?"

ছেলের কথায় খুব আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মা বলিল, "পয়সা কোথায় কি রে, রূপো! পয়সা কোথায় ব'লে ঠাকুরের মানসিক শোধ করবি না? কত পয়সাই বা লাগবে?"

রূপো বলিল, "লাগবে বৈ কি, চার পাঁচ টাকার কমে হবে না। নতুন কাপড় চাই, গামছা চাই, তিনটে মাল্সা পোড়াতে হবে। তার পর ঝাঁপের খরচ আছে।"

মা বলিল, "তা হোক্। যে রকমে পারিস্, মানসিক শোধ কর্। ওরে বাপ রে, ঠাকুরের ধার! গেল ভাদরে তুই কি ছিলি? কেবল বাবা মুখ তুলে চেয়েছিল ব'লেই তোকে ফিরে পেয়েছি। নাচু (পাঁচু) কবরেজ বল্লে, নাচ (পাঁচ) টাকা দিস্ তো তোর ছেলে বাঁচবে, নইলে ও গিয়েছে জেনে রাখ। আমি তো ভয়ে কেঁদেই মরি, নাচ টাকা কোথায় পাব? তা ভুলোর পিসী বললে, তোর ভাবনা নাই, রূপোর মা, বাবাকে ডাক্। তাই না শুনে আমি তো ছ' বেলা গিয়ে বাবার দোরে মাথা কুটতে লাগলুম। বলি, হে বাবা, বদ্যি-কবরেজ সবই তুমি; আমার বুকছেঁচা ধন রূপোকে ফিরিয়ে দাও, সে তোমার গাজনে দণ্ডী খাটবে। তা বাবা আমার কথা মনে ব'সে কানে শুন্লেন। তিন দিন বাবার বেলপাতা-ধোয়া জল খাওয়াইতেই তুই সেরে উঠলি। না বাছা, ঘটী-বাটি বেচেও বাবার ধার শোধ কর্।"

ঈষৎ হাসিয়া রূপো বলিল, "ঘটী-বাটি তো তোর ঘরে ঢের! একটা ঘটী, একখানা কাণা-ভাঙ্গা পাতর,—বেচলে একটা টাকাও হবে না।"

মাথা নাড়িয়া মা বলিল, "তা নাই হোক্, বাবার ধার রাখা হবে না। না বাছা, শেষে কি বাবার কোপে পড়বো?"

বিরক্তভাবে রূপো বলিল, "ঠাকুর ঠাকুর ক'রে মচ্চিস্, ঠাকুর কৈ দু'টাকা পাইয়ে দিক্ দেখি।"

ছেলের কথায় শঙ্কিত হইয়া দন্তে জিহ্বা দংশন পূর্ব্বক মা বলিল, "অমন কথা কি কইতে আছে রে, রূপো! ঠাকুর দিচ্ছে না তো দিচ্ছে কে? ঠাকুরের দয়া আছে ব'লেই বেঁচে আছিস্, তা জানিস্?"

গম্ভীরভাবে রূপো উত্তর করিল, "তা তো জানি, তবে খেতেই কুলোয় না, ঠাকুরের ধার শুধবো কি ক'রে?"

মা বলিল, "যে ক'রেই হোক্, শুধতেই হবে। আচ্ছা, এক কায করলে হয় না, রূপো?"

"কি কায, মা?"

"তোর বামুন খুড়োর কাছে একবার যা না।"

"সেখানে গিয়ে কি হবে? বামুন খুড়ো তোকে টাকা দেবে না কি?"

"টাকা কি আর অম্নি দেবে, না খয়রাৎ করবে? এর পর খেটে শোধ দিতে পারবি।"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে রূপো বলিল, "সে বামুন খুড়োই নয়, মা। খেটেই পয়সা পাওয়া যায় না, সে তোকে আগাম টাকা দেবে।"

মা বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তাই তো, কি উপায়ে মানসিক শোধ করা যায়? সে দিন রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখিয়াছে, বাবা যেন নিজে তাহার কুটীরের দরজায় আসিয়া বলিতেছেন, ও রূপোর মা, তোর ছেলে তো ভাল হয়েছে, তার মানসিক কৈ শোধ করলি না? ওঃ, মনে হইলে এখনও যেন গায়ে কাঁটা দেয়! কিন্তু হাতে তো এমন চার গণ্ডা পয়সা নাই, যাহাতে একটা মালসাও পোড়ান যায়! এখন লোকের ক্ষেতে-খামারেও তেমন কাব নাই যে, রূপো এই কয়টা দিন খাটিয়া যতটা হয় যোগাড় করিবে। উপায়ের মধ্যে বামুন-গিন্নীর কাছে তাহার সাতটি টাকা পাওনা আছে। সে বামুন-গিন্নীকে ঘুঁটে যোগাইয়া এই টাকা জমাইয়া রাখিয়াছে, আশা—এইরূপে আর কিছু জমাইয়া ছেলেটার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিবে। অনেক কষ্টে ধান ভাঙ্গিয়া ঘুঁটে বেচিয়া সে রূপোকে মানুষ করিয়াছে, এখন তাহার মাথায় এক গণ্ডূষ জল না দিয়া যদি সে মরে—রূপোকে রাখিয়া সে মরিবে, ইহা তাহার আন্তরিক কামনা হইলেও সে মরণে যে তাহার সোয়াস্তি নাই। সুতরাং পেটে না খাইয়াও সে এই টাকা জমাইয়া রাখিয়াছে; এইরূপে যদি আর দুই সাত টাকা জমাইতে পারে, তার পর দুই চারি টাকা ধারকর্জ্জ করিয়া ছেলেটার মাথায় এক গণ্ডূষ জল দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে।

মাকে ভাবিতে দেখিয়া রূপো বলিল, "তুই এত ভাবিস্ না, মা, বাবাকে জানিয়ে রাখ্, আস্‌চে বছরে দিন থাক্‌তে পয়সার যোগাড় ক'রে বাবার ধার শোধ করা যাবে। কি বলিস্?"

চিন্তাগম্ভীর মুখে মা বলিল, "তাও কি হয় রে বাছা, এ বছর নয় ও বছর!"

বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গী করিয়া রূপো বলিল, "তবে কি ক'রে কি করবি, তার চেষ্টা দেখ।"

"আচ্ছা, দেখি, কদ্দূর কি হয়।"

বলিয়া রূপোর মা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ছেঁড়া ময়লা কাপড়খানা ছাড়িয়া বামুনপাড়া অভিমুখে যাত্রা করিল।

২

রামবল্লভ ঠাকুর গৃহিণীর কথা শুনিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "এমন সময় কি ক'রে তোমার ঘুঁটের দেনা শোধ করবো? মেয়ের চড়কের তত্ত্বে দশ পনরো টাকা খরচ আছে, মুদীর দোকানে আখেরী মেটাতে হবে। তার পরে জমীদারের আখেরী কিস্তি আছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এটাও তো দেনা। সাত টাকা না হয়, গোটা চারেক টাকা দাও।"

রামবল্লভ বলিলেন "এখন এক পয়সাও দিতে পারবো না, আস্‌ছে মাসে দেখা যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "কিন্তু ও যে এই মাসেই ছেলের মানসিক শোধ করবে।"

রাগতভাবে রামবল্লভ বলিলেন, "ওর ছেলের শ্রাদ্ধ করবে! যত ব্যাটা ছোটলোক, গাজনের ঢাক বাজলেই নেচে ওঠে।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে তা হ'লে কি বলবো?"

রামবল্লভ বলিলেন, "ব'লে দাও না, আস্‌ছে বছরে তখন ছেলের মানসিক শোধ করবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "ও কিন্তু বলছে, মানসিক শোধ না করলে বাবা রাগ করবে।"

ভ্রূকুটী করিয়া রামবল্লভ বলিলেন, "হাঁ, রাগ ক'রে বাবা ওর ছেলের ঘাড় ভাঙবে! ভারী তো মানসিক! রূপো গিয়ে দণ্ডীসেবা খাটুলে বাবা তো কৃতার্থ হয়ে যাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে কথা তুমি আমি বুঝি, মাগী তো তা বুঝে না।"

রামবল্লভ বলিলেন, "তুমি বুঝিয়ে দাও না যে, আস্‌ছে বছরে মানসিক শোধ করলে কিছু দোষ নাই।"

তখন গৃহিণী গিয়া রূপোর মাকে সেইরূপই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; সেই সঙ্গে এরূপও উপদেশ দিলেন যে, এ ভাবে জমান টাকা খরচ করিয়া ফেলিলে ছেলের মাথায় জল দিবে কিরূপে? তাহা হইলে হয় তো রূপোর বিবাহই হইবে না। তাহা অপেক্ষা এ বৎসর মানসিক শোধ স্থগিত রাখিয়া রূপোর বিবাহ দেওয়া হউক, পরে আগামী বৎসরে বৌ-ব্যাটা লইয়া বাবার মানসিক শোধ করিবে। ইহাতে বাবার রাগের কোনই সম্ভাবনা নাই।

পরামর্শটা খুব ভাল বলিয়া বুঝিলেও শুধু বাবার কোপের ভয়েই রূপোর মা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু শেষ রামবল্লভ নিজে আসিয়া যখন বলিলেন, ইহাতে কোনই দোষ নাই, এবং বাবাও এ জন্য রাগ করিবেন না, তখন

রূপোর মা আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, ব্রাহ্মণের বাক্য বেদবাক্য জ্ঞানে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সে শিবের দোরে গিয়া মাথা কুটিয়া নিবেদন করিল, "বাবা গো, আমরা গরীব মানুষ, পয়সাকড়ি নাই, আমাদের অপরাধ নিও না। আমার রূপোকে বাঁচিয়ে রাখ, আস্‌ছে বছরে সে তোমারই দণ্ডী খেটে মানসিক শোধ করবে।"

বাবাকে বেশ করিয়া জানাইয়া রূপোর মা ঘরে ফিরিয়া ছেলেকে বলিল, "সেই ভালো, রূপো, আস্‌ছে বছরেই মানসিক শোধ করা যাবে। তোর বামুন খুড়ো বললে, তাতে কিছু দোষ হবে না।"

রূপো বলিল, "আমিও তো সেই কথা বলেছি, মা। আস্‌ছে বছরে ধীরে সুস্থে দিন থাকতে যোগাড় করলেই হবে। দেশ ছেড়ে তো পালিয়ে যাচ্ছি না যে, ধার শোধ করলুম না ব'লে বাবা রাগ করবে।"

মা বলিল, "তা তো বটেই, বাছা, তবে ঠাকুরদেবতার ধার, তাই ভয় করে।"

রূপো বলিল, "তা হ'লে এক কায করা যাক্, মা, মদন খুড়ো রেলের রাস্তায় কায কত্তে যাবার কথা বলছিল। এক দুপুর খাটুনি, আট আনা রোজ। মাসখানেক খেটে এলে একমুঠো টাকা ঘরে আসবে।"

মা ইহাতে অসম্মতি জানাইয়া বলিল, "না বাছা, রেলের রাস্তায় কায কত্তে যায় না। গেল বছরে হীরে ছোঁড়া কায কত্তে গেল, আর ফিরে এলো না।"

রূপো বলিল, "হীরে আর ফিরিলো না, কিন্তু আর সকলে তো ফিরে এলো।"

মা বলিল, "তা আসুক, তোর সেখানে যেতে হবে না।"

ভারীমুখে রূপো বলিল, "এখানে যেতে হবে না, সেখানে যেতে হবে না; শুধু ঘরে ব'সে থাকলে দুখ্যু ঘুচবে কি ক'রে?"

সহাস্যমুখে মা বলিল, "আমার দুখ্যু ঘুচে কায নাই রূপো, তুই আমার সাগরছেঁচা মাণিক,—তোর মুখ দেখেই আমি সুখী, তা জানিস?"

স্নেহের উচ্ছ্বাসে মায়ের মুখখানা প্রদীপ্ত—চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। স্নেহরুদ্ধ কণ্ঠে মা বলিল, "আমি কি পয়সার ভিখিরী রে রূপো, না খেয়ে না প'রে তোকে মানুষ করেছি, তোকে রেখে যদি মত্তে পারি, সেই আমার চারপো সুখ।"

ঈষৎ রাগতভাবে রূপো বলিল, "তোর, মা, শুধু ঐ এক কথা—মরবো আর মরবো।"

মা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর ভয় নাই রে, ভয় নাই। তোর মাথায় এক আঁজলা জল না দিয়ে তোর মা মরবে না—মরবে না।"

রূপো বলিল, "মাথায় জল তো অম্‌নি হবে না, টাকা চাই।"

মা বলিল, "টাকা চাই বৈ কি। কিন্তু সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না যাদু, তার যোগাড় আমি কচ্চি। হরি যদি করে, আস্‌ছে মাঘ ফাল্গুনে তোর একটা হিল্লে ক'রে দেবই দেব। তবে মানসিকটা শোধ হ'লো না, এই যা। তা আস্‌ছে বছরে না হয় নাচটা (পাঁচটা) মালসা পোড়াবি।"

"তাই যা হয় হবে" বলিয়া রূপো ছিপ হাতে বাহির হইয়া গেল। রূপোর মা বাবাকে মনে মুখে ডাকিতে-ডাকিতে ঝোড়া লইয়া গোবর কুড়াইতে বাহির হইল।

৩

রূপোর মা রূপোকে নির্ভাবনায় থাকিতে বলিল বটে, কিন্তু নিজে একটু ভাবনায় পড়িল। সে গোবর কুড়াইয়া ঝোড়া মাথায় যখন ঘরে ফিরিতেছিল, তখন পথে মতি মালিকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। মতি তাহাকে বলিল, "দেখ, রূপোর মা, আস্‌ছে বোশেখে আমাকে মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে।"

শঙ্কিতভাবে রূপোর মা জিজ্ঞাসা করিল, "এত তাড়াতাড়ি কেন? মালিক?"

মতি বলিল, "দেনার জ্বালায় আমাকে তাড়াতাড়ি কত্তে হচ্ছে। রামবল্লভ ঠাকুরের কাছে আমি তিন গণ্ডা টাকা ধারি কি না, তিনি আমাকে তাড়া দিচ্ছে, বোশেখ মাসে টাকা মিটিয়ে দিতেই হবে, নয় তো নালিশ করবে।"

মাথার ঝোড়াটা মাটীতে নামাইয়া চিন্তিতভাবে রূপোর মা বলিল, "তাই তো মালিক, এক মাসের ভেতর এত টাকার যোগাড় করবো কোথেকে?"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া মতি বলিল, "যেখান থেকে

পারি, যোগাড় কর, নয় তো আমাকে জবাব দাও, আমি অন্য চেষ্টা দেখি।"

খানিক ভাবিয়া রূপোর মা বলিল, "আচ্ছা, কা'ল তোমাকে ভেবে বল্‌বো।"

গোবরের ঝোড়া মাথায় তুলিয়া লইয়া রূপোর মা ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

মায়ের ভাবনার কথা শুনিয়া রূপো বলিল, "তা দিক্ না মতি মালিক মেয়ের বিয়ে, তার তরে তুই ভেবে মরিস্ ক্যানে? তোর টাকার জোগাড় হ'লে কি মেয়ে জুটবে না?"

মা বলিল, "মেয়ে জুটবে অনেক, কিন্তু চাঁড়ালের ঘরে এমন মেয়ে দেখা যায় না। দেখলে মনে হয়, যেন বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়ে।"

ভ্রূকুটী করিয়া রূপো বলিল, "রেখে দে তোর বামুন-কায়েতের মেয়ে! চাঁড়ালের ঘরে বামুন-কায়েতের মেয়ে নিয়ে করবি কি বল্ তো?"

মা বলিল, "আমি যাই করি, কিন্তু এই মেয়েটিকে বৌ কত্তে না পারলে আমার দুখ্যুর সীমে-পরিসীমে থাকবে না রূপো।"

রূপো বিরক্তভাবে বলিল, "তা যদি না থাকে, তবে টাকার যোগাড় কর্।"

বিষণ্ণমুখে মা বলিল, "কি ক'রে যোগাড় করবো, তাই তো ভাবচি। ভাল কথা, রেলের রাস্তায় কায কত্তে গেলে এক মাসে তুই কত টাকা আন্‌তে পারবি?"

রূপো বলিল, "তা এখন কি ক'রে বল্‌বো? তবে তিন গণ্ডা সাড়ে তিন গণ্ডা হ'তে পারে।"

মা। কবে যেতে হবে?

রূপো। পরশু।

নীরবে কিছুক্ষণ ভাবিয়া মা বলিল, "বাবাকে গড় ক'রে তাই চ'লে যা, রূপো। আর দেখ, পারিস যদি, দু' চার টাকা নিয়ে গাজনের দিন চারেক আগে ফিরে আস্‌বি।"

রূপো জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরে এসে কি হবে?"

মা বলিল, "কি হবে কি রে, বাবার মানসিক শুধে দিয়ে আবার যাবি।"

রূপো বলিল, "হুঁ, মানসিক শুধবার তরে আবার আমি আট দশ কোশ রাস্তা ভেঙ্গে আসবো!"

মা। আট দশ কোশ? এত দূর?

রূপো। তা নয় তো তোর ঘরের পাঁদাড়ে না কি?

চিন্তিতভাবে মা বলিল, "তাই তো, এত রাস্তা! সেখানে খুব সাবধানে সতর্কে থাকবি। নাওয়া খাওয়া—"

বাধা দিয়া রূপো বলিল, "হাঁ হাঁ, সে জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি তবে বদন খুড়োর কাছ থেকে আসি।"

রূপো বদন খুড়োর কাছে চলিয়া গেল। মা চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

তাই তো, এত দূরে ছেলেটাকে পাঠাইয়া দিবে? কুড়ি বছরের ছেলে হইল, এ পর্য্যন্ত এক দিনের জন্যও তাহাকে কাছছাড়া করে নাই। সেবারে পাঁচপুকুরে মেলা দেখিতে গিয়া এক রাত্রিমাত্র আসে নাই, সে রাত্রিটা রূপোর মা চোখে পাতায় করিতে পারে নাই, সমস্ত রাত্রি জাগিয়াই কাটাইয়াছিল। কিন্তু এবারে তাহাকে দূরদেশে পাঠাইয়া এক মাস—ত্রিশটা দিন কিরূপে কাটাইবে? সেখানে যদি একটু অসুখ-বিসুখ করে? মুখে আগুন, পোড়া মন কেবল অকল্যাণের কথাই আগে ভাবে। এই জন্যই বলে, মায়ের মন ডাইনীর মন। তা অসুখ বিসুখ না হউক, বিদেশে থাকিতে কষ্ট তো হইবেই। দূর হউক, বিদেশে পাঠাইয়া কায নাই। ছেলে বাঁচে, তবে তো ছেলের বিয়ে। রূপো ঠিকই বলিয়াছে, মেয়ে কি আর জুটবে না? পয়সা থাকিলে ঢের মেয়ে জুটিবে।

কিন্তু এই কয় মাসে রূপোর মা যদি দরকারমত টাকা জমাইতে না পারে? যদি সে কোন অসুখেই পড়ে, এই কয় মাসের ভিতর যদি সে মরিয়াই যায়? মরণকে তো বিশ্বাস নাই। এই যে খেলার মা ছেলের বিয়ে দিবে দিবে করিয়া হঠাৎ মরিয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত খেলার আর বিয়েই হইল না। না, একটা মাস কোনরূপে চোখ-কাণ বুজিয়া কাটাইতে হইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার স্তূপে স্তূপে আসিয়া কুটীরপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন করিল; রূপোর মা অন্ধকার কুটীরদ্বারে বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিল।

৪

নির্দ্দিষ্ট দিনে রূপো সঙ্গীদের সহিত মজুরী খাটিতে চলিয়া গেল। রূপোর মা গ্রামে যেখানে যত দেবতা ছিল,

সকলের ফুল-বিল্বপত্র আনিয়া রূপোর কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া দিল। ছল ছল চোখে মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া রূপো বিদেশযাত্রা করিল। মা তাহার সঙ্গী প্রত্যেক লোকের হাতে ধরিয়া রূপোকে দেখিবার জন্ত অনুরোধ করিল। তার পর ছেলের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন শুধু ঘরখানা নয়,তাহার প্রাণটা পর্য্যন্ত যেন সম্পূর্ণ ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল, রূপো শুধু একা বিদেশে যায় নাই, সেই সঙ্গে তাহার প্রাণটাও বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। শূন্যপ্রাণে শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া রূপোর মা আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হায় রে, স্বামীর মৃত্যুর পরও রূপোর মা কুটীরখানাকে শূন্য বোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা এমন ভয়ানক শূন্য নয়, এক বছর বয়সের রূপো তখন সে শূন্যতার মধ্যেও খানিকটা পূর্ণতা আনিয়া দিয়াছিল। আজ কিন্তু কুটীর একেবারে শূন্য, প্রাণটা শূন্য, সমগ্র সংসার শূন্য। শূন্য ঘরখানার দিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণটা যখন হাঁপাইয়া উঠিল, তখন রূপোর মা গোবরের ঝোড়াটা লইয়া তাড়াতাড়ি মাঠের দিকে চলিয়া গেল।

সে দিন রাত্রিটা একপ্রকার অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইয়া সকালে রূপোর মা আপন মনে বলিল, "আমার রূপো আজ এক দিন আস্তে গিয়েছে। ফিরে আস্তে এখনও উনত্রিশ দিন বাকী।"

কিন্তু সে উনত্রিশটা দিন—দিন কি বৎসর, রূপোর মা অনেক সময়ে একা বসিয়া তাহাই ভাবিত। মুখে আগুন, দিনগুলা যেন কাটিতে চায় না। এত বড় লম্বা দিন-রাত্রি রূপোর মা জীবনে আর কখন দেখে নাই। ওঃ, এক একটা দিন নয় তো, যেন এক একটা যুগ। কবে রূপো গিয়াছে, এত দিন পরে আজ কি না সাতটা দিন হইল! এমন করিয়া বাকী দিনগুলা কাটিলে রূপোর মা ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবে কি?

রূপোর মা এখন আর গোবর কুড়াইতে বড় একটা যায় না। বামুন-গিন্নীর নিকট হইতে খুঁটের তাগাদা আসিলে জবাব দেয়, "বামুন দিদিকে ব'লো, মাঠে এখন আর গোবর পাওয়া যায় না; আসছে মাসে ছ'মাসের খুঁটে একবারে দেব।"

রান্না-খাওয়াতেও রূপোর মা'র আর আগ্রহ নাই। কোন দিন দিনের বেলা রাঁধে, কোন দিন একেবারে রাত্রিতে রাঁধিয়া খায়। এক দিন রাঁধিলে তিন দিনে হাঁড়ীর ভাত উঠে না। হাঁড়ীতে একার মত চাউল দিতে গিয়া ভুলক্রমে ছেলের পর্য্যন্ত চাউল ঢালিয়া দেয়; তার পর ভাতের রাশি দেখিয়া পোড়া মনকে গালি দিতে থাকে। দিনে ছইবার বদন ঠাকুরপোর বাড়ীতে গিয়া খোঁজ লয়, সেখান হইতে কোন খবর আসিল কি না। সে নিয়ত বসিয়া বসিয়া ভাবে, রূপো কবে ফিরিবে, কেমন আছে, কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। গাছের ডালে বসিয়া কাকগুলা কা কা শব্দ করে, রূপোর মা লাঠি লইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়।

সকালে সন্ধ্যায় রূপোর মা সকল কায ফেলিয়া শিবের দরজায় গিয়া মাথা কুটিয়া আসে, "বাবা, একবার তুমি যমের মুখ হইতে ফিরিয়ে দিয়েছিলে, এবার দুঃখিনীর ধনকে বিদেশ থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে এনে দাও। তোমার ধার কে শুধতে পারে? তবু রূপো আমার ফিরে এলে আমি পাঁচ পোয়া চাল পাঁচ রম্ভা দিয়ে তোমার পূজো দেব।"

তাহার উপহারের প্রলোভন শুনিয়া বাবা হাসিতেন কি না, বলা যায় না; রূপোর মা কিন্তু প্রত্যহ সন্ধ্যায় সকালে আসিয়া তাঁহাকে উপহারের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া যাইত।

৫

এমনই করিয়া কোনরূপে পনরোটা দিন কাটিয়া গেল। ক্রমে গাজনের উৎসব আসিয়া পড়িল। ঢাকের শব্দে, সন্ন্যাসীদিগের সেবাধ্বনিতে শুধু শিবমন্দির নয়, সারা গ্রামখানা প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল; নিত্য অভাবগ্রস্ত, নিত্য রোগজীর্ণ পল্লী আপনার অভাব-দৈন্য বিস্মৃত হইয়া গাজনের উৎসবে মাতিয়া উঠিল। ছেলে-বুড়া মেয়ে-পুরুষ গেরুয়া কাপড় পরিয়া, গলায় উত্তরীয় ঝুলাইয়া মহাদেবের জয়ধ্বনিতে পল্লী মাতাইয়া তুলিল। সে ধ্বনি শুনিয়া রূপোর মা'র প্রাণটা যেন কেমন কেমন করিতে লাগিল। আহা, রূপো আমার যদি এই সময়ে ফিরিয়া আসিত! বাবা, এখনও তাহাকে আনিয়া দাও, এখনও চড়কের চার দিন বাকী। রূপো আমার গলায় উত্তরীয় পরিয়া তোমার সেবা খাটিয়া মানসিক শোধ করুক।

কি জানি কেন, সে দিন কেমন একটা আগ্রহে রূপোর মা রূপোর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। রূপো কিন্তু আসিল না। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি এক প্রহর উত্তীর্ণ হইল, চতুর্থীর চাঁদ ডুবিয়া গেল। রূপোর মা হতাশচিত্তে ছেলের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমন্ত অবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিল, যেন জটাজূটধারী ফণিভূষণভূষিত ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত মহাদেব আসিয়া রুদ্রগম্ভীর স্বরে তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "কে রূপোর মা, তোর ছেলের মানসিক শোধ করলি না?"

রূপোর মা ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "কি করবো বাবা, ছেলে যে এলো না।"

রুদ্রদেব রুদ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ছেলেকে তো তুই নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছিস্। ভাল চাস্ তো মানসিক শোধ কর্, নয় তো—"

রূপোর মা আর কিছু শুনিতে পাইল না, শুধু একটা ভীম হুঙ্কারে কুটীরখানা কাঁপিয়া উঠিল। রূপোর মা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে জাগিয়া উঠিয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে লাগিল।

সকাল হইলে রূপোর মা উঠিয়া মুখে জল না দিয়াই বাবার কাছে ছুটিয়া গেল, এবং তাঁহার দরজায় মাথা কুটিয়া নিতান্ত কাতরভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তার পর রূপোর ভাবী শ্বশুর মতি মালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। মতি ভয় পাইয়া রূপোর মাকে সঙ্গে লইয়া বাবার পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইল।

পুরোহিত বিধান দিলেন, অপরাধের জন্য বাবাকে নগদ এক টাকা দণ্ড দেওয়া হউক, তাহা হইলেই বাবার কোপ প্রশমিত হইবে। রূপোর মা অনেক কাঁদাকাটা করিয়া বামুন-গিন্নীর নিকট হইতে একটি টাকা লইয়া বাবাকে দণ্ড দিয়া আসিল। পুরোহিত তাহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই, আমি বাবাকে বেশ ক'রে জানালেই বাবার কোপ দূর হবে।"

পুরোহিত অভয় দিলেও রূপোর মা কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; মনের ভিতর গভীর আশঙ্কা লইয়া সে কেবল বাবাকে ডাকিতে লাগিল। সে দিন সে রাঁধিল না, খাইল না, সারা দিন ঘরের ভিতর উবুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৈকালে মতি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, রূপো যেখানে কায করিতে গিয়াছে, সেখানে ভয়ানক কলেরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, দুই তিন জন মারা গিয়াছে। তবে রূপো ভাল আছে কি মন্দ আছে, তাহার কোন সঠিক খবর পাওয়া যায় নাই।

বাবা গো, এ আবার কি করিলে? তবে কি তোমার কোপ দূর হয় নাই? রূপো আমার কি তোমার কোপে পড়িল? রূপোর মা পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া বাবার দোরে আছাড় খাইয়া পড়িল। রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর; দুঃখিনীর বুক-ছেঁড়া ধনকে ফিরিয়ে এনে দাও, আমি বুক চিরে রক্ত দিয়ে তোমার মানসিক শোধ করবো।

রূপোর মা'র কাতর ক্রন্দনে প্রাণহীন পাষাণ-মন্দির পর্য্যন্ত যেন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, ঢাক-ঢোলের গুরুগম্ভীর শব্দের ভিতর দিয়া মাতৃহৃদয়ের করুণ ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। শুধু দেবতার পাষাণমূর্ত্তি নিশ্চল নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন।

রূপোর মাকে বাবার দরজা হইতে কেহই উঠাইতে পারিল না; সে বাবার সম্মুখে ধন্না দিয়া পড়িয়া রহিল। বলিল, "আমার রূপো যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ আমি উঠবো না।"

৬

গভীর নিশীথে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মন্দিরের পাশ দিয়া যখন সাঁই সাঁই করিয়া নৈশ বাতাস বহিয়া যাইতেছিল, তখন রূপোর মা স্বপ্নে দেখিল, যেন বাবা তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, "উঠে যা রূপোর মা!"

রূপোর মা বলিল, "আমার রূপো ফিরে না এলে আমি কখনও উঠবো না।"

"এখানে প'ড়ে থেকে কি করবি?"

"আমার প্রাণ দেব।"

"প্রাণ দিতে পারবি?"

"দিতে পারি কি না দেখ।"

"প্রাণ দিতে হবে না, তোর রূপো বেঁচে আছে।"

"বেঁচে থাকে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

"তার ব্যারাম হয়েছে, ভাল হ'লেই ফিরে আসবে।"

"ব্যারাম হয়ে থাকে, ওষুধ দাও। তোমার ওষুধ না খেলে তো ভাল হ'তে পারবে না।"

"ওষুধ নিয়ে তুই যেতে পারবি ?"

"খুব পারবো। রাতারাতি গিয়েই ওষুধ খাইয়ে দেব।"

"তবে তুই উঠে আমার দরজার সাম্‌নে যা দেখ্‌তে পাবি, তাই নিয়ে রাতারাতি তাকে খাইয়ে দিবি। রাত পুইয়ে গেলে ফল হবে না।"

বাবা অন্তর্হিত হইলেন, রাশি রাশি ফোটা ফুলের সুগন্ধে মন্দির ভরিয়া উঠিল।

রূপোর মা'র ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া হর্ষপ্রফুল্ল চিত্তে ঔষধের সন্ধানে দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। কৈ, কিছুই তো নাই, বাবা কি তবে মিথ্যা বলিলেন? এই যে, এটা কি? এ যে একটা সাপ! বাবা বুঝি ভয় দেখাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন? কিন্তু রূপোর মা ভয় পাইবার পাত্রী নয়। রূপোর মা জানিত, কত লোক এইরূপে ঔষধ খুঁজিতে গিয়া সাপ-বেঙ দেখিয়াছে, এবং সাহস করিয়া তাহা ধরিবামাত্র পক্ক কদলী বা মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং রূপোর মা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া সাপটাকে মুঠা করিয়া ধরিল। ধরিবামাত্র সাপটা গর্জ্জন সহকারে ফণা তুলিয়া তাহার বাহুমূলে দংশন করিল। রূপোর মা তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই সবলে তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া আঁচলে বাঁধিবার জন্য চেষ্টিত হইল। সাপটাও পুনঃ পুনঃ দংশনে তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

* * *

সকালে পুরোহিত আসিয়া মন্দিরের দরজা খুলিতে গিয়া দেখিতে পাইল, মন্দিরদ্বারে রূপোর মা'র মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার হাতে একটা মরা সাপ, অঙ্গের স্থানে স্থানে সর্পদংশনচিহ্ন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিবার জন্য গ্রামের লোক দলে দলে তথায় উপস্থিত হইল।

সেই দিন মানসিক শোধ করিবার উদ্দেশ্যে রূপো ঘরে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আসিয়া দেখিল, তাহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই মা নিজের জীবন দিয়া তাহার মানসিক শোধ করিয়াছে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তারাপদ চট্টোপাধ্যায়

বিখ্যাত সুকণ্ঠ কথক বরাহনগর-নিবাসী তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ৫ই ফাল্গুন লোকান্তরিত হইয়াছেন। কথকতা ভারতীয় শিক্ষা-সভ্যতার বিশেষত্ব। বর্ত্তমানে সুলভ সাহিত্য প্রচারের ফলে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে লোক অন্যরূপে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এক সময় এই কথকতা প্রভৃতিই লোকশিক্ষার প্রধান উপায় ছিল। তখন কথকতা

শিখিবারও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যথানিয়মে শিক্ষা-লাভ করিয়া কথকতা করিতে আরম্ভ করেন। নানা সংস্কৃতশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কথকতায় তাঁহার সুখ্যাতি শুধু বাঙ্গালার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না, বারাণসী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানেও তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের খুল্লতাত ছিলেন।

পুরাতন পঞ্জিকা

২

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো—" প্রভৃতি 'নিত্যকর্ম্ম বচনগুলি আউড়ে 'সুপ্রভাত" "সুপ্রভাত" ব'লে বিছানা ছেড়ে উঠে দাদা দরজা খুলে দেখে বল্লেন, "ইস্, আকাশে মেঘ করেছে, জলও একটু একটু পড়ছে, টিকে-ও ফুরিয়ে গেছে, শোলা-ও নেই, মুস্কিল করলে, বাদলায় এরা বেরোবে কি না, বুঝতে পারছি না।" আমি দাদার পৌত্র, কিন্তু গুড়ুকখোর হিসেবে দাদা আমার বাবার বাবা ঠাকুর-দাদা ছিলেন। তখন বিলিতী দেশালাই ওঠেনি, কোক কয়লার নাম-ও তখন কেউ শোনেনি; সুঁদরি কাঠের জ্বালে রান্না হ'ত। সোঁদরবন থেকে নৌকায় সুঁদরির গুঁড়ি চালান হয়ে বেলেঘাটায় এসে তা লাগত, সেইখানে-ই ছিল সুঁদরি কাঠের বড় আড়ত; পাড়ায় পাড়ায় খুচরা কাঠের দোকান ছিল; সেই মুসলমান দোকানদাররা আর পাকা গৃহস্থরা আড়ত থেকে গাড়ী-দরে সুঁদরির গুঁড়ি কিনে এনে তার সরু মোটা চেলা করিয়ে দোকানদাররা বেচত, আর গৃহস্থরা মজুত রেখে খরচ করত। সেই গুঁড়ি চেলা করত উড়েরা; বড় বড় কুড়ুল দু'মুড়োয় দু'জন দাঁড়িয়ে গুঁড়ির উপর পর্য্যায়ক্রমে কোপ মারত; আজকাল-কার দিন হ'লে সেই কাঠচেলানকে আমরা একটা আর্ট বললে-ও বলতে পারতুম। তখন উড়িষ্যাবাসীদের কল-কেতায় প্রধান কায ছিল গুটি চার পাঁচ;—বাঁকে ক'রে জল তোলা, কাঠ চেলান, স্নানের ঘাটে ছেলেমেয়েদের ছাপা পরান, সাহেবদের খিজমদগারী। ছাতা ধ'রে আফিস পৌঁছানটা তখন উঠে গেছে, কিন্তু পাল্কী বওয়ার চলনটা খুব-ই ছিল, কারণ, কালীঘাটাদি দূরস্থানে যাওয়া ভিন্ন মেয়েদের গাড়ী চড়াটা তখন বিশেষ মর্য্যাদার কথা ছিল না; অনেক বাবুও নিজের পাল্কী চ'ড়ে কুঠী যেতেন, সাহেবরা-ও অনেকে পাল্কী চড়তেন; কোন কোন তাজা সাহেব জাহাজ থেকে চাঁদপাল ঘাটে নেমে-ই পাল্কীর ছাতের উপর চ'ড়ে বসতেন, দু'শ লোক বুঝিয়েও তাঁদের ভিতরে ঢোকাতে পারত না। আর আজ কলকাতা সহর যুড়ে ব'সে গেছে উড়ে। এঁরাই এখন ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা, কারখানায় কারখানায় বিশ্বকর্ম্মা। সে ঝুঁটি খোঁপা নাই, শালপাতার ধোঁয়াপত্র নাই, তালপাতার ছাতা নাই, এখন "দেখে ঘাড়ছাঁটা টেরিকাটা বিবরে লুকায় বাবু," তামাক চলে রূপা বাঁধান হুঁকায়, ঝাঁঝরি-বেলন হাতে ট্রাম চ'ড়ে যান লুচি ভাজতে।

সুঁদরি কাঠে রান্না হ'ত ব'লে তার-ই আগুন মালসাভরা প্রায় বাড়ী বাড়ী থাকত, তাইতে পুরুষদের তামাক খাওয়ার সুবিধা হ'ত; শীতকালে মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যায় মালসার চার ধারে ব'সে আগুন পোয়াতেন, ছেলেরা গুলি-আলু বা কাঁঠালবীচি পেলে সেই আগুনে পুড়িয়ে খেত, আর প্রদীপ জ্বালবার দরকার হ'লে মেয়েরা গন্ধকের দেশালাই সেই আগুনে ঠেকিয়ে আলো ক'রে নিত। গন্ধকের দেশালাই গৃহস্থের মেয়েরা নিজেরা-ই. প্রস্তুত করতেন; কালীপূজার আঁজিপুঁজি করবার জন্য পাকাঠি কেনা হ'ত, পাকাঠী ভেঙ্গে ছুচির ক'রে আঙ্গুল আষ্টেক কাঠির দু'দিক ঐ আগুনের মালসায় বসান একখানা খুরীতে গলান গন্ধকের উপর ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিতেন; বাসাড়ে লোক দেশালাই কিনতেন ফেরীওয়ালার কাছে; পরিষ্কার কাপড় পরিষ্কার মেরজাই জরি-বসান বাহারে টুপি প'রে দেশালাই-ওয়ালারা বেলা ৯টা সাড়ে ৯টার সময় "লে—দেশ্লাই" ব'লে রাস্তা দিয়ে হেঁকে যেত। দেশালাইওয়ালা তখন সহরের একটি বিশিষ্টচিত্র-ই ছিল, চৈত্রসংক্রান্তিতে কাঁসারীপাড়ার সংএ যে প্রাচীন ভদ্রলোকটি দেশালাইওয়ালা সাজতেন, তাঁর গায়ের পোষাক ও হীরেমতি সোনার গয়নার দাম অন্ততঃ বিশ পঁচিশ হাজার টাকার হবে। বেশী রাত্তিরে টাট্টিরে তামাক খাবার ইচ্ছা হ'লে অথবা মালসায় আগুন না থাকলে লোককে চকমকির সাহায্য নিতে হ'ত। শুধু আমার দাদা নয়, প্রায় সকলেরই ঠাকুরদাদা বা জ্যেঠা মহাশয়ের এক একটি চক্‌মকির আধার ঘরে থাকত; মাটির গোল বা বাদামে ধরণে গড়া, ভিতরে গুটি তিনেক খোবর, এক খোবরে খানিক তামাক, অন্য খোবরে খান-কতক টিকে, মাঝখানে চক্‌মকির পাতর, কতকটা শোঁতির

ধরণে গড়া একখানি ইস্পাতের পাত আর খানিকটা মুখ পুড়িয়ে রাখা শোলা। দাদার কি হাত দোরস্ত-ই ছিল, বাঁহাতে শোলাটি ধ'রে তার উপরে দু' আঙ্গুলে ধরা পাতরখানির উপর ডান হাত দিয়ে ইস্পাতের এক ঠোকর, আর ফিন্‌কিটি শোলার উপর প'ড়েই ধ'রে উঠল, তার পর তাই থেকেই টিকে ধরিয়ে নেওয়া। এই মেহনত ক'রে তামাক সেজে হুঁকায় হুঁকায় তামাক চালাচালি ক'রে একত্রে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাক সকলে মিলে আনন্দ ক'রে এক সঙ্গে ধূমপান; আর এখন চুরোট বিঁড়ি সিগারেট, একালসেঁড়েমির ফাষ্ট' রেট; মুখামৃতসিক্ত ধূমশলাকা শ্যালককুলতিলকের মুখে-ও তুলে দেওয়া যায় না।

"টিকে লেও!"—বাঁচা গেল, দাদার একটা ভাবনা ঘুচে গেল, টিকেওয়ালা বেরিয়েছে; কিন্তু বৃষ্টি একটু বাড়ল, বাতাসটা তার চেয়েও একটু বেশী, তবু মাখমওয়ালা দু'পাত মাখম বাড়ীতে দিয়ে গেল; এখন যেমন চা চলেছে, তখনকার ভদ্রলোকের একটা চাল ছিল, ভিজে ছোলা, আদা ও মাখম-মিছরি খাওয়া। ক্রমে "সরাগুড় তিলকুটো সন্দেশ মুকুন্দমোয়া" ডেকে গেল, "বাত ভাল করি, দাঁতের পকা বার করি" বলতে বলতে বেদিনীও বাজারের দিকে গেল, "হে দীননাথ, হে মধুসূদন, এই অন্ধকে কিছু দাও" ব'লে আমাদের পরিচিত দীননাথ দাতার মনে দয়া জাগিয়ে দিয়ে চল্লো, 'মাজনমিসি মাথাঘসা'র চুব্‌ড়ি কাঁকে মুসলমান বুড়ী-ও চেঁচিয়ে গেল, যখন বেলা প্রায় সাড়ে ৮টা, "রিপুকর্ম্ম" "চাই ঘোল" ডেকে যাচ্ছে, বলদেরা বলদের পিঠে ছালা চাপিয়ে এর একটু আগে-ই চ'লে গেছে, তখন বাড়ীতে কথা উঠল, এ কি, ঝড় হবে নাকি? সে দিন প্রথম ছুটী সুরু, আফিস স্কুল বন্ধ; সুতরাং রান্নার ততটা তাগাদা ছিল না, একটু দেরিতে-ই উনান ধরান হয়েছিল। ভাতের তোলো নেবেছে, ডাল ফুটছে, দোপাকা উনানের আর এক মুখে চচ্চড়ির কড়াখানি চুড়বুড় করছে, বেলা প্রায় ১০টা, সেই সময় ঝড়ের এমন একটা দম্‌কা এল যে, আমাদের উঠানের নারিকেলগাছটা যেন জাহাজের মাস্তুলের মত দুলতে লাগল, ঘরগুলো সব কেঁপে উঠল। তখন সকলের-ই মুখে "দুর্গা দুর্গা! মা, এ কি করলে! পরশু যে তোমার পূজো মা, এ কি করলে!" আর—এ কি করলে! মা তখন রণরঙ্গে মেতে উঠেছেন, দশভুজের আস্ফালনে একেবারে বিশ্বতোলপাড় ক'রে দিচ্ছেন। দম্‌কার উপর দম্‌কা। গোঁ গোঁ গোঁ গোঁ একটা ভয়ানক আওয়াজ! সেই আওয়াজ আর একবার শুনেছিলুম তিন বছর পরে কার্ত্তিকের ঝড়ের রাতে; আর সেই দানব-সঙ্গীতের সা রে গা মা ভাঁজা শুনেছিলুম প্রায় মাস তিনেক ধ'রে যখন আমি যৌবনকালে বছরখানেক ছিলুম পোর্ট ব্লেয়ারে (বেড়ী পরবার সৌভাগ্য হয়নি)। রাস্তার জনমানব নেই, যাঁরা সে দিন পূজোর বাজার করবেন মনে করেছিলেন, তাঁরা ঘরে ব'সে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। যাঁরা বড় বড় নৌকা ক'রে বড় বড় গঙ্গাজলের জালা, পূজার প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যসম্ভার, কেহ কেহ বা স্ত্রীপুত্র পরিবার পর্য্যন্ত সেই নৌকায় তুলে দিয়ে দুতিন দিন পূর্ব্বে দেশের উদ্দেশে রওনা ক'রে দিয়েছেন, এই অভূতপূর্ব্ব ঝড়ের সময় তাঁদের মনের ভাবকে ভাবনা বললে কিছু-ই বুঝায় না। রাস্তায় চালের খোলা উড়ছে, চাল উড়ে যাচ্ছে, পাঁচীল বারান্দা কোথাও কোথাও হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে, ডাক্তারখানার প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড ঝড়ে উড়ে এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায় গিয়ে পড়ছে, আর কোথায় যে কার কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা নিজের নিজের ঘরে খিল দিয়ে ব'সে কে কি ক'রে বলবে?

এই রকম কাণ্ড চল্‌ল বেলা চারটে অবধি, তার পর বাজীকর বল্‌লেন, ফুস মন্তর যা ঝড় উড়ে যা। অমনি সব স্থির, কোথায় বা বৃষ্টি, কোথায় বা বাতাস, পশ্চিম আকাশে ঢ'লে পড়া সূর্য্য দেখা দিলেন। এর আগে ঘণ্টা পাঁচেক ধ'রে যে হুড়োমুড়ি চ'লে গেল, তার কিছুই নেই। চারটের পর চারদিকের দেওয়াল-পড়া ইট কাঁকর ছড়ান ছাতে উঠে গঙ্গার দিকে চেয়ে দেখি যে, যেন একেবারে মাস্তুলের বন। দু' দশখানা মাস্তুলওয়ালা জাহাজ তখন শালকের ডকে মেরামত হ'তে আসত মাত্র, নইলে কালপিন ঘাট, বড় জোর কয়লা ঘাট, তার উত্তরে কি বড় জাহাজ, কি ছোট ষ্টীমার বড় একটা দেখা যেত না; আহিরীটোলার ঘাটে বাঙ্গালীর একখানা পেয়ো জাহাজ দিন কতক হয়েছিল, সেটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ ব'লে বাড়ীর লোক ছেলেপুলেদের দেখাতে নিয়ে যেত, এই অবস্থায় বাগবাজার কুমারটুলীর সব ঘাটে বড় বড় জাহাজের গাদি লেগে গেছে দেখে লোক একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

ব্যাপারখানা হয়েছিল এই, ঝড়ের তাড়সে গোটাকতক সমুদ্রের ঢেউ বড় গাঙ্গে ঢুকে প'ড়ে ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সরকারী হিসাবে ঐ সাবডিভিসনে বিশ হাজারের উপর লোক ঐ ঝড়ে বন্যায় ভেসে যায়, গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতি যে কত গিয়েছিল, তার সুমার হয়নি; ঘর-দোরের কোথাও কোন চিহ্ন ছিল না, সেই ঢেউ কলকাতার কাছে এসে মোটা মোটা শিকলি ছিঁড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ ষ্টীমার সুলুপ গাধা-বোট ভড় পানসী ভাউলে সব ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। পরদিন বৈকালে বাবার সঙ্গে গাড়ী ক'রে গিয়ে দেখি যে, ইডেন গার্ডেনের কাছে রাস্তার উপর এক প্রকাণ্ড জাহাজ, আরও ঐ দিকে রাস্তার উপর একখানা জাহাজ দেখেছিলুম, কোন্‌খানটায়, তা ঠিক মনে নেই। ডাঙ্গার লোকের ত ক্ষতি-কষ্ট খুব-ই হয়েছিল, কিন্তু জলে যারা ছিল—দাঁড়ী মাঝী চড়নদার সেলার অফিসার—এ বেচারীদের যে কষ্ট, যে ক্ষতি, তার আর সীমা ছিল না। আবার শুনেছি, এক জনের সর্ব্বনাশে আর এক জনের পৌষ মাস হয়ে গিয়েছে। কাঠপাড়া থেকে টাকা-গয়নাভরা সিন্দুক বরুণঠাকুর আপনি মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে ভাটপাড়ায় সরকারদের কুঁড়েয় তুলে দিয়ে এসেছেন, এই রকম অনেক যায়গায়।

তিন বৎসর পরে কার্ত্তিকে ঝড় রাত্রিকালে হওয়ায় কলকাতায় মানুষ অনেকগুলি মারা গিয়েছিল, আশ্বিনে ঝড়ে বড় তা হয়নি। একে পূজোর বাজার, তার উপর ঝড়, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য দারুণ বেড়ে উঠল। আপনারা শুনলে অবাক্ হবেন, ভাল পুরানো বালাম চাল তিন টাকা মণের উপর-ও উঠেছিল, পাকা রুইমাছ ছ'আনা সাত আনা সের পর্য্যন্ত দাঁড়িয়েছিল; এই হারে খাদ্য, পরিধেয় তখনকার হিসেবে দামে আগুন হয়ে সাধারণ লোককে বড়ই কষ্টে ফেলেছিল। গুণ্‌তিতে আট দশ জন সমন্বিত পরিবার যেখানে ম্যাসিক ৪০ টাকা আয়ে স্বচ্ছন্দে খেয়ে-প'রে দু'জন উপরি দু' দিন এলে তাদের-ও অন্ন দিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দে চলত, তাদের একটু কষ্টে পড়তে হয়েছিল। বেশী লভ্যমান হয়েছিলেন গাধাবোটের মালিকরা, ঘরামীরা আর রাজ-মজুররা। যে গাধাবোটের ঘাট ছিল দৈনিক ২॥০ টাকা কি ৩ টাকা, তাই দাঁড়িয়েছিল ৮০।৯০ টাকা, এক বৎসর পর্য্যন্ত ৪০।৬০ টাকার নীচে নামেনি।

ছিঁচকাঁদুনে বদনাম থাকলে ও বাঙ্গালী যেমন চট্ ক'রে নিজের চোখের জল মুছে অভ্যস্ত কাযে নিযুক্ত হতে বা অন্যের আনন্দে যেমন সহজে যোগ দিতে পারে, অন্য কোন জাতি তা পারে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালার গৃহিণী সদ্যো-মৃত পুত্রের শোক চাপা দিয়ে শ্বশুর-স্বামীর জন্য রাঁধতে ব'সে যান, একান্নবর্ত্তী পরিবারের কিশোরী বিধবা বাড়ীতে বিবাহ হ'লে অন্যের বাসরে ব'সে নবদম্পতির আনন্দবর্দ্ধন করতে পারে, শ্মশানঘাটের ফেরৎ বাবু ঠিক আপিস এটেণ্ড করে; তা ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বড় বাবুরা জানেন। এ দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, আনন্দময়ীর আগমনে কেউ নিরানন্দ থাকে না, তার কারণ যে, ব্যক্তিগত দুঃখের বোঝা হাটে নামিয়ে কেহ-ই জাতীয় আনন্দোৎসবে নিরা-নন্দের সৃষ্টি করতে চায় না। সাধারণতঃ পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন-ই সহরের বাইরে থেকে বেশী সংখ্যায় ঢাকী ঢুলী এসে কলকেতায় জড় হয়, চতুর্থীর দিন আসে বটে, কিন্তু তত অধিক নয়; এবারে মহাপঞ্চমীর প্রলয়ের দিন কেউ আর বাড়ী থেকে বেরোতে পারেনি, সুতরাং ঢাকী-ঢুলী-ও কলকেতায় বেশী দেখা দেয়নি, কিন্তু ষষ্ঠীর সকাল থেকে-ই বড় বড় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বাদ্যকরের আড্ডা ব'সে গেল; যাদের নায়ক-বাড়ী বাঁধা আছে, তারা সরাসর যে যার যায়গায় পৌঁছে, ঢাক ঢোল কাড়া-নাগরা জগঝম্প ট্যামটেমী তাসা টিকাড়া দামামা কাঁসি বাঁশী শাণাই বাজিয়ে গিজ্‌দা-গিজোড় গিজদা-গিজোড় আওয়াজে আগমন-সংবাদ ঘোষিত ক'রে দিলে। আবার রাস্তায় সকালে শাঁখা-ওয়ালা সিঁদুরওয়ালা মধুওয়ালা বার হ'ল; আবার 'ধনে সয়বে লেবে গো' বেরুল, মধ্যাহ্নে আনরপুরে দইওয়ালারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধামা মাথায় "চাই শুকো দই" হাঁকতে লাগল। তারা এক পয়সায় এক মালসী দুই মালসী দই দিত, মালসী উপুড় ক'রে দেখাত যে, দই ভূমে পড়ে না। এক পয়সার এক মালসীতে দুজনের বেশ দুপাত ভাত মেখে খাওয়া চলত, আবার মালসীর তলায় একটু দম্বলের জন্য-ও থাকত, এখন এক পয়সার দই কিনতে গেলে ছেলে-পুলে হ'লে 'যা যা' ব'লে তাড়িয়ে দেয়, বয়স্ক লোক হ'লে মুখপানে চেয়ে একটু মুচকে হাসে। বেলা ৩টায় বেরুল

মুসলমান ফিরিওয়ালা, "বিলিতি চুড়ি চাই, কাচের খেলনা চাই, সাবান চাই" ব'লে; জ'য়ের পুতুল বেণে পুতুল বিক্রয়কারিণীরা বাড়ীর ভিতর ঢুকে ঢুকে-ই দেশী মাটীর পুতুল গছিয়ে যেত, চাচারা বেচত বিলিতী চীনে মাটীর পুতুল, আর সাবান তখন সচরাচর গৃহস্থ লোক বাড়ীতে কারুর পাঁচড়া হ'লেই কিনত। তবে পুজোর সময় একটু হাতে মুখে মাখবার জন্য বিয়ের বয়সী মেয়ে ও ছোট ছোট বৌরা একটু একটু আব্দার ধরত। তবে বেলোয়ারী চুড়ী পরার রেওয়াজটা খুব জাঁকিয়ে উঠেছিল। পুরুষমানুষের, বিশেষ ছেলেদের পুজোর সময় যেমন নূতন জুতো কিনে পায়ে দিতে-ই হবে, পঞ্চমী ষষ্ঠীর দিন তেমনই মেয়েদের বেলোয়ারী চুড়ী চাই-ই চাই, তা যাঁর হাত সোনার বাউটী বাঁউড়ী খাড়ু পঁইচে মরদানা নারকেলফুল মুড়কী-মাদুলী দিয়ে মোড়া, তাঁর-ও। বাবা কাকা দাদারা ভাই ভাইপো ছেলে সঙ্গে ক'রে নতুন জুতো কিনতে বেরুলেন। ঠিক বীডন গার্ডেনের সামনে চিৎপুর রোডের পশ্চিম ধারে সারি সারি লম্বা হিন্দুস্থানী মুচিদের জুতোর দোকান ছিল, তারা বুরুষ-করা বার্ণিসকরা ফিতেওয়ালা সিঙ্গেল স্প্রিং ডবল স্প্রিং জুতো তৈরী ক'রে দোকানের সামনের লহরের উপর শুকাতে দিত। ঘড় পায়ের ব্যবহারসই ভাল জুতো ৯ আনা হ'তে ১৷০ সিকে ১॥০ টাকার মধ্যে সচরাচর বেশ কেনা যেত, তবে পুজোর সময় দুচার আনা দর অবশ্য বেড়ে যেত। তখনকার একশো দেড়শো টাকা মাস মাইনের চাকুরেরা-ও ঐ জুতো ব্যবহার কত্তেন। তবে তখনকার একশো দেড়শো টাকা আয়ে লোকের যা সঙ্কুলান হ'ত, এখন ৫।৬ শো টাকা আয়ে তা হয় কি না সন্দেহ। মেছোবাজার থেকে শুঁড়উল্টান রঙ্গিন পাতর-বসান জরির জুতো পরা তখন-ও ছেলেরা ছাড়েনি, তবে "তাড়য়েৎ দশবর্ষাণি" কেটে গেলে জরির জুতো পরতে অনেক ছেলের-ই লজ্জা করত, তাই তাদের লাল-বাজারের মোড়ে বা চাঁদনীতে নিয়ে গিয়ে একরঙ্গা বা দোরঙ্গা চামড়ার রপাট (রবার) লাগান বোতাম-বসান জুতো ১০.১২ আনা খরচ ক'রে দিতে হ'ত; একটু স্বচ্ছল অবস্থার লোকরা কসাইটোলার (বেন্টিক ষ্ট্রীট) চীনের বাড়ীর চক্‌চকে বার্ণিস করা ফিতে বাঁধা টিকিটমারা জুতো ১৸০ থেকে ২॥০ টাকার ভিতর-ই কিনে দিত। স'বাজার, নতুন বাজার, বৌবাজার, বড়বাজার এই সব যায়গায় কাপুড়েপটীতে যেমন বছর বছর ভিড় হয়, তেমন-ই ভিড় চলছে। ৫৭ সালের মিউটিনির পর ঢাকার তাঁতিরা সিপাইপেড়ে সাড়ী-ধুতীর ফেশান বার করে, ৬৩তে সে সব একেবারে লোপ পায়নি, ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তখন-ও সিপাইপেড়ের আদর আছে, একটু বড় হলেই ঢাকাই বা শান্তিপুরে ফুলপাড়, তখন ঢাকাই কালাপাড় ফালাপাড়ের সৃষ্টি-ই হয়নি, কালাপাড় পরতে গেলে-ই সিমলা বা ফরাস-ডাঙ্গা অথবা অন্যান্য আড়ঙ্গের নানারকম পাড়, গুলবাহার উড়ানি, ডুরে উড়ানি, শান্তিপুরে জরিপাড় উড়ানি, কলমে উড়ানি। মেয়েদের জন্য কস্তাপেড়ে সাড়ী, নীলাম্বরী, জম্ম-এয়স্ত্রী ডুরে, বিদ্যাসাগর পেড়ে সাড়ী, ঢাকাই গুলবাহার, শান্তিপুরে কল্কাদার এই সব বাছতে বাছতে দোকানদার খদ্দের দুজনের-ই মাথা ঘুরে যাচ্ছে। বাঙ্গালীর গায়ে দেবার যোগ্য তৈয়ারী জামা তখন ছিটের বা রঙ্গিন মেরুণোর এক চাঁদনী বা বড়বাজারেই কিছু কিছু পাওয়া যেত, কামি-জের রেওয়াজ বড় ছিল না, পাঞ্জাবীর নাম তখন কেউ শোনেওনি; মেয়েরা তখন জামা গায়ে দিতেন না, ছেলের-ই হোক বা বড়র-ই হোক, পিরাণ বা চায়না কোটের দরকার বা সখ হ'লে দেশী মুসলমান দরজীকে কাপড় কিনে তৈরী করতে দিতে হ'ত, সাধারণতঃ ২।১ মাসের ভিতর তৈরী হয়ে এলে বেশ শীগ্‌গির শীগ্‌গির দিয়েছে মনে হ'ত; এখন বৌবাজার পটলডাঙ্গা সিমলে হাতীবাগান জোড়া-সাঁকো এই সব পুরোন নাম বদলে বড় জামাবাজার, মেজো জামাবাজার, সেজো ন' জামাবাজার নাম দিলে বে-মানান হয় না। বাঙ্গালী এণ্ড কোঁদের কল্যাণে পুরানো দর্জ্জিদের নবাবী মর্জ্জির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে বটে, ৬ ঘণ্টার অর্ডারে এখন বেলদার পাঞ্জাবী তৈরী হয়ে যায়, কিন্তু বঙ্গ-অঙ্গের ঘেরাটোপ তৈরীর এই মহাধুমধাম দেখে মনে হয় না কি যে, ফতোনবাবী বা ফফিসনেসটা বড্ড বেড়ে উঠেছে। বিয়ের আগে এক একটি মেয়ের পেনি থেকে আরম্ভ ক'রে বডিস, ব্লাউজ, জ্যাকেট প্রভৃতিতে যা খরচ পড়ে, তাতে অনায়াসে দুখানা কনে গয়না তৈরী হয়ে যায়।

৪

দুর্গোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় উৎসব। বর্ষায় ডুব দিয়ে নেয়ে উঠে আশ্বিনে যেন বাঙ্গালী গা-মাথা মুছে নতুন

কাপড়চোপড় প'রে আবার নবীন জীবনের কাযে লেগে যায়। আশ্বিনে বাঙ্গালী মহাশক্তিকে আনন্দময়ী নামে উদ্বোধিত ক'রে আপন আপন সংসারমধ্যে আপন আপন হৃদয়মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করেন। বাঙ্গালী পিতামাতা দেবীকে দূরে শূন্যে নিরাকাররূপে কল্পনা করিয়া ভূমিষ্ঠপ্রণামে পরিতুষ্ট হয়েন না। মাকে প্রতিমায় মূর্ত্তিমতী করিয়া মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিতা করেন এবং সেই মূর্ত্তিতে আপনার পতি-গৃহবাসিনী প্রিয়তমা কন্যাকে পিতৃগৃহে প্রত্যাগতা জ্ঞানে অপত্যস্নেহের আনন্দে আপ্লুত হইয়া পড়েন। উপাসক কেবল পরকালে মুক্তি ও ইহকালে জয়কামনায় দেবীর সম্মুখে নৈবেদ্য-ভোজ্যাদি নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন না, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, আত্মীয়স্বজন, কুটুম্ব, স্বজাতি বিজাতি, আহূত অনাহূত সকলকে না ভোজন করাইলে তাঁহার আনন্দের বাজার অপূর্ণ রহিয়া যায়। এই প্রলয়-কারী আশ্বিনে ঝড় কত জাহাজ ডুবাইল, কত হর্ম্ম্য ভূতল-শায়ী করাইল, কিন্তু বাঙ্গালীর প্রাণের প্রমোদ-চালার একটি খড়-ও ঐ ঝড়ে নড়িল না।

কলকাতার সব পুজোবাড়ীতে যেমন ধুমধাম, বিদায়-আদায়, নৈবিদ্য বিলি, পাঁঠা বলি, ভোগ বিলি, প্রসাদ বিতরণ, ভূরিভোজন, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, যাত্রা গান নাচ যেমন হয়, তেমন-ই হ'ল। সে সময় কলকাতায় একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, মা এসে গয়না পরেন জোড়াসাঁকোয় শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ী, ভোজন করেন কুমারটুলীর অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী, আর রাত্রি জেগে নাচ দেখেন স'বাজারের রাজবাড়ীতে। শিবকৃষ্ণ দাঁর মত অমন পরিপাটী ঠাকুর সাজান আর কোথাও হ'ত না, এখন-ও বোধ হয়, একেবারে তা উঠে যায়নি, তবে সাবেক লোকের সঙ্গে সাবেক ভাব-ও গিয়েছে, একটি শিবরাত্তিরের সলতে যথাসাধ্য নিয়ম রেখে চলচেন। কিন্তু অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী একেবারে ধু ধু। এখনকার কুমারটুলীর লোক আর অভয়চরণ মিত্তির, ভৈরব মিত্তির, বনমালী সরকার নাম করলে কিছু বুঝতে পারে না; "এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে, বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" পাল মশাই, কুণ্ডু মশাইরা এখন ওখানে দণ্ডধর, সিংহাসন পরিপূর্ণ; কিন্তু রাজকার্য্যের কোন চিহ্ন-ই নেই, তবে কবিরাজ মশাইরা এখন-ও গঙ্গা-তীরস্থ ঐ পল্লীর গৌরব কতকটা বজায় রেখেছেন; স্বনামধন্য স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের পুতচরিত্র পৌত্র গিরিজাপ্রসন্ন এখন-ও পুজার সময় বহু ক্ষুণ্ণ জনকে প্রসন্ন করেন। কিন্তু ঐ ১২৭১ সালে-ও অভয়চরণ মিত্রের বাড়ী দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা একটা দেখবার জিনিষ ছিল। সাধারণ ঠাট বাঁধা কাঠামোর মিত্তিরদের বাড়ীর প্রতিমা প্রস্তুত হ'ত না। দোলচৌকীর ধরণে কাঠের একখানা সুসজ্জিত সিংহাসন ছিল, যাতে "সিংহশিখী মূষাপৃষ্ঠে সপুত্র পার্ব্বতী" আর দক্ষে বামে লক্ষ্মী সরস্বতীর আলাদা আলাদা পুতলী প্রতিষ্ঠিত হ'ত; সিংহাসনের উপরিভাগে মহাদেব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি-ও স্থাপিত হ'ত; দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি মূল্যবান্ বস্ত্রপরিহিতা ও আসল স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কারে ভূষিতা; বিজয়া হ'ত সুসজ্জিত পাল্কীতে প্রতিমাগুলি আলাদা আলাদা তুলে দিয়ে। দালানে প্রতিমার এক পাশে মায়ের শয়নের জন্য মূল্যবান্ শয্যাবিন্যস্ত পর্য্যঙ্ক থাকত, আর মায়ের মুখপ্রক্ষালনের জন্য রূপার গাড়ু ঘটি গামলা ইত্যাদি। কিন্তু সবার চেয়ে দেখবার জিনিষ ছিল যা কোথায় হ'ত না বা আর কোথাও হবে ব'লে মনে হয় না;—রচনা আর মিষ্টান্নসজ্জা। দুর্গোৎসবের সময় বাটীর প্রাঙ্গণে একটা রচনা টাঙ্গাবার পদ্ধতি আছে। বছর কতক আগে জোড়া-সাঁকোর প্রতাপ ঘোষ মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি শাস্ত্রমতে দুর্গোৎসব করতেন ও প্রাঙ্গণে ঐ রচনা-বিন্যাস-ও করতেন। রাসের সময় যেমন রাসমঞ্চের সামনে একটা জাল খাটিয়ে তাতে নানাবিধ রঙ্গিন শোলার ফুল মাছ পাখী ইত্যাদি টাঙ্গিয়ে ইন্দ্রজাল রচনার প্রথা আছে, তেমন-ই দুর্গোৎসবের সময়ে মণ্ডপের সামনে অঙ্গনে একটা রচনা খাটাতে হয়, তাতে মাটীর নয়, শোলার নয়, আসল স্বভাবজাত ফলমূল ফুল, যেমন—কাঁদিসুদ্ধ নারিকেল, কলা, মোচা, লাউ, কুমড়া, বেল, আখ, নেবু, ডালিম আর যেখানে যত ফলফুল পাওয়া যায়, সব টাঙ্গায় আর সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টান্ন তৈরী করে-ও টাঙ্গাবার পদ্ধতি আছে। অভয়চরণ মিত্তি-রের বাড়ী যত রকম ফলফুল পাওয়া যেত, তা ত খাটান হ'ত-ই, তার পর মিষ্টান্ন, এক একখানা জিলিপি যেন এক একখানা গরুর গাড়ীর চাকা, গজা নয়, যেন এক একখানা বারকোষ, মতিচুর এক একটা বড় কামানের গোলা, এই রকম সব। দালানে মায়ের দু'পাশে দু'খানা থালা পাতা হ'ত, তাতে উপরি উপরি মিঠাই সাজান হ'ত—একেবারে

মেঝে থেকে আরম্ভ ক'রে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত। বর্ত্তমান পাঠকের জন্য আমি 'হ'ত' 'ঠেকত' লিখলুম, কিন্তু আমি নিজে যেন ষাট বচ্ছর পেছিয়ে গিয়ে অবাক্ বালক-চক্ষুতে দেখছি, সেই নীচের থাকে কাশীর কলসীর মত এক একটা বড় বড় মেঠাই, তার ওপর থাকে তার চেয়ে একটু ছোট, এমনি আকৃতিতে কমে কমে চূড়ায় একটি আগ্‌মণ্ডা আকারে একটি ছোট মেঠাই। এঁদের গুরুর বাড়ী ছিল শ্যামপুকুরে, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে মহাষ্টমীর দিন সেখানে মহানৈবেদ্যখানি যেত। একটা বড় বাঁশের মাঝখানে নৈবেদ্যের থালাখানি ঝুলিয়ে দু'জন দু'জন ক'রে চার জন বেয়ারায় নৈবেদ্যখানি ব'য়ে নিয়ে যেত; নৈবিদ্যির মাথার উপর যে একটি আগ্‌মণ্ডা সাজান থাকত, সেটির ওজন ১০।১২ সেরের কম নয়, চালের ওজনটা অঙ্কবিদ্‌রা খতিয়ে নেবেন।

স'বাজারের রাজাদের উত্তর দক্ষিণ দু' বাড়ীতে এখন-ও পূজো হয়, কিন্তু ধুমধাম যা তা রাস্তায়, ভিতরে ধাম আছে, কিন্তু ধুম নেই, তবে যদি সিগারেট বা বিঁড়ির ধুম বলেন ত সে স্বতন্ত্র। কিন্তু ৭১ সালে-ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ক'মে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তবু রাজারা তখনও রাজা ছিল। কৃষ্ণা নবমীতে এঁদের বাড়ী বোধন বসে, সেই দিন থেকে দু' বাড়ীতেই নাচ আরম্ভ, শেষ মহানবমীতে। পঞ্চমী অবধি উপরের নাচঘরে-ই মজলিস, ষষ্ঠীর দিন বন্ধ, পূজার তিন দিন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুই উঠোনে। বোধনের ক'দিন যে ইচ্ছে সে বাইনাচ দেখতে যেতে পারে, পূজোর তিন দিন টিকিট না দেখালে ঢোকবার যো নেই, আর রাজার বাড়ীর একখানি টিকিট পাবার জন্য কত হাঁটাহাঁটি, কত সাধ্যসাধনা। আর রাজার বাড়ী লেগে যেত সাহেব-মেমদর্শকের ভিড়। আজকাল ছুটী পেলে নিজের বাড়ীর পুজো ফেলে-ই বাবুরা হিল্লী দিল্লী কিষ্কিন্ধ্যা দার্জ্জিলিং ছোটেন, তা সাহেবদের কথা বলব কোন্ মুখে? কিন্তু তখনকার সাহেবরা পূজোর আমোদ করত, আমাদের সঙ্গে একটু বেশী মেশামেশি-ও করত; অনেক বড় বড় সাহেব-ও রাজার বাড়ীতে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য পরিচিত অন্য 'সাহেবের বা বিখ্যাত বাবুদের সুপারিস ধরতেন। সাদা মুখের শোভায় রাজবাড়ীর উঠানে যে পদ্মফুলের মালা ফুটে উঠত আর আমরা কাল কাল অলিরা আশেপাশে ঘেঁসে ঘুঁসে গুঞ্জন করতুম। সাহেবদের জন্য একটু সেরি শ্যাম্পেন ব্র্যাণ্ডি বিস্কুট থাকত বটে, ভাগ্যবান্ দু' দশ জন বাঙ্গালী প্রসাদ-ও পেতেন; কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার বেলা নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীদের ভাগ্যে কলা, আর অ-টিকিটী ভদ্রলোকের পক্ষে গলাধাক্কা। তবে পূজার পর রাজারা নিমন্ত্রিতদের বাড়ীতে বাড়ীতে খুব ভাল মেঠাইয়ের থালা পাঠাতেন বটে।

একবার কালী সিঙ্গী—নাম করলে-ই যাঁর প্রতি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা উথলে উঠে, যে সিংহ মহোদয়ের অমরস্মৃতি জাগরিত রাখবার জন্য মর্ম্মরমূর্ত্তি তৈলচিত্র, এমন কি, বাৎসরিক শোক-সভারও প্রয়োজন হয় না, তাঁর বাঙ্গালা নামটা বাঙ্গালীর মতন সোজা বাঙ্গালাতেই উচ্চারণ ক'রে কালী সিঙ্গী বললুম, আমার এই "সিঙ্গী"তেই এত শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা মাখান আছে যে, অন্য কোন সাহিত্য-সিংহ-ও তত ভক্তি ভালবাসা দিতে পারবেন না। সেই কালী সিঙ্গী একবার পূজোয় রাজার বাড়ী নিমন্ত্রণ এসেছিলেন, বৈঠকখানায় ব'সে আছেন, বিস্তর বড়লোক সেথায় জমায়েৎ; ও দিকে উঠোনে নাচের মজলিস বসেছে, এমন সময় সেই নির্ভীক তেজস্বী স্পষ্টভাষী যুবক ব'লে উঠলেন, "রাজার বাড়ী—দুগ্‌গো পূজো—নেমন্তন্ন আসা গেছে—সেপাই খাও, শান্ত্রী খাও—গোরা কনেষ্টবল খাও—ফরাস তাকিয়া চেয়ার কউচ খাও, ঝাড় সেজ দেলগিরি বেল-লণ্ঠন যত পার খাও, বাইজীর সেঁইয়া বেঁইয়া খাও, কিন্তু লুচি সন্দেশের যদি প্রত্যাশ কর ত স'রে পড়।" মজলিসে একটা হাসি-ও উঠল, একটা আমতা আমতা ভাব-ও কারুর কারুর মুখে দেখা গেল। রাজবাটীর প্রতিভূ ছিলেন তথায় হরেন্দ্রকৃষ্ণ, তিনি বিশেষ অপ্রস্তুত না হয়ে বল্লেন,—"কি জানেন কালী বাবু, আমাদের বৃহৎ ব্যাপার, এই কলকাতার সাহেব-ই বলুন, মেম-ই বলুন, আর সমস্ত বড় মানুষ গুষ্টীত আছেন-ই, তাতে এই নাচের মজলিসের ব্যাপার, এর সঙ্গে কি আবার খাওয়ানর উদ্যোগ ক'রে সামলানবার, ঐ জন্যে আমরা এর পরে বাড়ী বাড়ী খাবার

পাঁঠাই।" "সামলাতে পারা যায় কি না, একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়।" এই ব'লে সিংহ মহোদয় নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে বাড়ী গেলেন। পর-বৎসর হ'তে কয়েক বৎসর তিনি নিজের বাড়ীতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে রাস্তার দু'ধারে বাঁধা রোশনাই, বাড়ীতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তরফার মজলিস ক'রে আর হাজার হাজার লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে পরিতোষ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্যের আয়োজনে ভূরিভোজন করিয়েছিলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

বিরাট বিমানপোত

ওহিওতে সংপ্রতি একখানি বিরাট বিমানপোত নির্ম্মিত হইয়াছে। এত বড় বিমানপোত পৃথিবীর কুত্রাপি আর নাই। মার্কিণ সমর-বিভাগের জনৈক এঞ্জিনীয়ার ওয়াল্‌টার, এইচ বার্লিং এই বিমানপোতের নক্সা প্রস্তত করেন। এই পোতের সাহায্যে অনায়াসে ৫ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা প্রেরণ করা চলে। ১০ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা লইয়া ইহা দুই ঘণ্টাকাল আকাশে উত্থিত হইতে পারে। অন্যান্য যুদ্ধসরঞ্জাম ও দ্রব্যাদি ব্যতীত এই পোতে ২ হাজার গ্যালন গ্যাসোলাইন ও ১ শত ৮১ গ্যালন ওজনের তৈল রাখিবার জন্য ৬টি কক্ষ আছে। তাহা ছাড়া ৪ জন বা তদধিক চালকের উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থাও ইহাতে আছে। পূর্ণমাত্রায় বোঝাই হইলে ইহার ওজন প্রায় ৪ শত ৮৭ মণ হয়। সেই অবস্থায় এই বিমানপোত ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে বায়ুপথ ভেদ করিয়া চলিয়া থাকে। যিনি ইহার উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহারই নামানুসারে এই বিমানপোতের 'বার্লিংবম্বার' নামকরণ হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ২৮ ফুট। এক দিকের ডানা হইতে অপর দিকের ডানা পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি ১ শত ২০ ফুট। ৬টি লিবার্টি মোটরের দ্বারা এই বিমানপোত পরিচালিত হয়। পৃথিবীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমানপোত এককালে ১২ ঘণ্টাকাল ব্যোমপথে বিচরণ করিবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই পোতে ৭টি কামান বসাইতে পারা যাইবে। দুই জন নাবিক পোতের দুই ধারে বসিয়া বিমানপোত চালাইবে। ইচ্ছামত তাহারা যখন যে দিকে ইচ্ছা স্থানগ্রহণ করিতে পারিবে, সেরূপ ব্যবস্থাও ইহাতে আছে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধকালে বিমানপোত হইতে যদি ৩০ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা রণক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিতলে ৫০ ফুট পরিধিবিশিষ্ট গর্ত্ত হইয়া যাইবে। সেই উদ্দেশ্যেই বার্লিং বিমানপোতের সৃষ্টি। তবে ৩০ হাজার পাউণ্ড ওজনের বোমা বহন করিতে যেরূপ বিমানপোতের প্রয়োজন হইবে, তাহার আকার বার্লিং বিমানপোতের অপেক্ষা ৫ গুণ অধিক হওয়া প্রয়োজন। মার্কিণ সমরবিভাগ এই নূতন প্রকারের বিমানপোত নির্ম্মাণের পর আশা করিতেছেন, কালে তাঁহারা সেইরূপ বিমানপোতও নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন। সৃষ্টিনাশের জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকার উদ্ভাবনীশক্তি এখনও শ্রান্ত হয় নাই। য়ুরোপের মহাকুরুক্ষেত্রের পরও মানুষমারা কলের জন্য পাশ্চাত্যজাতি নিশ্চিন্ত নাই।

দারুনির্ম্মিত ঘড়ীর চেন

এক টুকরা কাঠ হইতে জনৈক মার্কিণ শিল্পী একটি, সুন্দর ঘড়ীর চেন (হার) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৪ মাস পরিশ্রমের পর শিল্পী এই সুন্দর ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় ঘড়ীর হার তৈয়ার করিয়া আমেরিকার সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও রসজ্ঞদিগের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র হারটির কোথাও কোন অসম্পূর্ণতা নাই। যন্ত্রের সামান্য আঘাতচিহ্নও কুত্রাপি

দারুময় ঘড়ীর চেন।
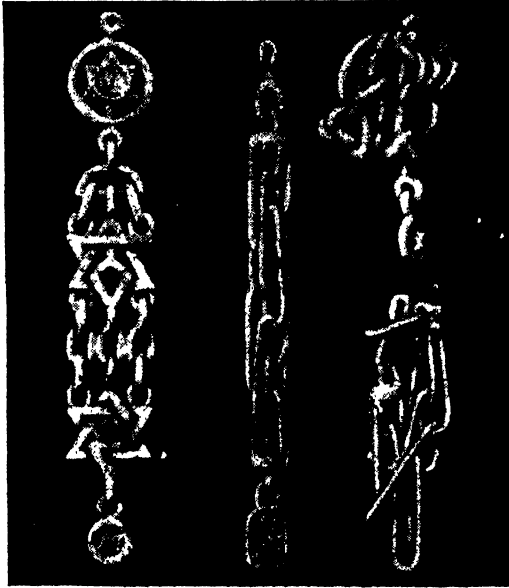
পরিলক্ষিত হইবে না। প্রথম হার নির্ম্মাণ করিতে ৪ মাস লাগিলেও পরবর্ত্তী হারগুলি নির্ম্মাণ করিতে শিল্পীর ৩ সপ্তাহের বেশী সময় লাগে নাই।

রাস্তা-পরিষ্কারক মোটর

মার্কিণের কোন কোন সহরে সাধারণ ঝাড়ুদারের পরিবর্ত্তে চিত্রানুযায়ী মোটর ব্যবহৃত হইতেছে। এই প্রকারের একখানি মোটর বিশ জন ঝাড়ুদারের কায

ট্যাঙ্কের আকারে গঠিত রাস্তাপরিষ্কারক মোটর।

করিতে সমর্থ। ইহার সম্মুখভাগে যে কলের সমার্জ্জনী সংযুক্ত আছে, তাহার ঘর্ষণে প্রথমতঃ রাস্তার ধুলি, আবর্জ্জনা প্রভৃতি আলগা হইয়া যায় এবং পরক্ষণেই তাহারা যন্ত্রস্থ একটি বৃহৎ কক্ষে আকৃষ্ট হইয়া প্রবেশ করে। এই কলের ব্যবহারে ধুলি উড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই।

ফ্রান্সের হেলিকপটার বিমান

এই নব-উদ্ভাবিত বিমান ভূপৃষ্ঠ হইতে বহু উর্দ্ধে গমন করে না। ইহার সাহায্যে অনায়াসে ভূপৃষ্ঠ হইতে ১০।১৫ ফুট উর্দ্ধে ভ্রমণ করা যায়। অন্য প্রকার বিমানে এরূপ ভ্রমণ সম্ভব নহে।
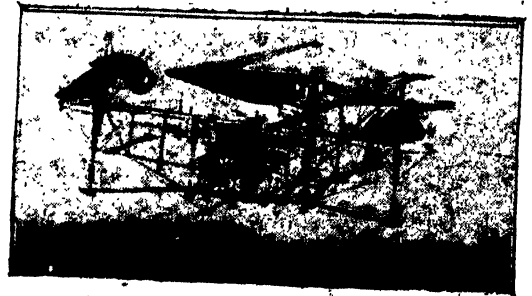
ফ্রান্সের হেলিকপটার বিমান।

হস্তচালিত নূতন মুদ্রাযন্ত্র

মোটা কাগজের উপর সহজে নানাবর্ণের মুদ্রাঙ্কন।

মোটা কাগজের উপর রঙীন অক্ষরের মুদ্রাঙ্কন ব্যয়সাধ্য কার্য্য; কিন্তু উপরের ঐ চিত্র প্রকাশিত ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহারে ইহা অতি অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যাহা ছাপিতে হইবে, তাহা স্থির করিয়া অক্ষরগুলি বাছিয়া ঐ কলে বসাইয়া দিতে হইবে। পরে যে মোটা কাগজে ছাপা হইবে, তাহার উপরে যে বর্ণের অক্ষর আবশ্যক, সেই বর্ণের একখানি কাগজ রাখিয়া কলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরাইয়া হাত দিয়া চাপ দিয়া টানিয়া লইলেই চমৎকার (Emboss) এমবস্ করা ছাপা বাহির হইবে।

একাধারে ভূচর ও জলচর

সাধারণ মোটর যানের গতি জলে ব্যাহত হয় এবং মোটর বোটও স্থলে চলে না। এই জন্য উভয় প্রকার কলের

ইহা স্থলে মোটর গাড়ী, জলে মোটরপোত।

সমাবেশে এই উভচর মোটর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ওজন প্রায় ৮০০ পাউণ্ড এবং ইহাতে চালক ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির বসিবার স্থান আছে। পরিষ্কার রাস্তায় এই মোটরগুলি ঘণ্টায় ১৬ মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে; যেগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, তাহারা ঘণ্টায় ২০ মাইল পর্য্যন্ত যায়। চিত্রে মোটরখানি দীর্ঘ ধূলিমাখা পথ অতিক্রম করিয়া ধূলিধূসরিতদেহে জলযানের আকার ধারণ করিয়া ছুটিতেছে। এই সকল মোটরযানের উল্‌টাইবার সম্ভাবনা নাই।

ষোলতল অট্টালিকা

ষোলতল অট্টালিকা।

কোন্ দেশ কত উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে, বর্ত্তমান যুগে যেন তাহার এক প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। এ বিষয়ে এত দিন আমেরিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল; কিন্তু সম্প্রতি সুইডেনের ষ্টকহলম্ নগরে এক ষোলতল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড বাড়ীর ছাতের উপর আবার একটা রেস্তোরাও স্থাপিত হইয়াছে। এত উচ্চ অট্টালিকা পৃথিবীর কুত্রাপি আর নাই। এই বাড়ীটি সরকারী কার্য্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে।

তারহীন বার্ত্তাবহের সংক্ষিপ্তসার

জার্ম্মাণ-পুলিস প্রহরীর পৃষ্ঠে ও বক্ষে ক্ষুদ্রায়তন বেতারের কল বসান হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর কোন কোন প্রদেশে বিশিষ্ট পুলিস-কর্ম্মচারিগণকে এক একটি তারহীন বার্ত্তাবহের কল লইয়া প্রহরীর কার্য্য করিতে হয়। জার্ম্মাণীর কোন স্থানে হঠাৎ কোনও প্রকার অশান্তি উপদ্রবের সূচনা উপস্থিত হইলে পুলিসের প্রধান কেন্দ্র হইতে বেতারের সাহায্যে এই প্রকার যন্ত্রধারী পুলিস-কর্ম্মচারিগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অবিলম্বে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে তৎপর হন। কলের যে অংশ পুলিস-কর্ম্মচারীর পশ্চাদ্ভাগে থাকে, সেটি বৈদ্যুতিক তারের জাল মাত্র। সম্মুখের অংশটি একটি তড়িৎপূর্ণ বাক্স। টেলিফোনের শব্দগ্রাহী বাক্সের ন্যায় একটি বাক্স প্রহরীর বাম কর্ণের নিকট ঝুলিতেছে।

চুরী ব্যর্থ করিবার অভিনব কৌশল

পাশ্চাত্যদেশে অনেক স্থানে দুগ্ধওয়ালা প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারদিগকে অতি প্রত্যূষে প্রত্যহ দুগ্ধাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। অনেক সময় এমন হয় যে, ক্রেতা উঠিবার অগ্রেই ফেরীওয়ালা তাহার বাড়ীতে জিনিষ রাখিয়া যায়। তাহাতে অপরের চুরী করিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এজন্য মার্কিণ দেশে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিক্রেতা দুগ্ধের বোতল অথবা আধারপূর্ণ অন্য দ্রব্য এক প্রকার বন্ধনীর (Clip) সাহায্যে ক্রেতার বাটীর বহির্দ্বারে আটকাইয়া রাখিয়া যায়। উহার এমনই নির্ম্মাণকৌশল যে, বাড়ীর দ্বার না খুলিলে কোনও মতে সেই আধারপূর্ণ দ্রব্য কেহ লইতে পারে না। দ্বার মুক্ত হইবামাত্র উক্ত বন্ধনীর বেষ্টন শ্লথ হইয়া পড়ে। তখন পাত্রটি খুলিয়া লওয়া যায়। একবার এই বন্ধনীর মধ্যে পাত্রটি রাখিতে পারিলে আধারস্থ দ্রব্য পড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোনও জিনিষ এই উপায়ে বাহিরে রাখিলে তাহা চুরী যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

দুগ্ধপূর্ণ বোতল বন্ধনীর সাহায্যে দ্বারে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

বেতার চালিত জার্ম্মাণ ঘড়ী

সমগ্র জার্ম্মাণীতে যেখানে যত ঘড়ী আছে, যাহাতে সেগুলি একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে নির্ভুল সময় প্রাপ্ত হয়, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে সেই প্রকারের পরীক্ষা চলিতেছে। এই উপলক্ষে রাজধানী বার্লিনের নিকটে এবং বার্লিন হইতে বহু দূরে একটি পর্ব্বতশিখরে এই দুই স্থানে দুইটি তারহীনের কল বসান হইয়াছে। এই কল হইতে দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার তারহীনের সাহায্যে জার্ম্মাণীর সর্ব্বত্র নির্ভুল সময় প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতে সরকারী আফিসসমূহ, রেল-ষ্টেশন, শিল্পাগার সর্ব্বত্রই কর্ত্তৃপক্ষ সহজে শুদ্ধ সময় জানিতে

পারিয়া থাকেন। এমন কি, যে সকল জাহাজ জার্ম্মাণ বন্দরে অবস্থিতি করিতেছে এবং জার্ম্মাণী অভিমুখে আসিতেছে, তাহাতেও ঐ বিশুদ্ধ সময় প্রেরিত হয়। নাগরিকগণও এই সুযোগে স্ব স্ব ঘড়ী সংশোধন করিয়া লয়েন। এই ভাবে সর্ব্বত্র "সময়" পাঠাইতে প্রতি দিন ৭ মিনিট ব্যয় হয়। দিবাভাগে ১টা ও রাত্রিতে ১টা দুইবার "সময়" প্রেরিত হয়। ঐ সময় কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে জার্ম্মাণীর অন্যান্য বেতার কারখানার কার্য্য বন্ধ থাকে।

বেতার চালিত জার্ম্মাণ ঘড়ী।

পুকুরে জমান স্বাভাবিক বরফ

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উভয় প্রকার বরফই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর প্রায় ২৪০০০০০০ টন স্বাভাবিক বরফ হ্রদ, তড়াগ বা সরোবরাদি হইতে কলের করাতের দ্বারা কাটিয়া দেশের নানা স্থানে চালান

কলের করাতে বরফ কাটা হইতেছে ও রেলে চালান যাইতেছে।

হয়। জলাশয় হইতে কাটিয়া তুলিবার সময় এক একটি টুকরা প্রায় ১০০ ফুট দীর্ঘ থাকে। তাহার পর সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাংশে বিভক্ত করিয়া চালান দেওয়া হয়।

জলাশয়ের উপরিস্থ বরফের কঠিন স্তরের উপরিভাগে তুষারপাত হইয়াছে। এই তুষাররাশি অপসারিত করিয়া মোটর কিংবা অশ্ব দ্বারা চালিত করাতের সাহায্যে ঐ কঠিন বরফ কাটা হইতেছে।

আধুনিক কলের ইঞ্জিনের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

রেল ইঞ্জিনের নির্ম্মাণ-প্রণালীর ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। ৪ প্রকার উন্নততর প্রণালীতে নির্ম্মিত ইঞ্জিনের চিত্র

৪০৭৩ সংখ্যাযুক্ত ইঞ্জিন।
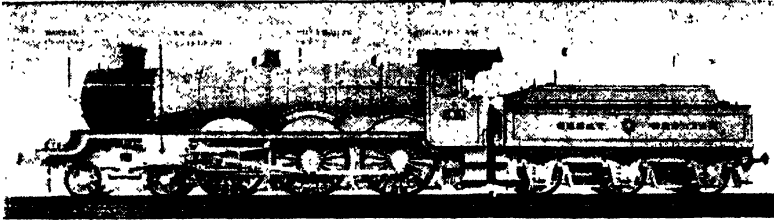
প্রদত্ত হইল। ৪০৭৩ সংখ্যাযুক্ত ইঞ্জিন যাত্রিগাড়ী বহন করিয়া থাকে। এইশক্তিশালী ইঞ্জিন গ্রেট বৃটেনে নির্ম্মিত হইয়াছে, বিলাতে এই শ্রেণীর ১০খানা ইঞ্জিন আছে, তন্মধ্যে এইখানি প্রথম। মিঃ সি, বি, কলেট্ উহার নির্ম্মাতা। সুইনডনের কারখানায় উহা নির্ম্মিত হয়। এই ইঞ্জিনের প্রধান লক্ষণ—উহার দীর্ঘাকার সিলিনডার (Cylinder) নূতন ধরণের বয়লার, চালকের ব্যবহৃত স্থানের প্রসারতা এবং বসিবার আসনের বৈচিত্র্য। যে স্থান দিয়া ধুম নির্গত হয়, তাহার উপরিভাগ তাম্রনির্ম্মিত। এই ইঞ্জিনের মোট ওজন ৩ হাজার ২ শত ১৩ মণেরও অধিক, দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট।

১৪৭৯ সংখ্যাযুক্ত ইঞ্জিন।

১৪৭৯ নম্বরের আর এক শ্রেণীর ইঞ্জিন নির্ম্মিত হইয়াছে,উহা "গ্রেট নর্দায়ণ" রেলপথে যাত্রিগাড়ীতে ব্যবহৃত হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ডংকাষ্টারে উহা উক্ত রেল কোম্পানীর দ্বারা নির্ম্মিত হয়। যুগ্ম চাকা এই ইঞ্জিনের বৈশিষ্ট্য। চাকাগুলির ব্যাস ৬·ফুট ৮ ইঞ্চ। যেখানে আগুন জ্বলে, সেই আধারে দৈর্ঘ্যে ৯ ফুট সাড়ে ৫ ইঞ্চ, প্রস্থে ৭ ফুট ৯ ইঞ্চ। এই ইঞ্জিনের সমগ্র ওজন ২ হাজার ৫ শত মণ।

সুইজরলণ্ড ও জর্ম্মণীর রেল বিভাগে এক শ্রেণীর ইঞ্জিন গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু নাই, তবে সুইজরলণ্ডের রেলকর্ত্তৃপক্ষ শাখা লাইনগুলিতে তাড়িত গাড়ীর প্রচলন করিবার জন্য যে কল্পনা করিয়াছিলেন, এই ইঞ্জিনের আবিষ্কারে সে কল্পনা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন। বৈজ্ঞানিকগণ এই ইঞ্জিনের সংলগ্ন ধুম-নির্গমন-প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।
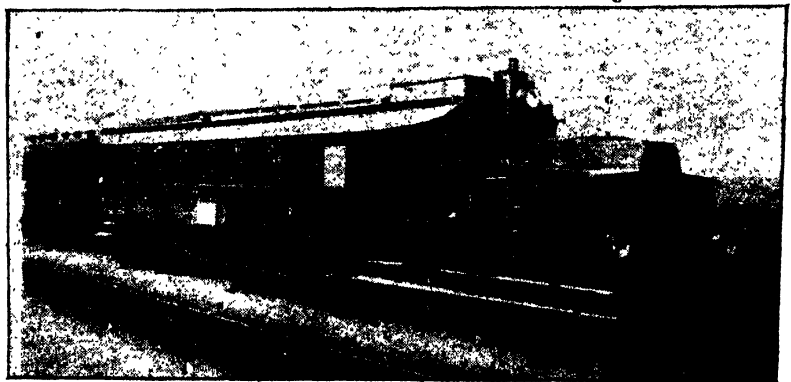
আধুনিক নূতন ইঞ্জিন।

লণ্ডন মিড্‌লাণ্ড ও স্কটিশ রেল বিভাগে এক প্রকার ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার নাম এল্ এম্ এস
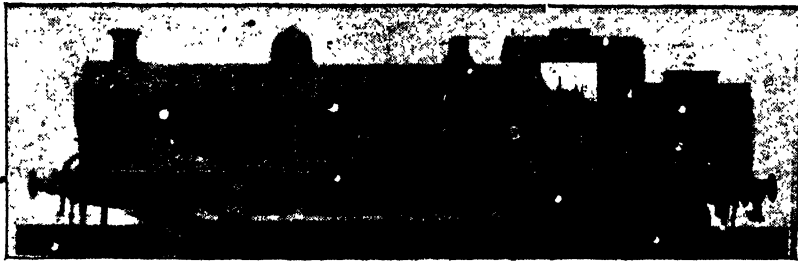
এল্‌. এম্‌. এস্‌, ইঞ্জিন।

ইঞ্জিন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ক্রুতে সর্ব্বপ্রথম উহা নির্ম্মিত হয়। এখন এই শ্রেণীর ৩০খানা ইঞ্জিন উক্ত রেল কোম্পানী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৯খানা এবার-গারেনি জিলায় কায করিতেছে। পূর্ব্বে ৩০খানা ইঞ্জিনে যে কায হইত, এই ১৯খানার দ্বারা সেই পরিমাণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

—

অদাহ্য কাগজ

কাগজ দাহ্য পদার্থ; কিন্তু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রভাবে জনৈক মার্কিণ বৈজ্ঞানিক একপ্রকার অদাহ্য কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে হস্তলিপি বা মুদ্রাঙ্কন কার্য্য সবই চলে; এই প্রকারের কাগজে বহুমূল্য দলিলাদি লিখিবার প্রস্তাব হইতেছে। অগ্নিদগ্ধ হইলে কাগজের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু কাগজ নষ্ট হয় না ও লিখিত অংশ পূর্ব্ববৎ স্পষ্ট থাকে।

বৈদ্যুতিক সিগারেট বাক্স

সংপ্রতি মার্কিণ মুলুকে এই অদ্ভুত সিগারেট বাক্স বাহির হইয়াছে। মোটরগাড়ী চালাইবার সময় সিগারেট খাইবার ইচ্ছা হইলে হয় গাড়ীর দম কমাইতে হয়, না হয়, সিগারেটের মায়ায় অন্যমনস্ক হইয়া দুর্ঘটনা ঘটাইতে বাধ্য হইতে হয়। এই দুই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই এই বৈদ্যুতিক সিগারেট বাক্স তৈয়ার হইয়াছে। মোটর চালকের সম্মুখে মোটর চালাইবার বিভিন্ন কল-কব্জা যে কাষ্ঠ-ফলকটির উপরে থাকে, সেইখানেই এই বাক্স বসান থাকে। প্রথমতঃ একটি স্প্রিং টিপিয়া বাক্সের ভিতর হইতে সিগারেটটি বাহিরের দিকে আনা হয়। সিগারেট সেখানে আসিলে দুই পাশে দুইটি ছোট কলের প্রভাবে আপনিই ধরিয়া যায়। একটি কলে বিদ্যুতের সাহায্যে আগুন ধরান হয়; অপরটি দমকলের মত হাওয়া টানিয়া সিগারেট ভাল করিয়া ধরাইবার পক্ষে সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, মোটরের বৈদ্যুতিক ব্যাটারী ও ইঞ্জিনের সাহায্যেই এই বৈদ্যুতিক বাক্সের কল-কব্জা চলিয়া থাকে। মোটরচালক মোটর চালাইতে চালাইতে কেবল ঐ একটি স্প্রিং ও একটি হাতাল টানিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বেশ ভাল করিয়া ধরান সিগারেটটি সে তখন নিজ ইচ্ছা ও অবসরমত টানিয়া লইয়া উপভোগ করিতে পারিবে।
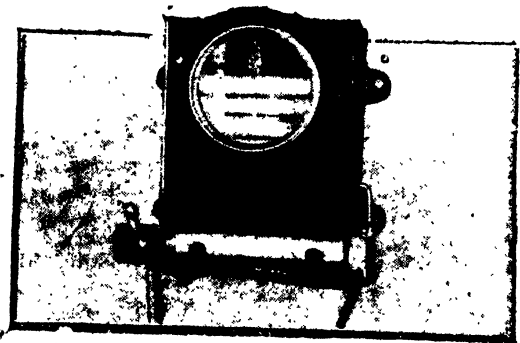
মোটরগাড়ীতে ব্যবহার করা হয়; সিগারেট আপনি ধরিয়া বাহিরে আইসে।

অশ্বের ইতিবৃত্ত

অশ্বজাতীয় প্রাণীদিগের কথা বলা হইয়াছে। এখন পৃথিবীর নানা দেশের অশ্বের কথা বলিব। স্থানভেদে, ভূমির প্রকৃতি-ভেদে ও অন্যান্য নানা কারণে যেমন মানুষের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়—অশ্বেরও সেইরূপ। ইহার উপরে আবার শিক্ষার তারতম্য বা দুই তিন জাতীয় অশ্বের সংমিশ্রণে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অশ্বের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটে। আবার কার্য্যবিভিন্নতাবশতঃ একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অশ্ব দেখা যায়। আকারে কেহ বা বড় হয়, কেহ বা ক্ষুদ্র। অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও ঐরূপ তারতম্য দেখা যায়। কোন কোন অশ্ব লঘুকায় হয়, আবার কোন কোন জাতির দেহ স্থূলাকার হয়। কাহারও গলা দীর্ঘ হয়, কাহারও খর্ব্ব হয়। বর্ণের প্রভেদ ত থাকেই। স্বাভাবিক বর্ণ ছাড়া অশ্বপোষকরা নূতন নূতন বর্ণের অশ্ব জন্মাইয়া লইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এ বিষয়ে চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। মানুষ চেষ্টার ফলে এ বিষয়ে অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছে।

ভূমণ্ডলের প্রধান প্রধান দেশে এইরূপ বহুজাতীয় অশ্বের সংমিশ্রণে নূতন নূতন অশ্বের উদ্ভব হইতেছে। মানুষও যেমন এক দেশ হইতে অন্য দেশে বসতি করিতেছে ও তত্রত্য জাতির সহিত মিলিত হইতেছে, অশ্বাদি পশুও সেইরূপ এক দেশ হইতে অপর দেশে নীত হইতেছে এবং নানা উপায়ে ও নূতন নূতন সংমিশ্রণে নূতন নূতন ও বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী অশ্বের উদ্ভব হইতেছে।

মৌলিকতার হিসাবে স্বতন্ত্র অশ্বজাতির কথা আগে বলিয়া পরে নূতন মিশ্রিত অশ্বজাতির কথা বলা হইবে।

ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্ব বা পোনি

ক্ষুদ্রাকৃতি অশ্ব বা পোনি জাতির বৈশিষ্ট্য আছে। উৎকৃষ্ট পোনি শেটল্যাণ্ড, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড ও ওয়েলসে জন্মে।

শেটল্যাণ্ড পোনি শ্রেষ্ঠজাতীয়। আকারে ইহারা বেশী বড় হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহারা দ্রুতগামী, কষ্টসহ ও বিশেষ পরিশ্রমী। এত ক্ষুদ্র আকারে এত কর্ম্মক্ষমতা আর কোন জাতীয় অশ্বের নাই বলিলেও হয়। ইহাদিগকে লোক চাষের কার্য্যেও লাগায়, আর প্রয়োজন হইলে ইহাদের পৃষ্ঠেও চড়ে। ইহার মালবহনের ক্ষমতা অসাধারণ। ছোট ছোট শেটল্যাণ্ড পোনি দুর্গম পার্ব্বত্যপথে ১৪।১৫ মণ মাল টানিয়া প্রায় প্রত্যহ ৩০।৩৫ মাইল লইয়া যায়।

শেটল্যাণ্ডে এই অশ্ব অতি প্রয়োজনীয় জন্তু। ইহারা সহজেই পোষ মানে ও বড় শান্ত হয়। ইহাদের বুদ্ধিও খুব বেশী। ছোট ছোট ছেলেরা ইহাদের সহিত খেলা করে ও নির্ভয়ে ইহাদের পিঠে চড়ে। সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সেই ঐ দেশের ছেলেরা ঘোড়ায় চড়িতে শিখে। অশ্বও অত্যল্পকালমধ্যে নিজ প্রভুকে চিনিয়া লয়।

আজকাল নানা দেশে এই শেটল্যাণ্ড পোনির বিশেষ আদর হইয়াছে। ইংলণ্ডে, স্কটল্যাণ্ডে, আমেরিকায় সর্ব্বত্রই এই পোনি নীত হইয়াছে। এ দেশেও দুই চারিটি যে না আসিয়াছে, তাহা নহে। এখন চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে আহারের উৎকর্ষে ও প্রাচুর্য্যে এই শেটল্যাণ্ড পোনির আকার বড় করিতে পারা যায়। অবশ্য উহা কালে সম্পাদিত হইবে, আশা করা যায়।

নরওয়ের পোনি বা ডুন ক্ষুদ্রাকৃতি। ইহারা তার্পানের বংশধর বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও শেটল্যাণ্ড পোনি অপেক্ষা বৃহদাকার—গোলগাল, দেখিতেও মন্দ নহে। বর্ণ প্রায়শঃই ধূসর বা ধূসর-কাল। ইহাদের পরিশ্রমের ও গাড়ী টানিবার ক্ষমতা বিশেষ আছে। অনেক নরওয়ে পোনি এক সময়ে ইংলণ্ডে নীত হইয়াছিল ও উহাদের সংমিশ্রণে একটি নূতন জাতীয় অশ্ব জন্মিয়াছিল।

শেটল্যাণ্ড ও নরওয়ের ন্যায় আইসল্যাণ্ড দ্বীপেও দুই তিন জাতীয় পোনি আছে। কেহ কেহ বলেন যে, উহারা নরওয়ে পোনির বংশধর। আবার অন্যের মতে উহা আয়র্লণ্ডের পোনির বংশোদ্ভব। যাহা হউক, এই দ্বীপের কেল্‌টিক পোনিও উৎকৃষ্ট জন্তু। উহারা বিশেষ কষ্টসহ ও চতুর। লোক উহাদের পৃষ্ঠে চড়ে—উহারা মালও টানে। উহাদের গায়ের লোম দীর্ঘ হয়; বিশেষতঃ শীতকালে। লেজটিও লোমশ এবং লোমগুলি খুব দীর্ঘ হয়। এই লেজের

দ্বারা ইহারা নিজেদের শরীর রক্ষা করে। ঝড় বা তুষার-পাতের সময় ইহারা লেজটি ছড়াইয়া গোলাকার করিয়া তুষারের দিকে রাখে। উহাতে গাত্রের যে সকল অংশ স্বাভাবিকভাবে সুরক্ষিত নহে—উহাতে তুষার পড়ে না বা শৈত্যবশতঃ সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা লাগে না। আইসল্যাণ্ডের লোকের এই অশ্ব ব্যতীত চলে না। সে দেশের লোকের খাদ্যসামগ্রী আনয়ন, মাছ ধরিয়া সমুদ্র হইতে গৃহে আনয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্যেই এই অশ্বের প্রয়োজন। ইহারা বিলক্ষণ চতুর। ঝড়বৃষ্টির সময় কোন লোক সঙ্গে না থাকিলেও কেবল একটি কুকুরের সঙ্গে এক দল পোনি জলা ও পাহাড় অতিক্রম করিয়া বহুদূরে মাল লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়। সামান্য খাদ্যেই ইহারা পরিতৃপ্ত হয়। গ্রীষ্মের সময় মাঠে চরে, ঘাস-খড় প্রভৃতি খায়, তাহার অভাব হইলে শুঁটকি মাছ ও কিছু খড়ভূষি পাইলেই ইহারা সন্তুষ্ট।

গ্রেট বৃটেনেও ঐরূপ নানা প্রাকারের ক্ষুদ্র অশ্ব পাওয়া যায়। উত্তর-বৃটেনে কাম্বারল্যাণ্ড বা ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড, আয়র্লণ্ডের নানা স্থানে ভিন্ন শ্রেণীর পোনি দেখা যায়। এইগুলির মধ্যে ওয়েল্‌সের পোনি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতেই উহারা ওয়েল্‌সের পার্ব্বত্য প্রান্তরে চরিয়া আসিতেছে। ইহারা পাহাড়ে উঠিতে, জলায় চলিতে ও দুর্গম পথে যাইতে পারে। ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতাও অসীম। কথায় কথায় লোক ইহাদের উদাহরণ দিয়া থাকে। দেখিতে ইহারা গাড়ীটানা ঘোড়ার মত—তবে আকারে কিছু ছোট। মাথাটি নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব। ঘাড় মাংসল, পাগুলি মাংসল ও সুন্দর। ইহারা খুব দৌড়াইতেও পারে। বড় জাতীয় অশ্বের সহিত ইহাদের মিশ্রণের চেষ্টা হইয়াছিল, বিশেষ কোন ফল হয় নাই। দুই চারিটি আকারে বিশেষ বড় হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণতঃ ঐরূপ সংমিশ্রণের ফল বিশেষ আশাপ্রদ নহে।

প্রাচ্যভূখণ্ডেও নানা জাতীয় পোনি দেখা যায়। কোরিয়া ও জাপানের পোনি কষ্টসহ বটে, কিন্তু দ্রুতগামী নহে। বর্ম্মার টাট্টু ঘোড়া বিশেষ বিখ্যাত। দেখিতে ক্ষুদ্রাকৃতি হইলেও উহারা বিশেষ দ্রুতগামী ও বিশেষ কষ্টসহ। ইহাদের শীতগ্রীষ্মাদি সহনের ক্ষমতাও অসাধারণ। তবে উহাদিগকে বিশেষ যত্নে না রাখিলে এ দেশে উহারা ক্রমে খারাপ হইয়া আইসে।

আরবদেশের অশ্ব

নানাজাতীয় অশ্বের মধ্যে আরবদেশীয় অশ্ব বিশেষ বিখ্যাত। প্রাচীন যুগ হইতেই এই আরব অশ্ব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতেছে। আজিও উহাদের মর্য্যাদা কমে নাই।

আরবদেশেই এই অশ্বের প্রাচীন জন্মস্থান কি না, তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা তার্পান, ওনেগার বা জেব্রার বংশধর। আবার অনেকে বলেন যে, উত্তর-আফ্রিকাই এই অশ্বের প্রকৃত উৎপত্তিস্থান। তথা হইতে আরবদেশে লইয়া গিয়া ইহার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই থাকুক না কেন, আরবদেশীয় অশ্বের দেহগঠনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। শরীরের অনেক অস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থির বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। মাথাটি অন্যান্য জাতীয় অশ্ব হইতে ভিন্নাকৃতির। উহার উপরাংশ বড়, ক্রমে ছোট হইয়া আসিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় পাতলা। নাসারন্ধ্র দীর্ঘ। চক্ষুর্দ্বয় অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত। হনুর হাড়ও অনেকটা তফাতে অবস্থিত। কান দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট আর খাড়া হইয়া থাকে। ইহাদের ঘাড়টি লম্বা ও মাংসপেশীবহুল; পিঠও বড় ও মজবুত; কিন্তু দেহের পশ্চাদ্‌ভাগের অংশ অপেক্ষাকৃত ছোট। সম্মুখের পায়ের তলার অংশ বিশেষ মজবুত। পশ্চাতের পাও বেশ মাংসল ও সবল। ইহাদের ঘাড়ে ও লেজে বড় বড় চুল জন্মে। বর্ণ সাধারণতঃ ধূসর, কাল বা পাঁশুটে। শ্বেতবর্ণের আরব অশ্ব দুষ্প্রাপ্য, পাইলে উহার মূল্যও অনেক হয়। আরবদিগের ধারণা এই যে, বাদামে বা chertnut বর্ণের ঘোড়া সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হয়। গাঢ়বর্ণের ঘোড়া কষ্টসহ হয়। আর উহার উপর যে ঘোড়ার কপালে সাদা থাকে, তাহা সুলক্ষণাক্রান্ত ও ভাগ্যদায়ক হয়।

আরবদেশীয় অশ্ব অন্যান্য নানাজাতীয় বিলাতী ঘোড়া অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু তাহা হইলেও দ্রুতগামী হিসাবে ইহাদের সমকক্ষ বড় কমই পাওয়া যায়। আরবদের বিবেচনায় যে ঘোড়া একলাফে ১০ ফুট অতিক্রম করে, উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। মধ্যশ্রেণীর অশ্ব এক লাফে ১৫ ফুট পার হয়। আর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অশ্ব ১৫ ফুটের অধিক যায়।

কষ্টসহিষ্ণুতা ও দ্রুতগামিত্ব লইয়াই আরবদের নিকট অশ্বের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। আরবদেশীয় অশ্ব অসাধারণ প্রভুভক্ত, ইহা অবশ্য অনেক পাঠকের নিকটেই অজ্ঞাত নহে। শত্রুর হস্ত হইতে প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য অতি দ্রুতবেগে ধাবন করিয়া ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। আর নিজ প্রভুকে ইহারা খুব চিনে। কোন আরব-দস্যুর অশ্ব তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রভুকে দাঁতে ধরিয়া শিকল কামড়াইয়া লইয়া পলাইয়া রক্ষা করে, এ গল্পও বোধ হয় অনেকে জানেন।

আরবরা এই সকল কারণে অশ্বকে বড় যত্ন করে। তাহারা নিজে অশ্বের সেবা করে। নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে রাজী হয়, তবু নিজের অশ্ব ছাড়ে না। তাহাদের চক্ষুতে অশ্বের স্থান স্ত্রীপুত্রাদিরও উপরে। জগতে সবই ছাড়িতে পারে, তবু অশ্বকে তাহারা হস্তান্তর করিতে চাহে না। পাঠকরা বোধ-হয়, ইংরাজীতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কবিতা পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, কোন লেখক আবদ্ এল্ কাদের নামক আরব-দলপতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আবদ্ এল্ কাদেরের মতে—"যদি কেহ সুলক্ষণাক্রান্ত সদ্বংশ-জাত অশ্ব পায়, তবে উহার উচিত, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া। উহা বড় সৌভাগ্যের কথা।"

মধ্যযুগে এই আরবদেশীয় অশ্ব য়ুরোপে বিশেষ সমাদৃত হইত। ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগুলির অনেকেই আরব অশ্বের বংশে উৎপন্ন।

আরবদিগের নিকট হইতেই মধ্যযুগের য়ুরোপের লোকরা অশ্বের সমাদর করিতে শিখেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে যখন বিজয়ী আরব সৈনিকরা মহম্মদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে সমগ্র মিশর ও উত্তর-আফ্রিকা জয় করে। উত্তর-আফ্রিকা জয়ের পর সমগ্র স্পেন্ ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ আরবদিগের অধিকারে আইসে। ঐ সময়েই ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক জাতির প্রভুত্ব ছিল। তাহারা টুর্সের যুদ্ধে মুসলমানবাহিনী ধ্বংস করে। যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সমগ্র আরববাহিনীর অশ্বগুলি ফ্রাঙ্কদিগের হস্তে পড়ে। এইগুলি সমগ্র ফ্রান্সের প্রধান প্রধান স্থানে নীত হয়। অনেকের ধারণা, কালক্রমে এইগুলি হইতেই ফ্রান্সের ও ক্রমে সমগ্র দক্ষিণ মধ্য য়ুরোপের অশ্বগুলির উৎপত্তি হয়।

ফ্রান্সের পেঁসের জাতীয় অশ্ব

এই অশ্ব হইতেই ফ্রান্সে অপেক্ষাকৃত উত্তম অশ্বের জন্ম হয়। কালে যখন Chivalry বা অশ্বারোহী অভিজাতবর্গের অভ্যুদয় হয়, তখন আবার নানা উপায়ে উত্তম খাদ্য, উত্তম শিক্ষা ও নানা জাতীয় অশ্বের সংমিশ্রণে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও বলশালী অশ্বের উৎপাদনের চেষ্টা হয়। সে যুগে বর্ম্মাবৃত যোদ্ধার ভার বহনের জন্যই এইরূপ বলশালী অশ্ব ব্যতিরেকে কার্য্য চলিত না। ক্রমে আবার যখন ফরাসী বা জার্ম্মাণ বা ইংরাজজাতীয় যোদ্ধ্ বর্গ প্রাচ্যদেশে crusade বা ধর্ম্ম-যুদ্ধার্থ যাইতেন, তখন সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন হইতে প্রাচ্যের অশ্ব য়ুরোপে আমদানী হইত। এই সকলের সংমিশ্রণেই অপেক্ষাকৃত উত্তম অশ্বের জন্ম হয়। ফ্রান্সের পেঁসে (Prche) প্রদেশের সুবিখ্যাত অশ্ব ইহারই অন্যতম। ইহা আকারে বৃহত্তম নহে। ইংলণ্ড ও বেল্‌জিয়মের বহু অশ্বই ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর, তথাপি কার্য্যপটুতায় ও সৌন্দর্য্যে ইহা বড়ই আদৃত। ইহাদের বর্ণ প্রায়শঃই কৃষ্ণবর্ণ বা ধূসর। তবে অন্যান্য বর্ণেরও দুই চারিটি দেখা যায়।

পেঁসের অশ্ব অনেক দেশেই, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে বিশেষ সমাদৃত। বহু অশ্বই ঐ দেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং আমেরিকার নানা স্থানেই উহার উৎকর্ষ ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমেরিকায় এ জাতীয় অশ্বের সংখ্যা অনেক। যুদ্ধের সময় ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আমেরিকা হইতে এই জাতীয় অনেক অশ্ব কিনিয়া আনেন।

ইংলণ্ডের অশ্ব

ইংলণ্ডের স্থানীয় পোনিজাতীয় অশ্ব ভিন্ন নানাপ্রকারের উচ্চশ্রেণীর অশ্ব আছে। তন্মধ্যে Hackney বা গাড়ীটানা ঘোড়া, Thoroughbred বা দৌড়ের ঘোড়া ও অন্যান্য দুই এক প্রকারের অশ্বই প্রধান।

এই হ্যাক্‌নি বা গাড়ীটানা ভারবাহী অশ্ব আরবদেশীয় অশ্বের বংশে উৎপন্ন। দুই শত বৎসরের শিক্ষা ও ক্রমোন্নতির ফলে উহা এখন ঐ কার্য্যের উপযোগী অশ্বের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতেছে। অশ্বতত্ত্ববিদরা বলেন যে, মহারাণী এ্যানের সময় ডার্লি নামক একটি আরবদেশীয় অশ্ব ইংলণ্ডে

নীত হয়। উহার সহিত একটি দেশীয় অশ্বিনীর সম্মিলনেই উহার কয়েকটি সন্তান জন্মে। ক্রমে ঐ বংশ বিস্তৃতি লাভ করে। ইংলণ্ডের নানা স্থানেই আজ এই জাতীয় অশ্ব বিদ্যমান। নরফোক প্রদেশের অশ্ব আবার সুবিখ্যাত। আকারে, বলে ও কার্য্যক্ষমতায় ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মূল্যও অনেক। আমেরিকা ও পৃথিবীর নানা স্থানেই এই অশ্ব নীত হইয়াছে।

ইহা ভিন্ন সাফোকের গাড়ীটানা ঘোঁড়াও বিশেষ বিখ্যাত। অনেকে অনুমান করেন যে, এই জাতীয় অশ্বের পূর্ব্বপুরুষ ফ্রান্সের নর্ম্মানদিগের সহিত ইংলণ্ডে আনীত হয়। এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। যাহা হউক, এ জাতীয় অশ্ব অতি উৎকৃষ্ট ও ইহার মূল্যও অধিক।

সাফোকের নীচেই ক্লাইভস্‌ডেল অশ্ব উল্লেখযোগ্য। অনেকের ধারণা যে, এই অশ্ব ফ্লেমিশ দেশীয় বৃহদাকার অশ্ব ও দেশীয় অশ্বের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা আকারে ছোট হইলেও দ্রুতগামী ও ইহাদের চালচলন বড় সুন্দর। এ জাতীয় অশ্বও বিশেষ সমাদৃত এবং আমেরিকা ও অন্য নানা স্থানে নীত হইয়াছে।

অতঃপর সায়ার জাতীয় বৃহদাকার অশ্ব উল্লেখযোগ্য। ইহারা খুব উচ্চ ও আকারে বৃহৎ হয়, কার্য্যক্ষমও হয়।

অতঃপর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার কথা—থরোব্রেড বা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও উহার সমাদর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই জাতীয় অশ্বগুলি মূলে আরব-দেশীয় অশ্বের সন্তানসন্ততি। রাজা দ্বিতীয় চার্লসএর (Charles II) সময় হইতে আরব ও উত্তর-আফ্রিকার অশ্ব ও অশ্বিনী ইংলণ্ডে আনীত হয়। ইহাদের আকার ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে শিক্ষার ফলেও অনেক উৎকর্ষ হইয়াছে। ইহাদের মূল্যের কথা শুনিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। দামের সময় বংশমর্য্যাদার হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি হয়।

২০।২৫ হাজার হইতে ৩।৪ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত এক একটির দাম হইয়া থাকে। অবশ্য বাজী জিতিয়া ইহারা অনেক টাকা উপার্জ্জনও করিয়া থাকে। সখের জন্য মানুষ যে কি না করে, তাহা বলা যায় না। ইহাদের আহারাদির ব্যবস্থাও বিশেষ যত্নের সহিত করা হইয়া থাকে। দেশে দেশে আবার ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া বিশেষ প্রতিযোগিতা চলে। পাঠকদিগের কাছে জেভ (Zev) প্যাপিরাস (Papyrus), এপিনার্ড (Epinard) গালাহাড (Galahad) প্রভৃতি অশ্বের নাম অবিদিত নাই।

জার্ম্মাণীর অশ্ব

জার্ম্মাণীতেও অশ্বের বিশেষ সমাদর ও যত্ন হয়। জার্ম্মাণীতে মধ্যযুগ হইতে বৃহদাকার গাড়ীটানা বা মানুষবহা ঘোড়ার উৎপাদনের চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। ওলডেনবর্গ (Oldenburg) ও পূর্ব্ব-ফ্রিজল্যাণ্ড (East Freaseland) এর বৃহদাকার অশ্ব বিশেষ বিখ্যাত।

বেলজিয়ম দেশেরও বেলজিয়ম নামক অশ্ব আকারে বেশ বৃহৎ; এমন কি, বৃহত্তম বলিলেও চলে। ইহা ভিন্ন আর্দ্দেনেশ ও প্রাবাসঁ জাতীয় অশ্ব ক্ষুদ্রাকৃতি।

অতঃপর ভারতের অশ্বের কথা বলিয়া উপসংহার করিব। ভারতে অশ্বের সমাদর প্রাচীন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঘোড়দৌড় প্রাচীন যুগের একটি প্রধান আমোদ ছিল। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অশ্বারোহীর ব্যবহারও প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। তবে ভারতের প্রধান প্রধান অশ্বগুলি অধিকাংশই পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম ভারতের। পূর্ব্ব-ভারতে বা বঙ্গদেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব জন্মে না এবং আমদানী করিলেই জলবায়ুর দোষে উহাদের বংশ খর্ব্বাপ হইয়া যায়। এ ব্যাপার বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অবশ্য টাঙ্গন ঘোড়া বা দেশী ঘোড়া যে নাই, তাহা নহে। তবে তাহারা শীর্ণকায়, খর্ব্বাকৃতি ও দেখিতে আদৌ সুশ্রী নহে।

অতি প্রাচীনযুগেও এই অবস্থাই ছিল। খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে কৌটিল্য কাম্বোজ, সৈন্ধব, আরট্ট ও বামাযুজ অশ্বকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ প্রদেশগুলি অধিকাংশই পশ্চিমভারত সীমান্তে বা ভারতের বাহিরে। মধ্যম শ্রেণীর অশ্ব পাওয়া যাইত বাহ্লীক, পাপেয়, সৌবীর দেশে।

অশ্বের লক্ষণ, অশ্বের শিক্ষা, উহার চিকিৎসা ও রক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে কৌটিল্য অনেক কথাই বলিয়াছেন। অশ্বদিগকে যথাসম্ভব যত্নেই রাখা হইত। অশ্বের বাসগৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

অশ্বের আহারাদি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথাই আছে। সদ্যঃপ্রসূত অশ্বিনীকে ঘৃত ও শক্তু প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা আছে, আবার উত্তম যুদ্ধের অশ্বকে নানা প্রকার ধান্য, ঘাস, তৃণ, মুগ, মাষকলাই প্রভৃতি, লবণ, দধি, এমন কি, মাংস ও মাংসযূষ প্রদানের ব্যবস্থাও আছে।

এতদ্ভিন্ন অশ্বের চিকিৎসার্থ নানা প্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। পাছে অশ্বে ভূতাবেশাদি হইয়া উহার অনিষ্ট হয়, তজ্জন্য পর্ব্বদিনে উহাদিগের আবাসে ভূতের পূজা প্রভৃতি করিবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ যুগে প্রজাসাধারণেরও অশ্বের বিশেষ প্রয়োজন হইত এবং এ বিষয়ে রাজা প্রজাগণকে বিশেষ সাহায্য করিতেন। সন্তান উৎপাদনের জন্য রাজকীয় অশ্বগুলি প্রজাসাধারণকে দেওয়া হইত।

মধ্য-ভারতেও ক্ষত্রিয় যোদ্ধৃবর্গের চক্ষুতে অশ্বের মূল্য ও সমাদর বিশেষই ছিল। রাজপুতরা অশ্বের বিশেষ যত্ন করিত। রাণা প্রতাপের চৈতকের মূর্ত্তি আজিও পূজিত হয়। উত্তর-পশ্চিমে ও মধ্য-ভারতে অশ্ব রাখিবার আগ্রহ ও সখ সকলেরই আছে। তবে বঙ্গদেশে অশ্বারোহণ একটি ভীষণ ভয়ের ব্যাপার। অবশ্য ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না। আশা করা যায়, শারীরিক উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে উহা আবার ফিরিয়া আসিবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহিলার সম্মান

শ্রীমতী দিলসাদ বেগম পূর্ব্বেই বোম্বাই প্রদেশে বহুবিধ জনহিতকর কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "জষ্টিশ অফ দি পীস" উপাধি প্রদান করিয়া যোগ্যতার এবং নারী জাতির সম্মান করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশবাসিনী মহিলা শ্রীমতী জগমোহন দাস বারজীবন দাস "জষ্টিশ অফ দি পীস" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, এই সম্মান অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের অগ্রদূত স্বরূপ। ইঁহারাই ভবিষ্যতে বোম্বাই প্রদেশে অবৈতনিক মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত হইবেন।

৪

সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু চাকররা তখন পর্য্যন্ত ঘরে আলো দিয়া যায় নাই। শ্রান্তি, পরিতাপ ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে আলেখ্য সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল, উপরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িবার জোরটুকুও যেন তাহাতে ছিল না। এমন সময়ে এক জন অতিশয় বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক বলা নাই কহা নাই, দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আলেখ্য বিস্মিত ও বিরক্তচিত্তে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, কে?

বৃদ্ধটি সম্মুখের একখানি চেয়ার সযত্নে ও সাবধানে টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে কহিলেন, আমার নাম নিমাই ভট্‌চায্যি, দূর সম্পর্কে অমরনাথের আমি ঠাকুরদাদা হই,—আর শুধু অমরনাথের বলি কেন, এ অঞ্চলে সকলেরই আমি ঠাকুর্দ্দা, আমার চেয়ে বুড়ো আর এ দিকে কেউ নেই। তোমার বাবা রাধামাধবও ছেলেবেলায় আমাকে খুড়ো ব'লে ডাকতেন। কাশীতে ছিলাম, হঠাৎ যে গরম পড়েছে, টিক্‌তে পারলাম না। যে যাই বলুক দিদি, বাঙ্গালা দেশের মত দেশ আর নেই—যেন স্বর্গ। এখানে এসে কেমন আছো? বাবা ভাল আছেন?

আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, তিনি ভাল আছেন। আপনার কি প্রয়োজন? বাবা কিন্তু আজ বাড়ী নেই।

নিমাই বলিলেন, কিন্তু তাঁর ত আজ ফেরবার কথা ছিল?

আলেখ্য কহিল, ছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক্ ফিরতে পারেন নি। কা'ল তিনি এলে আপনি দেখা করবেন।

বৃদ্ধ আলেখ্যর মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, না দিদি, আমার বেশ স্বচ্ছল অবস্থা, আমি ভিক্ষের জন্তে আসিনি। অমরনাথের মুখে শুনেছি, তুমি না কি বিলেতে পর্য্যন্ত গেছ। ভাল লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের আমি বড় ভালবাসি। তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইবার আমার ভারি লোভ, কিন্তু কখনও সে সুযোগ পাইনি। তারা আমার মত এক জন নগণ্য বুড়ো মানুষের সঙ্গে কথা কইতে চাইবেই বা কেন? তাই ভাবলাম, ঘরের কাছে যদি এত বড় সুবিধে পাওয়াই গেছে ত ছাড়া হবে না। ক'টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু বুড়োর ওপর তুমি ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছ না দিদি?

আলেখ্য মনে মনে লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে না; শুধু আজ বড় ক্লান্ত ছিলাম বলেই—

নিমাই বলিলেন, সে আমি শুনেছি দিদি, অমরনাথ আমার কাছে সমস্ত বলেই তবে গেছেন। বড় ভাল ছেলে, এতখানি বয়সে তার আর জোড়া কোথাও দেখলাম না। পাগলা দুঃখের জ্বালা সইতে পারলে না, আপনাকে হত্যা ক'রে ফেললে,—আহা! তাই ভাবি, দিদি, ভগবান্ শক্তি হরণ ক'রে নিলে মানুষ কি-ই বা! আসবার পথে তাদের বাড়ীর পাশ দিয়েই আসছিলাম, শ্মশান থেকে এখনও তারা ফেরেনি, ভেতরে মেয়েটা ডাকছেড়ে চেঁচাচ্চে,—আহা! সংসারে লঘু পাপে কত গুরু দণ্ডই না হয়! জিনিষ হয়ে বয়ে চুকে যায়, কিন্তু দাগ তার সারা জীবনে মিলোয় না। ভাবলাম, একবার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলি, দুর্গা, অভিসম্পাত ক'রে আর লাভ কি মা, সে যদি জান্‌তো, এত বড় ভয়ানক কাণ্ড হবে, তা হ'লে কি কখনও তোমার বাবাকে জবাব দিতে পারতো? তা'কে আমি চিনিনে, তবু বল্‌ছি কখ্‌খনো না। যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু যে বেঁচে রইল, তার মনস্তাপ কি কখনও ঘুচবে! এ কলঙ্কের দাগে তাকে চিরকাল দাগী হয়ে থাকতে হবে। অথচ তলিয়ে দেখলে এ তো সত্য নয়। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি

দিদি, তার মেয়ের চেয়ে এ দুর্ঘটনা তোমাকে ত কম আঘাত করেনি।

এই আগন্তুকের অবাঞ্ছিত আগমনে আলেখ্যর পীড়িত চিত্ত তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মন্তব্য শেষ হইলে সে সবিস্ময়ে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কে বললে আমি আঘাত পেয়েছি?

বৃদ্ধ কহিলেন, অমরনাথ আমাকে ত তাই ব'লে গেলেন।

আলেখ্য তেমনিই আস্তে আস্তে বলিল, অমরনাথ বাবুর এরূপ অনুমানের হেতু কি, তা' তিনিই জানেন। গাঙ্গুলী মশাই সম্পূর্ণ কাযের বার হয়ে গিয়েছিলেন। আমার জমিদারী সুশৃঙ্খলায় চালাবার চেষ্টা করা ত আমার অপরাধ নয়।

নিমাই বলিলেন, তোমার অপরাধের উল্লেখ ত সে একবারও করেনি দিদি।

আলেখ্য প্রত্যুত্তরে শুধু কহিল, আমি আমার কর্ত্তব্য করেছিলাম মাত্র।

তাহার জবাব শুনিয়া বৃদ্ধ অন্ধকারে ঠাহর করিয়া তাহার মুখের চেহারা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, কর্ত্তব্যের কি বাঁধা-ধরা কোন হিসেব আছে ভাই, যে, এই শক্ত, সোজা জবাবটা দিয়েই এই সত্তর বছরের বুড়োটাকে ঠকিয়ে দেবে? বুদ্ধিহত, অক্ষম, এই যে দুঃখী মানুষটা তোমার অন্নেই চিরদিন প্রতিপালিত হয়ে অবশেষে তোমার ভয়েই কূল-কিনারা না পেয়ে নিজের প্রাণটাকেই হত্যা ক'রে সংসার থেকে বিদায় নিলে, কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে কি এর দুঃখকে ঠেকানো যায় দিদি? নিরুপায় মেয়েটা তার শোকে চেঁচাচ্চে, তার উপবাসী নাতিটা গেছে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে—এর দুঃখের কি আদি অন্ত আছে? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দিদি, একলা ঘরের মধ্যে ব'সে ব্যথায় তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে।—এই বলিয়া বৃদ্ধ উত্তরীয়প্রান্তে নিজের দুটি আর্দ্র চক্ষু মার্জ্জনা করিতে গিয়া সহসা সম্মুখে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ আলেখ্য কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু কথা তাঁহার সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই সুমুখের টেবলে সে সজোরে মাথা রাখিয়া একেবারে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বুড়া নিমাই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অসময়ে সান্ত্বনা দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। মিনিট পাঁচ ছয় এই ভাবে কাটিলে আলেখ্য উঠিয়া বসিয়া নিজের চোখ মুছিতে লাগিল। এতক্ষণে নিমাই কথা কহিলেন। সস্নেহ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, এ আমি জানতাম দিদি। এ নইলে কিসের শিক্ষা, কিসের লেখাপড়া! এত বড় জমিদারীর বোঝা সাধ্য কি তোমার, বইতে পার!

কোন কারণে কাহারও কাছেই বোধ করি এমন করিয়া আলেখ্য আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে পারিত না, কিন্তু আজ সে এই অপরিচিতের কাছে নিজের মর্য্যাদা বাঁচাইবার এতটুকু চেষ্টা করিল না। হয় ত, সে শক্তিও তাহার ছিল না। অশ্রুরুদ্ধ ভগ্নস্বরে সহসা বলিয়া উঠিল, আপনাদের দেশে এসেছিলাম আমি থাকতে, কিন্তু এর পরে আর এখানে মুখ দেখাতেও পারব না।

বৃদ্ধ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, এ লজ্জা যে তোমার মিথ্যে, এ মিথ্যে সান্ত্বনা তোমাকে আমি দেব না। কিন্তু সমস্ত যদি চিরকালের মত ত্যাগ ক'রে যেতে পারো, তবেই এ যাওয়ার অর্থ হবে, নইলে যত দূরেই কেন যাও না, এই রস শোষণ করেই যদি তোমাকে জীবন ধারণ করতে হয় ত আর এক জনের জীবন হরণের পাপ থেকে তুমি কোন দিন মুক্তি পাবে না। এখানকার লজ্জা সেখানে চাপা দিয়েই যদি মুখ দেখাতে হয় দিদি, আমি বলি, তা হ'লে লোক ঠকিয়ে আর কায নেই। তুমি এখানেই থাকো।

আলেখ্য বলিল, কিন্তু আমি যে সত্যিকার অপরাধ কিছু করিনি, এখানকার লোক ত তা' বুঝতে চাইবে না।

নিমাই কহিলেন, বুঝতে চাওয়া ত উচিতও নয়।

আলেখ্য সহসা একটু কঠিন হইয়া বলিল, এ কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করতে পারিনে।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপরেই জবাব দিলেন, আজ হয় ত পারো না, কিন্তু আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, আর এক দিন যেন এ সত্য সবিনয়ে স্বীকার করার মত সাহস তোমার হয়।

ভৃত্য বাতি দিয়া গেল। সেই আলোকের সম্মুখে আলেখ্য কিছুতেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। নিমাই কহিতে লাগিলেন, তুমি শিক্ষিতা মেয়ে, অনেক দূর থেকে

তোমাকে আমি দেখতে এসেছি। যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, হয় ত সে কেবল এই কথাই তোমাকে শিখাতে চেয়েছে যে, এ দুনিয়ায় যোগ্যতাটাই একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু আমাদের এই সোনার দেশ কোন দিন কিছুতে এ কথা স্বীকার করেনি। এ দেশে অক্ষম, দুর্ব্বল, একান্ত অযোগ্যেরও দুটো ভাত-কাপড়ের দাবী আছে। অযোগ্যতার অপরাধে বাঁচবার অধিকার থেকে সংসারে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। কিন্তু গাঙ্গুলীকে তাই ত তুমি করলে। তাদের সকল দুঃখের ইতিহাস শুনেও তোমার খাতা লেখবার যোগ্যতা দিয়েই শুধু তার প্রাণের মূল্য ধার্য্য ক'রে দিলে। তুমি স্থির করলে, যে তোমার খাতা লিখতে আর পারে না, তার খাওয়া-পরার ওই ক'টা টাকা খরচ না হয়ে তোমার সিন্দুকে জমা হওয়াই দরকার। এই না দিদি?

আলেখ্যর কণ্ঠস্বর পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, আমি কখখনো এত কথা ভেবে করিনি। আমি কিছুতেই এত হীন নই।

নিমাই বলিলেন, সে আমি জানি, তাই ত তোমার শিক্ষার কথা আমি বলছিলাম দিদি। অমরনাথ বলছিলেন, তোমার জামা-কাপড়-জুতো-মোজার খরচ, তিনি বলছিলেন, তোমার আয়না চিরুণি-সাবান-গন্ধের অত্যন্ত ব্যয়; এক জনের ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে আর এক জনের এইগুলোর প্রয়োজন যে কোন অবস্থাতেই বড় হ'তে পারে, এ কুশিক্ষা যদি কোথাও পেয়ে থাকো ত সে তোমাকে আজ ভুলতে হবে। যারা জন্মেছে, তারা যত দুর্ব্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এ সত্য তোমাকে শিখতেই হবে। এত বড় জমিদারীর দৈবাৎ আজ তুমি মালিক, তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর এক জনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এ তো হতেই পারে না; এবং যে সমাজ-বিধানে এত বড় অন্যায় করাও তোমার পক্ষে আজ সহজ হ'তে পারলে, এ বিধান বহু দিনেরই প্রাচীন হোক্‌, কিছুতেই এটা মানুষের সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হ'তে পারে না। আমি বুড়ো হয়েছি, সে দিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্ম্মণ্য ব'লে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভাণ করছ, তাদেরই ছেলেপুলের কাছে আর এক দিন তোমাদেরই কর্ম্ম-পটুতার জবাবদিহি করতে হবে। সে দিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারীর মালিক বলেই আর্জ্জি পেশ করা চলবে না।

আলেখ্য তাঁহার কথাগুলি যে বিশ্বাস করিল, তাহা নয়। বরঞ্চ, আর কোন সময়ে এই সকল অপ্রিয় কঠিন আলোচনায় সে মনে মনে ভারি রাগ করিত। কিন্তু আজিকার দিনে, কতক বা কৌতূহলবশে, কতক বা লজ্জায় ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, প্রজারা কি বিদ্রোহ করবে আপনি বল্‌ছেন? তাদের কি সব এই রকম মনের ভাব?

নিমাই কহিলেন, দিদি, বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ করে না; এবং মনোভাব জিনিসটা অত্যন্ত অস্থির বস্তু। ওর নিজের কোন ঠাঁই নেই, অর্থাৎ ওটা নিছক অবস্থা এবং শিক্ষার ফল। এরা কাঁধ মিলিয়ে দ্রুতবেগে যে দিকে চলেছে, আমি শুধু তার দিকেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এদের ঠেকাতে না পারলে ওকেও ঠেকাতে পারা যাবে না। জগতে বুদ্ধিমানেরা এত কাল তাদের আফিঙ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙে গেছে। পেট না ভরলে আর যে তারা নীতিপূর্ণ বচন এবং পুরোনো আইন-কানুনের চোখ-রাঙানিতে থামবে, এমন ত ভরসা হয় না দিদি।

আলেখ্য কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন, এ সমস্তই তবে বিলাতি শিক্ষার দোষ?

বৃদ্ধ কহিলেন, আমি দোষের কথা ত একবারও বলিনি দিদি। আমি বলি, এ তার ফল।

আলেখ্য কহিল, কুফল।

বৃদ্ধ হাসিলেন। বলিলেন, কথাটা একটু গুলিয়ে গেল ভাই। তা' যাক্‌। আমি সুফল-কুফলের উল্লেখ করিনি, শুধু ফলের কথাই বলেছিলাম। তা', সেই কথাই যদি উঠলো, তবে বলি দিদি, আমার জীবনেই আমি দেখেছি, দু'টো পয়সা এবং এক পাত্র গোকার বদলে একটা লোক সারাদিন মজুরি ক'রে তার পরিবার প্রতিপালন করেছে। দুঃখে নয়, স্বচ্ছন্দে,—আনন্দের সঙ্গে। দেশে টাকা ছিল না, কিন্তু প্রচুর খাদ্য ছিল। রেল ছিল না, জাহাজ ছিল

না,—বিদেশী সাহেব আর ততোধিক বিদেশী মাড়বারীতে মিলে দেশের অন্ন বিদেশে চালান দিয়ে তখন সহস্র কোটি লোকের জীবন-সমস্যা এমন দুঃসহ, এমন ভীষণ জটিল ক'রে তোলবার সুযোগ পেত না। তখন ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস জুয়ার আড্ডার মধ্যে দিয়ে এমন ক'রে সোনা-রূপোয় রূপান্তরিত হয়ে যোগ্যতমের সিন্দুকে গিয়ে উপস্থিত হ'ত না।—বলিতে বলিতে হঠাৎ বৃদ্ধের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন, দিদি, আমার ছেলেবেলায় অক্ষম অযোগ্যের বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা ছিল না। আজ একমুঠো শাকান্নও দেশে নষ্ট হবার নয়, বুদ্ধিমান্ ও ব্যবসায়ীতে মিলে তাঁবার টুকরোয় তাকে দাঁড় করাতে দেরি করে না—অর্থ-বিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বল্‌বেন, এর চেয়ে মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু আমার মত যাকে গ্রামে গ্রামে দুঃখীদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, সেই জানে, মঙ্গল এতে কত!

এই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাবে আলেখ্যর নিজের চিত্তও করুণ হইয়া আসিল, কিন্তু সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, ট্রেণ এবং ষ্টীমারকে কি আপনি ভাল মনে করেন না?

বৃদ্ধ হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, কোন-কিছুর ভাল-মন্দই কি এমন বিচ্ছিন্ন ক'রে নির্দ্দেশ করা যায় দিদি? অপর সকলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, সামঞ্জস্য ক'রে তবেই তার ভাল-মন্দের সত্যকার বিচার হয়।

আলেখ্যও হাসিল, কহিল, ওটা শুধু আপনার কথার মার-প্যাঁচ। আসল কথা, আপনাদের পণ্ডিতসমাজ বিলাতি শিক্ষার অত্যন্ত প্রতিকূলে। ওদের যা-কিছু সমস্তই মন্দ এবং আপনাদের যা-কিছু সমস্তই ভাল, এই আপনাদের বদ্ধমূল ধারণা। যতক্ষণ না তাদের বিদ্যা, তাদের বিজ্ঞান আপনারা আয়ত্ত করবেন, ততক্ষণ কোনমতেই নিরপেক্ষ বিচার করতে পারবেন না।

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, দিদি, নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ হয়, কিন্তু তোমার কথায় মনে হয় যেন, আচরণে আমার আত্মগোপনের অপরাধ হচ্ছে। সেকালে আমি এক জন বড় অধ্যাপক ছিলাম। অমরনাথ আমারই ছাত্র। আমার কাছ থেকেই সে এম, এ, পাশ করে, তার সংস্কৃত শিক্ষার গুরুও আমি। তুমি যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের কথা বল্‌লে, তা' আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু একেবারে অনভিজ্ঞ বল্‌লেও মিথ্যাভাষণের পাপ হবে।

কথাটা শুনিয়া আলেখ্য চমকিয়া উঠিল,—তাহাকে কে যেন মারিল। সেই তাহার আরক্ত মুখের প্রতি বৃদ্ধ নিঃশব্দে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আজ তুমি শ্রান্ত, তুমি উপরে তোমার ঘরে যাও দিদি, অমরনাথ কোন বিপদে যদি না প'ড়ে থাকে ত কা'ল এসে দুজনে আবার দেখা কোরব। আমিও চল্‌লাম,—এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া পুনশ্চ কি একটা যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শেষ জাগরণ

কার যেন ভাঙে ঘুম কে ফেলে নিশ্বাস,
হিয়ার মাঝারে হিয়া পরম মধুর,
কানে বাজে দোয়েলের ঘুমমাখা সুর
কে পেতেছে ফুল সেজ—পারুল পলাশ!

ধারা ধারা ধারা চোখে, এ যে মহানিধি,
পরশ-মাণিক আমি পেলাম শ্মশানে,
দগ্ধদেহে জ্বালামালা, নাম-সুধাপানে
অন্তর আনন্দে ভরা, অনুকূল বিধি।

বজ্রসূচি দিয়া বিধি দিলে দিব্য ধন,
আনন্দ-জ্যোতির মাঝে কি আনন্দ স্নান
কোথায় বাজিছে বীণা, কে গাহিছে গান;
চেয়ে দেখি, হৃদিমাঝে মা'র শ্রীচরণ।

সর্ব্বস্বরূপায়ে করি সর্ব্ব সমর্পণ,
ঘুচি গেল জীববন্ধ, ঘুচিল অঞ্জন।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীরামকৃষ্ণ

পারিবারিক বিশেষত্বের পরিচয়

গদাধরকে বিদায় দিয়া দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ের উজ্জ্বলদীপ্তি যেন সহসা নিবিয়া গেল। মথুরমোহনের মনে হইল, সমস্ত উদ্যানখানিকে যেন একটা বিষাদের ছায়া ঘেরিয়া রাখিয়াছে। তরুলতা আর তেমন করিয়া কথা কহিতেছে না; গঙ্গার জলে আর তেমন কলাইল্লোল উঠিতেছে না; বাতাস বয়, মনে হয়, যেন কার অদর্শন-ব্যথায় উদ্যানময় কে নিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিতেছে। দেবালয় যেমন ছিল, তেমনই আছে। প্রভাতী সুরে সেই চিরশ্রুত নহবত বাজিতেছে। চাঁদনীর উভয় পার্শ্বে গঙ্গাতীরবর্ত্তী দ্বাদশ শিবালয়ে, বিষ্ণুঘরে, শ্রীশ্রীভবতারিণীর নবরত্ন-মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টারোল তেমনই উঠিতেছে। মধ্যাহ্নে অতিথি-ভোজনের তেমনই কোলাহল। কিন্তু তবু মনে হইতেছে, যেন দেবালয়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ কে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। 'বাবা'র সহিত প্রথম বিচ্ছেদ রাণীর জামাতাকে নিরতিশয় কাতর করিয়া তুলিল। মথুর একাধারে 'বাবা'র স্বনিয়োজিত অভিভাবক এবং সেবক। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তানের উপর তাঁহার অবিচলিত ভালবাসার কথা ভাবিলে মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা স্বয়ং শ্রীহস্তে তাহার গ্রন্থি বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, যাঁহারা তাঁহার প্রয়োজন যোগাইবার জন্ত শ্রীশ্রীজগদম্বার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সকল রসদ্দারদিগের মধ্যে মথুর সর্ব্বপ্রথম।

মথুর বাবু।

সংশয়-জননী পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রখর আলোকে গদাধরের চরিত্রের অপার্থিব উজ্জ্বলতা মলিন হওয়া ত দূরের কথা, বরং মথুরের চক্ষে উজ্জ্বলতর কিরণ বিকাশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিকতা বলিয়া যখন সমগ্র দেশ বীতশ্রদ্ধ ও বিমুখ, তখন এই ব্রাহ্মণ-সন্তান একা অলৌকিক বিশ্বাসে বুক বাঁধিয়া মন্দিরের ঐ মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে চিন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল। কি উদ্দাম সে ব্যাকুলতা! মাথার উপর দিয়া সময়স্রোত বহিয়া যায়, হুঁস থাকে না। কাঁটাবনে পড়িয়া শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, ভ্রূক্ষেপ নাই। আবার যখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যায়, বজ্রপাতেও চৈতন্ত হয় না, স্থাণুর স্তায় স্থির! ধূলায় কাদায় মাথার কেশে জটা পাকাইয়া গিয়াছে, তাহার উপর পাখী বসিয়া নিঃসঙ্কোচে আহার অন্বেষণ করে।

এই সময়ের ধ্যান-প্রত্যক্ষের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, আসনে বস্‌লেই বোধ হ'ত, শরীরের সব গ্রন্থিতে কে যেন কট্ কট্ ক'রে তালা বন্ধ ক'রে দিচ্ছে! একটু নড়্‌বার-চড়্‌বার যো' থাক্‌ত না। ধ্যান কর্‌তে ব'সে প্রথম প্রথম জোনাকী পোকার মত রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ দর্শন হ'ত। কখন কুয়াসার মত, কখন গলারূপার মত চারদিক

ঝক্ ঝক্ করত—চোখ বুজেও যেমন, চোখ চেয়েও তেমনই।

পাশ্চাত্যবিজ্ঞান এই সকল অনুভূতির বিরুদ্ধে সহস্র যুক্তি উত্থাপন করিলেও মথুরের বিশ্বাসী মন বলিত, শিশু জড়বিজ্ঞান এখনও এ সকল তত্ত্বের সন্ধান পায় নাই! বিজ্ঞান এখনও বুঝে নাই যে, কেবল জড়শক্তি দ্বারা জগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় না। কি এক দুর্ব্বার, দুর্ব্বোধ শক্তি যে এই দ্বিজবালকের দেহ-মন অধিকার করিয়া অলক্ষ্যে ক্রীড়া করিতেছে, কে বলিবে? ইহার সকলই বিস্ময়কর। কেমন করিয়া কোথা দিয়া কি হয়, কিছুই বুঝা যায় না! বেশী দিনের কথা নয়, স্বহস্ত-রোপিত পঞ্চবটীর চারিদিকে গদাধরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হয়। অনতিপরেই গঙ্গায় বান ডাকিল এবং আবশ্যকমত গরাণের খুঁটি, বাঁকারি, নারিকেল-দড়ি ও একখানি কাটারি পর্য্যন্ত কোথা হইতে ভাসিয়া আসিল। বেড়া বাঁধিবার পর তাহার একখানি বাঁকারি কি এতটুকু দড়ি অবশিষ্ট রহিল না! যাহা সাধারণ লোক-চক্ষুতে প্রতিভাত হয় না, কি অমানুষী দৃষ্টি সহায়ে এই অনন্যসাধারণ সাধক সেই অলক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ করে? মানস-চক্ষে নয়—এই চর্ম্মচক্ষুতে প্রত্যক্ষ করে যে, মন্দিরের ঐ নিশ্চল পাষাণময়ী প্রতিমা মানব-দুহিতার মত চঞ্চল আনন্দে মন্দিরের এক তলা হইতে অপর তলায় উঠিতেছেন, আবার কখন দেখে, এলোচুলে দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন! ইহার অলৌকিক দেবভক্তি, অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি কি বংশানুগত গুণসমূহের অভিব্যক্তি? পাশ্চাত্যবিজ্ঞান বলে, যে-বংশে কোন প্রতিভাশালী বা আধিকারিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, সে-বংশে প্রায়ই ভাবপ্রবণতা, অতীন্দ্রিয় দর্শন-শ্রবণ প্রভৃতি অপস্মার-রোগের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। গদাধরের কি সত্যই বায়ুরোগ? তবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ তাহার প্রতীকারে সমর্থ হইতেছেন না কেন? ইহার দুঃসহ গাত্রদাহ কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না, অবশেষে কি অদ্ভুতভাবেই না তাহা শান্তি লাভ করে? শাস্ত্রের নিয়মানুসারে পূজার সময় চিন্তা করিতে হয় যে, শরীরস্থ পাপ-পুরুষ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। একদিন পঞ্চবটীতে গদাধর দেখিল, দুই জন পুরুষ তাহার দেহাভ্যন্তর হইতে পর পর বাহির হইয়া আসিল। এক জন বিকটাকৃতি কৃষ্ণকায়, অপর জন শুভ্র কাঞ্চন-গৌর, সৌম্যমূর্ত্তি। দ্বিতীয় প্রথমকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিবার পর গদাধরের গাত্রদাহ শান্ত হয়। শাস্ত্র ঐ বিকটাকারকে পাপপুরুষ বলিয়া অভিহিত করে! বায়ুরোগ যদি, তবে গদাধরের সাধন-প্রসূত সকল অভিজ্ঞতাই শাস্ত্রসঙ্গত হয় কেন? সে দিন পানিহাটী মহোৎসবে, কেন তবে সাধক বৈষ্ণবচরণ গদাধরকে দেখিবামাত্রই উচ্চাবস্থাপন্ন মহাপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল? আবার স্বভাবতঃ ধীর, শান্তশিষ্ট এই ব্রাহ্মণকুমারের সময় সময় উগ্র উত্তেজনায় ভাব মথুরমোহনের মনে সংশয়ের উদয় করে। কখন কখন 'বাবা'র আচরণও অনন্যসাধারণ মনে হয়। অসুখের সময় দুঃসহ গাত্রদাহ একদিন গদাধরকে নিরতিশয় পীড়া দিতেছিল। গদাধর তখন বসিয়াছিল পঞ্চবটীতে এবং মথুর গঙ্গাতীরে। হঠাৎ একটা ঢিল সজোরে মথুরের গায়ের উপর পড়িল। মথুর ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, 'বাবা' তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। কাছে আসিতে গদাধর সজলনেত্রে বলিল, সবাই বলছে, আমার বায়ুরোগ হয়েছে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ—নিঃসম্বল,তুমি যদি দয়া ক'রে আমার চিকিৎসা করাও! সে কাতর স্বর, সজল চক্ষুর সে মূক মিনতি, মথুরের অন্তরে আজিও তীরের মত বিঁধিয়া আছে। হৃদয়ের মুখে মথুর এই দীনব্রাহ্মণপরিবারের ইতিহাস অনেক শুনিয়াছেন। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু ত্যাগে, নিষ্ঠায়, ভক্তি, ভাবুকতায়, সত্যে, সততায়, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় ইহাদের সমকক্ষ কোথায়? গদাধরকে প্রেতাবিষ্ট, পাগল বলিতে হয়, বল। কিন্তু এ উন্মত্ততা সাধারণ নয়। 'এ উন্মাদ জগৎ উন্মাদ করে!' গাছের গুণপরিচয় মূলে নয়—ফলে।

গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম ঋষিতুল্য লোক ছিলেন। তাঁহার ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, দেব-ভক্তি অতুলনীয় ছিল। উন্নতকায়, সবল, সুশ্রী, গৌরকান্তি, প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ পথে বাহির হইলে পল্লীবাসিগণ বৃথালাপ পরিত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত। তাঁহার স্নান সমাপন না হইলে পুষ্করিণীতে কেহ অবগাহন করিত না। গায়ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে ব্রাহ্মণের বিশাল বক্ষঃস্থলটি প্রভাত-কিরণপাতে সাগরের ন্যায় স্ফীত এবং আরক্ত হইয়া উঠিত। 'রঘুবীর—রঘুবীর' বলিতে বলিতে তাঁহার বদনমণ্ডল অরুণরাগ-রঞ্জিত বিকচ পদ্মের মত প্রফুল্ল ও

নয়নযুগল দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রুপাত হইত। পল্লীবাসিগণ সম্পদে বিপদে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ব্রাহ্মণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেন।

শ্রীশ্রীরঘুবীর এবং শীতলা দেবীর পূজার জন্য ক্ষুদিরাম প্রতিদিন প্রত্যূষে যখন কুসুম চয়ন করিতেন, দেখিতেন, দিব্যাভরণধারিণী, রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, একটি অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা হাস্যমুখে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; কখন বা চয়নের জন্য পুষ্পিত শাখা নত করিয়া ধরিতেছে। আরাধ্যা দেবীর এইরূপ প্রত্যক্ষ-দর্শন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে; আর কয়জনই বা ভাব-প্রবণতায় দুঃখদৈন্য উপেক্ষা করিয়া আত্মহারা হইয়া থাকে!

এক সময় ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর যাইবার প্রয়োজন হয়। তখন শীত শেষ হইয়া গেছে এবং রৌদ্রের তাপ ক্রমে ক্রমে দুঃসহ হইয়া উঠিতেছে। মাঠে তরুচ্ছায়া নাই। বসন্তের অভিনব বেশ ধারণ করিবার জন্য বৃক্ষ সকল জীর্ণ পল্লব-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছে। ছায়া-বিরল মেঠো পথে বিশ ক্রোশ অতিক্রম করিতে হইবে, ক্ষুদিরাম অতি প্রত্যুষেই বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কয়েকখানি গ্রাম পার হইয়া বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে একটি পল্লীতে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সেখানকার বেলগাছে অপর্য্যাপ্ত নূতন পাতা গজাইয়াছে। দেখিয়া ক্ষুদিরামের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কামারপুকুর অঞ্চলে তখন বিল্বপত্রের একান্ত অভাব; দেবাদিদেব মহাদেবকে তাঁহার এই প্রিয় বস্তুটি দিতে না পারিয়া ক্ষুদিরাম অতি ক্ষুণ্নমনেই নিত্য-পূজা সম্পন্ন করিতেছিলেন। এই পল্লীর বৃক্ষসকলে অজস্র পত্রোদগম দেখিয়া ব্রাহ্মণ আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। গ্রাম হইতে নূতন চুপড়ী ও গামছা কিনিয়া আনিয়া বাছিয়া বাছিয়া প্রচুর বিল্বপত্র চয়ন করিলেন। পরে নূতন গামছাখানি ভিজাইয়া তাহার উপর চাপা দিয়া দেশের দিকে গতি ফিরাইলেন। তখন সূর্য্য প্রায় মাথার উপর, সৌর রুদ্রমূর্ত্তি। কিন্তু প্রেম-ভক্তির আবেগে ক্ষুদিরাম তাহাকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিলেন না। যখন কামারপুকুরে পৌঁছিলেন, তখন বেলা প্রায় ৩টা। চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু স্বামীকে সহসা কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। এ দিকে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া ক্ষুদিরাম পূজায় বসিয়া গেলেন। তার পর গলদশ্রুধারে যখন তাঁহার পূজা সমাপ্ত হইল, তখন পত্নীকে ডাকিয়া প্রত্যাগমনের কারণ বলিয়া পরদিন পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন।

ভাবুকতার এইরূপ অসংযত উচ্ছ্বাস এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের বংশগত। ক্ষুদিরামের সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর কানাইরাম এক দিন যাত্রা শুনিতেছিলেন। পালা হইতেছিল, রাম বনবাস। শুনিতে শুনিতে কানাইরাম ভাবে বিভোর এবং তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। কৈকেয়ী যখন দশরথের কাছে শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার প্রস্তাব করিল, তখন আর কানাইরামের ধৈর্য্য রহিল না। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর রক্তচক্ষু ব্রাহ্মণ সহসা দণ্ডায়মান হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, পামরি! এই সময় আসরে একটা প্রজ্বলিত মশালের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কানাইরাম তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া বিস্মিত অভিনেতার মুখে অগ্নিসংযোগ করিতে অগ্রসর হইলেন। অপরিমিত ভাবের উচ্ছ্বাস এবং অতীন্দ্রিয়-অনুভূতির বিকাশ, এই ব্রাহ্মণবংশের যেন একচেটিয়া।

এই ত সে দিনের কথা, কানাইরামের পুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে দেবীপূজায় ব্রতী হইবার প্রায় এক মাস পরে শ্রীমন্দিরে একদিন সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছিলেন। ইনি বিষ্ণুভক্ত, শক্তিপূজায় ইঁহার তেমন আনন্দ ও উৎসাহ ছিল না। ঐ দিন সন্ধ্যা করিতে করিতে হলধারী দেখিলেন, মায়ের স্বভাবত শান্তমূর্ত্তি অতি উগ্রভাব ধারণ করিল। পরক্ষণেই তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তুই এখান থেকে উঠে যা, তোর আর পূজা করতে হবে না। ভীত হলধারী সেই অবধি দেবীপূজার আসন ছাড়িয়া বিষ্ণুপূজায় ব্রতী হইয়াছেন।

এই অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল চন্দ্রাদেবীতে, বিশেষ করিয়া গদাধর যখন গর্ভে। অন্তর্ব্বত্নী হইবার পূর্ব্বে একদিন তাঁহার অনুভূতি হইয়াছিল, যেন একটা অলৌকিক জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে তাঁহার দেহাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাহ্য চেতনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তার পর গর্ভিণী অবস্থায় চন্দ্রাদেবীর কখন মনে হইত, যেন দিব্য গন্ধে দিক্ পূর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে, আশে-পাশে অন্তরীক্ষে, কত জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি জলে জলবিম্বের ন্যায়

চকিতে ফুটিয়া চকিতে মিলাইয়া যাইতেছে। কাহারও দ্বিনয়ন, কাহারও ত্রিনয়ন; কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ। ইঁহারা যে দেবতা, তাহাতে দেবীর সংশয় ছিল না। কিন্তু কি সৌভাগ্যে যে তাঁহাদের দুর্লভ দর্শন এই দীনহীনা পল্লীবাসিনীর পক্ষে এত সুলভ হইয়া উঠিয়াছে, অশিক্ষিতা, সরলপ্রাণা ব্রাহ্মণী তাহা বুঝিতে পারিতেন না। কখন আকাশ হইতে অশরীরী বাণী আসিয়া তাঁহার শ্রবণে কত অদ্ভুত সমাচার প্রদান করিত। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে দেবী নিরন্তর আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। কাহারও শুষ্ক মুখ দেখিলে চন্দ্রাদেবীর মাতৃহৃদয় করুণায় উথলিয়া উঠিত। এক দিন দেখিলেন, হংস-বাহনে এক অপরূপ দেবতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত। চন্দ্রার মনে হইল, রৌদ্রের তাপে তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অমনি তাঁহার অন্তর ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। বলিলেন, ও বাপ হাঁসে চড়া ঠাকুর, আহা, মুখখানি যে শুকিয়ে গিয়েছে! ঘরে পরিষ্টি ভাত আছে, দুটি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে যা! হাঁসে-চড়া ঠাকুর হাসিতে হাসিতে হাওয়ায় মিলাইয়া গেল!

গদাধরকে গর্ভে ধারণ করিবার বহু পূর্ব্বে চন্দ্রাদেবীর জীবনে একবার যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁহারও প্রকৃতিগত। সে দিন কোজাগরপূর্ণিমা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের বয়স তখন প্রায় পঞ্চদশবর্ষ। দৈন্যের সংসারে সেই কিশোর বয়সেই রামকুমারকে উপার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এই জন্য চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে করিতেই তিনি যাজকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভুরসুবো গ্রামে এক যজমান-গৃহে রামকুমার ঐ দিন লক্ষ্মীপূজা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু বাটী ফিরিতে তাঁহার অসম্ভব বিলম্ব হইতে লাগিল। উৎকণ্ঠায় চন্দ্রাদেবী বার বার ঘর-বার করিতে লাগিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীর হইয়া উঠিল। চন্দ্রা তখন কুটীর-বাহিরে আসিয়া সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ভুরসুবোর পথপানে চাহিয়া রহিলেন। এমনিভাবে কিছুক্ষণ পথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, অতিদূরে মেঠো পথ দিয়া কে চলিয়া আসিতেছে। প্রান্তর অত্যুজ্জ্বল জ্যোৎস্না-প্লাবিত হইলেও চন্দ্রা আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন না, মানসিক উদ্বেগে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে সেই সচলমূর্ত্তি তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। চন্দ্রা দেখিলেন, এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী তাঁহার সম্মুখে। তাঁহার অলৌকিক কান্তির আভায় ফুটন্ত চন্দ্রকিরণ মলিন হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রা ক্রতপদে রমণীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মা, তুমি কোথা হ'তে আসছ?

কিশোরী উত্তরিল, ভুরসুবো থেকে।

চন্দ্রা সোৎসুকে প্রশ্ন করিলেন, আমার ছেলে রাম-কুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে? সে কি ফিরে আসছে?

অপরিচিতা রামকুমারকে চিনিবেন কি করিয়া, এ প্রশ্ন একবারও তাঁহার মনে হইল না। কিশোরী কহিল, হাঁ, তোমার ছেলে যে-বাড়ীতে পূজা করতে গেছে, আমি সেই-খান থেকেই আসছি। ভয় নাই, মা, তোমার ছেলে এখনই আসবে।

চন্দ্রা আশ্বস্ত হইলেন। তখন কিশোরীকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার মত তাঁহার অবকাশ হইল। এ কি রূপ! বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে ইহার শরীর যেন স্থির দীপ-কলিকার ন্যায় জ্বলিতেছে। বর্ণে যেন উষা-রাগ-রঞ্জিত কচি কমলের মাধুরী ঢল ঢল করিতেছে। সংসার হইতে বিতাড়িতা করুণা যেন ইহার অক্ষির সুদীর্ঘ পক্ষ্মাবলির মাঝে অপূর্ব্ব নীড় রচনা করিয়াছে। মরি মরি, চঞ্চল অলকা-চুম্বিত মুখখানি যেন পাতায় ঘেরা প্রফুল্ল স্থলকমল! চন্দ্রা-দেবী বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিতে চাহিতে ভাবিতে লাগি-লেন, এ অপার্থিব ফুল মর্ত্ত্যে ফুটে? এত বড় চুল মানুষের হয়? এ সব রত্নালঙ্কার এ পল্লীবালিকা কোথায় পাইল, আর এত রাত্রিতে বহুমূল্য অলঙ্কার প'রে এ যায়ই বা কোথা? ইহার কর্ণমূলে ও কি অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে? বিস্মিতা চন্দ্রা প্রশ্ন করিলেন, মা, তোমার কানে ও কি গয়না?

কিশোরী কহিল, কুণ্ডল।

চন্দ্রা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, মা, এত রাত্রে এ সব গয়না-গাঁটি প'রে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার অল্প বয়েস। আমাদের বাড়ী এস না!

অপরিচিতা উত্তরিল, আমাকে এখনও অনেক দূর যেতে হবে, মা!

অনেক দূরে যেতে হবে! এই নিশুতি রাত, একা এ

বালিকা কোথায় যাইবে? পথে কত দুষ্ট লোক আছে! চন্দ্রা সস্নেহে বলিলেন, তা কি হয়, মা! আজ রাত্রের মত আমাদের ঘরে চল। কাল সকালে উঠে যেখানে যাবার যেয়ো!

অতি মধুরস্বরে কিশোরী কহিল, মা, মা, আমাকে এখনই যেতে হবে। তোমাদের বাড়ীতে আর এক সময় তখন আসব।

অপরিচিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার কথা চন্দ্রা-দেবীর মনেই উদয় হইল না। তিনি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বালিকার গমনভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কুটীরের সন্নিকটে লাহাবাবুদের কয়েকটি ধান্যের মরাই ছিল। অপরিচিতা তাহারই ভিতর অন্তর্হিতা হইল। চন্দ্রা ভাবিলেন, এ কি পথ ভুলিল না কি? দ্রুত গিয়া দেখিলেন, অপরিচিতা সুন্দরী অদৃশ্য হইয়াছে, তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ভয়ে, বিস্ময়ে চন্দ্রা স্বামীর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। ক্ষুদিরাম বলিলেন, মা লক্ষ্মী তোমাকে কৃপা ক'রে দর্শন দিয়েছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃটিশ চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ 'প্রজাবন্ধু' পত্রের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। সংবাদপত্রের সেবা করিতে গিয়া এ দেশে যাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছেন, তিনকড়িবাবু তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয় ছিলেন, নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তিনি মাতুলের গুণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি বৃটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করিতে ভীত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার সেই সমালোচনায় লর্ড ল্যান্সডাউন এতাদৃশ বিচলিত হইয়াছিলেন যে, সরকারী গেজেটে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বৃটিশ ভারতে 'প্রজাবন্ধুর' প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তিনকড়ি বাবুকে শিক্ষা-বিভাগের দপ্তর হইতে পদচ্যুত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি বৃটিশ সরকারের সি, আই, ডি, বিভাগের সতর্ক দৃষ্টির অধীন হন। তিনি "গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবন-চরিত" লিখিয়া বঙ্গভাষাকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, সে জন্য তিনি বাঙ্গালীর চিরদিন স্মরণীয় থাকিবেন। এই গ্রন্থখানির উপকরণ তিনি পঞ্জাবে অবস্থানকালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনকড়ি বাবুই সর্ব্বপ্রথমে 'শিশু রামায়ণ' ও 'শিশু মহাভারত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন: 'শিশু-চৈতন্য' নামে তিনি আর একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'পুরাণ রহস্য' নামে একখানি গ্রন্থে তিনি পুরাণ তত্ত্বের সুন্দর আলোচনা করিয়াছিলেন।
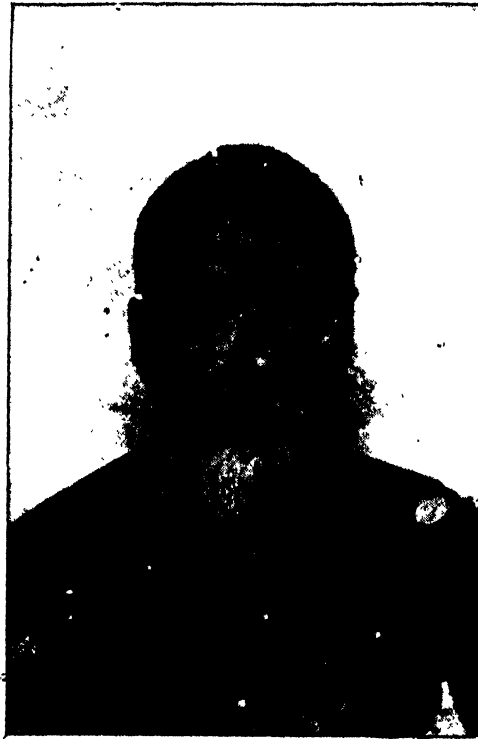
হারাধন

(গল্প)

১

মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বহুকাল তাহাতে তৈলস্পর্শ ঘটে নাই, কৃষ্ণবর্ণ কৃশদেহ, কোটরগত চক্ষু, অত্যন্ত ছিন্ন মলিনবেশী এক প্রৌঢ় ব্যক্তি সিরাজগঞ্জ বাজারে রামলোচন সরকারের চাউলের আড়তে আসিয়া বলিল, "বাবু মশায়, আজ সারাদিন আমি কিছু খেতে পাইনি।"

রামলোচন তহবিল মিলাইবার জন্য সম্মুখে রাশীকৃত টাকা পয়সা সিকি দুয়ানি প্রভৃতি লইয়া, গণিয়া গণিয়া থাকে থাকে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ভিখারীর প্রতি চোখের কোণে একবার দৃষ্টিমাত্র করিয়া, একটা পয়সা তাহার দিকে ঠক্ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। পয়সাটি কুড়াইয়া লোকটা টেঁকে গুঁজিয়া করুণস্বরে বলিল, "একটা পয়সায় কি হবে বাবু? সারাদিন কিছু খাইনি।"

এইবার রামলোচন ভাল করিয়া লোকটার মুখের পানে চাহিলেন। চেহারা দেখিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় একটু দয়ার সঞ্চার হইল; বলিলেন, "ভাত খাবে?"

লোকটা বলিল, "আজ্ঞে, তাই যদি দুটি আজ্ঞে হয়।"

"আচ্ছা, বোস তা হ'লে। সন্ধ্যেটা দেখিয়েই দোকান বন্ধ করবো। বাসায় নিয়ে গিয়ে তোমায় ভাত খাওয়াব। ঐ যে পয়সাটা দিলাম, ময়রার দোকানে গিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে ততক্ষণ জল খাও গে।"—বলিয়া তিনি তহবিল মিলাইতে মন দিলেন।

২

রামলোচন সরকার জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার নিবাস এ স্থানে নহে, তবে এই জিলাতেই বটে। বাজারে এই চাউলের আড়তটি তাঁহার পৈতৃক আমলের; বাজার হইতে কিছু দূরে নদীর সন্নিকটে দ্বিতল বাসাবাটীখানিও তাঁহার পিতা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রামলোচন ও তাঁহার কনিষ্ঠ পদ্মলোচন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কারবার চালাইতেন। পিতার জীবিতকালেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল; বড়বধূর নাম তারাসুন্দরী, ছোটর নাম রাধারাণী। বাড়ীতে বিধবা মাতা ছিলেন; তাঁহার সেবা ও ঘর-গৃহস্থালী কর্ম্মের জন্য, উভয় বধূ এককালে এখানকার বাসাবাটীতে আসিয়া থাকিতে পারিতেন না—পালাক্রমে ছয় মাস করিয়া এক জন বাটীতে থাকিতেন, এক জন বাসাবাটীতে আসিয়া স্বাধীন গৃহিণীপণার সুখাস্বাদন করিতেন। পাঁচ ছয় বৎসর এই বন্দোবস্তই চলিয়া আসিতেছিল;—এক দিন হঠাৎ কলেরারোগে পদ্মলোচনের মৃত্যু হইল। ইহার পর বিধবা জননীও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, মাস ছয়েক পরেই তাঁহার পুত্রশোক, চিতার আগুনে নির্ব্বাপিত হইল। সেই অবধি তারাসুন্দরীই সিরাজগঞ্জের বাসাবাটীতে কায়েম হইলেন; রাধারাণী তাঁহার শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। বড়বধূও অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন; কিন্তু অধিক দিন থাকিতে পারিতেন না—বাসাবাটীতে কর্ত্তাকে, অতিথি-অভ্যাগতকে ভাত-জল দেয় কে? সম্প্রতি দিন পনরো হইল, ছোট বধূ বাসাবাটীতে আসিয়া রহিয়াছেন; কারণ, তারাসুন্দরী এখন সন্তানসম্ভাবিতা—দিনও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

৩

তহবিল মিলানো শেষ করিয়া, টাকাগুলি বাসায় লইয়া যাইবার জন্য খেরুয়ার থলিতে ভরিয়া রাখিয়া, সন্ধ্যাব প্রাক্কালে রামলোচন খেলো হুঁকা হাতে করিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বকথিত সেই ভিখারী আসিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। রামলোচন বলিলেন, "কি হে, জলটল কিছু খেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এক পয়সার বাতাসা কিনে জল খেলাম।"

"বেশ। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম শ্রীহারাধন দত্ত। কায়স্থ।"

"কায়স্থ? বেশ বেশ। আচ্ছা, ব'স ঐখানটায়।"—বলিয়া, যে চৌকিখানির একপ্রান্তে তাঁহার "গদী", চক্ষুর

ঙ্গিতে রামলোচন তাহারই অপর প্রান্ত দেখাইয়া দিলেন। হারাধন বসিল।

হুঁকায় কয়েক টান দিয়া রামলোচন বলিল, "কায়স্থ? বটে! তা, তোমার এমন অবস্থা হ'ল কি ক'রে?"

হারাধন নীরবে আপন ললাটে হস্তার্পণ করিল।

রামলোচন বলিল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ত বটেই, সে ত বটেই। অদৃষ্টই হচ্চে মূলাধার। বাড়ী কোথা তোমার?"

"কোথাও নেই। বাড়ী-ঘর থাকলে কি আর পথে পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াই বাবু?"

"তবু—তোমার বাপ পিতামহ কোথায় থাকতেন, কোথায় তুমি জন্মেছিলে, কোথায় ছেলেবেলা কাটিয়েছ, সে সব ত বল্‌তে পার?"

হারাধন মাথাটি নাড়িয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে মশাই অনেক কথা! বলতে গেলে মহাভারত!"

রামলোচন ভাবিলেন, পূর্ব্বে বোধ হয়, ইহার অবস্থা ভালই ছিল, গ্রহবৈগুণ্যবশে এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে, সে সকল কথা বলিতে বোধ হয় লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছে। ভাবিলেন, সকলই অদৃষ্টের খেলা, কখন্ কার কি অবস্থা দাঁড়ায়, কিছুই ত বলা যায় না—এ বিষয়ে উহাকে আর জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। করুণাপূর্ণ নয়নে লোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন, "তামাক খাবে?"

"আজ্ঞে দিন"—বলিয়া হারাধন হাত বাড়াইল। রামলোচন কলিকাটি খুলিয়া তাহার হাতে দিলেন; হুঁকা দিলেন না, কারণ, যদিও এ ব্যক্তি নিজেকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে—সত্যই কায়স্থ কি না, তাই বা কে জানে! লোকে কথায় বলে, "জাত হারালে কায়েত।"

হারাধন কলিকাটি লইয়া, তাহা অঙ্গুলিপুটে ধারণ করিয়া, হস্ত দ্বারা কৃত্রিম হুঁকা রচনা করিয়া খুব জোরে জোরে তিন চারিটা দম লাগাইল। তাহার ভঙ্গি দেখিয়া রামলোচন সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড় তামাক খাওয়া অভ্যাস আছে না কি?"

"বড় তামাক"—অর্থাৎ গাঁজা। হারাধন বলিল, "মাঝে মাঝে তাও চলে বৈ কি!"—বলিয়া কলিকাটি সে রামলোচনকে প্রত্যর্পণ করিল। রামলোচন তখন সেটি নিজের হুঁকায় বসাইয়া, দুই এক টান দিয়াই বুঝিতে পারিলেন, উহাতে আর কিছুই নাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রামলোচন ডাকিলেন—"বেজা! প্রদীপটে জাল রে।" বালক ভৃত্য ব্রজনাথ গদীর উপর একটি পিত্তলের রেকাবী বসাইয়া, প্রদীপসহ পিলসুজটি তাহার উপর রাখিয়া প্রদীপ জালিয়া দিল। রামলোচন তখন "হরিবোল হরি—দুর্গা দুর্গা, জয় মা অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি দেবদেবীর নামোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। বেজা তার পর প্রদীপটি হাতে করিয়া, দোকানের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া, "সন্ধ্যা দেখাইয়া" আসিল। দোকানের গোমস্তা এবং ওজনদার উভয়ে মিলিয়া, সকল দ্বার ও জানালাগুলি সাবধানে বন্ধ করিয়া, মোটা মোটা লোহার হুড়কা তুলিয়া দিল। চাউলের বস্তা প্রভৃতিও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া, নিজ নিজ পিরিহান ও চাদর প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রামলোচন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া, গোমস্তার হাতে দিয়া, টাকার থলি হাতে লইয়া আড়তের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ম্মচারিগণ বাহির-দ্বারটি বন্ধ করিয়া, তাহার নানা স্থানে বড় বড় তালা লাগাইয়া চাবির গুচ্ছ প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিল। "এস হে হারাধন" বলিয়া রামলোচন অতিথি ও ভৃত্য সহ বাসা অভিমুখে চলিলেন; কর্ম্মচারীরাও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

৪

হারাধনকে বাসায় লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরের বারান্দায় তাহাকে বসাইয়া রামলোচন বলিলেন, "রান্নার ত এখনও দেরী আছে; তুমি এখানে ব'স ততক্ষণ, আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আসি।"—বলিয়াই তিনি আগন্তুকের বস্ত্র প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি কাপড় ছাড়বে? একখানা ধুতিটুতি পাঠিয়ে দেবো?"

হারাধন বলিল, "হলে ত ভালই হয়।"

"আচ্ছা, তুমি ব'স।" বলিয়া রামলোচন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিজ শয়নঘরের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ভিতরে তাঁহার স্ত্রী কোলের ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইতেছেন—ছোট বউ সেখানে বসিয়া ছিলেন, ভাসুরের পদশব্দ পাইয়া অপর দ্বার দিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। রামলোচন প্রবেশ করিয়া, টাকার থলি এবং আড়তের

চাবির গুচ্ছ লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "ওগো! দেখ, এক জন ভিখারী সারাদিন কিছু খায় নি, তাকে সঙ্গে ক'রে এনেছি, তাকে দুটি ভাত দিতে হবে। আর কিছু জলখাবার—দুই এক টুকরো শসা কি পেঁপে, আর কিছু মিষ্টি যদি থাকে—বেজাকে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দাও, বাইরের ঘরের বারান্দায় সে ব'সে আছে। আর দেখ, আমার একখানা ছেঁড়াখোঁড়া ধুতি যদি খুঁজে বের ক'রে দিতে পার ত ভাল হয়, সে কাপড় ছাড়বে।"

প্রস্তাবগুলি শুনিয়া তারাসুন্দরী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। বলিলেন, "ভিখারী—না কুটুম? এত খাতির যে?"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড় কুটুম,—তোমার ভাই। ওগো, ভিখারী হলেও সে ছোটলোক নয়—কায়স্থ সন্তান। আমিও যা, সেও তাই, তবে অবস্থার গতিকে সে এখন ভিখারী হয়েছে।"

"ওঃ—আচ্ছা, তা দিচ্ছি"—বলিয়া তারাসুন্দরী খোকাকে দুধ খাওয়ান শেষ করিতে মন দিলেন। রামলোচনও মুখ-হাত ধুইবার আয়োজন করিলেন।

জলযোগাদি শেষ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলেন, হারাধনের আর সে চেহারা নাই। স্নান করিয়া, ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, এখন তাহাকে ভদ্রলোকের মত দেখাইতেছে। রামলোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, চান করেছ যে দেখছি!"

হারাধন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, নদীতে গিয়ে চান ক'রে এলাম।"

"খেলে টেলে কিছু?"

"খেলাম বৈ কি। বড় গিন্নী খানিকটা মুটি আর গুড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে প্রাণটা শীতল হ'ল।"

রামলোচন হাসিয়া বলিলেন, "বড় গিন্নী কি মেজ গিন্নী, তা তুমি জানলে কি ক'রে? তুমি এরই মধ্যে আমার সাংসারিক খবর সব পেয়ে গেছ দেখছি!"

"আজ্ঞে হাঁ—আপনার বেজা চাকরকে জিজ্ঞাসা ক'রে সব কথাই জেনে নিলাম।"

রামলোচন সেখানে বসিয়া হারাধনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর, প্রতিদিনই তিনি এই বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া, আহারের পূর্ব্বে, দুই এক ছিলিম "বড় তামাক" সেবন করিয়া, ক্ষুধায় শাণ দিয়া লন—কেহ সাথী জুটিলে তাহার সঙ্গে বসিয়া, নচেৎ একাকী। বড় তামাকের প্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বেই হারাধনের সহিত তাঁহার হইয়া গিয়াছিল—এবার তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। নেশাটি ক্রমে জমিয়া উঠিতে লাগিল। তখন রামলোচন অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িলেন। হারাধনের কষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহার মনটি তৎপ্রতি অত্যন্ত স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, প্রস্তাব করিলেন, হারাধন যত দিন ইচ্ছা এখানে অতিথি-স্বরূপ অবস্থান করিতে পারে।

রাত্রি ৯টার সময় বেজা আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। হারাধনকে লইয়া রামলোচন অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শয়নঘরের বারান্দাতেই আহারের স্থান হইয়াছিল। হারাধন বসিয়া, মুক্ত দ্বারপথে ঘরের ভিতরে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "এই ঘরেই আপনার শয়ন হয় বুঝি?"

রামলোচন বলিলেন, "হাঁ, এই ঘরখানিতে আমি শুই। এই পাশাপাশি ঘর দু'খানি, আমার দু' ভাইয়ের ছিল আর কি। ভাই ত আমার, দাগা দিয়ে চলেই গেলেন!"—বলিয়া, গাঁজার প্রভাবে, তাঁহার পুরাতন ভ্রাতৃ-শোক নূতন হইয়া উঠিল। ভাত খাইতে খাইতে, কোঁচার খুঁটে তিনি চক্ষু মুছিলেন।

"হ্যাঁ—সবই ত আমি শুনেছি।" বলিয়া হারাধন ঊর্দ্ধ-মুখে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছোট বধূ রাধারাণীই ভাত বাড়িয়া দিয়া গিয়াছিল। এই সময়, সে ভাসুরের দুধের বাটি লইয়া আসিয়াছিল—ভাসুর ও আগন্তুকের এই কথোপকথন শুনিয়া, ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া আগন্তুকের পানে চাহিল। হারাধনের দৃষ্টিও ঠিক এই সময় অবগুণ্ঠনবতীর পানে ফিরিল। উভয়ে চোখোচোখি হইবামাত্র, রাধারাণীর দৃষ্টি রোষ ও বিরক্তি জ্ঞাপন করিল। হারাধন তখনই মাথাটি নীচু করিয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল, "হরি হে, তোমার ইচ্ছা!"

[ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

আমেরিকায় খুন ও আত্মহত্যা

জ্ঞান ও সভ্যতার লীলাভূমি আমেরিকায় খুন ও আত্মহত্যার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তত্রত্য চিন্তাশীল মনীষীরা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। নানা সংবাদপত্রে এ বিষয়ে আলোচনাও চলিতেছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সম্পূর্ণ খুনের তালিকা এখনও আলোচিত হয় নাই; কিন্তু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় যে, তথায় খুনের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডাক্তার ফ্রেডরিক্ হফম্যান্ নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত স্পেক্‌টেটর পত্রে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ২৮টি প্রধান নগরের লোকসমষ্টির অনুপাতে প্রতি লক্ষ জনের মধ্যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে হতব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৫'১। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা বাড়িয়া ৮'৫ হয়। বিগত ১৯২১ খৃষ্টাব্দে খুনের সংখ্যা প্রতি লক্ষ জনে ৯.৩ দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'ইভনিং পোষ্ট' পত্র নরহত্যা সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,"আমাদের সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অধিবাসীদিগের উগ্র স্বভাব ও আইনের প্রতি উপেক্ষাই আমেরিকায় নরহত্যাবৃদ্ধির প্রধান কারণ। এখানে হত্যাকারী অনায়াসে দণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। চিকাগো হইতে প্রকাশিত 'ট্রিবিউন্' পত্র দেখাইয়াছেন, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ৮ হাজার ২ শত ৭২ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়, তন্মধ্যে মাত্র ১ শত ১৫ জনের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ৭ হাজার ৮ শত ৩ জন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হয়। তন্মধ্যে ৮৫ জন হত্যাকারী প্রাণদণ্ড লাভ করে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ৭ হাজার ৬ শত ৬৭টি খুনের অপরাধীর মধ্যে মাত্র ৮৫ জনের ফাঁসী হইয়াছিল। দেশের ব্যবস্থানুসারে দুষ্টলোক সহজেই প্রাণঘাতী অস্ত্র রাখিতে পায়। এজন্য যাহারা প্রকৃতই নরহন্তা, তাহাদিগকেও উপযুক্ত দণ্ড দিবার সুবিধা হয় না।"

ডাক্তার হফম্যান্ বিষ ও প্রাণঘাতী অস্ত্র বিক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, আমেরিকার বহু সংবাদপত্রও তাঁহার মতানুবর্ত্তী। কেহ কেহ বলিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, সামাজিক অবস্থারও উন্নতির প্রয়োজন। নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত 'গ্লোব' পত্র লিখিয়াছেন যে, আদালতের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, বিষ ও নরঘাতী অস্ত্র বিক্রয়ের সঙ্কোচসাধন ও পুলিসের সংখ্যা বাড়াইলেই এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড প্রশমিত হইবে না। হয় ত তাহাতে আপাততঃ কিছু সুফল দেখা যাইতে পারে; কিন্তু অগ্রে রোগ নির্ণয় করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা না করিলে সবই নিষ্ফল হইবে। সামাজিক অবস্থা হইতেই রোগের উৎপত্তি। বিগত ২০ বৎসরে সামাজিক অবস্থার বহুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নগরে ক্রমেই অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, সে জন্য নানাবিধ সমস্যারও উদ্ভব হইয়াছে। গৃহ-সমস্যা, শিক্ষা ও ক্রীড়া-সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা অল্প।

আত্মহত্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তরুণীদিগের পরিচালিত একটি ক্লব আবিষ্কৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৯ শত তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সমগ্র যুক্তরাজ্যে ঐ বৎসরে ১২ হাজার নরনারী আত্মহত্যা করিয়াছিল। তৎপূর্ব্ববৎসরেও অনুরূপসংখ্যক লোক আত্মহত্যা করে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায়, আত্মহত্যাকারীদিগের মধ্যে ধনী, সমাজে গণ্য-মান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন। ৩৮জন কলেজের ছাত্র, ৫০জন অধ্যাপক ও শিক্ষক, ১৯ জন ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মজগতের নেতা, ৫২ জন বিচারক ও ব্যবহারাজীব, ৮৪ জন চিকিৎসক, ১০০ শত জন বড় বড় ব্যবসায়ের পরিচালক ও প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি আত্মহত্যা করিয়াছেন। একটি ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট দশবার ব্যর্থকাম হইবার পর একাদশবারে আত্মহত্যায় সমর্থ হয়েন। উক্ত তালিকায় ৭৯ জন কোটিপতিরও নাম আছে। আমেরিকায় 'Save a Life League' নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উহার প্রেসিডেণ্ট (সভাপতি) ডাক্তার হ্যারী ওয়ারেণ আত্মহত্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, অবিলম্বে এই ভীষণ ব্যাপারের প্রতীকার না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। অত্যন্ত সামান্য কারণেই লোক আত্মহত্যায় অগ্রসর হয়। ডাক্তার ওয়ারেণের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কেশ ছোট করিয়া কাটা

হইয়াছিল, এই দুঃখে একটি তরুণী আত্মহত্যা করে। গলফ ক্রীড়া হইতে বিতাড়িত হওয়ায় জনৈক পুরুষ আত্মহত্যা দ্বারা সেই দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করে। একটি রমণী ছুইবার ট্রেণ ধরিতে পারে নাই, শুধু এই কারণেই মরিয়াছিল। এক ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ আরও অদ্ভুত; পৃথিবীর ধ্বংস—শেষদিন আসন্ন, এইরূপ অলীক কল্পনার আতিশয্যে সে আত্মহত্যা করিয়াছিল। বিড়াল উপলক্ষে কলহ হওয়ার ফলে একটি লোক আত্মহত্যা করে। শীত ভোগ করিবার দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আশায় এক জন পুরুষ আত্মহত্যার আশ্রয় গ্রহণ করে। আত্মহত্যা করিলে কি মজা হয়, শুধু এই অভিপ্রায়েই এক ব্যক্তি মরিয়াছিল। আবার আর এক জনের লিখিত পত্র হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সে আত্মহত্যার সময় মনের অবস্থা উপভোগ করিবার জন্যই এই কার্য্য করিয়াছিল। এইরূপ লঘু কারণে এমন ভীষণ মহাপাতকের অনুষ্ঠান সভ্যদেশের পক্ষেই সম্ভবপর।

ডাক্তার ওয়ারেণের বিবরণ পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তরুণ-তরুণীর আত্মহত্যার ব্যাপারে আমেরিকা অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ৪ শত ৭৭ জন তরুণ-তরুণী আত্মহত্যা করিয়াছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে উহার সংখ্যা ৭ শত ৭ জনে দাঁড়ায়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৮ শত ৫৮ জন এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আত্মহত্যাকারী তরুণ ও তরুণীর সংখ্যা ৯ শত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ৪ বৎসরে ৩ হাজার কিশোর-কিশোরীর তিরোভাব বড় উপেক্ষার কথা নহে। সাধারণতঃ কিশোরগণ ১৭ বৎসরে ও কিশোরীরা ১৫ বৎসরে আত্মহত্যা করিয়া থাকে। কিশোরীরা বিষ ও তরুণেরা পিস্তল বা বন্দুকের সাহায্য লইয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ।

এইরূপ শোচনীয় আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অভিজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন যে, অনেকের মানসিক অবস্থার বিশৃঙ্খলতা বা গৃহের দুর্ব্যবহার অথবা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপ্রণালীই প্রধানতঃ দায়ী। এই তিনটি প্রধান কারণবশতঃই কিশোর-কিশোরীরা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। বাল্যবিবাহও অন্যতম কারণ বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিতেছেন। বিগত ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যে পঞ্চদশ বর্ষের ১ হাজার ৬ শত কিশোর ও ১২ হাজার কিশোরী পরিণীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৫ শত কিশোরী বিধবা ও পতি দ্বারা পরিত্যক্তা (divorced) হয়। ১৬ বৎসরের বিবাহিত কিশোরের সংখ্যা ৩ হাজার ২ শত ; ... বৎসরের বিবাহিতের সংখ্যা ৭ হাজার ৬ শত ... অষ্টাদশ বর্ষের পরিণীত তরুণ যুবকের সংখ্যা ... হাজার ৬ শত ৪৪। তরুণীদিগের বিবাহের সংখ্যা এইরূপ : ষোড়শ-বর্ষীয়া ৪১ হাজার ৬শত ২০ ; সপ্তদশবর্ষীয়া ৯০হা... ৩০ ; অষ্টাদশবর্ষীয়া ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬ ... বিবাহের অব্যবহিতকাল পরেই এই সকল তরু... অধি... কাংশই বুঝিতে পারে যে, তাহাদের নির্ব্বাচন ... হয় নাই। তাহার ফলে, মতান্তর, মনান্তর, বিচ্ছেদ এবং বিবাহবন্ধনের উচ্ছেদ। সঙ্গে সঙ্গে অ... আত্মহত্যা বা খুনেই পরিণীত জীবনের পরিসমাপ্তি ...

'ক্যাথলিক ভিজিল্' নামক পত্র এই শোচ... আত্ম-হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনাপ্রসঙ্গে লি...ছেন, "পরিণতবয়স্করাও কেন আত্মহত্যা করে, তাহ... কারণও বুঝা যায় না। মস্তিষ্কবিকৃতি অন্যত... হইতে পারে। এ জন্য চরিত্রের গঠনকার্যে ... হইতে হইবে। ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলে ... ক্ষেত্রে চরিত্র দৃঢ় হয় না। ভগবদ্বিশ্বাস, চরি... নরনারীর চিত্তকে আঘাতসহ করিয়া তুলে। ... আত্মহত্যা করিতে চাহিবে না। কিন্তু কিশোর-কি... আত্মহত্যার ব্যাপারটা বড়ই সমস্যাবহুল। শি... দোষেই ইহা ঘটে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

উক্ত পত্র বলিতেছেন যে, যুদ্ধের ফলেই যে ... সংখ্যা বাড়িয়াছে, ইহা সত্য নহে। তরুণ-তরুণী... হত্যাব্যাপারে উহার কোনও সংস্রব নাই। ব্যবসা... মস্তিষ্কবিকৃতি প্রভৃতি আত্মহত্যার কারণ নহে। গৃহে এবং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও নিয়ম মানিয়া চলিবার ... ব্যবস্থার বিশেষ অভাব এবং ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ... নাই বলিয়া এই সকল শোচনীয় ব্যাপার ... ষোড়শবর্ষেই সাধারণতঃ আত্মহত্যার আধিক্য দেখা ... এই বয়সে অসংযম প্রবল হয়। নরনারী এই ... সকল প্রকার বিধিনিষেধের বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ... ষোড়শবর্ষই সাংঘাতিক। স্বাধীনতা যদি নিয়মা... দ্বারা প্রভাবিত না হয়, তাহা হইলে, উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রাদুর্ভাব ঘটে ; সুতরাং ধর্ম্মবুদ্ধির বিকাশ ও বাধ্যতা শিক্ষার ... না করিলে চলিবে না।

ব্যবস্থাপক সভার প্রসঙ্গ

১

শাসন-সংস্কারে ভারতবাসীকে যে অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, তাহা ভারতবাসীর যোগ্যতার উপযুক্ত নহে এবং তাহার নবজাগ্রত জাতীয় ভাবেরও অনুকূল নহে বলিয়া যে মত প্রকাশ করা হইয়াছিল, অসহযোগ আন্দোলনে যখন তাহা পরিণতি লাভ করে, তখন ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করাই অসহযোগ আন্দোলনের অংশ স্থির করিয়া কংগ্রেস-কর্ম্মীরা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করেন। তখন মহারাষ্ট্রে এক দল রাজনীতিক বর্জ্জনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের মতানুবর্ত্তী হইয়া responsive co-operation করিতে চাহিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের মত এই যে, সরকার যদি দেশের লোকের মতানুযায়ী কায করেন, তবে তাঁহারা সরকারের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত। শ্রীযুক্ত কেলকার ও ডাক্তার মুঞ্জী ইঁহাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া দেশবাসীর কল্যাণকর কার্য্যে সরকারের সহিত সহযোগ করিতে প্রস্তুত; এমন কি, মন্ত্রী হইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারাও গতবার ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন নাই। এবার তাঁহারা তাহা করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য এবং ডাক্তার মুঞ্জী তাঁহাদের নেতা। বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড লিটন যেমন বাঙ্গালায় স্বরাজ্যদলপতি মিষ্টার সি, আর, দাশকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, মধ্য প্রদেশের গভর্ণর তেমনই ডাক্তার মুঞ্জীকে সেই কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মুঞ্জী তাহাতে সম্মত হয়েন নাই।

ডাক্তার মুঞ্জী ও তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া দ্বৈতশাসনে আঘাত করিতে আরম্ভ করেন। গত ১৮ই জানুয়ারী তাঁহারা মন্ত্রীদিগকে আক্রমণ করেন; বলেন, তাঁহাদের প্রতি ব্যবস্থাপক সভার (সদস্যদিগের) আস্থা নাই।

যে স্থলে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্য ভিন্নদলভুক্ত, সে স্থলে এক হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রীদিগের উপর সদস্যদিগের অধিকাংশের আস্থা নাই। পার্লামেণ্টের যে "জয়েণ্ট কমিটী" শাসন-সংস্কার আইন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন, সেই কমিটী এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"The ministers selected by the Governor to advise him on the transferred subjects should be elected members of the Legislative Council, enjoying its confidence and capable of leading it."

অর্থাৎ হস্তান্তরিত বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য গভর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্য হইতে এমন লোক বাছিয়া লইবেন যে, তাঁহারা সভার (সদস্যদিগের) আস্থাভাজন এবং সে সভার নেতৃত্ব করিবার উপযুক্ত।

এ হিসাবে মধ্য প্রদেশের মন্ত্রীরা যে ব্যবস্থাপক সভার আস্থাভাজন ছিলেন না, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু তেমনই আবার সরকারপক্ষ হইতে বলা যাইতে পারে, যখন প্রধান দলের দলপতি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসম্মত, তখন আস্থাভাজন লোক পাইবার উপায় কি?

সে যাহাই হউক, ১৮ই জানুয়ারী মিষ্টার রাঘবেন্দ্র রাও প্রস্তাব করেন :—

গভর্ণরকে জানান হউক যে, মাননীয় মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার আস্থাভাজন নহেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলুন।

প্রস্তাবক বলেন, অধিকাংশ নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতেই স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সেই বিতর্কেই এবার সদস্য নির্ব্বাচন হইয়াছে। মন্ত্রীরা যাহাতে শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা সচল রাখিতে না পারেন, তাহা করাই স্বরাজ্য দল কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সরকার যদি হস্তান্তরিত বিভাগের কায চালাইতে চাহেন, তাঁহারা কায চালাইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা দেশের নির্ব্বাচনকারীদিগের

নামে সে কায করিতে পারিবেন না, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার আস্থাভাজন নহেন এমন মন্ত্রীর দ্বারা সে সভার নামে তাঁহাদিগকে সে কায করিতে দেওয়া হইবে না। মন্ত্রীদিগকে বিদায় দানের অধিকার ব্যবস্থাপক সভার আছে। স্বরাজ্য দল দ্বৈত শাসন ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প।

সরকারপক্ষ মিষ্টার ষ্টাণ্ডেন বলেন, ব্যবস্থাপক সভা অবশ্য মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিতে পারেন; কিন্তু প্রবল পক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত চিঠনবিশ মহাশয় বলেন, তিনি লোকের স্বার্থরক্ষার জন্য—কল্যাণকল্পে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি মন্ত্রী থাকিলে সেরূপ কল্যাণ সাধিত হইবে না বুঝিলেই তিনি পদত্যাগ করিবেন।

তাঁহার পর মাননীয় মিষ্টার যোশী বলেন, যে দল পুনঃ পুনঃ শাসন-পদ্ধতির কথা বলিতেছেন, সে দলের পক্ষে পদ্ধতি অনুসারে কায করিতে প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। স্বরাজ্য দল পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু পদ্ধতি অনুসারে কায করেন নাই। ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্য যে মন্ত্রীদিগের সমর্থন করেন না, তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই—তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে মন্ত্রীর কায পাইয়াছেন, তাহার কারণ—সরকারের কায চালাইতে হইবে, সে কায বন্ধ রাখা যায় না। দ্বৈত-শাসন যে দেশের লোকের অপ্রিয়, তাহা দেখানই যদি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার কারণ হয়, তবে সে কথা ত আর নূতন করিয়া বুঝাইবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহে এবং গত ৩ বৎসর লোকমতের অভিব্যক্তিতে তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে।

তাহার পর যোশী মহাশয় বলেন, আজ যখন বিলাতে শ্রমিকদলের প্রাধান্যলাভসম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, তখন কি কর্ণেল ওয়েজউডের পরামর্শ অবজ্ঞা করা সঙ্গত হইবে? এই কথাতেই তিনি তাঁহার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলেন। তিনি যে রাজনীতিক দলভুক্ত, সে দল অভ্যাস বা অনুশীলনফলে পরমুখাপেক্ষিতাই সম্বল করিয়াছেন। তাঁহাদের আশা, বিলাতের কোন কোন রাজনীতিক দল ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার সমর্থন এবং পারিলেই ভারতবাসীকে সব অধিকার প্রদান করিবেন। ১৮ই জানুয়ারী তারিখে যোশী মহাশয় যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ২দিন পরে বিলাতে 'হিন্দু' প[illegible] শ্রীযুক্ত শন্ত নেহাল সিংহকে শ্রমিক সরকারে[illegible] র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড যাহা বলিয়াছেন, তাহ[illegible] নিরাশার অন্ধকারে ডুবিয়া যায় নাই কি? র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন :—

আমি সময় সময় উদ্বেগ সহকারে ভারতে[illegible] লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমার সমগ্র রাজনৈ[illegible] আমি এই বিশ্বাসেই অবিচলিত আছি যে, [illegible] করিতে হইলে রাজনীতিক বা নিয়মানুগ পন্থা[illegible] উপায় নাই। আমরাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, [illegible]ত্মক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে মনে[illegible] পুরাতনের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া,—[illegible]রিক ক্লেশ ও নানারূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া [illegible] বিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ পুনরায় সংস্থাপিত করিতে ও [illegible] নীতি পুনরায় পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছে[illegible]

ভারতবর্ষ যদি নিয়মানুগতার ও বিপ্ল[illegible] পরিণত হয়, তবে আমার মতে ভারতবর্ষের [illegible] আশা থাকিতে পারে না। বলের ভয়ে [illegible] অচল করিবার শঙ্কায় বিলাতের কোন [illegible] ভীত হইবেন না। যদি ভারতে কেহ ইহা [illegible] তাঁহারা অচিরে হতাশ হইবেন। আমি তা[illegible] আমাদের নিকট হইতে সরিয়া না দাঁ[illegible] আসিতে ও সদ্ভাব অর্জ্জন করিতে বলি।

এই উক্তিতে মিষ্টার র‍্যামজে ম্যাকডো[illegible] ভাবের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা[illegible] শীল সরকারের মনোভাবের বিন্দুমাত্র প্রভে[illegible] ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই শ্রমিক নেতাই শাসন-সংস্কা[illegible] কংগ্রেসের কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারিত ব[illegible]

জাতির জন্য পূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত কার্য্যপদ্ধতি[illegible] দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, ভারতবাসীরা [illegible] সব ব্যবস্থায় আপত্তি করে, তাহারা সে সব [illegible] লইতে বাধ্য নহে। পরন্তু তাহারা যাহা চাহে[illegible] করিবার চেষ্টা করিবে।

অর্থাৎ সে দিন তিনি যাহা কর্ত্তব্য ব[illegible] করিয়াছিলেন, আজ তাহাই বিপ্লবাত্মক ও [illegible]কূল বিবেচনা করিতেছেন।

ডাক্তার মুঞ্জী বলেন, নিয়ম যখন এইরূপ যে, মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার আস্থাভাজন হইবেন, তখন সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া সরকার আইনের ঈপ্সিত কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও স্বরাজ্য দলের কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেশের ভোটাররা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধন জন্য ব্যবস্থাপক সভা ব্যবহার করিতেছে এবং বিশেষ কায করিবার আদেশ দিয়া প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। যে অবস্থায় গভর্ণরকে স্বয়ং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ভার গ্রহণ করিতে হইবে, স্বরাজ্য দল সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে চাহেন। ব্যুরোক্রেশীর সহিত সংগ্রাম সর্ব্বপ্রথম মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আরব্ধ হইয়াছে এবং সমগ্র দেশ সোৎসুক দৃষ্টিতে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিতেছে। তাঁহারা বিদেশী স্বার্থপর ব্যুরোক্রেশীর উচ্ছেদসাধনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের কাযের ফল ভোগ করিতে প্রস্তুত। গভর্ণর যদি ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণে হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাকে সরাইবার জন্য সমগ্র প্রদেশে আন্দোলন করিবেন। তাঁহারা সেইরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং তদনুসারে কায করিতে বাধ্য। তাঁহারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে মন্ত্রীদিগের প্রভুত্ব অস্বীকার করিতে পরামর্শ দিবেন। কাযেই গভর্ণর যদি শান্তির পক্ষপাতী হয়েন, তবে তাঁহার পক্ষে মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করাই সঙ্গত।

ব্যবস্থাপক সভায় লিবারল (মধ্যপন্থী) ও মনোনীত সদস্যরা এ প্রস্তাবে কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও মহাশয়ের প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

এই ঘটনার পর ৪ঠা মার্চ্চ ব্যবস্থাপক সভার আবার অধিবেশন হয়। রাজস্ব মেম্বার ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের বাজেট পেশ করেন। তাহাতে তিনি দেখান, সম্ভাবিত রাজস্বের পরিমাণ—৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, আর সম্ভাবিত ব্যয়ের হিসাব—৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ইহার পর মন্ত্রী চিঠনরিশ মহাশয় মধ্য প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের খশড়ার আলোচনার প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত রাঘবেন্দ্র রাও সে আইনের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, তাঁহার দল যে মূলনীতির অনুসরণ করিতেছেন, তদনুযায়ী তিনি প্রতিবাদ করিতেছেন না—তাঁহাদের প্রতিবাদ নিয়মামুগ। প্রতিবাদকারীদিগেরই জয় হয়। শেষে আরও কয়খানি আইনের ভাগ্যে এইরূপ ফল হয়।

৭ই তারিখে বাজেটের নানা বিভাগ আলোচিত হয়। তখন স্বরাজ্য দল বলেন, মন্ত্রীদিগের উপর সভার আস্থা নাই জানিয়াও যখন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন না, তখন তাঁহারা সমগ্র বাজেট না-মঞ্জুর করিবেন। উত্তরে সরকারপক্ষ হইতে বলা হয়, মন্ত্রীদিগের প্রতি আস্থার অভাব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বরাজ্য দল বলিয়াছেন, তাঁহারা মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিবেন না, তখন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলে কি ফললাভ হইবে? ইহার উত্তরে স্বরাজ্যদলপতি ডাক্তার মুঞ্জী বলেন, সরকার বলিয়াছেন, স্বরাজ্য দলের কাযের কোন সঙ্গত কারণ নাই এবং তাঁহারা পদ্ধতি মানিতেছেন না; কিন্তু তাঁহারা যাহাকে পদ্ধতি বলিতেছেন, তাহা ভারত সরকার আইন, আর সে আইন স্বরাজ্য দলের অসাক্ষাতে বিলাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি একটি প্রশ্নে ও একটি প্রস্তাবে সহযোগের আভাস দিয়াছিলেন; কিন্তু গভর্ণর সে বিষয়ে অবহিত হয়েন নাই এবং তাঁহার প্রশ্ন ও প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কাযেই আজ যে স্বরাজ্য-দল সমগ্র বাজেট বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সে জন্য সরকারই দায়ী।

ভোটের আধিক্যে শেষে সমগ্র বাজেট না-মঞ্জুর করা হয়। কেবল পাছে মন্ত্রীদিগকে কোন বেতন না দিলে সে কায আইনবিগর্হিত হয়, সেই জন্য তাঁহারা মন্ত্রীদিগের বেতন বাবদে ২ টাকা মঞ্জুর করেন। ডাক্তার মুঞ্জীর কথার ভাব এই যে, তাঁহারা হয় ত বা responsive co-operation করিতেন; কিন্তু সরকার সে সুযোগ দেন নাই। মধ্য প্রদেশের স্বরাজ্য দল কি হইলে responsive co-operation করিতেন, তাহাও ভাল বুঝা যায় নাই।

বাজেট না-মঞ্জুরের ফলে কি হইবে, তাহা লইয়া লোক অনেক জল্পনাকল্পনা করিয়াছিল। কারণ, এরূপ ব্যাপার ভারতবর্ষে ইংরাজাধিকারকালে আর কখন ঘটে নাই।

শেষে ২৪শে মার্চ্চ তারিখে সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী এ বিষয়ে এক রেজলিউশন প্রকাশ করেন:—

"ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য মন্ত্রীদিগের বেতন বাবদ ২ টাকা ব্যতীত সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিভাগে আর সব দাবী না-মঞ্জুর করিয়াছেন। এমন ব্যাপার পূর্ব্বে

কখন ঘটে নাই। এ অবস্থায় গভর্ণর কি করিবেন, তাহা তাঁহাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তিনি দুই পথের একটি অবলম্বন করিতে পারেন। হয় তিনি ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণই মানিয়া লইবেন; নহে ত, আইনে তাঁহার যে ক্ষমতা আছে, তদনুসারে ব্যবস্থাপক সভার না-মঞ্জুরী খরচ মঞ্জুর করিবেন। যদি তিনি ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে কায করেন, তবে সরকারের সব বিভাগ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং প্রাদেশিক ও নিম্নস্থ চাকুরীয়াদিগকে ও কেরাণী প্রভৃতিকে বিদায় দিতে হয়। তাহাতে সরকার প্রকৃত প্রস্তাবে লুপ্ত হয়। কাযেই গভর্ণর স্থির করিয়াছেন, আইনে তাঁহাকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, তিনি তাহার ব্যবহার করিবেন—অর্থাৎ সভ্য সরকারের কাষ চালাইবার জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তাহা এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সরকারের ধ্বংস না হয়, সে জন্য যে টাকা দিতে হয়, তাহা মঞ্জুর করিবেন।

"সংরক্ষিত বিভাগে অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু কয় বৎসর হইতে ব্যয় যেরূপ কমান হইয়াছে, তাহাতে আর কমান সম্ভব নহে। সেই জন্য যে কয়টি বাবদে ব্যয় এখন না করিলেও সরকারের ক্ষতি বা রাজস্ব হ্রাস না হয়, সেই কয়টি বাবদে ব্যয় ব্যতীত সংরক্ষিত বিভাগের আর সব ব্যয় তিনি মঞ্জুর করিলেন।

"হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে তিনি কয়টি বাবদে ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন—সব নহে। কতকগুলি ব্যয় নূতন বলিয়া লিখিত হইলেও সরকার পূর্ব্ব হইতে সেগুলির জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—কাযেই সেগুলি মঞ্জুর করা হইবে। এইরূপে স্থানীয়-প্রতিষ্ঠানসমূহে সে অর্থ-সাহায্য করা হইবে বলা হইয়াছিল, সে সাহায্য করা হইবে। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা ব্যয় মঞ্জুর না করা পর্য্যন্ত বাজেটে প্রার্থিত উন্নতিকর বা লোকের কল্যাণকর কার্য্যের ব্যয় মঞ্জুর করা হইতে পারে না। এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে বেরারে কয়টি রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ, কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জলসংস্থানের ব্যবস্থা, হাঁসপাতালের উন্নতিসাধন, কৃষির উন্নতিসাধন বাবদে পরীক্ষা প্রভৃতি আছে।

"এই সব কায স্থগিদ রাখায় অবশ্যই প্রদেশের উন্নতির গতি প্রহত হইবে এবং ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণফলে হস্তান্তরিত বিভাগসমূহেরই অধিক ক্ষতি হইবে। সেই ... বিভাগেরই উন্নতির অধিক প্রয়োজন।

"ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণের পর ... বেতন দিতে পারেন না। ফলে মন্ত্রী ... হইবে। কাযেই গভর্ণরকে হস্তান্তরিত ... ভার লইতে হইয়াছে এবং ভারত সরকা... শাসনের দিকে অগ্রসর হইবার যে উপায় ... জনীয়, মধ্য প্রদেশ তাহাতেই বঞ্চিত হই...

প্রায় এই সময়েই (২১শে মার্চ্চ) ... ল্লাই সকরে য়োতমালে যাইয়া বলেন, ... শোচনীয়; সেই জন্য সরকার সে সকলে... এবার লক্ষ টাকা দিবেন স্থির করিয়াছি... স্থাপক সভা বাজেট না-মঞ্জুর করায় তাহ... তিনি আইনতঃ এরূপ নূতন কাযের জন্য ... পারেন না। স্বরাজ্য দলের কাযের ত... ব্যবস্থাপক সভা মতপরিবর্ত্তন না করিলে ... ভাঙ্গিয়া না দিলে এ অবস্থার পরিবর্ত্তন হই...

অর্থাৎ সার ফ্রাঙ্কল্লাই লোকের কাছে ... চাহিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সভার অধি... না-মঞ্জুর করায় লোকের ক্ষতি হইয়াছে।

এ বিষয়ে এ কথাও বলা যাইতে পা... সভা যদি খরচ না-মঞ্জুর করেন এবং সঙ্গে ... রাজস্বদান বন্ধ করিতে না পারেন, তবে ... কারের কাযে বাধা দিতে চাহেন, সেই ... অধিক অর্থ তুলিয়া দিয়া সরকারকে সে ... বার সুযোগ প্রদান করা হয়। মধ্য প্রা... হইতে এ বিষয়ে কোন উত্তর পাওয়া যা... অতঃপর তাঁহারা কি উপায়ে সরকারকে ... চাহেন বা বিব্রত করিবার আশা করেন, ... নাই। কেবল ২৫শে মার্চ্চ তারিখে ডাক্তার মুঞ্জী ... 'হিন্দু' পত্রের প্রতিনিধিকে যাহা বলিয়াছে... বিষয়ে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে।

ডাক্তার মুঞ্জীর মত এই যে, সরকার ... ব্যবস্থা ... তাহা বুঝিয়া স্বরাজ্য দলকে কার্য্যপদ্ধতি ... তিনি বলিয়াছিলেন, এরূপ অবস্থায় সরকার ... পথ অবলম্বন করিতে পারেন—

(১) গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া আইনের ৫২এ ধারা অনুসারে সরকার মধ্য প্রদেশ ও বেরার ...

ঘোষণা করা হইতে পারে। তাহা হইলে সপার্ষদ গভর্ণরের নির্দ্ধারণানুসারে মধ্য প্রদেশের জন্য সে আইনের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন পরিবর্জ্জন হইতে পারে।

(২) সরকার ইচ্ছা করিলে আইনের সঙ্গে যে নিয়ম আছে, তদনুসারে হস্তান্তরিত বিভাগগুলি বন্ধ করিয়া অর্থাৎ এখন কিছুকালের জন্য স্বতন্ত্র হস্তান্তরিত বিভাগের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সে কায করিতে হইলে পূর্ব্বাহ্ণে ভারত-সচিবের অনুমতি লইতে হয় এবং সেরূপ ব্যবস্থার জন্য কালও নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।

(৩) ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলে। কিন্তু তাহাতে ৬ মাস পরে আবার নূতন করিয়া নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া সভা গঠিত করিতে হয়।

(৪) বর্ত্তমানে যখন ২ জন মন্ত্রীই পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সদস্যের বিশ্বাসভাজন কেহই মন্ত্রীর কায লইতে স্বীকার করিতেছেন না, তখন আইন অনুসারে গভর্ণর হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন।

(৫) যখন ব্যবস্থাপক সভার যে দলের সংখ্যাধিক্য, সে দলের কেহই মন্ত্রীর কায করিতে সম্মত নহেন, তখন গভর্ণর ভারত সরকার আইনের আবশ্যক পরিবর্ত্তন জন্য তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারীদিগের নিকট আবেদন করিতে পারেন।

তখনও, বোধ হয়, সরকারের রেজলিউশন ডাক্তার মুঞ্জীর হস্তগত হয় নাই; কিন্তু দেখা যায়, তখনই ডাক্তার মুঞ্জী মনে করিয়াছিলেন, গভর্ণর চতুর্থ পথই অবলম্বন করিবেন। কারণ, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আগামী বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুনরায় বাজেট পেশ করিবার সময় পর্য্যন্ত আর ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করান প্রয়োজন হইবে না।

অবশ্য দেখা গিয়াছে, ডাক্তার মুঞ্জীর অনুমানই সত্য। মধ্য প্রদেশের গভর্ণর মন্ত্রীদিগের পদত্যাগে স্বয়ং হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কিন্তু এখন কি হইবে? গভর্ণর নিজের হাতে হস্তান্তরিত বিভাগের ভার লইয়াছেন; অর্থাৎ দ্বৈতশাসন নষ্ট হইয়াছে। এখন স্বরাজ্য দল কি করিবেন?

ডাক্তার মুঞ্জী বলেন—কংগ্রেস এই দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাই হইল। অতঃপর অসহযোগ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার কি করা কর্ত্তব্য, তাহা কংগ্রেসকে নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

ডাক্তার মুঞ্জীর মত লোক যে ভবিষ্যতের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তবে তিনি হয় ত ইহার পর দেশবাসীর কর্ত্তব্য কংগ্রেস হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে চাহেন; সেই জন্যই বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কংগ্রেসই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে কংগ্রেসে বহুমত ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষে অকুণ্ঠ কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করিলে স্বরাজ্য দল সে মতের পরিবর্ত্তনসাধন জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন কেন? এখনও দেশে অধিকাংশ লোক ব্যবস্থাপক সভার মোহে মুগ্ধ নহে। ব্যবস্থাপক সভা যে অসার, তাহা বুঝাইবার জন্য স্বরাজ্য দলের এত সময়, উদ্যম ও অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল না। মহাত্মা গন্ধীর ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের কথাতেই দেশের লোক তাহা বুঝিয়াছিল। তাঁহারা তাহা বুঝাইয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমবারের নির্ব্বাচনে দেশের জাতীয় দলের কোন লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন নাই।

মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার বলিয়াছেন, মধ্য প্রদেশ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই স্বরাজ্য দলকে সুর নামাইতে হইয়াছে। সেই মধ্য প্রদেশের বিজয়ী স্বরাজ্য দলও কি হস্তান্তরিত বিভাগের কায এইভাবে অচল করিয়া দিবার পর কর্ত্তব্য কি, তাহা বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন নাই?

বাঙ্গালার স্বরাজ্য দল মন্ত্রীদিগের বেতন না-মঞ্জুর করা ব্যতীত হস্তান্তরিত বিভাগে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের উপায় করিতে পারেন নাই। মধ্য প্রদেশে তাহা হইয়াছে। এখন তথায় কোন্ পথ অবলম্বিত হইবে? দেশের লোক কি তাহা জানিতে চাহিতে পারে না?

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

তাহারা দস্যুবৃত্তি করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাবরের বয়স এখন ৪০ বৎসর। সে ৩ বার বিবাহ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্ব ২ স্ত্রী জীবিত থাকিলেও কোনও কারণে তাহাদের সহিত বাবরের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই। বাবরের তৃতীয় পত্নী আজকাল তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া বেড়াইত। পুলিসের উৎপাতে বাবর কখনও নিজ বাটীতে রাত্রিযাপন করিতে পারে নাই ;—মাঠের মধ্যে, বনে জঙ্গলেই তাহার অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। বাবরের ৫ ভ্রাতা ও জননী এখন কারাগারে দণ্ডভোগ করিতেছে।

বাবর প্রথম জীবনে কনষ্টেবলের কায করিত। এক দাঙ্গামামলার জন্য তাহাকে পলাতক হইতে হয়। তাহার পর হইতেই সে ডাকাইতী করিতে আরম্ভ করে।

বাবরের বাটী খানাতল্লাস করিয়া পুলিস কয়েক হাজার টাকা গহনা প্রভৃতিতে পাইয়াছে। তাহার জমী-জমা ও অন্যান্য সম্পত্তিও পুলিস বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছে। জমীগুলি বাজেয়াপ্ত হইলেও বাবরের ভয়ে বা অন্য কারণে কেহ উহা চাষ-আবাদ করে না।

অধ্যাপক রমণ

অধ্যাপক রমণ

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমণ সংপ্রতি বিলাতের রয়াল সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বেও এই সম্মান ভারতবাসীর পক্ষে অনধিগম্য ছিল, বলিয়াই লোক মনে করিত। বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণার আদর এই সোসাইটীর সদস্যপদপ্রাপ্তিতে প্রকাশিত হইত।

মাদ্রাজের গণিতজ্ঞ—কুশাগ্রবুদ্ধি—স্বল্পায়ু যুবক রামানুজম যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কৃষ্ণাঙ্গ হইলেও সোসাইটী তাঁহার প্রতিভার আদর না দেখাইয়া থাকিতে পারেন নাই।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় উভয়েই স্ব স্ব বিভাগে অসাধারণ মৌলিক গবেষণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বসু মহাশয় উদ্ভিদের প্রাণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে জড়বাদী যুরোপের কাছে এমনই বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল যে, যুরোপের বৈজ্ঞানিকরা মনে করিয়াছিলেন, প্রাচীর দার্শনিকোচিত কল্পনা-প্রাবল্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। শেষে কিন্তু বসু মহাশয়ও রয়াল সোসাইটীর সদস্য (ফেলো) মনোনীত হইয়াছেন।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রকে সভা সদস্য মনোনীত করেন নাই। অনেকের বিশ্বাস, তিনি যে রাজনীতিক মত প্রচার করিয়া থাকেন, তাহারই ফলে তিনি বহু ইংরাজের অপ্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাঁহার রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত না হইবার তাহাও অন্যতম কারণ।

হইয়াছিলেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ডাক্তার আন্নান্দেল বহু দিন সে সম্মান উপভোগ করিতে পারিলেন না। গত ২৮শে চৈত্র কলিকাতায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা আশা করি, অধ্যাপক রমণ অতঃপর নূতন নূতন মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

বিলাতের বৈজ্ঞানিক সভাসমূহের মধ্যে এই রয়াল সোসাইটীই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়; কিন্তু, বোধ হয়, তাহারও পূর্ব্বে সভা স্থাপিত হইয়াছিল। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দেই বিজ্ঞান-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের সাপ্তাহিক সভাধিবেশন হইত। কথিত আছে, জার্ম্মাণ পণ্ডিত থিয়োডোর হাক লণ্ডনে অবস্থানকালে সর্ব্বপ্রথম এই সাপ্তাহিক সভা ... করেন।

ভারতবর্ষে প্রথম প্রতীচ্যপ্রথায় বিজ্ঞান ... যেরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে এ দেশেও সম্ভবতঃ ... জন্য বৈজ্ঞানিক সভা প্রতিষ্ঠার সময় আসিয়াছে। কলিকাতার আচার্য্য বসুর বিজ্ঞানাগারের সহিত ... সভা প্রতিষ্ঠিত করিলে হয় না?

মেজর হাসান সুরাবর্দ্দী

ডাক্তার হাসান সুরাবার্দ্দী এবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প... সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ... হইয়াছিলেন। সুরাবার্দ্দী ... পূর্ব্বপুরুষরা ভারতের ... ভারতে আসিয়াছি... তাঁহারা মেদিনীপুরে ... ছেন।

ডাক্তারের অগ্রজ ... সুরাবার্দ্দী কলিকাতার বিশ্ব... এবং কলিকাতা বিশ্ব... জন অধ্যাপক।

এই সুরাবার্দ্দী পরিবা... ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া... জাহিদ সুরাবার্দ্দী হাই... তাঁহার পুত্র মিষ্টার স... সুরাবার্দ্দী ... ব্যবহারাজীব ও বঙ্গীয় ব... অন্যতম সদস্য। নূতন ... কর্পোরেশনে ইনি ডেপুটী ... অল্ডারম্যান মনোনীত ...

ডাক্তার হাসান সু... ইণ্ডিয়ান রেলের ডাক্তার ... লিলুয়ায় ছিলেন।

ডাক্তার সুরাবার্দ্দী ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার পর প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার কটন এইরূপ ...

করিয়াছিলেন যে, তিনি কোন প্রস্তাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতে অর্থাৎ ভোট দিতে পারিবেন না। সভাপতির এই নির্দ্ধারণে অনেক সদস্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। একবার জনরব উঠিয়াছিল, তিনি বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী হইবেন।

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে এক জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবির তিরোভাব হইল। মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় খুলনায় সিভিল সার্জ্জন ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ৩ পুত্রকে বিদ্যালাভার্থ বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুত্রত্রয়ের মধ্যে মনোমোহন ও অরবিন্দ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অরবিন্দ পরে সাহিত্য হইতে সরিয়া রাজনীতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মনোমোহন সাহিত্যসেবাতেই অবিচলিত ছিলেন। তিনি যখন বিলাতে পাঠার্থী ছিলেন, তখনই তাঁহার কবি-প্রতিভার বিকাশ হয় এবং বিলাতের উদীয়মান কবিদিগের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন।

তিনি এ দেশে আসিয়া ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন এবং ছাত্রদিগকে অতি যত্নসহকারে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। ছাত্রদিগকে সাহিত্যরসিক দেখিলে তিনি পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

মনোমোহন যখন বিলাতে সাহিত্যিকদলে যোগ দেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ রচনা লাভের আশা করা গিয়াছিল, সেরূপ কোন রচনা তিনি সাহিত্য-ভাণ্ডারে দিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহাও অল্প মূল্যবান্ নহে।

মিষ্টার ডান

মিষ্টার ডান বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার কয় দিন পরেই নৌকায় গঙ্গা পার হইবার সময় জলে পড়িয়া তিনি প্রাণ হারাইয়াছেন।

মিষ্টার ডান।

মেদিনীপুর সাহিত্য সম্মিলন

মেদিনীপুরে স্থানীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় বৎসর বৎসর সাহিত্য সম্মিলন হইয়া থাকে। এবারও সে সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার সভার ডাক্তার শ্রীযুক্ত

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা।

নরেন্দ্রনাথ লাহা সভাপতির ছিলেন। তাঁহার অভিভাষ কথার সঙ্গে সঙ্গে মেদিনী পরিচয় প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মত উপযোগী হইয়াছিল।

মেদিনীপুর সাহিত্য স বিজয়কৃষ্ণ খাঁন। তিনি সু সুচিন্তিত ও সুলিখিত অ বিশেষ পরিচয় ছিল। এ সাহিত্যের ক্রমোন্নতির স হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত র

দিল্লী লেজিসলেটিভ এসেম্ব্লীর এ

রঙ্গাচারী এসেম্ব্লীর ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জনরব, বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল শেষ হইলে তিনিই প্রেসিডেণ্ট হইবেন।

কুমার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ খাঁন।

শ্রীযুক্ত রঙ্গাচারী

সম্পাদক—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

... "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।